CUC-H04256-1-0120623
120623
CUC-H04256-1-0120623

সপ্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড] [শ্রাবণ, ১৩৪৬—পৌষ, ১৩৪৬

[বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অন্তঃপুর	শ্রীপ্রভারাণী মুখোপাধ্যায়	৭৫
অন্তঃপুর-শিক্ষা [পঞ্চাশ বৎসরের কথা]	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৮২৯
অপরাধী (গল্প)	শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য	৭৮৪
অভিশাপ (কবিতা)	শ্রীগোপাল ভৌমিক	১৭৭
অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য	শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ	৭৯
অহিংস সৈন্য (সচিত্র গল্প)	শ্রীপ্রভাত দেব সরকার	৪৯৯
আকবর কি নিরক্ষর ছিলেন ?	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৭৪
আছে মোর ছায়া (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৫৩৭
আদর্শের বিপর্য্যয় (উপন্যাস)	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	৬৭, ২০২, ৪০২
আভাস (কবিতা)	শ্রীঅপরাজিতা দেবী	১০০
আমি কবি কাঁদি বেদনায় (কবিতা)	শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৫৯
ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্য	শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ	৪৮৩
একটি গ্রীক উপাখ্যান	শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩২৮
একটি গ্রীক উপাখ্যান (রস-রচনা)	শ্রীশচীবিলাস সামন্ত	৭৯৩
একটি ভৌতিক কাহিনী (রস-রচনা)	শ্রীশচীবিলাস সামন্ত	৫৩৮
একটি সেকালের গান (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দত্ত	৪৩৬
ঔরংজীবের আমলে কয়েকটী বিদ্রোহ	শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মা	৯২
কবি (গল্প)	শ্রীঅমলাদেবী	৪৪৪
কাহিনী (রস-রচনা)	শ্রীচারুলতা রায় চৌধুরী	২৬৩
কিষণগড় (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ	৫২৩
কালীপূজা	শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬৭১
কৃষিঋণ ও দেশীয় মহাজন	শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়	৬৪
ক্ষয় রোগ	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	২৭৭
খলিসাদহের বিল (কবিতা)	শ্রীগোপেশ্বর সাহা	৭৩০
খুদিরাম (গল্প)	শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার	২৫৮
গণৎকার (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৬৯
গুরুদেব (সচিত্র রস-রচনা)	শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য	৭৮[illegible]
গ্রামের কথা	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১১[illegible]
চুরি (গল্প)	শ্রীবিনয় চৌধুরী	[illegible]
জননী জগদ্ধাত্রী (কবিতা)	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	১৩[illegible]
জল-বুদ্‌বুদ (গল্প)	শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়	৫২[illegible]
জীবন অপরিমেয় (কবিতা)	শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ	৮[illegible]
জীবন-চিত্র (নক্‌সা)	শ্রীবিজনবালা দেবী	৪০, ২১১, ৩৪৯, ৪৪১, ৬০১, [illegible]
টিপু সুলতান ও নেপোলিয়ান	শ্রীমন্মথনাথ সরকার	[illegible]৫
তুমি (কবিতা)	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	[illegible]৫
তোমার উপমা (কবিতা)	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	[illegible]৭
ত্রিপুরী-রহস্য (আলোচনা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত	১৩৯
দেশ-প্রেমী বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ভট্টশালী	২৩৭
দেশের রূপ (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ	[illegible]৭০
নাস্তিক (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	[illegible]৮৩
নারী কি অবলা	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	[illegible]২৮
নিরুদ্দেশ (গল্প)	শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	[illegible]৭৯
নূতন কথামালা (সচিত্র রস-রচনা)	শ্রীশচীবিলাস সামন্ত	[illegible]৫১
পুনরাবৃত্তি (কবিতা)	শ্রীমোহিনী চৌধুরী	[illegible]৯৫
পূজার বাজার	শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	[illegible]৫৬
পূজারিণী (কবিতা)	শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	[illegible]২২
প্রসন্ন বাবু (রস-রচনা)	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	[illegible]৯৪
প্রাক্‌-সামরিক ও যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ড (সচিত্র)	শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য	[illegible]১০
প্রাহা-পরিচয় (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীমতিলাল দাশ	[illegible]০১
প্রেম ও কাম	শ্রীবিজয়রত্ন সেনশর্ম্মা	৭৩২
ফল্গুধারা (গল্প)	শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য	১২০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গভাষার আধুনিক বিকৃতি	শ্রীহরিপদ দত্ত	৫৯৬
বঙ্গের সঙ্গীত (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৫০
বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব	শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০৮
বন্ধ্যা (অনুবাদ গল্প) [অনুবাদক—শ্রীতারাপদ রাহা]	শ্রীমতী পার্ল বাক	৫৯৩
বর্ত্তমান জগৎ (সচিত্র)	শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	২৪৫, ৪০৮
বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত	৫২
বর্দ্ধমান (কবিতা)	কাদের নওয়াজ	১১৮
বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী	শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	৩৪৫, ৫৫৬, ৭৯৯
বলটিকে রাষ্ট্রিক ঘূর্ণাবর্ত্ত (সচিত্র)	শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য	৬৩৪
বসুমতী (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দত্ত	২৮৬
বংশ-প্রদীপ (গল্প)	শ্রীকণা দত্ত	৮৫
বাঙ্গালা সাহিত্য [আলোচনা]		
কার কোথা স্থান ?	শ্রীঅজিতকুমার দত্ত	৪৯১
সাহিত্যের বন্ধন-মুক্তি	শ্রীঅমূল্য সেন	৪৯১
বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়	৪৯৭
বাঙ্গালার মৎস্য (সচিত্র)	শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	৩৩, ৭৫৯
বাঙ্গালীর লঙ্কা-বিজয়	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়	৯৬০
বাদল (গল্প)	শ্রীপ্রভাত দেব সরকার	৯৬৩
বাসে (রস-রচনা)	শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য	৯৮৮
বাংলা দেশে মেষ-চাষ	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার	৯১৪
বাংলা সাহিত্যে গল্পের সূচনা	শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য	৯০৭
বাঁকা হাসি (গল্প	শ্রীকণা দত্ত	৯৭২
বিজয়ী (উপন্যাস)	শ্রীঅপরাজিতা দেবী	৬৮২, ৯৩৭
বিশ্ব-পাঠাগারে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৫৩৭
বুদ্ধ মুর্ত্তি (কবিতা)	শ্রীঅমর ভট্ট	৬৯৬
ভাগ্যবতী (গল্প)	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুস্তফী	২৯৩
ভামতী (কবিতা)	শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	৪৩৭
ভারতের লবণশিল্প ও বঙ্গভূমি (সচিত্র)	শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ	৯৫৮
মজুর (কবিতা)	শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু	৯৬০
মধু-উৎসবে (কবিতা)	শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ	৫১৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মধ্য-বঙ্গে বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার ?	শ্রীহরিদাস মিত্র	২৬
মা (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৩
মানব শরীরে জলের উপকারিতা	শ্রীফণিভূষণ রায়	৬৪
মানস (কবিতা)	শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ	৭
মায়ের সন্ধান (কবিতা)	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী	২৪
মিছিল (গল্প)	শ্রীসু[illegible] চন্দ্র রাহা	২৪
মুক্তি (গল্প)	শ্রীসুশীলকুমার দত্ত	২২
মূর্ত (গল্প)	শ্রীমি[illegible] সেন	৬১
মৃত্যু সাংবাৎসরিক (সচিত্র)		২৮
যশোহর-পরিচিতি	শ্রীসুশীলকুমার বসু	৬৩০, ৭২
যাযাবর ইহুদী (সচিত্র)	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত	২৫
যুদ্ধ কি অপরিহার্য্য ?	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৬২
রাজযোটক (গল্প)	শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়	৫১
রাষ্ট্র-সংঘর্ষের পটভূমিকা (সচিত্র)	শ্রীবিনয় দত্ত	৪৫
রূপনারায়ণের তীরে মাটির ঘর (গল্প)	শ্রীরজত সেন	৮
শহরে শারদীয়া (কবিতা)	শ্রীমঞ্জুলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী	৫
শিক্ষার দোষ কোথায় ?	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১
শিবসঙ্কীর্ত্তন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	৬০৯, ৭
শ্রীরাধার প্রাচীনত্ব	শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭
সঙ্কলন	শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	২৫৩, ৩৩৯, ৫
সন্ধানে (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৭
সম্পাদকীয়	শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	
এ-আই. সি. সি.-র বোম্বাই অধিবেশন ও ভারতের আভ্যন্তরীণ দলাদলির দায়িত্ব		
বাঙ্গালার রাস্তার প্রসার		
পল্লী অঞ্চলের ঋণ সমস্যা		
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ও আধুনিক নেতৃত্বের নমুনা		
মুখবন্ধ		
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়		
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিচারক মিঃ বিশ্বাস		
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়		
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ এন. সি চ্যাটার্জ্জি		
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডক্টর মেঘনাদ সাহা		

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মানবজাতির সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা		২৯
রবীন্দ্রনাথের 'কনগ্রেস'		১৪৫, ২৮৫
ফরোয়ার্ড ব্লক ও তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন		১৫৬
গত মাসের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা এবং তাহা হইতে জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়		১৬৪
বাঙ্গালার হিন্দু-সংগঠন আন্দোলন		২৯১
বক্তৃতাসমূহের বিশ্লেষণ		২৯৬
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা		২৯৬
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা		২৯৭
মিঃ এস. কে. রায়চৌধুরীর বক্তৃতা		২৯৭
মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলারক্ষক দণ্ড		২৯৯
'চক্রকে'র নিদর্শন		৩০১
ইহা কি বৃটিশ রাজনীতিবেত্তৃত্ব ?		৩০৭
বাঙ্গালা সরকারের ভ্রান্তির নিদর্শন		৩০৯
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন ও স্যর এন, এন. সরকার		৩১৬
বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য		৩২১, ৪৩২
দুর্গাপূজা ও বর্ত্তমান কাল		৪২১
ইহা কি মনুষ্যোচিত না পশূচিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া ?		৪৩২
গীতা-বিচার		৫৬১, ৬৯৭
মোক্ষ-যোগ-বিচার		৫৬৮, ৬৯৭
ভারতে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের সম্ভাব্য পরিণাম		৫৭৪
ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি		৫৭৬
দেশের আসন্ন বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে		৫৭৯
যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা		৫৮২
বড়লাট ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য		৫৮৩
বেলজীয়-ওলন্দাজ শান্তি-প্রস্তাব		৫৮৬
স্বকীয় প্রশংসায় মিঃ গান্ধী		৫৮৮
বাঙ্গালার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ		৫৮৯
ধর্ম্ম ও জাতীয়তা		৫৯১
ছাত্রবৃন্দের নেতৃত্ব		৭০৬
বাঙ্গালা সরকারের পল্লীসংস্কার পরিকল্পনা		৭১৩
কংগ্রেস কি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলিয়াছে ?		৭১৭
মাননীয় মিঃ এন. আর. সরকারের "ভারতবাসীর দৃষ্টিতে যুদ্ধসংক্রান্ত অর্থনীতি"		৭১৯
সংগ্রহ	শ্রীনীলরতন কর	২১৮,৩৯৫
সংগ্রহ (সচিত্র)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	১৩৫
সংবাদ ও মন্তব্য		২৮
সাহিত্য ও সমাজ	শ্রীবিমলেন্দু সান্যাল	৭
সাহিত্য বাস্তবতা	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	৭২৫
সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা	শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৪৭,২৩০,৮০৮
সুইডেনের স্মৃতি (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীমতিলাল দাশ	৩৮২
সুবোধ মাষ্টার (গল্প)	শ্রীঅমলা দেবী	৩৮৯
স্বদেশ আমার ঘুমে অচেতন (কবিতা)	শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৮৫
স্বপ্ন-দেউল (কবিতা)	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	৪৫৫
স্বপ্ন-সৌধ (গল্প)	শ্রীবেণুকর বসু	৬২৫
স্বাধীনতা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৪৩৫
স্থিতি ও গতি (উপন্যাস)	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ	১০৭,১৮৫,৩৭৩-৫৪৮,৬৫৯,৮০
হামবুর্গ (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীমতিলাল দাশ	৮
হে আদর্শ, হে ঈশ্বর ! (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৭২
হেড-লাইন (সচিত্র গল্প)	শ্রীরাঘবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৪২৩
হেঁয়ালি নং ৩ (কবিতা)	কস্তচিদবেস্বস্ত	৩২
হেঁয়ালী নং ৪ „	কস্তচিদবোস্রস্ত	২৬৩
হেঁয়ালী নং ৫ „	কস্তচিদবোস্রস্ত	৫৬০

লেখক-সূচী

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত
- কার কোথা স্থান [আলোচনা – বাঙ্গালা সাহিত্য] — ৫৯১

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়
- কৃষিকুল ও দেশীয় মহাজন — ৬৪

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ভট্টশালী
- দেশ-প্রেমী বঙ্কিমচন্দ্র — ২৩৭

শ্রীঅপরাজিতা দেবী
- আভাস (কবিতা) — ১০০
- বিজয়ী (উপন্যাস) — ৬৮২,৭৩৭

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
- আছে মোর ছায়া (কবিতা) — ৫৩৭
- বজ্রের সঙ্গীত (কবিতা) — ২০
- বিশ্ব-পাঠশালে (কবিতা) — ৩৩৭
- হে আদর্শ, হে, ঈশ্বর ! (কবিতা) — ৭২৮

শ্রীঅমর ভট্ট
- বুদ্ধ মূর্ত্তি (কবিতা) — ৩৬

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
- মায়ের সন্ধান (কবিতা) — ২৪৮

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
ভামতী (কবিতা) ৪৬৭
শ্রীঅমলা দেবী
কবি (গল্প) ৪৪৪
সুবোধ মাষ্টার (গল্প) ৩৮৩
শ্রীঅমূল্য সেন
সাহিত্যের বন্ধন মুক্তি [আলোচনা—বাঙ্গালা সাহিত্য] ৪৯৪
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়
বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব ৬৩৮
শ্রীনককভূষণ মুখোপাধ্যায়
আমি কবি কাঁদি বেদনায় (কবিতা) ৩৫৯
স্বদেশ আমার ঘুমে অচেতন (কবিতা) ৪৮২
শ্রীকণা দত্ত
বংশ-প্রদীপ (গল্প) ৮৪
বাঁকা হাসি (গল্প) ২৭২
কস্তচিদবোধস্ত
হেঁয়ালী নং ৩ (কবিতা) ৩২
হেঁয়ালী নং ৪ (কবিতা) ১৬৯
হেঁয়ালী নং ৫ (কবিতা) ৪২০
কাদের নওয়াজ
বর্দ্ধমান (কবিতা) ১১৮
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
জননী জগদ্ধাত্রী (কবিতা) ১৩৮
তোমার উপমা (কবিতা) ৪০৭
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ
স্থিতি ও গতি (উপন্যাস) ১০৭, ১৮৪,৩৭৩,৫৪৮,৫৫৯,৮১৬
শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালার মৎস্য (সচিত্র) ২৩,৭৫১
শ্রীগোপাল ভৌমিক
অভিশাপ (কবিতা) ১৭৪
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
কিষণগড় (সচিত্র ভ্রমণ) ৫২৩
দেশের রূপ (সচিত্র ভ্রমণ) ১৭০
শ্রীগোপেশ্বর সাহা
খলিসাদহের বিল (কবিতা) ৭৩০
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
জল-বুদ্‌বুদ (গল্প) ৫২৮
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্ন বাবু (রস-রচনা) ৬৯৪
শ্রীচারুলতা রায়চৌধুরী
কাহিনী (রস-রচনা) ২৬৩
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ
ভারতের লবণ-শিল্প ও বঙ্গভূমি (সচিত্র) ৬৮৮
শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ
জীবন অপরিমেয় (কবিতা) ৮১৫
শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়
বর্ষ-প্রবন্ধ-পঞ্জী ৩৪৪,৫৪৪,৭৯১
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শিব সঙ্কীর্ত্তন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল ৬০৯,৭৪৩
শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়
তুমি (কবিতা) ৭৭৫
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র
সাহিত্যে বাস্তবতা ৭২৫
শ্রীনিখিল সেন
মৃত (গল্প) ৬১
শ্রীনীলরতন কর
সংগ্রহ ২১৮, ৩৯৪
শ্রীমতী পার্ল বাক্
বন্যা [অনুবাদ (গল্প)—শ্রীতারাপদ রাহা] ৫৯৫
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার
বাংলা দেশে মেষ-চাষ ৪১
শ্রীপ্রভাত দেব সরকার
অহিংস সৈন্ত (সচিত্র গল্প) ৪৯
বাদল (গল্প) ৩৫
শ্রীপ্রভারাণী মুখোপাধ্যায়
অন্তঃপুর ৭৫
শ্রীফণিভূষণ রায়
মানব শরীরে জলের উপকারিতা ৬৪
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
রাজযোটক (গল্প) ৫
শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য
প্রাক্-সামরিক ও যুদ্ধোত্তর পোলাণ্ড (সচিত্র) ৫
বল্টিকে রাষ্ট্রিক ঘূর্ণাবর্ত্ত (সচিত্র) ৬
শ্রীবিজনবালা দেবী
জীবন-চিত্র (নক্সা) ৪০, ২১১, ৩৪৯, ৪৪১, ৬০১, ৭
শ্রীবিজয়রত্ন সেন শর্ম্মা
প্রেম ও কাম ৭৮
শ্রীবিনয় চৌধুরী
চুরি (গল্প)
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ
যাযাবর ইহুদী (সচিত্র)
রাষ্ট্রসংঘর্ষের পট-ভূমিকা (সচিত্র)
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
গণৎকার (গল্প)
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
স্বপ্ন-দেউল (কবিতা) ৩
শ্রীবিমলেন্দু সান্যাল
সাহিত্য ও সমাজ
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য
গুরুদেব (সচিত্র রস-রচনা)

বাসে (রস-রচনা) ৪৮৮
বাংলা সাহিত্যে গল্পের সূচনা ২০৭

শ্রীবেণুকর বসু
স্বপ্ন-সৌধ (গল্প) ৩২৬

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ
অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য ৭৯
উনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্য ৪৮৩

শ্রীমতিলাল দাশ
প্রাহা-পরিচয় (সচিত্র-ভ্রমণ) ১০১
সুইডেনের স্মৃতি (সচিত্র ভ্রমণ) ৩৮২
হামবুর্গ (সচিত্র ভ্রমণ) ৮২৩

শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ
মানস-পূজা (কবিতা) ৭৮

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী
শহরে শারদীয়া (কবিতা) ৫৫৯

শ্রীমন্মথনাথ সরকার
টিপু সুলতান ও নেপোলিয়ান ১৭৫

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়
আদর্শের বিপর্য্যয় (উপন্যাস) ৬৭, ২০২, ৪০২

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
নাস্তিক (কবিতা) ১৮৩
স্বাধীনতা ৪৩৭

শ্রীমোহিনী চৌধুরী
পুনরাবৃত্তি (কবিতা) ৫৯৫

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
ত্রিপুরী-রহস্য [আলোচনা] ১৩৯

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
গ্রামের কথা ১৭৭

শ্রীরজত সেন
রূপনারায়ণের তীরে মাটির ঘর (গল্প) ৮৬৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
সঙ্কলন ২৫৩, ৩৩৯, ৫৩২
সংগ্রহ (সচিত্র) ১৩২

শ্রীবান্ধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হেড-লাইন (সচিত্র গল্প) ৪৫৪

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরাধার প্রাচীনত্ব ৭১৭

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুস্তফী
ভাগ্যবতী (গল্প) ২৩৩

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার
খুদিরাম (গল্প) ২৫৮

শ্রীশচীবিলাস সামন্ত
একটি গ্রীক উপাখ্যান (রস-রচনা) ৭৯৩
একটি ভৌতিক কাহিনী (রস-রচনা) ৫৩৮
নূতন কথামালা (সচিত্র রস-রচনা) ৬৫১

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
পূজারিণী (কবিতা) ৮৫২

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আকবর কি নিরক্ষর ছিলেন? [illegible]
যুদ্ধ কি অপরিহার্য্য? [illegible]
শিক্ষার দোষ কোথায়? [illegible]

শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মা
ঔরংজীবের আমলে কয়েকটি বিদ্রোহ [illegible]

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
অপরাধী (গল্প) [illegible]
স্বপ্নধারা (গল্প) [illegible]

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু
মজুর (কবিতা) [illegible]

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
ক্ষয়রোগ [illegible]

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদকীয়
এ.-আই.-সি.-র বোম্বাই অধিবেশন ও ভারতের আভ্যন্তরীণ দলাদলির দায়িত্ব ১
বাঙ্গালার রাস্তার প্রসার ২
পল্লী-অঞ্চলের ঋণ-সমস্যা ৩
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ও আধুনিক নেতৃত্বের নমুনা [illegible]
মুখবন্ধ [illegible]
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় [illegible]
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিচারক মিঃ বিশ্বাস [illegible]
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় [illegible]
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ এন. সি. চ্যাটার্জ্জী [illegible]
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডক্টর মেঘনাদ সাহা [illegible]
মানবজাতির সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা [illegible]
রবীন্দ্রনাথের 'কনগ্রেস' ১৪৫, [illegible]
ফরোয়ার্ড ব্লক ও তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন [illegible]
গত মাসের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা এবং তাহা হইতে জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয় [illegible]
বাঙ্গালার হিন্দু-সংগঠন আন্দোলন
বক্তৃতাসমূহের বিশ্লেষণ [illegible]
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা [illegible]
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা [illegible]
মিঃ এস. কে. রায়চৌধুরীর বক্তৃতা [illegible]
মিঃ সুভাষচন্দ্রের বসুর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলারক্ষক দণ্ড [illegible]
'চক্রকে'র নিদর্শন [illegible]
ইহা কি বৃটিশ রাজনীতিবেত্তৃত্ব? [illegible]
বাঙ্গালা সরকারের ভ্রান্তির নিদর্শন [illegible]
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাবিরোধী সম্মেলন ও স্যর এন. এন. সরকার [illegible]
বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধসম্পর্কে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ৩২৮, [illegible]
দুর্গাপূজা ও বর্ত্তমান কাল ৩২১

ইহা কি মনুষ্যোচিত না পশূচিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া? ৪৩৫
গীতা-বিচার ৫৬১, ৬৯৭
মোক্ষযোগ-বিচার ৫৩৮, ৬৯৭
ভারতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের সম্ভাব্য পরিণাম ৫৭৪
দেশের আসন্ন বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে ৫৭৯
যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা ৫৮২
বড়লাট ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ৫৮৩
বেলজীয-ওলন্দাজ শান্তি-প্রস্তাব ৫৮৬
স্বকীয় প্রশংসায় মিঃ গান্ধী ৫৮৮
বাঙ্গালার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ ৫৮৮
ধর্ম্ম ও জাতীয়তা ৫৯১
ছাত্রবৃন্দের নেতৃত্ব ৭০৬
বাঙ্গালা সরকারের পল্লী-সংস্কারের পরিকল্পনা ৭১০
কংগ্রেস্ কি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলিয়াছে? ৭১৪
মাননীয় মিঃ এন. আর. সরকারের "ভারতবাসীর দৃষ্টিতে যুদ্ধসংক্রান্ত অর্থনীতি" ৭১৭

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
ত্রিপুরী-রহস্য [আলোচনা] ১৩৯

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ
মধু-উৎসবে (কবিতা) ৫০৯

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
নিরুদ্দেশ (গল্প) ৪৭৯
বর্ত্তমান জগৎ (সচিত্র) ২৪২, ৪০৮

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা
মিছিল (গল্প) ২৪৯

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
মা (গল্প) ৩৩৩
সন্ধানে (গল্প) ৭৫৩

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
কালীপূজা ৬৭১

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়
নারী কি অবলা ১২৮

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
একটি গ্রীক উপাখ্যান

শ্রীসুশীলকুমার দত্ত
মুক্তি [গল্প] ২২৪

শ্রীসুশীলকুমার বসু
যশোহর পরিচিতি ৬৩৫, ৭৯০

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
পূজার বাজার ৫৫৯
সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা ৪৭, ২৩০, ৮০৮

শ্রীহরিদাস মিত্র
মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃসংস্কার ২৬১

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যে জাতীয়তা [আলোচনা—বাঙ্গালা সাহিত্য] ৪৯৭

শ্রীহরিপদ দত্ত
একটি সেকালের গান (কবিতা) ৪৩৬
বঙ্গভাষার আধুনিক বিকৃতি ৫৯৬
বসুমতী (কবিতা) ২৮০

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
অন্তঃপুর-শিক্ষা [পঞ্চাশ বৎসরের কথা] ৮২৯

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ রায়
বাঙ্গালীর লঙ্কা-বিজয় ৩৬০

চিত্র-সূচী

অবতরণ (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৪১৬
অহিংস সৈন্য
মুরারি-দা হাসিয়া উঠিলেন ৫০০
আজ আমাদের বক্তৃতা করবার সময় নয় ৫০১
যে যেমন কাজ করবে ৫০২
মুকুন্দ আগাইয়া গেল ৫০৩
মুকুন্দ তাহার গাল টিপিয়া ধরিল ৫০৫
ভাঙ্গা স্বাস্থ্য, ভাঙ্গা মন ৫০৬
একটা বিড়ি দিতে পারেন? ৫০৭
আমিই জ্বেলেছি দীপ (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৪৩৬
আল্পস (একবর্ণ) ৪৮০
ইস্কিয়া দ্বীপ (একবর্ণ) ৫২৮
একটি মুখ (দ্বিবর্ণ)
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ ২৪৮
একতার তরে (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১২৪
গুরুদেব
মুণ্ডিত মস্তকে ও অর্দ্ধোলঙ্গ বেশে ৭৮১
শুভ্র চিকুর, শ্মশ্রু ও টুপি আলখাল্লা সমন্বিত ৭৮৩
গুহাভিমুখে! (কার্টুন)
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত ৭৩৫
কাপ্রি দ্বীপের নিসর্গ দৃশ্য (একবর্ণ) ৪৬৪
কিষণগড়
কিষণগড় দুর্গ — শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ ৫২৫
রাজপুত " ৫২
যুদ্ধ " ৫২৫

ফুলমহল প্যালেস ও কিষণগড় : শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ ৫২৫
রাজপুতানা ৫২৬
সীমাহীন প্রান্তর ৫২৬
কিষণগড় ষ্টেট গেষ্ট-হাউস ৫২৭
কুক ও চ্যান্সেলর (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৫২
গর্দ্দভ ও চালক (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৬৮
চক্ষের নিমিষে (কার্টুন)
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত ৭০৬
চেরা (দ্বিবর্ণ—ফোটোগ্রাফ)
শ্রীগৌরচরণ বসু ১৭৬
ছুটির সাথী (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১৯৬
জুয়াড়ী (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১৯৭
জেনোয়া (একবর্ণ) ৭৮৮
দক্ষিণেশ্বর (দ্বিবর্ণ ফোটোগ্রাফ)
পি. গোস্বামী ৭৫২
দেশের রূপ
কাসাই নদী শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ ১৭০
স্নানের ঘাট ১৭১
ঘর-সংসার ১৭২
খিড়কীর পুকুর ১৭৩
দ্বার-বিভ্রাট (কার্টুন)
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত ৭২৪
ধবলগিরি (দ্বিবর্ণ ফোটোগ্রাফ) ৬০৮
ধাত্রী (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ২৩৬
ধীবর (ত্রিবর্ণ)
শ্রীবাসুদেব রায় প্রচ্ছদ, পৌষ
নকলে নাকাল (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ২৩৭
নয়া হুকুম (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৩৬০
নিরুপায় (ত্রিবর্ণ)
শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত প্রচ্ছদ, ভাদ্র
নূতন কথামালা
একটি নূতন ধরণের প্রাণী গাধার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল ৩১২
গাধার অশান্তিকর জীবনে বৈচিত্র্য আসে ৩৫৩
প্রায়ই যুদ্ধ বাধিতে লাগিল ৩৫৫
তাহারা সভা করিয়া ঘোড়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ আনিল ৩৫৬
প্রাক্-সামরিক ও যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ড
আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত পোল-সৈনিক ৫১২
প্রেসিডেণ্ট ইগ্নাসি মসিস্কি [illegible]
কর্ণেল জোসেফ বেক [illegible]
জেনারেল ষ্টাচিভিস্ব্র [illegible]
মার্শাল এডওয়ার্ড স্মিগলি-রিজ [illegible]
পোল্যাণ্ডের মানচিত্র [illegible]
প্রাহা পরিচয়
সেণ্ট ভিটাস গির্জ্জা [illegible]
পুরাতন সহরের ব্রিজ-টাওয়ার [illegible]
পুরাতন সহরের একটি রাস্তা [illegible]
গোল্ডন লেন [illegible]
চার্লস ব্রিজ ও ক্যাসল [illegible]
পর পর চারিটি ব্রিজের সংস্থান [illegible]
বারিপ্লবক্ত [illegible]
সাধারণ দৃশ্য [illegible]
ন্যাশনাল থিয়েটার [illegible]
চেক ব্রিজ ও ক্যাসল [illegible]
হিব্রু অক্ষরলাঞ্ছিত ক্রুশচিহ্ন [illegible]
চকের মোড় [illegible]
টাউন হলের গম্বুজ-ঘড়ী [illegible]
বল্টিকে রাষ্ট্রিক ঘূর্ণাবর্ত্ত
হের হিটলার [illegible]
মঃ মলোটভ [illegible]
ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন ও তাহার সৃষ্ট দানব (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী [illegible]
বড়দিনের উপহার (কার্টুন)
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত [illegible]
বর্ণশ্রী (ত্রিবর্ণ) প্রচ্ছদ, কার্ত্তিক
বর্ত্তমান জগৎ
মিঃ নেভিল চেম্বারলেন [illegible]
আধুনিক শিকারি আদর্শ (ব্যঙ্গচিত্র) [illegible]
হিটলারের স্বরূপ (ব্যঙ্গচিত্র) [illegible]
হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনী [illegible]
হিটলারের চেষ্টা (ব্যঙ্গচিত্র) [illegible]
মার্শাল স্মিগলি-রিজ [illegible]
মিঃ নেভিল চেম্বারলেন [illegible]
হের হিটলার [illegible]
রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ [illegible]
ব্যারন হিরানুমা [illegible]
প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট [illegible]
বাঙ্গালার 'টুবাডুর'-দল (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী [illegible]
বাঙ্গালার 'নাইট'-যুগল (কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী [illegible]
বাঙ্গালার মৎস্য
শল্কহীন পোনা—Leather carp ৩৩
অর্দ্ধশল্ক পোনা—Mirror carp ৩৪
রুই ৩৪
নাদিম (রুই-কাতলা) [illegible]
জুংঘা ৩৫

গোরিয়া ৩৬
কালবোস ৩৬
পুঁটী-বাটা ৩৭
ভাঙ্গন-বাটা ৩৭
স্বর্ণশফর ৩৮
স্বর্ণশফর ৩৭
তিতপুঁটী ৩৯
চাঁদা-মৌরলা ৭৩০
ডানকোনা ৭৩১
ইলিশ ৭৩২
আমলেট ৭৩২
হেরিং ৭৩৩
খয়রা (চাপলে) ৭৩৩
গাংদাঁড়া ৭৩৪
খড়কেঠুঁটী ৭৩৪
খীর্ধে ৭৩৫
ভাঙ্গন ৭৩৫
পারশে ৭৩৬
বড় ডানকোনা ৭৩৬
দাঁড়কে ৭৩৬
সোণাখড়কে ৭৩৭
জেব্রাধানি ৭৩৭

বাগ্নীস্নান (দ্বিবর্ণ ফোটোগ্রাফ) পি. গোস্বামী ৭৯২

ব্রাশ টি ট্রমেন্ট (দ্বিবর্ণ) -শ্রীগোবর্দ্ধন আশ ৮৪

ভারজিন ও শিশু (দ্বিবর্ণ) ভেরোক্কিয়ো ৫৫২

ভারতের লবণ-শিল্প ও বঙ্গভূমি
কঁরকচ লবণের ট্যাঙ্ক ৬৮৯
'সোলার বেড' ৬৮৯
ইরাণী চাকার জলনিষ্কাশন ৬৯০
নৌপদায় লোণাজল গর্ত্ত করিয়া তোলা হইতেছে ৬৯০
লবণের স্তূপগুলিকে দরমা ঢাকা দেওয়া হইতেছে ৬৯১
মাদ্রাজের লবণ চাষ ৬৯১
টিউটিকর্ণ লবণ-ক্ষেত্র ৬৯২

ভারতীয় পিগ ম্যালিয়ন (কার্টুন্)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৩৩১

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু (কার্টুন্)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৪৪৩

মাউন্ট এৎনা (একবর্ণ) ৪৬৪

মেরী মাতা ও শিশু যীশু
জাঁ দেল কুর ৪৫২

মৃত্যু-বাৎসরিক
রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২৮৪

যাত্রা (ত্রিবর্ণ) শ্রীহিমাদ্রী সেন
প্রচ্ছদ—আশ্বিন

যাযাবর ইহুদী
যীশুখৃষ্টের বিচারকালীন পাইলেট কর্ত্তৃক জনতাকে তাঁহার নির্দ্দোষিতার কথা ঘোষণা—অ্যান্টনিয়ো সিজেরী ২৬৫
পিটার —লিন্ট ২৬৬
জর্ডান নদীতে লোকসমাগমের দৃশ্য ২৬৭
যীশুখৃষ্টের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জার ঘন্টা ২৬৮
যীশুখৃষ্টের আদিমতম প্রতিমূর্ত্তি ২৬৮
খৃষ্টের জীবনের একটি ঘটনা —বারোকচিয়ো ২৬৯
জেথসিমেনের একটি প্রাচীন জলপাই বৃক্ষ ২৭০
যীশুখৃষ্টসহ পিতামাতার মিশরে পলায়ন— মুরিলো ২৭১

রাষ্ট্রসংঘর্ষের পটভূমিকা
মানচিত্র ৪৬১
মানচিত্র ৪৬৩

রোম শহরে মুসোলিনি-ফোরাম (একবর্ণ) ৪৪৮

লাগান হ্রদের সূর্য্যাস্ত (একবর্ণ) ৪৪০

লিগুরিয়েন রিভিয়েরা (একবর্ণ) ৪৭২

শ্রাবণ-বেলা (ত্রিবর্ণ) শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
প্রচ্ছদ—শ্রাবণ

শ্রীদুর্গা (দ্বিবর্ণ) শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
প্রচ্ছদ—কার্ত্তিক

সংগ্রহ
ডক্টর অ্যালেক্সিস ক্যারেল ১৩৩
মার্শাল চিয়াং কাই-শেক ১৩৪
মাদাম চিয়াং কাই-শেক ১৩৫

সুইডেনের স্মৃতি
ষ্টকহলম : পার্ক ৩৮২
ষ্টকহলম : বিভিন্ন দৃশ্য ৩৮৩
ষ্টকহলম : বিভিন্ন দৃশ্য ৩৮৪
ষ্টকহলম : নিসর্গ ৩৮৫

সোরেন্টো সমুদ্র তীর হইতে দৃষ্ট বিষুবিয়াস (একবর্ণ) ৫২০

স্নানার্থিনী (ত্রিবর্ণ) শ্রীইন্দুগুপ্ত ৩৭২

স্মৃতি (ত্রিবর্ণ) শ্রীগোবর্দ্ধন আশ প্রচ্ছদ—অগ্রহায়ণ

হামবুর্গ
ক্রুনার পরিবার ৮২৩
এলব নদীর সেতু ৮২৪
আলষ্টার হ্রদের ষ্টীমার-ষ্টেশন ৮২৫
টাউন-হল ৮২৫
নিকোলাস গীর্জ্জা ৮২৬
এলব নদীর সুড়ঙ্গ-দ্বার ৮২৬
পার্কের প্রবেশ-দ্বার ৮২৭
বন্দরের দৃশ্য ৮২৭
খাল ৮২৮
সেট পৌলির ঘাটির পাশের রাস্তা ৮২৮

হেড লাইন
আমাদেরই শাস্ত্রে আছে ৪৫৪
অভিরাম বাবু ৪৫৫
হাসির আওয়াজটা ৪৫৬
জজগিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন ৪৫৭

হ্যামলেট (দ্বিবর্ণ কার্টুন)
শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৪৯

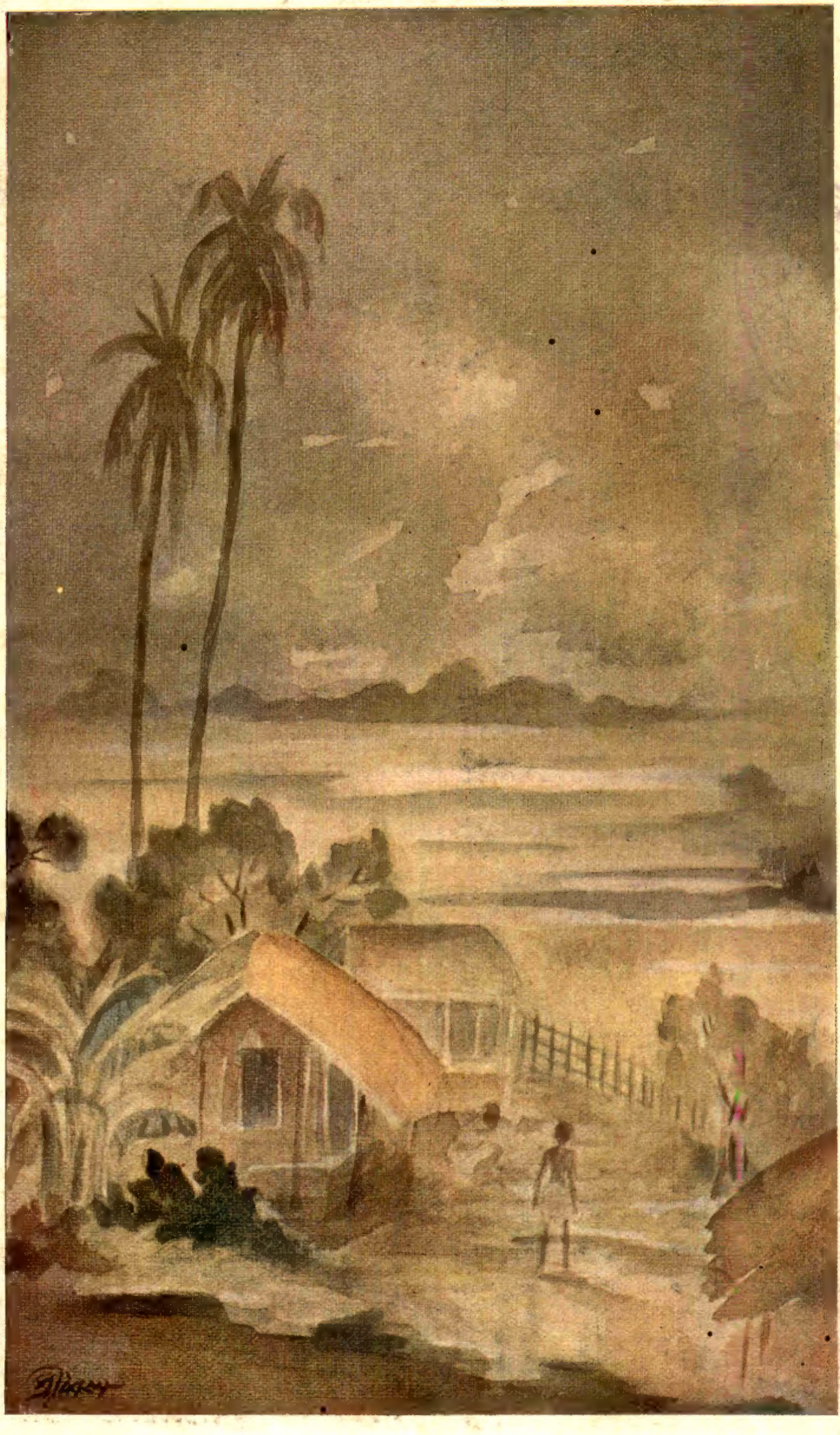

শ্রাবণ-বেলা [শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গশ্রী

শ্রাবণ—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

এ-আই. সি. সি-র বোম্বাই অধিবেশন এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ দলাদলির দায়িত্ব*

দেশের আর কোন নায়ক অপেক্ষা মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দই ভারতের বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ দলাদলির নিমিত্ত অধিকতর দায়ী, ইহা আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত। আমরা এমন কথা একেবারেই বলিতে চাহি না যে, মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানী দেশের মধ্যে ঐক্য গঠনের ইচ্ছা পোষণ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যাবলী যথাযথ-ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঐক্য-গঠনের নীতি ও প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতার নিমিত্তই দেশের মধ্যে ক্রমশঃ দলাদলি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দেশবাসী কষ্ট পাইতেছে। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, যদি নিজেদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য বাঞ্ছনীয় হয়, তবে যাহাতে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা, এমন সকল বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া, যে-সকল বিষয়ে ঐকমত্যের নিশ্চিত সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয়ের শরণ লইতে হয়। কিন্তু, দেশের মধ্যে যে-সব বিষয় সকলেই একবাক্যে সমর্থন করিবেন, মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানী তাহা নেপথ্যে রাখিয়া, যাহাতে দেশের মধ্যে মতপার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, তদ্বিষয়েই সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন। এই ভাবেই "মহাত্মা"র ছদ্মবেশে পাপাত্মা কর্ত্তৃক দেশের মধ্যে পাপের প্রসার হইতেছে, এবং ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাকে মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের পক্ষে পর্য্যন্ত আশঙ্কা-জনক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

গত জুন মাসের শেষ ভাগে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ২৪শে জুন হইতে ঐ অধিবেশন সূচিত হয় এবং চারি দিন ধরিয়া কার্য্য চলে।

প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

(১) সিংহলের সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় অধিবাসীদের বহিষ্কার-চেষ্টা কার্য্যের প্রতিবাদ।

* ইংরাজীতে লিখিত ও 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী' (The Weekly Bangashree) পত্রিকার ১৯শে জুন তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল সন্দর্ভ হইতে অনূদিত।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের (ভারতবাসিগণকে) স্বতন্ত্রীকরণ প্রস্তাবের নিন্দা।

(৩) কংগ্রেস ব্যাপারে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতকে পৃথক্‌করণ।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে প্রধানতঃ নিম্নের বিষয়-সমূহক প্রস্তাব আনীত ও গৃহীত হয়:

(১) পর পর তিন বৎসর কংগ্রেসের সদস্য না থাকিলে কেহ প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

(২) যে ব্যক্তি বিদেশী অথবা বিলাতী বস্ত্রের কারবার করেন কিংবা মদ্য-ব্যবসায়সংশ্লিষ্ট অথবা মদ্যপ, তিনি কোন কংগ্রেস কমিটিতে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনসম্পর্কিত ব্যক্তিকে কোন নির্ব্বাচক কংগ্রেস কমিটী সদস্য পদ কিংবা দায়িত্ব-সূচক কার্য্য হইতে দূরে রাখিবেন।

(৪) প্রাদেশিক নির্ব্বাচন (election tribunal) অধিকরণ-নিয়োগ।

তৃতীয় দিবসে প্রধানতঃ প্রস্তাবের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

(১) সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পূর্ব্ব অনুমতি ব্যতীত কোন কংগ্রেসী ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিরুপদ্রব আইন-প্রতিরোধ অভিযাননিবারণ।

(২) লোক-সমষ্টির অনুপাতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনব্যবস্থা।

(৩) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহ ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে কি সম্পর্ক থাকা উচিত, তাহা নির্দ্দিষ্টীকরণ।

শেষ দিবসে নিম্নের দুইটি বিষয়ে প্রস্তাব আলোচিত হয়:

(১) ডিগবয় শ্রমিক বিবাদ।

(২) অন্ধ্র প্রদেশের পৃথক্‌করণ।

যদি সমগ্র অধিবেশনের প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রস্তাবের জন্য যে-সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার একটিও এমন নহে, যাহাতে দেশের মধ্যে তীব্র মত-বিরোধ আনয়ন করিবে না।

সম্ভবতঃ, সিংহল সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় অধিবাসী-দিগকে বহিষ্কৃত করিবার কার্য্যের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, —যখন দেশবাসীর অধিকাংশের অনাহার-সমস্যার সমাধান-কল্পে একতার একান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, একতা অপেক্ষা আর কিছুই যখন অধিকতর বিবেচনীয় নহে এবং যদি দেখা যায়, এই প্রকার প্রতিবাদের ফলে কোন না কোন রূপ অনৈক্যসৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে,—তখন এই শ্রেণীর প্রতিবাদ, এমন কি যদ্যপি তাহারা বিশেষ ভাবেও যুক্তিযুক্ত হয়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থপূরণার্থে অবশ্য স্থগিত রাখা বিধেয়। সিংহল সরকারের বিরুদ্ধে সুযৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক যে কোন প্রতিবাদই কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার এবং তাহার সমর্থনকারীদের মধ্যে কোন না কোন প্রকার বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে বাধ্য। যদি আশা থাকিত যে, কংগ্রেসের এই কার্য্যে দেশবাসী অধিকাংশের সমর্থন বিদ্যমান এবং নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিত যে, এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মিলিত ভারতবাসীর বৃহৎ ও শক্তিমান্ দল গঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে এই শ্রেণীর অনৈক্যসৃষ্টি সমর্থন করা চলিত। কিন্তু, তাহা তো নহেই, উপরন্তু দেখা যাইবে যে, শতকরা নিরানব্বই জন ভারতবাসীরই এই শ্রেণীর ব্যাপারে কোন স্বার্থ নাই এবং এতদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে বাধ্য। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে এই প্রতিবাদের স্বপক্ষে পাওয়া গেলেও কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ও তাহার সমর্থনকারী ব্যক্তিদের যে শক্তিশালী দল বর্ত্তমান, তাহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। মোটামুট ফল দাঁড়াইবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং ভারতবাসী অধিকাংশের স্বার্থসিদ্ধির কোন সহায়তা না করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে—সামান্য হইলেও, অনৈক্যসৃষ্টি। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের স্বতন্ত্রীকরণ-বিষয়ক নিন্দা-প্রস্তাবের ফলও ঐ একই দাঁড়াইবে।

ভারত হইতে ব্রহ্মদেশকে স্বতন্ত্র করিবার প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয় মহাসভার পরিধিকে ক্ষুদ্র করিতে বাধ্য এবং উহার ফলে ভারতবাসীর এক শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হইতেও বাধ্য, কেন না এইরূপ স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাবের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় প্রকার দলই বিদ্যমান।

যাঁহারা পর পর তিন বৎসর কংগ্রেসের সদস্য নহেন, তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি করিতে অস্বীকার-প্রস্তাব,—যাঁহারা এই ভাবে তিন বৎসর সদস্য না থাকিয়া কংগ্রেসের

প্রতিনিধি হইতে চাহেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম হইবে না—তাঁহাদিগকে রুষ্ট করিতে বাধ্য। হইতে পারে যে, এই প্রস্তাব দ্বারা মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানী কংগ্রেস হইতে তাঁহাদের অবাঞ্ছিতদের অনেককে দূরে রাখিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে এই ভাবে দূরে রাখা হইবে, তাঁহারা দেশের স্বার্থের দিক্ হইতে অবাঞ্ছিত হইতেও পারেন, না-ও হইতে পারেন। যে ভাবেই হউক, ভারতবাসীদের এক শ্রেণীর মধ্যে এই প্রস্তাবে নিশ্চিত ও তীব্র মত-বিরোধ সৃষ্টি করিবে।

কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনে ব্রিটিশ মালের এবং বিদেশী কাপড়ের ব্যবসায়ীদের, মদ্য-ব্যবসায়ীদের, তথা মদ্যপদের যোগদান প্রতিরোধ করিবার প্রস্তাব এমন একটি পরিকল্পনা, যাহা কার্য্যকরী করা কঠিন এবং ইহার ফলে কংগ্রেস কমিটী হইতে ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মনিপুণ, তাঁহারাই বিতাড়িত হইতে বাধ্য। বর্ত্তমানে ভারতের বাস্তব অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার মত বুদ্ধি-সামর্থ্য কাহারও থাকিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবৃন্দ মোটামুটি শিল্প-ব্যবসায়ী, বণিক্, স্বাধীন-পেশাজীবী, শিক্ষাব্রতী এবং কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র শিল্প-ব্যবসায়ী এবং বণিক্রাই কেবল দেশের মধ্যে টাকা-কড়ি খাটাইয়া থাকেন। হইতে পারে যে, স্বাধীন-পেশাজীবী, শিক্ষাজীবী এবং রাজকর্ম্মচারীদের বুদ্ধিবৃত্তিতেও গুরুত্ব আরোপের যথেষ্ট সুযুক্তি রহিয়াছে, কিন্তু ইহাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে, শিল্প-ব্যবসায়ী এবং বণিক্দের তুলনায় দেশের মধ্যে টাকা আদান-প্রদানের ব্যাপারে তাঁহাদের স্বার্থ অতি নগণ্য। সুতরাং ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠানে যদি শিল্প-ব্যবসায়ী এবং বণিক্ না থাকেন, তবে তাঁহারা অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা যে প্রকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান হইত, তদপেক্ষা অনধিক দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানে তাহা পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। এক্ষণে যদি ব্রিটিশ মালের ব্যবসায়ীদের কংগ্রেস কমিটীতে যোগদান বন্ধ করা হয়, তাহার ফল দাঁড়াইবে যে, কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প-ব্যবসায়ী কিংবা বণিক্ই তদন্তর্ভুক্ত থাকিবেন না, কেন না, ব্রিটিশ মালের ব্যবসায় না করিলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন শিল্প-ব্যবসায়ী কিংবা বণিক্ লাভবান্ হইতে পারেন না। এই সহজ সত্য কথাটি বুঝিবার মত অভিজ্ঞতা মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর না থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের হাতে-কলমে শিল্প-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই উক্তি অপর সকল অভ্রান্ত বিষয়েরই অন্যতম। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যদি মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর এই প্রস্তাব কার্য্যে গৃহীত হয়, তবে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা নির্ব্বোধ ও অর্ব্বাচীনদের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইবে। যে-ভাবেই হউক, কংগ্রেস কমিটীতে ব্রিটিশ মালের ব্যবসায়ীদের যোগদান রহিত করিবার প্রস্তাব দেশের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিতে বাধ্য, কেন না দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্প-ব্যবসায়ী এবং বণিক্গণ কংগ্রেসকে দূরে রাখিয়া চলিতে পারেন না, সুতরাং প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে তাঁহারা মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর পাপ-নেতৃত্ব যাহাতে বস্তুতঃ শিথিল হয়, তদনুযায়ী কার্য্য পরিকল্পনা করিতে বাধ্য।

কংগ্রেস কমিটী হইতে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যবৃন্দকে বাদ দিবার প্রস্তাবও এমন একটি পরিকল্পনা, যাহা প্রথমতঃ সুবুদ্ধিমূলক এবং সুপবিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, ইহাও দেশের মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য; কেন না দেশের মধ্যে এমন একজন রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ, যিনি কোন না কোন রূপে সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন নহেন। যদি সাম্প্রদায়িকতার অর্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তথাকথিত গান্ধী-বাদের অনুচররাও বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য। যদি তাঁহারা তাহা না হইতেন, তবে নিজের দল ভারী করিবার নিমিত্ত কংগ্রেস হইতে ইহাকে ও উহাকে বহিষ্করণের প্রচার ও প্রয়াস করিতে পারিতেন না। যদি দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য হইত, কিংবা কংগ্রেস যাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদারচিত্ত এবং বিন্দুপরিমাণ সাম্প্রদায়িকতা কিংবা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য মনোভাবদুষ্ট না হইতেন, তবে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু, যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস-পরিচালনা এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হস্তে ন্যস্ত, অপর সকল সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের

তাঁহা হইতে বিতাড়িত করার তখন কোন অর্থই হয় না। এই প্রকার চেষ্টা যে, প্রকাশ্যে হউক্ গোপনে হউক, অধিকতর কলহ ও বিবাদের কারণ হইতে বাধ্য, তাহা বুঝা কষ্টসাধ্য নহে।

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রতিরোধসূচক প্রস্তাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, কেন না, মিঃ গান্ধী যে কি পরিমাণ ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন এবং সঙ্কীর্ণচিত্ত, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। হিন্দুদের সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার নিমিত্ত হিন্দু সমাজ-নেতাগণই প্রথম এই শ্রেণীর 'ঘরোয়া শাস্তি'র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মনুষ্যোচিত কাণ্ডজ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই সন্ধান লইলে বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা উদ্দেশ্যপূরণে ব্যর্থ হয়, কিন্তু তথাপি মিঃ গান্ধীর বিবেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে বাধে নাই। এখন যখন তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থায় তাঁহাকে অপরে শিক্ষা দিতে চাহে, তাহাতে তিনি প্রতিবাদ করেন কি হিসাবে? এই জন্যই আমরা বলিতেছি দেশবাসীর মস্তিষ্কশক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে রাজনীতির ক্ষেত্রে আইন-অমান্য আন্দোলনের এবং অসহযোগের প্রবর্ত্তক মিঃ গান্ধীকে তাঁহারা নেতা হিসাবে মানিয়া লইতেন না। ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, আইন-অমান্য আন্দোলন এবং অসহযোগ, উভয়ই সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ গান্ধী গোড়াতেই গলদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং এই বর্জ্জনের ব্যাপারে অধুনা হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না, কেন না, একদল বিবেকবুদ্ধিহীন যুবক ইহা লইয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এখন ইহা স্থগিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইলে অনৈক্যের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আইন-অমান্য অপেক্ষাও ফল খারাপ দাঁড়াইবে।

লোক-সমষ্টির অনুপাতে প্রতিনিধিনিয়োগ-পরিকল্পনা ঘোঁট পাকাইবার চেষ্টা বাড়াইয়া তুলিবে এবং চিন্তাশীল লোকের কংগ্রেসে যোগদানের পথে ইহা অন্তরায় উপস্থিত করিবে। যদি দেশের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষার নামে যে কুশিক্ষা চলিতেছে, তাহাতে লোক-সমষ্টির অনুপাতে প্রতিনিধি-নিয়োগের এই পরিকল্পনা নানাভাবে দ্বন্দ্ব-কলহ এবং উৎকোচদান বৃদ্ধি করিতে বাধ্য। ইহা অবশ্য উপলব্ধি করিতে হইবে যে, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ ব্যতীত ঘোঁট পাকানো চলিতে পারে না।

শাসন-পরিচালনার দিক্ হইতে দেখিলে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নামে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কবল হইতে নিষ্কৃতিদানের চেষ্টার পশ্চাতে, যথেষ্ট সুযুক্তি থাকিতে পারে এবং যদি কংগ্রেসী মন্ত্রিবৃন্দ সচ্চরিত্র ও প্রয়োজনীয়-গুণবিশিষ্ট হইতেন, তবে ইহাকে ঠিক কাজ হিসাবে দেখা যাইত, কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার ফলে উৎকোচ-দান এবং অন্যায় স্বৈরাচার বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে শেষতঃ কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বর্ত্তমান মতানৈক্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং ইহাকেও দেশের মধ্যে অনৈক্য-সৃষ্টির আর একটি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সমর্থন সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, দেশের শ্রমশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অজ্ঞতার উহা অন্যতম উদাহরণ। যদি দেশের মধ্যে শিল্প-বিস্তার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না যে, শ্রমিকদের বেতনের হার সর্ব্বনিম্ন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং শ্রমিকরা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগকর্ত্তাদের নির্দ্দেশ ও কার্য্যপ্রণালী মানিয়া চলিতে বাধ্য হয় তাহারও বিধি-ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। কোন প্রকার শ্রমিক-ধর্ম্মঘটকে উৎসাহিত করা দূরে থাক্, নিয়োগ-কর্ত্তা এবং শ্রমিকপক্ষের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তৃতীয় পক্ষের তাহাতে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। হইতে পারে যে, নিয়োগকর্ত্তার অন্যায়-ভাবে লাভের পথ বন্ধ করা উচিত এবং যাহাতে শ্রমিকগণ কমপক্ষে তাহাদের যাহা প্রাপ্য, তাহা পাইতে পারে, তাহার নিমিত্ত আইন-কানুন হওয়ারও হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু যদি নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি সামান্য মাত্র শ্রদ্ধাও থাকে, তাহা হইলে কোন অবস্থাতেই শ্রমিকদের প্রতি নিয়োগকর্ত্তার আচরণে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত করা উচিত নহে। সুতরাং ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট কোন সদসদ্‌বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পারেন না এবং দেশের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোকের অভাব হইবে না। সুতরাং

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক ইহার সমর্থন-প্রয়াস দেশের মধ্যে নিশ্চিত অনৈক্য আনয়ন করিবে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি; তাহা হইতে পরিস্ফুট হইবে যে, যদ্যপি মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানী প্রতিক্ষণই একতার নিমিত্ত চীৎকার করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের কার্য্যের ফলেই দেশে অধিকতর অনৈক্যের সৃষ্টি হইতেছে। ফলে মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বগ্রহণের পূর্ব্বে দেশে যেখানে দুইটি কি তিনটি উল্লেখযোগ্য দল বিদ্যমান ছিল, সেইখানে তাঁহার সঙ্কীর্ণদৃষ্টি নেতৃত্বের পরিচালনায় অসংখ্য ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইয়াছে।

যদি দারিদ্র্য; বেকার, ব্যক্তিগত নফরগিরী, অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তিরূপ অনুপেক্ষণীয় সমস্যা-সমূহের সমাধান প্রকৃত লক্ষ্যের বিষয় হয়, তবে ভারতবাসী-দিগকে সর্ব্বতোভাবে মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর নেতৃত্ব হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ কাগজের নোট ছাপান এবং ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা তৈয়ারীর ক্ষমতা, রেল ও মোটর-রাস্তা, ব্রিজ ও আধুনিক বাণিজ্যকেন্দ্ররূপ সহরসমূহের রক্ষা ও বিস্তার বন্ধ রাখিবার এবং জলপথ প্রসারের ক্ষমতা মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত না করেন, ততদিন যেন কংগ্রেস কর্ত্তৃক কোন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গৃহীত না হইতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই সকল ক্ষমতালাভের চেষ্টায় দেশবাসীকে বিবাদ বাধাইবার, কিংবা ভীতিপ্রদর্শনের মনোভাব দেখাইলে চলিবে না। ইহাও অবশ্য সত্য যে; ঐ সকল ক্ষমতা চাহিলেই পাওয়া যাইবে না। সুতরাং দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রথমে আর্থিক সমস্যা-সমূহের সমাধানার্থ দাবী উপস্থিত করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, ঐ দাবী ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়।

যদি আর প্রত্যেকটি বিষয় উপেক্ষা করিয়া দেশবাসী, এমন কি বিচ্ছিন্ন ভাবেও আর্থিক সমস্যা সমাধানের দাবী উপস্থিত করিতে পারে, তবে অনতিবিলম্বে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্র ঐ দাবী উত্থাপিত হইয়াছে এবং আপনা হইতেই সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, কেন না দেশের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ঐ দাবীর প্রতি সহানুভূতি রহিয়াছে। যদি দেশের মধ্যে এইভাবে আন্তরিক ঐক্য-সংস্থান সম্ভব হয়, তবে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ হয় দেশবাসীর বিবিধ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, না হয় যে-সকল অধিকার যাচ্ঞা করা হইবে তাহা দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

এখনও কি দেশবাসী মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর নির্ব্বুদ্ধিতা ও পাপাচরণ উপলব্ধি করিবেন না?

বাঙ্গালায় রাস্তার প্রসার*

বাঙ্গালার প্রখ্যাত অর্থ সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি এই প্রদেশের রাস্তার প্রসারার্থ নির্দ্দিষ্ট একটি কর্ম্ম-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন সাংবাদিক ও কর্ত্তাস্থানীয়গণ মিঃ সরকারের এই পরিকল্পনার প্রচুর তারিফ করিয়াছেন। যদি এই পরিকল্পনাটীকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, যদ্যপি আপাতদৃষ্টিতে ইহার প্রকল্পয়িতার যথেষ্ট কার্য্যশৃংখলার জ্ঞান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ পক্ষে ইহা দেশবাসীর প্রতি প্রাথমিক দায়িত্বপালন পক্ষে অপরিহার্য্য ভাবে মন্ত্রীদিগের যে মস্তিষ্ক-সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহারই অভাবের পরিচায়ক। যদি দেশের মধ্যে অনাহার, দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা বিরাজ না করিত, তবে হয়ত ভারতের প্রত্যেক মন্ত্রিসভাই নিজেদের কার্য্যকুশলতা প্রমাণ করিয়া, তাঁহাদের ঘৃণার্হ স্তাবকবৃন্দ তাঁহাদিগের যে প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, দেশের মধ্যে অনাহার, দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা বিরাজমান এবং এই সকল সমস্যার দিক্ হইতে দেশবাসীর অবস্থার সংস্কারের কথা ধরিলে দেখা যাইবে যে, দেশের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার একটি ব্যক্তিও নিজের সামান্য মাত্র যোগ্যতা-প্রমাণেও এতাবৎ কৃতকার্য্য হন নাই।

* ইংরাজীতে লিখিত ও 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী (The Weekly Bangashree)'-র ৬ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল সন্দর্ভ হইতে অনূদিত।

মিঃ সরকারের বিবৃতির প্রথমাংশে উল্লিখিত হইয়াছে,

"বর্ত্তমানে রাস্তার প্রসারার্থ কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি নাই। সমগ্র প্রদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কোন কার্য্যক্রম লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে-সব রাস্তা তৈয়ারী হয়, তাহাদিগের বিভিন্ন কার্য্য গ্রথিত করিবার জন্ম কোন কেন্দ্রীয় নিয়ামক নাই। ফলে গ্রামাঞ্চলের যাতায়াতের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকারের রাস্তা নির্ম্মাণের তহবিল হইতে যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, আমরা যে এই পর্য্যন্ত তাহা ব্যয় করিয়া উঠিতে পারি নাই, এই ঘটনাতে আরও প্রমাণিত হয় যে, যথাবিহিত কর্ম্মপদ্ধতি গঠন করিয়া তাহা দ্রুত কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যাপারে আমরা কি পরিমাণ বিশৃংখল।"

এই বিবৃতি হইতে প্রকাশ পায় যে, বিভিন্ন রাস্তা-নির্ম্মাণ-পরিকল্পনা কার্য্য শেষ করিবার বিষয়ে, এবং ভারত সরকারের নিকট হইতে বাঙ্গালা এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ যে-অর্থ লাভ করিয়াছেন, তাহা ব্যয় করিবার ব্যাপারে মিঃ সরকার সুশৃংখল হইতে চাহেন।

অতঃপর, রাস্তানির্ম্মাণ তহবিলের প্রস্তাব অনুযায়ী বাঙ্গালা ভারত সরকারের নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন অর্থ পাইয়াছেন, তাহা ব্যয় করিতে না পারায় কি অশোভন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন :

"অবস্থা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে রাস্তার প্রসার-কার্য্য দ্রুত চলিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে প্রদেশের রাস্তা-প্রসারার্থ একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্ম সরকার মিঃ কিংকে বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে বলা হয় যে, যে-সকল রাস্তা পাকা অথবা মূল-রাস্তা, রেলষ্টেশন, বৃহৎ সহর, উল্লেখযোগ্য বাজার-হাট ইত্যাদির শাখা-রাস্তা হিসাবে কার্য্যকরী হইতে পারে, সেইরূপ রাস্তা নির্ম্মাণ এবং তাহারই উন্নতির প্রতি তিনি যেন বিশেষ ভাবে মনোযোগী হন এবং রেলরাস্তার সহিত যাহাতে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইতে পারে, তদ্রূপ রাস্তা-নির্ম্মাণ যথাসম্ভব বাদ দিতে তাঁহাকে বলা হয়; তিনি তাঁহার পরিকল্পনাতে ট্রাঙ্ক-রাস্তা, জিলা-সংযোজক বড় রাস্তা, জিলার অন্দরে বড় এবং ছোট রাস্তা এবং রেলষ্টেশন কিংবা ষ্টীমার ষ্টেশনের ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন শাখা-রাস্তা ইত্যাদি বিভাগ করিয়াছেন।"

মিঃ সরকারের এই উক্তি হইতে প্রকাশ যে, তিনি যে কেবলই তাঁহার কাজে-কর্ম্মে সুশৃংখল হইতে চাহেন তাহা নহে, কি ভাবে সুশৃংখল হইতে হয়, তাহাও তাঁহার জানা আছে। ইহা যথোচিত, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বাঙ্গালায় রাস্তার প্রসার কি জন-সাধারণের প্রকৃত হিতসাধক হইবে।

এই প্রদেশে রাস্তার বিস্তার প্রদেশবাসীর পক্ষে প্রকৃত হিতসাধক হইবে কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, কি জন্ম রাস্তার প্রয়োজন। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, রাস্তার প্রয়োজন প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে, (১) জন-সাধারণের পথ চলিবার জন্ম, এবং (২) মালপত্রের চালানীর জন্ম। ইহা হইতে ধরিতে পারা যায় যে, পথ চলিবার মত স্বাস্থ্যশালী লোক না থাকিলে কিংবা এক স্থান হইতে অন্যত্র চালানী দিবার মত উদ্বৃত্ত মালপত্র না থাকিলে রাস্তা কাহারও কোন প্রয়োজনেই লাগে না।

এই কথা হইতেই আরও বুঝা যাইবে যে, দেশবাসীর পক্ষে রাস্তার এইরূপ প্রসার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ হইতে পারে, যদি দেখা যায় যে, ইহার ফলে জন-সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা আছে এবং উদ্বৃত্ত মাল উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অন্ম পক্ষে যদি দেখা যায় যে, রাস্তার বিস্তারে জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের অপকর্ষের এবং জমির উর্ব্বরাশক্তি-হ্রাসের আশঙ্কা বিদ্যমান, তবে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, জমির উপর দিয়া রাস্তার বিস্তার মনুষ্যজাতির পক্ষে অভিশাপ-স্বরূপ এবং সর্ব্বথা ইহা বর্জ্জনীয়।

এইবার আমরা প্রথমতঃ পরীক্ষা করিব যে, রাস্তার বিস্তারে জমীর উর্ব্বরাশক্তি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, না ইহা হ্রাসের আশঙ্কা। তৎপরে আমরা পরীক্ষা করিব যে, উহা জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ না অপকর্ষ সাধন করিবে।

রাস্তার বিস্তারে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা অথবা হ্রাসের আশঙ্কা, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে জানিতে হইবে জমীর উর্ব্বরাশক্তির নিমিত্ত অতি অবশ্য প্রয়োজন কি। এই বিষয়ে যৎসামান্য অনুসন্ধান করিলে পরিস্ফুট হইবে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অথবা উৎপাদন-সামর্থ্য সমপরিমাণ রস ও তেজের সংমিশ্রণের মধ্যে নিহিত। ইহাও পরিলক্ষিত হইবে যে, যদি জমীর অভ্যন্তরে অতিরিক্ত মাত্রায় তেজ

বিদ্যমান থাকে, ইহা মরুভূমি-সদৃশ হইয়া পড়ে এবং আবার অতিরিক্ত মাত্রায় রস বিদ্যমান থাকিলে, ইহা জলাভূমিতে পরিণত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই জমীর উৎপাদন-সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু, যদি সম অনুপাতে তেজ ও রস বিদ্যমান থাকে এবং যদি তেজ ও রসের তীব্রতা সমধিক রূপে বজায় থাকে, তবে জমীর উৎপাদন-সামর্থ্য সর্ব্বোচ্চ হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যদি রাস্তার বিস্তারে জমীর অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের সঞ্চয়ের সাহায্য হয়, তবে জমীর উৎপাদন-সামর্থ্যের উন্নতি হইতে বাধ্য। অন্যপক্ষে যদি দেখা যায়, রাস্তা বিস্তারে জমীর অভ্যন্তরস্থ—হয় তেজ, নয় রস কোন কিছুর সঞ্চয় ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তবে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, রাস্তার এই বিস্তার নিশ্চিত জমীর উৎপাদন-সামর্থ্য হ্রাস করিবে।

রাস্তার বিস্তারে জমীর অভ্যন্তরস্থ রস ও তেজের সঞ্চয়ে সাহায্যের সম্ভাবনা অথবা উহাতে বাধাপ্রাপ্তির আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, স্বভাবতঃ জমীর রস ও তেজের উৎস কি। সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে যে, রৌদ্র ও বৃষ্টিই জমীতে রস ও তেজ সরবরাহের একমাত্র কারণ। ইহা সত্য যে, রৌদ্র ও বৃষ্টিই জমীর রস ও তেজ সরবরাহের প্রধান কারণ, কিন্তু উহারাই একমাত্র কারণ নহে। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে যে তেজ ও রস সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহা কেবল জমীর উপরিভাগে কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু যদি জমীর অভ্যন্তরে তেজ ও রসের প্রাচুর্য্য না থাকে, তবে উপরিভাগে উহার কার্য্যের বস্তুতঃ কোন সার্থকতাই নাই। যাঁহার প্রাকৃতিক কার্য্য সমূহ যথাবিহিত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, জমীর স্বাভাবিক সংস্থান এইরূপ যে, তাহাতে জমীর অভ্যন্তরে সুপ্রচুর তেজ ও রস সঞ্চিত থাকার সর্ব্বথা সম্ভাবনা অবশ্য যদি ঐ স্বাভাবিক সংস্থান নিষ্প্রয়োজনে বাধা প্রাপ্ত না হয়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র—ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ কিংবা কোন পার্ব্বত্য ভূখণ্ড, অথবা সমতল স্থান, যেখানেই হউক না কেন জমীর চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তর বিদ্যমান বলিয়া দেখা যাইবে। সর্ব্বোপরি যে-স্তর তাহা কর্দ্দম ও বালুকা-পরিপূর্ণ, কর্দ্দমাংশ বালুকাংশ অপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় স্তরও কর্দ্দম ও বালুকামিশ্রিত, তবে ইহাতে বালুকাংশ কর্দ্দমাংশ অপেক্ষা অধিক। তৃতীয় স্তর নিছক বালুকা-মিশ্রিত এবং চতুর্থ স্তর, হয় সুগঠিত, নয় গঠনশীল খনিজে পরিপূর্ণ। এমন হয়তো দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের গভীরতার পার্থক্য বিদ্যমান, কিন্তু পৃথিবীতে এমন স্থান কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না, যেখানে এই চারিটি সুবিন্যস্ত স্তর-বিভাগ অনুপস্থিত।

সর্ব্বত্র জমীর এইরূপ চারি স্তরে সুবিন্যস্ত বিভাগ ব্যতীত আরও দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশের মধ্যে প্রবাহিত নদী-সমূহ উহাকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। জমীর এই চারিটি স্তরের মধ্যে, সুগঠিত অথবা গঠনশীল খনিজে পরিপূর্ণ সর্ব্ব-নিম্ন স্তরই জমীর অভ্যন্তরে তেজ সরবরাহের উৎস এবং নিছক বালুকা-পরিপূর্ণ তৃতীয় স্তর—যদি দেশের নদীসমূহ এই স্তর পর্য্যন্ত প্রবহমান থাকে—ইহার রস-প্রাচুর্য্যের উৎস। জমীর এই স্বাভাবিক সংস্থান পরীক্ষা করিয়া ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যদি চতুর্থ স্তরের খনিজ দ্রব্য অবিন্যস্ত না করা হয় এবং যদি দেশের নদীসমূহ তৃতীয় স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গভীর থাকে, তবে জমীর অভ্যন্তরে রস ও তেজের সরবরাহে কোন ঘাটতি হইতে পারে না। অপর পক্ষে ইহা বলা যায় যে, যদি চতুর্থ স্তরস্থিত খনিজ দ্রব্যসমূহ অবিন্যস্ত করা হয় এবং নদীসমূহের গভীরতা তৃতীয় স্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ না করে, তবে জমীর অভ্যন্তরস্থ রস ও তেজের সরবরাহে ঘাটতি পড়িতে বাধ্য এবং ইহার ফলে জমীর উৎপাদন-সামর্থ্য হ্রাস পাইতে বাধ্য।

এইবারে আমরা দেখিব, কি উপায়ে দেশের নদীসমূহের গভীরতা সর্ব্বদা তৃতীয়-স্তরস্পর্শী থাকিতে পারে। প্রাকৃতিক ঘটনা পর্য্যালোচনা করিবার যথাবিহিত সামর্থ্য থাকিলে এই বিষয়েও দেখা যাইবে যে, যদি নদীস্রোতের তীব্রতায় বাধাদান না করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি স্বতঃই নদীসমূহের গভীরতা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। নদীস্রোতের তীব্রতা কি ভাবে রক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, নদীর উৎসমুখে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত-স্বিনী থাকে, এবং বর্ষার জলধারা অঞ্চলের সরবরাহই প্রধানতঃ নদীসমূহের স্রোতের তীব্রতারক্ষায় সাহায্য করে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, নদীমুখের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীসমূহ

এবং নিম্নভূমিতে নদীপার্শ্বস্থ জলাধার অঞ্চলসমূহে যদি কোন বাধা উপস্থিত না হয়, তবে নদীসমূহের স্রোত নিশ্চিত তীব্রতম হইবে এবং তৃতীয় স্তর পর্য্যন্ত উহাদের গভীরতা রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইবে না। অন্য পক্ষে, যদি নদীমুখের স্রোতস্বিনীসমূহে এবং নিম্নভূমিতে নদীপার্শ্বস্থ জলাধার অঞ্চলসমূহে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত করা হয়, তবে নদীস্রোতের তীব্রতা হ্রাস পাইতে বাধ্য এবং শেষতঃ নদী ক্ষীণতোয়া হইতে বাধ্য—যাহার ফলে অংশেষে জমীর উৎপাদন-সামর্থ্যের হ্রাস ঘটিতে বাধ্য।

অতঃপর যদি অনুসন্ধান-প্রয়াসী হওয়া যায় যে, নদীসমূহের জলাধার অঞ্চল কোন্‌গুলি, তবে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক জমীই—নদীর যত নিকটেই অবস্থিত হউক কিংবা যত দূরে অবস্থিত হউক, কোন না কোন নদীর জলাধার অঞ্চলের অংশবিশেষ। সুতরাং ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, রাস্তার বিস্তারে নদীর জলাধার অঞ্চলে নিশ্চিত বাধা উপস্থিত হয় এবং শেষতঃ ইহাতে নদীস্রোত বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়, যাহার ফলে নদী ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং জমীর উৎপাদন-সামর্থ্যের হ্রাস ঘটে।

যে-কোন দেশে যেরূপ রাস্তার এই বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে জমীর উৎপাদন-সামর্থ্যের হ্রাস, তেমনই ইহার অন্যতর নিশ্চিত পরিণতি হইতেছে অস্বাস্থ্যের প্রসার। কোন দেশের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজন কি, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিলে আমাদের এই উক্তি বুঝা বিন্দুমাত্র কষ্টসাধ্য নহে। কোন দেশের স্বাস্থ্যকরতা বজায় রাখিবার জন্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন কি, তাহার সন্ধান-প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ম্মল বায়ুর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। অতঃপর যদি দেখিবার চেষ্টা করা যায় যে, বায়ুর অবিশুদ্ধি ঘটাইবার কারণ কি, তবে দেখা যাইবে যে, নীল আকাশ এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর অধিবাসীর কার্য্যাকার্য্যের প্রতিক্রিয়ার পক্ষে দুরধিগম্য বায়ুমণ্ডলের যে-সব স্তর, তাহারা বায়ুর অবিশুদ্ধি ঘটাইবার জন্য কোনক্রমেই দায়ী নহে,—এই অবিশুদ্ধির দায় পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের।

যদি পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে কোন প্রকার পীড়া না থাকিত এবং ফলতঃ যদি তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অবিশুদ্ধির নিঃসরণ না হইত, কিংবা জমীর অভ্যন্তরস্থ রস ও তেজের অসামঞ্জস্য-জনিত মৃত্তিকা হইতে অবিশুদ্ধ বাষ্প না নির্গত হইত, তবে বস্তুতঃ বায়ুস্তর অবিশুদ্ধ হইবার অতিমাত্রায় ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকিত। এইভাবে উদ্যোগী হইলে সন্ধানলাভ করা যাইতে পারে যে, মৃত্তিকোত্থিত বাষ্পই বায়ুমণ্ডলের অবিশুদ্ধির প্রধান কারণ।

যদি জমীর অভ্যন্তরে তেজ ও রসের সামঞ্জস্য থাকে, তবে নির্গত বাষ্পে তেমন কোন অবিশুদ্ধি থাকিতে পারে না, কিন্তু যদি জমীর অভ্যন্তরে হয় রস, নয় তেজ, কিংবা উভয়ের কোন একটির মাত্রাধিক্য ঘটে, তবে অবিশুদ্ধ বাষ্পনির্গমন সুনিশ্চিত। ইতিপূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, রাস্তার বিস্তারে নদী ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে বাধ্য, যাহার ফলে জমীর অভ্যন্তরে রস কিংবা তেজের মাত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহাও যথার্থ হিসাবে বলা যায় যে, রাস্তার বিস্তারে অস্বাস্থ্যের প্রাদুর্ভাব সুনিশ্চিত।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, রাস্তার বিস্তারে এই প্রদেশকে সুপরিপাটি করা যাইতে পারে বটে এবং এমন কি, মোটরগাড়ী ও অপরাপর যানবাহনের সহজ ও আরামদায়ক চলাচলও ইহার সহায়তায় ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু এই বিস্তারে সেই চলাচলের আরাম ভোগ করিবার মত সুস্থ জনসংখ্যার হ্রাস ঘটিতে বাধ্য এবং একস্থান হইতে অপর স্থানে চালান দিবার উপযোগী উদ্বৃত্ত উৎপন্নও হ্রাস পাইতে বাধ্য। এক কথায়, বস্তুতঃ ইহার সাহায্যে যে-শাখার উপর সুস্থ সমাজ গঠিত হইবে, সেই শাখার কর্ত্তনেরই সাহায্য করা হয়। এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছি যে, আমাদের মন্ত্রিমণ্ডল সকল দিক্ দিয়াই সুচতুর, কেবল শুধু শাসন-পরিচালনার পক্ষে যে মস্তিষ্ক-সামর্থ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও তাহা নাই বলিয়াই প্রকাশ পায়।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, জমীর উৎপাদন-সামর্থ্য এবং জন-সংখ্যার স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য নিম্নের তিনটি বিষয় সম্বন্ধে একান্ত অবহিত হওয়া প্রয়োজন :—

(১) জমীর চতুর্থ স্তরের খনিজ দ্রব্যে বিদ্যুৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন।

(২) নদীর উৎসমুখের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীসমূহের সম্পূর্ণ বাধাহীনতা-রক্ষা।

(৩) নদীসমূহের জলধার অঞ্চলে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না করা।

যন্ত্রচালিতবৎ চলিয়া বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীলাভার্থ যাঁহারা মস্তিষ্ককে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কুশিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু যতদিন না এই তিনটি বিষয়ের উপলব্ধি এবং তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবে, ততদিন জন-সাধারণ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে না। এমন একদিন ছিল, যে দিন মনুষ্য-সমাজ ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিল এবং সেই উপলব্ধির ফলে সমাজ আর্থিক অভাব ও ব্যক্তিগত নফরগিরীর যন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তখন খনিজ দ্রব্যসমূহে প্রায়শঃ কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করা হইত না, শৈলশিখরে শহর নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ ছিল, এবং মাটীর বুকে রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যাপারকে সাধারণতঃ ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত। যদি ইতিহাস যথাযথভাবে অনুধাবন করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, এমন কি একশত বৎসর পূর্ব্বেও খনিজ দ্রব্যের বাণিজ্য, শৈল-বিহার কিংবা রাস্তার বিস্তার মনুষ্য-সমাজে প্রসার লাভ করে নাই। যদি অনুসন্ধান করা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সর্ব্বশুদ্ধ রাস্তার পরিমাণ কি ছিল, তবে দেখা যাইবে যে উহার পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। হয় ত কেহ বলিবেন যে, বিজ্ঞানের সর্ব্বব্যাপী অজ্ঞতাই ইহার মূলে ছিল। তথাকথিত এই বিজ্ঞান হয় ত জনসাধারণের তখন অপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান কুধার তুলনায় অনাহার সমস্যার তীব্রতা তখন দশ ভাগের এক ভাগ ছিল না। তথাকথিত সেই অজ্ঞতার অধীনে থাকিয়া সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে সুপ্রচুর খাদ্য, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং সম্পূর্ণ শান্তি উপভোগ করা কি আধুনিক এই তথাকথিত বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করিয়া বিভিন্ন দুঃখের কবলগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা অধিক কাম্য নহে?

মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারকে আমরা এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, দলের 'পাণ্ডাগিরি'তে চাতুর্য্য দেখাইয়া জীবনে কৃতিত্বলাভ ততদিনই সম্ভব হয়, যতদিন জনসাধারণের মধ্যে অত্যধিক অনাহার কিংবা বন্যার সমস্যার প্রাদুর্ভাব দেখা না যায়, কিন্তু বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে স্থায়ী কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইবার এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত যোগ্যতার প্রয়োজন।

পল্লী অঞ্চলের ঋণ-সমস্যা*

রাস্তা-বিস্তার-পরিকল্পনা ব্যতীত বাঙ্গালার অর্থ-সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার "পল্লী-অঞ্চলের ঋণ-সমস্যা" লইয়াও একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। জনসাধারণের জন্য আমাদের মন্ত্রিবৃন্দ কি করিতে পারেন, এই বিবৃতি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই বিবৃতি হইতেও প্রকাশ পায় যে, বাঙ্গালার অর্থসচিব বাঙ্গালার কৃষিজীবীর হিতের পক্ষে বাস্তব ও সারবান্ কার্য্য করিতে যে-পরিমাণ ব্যাকুল, তদপেক্ষা আধুনিক পৃথিবীর 'বিদ্যাবাগীশ অর্থ-নীতিবিদ্'দের একজন হইবার যশ অর্জ্জন করিবার ব্যাকুলতা তাঁহার অধিক। আমরা ইহা বলিতেছি এই জন্য যে, বস্তুতঃ তিনি যদি বাঙ্গালার কৃষকদের হিতার্থ বাস্তব এবং সারবান্ কোন কার্য্য করিতে উদ্‌গ্রীব হইতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার আমূল কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হইতেন। কিন্তু, আমাদের বর্ত্তমান সন্দর্ভের পরবর্ত্তী আলোচ্য হইতে প্রমাণিত হইবে যে, তাহা তিনি করেন নাই। আধুনিক পৃথিবীর "অর্থ-নীতিবিদ্"গণকে আমরা "বিদ্যাবাগীশ" বলিয়া থাকি, কেন না তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশই অনেক কথা বলিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের বাগ্‌বিন্যাস ও শব্দচাতুর্য্যে গভীর কুশলতা দেখা যায়, কিন্তু দেশবাসী জনসাধারণের বাস্তব কল্যাণের দিক্ হইতে দেখিলে বুঝা যে, তাহাদের কার্য্য প্রায় শূন্যগর্ভ। ইহাই যদি যথার্থ না হইত, তবে ক্রমশঃ দেশবাসীর অবস্থা কিছুতে হইতে নিকৃষ্টতর হইয়া চলিত না। আমাদের মতে আধুনিক এই-

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ১৯৩৯ সনের ৬ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজিতে লিখিত মূল সন্দর্ভ হইতে অনুদিত।

সব অর্থনীতি-বিদ্‌রা অধিকাংশই আত্মপ্রতারক, কেন না ইহাঁদের আত্ম-বিশ্লেষণ নাই এবং ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না যে, যে-জন-সাধারণের জন্য কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের গালভরা নামসম্বলিত পরিকল্পনা এবং কার্য্যবিধির ফলে সেই জন-সাধারণের আর্থিক অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে।

"পল্লী-ঋণসমস্যা"র এই বিবৃতিতে মিঃ সরকার সূচনাতে নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান পল্লীঋণদানব্যবস্থার (বাঙ্গালার) কার্য্যতঃ ধ্বংস ঘটিয়াছে এবং তাহারই ফলে অনেক ক্ষেত্রে কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নূতন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঋণদান-পরিকল্পনার প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না পুরাতন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।"

আমরা মিঃ সরকারের এই যুক্তির সহিত একমত নহি। যদি কৃষকগণের সম্পূর্ণ কল্যাণই উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন প্রকারের ঋণদানব্যবস্থার দ্বারা কৃষকবৃন্দের বাঞ্ছিত কল্যাণ-সাধন সম্ভব কি না। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি-সংঘের পক্ষে ঋণ-গ্রহণ সহজলভ্য করা হয়, তবে তাহাদের ঋণ-সৌকর্য্য সাধন করিয়া সাময়িক ভাবে তাহাদিগকে সুখী ও তৃপ্ত করা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কেন না ঋণীর অবস্থা কখনও লোভনীয় হইতে পারে না। অন্য পক্ষে, যদি এমন সংগঠন ব্যবস্থিত হয়, যাহাতে জন-সাধারণ ঋণ না করিয়াও দিব্য স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত দিনাতিপাত করিতে পারে এবং তৎসঙ্গে ঋণলাভ যথাসাধ্য কঠোর করা যায়, তবে তাহা আর্থিক মঙ্গলের দিক্ হইতে দেখিলে, বাঞ্ছিত ফল প্রসব করিতে বাধ্য। সুতরাং ইহা বলিতে হইবে যে, প্রচলিত ঋণদান-ব্যবস্থা কার্য্যতঃ ধ্বংস লাভ করিয়াছে বলিয়া নূতন ও বিজ্ঞান-সম্মত ঋণদান-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে, এইরূপ যুক্তি কখনও বিজ্ঞজনোচিত নহে। মিঃ সরকারের এই যুক্তি হইতেই ইহাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন। এই ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভারতে এমন একদিন ছিল, যখন কোন ব্যক্তিরই ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হইত না, সুতরাং ঋণদান-ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন ছিল, কেন না দেশের আর্থিক সংগঠন এমন ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেকেই—যদি অবশ্য কুস্বভাব এবং কুশিক্ষার তাড়নায় উচ্ছৃংখল না হইতেন,—সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ, মিঃ সরকারের শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের ভারতের এই প্রাচীন ইতিহাস জানা নাই, কেন না, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রাচীন ভারতীয়েরা যে-ভাষায় তাঁহাদের এই সংগঠনবিধি ও তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং যে-সব পুস্তকে উহা নিহিত আছে, তাহার নাম দূরে থাকুক, সে-ভাষা পর্য্যন্ত না জানিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে কথা কহিয়া থাকেন।

মিঃ সরকার এবং তাঁহার শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের অন্ততঃ ধারণা হওয়া উচিত যে, ভারতে নিশ্চয়ই কোন প্রকার অনন্যমেয় জ্ঞান ও সংগঠন প্রচলিত ছিল, নচেৎ লিখিত ইতিহাসের প্রথম যুগ হইতেই এই দেশে আসিবার জন্য ইউরোপীয়গণ আকৃষ্ট হইতেন না। যদি মিঃ সরকার ও তৎশ্রেণীর ব্যক্তিদের আমাদের কথিত প্রাচীন ভারতেতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে তাহা প্রমাণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।

আমাদের মতে প্রত্যেক শাসক-অর্থ-সচিবের প্রাথমিক দায়িত্ব হওয়া উচিত, যাহাতে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিনা ঋণে যথাপরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাপন করিতে পারে, তদনুরূপ সংগঠন-বিষয়ক জ্ঞানলাভ এবং মিঃ সরকার এই জ্ঞান অর্জ্জন করেন নাই বলিয়া বাঙ্গালার অর্থ-নীতি-পরিচালনার কার্য্যে তাঁহাকে অনুপযুক্ত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার জন-সাধারণের পক্ষে ইহা প্রকৃতই লজ্জার ব্যাপার যে, তাহাদের অর্থ-সচিব, জন-সাধারণের আর্থিক শাসনের অ-আ-ক-খও না জানিয়া বড় বড় কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন না।

মিঃ সরকারের দ্বিতীয় মন্তব্য :

"কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের ক্রমিক হ্রাস কেবল যে কৃষিকে অলাভজনক করিয়াছে তাহা নহে, ইহা কৃষকদিগের স্তূপীকৃত ঋণভারও বৃদ্ধি করিয়াছে।"

মিঃ সরকারের এই মন্তব্যও যথার্থ নহে। এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে, শাসন-সংক্রান্ত অর্থনীতি-পরিচালনার কার্য্যে-

তথ্যানুধাবনের যেরূপ ক্ষমতা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা বক্তার নাই। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের ক্রমিক হ্রাস কৃষকবৃন্দের স্তূপীকৃত ঋণভার বৃদ্ধি করিয়াছে, এই অভিমত একেবারেই যথার্থ নহে। যদি কৃষকদের স্তূপীকৃত ঋণ বিন্দুমাত্রও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের জন্যই হইত, তবে যখন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বনিম্ন ছিল, তখন কৃষকদের ঋণ সর্ব্বাধিক হইত এবং যখন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বোচ্চ ছিল, তখন উহা সর্ব্বনিম্ন হইত। কিন্তু, যদি বাস্তব অবস্থা যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গালায় একদিন ছিল, কেবল বাঙ্গালায় কেন, আমাদের বলা উচিত, সমগ্র ভারতে অথবা এমন কি সমগ্র জগতে, যখন কৃষিজাত দ্রব্য কাগজের নোট অথবা ধাতুমুদ্রারূপ অর্থমূল্যে ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইত না। তখন যে-কোন কৃষিজাত দ্রব্য অপর কৃষিজাত দ্রব্য অথবা কড়ি প্রভৃতির ন্যায় অতি নগণ্য দ্রব্যের বিনিময়ে পাওয়া যাইত। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য একেবারে কিছুই ছিল না। যদি অনুসন্ধান করা যায়, সেই সময়ে কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তবে দেখা যাইবে যে, ঋণ তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই সময়ের পর যে-সময় আসে, তখন ধাতু-মুদ্রারূপ অর্থের কিঞ্চিৎ প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু তখনও কাগজের নোটরূপ মুদ্রা-ব্যবহার-পরিকল্পনা আবিষ্কৃত হয় নাই কিংবা ধাতুমুদ্রারূপ অর্থ বর্ত্তমান কালের ন্যায় এতখানি প্রসার লাভ করে নাই। এই দ্বিতীয় যুগে দেখা যায়, পূর্ব্বযুগের তুলনায় মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমানের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। এমন কি, এই সময়েও কৃষকদিগের নিকট ঋণ অপরিজ্ঞাত ছিল। বর্ত্তমান কাল হইতে মাত্র দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কৃষককুলের মধ্যে ঋণের অভ্যাস আরম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার প্রথম যুগেও ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদিগের ঋণের যে-পরিমাণ, তাহা বস্তুতঃ নগণ্যই ছিল এবং তথ্যাদির উল্লেখ দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কৃষকদিগের মধ্যে ঋণের পরিমাণ তেমন ভীতিজনক ছিল না। ইউরোপের মহাযুদ্ধের শেষ পর্ব্বে (অর্থাৎ ১৯১৮ হইতে ১৯২৪ সনের মধ্যে) বাঙ্গালার কৃষকদিগের ঋণের পরিমাণ সর্ব্বোচ্চ দাঁড়ায়। যদি অনুসন্ধান করা যায়, এই সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কি পরিমাণ ছিল, তবে দেখা যাইবে যে, এই কালে উহা সর্ব্বোচ্চ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে পাট মণ প্রতি তিন অথবা চারি টাকায় বিক্রীত হইত, ১৯২১ হইতে ১৯২৪ এই কয় বৎসরে উহা বিক্রয়ে মণ-প্রতি কুড়ি-পঁচিশ টাকা আসিয়াছে। চালের দাম দুই টাকা হইতে ছয় টাকায় উঠিয়াছিল। এই সময়ে সর্ব্বপ্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগের ঋণগ্রস্ততাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন কথা বলা চলে না যে, কৃষকদিগের ঋণগ্রস্ততার মূলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস। এই জন্যই আমাদের অভিমত এই, যিনি এইরূপ নিতান্ত অসঙ্গত কথা কহিবার সাহস রাখেন, সেই মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার-শ্রেণীর ব্যক্তি যে আমাদের অর্থ-সচিব হইয়াছেন, ইহা আমাদের লজ্জার বিষয়। হয়তো বলা যায় যে, অপরকে অনুকরণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে এবং অপরের নিকট হইতে যাহা তিনি শ্রবণ করেন, তাহা তিনি অনায়াসে উদ্গার করিতে পারেন এবং এই জন্য তাঁহাকে উৎকৃষ্ট একটি তোতাপাখীর যে-কৃতিত্ব, সেই কৃতিত্বও দেওয়া যায়, কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী যে, বর্ত্তমানে আমরা যে দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া যাইতেছি, সেই দুর্দ্দিনে প্রাদেশিক অর্থ-বিষয়ক পরিচালনের জন্য নিম্নে যে সব সামর্থ্যের একান্ত প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। আমরা স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা ও শ্রমশীলতা আছে এবং সেই হিসাবে তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্য-সুযোগ প্রাপ্য, কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিঃ সরকারকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা যদি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্গতির উন্নতি অভিলাষ করেন, তবে এক্ষণে তাঁহাদের সমগ্র অবস্থার আদ্যোপান্ত পুনর্ব্বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। যদি কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা কাহারও আসিয়া থাকে এবং যদি এই আর্থিক দুর্গতির প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য যথার্থ ভাবে প্রয়াস করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, কৃষকদিগের এই আর্থিক দুর্গতি যেমন দ্রব্যমূল্যের হ্রাসের নিমিত্ত নহে, তেমনই জমিদারী স্বত্বের অস্তিত্ববশতঃও নহে, নিম্নলিখিত কারণসমূহ ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

(১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদন-সামর্থ্যের হ্রাস।
(২) কাগজের নোটের প্রবর্ত্তন এবং ইহার অত্যধিক বিস্তার।
(৩) ধাতুমুদ্রার অতি-প্রসার।
(৪) দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি।
(৫) প্রজা এবং জমিদারী সম্বন্ধে যথাবিহিত কর্ত্তব্য-পালনে জমিদারদিগের অবহেলা।
(৬) কৃষি-বিজ্ঞানের নামে নির্ব্বুদ্ধিতামূলক তত্ত্বের প্রচলন।

গ্রাম অঞ্চলে ঋণদানের যে-কোন ব্যবস্থাই করা হউক না কেন, তাহাতে কৃষকবৃন্দ তাহাদিগের আর্থিক দুরবস্থা হইতে মুক্তি পাইবে না; বিভিন্ন ঋণদান-ব্যবস্থার ফলে ঋণ সহজলভ্য হইবে এবং ইহার ফলে কৃষকগণ অধিকতর ঋণজালে জড়াইয়া পড়িবে, অর্থাৎ কৃষকগণের অবস্থা আরও 'সসেমিরা' হইয়া উঠিবে।

এতদুদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য হইতেছে এমন সংগঠন-ব্যবস্থা, যাহাতে কৃষকরা ঋণ না করিয়া সুখে জীবনযাপন করিতে পারে। জনসাধারণ কর্ত্তৃক যাহাতে জমীর উৎপাদন-সামর্থ্য-হ্রাসের প্রতিবোধ হয় এবং ক্রমশঃ উহার উন্নতি হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সরকারী তহবিল হইতে কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহার জন্য, যতদিন পর্য্যন্ত না জমীর উর্ব্বরাশক্তি উৎকর্ষ লাভ করে, ততদিন পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে অধিকতর কাগজের নোট ব্যবহারের প্রয়োজন হইতে পারে এবং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু জনসাধারণকে অধিকতর দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইবার জন্য এই ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষকদিগকে বর্ত্তমান ঋণভার হইতে নিষ্কৃতিদানার্থ সরকারের ট্রেজারীকেই ঐ ভার গ্রহণ করিতে হইবে, কেন না, সরকার জমীর উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই কৃষককুল বর্ত্তমানে উত্তমর্ণ-কুল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে হয়তো আরও নোট প্রচলনের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সরকারের তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

যখন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি পুনরায় উৎকর্ষ লাভ করিবে, কাগজের নোটের প্রচলন একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে এবং ধাতুমুদ্রার প্রচলনও সংযত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার এবং তাহাদিগকে নির্দ্ধারিত সমতাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অন্যদিকে জমিদারের গুণ হিসাবে কৃষিবিজ্ঞানের জ্ঞান কমপক্ষে কতখানি প্রয়োজন তাহা স্থির করিতে হইবে এবং প্রকৃত কৃষিবিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে হইবে।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা বুঝিয়া উঠা বর্ত্তমান অর্থনীতিবিদ্‌গণের পক্ষে দুঃসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখাইয়া দিবে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

আমরা, তথা-কথিত আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণকে সময় থাকিতে অবহিত হইতে বলি।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ এবং আধুনিক নেতৃত্বের নমুনা*

মুখবন্ধ

পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-বার্ষিক অনুষ্ঠান অধিবেশনে গত ২রা জুলাই তারিখে কলিকাতার আশুতোষ হলে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়—চিন্তার 'বালাই'-হীন বক্তৃতাপ্রদান যাঁহাদের জীবনের অন্যতম কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বক্তাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন। বক্তৃতার সাধারণ আলোচ্য বিষয় ছিল, "বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ।" বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন,- প্রখ্যাত 'শিল্প-সন্ধী' এবং "প্রাকৃতিক শক্তিসেবী" ডক্টর মেঘনাদ সাহা; প্রখ্যাত "নদীপ্রাণ" এবং "জন্মশাসনব্রতী" অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়; "সুনিপুণ স্বদেশসেবী" ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এন. সি. চ্যাটার্জ্জী এবং মিঃ জাষ্টিস্ সি. সি. বিশ্বাস।

* 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী'র ১৩ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজীতে লিখিত মূল সন্দর্ভ হইতে অনূদিত।

এই সকল বক্তা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকবৃন্দকে স্মরণ করাইতে চাহি যে, আমাদের অভিমত এবং সিদ্ধান্ত এই যে প্রত্যেকটী ব্যক্তি, প্রত্যেকটী প্রদেশ, প্রত্যেকটী দেশ, প্রত্যেকটী জাতি এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশাসমূহের প্রধান কারণ আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক ধর্ম্মমত এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকবৃন্দ। আমরা মনে করি যে, যদি জন-সাধারণ আধুনিক ধর্ম্মমত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ভ্রান্তি ও অসারতা সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবের ধারণা গঠন না করিতে পারে, এবং যদি তাহারা রাজনীতিব পাণ্ডা, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, রাজপুরুষ এবং ধর্ম্মগুরুরূপ আধুনিক জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকদিগের নির্ব্বোধ নির্দ্দেশ দ্বারা পরিচালিত হইতে না অস্বীকার করে, তবে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব ধ্বংসকারী সমস্যাসমূহের সমাধানের বিন্দুমাত্র উপায়ও নাই। প্রধানতঃ জন-সাধারণকে এই ধারণা-দানের উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ আমরা প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকি।

পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত "বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ"-বিষয়ক আলোচ্য বক্তৃতা কয়টি বর্ত্তমানে বাঙ্গালার 'বৈজ্ঞানিক' এবং 'অর্থনীতিবিদ্' হিসাবে সুপরিচিত গোষ্ঠীর জনকয়েকের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ অসারতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যদি আমরা বলি যে, "বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ" বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ভবিষ্যতের ভিত্তিগঠনের সম্ভাব্যতা-সহায়ক হিসাবে বর্ত্তমান অবস্থায় উল্লেখযোগ্য বিষয় কি কি, দ্বিতীয়তঃ দেখাইতে হইবে, ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ বিষয় প্রাধান্য লাভ করিবে এবং তৃতীয়তঃ ভবিষ্যতে যাহাতে অনিষ্টপাত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে কোন্ প্রতীকার-ব্যবস্থা বর্ত্তমানে প্রয়োগযোগ্য, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা হইলে চিন্তাশীল পাঠকের সহিত আমাদের মতানৈক্য না ঘটিবার সম্ভাবনা। পাঠকবৃন্দকে আমরা আলোচ্য বক্তৃতা কয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি। তাঁহারা দেখিবেন যে, অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ব্যতীত আর একটিতেও "বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ"-বিষয়ক আলোচনায় যে পারম্পর্য্য-রক্ষা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহার অণুমাত্র আভাসও নাই। এই পারম্পর্য্য-রক্ষার প্রশ্ন বাদ দিয়া বাঙ্গালার জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা-সম্পর্কে বক্তাদের আন্তরিক সহানুভূতির বোধ আছে কি না এবং দেশের ও দশের বিষয়ে আলোচনায় যে স্থিরতা এবং যুক্তিনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন, তাঁহারা তাহার অধিকারী কি না, তদ্বিষয়ক অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, বিচারক মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ব্যতীত আর সকলের বক্তৃতাতেই ইহার অভাব অতিমাত্রায় পরিস্ফুট।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে পারম্পর্য্য-রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহও যথার্থ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য করা যায় না। তথাপি উহা কিয়দংশে প্রশংসনীয়। যদি তিনি তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ বদ্ধ থাকিতেন কিংবা ডক্টর মেঘনাদ সাহার ন্যায় নিজের বৈজ্ঞানিকত্ব জাহির করিতে চাহিতেন, তবে তাঁহার বক্তৃতা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা করিত না।

ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, বর্ত্তমান বাঙ্গালার অবস্থায় কি কি বিষয় উল্লেখযোগ্য, এবং ভবিষ্যতে তাহার কি পরিণাম দাঁড়াইবে, তদ্বিষয়ক সন্ধানে ব্যাপৃত হইলে, তাঁহার বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশসমূহ উহা সহায়ক করিতে পারে :

(১) এই শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা যে-স্তরে গিয়া উপনীত হইবে, তাহা হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গালার অধিবাসীদের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অদূর-দর্শিতা, অবৈজ্ঞানিকোচিত ইঞ্জিনীয়ারিং এবং নদী নিয়মন, যাহার ফলে কৃষির এই অভূতপূর্ব্ব অবনতি সাধিত হইয়াছে—বাঙ্গালার জরাজীর্ণ ভূমিসম্পর্কিত ব্যবস্থা এবং একাঙ্গ শিক্ষা যাহার ফলস্বরূপ মন্থর শিল্প-প্রসার এবং অমিতাচারিতার পরিণামে চারি শতাব্দী কালের মধ্যে লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষ হইতে ৬ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চারি-পার্শ্বের অতুলনীয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে ভীষণ দারিদ্র্য দেখা

দিয়াছে—এই সমস্তই সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিবে। সর্ব্বোপরি, পরবর্ত্তী কালের দারিদ্র্যগ্রস্ত ও ক্ষীয়মাণ বাঙ্গালী জাতি তাহাদের বহির্নিষ্ক্রমণের প্রধান কারণ হিসাবে, বর্ত্তমানের রাজনৈতিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক রেষারেষি,—যে জন্য তাহাদের আশু সমস্যাসমূহের প্রতীকারার্থ সমগ্র ভাবে কোন মিলিত জাতীয় চেষ্টা হইতে পারিতেছে না,—তাহাকেই দোষ দিবে।

(২) নদীর ক্ষয়, জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস, অস্বাস্থ্যকর বন-জঙ্গলের বিস্তার, ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি এবং লোক-হ্রাস পরস্পর সংশ্লিষ্ট পাপচক্রের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের পাঁচ ভাগের দুই ভাগে ইতিপূর্ব্বেই ইহারা আস্তানা গড়িয়াছিল, এখন ধীরে ধীরে দুই ভাগের তিন ভাগ কবলায়িত করিতে চলিয়াছে।

(৩) ৮৬ হাজার ৬১৮টি গ্রামের ৬০ হাজার গ্রাম ম্যালেরিয়ার অধিষ্ঠান, ১৯০১ হইতে ১৯৩১-এর মধ্যে প্রতি বৎসরে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা—২ লক্ষ ৫০ হাজার হইতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। বর্দ্ধমান, হুগলী এবং যশোহর ইত্যাদি পতনমুখী অঞ্চলের এই সব স্থানে চাষের অধীন ক্ষেত্র যথাক্রমে শতকরা ৪০,৪৫ ও ৩৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

(৪) বাঙ্গালায় এখন বার্ষিক ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন চাউল ঘাটতি পড়িতেছে—আমদানী দ্বারা এই ঘাটতির পূরণ করা হয়। তথাপি ১৯২০ সন হইতে হিসাবে তাহার মোট আবাদী জমীর পরিমাণ ১০ লক্ষ একর কমিয়া গিয়াছে। দো-ফসলা জমীর পরিমাণেও হ্রাস দেখা দিয়াছে এবং বাঙ্গালার কয়েকটি অঞ্চলে, যেখানে ভাত এবং যৎ-সামান্য ডাল—ভারতে খাদ্য হিসাবে ইহা সর্ব্বনিম্ন পুষ্টিকারিতাবিশিষ্ট—প্রধান খাদ্য ছিল, সেখানে ভাতের পরিবর্ত্তে শাদা-আলুর ব্যবহার সুরু হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অন্ততঃপক্ষে বৎসরের যে-কয় মাস কাজকর্ম্ম কম থাকে।

(৫) পঞ্চাশ বৎসর পরে, পূর্ব্ববঙ্গের শহরে কিংবা চাষের অঞ্চলে, ১০ জনের মধ্যে ৮ জন মুসলমান, একজন তপশীলভুক্ত হিন্দু, এবং আর একজন হয় ব্রাহ্মণ, নয় বৈদ্য, নয় আর কোন জাতের লোক দাঁড়াইবে; সমগ্র বাঙ্গালা দেশে, যেখানে একটি উচ্চবর্ণীয় হিন্দু থাকিবে, সেখানে ৬ জন মুসলমান এবং ৩ জন তপশীলভুক্ত হিন্দু দাঁড়াইবে।

যদি অধ্যাপক রাধাকমলের বক্তৃতার উপরি উদ্ধৃত অংশ-সমূহ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, ইহাদের প্রথম দফায় তিনি লোক-বৃদ্ধির এবং দ্বিতীয় দফায় লোক-হ্রাসের উল্লেখ করিয়াছেন। যথাবিহিত ব্যাখ্যা না দেওয়ায় বলিতে হইবে যে, তিনি নিজেই নিজের কথা খণ্ডন করিয়াছেন।

পঞ্চম দফায় তিনি বাঙ্গালার লোক-বৃদ্ধির উল্লেখে, হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা-বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালার সম্প্রদায় হিসাবে, হিন্দু ও মুসলমানের এই সংখ্যা-বৈষম্য, উভয়ের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু জাতি হিসাবে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎকে ইহা কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। মুসলমান অথবা হিন্দু, যাহাদেরই সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করুক না কেন, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের বিচার আলোচনায় ইহা অপ্রাসঙ্গিক, কেন না হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জাতিই বাঙ্গালী। সুতরাং, ইহা অবশ্য বলিতে হয় যে, অধ্যাপক রাধাকমলের এই বিচার বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর এবং তিনি যে সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন, ইহা তাহারই প্রমাণ।

মোটের উপর, উপরি উদ্ধৃত অংশসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অধ্যাপক রাধাকমলের মতে বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ নিম্নানুযায়ী :—

(১) নদীর শুষ্কতা-নিবন্ধন জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস।

(১-ক) অবৈজ্ঞানিকোচিত ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য্য ও নদী-নিয়ামন-নিবন্ধন নদীর ক্ষয়।

(২) একাঙ্গ শিক্ষার পরিণামস্বরূপ অতি ধীর শিল্প-প্রসার।

(৩) অমিতচারিতার পরিণামস্বরূপ লোক-বৃদ্ধি।

(৪) আবাদী জমীর পরিমাণ হ্রাস।

অধ্যাপক রাধাকমল যে-সব প্রতীকার-ব্যবস্থার উল্লেখ

করিয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

(১) দেশের ক্রমাবনতির পথ কেবল সুপরিকল্পিত নদী-নিয়ন্ত্রণ এবং জলসেচ-ব্যবস্থা, যথা মরা নদীর সংস্কার-সাধন, বন্যাধবন (flood flushing), টিউবওয়েল-প্রতিষ্ঠা, খাল-খনন এবং বারি-বিদ্যুৎ-মূলক উন্নয়ন দ্বারাই রোধ করা চলিতে পারে।

(২) মাত্র মানভূম এবং সিংভূমের কয়লা ও খনিজপূর্ণ অঞ্চলসমূহের বাঙ্গালাকে প্রত্যার্পণ দ্বারা বাঙ্গালায় চাষের উপর ক্রমবর্দ্ধমান অতিমাত্রায় নির্ভরতার সংস্কার সাধিত হইতে পারে।

(৩) বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতি তাহার দ্রুত শিল্প-প্রসারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের দ্বারা প্রধানতঃ আকার প্রাপ্ত হইবে।

(৪) যদি কৃষিকার্য্য-সংশ্লিষ্ট নিম্নতম স্তরের চাষীর আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত করা না হয়, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিংবা জমীর অধিকার-ব্যবস্থার কোন অদল-বদলই স্থায়ী হইতে পারে না। ইহা শ্রেণী কিংবা সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন কার্য্য দ্বারা সম্ভব হইবে না, কেবল জাতীয়-ভাবাপন্ন কার্য্য দ্বারাই সম্ভব।

অধ্যাপক রাধাকমল-নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালার দুঃখ-দুর্দ্দশা ও তাহার প্রতীকারের উপরি উদ্ধৃত কারণসমূহ পাশাপাশি রক্ষা করিয়া উহা যথাযথভাবে পাঠ ও ঐ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া বিষয়টি আলোচনার জন্য এবং বাঙ্গালীর দুর্দ্দশায় সহানুভূতি-প্রদর্শনের জন্য তিনি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি না লইয়াই এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তিনি নিন্দাভাজনও বটে। যদি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কারণ ও প্রতীকারসমূহকে যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি নাই।

তাঁহার নির্দ্দেশসমূহ যথাবিহিতভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার মতে, বাঙ্গালার দুরবস্থার অন্যতম প্রধান হেতু হইতেছে, জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস এবং এই হ্রাসের মূলে নদীসমূহের ক্ষয়, তাহার মূলে রহিয়াছে অবৈজ্ঞানিক-কোচিত ইঞ্জিনীয়ারিং এবং নদী-নিয়মন। নদীসমূহের ক্ষয়-নিবারণার্থ তিনি নদীসমূহের পুনঃসংস্কার প্রভৃতি নদী-নিয়ন্ত্রণ-বিধির প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন এবং জমীর উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধির জন্য টিউবওয়েল-প্রতিষ্ঠা, খাল-খনন এবং বারি-বিদ্যুৎমূলক উন্নয়ন-ব্যবস্থা প্রভৃতি জলসেচ-কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা নিঃসন্দেহ যে, জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসই আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ এবং এই উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসের জন্য প্রধানতঃ দায়ী নদীসমূহের শুষ্কতা, কিন্তু টিউবওয়েল-প্রতিষ্ঠা, খাল-খনন এবং বারি-বিদ্যুৎমূলক উন্নয়ন প্রভৃতি জলসেচ-ব্যবস্থাই হউক, আর আধুনিক প্রথায় নদী-নিয়ন্ত্রণই হউক, কিছুই নদীসমূহের ক্ষয়ের প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। যদি আধুনিক ব্যবস্থার জলসেচনপ্রণালী জমীর উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইত, তবে যে-সকল অঞ্চলে ইতিমধ্যেই অতি-আধুনিক প্রণালীর বৈজ্ঞানিক জল-সিঞ্চন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় উন্নতির সূচনা পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু, বাস্তব অবস্থার আনুপূর্ব্বিক সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহার ফল ঐ সব অঞ্চলে ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। দেখা যাইবে যে, যে-সব অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক জলসেচ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় সাময়িকভাবে জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই দশ-কি-বার বৎসর পরে পুনরায় ঐ হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে এবং কুত্রাপি জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় নাই। এতদ্ব্যতীত আরও দেখা যাইবে যে, এই জলসেচাধীন অঞ্চলসমূহ ক্রমবর্দ্ধমান ও বিবিধ অস্বাস্থ্যের আগারও হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি জলসেচাধীন অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ যথাবিহিত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের আস্বাদ বিভিন্ন এবং সাধারণ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যের অনুরূপ স্বাস্থ্যকরও তাহারা নহে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জলসেচ-ব্যবস্থার এই সকল কুফলের কারণ সন্ধান করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

জমীর উর্ব্বরাশক্তির উপাদান কি, তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, জমীর অভ্যন্তরে নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ বৈশিষ্ট্যের তাপ, শৈত্য ও বায়ুর প্রবাহই ইহার মূলে। যদি

কোন ভাবে জমীর অভ্যন্তরস্থ তাপ, শৈত্য ও বায়ুর প্রবাহের এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৈশিষ্ট্যে বাধা উপস্থিত হয়, তবে ইহার উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস ঘটিতে বাধ্য। জমীর অভ্যন্তরস্থ তাপ, শৈত্য ও বায়ুর প্রবাহের উপরিলিখিত এই নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ বৈশিষ্ট্য নলকূপ-প্রতিষ্ঠা, খাল খনন এবং বারিবিদ্যুৎমূলক উন্নয়ন দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হইতে বাধ্য, কেন না ইহাদের কার্য্য জমীর অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা উপরিভাগেই অধিক। এইজন্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথায় বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভব নহে, সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রথা কার্য্যতঃ জমীর উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি সাধন করে নাই এবং করিতে পারেও না। যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তনের স্ব-পক্ষে কথা কহেন, তাঁহারা কেবল প্রমাণ করেন যে, এই বিষয়ে তাঁহারা গভীর অন্তর্দৃষ্টিহীন।

নদী-নিয়মনের আধুনিক বিধি-ব্যবস্থাসমূহ নদীর ক্ষয়-প্রতিরোধ সম্বন্ধে একেবারেই কার্য্যকরী নহে। যদি তাহাই না হইত, তবে যে সকল নদী এই বিধি-অনুযায়ী ইতিমধ্যেই নিয়মিত হইয়াছে, তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইত না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই কার্য্যেরও বাস্তব ফল হইয়াছে বিপরীত। আধুনিক নদী-নিয়মন-ব্যবস্থার বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারীং কার্য্যের প্রণালী সম্বন্ধে যিনি ওয়াকিবহাল, তাঁহার পক্ষে বুঝা কষ্টসাধ্য হইবে না যে, আধুনিক কালের কোন প্রকার নদী-নিয়মন-ব্যবস্থার দ্বারাই কখনও নদীর ক্ষয় প্রতিরোধ করিতে পারে না। ইহা করা দূরে থাকু, উপরন্তু ইহার ফলে এই ক্ষয় বৃদ্ধি পাইয়া চলিতে বাধ্য, কেন না নদীস্রোতের স্বাভাবিক গতি ও তীব্রতায় প্রতিবন্ধক উপস্থিত না করিয়া এই প্রকার নদী-নিয়মন সম্ভব নহে।

নদী-ক্ষয় বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, গতিপথেই হউক, উৎসমুখেই হউক, কিংবা জলাধার অঞ্চলেই হউক, তাহাদের স্রোতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না করিয়া অবাধে বহিতে দেওয়া। ইহার অর্থ এই যে, শৈলশিখরে অথবা নদীপার্শ্বে সহর-নির্ম্মাণ, সমতল ভূমিতে রেলরাস্তা ও মোটর রাস্তা-তৈয়ারী এবং নদীর উপরে সেতু-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে যেগুলি তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, তাহাদের রক্ষণ-ব্যবস্থাও পরিহার করিতে হইবে। উপরিলিখিত ভাবে কার্য্য করিলে, নদীর স্রোত স্বতঃই জমীর নিছকবালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর হইবে এবং তখন আর নদী-ক্ষয়জনিত দুশ্চিন্তার কারণ থাকিবে না। যদি একবার জমীর সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত নদীর গভীরতা পুনর্ব্যবস্থিত করা যায়, তবে নদীপার্শ্বস্থ বিস্তৃত অঞ্চলসমূহে জমীর অভ্যন্তরে বাঞ্ছানুরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৈশিষ্ট্যে তাপ, শৈত্য ও বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং তখন, আধুনিক-জলসেচব্যবস্থা কিংবা অপর কোন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই জমীর উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি আপনা হইতেই সাধিত হইবে।

আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা যথাবিহিত ভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, অধ্যাপক রাধা-কমল জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসের কারণ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ, কিন্তু নদীক্ষয়ের যে কারণ তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই যথার্থ নহে এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রতীকারসমূহ সম্পূর্ণ অবোধোচিত; ইহাতে নদীক্ষয় প্রতিরোধ দূরে থাকুক, ক্ষয় আরও বাড়িয়াই চলিবে।

অধ্যাপক রাধাকমলের মতে, বাঙ্গালার দুরবস্থার দ্বিতীয় কারণ, মন্থর শিল্প-প্রসার এবং ইহার মূল হইতেছে একাক্ষ শিক্ষা। ইহার জন্য তিনি দুইটি প্রতীকার-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, যথা—(১) মানভূম ও সিংভূম অঞ্চলের কয়লা ও খনিজে পরিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ বাঙ্গালাকে প্রত্যর্পণ, (২) দ্রুত শিল্প-প্রসার। ইহার অর্থ এই যে, অধ্যাপক রাধা-কমলের মতে, খনিজ সংস্থানের উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্প-প্রসার বাঙ্গালী জাতিকে আর্থিক দুরবস্থার কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভে সাহায্য করিবে।

আমরা স্বীকার করিতেছি যে, "মন্থর শিল্প-প্রসার" এবং "একাক্ষ শিক্ষা" ইত্যাদি কথার সাহায্যে অধ্যাপক রাধা-কমল কি বুঝেন, তাহা আমরা ঠিক অনুসরণ করিতে পারি নাই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, খনিজ সংস্থানের উন্নয়নই হউক অথবা দ্রুত শিল্প-প্রসারই হউক, কোনটিই বাঙ্গালী জাতিকে দুরবস্থা হইতে কোনরূপ নিষ্কৃতি দান করিতে পারিবে না। যদি কোন দেশের আর্থিক অবস্থার স্থায়ী উন্নতি খনিজ সংস্থানের উন্নয়ন অথবা দ্রুত শিল্প-প্রসার দ্বারা বিহিত হইতে পারিত, তবে ইংলণ্ড অথবা ইউরোপ-

ও আমেরিকার কোন দেশকেই কষ্ট পাইতে হইত না। সকলেই জানেন যে, ঐ সব দেশে খনিজ সংস্থানের এবং শিল্পের উন্নয়ন নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দশা অপেক্ষা কোন ক্রমেই অনধিক নহে। ইহার কারণ সন্ধানে বেশী দূর যাইতে হয় না। কোন দেশই কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে বাস্তবিকরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না, কেন না কৃষিকার্য্যই খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ব্যতিরেকে কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। যদি জমীর অভ্যন্তরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৈশিষ্ট্যে তাপ, শৈত্য ও বায়ু প্রবাহিত না থাকে, তবে তাহার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বজায় থাকিতে পারে না। যদি জমীর সর্ব্বনিম্ন স্তরের খনিজসমূহ অব্যাহত না থাকে, তবে জমীর অভ্যন্তরে তাপ-সঞ্চরণের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিতে পারে না। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী খনিজ সংস্থানের উন্নতির অর্থ হইতেছে, জমী হইতে খনিজ উত্তোলন, যাহার ফলে জমীর উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পায় এবং এই নিমিত্তই খনিসমূহের উন্নয়ন অবশেষে দেশের সমৃদ্ধির মূলে নিশ্চিত কুঠারাঘাত করে। দুঃখের কথা এই যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই মূলীভূত সত্যটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না এবং এই জন্যই তাঁহাদের দ্বারা প্রত্যেক দেশের দুরবস্থা সাধিত হইতেছে।

কুটীর-শিল্পের কথা ধরিলে শিল্পের দ্রুত প্রসার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি ইহার অর্থ যন্ত্র-শিল্পের প্রসার দাঁড়ায়, তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইহা কখনও জনসাধারণের স্থায়ী উন্নতির সহায়ক হইতে পারে না, কেন না ইহাতে সর্ব্বদা উৎপন্ন দ্রব্যের উদ্বৃত্তি ঘটিবেই ঘটিবে, তাহার ফলে মহাজনের লোকসান হইবে এবং ইহা শ্রমিকদেরও অস্বাস্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর কারণ উপস্থিত করিবে। যদি বাঙ্গালী জাতিকে সমৃদ্ধ করিবার পক্ষে যন্ত্র-শিল্পের উন্নয়ন কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিত, তবে আমরা ইতিমধ্যে অন্ততঃ ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতাম, কেন-না ইহা সত্য যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব অপেক্ষা বর্ত্তমানে এই প্রদেশে যন্ত্র-শিল্প অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহার বাস্তব পরিণাম সম্পূর্ণ বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাক্, গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশ ক্রমশঃ অবনতির পথে নামিয়া চলিয়াছে। ইহাতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমরা শিল্প-বিস্তারের বিরুদ্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা অবিসংবাদী সত্য।

যদি একবার স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় যে যন্ত্র শিল্প অনিষ্টকর, তবে যুক্তিযুক্তভাবে ইহা তখনও বলা চলে না যে, ইহার প্রসারে মন্থরতা দেশের দুরবস্থার নিমিত্ত কোনরূপ দায়ী।

যদি অধ্যাপক রাধাকমলের মনে কুটীরশিল্পের কথা থাকে, তবে আমরা বলিব যে, এই বাঙ্গালায় এমন একদিন ছিল, যখন কুটীরশিল্পের উন্নয়নে কোন অভাবই পরিলক্ষিত হইত না, কিন্তু কৃষির লাভজনকত্ব হ্রাসের ফলে ক্রমশঃ কুটীর-শিল্পেরও অবনতি ঘটিয়াছে, এবং জমীতে বৎসরের পাঁচ মাস কাল পরিশ্রমে বাৎসরিক প্রয়োজন অর্জ্জন সম্ভব না হইলে, ইহা কখনও পুনরায় কার্যকরী ভাবে বিভূতি লাভ করিতে পারে না। যখন পুনরায় ইহা সম্ভব হইবে, তখন যন্ত্রশিল্পের সর্ব্বপ্রকার প্রতিযোগিতা উপেক্ষা করিয়া কুটীর-শিল্প আপনা হইতেই পুনরায় বিভূতি লাভ করিবে। শিল্পবিষয়ক সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিতে পারিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, যখন কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্যে বৎসরের পাঁচমাস পরিশ্রমে বার্ষিক খাদ্যসংগ্রহ করা সম্ভব হইবে, তখন যন্ত্রশিল্প অতীতের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যন্ত্র-শিল্প-প্রসারের কারণ-নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাধাকমল যে "একান্ত শিক্ষা"র কথা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি ঠিক কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যদি তিনি ইহার দ্বারা সাধারণ-শিক্ষা প্রাধান্য এবং কারুশিক্ষার অভাবের বিষয় বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, শব্দগত অর্থে শিক্ষা কে সর্ব্বদাই "একান্ত" হইতেই হইবে, কেন না মন ও বুদ্ধির উন্নয়নই ইহার উদ্দেশ্য। হাতের কাজের "অভ্যাস" দ্বারা কখনও "শিক্ষা"-লাভ হয় না এবং কারুবিদ্যা আয়ত্ত করা "প্রয়োগ-অভ্যাস" মাত্র, উহা কোন ক্রমেই "শিক্ষা" নহে।

অধ্যাপক রাধাকমলের মতে, বাঙ্গালার দুরবস্থার তৃতীয় কারণ "লোকবৃদ্ধি"। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ১৮৮১ সালের

তুলনায় ১৯৩১ সালে বাঙ্গালার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ১৭৯১ অথবা ১৬৯১ অথবা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০৯১ সালের তুলনায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না, কেন না ১৮৯১ সালের পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোক-সংখ্যার কোন বিশ্বাসযোগ্য গণনার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ এদেশে বিশ্বাস করা হইয়া থাকে যে, উপার্জ্জনক্ষম লোকের সংখ্যা এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায়, তত দেশ শক্তিশালী হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের মূলে যুক্তিযুক্ততা বিদ্যমান। যদি ভারতীয় ঋষি-রচিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহ যথাযথভাবে পাঠ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, পৃথিবী ও সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের পরস্পর দূরত্ব কখনও সর্ব্বাধিক, কখনও সর্ব্বনিকট হইয়া থাকে, যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর দূরত্ব সর্ব্বনিকট হয়, তখন পৃথিবীর উৎপাদন-সামর্থ্য সর্ব্বাধিক হয় এবং এই কালে লোকসংখ্যাও সর্ব্বোচ্চ হয়, কেন না সূর্য্য তেজের আদি আধার এবং তেজ জনন-শক্তির অপরিহার্য্য উপাদান। অন্য পক্ষে, যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর দূরত্ব সর্ব্বাধিক হয়, পৃথিবীর উৎপাদন-সামর্থ্য তখন সর্ব্বনিম্ন হইয়া থাকে এবং এই সময়ে লোকসংখ্যাও সর্ব্বনিম্ন হয়। সূর্য্য ও পৃথিবীর এই সর্ব্বাধিক এবং সর্ব্বনিকট দূরত্বের মধ্যে কালের ব্যবধান সর্ব্বদা ছয় হাজার বৎসর। ভারতীয় ঋষিগণের তত্ত্বানুযায়ী, পৃথিবীর সকল অঞ্চলের লোকসংখ্যার সর্ব্বদা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং প্রতি ছয় হাজার বৎসরে ইহা সর্ব্বনিম্ন হইতে সর্ব্বাধিক এবং সর্ব্বাধিক হইতে সর্ব্বনিম্ন হয়।

সাধারণ বুদ্ধিতে এই তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। মোটের উপর, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে, প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৮০০০ অব্দে পৃথিবীতে এমন একটি সময় আসিয়াছিল, যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা বর্ত্তমান অপেক্ষা তিন গুণ দাঁড়াইয়াছিল এবং সেই কালে পৃথিবীর সমৃদ্ধিও সর্ব্বোচ্চ শিখর লাভ করিয়াছিল। ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে গণ্য করা যাইতে পারে যে, আগামী ২০০০ বৎসর কালের মধ্যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা সর্ব্বোচ্চসংখ্যক হইবে এবং পুনরায় ইহার সমৃদ্ধি-কাল সর্ব্বোচ্চে উপনীত হইবে।

সে যাহাই হউক, সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, পরিণতবয়স্ক এবং শিক্ষিত লোকসংখ্যার বৃদ্ধি মনুষ্যজাতিকে অধিকতররূপে উন্নত করিতে বাধ্য, সুতরাং লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি কোন প্রদেশের দুরবস্থার কোন প্রকার কারণ হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা অত্যন্ত অবোধোচিত। প্রকৃতপক্ষে বি-এ, এম্-এ, পি-এচ্, ডি, ডি এস্-সি প্রভৃতি উপাধিসর্ব্বস্ব কুশিক্ষার নির্ব্বুদ্ধিতাই বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার মূলে, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি নহে।

১৮৯১ হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত সেন্সাস্-বিবরণী যদি যথাযথ ভাবে অনুধাবন করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতি যথারীতি সচেষ্ট হইলেও, নির্ব্বুদ্ধিতা ও কুশিক্ষার ফলে মনুষ্যজাতি আত্মহত্যা করিতেছে এবং লোকসংখ্যার যথোচিত পরিমাণ বজায় রাখিতে অসমর্থ হইতেছে। ইহার ফলে ত্রিশ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক অপরিণত লোকসংখ্যা প্রত্যেক দেশে ও স্বাভাবিক বিভাগে বাড়িয়া চলিলেও তদনুপাতে ত্রিশ বৎসরের অধিক-বয়স্ক পরিণত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহারই জন্য অসহায় এবং পরনির্ভর লোক-সংখ্যার অনুপাতে উপার্জ্জন-ক্ষম লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহাই বস্তুতঃ আমাদিগের দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ।

অধ্যাপক রাধাকমলের মতে, আমাদের আর্থিক দুরবস্থার চতুর্থ কারণ "আবাদী জমীর পরিমাণ-হ্রাস।" আমরা জানি না, অধ্যাপক রাধাকমল ইহা কোথায় পাইয়াছেন। ভারত সরকারের বাৎসরিক বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ভারতের আবাদী জমীর পরিমাণ ১৯২১ সন হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২১ সনে যে-সংখ্যা মোটামুটি ২২ কোটি ৩১ লক্ষ একার ছিল, ১৯৩১ সনে তাহার সংখ্যা ২২ কোটি ৯১ লক্ষ হয়। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ সম্বন্ধেই এই কথা সত্য। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, অধ্যাপক রাধাকমলের শ্রেণীর ব্যক্তিরা বিশ্বাসযোগ্য নহেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের খেয়াল অনুযায়ী সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে, তাঁহারা কোন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে পরিশ্রম না করিয়াই মতবাদ গঠন করেন।

বস্তুতঃ, আবাদী জমীর পরিমাণ-হ্রাস আমাদের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল নহে, প্রধানতঃ জমীর উৎপাদন-সামর্থ্যের দ্রুত অবনতিই তাহাদিগকে দুরবস্থ করিতেছে। যদি সরকারী বিবরণী ও সংখ্যাসমূহ যথাবিহিত ভাবে অনুধাবন

করা যায়, তবে জ্ঞানার্থী নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানিতে পারিবেন যে, সরকার যতদূর সাধ্য আবাদী জমীর পরিমাণ-বৃদ্ধিকল্পে সচেষ্ট আছেন এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। সরকারকে বুঝিতে হইবে যে, উৎপাদন সামর্থ্যের বৃদ্ধি না হইলে, ব্যক্তিগত স্বার্থ-পূরণ হইবে না, কেন না একটি ব্যক্তি মোটামুটি ৯ হইতে ১১ বিঘা জমীতে লাঙ্গল দিতে পারে, তাহার অধিক পারে না।

অধ্যাপক রাধাকমলের সাম্প্রদায়িক ঐক্য-লাভ-স্বরূপ প্রতীকার-উল্লেখের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু নির্দ্দেশ দিবার নাই। সন্দেহ নাই যে, আমাদের সমস্যাসমূহের সমাধানার্থ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু ইহা দেখাইয়া দিতে আমরা বাধ্য যে, চীৎকার করিলেই বাঞ্ছিত ঐক্য-লাভ হইবে না। আমাদিগকে এমন কার্য্য-পন্থার পরিকল্পনা করিতে হইবে, যাহাতে ঐক্য গঠিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সেই কার্য্য-পরিকল্পনা কি। এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না।

অধ্যাপক রাধাকমলের বক্তৃতার আলোচনা আরম্ভে আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ-বিষয়ক আলোচনায় পারম্পর্য্য-রক্ষার জন্য প্রশংসা করিয়াছিলাম, কিন্তু যদি কেহ আমাদের বক্তব্য আনুপূর্ব্বিক অনুসরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, অধ্যাপক রাধাকমল প্রশংসা অপেক্ষা অধিক নিন্দাভাজন। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে যে, এই শ্রেণীর লোকেরা অ্যাসেম্বলী ও কাউন্সিলসমূহে আমাদের প্রতিনিধিত্ব পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে ছাত্রবৃন্দের ও জন-সাধারণের সম্মুখে বালোকোচিত বাণী-প্রচার করিতে দেওয়া হইয়া থাকে? জনসাধারণকে আমরা তাঁহাদিগের স্বরূপ জানিতে বলি।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিচারক মিঃ বিশ্বাস

বিচারক মিঃ বিশ্বাসের বক্তৃতা বিচার করিলে দেখা যায় যে, যদ্যপি তিনি 'বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ' আলোচনায় যথাবিহিত পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং যদ্যপি তাঁহার বক্তৃতা হইতে এমন কিছুই পাই না, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইবে অথবা আমাদের ভবিষ্যৎ দুঃখদুর্দ্দশা-বৃদ্ধি নিবারণ করিতে হইলে বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য, তথাপি তাঁহার বক্তৃতায় আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার নিমিত্ত সহানুভূতির আভাস পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে কি ভাবে চলিতে হইবে, মোটামুটি তৎসম্পর্কে নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তিনি মোটামুটি ভাবে যে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, দেশের ও দশের কার্য্যের জন্য মনের যে স্থিরতা ও যুক্তিনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন, তাহা তিনি হারান নাই। তথ্য দ্বারা আমাদের বক্তব্য-প্রমাণের জন্য বিচারক মিঃ বিশ্বাসের বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। বাঙ্গালী জাতি উত্তরাধিকারসূত্রে বর্ত্তমানে যে-সব দুঃখের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার জটিলতা-সমূহ বড় করিয়া দেখিয়াও লাভ নাই।

(২) মনুষ্যত্বের লক্ষণ হইতেছে, অতীতের কথা ভুলিয়া ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত। এই ভবিষ্যৎ নিকট অতীতের সহিত সম্পর্কবিহীন হইলেও যেন বাঙ্গালীর গৌরবময় বাস্তব অতীতের যোগ হয়। বাঙ্গালী জাতিকে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে

(৩) যদি সার্থকভাবে এই সমস্যা সমাধান করিতে হয়, তবে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত অভিযান প্রয়োজন। যদি তাঁহারা তাঁহাদের অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া মিলিতভাবে কার্য্যে অগ্রসর হন তবে তাঁহারা বর্ত্তমান নৈরাশ্য-পঙ্কে শায়িত বাঙ্গালার উদ্ধার করিতে পারেন।

উপরি উদ্ধৃত অংশসমূহের প্রথমটি হইতে বুঝা যায় যে, বিচারক মিঃ বিশ্বাস আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিষয়ে সহানুভূতি-সম্পন্ন। তাহা না হইলে তিনি বিগত ঘটনাসমূহের চিন্তায় জটিলতার বৃদ্ধি না করিবার সংযমনের কথা বলিতে পারিতেন না। জটিলতাবৃদ্ধি-বিষয়ে সংযমনসম্পর্কীয় এই নির্দ্দেশ তাঁহার মনের স্থিরতা ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচায়ক। তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্য একেবারে ত্রুটিহীন নহে, কিন্তু তথাপি ইহাকেও চিন্তাশীলতা ও স্থিরতার ফল বলিয়া বিবেচনা করা যায়। প্রকৃত কাল-বিজ্ঞানের হিসাবে অতীতের কথা ভুলিয়া

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাতের নির্দ্দেশ ভ্রান্তিকর। অতীতের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলে ভবিষ্যতের প্রতি বিচক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় না। অতীতের ভ্রান্তিজনিত উত্তেজনা হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে ইহা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অতীত সম্বন্ধে আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না, কেন না অতীতের ভ্রান্তিসমূহ সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে, ভবিষ্যতে যেন তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। নিকট অতীতকে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালার গৌরবময় অতীতের পুনরুদ্ধারবিষয়ক উক্তি বিচারক মিঃ বিশ্বাসের বিচক্ষণ-জনোচিত হইয়াছে, যদি অবশ্য বিচারক মিঃ বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে গৌরবময় যে অতীত, সেই অতীতেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন। সেই অতীত স্যর আশুতোষের কালের সময়ের নহে, স্যর সুরেন্দ্রের আমলের নহে, প্রভু রামকৃষ্ণের সময়ের নহে, কিংবা রাজা রামমোহন অথবা পণ্ডিত রঘুনাথ এবং জগদীশচন্দ্রের, এমন কি চৈতন্য অথবা রঘুনন্দনেরও সমসাময়িক নহে। সুতরাং প্রশ্ন উপস্থিত হয়, বাঙ্গালার সেই গৌরবময় কাল কখন?

যদি বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীরা সেই কাল স্মরণ করিতে চেষ্টা করেন,—যখন বাঙ্গালার অক্ষরমালার লিখন ও উচ্চারণ প্রণালী এবং বাঙ্গালা শব্দের ও বাক্যের গঠন-প্রণালী প্রথম সুনির্দ্ধারিত হয়, তবে তাঁহারা বাঙ্গালার গৌরবময় সেই অতীত যুগের পরিচয় লাভ করিবেন। বাঙ্গালার এই অতীত গৌরববাহিনী মহাবাণীর বাহক যে সাহিত্য, তাহা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সাহিত্য বুঝিবার মত ব্যক্তি অধিক নাই বলিয়া মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। এই কালই সেই কাল, যে-সময়ে যাহা কিছু গৌরবজনক, তাহার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল এবং যাহা কিছু কলঙ্কজনক, তাহা তিরোহিত হইয়াছিল।

বিচারক মিঃ বিশ্বাস কি সেই কালের উল্লেখ করিয়াছেন? যদি তিনি তাহাই করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার দূরদৃষ্টির জন্য তিনি মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের ধন্যবাদভাজন, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিব এবং তজ্জন্য আমাদিগের এই সামান্য আসন হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন ও আলিঙ্গন জানাইতেছি। যদি মানস নেত্রে একবার বাঙ্গালার এই গৌরবময় অতীতের পটভূমিকাকে আকার দান করা যায়, তবে অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে, তাহার পর হইতে এই পর্য্যন্ত এই দেশে কি নির্ব্বুদ্ধিতাই না চলিয়া আসিতেছে এবং আমরা বুঝিতে পারিব যে, অধুনা যে-সব ব্যক্তিকে আমরা প্রায়শঃ প্রশংসা করিয়া থাকি, তাঁহারা বস্তুতঃ নিন্দার যোগ্য।

বিচারক মিঃ বিশ্বাসের তৃতীয় মন্তব্য তাঁহার স্থিরতা ও যুক্তিনিষ্ঠার অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু আমাদিগকে তৎসঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, যদি তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া তাহাদিগের অনৈক্যের কারণ-সমূহ এবং আপনা হইতেই কি করিয়া তাহারা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তাহা দেখাইয়া না দেওয়া হয়, তবে এই ভাবে হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত অভিযানের নির্দ্দেশদানের কোন কার্য্যকারিতাই নাই। বিচারক মিঃ বিশ্বাসের বক্তৃতার সম্পর্কে আমরা এত কথা বলিতে পারিলেও আমাদের দুঃখ এই যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা, মিঃ এন. সি. চ্যাটার্জ্জি এবং ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি অপর ব্যক্তিদের বক্তৃতা বিষয়ে প্রশংসাসূচক আমরা একটি কথাও বলিতে পারিতেছি না।

ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি পাশ্চাত্ত্যদিগের বাণীর প্রতিধ্বনি যথারীতিই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় এমন কিছুই নাই, যাহাতে প্রমাণ হয় যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ এবং সমস্যার সমাধানার্থ যে সাধারণ বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, তিনি তাহার অধিকারী।

মিঃ এন. সি. চ্যাটার্জ্জির বক্তৃতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলিতে হয়। ইহাতে বাঙ্গালীর দুরবস্থার নিমিত্ত সহানুভূতি প্রদর্শনের কিছু ভাণ আছে বটে, কিন্তু ইহাতে এমন কিছুই নাই, যাহাতে চিন্তার খাদ্য উপস্থিত হয় কিংবা প্রমাণ হয় যে, তাঁহার উদ্দেশ্যের পশ্চাতে আন্তরিকতা বর্ত্তমান। তাঁহার বক্তৃতায় সুস্পষ্টই প্রকাশ হয়, তিনি বাঙ্গালার মঞ্চে নবাগত।

ডক্টর মেঘনাদ সাহার বক্তৃতাটি সমগ্র বক্তৃতার মধ্যে নিকৃষ্টতম। বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, এমন কিছু ইহার মধ্যে তো পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু যদি তাঁহার উপদেশের একটিও কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য অবহিত হওয়া যায়, তবে বাঙ্গালার দুরবস্থার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

যদি পাঠকবৃন্দ চিন্তা করিতে চেষ্টা করেন, কেন বিচারক মিঃ বিশ্বাসের বক্তৃতা কিছু পরিমাণ শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারে, অথচ ডক্টর মেঘনাদ সাহার বক্তৃতা নিন্দার যোগ্য হয়, তবে দেখিবেন যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহার বর্ত্তমান কালের একজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টাই ইহার প্রধান কারণ। যুবকবৃন্দকে বর্ত্তমান বিজ্ঞানে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত যে শিক্ষা-প্রণালী প্রয়োগ করা হয়, যথাযথভাবে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন বিজ্ঞান নামে যে সকল বিষয় বর্ত্তমানে প্রচলিত, সেগুলি কতকগুলি নির্ব্বুদ্ধিতামূলক অনুমানের উপর প্রায়শঃ নির্ভর করিতেছে এবং এই সকল অনুমানের সত্যতা-পরীক্ষার কোন চেষ্টাও নাই, অপর দিকে তেমনই ঐ যুবকবৃন্দের স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের কোন সুযোগদান না করিয়াই এই সব অনুমান যন্ত্রচালিতবৎ তাহাদিগের গ্রহণীয় করা হইতেছে। এইরূপে বিজ্ঞানের ছাত্রবৃন্দ স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি পরিহার করিয়া বিজ্ঞানের নামে অযথার্থ কতকগুলি তত্ত্ব-গ্রহণে কমবেশী বাধ্য হইতেছে। ইহার ফলে জড়তাপ্রাপ্ত মস্তিষ্কযুক্ত জন-কয়েক লোক আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায় চলাফেরা করিয়া বেড়াইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। মস্তিষ্কের এই জড়তাপ্রাপ্তিবশতঃই ডক্টর মেঘনাদ-শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ যেমন না বুঝিয়া কতকগুলি কথা বলিয়া থাকেন, তেমনই তাহাতে সমাজের হিত অপেক্ষা যে অধিক অহিত সাধিত হইতেছে, তাহাও বিবেচনা করিতে পারেন না। মস্তিষ্ক-শক্তির এই পক্ষাঘাতগ্রস্ততার উপরে, বৈজ্ঞানিকগণ আবার স্ফীতমস্তিষ্কও হইয়া থাকেন, কেন না তাঁহারা মনে করেন যে, রেল, মোটরকার, এরোপ্লেন, রেডিয়ো, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছেন। "অস্ত্রোপচার ঠিক-ই হইয়াছে, কিন্তু রোগীর নির্ব্বিবাদে মৃত্যু ঘটিয়াছে" এবংবিধ প্রবাদ-বাক্যের ভ্রান্তি কোথায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলে দেখা যাইবে যে, যদ্যপি বর্ত্তমান-যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহকে অদ্ভুত কিছু বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, তথাপি প্রধানতঃ ইহাদের জন্যই, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উদ্ভবাবধি, মনুষ্যজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে তথাকথিত বিজ্ঞানের যে সব আবিষ্কারকে অত্যদ্ভুত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে, তাহাদের জন্মকথা সযত্নে সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাথমিক আবিষ্কারাদির প্রায় কোনটিই শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফলে কিংবা সুচিন্তিত মতামতের সুপরিণত ফলস্বরূপ নহে। তাহাদের অধিকাংশই মিস্ত্রী-শ্রেণীর কার্য্যক্রমের ফলে কোন-না কোনরূপ কারিগরীর আকস্মিক উদ্ভব। ইহা সত্য যে, পরবর্ত্তী কালে এই সকল আকস্মিক উদ্ভবের কারণসমূহ নির্দ্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিকবৃন্দ চেষ্টা পাইয়াছেন, এমন কি, তাহাদিগের ব্যাখ্যা দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারও চেষ্টাই সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। এইরূপে কয়েকটী মিস্ত্রীর কারিগরীকে কাজে লাগাইয়া বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—ইহাই ক্রমশঃ জীবনযাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হিসাবে মনুষ্য-সমাজ বিভিন্ন ব্যবহারে লাগাইয়াছে, অথচ কেন যে ইহাদের উৎপত্তি এবং শেষতঃ ইহার ফল কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা তাহাদের অজ্ঞাতই থাকিয়া গিয়াছে। এইভাবে, বৈজ্ঞানিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নামে জনসাধারণ নির্ব্বোধের ন্যায় অমৃত বলিয়া নির্ব্বিচারে গরল গলাধঃকরণ করিয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কুফল হিসাবে আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, আধুনিক সমাজে এরূপ অনেকে আছেন, ইহা যাঁহাদের অবোধ্য হইবে বলিয়া আমরা জানি, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, সে-সময়ের বিশেষ বিলম্ব নাই, যখন তাঁহাদিগকে আমাদের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইবে।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে দিব্য সূচিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের কার্য্যে মস্তিষ্ক-শক্তির পক্ষাঘাতগ্রস্ততা এবং উহার অপরাংশের স্ফীতির লক্ষণ সুপ্রকাশ।

ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এন্. সি. চ্যাটার্জ্জী এবং ডক্টর মেঘনাদ সাহার বক্তৃতার বিরুদ্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা নিম্নে উহার প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ডক্টর রাধাকুমুদের বক্তৃতার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

120,623

"শতকরা তিনজন শিক্ষিত লইয়া এবং মাথাপিছু দৈনিক তিন আনা আয় লইয়া কোন সুযোগ্য জাতি-গঠন করার ভরসা অন্ধকারময়।"

ডক্টর রাধাকুমুদের এই উক্তির অর্থ এই যে, তাঁহার মতে, সুযোগ্য জাতিগঠনের জন্য শতকরা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা এবং মাথা-পিছু আয়ের হার অধিকতর হওয়া অত্যাবশ্যক। কেবলই যে ডক্টর রাধাকুমুদ এই মত পোষণ করেন তাহা নহে, পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই এই মত পোষণ করেন। এই শ্রেণীর অভিমতের জন্ম কোথায় তাহার সন্ধান-চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে নহে, পাশ্চাত্ত্যেই এই অভিমতের জন্ম। সুতরাং বলা চলে, যদিও ডক্টর রাধাকুমুদের শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ "স্বাধীনতা"র বিষয় প্রচার করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহারা অপকৃষ্ট পরাধীন-বুদ্ধি ব্যক্তিবৃন্দের শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাঁহারা পাশ্চাত্ত্যের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠাইয়া দেশকে অধিকতর মাত্রায় দাস করিয়া তুলিতেছেন।

"শিক্ষিতের হার এবং পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স হিসাবে আয়ের মাথাপিছু হার যত অধিক হইবে, কোন সুযোগ্য জাতি গঠনের ভরসা তত উজ্জ্বলতর হইবে," এই তত্ত্ব একেবারেই অভ্রান্ত নহে এবং ইহা নির্ব্বুদ্ধিতামূলক। যদি তাহাই না হইত, তবে যে-সকল দেশে শিক্ষিতের হার এবং পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের হিসাবে মাথাপিছু আয়ের হার অধিকতর, তথাকার অধিবাসিগণ নিজদিগকে সুযোগ্যতর জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারিত এবং তাহাদিগকে জীবনযাপনে অধিকতর দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইত না। এই সকল দেশের বাস্তব অবস্থা বুদ্ধির সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের প্রত্যেকটি দেশে, অনাহারগ্রস্ত এবং ভিটামাটিহীন লোকসংখ্যার হার ভারত অপেক্ষা অধিক। ইহা সত্য যে, ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণের কার্য্যশৃঙ্খলা এবং কার্য্যসামর্থ্য অধিকতর এবং এই নিমিত্ত মনুষ্য হিসাবে তাহারা ভারতীয়গণের তুলনায় উৎকৃষ্টতর এবং ইহাও সত্য যে, তাহাদের মধ্যে লক্ষপতির হার অধিকতর, কিন্তু ভারতবাসী অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে অনাহারগ্রস্ত, ভিটামাটিহীন ব্যক্তির হার যে অনধিক, তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণ, জন-সাধারণ যাহা উৎপন্ন করে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার বিষয়ে এবং দরিদ্র জন-সাধারণের উৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের মুষ্টিমেয়ের জন্য সঞ্চয়ের ব্যাপারে সুচতুর, কিন্তু তাহারা যেমন মনুষ্য-সমাজের বাস্তব ও মূল ঐশ্বর্য্য যে আহার্য্য ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, তাহার প্রচুর উৎপাদন-রীতি জানে না, তেমনই দরিদ্রদের মধ্যে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের বিতরণ-সাম্যের নীতি বিষয়েও তাহারা অজ্ঞ। এই জন্যই এই সকল দেশে সমূহবাদ, বিপ্লব ও বিগ্রহবাদ এবং সামরিকবাদ শান্তিপূর্ণ রাজ্য-শাসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে।

আধুনিক তথাকথিত শিক্ষার বিস্তার এবং কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রবর্ত্তন ও প্রসার নিমিত্তই যে এই সকল দেশে পুঁজিবাদ দেখা দিয়াছে, এই সরল কথাটি ডক্টর রাধাকুমুদ-শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ বুঝিতে অসমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু ঘটনাসমূহ গভীর ভাবে পর্য্যালোচনার সামর্থ্য এবং সাধারণ বুদ্ধি যাহার আছে, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাই প্রকৃত সত্য। যখন অক্ষরে নিহিত স্বাভাবিক শব্দের উপলব্ধির ভিত্তিতে অক্ষরজ্ঞান জন্মে, তখনই অক্ষরজ্ঞান সত্য ও প্রকৃত হয়, কিন্তু কয়েকটি নির্ব্বোধ সংস্কার এবং কাল্পনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন ইহার উদ্ভব হয়, তখন ইহা কোন কার্য্যেই লাগে না। প্রকৃত অক্ষরজ্ঞান মনুষ্যকে সত্যবাদী ও বিবেকী করে এবং ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ের যাথার্থ্য-বিচারের ক্ষমতা জন্মে এবং অপরের জন্য আন্তরিক সহানুভূতিবোধ জাগে। অন্যপক্ষে, তথাকথিত অক্ষরজ্ঞান মনুষ্যকে কূটনীতিপরায়ণ, অসত্যবাদী, অবিবেকী এবং স্বার্থপর করে। এই নিমিত্তই প্রকৃত অক্ষরজ্ঞানের অস্তিত্বকালে অপরের জন্য কার্য্য করিবার প্রকৃত প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে এবং সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি-লাভ সম্ভব হয়। অন্য পক্ষে, তথাকথিত অক্ষরজ্ঞানের অস্তিত্বকালে কেবল নিজের কার্য্যের স্বার্থবুদ্ধিই প্রবল হয় এবং সমাজের অধিকাংশের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া মাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ধনবান্ হয়। কোন দেশেরই অনেকসংখ্যক লোকের পক্ষে প্রকৃত অক্ষরজ্ঞান-লাভ সম্ভব নহে, কেন না, অক্ষর-নিহিত স্বাভাবিক শব্দ-বিজ্ঞানের উপলব্ধির উপরই ইহা নির্ভর করে, সুতরাং ইহার হার-বৃদ্ধির কথা উত্থাপন করা অর্থহীন। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন দেশেই প্রকৃত অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির হার-বৃদ্ধি সম্ভব

নহে এবং প্রকৃত অক্ষরজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে যে কৃত্রিম অক্ষরজ্ঞান দেখা দিয়াছে, তাহা দেশের স্বার্থহানিকর।

আধুনিক কালের এই কৃত্রিম অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হার-বৃদ্ধি যেরূপ অনিষ্টকর, সেইরূপ পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের হিসাবে মাথাপিছু আয়ের হার-বৃদ্ধির কোন প্রকার চেষ্টাও সমান অনিষ্টজনক, কেন না কৃত্রিম মুদ্রার প্রচলন ইহাতে বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং তাহার ফলে পুঁজিবাদী মনোভাব বিস্তার লাভ করিবে। এই সম্পর্কে বুঝা দরকার যে, প্রকৃত পুঁজিবাদীর (অর্থাৎ যাহারা আহার্য্য ও কাঁচামাল প্রভৃতি প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী) সংখ্যা কোন দেশে যত বৃদ্ধি পায়, সে দেশের জন-সাধারণের সুখ তত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবিচ্ছিন্ন পুঁজিবাদী মনোভাব দেশে যত বৃদ্ধি পায়, ততই তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশাও বৃদ্ধি পায়।

ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রারূপ কৃত্রিম ধনের প্রচলন ও অতিমাত্রায় বিস্তারের পশ্চাতে কি মনোভাব কার্য্যকারী হইয়াছে, তাহার আদি জানিবার চেষ্টায় দেখা যাইবে যে, যখন মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি দেশে আহার্য্য ও কাঁচামাল-রূপ প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য থাকে, তখন এইরূপ কোন কৃত্রিম মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না এবং এইরূপ কোন কৃত্রিম মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রয়োজন কেবল তখনই হয়, যখন প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের হ্রাস ঘটে, কেন না এই কৃত্রিম মুদ্রার সহায়তাতেই যাহারা অধিকতর চতুর, তাহারা অধিক মূল্যের বিনিময়ে উৎপাদককে উৎপন্ন-দ্রব্যবিক্রয়ে প্রলুব্ধ করে। এইরূপে যখন কৃত্রিম মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রচলন হয়, তখন আহার্য্য এবং কাঁচামালরূপী প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের উৎপাদন না করিয়াই, অথবা ইহার উৎপাদনে বিন্দুমাত্র সহায়তা না করিয়াই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি—যাঁহারা মোটা মাহিনা অথবা লভ্যাংশের উপার্জ্জনের সুযোগ লাভ করেন, উৎপাদকদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজেরা ধনবান্ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সুতরাং ইহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, কৃত্রিম অক্ষর-জ্ঞানের বিস্তারই হউক, অথবা পাউণ্ড, শিলিং ও পেন্সরূপ আয়ের মাথাপিছু হার-বৃদ্ধিই হউক, কিছুরই জন-সাধারণকে সুযোগ্য করিয়া গঠনের সহায়ক হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্য-পক্ষে, এই উদ্দেশ্যসাধনের নামে এই উভয়ই নিশ্চিত ভাবে প্রচুর অহিত সাধন করিবে। তথাপি যে, ডক্টর রাধাকুমুদ-শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ ইহার সপক্ষে কথা বলিয়া থাকেন, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, এই সকল ব্যক্তি সাধারণ বুদ্ধিবিবর্জ্জিত?

যদি অধিকাংশের সমৃদ্ধির ভিত্তিতে জাতীয়তা-গঠনই লক্ষ্য হয়, তবে দেশের জনসাধারণকে প্রথমতঃ আহার্য্য ও কাঁচা-মালরূপ প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য উৎপাদনের কার্য্যে লাগিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা মান উঠাইয়া দিতে হইবে এবং ধাতুমুদ্রার প্রচলন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ কৃত্রিম অক্ষরজ্ঞানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে; এবং চতুর্থতঃ অক্ষরনিহিত স্বাভাবিক শব্দের ভিত্তিতে গঠিত প্রকৃত অক্ষরজ্ঞানের মনোভাব জাগ্রত করিতে হইবে। আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে যে, এই প্রকৃত অক্ষরজ্ঞানের মনোভাব জাগরূক করাই সুযোগ্য জাতিগঠনের পক্ষে প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়, কেন না, জাতিগঠনমূলক কোন প্রকৃত কর্ম্মপদ্ধতি-গঠন প্রকৃত অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে, কিন্তু তাহা বলিতে আমরা নিরস্ত থাকিলাম, কেন না আর্থিক দুরবস্থার বর্ত্তমান আতিশয্যের অবস্থায়, ঐ প্রকৃত অক্ষরজ্ঞানের অর্জ্জন সাধারণতঃ সম্ভব নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় যে কতিপয় ব্যক্তির আকস্মিক কারণে ঐ প্রকৃত অক্ষরজ্ঞান-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, সাময়িক ভাবে তাঁহাদের নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করা ব্যতীত দেশবাসীর গত্যন্তর নাই।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ এন্. সি. চ্যাটার্জ্জী

এইবার আমরা যদি মিঃ এন্. সি. চ্যাটার্জ্জীর বক্তৃতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখি যে, দেশের হিতের দিক্ হইতে উহা ডক্টর রাধাকুমুদের বক্তৃতার ন্যায়ই অসার। মিঃ চ্যাটার্জ্জী একবার বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালার পক্ষে বিপজ্জনক হইতেছে নূতন শাসন-ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতারূপ ক্ষতের বৃদ্ধি", এবং "বাঙ্গালী জাতি কল্যক পুরুষ ধরিয়া এক মাতৃভূমির প্রতি সাধারণ অনুরাগ, জাতীয়তার উচ্চতম আদর্শ এবং অবিমিশ্র জাতীয়তাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে" এবং একই নিঃশ্বাসে আবার বলিয়াছেন, "সর্ব্ব-ভারতীয় দৃষ্টি-কোণ হইতে সর্ব্বদা দৃষ্টিভঙ্গী রঞ্জিত করা উচিত হইবে না,

স্বকীয় প্রদেশের সম্মুখীন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ এবং বিশেষ বাধাগুলি নিরাকরণ করিতে হইবে।”

যদি “এক মাতৃভূমির প্রতি সাধারণ অনুরাগ” “জাতীয়তার উচ্চতম আদর্শ” বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে “সর্ব্ব ভারতীয় দৃষ্টিকোণ দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গী রঞ্জিত” না করিবার উপদেশ তৎসহ সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হয় না, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জ্জী তাহাই বলিয়াছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জীর পক্ষে ইহা কি বাতুলোচিত হয় নাই ?

অতঃপর দেখা যায়, তিনি একবার প্রচার করিয়াছেন, “সাম্প্রদায়িকতারূপ ক্ষতের বৃদ্ধিই বাঙ্গালার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়াছে”, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার বলিয়াছেন, “স্বকীয় প্রদেশের সম্মুখীন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিশেষ বাধাগুলির নিরাকরণ করিতে হইবে।” এই দুইটি ভাব পরস্পর-বিরোধী। বাঙ্গালার উন্নতির পথে সাম্প্রদায়িকতা-বোধ ব্যাধিস্বরূপ বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হইলে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার প্রয়োজন ও বাধাসমূহের নিরাকরণের প্রতি মনঃসংযোগ-বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবে উপদেশ দান করা চলে না, কেন না ইহার ফলে প্রাদেশিকতাবোধ আসিবে এবং প্রাদেশিকতাবোধ ফলতঃ সাম্প্রদায়িকতাবোধেরই সদৃশ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পরিণতবয়স্ক হইলেও মিঃ চ্যাটার্জ্জী অদ্যাপি এত বালকোচিত এবং অনভিজ্ঞ যে, তাঁহার পক্ষে দেশের কাজে অবতীর্ণ হওয়া অশোভন। সুতরাং অসার চিন্তা এবং শব্দবিন্যাসে পরিপূর্ণ তাঁহার বক্তৃতার অবশিষ্টাংশের আমরা কোন আলোচনা করিব না।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডক্টর মেঘনাদ সাহা

এই সম্বন্ধেই ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, কি ভাবে বিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের মস্তিষ্ক জড়তাবিশিষ্ট ও দম্ভস্ফীত করিয়া থাকে এবং উল্লেখ করিয়াছি যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকবৃন্দের অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। এইবার আমরা তাঁহার বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব, তাহা হইতে কি বুঝিতে হয়।

ডক্টর মেঘনাদ সাহার বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) খনিজ সংস্থান ও বারি-শক্তির দিক্ হইতে ভারতের যে বিপুল সম্ভাবনা, তৎসাহায্যে ভারতকে শিল্প দ্বারা যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট রুশিয়ার ন্যায়ই সমৃদ্ধ করা যায়।

(২) এই বিপুল সংস্থান সত্ত্বেও ভারত যে শিল্প-বিষয়ে এত পশ্চাৎবর্ত্তী, ইহার কারণ এই যে, অনেকে অতীতে ক্রমাগত বলিয়া আসিয়াছেন যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষির উন্নতির দ্বারাই তাহার সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইবে।

(৩) বাঙ্গালার কথা ধরিলে দেখা যায়, কৃষির উপর তাহার লোকসংখ্যার চাপ মারাত্মক এবং প্রতি বর্গ-মাইলে যে-পরিমাণে লোক বিনা কষ্টে দিনাতিপাত করিতে পারে, তদপেক্ষা চারিগুণেরও অধিক তাহার লোকসংখ্যা।

(৪) সুতরাং এই অতিরিক্ত লোকসংখ্যার জীবিকা-নির্ব্বাহের কোনরূপ ব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গালার জন-সাধারণের অধিকাংশের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন-সাধন অসম্ভব।

(৫) ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষির মধ্যেই তাহার মুক্তি নিহিত রহিয়াছে, ইহার উপর অত্যধিক জোর দেওয়াই তাহার বর্ত্তমান অবস্থার মূলে।

(৬) অতীতে যে-সকল বিভেদকর প্রভাব ভারতের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছিল, ভারতের জাতীয় জীবনে পুনরায় সে-সব দেখা দিতে পারে।

(৭) কোন দেশের উন্নয়নকল্পে দুইটি প্রধান বস্তু সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, প্রাকৃতিক শক্তির সুলভ বিতরণ এবং প্রধান শিল্পসমূহ রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা। ইহাদিগকে পুঁজিবাদীর স্বার্থানুযায়ী পরিচালনা না করিয়া জনসাধারণের স্বার্থানুযায়ী পরিচালনা করা উচিত।

(৮) বাঙ্গালার সরকার প্রদেশস্থ বৈজ্ঞানিকদিগকে কার্য্যে লাগাইতেছেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি বৈদেশিক বিশেষজ্ঞবৃন্দের উপর নিবদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

(৯) সময় আসিয়াছে, যখন বাঙ্গালার সরকারকে অন্য সকল কার্য্য হইতে মন ফিরাইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের

সাহায্য লইয়া গঠনমূলক কার্য্যের প্রতি অবহিত হইতে হইবে।

ডক্টর মেঘনাদ সাহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা যথাবিহিত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যায়, তাঁহার সিদ্ধান্ত, মতবাদ এবং নির্দ্দেশ নিম্নলিখিতরূপ:—

(১) যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েট-রুশিয়ার আর্থিক অবস্থা ভারত অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, সুতরাং ভারতকে ঐ সব দেশের অনুকরণ করিতে হইবে।

(২) আর্থিক সমৃদ্ধিলাভার্থ কোন দেশে কৃষি অপেক্ষা শিল্পের উন্নয়নের প্রতি অধিকতর অবহিত হইতে হইবে। কৃষিপ্রধান দেশ এবং শিল্প অপেক্ষা কৃষির প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়াতেই ভারত আর্থিক দিক্ দিয়া পশ্চাৎপদ।

(৩) শিল্প-উন্নয়ন করিতে হইলে দেশে প্রাকৃতিক শক্তির সুলভ বিতরণ-ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রধান প্রধান শিল্পসমূহকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

(৪) বাঙ্গালার পক্ষে আর্থিক সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব নহে, কেন না, ইহা অত্যন্ত কৃষিনির্ভর এবং প্রতি বর্গমাইলে যে-পরিমাণ লোক বিনা কষ্টে দিনাতিপাত করিতে পারে, ইহার লোকসংখ্যা তদপেক্ষা চারিগুণ অধিক।

(৫) বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার সম্যক্ পরিবর্ত্তন-সাধনায় বাঙ্গালার সরকারকে বৈজ্ঞানিকদিগের সাহায্য লইতে হইবে এবং গঠনমূলক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে হইবে।

(৬) এই গঠনমূলক কার্য্যের উপরেও মনে রাখিতে হইবে যে, অতীতে যে বিভেদকারী প্রভাবসমূহ ভারতের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছিল, ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনে তাহার পুনরভ্যুদয় এড়াইবার বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

আমরা এইবার দেখাইব যে, উপরিলিখিত প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত, মতবাদ এবং নির্দ্দেশ অযথার্থ এবং নির্ব্বোধোচিত।

প্রথমতঃ, ডক্টর সাহার মতে যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েট রুশিয়া আর্থিক দিক্ দিয়া ভারত অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ, সুতরাং ভারতকে উহাদের অনুকরণে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মতে, যুক্তরাজ্য কিংবা সোভিয়েট রুশিয়া, উভয় দেশই অতীতেও যেরূপ কোন দিন ভারত অপেক্ষা আর্থিক দিক্ দিয়া অধিক সমৃদ্ধ ছিল না, সেইরূপ এখনও তাহা নহে এবং ঐ সকল দেশে ভারতীয়গণের অনুকরণযোগ্য কোন প্রকার সংগঠন নাই।

কোন দেশে অপর কোন দেশ অপেক্ষা আর্থিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে, এই আর্থিক সমৃদ্ধি কি ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নে চারিটি হিসাব উপস্থিত করিতেছি:—

(১) খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্য। কোন দেশে যত অধিক খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইবে এবং যত অধিক সেই দেশ ইহার রপ্তানী করিতে পারিবে, সে দেশের সমৃদ্ধি তত অধিক ধরিতে হইবে।

(২) মনুষ্যের বাঁচিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক শিল্পদ্রব্যরূপ ব্যবহার্য্য ও কাঁচামালের প্রাচুর্য্য।

(৩) একান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের প্রাচুর্য্য। মনুষ্যের বাঁচিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের প্রাচুর্য্য কোন দেশে যত অধিক হইবে এবং যত অধিক পরিমাণে ইহা কোন দেশ রপ্তানী করিতে পারিবে, তাহার সমৃদ্ধি তত অধিক ধরিতে হইবে। ইহা যত অনধিক হইবে এবং যথোচিত ইহাদের আমদানী যত অধিক হইবে, দুরবস্থা তত অধিক বুঝিতে হইবে।

(৪) ব্যক্তিগত নকরগিরীর পরিমাণ। যে দেশে যত কম লোক জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বেতনভোগী, চাকুরী-প্রত্যাশী এবং স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ উপজীবী লোকসংখ্যার হার যে দেশে যত অধিক সে দেশের সমৃদ্ধি তত অধিক ধরিতে হইবে। বেতনভোগী, চাকুরী-নির্ভর লোক-সংখ্যার হার যে-দেশে যত অধিক, সে-দেশের দুরবস্থা তত অধিক।

যদি আমরা ধরিয়া লই যে, বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধির তুলনার্থে এই চারিটীই প্রধান নিরিখ, তবে চিন্তাশীল পাঠকের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য হইবে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

এই চারিটি নিরিখের সাহায্যে যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট রুশিয়া এবং আমেরিকার অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে ইহা সত্য যে, অতীত অপেক্ষা ভারত বর্ত্তমানে অনেক দরিদ্র হইয়াছে, কিন্তু যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েট রুশিয়ার তুলনায় অতীতে কিংবা বর্ত্তমানে ইহার সমৃদ্ধি কখনও কম ছিল না কিংবা নহে।

এই তিনটি দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকার যথাবিহিত আলোচনায় দেখা যাইবে যে, এমন কি দশ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে এমন কোন দ্রব্যের বিন্দুমাত্র ঘাটতি ঘটে নাই, মনুষ্যের বাঁচিবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অন্য পক্ষে, অন্য দুইটি দেশে কয়েকটি বিলাসদ্রব্য উদ্বৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি মনুষ্যের বাঁচিবার পক্ষে যে-সকল দ্রব্যের একান্ত প্রয়োজন, এমন কয়েকটি দ্রব্যের অভাবও ঐ দুইটি দেশে পরিলক্ষিত হইবে।

সত্য যে, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয়ভাবে পরাধীন, কিন্তু এমন কি, পোনের বৎসর পূর্ব্বেও বেতনভোগী চাকুরী-প্রত্যাশীর হার অপর দুইটি দেশের তুলনায় ভারতে নগণ্য ছিল। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার করিতে হইলে আরও অনেক লিখিতে হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যায় উহার স্থানাভাব, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে ঐ আলোচনা আমরা করিব।

দ্বিতীয়তঃ ডক্টর মেঘনাদ সাহার মতে, আর্থিক সমৃদ্ধি-লাভার্থ দেশের কৃষি অপেক্ষা শিল্পের উন্নয়নের প্রতি অধিক অবহিত হইতে হইবে, কিন্তু আমাদের মতে এতদুদ্দেশ্যে কৃষি ও কুটীরশিল্পের প্রতি সমান পরিমাণে অবহিত হইতে হইবে এবং প্রথমে কৃষির উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে, কেন না, কৃষির উন্নয়ন ব্যতিরেকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে না।

আমরা পুনরায় বলিতেছি যে, যদি শিল্পোন্নয়ন দ্বারা কোন দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে সমৃদ্ধ হইতে পারিত, তবে, ইউরোপ এবং আমেরিকার কোন দেশেই দুর্দ্দশা পরিলক্ষিত হইত না। এই সম্পর্কে ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিয়াছেন যে, কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া এবং শিল্প অপেক্ষা কৃষির উন্নয়নে অধিকতর অবহিত বলিয়াই ভারত আর্থিক দিক্ দিয়া পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর অপর কোন দেশের তুলনাতেই ভারত কোন দিনই পশ্চাদ্বর্ত্তী নহে। যদি তাহাই না হইত, তবে ভারতবাসীদের জীবিকার জন্য বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কিন্তু এমন কি, আজিও পর্য্যন্ত অপরাপর দেশবাসীর ন্যায় ভারতবাসীদের তাহা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। আজিও পর্য্যন্ত ভারতবাসী দাতা, অপরাপর দেশ গ্রহীতা। ভারতের এই সমৃদ্ধির মূল সম্পূর্ণভাবে কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উন্নয়ন। ভারত যে আর সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধি বজায় রাখিতে পারিতেছে না, তাহার মূল এই যে, তাহার সন্তানগণ ভারতের কৃষি-উন্নয়নে নিজস্ব সনাতন বৈজ্ঞানিক পন্থা বিস্মৃত হইয়াছে এবং অপর দেশবাসীর সাহচর্য্যে ডক্টর মেঘনাদ সাহার ন্যায়ই মস্তিষ্কহীন এবং স্ফীতমস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ডক্টর মেঘনাদ সাহার মতে, শিল্পের উন্নয়নার্থ দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির সুলভ বিতরণ প্রয়োজন এবং প্রধান শিল্পসমূহের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, কোন দেশেই এরূপ শিল্প প্রবর্ত্তিত হওয়া অন্যায়, যাহার জন্য শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন; কেন না 'শক্তি'র প্রয়োগ জমীর উর্ব্বরাশক্তির অনিষ্ট করিতে বাধ্য, যাহার ফলে অবশেষে দেশকে আহার্য্য ও কাঁচামালের জন্য ভিক্ষার্থী হইতে হয়। সুতরাং যন্ত্র-পরিচালিত শিল্পের উন্নয়নের সকল পরিকল্পনাই সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় এবং তৎপরিবর্ত্তে কুটীর-শিল্প-উন্নয়নের পরিকল্পনা অবশ্যগ্রহণীয়। যদি জমীকে যথেষ্ট উর্ব্বরা করা যায় এবং কৃষিকার্য্যকে যতদূর সম্ভব সচ্ছন্দ করা যায়, তবে এই পরিকল্পনা স্বতঃই সার্থক হইবে। প্রধান প্রধান শিল্পকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করিবার বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা অদূরদর্শিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার অন্যতম উদাহরণ, কেন না, ইহাতে শ্রমজীবীকে বেতনভোগী চাকুরীর দাস করিয়া ফেলা হইবে—মনুষ্যোচিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ধারণার সহিত ইহা মোটেই খাপ খাইতে পারে না।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, এমন সংগঠনের ব্যবস্থা, যাহাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় পরিশ্রমে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার সামর্থ্য লাভ করে, অতীতে ভারতীয় কৃষক, কুটীর-শিল্পী (কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি), বণিক্ (শাহা, তিলি, প্রভৃতি) ইত্যাদির যেরূপ অবস্থা ছিল। ডক্টর শাহা তাঁহার বৈজ্ঞানিক হিসাবে যশের জন্য যথেষ্ট গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারেন এবং তিনি তাঁহার মোটা মাহিনার জন্যও গর্ব্বিত

হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত যে, মোটের উপর তিনি বেতনভোগী নফর এবং পাশ্চাত্ত্য মনোভাবের পরাধীন-বুদ্ধি দাস মাত্র ; শাহা-শ্রেণীর স্বাধীন ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের যে আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং কাণ্ডজ্ঞান ছিল, তাঁহার তাহা আছে বলিয়া মনে করা যায় না। কুশিক্ষা লাভ করিয়া সনাতন আত্মমর্য্যাদা যে তিনি হারাইয়া বসিয়াছেন এবং নিকৃষ্টতম ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছেন, পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহা তিনি উপলব্ধি পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। যদি তাঁহার মস্তিষ্কের সেই সামর্থ্য থাকিত, যদ্দ্বারা অতীত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়, তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, দেশে এমন একদিন ছিল, যখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে পুত্র-প্রপৌত্রের সাংসারিক স্বচ্ছলতা বিষয়ে দুশ্চিন্তা করিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার মোটা মাহিনা এবং টাকা-আনা-পাইয়ের সঞ্চিত তহবিল সত্ত্বেও নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না যে, তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা ভিক্ষুক ও লক্ষ্মীছাড়া হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও প্রশংসা লাভ করিবার ফলে যে নির্ব্বোধোচিত দাম্ভিকতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা তাহা তাঁহাকে পরিহার করিয়া এমন গুরুর সন্ধান করিতে বলি, যিনি তাঁহাকে প্রকৃত বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দান করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, ডক্টর মেঘনাদ সাহার মতে, বাঙ্গালার পক্ষে আর্থিক সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব নহে, কেন না, ইহা অত্যন্ত কৃষিনির্ভর এবং প্রতি বর্গ-মাইলে যে-পরিমাণ লোক কষ্টে দিনাতিপাত করিতে পারে, তদপেক্ষা ইহার লোকসংখ্যা চারিগুণ।

এই বিষয়ে আমাদের অভিমত এই যে, ইহা সত্য যে, প্রয়োজনের অনুপাতে এবং অতীতে যে অবস্থা ছিল, তাহার তুলনায় বাঙ্গালা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এমন কি আজও পর্য্যন্ত ইহা পৃথিবীর সমৃদ্ধতম প্রদেশ, কেন না, ভারতের অপরাপর প্রদেশের তুলনায় ইহা সমধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং ভারত পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনায় সর্ব্বাধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাহাই যদি না হইত, তবে এমন কি পনের বৎসর আগেও বাঙ্গালী কৃষক বেতনভোগী চাকুরীর দাসত্ব-প্রত্যাশী না হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। বাঙ্গালী কৃষক যে অন্য প্রদেশে গিয়া দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়াই সাধারণতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং অনুপক্ষে যে এমন একটি প্রদেশ নাই, যাহার শ্রমজীবীকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য প্রবাসী না হইতে হয়, এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না যে, সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অঞ্চল। বাঙ্গালা যে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, ইহার কারণ হইতেছে, অপরাপর সকল অঞ্চলের তুলনায় বাঙ্গালার জমীর উর্ব্বরাশক্তি সর্ব্বাধিক। পূর্ব্বে ইহার যে ঐশ্বর্য্য ছিল, এখন যে তাহা আর নাই, তাহার কারণ ইহার জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস। যদি অবিলম্বে ইহার জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির পুনরুদ্ধার করা যায়, তবে মাত্র তিন বৎসর কালের মধ্যে ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনা সম্ভব এবং যদি ইহার নদনদী-প্রবাহে বাধা উৎপন্ন না করা হয় এবং ইহাদের উৎস হইতে মোহনা পর্য্যন্ত রেলরাস্তা, মোটর চালাইবার রাস্তা, ব্রিজ ও বাণিজ্য-কেন্দ্রস্বরূপ আধুনিক শহররূপ যে সকল বাধা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, সেই সকল বাধা নির্ম্মূল করিয়া ফেলা হয়, তবে ইহার মাটীর এই স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি নিশ্চিতরূপে পুনরুদ্ধার অবিলম্বে সম্ভব।

ইহার অর্থ এই যে, যদি ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের কেরামতি অচিরাৎ নির্ম্মূল করা যায়, তবে বাঙ্গালার দরিদ্র অধিবাসীরা,—কেবল বাঙ্গালার কেন, সমগ্র পৃথিবীর বলা উচিত, অনতিবিলম্বে দুর্দ্দশার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। যাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা বুঝিয়া উঠিতে তাঁহাদিগের বেগ পাইতে হইবে না—অবশ্য যদি তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের কুশিক্ষার দ্বারা কোন ভাবে মোহগ্রস্ত না হন।

ডক্টর মেঘনাদ সাহার যে মত,—প্রতি বর্গ-মাইলে যে-পরিমাণ লোকের বিনা কষ্টে দিনাতিপাত সম্ভব, বাঙ্গালার লোকসংখ্যা তদপেক্ষা চারিগুণ—তাহা তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় না। ইহা কেবল প্রমাণ করে যে, এই সব বিষয়ে মত-গঠনের উপযোগী বুদ্ধিও তাঁহার নাই। যদি দেখা যাইত যে, স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির অস্তিত্ব সত্ত্বেও, সমগ্র বাঙ্গালী লোকসংখ্যার জন্য যে পরিমাণ আহার্য্য ও কাঁচামাল প্রয়োজনীয় এবং বাঙ্গালার সমগ্র কৃষকসংখ্যার কার্য্যনিয়োগের জন্য যে পরিমাণ আবাদী জমীর পরিমাণ প্রয়োজন, বাঙ্গালার জমী

তদপেক্ষা কম, তবে বাঙ্গালায় জমীর উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে, ইহা ধরিয়া লওয়া অন্যায় হইত না। কিন্তু, সমগ্র বাঙ্গালার আবাদী জমীর বিঘা-সংখ্যাকে সমগ্র জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ১ বিঘা অপেক্ষা যদি কম না হয়, তবে বলিতে হয় যে, সমগ্র লোকসংখ্যার উপযোগী আহার্য্য ও কাঁচামালের পক্ষে যথেষ্ট জমী বাঙ্গালায় আছে,—যদি অবশ্য স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির অস্তিত্ব থাকে, কেন না গড়পড়তা বিঘা প্রতি ১২ মণ ধান্য উৎপন্ন হইলে—এবং স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বজায় থাকিলে ইহাই উৎপন্নের পরিমাণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে—মোটামুটি সমগ্র বৎসরে একটি লোকের যাহা প্রয়োজন, উহাকে তদপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সেন্সাস-বিবরণী এবং বার্ষিক কৃষি-বিবরণী-সমূহ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি এবং আবাদী জমীর পরিমাণ প্রায় ৭॥০ কোটি বিঘা। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালার প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে গড়পড়তায় ১॥০ বিঘা জমী পড়ে। একটি ব্যক্তির প্রয়োজনের পক্ষে ইহা বস্তুতঃ শতকরা ৫০ ভাগ বেশী—অবশ্য যদি জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির অস্তিত্ব থাকে।

এমন কি, যদি এমনও দেখা যায় যে, আবাদী জমীর পরিমাণ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক কৃষকের ভাগে ১০ বিঘা পড়িবার অনুরূপ যথেষ্ট নহে, তবে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় যে, কোন কোন হিসাবে বাঙ্গালায় জমীর উপর চাপ অত্যধিক। এমন কি, এই দিক্ হইতে দেখিলেও বাঙ্গালার জমীর উপর চাপ অত্যধিক বলিয়া ধরা চলে না, কেন না বাঙ্গালায় আবাদী জমীর পরিমাণ ৭॥০ কোটি বিঘা এবং কৃষকসংখ্যা ৬৫ লক্ষ।

সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন দিক্ দিয়াই বাঙ্গালার জমীর উপর চাপ অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালী কৃষক যে তথাপি দারিদ্র্য-গ্রস্ত, ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ইহার জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস, যাহার নিমিত্ত দায়ী প্রধানতঃ আধুনিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতার ক্রিয়াকলাপ—যথা, নদীস্রোতে বাধা-উৎপাদন-কারী রেল রাস্তা, মোটর-রাস্তা, ব্রিজ এবং বাণিজ্যকেন্দ্রস্বরূপ শহর এবং জলসেচের জন্য বাঁধ-নির্ম্মাণ; জমীর অভ্যন্তরস্থ তেজোৎপাদনে বাধা-উৎপাদনকারী খনিজ-উত্তোলন; চারি পার্শ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপ ও শৈত্য সঞ্চারক কার্য্যে বাধা-উৎপাদনকারী শক্তি-জনন। এই জন্যই আমরা ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকবৃন্দের এত বিরুদ্ধে।

পঞ্চমতঃ, ডক্টর মেঘনাদ সাহার মতে, বাঙ্গালার আর্থিক ব্যবস্থাসমূহের পরিবর্ত্তন-সাধনকল্পে বাঙ্গালার সরকারের গঠন-মূলক কার্য্যের প্রতি এবং বৈজ্ঞানিকবৃন্দের সাহায্যে কার্য্যে অবহিত ও অবতীর্ণ হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আমাদের মত এই যে, বাঙ্গালার পুরাতন সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, বাঙ্গালার সরকারকে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া, ভারত সরকারকে দিয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত নদীস্রোতের পথে যে প্রতিবন্ধকতা নিক্ষেপ ও নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা অপসৃত করিবার নিমিত্ত এবং অপর যে-সকল বৈজ্ঞানিক সংগঠন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জমীর উর্ব্বরাশক্তিতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, তাহা নির্ম্মূল করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের ইহাও অভিমত যে, শাসন-ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিকদিগের সাহায্যগ্রহণ দূরে থাক, যে সব বৈজ্ঞানিক গোঁড়া, সুতরাং যাঁহারা মস্তিষ্কহীন, তাঁহাদিগকে সকল প্রকার কার্য্য হইতে সরকারের বিতাড়িত করা উচিত।

আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, আমরা কেন ইহা বলিতেছি।

ষষ্ঠতঃ, ডক্টর মেঘনাদ সাহার মত যে, অতীতে যে বিভেদকারী প্রভাবসমূহ ভারতের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনে যাহাতে তাহাদের পুনরভ্যুদয় না ঘটে, এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। এই বিষয়ে আমাদের অভিমত এই যে, ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞান ও সংগঠনের বিকৃতিই সমগ্র বিভেদকারী প্রভাবসমূহের মূলে, যাহার ফলে ভারতের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছে এবং ঋষিগণের সংস্কৃত (প্রচলিত সংস্কৃত নহে) যথাযথ-ভাবে শিক্ষা করিয়া সর্ব্বথা ঐ সংগঠন ও বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধারার্থ চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই জন্যই, যাহারা, এমন কি দেবভাষার বর্ণমালার প্রথম তিনটি অক্ষর-শিক্ষার সামর্থ্যহীন হইয়াও বেদ ও দেবভাষাকে ব্যঙ্গ করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করে, তাহাদিগকে ভদ্রসমাজ হইতে অস্পৃশ্য জীববিশেষের ন্যায় অনতিবিলম্বে বিতাড়িত করিতে হইবে।

এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সুদীর্ঘ হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যার পক্ষে আমাদের আলোচনা ইহাতেই দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ঐ আলোচনায় নিবৃত্ত থাকিলাম।

উপসংহারে আমরা পাঠকদিগকে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে বলিতেছি এবং তাঁহাদিগের বিভ্রান্তিকর নেতৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে অনুরোধ করিতেছি।

মানবজাতির সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা

কলিকাতার কৈলাস বসু ষ্ট্রীট হইতে "হিন্দু" নামক যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার ১৬ই আষাঢ়ের সংখ্যার সাময়িক প্রসঙ্গে এই সন্দর্ভের লেখককে পরোক্ষভাবে কিছু বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং কয়েকটী অযাচিত উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। "হিন্দু" পত্রিকার এই সংখ্যা পড়িয়া আমাদিগের বুদ্ধির দ্বারা যতদূর বুঝা সম্ভব হয় তাহাতে মনে হইয়াছে যে, আমরা মাসুবের "মানবধর্ম্ম" সম্বন্ধে লিখিয়া থাকি বলিয়া "হিন্দু" পত্রিকার বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছি। উপরোক্ত লেখক আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী কথা উল্লেখযোগ্য :—

(১) আমরা 'বঙ্গশ্রী'র 'মানবধর্ম্ম'-প্রবক্তা মহাশয়কে বলিতেছি, আগে মানবজনমরূপ পতিত জমিটির চাষের ব্যবস্থা করুন। তাহার পর ভারতের নদীগুলিকে বাঁধমুক্ত করিয়া দিবেন, নোট ও টাকা-পয়সা প্রভৃতি ধাতব মুদ্রার প্রচলন নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থের যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। গোড়ার কথা শিক্ষার কথা। যে শিক্ষায় কাম-কামনার প্রবৃদ্ধি হয়, লোভ, স্বার্থ-পরতা ও বিচারবিমূঢ়তা বিশ্বগ্রাসী হয়, সেই শিক্ষা যাহাতে একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে ভারতের চিরন্তন শিক্ষার প্রসার হয় তাহার চেষ্টা করুন।

(২) মানবজনমকে পতিত রাখিয়া "মানবধর্ম্ম" ব্যাখ্যার কোনও অর্থই হয় না।

"হিন্দু" পত্রিকার উপরোক্ত দুইটি কথা ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা, চিন্তাশক্তির অভাব, অদূরদর্শিতা, আত্ম বিশ্লেষণহীনতা, ব্যক্তিবিশেষের উপর বিদ্বেষপরায়ণতা এবং "বঙ্গশ্রী"র কথাগুলি সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহিতার পরিচায়ক। ঐ কথা দুইটী যতই দোষযুক্ত হউক না কেন, উহার কোনটাই অনন্য-সাধারণ ভাবের দোষে দুষ্ট নহে এবং সেই হিসাবে একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

"হিন্দু" পত্রিকার আলোচ্য কথা দুইটী সম্বন্ধে আমরা কেন উপরোক্ত মতবাদ প্রকাশ করিতেছি, তাহা দেখান আমাদিগের এই সন্দর্ভের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙ্গালার, তথা ভারতবর্ষের, তথা মানবজাতির বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইলে কোন্ পন্থার পর কোন্ পন্থা কেন অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী মোটা কথা এই প্রসঙ্গে দেখা যাইবে। কাজেই, আলোচনা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষেও প্রয়োজনীয়।

"হিন্দু" পত্রিকার আলোচ্য কথা দুইটীতে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রভৃতি উপরোক্ত দোষগুলির সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে ঐ কথা দুটীকে আরও তলাইয়া বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে তাহাই করিব।

"হিন্দু" পত্রিকা আমাদিগকে অযাচিত ভাবে যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, তন্মধ্যে যে দুইটী কথা উল্লেখযোগ্য, তাহার প্রথম কথাটীর সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগের বিষয় রহিয়াছে নিম্নলিখিত বাক্যে :—

"যে শিক্ষায় কাম-কামনার প্রবৃদ্ধি হয়, লোভ, স্বার্থ-পরতা ও বিচারবিমূঢ়তা বিশ্বগ্রাসী হয়, সেই শিক্ষা যাহাতে একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে ভারতের চিরন্তন শিক্ষার প্রসার হয় তাহার চেষ্টা করুন।"

"ভারতের চিরন্তন শিক্ষা" বলিতে যে কি বুঝায় এবং কি করিয়া যে তাহার প্রসার সাধন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমরা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারি না। "হিন্দু" পত্রিকার উপরোক্ত বাক্যটি হইতে বুঝিতে হয় যে, ভারতবর্ষে একটী "চিরন্তন শিক্ষা" রহিয়াছে এবং ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে

পারিলে কাম-কামনা, লোভ, স্বার্থ পরতা ও বিচার-বিমূঢ়তা বিনষ্ট করা সম্ভব হইয়া থাকে। আমাদিগের যতদূর জানা আছে, তদনুসারে বলিতে হয় যে, এতাদৃশ কোন "শিক্ষা"র কথা ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থে বিদ্যমান নাই। ঋষিগণের গ্রন্থানুসারে "শিক্ষা" হয় 'অক্ষর', 'পদ' ও 'বাক্য'মূলক। ঐ "শিক্ষা"র-ফলে বিভিন্ন গ্রন্থ "পাঠ" ও "অধ্যয়ন" করিয়া সেই গ্রন্থসকলের যথাযথ অর্থ গ্রহণ করা এবং তদ্বক্তব্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ঋষি-কথিত "শিক্ষা" লাভ করিয়া ঋষি-প্রণীত পৌরুষেয় এবং অ-পৌরুষেয় শাস্ত্রগুলি সম্যক্ ভাবে পাঠ ও অধ্যয়ন করিতে পারিলে খণ্ড-মণ্ডল ও অখণ্ড-মণ্ডল-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুমান করা এবং এমন কি প্রত্যক্ষ করা পর্য্যন্ত সম্ভব হয় বটে, কিন্তু স্বকীয়, অথবা অপর কাহারও কাম-কামনা, লোভ, স্বার্থ-পরতা ও বিচার-বিমূঢ়তামূলক কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় বলিয়া আমরা ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ হইতে বিদিত হইতে পারি নাই।

চারিটী বেদের চারিটী 'প্রাতিশাখ্য' রহিয়াছে। ঐ চারিটী "প্রাতিশাখ্যে" এবং বেদাঙ্গের "শিক্ষা"র যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞগণের পক্ষে ঐ চারিটী 'প্রাতিশাখ্যে'র কোনটীতেই অথবা বেদাঙ্গের শিক্ষায় যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে, কারণ সাধারণতঃ "ভাষ্য"ই এই সংস্কৃতজ্ঞগণের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে এবং উহার কোন ভাষ্যটীতেই কোন "প্রাতিশাখ্যে"র অথবা বেদাঙ্গান্তর্গত "শিক্ষা"র মূল বক্তব্য সঠিক ভাবে পরিস্ফুত হয় নাই।

ঋষিগণের কথানুসারে কাহার নাম "শিক্ষা" তাহা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আজকাল মানুষ শরীর, মন ও বুদ্ধি বিষয়ে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখযোগ্য ভাবে 'শিক্ষা'র প্রসার সাধন করা ত' দূরের কথা, সমগ্র ভারতবর্ষে 'শিক্ষা'-গ্রহণের উপযোগী দশটী মানুষ পাওয়াও সম্ভব কি না, তাহা চিন্তার বিষয়। বস্তুতঃ পক্ষে ঋষিগণ যাহাকে 'শিক্ষা' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তাহা কোন কালেই আর্য্য ও শূদ্র-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। তাঁহাদিগের কথানুসারে যাঁহারা 'ব্রহ্ম'কে প্রত্যক্ষ করিতে অথবা অন্ততঃপক্ষে যথাযথভাবে অনুমান করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃত 'শিক্ষা' অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। অক্ষর, পদ ও বাক্যমূলক যে 'শিক্ষা' তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে জিহ্বার বিভিন্ন উচ্চারণ-শক্তির ও চক্ষুরাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন শক্তির উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয় কেন, তাহা স্বকীয় অবয়বের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ উপলব্ধির কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় অবয়বাভ্যন্তরস্থ ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নির বিভিন্ন কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতে হয়। স্বকীয় অবয়বাভ্যন্তরস্থ ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নির বিভিন্ন কার্য্য প্রত্যক্ষ করার নাম 'জীব-ব্রহ্ম'কে প্রত্যক্ষ করা। যাঁহারা এই 'জীব-ব্রহ্ম'কে প্রত্যক্ষ করিবার কার্য্যে সিদ্ধ হইতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে ঋষিদিগের ভাষানুসারে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া আখ্যাত করা হইত। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, খাঁটি ব্রাহ্মণ আজকাল প্রায়শঃ একটীও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারই জন্য বলিতে হয় যে, আজকাল মানুষ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহাতে মনুষ্য-সমাজে এখনই ঋষি-কথিত 'শিক্ষা'র প্রসার সাধন করা সম্ভব নহে। অথচ, যখন 'হিন্দু' পত্রিকা আমাদিগকে ঐ কার্য্যের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতেছেন, তখন কি বুঝিতে হয় না যে, উহার সম্পাদকমণ্ডলী ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ, চিন্তাশক্তির অভাবযুক্ত, অদূরদর্শী এবং আত্ম-বিশেষণহীন?

অনেকে হয়ত মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ্য লাভ করাও 'শিক্ষা'সাপেক্ষ। যাঁহারা ঋষি-প্রণীত মূল শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইবার সামর্থ্যযুক্ত, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ঐ ধারণাও সঠিক নহে। "ব্রাহ্মণ্যে" উন্নতি লাভ করিতে হইলে 'শিক্ষা' একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। যে যে প্রকরণের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয় তাহার নাম 'অভ্যাস'। 'শিক্ষা' যেরূপ অক্ষর, পদ ও বাক্যমূলক, 'অভ্যাস' সেইরূপ 'ব্যবহার'-মূলক।

কাম-কামনার প্রবৃদ্ধি, লোভ, স্বার্থ-পরতা ও বিচার-বিমূঢ়তা বিদূরিত করিতে হইলে প্রয়োজন হয় কতকগুলি অভ্যাসের।

'পরেবামসমাখ্যেয়মভ্যাসাদেব জায়তে।
মণিরূপ্যাদিবিজ্ঞানং তদ্বিদাং নানুমানিকম্'।

এই শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "মণির রূপ ও ব্যবহার প্রভৃতি যেরূপ পদার্থ-জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, পরন্তু উহার ব্যবহারে বিষয়-অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যক্ত ও বিকৃত পরিচালনাও মূলতঃ অভ্যাসের দ্বারাই নিয়মানুগ করিতে হয়।" এই শ্লোকটী আমাদিগের উপরোক্ত কথার প্রমাণ। তন্ত্রের 'পঞ্চ-তত্ত্বে'র অভ্যাস-সম্বন্ধীয় কথাগুলি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলেও আমাদিগের বক্তব্যের যাথার্থ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। বস্তুতঃপক্ষে কাম-কামনার প্রবৃদ্ধি, লোভ, স্বার্থপরতা ও বিচারবিমূঢ়তা বিদূরিত করিবার উপায় এই পঞ্চ-তত্ত্বের "অভ্যাসে"র মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু, পরিতাপের

বিষয় এই যে, আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞগণ এতই নিকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, "পঞ্চ-তত্ত্বে"র অভ্যাস ত' দূরের কথা, "পঞ্চ-তত্ত্ব" যে কি বস্তু, তাহা পর্য্যন্ত ইঁহারা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারেন না। 'মদ্য', 'মাংস', 'মৎস্য', 'মুদ্রা' ও 'মৈথুন' লইয়া যে 'পঞ্চ-তত্ত্ব', তাহা সম্ভবতঃ পাঠকগণের অনেকেই বিদিত আছেন। আজকালকার সংস্কৃতজ্ঞগণ সাধারণতঃ পঞ্চ-তত্ত্বের মদ্য, মাংস ও মৎস্যকে তিনটি দ্রব্য বলিয়া এবং মুদ্রা ও মৈথুনকে দুইটী আবয়বিক প্রকরণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। "তত্ত্ব" শব্দটীর অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন দ্রব্য অথবা আবয়বিক প্রকরণ কখনও 'তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, পরন্তু কোন না কোন উপলব্ধিজাত জ্ঞানকেই "তত্ত্ব" বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কাযেই যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন লইয়া "পঞ্চ-তত্ত্ব", তাহার কোনটীকে কোন দ্রব্য-বাচক বস্তু অথবা আবয়বিক কার্য্য-বাচক প্রকরণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে।

আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একদিকে যেরূপ এখনই ঋষিগণকথিত শিক্ষার প্রসার সাধন করা সম্ভব নহে, সেইরূপ আবার যে "অভ্যাস"গুলির সহায়তায় কাম-কামনার প্রবৃদ্ধি, লোভ, স্বার্থ-পরতা ও বিচার-বিমূঢ়তা সংযত করা সম্ভব হইতে পারে, সেই অভ্যাসগুলিও যথোপযুক্ত পরিমাণে সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব নহে।

সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, মানুষের পেট যখন অন্নাভাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন সরবরাহের দ্বারা ঐ জঠরাগ্নি প্রশমিত করিবার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষকে অন্য কোন উন্নতিকর উপদেশে অবহিত করা সম্ভব নহে।

যে যে "অভ্যাসে" কাম-কামনার প্রবৃদ্ধি, লোভ, স্বার্থ-পরতা ও বিচার-বিমূঢ়তা প্রশমিত হইতে পারে, সেই সেই "অভ্যাস" যাহাতে ব্যাপকভাবে সমাজমধ্যে প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অন্নের প্রাচুর্য্য সংঘটিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব নহে, ইহা আমাদিগের অভিমত।

ইহারই জন্য যাহাতে নেতৃবর্গ সর্ব্বাগ্রে অন্নের প্রাচুর্য্য সংঘটিত করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আমরা বরাবর তাহারই কথা বলিয়া আসিতেছি। "হিন্দু" পত্রিকার কর্ণধারগণ আমাদিগের ঐ কথা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে পল্লবগ্রাহী বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

"হিন্দু" পত্রিকার আলোচ্য দ্বিতীয় কথা সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, "মানবজনমকে পতিত রাখিয়া মানবধর্ম্ম" ব্যাখ্যার কোনও অর্থ ই হয় না, তাহা সত্য বটে—কিন্তু 'মানব-ধর্ম্ম' না বুঝিয়া মানবজনমকে উত্থিত করিবার প্রযত্নেরও কোন অর্থ হয় না। এই কথাটী "হিন্দু" পত্রিকার অবোধ্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু খু- সম্ভব সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে ইহা অবোধ্য হইবে না।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, "হিন্দু" পত্রিকার কর্ণধারগণ যাহাতে কাম-কামনার প্রবৃদ্ধি, লোভ, স্বার্থ-পরতা ও বিচার-বিমূঢ়তা সমাজ হইতে বিদূরিত হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা বিধান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রায় প্রত্যেক ছত্র হয় কাম-কামনা, নতুবা লোভ, নতুবা স্বার্থ-পরতা, নতুবা বিচার-বিমূঢ়তার দৃষ্টান্তে দুষ্ট। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা শ্রীপ্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে ঐ কর্ণধারগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। লেখায় যে যে দোষ থাকিতে পারে, লেখা হইতে লেখকের যে যে দোষের অনুমান করা যাইতে পারে, সেই সেই দোষের কোন্ দোষের অভাব যে, ঐ দুইটী লেখকের লেখায় বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। ইঁহারা যে ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথচ দাম্ভিকতার এক একটী প্রতিমূর্ত্তি, সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানহীন, লোভী, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর, বিচারবিমূঢ় ও বেদ-বিরোধী কার্য্যোৎসাহী, তাহা ইঁহাদিগের লেখার প্রায় প্রতি ছত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ আমরা এই শ্রেণীর মনুষ্যগুলির রচনা সমাজের হিত-পক্ষে জঞ্জালস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি এবং তদনুসারে উহার আলোচনা হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করি। তথাপি ঐ রচনাগুলি যে উপরোক্ত দোষসমূহের উপযোগী এবং সমাজের হিতপক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাহা আমরা প্রয়োজন হইলে পাঠকবর্গকে দেখাইব। যাঁহারা এতাদৃশ প্রবন্ধসমূহ প্রচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে সমাজের হিতের কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। জীবিকার্জ্জনের জন্য যাঁহারা নিজেরা অথবা যাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ রচনা বিক্রয় করিতে, অথবা কোনরূপে 'বৃত্তি' গ্রহণ করিতে, অথবা অপরের দান স্বীকার করিতে, অথবা বেতন-যুক্ত চাকুরী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাঁহারা 'মনু'র কথানুসারে ব্রাহ্মণের অপাংক্তেয়। ইঁহাদিগের পক্ষে যে ব্রাহ্মণ্যের অথবা হিন্দুত্বের আস্ফালন না করাই সুশোভনীয়, তাহা ইঁহারা বুঝিতে পারিবেন কি?

হেঁয়ালী নং ৩

—কস্যচিদবোধস্য

নগর ভিতরে আর উপকণ্ঠে তা'র
থাকিতে এতই স্থান,
পিঞ্জরাপুলের পানে ক্ষুদ্র সোদপুরে
টানিল কি হেতু প্রাণ ?
জ্ঞাতিত্বের, ভ্রাতৃত্বের না দেখি বন্ধন
অধিবাসিগণ সনে,
শুনিলে শ্রবণে হাম্বারব মাঝে মাঝে
উপজে কি প্রীতি মনে ?
কিম্বা আসে বুঝি মহাপ্রস্থানের কাল
ঘনাইয়া ধীরে ধীরে,
নিলে বাসা সেথা তাই যে বয়সে লোক
করে বাস গঙ্গাতীরে।

এসেছিলে "বুকে বসে' উপাড়িতে দাড়ী",
পূর্ণ সেই অভিলাষ,
শ্রীমুখপঙ্কজে কিম্বা নহে তুনয়নে,
অন্তরে তোমার হাস।
হাসে ছাগী, ছাগশিশু, ভক্ত, অনুচর,
হাসিছে ভেড়ার পাল,
উল্লাসে অন্তর নাচে, না করে প্রকাশ—
চক্ষুলজ্জা কি জঞ্জাল!
গৈবীচালে মনে কর হইল তোমার
বাজী মাৎ এইবার,
কিন্তু ডুব দিয়ে খেলে জল, হয় না কি
উদ্গারে প্রচার তা'র ?

অভিনব অভিনয় বঙ্গরঙ্গালয়ে
করিলে যা' প্রদর্শন,
মোহিত চাতুর্য্যে তা'র, করি অনুমান,
আপামর সাধারণ।
হয় যদি ইহা তব মহলার ফল,
ক'বে উচ্চ কণ্ঠে সবে—

অভিনীতিশাস্ত্রজ্ঞানে তুলনা তোমার
একমাত্র তুমি ভবে।
রহিবে উদ্‌গ্রীব সবে নব অভিনয়
হেরিবারে পুনরায়
ভবনাট্যশালে, হ'বে বিঘোষিত তব
নব খ্যাতি এ ধরায়।

কিন্তু এক-আনার ধার নাহি ধার' শুনি
দেশের যে প্রতিষ্ঠানে,
নাহি জানি কি কারণে হয় অভিলাষ
তা'তে তব হস্তদানে!
পার কি বুঝা'তে ইথে প্রকাশ কেমনে
সারল্যের পরিচয় ?
দেবতার লীলা যাহা মানবের পাপ
তোমারো বিচারে হয় ?
শুনি মাঝে মাঝে সর্ব্ব পার্থিব বাসনা
করিয়াছ পরিহার,
করিয়াছ আত্মসমর্পণ ভগবানে,
এ কি পরিচয় তা'র ?

"ধরি মাছ নাহি ছুঁই পানী" এই বুদ্ধি
উদ্ভুত কি ছাগীক্ষীরে—
অন্তরালে করি' অবস্থান, সুকৌশলে
টান সূত্র ধীরে ধীরে ?
ছাগদুগ্ধে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ এমন
রহিলে ধারণা আগে,
করিতাম পুঞ্জ পুঞ্জ ছাগীর-পোষণ
শুধু দুগ্ধ-অনুরাগে।
যে-ভাবে তোমারে হেরি, না পারি চিনিতে
জটিল হেঁয়ালী তুমি।
"বাড়িছে গোকুলে" যে বা চিনিবে তোমায়,
মানি পরাজয় আমি।

বাঙ্গালার মৎস্য

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় মৎস্য-শ্রেণী

বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের নদী ও জলাশয়াদিতে যে-সকল মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এক একটী শ্রেণীর মধ্যে নানা অধিশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মৎস্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি জাতির মৎস্য মিষ্ট ও লোনা উভয়বিধ জলেই বাস করিয়া থাকে, এবং এইরূপ বিভিন্ন প্রকার জলে বাস করার জন্য তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রাদির কোন বিঘ্ন ঘটে না। কতকগুলি জাতি আবার শুধু মিষ্ট অথবা লোনা, এক প্রকার জলেই বাস করিয়া থাকে এবং জলাদির সামান্য তারতম্যে তাহাদের স্বাস্থ্য বা জীবনযাত্রার সাতিশয় ক্ষতি হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি জাতি প্রাকৃতিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহাদের স্বাভাবিক জীবনধারায় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া নূতনতর পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে তদুপযোগী বর্দ্ধিত হইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন বৈশিষ্ট্যময় জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে—ইহাও যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। ইলিশ, ভেটকী, টেংরা, খয়রা, পোয়া প্রভৃতি জাতীয় মৎস্য মিষ্ট ও লোনা উভয়বিধ জলে বাস করিলেও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহাদের স্বাস্থ্য বা জীবনযাত্রায় কোন ক্ষতি হয় না। পোনা, গজার, বোয়াল, মৌরলা প্রভৃতি মৎস্যগণ লোনা জলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পায়রাচাঁদা, রূপচাঁদা, গাংজাওলী, ভাঙ্গন প্রভৃতি মৎস্যগণ মিষ্ট জলে বাঁচে না। বাম, কুঁচে কালাবেলে, গোগরা, ল্যাঠা, কই প্রভৃতি আবার জল ও স্থল উভয়বিধ অবস্থানে সমানভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং উহারা স্থলচর প্রাণীর ন্যায় স্বতন্ত্র শ্বাস-যন্ত্রযুক্ত হওয়ায় স্থলের ঘন বাতাসেও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অধিকন্তু ইহাতে তাহাদের জীবনী-শক্তির বা স্বাস্থ্যের কোন হানি ঘটে না। উহারা প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য মৎস্যগণের ন্যায় সম্পূর্ণ জলচর হইলেও, যুগ-যুগান্তরের প্রকৃতিগত অবস্থা-ভেদে উভয়বিধ ভূতেই বাস করিয়া জীবনধারার সমতা রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। পরিবর্ত্তনশীল কালের অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থাভেদে তাহাদের দৈহিক ও স্বাভাবিক রূপান্তর ঘটিয়া, প্রকৃতির অবদানে জীবনে নূতনতর বৈশিষ্ট্যের সৃজন হইয়াছে। প্রাণী-জীবনে এইরূপ অনেক দেখা যায়। দেশ-কাল-পাত্রভেদই এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ।

শল্কহীন পোনা (কাবুল নদীজাত)—Leather Carp.

বাঙ্গালা দেশের মৎস্যাদির মধ্যে পোনা, ভেটকী ও টেংরা শ্রেণীর মধ্যে অনেক প্রকার অধিশ্রেণী দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি একেবারে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী এবং অন্যান্যগুলি মৎস্যাশী। নিরামিষাশী মৎস্যগণ দন্তহীন, ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শৈবাল-গুল্মাদি চর্ব্বণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বণ-দন্ত দেখা যায়—কাতলা, জুংঘা, রুই প্রভৃতি দুই চারিটী মাছের এইরূপ দন্ত আছে দেখা যায়। ভেটকী, টেংরা, সিলিন্দ প্রভৃতি মৎস্যগণ

মৎস্যাশী হইলেও, উহাদের কোন দন্ত নাই, উহারা ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে গ্রাস করিয়া থাকে। আবার বেলে, পোয়া,

অর্দ্ধশল্ক পোনা (হিমালয় নদীজাত)—Mirror Carp.

গুলে, দাঁতন, ভেটকী, গাংদাড়া প্রভৃতি মৎস্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ দন্তরাজি দৃষ্ট হয়। উহারাও মৎস্যাশী বলিয়া বিখ্যাত।

নিম্ন বঙ্গ ও আসাম দেশীয় মৎস্যগণের শ্রেণী-বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :

পোনা শ্রেণী (Carps) :

ইহারা মিষ্ট জলের অধিবাসী, লোনা জলে কখনও ইহাদের বাস করিতে দেখা যায় না। ইহারা ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা অধিশ্রেণীতে বিভক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্যও পোনা শ্রেণীর মৎস্য সমধিক বিখ্যাত। এই শ্রেণীর মধ্যে যত অধিক অধিশ্রেণী ও উপজাতি দৃষ্ট হয়, এমন আর কোনও মৎস্যের শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে অনেক প্রকার পোনা-শ্রেণীর মৎস্য দেখা যায় ; বাহুল্য ভয়ে কেবলমাত্র আমাদের স্বদেশীয় মৎস্যের অধিশ্রেণীর বিষয় লিখিত হইল। জলজ গুল্ম, শৈবাল ও পঙ্ক-নিহিত খাদ্যাদি ইহারা আহার করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ মৎস্য বর্ষার শেষে ও শরৎ-কালে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। অধিশ্রেণীগুলি লিখিত হইল।

রুই—রোহিত (Labeo Rohita) :

পোনা জাতীয় মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য গুণে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। ইহারা রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ এবং রক্তপক্ষ ও পুচ্ছবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তবে অনেক সময় জলাশয়াদির গুণে ইহাদের বর্ণ রক্তাভ না হইয়া কৃষ্ণাভযুক্ত হইতেও দেখা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব-প্রদেশের সিন্ধু ও তাহার উপ-নদীজাত রোহিত মৎস্যই যথার্থ রক্তাভযুক্ত ও গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। পাঞ্জাবের রোহিত মৎস্য বাঙ্গালার রোহিত অপেক্ষা বৃহদাকারের না হইলেও আস্বা-দনে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালার রোহিতকে এক মণের উপর হইতেও দেখা যায়, তবে সচরাচর এইরূপ বৃহদাকার রোহিত বাজারে খুব কমই আমদানি হয় ; সচরাচর অর্দ্ধ মণ বা পঁচিশ সের পর্য্যন্ত রোহিত মৎস্যই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। পোনা মাছ পুষ্করিণীর স্থির জলে প্রায় ডিম্ব প্রসব করে না, ইহারা প্রবল বর্ষায় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নদীতে ডিম্ব প্রসব করে। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে পদ্মা ও দামোদর নদের রোহিত-ডিম্বই অধিক আদৃত হইয়া থাকে। জেলেরা নদীর স্বল্প জলে মোটা কাপড়ের জাল দিয়া পোনা-শাবক ধরিয়া থাকে। ছোট পুকুর বা ঐ প্রকার জলাশয়ে পোনা-শাবক শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পুষ্করিণী অপেক্ষা নদীর জলেই রোহিত, কাতলা, মিরগেল প্রভৃতি মৎস্যগণ অধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নদীর রোহিত মৎস্য বর্ণেও অধিক লোহিত হইয়া থাকে। এরূপ পুষ্টিকর ও ক্ষয়-রোগাদি নাশক উপকারী

রুই।

মৎস্য এশিয়া মহাদেশে আর নাই। শিররোগ, জক্ক, নেত্র-রোগ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, নষ্টপুংস্ত্ব প্রভৃতিতে ইহা অতিশয় উপকারী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে।

কাতলা—কাতল—(Catlo Carpeo) ঃ

পোনা মৎস্যের মধ্যে ইহারাও খুব বৃহদাকার মৎস্য। ইহাদের মস্তক, চক্ষু ও দেহের বিস্তৃতি অন্যান্য মৎস্য অপেক্ষা

নাদিম (রুই-কাতলা)।

অধিক বৃহদাকারের। ইহাদের কানকোর পাশে একটী বড় ও নরম মাংসল পর্দ্দা যুক্ত থাকে ও ইহাদের মুখবিবর বৃহৎ ও অধরোষ্ঠ পুরু ও মাংসযুক্ত। ইহাদের দেহ বৃহদাকারের হইলেও ইহারা বলশালী মৎস্য নহে। ইহাদের মাংসগুণ, জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ডিম্বপ্রসবাদির কাল রোহিত মৎস্যের ন্যায়। এদেশে দেড়মণ ওজনের কাতলা মৎস্যও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের কাতলার মস্তক অপেক্ষাকৃত ছোট ও বর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত।

মিরগেল্—মৃদ্‌গিল (Cirrhina Mrigala) ঃ

ইহাদের মস্তক ছোট, দেহ সরু ও লম্বা ও রুই মৎস্যের মত ইহাদের পাখনা ও পুচ্ছাদি ঈষৎ লোহিত বর্ণের হয়। ইহারা গভীর জলের তলায় পাঁকের উপর বাস করে। পাখনা দ্বারা পাঁক ছানিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আহার করে বলিয়া ইহাদের নাম মৃদ্‌গিল হইয়াছে। পোনাজাতির মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ মৎস্য। বড় মিরগেল মাছ জাল টানিয়া ধরা বড় কঠিন ব্যাপার, যেহেতু জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিতে ইহাদের মত কোন মৎস্য সক্ষম হয় না। অনেক সময় জালের উপরে এরূপভাবে লম্ফ প্রদান করে যে, তাহাতে ধীবরগণকে অনেক সময় আহত হইতে দেখা যায়। ছিপে মিরগেল মৎস্য ধরাও খুব কঠিন; টোপ খাইয়া একবার যদি মিরগেল মৎস্য পাঁকের মধ্যে আশ্রয় লইতে পারে তবে তাহাকে টানিয়া তোলা যায় না। এরূপ অবস্থায় বংশদণ্ডের দ্বারা তাহাকে পাঁক হইতে আশ্রয়চ্যুত না করিলে, ভাসিয়া উঠে না। ইহাদের ডিম্ব ছাড়িবার সময় রোহিতের অনুরূপ, এবং ইহার মাংসগুণও রোহিতের ন্যায় উপকারী। বাংলায় অর্দ্ধ মণ হইতে ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মিরগেল মৎস্য বড় হইতে দেখা যায়। পোনা জাতির মধ্যে মিরগেল মৎস্যের বংশবিস্তার অধিক এবং বাজারে বাটা মাছ বলিয়া যে চারাপোনা মাছ বিক্রীত হয়, তাহার মধ্যে মিরগেল-শাবকই অধিক দেখা যায়।

নাদিম্ বা রুই-কাতলা ঃ

ইহা কোন বিশিষ্ট জাতির মৎস্য নহে; ইহা রোহিত ও কাতলার সংমিশ্রণে একপ্রকার বর্ণসঙ্কর মৎস্য বিশেষ। ইহারা দেখিতে খুব সুন্দর; আকৃতি প্রায় কাতলার ন্যায়, বৃহদ্‌মস্তক ও দেহবিশিষ্ট হইলেও ইহাদের মুখাগ্রভাগ রোহিতের অনুরূপ সরু ও মুখবিবর ছোট হইয়া থাকে। মাংসগুণ রোহিতের ন্যায় ও আস্বাদনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জুংঘা।

জুংঘা—(Barbus Progeneius) ঃ

ইহা আসামের পার্ব্বত্য নদীর মৎস্য ও পোনা শ্রেণীর অন্তর্গত। আকৃতিতে ইহারা অনেকটা মিরগেলের ন্যায়,

কেবল একটু স্থূল ও নাসিকার উপরে আধুলির ন্যায় একটী চর্ম্ম যুক্ত থাকে। ঐ চর্ম্মদ্বারা উহারা নাসিকার গহ্বর আবৃত করিতে পারে। ইহারা ওজনে দশ পনের সের পর্য্যন্ত হইয়া

গোরিয়া।

থাকে। ইহাদের আঁশ দৃঢ় ও বৃহৎ এবং পুচ্ছ ঈষৎ রক্তাভ। মাংসগুণ মিরগেলের ন্যায়, তবে অধিক আহারে বায়ুকারক হইয়া থাকে।

গোরিয়া—গৈরিক (Labeo Dyocheilus) :

ইহারাও আসামের পার্ব্বত্য নদীর মৎস্য, আকৃতিতে ইহাদের রোহিত মৎস্যের সহিত অধিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ইহাদের অধরাগ্রভাগেও একটী বড় স্বতন্ত্র পুরু চর্ম্ম যুক্ত থাকে, এবং তদ্দ্বারা উহারা মুখ ও নাসিকা-গহ্বর আবৃত করিতে পারে। ইহাদের পাখনা ও পুচ্ছ রক্তবর্ণের। আকারে ও গুণে জুংঘার অনুরূপ হইয়া থাকে।

কালবোস্—কালবসু (Labeo Calbasu) :

আকৃতিতে ইহাদের সহিত রুই মৎস্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহাদের কৃষ্ণাভ বর্ণ দেখিয়া ইহাদের সহজে চিনিতে পারা যায়। পোনাজাতির প্রায় সকল মৎস্যই উজ্জ্বল শ্বেতাভ বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু একমাত্র কালবোস্ মাছ কৃষ্ণবর্ণযুক্ত হইতে দেখা যায়। পোনাজাতির মধ্যে ইহাদের বংশবিস্তার কম হইয়া থাকে। আস্বাদনে ইহার মাংস একটু পঙ্কগন্ধ-যুক্ত হইলেও খাইতেমন্দ নহে। ইহার মাংসগুণ পুষ্টিকারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতল গুণবিশিষ্ট ও মিষ্ট। রোহিতের ন্যায় ইহারা একই ঋতুতে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

কালবোস।

মহাশোল—মহাশীর (Labeo Mahsira):

ইহার মিরগেলের ন্যায় সরু দেহবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তবে ইহারা মিরগেল অপেক্ষা প্রকাণ্ড আকারের হয় ও ইহার গাত্রশল্ক খুব বড় হইতে দেখা যায়। মিরগেলের ন্যায় ইহাদের ওষ্ঠে ছোট ছোট গুম্ফ হইয়া থাকে। বাংলার নদনদীতে প্রায় ইহাদের দেখা যায় না। ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও অন্যান্য বড় বড় পার্ব্বত্য নদীতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা ডিম্ব প্রসব করিবার সময় প্রস্তরসঙ্কুল স্থানে ডিম্ব প্রসব করে, ও পার্ব্বত্য নদীতেই ইহাদের শাবকগণ ভালরূপে বর্দ্ধিত হয়। নদীতীরস্থ স্বল্প জলে প্রস্তরাদির গর্ত্তে ইহারা বাস করে। ত্রিশ সের হইতে একমণ পর্য্যন্ত ওজনের মহাশীর মৎস্য অনেক সময় দেখা যায়। ইহার মাংস খুব মিষ্ট ও মাংসগুণ রোহিতের ন্যায়। হিমালয়ের সানুপ্রদেশ, আসাম, ব্রহ্ম, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে এই মৎস্য যথেষ্ট দেখা যায়। পার্ব্বত্য নদীর জল কমিয়া গেলেও ইহারা প্রকাণ্ড দেহ লইয়া স্বল্পজলে প্রস্তরাদির গর্ত্তে বাস করিতে অসুবিধা ভোগ করে না। অনেকে ছিপে এই মৎস্য ধরিয়া থাকে।

ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন ও তাহার সৃষ্ট দানব

বাটা—(Labeo Bata)—White Carp :

বাটা শ্রেণীতে অনেকগুলি অধিশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। সাদৃশ্যে ইহারা অন্যান্য পোনা মৎস্যের অনুরূপ হইলেও,

পুঁটীবাটা।

আকারে ইহারা ক্ষুদ্র বা মধ্যমাকার হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত বাটা মৎস্য আমাদের দেশের জলাশয়াদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা :

(১) ভাঙ্গন বাটা—ইহারা উজ্জ্বল রৌপ্য বর্ণের ও অপেক্ষাকৃত বড় শল্কযুক্ত হইয়া থাকে। ওজনে তিন পোয়া পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহার কাঁটা কম ও আস্বাদ সুন্দর। ইহার মাংসগুণ সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ইহা ত্রিদোষনাশক, সহজপাচ্য, স্বাদু ও অল্প-পুষ্টিকর। রোগীদের পথ্য হিসাবে ইহা খুব উপকারী।

(২) কুরচি—ইহাও শ্বেতবর্ণের; কিন্তু ইহার আঁশগুলি খুব ছোট, দেহ নরম ও মাংস খুব তীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত। এই জন্য অনেকে ইহা পছন্দ করে না। ইহাও ভাঙ্গন বাটার ন্যায় আকারে বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদের মাংস খুব নরম বলিয়া মৃতাবস্থায় সহজেই ইহা পচিয়া যায়। ইহা সহজপাচ্য মৎস্য।

(৩) খড়কে বাটা—ইহারা খুব ক্ষুদ্রাকারের ও কম কাঁটা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাটাজাতির মধ্যে ইহাদের বংশ-বিস্তার খুব অধিক। ইহা মিষ্ট, লঘু, অল্প-পুষ্টিকর হওয়ায় রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য।

ভাঙ্গন বাটা।

(৪) রায়চারী বা রায়ফল—ইহারাও খড়কে বাটার ন্যায় ক্ষুদ্রজাতির মৎস্য। তবে ইহার দেহ খড়কে-বাটা অপেক্ষা একটু স্থূল ও চওড়া হইয়া থাকে। ইহার মাংস খড়কে বাটার ন্যায় গুণসম্পন্ন। ইহার বংশবিস্তারও খুব অধিক।

(৫) ডুমশী বা টাট্‌কিনি—আকৃতিতে অনেকটা ভাঙ্গন বাটার অনুরূপ, তবে আকারে কিছু ছোট হইয়া থাকে। ভাঙ্গন বাটার ন্যায় একেবারে উজ্জ্বল রৌপ্যাভ হয় না, ইহার আঁশ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র, ও দেহও লঘু। আধপোয়া হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

(৬) ডানকোনা বাটা—Rasbora Daniconius—ইহাও এক জাতির বাটা মাছ; বাংলায় নদনদী ও জলাশয়াদিতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আকারে অনেকটা রায়চারী বাটার মত। তবে ইহার দেহ হরিদ্রাভ শ্বেত, পৃষ্ঠ ধূসর বর্ণের ও ইহার কানকো হইতে পুচ্ছ পর্যান্ত দাঁড়কে মাছের মত একটা চওড়া কৃষ্ণবর্ণের রেখা অঙ্কিত থাকে, ইহার মাংসগুণ অন্যান্য বাটা মাছের মতই লঘু, স্বাদু ও অল্প-পুষ্টিকর।

(৭) চেলা বাটা—(Barilius Bendelisis)—ইহার পৃষ্ঠ-রেখা সরল, অন্যান্য বাটাজাতীয়গণের ন্যায় ঈষৎ কুব্জ হয় না। ইহারা সাদৃশ্যে অনেকটা চেলা মাছের ন্যায়। ইহার চক্ষু বড় ও আঁশ মধ্যমাকারের। আকারে ইহারা খুব ছোট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই জাতীয় মাছ প্রায় দেখা যায় না; গোদাবরী, মহানদী ও দাক্ষিণাত্যের নদীতে অধিক দৃষ্ট হয়। বাংলায় সুবর্ণরেখা নদীতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

(৮) পুঁটীবাটা—(Barbus Malabaricus)—ইহাদের

দেখিতে অনেকটা সরল পুঁটীর মত, তবে ইহার মস্তক ও চক্ষু একটু বড় হইয়া থাকে। সরল পুঁটির ন্যায় অধিক চওড়া হয় না। ইহার বর্ণ শ্বেত ও উজ্জ্বল। ওজনে

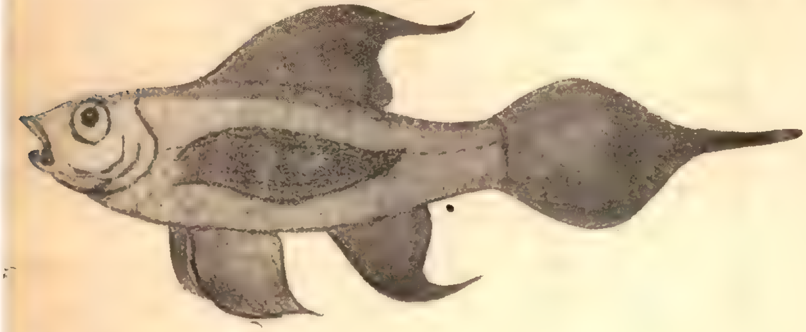

স্বর্ণশফর।

আধপোয়া হইতে একপোয়া পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহারা পার্ব্বত্য নদীতে অধিক বাস করে এবং বাংলার তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের নদীসমূহে অধিক দৃষ্ট হয়। ইহারা বসন্তকালে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

পুঁটী—প্রোষ্ঠী—(Barbus Sophore) :

এই জাতির মধ্যে অনেকগুলি অধিশ্রেণী দেখা যায়। আকৃতি, প্রকৃতি ও আহার-বিহারাদিতে ইহাদের পোনা মৎস্যের সহিত খুব সাদৃশ্য বর্ত্তমান; সেই জন্য ইহারা পোনাশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। নিম্নলিখিত মৎস্যগুলি পুঁটী জাতির অন্তর্গত, যথা :

(১) সরলপুঁটী—মহাশফর (Barbus Sarana)—সমস্ত পুঁটী জাতির মধ্যে ইহারা বৃহদাকার হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে যেরূপ সুন্দর সেইরূপ বলশালী হয়। ইহাদের মস্তক ও চক্ষু বৃহৎ, দেহ স্থূল, বর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত ও দেহ বড় আঁশযুক্ত হইয়া থাকে। বর্ষার প্রথমে ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহার মাংসগুণ—তিক্ত, মধুর, কফ-পিত্ত-নাশক, রেচক, মুখক্ষত ও কণ্ঠ-রোগ-নাশক। ওজনে সাধারণতঃ অর্দ্ধ সের হইতে এক সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কদাচিৎ তিন সের পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

(২) দেঁতোপুঁটী—শফর (Barbus Sophore)—ইহারা চর্ব্বণ-দন্তযুক্ত বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে। আকারে ইহারা সরল পুঁটী অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে। ওজনে একছটাক হইতে আধপোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার মাংসগুণ সরল পুঁটীর মত, এই মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে যাবতীয় গলক্ষত, পীনস প্রভৃতি রোগ সারিয়া যায়, আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ উক্ত আছে।

(৩) লাল পুঁটী (Barbus Puntius)—ইহারা দেঁতো পুঁটী অপেক্ষা আরও ছোট হইয়া থাকে। এই জাতীয় পুঁটী মৎস্য বাঙ্গালার পুকুরে সাধারণতঃ যথেষ্ট দেখা যায়, ইহারা দৈর্ঘ্যে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের দুই পার্শ্বে, মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত, ঠিক সেলাইয়ের দাগের নিকট দুইটী উজ্জ্বল লোহিতাভ রেখা দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদের অনেকে লাল পুঁটী বলিয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছের নিকট একটী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুচিহ্ন শোভিত থাকে। ইহার মাংসগুণ তিক্ত, মধুর ও কিঞ্চিৎ পিত্তকর।

(৪) তিতপুঁটী—তিক্তশফর (Barbus Ticto)—ইহা পুঁটীজাতির মধ্যে খুব ক্ষুদ্র মৎস্য। পশ্চিম বাঙ্গালায় ইহাকে চুনোপুঁটীও বলা হয়। আকারে ইহা একটু বেশী চওড়া ও ইহার পুচ্ছদেশের নিকট কৃষ্ণবিন্দু শোভিত থাকে। অনেক তিতপুঁটীর পাখনা ও পুচ্ছ লোহিতাভ হইয়া থাকে।

বর্ণশফর।

ইহা খাইতে তিক্তাস্বাদযুক্ত ও পিত্তকর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা আস্বাদনে খুব তিক্ত বোধ হইলেও ইহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলে ইহা খাইতে আর তিক্ত বোধ

হয় না। ইহার মস্তকই তিক্তস্বাদের কারণ বলিয়া বোধ হয়।

(৫) নির্ঝরশফর (Barbus Chola)—এই অধি-শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক প্রকার শফর মৎস্য দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রায় সকলেই পার্ব্বত্য নদীর অধিবাসী এবং দেহের নানা প্রকার বর্ণ-বৈচিত্র্যে এই জাতীয় মৎস্য সমগ্র শফর জাতির মধ্যে বাস্তবিক অতুলনীয়। সৌখীন ও ধনী সমাজে এই মৎস্যজাতির আদর খুব অধিক। কৃষ্ণা, নর্ম্মদা, গঙ্গা, সানপো, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির পার্ব্বত্য নদীর উৎপত্তি-স্থানসমূহে ইহাদের যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। লাল, নীলাভ, কৃষ্ণ, স্বর্ণ, ধূসর, রৌপ্যাভ প্রভৃতি নানা বর্ণের নির্ঝরশফর ভারতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে যথার্থ স্বর্ণাভ শফর মৎস্য ভারতের অধিবাসী নহে, উহা চীনদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা হইয়াছে। ইহা কতক পরিমাণে যথার্থ হইলেও, ঐরূপ বর্ণের মৎস্য যে ভারতে আদৌ ছিল না, ইহা অনুমিত হয় না। যাহা হউক নিম্নে কতকগুলি ভারতীয় শফর জাতির বিষয় বর্ণিত হইল। এই নির্ঝর শফর মূলতঃ পার্ব্বত্য হিমনদীর অধিবাসী হইলেও সকল প্রকার আবহাওয়ায় ইহারা স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে।

(ক) লোহিত শফর—ইহারা উজ্জ্বল লোহিত কিংবা লোহিতাভ বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু ও পাখনা-গুলি বৃহৎ; এইরূপ অন্য শফর জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

(খ) স্বর্ণ-শফর (Golden Carp)—অনেকে ইহাদের চীন-জাপানের অধিবাসী বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহারা যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও মনোহর মৎস্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের পাখনা ও পুচ্ছ খুব বৃহৎ ও সুন্দর। ইউরোপে ও আমেরিকায় এই মৎস্যের চাহিদা খুব অধিক। লোকে ইহাদের কৃত্রিম জলাধারে সযত্নে পালন করিয়া থাকে। বিলাতি সমাজে এই মৎস্য অনেক সময় এক জোড়া একগিনি দামে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। আকারেও বেশ বৃহৎ হইতেও দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টাইনে এক প্রকার অতিকায় স্বর্ণ-শফর দেখা যায়।

(গ) বর্ণ-শফর (Coloured Carps)—এই জাতিগুলি লোহিত শফরের ন্যায় একই অধিজাতির জাতি বলিয়া মনে হয়। ইহারা কৃষ্ণ, ধূসর, শ্বেত, কমলা প্রভৃতি নানাপ্রকার বর্ণসুষমায় শোভিত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির পাখনা ও চক্ষু বৃহৎ এবং অন্যান্য কতকগুলির সাধারণ আকারের হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার কতক-গুলি এক প্রকার বিশিষ্ট বর্ণে রঞ্জিত না হইয়া আবার নানা প্রকার বর্ণ-বিন্দু-শোভিত হইয়াও থাকে। এই সকল মৎস্য কেহ আহার করে না, লোকে ইহাদের পালন করিয়া থাকে গৃহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য। কলিকাতায় পরেশনাথের মন্দিরের ছোট পুষ্করিণীতে এই জাতীয় নানাপ্রকার অসংখ্য নির্ঝর-শফর সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই নির্ঝর-শফর মৎস্য, নদীর প্রস্তর ও নুড়িবহুল স্বল্প জলে গ্রীষ্মের শেষে

তিতপুঁটী।

ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। গৃহে কৃত্রিম জলাশয় বা জলাধারে ও উপযুক্ত ব্যবস্থায় ইহার ডিম্ব প্রসব করে দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যাদির ব্যবস্থা ও নুড়ি প্রস্তরাদির দ্বারা অনুকূল অবস্থা সৃজন করিলে, সেই কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে ইহাদের ডিম্ব প্রসবের কোন অন্তরায় ঘটে না, ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে। উপযুক্ত কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে ইহারা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার দিনে, যদি কেহ স্বল্প মূলধনে কৃত্রিম জলাধারে এই বর্ণ-শফর বা যে কোন সুদৃশ্য নির্ঝর-মৎস্য আধুনিক নিয়মে সংরক্ষণ ও পালনাদি করিয়া রীতিমত ব্যবসায় করেন ও সৌখীন সমাজে ইহার চাহিদা বাড়াইতে চেষ্টা করেন, আশা করি, তিনি বিফলমনোরথ না হইয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারিবেন।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

অভিজ্ঞতা

ছইয়ের মধ্যে একদিকে সুরুচি বউটির দিকে একেবারে পিছন ফিরিয়া নৌকার সামনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ফণী ও বউয়ের এক ভাই ও দেওর নদীর পাড় ধরিয়া হাঁটিয়া রওনা দিল।

দাঁড়ি মাঝি দেড়টি, একজন বড়, একজন বালক। আকাশের অবস্থা ভালই, তবে ভয়ানক গুমোট গরম, গাছের পাতাটি নড়ে না। শ্বশুর খদ্দরের জামা ও চাদরটি খুলিয়া ছইয়ের ভিতর বৌয়ের কাছে দিলেন। বউ সে দুটি এক কোণে ফেলিয়া রাখিল, মেয়েদের পিটুনি দিল এবং বলিতে লাগিল—"বাবা আসতে দিতে চাইলে না। বললে 'পরে যাবে',—না—এখুনি—এখুনি আমায় না এলেই নয়! এসে তো এই দুর্গতি, এতখানি পথ পা ছড়াবার জায়গা নেই। মানুষ পারে? আমার ভাইটের নৌকায় জায়গা হল না। হেঁটে যাবে এত পথ? ও কি চাষা? ওর কি এই অভ্যেস আছে? এমন মুস্কিল হবে জানলে কে আসত।"

শ্বশুর সামনেই বসিয়া সবই শুনিতেছেন, সন্দেহ নাই। বউটি নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে, নাকে একটি নাক-ফুল, এই গরমেও গায়ে একটা গোলাপী রংয়ের নকল শাল, সেটা অবশ্য বাক্সের উপর রহিয়াছে। নামিবার সময় গায়ে দিয়া নামিবে।

বউটি ছোট্ট নৌকাটি তোলপাড় করিয়া তুলিল, একবার বাক্স খোলে, বিছানা পাতে, হাঁড়ি কলসী আছড়ায় (যা শ্বশুর-বাড়ীর জন্য এটা ওটা দিয়াছেন) আর গর্জ্জায়।

শ্বশুর ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, বড় সাদাসিদে ভাল মানুষ। সুরুচির চিত্ত-সংযম আর থাকে না, এত কঠোর সাধনা বুঝি বৃথাই হয়, আবার মনে মনে বলেন—

ক্রোধ সম পাপ আর না আছে সংসারে
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ কত পাপ ধরে।

ব্রাহ্মণ বড় ভীরু, বলিলেন, "বাবা কিনারায় চল। নৌকো ত টেকে না!"

নৌকা ভীষণ নৃত্য শুরু করিয়াছে। মাঝি খুব জোরে দাঁড় বাহিতেছে। বলিল, "বাবু নদী টুকুন ছাড়াই আগে, বাতাস উঠলে মুস্কিল হবে।"

—"না রে বাপু তুই কিনারায় নে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বড় ভয় আমার।" নাতনী দুটি শিশু।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকা নদী ছাড়াইয়া খালে পড়িল। এবার নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রাহ্মণ তামাক সাজিলেন।

বাতাস উঠিল, ধূম্রাকার নভোমণ্ডলে সূর্য্য অদৃশ্য, খুব ঠাণ্ডা বাতাস নিমেষে শীত ধরাইয়া দিল। মাঝি বলিল, "ভাগ্য ভাল, নদী ছাড়িয়ে বাতাস উঠল।"

বউটি শ্বশুরের চাদরখানি দিয়া ছইয়ের পিছন দিক ঘিরিয়া গুঁজিয়া দিল এবং পাঞ্জাবীটি পাতিয়া ছোট মেয়েটিকে ঘুম পাড়াইল, পরে নিজের সতরঞ্চিটা একটু খুলিয়া (পাছে সুরুচি বসেন) শুইয়া পড়িল।

সুরুচি বলিলেন, "ও কি করলেন? ওঁর জামা চাদর দুটোই আটকালেন, উনি পরবেন কি?"

উত্তরে একটা অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ করিয়া সে পিছন ফিরিল।

এবার সুরুচির ভয়ানক হাসি পাইল। আশ্চর্য্য সংযম শিক্ষা হইয়া গিয়াছে এইটুকু সময়ের মধ্যে এই বউয়ের হাতে পড়িয়া! শুইয়া শুইয়া বড় মেয়েটিকে বউটি বলিতেছে—"নে তুই বসে থাক। শুবি যে, জায়গা কি আছে? তোদের কপালের ভোগ। টাকা দিয়ে নৌকা ভাড়া করেছি, সরিক জুটল। যেমন অদেষ্ট। আমায় লিখল—'আমি তোমায় নিয়ে যাব' তা এনাদের সইল না। অমনি আনতে গেলেন। যে আমার শ্বশুর-বাড়ীর ছিরি! মানুষে থাকতে পারে? কাজ আর কাজ! এক দণ্ড বসবার যো নেই! আমি পনের দিনের বেশী কিছুতে থাকব না। যদি বাসায় নিয়ে যায় তো যাব, নইলে বাপের বাড়ী,—আমার বাপের অভাব কি? এমন ঘরে দিলে—রাত দিন 'নেই নেই', এত টাকা দেয়, তবু কুলোয় না।"

এমন সময় পশ্চিম দিক্ হইতে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া নৌকাটাকে কাত করিয়া ফেলিল, সুদক্ষ মাঝি

তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইল। ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটা পড়িয়া গেল। ছই ধরিয়া তিনিও সামলাইলেন, বউটি উঠিয়া বসিল।

বাতাস ভীষণ জোরে বহিল, তার পরেই ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে নামিল চটপট্ শব্দে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।

সুরুচি ভিতরের দিকে সরিয়া বসিয়া বলিলেন, "আপনি এদিকে সরে আসুন, ভিজে গেলেন যে!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "জায়গা কি হবে?"

বউয়ের মাথায় ঘোমটা আছে কপাল অবধি ঢাকা, গলা যতই উঁচুতে উঠুক না কেন।

—"জায়গা—জায়গা আছে! মেয়েদের নিয়ে জলে নেমে পড়ব না কি? ও কি আমার বাক্সটা সরাচ্ছ কেন? বাক্সে ভাল ভাল কাপড় আছে, ভিজবে যে।"

—"মানুষের চেয়ে বাক্স ভেজা ভাল, আসুন, সরে আসুন।"

সুরুচির নিজের চিকন বেতের বাক্স ও বিছানাটি নৌকার মুখের কাছে। ব্রাহ্মণ সরিয়া আসিলেন। বউটি সরোষে বলিল, "দিব্যি জুড়ে বসলে ত তোমরা, আলাদা নৌকা ভাড়া করতে পারলে না বুঝি? আমারই ঘাড়ে চাপলে?"

যেমন বাতাস, তেমনই বৃষ্টি, ছইয়ের দুইদিক হইতে তীরের মত বৃষ্টিধারা গায়ে বিঁধিতে লাগিল। এক দিকে শ্বশুর, অন্য দিকে উঁচু টিনের ট্রাঙ্ক, মাঝখানে বউটি মেয়ে ছুটিকে লইয়া ভালই রহিল বটে, কিন্তু সুরুচি ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একেবারেই ভিজিয়া গেলেন।

দশ মিনিটের মধ্যে বাতাস ভীষণ ঝড়ে পরিণত হইল, নৌকা উড়িয়া যাইতে চায়। মাঝি লাফ দিয়া জলে নামিয়া পড়িল, প্রায় বুক জল, দুই হাতে প্রাণপণ জোরে নৌকাটি ঠেলিয়া ধরিয়া সোজা করিয়া রহিল, নহিলে কোন্ কালে উল্টাইয়া যাইত।

ব্রাহ্মণ আর্ত্ত স্বরে ভগবানের নাম করিতেছেন, 'রক্ষা কর রক্ষা কর, কেন এ দুর্ম্মতি হল, কেন এদের আনতে গেলাম। কি উপায় হবে?'

চারিদিকে লোকালয় নাই, শুধু জল আর জল। অসীম অকূল সাগর যেন। বউটির রাগ রোষ মিলাইয়া গিয়াছে, মেয়ে ছুটিকে কোলের কাছে ধরিয়া পাংশু মুখে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে মুখে কথা নাই।

চির দিনের ভীরু সুরুচির মনে কোথা হইতে সাহস আসিল কে জানে! পদ্মাবক্ষ নহে, এইটুকু রক্ষা! হইলে অনেক কিছু হইতে পারিত! বড় বড় টিনের ঘর ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যায়—এইটুকু নৌকা তার কতক্ষণ কি? যাহারা ঝড়ের স্বরূপ জানে, তাহারা ভয় পাইবে নিশ্চয়, সুরুচি ত অভিজ্ঞ নন, কাজেই সাহস আছে।

ব্রাহ্মণ উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, 'বাঁচাও দয়াল, বাঁচাও দয়াল, এই সে দিন কি কাণ্ড হল, এই সময়েই তো, এই ত ঠিক সেই সময়! কেন এলাম, কেন এলাম! কেন এলাম!"

সুরুচি বলিলেন, "আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, এখানে জল ত বেশী নয়।"

—"মা তুমি জান না, জলে কি করবে, ঝড় দেখছ না? হায়, হায়, সব গেল, সব গেল!"

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নৌকা বাঁচাইতে মাঝির সর্ব্বাঙ্গের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

প্রায় এক ঘণ্টা! যেন এক যুগ বহিয়া গেল!

তারপরে বাতাস ও বৃষ্টি কমিল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিয়া জল হইতে নৌকায় উঠিল, ছোট্ট মাঝিটিও নৌকার অপর কোণ ধরিয়া ছিল, সেও উঠিল।

ব্রাহ্মণ শীতে কাঁপিতেছেন, চোখমুখ নীল হইয়া গিয়াছে। হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "মা দাও ত, আমার চাদর আর জামাটা—"

চাদর জামা ভিজিয়া নৌকার কোণে গড়াইতেছে বহু ক্ষণ হইতে।

বউ বলিল, "সে সব ভিজে গেছে।"

'হে ভগবান! কি করি, আর পারিনে যে—"

শীতের কাঁপুনিতে ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কথা বাহির হয় না। দ্বিতীয় বস্ত্রও তাঁর সঙ্গে আর নাই।

সুরুচি বলিলেন, "তোমার হয়েছে কি? ওঁর জামা চাদরের এমন দুর্গতি করলে? উনি এখন পরবেন কি?"

"তা আমি কি জানি? মেয়ে শোয়াব কিসে"

"তোমার নিজের কিছু নেই?—বাক্স থেকে কিছু বার করে দাও না—খুব বউ তুমি!"

"বাক্সে আমার কিছু নেই।"

ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "থাক্ থাক্।"

এমন সময় ফণীরা তিনজন ভিজিয়া অপরূপ মূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত। বউ নিজের ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া বলিল, "ও কপাল! আজই অসুখে পড়বে; কি হাল হয়েছে!—এই কপালে ছিল?"

জল ভাঙিয়া তাহারা নৌকার কাছে আসিল—সুরুচি বলিলেন ফণীকে, "আমার বাক্স বিছানায় জল ঢেউ খেয়েছে—তুমি তোমার এটাচি কেসটা খুলে এঁকে কিছু দাও—"

ফণী একটা মটকার চাদর ও একটা ধুতি বাহির করিল। একদিনের জন্য মেদিনীপুর গিয়াছিল—বেশী কিছুই নেয় নাই।

"আপনি পরুন, এইগুলো পরুন আগে, আগে কাপড় নিংড়ে, গা মুছে ফেলুন—"

ব্রাহ্মণ শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া, চাদরটা গায়ে জড়াইয়া বসিলেন, বলিলেন, "বাঁচালে মা, বাঁচালে—"

ফণীরা কেহ কাপড় ছাড়িল না—কাপড় কই যে ছাড়িবে? বলিল, "আমরা আশা করিনি আপনাদের দেখতে পাব, যে নৌকো! ঝড়ে যে টিকেছে এই ভাগ্যি।"

"মাঝির জন্যে—মাঝিকে একটা টাকা দাও, বড্ড খেটেছে।" বুক-পকেটে মানিব্যাগও ভিজিয়া ভারি, ফণী মাঝিকে একটা টাকা দিল—নৌকার অর্দ্ধেক ভাড়া ব্রাহ্মণকে দিল। সুরুচি বলিলেন, "ছোট ছেলেটিকেও কিছু দাও।"

ফণী একটা আধুলি দিল।

ছেলেটা নৌকার জল ছেঁচিতেছে, বাঁ হাতে আধুলিটা আবার ফণীর কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "এ আমি কি করব? পয়সা আবার কি হয়?"

মাঝি বলিল, "ও ভারি বোকা—পয়সা চেনে না, হাতেও নেয় না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা তুই ধন্য—আমরা পয়সার জন্য মরে যাচ্ছি—তুই হাতে পেয়ে ফেলে দিলি?"

নৌকা ছাড়িয়া দিল—বেলা শেষ, দুর্দ্দান্ত শীত, ভিজা কাপড়—অবস্থা অবর্ণনীয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, এইবার নাবব—তোমাদের জামা কাপড়—"

সুরুচিরা আরও কিছু দূর যাইবেন, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "খুলবেন না চাদর—ঠাণ্ডা লেগে ভীষণ অসুখ করবে—যতটা লেগেছে তাই দেখুন কি হয়। বাড়ী গিয়ে গরম জলে হাত পা ধুয়ে চা খাবেন এক পেয়ালা আগে—আর গরম কাপড় গায়ে দেবেন—ও কাপড় চাদরের জন্যে ভাবনা নেই।"

তাঁহার নিজেরও যে এই সময়ে এক পেয়ালা চা কি দরকার ছিল, সে কথা আর প্রকাশ করিলেন না।

দিদি বলিলেন, "ও-মা, কি দুঃসাহস—ছোট বৌটা মনিষ্যি নয়—না চিঠি-পত্তর না কিছু—নদী পাড়ি দিয়ে এল। এই সেদিন অমন কাণ্ড হয়ে গেল। তা কি বুকের পাটা দেখ! ভরা জোয়ারে নদীর ওপর, তবু তো সাঁতার জানেন না!"

পান্তামুখের নেমন্তন্ন

যার বিয়ে তার মনে নেই
পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই

বাড়ীতে সুরুচি আছেন পরম সুখে, যায়েদের নির্দ্দেশ মত চলেন, অবসর সময়ে বই পড়েন। ভাশুরেরা যেখানে যে জিনিসটি ভাল দেখেন আসিয়াই "ছোট বৌমা এই নিন", কিংবা "ছোট বৌমাকে দাও।"

বই সুরুচির আবাল্য সঙ্গী, হাত ধরিয়া চালায়, এমন বন্ধু আর কে? ছেলে বয়সে বিশ্বকর্ম্মার বিদেশের বাসায় গৃহিণীপদে অধিরূঢ়া হইতে হইয়াছিল, দিদি বাছা বাছা এক গাদা বই সঙ্গে দিয়াছিলেন। চলা-ফেরা কাজ-কর্ম্ম ধরণ ধারণ সুরুচিকে শিখাইয়াছে, 'গৃহলক্ষ্মী', 'গৃহিণীর কর্ত্তব্য,' 'গৃহশ্রী,' 'কুললক্ষ্মী,' রান্না শিখাইয়াছে 'পাক-প্রণালী'। সমস্ত দুপুর বেলা ধরিয়া সুরুচি অভিনব খাদ্য তৈরী করিতেন, বৈকালে বিশ্বকর্ম্মা আস্বাদ করিয়া উৎফুল্ল হইতেন। পরীক্ষক এবং ছাত্রীর উৎসাহের কাছে অতি-লবণ, আলুণি, কাঁচা বা পুড়িয়া তিক্তাস্বাদ কোন কিছুই টিকিতে পারিত না। যে বইয়ের দুর্নাম—'বই মুখে করে বৌ অজ্ঞান,' সেই বই সুরুচিকে সমস্ত অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছে, আবার বাড়ীতে আসিয়া কত সমালোচনা, তীক্ষ্ণ তীব্র মন্তব্য সহিতে সহিতে যখন নিজের রাগ বাড়িয়া উঠে, তখনই সেই বইয়ের উপদেশাবলী স্মরণ করিয়াই সংযত হইয়া যান।

সমালোচনাটা কিসের? না পাড়াপড়শীর। পাড়া-পড়শী সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে ভিন্ন এরূপ একা সুরুচি আর কখনো বাড়ী আসেন নাই। ইহাই প্রথম

কারণ, দ্বিতীয় কারণ, সুরুচি কোথাও বেড়াইতে যান না—কোন নিমন্ত্রণেও না, গায়েও তেমন গহনা নাই, ব্যাপারটা কি ?

কারণ বাহির হইতে কতক্ষণ ? খবরের কাগজের কল্যাণে সর্ব্বত্র সকলের বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে ; নিশ্চয় মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া দুই জনে স্বতন্ত্র হইয়াছে, এইবার খোর-পোষ আদায় করিবে। তা ছোট কর্ত্তা বড় শক্ত মানুষ, খোর-পোষ দিবে না কিছুতেই।

সব কথাই কাণে আসে। সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "মামলা করে কি কেউ শ্বশুর-বাড়ী থাকতে আসে ?"

মেজ-বৌ হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন, "বাড়ীর বৌ বাড়ী এসেছে পাড়ার লোকের এত মাথাব্যথা কেন ?"

এ আসে ও আসে, "কই তোমাদের ছোট-বৌ কই ? মেদিনীপুর যাবে কবে ?"

কেহ বলে, "ছোট কর্ত্তা আসবে না ? চিঠি-পত্তর দের না বুঝি ?"

মামলা যদি বাধিয়াই থাকে, তবে ছোট কর্ত্তা একটা বিবাহ করিবে নিশ্চয়, কিন্তু সেই মেদিনীপুর হইতে খবরটা আনিয়া দেয় কে ? বাড়ীর লোকেরা বড় চাপা, একটা কথা বাহির করিবার যো নাই। আহা ! তাই ছোট-বৌ মনের দুঃখে ঘরেই থাকে, সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইবে কি বলিয়া ?

এক এক সময় সুরুচি ভয়ানক রাগিয়া যান, "দিদি এই সব বিশ্রী কথা শুনলে কি মনে হয় বলুন দেখি, এ কি অন্যায় ? এবার আমি জবাব দেব। যে-না-সেই যা-তা বলবে ?"

মেজ-বৌ বলিলেন, "পাড়া-গাঁয়ের দস্তুরই এই, চুপ করে থাকাই ভাল, বলে বলে নিজেরাই থেমে যাবে। তুই না এত ভাল ভাল বই পড়িস, লোকের কথায় কি রাগ করতে আছে ? ওতে নিজেরই ক্ষতি।"

"আমার যে রাগী স্বভাব দিদি, যত মনে করি রাগ করব না, মনেই থাকে না। আবার বেশী ভালমানুষও হতে নেই কিন্তু, তা হলে লোকে পেয়ে বসে।"

শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় সব সময় চলে না, একটু 'কমনসেন্স' থাকা চাই, সেই জিনিসটার অভাব আছে সুরুচির, সুতরাং মধ্যে মধ্যে অসুবিধা ঘটে।

সকাল বেলা বৈষ্ণব-পাড়ার একটি ছেলে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে, যথারীতি গলবস্ত্রে যুক্তকরে বলিল, "কাল সন্ধ্যায় মাধব বাবুর ওখানে কীর্ত্তন গান হবে, দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন, পান-তামুকের নেমন্তন্ন রইল।"

ঘরের মধ্যে সুরুচি মহা ভাবনায় পড়িয়াছেন, সে আবার কি ? নিমন্ত্রণ করিয়া 'মিষ্টি-মুখে'র বদলে 'পান্তামুখ' করাইবে ? শেষে নিজের বুদ্ধিমত ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৈষ্ণবদের অনেক রকম উৎসব ও নিয়ম বিধি আছে, তিনি তো কিছুই জানেন না, হয় তো কোন উৎসবের এই রূপই নিয়ম যে, রাত্রির ভোগের প্রসাদী অন্ন মহাপ্রসাদের মত পরের দিন ভক্তবৃন্দকে দুটি দুটি করিয়া দিতে হয়।

সন্ধ্যায় সকলেই নিমন্ত্রণে গেল, শুধু সুরুচি গেলেন না বলিয়া বায়েরা দু'জন গেলেন না। সুরুচি বলিলেন, "ঠাকুর-ঝি রাত্তির বেলা 'পান্তা ভাত' খাবেন কি করে ?"

"পান্তা ভাত খেতে যাবেন কেন ? বলিস কি ?"

ঐ যে সকাল বেলা বলে গেল, "পান্তামুখের নেমন্তন্ন।"

"দূর ছ; তোর একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, নেমন্তন্ন করে লোকে পান্তা খেতে দেয় ? 'পান-তামাকে'র নেমন্তন্ন, অনেক লোককে নেমন্তন্ন করেছে কি না, তাই অন্ন আয়োজন করতে পারে নি, শুধু পান-তামাক দেবে।"

"ও—আর আমি সারা দিন ভেবে সারা হচ্ছি তা পান দেবে কি তামাক দেবে সেটা না বললেই হয়।"

মেজ-বৌ বলিলেন, "ওরা তো তোর মত অত পণ্ডিত নয়, যেমন নেমন্তন্ন করবার নিয়ম আছে, তেমনি বলে গেছে ?"

"বাড়ীতে থাকলে অনেক কিছু শিখতে পারা যায়, না দিদি ?"

বিশ্বকর্ম্মার চোখে বোধ হয় সুরুচির সেই বিবাহকালীন বয়স আর বাড়ে নাই, তাঁহার ব্যবহার অন্ততঃ সেইরূপ ; সুরুচি যেন নেহাৎ নাবালিকা, সর্ব্বদা শাসনে ও তত্ত্বাবধানে রাখিতে চান। 'ওটা পারবে না,' 'থাক্ থাক্ আমি নামিয়ে দিচ্ছি,' রেল-ষ্টীমারে উঠিতে নামিতে হাত ধরিয়া চলা অভ্যাস ; এ-সব সুরুচি আদৌ পছন্দ করেন না। তা ছাড়া বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে যাতায়াতে কোন বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব নাই, বিপদ

লটবহর লইয়া চলা—টেলিগ্রামে সব বন্দোবস্ত ঠিক রাখা, সর্ব্বত্র যেন ঘরের আরাম চাই। তা সে কি ট্রেন, কি ষ্টেশন, কি অচেনা বায়গা।

এবারকার অভিজ্ঞতা সুরুচির একেবারে নূতন,—দীর্ঘ-পথ-যাত্রীর নব নব বৈচিত্র্যের আনন্দ লাভ হইয়াছে। সুতরাং মনের ভাব খুব প্রফুল্ল।

বিশ্বকর্ম্মা যদি জানিতে পারেন পথে সুরুচির কি অবস্থা হইয়াছিল। চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিতে দারুণ ইচ্ছা হয়, কল্পনায় বিশ্বকর্ম্মার সেই চেহারা দেখিয়া সুরুচি ভারি আনন্দ পান। দুর্দ্দম অভিমানে হাতে কলম ওঠে না, এই আফশোষ।

জোর তলব

আজ্ঞা দিলা বিশ্বকর্ম্মা হইয়া সত্বর
উপায় নাহিক কিছু আর
দেবীরে আনহ ত্বরা করি
বিলম্বে কি হইবে আবার।

হঠাৎ সরোজ আসিয়া উপস্থিত। মায়েদের মুখ শুকাইয়া গেল—"কেন, কিসের জন্তে দুদিন বাড়ীতে থাকবে না? অমনি পেয়াদা পাঠানো। এখন যাবে না—"

সরোজ বলিল, "যেতেই হবে—এসেছি কি জন্তে?"

সুরুচি বলিলেন, "না আমি যাব না, যখন যা খুসী বলা। অত রাগের ধার আর ধারি নে। দেখ, দেখে যা, আমি কেমন সুখে রয়েছি, হিসাব লেখা নেই, ভোজযজ্ঞির আয়োজন করতে হয় না, অষ্টপ্রহর তটস্থ থাকতে হয় না,—এ ছেড়ে আমি যাব ধমকানি খেতে? ভয়ে ভয়ে থাকতে? যা, আমি যাব না, যা—"

ভাগ্যে বিশ্বকর্ম্মার দিদি মরে নাই।

মেজ-বৌয়েরা সবই জানেন, বলিলেন, "এখন থাক্ না কিছুদিন, রাগটা দুপক্ষেরই পড়ুক—পূজোর সময় ঠাকুরপো এসে নিয়ে যাবে—"

সরোজ বলিল, "কাকা বলে দিয়েছেন নিয়ে যেতেই, না গেলে ভয়ানক রেগে যাবেন—"

সুরুচি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কে তোর কাকার ধার ধারে? আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, বলিস গিয়ে—"

"সম্পর্ক নেই যদি, তবে এ বাড়ীতে থাকবেন কেন?"

"এ বাড়ী তোমার কাকার একার না কি? তাঁর মেদিনীপুরে তিনি যা খুসী করুন—এখানে নয়। আমায় এনেছেন বিয়ে দিয়ে এ বাড়ীতে, আমার ভাসুরেরা, তোমার কাকা নয়! যাও ভাল চাও তো চলে যাও—"

"আপনিও চলুন—কাকাকে চেনেন তো? এত সাহস ভাল নয়—"

"ইস্—ভয় দেখান হচ্ছে! আমি আর তাকে চিনতে চাই নে, তিনিই আমায় একটু চিনুন এবার,—আমি যাব না, যাব না, যাব না! তাঁর যা খুসী তিনি করতে পারেন!"

সরোজ চলিয়া গেল।

দিদি বলিলেন, "ছোট বৌ গেল না?"

মেজ-বৌ বলিলেন, "না, পূজোর সময় যাবে।"

সেদিন জন্মাষ্টমী। রাত্রি অনেক, হঠাৎ উঠানে সরোজের গলা শোনা গেল, ব্যাপার কি? সবে পাঁচ ছয় দিন হইল গিয়াছে, ইহারই মধ্যে আবার কেন?

"না—সংবাদ ভালই।"

উপবাসিনীরা শয়ানা, কিছু অবসন্না। মেজ-বৌ সেজ-বৌ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, "আবার যখন এসেছে নিয়ে যাবেই—"

"আমি গেলে ত?"

সরোজ একটা চিঠি দিল, বিশ্বকর্ম্মা লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়াসু,

বিশেষ প্রয়োজনে তোমার আসাই চাই, অন্যথা করিও না অবিলম্বে চলে এস, টেলিগ্রাম করে রওনা হবে, আর সবই সাক্ষাতে বলব, আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—
তোমার বিশ্বকর্ম্মা

"কি রে? কি এমন বিশেষ প্রয়োজন?"

"আমি জানি নে ঠিক, কাকাবাবু বললেন, খুব জরুরি খুব ভীষণ।"

"খুব ভীষণ? খারাপ?"

"না খারাপ নয়, খুব দরকারী, না গেলেই নয়।"

"চালাকি নয় তো?"

"না—না, সে কি কথা? কাকা কি সেইরকম মানুষ?"

"তোমার কাকাকে আমি খুব চিনি, ঠিক করে বল—"

"না খুড়ি-মা বড় দরকার, চিঠিতে লেখা নেই?"

এবার যাইতেই হইল।

দিদি একবার বলিলেন, "সেই সময় গেলেই হত, মেদিনীপুর কি কাছের পথ?"

দিদি ছাড়া সকলে মনঃক্ষুণ্ণ, তিন যায়ে কাঁদিয়া ঘাটের জল আধ হাত বাড়াইয়া ফেলিলেন।

সরোজ সুরুচির জামা-কাপড় কিছু কিছু লইয়া আসিয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা পাঠাইয়া দিয়াছেন, ব্যাপার দেখিয়া সেগুলি সে বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেল এবং নৌকায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়া-পড়শীরা আসিয়াছে, এত কান্নার মধ্যে তাহারাই বা না কাঁদিয়া থাকে কি করিয়া? একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে? অগত্যা বার বার চোখ মুছিতে লাগিল।

দিদি কিছু দুঃখিত—সন্তুষ্টও। ভাই একা আছে কষ্ট হয়, বৌয়ের যাওয়াই ভাল। আবার ছোট-বৌটা বড় বাধা, হক অকর্ম্মা, সব ব্যাপারে যাইচ্ছেচায়, ইচ্ছা আছে, মায়া মমতা ভালবাসাও আছে। এক দোষ—জল ভালবাসে, আর দোষ হাসি, হাসিটা একটা ব্যারাম বিশেষ, কারণে-অকারণে—যখন তখন হাসিয়া গড়াগড়ি। অত হাসি মেয়েদের ভাল না। তা চলিয়া গেলে বড় খালি খালি ঠেকিবে, হাসিও শোনা যাইবে না, ভাসুরেরাও ডাকাডাকি করিবেন না—"ছোট-বৌমা আর জলে থাক্‌বেন না, এবার উঠে আসুন, জর হবে।" (সুরুচি সাঁতার শেখেন।)

শেষে দিদি বলিলেন, "খুবও হয়েছে, অত কান্না কি? ইষ্টিমার ফেল করবে না কি?"

চমৎকার ব্যাপার! সেই ষ্টেশন এখন স্থল হইতে জলে। বড় বড় ফ্ল্যাটে ষ্টীমার-ষ্টেশন স্থাপন। চারিদিকে অসংখ্য নৌকায়-নৌকায় দোকান বাজার, বেচাকেনা। হোটেলটি ভাসমান। প্যাসেঞ্জার ষ্টীমার আসিয়া ফ্ল্যাটের গায়ে ভিড়ে। সাধারণ যাত্রীরা ফ্ল্যাট ষ্টেশনের নাম দিয়াছে 'আন্ধা বোট'। ওধারে যাত্রীবাহী ষ্টীমার, এ ধারে যাত্রীদের নৌকা, ফ্ল্যাটের ভিতর দিয়া যাতায়াতের পথ। কলকব্জাহীন ফ্ল্যাট সরাইবার দরকার হইলে ষ্টীমারের সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হয়।

সন্ধিস্থাপন

দেবী কহে বন্দিয়া চরণ
কহ প্রভু, কোন প্রয়োজন
কি হেতু করিলে আনয়ন?

মেদিনীপুর—বেলা এগারোটা।

সুরুচি কোন দিকে না চাহিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই বাথরুমে।

স্নানের পর ঘরে আসিলেন, বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত শান্ত ও অসুস্থ ভাবে শয়ান। বাড়ী ঘর চক্‌চকে ঝকঝকে, রান্নাঘরে বিপুল ব্যাপার।

"এ কি—তোমার অসুখ না কি?"

"না, তেমন কিছু নয়—"

"আমাকে আনলে কেন বল? কি জরুরি কাজ?"

"বলছি, তুমি নেয়ে এস—"

"কি আর খাব, ট্রেনে আমার ভীষণ জর—"

"তবে স্নান"—বলিয়াই বিশ্বকর্ম্মা চুপ, পরে বলিলেন, "জর কেন?"

"গোয়ালন্দ ঘাটে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, একটা বোতল-ভাঙা কাচে হাতের আঙুল অর্দ্ধেক কেটে গেছে" ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত দেখাইলেন। "ব্যথায় জর এসে পড়েছে।"

"ঘাটে? অঃ—ল্যাভেটরীতে জল ছিল না?"

"ল্যাভেটরীর জল মুখে দিতে পারা যায়? ঘেন্না করে না?"

"ষ্টেশনের কল থেকে আনিয়ে নিলে না কেন?"

"ও দু-এক ঘটী জলে আমার হাত-মুখ ধোয় হয় না।"

বিশ্বকর্ম্মা চুপ করিলেন। বলিলেন, "কিছু খাবে না? তোমার জন্যে সব হচ্ছে।"

"আমার জন্যে? আমি কি নতুন না কুটুম্ব?"

"তার চেয়ে বেশী।"

"এক পেয়ালা চা হলেই হবে আমার, অত আদরে আমার কাজ নেই, বল, কি দরকার বল?"

"দরকার এই যে বাড়ীটা বড় লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে, এই কথাটা তোমাকে বলবার জন্যে—

"এই কথা বলবার জন্যে তিন দিনের পথ থেকে টেনে আনলে? আমি কি সুখে ছিলাম বাড়ীতে,—কেন আনলে?"

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত আহত হইলেন, সেটা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, 'তোমার কাছে আমার সুখ নেই', কোন্ স্বামী সহ্য করিতে পাবেন ?

"এখানে তোমার কষ্টটা কি ?"

"কষ্ট ? অনেক কষ্ট, ভাল লাগে না তোমার বিশ্রী ব্যবহার, কঠিন ব্যবহার, কটু কথা, যাচ্ছেতাই অপমান। তার চেয়ে আমি বাড়ী থাকি, তুমি এখানে থাক, সেই ভাল।"

"ঐ কথাটি বল না, আর যা খুসী কর, বল, আমি বলব না কথা দিচ্ছি।"

"ও তোমার মনে থাকবে না, কথা তুমি অনেকবারই দিয়েছ, ভুলতে এক মিনিট, তোমায় আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যা খুসী কর আমি কিছু বলিনে তো, তবে আমার কাজকর্ম্মে তুমি তেড়ে উঠবে কেন ? আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছু নেই ? সব তোমার শ্রীচরণে বিসর্জ্জন দিয়েছি না কি ?"

"দেওয়াই উচিত, স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীর ইচ্ছা।"

"না, কখনও না—সে তুমি খুসী হও আর রাগ কর।"

"আচ্ছা তোমার ইচ্ছামত যা খুসী কর, আমি আর কিছু বলব না।"

"মনে থাকবে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কথার উপর কথা বলবে না ?"

"না—আবার !"

"আমার কাজের প্রতিবাদ করবে না ?"

"না—কস্মিন কালেও না।"

"যা তা বলবে না, ফার্ষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা করাবে না ?"

"না—না, আবার ?"

"যদি কর ?"

"তদ্দণ্ডে তুমি চলে যেও, তার চেয়ে বেশী শাস্তি আমার নেই।"

এবার সুরুচি আশ্বস্তা হইলেন।

"এখন ভরসা পেতে পারি ? দেবী কি প্রসন্না হয়েছেন ?"

"জানি না—"

"আমি জানি, যে বোঝে সেই জানে" বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা সোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, "কি কষ্টে ছ'মাস কাটিয়েছি জান ? সব শূন্য, শূন্য। ঘরে থাকতে পারি নে, বাইরে ভাল লাগে না, আমার বাড়ীর লক্ষ্মী রাগ করে চলে গেছেন, কি সুখে আমি জীবন ধারণ করি ?"

"যাও আর থিয়েটার কর না।"

"আলবাৎ করব, আমার যা বলবার আছে, বলব না ? লোকে বলে নারী কোমলপ্রাণা, আমি দেখি, এমন কঠিন প্রাণ পুরুষেরও নয়। উঃ—কি কষ্টে দিন কেটেছে; আমিই জানি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক আর আমি কিছু বলছিনে। তুমি সূর্য্য আমি চন্দ্র, তোমা ছাড়া আমার গতি নেই।"

সাহিত্য ও সমাজ

..."সাহিত্য" যে একটা ভাল জিনিষ এবং উহা যে মানুষের মঙ্গলপ্রদ, একমাত্র তাহা স্বীকার করিয়া লইলেই, বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের কুত্রাপি যে প্রকৃত সাহিত্যের অভ্যুদয় হয় নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা অস্বীকার করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে মনুষ্য-সমাজে যে শান্তি ও সুখ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা প্রমাণিত করিতে হয়।...

সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

যুদ্ধের ব্যাপকতা : শিখ সৈন্যের বিরুদ্ধতা : জৌনপুর অভিযান

সিপাহী-যুদ্ধের মূল কারণ ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর দিনলিপি হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে দেশীয় অধিকাংশ সৈনিক দল যুদ্ধকামিগণের সহিত যোগদান করে নাই, তাহারও আভাস সূর্য্যকুমার দিয়াছেন। জমিদার ও দেশীয় নৃপতিবর্গের প্রায় সকলেই সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কোম্পানীর সাহায্যে যথাসাধ্য করিয়াছেন, তাহার প্রমাণের অভাব সূর্য্যকুমারের দিনলিপিতে নাই। জনসাধারণের অন্ততঃ বিশিষ্টাংশ কোম্পানীর স্বপক্ষে, তাহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কোম্পানীর পক্ষে এই আনুকূল্য সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রসার ব্যাপক ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ কি? পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহার রোজনামচায় তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তৎসময়ে সংগৃহীত বিলাতী মতও আছে। সে অভিমত এই: "যুদ্ধ ব্যপদেশে জয়োন্মত্ত দেশীয় সৈন্যের শ্বেতাঙ্গের বাসস্থান প্রভৃতি লুঠতরাজ-করা ও তাহাতে অগ্নিপ্রদান-করা এবং তাহা করিবার সময় শত্রুজ্ঞানে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, নারী এমন কি শিশুদিগকেও বধ করা হেতু প্রত্যেক ভারতবাসী সম্বন্ধে জাতক্রোধ এবং ভীষণ প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি শ্বেতাঙ্গ-হৃদয়ে জাগরিত হয়। ক্রোধোন্মত্ত শ্বেতাঙ্গ ভারতীয় মাত্রকেই শত্রুর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দেয় এবং তাহাদের সকলের উপর খড়্গহস্ত হয়।' এ ভাব বিপজ্জনক এবং ইহার ফলে বিপদ আরও ঘনীভূত হয়।" এ সম্বন্ধে তৎকালীন গভর্ণর-জেনারল লর্ড ক্যানিং-এর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত পত্রের যে আদান-প্রদান হয়, তাহা যথাসময়ে ডাঃ সর্ব্বাধিকারী তাঁহার দিনলিপির অন্তর্ভুক্ত করেন। টাটকা শোনা কথা অপেক্ষা পত্রাদিতে বর্ণিত কাহিনী আরও সুস্পষ্ট। লর্ড ক্যানিং-এর একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"One of the greatest difficulties which lie ahead—and Lord Canning grieves to say so to your Majesty—will be the violent rancour of a very large proportion of the English community against every native Indian of every class. There is a rabid and indiscriminate vindictiveness abroad, even amongst many who ought to set a better example, which it is impossible to contemplate without something like a feeling of shame for one's fellow country-men."

সেই সময়ে শ্বেতাঙ্গের মধ্যে যে কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় তাহার প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায় এবং যুদ্ধের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

সূর্য্যকুমারের কথা : "বন্ধুকে শত্রুজ্ঞান, বন্ধুকে অপমানও যথার্থ বন্ধু নীরবে সহ্য করে কিন্তু সে অবস্থায় ভিন্নমতাবলম্বীর হাসি-টিটকারি সহ্য-করা খুবই কঠিন, বিশেষতঃ যদি তাহারা দেখাইয়া দেয়, তাহাদের বন্ধুত্বের পুরস্কার স্বরূপ শ্বেতাঙ্গের হস্তে কৃষ্ণাঙ্গের ঘোর লাঞ্ছনার এক নয়, দুই নয় বহু দৃষ্টান্ত।"

দুঃখ করিয়া সূর্য্যকুমার বলিয়াছেন : "গাজীপুরে বর্ত্তমান শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মনোভাব সর্ব্বত্র যদি বিরাজ করে যুদ্ধের অবসান হয় বোধ হয় দু'দিনে এবং দুচক্রীর শাস্তিরও অবধি থাকে না।"

শ্বেতাঙ্গের মনোভাব সম্বন্ধে লর্ড ক্যানিং-এর পত্রের একাংশে প্রকাশ যে শ্বেতাঙ্গের জেদ্ :—

...."Distrust every subject who is not a Christian and who has a dark skin. ....(They) refuse to believe in the fidelity or goodwill of any native towards any European although many instances of the kindness and generosity of both Hindoos and Mohammedans have come upon record during the trouble."

"রোগ ভীষণ ইহার চিকিৎসা-প্রকরণও ভীষণাকার ধারণ করে"—সূর্য্যকুমার বলিয়াছেন। তথাপি দেশীয় বন্ধুর সংখ্যা লুপ্ত হয় নাই। দেশীয়ের বিশ্বস্ততার এ উত্তম দৃষ্টান্ত। যেকলের দৃষ্টি এ বিষয়ে অন্ধ হইলেও ইতিহাস সে কারণে উল্টাইয়া যাইবে না।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সূর্য্যকুমার ও তাঁহার পিতা যদুনাথের দিন-লিপি হইতে কাশীতে দেশীয় পদাতিক সৈন্যের কু-অভিসন্ধি ও তাহা দমনে কোম্পানীর কার্য্য-কলাপ বর্ণিত হইয়াছে। শিখ-সৈন্যের বিশ্বস্ততার কথাও ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। শিখ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য কোম্পানীর সহায় হইয়া বিদ্রোহী পদাতিক দমনে আগুয়ান হয়।

সূর্য্যকুমার বলিতেছেন: "ভীষণ সংবাদ। জনে জনে বলিতেছে, কাশীর যুদ্ধে কোম্পানীর স্বপক্ষ শিখ সৈন্যকেও কোম্পানী তোপে উড়াইয়া দিয়াছে। ইহাতে সকলেই হতভম্ব। গাজীপুরের দেশীয় সৈন্য-নিবাসে ইহাতে উত্তেজনার অবধি নাই।"

ইহার পরে সূর্য্যকুমার জানাইয়াছেন: "দেশীয় সৈন্য উত্তেজিত দেখিয়া সামরিক কর্ত্তৃবৃন্দ তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য আমাদের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া সেনা-নিবাসে উপস্থিত হন এবং সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'শত্রু-পক্ষ সংবাদ ঘোর অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করিয়াছে। প্যারেড-ক্ষেত্রে কোম্পানীর পক্ষে উপস্থিত শিখ সৈন্যের কয়েকজন মাত্র ভ্রমক্রমে নিহত হইয়াছে। এ ভ্রমের জন্য কোম্পানী যারপরনাই দুঃখিত।' কর্ত্তৃপক্ষের কথা শুনিয়া সৈন্যগণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে এবং আমাদের মুখ হইতে এ-বিষয়ে কিছু শুনিবার প্রত্যাশা করে। আমাদের মুখপাত্র স্বরূপ আমাকে কিছু বলিতে হয়। সংবাদের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না। কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছায় তথাপি আমাকে কিছু বলিতে হয়। আমি তাহাদিগকে বলি, 'জনরব জনরব। সত্য সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত আন্দাজে 'কু-সু' স্থির করা সঙ্গত নহে। জনরবের প্রতিবাদ কোম্পানী-বাহাদুর এই মাত্র করিয়াছেন। কোম্পানীর নেমকদার যাহারা তাহারা সহজেই আমার কথা বুঝিতে পারিবে।"

সূর্য্যকুমারের ডায়েরী হইতে আরও পাওয়া যায়: "সৈন্য-নিবাস হইতে আমরা চলিয়া আসিলে অল্পক্ষণ পরে সৈনিক-দলের কয়েকজন মুরুব্বি বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কাশীর ঘটনা সম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন করেন। প্রধান প্রশ্ন—শিখ সৈন্য কোম্পানীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার সংবাদ সত্য কি? উত্তরে 'হাঁ না' কিছুই আমি বলিতে পারিলাম না, কারণ, কথাটা পাঁচ জনের মত আমিও শুনিয়াছিলাম। উত্তরদানে আমাকে অসমর্থ দেখিয়া তাহারা বলে, "কোম্পানী বাহাদুরের সঠিক সংবাদ জানা আছে, দেখিতেছি আপনার ন্যায় ব্যক্তির নিকটেও তাঁহারা আর কোনও কথা প্রকাশ করিতেছেন না, কোনও কালা আদমীকে বিশ্বাস করেন না বলিয়া। আমরা কোম্পানীর নেমকের। কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ করার আমাদের কোনও মতলব নাই। কিন্তু এক পক্ষে বিশ্বাস অপরপক্ষে অবিশ্বাস জন্মিলে সংস্রব রাখা দায়।'"

ইহার উত্তরে ডাঃ সর্ব্বাধিকারী বলেন, "এখানকার সেনা-সমূহকে আমি যতদূর জানি, শোনা কথায় তাহারা কাণ দিবে না আমার বিশ্বাস। আপনাদের বেশী আর কি বলিব, ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হয় এমন কার্য্য আপনারা থাকিতে হইবে না, আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি।"

সূর্য্যকুমারের আন্তরিকতায় সমাগত ব্যক্তিবর্গ প্রাণ খুলিয়া অনেক কথা বলেন। সূর্য্যকুমার বলিতেছেন, "বেশ সম্ভ্রম-সহকারে তাঁহারা বলেন, 'ডাক্তার সাহেব আমরা সব বুঝি। আপনার কাছে আমাদের কোনও গোপন কথা নাই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের সম্বন্ধে খুব সহৃদয়। এমন ব্যবহার কিন্তু অন্যত্র বড় হইতেছে না। গোল ওইখানেই। আপনি জানেন, গাজীপুরের সেনাগণ কি দৃঢ়তার সহিত এখনও পর্য্যন্ত নেমক্ রাখিয়া চলিয়াছে। তাহারা সেই ভাবেই চলিবে, ঘটনাপরম্পরায় ইতরবিশেষ যদি না ঘটে। কোম্পানীর দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিলে আমাদের কে কি করিতে পারে?'"

ইহার কয়েক দিন পরে কাশী হইতে যদুনাথের এক পত্র সূর্য্যকুমার প্রাপ্ত হ'ন—কাশীর ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কথা তাহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত। শিখ-সৈন্য সম্বন্ধে প্রচারিত জনরব একেবারে মিথ্যা নহে, পত্র-পাঠে সূর্য্যকুমারের মনে হয়। সূর্য্যকুমারের আরও মনে হয় যে, ব্যাপার যে ভাবে বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে যুদ্ধ দেশ-ব্যাপী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে খুবই।

পত্র অপেক্ষা যদুনাথের রোজনামচায় ঘটনা বিশদ ভাবে বর্ণিত। রোজনামচায় পাওয়া যায়:

"(পলায়িত বিরুদ্ধ সৈন্যগণ বরুণা পার হইয়া) কতক সৈন্য কিঞ্চিৎ অবসরে ধাবমান হইয়া আপন আপন শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রাদি লইতে গিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্য-

গণ দেখিয়া ঐ শিবির মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দগ্ধ করিল। তাহাতে অনেকে হত হইল। তন্মধ্য হইতে যে কেহ অস্ত্রধারী হইয়া নির্গত হইল তাহারা রণস্থলে আসিয়া কতকগুলি গোরা সেনা এবং সেনাপতিগণকে হত করিয়া, কেহ যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ, কেহ কেহ বা পলায়ন করিল।"

"শিখ-সৈন্যগণ সেনাপতিদিগের সম্মতিতে ছিল। কেবল বিপক্ষ মতান্তরী পদাতিকগণের প্রাণদণ্ডের জন্য এই চক্রব্যূহ রচনা হইয়াছিল। তাহাতে বিধিকৃত বলণ্টরি পদাতিক দুই শত হত হইয়া বক্রী পলায়ন সময় তোপের ধূমে রণস্থল ঘোর কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকার হইয়াছিল। কিন্তু গোরাসকল তোপ নিক্ষেপে নিবৃত্ত ছিল না। ঐ তোপের দ্বারা প্রায় দেড়শত শিখ-পদাতিক হত হইল। শিখ-সৈন্যগণ ইহা দেখিয়া, মনে বিবেচনা করিল যে, 'কেবল বলণ্টরী পদাতিক-গণকে তোপে উড়ান নহে কালা পল্টন মাত্র কিছু রাখিবে না। ইহা না হইলে আমাদের দলের সেনা কি জন্য হত হইতেছে?' ইহা কহিয়া রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া রণী, পদাতিক এবং প্রধান সেনাপতি মেজর গাইস্‌কে গুলি দ্বারা হত করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদিগের গমন দেখিয়া অশ্বারোহী অস্ত্রপাণি যে এক সহস্র ছিল তাহার মধ্যে পাঁচ শত ঐ সমভ্যারে গমন করিল।"

তাহার পরেও অবাধ নৃশংসতা। যদুনাথের বর্ণনায়:

"এখানে গোরাগণ রণে উন্মত্ত হইল। পদাতিকগণকে অন্বেষণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। যে কোন পদাতিক প্রাণভয়ে কাহারও গৃহমধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, তাহাকে গৃহস্বামী বাহির করিয়া না দিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি দিয়া গৃহ দগ্ধ করিয়া দিতেছে। ওখানে পদাতিকগণ মধ্যে যে কেহ পাইতেছে, সাহেবদিগের বাঙ্গালার এবং গোরা-বারিকে অগ্নিসংযোজন করিতেছে। শিকরোল একেবারে অগ্নিময় হইয়া দুর্জ্জয় অনলে প্রজ্জ্বলিত হইল। পুনরায় ত্রেতা যুগ উপস্থিত।"

৬ই জুন পর্য্যন্ত তাণ্ডবের অবধি থাকে না। কত ধন-প্রাণ নষ্ট হইল ইয়ত্তা নাই। প্রহরিখানার কার্য্যে গোরা-সৈন্যই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহাদের অধীনে দেশীয় অশ্বারোহী নিযুক্ত। আহার-নিদ্রারও অবসর তাহাদের নাই। শিখ-সৈন্য সম্বন্ধে শোচনীয় ঘটনার কুফল যতটা সম্ভব হ্রাস করিবার চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ অন্যান্য দেশীয় সৈন্যগণের মনোরঞ্জন করিতে নম্বা উপায় উদ্ভাবন করেন। চেষ্টার ফল আশানুরূপ হয় নাই। যদুনাথের দিনলিপিতে প্রকাশ: 'যে সমস্ত অশ্বারোহিগণ রণস্থলে বৃহদ্বারের রক্ষক ছিল, তাহাদিগকে সাহেবগণ পারিতোষিক দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন যে তোমরা সরকারের খয়ের খাঁ। অতএব তোমাদের এক এক ব্যক্তিকে দশ দশ টাকা, আর এক এক সের মেঠাই দিতেছি। তোমরা কোমর খুলিয়া শ্রম দূর করিয়া আহারাদি কর।"

'বলণ্টরী পদাতিকের' ব্যাপার তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে 'কোমর খোলা'র কথায় তাহারা সন্দেহযুক্ত হন। যদুনাথ জানাইতেছেন: "সওয়ারগণ উত্তর করিল, আমরা কোমর খুলিয়া নিরস্ত্র হইয়া প্যারেডের মাঠে যাইব না এবং চাকুরি করিব না। (তবে) যাহা পারিতোষিক তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। এই কথা কহিয়া টাকা আর মেঠাই লইয়া...সশস্ত্র, সবাহন স্থানান্তরে গমন করিল। এই মত সৈন্যগণ ভঙ্গিয়ান দিয়া গেল।"

ওদিকে "যে সকল পদাতিক প্রহরাতে নিযুক্ত ছিল, তাহারা আপন আপন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।"

"মতান্তরী সৈন্যগণ—দোকানদারদিগের দোকান হইতে দাল আটা ঘৃতাদি আপনাদিগের আহারের মত (কাড়িয়া) লইয়া—জৌনপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।"

যে সকল পদাতিক জৌনপুরাভিমুখে গমন করিয়াছিল, তাহারা আজমগড়ে শ্বেতাঙ্গদিগকে হত্যা ও তাহাদিগের বাঙ্গালা জ্বালাইয়া দিয়া এবং খাজনা-খানা লুঠ করিয়া দুই লক্ষ টাকা হস্তগত করিল। স্থানীয় 'রংরুট' (recruit) সংগ্রহ করিল অনেক। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্যে নীলকর সাহেবদিগের কুঠি, রাজবন্দী সাহেবের কাছারি, স্থানীয় জমিদারবর্গের সাহায্যে লুণ্ঠন করিল। জৌনপুরে সমাগত দেশীয় সৈন্য, তদ্দেশীয় জমিদার ও স্থানীয় অসজ্জনেরা একযোগ হইয়া বন্দীশালার বন্দীদিগকে মুক্তিদান, শ্বেতাঙ্গ-নিবাসে অমানুষিক অত্যাচার, রাজপুরুষদিগকে হত্যা, খাজনা-

খানা লুঠ, কুঠী, দোকান ও ধনাঢ্যদিগের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া প্রায় বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিল এবং তাহার পরে লক্ষ্মৌ অভিমুখে যাত্রা করিল। এ সকল কথা যদুনাথের তীর্থ-ভ্রমণে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ হইতে সিপাহী-যুদ্ধ কি ভীষণ আকার ধারণ করে এ সকল ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট। ঘটনাসকল পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া এবং যে সকল ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা তাহার সহিত মিলাইয়া অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন, "কর্ত্তৃপক্ষ স্বমতে চলিতে পাইলে ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের প্রভাব ঘটনা জটিল করিয়া দেয়।"

এ কথা যখন সূর্য্যকুমার লিখেন ইংলণ্ডের প্রভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের এ বিষয়ে উত্তেজনার বিষয় তাঁহার জানা ছিল না। পরে তিনি সে কথা জানিতে পারেন।

জনসাধারণের রুক্ষ ভাব হেতু বিপন্ন অবস্থায় লর্ড ক্যানিং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে নিবেদন জানান:

"The cry (of vindictiveness and prejudice) is raised loudest by those who have been sitting quietly in their homes from the beginning and have suffered little from the convulsions around them unless it be in pocket. It is to be feared that this feeling of exasperation will be a great impediment in the way of restoring tranquility."

গভর্ণর-জেনারলের এই পত্রপাঠে শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি বিষম বিদ্বেষের এবং তজ্জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যহানির কথা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন সকলেই। প্রত্যক্ষদর্শী যদুনাথ ও সূর্য্যকুমারের অভিমত এই পত্র সমর্থন করে।

বজ্রের সঙ্গীত

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মুছে যায় গতযুগ-গৌরবের স্বর্ণরেখা সংসারের মানচিত্র হতে,
অতীতের স্মৃতিপুঞ্জ মেঘপুঞ্জে হ'ল ঢাকা, উড়ে যায় জীর্ণ পাণ্ডুলিপি,
আদর্শবিহীন মোর সর্ব্বহারা স্বৈণজাতি ভেসে যায় মহাকাল স্রোতে,
অন্তরের দৃষ্টিক্ষেত্র হারায়ে তমসাক্ষেত্রে ভ্রমিতেছে ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী।
প্রণাম-বিহীন তার প্রতিটী মুহূর্ত্ত যায় ঈশ্বরের পদপ্রান্ত দিয়া,
সে মুহূর্ত্ত ছুটিতেছে স্বার্থের সন্ধানে শুধু ভাগবত শক্তি হেলা করি'
পাশবিক স্বৈরাচারে সে মুহূর্ত্ত ভোগলিপ্সু বিলাসের নৃত্যগীত নিয়া,
দেশের ললাটে দিল কলঙ্ক কালিমা তার চিতাভস্মে সিন্দুর আবরি।

এমন সময়ে, বন্ধু! বৈরাগ্যসঙ্গীত তব শুনায়ো না দুর্ব্বলের মত,
বাড়ববহ্নির সম তুমি জাগো শক্তিধর যেথা জ্বলে লক্ষ লক্ষ চিতা,—
সহিতেছে নির্য্যাতন তব দেশকুললক্ষ্মী, যেথা ঝরে অশ্রু অবিরত,
তোমার মৃত্তিকা-মাতা হতশ্রী, বিগতভাগ্য কষ্টাপরি' কাঁদে বুভুক্ষিতা।
স্বপনপসারী যারা কল্পলোক-স্বপ্ন নিয়া রচিয়াছে বিশ্ব-দেবালয়
যে বিশ্বাসের ভিত্তি বলে, আজ তাহা ভগ্নপ্রায় বাস্তবের তীব্র পদাঘাতে।
বলিষ্ঠ প্রাণের আশা নীচতার অন্ধকারে অবিশ্বাসে দুঃখমগ্ন রয়,
আশার পশ্চাতে রহে অশ্রুপ্লুত অভিজ্ঞতা বুকভাঙা নৈরাশ্যের সাথে।

রজনীগন্ধার বনে গুন্ঠিত রজনীকণ্ঠে উঠিতেছে বেদনার গান,
নিমজ্জিত চিত্ততরী ঝটিকার বিঘূর্ণনে অন্তরের অলকানন্দায়।
তমসাতরঙ্গবক্ষে দামিনী ঝলকে ঘন,—ঈশানের বাজিছে বিষাণ;
মহাকালপক্ষ ভেদি' প্রলয়ের মেঘমন্দ্র শঙ্খধ্বনি করিছে সন্ধ্যায়।
পশ্চিমের চক্রবালে সভ্যতার প্রাণ-সূর্য্য অস্ত যায় বিষণ্ণ আননে,
বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা জীবনের সিন্ধুতটে নেমে আসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রাণে।
দুর্য্যোগতিমির রাত্রি সম্মুখে আসিছে, বন্ধু! মৃত্যুভীতি জাগাইয়া মনে,
মাথার উপরে উড়ে শকুনি ও শঙ্খচিল,—পৃথ্বী কাঁপে চাহি ঊর্দ্ধপানে!

ভীরুতার বাহুমন্ত্রে যান্ত্রিক যুগের যাত্রী আপনারে করেছে বন্ধন,
বণিকের মানদণ্ড শ্রমিকের অর্থ শোষি রাজদণ্ড রূপে দিল দেখা।
অনন্ত আনন্দলোকে স্বার্থোদ্ধত অবিচারে দরিদ্রের উঠেছে ক্রন্দন,
মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ধনিকের অত্যাচারে রাত্রিদিন পড়ে অশ্রুরেখা।
তারি মাঝে স্তব্ধ কর মৃদঙ্গেরে,—মাভৈঃ মাভৈঃ মন্ত্রে কর তব তূর্য্যনাদ,
বজ্রের সঙ্গীতে গাই জীবনের গীতিকাব্য দুর্ব্বলেরে করিতে উদ্ধার।
জ্যোৎস্নামদির রাত্রে তব প্রেম-অভিসার ভুলে যাও—যদি থাকে সাধ
শ্মশান সাধনবলে স্বর্গরাজ্য বিরচিতে লুপ্ত করি' বিশ্ব-হাহাকার।
অজস্র ক্ষুদ্রতা মাঝে বিশ্ব-মানবের পথে দুর্ব্বলের উষ্ণরক্ত ঢালা,
সেই পথে চলিয়াছে রণলুব্ধ দস্যুদল লুণ্ঠনের সর্ব্বনাশা সুখে।
নাহি সুখ, নাহি শান্তি; শুধু শোনো আর্ত্তনাদ, প্রাত্যহিক দাবদগ্ধ জ্বালা,
শুধু আছে প্রবঞ্চিত নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস নিপীড়িত ধরণীর বুকে।

বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

অসভ্য মানুষ সভ্য (?) হইয়াছে না কি ক্রমবিবর্ত্তনে। এই সভ্যতা একদিনে গড়িয়া উঠে নাই, হাজার হাজার বৎসর বর্ব্বরতার সহিত সংগ্রাম করিয়াই না কি তাহার বর্ত্তমান বহুমুখী প্রকাশ। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাই(?) বলবান্ —তাহার সহচর আধুনিক বিজ্ঞান এবং বলা যায় তাহা যান্ত্রিক। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিয়া মানুষের কাজে তাহার নিয়োগেই ইহার বিশিষ্ট ভঙ্গী। এই বলবান্ সভ্যতা বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্র উদ্ভাবন করে, পিষ্ট হয় অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্যরা। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্ত্তনে এই অসভ্য এবং অর্দ্ধ-সভ্যরা ক্রমশঃ সভ্য অথবা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এইরূপ বিজ্ঞানের চক্রপিষ্ট হইয়া পৃথিবী আজ সভ্য জাতিতে পরিপূর্ণ। সকল দেশেই বর্ত্তমান সভ্যতার উপকরণ হিসাবে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র (representative government), আইন-আদালত এবং যন্ত্রশিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। যন্ত্রশিল্পের বিস্তার হইয়াছে ইউরোপেই বেশী। জাতিগত যে কোন পার্থক্য থাক না কেন, বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার উপকরণ বা অবলম্বনগুলি সকল দেশেই প্রায় এক।

বর্ত্তমান ইতিহাসে বলা হইয়া থাকে যে, একই সভ্যতার এরূপ বিস্তার পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিস্তার ছিল নীল নদ, আফ্রিকার ভূমধ্যসাগর-উপকূল ও এশিয়া মাইনর। সম-সাময়িক কালে চীন ও ভারত সভ্য থাকিলেও অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধিক তখন অন্ধকার। গ্রাকো-রোমান সভ্যতার বিস্তারকালে ঐ ভূমধ্যসাগর এবং এশিয়া মাইনর ঘিরিয়াই ছিল সেই সভ্যতার বিস্তার। পারস্য, চীন ও ভারত সভ্যতার আলোক-বর্ত্তিকায় প্রত্যন্তপ্রদেশ ক্রমশঃ আলোকিত করিলেও পৃথিবীর অন্ধকার তখনও কমে নাই। মুসলমানদের অভ্যুত্থানের সময় একই সভ্যতার বিশেষ বিস্তার দেখা যায়। ইস্‌লাম প্রধানতঃ ওরিয়েণ্টাল (প্রাচ্য) সভ্যতা। প্রায় সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকার উপকূল এবং ইউরোপের অংশবিশেষে ইহার প্রভাব সুদৃঢ় হয়। তখনও অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিক অনাবিষ্কৃত।

সভ্যতার সীমারেখা বহুধা বিস্তৃত হইল ইউরোপীয় বণিকদের হাতে; 'মশলা ও খৃষ্টানে'র খোঁজে তাহারা সারা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। কয়েক শতাব্দীর চেষ্টার পর সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের সভ্যতার প্রভাব সুদৃঢ় হইল। ইহার বহিরাবরণ ঐ তিনটি—নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিচালনা, আইন-আদালত এবং যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার।

ওরিয়েণ্টাল সভ্যতারও শাসনযন্ত্র ছিল, কিন্তু এই সভ্যতার মাপকাঠিতে তাহা অর্দ্ধ-সভ্যদের, কারণ একরাটত্বই তাহার বৈশিষ্ট্য। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির কোন প্রয়োজন ছিল না সে শাসনযন্ত্র পরিচালনায়। আইন-আদালত অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে বিচারকার্য্য এবং আইন ছিল রাজপুরুষের মুখাপেক্ষী। কুটীর-শিল্পই ছিল প্রধান এবং কৃষিজাত শস্যাদিই ছিল জাতির প্রাণ। এই সভ্যতাকে বলা যায় কৃষি-সভ্যতা। বিদেশী যন্ত্র-সভ্যতার সংঘাতে তাহার পরিবর্ত্তন আজিকার প্রত্যক্ষ সত্য। ভারতবর্ষে কৃষি-সভ্যতার পরিবর্ত্তে বিদেশীয় শিল্পনিষ্ঠ সভ্যতার বিস্তার শতাব্দীর প্রথম হইতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

সমগ্র পৃথিবী যে বর্ত্তমানে একই সভ্যতার আলোকে 'উজ্জ্বল' ইহা মানিয়া লওয়া যায়। যেখানে যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার হয় নাই, সেখানে অবশ্য কৃষি-সভ্যতার চিহ্ন দেখা যাইবে, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ক্রমশঃ কাঁচামাল বা 'র মেটিরিয়াল' সরবরাহ করাই হইয়াছে ইহাদের প্রধান কার্য্য। স্বাবলম্বী কৃষি-সভ্যতায় কিন্তু ইহারা পরমুখাপেক্ষী ছিল না। এখন কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের হ্রাস না হইলেও তাহা বিদেশে রপ্তানী প্রভৃতির ফলে গ্রাম্য জীবনের নিঃসংলগ্নতা আর নাই। বহির্জ্জগতের চলাচলের উপর তাহার জীবন নির্ভর করে।

ক্রুদ্ধ চ্যান্সেলর

ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া সংপ্রতি এক বক্তৃতায় বলেন, মিঃ গান্ধী সত্যাগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে যে-সকল বালক হাতে-খড়ি না পাইয়া বি-এ পরীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছে, তাহাদিগকে পাঠশালায় ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন।

কৃষি-সভ্যতায় গ্রামবাসীদের জীবনধারণের জন্য কাহারও প্রত্যাশায় থাকিতে হইত না। ক্ষেত্রজ শস্য ও গৃহপালিত পশু, চরকা, তাঁত প্রভৃতি তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সকল উপকরণ যোগাইত। অর্থের প্রয়োজন ছিল না এবং জীবন-ধারণের উপকরণের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব ছিল না। বর্ত্তমান সভ্যতার বিস্তারের সহিত এই পল্লীজীবনের পরমায়ু ফুরাইয়াছে।

এই অবস্থার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট; কৃষি-সভ্যতায় গ্রামবাসীই বেশী লোক এবং গ্রামবাসী স্বাবলম্বী বলিয়া দেশের অধিকাংশ লোকই স্বাবলম্বী। বাণিজ্যের প্রসার সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র বিলাসের উপকরণ লইয়াই বাণিজ্য। এ অবস্থায় যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার সম্ভব নহে। শিল্পনিষ্ঠ সভ্যতার আরম্ভই হইবে না যতক্ষণ না কল-কারখানা চলিবে। ইহা তখনই চলিতে পারে যখন বহু লোকের একই জিনিষ প্রয়োজন। যত অধিক লোকের জন্য একই মাল সরবরাহ করিতে হয়, তৈয়ারী করিবার খরচ ততই কম পড়ে এবং লাভ বেশী হয়। একটি মসলীন এক বৎসর ধরিয়া তৈয়ারী হয়, তাহার সূক্ষ্ম সূতা-প্রস্তুত ও বুনন বহু শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। সাধারণ কাপড়ের তুলনায় তাহার দাম অনেক। কিন্তু এক বৎসরে মিলের কাজ, হাজার হাজার সাইজ-মত কাপড় তৈয়ারী করা— দাম কম, জিনিষ সামান্য, কিন্তু বিন্দু বিন্দু জলেই সাগর। এই সামান্য জিনিষ ক্রয়-বিক্রয়ে কোটি কোটি টাকা হস্তান্তর হয়। সামান্য জিনিষ কিনিবার জন্য সামান্য লোকের দরকার। কৃষি-সভ্যতায় প্রায় সকল সামান্য লোকই গ্রামবাসী এবং স্বাবলম্বী। ঘরের মেয়েদের চরকার সূতায়, গাঁয়ের তাঁতে বোনা কাপড় আলো-বাতাসের মত স্বাভাবিক। টাকা দিয়া মিলের কাপড় কিনিবার প্রয়োজন ছিল না, অর্থও ছিল না। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন না থাকিলেও মিলের তাহাদের প্রয়োজন আছে। স্বাবলম্বী কৃষক তাঁতের কাপড় ব্যবহার করিবে এ অবস্থা চলিলে মিল চলে না, যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার বন্ধ হয়। তাই যন্ত্র-সভ্যতার প্রাথমিক প্রয়োজন কৃষি-সভ্যতার মূল গ্রাম-গুলিকে পরাবলম্বী করা। কৃষকের পরিধেয় বস্ত্র আসে মিল হইতে, তাহাদের কিনিবার শক্তি বৃদ্ধি করা হয় শস্যের মূল্য এবং ক্ষেত্র ও শস্যের পরিবর্ত্তে ঋণ দিয়া। অবাধে পল্লীজীবনে বিলাসিতার উপকরণ আসে এবং কৃষি-সভ্যতার মূলে হয় কুঠারাঘাত।

কৃষি-সভ্যতা ধ্বংস না হইলে যন্ত্র-সভ্যতার বিস্তার সম্ভব নহে, এমনি ধারণা ক্রমশঃ ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বদ্ধমূল হওয়ায় তাহারা অধিকৃত প্রদেশ ও দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলিকে কেবল মাত্র কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবেই দেখিতে আরম্ভ করে। ইহারা কেবল কাঁচামাল বিক্রয় করিবে, পরিবর্ত্তে যন্ত্রে তৈয়ার জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া সভ্য হইবে। এ ব্যবসায়ে লাভ দুপক্ষের ব্যবসায়ীদের। কাঁচা-মালের প্রয়োজন বাড়িলে দাম বাড়িবে, যদি না তাহা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। সস্তায় মাল কিনিতে হইলে দূরবর্ত্তী পল্লীর সহিত সংযোগ প্রয়োজন। তাহার জন্য রেলপথ চাই, মালবাহী ষ্টীমার চাই। রেলপথ হয়, বণিকরাই টাকা ঋণ দেয়, কারণ কাঁচামাল সস্তা হইবে এবং বেশী পাওয়া যাইবে। এইরূপে সভ্যতা একপদ অগ্রসর হয়।

যন্ত্রপাতি আসে বিদেশ হইতে—যেখানে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়, কারণ তাহারাই যন্ত্র-সভ্যতার পুরোহিত। ঋণের টাকা এইরূপে বণিকদের স্বদেশে ফিরিয়া আসে, অথচ ঋণও শোধ হয়। সারা দেশ ব্যাপিয়া রেলপথ, ষ্টীমার ক্রমশঃ উৎপন্ন-স্থান হইতে কাঁচামাল বহন করিয়া আনা সহজ করিয়া দেয়। অন্যদিকেও পরিবর্ত্তন সুরু হয় কাঁচামাল লইয়া যন্ত্রে প্রস্তুত হয় সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও কম দামী বিলাসিতার উপকরণ। কাঁচামাল-বোঝাই জাহাজ ফিরিবার পথে এই নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত্র ও বিলাস দ্রব্য বহন করিয়া আনে। সেগুলি যায় গ্রামে গ্রামে, ঐ রেলপথ ও ষ্টীমার তাহা বহন করিয়া লইয়া যায়। বাণিজ্যের জোয়ার-ভাঁটার টান আর বন্ধ হয় না, কেননা যত যায় তত আর ফেরে না। এইরূপে কৃষি-সভ্যতা ভাঙ্গে। স্বাবলম্বী কৃষকরা হয় যন্ত্র-শিল্পের উত্তরসাধক, কাঁচামাল উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। ইহাই হইল বর্ত্তমানে সভ্যতার সমস্যার ইতিহাস।

এই যন্ত্র-সভ্যতার বিস্তারের মূলে অজস্র অর্থের প্রয়োজন। কেবল মাত্র রাজকার্য্য চালাইবার জন্য নহে, যন্ত্র তৈয়ারী, ব্যবহার প্রভৃতি কাজে প্রচুর অর্থ চাই। প্রকৃতি দেবীর পূজা করিতে হয় ষোড়শোপচারে, অন্যথায় তিনি বিমুখ। অতি সহজেই বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায় জল-

প্রপাত হইতে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। মাটীর নীচে কুবেরের ভাণ্ডার আছে, কিন্তু সন্ধান পাইলেই হয় না, দ্বারীকে দক্ষিণা দিতে হয়—লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি চাই। রেলগাড়ি, জাহাজ, কলকারখানা যন্ত্র-শিল্পের সকল উপকরণই আসে টাকা থাকিলে।

সাধারণতঃ এইরূপ প্রচুর অর্থ রাষ্ট্রের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তাহার শূন্য পাত্র পূর্ণ করিতে কোন বাধা নাই—প্রকৃতিকে শোষণ তাহার ধর্ম্ম। যন্ত্র-সভ্যতার প্রাক্কালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সক্রিয় হয় নাই। নূতন সভ্যতার বিস্তার-কল্পে অর্থ ব্যয় করার এ চিন্তা রাষ্ট্রকে স্পর্শ করিত না। সবেমাত্র তাহারা 'চার্চ্চ' হইতে 'ষ্টেট'কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। রাষ্ট্র ভগবানের দান নহে। তাঁহার প্রতিনিধি পোপের কথায় রাজা-প্রজা সকল কাজে উঠিবে বসিবে এ কথা অবিশ্বাস্য। রাষ্ট্রের অধিনায়ক-রাজাই তাহার বন্ধু এবং প্রতিচ্ছবি পোপ নহেন।—মূলতঃ রাষ্ট্রাধিনায়ক তাহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতা দাবী করিতেই ব্যস্ত। চার্চ্চ এবং অভিজাতবর্গের (পুরোহিত এবং সামন্তবর্গ) ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া স্বপ্রধান হওয়াই তাঁহার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। এ অবস্থায় সভ্যতার বিস্তারে যন্ত্রাদিনির্ম্মাণে অর্থব্যয় সম্ভব হয় নাই।

রাষ্ট্র অর্থ দিতে না পারিলেও তাহার সার্ব্বভৌম শক্তির এক প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমশঃ যন্ত্র-সভ্যতার বিস্তার হইল। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করে। যুদ্ধে অস্ত্রের প্রয়োজন। 'স্থাকসন্ আর্চ্চার' ক্রমশঃ 'নাইটস্ ইন্ আরমার'কে বাতিল করে। আবার বন্দুকের আগমনে তাহাদের কাজ ফুরাইয়া যায়। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নির্ণয় হয় অস্ত্রশস্ত্রের উপর, বাহু-বলে নহে। জাহাজেও কামান রাখিতে হয় এবং কামানের গোলা সহ্য করিতে পারে এমন জাহাজের প্রয়োজন হয়। সকল কাজই বৈজ্ঞানিকদের হাতে। তাঁহাদের প্রস্তুত অস্ত্রাদিই যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করে।

আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা যুদ্ধের নব-পুরোহিত। দৈত্যকুল সংহারে বজ্র আসিয়াছিল দধীচির অস্থি হইতে; আর্কিমিডিস্ হইতে নিউটনের তপস্যার ফল রূপ নেয় রাষ্ট্রের শত্রু-নিধনে, নব নব মারক অস্ত্র নির্ম্মাণে। বিজ্ঞানের প্রচার বাড়ে যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিতে। অর্থ দেয় রাষ্ট্র। এই বিজ্ঞানই ক্রমশঃ যন্ত্র-সভ্যতা বিস্তারের পথ সুগম করে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের তপস্যার ফল নূতন মারক মন্ত্র লইয়া পর্ত্তুগাল ও স্পেন "মশলা ও খৃষ্টানের" সন্ধানে বাহির হয়। ভগবানের প্রতিনিধি আশীর্ব্বাদ-বাণী দেন জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া—তাঁহার এই দুই ধর্ম্মপুত্রের জন্য। পৃথিবীতে আবার পবিত্র "ধর্ম্মের" প্রচার সুরু হইল। কালা আদমী নিগ্রোরা সর্ব্বপ্রথম পর্ত্তুগীজদের হাতে দীক্ষা পাইয়া ক্রীতদাস হইয়াও অভিনব অপূর্ব্ব আত্মিক ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইল না।

পূর্ব্বে পর্ত্তুগাল, পশ্চিমে স্পেন বাণিজ্য ও লুণ্ঠনে প্রভূত অর্থলাভ করে। সমগ্র ইউরোপ তাহা দেখিয়া ঈর্ষায় জলিয়া উঠিল, বিশেষ করিয়া স্পেনের পর্ত্তুগাল গ্রাসে। কি করিয়া ঘুষখোর ভগবানের প্রতিনিধি পোপের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এই ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লওয়া যায়, ইহাই তাহাদের এক মাত্র চিন্তা; কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই একমত—ঐশ্বর্য্যের অংশ চাই। রাষ্ট্রগুলি শঙ্কিত হইল, একরাষ্ট্রের আধিপত্যে; প্রজারা উত্তেজিত হইল ঐশ্বর্য্যের অংশ না পাইয়া।

অসীম ঐশ্বর্য্যশালী স্পেনের বিরুদ্ধে ডাচ এবং ইংরাজের সকল সংগ্রাম ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেদিনের যুদ্ধে তাহাদের স্বার্থের কথা ভুলিয়া যাওয়াও অন্যায়। বণিক জাতি দেশমাতার রক্ষার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছিল এ কথা সত্য নহে। সেদিনকার স্বদেশ-রক্ষার মূলে ডাচ ও ইংরাজ স্বদেশ-প্রেমিকদের মনে ভাবী ঐশ্বর্য্য-স্বপ্ন বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিল, এ কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। স্পেনের সহিত তখন যুদ্ধ হয় নাই, স্পেনীয় স্বর্ণবাহী জাহাজ লুণ্ঠনের জন্য ইংরাজী জাহাজ সাজা-ইতে সম্রাজ্ঞীও জানিয়া শুনিয়া অর্থদানে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। দস্যুতার প্রশ্রয় দিতে সেদিন রাষ্ট্র দ্বিধা করে নাই এবং তাহা পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

স্পেন ও পর্ত্তুগাল প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছিল লুণ্ঠনে। পরবর্ত্তী বণিকরা মনযোগ দিল বাণিজ্যে। ক্রমশঃ উপনিবেশ-গুলি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বাড়িয়া উঠিল। রাষ্ট্র রহিল তাহাদের শাসন লইয়া। বণিকেরা রাষ্ট্রকে বিপদে সাহায্য

করিয়া তাহাদের প্রভুত্ব সুদৃঢ় করিয়াছিল। উপনিবেশের লাভ রহিল বণিকদের হাতে। ক্ষুদ্র ইংলণ্ড এক বৃহৎ ইংলণ্ডের কল্পনায় বিভোর হইয়া তাহার প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিল। বড় বড় জাহাজ আসিয়া বাণিজ্যের পথ সুগম হইল। অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় বাড়িল উপনিবেশগুলিতে।

এই অর্থ-উপার্জ্জনের সহায় হইল বিজ্ঞান। যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিতে, যে-সব গবেষণা হইয়াছিল, তাহারই বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা দিল বাণিজ্য-বিস্তারে। কি করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, গমনাগমনের পথ সুগম হয়, এ সকল সমস্যায় বৈজ্ঞানিক মনোযোগ দিলেন। এই ভাবে ক্রমে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন্'-এর যুগ আসিল এবং বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার হইল পত্তন। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপে কৃষি-সভ্যতা মরে নাই। এখন তাহার মৃত্যুযোগ উপস্থিত হইল। তখনও বর্ত্তমান সভ্যতার বহিরঙ্গ প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রতন্ত্র, আইন-আদালত এবং যন্ত্রশিল্প বিশেষ পরিণতি লাভ করে নাই, তাহাদের সার্ব্বভৌম প্রকৃতি তখনও অনিশ্চিত।

বাণিজ্য-বিস্তারের সহিত ক্রমে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন্ আসিবার পর হইতে যন্ত্র-শিল্পের প্রসার বাড়িল। কৃষি-সভ্যতার পরিবর্ত্তন সুরু হইল। সহরের সংখ্যা বাড়িল। স্বাবলম্বী কৃষি-জীবনের পরিবর্ত্তে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব এই সময়েই। জীবনযাত্রা প্রণালীর ও সভ্যতার পরিবর্ত্তন সুরু হইলেও অর্থ উপার্জ্জনের অধিকতর আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জাতির মনোগত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। দেশান্তরে রাজত্ব বিস্তার করার পর তদ্দেশ হইতে অর্থ-শোষণ করাই ছিল ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতে রাজত্ব বিস্তারের পর প্রথম হইতে রাজশক্তি খরদৃষ্টি রাখিয়াছিল, কি করিয়া তাহাদের বাণিজ্য ও রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। রাজ্য-শাসনকালে নানারূপ প্রজার কল্যাণ চিন্তা প্রশ্ন উঠিলেও প্রশ্নোত্তরের অধিক কিছু ঘটিয়াছিল কি?

না ঘটিবারই কথা। রাষ্ট্রিক চৈতন্য তখনও কেবল মাত্র দেখা দিয়াছে। ডিমোক্রাসির লক্ষণ—ফ্র্যান্চাইজের প্রসার হয় নাই; অসদুপায়ে উপার্জ্জিত ইংরাজ-"নবাব"দের টাকায় পার্লামেন্টের বৈদেশিক-নীতি পরিচালিত। এ অবস্থায় অধিকৃত প্রদেশে বণিকদের লোভের উগ্র প্রকাশ ব্যতীত কিছুই দৃষ্ট হয় কি?

রেল, টেলিগ্রাফ, ব্রীজ, ইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্রভৃতির বিস্তারে দেশের "উন্নতি"র সহিত যে অধঃপতন সুরু হইয়াছে আজও তাহার শেষ অধ্যায় আসে নাই। ইহা অর্থনীতির কথা। আগুনের মধ্যে দাহ্য পদার্থ পড়িলে জ্বলিয়া উঠে— তাহা সকলেই দেখি। অগ্নিশিখার উপর যে অদৃশ্য প্রবাহ তাহার দাহিকা শক্তি যে আরও অধিক, এ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বোঝেন। এদেশী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞগণ আজও এই অদৃশ্য অগ্নিশিখার দাহনের পরিপূর্ণ বিবরণ দেন নাই। কিন্তু কৃষি-সভ্যতার আবাসস্থল ভারতে কৃষির বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারেন অধঃপতন বন্ধ হয় নাই। এদেশী কোটীপতি বণিক এবং আকণ্ঠ ঋণমগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য কৃষক ইহাঁরা একই সভ্যতার অনুগামী।

এই অদৃশ্য অধঃপতনেরই নাম দেওয়া হইয়াছে—white man's burden, কালা আদমীর অসভ্যতা। তাহারা প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্য্য ব্যবহার করিতে জানে না; বিজ্ঞানের পরিচর্য্যা তাহারা করে নাই। শাদা বণিকের সম্মুখে মহান্ আদর্শ রহিয়াছে কালা আদমীর ভবিষ্যৎ শাদার মত কালাও মানুষ। তাহারাও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে পারে, এই সুসমাচার দিবার জন্য শাদা বণিকের মধ্যে যে সুমহান্ ব্যগ্রতা দেখা গিয়াছিল— ইতিহাসের তাহা এক পরিচিত অধ্যায়। সোনারূপার খনির সন্ধানে তুচ্ছ প্রাণ-ত্যাগের কাহিনী অতি সুপ্রাচীন। কিন্তু তামা, কয়লা, লোহা, পেট্রোলের সন্ধানে সারা পৃথিবী চষিয়া ফেলার অদম্য উৎসাহ এই শাদা জাতির মধ্যেই প্রথম দেখা যায়। এই সব অস্বাস্থ্যকর, অসভ্য, বন্য দেশে বসবাস করিয়া তাহারই উন্নতিকল্পে যে সব মহাপুরুষরা প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, অকৃতজ্ঞ দেশবাসী আজ তাঁহাদের কথা স্মরণ করে না। না করুক। হোয়াইট ম্যান্স্ বার্ডেন—উহারা না চাহিলেও উহাদের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের উন্নতি, মঙ্গলগামী সভ্যতার দ্রুতগতি, পৃথিবীতে সভ্যতার সমতা—এই সকল মহান্ আদর্শের জন্য শাদা জাতি কখনও পশ্চাদ্পদ নহে।

সভ্যতার সমতা আনিতে হইলে নিগ্রো প্রভৃতি জাতিদের

শাসনে রাখিতে হইবে—যাহাতে তাহারা ক্রমে ম্যানচেষ্টারের কাপড়, সিগারেট, মোটর, সিনেমা প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। নিঃস্বার্থপর শাদাজাতি ব্যতীত এ গুরুভার কে লইবে!

এ পর্য্যন্ত বোঝা যায়। স্বার্থের আবরণটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও আবরণ রহিয়াছে। বহু বক্তৃতায় ইহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে আলোকপ্রাপ্ত জাতিরা, হয় ত এই আবরণটি ক্রমে আরও কার্য্যকরী হইবে, এরূপ আশা পোষণ করিয়া নিজেদের পরনির্ভরতার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দিন না ফুরাইতেই এই অকিঞ্চিৎকর আবরণটিও খসিয়া পড়িল। উপনিবেশ-সমস্যা সম্পর্কে বিবাদে স্বার্থের নগ্নমূর্ত্তি প্রকট হইল।

ইংরাজ, ডাচ ও ফরাসী, পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয়েদের অনুসরণে দেশান্তরে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এজন্য ইহাঁদের মধ্যে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কালা আদমীকে সভ্য করার খেলার পদ্ধতি কি হার-জিত লইয়া বিশেষ হৈ চৈ হয় নাই। যে যাহাকে পারিয়াছে তাহাকে সভ্য করিয়া ছাড়িয়াছে। জার্ম্মানী এই খেলাতে যোগদান করে দেরীতে এবং তাহার গৌরবভাগ্যও সেজন্য সামান্য। আশা ছিল, জার্ম্মানী ইউরোপে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হইয়াই শান্ত থাকিবে।

পরিতৃপ্ত ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত অশান্ত জার্ম্মানীর যুদ্ধ সেদিনের কথা। পরাজিত জার্ম্মানী হতমান ও শক্তিহীন হইয়াও আজ শক্তিশালী হইয়াছে। ইউরোপে আবার যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা যাইতেছে। এই তৃপ্ত এবং অপরিতৃপ্তের কাহিনীর মূলে রহিয়াছে সভ্যতার সমতার কথা, শাদাজাতির মিলনের কথা, কৃষি-সভ্যতার পতন ও যন্ত্র সভ্যতা বিস্তারের কথা,—স্বার্থের রঙীন ইন্দ্রধনু বিচিত্র ঘনচ্ছটায় এই শাদা-কালোর দ্বন্দ্বকে মিথ্যা মহাকাব্যের ঔজ্জ্বল্য দিয়াছে। এই ঔজ্জ্বল্যেই আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়াছে। মূলগত স্বার্থের সংঘাতের কথা ভুলিয়া আমরাও পরিতৃপ্তির সহিত একস্বরে বলিতেছি··· আর নয়, ডিমোক্রেসী রক্ষার জন্য, মানব-সভ্যতার কল্যাণকল্পে অপরিতৃপ্ত জাতিদের পরিতৃপ্ত হইবার রাস্তায় বাধা দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইবার নহে।

যুদ্ধের পর অনেকের মনে হইয়াছিল, এইবার ডিমোক্রেসীর স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হইবে। অর্থাৎ শাদাজাতি পৃথিবীময় তাহাদের যন্ত্র-সভ্যতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। কালাজাতির কাজ কেবলই কাঁচামাল উৎপাদন এবং তৈয়ারী মাল কেনা। কিন্তু, রাবণরাজার স্বর্গের সিঁড়ির মত এই আদর্শ ডিমোক্রেসী দেখা দিবার পূর্ব্বেই সভ্যতার মৃত্যুযোগ উপস্থিত।

বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গগুলির এখন আলোচনা করা যাক। প্রথম রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আসিয়াছে বণিকদের হাতে—নাম হইয়াছে ডিমোক্রেসী। রাজার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রে প্রজাদের অধিকার বাড়ে নাই, বাড়িয়াছে বণিক-প্রজা বা ক্যাপিটালিষ্টদের। যন্ত্র-সভ্যতার ক্ষমতার মূল অর্থ তাহাদের আয়ত্তে। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা শাসনকার্য্যে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু নির্ব্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ণয় হয় টাকায়। জনসাধারণের রাষ্ট্রিক চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হয় নাই। ভোট দিবার ক্ষমতা হইলে এই চৈতন্য আপনি উদ্বুদ্ধ হইবে, এ স্বপ্ন ডিমোক্রেসীর প্রথম যুগের। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ অর্থশালী সঙ্ঘের প্রভাবে পড়েন। সঙ্ঘের আদর্শে অহৈতুকী ভক্তি—পার্টি-পলিটিকস-এর প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। রাষ্ট্রিক চিন্তায় ও কার্য্যে পার্থক্য আসে। ভাষ্যকাররা বলেন, 'জনসাধারণ' অর্থে রাষ্ট্রের সকলই। কার্য্যে দেখা যায় জনসাধারণ অর্থে বণিক সম্প্রদায়। তাহাদেরই অর্থে ক্রীত পার্টি-পলিটিসিয়ান এবং ভোটাররা প্রভৃত স্বার্থহানির আশঙ্কায় কথাটির রাষ্ট্রিক তাৎপর্য্য বুঝিয়াও বোঝেন না। ডিমোক্রেসীর চ্যাম্পিয়ানরা এই পার্থক্য দেখিয়া হটিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা নিরুদ্বেগে বলেন, মানুষ এখনও অসম্পূর্ণ, সেই জন্য এই পার্থক্য দেখা দিয়াছে এবং ডিমোক্রেসীর আদর্শ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। টাকার প্রভাব যেদিন মানুষকে এভাবে বিচলিত করিবে না, তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ যখন পূর্ণাঙ্গ হইবে, তখনই ভোটের মর্য্যাদা বুঝিয়া ভোটারেরা ভোট দিবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তার। শিক্ষা পাইলেই এই অনাচার দূর হইবে। অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি, বলিবার কিছু নাই। সেই আশী মণ তেলের ব্যবস্থা!

ভোটারদের শিক্ষার ফলেও যদি অবস্থান্তর না দেখা যায়, তখন প্রশ্ন উঠে প্রকৃত শিক্ষা লইয়া—একটির পর

একটি যুক্তি উত্থাপিত হয়, আদর্শ অটুট থাকে। কথা হইতেছে, মনকে প্রবোধ দিবার নানা উপায় আছে। ভোটারদের ভোট দিবার রীতি জানিয়া, ভোটারদের শিক্ষার রীতির বিফলতা বুঝিয়াও যাঁহারা ডিমোক্রেসীতে বিশ্বাস রাখেন তাঁহারা আত্মপ্রবঞ্চক। যে রাষ্ট্রিক চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ডিমোক্রেসী প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, তাহা যে কল্পনা মাত্র এ কথা স্বীকার করার সৎসাহস তাঁহাদের নাই। নানা ভগবানের পুত্র ও সাক্ষাৎ ভগবানের সাহচর্য্য লাভ করিয়াও দেবতা হইবার কোন লক্ষণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। খৃষ্টের ধর্ম্ম অধিকাংশ খৃষ্টানদের সঙ্কল্পই করিয়াছে—স্বর্গরাজ্যের দ্বার অবরুদ্ধ জানিয়াও তাঁহাদের অর্থলোলুপতার হ্রাস হয় নাই। গালে চড় খাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা চড় মারেন। ফলতঃ মানুষ সর্ব্বদোষমুক্ত হইবে, ইহা অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। ডিমোক্রেসীর প্রতি এই অবাস্তব-কল্পনা-প্রসূত ভক্তি লইয়া বর্ত্তমান অবস্থার দোষগুলির প্রতিকারের চেষ্টা না করা স্বার্থবানের লক্ষণ।

ডিমোক্রেসীর এই ভোট ক্রয়-বিক্রয়ের মূলে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি ভোটারদের অনাস্থাই প্রবল। শিক্ষা বা আচরণে এই অনাস্থার প্রতিকার চেষ্টা হয় নাই। বণিক-পরিচালিত রাষ্ট্র এরূপ আত্মঘাতী শিক্ষা দিতে অক্ষম। পুঁজিবাদ বাঁচিয়া আছে রাষ্ট্রকে নিজের সুবিধামত ব্যবহার করিবার ক্ষমতায়। এই ক্ষমতা হারাইলে "পুঁজি"ও হারাইতে হইবে। যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা পুঁজিবাদ বিরোধী। সোশুলিজম্ প্রভৃতি নানাপ্রকার 'ইজ্‌ম্'-এর জন্ম হইয়াছে ভোটারকে এই শিক্ষা দিবার জন্য। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ধ্বংসই ইহাদের গৌণ উদ্দেশ্য। কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্য হইয়াছে এখন মুখ্য। ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌এর সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে রাষ্ট্র-গঠনের যুদ্ধ। রাজা যেমন চার্চ্চ ও নোবলদের বিরুদ্ধে নিজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বণিক সম্প্রদায় পরে যেমন রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করে, তেমনি বণিকসম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে। ফল এখনও অনিশ্চিত।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রের প্রকৃতি শোষণ এবং দলন। এই রাষ্ট্র চলিতে পারে প্রজাবৃন্দকে শোষণ করিয়া, অবশ্য এই শোষণ-কার্য্যে তাহাদের সম্মতি প্রয়োজন। "ওরিয়েন্টাল ট্যাক্সগ্যাদারিং এম্পায়ারস্"-এ এই শোষণ চলিত প্রজাদের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া, কারণ প্রজাদের শাসনকার্য্যে কোনরূপ অধিকার ছিল না। রাজার ইচ্ছামত সকল শোষণ-কর ধার্য্য হইত, প্রজারা ক্ষমতাহীন। রাজা প্রজার পৃথক্ অস্তিত্ব রাষ্ট্রের সহিত রাজার নিত্য অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রজাপুঞ্জের মতামতের সহিত রাষ্ট্র-পরিচালনার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই রাজার সহিত রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিন্ন এবং রাষ্ট্র ও জনসাধারণের অঙ্গাঙ্গী যোগ পূরবর্ত্তী যুগের ঘটনা। রাষ্ট্রের পৃথক্ অস্তিত্ব তখনও সুনির্দ্দিষ্ট নহে। জনসাধারণের সহিত রাষ্ট্রের নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল না—কারণ নহস্তরবিশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে রাজ্যশাসন উপযোগী ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আদর্শ রাষ্ট্রে জনসাধারণের অক্ষুণ্ণ প্রভাবের কথা স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ ফ্র্যান্‌চাইজ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী জনসাধারণকে পৃথক্ করা হইল। কিন্তু জনাপ্রবার চেষ্টা করিয়াও আদর্শ ও কার্য্যে কোন সমতা আসে নাই। বরং ক্রমশঃ রাষ্ট্রের পৃথক্ সত্তা কল্পিত হইল। জনসাধারণের সহিত পৃথক্, তাহাদের সকলের ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র অথচ স্বতন্ত্র নয়, কারণ পরিপূর্ণ মঙ্গলকামী, এক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভাষ্যকারেরা মন দিলেন। জনসাধারণ এই রাষ্ট্রের অঙ্গমাত্র, রাষ্ট্র মস্তক। রাষ্ট্রেরই ইঙ্গিতে জনসাধারণকে চলিতে হইবে। স্বাতন্ত্র্য রহিল মাত্র রাষ্ট্রের।

পুঁজিবাদীদের হাতে এই স্বাতন্ত্র্যের প্রধান রূপ। তাহারা শাসন-পরিষদে যোগদান না করিয়া অলক্ষ্যে রাষ্ট্রের নামে শাসন করে। যেন তাহারাও অন্য সকলের মত রাষ্ট্রের শাসন মানিতে বাধ্য। তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলীরা তাহাদেরই বিরুদ্ধাচারী হইবে। রাষ্ট্রের এই স্বাতন্ত্র্য আশ্রয়ে অনাচার সুরু হয়। জাপানেরই কেবল মাঞ্চুকুয়ো নাই, প্রতি রাষ্ট্রই মাঞ্চুকুয়োর অবস্থায় আসিয়াছে। অদৃশ্য শক্তি প্রতিনিধিবৃন্দকে নাচাইতেছে। অপমৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান। ভোট-যুদ্ধে জয়ী প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার কোন ভবিষ্যৎ নাই, কারণ ভোটারদের শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। পার্টি পলিটিক্স্ এবং গুণ্ডামীর প্রভেদ দিন দিন কি ভাবে কমিতেছে, তাহার অনেক নমুনা দেখিতেছি এবং আরও দেখিব। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি যে ভোটারদের মুখপাত্র হয় না, এ কথা নিঃসন্দেহ। জগতঃ, বর্ত্তমান সভ্যতার

প্রধান অঙ্গ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসনে পূর্ব্বের মত আস্থা থাকা অসম্ভব।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রের দ্বিতীয় অঙ্গ আইন-আদালত। শাদা জাতি উপনিবেশ স্থাপনের পর হইতেই তাহার আইনের শ্রেষ্ঠত্বর কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের পর হইতে ইংরাজি আইনের নানা গুণাবলীর কথা শুনিয়া শুনিয়া আমরা তাহা সত্য বলিয়া মনে করি। ভুলিয়া যাই ইংরাজি আইন কি ভাবে ইংরাজি অনভিজ্ঞ পরাধীন স্বতন্ত্র জাতির উপর প্রয়োগ করা হইয়াছিল—প্রকৃত আইনজ্ঞ—জুরিষ্টরদের অভাব না থাকিলে আইনের জগতে এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা হইত না। ভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াও জোর করিয়া নিজেদের আইন চালাইবার চেষ্টা বিসদৃশ এবং অবিবেচকের কর্ম্ম। পরিণত কালেও ভারতীয় আইন প্রণয়নে কোন প্রকার গবেষণার চিহ্ন দেখা যায় নাই। আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহাদের সম্যক জ্ঞানের অভাব, বড় স্পষ্ট। ক্যাপিট্যালিষ্ট শাসনে যে আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে 'বেঞ্চ' এবং 'বার' বদ্ধপরিকর, বণিকদের সুবিধাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। এই আইনের দোহাই দিয়া কি না হইয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার একাই এই আইনের যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন নাই—সমগ্র জাতি এই আইনের নাগপাশে পিষ্ট। পুরাতন সভ্যতার ধ্বংসের সূচনা হইয়াছে। আইনের মার-প্যাঁচে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত কৃষককে দিনমজুর হইতে হইয়াছে—কৃষি-সভ্যতার প্রাণস্বরূপ স্বাবলম্বী কৃষকদল এইরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া জমিদারের ক্রীতদাস 'টেনাণ্ট'-এর সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ গঠন ও কৃষি সভ্যতার চিহ্ন নষ্ট করিতে এবং মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে এই আইনের মত উপকারী আর কোন অস্ত্র নাই। বিদেশী তথাকথিত 'রুল অব ল'—আইনের চোখে সকলে সমান—ইত্যাদি নীতির প্রচারে মনের প্রসার বাড়িয়া যায় এ কথা সত্য। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, আইন এক—আদালতে সেই আইনের কার্য্য সম্পূর্ণ অন্ধ। আদালতে আইনের মহান্ সূত্রগুলির কি দুর্গতি হয় দেখিয়াও যাঁহারা এই আইনের পৃথক্ সত্তা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেন, তাঁহারা বাস্তবপন্থী নহেন। আমেরিকান 'প্রহিবিশন্ ল' এই পার্থক্যের একটি দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্রে পৃথক সত্তা কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রকে নিজ আয়ত্তে রাখিতে পারিলে যেমন স্বার্থ-সিদ্ধির পথে বিঘ্ন কম, তেমনি আইনের দুইটি দিক—'থিয়োরী' এবং 'প্র্যাক্‌টিস্' বিভিন্ন রাখিতে পারিলে ঐ বণিক সম্প্রদায়েরই সুবিধা। থিয়োরী অনুসারে ক্রোড়পতি এবং দরিদ্র আইনের চক্ষে এক। এই একত্বের প্রতিষ্ঠা হয় আদালতে। টাকা না থাকিলে আদালতে বিচার-প্রার্থী হওয়া অসম্ভব। তাহার পর বিচার-প্রার্থী হইলেই হয় না, স্বপক্ষে উকিল চাই। অভিজ্ঞ উকিল না থাকিলে সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় না, অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে মোটা মজুরী চাই। এ অবস্থায় দরিদ্রের এই একত্বের মূল্য কি!

আইনের মূলে রহিয়াছে আইন-অমান্যকারীকে দণ্ড-বিধানে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা। রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আইনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এই দণ্ডবিধানের ক্ষমতার প্রভাবেই। যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁহাদের হস্তেই এই ক্ষমতা ন্যস্ত। তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আইনরূপে প্রচার করিবার পথে কোন বাধা নাই।

আইন এই সভ্যতায় রাষ্ট্রের অনুচর। তাহার পৃথক্ সত্তা কল্পনায় ঐ রাষ্ট্র-পরিচালকদের প্রভূত সুবিধা। রাষ্ট্র যে পরিমাণে অদৃশ্য বণিকশক্তির ক্রীড়াপুত্তলী, আইনও সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রণোদিত।

এই ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রণোদিত আইনকে নানাভাবে গৌরবান্বিত করা হইয়াছে—সভ্যতার সহিত ইহার অঙ্গাঙ্গী সংযোগ দেখাইয়া অসভ্য জাতির মধ্যে ইহার প্রসারে অনেকেই পঞ্চমুখ। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে স্বার্থের মূর্ত্তির প্রতি এতদিন বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। রাষ্ট্র ও তাহার অনুচর আইন স্বার্থপরের হাতে পড়িয়া যে মারক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহার নিরাকরণই আজিকার সমস্যা।

বর্ত্তমান সভ্যতার তৃতীয় অঙ্গ যন্ত্রশিল্প। যন্ত্রশিল্পের বহুল প্রচার এই যুগের বৈশিষ্ট্য। ইহার সমূহ প্রচার কলোনীজে-শনের ফলে। যন্ত্র-শিল্পের প্রচারে কৃষি-সভ্যতা ভাঙ্গিয়াছে এবং অধিকৃত দেশগুলির "র-মেটিরিয়াল" কাঁচামাল রপ্তানী এবং তৈয়ারী মাল আমদানীই এক মাত্র কাজ। বেশী দামে তৈয়ারী মাল কিনিয়া বাঁচিয়া থাকাই তাহার ভাগ্য। প্রথম হইতে যন্ত্রশিল্প এই শোষণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার ফলে

বৈজ্ঞানিকরা হইয়াছেন যন্ত্রশিল্প-পরিচালক বণিকদের হস্তে যন্ত্রমাত্র। বণিকদের প্রয়োজন ও খেয়াল অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়াছে। রেল, টেলিগ্রাফ, রেতার, যান্ত্রিক গান, এরোপ্লেন প্রভৃতি যন্ত্রসভ্যতার অঙ্গগুলির সহিত বণিক-সম্প্রদায়ের সুবিধার কথা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবহারিক বিজ্ঞান বণিক-সম্প্রদায়ের শোষণের অস্ত্রমাত্র। রাষ্ট্র যখনই পররাষ্ট্র গ্রাসে তৎপর, তখনই অস্ত্র-নির্ম্মাণে বৈজ্ঞানিকদের ডাক পড়ে। বণিক-সম্প্রদায়ের হস্তে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসিয়া বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে দেশলুণ্ঠন কেবল বাড়িয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার খনিজ পদার্থ লুণ্ঠন এবং বিদ্রোহীদের শাসনে রাখিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে আশ্চর্য্যকর। পূর্ব্বে কেবল রাজধানী ও বড় বড় সহর লুণ্ঠন করিবারই রীতি ছিল, এখন দেশের রীতি হইয়াছে খনিজ পদার্থ, কৃষিজাত দ্রব্য, জনসাধারণের পণ্যদ্রব্য কিনিবার ক্ষমতা সকল ধীরে ধীরে শোষণ করা। এবং বিজ্ঞানের "উন্নতি"তেই ইহা সম্ভব।

বৈজ্ঞানিকদের আদর বাড়িয়াছে—তাহারাই এখন রাষ্ট্রের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। বৈজ্ঞানিকরা রাষ্ট্রের কল্যাণকামী, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িলে তাঁহাদের আর্থিক উন্নতি এবং সম্মান বৃদ্ধি। ইঁহারা এই অর্থ এবং সম্মান আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। আর-এক রাষ্ট্র অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ বন্ধ রাখিয়া নিজ ক্ষমতা খর্ব্ব করিলেও অন্য রাষ্ট্র যে তাহার অনুসরণ করিবে এ কথা নিরর্থক। এবং এই অমনোযোগের সুবিধা লইয়া অন্য রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় এবং পারিলে অরক্ষিত অবস্থায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া গ্রাস করার চেষ্টাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বৃদ্ধিকারী বৈজ্ঞানিকরা রাষ্ট্র-বন্ধু। ছলে বলে কৌশলে রাষ্ট্র যাহা আয়ত্তে আনিয়াছে, তাহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে এবং সুবিধা হইলেই এই "ক্যাপিটাল" বাড়াইতে রাষ্ট্র বন্ধু বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিকের দোষ কোথায়? বিজ্ঞানের অপব্যবহারের জন্য দায়ী ত' বৈজ্ঞানিক নহেন, দায়ী রাষ্ট্র। সামান্য বুদ্ধিতে বুঝা যায়, আপনার ক্ষমতারক্ষার্থ রাষ্ট্র—অর্থাৎ তাহার অস্ত্র পরিচালক বণিকসম্প্রদায়—এইপ্রকার অপব্যবহার করিবে। বৈজ্ঞানিকরা বণিক-পরিচালিত রাষ্ট্রের দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাহারই ফলে প্রকৃতির ক্ষমতা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করি না ও মানুষ আজিও সেই পুরাতন সমস্যার—দুঃখ হইতে মুক্তির—কোন সমাধান করিতে পারে নাই।

দুঃখ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অনিত্য সংসারে জীবনের বিশেষ মূল্য আছে এ কথা বলা কঠিন। যুদ্ধ ও রোগাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ মানুষের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া মৃত্যু আনে। কিন্তু জীবদ্দশায় অর্থাদির জন্য প্রতিকার-সাপেক্ষ দুঃখ-ভোগের কোন কারণ নাই। রাষ্ট্র-পরিচালনার বিভ্রাট ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

আমাদের সমস্যা এই রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার নায়ক-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে গ্রহণ করা। নায়ক-সম্প্রদায় রাষ্ট্রের দণ্ড দিবার ক্ষমতা আয়ত্তে আনিয়া যে-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বিফলতা অতএব স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইবে না। রাষ্ট্রের যে শক্তি পরিচালনা করিবে, তাহাও বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের মত স্বার্থান্বেষী হইবে না কে বলিতে পারে?

ভারতের সমস্যা আরও গভীর। ভারতবাসী বাঁচিবে কোন পথে? পাশ্চাত্য সভ্যতা দেখিতেছি বণিকদের অত্যাচারে মরিতে বসিয়াছে, তাহারই এক বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ কি ভারতে নব সভ্যতার পত্তন করিবে? ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজেশনের মোহে এখানে কি স্বদেশী বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে—কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধগামী সোভিয়েটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অবাস্তব ডিমোক্রেসীর মত অন্য এক স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায় গৃহবিবাদ ও রক্ত-গঙ্গা আনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—অথবা ভারত অন্য কোন সভ্যতার জন্ম দিবে, অথবা ভারত তাহার প্রাচীন সভ্যতার পুনরুজ্জীবন করিবে?

চুরি

—শ্রীবিনয় চৌধুরী

তিন চারদিন প্রায় অবিশ্রাম বৃষ্টিপাতের পর আজ সকালে একটু 'ধরান' হইয়াছে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তরুণ সূর্য্যের আলোয় আকাশে একটা সজল উজ্জ্বলতা ফুটিয়াছে। পৃথিবীর মানুষ কদিনের জড়তা ত্যাগ করিয়া হঠাৎ সজাগ, কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছে।

বিনোদ চাটুজ্জে আজ মেয়ের বিয়ের পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবেন, খুচরা টাকার প্রয়োজন, তাই বাপ-মা-মরা নাতিটাকে সকালে একখানা দশটাকার নোট ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলেন। বেলা দশটার সময় অপোগণ্ড ছেলেটা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, নোটখানা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। চাটুজ্জেমশাই ছাতি-লাঠি নিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছেলেটার অপেক্ষায় ছিলেন, শুনিয়া কিছুকাল তাঁর মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েকটা চড় লাগাইলেন তার গালে পিঠে, তারপর হাঁক ছাড়িয়া বলিলেন, "কুপুষ্যি আছেন কেবল ধ্বংস করতে! খুঁজে নিয়ে আয়, হারামজাদা যেখান থেকে পারিস, নইলে মেরেই ফেলব" বলিয়া পুনরায় প্রহারে উদ্যত হইলেন।

চাটুজ্জে-গিন্নী আসিয়া স্বামী ও নাতির মাঝখানে দাঁড়াইলেন, "বলি কেবল মারলে কি হবে? শুনিই না ছাই কি হয়েছে?"

"হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ"—চাটুজ্জেমশাই, কাপড়খানা আঁটিয়া পরিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "দশ-দশটা টাকা, সোজা কথা মশাই…"

মার খাইয়া ছেলেটা নিঃশব্দে ফুঁপাইতেছিল; মার সে প্রায়ই খায় কিন্তু শব্দ করিয়া কাঁদিবার জো নাই। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ঘটনাটা সে পুনরায় বিবৃত করিল: নোটখানা সে কোমরে গুজিয়া নিয়াছিল ঠিক, এ পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও সে ভাঙানি পায় নাই, অবশেষে উত্তর পাড়ায় মতি পালের বাড়ী গিয়া টাকা নিয়া নোট দিতে গিয়া দেখে, নাই! তারপর সমস্ত পথ সে খুঁজিয়াছে, যেখানে যেখানে গিয়াছিল, সবখানেই দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও পায় নাই…

বৃত্তান্ত শুনিয়া গিন্নী বলিলেন—"বরাত, সব বরাত; নইলে মেয়ে জামাই চলে যাবে কেন, আর এই হতচ্ছাড়াকেই বা রেখে যাবে কেন আমার হাড় জ্বালাতে? মর মর তুই ড্যাগরা, আমার হাড় জুড়ুক…"

গণ্ডগোল শুনিয়া অনেকে আসিল, এবং ব্যাপার শুনিয়া—যে যার ইচ্ছামত মন্তব্য করিতে লাগিল। পল্লীগ্রামের ঘটনা-বৈচিত্র্যহীন জীবনে ইহাই পল্লীবাসীর কিছুক্ষণের জন্য আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল—এবং কৌতূহল মিটিলে একে একে যে যাহার পথ ধরিল।

বামনদাস ঘটক এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, এবার একমুখ-ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন—"তাইত। গেল কোথায় নোটখানা? আমার ওখানে যখন গিছল, তখনও যেন দেখিছি ওর হাতে। আচ্ছা, আমার ওখান থে তুই কোথায় গিছিলি তার পর?"

ছেলেটা তার গমন-পথের বিবরণ দিল, শুনিয়া তিনি আবার বলিলেন—"তাই ত গাঁয়ের ভিতরকার রাস্তা, হামেশাই কিছু আর কোনো লোকজন চলে না যে, পড়ে গেলে কে না কে নিয়েছে কুড়িয়ে। গ্রামের লোকই কেউ না কেউ পেয়েছে, এ আমি বলে দিচ্ছি?"

চাটুজ্জেমশাই সখেদে বলিলেন—"যেই পাক, আমার যা যাবার, তা ত গেল। এত বড় ছেলে, কোনও হুঁস বুদ্ধি নেই…একটি দুইটি নয়, একমুঠো টাকা—সোজা কথা…"

অকস্মাৎ যেন ঘটক মশায়ের দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গেল। খানিকটা তফাতে উপবিষ্ট একটি বুড়া গোছের নিম্নজাতের লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "একটি লোক, মাথায় একটি ধামা না কি ছিল, সকালে যাচ্ছিল গাঁয়ের

পথ দেয় ; তোর মতনই হবে, মনে হচ্ছে এখন, তুই না কি কুঞ্জ ?"

কুঞ্জ ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, হাঁ সেই যাইতেছিল বটে।

"তা হলে তুইই—নিশ্চয় পেয়েছিস হারামজাদা ? তখন আর কি করে জানবো যে এদিক ওদিক চেয়ে ওই বেটাই নোটখানা কুড়িয়ে নিলে···কবুল কর, নইলে থানায় নিয়ে যাব তোকে···"

হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কুঞ্জ বলিয়া উঠিল··· "আমিও ত তাই কতিছি এ হাতবেলা, আপনারা লোট লোট কত্তেছো, তা কুন্ লোট তা না জানলি আমি কি কবো। শুনতিছি আর বসে ভাবতিছি, আপনাদের কওয়া শেষ হলি আমি কমনে···"

অধৈর্য্য চাটুজ্জে ধমক দিয়া বলিলেন—"পেয়েছিস কি না বল, ভনিতে করতে লাগল দেখ···"

কুঞ্জ মাথায় জড়ান গামছা খুলিয়া ফেলিল। তার ভাঁজ থেকে নোটখানা বাহির করিয়া দুই হাতের তালুতে বারকতক ঘসিয়া সেটি মসৃণ করিল, তার পর মুহূর্ত্তকাল ইতস্তত করিয়া হাতটি বাড়াইয়া কহিল—"আপনাদের হয়ত এই ল্যাও। ঠাকুর মশাইর বেড়োর কোণটায় পড়ে পালাম, মন কলে এখন কারুরি কসনে, যার নোট সাব্যস্ত করে দিয়ে দিম্যানে···"

'ঢের হয়েছে"—বিনোদ চাটুজ্জে মুখ ভেঙাইয়া বলিলেন···"তুমি মহা সাধুপুরুষ, মন কলে, তোমার সব বুজরুকি, চোর কোথাকার—" বকিতে বকিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

মিনিট খানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কুঞ্জ বলিল— "আমারে কি চোর ঠাওরালে ঠাকুরমশাই ?"

চাটুজ্জে-গিন্নী রান্নাঘরে বসিয়া নাতিকে তেল মাখাইতেছিলেন আর হাজার ঝুড়ি বকিতেছিলেন। কুঞ্জ পায়ে পায়ে গিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—"চ্যাঙারী রাখবা মাঠারোণ ?"

কোন জবাব না পাইয়া আরও খানিকটা আগাইয়া গিয়া পুনরায় বলিল—"রাখবা মাঠারোণ, চ্যাঙারী খান ?"

চাটুজ্জে-গিন্নী বাহিরে আসিলেন নাতিটির হাত ধরিয়া, কুঞ্জকে উঠানে দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—

"রান্না-ঘরের মধ্যে এসে না দাঁড়ালে বুঝি আর 'চ্যাঙারী রাখবা' হয় না ? মানুষের একটা আক্কেলও ত থাকে।"

থতমত খাইয়া কুঞ্জ গোলার নিকটে যেখানে মেঘলা রৌদ্রে ধান শুকাইতে দেওয়া ছিল খেজুর পাতার পাটিতে, পিছাইয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। নিতান্ত অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিল, "ভাল জিনিষটা মাঠারো, আপনাদের কাজে লাগতি পারে। তুই রেখেলাম ; হাটে আর যাই নি।"

গিন্নী এক নজর জিনিষটা দেখিয়া বলিলেন "আর বোঝাতে এসেছ ? বিক্রী হলে তুমি ঘরে রেখে দাও, না ? —না বাপু তোমার জিনিষ নেব না, খাওয়া দাওয়ার সময় এখন ত্যক্ত করো না, যাও"··· বলিয়া ঘড়াটা তুলিয়া লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

পাঁচ সাত মিনিট পরে অনুপস্থিত চাটুজ্জে মশাইএর উদ্দেশ্যে ডাকিয়া বলিল, "গোটা কত পয়সা নাতেলাম আমি···"

বার দুই তিন ডাকিয়াও কোন সাড়া মিলিল না, কুঞ্জ কি ভাবিয়া গোলার ছায়ায় গিয়া অমনি বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে চাটুজ্জে-গিন্নী স্নান সারিয়া ফিরিলেন এবং কুঞ্জকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত তেমনি ক্রুদ্ধ হইলেন।

"কি রকম লোক তুমি বলত ? পাঁচ-শো বার বললাম, নেবো না তোমার চ্যাঙারী, বসে রয়েছে কি জন্যে ? তোদের ছোটজাতের কি সবই রিটকেল ?"

কুঞ্জ অপ্রতিভ হইল না ; তার শুষ্ক তোবড়ানো গাল হাসিতে কুঞ্চিত হইল—"বকসিশির জন্যি কইছি, লোটখান ত গিইল তামাদের ফিরিয়ে ত দেলাম।"

তারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গিন্নী বলিলেন, 'ফিরিয়ে ত দেলাম' ? আস্ত নোটখানাই হজম করার তালে ছিলে, ধরা পড়ে এখন 'ফিরিয়ে ত দেলাম'। তোমার

জন্যেই ত ছেলেটি সাব খেয়ে মরল! আবার বকসিশ চাইছে!"

নির্ব্বিকার কুঞ্জ এসব কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল, "গোটাকত চাল দাও তালি মাঠারোণ। এট্টা বলতি দানা নাই ঘরে। সত্যি কতিছি মাঠারোণ, বুষ্টিতি কদিন বারুতি পারি নি? দাও মাঠারোণ, নলি খাওয়া হবে না? তোমাদের অনেক আছে।"

সত্যিই গ্রামের মধ্যে চাটুজ্জেরাই অবস্থাপন্ন এবং ইহারা হাত-ভারী লোক হইলেও ফকির-বোষ্টম যে শূন্য-হাতেই ফেরে তা নয়।

কিন্তু আজ লোকটারই উপর গিন্নী বীতরাগ, সুতরাং তার সকল আবেদন-নিবেদনই নিষ্ফল হইল, এবং সমস্ত ব্যাপারটা দেখিতে খুবই অশোভন ও হৃদয়হীন ঠেকিল।

চাটুজ্জে-মশাই এতক্ষণে পুনরায় প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, "কি ভ্যানর ভ্যানর করে লোকটা? যাচ্ছি এক শুভকাজে, যত অযাত্রা! দাও না বিদেয় করে!"

"এত করে ত বলছি, নড়ে না আপদ! ঘেন্না-পিত্তিও কি নেই?"

ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কুঞ্জ আপন মনে কি ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দিনের আরম্ভটাই আজ বড় খারাপ হইয়াছে কুঞ্জর, সকালে উঠিয়া তামাক খাইতে গিয়া দেখে তামাকের চোঙাটা শূন্য। বার বার ঘা দিয়াও যখন শূন্য চোঙাটা হইতে এককণা তামাকও বাহির হইল না, ক্ষোভে ও হতাশায় কুঞ্জ সেটি দূরে আছড়াইয়া ফেলিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে সুন্দরী বাহির হইতে বলে—"আজ কি আর ঘরের বার হতি হবে না নাকি?" তারপর সে জানাইয়া দেয় যে ঘরে বসিয়া থাকিলে আজ চলিবে না এবং সেও কিছুতে আর আঁচল পাতিয়া গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে মা মানুষের বাড়ী। এই বলিয়া সুন্দরী আর বাড়ীতে দাঁড়ায় নাই। নিস্তেজ আক্রোশে কুঞ্জ ঘরের মধ্যে মুহূর্ত্তকালের জন্য গরম হইয়া উঠে।

কুঞ্জ বুড়া হইয়াছে এবং তার ধামা-কুলার ব্যবসাও আর চলে না। অভাব ইহাদের পুরুষ-পরম্পরাগত। সম্পদ্ ত নহেই, একদিনের সংস্থানও ইহাদের থাকে না, কোন দিন রোজগার বন্ধ হইলে হাঁড়ি শিকায় উঠে। তাই বলিয়া অভাবকে অভিসম্পাৎ বলিয়া ক্ষেপিয়াও ইহারা কোন দিন উঠে না, তাহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক, অতি সহজে একথা মানিয়া লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কুঞ্জর সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে চাল অমন কত কত দিন থাকে নাই, সাক্ষী ত সুন্দরীই রহিয়াছে,—দুঃখ তাহা নয়, জরাগ্রস্ত পেশীর শক্তি যখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, আর ভদ্রলোকেরাও তাহাদের কেমন সন্দেহের চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছে, বুড়া কুঞ্জর মনে হয়—তার সমস্তই যেন লোকসান গিয়াছে। চোখের সামনে কত লোকের অবস্থা ফিরিল, আর তার পৈতৃক ঘরখানা ঝড়ে ভূমিসাৎ করিয়া গেল, আজীবন পরিশ্রমের—জাত-ব্যবসা অচল হইল বৃদ্ধ-বয়সে! বিশ বছরের ছেলেটা, তল্লাবাঁশের মত চেহারা সুঠাম, সরল ও মজবুত, চাহিলে কুঞ্জর চোখ জুড়াইত, নৌকার কাজ করিতে গিয়া, নৌকাসহ ডুবিল বড়দলের গাঙে। কাজ-কর্ম্মে মন লাগে না কুঞ্জর, বেলা বাড়িয়া রৌদ্রের তেজ যখন বাড়িতে থাকে, ছায়ায় বসিয়া ইদানীং তার কেবল এই সব কথাই মনে হয়।

আজ পঁয়তাল্লিশ বছর সে সুন্দরীকে লইয়া ঘর করিতেছে—লাভ হইয়াছে কি? পাড়ায় পাড়ায় গিয়া কেবল কুঞ্জর বদনাম করিয়া বেড়ায়—বিশ বছর আগে মৃত পুত্রের নাম করিয়া চোখের জল ফেলে, আর চাহিয়া চিন্তিয়া এখান-ওখান হইতে এটা-সেটা সংগ্রহ করে অভাবের সময়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে একটির বেশি সন্তান হইল না তার, যেটি হইল, সেও রহিল না অসময়ে বুড়া বাপের বোঝা বহিতে।

চ্যাঙারীখানা লইয়া কুঞ্জ দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। পথে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবে—জীবনটাই—একটি লোকসানের কারবার।

চ্যাঙারীখানা দুই হাট ফেরৎ হইয়াছে কেহ কিনে নাই। গ্রামেও অনেকের বাড়ী ফিরিল কেহ রাখিল না। ফিরিবার মুখে কুঞ্জ পথে নোটখানা দেখিতে পায় এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গ তার করতলগত হয়। কিন্তু তার

পরই নানা ভাবনায় সে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। পাড়াগাঁয়ে মানুষ, অত্যন্ত পরিচিত এবং কাজকর্মে গোপনীয়তা কদাচিৎ সম্ভব—কুঞ্জ গ্রামে আসিয়াছে এবং দশ টাকার নোট ভাঙাইয়াছে—যার নোট হারাইয়াছে, ইহা তার কানে উঠিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, কে জানে!

কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া দেখিল, সুন্দরী মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, খাওয়ার কোনই আয়োজন নাই, সুন্দরী যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিয়াছে—ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবারও কিছু নাই,—নাই কেন, বলিয়া রাগারাগি করিবার মতনও তার মনের অবস্থা ছিল না; ঘরের চৌকাট ধরিয়া নিঃশব্দে কুঞ্জ বহুক্ষণ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, ক্রোধ, কিছুই তার মনে আছে বলিয়া বোধ হইল না, কেবল অতি ধীরে ধীরে তার মুখের চেহারায় একটি নিগূঢ় সকল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর পুনরায় আকাশে ঘনঘটা করিয়া মেঘ করিল এবং একপ্রহর রাত না হইতেই মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণপক্ষের রাত, মেঘের আড়ালে আকাশের জ্যোতিসম্পদ অবলুপ্ত, নিরাকার, পিচঢালা অন্ধকারে একটানা বৃষ্টিপাতের মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় ঘর-বাড়ী ও গাছপালার বৈষম্য মুছিয়া গেল, গ্রামের লোকে সন্ধ্যারাত্রেই ঘরে দরজা দিল।

একঘুমের পর জাগিয়া চাটুজ্জে-গিন্নী উঠিয়া বসিলেন, ভিতরের উঠানের দিকে যেন মানুষ যাতায়াত করিতেছে। বৃষ্টিতে জলে পা বাধিয়া শব্দ হইতেছে—ছপ্ ছপ্ ছপ্—কতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া গিয়া জানালাটি খুলিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। অন্ধকারে ভাল দৃষ্টি চলে না, খানিকক্ষণ চাহিয়া শব্দটি অনুসরণ করিয়া একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি টের পাইলেন। সর্ব্বনাশ! রান্নাঘরের দাওয়ায়—শুকনো ধান রাখা হইয়াছে, গোলায়ও চাবী দেওয়া নাই। চাটুজ্জে-গিন্নী বিপদ গণিলেন। চাটুজ্জে মশাই আজ বাড়ী ফেরেন নাই। এই বৃষ্টির রাতে নিশুতি সময়ে ডাকিয়া গলা ফাটাইলেও সাড়া মিলিবে না কায়স্থ পাড়ায়। গিন্নী শিহরিয়া উঠিলেন ভয়ে, কি জানি চেঁচামেচি করিলে মনুষটা ঘরে ঢুকিয়া যদি তাঁর গলাটাই টিপিয়া ধরে?

বৃষ্টির জলের ঝাপটে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ভিজিতে লাগিল, পাথরের মূর্ত্তির মত তিনি জানালার গরাদে ধরিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটা শব্দ করিবার সাহসও যেন নাই। লোকটা একবার, দুইবার তিনবার আসিয়া মাথায় করিয়া ধামা লইয়া কোথায় রাখিয়া আসিল। অত পরে গলা পরিষ্কার করিয়া গিন্নী হাঁক দিলেন—"কে, কে তুমি; ধানগুলো যে সব নিয়ে চললে?"

লোকটি বোধ হয় শুনিতে পাইল না; কণ্ঠস্বর আরও চড়াইয়া পুনরায় হাঁকিলেন—"বলি কে; কে ও—"

অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তিটি এবার থমকিয়া দাঁড়াইল এবং কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি কুঞ্জ, মাঠাক্‌রুণ।"

কুঞ্জ! বিস্ময়ে, ক্রোধে বিমূঢ় চাটুজ্জে-গিন্নী কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দেশের অবস্থা

…যে দেশের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৯৯ জন একদিন চাকুরী না করিয়া স্বাধীন ভাবে সম্পূর্ণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, ত্রিশ বৎসর আগেও যে দেশের অধিকাংশ কৃষক ও কুটীর-শিল্পী প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের জীবিকার জন্য চাকুরীর উপর নির্ভরশীল হইতে হইত না, সেই দেশে এখন কি করিয়া স্ব স্ব পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহ হইবে, তাহাই হইয়াছে প্রত্যেকের প্রাত্যহিক সমস্যা। যে দেশের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ ত্রিশ বৎসর আগে কোন রেল ষ্টেশনের মুটিয়াগিরি ও কলের কুলিগিরি প্রভৃতি দাসবৃত্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সেই দেশের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ বর্ত্তমানে সর্ব্ব প্রকারের দাসবৃত্তিকে আদর করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না। যে দেশের মধ্যবিত্তগণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষগণ কোন দিন চাকুরি করা ত' দূরের কথা, শ্রমজীবীর কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত, সেই দেশের সেই মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানগুলি যে কোন কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও তাহা জুটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।…

কৃষিঋণ ও দেশীয় মহাজন

—শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃষিই ভারতবাসীর প্রধান উপজীবিকা। ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন কৃষিজীবী। এ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত কৃষির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উহার পূর্ব্বকালীন উন্নতির মূল অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা আজিও অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে ভারতের কৃষি-সম্পদ্ ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। যে কারণে কৃষি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে তাহা বহু। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয় সহজলভ্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব। অন্যান্য অনেক দেশে কৃষকের স্বীয় মূলধন ও ব্যাঙ্কপ্রদত্ত মূলধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও গভর্ণমেণ্ট ও অনেক ঋণদান-সমিতি অধিবাসীদের কৃষির অর্থসঙ্কট দূর করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, কৃষি-মূলধন ও কৃষিঋণ বর্ত্তমানে সকল দেশের গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ও করিতেছে।

ইংলণ্ডের মত শ্রম-শিল্প-প্রধান দেশে, যেখানে অধিবাসীদের অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, সেখানেও কৃষির উন্নতিবিধায়ক আইন প্রণয়ন দ্বারা কৃষকদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কৃষিঋণ আইন অনুযায়ী ইংলণ্ডে "এগ্রিকালচারাল মর্টগেজ কর্পোরেশন লিমিটেড" স্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ঐ করপোরেশনের শেয়ার-হোল্ডার। কৃষিজাত সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া ঐ করপোরেশন ব্যাঙ্কপ্রদত্ত মূলধন হইতে কৃষকদের টাকা ধার দিয়া থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহার কার্য্যক্রম বহুদূর প্রসারলাভ করিয়াছে। ফ্রান্সেও কৃষিঋণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিয়াছে। 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নূতন চার্টার লাভ করিবার সময় বিনা সুদে কৃষি ঋণ-দান সমিতিকে চারকোটী মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা ধার এবং ঐ সমিতিকে পুনরায় স্বীয় লভ্যাংশ হইতে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড কৃষির সাহায্যার্থে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ঐ প্রতিশ্রুতির ফলে বর্ত্তমানে শতকরা ৩.৪ টাকা সুদে ফ্রান্সে কৃষকেরা ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষিঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে :—

(ক) দেশীয় মহাজন ;
(খ) সমবায় ঋণদান সমিতি ;
(গ) গভর্ণমেণ্ট ;
(ঘ) কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক।

শ্রফ ও দেশীয় মহাজন সমগ্র ভারতে প্রায় ১০০ কোটী টাকার উপর ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিয়া থাকে। ভারতীয় কৃষিঋণের বেশীর ভাগ এই দেশীয় মহাজনেরা সরবরাহ করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট স্বল্পকালের জন্য এবং উপযুক্ত বন্ধকী সামগ্রী জামানত রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী কালের জন্য উহারা চাষী, কারিগর ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়া থাকে। উহাদের লেন-দেন-পদ্ধতি যৌথ ব্যাঙ্কগুলির কর্ম্মপদ্ধতি হইতে একটু স্বতন্ত্র। যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মত উহারা জমা গ্রহণ করে না। নিজেদের পকেট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে এবং যখন অর্থের অসঙ্কুলান হয়, তখন কেহ কেহ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে বিল ভাঙ্গাইয়া ঐ অর্থ সংগ্রহ করে। ঋণগ্রহণকারীদের নিকট হইতে সিকিউরিটী গ্রহণ বিষয়ে যৌথ ব্যাঙ্কদের মত উহাদের কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই। পরিচয় জানা থাকিলে নামমাত্র সিকিউরিটী গ্রহণ করিয়া, কখনও বা বিনা সিকিউটীতেই উহারা টাকা ধার দিয়া থাকে। মহাজনেরা প্রায়ই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, তাহাদের পক্ষে যে সকল খবরাখবর রাখা সম্ভব, ঐ সকল যৌথ ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। সেইজন্য যৌথ ব্যাঙ্ক কখনই উপযুক্ত সিকিউরিটী ব্যতীত টাকা ধার দিতে রাজী হয় না। আবার, যৌথ ব্যাঙ্কের ঐ সব সিকিরিউটী সাধারণতঃ কোম্পানীর কাগজ অথবা কোনও ভাল চলতি কারবারের শেয়ারে গৃহীত হইয়া থাকে। ঋণগ্রহণকারী নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ঋণ পরিশোধ

করিতে না পারিলে, যৌথ ব্যাঙ্ক ঐ সিকিউরিটী বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিয়া লয়। দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে ঐরূপ সিকিউরিটী প্রদান করা অসম্ভব। সেইজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্ত তাহাদিগকে দেশীয় মহাজনদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। ফলতঃ কৃষিঋণ সরবরাহ করিবার বিষয়ে দেশীয় মহাজনেরাই বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র ভরসা। এইরূপ ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্টে দেশীয় মহাজনদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ করিবার যে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা কোনও ক্রমে অনুমোদনযোগ্য নহে। ঐরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এ দেশের মহাজনেরা এবং তৎসহ কৃষকেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বঙ্গীয় সরকার যে কৃষি-ঋণ লাঘব আইন প্রণীত করিয়াছেন এবং যে নূতন মহাজনী আইন আলোচিত হইতেছে তাহার ফলে দেশীয় মহাজনদের পক্ষে চাষীদের ঋণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত চাষীদের দুর্দ্দশা একেবারে চরমে পৌঁছাইবে।

দেশীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে, উহাদের সুদের হার অসম্ভব রকম চড়া এবং সরল, বিশ্বাসপ্রবণ চাষীরা অনেক স্থলে উহাদের দ্বারা প্রতারিত হয়। ব্যাঙ্কের হিসাব-বহির মত মহাজনদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোন হিসাব-বহি নাই, যাহাতে লেন-দেনের একটা স্পষ্ট স্থায়ী রেকর্ড থাকিতে পারে। দরিদ্র কৃষক এবং মহাজন উভয়ের হিতের জন্য ঐরূপ হিসাব-বহির একান্ত প্রয়োজন এবং ঐ সকল হিসাব-বহি মধ্যে মধ্যে হিসাব-পরীক্ষকদের দ্বারা উপযুক্ত ভাবে পরীক্ষা করানও যুক্তিযুক্ত। উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে মহাজনী প্রথায় যে বিশ্রী গলদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা অচিরাৎ দুরীভূত হইবে এবং তাহা হইলে মহাজনেরাও সর্ব্বসাধারণ ও ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। মহাজনী প্রথার এই সংস্কার মহাজনদের ভিতর ব্যাঙ্কিং-শিক্ষা প্রচার এবং কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতার দ্বারা যত শীঘ্র সম্ভব বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের দ্বারা তাহা হইবে না।

দেশীয় মহাজনদের বিষয়ে অনেকের ধারণা, উহারা স্বার্থপর ও অতিরিক্ত অর্থলোভী; চড়া সুদে টাকা দাদন খাটাইয়া দরিদ্র কৃষকদের শোষণ-কার্য্যে উহারা তৎপর; উহাদের দ্বারা কৃষির কোনও প্রকার মঙ্গল সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, বহুল অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। অতএব ঐরূপ শোণিত-শোষক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রকার মনোভাবের পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তির অভাব রহিয়া গিয়াছে। মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধ সমালোচকগণ যে বিষয়টি লইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইতেছে চড়া সুদের হার। এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের সমালোচনা তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে মহাজনদের এই চড়া সুদের হার অধিকাংশ স্থলেই সমর্থনযোগ্য।

যে সিকিউরিটী লইয়া মহাজনেরা কৃষকদের টাকা ধার দিয়া থাকে, তাহার মূল্য ও পরিমাণ এত অল্প যে, কোনও ব্যাঙ্কই ঐরূপ সিকিউরিটীতে টাকা ধার দিতে রাজি হইবে না। এই সামান্য সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেয় বলিয়া উহারা যদি একটু অতিরিক্ত হারে সুদ দাবী করে, তাহা হইলে তাহা কি খুবই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? যে প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যে উহারা পা বাড়ায়, তাহাতে যদি একটু চড়া হারে সুদের লোভ না থাকে, তাহা হইলে কি সব লোকে তাহারা ঐরূপ কার্য্য করিতে প্রয়াসী হইবে? ইহা ছাড়া, হিসাবের পরিমাণ সুদের টাকা হয় আদায় হয় তাহার অপেক্ষা ঢের কম। ইহা জানে বলিয়াই উহারা টাকা ধার দিবার সময় একটু বেশী হারে সুদ দাবী করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উহা নামে মাত্র বেশী, যে হারে সুদ আদায় হয়, তাহাকে অতিরিক্ত বলা যায় না। বর্ত্তমানে দেশীয় মহাজনদের সাধারণতঃ কতকগুলির অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে। ব্যবসায় বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব রকম পড়িয়া গিয়াছে এবং উহার ফলে কৃষকদের দুরবস্থার আর পরিসীমা নাই। পুরাতন ঋণ বোঝার ধরার মত চাপিয়া বসিয়া আছে, নূতন করিয়া ঋণ গ্রহণ করিবার মত সাহস আর তাহাদের নাই। কৃষকদের এই আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মহাজনেরা। তাহাদের বহু টাকা অনাদায়ী রহিয়া গিয়াছে এবং নূতন করিয়া আর কেহ টাকা ধার লইতেছে না। আবার সম্প্রতি উহাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে যৌথ ও সরকারী ব্যাঙ্কগুলি ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়াছে। হুণ্ডি ভাঙান ব্যাপারে মহাজনদের পূর্ব্বে যে সুবিধা ছিল, এক্ষণে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি তাহা নষ্ট করিয়া দিতেছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

এনকোয়ারি কমিটীর রিপোর্টে এই সকল যৌথ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ইহারা ছোট ছোট কারবারগুলির কথা দূরে থাকুক, বড় বড় পসারওয়ালা ভারতীয় কারবারগুলিকেও বিশেষ কিছু সুবিধা দেয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় মহাজনেরা টাকা ধার দিবার সময় যৌথ ব্যাঙ্কের চাইতে যদি একটু অতিরিক্ত হারে সুদ দাবী করে, কোনক্রমে তাহা অন্যায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মহাজনদের সুদের গড়পড়তা হার সাধারণতঃ শতকরা ১০ হইতে ১২ টাকা। বাঁড়তি ব্যবসায়ের সময় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি শতকরা ৮ হইতে ১০ টাকা হারে সুদ দাবী করে। এই সামান্য তফাৎটুকু সহজেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

মহাজনেরা কখনও টাকায়, কখনও দ্রব্যে ধার দিয়া থাকে এবং উভয়বিধ উপায়ে সুদ আদায় করে। যদিও উহাদের সুদের হার কোন কোন প্রদেশে একটু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়,—ঠিক ঐ হারে সুদ আদায় হয় না। আদায়ী সুদের পরিমাণ ও হার প্রার্থিত সুদের পরিমাণ ও হার অপেক্ষা সকল ক্ষেত্রেই কম। উহাদের দেয় ঋণের চাহিদা হইতে ইহা প্রমাণ হয়। ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ অর্থ উহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে।

এ যাবৎ ভারতে যতগুলি যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা ভারতীয় কৃষি ও ব্যবসায়ে ঋণের খুব সামান্য অংশই সরবরাহ হইয়া থাকে। সহরে বা পল্লীতে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ছোট ছোট কারবারী লোকদের অর্থের প্রয়োজন এখনও দেশীয় মহাজনেরা মিটাইয়া আসিতেছে। অন্য কোনও ঋণদান-প্রতিষ্ঠান না থাকায় দেশীয় মহাজনেরা ভারতে এত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। সমবায় ঋণদান-সমিতি যেখানে আজও শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই, ল্যাণ্ড-মর্টগেজ ব্যাঙ্ক যেখানে আজও অধিকাংশ স্থলে কল্পনায় বিরাজ করিতেছে, সেখানে কৃষি-ঋণ সরবরাহ করিবার পক্ষে দেশীয় মহাজনেরাই যে একমাত্র ভরসাস্থল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর পল্লীর সর্ব্ববিধ ব্যাঙ্কিং কার্য্যে যাহাদের একচেটিয়া আধিপত্য তাহারা যদি চড়া হারে সুদ দাবী করে, তাহার প্রতিকার কোথায়? কৃষকদের মূলধনের প্রয়োজন, শুধু মূলধন কেন, অজন্মার বৎসর খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবারও প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোনও পথ খোলা না থাকিলে, বর্দ্ধিত হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহাদিগকে দেশীয় মহাজনদের শরণাপন্ন হইতে হয়।

ভারতীয় কৃষকদের দুর্নাম আছে যে, তাহারা গৃহীত ধন পরিশোধের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের বিষয়ে মহাজনদের অনেক সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হয়। সুতরাং সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে উহারা একটু চড়া হারেই সুদ দাবী করিয়া থাকে, যাহাতে আসল টাকা অনাদায়ী থাকিয়া গেলেও সুদের টাকায় পোষাইয়া যাইতে পারে।

উপরে উক্ত বিষয়গুলি সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখিলে মহাজনদের সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কৃষি-ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য যতদিন পর্য্যন্ত অন্য কোনও অধিকতর সুবিধা-জনক ব্যাঙ্কিং-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত মহাজনী-প্রথা ভারতে টিকিয়া থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই, যদিও বর্ত্তমানে মহাজনী প্রথাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। এ দেশে ঋণদান-সমিতিও ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের মত কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে মহাজনদের প্রয়োজন শেষ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন। ঐ সকল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের পাশা-পাশি মহাজনী প্রথাও টিকিয়া থাকিবে এবং বর্ত্তমানে উহার ভিতর যে গলদটুকু রহিয়াছে তাহা দূর করিতে পারিলে, উহা সত্যই যে কৃষির একটী হিতকর প্রতিষ্ঠান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘোর দুর্দ্দিনে অনশনে যখন মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন মহাজনেরাই বন্ধুর মত কৃষকদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া আসে এবং তাহাদের জীবন রক্ষা করে। একই গ্রামে বংশানুক্রমে পাশাপাশি বাস করিয়া মহাজন ও কৃষকদের মধ্যে যে সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হয় তাহা সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চাষী-মহাজনের এই মনোভাব কখনই সম্ভব হয় না।

মহাজনী-প্রথার কয়েকটী গলদের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে আরও দু'চারটীর বিষয় উল্লেখ করিব। মহাজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তাহারা অনেক সময় অগ্রিম সুদের অন্যায় দাবী করে এবং তাহার জন্য পীড়নও করিয়া থাকে। আবার শুনা যায় উহারা শাদা কাগজের উপর অজ্ঞ ও সরল কৃষকদের নিকট হইতে বুড়া আঙ্গুলের ছাপ লইয়া পরে উহাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়াইয়া লয়। অধিকাংশ সময় উহাদের হিসাবের গোলমালও হইয়া থাকে। এই সকল গলদ অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার। এইগুলি দূর করিতে পারিলে মহাজনী-প্রথা সমাদর লাভ করিবে। এই সকল গলদ দূর হইলে মহাজনী-প্রথা সত্যই কৃষির একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিবে না কি?

আদর্শের বিপর্য্যয়

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

১

তিন দিন পরে রাত্রিতে বালীগঞ্জে হীরেন বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও জগত্তারিণী বসিয়া অরুণের বিবাহের কথা কহিতেছিলেন। অরুণ বাহির হইয়াছে মোটরে, বন্ধুদের বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে—কার্ডও ছাপাইয়াছে।

কিন্তু ইহা ব্যতীত আর এক কার্য্য ছিল তাহার, কিন্তু সে কার্য্য যে কি, তাহা অরুণ ব্যতীত আর কেহই জানিত না। তটিনী কলিকাতায় আসিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে করুণ প্রার্থনা জানাইয়াছে। সে হ্যারিসন রোডে এক হোটেলে উঠিয়াছিল। অরুণ গিয়া সেই হোটেলে উপস্থিত হইল। কি তটিনীর চেহারা হইয়াছে—সেই তটিনীর এই চেহারা, এত হীনপ্রভ সে। অরুণকে দেখিয়া তটিনী কাঁদিয়া ফেলিল। অরুণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুরুষ বা নারী যখন ইন্দ্রিয়-প্রধান হইয়া তাহাদের মন ও প্রবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে নিয়োজিত করে, তখন সে বোঝে না যে, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বার গতিতে হয়-ত সে সমাজের বাঁধন, অনুশাসন, পিতা-মাতার বন্ধন, কল্যাণ-কামনা সবই এক মুহূর্ত্তে ভঙ্গ করিয়া নানান যুক্তির সাহায্যে লালসার জয় ঘোষিত করে। কিন্তু সে জানে না যে, তাহা জয় নহে, পরাজয়। তাহা জীবন নহে, মৃত্যু। যে লালসার দাবানল সমাজকে, পিতা-ভ্রাতা-মাতার সম্বন্ধকে পুড়াইয়াছে, তাহা এক দিন যে সেই পুরুষ বা নারীকেও ভস্মীভূত করিবে গভীর মর্ম্মভেদ আর্ত্তনাদের মধ্যে, তাহা সুনিশ্চিত।

কিছুক্ষণ কাটিলে তটিনী অরুণকে বলিল, "আজ আমি বড়ই বিপদে পড়েছি অরুণ—আজ আমার কেউ নেই।"

অরুণ বলিল, "কেন তোমার ত বিয়ে হয়েছে এক পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে, অন্তত তাই ত শুনেছিলাম।"

তটিনী বলিল, "সবই সত্যি কিন্তু আমি এখন তার কাছ থেকে পালাতে চাই—ভাল লাগছে না।"

"তা আমি আর কি করতে পারি?"

"আর কিছু না পার, বন্ধুভাবে আমায় কিছু টাকা—অন্ততঃ পাঁচশো টাকা—দাও, সত্যি বলছি অরুণ, আর আমি কখনও তোমার কাছে আসব না—আমি বর্ম্মা চলে যাব—এই সাহায্য আমায় কর অরুণ—আমি বড়ই বিপন্ন।"

"তটিনী, কত টাকাই নিয়েছ আমার কাছ থেকে—কতরকম ভাবেই জীবন কাটালে; এখনও...আবার বর্ম্মা যাবে বলছ।"

"উপদেশ দিতে এস না অরুণ—কেন যে আজ এ রকম করি, তার কারণ বলতে চাই না। টাকা সাহায্য করবে কি?"

"আমার হাতে এখন অত টাকা নেই—আর সব টাকা এখন মা ও হীরুদার কাছে—এক-শ টাকা জোর দিতে পারি—আমার বিয়ে এই হপ্তায়—"

তটিনী বলিল, "মেয়ে বোধ হয় সেই নীহারিকা, না?"

অরুণ বলিল, "হ্যাঁ"—

তটিনী বলিল; "Wish you good luck (তোমার কল্যাণ কামনা করি।")

অরুণ এক-শ টাকার একখানা নোট তটিনীর হাতে দিয়া বলিল, "তটিনী আমার কথা শোন—এই টাকা নিয়ে স্বামীর কাছে চলে যাও—"

তটিনী হাসিয়া বলিল, "স্বামী! স্বামী!"

সেই হাসিতে অরুণ ভীত হইল; সেই হাসি কি ভয়ানক। নারী ভগবানের মহিমান্বিত সৃষ্টি। নারীরূপে আমরা দেবীর আরাধনা করি। কিন্তু নারী ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তে তাহার দানবী শক্তিতে পুরুষের ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতে পারে; মানুষের জীবনকে বিরাট হাহাকারে পরিণত করিতে পারে যদি সে মানুষ ইন্দ্রিয়-প্রবণতাকে সংযমের মধ্যে না আনিতে সমর্থ হয়। সেই কারণেই নারীর শাসন সমাজে এত কঠোর—সৃষ্টিরক্ষার জন্য তাহা প্রয়োজন। কিন্তু ইহার আরও একটি দিক্ আছে। সমাজ সংস্কারের জন্য

বর্ত্তমানে নারীর পক্ষে যেরূপ কঠোর অনুশাসন প্রয়োজন, পুরুষের পক্ষেও সেইরূপ শাসনের প্রয়োজন হইয়াছে ; এইরূপ আইন করা উচিত যে পরস্ত্রীর সহিত অবাধে মেলা-মেশা দণ্ডনীয়।

ইউরোপ, আমেরিকা বা ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পুরুষ ও নারীর মেলা-মেশা বহুদিন হইতে সে সব দেশে প্রচলিত থাকিলেও সমাজের নানা বিভীষিকা এবং জনসাধারণের অসন্তুষ্টি, হাহাকার, অন্নাভাব কিছুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষ এই পাশ্চাত্যের অনুকরণে উন্মত্ত হইয়াছে, এই অনুকরণের ফলে জাতি নির্জ্জীব হইয়া ক্রমশঃ যে ক্লীবত্বের দিকে অগ্রসর হইবে, তাহা আমাদের চিন্তা করা উচিত যে উপায়েই হউক এমন কি আইন করিয়াও অবিবাহিতা বিবাহ-যোগ্যা কন্যা যাহাতে সমাজে না দৃষ্ট হয় তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। রামের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শ্যামের কন্যার বিবাহ হইয়াছে ইহারা আমাদের আত্মীয়, আমার কন্যা নাই আমি নিশ্চিন্ত। চারটি পুত্র আছে, শিক্ষিত, চাকুরীও জুটাইতে পারিয়াছে, সুতরাং কন্যার-পিতার গলা কাটিয়া অর্থ শোষণ করিয়া পুত্রদের বিবাহ দিব, এ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে। আমার কন্যার বা আমার পুত্রের ন্যায় সকলেরই পুত্র-কন্যা বর্ত্তমান, অর্থাভাবে, সুযোগ্য পাত্রের অভাবে, বিবাহ হইতেছে না—ইহার সমাধান করা প্রয়োজন। অবিবাহিতা তরুণী-সংখ্যা সমাজে বাড়িলে অনাচার ব্যভিচাররূপ ক্ষত সমাজকে অচিরে ধ্বংস করিবে।

কিন্তু আপাতমধুর চাকচিক্যময় পাশ্চাত্য বিলাসের উপকরণ যখন সুলভে প্রাপ্য, তখন কে চিন্তা করিবে দেশের নারীর করুণ কাহিনী, কন্যার পিতার দুরদৃষ্টের কথা ?

*

এ দিকে অরুণের বাড়ীতে কন্যা-আশীর্ব্বাদের কথা চলিতেছে। "নিরীক্ষণী" লইয়া আলোচনা চলিতেছে, প্রচুর জিনিষপত্র, গহনা, বেনারসী শাড়ী, ব্লাউস ইত্যাদিতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে।

জগত্তারিণী এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহ শ্যামমাধব বাবুর বাটীতেই হইবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

জগত্তারিণী অরুণকে ডাকিয়া বলিলেন, "খোকা দেখ ত এ শাড়ীগুলো—কোন্ কোন্ শাড়ী তোর পছন্দ হয় ?"

অরুণ বলিল, "এতগুলো শাড়ী—গয়না—বাবা ! এত !"

অরুণের মাতা কহিলেন, "এ যে নিরীক্ষণী কি না।"

অরুণ অবাক্ হইয়া মাতার দিকে তাকাইয়া থাকিল।

১০

যেদিন নীলাম্বর সপরিবারে সুরেশের প্রেরিত বাসে খিদিরপুরে যাইবে ঠিক করিতেছে, সেই সময়ে জগত্তারিণীর টেলিগ্রাম আসিয়া পৌছিতে সকল ব্যবস্থায় গোলমাল হইয়া গেল। বাস ফেরৎ পাঠান হইল। পরের দিনই হীরেন বাবু অরুণের দূর-সম্পর্কীয় কাকাকে লইয়া কন্যা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। নীলাম্বর মহা বিপদে পড়িলেন। বাড়ীর যেরূপ জীর্ণ অবস্থা তাহাতে সে বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া চলে না। শ্যামমাধব বাবুর বড় বাড়ী তাহার একটা কড়ি বদলাইতে বা একটা দরজা নূতন লাগাইতে বা গেটের বিরাট থামের চুণ-বালী-খসা বন্ধ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা নীলাম্বরের নাই কিন্তু উপায় কি ? জগত্তারিণীর অসীম কৃপায় বিবাহ হইতেছে, তাঁহার মত উপেক্ষা করার প্রবৃত্তিও নীলাম্বরের ছিল না।

স্ত্রীর নিকটে কেবল কথা শুনিতেছেন। স্ত্রী বলিতেছেন, "এ কি রকম বিয়ে হবে, এখনও নিরুর গয়না, কাপড়-চোপড় কিছু কেনা হল না। জামাইয়ের ত সব কেনা হয়েছে ? তুমি আমার গয়না কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বদলে নূতন গয়না নিয়ে এস, নীরুর হাতের মাপ নিয়ে যাও।"

নীলাম্বর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা হবে এখন—কাল আগে কন্যা আশীর্ব্বাদ হয়ে থাক।"

পরের দিন সকালে তিনখানি মোটর গাড়ী আসিয়া নীলাম্বরের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া হীরেন বাবু আর অরুণের খুল্লতাত মহাশয়কে সাদরে নামাইয়া আনিলেন। অরুণের বাড়ীর দারোয়ান অনবরত জিনিষপত্র অপর দুই গাড়ী হইতে নামাইতে আরম্ভ করিল। হীরেনবাবু গাড়ী হইতে একটি বড় সুটকেশ ও দুটা ছোট অ্যাটাচি কেস নিজে নামাইয়া ঘরে রাখিলেন।

নীলাম্বর অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। প্রথমেই হীরেনবাবু নীলাম্বরবাবুকে জগত্তারিণী দেবীর পত্র দিলেন। পত্রেতে 'নিরীক্ষণী'র জিনিষপত্রের সব ফর্দ্দ—দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতে নীলাম্বরের

গর্দ্দভ ও চালক (ঈশপের গল্পের অনুসরণে)

নামে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দেড় হাজার টাকার একখানি চেক্। গহনা দুই সেট করিয়া, প্রত্যেক দফায় এক সেট সাধারণ গহনা আর এক সেট জড়োয়া গহনা। বেনারসী হইতে সকল প্রকার শাড়ী—এত যে নীহারিকা চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিধান করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। নমস্কারী ইত্যাদি বাসন—রূপার, কাঁসার—কত আর বর্ণনা করা সম্ভব।

নীলাম্বর বুঝিলেন 'নিরীক্ষণী'র পূর্ব্বে কেন নীহারিকার গহনা ইত্যাদি জগত্তারিণী প্রস্তুত করাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। টাকার অভাব আর নাই। হীরেনবাবুরা চলিয়া গেলেন।

সৌদামিনী ধরিলেন শশধরদের নিমন্ত্রণ করিতে তিনি যাইবেন। নীলাম্বর বলিলেন, "তুমি আর যাবে কেন, আমি বলে আসব এখন—যে ভাবে খুকীর বিয়েতে বাড়ী চাইতে…"

সৌদামিনী বলিলেন, "তোমার ঐ দোষ, শশধর ঠাকুরপো তোমার মেয়েকে রেখেছিলেন, যত্ন করেছিলেন যথেষ্ট বৌমা, মেয়ে দেখিয়েছিলেন তাঁরা। সেটা মনে করে—তুমি তাদের কি করেছ? কার দোষ সেটা না দেখে কার কি গুণ সেইটেই দেখা উচিত, আমি ত তাই মনে করি।"

নীলাম্বর বলিলেন, "তাই বলে ও রকম বাড়ীতে জায়গা নেই বলে।"

সৌদামিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ চটোনা, শশধর ঠাকুরপোর আর এমন আর হাতী ঘোড়া নয়—"

আবার নীলাম্বর চটিয়া বলিলেন, "আমি ত তার কাছে টাকা ধার করতে যাই নি।"

সৌদামিনী বলিলেন, "সবটা শোন আগে। আমি কি তাই বলছি? বলছি যে এমন হাতী-ঘোড়া আর নয়, আর আমরাও গরীব, অভাবের সংসার আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ওঁর বাড়ীতে যদি কিছু টাকা কম পড়ে যায়, ওঁর ঘাড়ে যদি কিছু ঝুঁকী পড়ে এই ভয়ে। যা ব্যাপার তার পর ঘটেছে ও কালও ঘটেছে এ সব ভৌতিক কাণ্ড, আমাদের চোখে এ সব দেখিনি, নিরীক্ষণী যে এই ব্যাপার তা তুমিও কল্পনা করতে পার নি, আর আমিও পারিনি, শশধর ঠাকুরপো কি করে বুঝতে পারবেন?"

নীলাম্বর বলিলেন, "যে সহানুভূতি সুরেশ দেখালে, খিদিরপুরে ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক, সেই বৈষ্ণব হরিভক্ত, দেখালেন তার সিকির সিকিও যদি নিজের—"

সৌদামিনী বলিলেন, "ছিঃ ছি, অন্যায় রাগ কর না, সুরেশবাবু হয়ত একজন খাপছাড়া আদর্শ লোক—চল চল আমায় নিয়ে চল।"

নীলাম্বর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বেশ চল।"

তাহার পরের দিন তাঁহারা কলিকাতায় আসিলেন। নীলাম্বর সৌদামিনী, শশধর ও ভ্রাতৃবধূর নিমন্ত্রণ করিলেন। শশধরও প্রতিশ্রুতি দিল যে, তাহারা নিশ্চয়ই সকলে যাইবে।

নীলাম্বর যখন বিদায় গ্রহণ করিবার সময় শশধরের যাতায়াতের খরচ স্বরূপ তিনটি দশ টাকার নোট শশধরের হাতে গুঁজিয়া দিলেন তখন সে প্রথমে 'না না' করিয়া শেষে তিনটি নোট পকেটস্থ করিল।

তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর শশধর বিস্মিত হইল। সে ভাবিল এত টাকা নীলাম্বর কোথায় পাইলেন, যাহাতে শ্রীরামপুরে জাঁকজমকের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন।

শশধর কখনও ভাবে নাই যে, সংসারে কাহাকেও দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতে নাই। আজ যে দরিদ্র আছে কাল সে ধনী হইতে পারে, আবার আজ যে ধনী আছে কাল সে পথের কাঙ্গাল হইতে পারে। সেই কারণে যে আত্মীয়ের প্রচুর অর্থ, মোটর গাড়ী ও টেলিফোন আছে, শুধু তাহার বাড়ী আশী মাইল দূরে হইলেও বাস, ট্রাম, ট্রেন ডিঙ্গিয়া ঘন ঘন উপস্থিতি দেওয়ার উন্মত্ততা থাকা উচিত নহে, আর যে আত্মীয় হয়ত গরীব, মোটর গাড়ী বা টেলিফোন নাই, শুধু আছে প্রাণের নিরাড়ম্বর ভালবাসা, তাহাকে উপেক্ষা করা হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক।

১১

আজ নীহারিকার বিবাহ। বরযাত্রী সর্ব্বশুদ্ধ জন দশেক আসিয়াছে। অরুণের ভাগিনেয় বটুল নীতবর হইয়াছে। নীলাম্বরের পুরান বাড়ী হইলেও, বরের অঘোর ডাক্তারের পরামর্শে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে আধুনিক কল-রাজের রকাননে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাগানের ভাঙ্গা দেওয়ালও

যেন সুন্দর দেখাইতেছে আলোর-অপূর্ব্ব খেলাতে। নহবৎ বাজিতেছে। বরকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

এই সময়ে দুইটী বাস বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিয়াছিল যে, বরযাত্রী আসিয়াছে। কিন্তু বাসের গায়ে খাবারের দোকানের নাম লেখা থাকাতে আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই দুই বাস-ভরা দধি-সন্দেশ-ক্ষীর কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, পাঠাইয়াছেন জগত্তারিণী।

নীলাম্বরের বন্ধু সুরেশ খিদিরপুর হইতে আসিয়াছে একদিন আগে এবং সেই সব তত্ত্বাবধান করিতেছে। সুরেশ সব নামাইল বাস হইতে।

শশধর ও তাহার ভ্রাতারা ও মহিলারা বিবাহের দিন বৈকাল বেলা আসিলেন। নীলাম্বর অবশ্য আদর আপ্যায়ন যথেষ্ট করিলেন। কিন্তু এ আদর আপ্যায়নের মধ্যে একটু শুষ্কতা লক্ষ্য করা গেল। নীলাম্বর যে শশধরের পূর্ব্ব ব্যবহারে বেশ ব্যথিত হইয়াছেন তাহা গোপন করিতে পারিলেন না।

সুরেশ সমগ্র বিধি-ব্যবস্থা চমৎকার সুসম্পন্ন করিতেছে। নিতাই-দা বরযাত্রীদের চা-পান ইত্যাদি দিতেছেন। অঘোর ডাক্তার শ্রীরামপুরের বৃদ্ধ মহলের মধ্যে শ্যামমাধব বাবুর গুণাবলীর কথা বলিতেছেন। যে ঘরে বর আসিয়া বসিয়াছিল, সেই ঘরে শ্যামমাধব বাবুর সুন্দর তৈল-প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

শশধরকে সুরেশ খুব খাতির করিতেছে, চা, পান, সিগারেট ইত্যাদি দিতেছে, শশধরের কিন্তু ভাল লাগিতেছে না। সে এ বিবাহে যে নেহাৎ বাহিরের লোকের ন্যায় আসিয়াছে তাহা যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিতেছে।

যাহা হউক যখন কন্যাকে সাত-পাক ঘুরাইবার জন্য পিঁড়ি উঠাইতে নীলাম্বর শশধর ও তাঁহার ভ্রাতাদের ডাকিলেন, তাহারা যেন সকলেই বেশ সুস্থ বোধ করিল।

পুরমহিলাদের সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সমাগম হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী, যিনি এই তিন চারি বৎসরের মধ্যে নিকটে থাকিয়াও কখন সংবাদ লওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই, তিনিই আজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সর্দ্দারী করিতেছেন। মজুমদার-দুহিতা—যিনি জড়োয়া গহনা যে স্ত্রীলোকের গায়ে নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন না, তিনিও আজ "বৌমা এ পিঁড়ি-টা ঐ খানে রাখো"—"এ আল্‌পনা ঠিক হয় নি" ইত্যাদি পরামর্শ দিয়া সৌদামিনীকে উদ্‌ব্যস্ত করিতেছেন এবং তাঁহার বিরাট শরীরকে কষ্ট দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও ভাঁড়ারের খবর লইতেছেন।

বালিকা বন্ধুরা—যাহারা নীহারিকাকে এতকাল উপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছে, যে-হেতু তাহার পিতার এমন পয়সা নাই যে, কন্যাকে স্কুলে পাঠান ও লেখা-পড়া কিছু হউক আর নাই হউক, শাড়ী ও স্যাণ্ডাল পরিবার কায়দা-কানুন শেখার ও অকালপক্ক হইবার সুবিধা কন্যাকে দেন নাই—সেই বালিকারাই নীহারিকার সহিত ঘনিষ্ঠতা জানাইতে ব্যগ্র। হালদারের মেয়ে, যে কখনও প্রসন্ন মনে নীহারিকার সহিত বাক্যালাপ করিত না, সেও তাহার নিকটে বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পাখা লইয়া বাতাস করিয়াছে।

সমগ্র বাড়ী হাস্য-কলরবে মুখরিত। দরিদ্র নীলাম্বরের পুরান বাটিতে আজ যাহা ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা কোন বিশিষ্ট ধনীর গৃহে ব্যবস্থা হইলেও অশোভন হইত না।

আফিসের বড় সাহেব ও ছোট সাহেব আসিয়া কন্যাকে ও জামাতাকে দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন ও রূপার টি-সেট্ ইত্যাদি উপহার দিয়াছেন। ছোট-সাহেব একটু বেশী উপহার দিয়াছেন, কারণ ছোট সাহেব নীলাম্বরকে ঠিক অধীন কর্ম্মচারী হিসাবে দেখিতেন না।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে আকাশ নির্ম্মেঘ, নক্ষত্র-খচিত, বসন্তের মৃদুমন্দ পবনে, কুসুমের সৌরভে, হাস্যময়ী বৃক্ষরাজির শ্যাম পুষ্পের শোভা আলোকে বিচ্ছুরিত হইয়া নীহারিকা-অরুণের জীবনের যৌবন-নিকুঞ্জে মধুময় আবেশ আনিয়াছে।

হিন্দুর বিবাহ—আইনে রেজেষ্ট্রী করা কবুলিয়ৎ নহে, হিন্দুর বিবাহ—তাহা ত নর-নারীর পূর্ব্ব হইতে প্রচুর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, বিচার-অবিচার-অনাচারের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় না। তাহার বিবাহ স্বীকৃত, আত্মীয়-স্বজনের সুবিবেচিত। হিন্দুর বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ শুধু এ জন্মের নহে, জন্ম-জন্মান্তরের।

তাই বিবাহিত জীবনে যদি অশান্তির ঘনঘটা কখনও তাহাদের জীবনে আসে, উভয়েই ভগবানের বিধান বলিয়া এই অশান্তির মেঘকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হয়। উভয়েই

অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া বাদ-বিসংবাদের সামঞ্জস্য করিয়া লয়।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিবাহের প্রথা অনুসারে নিজে ভাবী স্ত্রী ও ভাবী স্বামী যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগে নিজেদের যুগল-মিলন সম্পাদন করেন, তখন বিবাহের পরে অশান্তি আসিলে সে অশান্তি যে উভয়ের সৃষ্ট, ইহাই মনে হয়।

বিবাহ হইয়া গেল। বাসর ঘরে শ্যালিকা-সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অরুণকে বিরক্ত করিবার মত মহিলা যথেষ্ট ছিলেন।

অরুণ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে যথেষ্ট মিশিয়াছে, অনেক বান্ধবীর সহিত মেলা-মেশা করিয়াছে, অনেক বান্ধবীর বাটীতে টেবিলে খানা খাইয়াছে, হয় ত এই আপাতমধুর চাকচিক্যের জোয়ারে ভাসিয়া যাইত, যদি মাতৃভক্তি না থাকিত।

তাহার চক্ষুর সম্মুখে আজ উদ্ভাসিত হইল এক বিভিন্ন জগৎ, এক বিভিন্ন সমাজ, সে সমাজের প্রাণে বাংলার সরস মাটী মিশিয়া আছে; যে সমাজের পশ্চাতে আছে যুগ-যুগান্তরের এক শ্রেষ্ঠ জাতির প্রভাব; যে সমাজ আজকালের পরিবর্ত্তনে যতই হেয়, যতই নগণ্য হউক না কেন, তাহাতে জাতির সংস্কারের স্বর্ণচ্ছটা ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলোর ন্যায় আজও দৃশ্যমান।

অরুণ ভাবিতেছে, তাই ত যার মত কি সবই ঠিক? তবে তাহার আশে পাশে কি সব দেখে প্রত্যহ? সে কি সবই মায়া, মিথ্যা, ভ্রান্তি?

অরুণ সুবিধা পাইলেই ঘোমটার মধ্য দিয়া যেটুকু নীহারিকার মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া কি আনন্দই পাইতেছে! হিন্দু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই খেলা জীবনভোরই চলে।

হায়, এই বিরহ-মিলনের প্রাণপূর্ণ সজীব অভিনয় হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জীবনভোর যে যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি আজ পাশ্চাত্যের ধার-করা মেকী ঝুটো মুক্তা কোর্টশিপের কাছে ম্লান হইবে? কখনই নহে। প্রথমে কোর্টশিপ তার পর হানিমুন, এ সব ইন্দ্রিয়-প্রধান মানুষের অভিব্যক্তি, ইহাতে অসংযম, চিন্তাহীনতা, অধীরতা দৃষ্ট হয়। ফলে বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট; স্বামী অন্য নারী চাহেন, নারী অন্য পুরুষ চাহেন; শুধু চাহেন না এইরূপ ভাবে স্বামী-স্ত্রী বিভিন্ন প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর সহিত কালযাপন করেন; যতদিন সহ্যের সীমা অতিক্রম না করে, ততদিন উভয়ে কোন রকমে ঠাট বজায় রাখিয়া চলেন, কিন্তু যখন তাহাও সম্ভব হয় না, তখন বিবাহচ্ছেদের মামলা হয়। এই মামলার সংখ্যা এত ভয়াবহ ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সে দেশের বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জাতির অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। আর আমরা সেই প্রথা যাহাতে আমাদের সমাজে চলে তাহার জন্য ব্যগ্র। প্রকৃতির কি কঠোর পরিহাস অরুণ এ বিবাহে বিশেষ প্রীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

হীরেন বাবু যখন বলিলেন, "কি খোকা, এখন কেমন মনে হচ্ছে? তখন ত খুব তর্ক করেছিলে? এ বিয়ে ভাল নয়? আমি বিলেত-জার্ম্মানী ঘুরে এসেও ত তোমার দিদীকে না দেখেই একদিন যে বিয়ে করেছিলাম তার জন্য তো এতটুকুও কষ্ট হয় না, আর আমরা যে বিবাহিত জীবন করব চেয়ে কম সুখী তাও ত মনে হয় না।" অরুণ কোন কথা না বলিয়া ভগ্নীপতির মুখ চাপিয়া ধরিল।

কন্যা বিদায়ের সময় আসিল। নীহারিকা কাঁদিয়া আকুল। বয়সও বিশেষ বেশী হয় নাই বা এমন আধুনিকা হয় নাই যে লোক দেখান দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া মোটরে গিয়া বিবাহের পরই স্বামীর সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইবে? সে বালিকা বধূ, তাহার চোখের জল বাধা মানিতেছে না। সে বিবাহের দিনও কখন গিয়া পাখীকে ছোলা দিয়া আসিয়াছে, কখন পুষীকে দুধ দিয়াছে, কখন নেড়া শিশু ছোট ভাইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। পাঁচু কিন্তু স্ফূর্ত্তিতে আছে, দিদির সঙ্গে যাইবে। ইঁদুর মুখ ভার করিয়া সৌদামিনীর আঁচল ধরিয়া ঘুরিতেছে ও কাঁদ কাঁদ স্বরে "মা মা" বলিতেছে।

সৌদামিনী চোখের জলে কন্যাকে বিদায় দিলেন। নীলাম্বরের দুই চোখ হইতে প্রবল জলধারা বহিয়া পড়িতেছে, তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি মা—আমি গিয়ে ও হপ্তায় তোমাকে নিয়ে আসব।"—শশধরের স্ত্রী ও বধূরা আশ্বাস দিলেন। কিন্তু সৌদামিনীর মন মানে না। হাস্যোজ্জ্বল বিকশিত শতদলের ন্যায় নীহারিকার শুভ্র আনন আজ সজল, ম্লান! বিজয়া-দশমীর প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দৃশ্য আজ যেন নীলাম্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

সাহিত্য ও সমাজ

—শ্রীবিমলেন্দু সান্যাল

সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানব-মনের যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ভাব ও ভাষার সাহায্যে লেখনীমুখে প্রকাশিত হয়—মোটামুটি বলিলে তাহাই সাহিত্য। সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে সমাজের গভীরতম অন্তরের কথা সাহিত্যের মধ্যেই প্রকাশ পায়। সমাজের আদর্শ, সমাজের সমস্যা বা দোষ ত্রুটী সাহিত্যের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; সাহিত্য সমাজের একটি অঙ্গস্বরূপ।

"সমাজ মাত্রেই অতি গুরুতর বস্তু, বৌদ্ধেরা সমাজকে 'সংঘ' বলিয়া এবং কোম্‌টিষ্টরা 'হিউম্যানিটী' বলিয়া অতি পূজনীয় পদার্থ বিবেচনা করেন; যুক্তি এবং শাস্ত্রমতেও সমাজ শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজটি অতি গৌরবেরই বস্তু।"

মানব-হৃদয়ের একটি সহজধর্ম্ম পরস্পর মিলিত হওয়া এবং সামাজিক মিলনের মধ্য দিয়াই মানব-জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা ফুটিয়া উঠে; কিন্তু সাহিত্য ব্যতীত এই মিলন কখনও সুসম্পন্ন হয় না, সেই জন্য সাহিত্যের ভিতর একটি মিলনের সুর ঝঙ্কৃত হয়। 'সহিত' শব্দ হইতেই 'সাহিত্যে'র উৎপত্তি; সুতরাং কেবল মাত্র 'সাহিত্য' এই কথাটির মধ্যেও একটা মিলনের ভাব বর্ত্তমান। "অন্য সকল মিলনের মধ্যে বিরোধের বীজ নিহিত আছে, আঘাত-প্রতিঘাত আছে, কিন্তু সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে মিলন সেখানে বিরোধের অবকাশ নাই।"

সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"সাহিত্যের মিলন যে কেবল ভাবে ভাবে, ভাষায় ভাষায়, গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগ সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে, যে-দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাঁহারা বিচ্ছিন্ন।"

কোনও জাতির সাহিত্য আলোচনা করিলেই সেই জাতির সামাজিক সভ্যতার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। অধিকন্তু জাতির অন্তরের ভাবধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাও সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যেই অনুভব করা যায়। সকল দেশের সাহিত্যই জনসাধারণের একটি অমূল্য সম্পদ, কাজেই, ইহার উন্নতি করা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভাষার সাহায্যে আমরা নিজেদের মনোভাব অপরকে জানাই এবং অপরের মনোভাব জানিতে চেষ্টা করি। স্বদেশের ও বিদেশের অতীত ও বর্ত্তমানের সঞ্চিত জ্ঞানসমূহ আমরা লিখিত ভাষার সাহায্যেই লাভ করিতে পারি। সাহিত্য-আলোচনায় কেবল যে ব্যক্তিগত মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশ হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা সমাজ-জীবনেও উন্নততর বিচার-বুদ্ধি, চিন্তা-শক্তি ও দূর-দৃষ্টি লাভ করা যায়। বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য তাহা বিতরণ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সাহিত্যের সহিত সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সমাজের অগণিত জনসাধারণের গতি নূতন পথে পরিচালিত করিতে হইলে, সকল রকম বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের মধ্যেই এই আশার সঞ্চার হওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যের আদর্শ ও প্রভাব যে জনসাধারণের মনে কতখানি কাজ করে, ফরাসী-বিপ্লবের কাহিনী পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ফরাসী-বিপ্লব ঘটিয়া সমগ্র ইউরোপের শাসন-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল, তাহার মূলেও সাহিত্যের প্রভাব ছিল। রাজশক্তির অত্যাচারে প্রজারা যখন মর্ম্মে মর্ম্মে নিষ্পেষিত ও নিরুপায় হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে রাজশক্তির ধ্বংস কামনা করিতেছিল, সেই সঙ্কট-সময়ে এক ফরাসী সাহিত্যিক তাঁহার পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিলেন যে,

একদিন যাহা তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, সেই শাসন-যন্ত্রকে ধ্বংস করিবার অধিকার তোমাদেরই আছে। সাহিত্যের এই প্রচার অতি সত্বর ফরাসী প্রজাশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া চিরদিনের জন্ম রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইল। সাহিত্যই জাতিকে মুক্তির উপায় ও কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

কিছুকাল হইতে ভারতে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়াছে, যখন ইহার কোন সম্ভাবনাই সাধারণের মনে জাগে নাই, তখনই আমাদের সাহিত্যে ভাবী আন্দোলনের ছায়া পড়িয়াছিল। আমাদের জীবনের চতুর্দ্দিকেই বন্ধন, এই বন্ধন হইতে মুক্তির জন্ম আমরা যখন প্রথম জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইলাম, তখন হইতেই আমাদের কাব্যে, সাহিত্যে দেশপ্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠিল। বঙ্কিম সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বদেশের একটা বৈশিষ্ট্য কল্পনার তুলিতে রঞ্জিত হইয়া আমাদের প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিল; আমাদের অন্তরে স্বদেশ-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিল; আমরা সশ্রদ্ধ ও সচেতন হইলাম। অতএব বঙ্কিম-সাহিত্যই আমাদের জাতীয় জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

কবি যখন কাব্য রচনা করেন, ঔপন্যাসিক উপন্যাস লেখেন, সে সময় হয় ত তাহা অনাবশ্যক ও অর্থহীন মনে হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে উক্ত কাব্য বা সাহিত্য সমাজে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

সাহিত্য-সৃষ্টির আদিতে মানুষ যখন নিজের মনের কথা সাজাইয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, তখনই হয় কথা-সাহিত্যের গোড়াপত্তন, কিন্তু সে সময় এই সকল বিষয়ে আলোচনার অনেক বাধা-বিঘ্ন ছিল বলিয়া, ছড়া, পাঁচালি, রূপকথা, মনসা-ভাসান, কবি বা তর্জ্জা গান ইত্যাদি নামে তখনকার সাহিত্য লোকের মুখে মুখে চলিত। এখনও দূর পল্লীগ্রামে তাহার কোন কোন অংশ প্রচলিত আছে। সাধারণ জীবনকে অবলম্বন করিয়া গ্রাম্য কবিদের এই যে অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় সাহিত্য ও কাব্য সৃষ্টি—ইহাকেই গ্রাম্য সাহিত্য বলা যায়।

সাহিত্যের একটা আদর্শ থাকা দরকার। বাস্তব জীবনের সঙ্গে চিন্তা ও কল্পনার সামঞ্জস্য রাখিয়া সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ সাহিত্যে ফুটাইয়া তোলা প্রয়োজন। সামাজিক জীবনের সহিত কল্পনার সমন্বয়-সাধনই সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থকতা। মানুষের মনের মালিন্য দূর করিয়া সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করাই সাহিত্যিকের লক্ষ্য।

যখন সাহিত্য শৌর্য্যে, বীর্য্যে উদারতায় মহিমান্বিত আদর্শ পুরুষ এবং স্নেহে, প্রেমে, দয়া দাক্ষিণ্যে কল্যাণময়ী নারী-চরিত্র সৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন আদর্শ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া জন-সাধারণ আপন আপন চরিত্র গঠনের প্রয়াস পাইত। রাম, কৃষ্ণ, ভীষ্ম, সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা প্রভৃতি আদর্শ পুরুষ ও নারী-চরিত্রগুলি অদ্যাবধি অমর হইয়া আছে। সেই সব চরিত্র আলোচনা করিলে এখনও সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় অন্তর পূর্ণ হয়। সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা সেকালের নিখুঁত সমাজচিত্র দেখিতে পাই। সাহিত্যিকের দূরদৃষ্টি বিশেষ দেশের ও বিশেষ কালের অতীত, তাই বলিয়া তিনি যে, দেশ, কাল ও পাত্রকে অগ্রাহ্য করেন তাহা নহে, দেশ, কাল ও পাত্ররূপ মাল-মশলা লইয়াই একটা সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন অসীম জিনিষ—বিশ্ব-সাহিত্যকে গড়িয়া তোলেন।

নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করিয়া সমাজের কল্যাণ-সাধন করাই যেমন প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শ ছিল, বর্ত্তমান সাহিত্যে কিন্তু ঠিক সেই উদ্দেশ্যটি পাওয়া যায় না। আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা বিভিন্ন ধরণের। সামাজিক চালচলনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ভাবধারা ও অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। সেকালের সাহিত্যে আমরা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কল্যাণের সমাবেশ দেখিতে পাই। আধুনিক সাহিত্যিকরা চাহেন কেবল তথাকথিত বাস্তব সত্য, সে সত্য যদি নির্লজ্জ, অসুন্দর ও অকল্যাণকর হয় তবুও।

সকল দেশের সাহিত্যেই কতকগুলি সামাজিক সমস্যা-মূলক উপন্যাস আছে, আমাদের সাহিত্যেও অতি অল্পদিন হইল এইরূপ সমস্যা-মূলক উপন্যাস সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সমাজবিধির কঠোরতায় যখন আমরা অন্তরে অন্তরে প্রাপ্ত হই, তখন পুরাতন সংস্কার ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অন্তর তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাবই সমস্যা-মূলক উপন্যাসের প্রাণ। জীবনের যাত্রাপথে যে সমস্যাগুলি আমাদের কাছে অতি নিষ্ঠুর ভাবে সত্য হইয়া উঠে, তাহার সমাধান করাই এই জাতীয় উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

এই শ্রেণীর লেখাও সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসাধন করিয়া থাকে। অনশন ও দুঃখ-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত শ্রমিক ও কৃষকদিগের বুকভরা বেদনা ও হাহাকার এই শ্রেণীর সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে। সমাজের উপেক্ষিতা, চিরবঞ্চিতা হতভাগিনীদের মর্ম্মব্যথার ইতিহাসও আমরা এইরূপ সাহিত্যেই দেখিতে পাই। সকল দেশেই, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে, ধনী সম্প্রদায় মুষ্টিমেয়মাত্র, দরিদ্র জনসংখ্যাই বেশী, সুতরাং যে লেখক মানবের বেদনার দিক্‌টা যত ভাল আঁকিতে পারেন, দরিদ্রের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি যত বেশী ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন, তাঁহার লেখার পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও তত বেশী হয়।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ-স্বরূপ। সমাজের গতি যখন যেমন হয়, সাহিত্যেও তদনুরূপ ছায়া পড়ে। সাহিত্যিক যে-সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মনের গঠনও সেই সমাজের প্রকৃতি গ্রহণ করে এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার লেখার মধ্যে সেই সমাজের ভাব ও চিন্তা বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়, সুতরাং সাহিত্যের উপর সমাজের প্রভাব এবং সমাজের উপরও সাহিত্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

আজকাল শিশু-সাহিত্য নামে সাহিত্যের একটা শাখা সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা যে মঙ্গলের সূচনা সন্দেহ নাই। শক্তিমান লেখকের হাতে যে শিশু-সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহা অশেষ কল্যাণের আকর। প্রত্যেকটি বালক-বালিকাই দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা, দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতি, ভালমন্দ ইহাদের উপরেই নির্ভর করে। সৎসাহিত্য যেমন শিশুদের কোমল মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে, এমন আর কিছুতেই করে না।

সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতির পথ-প্রদর্শক। মানব-চরিত্রের উপর সাহিত্যের প্রভাব অনেকখানি। সৎ-সাহিত্যের প্রভাব মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে, আবার কুসাহিত্য অনেক সময়ে প্রলোভনের প্রবল আকর্ষণে মানবকে দানবে পরিণত করিতে পারে। সুতরাং সাহিত্যিকের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। এই দায়িত্বজ্ঞানের অণুমাত্র বিচ্যুতি ঘটিলে সমাজে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সাহিত্যের মধ্যেই আমরা নির্ম্মল আনন্দ লাভ করি সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র আনন্দদানই সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে; আনন্দ-দানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়-মনের উৎকর্ষ সাধন ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করাই প্রকৃত সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সুতরাং শক্তিমান সাহিত্যিকেরা যদি জনসমাজের মঙ্গল-সাধন-উদ্দেশ্যে উন্নত, উদার চরিত্র অঙ্কিত করিয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিতে মনোযোগী হইয়া লেখনী ধারণ করেন, তবেই জনসাধারণের অন্তর সৎসাহিত্যের প্রভাবে পবিত্র, সংযত ও নির্ম্মল হইতে পারে এবং সাহিত্যের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। সাহিত্য সমাজকে যে-রস পরিবেশন করিবে, তাহা যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। কেবলমাত্র উপন্যাস ও কাব্যেই সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হয় না, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রবন্ধ, গল্প, কাব্য, উপন্যাস, আলোচনা, সমালোচনা প্রভৃতি সকল-গুলিরই সমাবেশ সাহিত্যে প্রয়োজন হয়। যাহা সমাজ বা জাতির পরিপন্থী, সাহিত্যে তাহার স্থান হওয়া উচিত নহে, কারণ আজ হউক বা দু'দিন পরে হউক, এইরূপ সাহিত্যের প্রভাব সমাজ-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। সাহিত্যিকের কেবল নির্ম্মল আনন্দ-রস সৃষ্টি করিলেই চলিবে না। এই দিকেও দৃষ্টি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

যখন সমাজের যেরূপ গতি হয়, তখন তদনুরূপ সাহিত্যই গড়িয়া উঠে; যে ঝড়-ঝঞ্ঝা সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যায়, সাহিত্যে তাহারই প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। সমাজে যখন জড়ত্ব আসে, তাহার অনুভূতি ক্ষীণ ও শক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া আসে, তখন জাতিকে নূতন মন্ত্র শুনাইবার জন্য নূতন সাহিত্যের প্রয়োজন হয়। সাহিত্যই যুগে যুগে জাতির প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ক্রমশঃই নির্জ্জীব ও পঙ্গু হইয়া আসিতেছে, এই সময় আমাদের সমাজকে নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করিবার জন্য, আশা-উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য দেশের বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের অনেকখানি দায়িত্ব আছে।

বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের কাছে এমন সাহিত্যই সমাজ আশা করে, যাহা উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রের মত ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি-সাধনার পথপ্রদর্শক হইতে পারে, জাতির মৃত প্রায় প্রাণে জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিতে পারে এবং সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসন লাভ করিয়া ধন্য হয় ও সমাজকে সার্থক করিয়া তোলে।

—শ্রীপ্রভারাণী মুখোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় প্রতিশ্রুত বিষয়গুলি লইয়া একটু আলোচনা করা যাক প্রথমেই। ঘুম-পাড়ান ছড়া-গান বাংলার সর্ব্বত্র বহুল প্রচলিত, উহাদের মধ্যে অনেক ছড়া এবং গান শিশু-মনের উপযোগী নহে। সুমাতা সুনির্ব্বাচিত গান ও ছড়া ছাড়া শিশুকে যাহা পাইবেন তাহাই যেন না শোনান। কারণ শিশুমনের অবচেতন স্তরে তাহার শৈশব-জীবনের ঘটনাবলী গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়, ইহার ফল সুদূর-প্রসারী। বহু শিশু এইরূপ ছড়া, গান, গল্প শুনিয়া ভূতের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকে। ভূতের হয়ত অস্তিত্বই নাই, কিন্তু যে শিশু শৈশবে ভূতের গল্প শুনিয়াছে, সে সারা জীবনেও ভূতের ভয় মন হইতে দূর করিতে পারিবে না। আমার নিজেরই জীবনে দেখিতেছি, আমার পিসিমা বাল্যকালে আমাদের খিড়কীর পুকুরের পাশের একটা তালগাছ দেখাইয়া বলিতেন, ঐ দেখ—

একানড়ে তালবেড়ে তালগাছে থাকে
মানুষের রক্ত নিয়ে গায়ে তেল মাখে

এই অদ্ভুত ছড়াটির প্রভাবে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরেও সন্ধ্যাবেলা ঐ তালগাছটির নিকট দিয়া আসিবার সময় আমার গাটা 'ছাঁৎ' করিয়া উঠে। ঐ ছড়ার এবং পিসিমার অন্য অনেক ছড়ার কুফল আমি জীবনে ভোগ করিয়াছি, তাই সকলকে সাবধান হইতে বলি। যে-সব ছড়া সুন্দর অর্থযুক্ত, অথবা একেবারেই অর্থহীন শব্দঝঙ্কার, শিশু-মনের পক্ষে তাহাই উপযোগী। আমার মা কোন একটি আধুনিক কবির রচিত ছড়া আমার পুত্রকে শোনাইতেন,

—বর্ষা এসো বৃষ্টি এসো, এসো মেঘের মেয়ে
ধানের শিশু উঠুক তোমার সজল জলে নেয়ে।

ছড়টি চমৎকার এবং অর্থগৌরবে সুমহান। *এইরূপ বহু ছড়াই আধুনিক কবিদের রচনা হইতেও বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ কালে এইরূপ গানের অভাব নাই—

মা যদি তুই আকাশ হতিস আমি চাঁপার গাছ
তোর সাথে মোর বিনি কথায় হোত কথার নাচ—রবীন্দ্রনাথ।

অথবা আধুনিক কবির—

রাজপুত্তুর এলো গো মা, টগবগিয়ে ঘোড়া,
বনের পথে ছুটলো গো মা, হরিণ-হরিণী জোড়া;
রাজপুত্তুর তীর ছুঁড়েছে, হরিণ গেল মরে
হরিণী আর গভীর বনে ফিরবে কেমন করে।
রাজপুত্রের কাছে এসে হরিণী কয় ভাই,
ঘরে ফিরে যেতে আমার একটুকু মন নাই।
অমনি করে তীর ছুড়ে দাও, আমিও যাই মরে
রাজপুত্তুর ভাবে—ওকে জ্যান্ত নেব ধরে।
রাজার ছেলে বললো তাকে পেতে দড়ির ফাঁদ
রাজকন্যার কাছে দিয়ে কিনবে পরমাদ।
চোখের জলে কয় হরিণী—কোথায় যাবি নিয়ে;
রাজার ছেলে হেসে বলে—আজ আমাদের বিয়ে।

এইরূপ ছড়ার মত বহু সুমিষ্ট ও সুঅর্থযুক্ত কবিতা ছড়া-গানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কবিদের অজ্ঞাতসারে ছড়াগান রচিত হইতেছে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। বাছিয়া উহাদের বাহির করিয়া লইতে পারিলে, অতীত যুগের ছড়া হইতেও উৎকৃষ্ট গান পাওয়া যাইতে পারে। তবে অতীত যুগের ছড়াগুলি মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত এবং তাহাদের সুরও প্রত্যেকের পরিচিত, সেই জন্য বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি ছড়া উদ্ধৃত করিলাম :—

১। ডালিম গাছে কুকড়ো নাচে—ঝুমঝুমাঝম্
চাকরী পাবে বলে ভাই সিলেট চলে গেছে।

দাদার গলায় তুলসীদানা
বৌ পালাইছে চাঁদের কোনা,
দাদা তোমার পায়ে পড়ি
এটু এ্যাটা বৌ এনে দাও খেলা করি ॥

২। এটুটুকু ঘরখানা বেতের বাম্বুন,
তারই মধ্যি বসে থাকে ময়না বিবির কান্দুন।
আর কেঁদো না ময়না বিবি বেলা হোল শেষ,
বাপ্-মায়েকে সালাম দিয়া চল আপন দেশ।

৩। কাঁতলা উঠিয়া বলে, আমরা দুটি ভাই,
রাজকর্ত্তা বাড়া ভানে, আমরা গান গাই,
আরহুলি উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড়,
আমাকে দিয়া গেরস্থের ধানচাল গুঁড়া কর।
ঢেঁকি উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড়,
আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করে পার;
সাপটা (ঝাড়ন) উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড়,
আমাকে দিয়া ধান চাল পরিষ্কার কর।

৪। ঘুঘু মল্লো—ঘুঘু মল্লো আলোচাল খ্যায়া
ঘুঘুর বিয়্যায় যাব আমি লাল সাড়ীখান পিন্ধ্যা।

৫। মায়ে দিল তেল সিঁদুর—বাপে দিল বিয়া,
পরের ব্যাটা ধরে নিয়ে মালকোঁচা দিয়া।

১ম। মাওই তাওই গ্যাছে কোনে ?
২য়। বাঁশ বেড়্যার হাটে,
১ম। ঘরখান নড়ে ক্যান্ ?
২য়। বাবুই মারে ঠ্যালা।
১ম। কান্‌চিৎ কি ?
২য়। গজ বুনেছি
১ম। গজের মধ্যে কি ?
২য়। বেজি পুষেছি, বেজির দৌলতে আমি রাচন শিখেছি।

নিম্নলিখিত ছড়াগুলি নেহাৎ কবি শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী :—

১। বাবা এদ্দিন ছিলে কোনে ?
হলুদ গাছের গোড়ে,
দুখিনী মার দুঃখ শুনে আইছি তোমার কোলে।

২। হোল হোল মাণিক রে,
কে কাল্লো পানিত্ রে—
এত রাতে বাঘের ভয়;
তাও তো মাণিক ভাল রয়,
নিঙুড়ে ভিজিল গাও,
মাণিক তুল্যা কোলে নাও।

৩। মালের ফুল, তিলের ফুল, জামাই গেল কতদুর ?
জামাই এল ঘামিয়া—ছাতা ধর টানিয়া ;
ছাতার উপর জোমলা, দেখ বিবির কমলা,
এন্থান বিবির খাড়া পায়,
জামাই দেখে নিবার চায়।

৪। আতা গাছের পাতা
বৌ কয়না কেন কথা,
কথা কইব কোন ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে
যখন কথার বুঝি হব,
কথায় কথায় তর্ক দিব।

৫। ছোট্ট ছোট্ট করল্লার ফুল,
জামাই যাবে কতদুর ?
জামাই এল ল্যাংটা ভোলা মহেশ্বর
ও গৌরী, করবৌরী-দুই কাণে তোর ঝুমকো পর।
ষাঁড়ের পিঠে চড়ে বা
ছাই-মাখা তোর বরের গা,
তেল যদি নাই, গোবর দিবে নিকুবি
বুড়ো বরের পায়ের তলায় আপনাকে লো বিকুবি।

৬। প্রশ্ন। পান খাও প্যানতা ভাই, কথা কও ঠারে,
পান-চুন-গুপারীর জন্ম কি প্রকারে।
পান খাওয়ার পর যদি না কও কথা,
ছাগ হয়্যা মুড়্যা খাও পড়া গাছের পাতা ?

উত্তর। গুয়া ধরে থোপা থোপা, পান ধরে ঝরে (বরজ)
সেই পান লইয়া বেচে সহরে বাজারে।
পানের উৎপত্তি কথা যদি কৃষ্ণ কয়
দিনে দিনে বাড়ে পত্র যদি বৃষ্টি পায়।

৭। আগে হাঁটে, প্রসাদ বাঁটে, ধরে নৌকার হাল,
বিয়ার যে ঘটকালি করে তার বাপে খায় গাল।

৭নং ছড়াটি একটি উৎকৃষ্ট নীতিকথা। পাঠক-পাঠিকারও ইহা জানিয়া রাখা উচিত। এইরূপ বহু নীতি-কথা বাংলা ছড়ার মধ্যে রহিয়াছে। শিশুমন উহাদের গূঢ়তত্ত্ব শৈশবে না বুঝিলেও পরবর্ত্তী জীবনে এই হিতকথাগুলি তাহার নিকট অমূল্য হইয়া উঠিবে।

৮। গাছতলা গ্যাছিলাম, টিয়া পাখী পাছিলাম,
মা তুমি ক্যান্দ ক্যা, সোণার গলা-ভাঙ্গ ক্যা ?
টাকা দিব বাজায়্যা—বৌ আনব সাজায়্যা।

৯। আতা গাছের পাতা এনো,
দীঘল গাছের গোটা এনো
চুল ধরে তিন-বাঁদী এনো
বিনে দুধের দৈ এনো

এইখানে বুদ্ধির পরীক্ষা হইতেছে। আতাগাছের পাতা=পান, দীঘল গাছের গোটা=সুপারী, চুল ধরে তিন বাঁদী=গলদা চিংড়ি এবং বিনা দুধের দৈ=চুণ। এই ছড়াটির মধ্যে হেঁয়ালী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি হেঁয়ালী উদ্ধৃত করিয়া এবারের মত প্রবন্ধ শেষ করিব। এই হেঁয়ালীগুলি শিশুমনকে চিন্তার খোরাক যোগাইবে। ইহা শিশুদিগকে তুষ্ট করিয়া শান্ত রাখিবার পক্ষে একটি চাতুর্য্যপূর্ণ সুন্দর খেলা।

১। রাজার বেটা সিনান করে তার নেংটি শুকায় না? উত্তর—জিভ, জিহ্বা।
২। রাজার বেটা সিনান করে তার নেংটি ভিজে না? " কচুপাতা বা পদ্মপাতা।
৩। একটু খড়ে ঘরটি বেড়ে (বেষ্টিত হয় পূর্ণ হয়) উত্তর—প্রদীপ।
৪। একমুঠা খড়ে ভুমিয়া বেড়ি............... " সূর্য্য—রৌদ্র।
৫। আয়রে ভাই পাহাড়ে যাই
পাহাড়ে গিয়া লেবু খাই
এ লেবুর বোঁটা নাই। " ডিম্।
৬। কালোয়ার জানোয়ার নিগূঢ়ে থাকে
মাথার উপরে তার তিন তলোয়ার ঘুরে।
কইলও মামদ মকাই—ই কোন্ খণ্ড,
মুখে আণ্ডা পাড়ে, ই কোন জন্তু। " শামুক।
৭। গাছের ডালে পিঠা ঝুলে মাসি পিঠা করে
সে পিঠা খাইতে গেলে গালে চাপড় মারে " মৌচাক।
৮। ইকড়ের তলে তলে ঝিক মানীর ছানি
কোন রাজ্যে দেখে আইছ গাছের উপর পানি। " নারিকেল।
৯। রাজার বাড়ীর ঘোঁড়া এক বিয়ানে বুড়া " কলাগাছ।
১০। কুঁকড়ী শিঙ্গী গাই, বন ভাঙ্গিয়া যাই " কাস্তে।
১১। এই দেখলাম এই নাই, কি কইমু রাজার ঠাঁই " বিদ্যুৎ।
১২। মাটির তলে থাকে বুড়ি সাত পাল্লা কাপড় উড়ি " রসুন।
১৩। এপারে লাল মাটি—ওপারেও তাই
মধ্যের নদী দিয়ে সব কিছু যায় " ঠোঁট-যোড়া।
১৪। বন থেকে বেরোইল ভট
নীচে লাঠি উপরে জট " আনারস।
১৫। উড়িয়া যাইতে পড়িয়া মরে
মোল্লায় পাইলে জবাই করে।
মাংস হারাম সিরা (ঝোল) পাক (খাদ্য)। " মধু।
মোল্লার লাইগ্যা কিছু রাখ
১৬। ছোট বেলা ঘোমটা-ঘুমটা
যৌবন কালে নেংটা " বাঁশের চারা।

এইরূপ বহু সহস্র সুন্দর ছড়া-গান ও হেঁয়ালীতে বাংলার পল্লী-সাহিত্য ভরপুর। অনুসন্ধান করিয়া আধুনিক সাহিত্যিকগণ উহাদের বাহির করিতেছেন। বহু জানিবার বিষয়, পল্লীজীবনের বহুবিধ আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব ঐ সকল ছড়া ও গানের মধ্যে খুঁজিলে মিলিতে পারে। নারীগণ এইরূপ ছড়া যত পারেন সংগ্রহ করিলে তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সুরক্ষিত থাকিবে। ঐরূপ অনেক ছড়ায় বাঙালীর আচারের সুবিস্তৃত এবং সুন্দর বর্ণনা আছে। দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম:—

মাঘে মাধব কৈলা মথুরা গমন,
প্রিয় বিনা শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।
ফাগুনে ফুটিল পুষ্প উঠিল সুগন্ধ
ভ্রমরা-ভ্রমরী নাচে মনের আনন্দ।
চৈতে চাতক পাখী নিকুঞ্জমন্দিরে,
পিয়া পিয়া রব করি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
বৈশাখে যুবতী যত করে দান কলস্ত্র
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জলে খেলতেন বনমালী
শ্যাম অঙ্গেতে জল দিতাম অঞ্জলি অঞ্জলি।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ডাকে ঘনে ঘনে
কালো মেঘ দেখে রাধার কালো পড়ে মনে।
শাওনে জলের ধারা বহে নিরন্তর
রাধার নয়নের ধারা বহে নিরন্তর।
ভাদরে তুফান নদী দুকুল পাথার
পার-ঘাটে খেয়া নাই মা, কে করিবে পার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে সর্ব্ব নর,
এমন সুখের দিনে শ্যাম নাই ঘরে।
সখী তোরে বলি শোন এল কার্ত্তিক মাস
গোবিন্দ গোকুলে নাই—কে করিবে রাস।
অগ্রাণে নূতন ধানে নূতন নবান্ন
অবশ্য আসিবে শ্যাম নাহি তাতে অন্য।
পৌষমাসে পত্র রাধা লিখেন আপন হাতে
পত্র পেয়ে রাধানাথ আসিলেন নৌকাতে।
(অথবা) পৌষে লিখিয়া পত্র দিলাম সখীর করে
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ মোর ব্রজপুরে।

রন্ধন-বিদ্যার জন্য বঙ্গ-মহিলা বহু চমৎকার ছড়া রচনা করিয়াছেন। একটি উদ্ধৃত করিলাম। এই সমস্ত ছড়াগুলি বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকাদের জন্য :

মাঘে মধুর মিষ্টি কচুতে উলো (ভাজা) সীম
ফাগুনে দ্বিগুণ মিঠে বার্তাকিতে (বেগুণ) নীম।
চৈত্রে চাতক ফল খেয়েছিলেন রাম,
বোশেখের সার মাছ—শোল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে আমক্ষীর, আষাঢ়ে কাঁঠাল
শ্রাবণে খৈ-দৈ—ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনে নারিকেলখণ্ড—কার্ত্তিকেতে ওল্।
অগ্রাণে নয়ানৌতুন চিংড়ী মাছের ঝোল।
পৌষে গুড়পিঠে খেতে বড়ো মিঠে
শ্রীকণ্ঠ শ্রীগোবিন্দ দাস-কেমনে বাঁয়রে বার মাস।

রন্ধনে ভুলের ব্যঙ্গ-ছবি কী সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে দেখুন :—

প্রথমেতে রাঁধতে গেলাম আপন মাথা খেয়ে,
হেন কালে শ্যাম দিলেন মুরলী বাজিয়ে ;
মুরলীর বাদ্য শুনে ঘরে টেকে না মন,
প্রথমে ডাল চাপিয়ে তাতে ফেলিলাম বেশন
ডালে দিলাম হলুদ আর অম্বলে দিলাম ঝাল,
খালি হাড়িতে ঝাল দিয়ে ফেলিলাম চাল।
ভাজাভাজা চালের উপর ঢালিলাম জল,
আধভাজা চালগুলি ভাসিল সকল।
আমড়াতে করলাতে তাতে দিলাম বড়ি
রুই মাছের ঝোলে ভুলে ফেলিলাম খাড়ি।
কটু তেলে ভেজে বেগুণ খাঁটিয়া নামালাম,
শিম চাপায়ে তাতে নিম বেঁটে দিলাম।
দুধলাও রেঁধেছি তাতে হিং দিয়েছি গুলে,
অবশেষে ক্ষীর করেছি—নুন দিয়েছি ভুলে—
কালা খাওহে তুমি।

এইরূপ বহু প্রচলিত সুন্দর ছড়া বঙ্গবধূর শিক্ষা করা উচিত।

মানস পূজা

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

ফোটা হৃদয়পদ্মদলে শক্তিময়ি ! বসবে তুমি।
সহস্রারে ঝরবে সুধা পাদ্য তব চরণ চুমি॥
বিবেক-বারিপ্রক্ষালনে মানস হবে অর্ঘ্যডালি।
আচমনীয় ভক্তিধারা প্রেমের ফুলে গন্ধ ঢালি॥
শুদ্ধ হবে রক্ত বসন নাচবে আঁখি রক্তে রাঙি।
শক্তিময়ী মার পরশে দুর্ব্বলতা পড়বে ভাঙি॥
শব্দ সকল গন্ধ হবে চিত্ত সূতে গাঁথব মালা।
মন্থিত প্রাণ সুধাম্বুধি রচে পূজার অন্নথালা॥

নেত্রনীরে স্নানের বারি ভৃঙ্গারের ভকতি ধারা।
অনাহত-ধ্বনির ধ্বনিমধুছন্দে বাজবে কাড়া॥
বাসনা ধূপ দগ্ধ হবে অনুরাগে জ্বলবে বাতি।
চঞ্চলতা চামর বায়ে আরত্রিকে নাচব মাতি॥
বিরাগের যূপের কাঠে কাটি গর্ব্ব ছাগের মাথা।
'জয় মা শক্তি' সমুচ্চারে মহোল্লাসে গাইব গাথা॥
হোম করিব সামোঙ্কারে অহমিকা সমিধ গোটা।
বিলীন হবে ভস্মাকারে ভালে নিয়ে জয়ের ফোঁটা॥

মানস-পূজা সাঙ্গ করি রাখব হৃদে দশভুজা।
মনে মনে দেখব মাকে ছেড়ে দিয়ে বাহির পূজা॥

অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য

—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ

অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের কথা শুনিয়া অনেকে হয় ত বিস্মিত হইবেন। অনেকের ধারণা, অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় দুই বস্তু মাত্র, খেলোয়াড় আর জানোয়ার। একদিকে ক্রিকেট অন্য দিকে ক্যাঙ্গারু এই লইয়াই অষ্ট্রেলিয়া জগতের নিকট অধিক পরিচিত। সাহিত্য বলিয়া কোন তৃতীয় বস্তু এ দেশে আছে, ইহা অনেকেরই জানা নাই, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে। সুতরাং বিশ্ব-সাহিত্যের জ্ঞানানুশীলনে আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাদের কতকাংশে সহায়তা করিতে পারিব মনে করিয়াই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যদিও অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য তেমন বিখ্যাত কিছু নহে, কিন্তু তথাপি ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করা যায় না।

কাব্য

প্রথমতঃ কাব্যের কথাই ধরা যাক্। কাব্যের ভিতর দিয়া জাতির চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা এদেশীয় কবিদের রচনায় সুস্পষ্ট।

অষ্ট্রেলীয় কাব্য আলোচনা করিতে গেলে অ্যাডাম লিণ্ডসে গর্ডন (Adam Lindsay Gordon) এবং বেঞ্জো প্যাটারসনের (Benjo Paterson) কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে যিনিই কিছু সংবাদ রাখেন তিনিই ইঁহাদের রচনার সহিত পরিচিত। অ্যাডাম লিণ্ডসে গর্ডনের জন্ম যদিও অষ্ট্রেলিয়ায় নহে, তথাপি তিনি তাঁহার কাব্যে অষ্ট্রেলীয় জীবন এবং ভাবধারাকে যথাযথরূপে কাব্যে রূপায়িত করিয়া এ দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আসন লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

বেঞ্জো প্যাটারসনকে কতকাংশে ইংরেজ কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রতিভায় সমশ্রেণীভুক্ত না হইলেও উভয়েরই রচনায় বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহার 'Travelling Post Office' এবং 'Man From The Snowy River' কবিতাগুলি কিপলিং-এর 'Barrack-room Ballads'-এর কথা মনে করাইয়া দেয়।

গর্ডন এবং প্যাটারসনের কবিতাগুলি ছন্দ-প্রধান। এই গুলি শ্রবণকে যত স্পর্শ করে, মনকে তত স্পর্শ করে না। এই কারণে ইঁহাদের কবিতা অষ্ট্রেলিয়ায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র আবৃত্ত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলীয় কাব্য সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার আর কিছুই নাই। তবে পরে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে আরও দু'একটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কথা-সাহিত্য

অষ্ট্রেলীয় কথা সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে 'Sentimental Bloke'-এর লেখক, কথা-সাহিত্যিক সি. জে. ডেনিসের (C. J. Denis) নাম করিতে হয়। ডেনিস এদেশের একজন শক্তিশালী লেখক, ইঁহার রচনায় অষ্ট্রেলীয় জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহার অন্যতম গ্রন্থ 'On One Selection' সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা অতি সাধারণ শ্রেণীর নর-নারী, সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা বিরাজ করে, তথাকথিত শিক্ষিত এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যাহাদের ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, মানুষ হইয়াও যাহারা আধুনিক সমাজে মানুষ বলিয়া পরিচিত নহে, তাহাদেরই চরিত্র জাজ্জ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ডেনিসের সুনিপুণ তুলিকায়।

অষ্ট্রেলীয় কথা-সাহিত্যে হেনরি লসনের (Henry Lawson) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, এদেশীয় লেখকদের মধ্যে লসন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত এবং জনপ্রিয়। ইঁহার লেখার জনপ্রিয়তাই যে ইঁহার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ ইহা বলাই বাহুল্য। লসনের ব্যক্তিগত চরিত্রে এবং জীবন-যাত্রায় একটু অসাধারণত্ব আছে। এ বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না।

গ্রেন্‌ফেল গোল্ডফিল্ডস নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশব হইতেই সিডনী নগরের এক ক্যাবিনেট ফার্মে কাজ করিতেন। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। সহসা একদিন সব ছাড়িয়া তিনি দেশভ্রমণে

বাহির হইয়া পড়িলেন, এইরূপে পরিব্রাজকের মত অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই এই পরিভ্রমণকালে লেখা।

প্রথমে লসনের লেখা মাঝে মাঝে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা সিডনী বুলেটিনে (Sydney Bulletin) প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতেই ইঁহার লেখার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ক্রমে সেই সকল লেখা পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকিলে ইঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইঁহার রচিত 'The Drover's Wife' অষ্ট্রেলীয় কথা-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। কতিপয় দরিদ্র ঔপনিবেশিকদের জীবন-যাত্রা এবং সেই জীবনের বিচিত্র ঘটনা-সমষ্টি লইয়াই গল্পটি লিখিত। ইহাতে এই সব দরিদ্র ঔপনিবেশিকদের জীবনের চিত্র এমন সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। এই লেখকের অন্যতম গ্রন্থখানি 'While the Billy Boils' ও মন্দ নয়। এই পুস্তকখানিরও বেশ সুনাম আছে। পাঠক মহলে লসনের গল্পের বইয়ের এখনও চাহিদা আছে। এখনও মাঝে মাঝে এইগুলির নূতন সংস্করণ হইতে দেখা যায়।

অষ্ট্রেলীয় কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে 'ভ্যান্স পামারের' (Vance Palmer) নামও উল্লেখযোগ্য। পামার বহুকাল দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত রুশিয়ায় বাস করেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহার লেখায় রুশীয় প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। ইঁহার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'Men Are Human' এবং 'The Passage' এই দুইখানাকেই শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। উপন্যাস হইতে ইঁহার ছোট গল্পগুলি অধিকতর উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর আমরা মার্টিন মিল্‌স্-এর (Martin Mills) নাম করিতে পারি। ইঁহাকে অষ্ট্রেলিয়ার গলস্‌ওয়ার্দি বলিয়া আখ্যা দেওয়া থাকে। ইঁহার রচিত 'The Montforts' একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সিড্‌নীর কোন একটি অজ্ঞাত পরিবারের কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত।

কোন্ এক-দূর অতীতে কোন দুইটি ভাই সপরিবারে এ দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। কালক্রমে দুই ভাই সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়ে এবং স্থানীয় সকল বিষয় ব্যাপারে যোগদান করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া পশার এবং প্রতিপত্তি হয়। কালক্রমে তাহারা এ-দেশেরই অধিবাসী হইয়া পড়ে। এ-দেশের গৌরবে তাহারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। মোটামুটি ইহাই উপন্যাসের আখ্যায়িকা। ঘটনানৈপুণ্যের দিক দিয়াও উপন্যাসখানি বেশ উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই বইখানা বাহিরে খুব বেশী দেখা যায় না। বিলাতের দু' একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশকের নিকট লিখিয়াও নিরাশ হইয়াছি।

কেনেথ্ স্লেসর্ (Kenneth Slessor) নামে একজন তরুণ লেখক নরম্যান্ লিণ্ডসে (Norman Lindsay) নামক অন্য এক তরুণ সাহিত্যিকের সহযোগে কয়েকখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। এই বইগুলি একটু অদ্ভুত এবং নূতন ধরণের। অষ্ট্রেলীয় ভাবধারা ইহাতে নাই বলিলেও চলে, কিন্তু তাহা হইলেও এইগুলি বেশ উপাদেয় হইয়াছে।

এ স্থলে রলফ্ বল্‌ড্রিউড্ (Rolf Boldrewood) কৃত 'Robbery Under Arms'-এর উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

আধুনিক কালের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ড্যালী (J. B. Dalley), ডোহার্টি (W. G. Doherty), কলিন্স্ (Dale Collins) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ড্যালীর উপন্যাসগুলি তেমন জনপ্রিয় নহে। ড্যালীর রচনাসমূহে আধুনিক সিডনী-জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।

ডোহার্টি অষ্ট্রেলিয়ার একজন বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ন ভারোত্তোলনকারী, ইঁহার বইগুলির মধ্যে একমাত্র 'In the Days of the Giants' বইখানিই উল্লেখযোগ্য।

কলিন্সের বই এখনও বাজারে খুব বেশী বাহির হয় নাই। 'Rich and Strange' ইঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সিনেমায় রূপ দিবার জন্য উক্ত বইখানি কোন এক বিলাতী ফিল্‌ম্ কোম্পানী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতেই বইখানির জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়।

আধুনিক কালের এই সকল উদীয়মান লেখকদের সম্বন্ধে এখনও খুব বেশী কিছু বলা যায় না। আমাদের দেশের সাহিত্যানুসন্ধিৎসুদের অবগতির জন্য শুধু এইটুকু বলিলাম।

অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যে মহিলা লেখিকার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে এবং ইঁহাদের অনেকেই বেশ শক্তিশালী। ক্যাথারিন সুসানা প্রিচার্ড (Catherine Susannah Pritchard) ইঁহাদেরই একজন। অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়া এই মহিলা এক হাজার পাউণ্ডের একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর হইতেই ইঁহার খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইঁহার রচিত বইগুলির মধ্যে 'The Pioneers Working Bullocks', 'Coonardoo' এবং কিছুদিন আগে প্রকাশিত 'Haxby's Circus' এই কয়খানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিডনীর দুই জন অল্পবয়স্কা মহিলা লেখিকা বার্নার্ড-এলডারশ' (Bernard-Eldershaw) নামে অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য-জগতে বিশেষ সুপরিচিত, ইঁহাদের একজনের নাম মারজোরী বার্নার্ড (Marjorie Bernard) এবং অপর জনের নাম ফ্লোরা এলডারশ' (Flora Eldershaw)। কিন্তু ইঁহারা বার্নার্ড-এলডারশ' এই যুক্ত নামেই লিখিয়া থাকেন। এই আধুনিক তরুণীদ্বয় হয়ত বিখ্যাত লেখক বার্নার্ড শ'-এর অনুকরণে এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী আর একজন লাইব্রেরিয়ান। এ রকম সাহিত্যিক যুগল-মিলন বড় একটা চোখে পড়ে না। ইঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের Elliot Sisters বা এলিয়ট ভগিনিদ্বয়ের কথাই মনে করাইয়া দেন।

ইঁহাদের প্রথম উপন্যাস 'A House is Built' বইখানিতে সিডনীর একটি যথাযথ চিত্র-পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'Green Memory'ও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই দুইখানি উপন্যাসই বিলাতে প্রকাশিত। বইগুলি কিনিয়া রাখিবার মত, একবার পড়িয়াই তৃপ্তি হয় না।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে লিখিয়া মিসেস্ ইনিয়াস গান্ (Aeneas Gunn) যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কার্য্যব্যপদেশে এই মহিলাকে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বহুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। সেখানে একমাত্র তাঁহার স্বামী ভিন্ন আর একটিও শ্বেতকায় ব্যক্তি আশে পাশে কয়েক মাইলের মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হইত না। এই স্থানে অবস্থান করিয়া এইখানকার আদিম অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা চাক্ষুষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নারীসুলভ কোমল হৃদয় ইহাদের প্রতি সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠে। নারীসুলভ মমতায় মিশিয়া ইহাদের জীবনের জীবন্ত চিত্র তাঁহার 'We of the Never Never' এবং 'The Little Black Princess' নামক গ্রন্থগুলিতে অতি সকরুণ হইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত গ্রন্থগুলিতে লেখিকার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, রসবোধ এবং সর্ব্বোপরি সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

এইবার আমরা হেনরী হ্যাণ্ডেল রিচার্ডসন (Henry Handel Richardson) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই মহিলা লেখিকাকে অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলা যাইতে পারে। এ-দেশীয় কথা-সাহিত্যে ইঁহার সমকক্ষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের কিছু পরিচয় আছে, তাঁহারা আশা করি সকলেই এই কথার সায় দিবেন। এই লেখিকার বিখ্যাত উপন্যাস 'The Fortunes of Richard Mahoney' অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এই উপন্যাসখানি বিরাট তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম দুই খণ্ড অনেকে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়, তখন ইঁহার নাম অনেকেই জানিতেন না। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড 'Ultima Thule' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লেখিকার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

এই বইখানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার রূপ যেন চোখের সামনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পূর্ণ অষ্ট্রেলীয় আবহাওয়ার মধ্য দিয়া চালিত হইলেও এই উপন্যাস-বর্ণিত নারী-পুরুষদিগকে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ বলিয়া মনে করিতে এবং ইহাতে আলোচিত সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। অধিকন্তু, উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, নায়ক রিচার্ড সপরিবারে যেন আমাদেরই প্রতিবেশী। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের ইহা একটি প্রধান লক্ষণ। যেখানে দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে সমস্যা সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বজনীন সমস্যার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়, নায়ক-নায়িকা যেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ এবং কালে থাকিয়াই সকল দেশের এবং সকল কালের বলিয়া প্রতিভাত হয়, বিশ্ব-সাহিত্যে সেই সব গল্প-উপন্যাসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। রিচার্ডসনের

উপন্যাসখানি এই দিক্ দিয়া অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

মেলবোর্ণস্থিত সাহিত্যের একজন অধ্যাপক ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Her work is Art and it is Life."

অধ্যাপক মহাশয় আর এক জায়গায় বলিয়াছেন—"In my own mind there is no doubt that Australian literature has, so far, reached its highest level in the work of Henry Handel Richardson."

এ দেশের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বলিবার মত তেমন কিছুই নাই। এ ক্ষেত্রে একটি নাটকের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

অষ্ট্রেলীয় লেখকদের মধ্যে অনেকেরই দেশের বাহিরে বিশেষ নাম নাই। সামান্য যে কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম বাহির্জ্জগতে পরিচিত, তন্মধ্যে এচ. বি. ম্যারিয়ট্ ওয়াটসন্ (H. B. Marriot Watson) একজন। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ওয়াটসন্ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নিউজিল্যাণ্ডে। ইঁহার রচিত 'Richard Savage' একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক; এই নাটকখানি অষ্ট্রেলিয়ার বাহিরেও বহু দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহার ভূমিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, এই নাটকখানি রচনায় তিনি ওয়াট্‌সন্ বেরী (Berrie) নামক অন্য সাহিত্যিকের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিশু-সাহিত্য

অষ্ট্রেলিয়ায় শিশু-সাহিত্য এবং রূপ-কথায় তেমন উন্নতি দেখা যায় না এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় তেমন শক্তিশালী শিশু-সাহিত্যিক এবং রূপকথার লেখক এ দেশে নাই। রেনটুল্ (Rentoul) এবং আউথ্‌ওয়েইট্‌স্ (Outh-Waits) এই দুই জনই এক মাত্র এ-দেশের রূপকথা এবং পল্লীকথার লেখক। অন্যান্য দেশের রূপকথা বা পল্লী-কথার তুলনায় ইঁহাদের রচনাগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। শিশু-সাহিত্যে নরম্যান লিণ্ডসে (Norman Lindsay) এবং ইথেল্ টার্নারের (Ethel Turner) নাম করা যাইতে পারে। ইথেল্ টার্নার শিশুদের উপযোগী অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার 'Seven Little Australians' বইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। লিণ্ডসে এবং টার্নার উভয়ের লেখাতেই শিশু-মনের যথেষ্ট খোরাক পাওয়া যায়। এইগুলি শিশুদের পক্ষে বেশ উপাদেয় হইয়াছে।

শিকার, 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' এইগুলিই এ দেশীয় শিশু-সাহিত্যের প্রধান উপাদান। ভৌতিক কাহিনী, আধ্যাত্মিক বা পৌরাণিক আখ্যানমূলক গল্প বা কবিতা বড় দেখা যায় না।

অতীতের কথা

অতীতের কথা সম্পর্কে লিখিত খুব বেশী পুস্তক অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যে দৃষ্টি-গোচর হয় না। মার্কাস্ ক্লার্কের (Marcus Clarke) 'For the Term of His Natural Life' বইখানিকে এ বিষয়ে শুধু শ্রেষ্ঠ কেন, একমাত্র বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতীতের বিবরণ সম্পর্কে লিখিত হইলেও বইখানি খুবই চিত্তাকর্ষক; বিশেষ করিয়া ইহার শেষ অধ্যায়টি খুবই চমৎকার হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা যায়, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লেখকের বয়স যখন মাত্র চব্বিশ বৎসর, তখন ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বয়সে এই রকম একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন খুবই প্রশংসনীয়। অল্প বয়সেই ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই লেখক বিখ্যাত 'Melbourne Public Library'-তে থাকিয়া নানা রূপ গবেষণা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় ইঁহার সমস্ত কাজই অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তথাপি ইঁহার এই সকল দান জ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-মাত্রের নিকটই খুব মূল্যবান।

ব্যঙ্গ-সাহিত্য

অষ্ট্রেলীয় ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকদের মধ্যে ডেভিড লো (David Low), উইল ডাইসন (Will Dyson), ল্যান্স ম্যাটিসন (Lance Mattison) এবং ডেভিস (J. B. Davis) প্রভৃতি কয়েকজনের নামই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। বাহিরে ইঁহাদের রচনায় কিছুটা সমাদর আছে।

বিবিধ

অধুনা সকল দেশেই অর্থ, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে গভীর চিন্তা এবং সমস্যামূলক পুস্তকাদি বহুল পরিমাণে লিখিত এবং প্রকাশিত হইতে দেখা যাইতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, রাষ্ট্র এবং সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতীয় জীবন সংগঠন সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সাহিত্য আলোচনা করিতে যাইয়া উক্ত বিষয়সমূহে লিখিত পুস্তকাদি বাদ দিলে চলিবে না। যদিও আলোচ্য সাহিত্যে ঐ জাতীয় বই খুব বেশী নাই। ইহার কারণ হয়ত এই যে,

অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় জীবনে ঐ সকল সমস্যা এখনও প্রকট হইয়া উঠে নাই, অথবা হইলেও বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হয় নাই। তথাপি যে দু'চারিখানি এ জাতীয় বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'The World's Population Problems and a White Australia' বইখানা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইখানি আগাগোড়া বেশ সুচিন্তিত ভাবে লেখা এবং যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ। ইহা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তার খোরাক যোগাইতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয়।

এদেশের ক্রীকেট, বিমান, শিকার প্রভৃতি বিষয়ক বইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিমান বিষয়ে দুইখানি বই-ই উল্লেখযোগ্য। একখানা কিংস্‌ফোর্ড-স্মিথ (Kingsford-Smith) এবং আলম্ (Ulm) কর্তৃক লিখিত 'The Great Pacific Flight'। লেখকরা প্রখ্যাত বৈমানিক। উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের বিমানযোগে পৃথিবী-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি অ্যালান কবহাম্ (Alam Cobham) কর্তৃক লিখিত। ইহাতে লেখক বিমান বিষয়ে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই লিখিয়াছেন। এস্থলে চাম্‌লির (C. Chomley) ছয় পেনী সংস্করণের বইখানিরও নাম করা যাইতে পারে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও অনুসরণে স্বীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা এদেশীয় সাহিত্যিকদের মধ্যেও দেখা যায়। এ. এচ. হুইন (A. H. Wheen) নামক জনৈক অষ্ট্রেলীয় লেখক কর্তৃক এরিশ মারিয়া রেমার্কের (Remarque) বিখ্যাত উপন্যাস 'All Quiet on the Western Front'-এর অনুবাদ এবং ডিক্সন্ (Dixon) কর্তৃক আল্ডুস্ হাক্সলির বিখ্যাত পুস্তক 'Point Counter Point'-এর নাট্যরূপ অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যের সম্পদ্-বিশেষ।

বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সংকলন এবং সঞ্চয়ন বিষয়েও এদেশীয় সাহিত্যিকগণ পশ্চাৎপদ নন্। শ্রেষ্ঠ গল্প ও কবিতার চয়নিকাও দু'চারখানা দেখা যায়। কাব্য সঞ্চয়নের মধ্যে 'Anthology of Australian Poetry' নামধেয় পুস্তকটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই বইখানি পড়িলে অষ্ট্রেলীয় কাব্যের উৎপত্তি, গতি এবং পরিণতি এবং অষ্ট্রেলীয় কাব্যের বিশিষ্ট রূপ, রস, ভাবধারা এবং ভঙ্গিমার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম কবি টার্ণারের কবিতা কেন যে বাদ পড়িয়াছে, বোঝা গেল না।

শ্রেষ্ঠ গল্প সঞ্চয়ন হিসাবে জর্জ্জ ম্যাকানেস্ (George Mackaness) কর্তৃক সঙ্কলিত গল্প-সঞ্চয়নখানিই প্রসিদ্ধ। এই বইখানি লণ্ডনে প্রকাশিত। ইহাতে অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যের যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিই সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দুইটি পুস্তক পাঠে অষ্ট্রেলীয় কাব্য এবং কথা-সাহিত্যের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়; শুধু তাহাই নহে অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে এই দুইটি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সংবাদপত্র

এ-দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'Sydney Morning Herald' এবং 'Sydney Bulletin' সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এই দুইটি পত্রেরও স্থান আছে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই নিকটই ইহাদের নাম সুপরিচিত।

সাহিত্যের সৃষ্টি এবং তাহার উন্নতিবিধানকল্পে উভয় পত্রিকার প্রচেষ্টাই উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। ইহাদের সহায়তা এবং সহানুভূতি ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য-সাধনা এতটা অগ্রসর হইতে পারিত কি না সন্দেহ। ইহাদের কর্তৃপক্ষের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আজ সুপরিচিত। অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যে এই সংবাদপত্র দুইটির দান অপরিমেয়।

Sydney Morning Herald-এর শতবার্ষিকী সংখ্যা অষ্ট্রেলীয় সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্। ইহা এ দেশীয় সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-স্বরূপ চিরদিন গণ্য হইবে। বহির্বে। বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ রচনা-সম্ভারে এই সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। এই সংখ্যাখানির মূল্য পঁচিশ শিলিং অর্থাৎ চব্বিশ টাকারও উর্দ্ধে। কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার মূল্য চব্বিশ টাকা হইতে পারে, বাংলাদেশে, তথা ভারতে ইহা কল্পনারও অতীত। সেখানকার লোকদের পশ্চাতে আমাদের মত এমন উজ্জ্বল অতীত নাই, তাহাদের বুদ্ধের মত পূর্ব্বপুরুষ নাই, নালন্দা, মহেঞ্জোদারো নাই, অথচ তাহারাও চব্বিশ টাকা দিয়া পত্রিকা কিনিয়া পড়ে, আর আমাদের দেশে চার-পয়সা মূল্যের পত্রিকাও বৎসরান্তে বস্তাবন্দী হইয়া মুদির দোকানে পরম গতি লাভ করে। ইহাতে আমাদের আর্থিক দুর্গতি এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যই প্রকাশ পায়—এ কথা মিথ্যা নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও মিথ্যা নহে যে, আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাদের রুচি এবং মনোবৃত্তি আরও উন্নততর না হইলে সংবাদপত্র এবং পত্রিকার এই দুর্গতি কস্মিনকালেও দূর হইবার নহে।

বংশ-প্রদীপ

—শ্রীকণা দত্ত

বেশী লোকের ভিড়ের মধ্যে এগোন সরস্বতী কোনদিনই বড় একটা পছন্দ করেন না, বাসু কিন্তু নাছোড়বান্দা। জোর-জবরদস্তি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁতীপাড়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে টানিয়া আনিল। সকাল হইতেই মায়ে-ছেলেতে তর্ক বাধিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাসুরই হইল জিৎ।

"বা,—রে! তুমি ত যাবেই না, আবার আমাকেও আটকে রাখবে; ফটিক, মানুকে—পাড়ার সবাই গেল, আর আমিই শুধু বন্দী রইলাম।"

অভিমানস্ফুরিত অধরে ছল ছল চোখে বাসু রাঙ্গা-মায়ের নিকট হইতে অন্যত্র উঠিয়া গেল।

সরস্বতী হাসিলেন, "পাগল ছেলের শুধু বয়সই বাড়িয়াছে, কিন্তু পাগলামোটুকু আজও ঘুচিল না।"

স্তূপীকৃত খড়ের গাদার পিছনে বাসু তখন আশ্রয় লইয়াছে। বাড়ীর গোপাল, গরুদের জাব মাখাইবার জন্য মালসায় ফেন ঢালিয়া গাদায় খড় লইতে আসিয়াছিল। তাহাকেই ধরিয়া, বাসু রাঙ্গা-মাকে জানাইতে বলিয়া দিল, রাঙ্গা-মা যতই সাধ্যসাধনা করুক, ভাত আজ বাসু কিছুতেই খাইবে না; রাঙ্গা-মা যদি তাহার সহিত উপোষও দেয় তবুও না।

দুর্ব্বলতাটুকু যে রাঙ্গা-মার কোন্খানে, বাসু তাহা বেশ জানে। রাঙ্গা-মা তখন সবে স্নান সারিয়া বাসুকে খাবার দিবারই উদ্যোগ করিতেছিলেন। যুগল সেই-স্থানে আসিয়া খোকাবাবুর নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা রাঙ্গা-ঠাকুরুণের কর্ণ-গোচর করিল। এঁটো হাত আর ধোওয়া হইল না।

খড়ের গাদার পিছনে যাইয়া সরস্বতী পুত্রকে গ্রেপ্তার করিলেন।

"তবে বে দুষ্টু, লেখাপড়া শিখে তোমার এই বিদ্যে হচ্ছে, না? মায়ের পরে তুমি রাগ করতে শিখেছ। বাঁদর কোথাকার! আসুন উনি, তোমার ইস্কুলে যাওয়া ঘুচাচ্ছি।"

পিতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাসু এতক্ষণ নিতান্তই অচেতন ছিল। তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিখানি রাঙ্গা-মা এক্ষণে স্মরণপথে জাগাইয়া দিলেও, সহজে হারিবার ছেলে বাসু নয়। মুখে যতই বলুক, বাবার কাছে তাহার বিরুদ্ধে রাঙ্গা-মা যে একটি কথাও তুলিবে না—এ জ্ঞান তাহার বেশ হইয়াছে।

"তা তুমি বলো। না হয় মারই খাব। ভাত কিন্তু আমি কিছুতেই খাব না আজ। মরে গেলেও নয়।"

সরস্বতী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, মুখে বলিলেন, "চাঁপাই-এর জ্বাজন নেমেছে, ও ত প্রতি বছরই নামে রে পাগল, দেখবার আর কি আছে ওতে নতুনটা?"

বলিতে বলিতেই কি যেন এক আশঙ্কার ছায়াঘন অন্ধকার তাঁহার সারা চোখে-মুখে ঘনাইয়া উঠিল। তিনি ত ভুলেন নাই যে, গত বৎসরই ওপাড়ার রাসমণির ছেলেকে উন্মাদিনী চাঁপাই-এর উদ্দাম স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পুত্রহারা হতভাগিনীর বিলাপ ত আজিও শেষ হয় নাই।

বাসু কিন্তু যুক্তিতর্কের কোন ধারই ধারিল না। চাঁপাই-এর তলে তাঁতীপাড়ার অধিকাংশ কুটীরই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন ত প্রতি বছরই হয়। এ ব্যাপার যে নূতন কিছুই নহে, সরস্বতীর এ উক্তিও সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এবার না কি জগৎ শেঠের বহুবিশ্রুত ঐতিহাসিক কীর্ত্তির শেষ অবশেষ জীর্ণ বাড়িখানিও চাঁপাই-এর বুভুক্ষু গ্রাসের নজর এড়াইতে পারিবে না, পাশাপাশি তিন চারিখানি গ্রামে এই রকমই একটা প্রবাদ রটিয়াছে। অপর গ্রামের জনসাধারণ যেখানে এ গ্রামে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাসু যে সেখানে এ-গ্রামের ছেলে হইয়াও নিশ্চিন্ত আরামে রাঙ্গা-মায়ের আঁচল-স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া আষাঢ়ে গল্প শুনিবে—রাঙ্গা-মার এ অতি অন্যায় প্রত্যাশা।

সুতরাং ছেলের জেদই শেষ পর্য্যন্ত বজায় রহিল। একা দুর্দ্দান্ত ছেলেকে কেমন করিয়া ঐ সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর উদ্দাম

"ব্রাশ-ট্রিটমেন্ট" | শিল্পী—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

নৃত্যলীলার সম্মুখে ছাড়িয়া দিবেন। তাই সরস্বতীও কাজকর্ম্ম ফেলিয়া বাসুর সঙ্গ লইলেন।

চার-পাঁচটী গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতায় চাঁপাই-এর তটভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত তখন জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভীড়েরই একপ্রান্তে বসিয়া রাসমণি হারাণ পুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছিল। চাঁপাই যদি তাহার বুকের মাণিকটুকুই কাড়িয়া লইতে পারিল, তবে সেই সঙ্গে সে তাহাকেও লইল না কেন?

বাসুর ক্ষুদ্র হাতখানি মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়া অবগুণ্ঠনবতী সরস্বতী ভীড় বাঁচাইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভীড়ের সকলের চোখে-মুখেই প্রবল উত্তেজনার সুস্পষ্ট ছাপ প্রকটিত। উদ্‌গ্রীব, উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায়, গ্রামের বধূগুলির সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনের তলের অপেক্ষমান দৃষ্টি, ক্রমেই উজ্জ্বল ও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। অর্দ্ধনগ্ন, তৈল-কর্দ্দমলিপ্ত বালকগুলি পর্য্যন্ত অধীর আগ্রহে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া উৎসারিত স্রোতের অপ্রতিহত গতির পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

"যাহা রটে তাহা কিছু কিছু বটে"। প্রবাদের রটনা তাই শুধু রটিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আপনার সত্যতাও প্রমাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

উত্তেজিত গ্রামবাসীর সমবেত কল-কোলাহলকে নিতান্তই উপেক্ষাপূর্ব্বক চাঁপাই জগৎ শেঠের জীর্ণ দীর্ণ বাড়ীখানির তটমূলে আসিয়া সবেগে পড়িল। প্রাচীনতম বসতবাটীটির ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত স্রোতের প্রবল আঘাতে কাঁপিয়া উঠিল। আর পলকপাতের অধিক সময় নষ্ট না করিয়া অশ্রান্ত চাঁপাই-এর বুভুক্ষু গতি সম্মুখের পানে আপনার গন্তব্য পথটুকু বাছিয়া লইয়া আগাইয়া চলিল। অসহায়, অক্ষম গ্রামবাসী শুধু নিরুপায়ভাবে সম্মুখের অসীম নিরাবয়ব শূন্যতার পানে বাক্‌শূন্য, আহত, স্তব্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কাহার বিরুদ্ধে তাহারা নালিশ জানাইবে? তাহাদের প্রতিরোধের ক্ষমতাই বা কতটুকু? রাজা, ধর্ম্ম, সমাজ কাহারও অন্যায়ের প্রতিকল্পে তাহারা যেমন কোন দিন কোন প্রতিবাদ জানায় নাই, শুধু নিরুপায় নির্ব্বাক ভাবে সকলের জুলুমই সহিয়া গিয়াছে, আজও ঠিক সেই রকমই বিকৃত মুখে ও নীরবে প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর অত্যাচারও সহিয়া গেল।

জগৎ শেঠের ঐতিহাসিক খ্যাতিটুকু রাক্ষসী স্রোত নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া গেল সত্য, কিন্তু তাহার অধিক ক্ষতি করিয়া গেল তাঁতীপাড়ার। তাঁতে যে কয়খানি কাপড় চড়িয়াছিল সেগুলিও আর উদ্ধার করা সম্ভব হইল না। নদীর পাড়ের ঝুঁকিয়া-পড়া, চালশূন্য, ভাঙ্গচুরো মাটীর দেয়ালগুলো, সম্বৎসরের জন্য সঞ্চিত খড়ের স্তূপ, আম, পেয়ারা কুলগাছ, ছাগল কুকুরের পালশুদ্ধ দরিদ্র গৃহস্থের খুঁটিনাটি যাবতীয় সামগ্রী তুচ্ছ তৃণখণ্ডের মতই স্রোতের মুখে অতি সহজেই ভাসিয়া গেল। প্রাচুর্য্যের সংসার না হইলেও ঐ গুলিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহাদের আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দিনগুলি এক রকম বহিয়া যাইতেছিল। পশুর মত যন্ত্রণাময় আহত দৃষ্টি মেলিয়া বিভ্রান্তের মত তাহারা শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। অর্দ্ধ-নিমগ্ন অসহায় পশুগুলি পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষায় করুণ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া প্রখর স্রোতের অতল তলে তলাইয়া গেল। চেষ্টা করিয়া বাঁচিবার শক্তিটুকুও তাহারা হারাইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন চেতনায় স্তম্ভিত গ্রামবাসী শুধু কাণ পাতিয়া নিমগ্ন কাতরতাপূর্ণ মিনতি ও বাঁচিবার প্রয়াসে অস্ফুট ক্রন্দন শুনিল মাত্র। নিজেদেরই সর্ব্বস্ব যাহারা রক্ষা করিতে পারিল না, তাহারা পরকে কেমন করিয়া বাঁচাইবে?

চাঁপাই-এর জল অনেকক্ষণ সরিয়া গিয়াছে। শূন্যতার পানে চাহিয়া সরস্বতীর অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কি যেন এক দুর্ব্বার বেদনা ও ভয়ে ভরিয়া উঠিল। এই নিস্তব্ধ, নিশ্চেষ্ট, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ প্রকৃতির মধ্যে যে এতবড় একটা বিশ্বগ্রাসী ধ্বংস আত্মগোপন করিয়াছিল, ইহাকে একান্ত সত্য জানিয়াও মানুষ ত ইহাকেই এতদিন নিশ্চিন্তে ভুলিয়াছিল। কিন্তু ইহাই ত নিয়ম। সুখ-দুঃখের একটানা জীবন-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, তাহার আংশিক ছোটখাট দুঃখ দুর্দ্দশায় ব্যথিত মানব, জীবনের একমাত্র সত্য মৃত্যুকেই তো প্রাণপণে ভুলিয়া থাকে। ভুলিয়াই ত সে বাঁচে। আশা করে আর ভালবাসে। জীবনের একমাত্র সত্যকে ভুলিয়া থাকার সার্থকতা ত এইখানেই।

ওদিকের ভীড়ে তখন নিদারুণ গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত গ্রামবাসী নজর রাখিতে পারে নাই, সেই অবসরে রাসমণি জলে ঝাঁপাইয়া

পড়িয়াছিল। কিন্তু চাঁপাই-এর নিজের প্রয়োজনের এক তিলও বেশী সে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ। অর্দ্ধ-নিমগ্ন বট-গাছের গুঁড়িটিতে, তাই রাসমণি অর্দ্ধচেতন অবস্থায় আট-কাইয়া গিয়াছে। নিজেদের ক্ষতির কথা ভুলিয়া তাহাকেই ঘিরিয়া সকলে কোলাহল করিতেছিল। সরস্বতীর ইচ্ছা হইল একবার যাইয়া হতভাগিনীকে দেখিয়া আসেন, কিন্তু বাসুর যেন এখানে আর একতিলও সবুর সহিতেছে না।

"চাঁপাইটা রাক্ষসী জান রাঙ্গা-মা? দেখলে না—কেমন করে এক নিমিষে সব খেলো। জগৎ শেঠ! অতবড় যে জগৎ শেঠের কথাটা ছাপার হরফে শুদ্ধ উঠে গেল, রাক্ষসী তার বাড়ীখানাকেও রেহাই দিলে না। উঃ, ওর মাটীর তলার ভাঙ্গা কুঠরীটায় কত লুকোচুরীই যে খেলেছি! জান রাঙ্গা-মা? একদিন এই এতবড় একটা দুধরাজকে তাড়া করেছিলাম।"

ক্ষুদ্র হাতখানি বিস্তার করিয়া বাসু সর্পটীর দৈর্ঘ্য বর্ণনা করে। উত্তেজনায় সুগৌর মুখখানি তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের অন্তঃস্থলে রাঙ্গা-মাও শিহরিয়া উঠিলেন। বাসুর জন্ম ভয় তাঁহার প্রতিপদে। "বাড়ী চল রাঙ্গা-মা। চাঁপাই-এর নিঃশ্বেসেও ডাইনীর বিষ আছে, ও সব পারে। দেখলে না জ্যান্ত জ্যান্ত কুকুরগুলো কেমন করে ভাসিয়ে ডুবিয়ে নে গেলো?"

যে নদীর তীরটি ভিন্ন বাসুর খেলার সুখ-সুবিধাই হইত না—শৈশবের প্রতিটি মধুর সন্ধ্যা যাহার শ্যামস্নিগ্ধ সজল বাতাসে প্রীতিসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহারই এই প্রকট ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় বাসুর ক্ষুদ্র চেতনাটুকু তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সরস্বতীর বুকের স্পন্দন তখনও থামে নাই, বাসুকে লইয়া গৃহে না ফিরিতে পারিলে তিনিও যেন শান্তি পাইবেন না। রাক্ষসীর খেয়াল ত? কখন কাহার বুকের মাণিক ছিনাইয়া লইবার জন্ম রাক্ষসীর অসীম তৃষ্ণা আবার জাগিয়া উঠিবে, কে জানে সে কথা?

তাঁহার বাসু, স্বামীর বংশের একমাত্র বংশপ্রদীপ। সরস্বতীর আর মুহূর্ত্তের অপেক্ষা সহিল না।

মূর্চ্ছাভঙ্গের শেষে রাসমণি ততক্ষণে আবার ফুঁপাইতেছে।

* *

রাঙ্গা-মায়ের স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় বংশপ্রদীপের দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন, রাঙ্গা-মা সত্য সত্যই রাগিয়া গেলেন। ছেলের নামে নালিশ তিনি প্রায়ই শোনেন, ও একরকম গা-সওয়াই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদু-জ্যেঠা সেদিন যেন একটু বাড়াবাড়ি করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। চাঁপাই এখনও স্তব্ধ ছায়াসমাচ্ছন্ন, ভোরের আলো এখনও তেমন ফুটে নাই, স্বামী-পুত্র তখনও নিদ্রামগ্ন। গত রাত্রের বাসী বাসনগুলো মাজিয়া, একটা ডুব দিয়া সিক্ত-বস্ত্রে আলের পথে পথেই সরস্বতী বাড়ী ফিরিতে-ছিলেন। যদু জ্যেঠাকে আর কষ্ট করিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে হইল না। জল-থৈ থৈ ধানের ক্ষেতের মাঝ-খানের সঙ্কীর্ণ সরু আলের পথটীতেই তিনি রাঙ্গা-বৌকে ধরিলেন।

সরস্বতী ঈষৎ বিস্মিত হইলেন না, তাহাও নহে। গত রাত্রে বেশ এক পশলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে, বর্ষণের প্রাচুর্য্য কমিয়া গিয়াছে বটে, তবু বৃষ্টি একেবারে ছাড়ে নাই। তাই ভোরবেলাও আকাশে পাংশুবর্ণ মেঘের ঘনঘটা। বাদলার সিক্ত হাওয়ায় অধিকাংশ প্রাণীই সুখে নিদ্রামগ্ন। যে সব কৃষাণদের অধিক প্রয়োজন, শুধু তাহারাই টোকা মাথায়, গায়ে চট মুড়ি দিয়া এই অতি প্রত্যুষেও আনত দেহে, নত নয়নে, নিবিষ্ট চিত্তে মাঠে খাটিতেছে।

সরস্বতী গ্রামের মেয়ে হইলেও এখন বধূপদে উন্নীত হইয়াছেন। যাঁহাদের কোলে-পিঠে চড়িয়া শৈশবের মধুর দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাদের দেখিলেও আজ সংক্ষিপ্ত অবগুণ্ঠনটুকু দীর্ঘতর করিয়া দিতে হয়।

কিন্তু হ্রস্বদীর্ঘ অবগুণ্ঠনের পানে আজ যদু-জ্যেঠা ফিরিয়াও চাহিলেন না। চিরকালই এই মেয়েটীকে তিনি একটু স্নেহ সমীহ করিয়া চলেন, কিন্তু বাসুর ব্যবহার এবার তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। রুক্ষভাবেই তিনি সরস্বতীকে আক্রমণ করিলেন,—"বলি মা, ছেলেকে শুধু লেখা-পড়া শেখালেই ত হোলো না, একটু-আধটু সহবৎ, ন্যায়-অন্যায়ের শিক্ষাও দিতে হয়।"

অন্ধকারের অতল গর্ভে নিমজ্জিতা সরস্বতী! এ অভিযোগের কি উত্তর দিবেন? নির্ব্বাক বিস্ময়-ভরে তিনি শুধু হাতের বাসনগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন।

যদু-জ্যেঠার আর্ত্ত কণ্ঠ পুনরায় যেন চাঁপাই-এর স্রোত-তরঙ্গে ছল ছল করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"আমার সর্ব্বস্ব গেল বৌ-মা; তোমার বাসু আমার যথাসর্ব্বস্ব লোপাট করে নিয়েছে।" বাসুর অত্যাচার বর্ণনা করিতে করিতে যদু-জ্যেঠা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অবস্থাপন্ন তিনি নহেন। ক্ষেতের শাকশব্জী যাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার পেট চলে, বাসু তাহাই লুটপাট করিয়া না কি তাঁতীপাড়ায় ঘরে ঘরে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছে।

"আবার বললে বলে কি না, 'দোবো না কেন? তোমরা দু'বেলা পেট পুরে খাও আর' ওরা দুবেলা উপোষ দেয়। চাঁপাই ওদের সব খেয়েছে। সহরে কারখানা খুলে ওদের তাঁত বন্ধ করেছে। ভগবান, মানুষ দু'পক্ষ মিলে ওদের কষ্ট দিচ্ছে, ওদের দোষ না ত, দোষো কাদের?"

যদু-জ্যাঠার আর্ত্তনাদ শেষ পর্য্যন্ত কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বাসুর অত্যাচারের বর্ণিত কাহিনীতে, কি জানি কেন, সরস্বতী রাগ ত করিলেনই না—বরং মনে মনে, বেশ যেন একটু খুশীই হইয়া উঠিলেন। দুখীর দুঃখে বাসু যাহাতে কাতর হয়, দেশের নিরুপায় দরিদ্র চাষীদের অসহায় অবস্থায় যাহাতে বাসুর মনে দয়া-মায়া জন্মায়, সরস্বতী চিরদিন বাসুর মনকে, সেইভাবেই গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপরের ক্ষতি করা অন্যায়। বিশেষ করিয়া যাহার উপরে একজনের জীবিকা নির্ভর করিতেছে, তাহাই লইয়া অন্য দরিদ্র গ্রামবাসীদের গৃহে গৃহে বিতরণ না করিলেই ছিল ভাল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, বাসুর ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে নিজের প্রভাবের ছায়া দেখিয়া, সরস্বতী আশাতীত খুশী না হইয়া পারিলেন না।

সত্যই হউক আর ভণিতাই হউক, নিজের এতখানি আর্ত্তনাদ ও নালিশের ফলে সরস্বতীর মুখের একটী রেখাও কুঞ্চিত হইল না দেখিয়া যদু-জ্যেঠা রাগিয়া গেলেন। এই মেয়েটীকে আঘাত করিতেই হইবে। তিক্ত বিকৃত কণ্ঠস্বরে তাই ইচ্ছা করিয়াই কিঞ্চিৎ শ্লেষের ঝাঁঝ মিলাইলেন।

"আর তোমাকেও বলি রাজা-বৌ। সতীনের ছেলেটাকে হরদম অন্যায় আদর দিয়ে তুমি ওকে খারাপ করলে শেষ পর্য্যন্ত। ডাকাত, ডাকাত, স্বদেশী ডাকাত যদি না হয় ওই ছেলে, যদুপতি তবে এই কানজুটো এখানে জমা রেখে যাবে।"

সরস্বতীর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। ঠোঁট ঠোঁট চাপিয়া কোনমতে তিনি যেন নিজেকে সম্বরণ করিলেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাঁহার পাণ্ডুর মুখশ্রী যদু-জ্যেঠা কিন্তু লক্ষ্যই করিলেন না।

তিনি তখন সুরটাকে আর এক পর্দ্দায় চড়াইয়াছেন। "আর তাও বা বলি আমি! সজ্জনের ছেলে মানুষ হল না হোলো, বয়ে গেলো, তাতে তোমারই বা কি মাথাব্যথা বল ত? হ্যাঁ, আজ যদি থাকত তর মা বেঁচে, ছেলেটা মানুষ হত বটে। দুষ্টু দুরন্ত হলেও ছেলেটার বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে; শাসন-সহবৎ ঠিকমত পেলে একটা মানুষের মত হয়ে দাঁড়াত কালে। পরের ছেলে—হলে তো তুমি ছাড়বেই। আচ্ছা আমি ওর বাপকেই বলবো'খন; যার ছেলে, সেই এর বিহিত দেখে নেবে।"

হাতের ভেরেণ্ডার ডালটী দাঁতন করিতে করিতে যদু-জ্যেঠা প্রাতঃকৃত্য সারিতে প্রস্থান করিলেন।

যন্ত্রচালিতের মত সরস্বতী গৃহে ফিরিলেন। অন্তর্নিহিত গোপন ক্ষতটুকু তখন অসহ্য যন্ত্রণা- জ্বলিতেছে। নিজে নিঃসন্তান! মৃতা সতীনের ছেলে বাসুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বন্ধ্যা নারীর দুঃসহ কষ্টটুকু ক্ষণেকের তরেও তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। বাসু যে তাহার নিজের সন্তান নহে, এই একটী মাত্র কথা যাহা তিনি প্রাণপণে ভুলিয়া থাকিতে চান, ইহারা খোঁচাইয়া শুধু তাহাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া খুসী হয়।

সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া বাসু তখন সবে জলযোগে বসিয়াছে। শীলাদহে আজ মাছ ধরার কথা; কয়েকদিন যাবৎ তাহারই সরঞ্জাম করা হইয়াছে। জাগিতেই উঠিতে বেলা হইয়া গিয়াছে। বাসু তাই আর রাজা-মায়ের অপেক্ষা করে নাই। নিজেই ভাঁড়ার হইতে গুড়মুড়ি, নাড়ু বাহির করিয়া লইয়াছে।

সরস্বতী আর ভিজা কাপড়টুকু ছাড়ারও অপেক্ষা করিলেন না। হাতের বাসনকটি নামাইয়া, বাসুর সুমুখ হইতে মুড়ির পাত্রটী উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। হতচকিত বাসুর হাত হইতে গুড়ের ডেলাটুকু মাটীতে পড়িয়া গেল। পা দিয়া তাহাও ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। রাজা-মায়ের এ অভূতপূর্ব্ব আচরণের কোন অর্থই বাসুর হৃদয়ঙ্গম হইল

না, সে শুধু অবাক্ বিস্ময়ে ছড়ান মুড়িগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল।

সুরপতি তখন সদ্য আগত দৈনিক পত্রিকার ভাঁজ খুলিতে ব্যস্ত। রাঙ্গা-বউয়ের আচরণ তাঁহার নিকটেও যেন একটু আশ্চর্য্য ঠেকিল। কিন্তু স্ত্রীর এই ব্যবহারের হেতু একটা আছেই কিছু। সুরপতি চীন-জাপানের নিষ্ঠুর সংঘর্ষে মনোনিবেশ করিলেন। সরস্বতী খাবার ছড়াইলে, বাসু সেই যে উঠিয়া পড়িল আর তাহার পাত্তাই পাওয়া গেল না।

বেলা ক্রমেই বাড়িতেছে, স্বামীর প্রাতরাশ গুছাইয়া সরস্বতী রান্না চড়াইলেন। তবু বাসুর দেখা নাই। উঠানের পেঁপে-তলায় ছড়ান মুড়িগুলির পানে চাহিয়া সরস্বতীর বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত মুচড়াইয়া উঠিল। পরের উপর রাগ করিয়া ছেলেকে খাওয়ার সময় টানিয়া উঠাইয়াছেন। তিনি সৎ-মা বলিয়াই বোধ হয় এতখানি নিষ্ঠুরতা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল, বাসুর মা বাঁচিয়া থাকিলে আজ কখনই সে এমনটা করিতে পারিত না। গোপনে গোপনে বুকখানি তাঁহার যেন রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পরের কথায় সন্তানকে এতখানি নির্য্যাতন না করিলেই কি চলিত না! জ্বলন্ত উনুনের বিস্ফারিত লেলিহান শিখার পানে চাহিয়া সরস্বতীর হাতের কাজ অকস্মাৎ থামিয়া যায়। সুদূর অতীতের একখানি জীবন্ত ছায়াছবি যেন সরস্বতীর স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিয়াছে। সরস্বতী সেদিন এ বাড়ীর বধূ নন, এ গ্রামের মেয়ে। পাড়ায় পাড়ায় হাজিরা দেওয়াই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ সেদিন। লক্ষ্মীর মত সুদর্শনা একটি বধূ সেদিন সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে, রাঙাপাড় কস্তা শাড়ী পরিয়া এই বাড়ীটিরই আনাচে কানাচে প্রতি পদক্ষেপে বসন্তের ফুল ফুটাইত। বর্ষার সজল, স্নিগ্ধ আকাশের মতই শ্যামমেদুর বধূটি চাঁপাই-এর মিঠে জলে ঘটটি ভরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় ধানক্ষেতের হিল্লোলিত সবুজ তরঙ্গের মাঝে সঙ্কীর্ণ মেঠো পথটি বাহিয়া আর্দ্রবস্ত্রে গৃহে ফিরিত। সাঁঝের সাড়ার সাথে সাথে গৃহাঙ্গনের ঐ তুলসীমঞ্জরী মূলে, একটি ঘৃতের প্রদীপ রাখিয়া একটি করুণ সূর্য্যাস্তের শেষে একমাত্র জীবনদেবতার চরণতলে একটিমাত্র প্রণাম রাখিত—সরস্বতীরই স্বামী আর পুত্রের মঙ্গল কামনায়। বংশ-প্রদীপেরই দীর্ঘায়ু মাগিয়া বধূটি তুলসীমূলে অবনমিত প্রার্থনাটি রাখিত। বধূটি সরস্বতীরই সতীন, ভালবাসিবার সামগ্রী সে নয়, বরং হিংসা জাগিবারই কথা কিন্তু সরস্বতী অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, মৃতা সতীনকে হিংসা করা দূরের কথা, তাহার প্রতি কি একটা অজানা সহানুভূতিতে ও করুণায় সরস্বতীর আঁখিপল্লব সিক্ত হইয়া উঠে। এত সুখ-সৌভাগ্য পাইয়াও যাহার অদৃষ্টে সহিল না, জীবন-যজ্ঞের পূর্ণপাত্রটি মুখের সুমুখে তুলিতে না তুলিতেই, কালের নির্ম্মম আঘাত যাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলায় ছড়াইয়া মিশাইয়া দিল, তাহাকে সরস্বতী কেমন করিয়া ঈর্ষা করিবেন?

অন্তর্নিহিত বিষাদের বিক্ষুব্ধ বেদনায় একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরস্বতী উনান হইতে কড়াখানি নামাইয়া লইলেন। অমনোযোগে তরকারী ধরিয়া গিয়াছে, লক্ষ্যই করেন নাই।

সূর্য্যের তেজ ক্রমেই প্রখরতর হইয়া উঠিল। আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্য উঠিয়াছে, কিন্তু বাসুর দেখা নাই, সরস্বতীর হাতের কাজে বারে বারে ভুল হয়। প্রস্ফুটিত সরিষা ক্ষেতের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকেন। বর্ষণোন্মুক্ত আকাশের সূর্য্যটি সরিষা-ক্ষেতে সোনার রঙে জ্বলিতেছে। সর্ব্বনাশা রঙে আগুনে চোখ ধাঁধিয়া যায়। বাসু যে তাঁহার সন্তান নহে, ইহাই কি জগতের একমাত্র সত্য কথা? ইহা ছাড়া বলিবার মত আরও কি কিছু নাই? নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সরস্বতীর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সরস্বতী আঁচলে চোখ মুছিলেন। যা রঙের ঢেউ, জল ত আসিবারই কথা। কিন্তু রঙের নয়, পিছন হইতে বাসু তখন রাঙ্গা-মাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—"তিন সত্যি রাঙ্গা-মা, তোমায় না বলে যদি আর কখনও ভাঁড়ারে আমি হাত দিই, বড় তাড়াতাড়ি ছিল কি না?"

* * *

অনেক দিন পরে যখন সরস্বতীর দিকে আবার মন দিবার অবসর পাওয়া গেল, সরস্বতী তখন বিধবা। সেদিনের লাঞ্ছনারত বধূটির সীমন্তের সিঁদুর আর রাঙ্গা শাঁখার পানে চাহিয়া যাঁহারা খুসী হইতেন, এ বিষাদময়ী তপস্বিনীর গৈরিক বেশে তাঁহারা আজ শ্রদ্ধায় নয়ন নত করিবেন। শুভ্র দুখানি শূন্য হাত, পরণে আধময়লা একখানি থান, চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। আশ্চর্য্য! সরস্বতী হাসিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। সেই উঠানটিরই একপ্রান্তে একখানি রেতের

মোড়ায় বসিয়া বাসব সেন ওরফে বাসু একগাদা বক্তৃতা করিয়া চলিয়াছেন। সরস্বতী নির্ব্বাকভাবে বাহিরের অন্ধকার আচ্ছন্ন বাঁশঝাড়টির পানে চাহিয়াছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত বাসবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।

"তুমি দেবে কি দেবে না স্পষ্ট কথা বলে দিলেই হয়। স্বামীর ভিটে, বাপের দেশ, ও সব সংস্কার আমি বুঝি না, বুঝতে চাইও না। এই জমিটা নদীর ধারে, এখানে কারখানা করলে প্রচুর লাভ হবে, আমাদের কোম্পানী হিসেব করে দেখেছে।"

সরস্বতী মুখ খুলিলেন। মাত্র দুটি কথা। "কিন্তু এ আমার স্বামীর ভিটে"।

বাসব সেন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তোমার স্বামীর ভিটে, আর আমারও বাপের ভিটে। তুমি না ছেড়ে দাও, আইন আদালত আছে। যে করে হোক কারখানা আমি বসাবই এখানে। শুধু সেইজন্যই ওদের নিয়ে আমার এই ম্যালেরিয়ার রাজ্যে থাকতে আসা। যত শীঘ্র পারি, ব্যবস্থা আমি করবই।"

প্রতিপক্ষের প্রবল জেদের নিকট সরস্বতীকে শেষ পর্য্যন্ত হার মানিতেই হইল।

সহর হইতে কণ্ট্র্যাক্টার আসিল, যন্ত্রপাতি প্ল্যান যাহা কিছু আবশ্যক, অভাব কিছুরই ঘটিল না।

'সেন এণ্ড চৌধুরী'র প্রকাণ্ড প্ল্যাকার্ডও বসিল। অনেক চাহিয়া চিন্তিয়া ভিটার এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র চালা সরস্বতী বাঁচাইয়া রাখিবার অনুমতি পাইলেন। সরস্বতী স্বামীর ভিটার উচ্ছেদ করিয়া, সরস্বতীর পুত্র কারখানার আয়োজন সুরু করিলেন। আঙ্গিনার প্রান্তে খড়ের গাদা, অনেক সাধের মধু-গুলগুলে আমগাছ, বাঁশের ঝাড়, গোয়ালঘর একে একে সবই অন্তর্হিত হইল। মূর্চ্ছাহত, স্বপ্নোত্থিতের মত স্বামীর ভিটের স্মৃতিচ্ছেদের মর্ম্মান্তিক অভিনয়ের শেষ অধ্যায়টুকু পর্য্যন্ত, সরস্বতী চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মুখে কিছুই বলিলেন না, পাণ্ডুর মুখখানি অন্তরের দুঃসহ যন্ত্রণায় শুধু আরও খানিকটা বিবর্ণ হইয়া গেল মাত্র।

শাশুড়ীর অসহায় অবস্থা দেখিয়া সুনয়না অন্তরালে মেয়েদের নিকট মুখভঙ্গী করিলেন। 'আদিখ্যেতা! পুরোণো পচা জমি-জায়গা আগলে বসে থাকলেই যেন ওঁর স্বামী উদ্ধার হয়ে যাবেন আর কি! ও সব মতলব জানা আছে। আসলে জমি-জায়গাগুলা ওঁর হাতে পড়েছে তাতেই যত আপত্তি। হুঁ—সৎমা বই ত নয়।"

মন্তব্য শেষে সুনয়না একটা বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিলেন। সরস্বতী তখন কি একটা প্রয়োজনে সেই ঘরেই ঢুকিয়াছিলেন। বধূর শেষ কথা কয়টি তাঁহার কর্ণকুহরে যেন একরাশি তীব্র গরল ঢালিয়া দিল। সুনয়না ফিরিয়া চাহিতেই শাশুড়ীর চোখে চোখ মিলিয়া গেল। প্রয়োজনীয় কাজটুকু আর সারা হইল না। পরের মত যন্ত্রণাবিদ্ধ আহত মৌন মুখশ্রী লুকাইয়া সরস্বতী আড়ালে সরিয়া গেলেন। দুই চোখ বাহিয়া তখন অশ্রুজলের উৎস নামিয়াছে। স্বামী যাওয়ার পরে একে একে সকল অধিকারই তিনি হারাইয়াছেন। বাকী আছে শুধু এইটুকু। অন্তরালে বসিয়া যত খুসী তিনি অশ্রুপাত করিতে পারেন, তাঁহার এই একটীমাত্র সুখে বাধা দিবার আর কেহ নাই।

ধরা পড়িয়া সুনয়নাও যে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন নাই, তাহা নহে, কিন্তু মচকাইলেও সহজে ভাঙ্গিবার পাত্রী তিনি নন—'দেখলি? দেখলি ত কেমন আড়ি পেতে পরের কথা শোনা হয়? এদিকে, আমার ছেলে আমার ছেলে, করে পাড়া মাৎ করেন, ওদিকে ছেলে যদি একটু নিজের জমিটুকু চাইল, অমনি স্বামীর ভিটে বলে জেঁকে বসলেন। যত সব লোক-দেখান আদিখ্যেতা।'

ছোট মেয়ে বননীলিমাও মায়ের সুযোগ্যা কন্যা, তৎক্ষণাৎ টিপ্পনীটুকু কাটিতে ভুলিল না, 'হুঁ মার চেয়ে টানে বেশী তাকে বলে ডাইন্। বাবা যতই গ্রাহ্য করেন না, উনি ততই পিঠে পুলি রেঁধে, ছেলে ছেলে করে ছুটবেন পাগল! সৎ-ছেলে কখন আপন হয়?"

এতটুকু মেয়ের বুদ্ধির বহর দেখিয়া সুনয়না ভারী খুসী হইলেন। বড় বন-কেতকী চুপ করিয়া ছিল। নিতান্ত নিরীহ স্নেহপ্রবণ দুঃখী ঠাকুরমাটিকে অন্তরে অন্তরে সে একটু ভাল না বাসিয়া পারে নাই। অল্প কদিন মাত্র তাহারা দেশে আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে সরস্বতী তাহার মনে নিজের জন্য অনেকখানি ঠাঁই করিয়া লইয়াছিল। বনকেতকীর এ অহেতুক পক্ষপাত সুনয়না বা বননীলিমা মোটে পছন্দ করিত না এবং ইহার জন্য বনকেতকীকে

লাঞ্ছনাও কম সহিতে হয় নাই। আজ তাই মাতা ঠাকুরমার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিলে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুনয়না মনে মনে রাগিয়া গেলেন। মুখে বলিলেন, "লিলি তুই আজকাল বেশ চালাক চতুর হয়েছিস ত। কিটি যে হাবা সেই হাবাই রইল। পরের বাড়ী ঘর করতে গিয়ে, ওর কপালে অশেষ দুঃখ আছে দেখিস্।"

মাতার প্রশংসায় বননীলিমা ওরফে লিলি আরও অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। "থাকেন ত এই ন্যাষ্টি পাড়াগাঁয়ে; তার আর কত কিই বা শিখবেন বল? উঃ একমাস এ দেশে থাকতে হলে মরে পচে ভূত হয়ে যাব। যেমন দেশ, তার তেমনি সব অধিবাসী। তাঁত বন্ধ হয়ে খাওয়া দাওয়া শিকেয় উঠেছে। বাবা এত করে বললেন 'আমি মিল খুলছি তোরা এসে কাজে লাগ'; সব যে যার ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল, বলে, 'বাপ-পিতামোর ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে দুগণ্ডা পয়সার জন্য পরের গোলামী! সে আমরা নারব বাবু।"

উত্তেজনায় সুনয়নার চক্ষু দুইটী আকর্ণ বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে।

"জানিস্ একটা হাতকাটা লোক ওদের পাণ্ডাগিরি করছে, বলে কি—যদি হিতমঙ্গল চাস, তবে তোরা খবরদার যেন কারখানায় যাস না। আমার দুর্ম্মতি হয়েছিল তাই গেছলাম। হাতখানা কলের সাথে মুচড়ে কেটে গেল, দুলো অপদার্থ হয়ে বাড়ী ফিরলাম। শুধু দুটো টাকা চেয়েছিলাম রাস্তা খরচা। তাও দিলে না, দুর দুর করে তাড়িয়ে দিলে।" লিলির মুখখানি রাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

"কেন দেবে না তাড়িয়ে শুনি? তোর হাত কাটা গেছে। সে কি তাদের দোষে, না তোর কপালের দোষে? পয়সা দেবে? টাকা দেবে? ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

মা-বোনের এ সব কথা কিটির ভারী বিসদৃশ লাগে; নারীর সহজাত কোমল বৃত্তিনিচয় যাহারা হারাইয়া বসিয়া আছে, তাহাদের মনুষ্যত্বের বাকী আছে আর কতটুকুই বা? কিটি উঠিয়া ঘরে গেল। বাহিরের কর্দ্দমাক্ত মেঠো পথে গলার ঘণ্টা বাজাইয়া মন্থরগতিতে বলদগুলি গাড়ী টানে। একটা ফিঙে পাখী পল্লবিত আমের ডালে বসিয়া অবিরাম পুচ্ছ নাচায়। কাঠবিড়ালী সচকিত ব্যস্ততায় আহার অন্বেষণে এ-ডাল ও-ডালে ফিরিয়া বেড়ায়। ছোট ছোট আগাছা গুলির ভিতর দিয়া একটি গোসাপ কুৎসিত গতিভঙ্গিতে গোয়াল ঘরের পানে আগাইয়া চলে। অলস উদাস মধ্যাহ্নে দূর নদীতীরের ছায়াঘন ধুসর-নীল বন-রেখার দিকে উন্মনা মনে চাহিয়া থাকে। এই হতভাগ্য দেশের নিরীহ উদাস বৈরাগ্যের মধ্যেই কিটি যেন শুধু তাহার অসহায় ঠাকুরমার সঙ্গতি খুজিয়া পায়।

কয়েকদিন হইতেই বাসব ভিতরে ভিতরে অসুস্থতা বোধ করিতেছিলেন, কারখানার কাজ শেষ হইতে তখনও অনেক বাকী। সহরের সিনেমা, পার্টি ইত্যাদি ছাড়িয়া আসিয়া পাড়াগাঁয়ে লিলিরও মন টিকিতেছিল না। অগত্যা ঢাকা হইতে বাসবের পরিবর্ত্তে 'সেন এণ্ড চৌধুরী' কোম্পানী মিষ্টার হোড় ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে গ্রামে আসিলেন। বাসব সপরিবারে ঢাকার বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। সরস্বতীকে ঢাকার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য কেহই বিশেষ সাধাসাধি করিল না, যতটুকু না বলিলেই নয় শুধু সেইটুকু বলিয়াই সুনয়না ক্ষান্ত দিলেন।

মাতা ও ভগ্নীর কঠোর অনুশাসনের মধ্যে ঠাকুরমাকে টানিয়া লইয়া গেলে তাঁহার মানসিক অশান্তির আর সীমা পরিসীমা থাকিবে না, কিটি তাহা জানিত; কাজেই অনুরোধ উপরোধ কিছুই না করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। গরুর গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে সকলকে লুকাইয়া অন্তরালে সে সরস্বতীকে একটী প্রণাম না করিয়া পারিল না। অশ্রুম্লান চোখে সরস্বতী কিটিকে বুকে টানিয়া শুধু মাথায় হাতখানি রাখিলেন। এই একটী মেয়েই আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে লুকাইয়া ভালবাসিয়াছে।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল, সরস্বতী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বাসু অসুস্থতা লইয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন খবর আসিল না।

গ্রামের পিওনকে আসিতে দেখিলেই সরস্বতী হাতের কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসেন। সে কোনদিন বা দাঁড়াইয়া দুটো কথা বলে, কোনও দিন প্রয়োজনহেতু তাড়াতাড়িই পাশ কাটাইয়া যায়, সরস্বতী ঘরে ফিরিয়া আসেন। অকারণেই বুকের ভিতরটা কেমন মুচড়াইয়া ওঠে।

কিন্তু খবর শেষ পর্য্যন্ত আসিল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত খবরে কিটি লিখিয়াছে—"বাবার অসুখ নিউমোনিয়ার আকার গ্রহণ করিয়াছে, বড় ব্যস্ত।"

স্বামীর ভিটে ফেলিয়া যাইবারও উপায় নাই, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিবে না এবং সেখানে যাইলেও সুনয়না আদপেই সন্তুষ্ট হইবে না। গৃহদেবতার চরণতলে সরস্বতীর বুকের শোণিত মানত করিলেন।

কয়েকদিন পরেই পুনরায় খবর আসিল, "বাবা ক্রমেই খারাপের দিকে।" সরস্বতীর একবেলার আহার। তাহাও প্রায় ছাড়িয়া দিলেন। স্বামীর একমাত্র বংশপ্রদীপের জীবন-সঙ্কট, মা হইয়া তিনি কেমন করিয়া আহার মুখে তুলিবেন?

কারখানার শ্রমিক আর মিষ্টার হোড় শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে দিনের পর দিন লক্ষ্য করিলেন, পাগলিনীর মত রুক্ষ, দীর্ণবেশা একটী নারী দিনরাত বাসব সেনের বাস্তুভিটার তুলসীমূলে অনাহারে পড়িয়া থাকে! নারীটীর পরিচয় কেহই জানে না, গ্রামের লোক যাহা বলে তাহাও নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য গল্পকথা।

* * *

আবার যখন এ আখ্যায়িকাটীর যবনিকা উত্তোলন করা গেল, বাসব সেন তখন সবে মাত্র পথ্য পাইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। মিষ্টার হোড় সেদিন সেনের সহিত দেখা করিয়া কারখানা সম্বন্ধে ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছিলেন। কথায় কথায় মিষ্টার হোড় প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা সেন তোমার বাড়ীর যেখানে কারখানা বসেছে, সেখানে কোনও পাগলীকে তোমার মনে পড়ে? ভাঙ্গাচোরা একটা কুঁড়েয় সে থাকে। অদ্ভুত পাগল সে, আর কোনো লক্ষণই নেই শুধু দিনরাত একটা তুলসীগাছের তলায় না খেয়ে-দেয়ে পড়ে থাকবে। কাল যখন আমার লোকেরা তাকে গিয়ে তুললো, তখন সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

বাসবের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখশ্রী উত্তেজনায় রক্তিম হইয়া উঠিল, মিঃ হোড় হাসিলেন—"পাড়ায় রটেছে কি জান? সে না কি তোমার মা। তোমার অসুখে বুকের রক্ত মানত করেছিল, তাই দিয়ে অমনি দুর্ব্বল হয়ে গেছে।"

অকস্মাৎ সেনের মৃতের মত রক্তলেশশূন্য মুখের পানে চাহিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। পরে সেনকে আশ্বস্ত করার অভিপ্রায়েই আবার বলিলেন, "আরে পাগল না কি হে? আমি ওসব কথা বিশ্বাস করলুম না কি? আমি তোমার ফ্যামিলির সঙ্গে এতদিন ধরে সংশ্লিষ্ট, তোমার মা কবে মারা গেছেন, তা কি আমি জানি না, না কি? আমি ওদের জোর করে বললুম, বাসব হয় ত' ওকে চেনেই না। চিনলে তাদের বাড়ী থেকে আমি নিশ্চয়ই শুনতুম। ও কোথাও থেকে গাঁয়ে নূতন এসেছে। কি বল হে?"

বাসব সেন যন্ত্রচালিতের মত মাথা নাড়িলেন। বাহিরে বাসব সেন এমন ভাব দেখাইলেন, যেন ঐ রকম বর্ণনার কোন নারীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই।

কিন্তু অন্তর্নিহিত অবিরাম দ্বন্দ্বে সুস্পষ্ট চিহ্ন বাসবের চোখে মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। বন্ধুর নিকট নিজের আভিজাত্যের গর্ব্বটুকু বজায় রাখিতে আজ তিনি কাহাকে অস্বীকার করিয়া বসিলেন? নিজের মায়ের অধিক স্নেহ-করুণা দিয়া আশৈশব যিনি বাসবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিলেন, সে সেই রাজা-মাকে নয় কি?

আরও দু'একটা কথার পর মিঃ হোড় বিদায় লইলেন। স্খলিত চরণে বাসব নিজের সুট-কেসটী টানিয়া আনিয়া গুছাইতে বসিলেন। রাজা-মায়ের আঁচলের স্নেহচ্ছায়া আজ তাঁহাকে অবিশ্রান্ত আকর্ষণ করিতেছে। বাসব আর কিছুতেই তাঁহার ডাক উপেক্ষা করিতে পারেন না—অবজ্ঞাত হইয়া পরম স্নেহকরুণায় যে দিবারাত্র তাঁহারই মঙ্গলকামনায় ফিরিয়াছে, অবহেলিত হইয়াও নাহারে মাতৃত্ব সন্তানের আয়ু মাগিয়া দেবতার দুয়ারে হত্যা দিয়া পড়িতে বাধা বোধ করে নাই।

বননীলিমার সঙ্গে সুনয়না যখন শপিং সারিয়া গৃহে ঢুকিলেন, সুটকেসটী হাতে তখন বাসব গাড়ীতে উঠিতেছেন। সীটের একপ্রান্ত অধিকার করিয়া কিটি নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছে।

কুঞ্চিত ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে হানিয়া সুনয়না প্রশ্নভরে স্বামীর পানে চাহিলেন।

"রাজা-মায়ের কাছে যাচ্ছি, তাঁর ভারী অসুখ"

মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া বাসব সেন চালককে হাঁকাইতে আদেশ করিলেন। মা-মেয়ে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অতি ক্রোধে স্তম্ভিত সুনয়না শুধু একটী মাত্র কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন "হুঁ! আদিখ্যেতা"।

বাসবের মনে তখন চাঁপাই নদী আবার বন্যা তুলিয়াছে। চাঁপাইয়ের বুকে আজ সে-বন্যা নাই। সেও শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। জগৎশেঠের কুঠী-বংসিনী চাঁপাই আজ মৃতা, হৃতসর্ব্বস্বা। বাসবেরও মনে কি করিয়া যেন শুষ্ক চাঁপাইয়ের সহিত রাজা-মায়ের রুক্ষ চেহারা এক হইয়া মিলাইয়া গেল। যে-দুঃখে রাজা-মা শুকাইয়াছেন, সেই দুঃখেই কি চাঁপাই শুখাইয়াছে? বাসব সেনের দুই চক্ষুতে বুঝি অশ্রু!

ঔরংজীবের আমলে কয়েকটী বিদ্রোহ

—শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মা

খৃষ্টীয় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তৈমুর-বংশীয় রাজবংশ যখন গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত, দিল্লীর সম্রাট্ তখন সাহজাহান। তিনি রুগ্ন। পুত্র ঔরংজীবের ঔদ্ধত্য ও চতুরতা দেখিয়া তাঁহার মনে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যেমন নিজ ভ্রাতাগণকে—সিংহাসনের কণ্টকদিগকে—নিপাত করিয়া পিতৃ-সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন, পুত্র ঔরংজীবও ঠিক তদ্রূপই করিবে। রুগ্ন-শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহজাহান বলিলেন—"তোমাদের সবাইকে ঔরংজীব হত্যা করবে। তোমরা ওর সঙ্গে পারবে না।" সম্রাটের এ-কথা বলার কারণও ছিল—তৎপূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ঔরংজীব বিজাপুর-রাজ ও গোলকুণ্ডা-রাজকে করদানে বাধ্য করিয়াছেন। সম্রাট্ সাহজাহান সুদীর্ঘ চারি বৎসর চেষ্টা করিয়াও যাহা পারেন নাই, ঔরংজীব তিন মাসের মধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন।

পার্শ্বে উপবিষ্ট দারা শিকো অধোবদনে বসিয়াছিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

সাহজাহানের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। তাহা তিনি জীবিত থাকিতেই দেখিয়া গিয়াছিলেন। সাহজাহান জীবিত থাকিতেই ঔরংজীব সিংহাসনের সমস্ত বাধা সরাইয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ঔরংজীবের চরিত্র

অনেকে বলেন, ঔরংজীব খুব নিষ্ঠুর ছিলেন। কিন্তু আবার অনেকে বলেন, তিনি যতই নিষ্ঠুর হউন না কেন, সে নিষ্ঠুরতা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে, রাজকার্য্যের সহায়তার জন্য। কাফি খাঁ বলিয়াছেন, দিল্লীর বাদসাহেরা ইচ্ছা করিলেও রাজনৈতিক কলহ হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাদের যৌবনে যখন পিতা বৃদ্ধ হইতেন, তখন পুত্রদের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিবার দুইটী বিষয় উপস্থিত হইত—হয় সিংহাসন নয় মৃত্যু; যে অপেক্ষাকৃত দুর্দ্দান্ত সেই সিংহাসন লাভ করিতে পারিত এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে নিহত করিত। ঔরংজীব যদি তাঁহার ভ্রাতাগণকে নিহত না করিতেন, বা তিনি যদি সিংহাসন দখলের চেষ্টা না করিতেন, তবে উহা তাঁহার ভ্রাতাগণের কেহ দখল করিত এবং তিনিই ঔরংজীবকে হত্যা করিতেন। ইহা অনিবার্য্য কথা। তবুও সাহজাহান সিংহাসন-লাভের জন্য যতগুলি নির্দ্দোষীকে হত্যা করিয়াছিলেন, ঔরংজীব তাহা করেন নাই। তিনি যাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতেন তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বধ করিতেন না, ঔরংজীব ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বধ করেন নাই। কিন্তু সাহজাহান তাহাও করিয়াছিলেন। ঔরংজীব পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন নাই। বৃদ্ধ পিতার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকে তিনি বন্দী করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যের সংস্রবে আনিতেন না।

ঔরংজীব মুসলমান ধর্ম্মের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। স্বধর্ম্মানুরাগই তাঁহার জীবনের প্রধান গুণ ছিল এবং এই স্বধর্ম্মীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কাফের-হত্যার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি মধ্য-এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণে পরিবেষ্টিত হইয়াও নমাজ পড়িতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রাণ অপেক্ষা নমাজকে ভালবাসিতেন। যে সকল মুসলমান নমাজ-এ অবহেলা করিত, সম্রাট্ তাঁহাদিগকে মোটেই পছন্দ করিতেন না, এমন কি শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কোন স্বধর্ম্মত্যাগী লোককে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে শুনিতে পাইতেন, তবে তাহাকে মৌখিক ভালভাব দেখাইলেও গোপনে তাঁহার শত্রুতা সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাকেও কেহ বিশ্বাস করিত না। সমস্ত রাজকার্য্য তিনি নিজ হস্তে করিতেন এবং পরের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে অবহেলা

তাঁহার চরিত্রে দেখা যায় নাই। সমস্ত বিষয়ই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া তবে কার্য্য করিতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে নিজেকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। এতবড় সাম্রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার একজনের দ্বারা সমাধান হওয়া কঠিন, তাই চারিদিকে দোষ-ত্রুটী রহিয়া যাইত এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত।

কাফি খাঁর বিবরণের এক স্থানে পাওয়া যায়—"কেবল তৈমুর-বংশীয়দের মধ্যে নহে ; কেহই সেকেন্দর লোদীর পর ঔরংজীবের মত কষ্টসহিষ্ণু সম্রাট্ দেখে নাই। তাঁহার সাহসও অসাধারণ ছিল। তিনি কোরান বিশ্বাস করিয়া উহার পদ্ধতি মানিয়া চলিতেন। তাঁহার ওমরাহগণ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ছিল। এই জন্য সম্রাট্ যখন যাহা করিতেন, সবগুলিই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত।"*

কোন কোন বিষয়ে ঔরংজীব শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা মানিয়া লওয়া যায়, তবে রাজ্যশাসন ও রাজ্যের মঙ্গল সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্যান্য বাদশাহের তুলনায় অনুরূপ ছিল, এবং এই জন্যই তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

ঔরংজীবের শিল্পে ও সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি লোককে শিক্ষা দিতে যথেষ্ট আনন্দানুভব করিতেন, নিজে যেটি ভালবাসিতেন অপরকেও সেটি বুঝাইতে, শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। ট্যাভের্নিয়ার সাহেব বলেন, কৈশোরে ঔরংজীব খুব সঙ্গীতপ্রিয় ও সঙ্গীপ্রিয় ছিলেন। ট্যাভের্নিয়ারের এই কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে আমরা ঔরংজীবের চরিত্রে ঐ দুইটী গুণের অভাবই দেখিতে পাই।

তিনি খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। কোন বাজে ব্যয় তিনি করিতে ভালবাসিতেন না। নিজে মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কবরে যেন বেশী কিছু খরচ না হয়। পিতা শাহজাহান যখন রাজকোষ শূন্য করিয়া মমতাজের সমাধি-সৌধ (তাজমহল) নির্ম্মাণে ব্যস্ত, ঔরংজীব পিতাকে এত বাজে ব্যয় হইতে নিরস্ত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। এমন কি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় প্রধানা বেগমসাহেবাদ্বয় উদীপুরী ও যোধপুরী—কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। যে সকল ব্যক্তি সম্রাটের উপকারের জন্য কাহারও উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিত, সম্রাট্ ঔরংজীব তাহাদের কার্য্যোদ্ধারের পর হত্যা না করিয়া ছাড়িতেন না। মনে করিতেন, লোকটী জীবিত থাকিলে আরও কাহার উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহার ঠিক নাই।

লালসা, সম্মুখ-ক্রোধ, সুরাপান, নারীর প্রতি আসক্তি ঔরংজীবের চরিত্রে দেখা যাইত না তিনি প্রমোদ-উদ্যানে অতি অল্প সময় ব্যয় করিতেন।

শেষ জীবনে ঔরংজীব বড়ই অশান্তিতে কাটাইয়াছেন, দক্ষিণ হস্ত পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল, পরপর দুই পুত্র বিদ্রোহ করায় তাঁহার মনে, নিজের ভ্রাতৃহত্যা ও পিতৃবিদ্রোহের স্মৃতি জাগরূক করিয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহার মনে যে অনুশোচনা জন্মে, তাহাতে সম্রাট্ ঔরংজীব বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন।

তিনি শেষ জীবনে যে সকল চিঠি পরস্পরের নিকট প্রেরণ করিতেন, সে গুলি বড়ই মর্ম্মান্তিক।"—আমি সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসন মোটেই করিতে পারি নাই··· কৃষকদের হিতসাধনও সম্ভব হয় নাই······আমার সৈন্যগণ আমার মতই অসহায়, অস্থির ও বিমূঢ় বোধ করিতেছে।" ·····

পুত্রগণ যখন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত, আমীর-ওমরাহগণ যখন পরস্পর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসোন্মুখ, চারিদিকে যখন বিদ্রোহ ও অশান্তির আগুন জাজ্বল্যমান, তখন ঔরংজীব নিজের মনে মনে ব্যর্থ জীবনের গ্লানি ও ভ্রাতৃহত্যার অনুশোচনা লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে তৈমুরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিলোপ আরম্ভ হয়।

বিদ্রোহের সূচনা

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে ঔরংজীবের রাজ্যাভিষেক হয়। কিন্তু অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিই অভিষেকের সময় আসিলেন না† সম্রাট্ ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। এই অভিষেকে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। মনে করিলেন পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষেক করিবেন।

তিনি কয়েকজন প্রধান ওমরাহকে এই বিষয়ে পরামর্শ

* ট্যাভের্নিয়ার-এর বিবরণ।

† কথিত আছে বাংলার নবাব মীরজুমলা গোপনে চক্রান্ত করিয়া সম্রাটের দরবারে নিমন্ত্রিতদের আসিতে দেন নাই।

করিতে ডাকিলেন এবং রাজা যশোবন্ত সিংহ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। সম্রাট পূর্ব্ব হইতে বাংলার নবাব মীরজুমলার উপর কোনও কারণ বশতঃ সন্তুষ্ট ছিলেন না; এখন যখন জানিতে পারিলেন এই ষড়যন্ত্রের তিনি প্রধান মন্ত্রী, তখন ঔরংজীব তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত-মুখল হইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে কোন খ্যাতনামা ও লোকপ্রিয় লোককে লজ্জা দিতেন না। কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করাইতেন।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি খাজুয়া ও দেওরাই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মনে করিলেন, এইবার রাজ্যাভিষেক করিবেন। যাহা মনস্থ করিলেন, অমনি তাহা সম্পন্ন করিতে ব্রতী হইলেন; তিনি সমস্ত নিমন্ত্রিতদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, এইবার যিনি নিমন্ত্রণ অবহেলা করিবেন তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। রাজ্যাভিষেক আরম্ভ হইল; সবাই আসিলেন, আসিলেন না কেবল মীরজুমলা; মীরজুমলা একটা অজুহাত দেখাইলেন যে তাঁহার শরীর অসুস্থ।

সম্রাটের দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেকে বিশেষ কোন ব্যয় তিনি করিলেন না, সামান্য কিছু ব্যয় করিয়া তিনি রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিলেন, পরে মীরজুমলাকে হত্যা করিবার অভিলাষে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মীরজুমলা যেন তাঁহার সৈন্যদিগকে প্রস্তুত রাখে, কারণ, শীঘ্রই তাঁহাকে আহোমদিগকে জয় করিতে আসামে যাইতে হইবে। এই আহোমদিগকে জয় করা বড় সহজ কথা ছিল না।

আহোম-বিদ্রোহ

ঔরংজীবের পিতার আমল হইতেই এই আহোমদিগের সহিত মুঘল সম্রাটের বিবাদ ও খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়াছিল। তখন কুচ বা হজ জিলা * বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, এই সূত্রেই সাহজাহানের সহিত আহোমগণের বিবাদ † বাধিয়াছিল, কিন্তু ১৬৩৮ অব্দে এই দুই পক্ষের সন্ধি হয়।

সিংহাসনের অধিকার লইয়া যখন দিল্লীতে বিরোধ উপস্থিত, তখন আহোমগণ সুযোগ বুঝিয়া (১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে) গৌহাটী দখল করেন। ঔরংজীব এই অন্যায়ের প্রতীকার জন্য এবং মীরজুমলাকে শাস্তি দিবার জন্যই মীরজুমলাকে আসাম-বিজয়ে প্রেরণ করিলেন।

১২৬১ অব্দে মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করেন। তিনি সঙ্গে লইলেন, ১২ হাজার অশ্বারোহী, ২৮ হাজার পদাতিক ও একটি বিশাল বাহিনী; কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের নিকট সৈন্য-সাহায্য চাহিয়াও মীরজুমলা কোন সাহায্য পাইলেন না। মীরজুমলা তাহাতে ভীত হইলেন না, তিনি প্রথমে কয়েকটি যুদ্ধে অহোমদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য নাশ হইল, কারণ আহোমগণ পাহাড়ের অন্তরালে থাকিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেছিল এবং সহজে শত্রুর সম্মুখীন হইতেছিল না। মীরজুমলা পুনরায় সম্রাটের নিকট সৈন্য-সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু সম্রাট কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

মীরজুমলা তখন মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া ঘোর বিক্রমে যুদ্ধ চালাইলেন, তিনি কুচবিহার জয় করিয়া ১৬৬২ অব্দে আহোমদের রাজধানী ঘরগাঁ অধিকার করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মীরজুমলার প্রায় অর্দ্ধেকের উপরে সৈন্য নিহত হইল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ পথ-শ্রান্তিতে ও যুদ্ধ-ক্লান্তিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আহোমগণ সুযোগ বুঝিতে পারিল। তাহারা পুনরায় মীরজুমলাকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিল। এবং ক্রমশঃ মীরজুমলাকে ঘরগাঁ হইতে তাড়াইয়া ডিরভাগ অঞ্চলে আনিয়া ফেলিল।

এই যুদ্ধে আহোম-রাজ জয়ধ্বজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কনকধ্বজ নিহত হন। আহোমরাজ এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন। আহোমগণও রাজার এই পরিবর্ত্তনে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল এবং তাহারা মীরজুমলাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও বাৎসরিক বহু সহস্র টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া মীরজুমলার সহিত সন্ধি করিলে, আহোম-রাজ জয়ধ্বজ পুত্রশোকে ও শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অপমানের গ্লানিতে সংসার-বিরাগী হইয়া গেলেন (১৬৬৩ খৃঃ অঃ)।

মীরজুমলা আহোমদিগকে শায়েস্তা করিলেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল এবং

---

* বর্ত্তমানে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া।

† ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আহোমগণ তাহাদের আদিম বাসস্থান উত্তর-ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া বাস করিতেছিল। ক্রমে ইহারা সমগ্র আসাম অধিকার করে এবং হিন্দু-ধর্ম্মের আচার-ব্যবহার পালন করিতে থাকে। ইহারা ছিল দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতি এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা পালন করিত। ক্রমে অবশ্য তাহারাও সভ্য হইয়াছিল।

ঢাকায় ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হইল।* কিন্তু মরিয়াও মীরজুমলা নিস্তার পাইলেন না। দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল যে, সম্রাট্ মৃতদেহ দেখিতে চান। অগত্যা ১৩ দিন পরে সেই মৃতদেহ গলিত অবস্থায় দিল্লী পৌছিলে, সম্রাট খুব দুঃখের (লোক-দেখান) সহিত মহাসমারোহে মৃতদেহ কবরে প্রোথিত করেন।

বাংলার পরবর্ত্তী সুবাদারকে (সায়েস্তা খাঁকে) তিনি যখন আরাকান ও চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) অধিকার করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তখন গিরবন খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে কয়েক সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে (সায়েস্তা খাঁর অগোচরে) সায়েস্তা খাঁকে সাহায্য করিতে পাঠান। ইহা ঔরংজীবের সন্দিগ্ধ চিত্তের নিদর্শন।

সায়েস্তা খাঁ মগ-দস্যুদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শনের যোগাড় করিতেছিলেন, সেই সময় গিরবন খাঁ তাঁহার বাহিনী লইয়া সায়েস্তা খাঁকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন এবং উভয়ে একযোগে চাটগাঁও অধিকার করেন। আরাকান-রাজও মুঘল সম্রাট্কে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতিসমূহ চিরদিনই দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাহারা প্রায়ই দস্যুগিরি ও লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে ইউসুফবাই দলই ছিল প্রধান। ইহারা দলে খুব ভারী এবং প্রায়ই সিন্ধুনদের ওপারে গিয়া লুঠতরাজ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। কিছুদিন পরে ইউসুফবাইগণ সম্রাটের নিকট পরাজিত হইল বটে, কিন্তু ১৬৭১ অব্দে আফ্রিদি ও খটকদল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলও ইহাদের সহিত যোগদান করিয়া একত্রে বিদ্রোহ করিল। ১৬৭৪ অব্দে ইহারা সম্রাট্-প্রেরিত ইমাম মহম্মদের নেতৃত্বে একটি মুঘল বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে।† ঔরংজীব এবার স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাত্রা করেন। বহু কষ্টে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বলে নহে কৌশলে। ঔরংজীব কৌশল করিয়া আফ্রিদি ও খটকদল এই দুই দলের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেন। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ কূটনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমে আফ্রিদি দলপতি বজ্রেশ্বরকে** অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া উভয় দলের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করেন এবং ক্রমে এই বিবাদ যখন যুদ্ধে পরিণত হয়, তখন ঔরংজীব সুযোগ বুঝিয়া উভয়কে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন। কিন্তু খটক-দলপতি মাজব্বর জজাউ বন্দী হইবামাত্র নিজ হস্তে ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু বজ্রেশ্বর বন্দী অবস্থায় দিল্লী আসিলে সম্রাটের নিকট হইতে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। সম্রাট্ প্রাণভিক্ষা দিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। তবে জাঠদের বিদ্রোহের সময় একজন বজ্রেশ্বরের নাম পাওয়া যায়; অনেকে বলেন এই বজ্রেশ্বরই পরে জাঠদের সহিত যোগদান করিয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল।

ফকির-বিদ্রোহ

ঔরংজীব যখন পাঞ্জাবের শিবিরে লাহোর যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট একটি কাশ্মীরী ফকিরের আগমন হইল। ফকির বিশেষ কোন কথা না বলিয়া সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলে, সম্রাট্ সেই ফকিরকে বলিলেন যে, "তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার উপযুক্ত কি না, তাহা যদি প্রমাণ করিতে না পার তবে আমি তোমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিব না।" ফকির পুনর্ব্বার কোন কথা না বলিয়া মৃদু হাসিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর মনে করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া ফেলেন এবং অদম্য প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন।†† ইহাতে কাশ্মীরের সমস্ত ফকির-সম্প্রদায় সম্রাটের উপর চটিয়া যান এবং সম্রাটকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিতে থাকেন। কিন্তু পরে ইহা মিটমাট হইয়া যায়। সম্রাট্

* কেহ কেহ বলেন, সম্রাট্-এর গুপ্তচরের দ্বারা তিনি নিহত হন। ইহা সায়েস্তা খাঁর পরামর্শে সংঘটিত হইয়াছিল।

† এই ইমাম মহম্মদ যখন পরাজিত হইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন, তখন সম্রাট্ই তাহার হাত ডান হাতের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলেন। উদ্দেশ্য যে, আর তরবারি ধরিতে না পারে।

** ইনি হিন্দু ছিলেন কিন্তু ইঁহার অধিকাংশ অনুচরই মুসলমান

†† অনেকে বলেন—সম্রাট তাঁহাকে গুপ্তচর মনে করিয়াই স্বীকারোক্তি করাইবার জন্য তাহাকে বধ করেন। কিন্তু কাফি খাঁ বলেন—"সম্রাট ভুল করেন নাই ফকিরটী শত্রুপক্ষের গুপ্তচরই ছিল।"

উক্ত ফকিরদিগকে ডাকিয়া প্রত্যেকের আশীর্ব্বাদ শিরে ধরিয়াছিলেন এবং কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিয়াছিলেন, জীবনে কোন ফকিরকে অপমান করিবেন না।

জাঠ-বিদ্রোহ

ঔরংজীব যখন এইরূপ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন, তখন (১৬৬৯ অব্দে) মথুরায় জাঠগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাদের দলপতি "দোকুলা" * প্রকাশ্য যুদ্ধে সম্রাটের ফৌজদারকে হত্যা করেন। বহু কষ্টে প্রায় এক বৎসর যাবৎ যুদ্ধ চলিয়াছিল। জাঠগণ সাধারণতঃ হিন্দুদের কিছুই বলিত না। মুসলমান দেখিলেই হত্যা করিত এবং মুসলমানদের উপর যারপরনাই অত্যাচার করিত। ক্রমে সম্রাট-সৈন্যের নিকট ইহারা পরাজিত হয় এবং দোকুলাকে সম্রাট গাত্রচর্ম্ম তুলিয়া নুন মাখাইয়া হত্যা করিয়াছিলেন।

বুন্দেলারাজ ও ছত্রশাল বিদ্রোহ

যখন ঔরংজীব হিন্দু দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া একাকার করিতেছিলেন, তখন ছত্রশাল ও বুন্দেলারাজ এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বিদ্রোহ করিলেন। এইবার সম্রাট প্রমাদ গণিলেন। তিনি প্রথমে বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। ছত্রশালের রাজ্য হিন্দুদের আশ্রয়ের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল।

ছত্রশালের পিতা চম্পৎ রায় বহুবার দিল্লীর সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। শেষে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন এইবার তাঁহাকে ধৃত হইতে হইবে, তখন তিনি নিজে আত্মহত্যা করিয়া বন্ধন-ভয় হইতে রক্ষা পাইলেন। ছত্রশাল তখন দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর-রাজের অধীনে চাকুরী করিতেন। এই সময় তিনি শিবাজীর নিকট যুদ্ধবিদ্যা ও দলগঠন-প্রণালী সম্যক্ শিক্ষালাভ করেন এবং ভবিষ্যতে শিবাজীর সাহায্য পাইবেন, শিবাজীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি বহুবার সম্রাটের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। শেষে যখন দেখিলেন, সম্রাট আর কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না, তখন তিনি সম্রাটকে রাগাইবার জন্য দিল্লী-প্রাসাদে সাতটি মুসলমান ফকিরের কর্ত্তিত মুণ্ড পাঠাইয়া দেন। এই মুণ্ডগুলির প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া বৈষ্ণব-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট যাহাতে রাগিয়া যান। সম্রাট চটিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। ছত্রশাল একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া সেখানে সব অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হিন্দুদের আশ্রয় দিতে লাগিলেন এবং মুসলমান-দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সৎনামী-বিদ্রোহ

সাধারণ অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুগণও ঔরংজীবের ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কৃষক ও শ্রমিকগণ বিদ্রোহ করিতে লাগিল। সৎনামী ** নামক হিন্দুদের ভিতর একটি নিরীহ সম্প্রদায় ছিল। পাতিয়ালা রাজ্যের নরনাউল ও মেওয়াট নামক স্থানে ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। † তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট কুসংস্কার ছিল।

ইহারা যে বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহা বাদশাহের অত্যাচারে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ক্রমে কিছু কিছু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতে লাগিল এবং নরনাউল স্থানটী অধিকার করিয়া ফেলিল। সম্রাট ঔরংজীব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ বিদ্রোহের পর বিদ্রোহের ফলে সম্রাটের বিরক্তি ধরিয়াছিল। এবারও সম্রাট নিজে বিদ্রোহ দমন করিতে চলিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টারও যখন তিনি বিদ্রোহীদের সন্ধান পাইলেন না, তখন তিনি একটী চাল চালিলেন। একদিন রাত্রে তিনি শিবির তুলিয়া লইয়া একটী পর্ব্বতের অন্তরালে স্থাপনা করিলেন। প্রভাতে সৎনামীগণ দেখিল সম্রাট নাই—মনে করিল পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহী দলপতি ভীমদাস একটী গণক দ্বারা গণাইয়া জানিতে পারিলেন যে, সম্রাট পলায়ন করিয়াছেন।

* অনেকে বলেন ইঁহার পুরা নাম "গোকুল জাঠ"।

** মা-আসির-ই-আলমগিরী গ্রন্থে পাওয়া যায় ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, নাপিত, সূত্রধার, চর্ম্মকার, ধোপা, ভূইমালী, ইত্যাদির প্রাধান্য ছিল।

কাফি খাঁর বিবরণে প্রকাশ, সৎনামীগণ সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কোনপ্রকার অন্যায় ব্যবহার বা মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিত না। যদি কেহ তাহাদের উপর অত্যাচার করিত তবে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইত।

† বর্ত্তমান আলোয়ার রাজ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহারা কুসংস্কারান্ধ। জীমুদাস-পণ্ডিত ও পুরোহিত আনাইয়া শত্রু-পরিত্যক্ত ভূমিতে একটী বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞের ফলে (সৎনামীদের মনে এইরূপ ধারণাই ছিল) শত্রুগণ আর তাহাদের দেশে আসিবে না।

যখন সৎনামীগণ যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত, তখন ঔরংজীব ভীম বিক্রমে পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সৎনামীগণ যে যাহার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। সম্রাট এইরূপে সৎনামী বিদ্রোহ দমন করিলেন।

হিন্দুমুখী মুসলমান বিদ্রোহ

১৬৭৫ অব্দে কর্ণাটকে কয়েকজন হিন্দুমুখী মুসলমান বিদ্রোহ করিয়াছিল। ইহারা দল বাঁধিয়াছিল দেশের উন্নতির জন্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় এই হিন্দুমুখী দলটী দুইটী ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার একটী দলের ইতিহাস আমরা পাই। এই দলটী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য করিত। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটকে অত্যাচারী হইতে না দেওয়া। ইহারা প্রথমে সম্রাটকে অনেক উপদেশপূর্ণ পত্রদ্বারা যখন কোন উপকার পাইল না, তখন সম্রাটের নামে কুৎসা রটাইতে লাগিল। সম্রাট ঔরংজীব ইহাদের দমন করিতে বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই দলের কোনই সন্ধান পাইলেন না। শেষে এরূপ ব্যবস্থা সম্রাট করিলেন যে, সমস্ত কর্ণাটক গুপ্তচরে ছাইয়া ফেলিলেন। তবুও কোন সন্ধান পাইলেন না। এই দলের লোক সকল সম্রাটের অন্দরমহলের সংবাদও জানিতে পারিত। একবার সমস্ত দিল্লী সহরে এইরূপ লিখিত কাগজে ভরিয়া গেল—"সম্রাট তাঁহার ভগিনীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ।"* এই সংবাদে ঔরংজীব তেলে বেগুনে জ্বলিয়া অন্তঃপুরের সমস্ত খোজাকে তাড়াইয়া দিয়া নূতন খোজা আনয়ন করিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, অন্দর-মহলের খবর বাহিরে প্রকাশ পায় এই খোজাদের দ্বারা। শেষে তাহাতেও যখন সেই হিন্দুমুখী দলের কোন অসুবিধা হইল না, তাহারা পূর্ব্বের মত ঔরংজীবের অন্দর মহলের অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন ঔরংজীব বেগমদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে এই দলের নেতা খন্দুকার গাবুল মল্লিক সম্রাটের গুপ্তচরের হস্তে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু তিনি কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে ঔরংজীব দুইজন বন্দীকে সন্দেহ করিয়া বধ করেন এবং কয়েকটী কারাবন্দীকে সাজাও দেন, কিন্তু বেশী দিন ঔরংজীবকে এই দলের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে হয় নাই। ইহার কিছু দিন পরে আর উক্ত হিন্দুমুখী মুসলমানগণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শিখ বিদ্রোহ

ঔরংজীবের দুর্নীতির জন্য শিখসম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, জাহাগির শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ শিষ্যদিগকে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। হরগোবিন্দ সুদীর্ঘ বার বৎসর মোগল কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। নবম গুরু তেগবাহাদুর যখন কাশ্মীরী পণ্ডিতগণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন তিনি ঔরংজীবের হাতে ধৃত হন। তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলায় তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন না। তেগ বাহাদুর খুব দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন দিল্লীতে কারারুদ্ধ তখন তাঁহার নামে একটা অভিযোগ আসে যে, তিনি সম্রাটের হারেমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সম্রাট এই অভিযোগের কৈফিয়ৎ চাহিলে তেগ বাহাদুর উত্তর দিলেন,—"মহারাজ, আমার দৃষ্টি আপনার অন্তঃপুরে ছিল না। ছিল ঐ পরদেশী শ্বেতাঙ্গদের উপর। আমি দেখিতেছি তাহারা আপনার রাজ্য গ্রাস করিতে আসিয়াছে।" তিনি মৃত্যুর সময় একখানি কাষ্ঠফলকে লিখিয়া গিয়াছিলেন "শির দিয়া, শের নেহি দিয়া।" ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ, শিখজাতিকে এক নবীন আদর্শের শিক্ষা দান করিল। এই তেগ বাহাদুরের আত্মত্যাগই পরবর্ত্তী শিখ-বিদ্রোহের ও শিখদের উন্নতির প্রধান কারণ।

* Travelling in India—by J. W.. Waldon, নামক পুস্তকে ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তবে ঔরংজীবের ভগিনী জাহানারার সহিত নহে, জাহাঙ্গীরের অন্য একজন বেগমের কন্যা "নিরুন্নেসা"-র সহিত এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে।

রাজপুত বিদ্রোহ

যশোবন্ত সিং প্রমুখ যে সকল রাজপুত সম্রাটের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহারাও সম্রাটের ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

মাড়বারের রাজা যশোবন্ত সিংহ সম্রাট্‌-সৈন্যসহ কাবুলে গমন করেন। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে আফগনিস্থানে জামরুদ নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে ঔরংজীব সুযোগ বুঝিয়া মাড়বার রাজ্য স্বরাজ্যভুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু রাজপুতদের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সম্রাটের সাহস হইল না। সম্রাট মনে করিলেন, যশোবন্তের বিধবা স্ত্রী ও নাবালক পুত্র* ইহাদের নিজ অন্তঃপুরে রাখিয়া লালন পালন করিবেন † এবং এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যশোবন্তের নাবালক পুত্র ও স্ত্রীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেন।

রাঠোর-রাজগণ সম্রাটের এই ইচ্ছায় বাধা প্রদান করেন এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যশোবন্তের নাবালক পুত্র অজিতের বন্ধু ছিল অনেক, অনেক রাজপুতই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, তাঁহাদের ভিতর দুর্গাদাস অন্যতম। শক্তিতে, কৌশলে, বীরত্বে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে দুর্গাদাসের সমতুল্য রাজপুত তখন একজনও দেখা যাইত না। তাঁহার অধীনে একদল রাঠোর সৈন্য সম্রাটের বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। যশোবন্তের শিশু পুত্র অজিত সিংহ ও রাণীকে সম্রাট ধরিয়া আনিবার জন্য এই সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাদাস এই সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অজিতকে ও যশোবন্তের স্ত্রীকে লইয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করেন। কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর তিনি পুনরায় সম্রাটের সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় রাঠোর সৈন্য মুসলমান বাহিনীকে বাধা প্রদান করিয়া হটাইয়া দিল। এইরূপে দুর্গাদাস বহু কষ্টে রাজকুমার ও রাজমাতাকে লইয়া রাজধানীতে আসিলেন।

ইহার পর ঔরংজীব স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যোধপুরের কতকগুলি সহর অধিকার করিয়া, রাজধানী ও নগর লুণ্ঠন করিয়া, মন্দির ভাঙ্গিয়া, মসজিদ তুলিয়া, নানারূপ অত্যাচারে রাজপুতদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। মেবারের রাণা রাজসিংহ এই সময় অজিতের সাহায্যে যোগদান করেন।* সম্রাট ঔরংজীব যখন রাজপুতদের উপর জীজীয়া কর ও কতগুলি নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন, তখন রাজসিংহ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ঔরংজীব অতঃপর মেবার আক্রমণ করিলেন। রাজসিংহ শৈলমালার আশ্রয়ে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কতক সম্রাট্‌-সৈন্য রাজধানীতে ও গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া, মন্দির ও বহু দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ইহাতে রাজপুতগণ ক্ষান্ত হওয়া দূরের কথা, অধিকন্তু আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। রাজপুত সৈন্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে চারিদিক হইতে অতর্কিতে সম্রাট-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল এবং একদিন সম্রাটের চতুর্থ পুত্র আকবরের শিবির আক্রমণ করিয়া রসদাদি লুণ্ঠন করিয়া ফেলিল। ঔরংজীবের সৈন্যদল ক্রমশঃ হতভম্ব ও ত্রাসিত হইয়া উঠিল। অন্যভাবে কতকগুলি সৈন্য সম্রাটের বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল।

পুত্রের বিদ্রোহ

আকবর সম্রাটের খুব প্রিয় পুত্র বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখা গেল, আকবর ঔরংজীবের মতই পিতৃভক্ত। আকবর এবার মনে করিলেন, তিনি রাজপুতদের সহায়তায় ঔরংজীবকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবেন। তিনি রাজসিংহের সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আনাগোনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রাজপুতদের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে; তিনি সম্রাটের সৈন্যদিগের মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া দিবেন। একেই ত' কতকগুলি সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে

* ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে (যশোবন্তের মৃত্যুর তিন মাস পরে) যশোবন্তের দুইটী যমজ পুত্র হইয়াছিল। ছেলেদুটীর একটী জন্মের কিছুদিন পরেই মারা যায়। অপরটী ইতিহাসে অজিত সিংহ নামে প্রসিদ্ধ।

† আবার অনেকে বলেন, ঔরংজীব উক্ত ছেলেটীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মনস্থ করেন।

* টড্ সাহেব বলেন, অজিত সিংহের মাতা শিশোদিয় বংশের মেয়ে ছিলেন এবং সেই সূত্রে রাজসিংহের সহিত অজিতের আত্মীয়তা ছিল।

—আকবর তাহাদিগকে হাত করিলেন এবং ঔরংজীবের সৈন্যগণের মধ্যে নানারূপ উত্তেজনা-বাণী প্রচার করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আকবর চারিদিক আঁটঘাট বাঁধিয়া কার্য্যে নামিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঔরংজীব আকবরের চক্রান্ত ধরিয়া ফেলিলেন এবং তিনি যে জানিতে পারিয়াছেন এরূপ আভাস প্রকাশ করিলেন না। তিনি রাজপুতের সহিত আকবরের মিত্রতা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, আকবর যদি রাজসিংহের সহিত একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করে, তবে তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি এই সময় প্রকৃত কু-চক্রীর চাল চালিলেন। তিনি আকবরকে অতিরিক্ত স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আকবরকে এরূপ আভাস দেন যে, তিনি এখন বৃদ্ধত্বে পদার্পণ করিয়াছেন, রাজ্যের উপর আর তাঁহার লোভ নাই; এবার দিল্লী পদার্পণ করিয়াই আকবরকে সিংহাসন প্রদান করিবেন। আকবর একটু সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি পিতার এই স্তোকবাক্যে একটু আশ্বস্ত হইয়া বড় যত্নে শৈথিল্য প্রকাশ করেন। ঔরংজীব দেখিলেন যে, তাঁহার ঔষধ কাজে লাগিয়াছে, ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ঔরংজীব ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি আকবরের বিষদাঁত ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুসিব্বর গাজী * ও কমলসুন্দরী † এই দুইজন গুপ্তচর এই সময় তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

১৬৮০ খৃঃ অব্দে আকবর যখন সম্রাটের আশ্বাসবাণী অবহেলা করিয়া ও রাজসিংহের সহায়তা পাইয়া সত্যই বিদ্রোহ করিল, তখন ঔরংজীব প্রমাদ গণিয়া রুসিব্বর গাজীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, রাজপুতের সহিত আকবরের বিবাদ বাধাইতে হইবে, রাজপুতের মনে আকবরের উপর সন্দেহের সৃষ্টি করিতে হইবে। ঔরংজীব রুসিব্বর গাজীকে দিয়া আকবরের দস্তখৎ জাল করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি আকবর যেন ঔরংজীবের নিকট লিখিতেছেন—এইরূপ ভাব। তাহাতে এই দেখান হইল যে, আকবর রাজপুতদের সহিত মিত্রতা করিতেছেন, ঔরংজীবের নিকট রাজসিংহ ও দুর্গাদাসকে ধরাইয়া দিবার জন্য। কমলসুন্দরী এই পত্র লইয়া একদিন গভীর রাত্রে ভিখারিণী সাজিয়া আকবরের শিবির হইতে বাহির হইয়া রাজপুত শিবিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। যেন হঠাৎ ভুল করিয়াছেন এইরূপ ভাব দেখাইয়া পত্রখানি লুকাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ফলে কমলসুন্দরী যাহা চাহিতেছিলেন, তাহাই হইল। তিনি রাজপুত সৈন্যের হস্তে ধৃত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজসিংহ ও দুর্গাদাস খবর পাইয়া এক সঙ্গে আসিলেন এবং কমলসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কি উদ্দেশ্যে গত রাত্রে এখানে আসিয়াছিল। ইহাতে কমলসুন্দরী বাগ্র বলিল তাঁহার মর্ম্মার্থ এই যে, তিনি আকবরের শিবির হইতে ঔরংজীবের শিবিরে যাইতেছিলেন, পথ ভুল করিয়া রাজপুত শিবিরে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপ জালপত্রখানি দেখাইলেন। রাজসিংহ পত্র পড়িয়া আকবরের উপর জ্বলিয়া উঠিলেন কিন্তু দুর্গাদাস ঘটনা কতকটা অনুমান করিলেন। এবং আকবরকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পত্র বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা ঔরংজীবের চক্রান্ত। তিনি কমলসুন্দরীকে ছাড়িলেন না। বন্দী করিয়া রাখিলেন। এবং আকবরের সহিত আলাপ করিয়া আকবরকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু রাজসিংহ কিছুতেই আকবরকে বিশ্বাস করিলেন না। দুর্গাদাসও কিছুতেই আকবরের উপর রাজসিংহের বিশ্বাস আনয়ন করাইতে পারিলেন না। এইরূপে ঔরংজীবের চক্রান্ত সিদ্ধ হইল। আকবরের পলায়ন ভিন্ন উপায় রহিল না। তিনি পলায়নের

* কাফি খাঁর বিবরণে প্রকাশ—রুসিব্বর গাজী গুপ্তচরদের ভিতর সম্রাটের বিশেষ বিশ্বাসী ছিলেন। সম্রাট্ ইহার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। ইনি ফকিরের বেশ পরিধান করিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সাজাহানের সময় হইতে রুসিব্বর গাজী উক্ত কার্য্যে বহাল ছিলেন। সম্রাট্ কখন কোন পরামর্শের দরকার হইলে উঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তিনি অন্য কোনও লোককে এত বিশ্বাস করিতেন না।

† কমলসুন্দরী ইঁহার ছদ্মনাম। ইনি জাতিতে মুসলমান। কোন অভিজাত মুসলমান বংশে ইঁহার জন্ম। রাজস্থানে কোন অসন্তোষের সন্ধান পাইলেই ইনি রাজপুতনায় ঐ ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া গুপ্ত কথা ও সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। কাফি খাঁ বলেন—যে, দুর্গাদাস ইঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্গাদাস তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এই ব্যাপারে রাজসিংহের সহিত দুর্গাদাসের মনো-মালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। আকবর রাঠোর বীরদের সহিত খান্দেশ ও কালানার পথে মারাঠা দেশে চলিয়া গেলেন। মারাঠারাজ সম্ভাজীর রাজ-সভায় তিনি মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

ঔরংজীব যখন দেখিলেন, তাঁহার চক্রান্ত সিদ্ধ হইয়াছে, আকবর মারাঠা দেশে পলায়িত, তখন তিনি রাজসিংহের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ঔরংজীবের এই শিক্ষা হইয়াছিল যে, রাজপুতদের বল-প্রয়োগ করিয়া জব্দ করা যাইবে না। রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সহিত তিনি সন্ধি করিলেন। জীজীয়া করের পরিবর্ত্তে রাজপুতগণ কয়েকটী জিলা সম্রাটকে ছাড়িয়া দিলেন। সম্রাট্‌ সসৈন্যে মেবার ত্যাগ করিয়া ১৬৮২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা রাজ্যে বিদ্রোহীপুত্র আকবরকে দমন করিবার জন্য গমন করিলেন।

কয়েকজন মুসলমান অধিনায়ককে মাড়ারারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঔরংজীব রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু রাঠোর বীর দুর্গাদাস তাহাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। এমন কি দুর্গাদাস তাহাদের নিকট হইতে চৌথ আদায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্‌ ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যে যখন মৃত্যু-মুখে পতিত হন, তখনও এই যুদ্ধ চলিতে থাকে। পরে পরবর্ত্তী দিল্লীসম্রাট শাহ আলম অজিত সিংহকে মাড়বারের রাজা বলিয়া স্বীকার করায় এই যুদ্ধের অবসান হয়। *

* প্রবন্ধটী লিখিতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে,—(১) টড্‌ সাহেবের 'রাজস্থানের বিবরণ'। (২) ট্যাভের্নিয়ারের 'ভারত-ভ্রমণ'। (৩)বার্ণিয়ারের 'ভারত-ভ্রমণ'। (৪) সুরেন্দ্রনাথ সেন-এর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। (৫) কাফি খাঁর বিবরণ।

আভাস

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

দুর্নিবার কালস্রোত ধীরে বয়ে যায়
বিভোর আপন গানে, চাহে না কাহারো পানে.
কে রহে পিছনে পড়ি, কে পথ-হারায়।
সাগরে তরঙ্গ ভাসে আকাশে তারকা হাসে
মায়া আবরণে ঘেরা এই চরাচর
নবীন মেঘের লীলা অশনি দামিনী-খেলা
আসে যায় পরে পরে রূপ মনোহর।

সুখে দুঃখে উদাসীন সতত আপনলীন
অনাদি অনন্ত এই বিশ্ব জগতের—
গতি অতি সাবলীল পরিবর্ত্তনশীল,
শুধুই বোঝে না ব্যথা ব্যথিত জনের।

প্রাহা-পরিচয়

—শ্রীমতিলাল দাশ

জার্ম্মানী হইতে প্রাহা যাই। ওরা ডিসেম্বর যে বৃদ্ধার বাড়ীতে ছিলাম তাহাকে সকাল-সকাল প্রাতরাশ দিতে বলিলাম। বৃদ্ধা ন্যুব্জদেহ, কুব্জপৃষ্ঠ, কিন্তু পয়সা গোছাইবার ফন্দি জানে। দোহন-বুদ্ধি সংসারে বাঁচিবার পন্থা—সে জন্য নিন্দা করিয়া লাভ নাই—তবে বৃদ্ধা এমনই মন্দ নয়। বিদায় বেলায় বলিল, "যখন ফিরবে এখানেই উঠবে বাবা।"

প্রাহা : সেন্টভিটাস গির্জ্জা।

পুরাতন সহরের ব্রিজ-টাওয়ার।

প্রাপ্তির মতলব ছিল, কিন্তু তবু এই আহ্বানকে আন্তরিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া একটু তৃপ্তি অনুভব করিলাম।

বাড়ীতে বাবাকে পত্র দিলাম। "বার্লিনে বেশ শীত, সুইডেন ও নরোয়েতে এত শীত ছিল না***মাকে প্রণাম দেবেন আর বলবেন এক মাসের পর গিয়ে তাঁর চরণ-বন্দনা করব,—য়ুরোপে এলাম কেন ও কি পেলাম, সে আমিই জানিনে—তবে হয়ত এটা তাঁরই খেলা এবং এই খেলার মাঝে তাঁর কি ইঙ্গিত তিনিই জানেন—

তবে ফিরব গৃহে বিস্ময়-নত চিত্তে সাধনার জন্য। যে কল্যাণ খুঁজতে এসেছিলাম, তা পাই নি, তবু দেখে নিলাম পরিপূর্ণ জীবন, জেনে নিলাম সাধনার বাণী—এই নিশ্চয়ই দেবে সত্যকার প্রেরণা।"

সে তপস্যা আজিও আরম্ভ হয় নি। যে পিতার স্নেহাশিস্ সমস্ত দুঃখ হইতে আড়াল করিয়া রাখিত, য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে পাই নাই। তিনি মর-জগতের বাসনা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অশ্রু-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

*

গাড়ী দশটায় ছাড়িল। গাড়ীতে একটি দক্ষিণ-আমেরিকার স্প্যানিশ যুবকের সহিত আলাপ হইল। সে বেশ ইংরাজী জানে—সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠার্থী, সংসারের

প্রাহা : (১) পুরাতন সহরের একটি রাস্তা।
(২) গোস্তন লেন।
(৩) চার্লস ব্রিজ ও ক্যাস্‌ল্‌।

অনেক খবর রাখে। তাহাকে দেখিয়া ভারতীয় বলিয়াই ভ্রম হয়। গাড়ীতে দুটী মেয়ে পরস্পর খুব আলাপ করিতেছিল। তাহাদের আমি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা জার্ম্মান ভাষায় প্রশ্ন করিলাম।

নীল-নয়নারা কৌতুক অনুভব করিল। সলজ্জ হাসিতে উত্তর দিল।

স্প্যানিশ যুবক এইবার আলাপের পথ পাইল। বাঁধ যখন ভাঙ্গিল, তখন তাহার বাক্যধারা স্রোতের মত বহিল।

উহাদের সমস্ত কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ বাধা আসিল, চেকার টিকিট দেখিতে আসিলে ধরা পড়িল, একটি মেয়ের টিকিট নাই। তাহাকে নামাইয়া দিল। যুবক তখন তাহাকে গন্তব্য পথের উপদেশ দিয়া টাকা ধার দিল। তাহার এই আন্তরিকতা আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিল।

পথে ড্রেসডেন পড়িল। জার্ম্মানীর এই ছবির মত সুন্দর বিখ্যাত নগরটিকে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইল, কিন্তু নিজেই নিজের শৃঙ্খলের দাস হইয়া পড়িয়াছি। তাই চলিতে হইল।

গোধূলির আলোকে চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্যামল প্রান্তরের সহিত পরিচয় ঘটিল। কর্ষিত ক্ষেত্ররাজি সুদূরের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে—মাঝে মাঝে মাঝে দীর্ঘশাখ বনস্পতি, কোথাও বা গুল্মলতা, কোথাও বা কুটীর। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রাহায় পৌঁছিলাম।

অনেক কষ্টে হোটেল সেণ্ট্রাল নামক পান্থশালায় আশ্রয় মিলিল। সেখান হইতে খুঁজিয়া ওয়াই. এম. সি. এ. (Y. M. C. A. তে গিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলাম। তাহার পর এখানকার অভিজাত অপেরা-গৃহে অপেরা দেখিলাম। নৃত্য ও গীতের রসালস আড়ম্বর চমৎকার লাগিল। একটি মেয়ে মোরগ-সুন্দরী সাজিয়া মাঝে মাঝে মোরগের মত ডাকিতেছিল—সেটি আমার কাছে খুবই ভাল লাগিল।

চেকোশ্লোভাকিয়া নূতন রাষ্ট্র—মাত্র ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বাধীন হইয়াছে। য়ুরোপের কেন্দ্রভূমিতে নানা বিচিত্র সভ্যতা-প্রবাহের সংঘাতে সে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু য়ুরোপের যে দুর্দ্ধর্ষ দুঃসাহসিকতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, এখানে তাহার অভাব। চেকেরা আমাদের মত কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী। হ্যাবসবুর্গ সম্রাটদের অধীনে জার্ম্মানেরা এবং ম্যাগিয়ার জাতি চেক ও শ্লোভাক জাতিদ্বয়ের কৃষ্টি ও স্বাতন্ত্র্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত রাখিতে একদল অধ্যাপক বিপ্লব করিয়া চলেন। তাঁহাদের সাধনার ফলে চেকেরা স্বাধীন হইয়াছে ইহা ভাবিতে আশ্চর্য্যই

মনে হয়। কারেল কাপেক একটি প্রবন্ধে এই দেশের কথায় লেখেন—

"It is a far more romantic land than is generally realized, it has wild mountains, primæval forests and wondrous caverns, it is the home of a folklore peculiar to itself, it has ancient castles that seemlike the magic ones of the moon, an infinite succession of precious specimens of architecture and art, and sweet and intimate landscapes. But more romantic and more wonderful than all those things are the fortunes of this sturdy and industrious nation which still has before it the lofty light of its miracle like resoigimento."

হায়, কাপেকের প্রথম কথাগুলি এখনও সত্য আছে—কিন্তু এই পরিশ্রমী জাতির যে নবজন্মের জয়বার্ত্তা সেদিন ইহার পথে ও গৃহে শুনিয়াছিলাম—নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়াছে।

শুক্রবার ৪ঠা ডিসেম্বর। ভোরবেলায় উঠিয়া হোটেল হইতে ওয়াই. এম. সি. এ. (Y. M. C. A.) প্রতিষ্ঠানে স্থান পরিবর্ত্তন করিলাম। নীচে একস্থানে প্রাতরাশ করিলাম। পরে ভাল ঘরের সন্ধান করিয়া বাড়ীতে চিঠি পাঠাইলাম। তারপর ইহাদের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ দেখিলাম। এই রঙ্গালয়ে নূতন নূতন নাটক সৃষ্টি করিয়া জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলাকে ঋদ্ধ করিয়াছে। এখানে অভিনয় দেখি নাই। শুনিয়াছি ইহাদের প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও সজ্জা-বিলাস অতিশয় উচ্চদরের।

এখান হইতে Church of the Knights of the Cross দেখিলাম। পরে চার্লস ব্রিজ দিয়া ওপারে চলিলাম। একটি ছোট পাহাড়ের উপর প্রাসাদ ও গির্জ্জা। দেখিবার মত বিশেষ কিছুই নাই তথাপি ইহার জয়ঢক্কানিনাদে কর্ণ বধির হয়। ফিরিবার পথে ইহাদের পার্লামেণ্টে গেলাম। তখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইতেছিল। রক্ষীদের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। তাহারা ভাষা বোঝে না, একবার একজনের নিকট লয়, পরে অপরের নিকট লয়। কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। আমাদের দেশের আরদালী, চাপরাশী প্রভৃতির তুলনায় ইহাদের সৌজন্য ও কর্ম্মনিষ্ঠ সততা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

চেকোশ্লোভাকিয়া ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক। ইহার দুইটি পরিষদ আছে। একটি নির্ব্বাচিত ৩০০ সভ্যের chamber of deputies, অপরটি সিনেট। সিনেটে দেড়শত সভ্য আছে। সিনেটের অধিবেশন হইতেছিল। রক্ষীরা যখন

প্রাহা: (১) পর পর চারিটি ব্রিজের সংস্থান।
(২) বারিগনডভ ৮৬ (৩) সাধারণ দৃশ্য।

নিরুপায় হইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না, তখন প্রোফেসর কোটজা আসিলেন। সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় এই ভদ্রলোকের বিনয়-নম্র সহৃদয় সম্ভাষণ মুগ্ধ করে।

উনি আমাকে একটি বিশিষ্ট স্থানে বসাইলেন। ধীরে

প্রাহা : (১) ন্যাশনাল থিয়েটার, (২) চেকব্রিজ ও ক্যাসল্,
(৩) হিব্রু অক্ষর লাঞ্ছিত ক্রুশচিহ্ন, (৪) চকের মোড়।

ধীরে তাহাদের পার্লামেণ্টের গল্প বুঝাইলেন। বলিলেন—"মাসরিক আমাদের জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা—তবে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, কাজেই রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশেষ হাত দিতে পারেন না—"

প্রশ্ন করিলাম, "নূতন শাসন-তন্ত্রকে আপনারা কেমনভাবে চালাচ্ছেন ?"

বলিলেন, "আমাদের রাষ্ট্রের চারিভাগ হয়েছে—বোহেমিয়া, মোরাভিয়া-সাইলেসিয়া, শ্লোভাকিয়া, রুথেনিয়া। প্রাদেশিকতা আছে, তা ছাড়া নানা দল আছে। বিবদমান নানা দলের ভারসাম্যেই গবর্ণমেণ্ট চলছে।"

"গণতন্ত্র কি সফল হয়েছে ?"

"সফলতা বিফলতা এক কথায় বলা মুস্কিল—তবে সর্ব্বজনীন ভোটের অধিকার আছে আর নির্ব্বাচিত সভ্যেরা সর্ব্বদাই নির্ব্বাচকদের স্বার্থ এবং কল্যাণে মনোনিবেশ করেন।"

অধ্যাপক ভারতবর্ষের প্রতি সশ্রদ্ধ। ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টি তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত পরিচিত বলিয়া বুঝাইয়া দিল। তিনি আমার অটোগ্রাফে লিখিলেন, "More powerful is he who has himself in his power." ভারতীয় তত্ত্বকথার অনুবাদ বলিয়াই মনে হয়। খানিকক্ষণ তর্কবিতর্কের মূক অভিনয় দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। অধ্যাপক লেসনির সহিত আলাপের ইচ্ছা ছিল। শুনিলাম, তিনি ইংলণ্ডে গেছেন, কাজেই ব্যর্থকাম হইয়া অধ্যাপক পার্টলোভের সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইল। প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয় অতি-পুরাতন,—১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পার্টলোভের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলাপ হইল। বলিলেন, "ভারতবর্ষের উন্নতির পন্থা শিক্ষা, বিপ্লব নয়, শিক্ষাই চেকেদের দিয়েছে মুক্তির আলো, শিক্ষাই ভারতে আলো দেবে।"

পণ্ডিত মানুষের এই কথাটি ভাবিবার বিষয়। আমাদের এই অগণিত জনসমুদ্র জীবনহীন, কারণ তাহাতে শিক্ষার তরঙ্গ নাই। ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে যুগে যুগে, কালে কালে নানা বিক্ষোভ আসিয়াছে কিন্তু সমস্ত জনচিত্তকে তাহা কখনও বোধ হয় স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে আমরা চলিয়াছি। কিন্তু গণদেবতাকে যদি আমরা অন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমাদের শক্তির উৎসকে আমরা খর্ব্ব করিয়া ফেলিব।

পার্টলোভ অটোগ্রাফে লিখিলেন, "The education of the mind is that power which leads towards the supreme enlightment," যে বিদ্যা আত্মার সন্ধান জানায় না, সে বিদ্যা বিদ্যা নয়, বোধির উদ্বোধন করে যাহা তাহাই বিজ্ঞান। পুরাতন পরিচিত কথা, তবু বিদেশীর নিকট হইতে শুনিতে ভাল লাগে।

অধ্যাপক অমূল্য সেনের কথা হইল। বলিলেন, "তিনি আজ আসেন নি, তিনি এখানে বাংলা পড়ান।" সেখান হইতে অধ্যাপক সেনের সন্ধানে চলিলাম।

পরিচয় নাই, তবে বন্ধুবর ভূপেন্দ্রের সহিত সেনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। বন্ধুর চিঠি ছিল সঙ্গে। ট্রামে করিয়া সহরতলী চলিলাম। ঠিকানা বাহির করিতে গলদঘর্ম্ম হইল, কিন্তু যাইয়া দেখা মিলিল না। মনোক্ষোভে ফিরিলাম।

শতচূড়াখচিত প্রাহার সহিত অন্তরতা করিবার অবসর ছিল না। ঔপন্যাসিক ক্রফোর্ড বলিয়াছেন Prague is an architectural fairy tale written in stone—প্রস্তরে রচিত রূপকথার পুরী। অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সমগ্র প্রাহা খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার আমার সময় হয় নাই, কিন্তু সহরের সমস্ত অংশের উপর চোখ বুলাইয়া গিয়াছিলাম। তাহাতে প্রাহার স্থাপত্য আমার মনে বিশেষ ছাপ দেয় নাই। হয় ত প্রাহার উপর অবিচার করিতেছি।

ফিরিয়া চুপ-চাপ বসিয়া য়ুরোপীয় খেলা সম্বন্ধে একখানি বই পড়িলাম। পরে নীচের রেস্তর্াঁয় খাইয়া লইলাম। রাত আটটায় তরুণ ছাত্রদের ইংলিশ ক্লাবের বক্তৃতার নিমন্ত্রণ দিলাম। গেলে ওদের সম্পাদক সাদরে সম্ভাষণ করিয়া লইয়া বসাইলেন।

ভূমিকায় বলিলেন, 'মিঃ দাস একজন বিচারক ও সাহিত্যিক। পৃথিবীর পরিচয় লাভের জন্য উনি বাহির হয়েছেন, উনি আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলবেন; আশা করি ওঁর বক্তৃতায় আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞান লাভ করব।"

ঘণ্টা খানেক বক্তৃতা করিলাম। বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে লিখিবার সুযোগ হয় নাই।

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ, যুগ-যুগান্তরের সভ্যতা ভারতকে জগৎ-সভায় বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। মানুষের ইতিহাস জানতে হলে ভারতবর্ষকে জানা চাই। য়ুরোপ বলতে পারে, য়ুরোপ তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গরিমায় দৃপ্ত, সে ভারতকে কেন সম্মান করবে। কারণ য়ুরোপ সুখী নয়, সে পেয়েছে শক্তির মন্ত্র, শান্তির মন্ত্র পায় নি।

ভারতবর্ষ তার সাধনায় আত্মতত্ত্বকে জানে। যে দৃষ্টিতে মানুষের চরম পরিস্ফুর্ত্তি সে দৃষ্টি বিকাশের পন্থা ভারতবর্ষ

প্রাহা: টাউনহলের গম্বুজ-ঘড়ী।

আবিষ্কার করেছে, পৃথিবী যদি কল্যাণ ও মৈত্রীর সেই বাণী জীবনে ফোটাতে চায়, ভারতবর্ষের দ্বারে তাকে অতিথি হতে হবে।"

শ্রোতারা বক্তব্য বুঝিল কি না, বলিতে পারি না, এ বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল নাই। তাহাদের প্রশ্ন—সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন সংসদ। বয়স কাহারও কুড়ি

বাইশের বেশী নয়। ইহাদের ব্যবহারে সঙ্কোচ নাই। ছাত্র এবং ছাত্রীরা অবাধে প্রশ্ন করে।

সমস্ত প্রশ্নের কথা মনে নাই। একটী ছাত্রী বলিল, "শুনেছি আপনারা মেয়েদের খুব শাস্তি দেন"। য়ুরোপে এই প্রশ্ন সর্ব্বত্রই পাইয়াছি। সাহেবদের লেখা বই পড়িয়া উহারা ভাবে আমরা নারীদের নির্য্যাতন করি।

প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "তোমাদের কাম্য কি ?"

দু'তিনটি কুমারী একবাক্যে বলিল, "বিবাহ আমরা চাই। সুন্দর ও সবল একজন স্বামী, তারপর দুজনে মিলে আনন্দের নীড় বাঁধব।"

একটি ছাত্র কৌতুকভরে বলিল, "কিন্তু হায় পাত্র জুটবে কোথায় ?" রহস্য করিয়া বলিল, "কেন তোমরা ?"

ছেলেটি বলিল, "উপায় নেই, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব কি না সন্দেহ—"

আমাদের দেশের মতই সেখানেও বেকার সমস্যা। আজকাল শিক্ষিত ছেলেরা প্রায়ই বিবাহে পরাঙ্মুখ, কারণ জীবনে দাঁড়াইবার ভরসা তাহাদের নাই।

কথাবার্ত্তা খানিক হইলে সম্পাদক প্রস্তাব করিল, "আসুন আমরা একটু আমোদ করে মিঃ দাসে-র সম্বর্দ্ধনা করি।"

ইহার পর ইহারা যুগলে নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল। এই অবসরে একটি রুষকুমারী পাশে আসিয়া বসিল। সে নিভৃত আলাপ জমাইতে চাহে। বলিল, "আমি ভারতবর্ষকে খুব ভালবাসি, কিন্তু আপনারা বোধ হয় পরিবারকে লাঞ্ছিত করেন !"

বলিলাম, "কেন ?"

সে আগ্রহভরে বলিল, "আমাদের একজন বান্ধবী এক জন ভারতীয় যুবককে বিয়ে করে। তাকে ভারতে নিয়ে আটকে রাখত, তাই সে ফিরে এসেছে।" বুঝিলাম পর্দ্দাপ্রথার দৌরাত্ম্যে য়ুরোপীয় বধূ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। উহার সঙ্গে রাশিয়ার সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। সিড্‌নি ওয়েবের বই পড়ার পরে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উচ্চ হইয়াছিল। মিথ্যা আভিজাত্য ও ধনিকের শোষণে অত্যাচারিত সমাজে রাশিয়া নূতন আলো আনিয়াছে বলিয়া মনে করিতাম।

কিন্তু এই কুমারী বলিল, "ভুল ধারণা, রাশিয়ার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, আমার বাবা ছিলেন একজন বড় সেনাপতি, তাঁকে ওরা নির্ব্বাসিত করেছে, আজ তাই দুঃখে আমাদের দিন কাটছে। ওখানে সাম্য নেই, পুরাতন অন্যায়ের বদলে চলেছে নূতন অন্যায়।"

কুমারী কমিউনিজ্‌মের প্রচার ফলে নির্ব্বাসিত। তাহার স্বাভাবিক দ্বেষ থাকা সম্ভবপর।

খানিক পরে যুবতী বলিল, "কাল কখন আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে ? আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি খুব খুসি হয়েছি।"

বলিলাম, "কাল ভোরেই চলেছি, থাকার সময় নেই"

যুবতী অনুরোধ জানাইল, "কেন ? থাকুন না কয়েক দিন এখানে।"

বলিলাম, "উপায় নেই, সমস্তই ঠিক ঠাক; তাছাড়া বাড়ীতে স্ত্রীপুত্রের জন্য মন উদাস হয়ে উঠেছে—"

"বলেন কি, আপনি বিবাহিত ?" যুবতী অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

"হাঁ। আমি সত্যই বিবাহিত—"

মেয়েটি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "না, না আপনি রহস্য করছেন, আপনি নবীন যুবা।"

বাড়ীতে গৃহিণী প্রতিদিনই বলেন, "বুড়ো হয়ে চললে এখনও কিছুই শিখলে না," তখন অকাল-বার্দ্ধক্যের ভাবনায় মুষড়াইয়া পড়ি।

বিদেশিনী এই তরুণীর কাছে তরুণ যুবা বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়া আনন্দ অনুভব করিলাম।

প্রাহার অন্য একটি বন্ধু লিখিয়াছিলেন, "Friendship does not know border and limits." এই সত্য আজ বাংলাদেশের মেঘমেদুর প্রভাতে বসিয়া একান্ত সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি। এই তরুণ ভাবোচ্ছল বন্ধুদের প্রীতির স্মৃতি সমুদ্র ও পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া অন্তরকে উল্লসিত করিতেছে।

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া রবীন প্রায় পাগলের মতই ছুটিয়া বাহির হইল। একখানা ট্যাক্সী লইয়া বরাবর একেবারে গড়ের মাঠে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ সেখানে পায়চারী করিল। তার পর একটি বৃক্ষ কুঞ্জের ভিতরে একখানি বেঞ্চিতে গিয়া বসিল, বসিয়া বহুক্ষণ কি ভাবিল। রাত্রি প্রায় ন'টায় গৃহে ফিরিয়া সামান্য কিছু আহার করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। পরদিন সকালে উঠিয়া মাকে বলিল, "তা হলে এখন—ধর এই আট দশ দিনের ভেতরেই—বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেল না মা?"

"আট দশ দিনের ভেতরেই? হঠাৎ এখন—"

"কেন, আগেই ত বলেছি যখন আমি বলব তখনই বিয়ের দিন করবে। এখুনি আমার সুবিধে।"

"আচ্ছা দেখি, বলি ত ওঁকে।"

"না, দেখতে আর কিছু হবে না। এরি ভেতর সব সেরে ফেলা চাই। ভাবছ কি? কেন বলিনি তোমাদের, ঘটা-ঘটি কিছু হবে না, চুপচাপ কোনও মতে অমনি বিয়েটা হয়ে যাবে।"

"সে তোমার যেমন ইচ্ছে তাই হবে। তবে মেয়ে পক্ষেরও ত সুবিধে অসুবিধে একটা দেখতে হবে।"

"না, ও সব কিছুই আমি দেখতে প্রস্তুত নই। ব'লে পাঠাও তাঁদের এই সময়ের ভেতর যে করে হক্ চুপচাপ কাজটা সেরে ফেলুক। ঘটা কিছু হ'লে, আর যদি দেরী বেশী কর, বিয়ে আমি করবই না। পালিয়ে কোথাও চলে যাব।"

বলিয়াই রবীন বাহির হইয়া গেল।

অখিলবাবু সব শুনিলেন। ঘটা কিছু করিতে নরেন-বাবুও ইচ্ছুক নন। তাড়াতাড়ি যাহাতে বিবাহটা হইয়া যায় উভয়েই ইহা চাহিতেছিলেন। বৈশাখের প্রথমেই শুভলগ্ন একটা ছিল। বিবাহ হইয়া গেল।

১২

"বলিস্ কি বিন্দু! এখুনি চলে যাচ্ছে! এই ক'দিনই বা বিয়ে হল—"

"তা কি হবে? তাঁর যদি ইচ্ছে হয়, ভালই না লাগে, কেন যাবেন না?"

বলিয়া বিন্দু একটি নিশ্বাস ছাড়িল; অতি ক্ষুদ্র একটু মৃদু হাসিও মুখে ফুটিল। শৈলবতী কহিল, "কথাটা মুখে যেমন অনায়াসে ব'লে ফেল্লি মনে ও ঠিক তেমনি ভাবতে পারছিস নি বিন্দু?"

"না, তা পারছি নি দিদি। তবে—তবে ভাবতে চেষ্টা করছি। ভাবতে হবেও।"

চক্ষে বিন্দুর জল আসিল। মুখখানি অন্য দিক ফিরাইয়া লইল। শৈলবতী গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"তখনই বলেছিলাম বিন্দু, তুই রাজি হল্লিনে, নইলে বিয়ের সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিলেই ভাল হত।"

"না, এই ভাল হয়েছে।"

"ভাল কি মুখে বললেই ভাল হয় বোন্?"

"বলতে বলতে মনেও ভাবতে পারব। না, দোহাই তোমার দিদি, থাক, ও কথায় আর কাজ নেই। বড় লজ্জা করে দিদি! ছিঃ! মন আমার এত অসার!"

শৈলবতী কহিল, "বিন্দু! আমার নিজের এখন দুঃখু নেই কিছু। যে ক'দিন তাঁকে পেয়েছিলাম, সত্যিই পেয়েছিলাম। সে স্মৃতি আমার বড় মধুর! কিন্তু তোর এ কি হল বোন্?"

"হবে সে ত আগেই জানতে দিদি।"

"জানতাম—মানে, মনে হত; আর মনে যা হত, সেটা অনুমান মাত্র। আশঙ্কা যাই হক্, বাস্তব জানার এই দুঃখটা কত বড় হবে, তা বুঝতে পারিনি।"

"আর কেন দিদি, কেন আমাকে মিছে আরও দুঃখু দিচ্ছ? তোমার সুকৃতি ছিল, স্মৃতিও এমন মধুর হয়ে রয়েছে। আমার—"

বলিতে বিন্দু থামিয়া গেল। বাষ্পাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কাঁদিয়া শৈলবতী ভগিনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। বিন্দু আর পারিল না। দিদির বুকে মুখ রাখিয়া অনেক-

ক্ষণ কাঁদিল। মুখ তুলিয়া শেষে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল "দিদি! কিছুরই বড়াই কেউ করতে পারে না। ভেবেছিলাম গায়ে কিছু তুলব না, শান্তভাবে এই ভাগ্য আমার মাথায় তুলে নেব। কিন্তু সেই ভাগ্য যখন আজ সত্য হয়ে এল, কই, মাথায় তুলে ত তেম্‌নি নিতে পারছি নি দিদি!"

"তাইত বলছিলাম বিন্দু, বুঝতে পেরেও কেন এ বিয়েটা—"

"ছি ছি! না দিদি, ও কথা যে ভাবতেও নেই এখন। সে ত হতেই পারত না। দুঃখু? হাঁ দিদি, মিছে বড়াই করব না, পাচ্ছি, খুবই দুঃখু পাচ্ছি আজ। সত্যি ত আর পাষাণী নই, কেন পাব না? তা সইতে যদি পারি, সয়ে আমার যা করা উচিত তাই যদি করতে পারি, এই দুঃখুই তখন বড় একটা সুখ হবে আমার। মিছে আর দুঃখু তুমি করো না দিদি, কেঁদো না, আশীর্ব্বাদ কর তাই এখন হক!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈলবতী কহিল, "কোথায় যাচ্ছে?"

"শুনলাম ত বোম্বের ওদিকে।"

"বোম্বে! বোম্বে হয়েই ত লোকে বিলেত যায়?"

"হাঁ, ঐ থেকেই জাহাজ চড়ে।"

"অমনি বিলেত চলে যাবে না কি?"

"হাঁ। তবে মাস দুই আড়াই আবও থাকবেন ওখানে।"

"কেন? সেখানে কি এমন জরুরী কাজ আছে কিছু?"

"জানি না।"

"বলে নি কিছু? জিজ্ঞেসাও কিছু করিস নি?"

"না।"

শৈলবতী স্তব্ধ, নীরব। কি বলিবে? জিহ্বাও আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "হয় ত কাজও কিছু বড় জরুরী থাকতে পারে—"

"কাজ? কিসের কাজ দিদি? কার কাজ?"

বলিতে বলিতে মণি গৃহে প্রবেশ করিল। শৈলবতী কহিল, "এই যে রথীন এখুনি বোম্বে যাচ্ছে কি না, তাই—"

"ও, তাই!" মণির চক্ষু মুখ অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, "কাজ! কাজ ত বড় জরুরী! জানি, সব জানতে পেরেছি দিদি। তার শকুন্তলা গিয়েছে কি না—"

"শকুন্তলা!"

"ঐ যে মিস্ মোকার্জ্জি নাটকে শকুন্তলা হয়েছিল—বজ্জাৎ বেটী!"

"ক্ষেপলি না কি মণি? বলিস্ কি?"

"ক্ষেপিনি। ঠিক সত্যি কথাই বলছি। বলব বিন্দুর সামনে? হাঁ, বিন্দুর সামনেই বলব। তাই বলা উচিত। বিন্দুর সব জানাই দরকার। বিয়ে যা হয়ে গেছে আর ফিরবে না ত? এ সব কেলেঙ্কারী আগেও কিছু জানা যায় না। তা হলে বিয়েই কি হতে পারত? এখন বিন্দু সব জানুক, জেনে যা করতে হয় করুক।"

দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া শক্ত হইয়া বিন্দু দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলবতী কহিল, "বুঝতে পারছিনি মণি, কে মিস্ মোকার্জ্জি, ঐ মীনা বুঝি?"

"মীনা! তুমি কি করে জানলে দিদি? হাঁ, হতভাগীর নাম মীনাই বটে। তা—তুমি কি করে জানলে?"

"কলেজে বিন্দুর সঙ্গে পড়ত—"

"কলেজে পড়ত! বিন্দুর সঙ্গে! বটে! হাঁ রে বিন্দু, মেয়েটা কেমন রে?"

"খুব ভাল।"

"ভাল? হারামজাদা নচ্ছার মাগী! একে বলে ভাল?"

"কেন, মন্দই বা কিসে হল? তাকে কেন, ছি, ও সব বিশ্রী গাল দিচ্ছ দাদা?"

"দেব না? তু'শোবার দেব! বেটী—বেটী—"

"ছি! ভদ্রলোকের মেয়ে—ও সব কথা বলতে নেই দাদা। কেন, তার কি অপরাধ হয়েছে?"

"কার তবে হয়েছে? পরের ছেলে—বিবাহিত যুবক—তাকে এমনি করে ভুলিয়ে নিয়ে—"

"সেটা কি করে তুমি আগেই ধরে নিলে? সে ত বোম্বে গেছে বলছ। উনি যদি এখন তার টানে যান, সেটা কি তার দোষ কিছু হল?"

"সেই যদি যেতে ওকে বলে গিয়ে থাকে? যদি এই বন্দোবস্ত করেই গিয়ে থাকে?"

"তা হলে উনি যে বিবাহিত, কি বিবাহ হচ্ছে কোথাও, এটা সে জানত না!"

হইতে পারে বটে! উত্তেজনার বশে মণি এতক্ষণ ধীর ভাবে বিচার করিয়া কোনও কথার যুক্তি অযুক্তি দেখিতে-

ছিল না। হাঁ, হইতে পারে বটে। বিন্দু যাহা বলিতেছে, তাহা অসম্ভব নয়।

"হাঁ, হতে পারে বটে। কিন্তু তা যদি হয়, তবে রবীনটা ত—ভারী পাজি!"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বিন্দু কহিল, "ছি, অমন কড়া গাল কাউকে দিতে নাই!"

শৈলবতী কহিল, "তুই কার কাছে শুনলি মণি?"

"এই ত অতীন বাবুর কাছে।"

"অতীন বাবু!—ও!" ফিরিয়া বিন্দু চাহিল, চোখে মুখে কেমন একটা রক্তজ্বালা জ্বলিয়া উঠিল।

মণি কহিল, "অতীন বাবু—ও—কি? মিছে কথা সব গড়িয়ে এসে বলেছেন?"

"না, তা বলছিনি। তবে—"

"কি তবে?"

"তাঁর এ সব খোঁজ-খবর নিতে যাবার দরকার কি ছিল?"

"দরকার—পরিবারের বড় একজন আত্মীয় তিনি, বন্ধু তিনি, কেন গিয়ে নিবেন না যদি আভাস কিছু পেয়ে থাকেন?"

"তোমরা নিজেরা ত কেউ নিতে যাও নি? দরদ কি তাঁরই বেশী হল?"

"বেশী না হক, কিছু ত আছে? আমাদের এ সব জানবার ত কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। রবীন তাঁর চেনা লোক, আগে থেকেই চেনেন। কাজেই জানতে পেরেছেন, জেনে আরও ভাল করে খোঁজ নিয়েছেন। কেন নেবেন না?"

"তা অমনি ছুটে তোমাকেই বা এত কথা বলতে এলেন কেন?"

শৈলবতী কহিল, "বলিস্ কি বিন্দু? এত বড় একটা সর্ব্বনেশে কথা সত্যিই যদি জানতে পারে, আমাদের এসে বলবে না? এর প্রতিকার যদি কিছু হতে পারে—"

"প্রতিকার! সত্যই যদি হয়ে থাকে তাই, প্রতিকার আর কি হবে?"

একটি নিশ্বাস বিন্দুর বুক ভরিয়া উঠিল। অতি সাবধানে সে তাহা চাপিয়া দিল।

আগুন হইয়া মণি কহিল, "হবে না ত কি এই বরমায়েসীতে অমনি তাকে ছেড়ে দেব আমরা?"

"ছি দাদা, আবার! অমন বিশ্রী গাল কাউকে দিতে নাই।"

"না, গাল দেবে না, সবাই মিলে একেবারে ধন্যি ধন্যি করবে তাকে মাথায় তুলে নিয়ে! এমনি করে আমাদের সর্ব্বনাশটা করছে আর চুপ করে থাকব? এই সব মতলব যদি ছিল, দু'দিন আগে বিয়ে করল কেন? পনের হাজার টাকা বাবা দিয়েছেন—এই ত? কেন, তার বাপের ঘরে টাকা ছিল না? এও কি ভদ্রলোকের কাজ!"

শৈলবতী কহিল, "থাম্, থাম্ এখন মণি! বকাবকি করে ত লাভ হবে না কিছু? দেখতে হবে, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে, সত্যি এর প্রতিকার এখন কি হতে পারে।"

"ঠাণ্ডা মাথা কেউ এতে রাখতে পারে না। প্রতিকারের কথাও আর ভাবতে কিছু হবে না এক প্রতিকার আছে এখুনি গিয়ে তার বাপকে সব জানাতে হবে—"

"সে গুড়ে বালি! রবীন্ স'রে পড়েছে! এই ত আজ দশটার গাড়ীতেই চলে গেছে।" বলিতে বলিতে অতীন গৃহে প্রবেশ করিল।

"গেছে!"

"হাঁ, এই সব টুন্ টুনি বোধ হয় কিছু কাণে গিয়েছিল। পাছে গোল কিছু হয়, অমনি দে ছুট!"

"আহম্মক! ছুট দিয়েই অমনি এড়াতে পারবে ভাবছে। কালই বিন্দুকে নিয়ে বোম্বে যাচ্ছি আমরা। গিয়ে সেখানে হাটে হাড়ী ভাঙ্গব। কি বলিস্ বিন্দু? যাবি ত? কই, বিন্দু গেল কোথায়?"

"এই ত বেরিয়ে গেল।"

"বেরিয়ে গেল! তাইত! ছুঁড়ী নেহাৎ বোকা! একেবারে মেয়েমানুষ! হাঁ, ডাকত তাকে দিদি এক্ষুণি! ও বিন্দু, বিন্দু! ওরে হতভাগী—"

দরজার দিকে মণি অগ্রসর হইল। বাধা দিয়া শৈলবতী কহিল, "ওরে পাগল, এখন থাম্! ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আর করতে হবে না। আর ডাকলেই সে অমনি আসবে কি না?"

"কি করবে তবে? কি করতে চায়?"

হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে অতীন কহিল, "একেবারে মহা-পতিব্রতা সতীর মত পতিদেবতার সুখে আত্মবলি দিতে!"

"ছি ঠাকুর পো! এই কি এ সব রঙ্গের সময়?"

"রঙ্গ! হাঁ, রঙ্গ ক'রে বল্লেও কথাটা যা বল্লাম ঠিক নয়?"

"ঠিকই যদি হয়, তাহলে এমন অন্যায়ই বা কি? এর চাইতে ভালই বা বিন্দু এ অবস্থায় কি করতে পারে আর?"

মণি বলিয়া উঠিল, "আঃ! রেখে দেও, রেখে দাও! তোমাদের ও সব সেকেলে সতীপণা আর ভাল লাগে না। মাথাটা বিন্দুর তুমিই খেয়েছ। নইলে এত লেখাপড়া শিখেও আজকালকার কোনও মেয়ে এমন ন্যাকা হয়?"

"কি তবে হবে? লাঠি হাতে করে তার পেছন পেছন ছুটবে?"

"তাই ছুটতে হবে! ও সব সেকেলে ন্যাকামোর দিন এখন নেই আর! পুরুষরা যা খুসী তাই করবে, আর মেয়েরা অমনি দেবতা দেবতা করে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে থাকবে, আর লাথি খেয়েও নাকী সুরে বলবে, ওগো দেবতা! যা করেছ, বেশ করেছ। অমনি আবার দশটা লাথি মার, তবু পায়ে রাখ, তাতেই আমি কৃতার্থ হব—"

"মেলাই বাজে বকিস নি মণি। সে কথা কেউ বলছে না।"

"কি বলছ তবে? কি বলতে চাও?"

"তুই-ই বা কি বলতে চাস্?"

"বল্‌তে চাই এই যে, ও সব পতিদেবতার দিন আর এখন নেই। মেয়েরা আর পুরুষের পায়ের কাদা হয়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে না। মাথা তুলে সমান সমান মানুষ হয়ে দাঁড়াতে হবে। ন্যায্য অধিকার তাদের জোর করে গলায় গামছা দিয়ে আদায় করে নিতে হবে।"

"ওরে পাগল! স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর আদর-যত্ন কি জোর করে গলায় গামছা দিয়ে আদায় করে নেবার জিনিস?"

অতীন কহিল, "না, তা নয় বৌদি। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি এই রকম পাষণ্ডের মত ব্যবহার করে, তাহলেই বা স্ত্রী কি করবে?"

"তার যা ধর্ম্ম তাই পালন করবে। আর কি করতে পারে?"

"ধর্ম্ম কি কেবল স্ত্রীর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে? স্বামীর কোনও ধর্ম্ম নেই? বিবাহের দায়িত্ব কি কেবল স্ত্রীকেই বহন করতে হবে? স্বামীর কোনও দায়িত্ব নেই?"

"আছে, দুজনেরই আছে। কিন্তু একজন যদি তার দায়িত্ব কি ধর্ম্ম না মানে, আর একজনকেও কি তাই করতে হবে?"

হাসিয়া অতীন কহিল, "তোমাদের শাস্ত্র আর সমাজ ত স্বামীকে সব দায়িত্ব থেকে ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দিয়েই রেখেছে। তার বোঝা সব চাপিয়েছে স্ত্রীর ওপর!"

"না, ঐটি তোমরা ভুল বোঝ ঠাকুরপো। ধর্ম্ম কাউকে তার কোনও দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় নি। সমাজ কখনও হয়ত অধর্ম্মের শাসন যেমন করা উচিত করতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র যতদূর জানি, ধর্ম্মকেই মেনে চলেছেন।"

মণি বলিয়া উঠিল, "জান তোমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি রবীন যে এত বড় অধর্ম্মটা করছে—"

"কোনও শাস্ত্র কখনও বলেন নি, রবীনের এই কাজটা ধর্ম্ম। সমাজও ধার্ম্মিক বলে তাকে মাথায় তুলে নেবে না, বরং ধিক্ ধিক্‌ই করবে।"

"তাতে তার বড় বয়েই গেল! তার এই অধর্ম্ম তোমার সমাজ দমন করতে পারবে?"

"অধর্ম্ম যে করবেই, তাকে কোন সমাজই দমন করতে পারে না, সে মেয়েই হক কি পুরুষই হক।"

অতীন কহিল, "তা না পারে, মেয়েদের বেলায় ধর্ম্মের বিধিনিষেধের খুব কড়া ব্যবস্থা করতে ত কসুর কিছু করে নি।"

"সেটা মেয়েদের ভাগ্যই বলতে হবে!"

"মেয়েদের না হক, পুরুষদের বটে!"

"না, অধর্ম্মের সুযোগ কারও ভাগ্যের কথা নয় ঠাকুরপো।"

"ধর্ম্মাধর্ম্ম কি, সেইটেই বা কে ব্যাখ্যা করে দেবে বৌদি!"

"ব্যাখ্যা সব দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রই একটা করে দিয়েছেন। তবে আসল কথাটা কি জান ঠাকুরপো, যে বোঝে সে আপনিই বোঝে, তার মনই তাকে বুঝিয়ে দেয়, ব্যাখ্যার অপেক্ষা কিছু তাকে করতে হয় না। আর সেই বুঝবার ভাগ্যি যার নেই, হাজার ব্যাখ্যাতেও সে বুঝবে না।"

মণি বলিয়া উঠিল, "আঃ! কি সব ধর্ম্মাধর্ম্মের তর্ক জুড়ে দিলে, ভাল লাগে না এখন। ওর কি সময় নেই আর? এখন ভাবতে হচ্ছে আমাদের এই কেলেঙ্কারীটার কিনেরা একটা কি করে করা যায়।"

অতীন কহিল, "কিনেরা যে কি করবে এর তা ত দেখতে পাইনে মণি! লজ্জা দিয়ে রবীনকে গিয়ে ধরে পাকড়ে আনবে ভাবছ? সে ছেলেই সে নয়।"

"যদি জানতেনই এত, তবে আগে কেন আমাদের বলেন নি যখন সময় ছিল?"

"ব'লে কি হত? বড়লোক দেখে তোমরা একেবারে অন্ধ হয়ে যে ঝুঁকে পড়েছিলে।"

"তবু—"

"তবু—কি? মোকার্জ্জিদের সঙ্গে এই কেলেঙ্কারীটের কথা? না, তখন কিছুই জানতাম না। তবে এই যে ঘটনাটা হল, সিনেমায় ছবি উঠল, রাস্তায় রাস্তায় সব পোষ্টার বেরুল, এ সব দেখেও কেন তোমরা ভাবনি? তাও কি আমাকে এসে বলবার অপেক্ষা করেছিলে?"

মণি বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। শৈলবতীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল; ঠোঁটে কামড় দিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। মণি একটু আমতা আমতা কহিল, "তাহলে আপনি বলতে চান, কোনও প্রতিকার এর হবে না? রবীন যা খুসী তাই করবে, আর বিন্দু—"

"বিন্দুকেই শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে মানুষের অধিকারের বলে; কেবল ন্যাকা মেয়েমানুষটি হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। তাকে দেখাতে হবে বিবাহ একটা হয়েছে বলেই, আর সে মেয়ে মানুষ বলেই, রবীনের এই যথেচ্ছাচার ক্ষমা করতে সে প্রস্তুত নয়। সে যদি ওকে ত্যাগ করতে পাবে, তেমনি তারো ত্যাগ করবার, ক'রে—ক'রে নিজের প্রাপ্য পাওনা স্বেচ্ছায় অন্য যে কোনও পথে খুঁজে নেবার অধিকার ওরও আছে! হাঁ, আমার এই কথা; বৌদি এখন যাই চলুন।"

বলিয়াই উত্তেজিত ভাবে হঠাৎ অতীন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। শৈলবতী ভ্রুকুটিকুটিল আঁধার মুখে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষে বিস্মিত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় মণির দিকে ফিরিয়া কহিল, "ছাখ মণি, এ সব ছেলেখেলার কাজ নয়। চটাচটি বকাবকি করেও কিছু এগোবে না। বিন্দুর ওপরেই নির্ভর কর্। যা তোরা ভাবিস্, বোকা মেয়ে সে নয়। ওর উপরে নির্ভর কর্; ভাল যা হতে পারে, সেই করবে, সেই বুঝবে, সেই করতে পারে; আর কারও সাধ্য কিছু নেই। আর আছেন তার শ্বশুর শাশুড়ী। তাঁরাই বা কি করবেন? যদি পারতেনই কিছু, এইটে আজ ঘটতই না।"

"দেখ, যা ভাল বোঝ কর। কিছুই ভাল লাগছে না আমার। কি যে একটা কেলেঙ্কারী আর অশান্তিই ঘটল।"

বলিয়া কেমন একটা বিষাদগ্রস্ত অবসন্ন ভাবে মণি বাহির হইয়া গেল।

১৩

"গর্ভস্রাব! আমাকে দোষ দিচ্ছ এখন মিছে! মেয়ে-মানুষ পারে কেবল কাঁদতে আর ব'কতে। কি হবে ওতে? আসলে ছেলেই তুমি পেটে ধরে ছিলে একেবারে একটা অকালকুষ্মাণ্ড গর্ভস্রাব!"

অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিরাজমোহিনী কহিলেন, "ওগো, আমাকে যত খুসী গালমন্দ দাও, কিছু এসে যায় না। কিন্তু উপায় এখন কি হবে? আহা, এমন সোণার লক্ষ্মী বউমা আমার—লজ্জায় দুঃখে মরে যাই—বন্ধুর মুখ-পানে যে মুখ তুলে চাইতে পারি না গো!"

"গর্ভস্রাব! একবার বলি, একশ বার, হাজার বার বলি গর্ভস্রাব! আহা হা! কেন জ্যান্ত জন্মেছিল? সত্যিই কেন নষ্ট হয়েছিল না গর্ভে? ছিল না ত ছেলেই না, টাকা আমি অনাথ আশ্রমে দান করতাম, কাশীতে মঠ দিতাম, অন্নসত্র খুলতাম। ওরে হতভাগা! এই যদি তোর মনে ছিল, কেন দুদিন আগে বিয়েতে মত দিলি?"

"সে কথা আর কোন্ মুখে এখন বলছ? মত ত সে দিতে চেয়েই ছিল না—কি কুবুদ্ধি তোমার হল, কিছুতেই বিলেত যাবার খরচ ওকে দিতে চাইলে না—"

"দিলেই বা কি হত? হতভাগা ছুঁড়ীটাকে সঙ্গে নিয়ে ভাগত। না হয় বিলেত গিয়ে একটা মেম বিয়ে করত। ভারী সুখ হত তোমার তাতে!"

"তবু পরের মেয়ের ত এমনি করে সর্ব্বনাশ করা হত না।"

"আসতে হবে! ফিরে আসতেই হবে হতভাগাকে! সব সম্পত্তি আমার উইল করে বৌমার নামে লিখে দিচ্ছি। পারে

ধবে এসে তার কাঁদতে হবে হারামজাদাকে দুটি পেটের ভাতের তরে! বিলেত যাবে? দেখি টাকা দেয় ওকে কোন্ শালা! হাঁ, দশ হাজার টাকা ফাঁকি দিবে হাতড়েছে। সে আর ওর কদিন? ঐ যোগেশ মুখুয্যে দেবে? সে দিকে চু চু! কেবল সায়েবী করে ফিরলেই হয় না। অমাব ঘরে শুন্যি। উল্টো বরং দেনাই বেবোবে ঢের। এটর্ণি আমরা কার ঘরের না খবর রাখি? শালার ব্যাটা শালা! হারামজাদা! টাকা আমাব ঘরে কিছু আছে কি না! সবে ঐ এক ছেলে; মেয়েটাকে দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে ভেবেছে খুব একটা দাঁও মারল।"

"বার বার তখন জিজ্ঞাসা করলাম, খুলে যদি বলত, না হয় ঐ মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিতাম।"

"ক্ষেপেছ তুমি। ওদের ঐ সব বিবিয়ানা ঢঙের মেয়ে—ষ্টেজে উঠে হাজারো লোকেরা সামনে নাচগান করে—নাচগানের ছবি সিনেমায় ওঠে—সেই মেয়ে ঘরে আন্তে পারে হিন্দু গেরস্ত ভদ্রলোক কেউ? ঘরটা গোল্লায় দেব, আবাব জাতটাও একদম খোয়াব? এক জাতও ত আমরা নই।"

"গিয়ে ত জুটেছে। বিয়ে যদি এখন করে?"

"করে, জাতমারা হয়ে বাইরে থাকবে, ত্যাজ্যপুত্রও হবে।"

"ছেলে ত সবে ঐ একটি। তার পর?"

"তার পর আবার কি? এক ছেলে কারও মরে না? নির্ব্বংশ কেউ হয় না?"

"বালাই! বালাই! অমন কথা মুখেও আনছ! মাগো! সত্যি কি পাষাণ তুমি! মুখের কথা ক্ষণেও বেরোয়, অক্ষণেও বেরোয়। এমনিই কপালে যা হল—"

"মরার বাড়া হয়েছে! গেছে, আপদ গেছে! বউমাকে পুষ্যি পুত্তুর রেখে দেব!—হাঁ!"

"নেও, ও সব কুডাক আর এখুনি ডাকতে হবে না। তা বিয়ে যদি করেই—"

"ওগো, সে হবে না, হবে না! ও সব ভাবনা তোমার মিছে। তবে যে বদমায়েস ছেলে বাপকে কলা দেখিয়ে ছুঁড়ীটাকে নিয়ে ভাগতে পারে। হাঁ, তাহলেই ঠিক জব্দ হবেন শালা মুখুয্যের পো!"

"রাম! রাম! রাম! অমন পাপ কথা মুখেও আন্তে পার? মনেও ভাবতে পার? হাজার হক, নিজের ছেলে ত?"

অখিলবাবু কহিলেন, "ভাবি কি আব সাধে গিন্নী? গলায় পা দিয়ে মুখে আনিয়েছে, মনেও ভাবিয়ে তুলেছে হারামজাদাবা! আর ভাববই বা কি এখন? গর্ভস্রাব যে ওদের পেছনে ছুটেছে, কেন, কি মতলবে?"

"হয় ত তাকে বিয়ে করবারই চেষ্টা করবে।"

"হাঁ, তাহলেই ঠিক হবে! পাঁচটি বছর অন্ততঃ জেল ঠুকে দেবে।"

"জেল! ওমা, সে কি! বিয়ে করে কি জেল হয়?"

"ওগো, হয়, হয়। এ সব আইনেব কথা, তোমরা কি বুঝবে? ওরা ত হিন্দু সমাজের লোক নয়, বেহ্মজ্ঞানী কি কেরেস্তান—ঐ রকম একটা কিছু হবে। কে জানে, হয়ত ধর্ম্মই কিছু মানে না, কেবল সিভিল ম্যারেজ—এই রেজেষ্ট্রী করা একটা চুক্তির বিয়েই হবে। তা সে আইন হচ্ছে কি জান একটা বিয়ে করে তাই ছাপিয়ে আর কাউকে বিয়ে করলে চুরী ডাকাতী চাইতেও বড় অপবাধ হয়। পাঁচ বছর—দশ বছরও জেল তাতে হতে পাবে।"

শিহরিয়া বিরাজমোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ওগো, জেনে শুনেও তুমি নিশ্চিন্তি হয়ে চুপ করে বসে রয়েছ? ওগো, দোহাই তোমার, যাও, আজই বোম্বে ছুটে যাও! ওগো, রবীন যদি আমার জেলে যায়, কি করে আমি ঘরে থাকব গো! রবীন যে আমার—"

"হেঁউ হেঁউ হেঁউ!" পত্নীর রোদনকে বিকৃতমুখে নাকী সুরে ভেঙচাইয়া অখিলবাবু কহিলেন, "হায়, হায়, হায়! একেবারে আদুরে গোপালটির মা নন্দরাণী যশোদা আর কি! অমন হতভাগা ছেলের জন্যে আবার কাঁদছ? পাঁশ মাখিয়ে আঁশবটীতে কেটে ওকে কুচি কুচি করে ফেলতে হয়। হতে হতেই তাই যদি করে ফেল্তে—"

"ওগো দোহাই তোমার, আর বলো না, বলো না! এমন পোড়া কপাল করেও এ পৃথিবীতে এসেছিলাম! যম যে কেন আমায় ভুলে রয়েছে গো!"

"ঐ গর্ভস্রাব অকালকুষ্মাণ্ড রবীনের মা ব'লে! বিস্তর দুঃখু তোমার কপালে আছে, তা এই বলে রাখলাম আমি আজ।"

"দুঃখু কি কেবল আমার? তোমার কিছু নেই? রবীন কি একলা আমার ছেলে? তোমার কেউ নয়!"

"না, কেউ নয়! দুঃখু? এতটুকুও দুঃখু আমার নেই। রাগে কেবল পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে যাচ্ছে। হক্, জেলই হক্! খুসী হয়ে কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব! মদনমোহনের বাড়ীতে মচ্ছোব লাগাব!"

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তাহলে বোম্বে তুমি আজ যাবে না?"

"না! আজও যাব না, কালও যাব না! মরুক গে হত-ভাগা!"

"বেশ, তাহলে আমি যাব!" বলিয়াই বিরাজমোহিনী ফিরিলেন।"

অখিলবাবু কহিলেন, "হাঁ পাঠাচ্ছি আর কি বিজার্ভ গাড়ী করে! কে তোমাকে নিয়ে যাবে?"

"সে আমি লোক দেখে নেব।"

"গিয়ে কি করবে?"

"সে যা জানি করব; তোমাকে ভাবতে হবে না কিছু। ছেলে জেলে যাচ্ছে, তার মুখ পুড়ছে, তুমি পার, ইচ্ছে হয়, নিশ্চিন্তি আরামে ঘরে বসে থাক; আমি পারব না!"

পাশেই গড়গড়াটায় কেষ্টা এই মাত্র এক কলিকা তামাকু রাখিয়া গিয়াছিল। সে জানিত ক্রোধের সময় কর্ত্তাবাবুর যার পর নাই তামাকুপিপাসা জাগ্রত হয়, আর সে পিপাসার তৃপ্তির সঙ্গে উত্তেজনারও অনেকটা নিবৃত্তি ঘটে। নলে লম্বা একটা টান দিয়া অখিলবাবু কহিলেন, "ওগো থাম, থাম! শুনছ? আর পাগলামো করতে হবে না। অত কাঁচা ছেলে রবীন নয়, আইনও পড়েছে। সে বেশ জানে এ বিয়ে হতে পারে না, হলে তাকে জেলে যেতেই হবে।"

"জানে? বিয়ে তা'হলে করবে না?"

"না, বিয়ে করবে না। তবে আর যা করবে বা করতে পারে—হাঁ, মায়ের প্রাণটা তোমার তাতে খুব ঠাণ্ডা থাকবে! আঁ?"

"আর কি করবে?"

মুখখানি বিরাজমোহিনীর যারপরনাই উদ্বিগ্ন ও পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। অতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অখিল বাবু কহিলেন, "ব'ল্লাম না, বাবাকে কলা দেখিয়ে ছুঁড়ীটাকে নিয়ে কোথাও ভাগবে, যদি না নেহাৎ নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া হয়?"

অগ্নিবর্ণ মুখে অগ্নিবর্ণ চক্ষু তুলিয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "দেখ, ওসব কথা আমাকে বলো না, শুনতেও ঘেন্না করে!—তুমি অনায়াসে রঙ্গ করে ব'লছ, আমি অমন কুকথা মনেও ভাবতে পারি না। তার চাইতে—তার চাইতে—হাঁ, সত্যি বলছি—"বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন

অখিল বাবু কহিলেন, "না, সত্যি বলছ না! তার চাইতে তার মৃত্যু থাক্, জেলও তুমি কামনা করতে পার না! মায়ের প্রাণ! মেয়ে মানুষ ত? মন তার এমনি অসারই বটে!"

কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া বিরাজ-মোহিনী কহিলেন, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, যা খুসী বল, যত খুসী গাল দাও, রবীনকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! বাপ তুমি, পুরুষ মানুষ, পাষাণ হয়ে থাকতে পার, আমি পারিনে! এই রকম একটা যদি কিছু ঘটে, সত্যি বলছি; তোমার পায়ে আত্মহত্যা আমি করব। আমার কথাও যদি না ভাব, ঐ বৌটো—পরের মেয়ে ঘরে এনেছ—"

অখিল বাবুর চক্ষে এবার জল আসিল। কহিলেন, "থাম, থাম গিন্নী! কেঁদো না। ওঠ! হাঁ, আর কাঁদ ত তত্র কিছু না ভাবি, বিন্দু-মা আমাকে ভাবিয়ে তুলছে বটে! সব পারি, কিন্তু তাকে ত চাপা দিয়ে রাখতে পারিনে গিন্নী! আচ্ছা, ভেবেই তবে দেখি, কি করা যায়? ওরে কেষ্টা! কি আগুন দিয়েছিস রে? আর এক ছিলিম কলকে ধরা না ব্যাটা হারামজাদা!"

বলিয়া নলে খুব জোরে ঘন ঘন কটা টান দিলেন। বিরাজমোহিনী উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে চলিলেন।

"শোন!"

"কি?"

"বৌমাকে বল তৈরী হতে। রসো, দেখি পঞ্জিকাটা, দেখি। হুঁ—কাল হচ্ছে তেরোস্পর্শ। পরশু অশ্লেষা, তরশু মঘা-দূর হক্ ছাই, এত জঞ্জালও এসে জোটে! হুঁ—আবার ঐ বড়ালদের মামলাটা রয়েছে—"

"ওগো, মামলা টামলা থাক্। না হয় টাকার কিছু ক্ষতিই

হবে। এই তেবোস্পর্শ অশ্লেষা মঘা কাটিয়েই চল যাওয়া যাক্।"

"উ হুঁ।—তা পারিনে। এত বড় সঙ্গীন মামলাটা—আবার কাগজপত্র সব তৈরী করেছি আমি—সব গোলমাল হয়ে যাবে। পরের কাজ—টাকা ঢের খেয়েছি—উ হুঁ, তা হয় না। আর কটা দিন দেরী করতেই হবে।"

"এর ভেতরই যদি—"

"এর ভেতরই—কি হবে? ক্ষেপেছ তুমি? না গো, যাই তার মতলব থাক, অমন ঝাঁ ক'রে কিছু হতে পারে না। আচ্ছা, হুঁসিয়ার একজন লোক পাঠাচ্ছি, গোপনে খোঁজ খবর নেবে। বেগতিক কিছু দেখে, তক্ষুণি তার করবে। আর নেহাৎ যা দরকার এর ভেতর হয়, সেই করবে।—বৌমাকে বুঝিয়ে তুমি বল। কিছু ভাবনা নেই তার, বাঁদরকে ঘাড়ে ধরে তার পায়ে এনে দেব।—কি করব? বেয়াড়া হয়ে পড়েছে, এ সব একটু সয়ে বয়ে তাকে নিতেই হবে। আর খবরও নিয়েছি, যোগেশ মুখুয্যের ঐ মেয়েটা নেহাৎ লক্ষীছাড়া একটা মেয়ে নয়। জাতকাঠামোটা এখনও ঘুণে ধরে নি। বিয়ে যদি ও না করে, অতটা দুঃসাহস করবেও না, পালিয়ে ওর সঙ্গে সহজে যাবে বলে মনে হয় না। রবীনের একটা বউ ঘরে আছে জানতে পারলে পয়জার মেরেই ওকে দূর করে দেবে। ভয় নেই কিছু, সুখী হবে সে, অবিশ্যি হবে। অমন লক্ষী মেয়ে অসুখী হবে বলে জন্মায়নি। হতভাগা।—কি রত্ন তার ঘরে এসেছে, চেয়ে একটিবার দেখল না, বাইরে একটা আলেয়ার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিরাজমোহিনী কহিলেন, "আশ্চর্য্যি মেয়ে বটে! এমনটি আর দেখিনি! আবও আশ্চর্য্যি এই যে এত বড় দুঃখুটা, লজ্জাটা, কিছুই যেন গায়ে তুলে নিচ্ছে না। সেই শান্ত মিষ্টি হাসিটুকু মুখে লেগেই রয়েছে, যেন আমাদেরই জন্মজন্মের মেয়ে, আমাদের কাছে এসেই কৃতার্থ হয়েছে—রবীনের কেউ নয়, সে আসুক না আসুক, তার তরে এতটুকুও মরে না।"

চক্ষে জল আসিল। গড়গড়ায় জোরে কয়েকটা টান দিয়া অখিলবাবু কহিলেন, "তাইত ভাবি গিন্নী, ভাল এমন কিছুই ত এ জীবনে করিনি, কোন্ ভাগ্যে এমন জিনিষ পেলাম। সাধে তাকে এত আগ্রহ করে ঘরে এনেছি? যখন দেখলাম, কি মিঠেই যে লাগল। সেই যে আমার কাছে এসে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল, লজ্জায় নরম অথচ জড়সড় ভাব কিছু নেই, আর সে কি মিষ্টি হাসিই তার মুখখানিতে দেখলাম। মনে হল এই আমার মা, এই আমার মেয়ে, এই আমার সব। দুঃখু পাবে, নইলে হতভাগ্য যা খুসী করত, জেলে যেত, মরত, কিছুই ভাবতাম না, ওকে নিয়েই পরম সুখে আমার জীবনটা কেটে যেত! আহা, ওকে আজ যেমন মিঠে লাগছে, রবীনকেও ত সেই ছেলে বেলায় এমন লাগেনি।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বিরাজমোহিনী কহিলেন, "সার্থক মেয়ে পেটে ধরেছিল বেয়ান। আর আমি অভাগী—মহাপাপিনী—কি কুসন্তানই পেটে ধরেছি। আহা, অমন একটি মেয়েও যদি আমার থাকত।"

"ঐ ত পেয়েছ গিন্নী। আর কি চাও? কেন আফশোষ করছ? ও যে তোমার মেয়েরও বড়। তবে হাঁ, দুঃখ হয়, বড় দুঃখ হয়, নরেনের ঘর থেকে যেন ডাকাতী ক'রে এনেছি। এতগুলো টাকা যে কেন নিলাম। বড় পরিতাপ হয় গিন্নী, বড় পরিতাপ হয়।"

"ফেরত কেন দেও না?"

"সে কি আর তা নেবে? টাকার কাঙ্গাল ত সে নয়? মুখ দেখাতে এখন লজ্জা করে তাকে। ছি-ছি ছি! এমন হতভাগা ছেলে যার জন্মে, সে কি আর ভদ্রসমাজে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে? অমন মেয়ে তার—সত্যি যেন ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে, ডাকাতি ক'রে কেড়ে আনলাম; ঐ ত সেদিনও এসেছিল, মনে বেশ একটা খুঁৎখুঁতি নিয়েই এসেছিল, হয় ত ভাবছিল সম্বন্ধটা যদি পারে ভেঙ্গেই দিয়ে যাবে। তা কথাটা মুখেও আনতে পারল না, এমনি ক'রেই ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে ফেল্লাম। কথাটা কি জান? মেয়েটিকেই ছাড়তে পারছিলাম না। এমন বৌমা ঘরে আনব—কি আশা, কি আনন্দ আমার! ঐ ত ও বাড়ীর শরতের সঙ্গে সেই একদিন তর্ক হচ্ছিল, তখন বুঝি নি, ভাবি নি— আজ মনে হ'চ্ছে, কেন, যার টাকা আছে সে আবার ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা নেয়! চাই একটি বৌ-মা, লক্ষী একটি বৌ-মা, যেমন আমি পেয়েছি! টাকা কি? ঢের ত আমার আছে গিন্নী। সত্যি এখন বড্ড পরিতাপ হ'চ্ছে।"

"তাই ত ব'লছিলাম, ফেরত কেন দেও না? কোন্‌-মুখেই বা সে টাকা তুমি রাখবে? নবীন্‌ নিয়ে গেছে দশ হাজার। নিয়েছে, তোমার ছেলে ভোম্রার টাকা নিয়েছে।"

"হাঁ, দেব! আগে ব'লব না কিছু, পাঠিয়ে দেব। লিখে দেব, যদি না সে রাখতে চায়, ভাল কোনও কাজে দিয়ে দিক্‌। আমাকে যা সে দিয়েছে, সেই অমূল্য ধন! মেয়ের জন্তে ভাবনা নেই তার কিছু। আমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী সে!"

১৪

"কি হে রবীন! আরে বাঃ! পালাচ্ছ কেন হে? আরে, শোন-শোন-শোন! ঘুরে একটিবার চেয়েই দেখ!"

বোম্বে সহরের সমুদ্রতীরে মালাবার পাহাড়ের নিকটে সহসা একদিন অপরাহ্ণে অতীনকে দেখিয়া রবীন সত্যই যেন দেখে নাই এই ভাবে সরিয়া যাইতেছিল। অতীনের এই উচ্চকণ্ঠ শ্লেষব্যঞ্জক আহ্বান কানে না তুলিয়া সে পারিল না; অগত্যা ঘুরিয়া দাঁড়াইতেও হইল। অতীন দ্রুত আসিয়া হাসিমুখে তার হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

"তাই ত! তুমি এখানে অতীন?"

বিস্মিত ভাবপ্রকাশে কেমন বিশুষ্ক মুখে রবীন চাহিল।

হাত ছাড়িয়া দিয়া অতীন কহিল, "তুমিও ত এখানে। আমার আসাটাই কি এমন একটা অভাবনীয় তাজ্জব ব্যাপার হ'ল?"

"না, না, তা নয়—তা নয়! তবে—"

"তবে কি হে? আমাদের মত লোকের এদ্দূর, এই বোম্বে বেড়াতে আসাটা কেমন যেন খাপ্‌ছাড়া লাগছে বুঝি? তা লাগতে পারে বই কি, কতকটা কাঙ্গালের ছেলের ঘোড়াই নাচের মত। তবে, ঠিক সখে বেড়াতে আসি নি তোমার মত। এসেছি কাজে।"

"কাজে!"

"তোমার বোধ হয় এটা স্মরণ নেই যে, সিনার্জী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে আমি কাজ করি।"

"ওহো! তাই ত! তুমি ত তারই একজন এজেণ্ট বট!"

"আজ কাল 'অর্গানাইজার' নামটা ওঁরা দিয়েছেন। কাজে তেমন না হ'ক, মানে নামটার একটু কদর আছে।"

"হুঁ! বাবাও একজন ডাইরেক্টর তোমাদের কোম্পানীর। তা সেই কোম্পানীর কাজে এসেছ বুঝি?"

"হাঁ, প্রকাশ্য কাজ সেইটেই বটে। তবে রথ দেখা উপলক্ষ্য ক'রে মেলায় গিয়ে কলা বেচতেও অনেকে বলে। তেম্‌নি—তা সে যাক্‌, তা তোমার সে কলা বেচাটা কদ্দূর এগোল?"

"কলা বেচা!"

"বলি, কেবল সখেও ত আস নি ছুটে সদ্য সদ্য এমন বিয়ের জলটা গায়ে না শুকোতেই? কাজের তাগিদও বড় একটা ছিল। তা সেটা কদ্দূর এগোল হে?"

"কাজ—কাজের তাগিদ—"

রবীনের মুখখানি কেমন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

"কাজ, কাজের তাগিদই বটে। আর সেটা বেশ জরুরীও জানি। নইলে সত্যি, এমন বউটি ঘরে একাই অম্‌নি—"

একটু ভ্রূকুটি রবীনের ললাটে দেখা দিল।

"তা, জরুরী কাজের তাগিদ তেমন থাকলে! (হাতঘড়ীটি দেখিয়া) ইঃ! ছটা যে বাজে! তা ভুলে আসি এখন অতীন, একটা 'এনগেজমেণ্ট' আছে।"

"আরে শোন, শোন! একটু দাঁড়াও না। এমন 'এনগেজমেণ্ট' সত্যি তোমার কিছু নেই যে এখুনি অম্‌নি ছুটতে হবে। সে রোজকার যা আছে, তার জন্তে এমন তাড়া কিছু নেই আজ। ক'মিনিট অপেক্ষা করলে এমন গোকুলপুরী অনাথ হ'য়ে যাবে না।" বলিয়া হাতখানি আবার চাপিয়া ধরিল।

"কি ব'লছ অতীন বুঝতে পারছি নে কিছু।"

"পারছ বই কি, বেশ পারছ। তা শোন—"

"আঃ! হাতটা কেন ছেড়ে দেও না? ভয় নেই, ছুটে পালাব না। পালাবার এমন কারণও নেই কিছু।"

হাত ছাড়িয়া দিয়া অতীন কহিল, "কারণ—তা যে কিছু থাক না থাক, পালাতে পারবে না। বড় ঘরের দুলালটি তুমি, আর আমি একজন ফুটবল-প্লেয়ার। দেখতে পার ট্রাই (try) ক'রে, একটা রানিং রেসে (running race এ) কে হারে কে জেতে! তবে বিদেশের এই সহরে রাস্তায়—লোকে হাসবে, হৈ হৈ একটা প'ড়ে যাবে!"

"থাক্, বাজে আর ব'কো না মেলাই। সত্যিই একটা এনগেজমেণ্ট আছে আমার; (ঘড়ী দেখিয়া) তা কি ব'লবে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে ফেল।"

"শোন। বন্ধু ভাবে একটা উপদেশ দিতে চাই, গ্রহণ ক'রলে উপকার হবে তোমার।"

"উপ—দেশ!"

"হাঁ উপদেশ। বন্ধুজনের অতি সমীচীন উপদেশ। অবহেলা ক'রো না। কাজটার যা-হয় শীগ্‌গিরই একটা কিছু ক'রে ফেল। নইলে ফাসাদে পড়বে, সব ফেঁস্তে যাবে।"

ভ্রূকুটি করিয়া রবীন কহিল, "কি ব'লছ তুমি অতীন, বুঝতেই পারছি না। ওসব বাজে কথার সময় আমার এখন নেই। আসি তবে, গুড বাই!"

"নেহাৎ বাজে নয়। শুনবে তবে? তোমার মা বাবা এখানে সবাই আসছেন তোমার নবপরিণীতা বধূটিকে নিয়ে। এই হপ্তার ভেতরই এসে পড়বেন।"

সহসা ঘুরিয়া রবীন একেবারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল।

"কি একদম পাথর হ'য়ে দাড়ালে যে। অতি আনন্দের এই অকস্মাৎ অশনিপাতটা জমাট মেরেই যে তোমাকে দিল। ত্তাঁ! তা জরুরী কি এনগেজমেণ্ট আছে না? একেবারে 'নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু'—এ কি!"

"তাঁরা আসছেন—কেন? কে তোমাকে বললে?"

"স্বয়ং তোমার পিতা যিনি এই ডেপুটেশনটা (deputation) লীড (lead) করে নিয়ে আসছেন for an urgent interview with—"

"ননসেন্স (nonsence)! ধাপ্পা দিচ্ছ! কাজকর্ম সব ফেলে হঠাৎ সপরিবারে তিনি এখানে আসছেন, সেও কি একটা কথা? কেন আসবেন? আর এলেও তোমাকে সে কথা বলতে যাবেন কেন? এমন একজন confidential friend (বিশ্বস্ত বন্ধু)ও ত নও তুমি তাঁর?"

"না, তা নই। তবে সম্প্রতি হয়েছি। যেমন গরজে বেড়ালের পায়েও লোক ধরে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না হয়, নেই। আমার কি? দেখা হল, বন্ধু ভাবে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। ব্যস্, এখন তোমার কাজ তুমি বোঝ।"

বলিয়াই উদাসীন ভাবে শিস্ দিতে দিতে অতীন ফিরিল।

"শোন অতীন।"

"বল।"

"সত্যি বলছ তুমি? সত্যিই তাঁরা আসছেন বৌকে নিয়ে?"

"এত বড় একটা মিথ্যেই বা বানিয়ে বলব কেন? কি গরজ আমার পড়েছে?"

"জানি না। তবে সত্যিটাই যে যেচে কেন আমাকে বলছ, কি মতলবে, সেইটে বুঝতে পারছি নি।"

"সেটা বুঝতে পার কি না পার, তাঁরা যে আসছেন এটা ত সত্যি বলে বুঝতে পারছ? তোমার পক্ষে এখন তাই যথেষ্ট নয় কি?"

রবীন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "অবশ্যি তাঁদের এখন এখানে আসাটা আমি যে ঠিক পছন্দ করতে পারছি—"

"না, তা পারছ না, পারবে না জানি।"

"জান! তার মানে?"

"মানে জানি, সব আমি জানি।"

"সব—কি সব তুমি জান?"

হাসিয়া অতীন কহিল, "খুলে বলবার দরকার কিছু আছে? নিজের কথা নিজেই জান না কিছু? আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পার। কিন্তু নিজের মনটাকে ত ফাঁকি দিতে পার না। কথাতেই লোকে বলে, মনের অগোচর পাপ কিছু নেই।"

"পাপ—"

"ওটা একটা কথার কথা বলে ফেল্লাম। নইলে পাপ-পুণ্যি কিছু চলতি হিসেবে তোমার মত আমিও মানি না। ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়ও আমার কিছু নেই। সোজাসুজি যা বুঝি, দেল খুলেই বলি, দেলখোলা ভাবেই চলি। তোমার মত অত ভয় পাইনে কিছুতে।"

"ভয়—সে থাক্ গে। তা বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কবে?"

"এই ত আসবার দিন-দুই আগে, ডাইরেক্টরের সভায় তিনি এসেছিলেন।"

"তার পর?"

"আমাকে বোম্বে একবার পাঠাবার কথা সভায় হ'ল।

শেষে আড়ালে ডেকে তিনি ঘরের অনেকগুলো কথাও আমাকে বল্লেন।"

"কেন, এ সব ঘরের কথা—"

"অবিশ্যি খুব ভালবেসে সুহৃদের মতও বলেন নি। সে রকম অন্তরঙ্গ একজন সুহৃদও তাঁর নই আমি। তবে বড় গরজ ছিল কি না—"

"গরজ—"

"হাঁ, গরজ। আসতে ক'দিন দেরী হবে তাঁর, জরুরী কি একটা মামলা আছে, ফেলে তাড়াতাড়ি করে আসতে পারছেন না। এ দিকে আবার—কে জানে—এই ক'দিনের ভেতরই যদি এমন একটা কিছু ঘটে যায়, যার প্রতিকার করা শেষে শক্ত হবে, তাই প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের মত বিশ্বাসী একটি লোকেরও দরকার তাঁর হয়েছিল।"

"ও, চর নিযুক্ত করেছেন তোমাকে। তা বিশ্বাসটা ত খুব রাখছ ?"

"না, তা রাখছি না। কিন্তু সে নিন্দে তুমি আমাকে করতে পার না। আমি অবিশ্বাসী হচ্ছি কেবল তোমার বাবার কাছে যিনি আমার কেউ নন। আর তুমি দারুণ অবিশ্বাসের কাজ করছ তোমার পিতার কাছে, তোমার স্ত্রীর কাছে, তার চাইতেও গুরুতর—সম্ভ্রান্ত একটি ভদ্রলোক আর তাঁর কন্যার কাছে, সাধুচরিত্র ভদ্রলোক ব'লে যাঁরা তাঁদের মান ইজ্জৎ পর্য্যন্ত তোমার হাতে সঁপে রেখে নিশ্চিন্ত আছেন।"

মুখখানি রবীনের অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া অতি আয়াসে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "তুমি কি সন্দেহ করছ অতীন ?"

হাসিয়া অতীন কহিল, "কি আর করতে পারি বল ? বিয়াহ তুমি করতে পার না। করলেও সেটা অবৈধ হবে, নিজেও বাইগেমীর (bigamy) চার্জ্জে বিপদে পড়বে। পার, free-love (স্বাধীন প্রেম) চাই, convention (লোকাচার) কিছু মানবার দরকার নেই, অতি-আধুনিক এই সব বুলির ধোঁকা দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়তে। কারণ তার বাবা ঝানু হিসেবী লোক, ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছু মানুন না মানুন, লোকাচারটা মানেন, আইনটাও মানেন, ওসব বুজরুকীতে রাজি হবেন না।"

ভ্রূকুটি করিয়া রবীন কহিল, "এই রকমই যে মতলব একটা আমার আছে কিসে তুমি বুঝলে ?"

"নইলে ছুটে কেন এসেছ বোম্বে অবধি এঁদের পেছনে ? আর কি মতলব থাকতে পারে ? তেমন হাঁদা ছেলে পেয়েছ আমাকে যে এইটুকুও বুঝব না ?"

"হাঁ, স্বীকার করছি মীনাকে আমি ভালবাসি। তা platonic love (নিষ্কাম প্রেম) বলেও ত একটা জিনিস আছে।"

"হাঃ হাঃ হাঃ। রবীন, কাকে-বোকা বোঝাচ্ছ ? Platonic love করবে তুমি ? হাঃ হাঃ হাঃ! ও-সব কাব্যেই আছে। বাস্তব জীবনে দেখেছ কোথাও ?"

হঠাৎ কথা ঘুরাইয়া লইয়া রবীন কহিল, "বুঝতেই পারছি নি, অতীন, এ সব কথা আমাকে বলবার কি উদ্দেশ্য তোমার থাকতে পারে।"

অতীনের মুখে কেমন একটা উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইল। বলিয়া উঠিল, "উদ্দেশ্য! উদ্দেশ্য! তা উদ্দেশ্য যে একটা থাকতেই হবে এমন কথা আছে কিছু? অনেক লোক আছে যারা কেবল দুষ্টুমী বুদ্ধিতেই লোকের ভেতর গোল পাকিয়ে বেড়ায়। নারদমুনি শুনেছি সর্ব্বত্র কেবল ঝগড়া বাঁধিয়েই বেড়াতেন। আমারও হয় ত ঐ রকমই একটা স্বভাব আছে। সে যাই হক, আমার উদ্দেশ্য নিয়ে ত কোনও কথা হচ্ছে না। উদ্দেশ্য—ধর না হয় একটা কিছু আমার আছে। কিন্তু তা জেনে তোমার কি হবে ? এটা ত বেশ বুঝতে পারছ তোমার এই বোম্বে আসবার রহস্যটা সব আমি জানি। আমি যখন জানি, আরও কেউ কেউ জানতে পারে। সুতরাং তোমার স্ত্রী, তোমার শালী, তোমার শালা, তোমার শ্বশুর, বাবা, এঁরাও জানতে পারেন। আর জানতে পারলে অবিলম্বে যে তোমার এই চেষ্টায় বাধা এসে দিতে চাইবেন, এটাও ঠিক। তোমাকে এখন দেখতে হবে, খবরটা যদি পেলে, কি করবে, কি ক'রে তাঁদের হাত এড়িয়ে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি করবে। আমি কেন, কি উদ্দেশ্যে, এ খবরটা তোমাকে দিলুম, কেন তোমার বাবার গুপ্ত বিশ্বাসটা ভাঙলাম, আত্মীয় হলেও কেন তোমার শ্বশুরবাড়ীর এত বড় অনিষ্ট করতে চাই, সে সব জানবার ত কোনও দরকার তোমার নেই। আসি তবে। তোমার বাবা এই হপ্তাখানেকের ভেতরেই বোধ হয় এসে প'ড়বেন। মামলাটার যদি কোনও বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারেন, হয় ত দু'তিন দিনের ভেতরই আসবেন। —আসি। আমার ঠিকেনা এই। দরকার বোধ করলে দেখ করতে পার।"

একখানি কার্ড রবীনের হাতে দিয়া অতীন চলিয়া গেল

(ক্রমশঃ)

বৰ্দ্ধমান

—কাদের নওয়াজ

বীরসিংহের সিংহ-দুয়ার
দেখিয়াছ তুমি বৰ্দ্ধমান !
নবরত্নের সভা ল'য়ে বুকে
গাহিয়াছ মেঘ-মন্দ্রে গান।
তনু-মন তব পদ-রজে পূত—
দিয়াছেন করি 'নূরজাহান',
তোমার সমাধি-অঙ্কে শায়িত
কুতবুদ্দীন—শের-আফ্‌গান। (১)
দাশরথি (২) আর লোচন দাসের (৩)
জনম তোমার হৃদয়'পর,
নরহরি (৪) দিল বাঁশরীর গীতে
উথেলি' তব পুলক'সর,
ভারতচন্দ্র (৫) সুর বাঁধি বীণে
গাহিল তোমার অতুল যশ,
তৃষ্ণা মিটালো কবি-কঙ্কণ (৬)
ওষ্ঠেতে ঢালি কাব্যরস।

গোবিন্দ দাস (৭) পদাবলী রচি'
অমিয়া তব বক্ষমাঝ
মুগ্ধ করিল সবারে ধরায়
শিরেতে লভিল উপাধি-তাজ।
তব তবু তানে দামোদর-নদ
ছুটিয়াছে তব পার্শ্বে ওই
বালুচরে তার বসি' আজ মোরা
চল অতীতের কাহিনী কই।
কমলার পুরী ছিল এ-নগর
বিভবেতে নিতি বৰ্দ্ধমান,
মখ্‌দুম (৮) আর সাহজাকেরের (৯)
তপোবলে পূত ইহার প্রাণ,
খুল্লনা সতী (১০) জনম লভিল
ধনপতি (১১) হেথা করিল বাস
'কমলে কামিনী' দেখায়ে রাজায়
সাধু শ্রীমন্ত (১২) মিটালো আশ।

---

(১) কুতবুদ্দীন—সের আফগান—বৰ্দ্ধমান সহরে পীর বাহরাম নামক স্থানে উভয়েই পাশাপাশি সমাহিত।

(২) দাশরথি—ইনি সাধারণ্যে দাশুরায় নামে পরিচিত। বৰ্দ্ধমান জেলার বাঁধমুড়া গ্রামে ইহার জন্ম। ইনি একজন বিখ্যাত পাঁচালী-রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন।

(৩) লোচন দাস—বৰ্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে ইহার জন্ম ও সমাধি-স্থান। ইনি একজন বিখ্যাত সাধক ও কবি ছিলেন।

(৪) নরহরি—বৰ্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে ইহার জন্ম হয়। গৌর-লীলার পদ ইনিই প্রথম রচনা করেন।

(৫) ভারতচন্দ্র—বিখ্যাত কবি, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা। তাঁহার বাড়ী পাণ্ডুয়া গ্রামে। এই গ্রামটি তখন বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল।

(৬) কবিকঙ্কণ—ইহার প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা, বৰ্দ্ধমান জেলার 'দামুন্যা' গ্রামে ইহার জন্ম।

(৭) গোবিন্দদাস—বৰ্দ্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রামে ইহার জন্ম হয়, ইনি এক-জন বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি ছিলেন। গুরুর নিকট 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

(৮) মখদুম—ইনি একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম "সাহ আবদুল্লাহ গুজরাটী", গুরুর নিকট মখ্‌দুম উপাধি প্রাপ্ত হন, বৰ্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রাম ইহার কর্ম্মভূমি এবং এই স্থানেই তিনি সমাহিত।

(৯) সাহজাকের—ইনি একজন সুবিখ্যাত তাপস, 'বোগদাদ' হইতে আসিয়া বৰ্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে বসবাস করেন ও এখানেই তাঁহার সমাধি বৰ্ত্তমান।

(১০) খুল্লনা—বৰ্দ্ধমান জেলার 'উজানী'-নিবাসী বিখ্যাত শ্রীমন্ত সদাগরের জননী।

(১১) ধনপতি—বৰ্দ্ধমান জেলার 'উজানী' নগরে বাস করিতেন। বিখ্যাত শ্রীমন্ত সদাগরের পিতা।

(১২) সাধু শ্রীমন্ত—বৰ্দ্ধমান জেলার 'উজানী'তে ইহার জন্ম হয়, সিংহল-রাজকে 'কমলে-কামিনী' দেখাইয়া ইনি পিতা ধনপতিকে কারামুক্ত করেন।

কমলাকান্ত (১৩) আসিল হেথায়
গাহিল উচ্চে শ্যামার গান।
ভক্তি-অশ্রু-সিক্ত হইল
শুনি' দস্যুর দুই নয়ান।
হামীদ-বাঙালী (১৪) মৌলানা (১৫) আর
মহামতি 'কাজী খোদা নায়াজ' (১৬)
উদিয়াছিলেন ভানুসম
এই বৰ্দ্ধমানের বক্ষমাঝ।
মাহ্‌তাব চাঁদ (১৭) কীৰ্ত্তি যাঁহার
আজিও ধরায় বিদ্যমান,
প্রাসাদ তাঁহার এই নগরেতে
এই সহরেতে জনমস্থান।

হেথাকার রাণী স্বর্ণময়ীর (১৮)
নাম শুনে নাই কোন্ মানব
দাতার শ্রেষ্ঠ মণি-মহারাজে (১৯)
হেথায় পেয়েছি আমরা সব
প্রতিভার খনি রাসবিহারীর (২০)
বিশ্বে আজিও অতুল মান
জনমিয়া হেথা ক'রেছেন তিনি
বাণীর স্নেহে সরিতে স্নান
রাজা মণিলাল (২১) সিংহের নম
বিক্রম হের আজিও রয়
জনমে তাঁহার ধন্য হ'য়েছে
হেথাকার মাটী, মিথ্যা নয়
যশো-মহিমার লীলাভূমি তুমি
মৃত্যুঞ্জয়ী বৰ্দ্ধমান
ললিত ছন্দে লক্ষ চারণ
গাহিতেছে তব কীর্ত্তিগান।
সেতার, বংশী সু-তানে তোমার
ধরিতেছে গীতি রাত্রি-দিন
ক্ষমা চাহে কবি তব সঙ্গীত
গাহিতেছে লয়ে ছিন্ন-বীণ। *

(১৩) কমলাকান্ত—বৰ্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইঁহার শ্যামাসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় একদল দস্যু ভাববিহ্বল হইয়া তাঁহার পদ-রজ গ্রহণ করিয়াছিল।

(১৪) হামীদ বাঙালী—ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। ভারত-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও ইনি উভয়েই এক দীক্ষা-গুরুর শিষ্য। বৰ্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি ও সমাধিস্থান।

(১৫) মৌলানা—ইঁহার প্রকৃত নাম 'মোহাম্মদ', মৌলানা ইঁহার পাণ্ডিত্যের উপাধি। ইনি একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। বৰ্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে ইঁহার জন্ম এবং এই গ্রামেই ৩২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(১৬) 'কাজী খোদা নওয়াজ'—বৰ্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান; ইনি একজন সুবিখ্যাত সহৃদয় দানবীর জমিদার বলিয়া সাধারণের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম করিলে দিন সার্থক যায় আজিও এই প্রবাদ এ অঞ্চলে প্রচলিত। ইঁহার বংশ আভিজাত্য-গৌরবে পশ্চিম বাঙ্গলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(১৭) মাহ্‌তাব চাঁদ—বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ।

(১৮) রাণী স্বর্ণময়ী—কাশিমবাজারের নপীলা মহারাণী, বৰ্দ্ধমান জেলার 'ভাটাকুল' গ্রামে ইঁহার জন্ম।

(১৯) মণি-মহারাজ—ইঁহার নাম 'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী', কাশিম-বাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ। বৰ্দ্ধমান জেলার 'মাথরুণ' গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি।

(২০) রাসবিহারী—ডাঃ স্যর রাসবিহারী ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। 'বৰ্দ্ধমান জেলা' ইঁহার জন্মস্থান।

(২১) রাজা মণিলাল—রাজাবাহাদুর মণিলাল সিংহরায় সি আই, ই; দেশসেবার জন্য ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে 'রাজা বাহাদুর' ও 'সি, আই, ই', উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদীঘির বিখ্যাত জমিদারবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি বহুদিন হইতে বৰ্দ্ধমান জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

* বঙ্গীয় সাহিত্য মহফিলে পঠিত।

ফল্গুধারা

—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

শীত শেষ হইয়া তখন সবেমাত্র বসন্তকাল পড়িয়াছে। সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া বৃন্দাবন বাড়ীর সম্মুখে সজনে-তলাটায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সংসারের নানান কথা চিন্তা করিতেছিল। বৈশাখ মাস পড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ঘরের ছাদটা এবার কোনরকম করিয়া না পাল্টাইলে এই বৈশাখে সমস্ত ঘরখানা ঝড়ে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ওদিকে আবার গোমস্তা আসিয়া সে-দিন বলিয়া-গিয়াছে, আড়াই বিঘে জমিটার দরুন গত তিন কিস্তীর বাকী খাজনা এই চৈত-সংক্রান্তির মধ্যে এককালীন সব মেটান চাই, নচেৎ জমিদার তাহার জোত-জমা সব নিলামে তুলিয়া খাস করিয়া লইবে।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার মাঝে মাঝে তাহার মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু আশাও হইতেছিল। তাহার ছোট ভাই গোপীমোহন কলিকাতায় থাকিয়া সেখানকার ছোট আদালতে ওকালতী করে। আজ মাস পাঁচ-ছয় হইল সে আইন পাশ করিয়া সম্প্রতি আদালতে বাহির হইতেছে। গোপীমোহন যে-রকম বুদ্ধিমান তাহাতে পসার করিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না।

বসিয়া বসিয়া বৃন্দাবন এইসব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় গ্রামের ডাকপিওন আসিয়া তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিয়া গেল। খামখানা হাতে করিয়াই সে বুঝিতে পারিল কাহার চিঠি। আজ কয়দিন হইতে বৃন্দাবন অনুরূপ একখানা চিঠি পাওয়ার আশায় একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া পথের পানে চাহিয়া ছিল। সজনে-গাছটার গায়ে হুঁকাটা ঠেসান দিয়া রাখিয়া সে যথাসম্ভব দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া বৃন্দাবনের স্ত্রী নারায়ণী তখন কুটনা-কোটায় ব্যস্ত ছিল। স্বামীকে একখানা খাম হাতে করিয়া অমন হন্ত-দন্ত ভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি গা?"

খামখানা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বৃন্দাবন বলিল "গোপার, চট্ কোরে চশমাটা আনত বড়-বৌ।"

চশমা আনা হইলে বৃন্দাবন খামের মুখটা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা পড়িতে সুরু করিল। এবার অনেকদিন পরে গোপীমোহনের চিঠি আসিয়াছে, দেবরের সংবাদ শুনিবার জন্য নারায়ণীও উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামীর পাশে চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা সে লক্ষ্য করিল চিঠি পড়িতে পড়িতে বৃন্দাবনের মুখখানা যেন অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর মুখের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপোর খবর কি গা?" উত্তরে বৃন্দাবন কোন কথা না বলিয়া চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া আলগোছে নারায়ণীর হাতে ফেলিয়া দিল।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারায়ণী সেইখানেই চিঠিখানা আগা-গোড়া পাঠ করিল। তাহার দেবর যে ভাইকে এমন করিয়া চিঠি লিখিতে পারে, তখনও সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। গোপীমোহন লিখিতেছে :

শ্রীচরণেষু

দাদা, অনেকদিন হ'ল আপনাদের কোন খবর পাই নাই। আশা করি আপনারা ভাল আছেন।

আপনাদের না জানিয়ে আমি এক কাজ করে ফেলেছি। গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ আমি পুলিস আদালতের উকিল রামসদয় চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জু-রাণীকে বিবাহ করেছি। আমার শ্বশুর উক্ত আদা-লতের একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী প্রবীণ উকিল। আজকালকার দিনে এইরকম একজন সুপারিশ না থাকলে এ ব্যবসায়ের উন্নতি করা যায় না।

আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ইচ্ছা আপনি ও বৌঠান একদিন এ-বাড়ীতে এসে আপনার বধূমাতাকে

আশীর্ব্বাদ করে যান। আপনার চিঠি পেলে আমি লোক পাঠাবার বন্দোবস্ত করব।

আপনারা আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

গোপী।

পড়া শেষ হইলে নারায়ণী একবারে ভয়ে ভয়ে স্বামীর মুখের পানে তাকাইল; দেখিল সে মুখে ভয়াবহ তেমন কিছু না থাকিলেও, এমন একটা কমনীয়, প্রশান্ত অথচ তেজোদীপ্ত গাম্ভীর্য্য সেই শান্তশীর্ণ মুখখানির মধ্যে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা সচরাচর বড় একটা কাহারও মুখে দেখা যায় না। চিঠিখানা হাতে করিয়া সে স্বামীর পাশে চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রভাতের রজতধবল সূর্য্যালোক তখন শিশিরসিক্ত গাছপালার ডালে-পাতায় ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। সম্মুখের সজনে-গাছটার দিকে চাহিয়া কতকটা আক্ষেপের সুরে বৃন্দাবন বলিল, "কলির বিচার দেখলে বড়-বৌ? যাকে এত করে মানুষ করলুম, সেই ভাই কি না স্পষ্ট লিখলে—সময় অভাবে আমার বিয়েতে তোমাদের বলতে পারলুম না···আবার আস্পর্দ্ধা দেখেছ, বলে কি না, তাব শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে বৌকে তার আশীর্ব্বাদ করে আসতে হবে।"

চিঠিখানা পড়িয়া নারায়ণী কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। স্বামীব কথার পিঠে কি যে বলিবে কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না।

একটুখানি থামিয়া কতকটা আপন মনে বৃন্দাবন বলিল, "বয়ে গেছে আমাব, মায়ের পেটের ভাই ফেলতে ত পারি না, খাইয়েছি, পরিয়েছি, লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, ব্যস, এখন যা খুসি করগে যা।" এই বলিয়া সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী পুনরায় কুটনা-কোটায় মনঃসংযোগ করিল।

এমনটা যে হইতে পারে, সে কখনও স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই। বেশী-দিনের কথা নয়, এই সেদিনও নারায়ণী দেবরের পরীক্ষার সময় ফি-এর টাকার জন্য গলার হার খুলিয়া দিয়াছে। খুব অল্প বয়সে গোপীর মা মারা গিয়াছিল বলিয়া ছেলে বেলায় তাহার বৌঠান-অন্ত প্রাণ ছিল। বৌঠানের কাছটিতে না হইলে তাহার ঘুম হইত না। নারায়ণী ভাবে, এত অল্প দিনের ব্যবধানে মানুষ সেই সব কথা ভুলিয়া যায় কেমন করিয়া?

দুপুর বেলায় বৃন্দাবন আহারে বসিলে, নারায়ণী তাহার সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো কি তা হলে এখন শ্বশুরবাড়ীতেই······"

কথাটা আর তাহার শেষ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হইল না, ধমক দিয়া বৃন্দাবন বলিল, "খবরদার আমার কাছে তার নাম পর্য্যন্ত মুখে এনো না, বড়-বৌ তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

বসিয়া বসিয়া নারায়ণী নির্ব্বিকারে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

তাহার পর প্রায় মাসাবধি কাল কাটিয়া গিয়াছে সেই হইতে বৃন্দাবন ভায়ের আর কোন সংবাদ পায় নাই পাইবার কথাও নয়। বিবাহের পর গোপীমোহন তাহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল—রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে বৃন্দাবন সে-চিঠির কোন উত্তর দেয় নাই। এদিকে তাহার আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আড়াই-বিঘা জমিটা হইতে এ বছর যাহা কিছু ধান খড় পাওয়া গিয়াছিল, সব বিক্রয় করিয়া জমিদারের বাকী খাজনা মিটাইতে হইয়াছে। কোন রকমে ধার-কর্জ্জ করিয়া দিন চলে, এখন এইরূপ অবস্থা।

কথায় কথায় বৃন্দাবন একদিন বলিল, "একবার না হয় কলকেতায় গিয়ে একটা কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখি, এমনি করে আর কতদিন চলবে?"

নারায়ণী কিন্তু স্বামীকে কলিকাতায় যাইতে দিতে একান্ত নারাজ। এতখানি বয়স হইল, বৃন্দাবন কখনও বিদেশ যায় নাই। তাহার উপর আজ কয়দিন হইতে তাহার সেই বুকের ব্যথাটা অত্যন্ত বাড়িয়াছে। প্রবল আপত্তি জানাইয়া সে বলিল, "না না, সে হয় না, তোমার এই রোগা শরীর, তার চেয়ে······" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে থামিয়া গেল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "তার চেয়ে কি বল না?"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া নারায়ণী বলিল, "কাদুপিসি বলছিল, মুখুজ্জেদের বাড়ী একটা লোকের দরকার—রান্নাবান্না গেরস্থালীর কাজ করবার জন্যে।"

হাতের হুঁকাটায় দীর্ঘ একটা টান দিয়া এঞ্জিনের মত

ধোঁয়া উড়াইতে উড়াইতে বৃন্দাবন বলিল, "ও সব কাজ ত আমার দ্বারা হবে না বড়-বৌ।"

স্বামীর কথা শুনিয়া নারায়ণী একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, "তুমি আবার গেরস্থালীর কি কাজ করবে ?"

"তবে কে করবে, তুমি ?"

চাবীর রিঙটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে মৃদু কণ্ঠে নারায়ণী বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে ?"

কতকটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বৃন্দাবন বলিল, "ন্যাঃ, হয় নি কিছু।"

যাহা হউক, নারায়ণীকে মুখুজ্জেদের বাড়ী রাঁধুনী-বৃত্তির আশ্রয় লইতে হইল না, অথবা বৃন্দাবনকেও আর অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাইতে হইল না, দেশেই তাহার একটা কাজ জুটিয়া গেল।

দুপুর বেলায় বৃন্দাবন একদিন বাড়ী ফিরিয়া তেল মাখিতে মাখিতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক বাঁচা গেল, তোমায় আর রোজ সকাল বেলায় ধুচুনী হাতে চালের জন্তে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হবে না।"

ব্যাপারটা সঠিক বুঝিতে না পারিয়া নারায়ণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বৃন্দাবন যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই, সকাল বেলায় মোড়লদের গোলায় তামাক খাইতে গিয়া সে অনেক আলাপী লোকের মুখে খবর পায়, গরলগাছার মহাদেব কোলের মুদীখানার দোকানে বেচাকেনা করিবার জন্ম একজন লোকের দরকার। খবরটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ মহাদেবের কাছে যায়। মহাদেব লোকটা ভাল, এক কথায় তাহাকে রাখিতে রাজী হইয়াছে।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু রোজ দুবেলায় এতটা করে পথ হাঁটতে পারবে ত ?"

পায়ের আঙুলের ফাঁকে তেল ঘসিতে ঘসিতে হাসিয়া বৃন্দাবন বলিল, "কি যে বল বড়-বৌ ? গরলগাছা ?... এই-ই-ত, পা চালিয়ে গেলে ঘণ্টা খানেকও লাগে না।"

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "মাইনে কত ?"

"মাইনে আপাততঃ চার টাকা, তা ছাড়া রোজ একসের চাল, একপো ডাল, আধসের আলু, আর এক ছটাক তেল। এক রকম ভাল, রোজের রোজ আর ভাবতে হবে না।" এই বলিয়া বৃন্দাবন অনর্থক একটুখানি হাসিল।

পরদিন দুপুর বেলায় খাইতে বসিয়া নারায়ণীর চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। যে লোক জীবনে কখনও চাকরী করে নাই, আশৈশব অভ্যস্ত সংসারের নানাবিধ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে অহোরাত্র বসবাস করিয়াও যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সঞ্জীবিত আশা মনে মনে পোষণ করিত দিন রাত্রি, সেই লোক কি না আজ...শেষটা আর নারায়ণী কল্পনা করিতে পারিল না। তাহার দুইটি চোখের কোণ বহিয়া ভাতের থালার উপর টস্ টস্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দিন পাঁচ সাত কাটিয়া গিয়াছে।

সে-দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নারায়ণী ঘরে শুইতে গিয়া দেখিল, বিছানার উপর বসিয়া স্বামী তাহার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবন কাগজের উপর হইতে মুখ তুলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিত স্বরে বলিল, "দেখ বড়-বৌ, খবরের কাগজে গোপার নাম দিয়েছে।"

আকস্মিক আজ স্বামীর মুখে দেবরের নামটা শুনিয়া নারায়ণী একটুখানি বিস্মিত হইল, ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছে গা ?" বৃন্দাবন স্ত্রীকে খবরের কাগজের সেই অংশটি পড়িয়া শুনাইল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। আদালতের একটি মকর্দ্দমায় গোপীমোহন ছিল আসামী পক্ষের উকিল। হাকিমের বিচারে তাহার পক্ষই জয়লাভ করিয়াছে। খবরের কাগজের আইন-আদালতের স্তম্ভে উক্ত মামলাটির মোটামুটি একটা বিবরণ ও উভয় পক্ষের উকীলদের নাম দেওয়া হইয়াছে, যেমন সাধারণতঃ হইয়া থাকে।

কাগজখানা ভাঁজ করিয়া রাখিতে রাখিতে বৃন্দাবন বলিল, "কেমন বড়-বৌ বলিনি, গোপার পশার করতে দেরী হবে না ? এই দেখ না, এরই মধ্যে বড় বড় মামলায় জিততে আরম্ভ করেছে।"

কথার পিঠে ফস্ করিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা ঠাকুরপোকে একখানা চিঠি দিলে হয় না ?"

কথাটা শুনিবামাত্র বৃন্দাবন যেন আগুনের মত দপ

করিয়া জ্বলিয়া উঠিল বলিল, "চিঠি দেব আমি, কেন অপরাধটা কি আমার?"

একটা ঢোক গিলিয়া নারায়ণী বলিল, "না-না, অপরাধের কথা বলছি না, অনেক দিন হয়ে গেল, কোন খবরাখবর নেই ত?"

"না, তার খবরাখবরে আমাদের কোন দরকার নেই। গরীব বলে বড় ভাইকে যে এতবড় অপমান করতে পারে, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি ত জান বড়-বৌ কত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছি, তার ওপর আমাদের কত আশা, তার বিয়ে দেওয়া নিয়ে দুজনে আমরা কত জল্পনা-কল্পনা করেছি, আর সে কি না আজ—।" আবেগের আধিক্যহেতু বৃন্দাবনের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আশৈশব মাতৃ-পিতৃহারা এই ছোট ভাইটিকে সে যে কত ভালবাসে নারায়ণীর তাহা অবিদিত নয়, তাই ও সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া সে আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে বৃন্দাবন কাজে বাহির হইয়া গেলে, খেয়ালের মাথায় নারায়ণী এক কাজ করিয়া বসিল। পাশের বাড়ীর একটি নববিবাহিত বধূর নিকট হইতে একখানা খাম চাহিয়া আনিয়া রসিয়া বসিয়া দেবরকে একখানি চিঠি লিখিল। দু'তিনখানা কাগজ নষ্ট করিয়া অনেক কাটাকুটির পর শুধু এইটুকুখানি লিখিতে পারিল:

ঠাকুরপো,

আমাদের কি একেবারে ভুলে গেলে ভাই? তোমার কথা ভেবে ভেবে দাদার তোমার কি চেহারা হয়েছে একবার এসে দেখে যাও। বড় ভায়ের ওপর কি অভিমান করতে আছে ভাই? ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা তোমার বৌঠান।

নারায়ণী যৎসামান্য লেখা-পড়া জানিত। স্থানকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে কাহাকে কি লেখা উচিত তাহা বিবেচনা না করিয়াই, যাহা মনে আসিল দেবরকে তাহাই লিখিয়া দিল। তাহার পর পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়া গোপীমোহনের শ্বশুর-বাড়ীর ঠিকানায় চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া দিল।

দুপুর বেলায় খাইতে আসিয়া বৃন্দাবন কথায় কথায় নারায়ণীকে বলিল যে, কাল তাহাকে একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে। দোকানের জন্য অনেক টাকার মাল কিনিবার বরাত আছে। অপর কাহাকেও পাঠাইয়া তাহাদের বিশ্বাস নাই।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পারবে ত?"

ঈষৎ হাসিয়া বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বৃন্দাবন বলিল, "খুব পারব বড়-বৌ, এ হাড়ে এখনও ভেল্কি খেলে।"

পরদিন সকাল বেলায় খাওয়া দাওয়া করিয়া দশটা নয়টার ট্রেনে বৃন্দাবন কলিকাতা যাইবার জন্য বাহির হইল। কলিকাতা তাহাদের গ্রাম হইতে বেশী দূর নয়, ট্রেনে করিয়া গেলে এক ঘণ্টাও লাগে না।

যাইবার সময় নারায়ণী তাহাকে বার বার করিয়া বলিয়াছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যেন সে ফিরিয়া আসে, নচেৎ এই জল-ঝড়ের দিনে ষ্টেশন হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত এতটা পথ আসিতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে।

বৃন্দাবনের কিন্তু ফিরিতে রাত্রি ন'টা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে নারায়ণী তাহাকে হাওয়া করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী হল যে?"

সকৌতুক একটুখানি হাসিয়া বৃন্দাবন বলিল, "একটা বড় মজা হয়েছে।"

"কি মজা গো?"

পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বৃন্দাবন বলিল, "মালপত্তর কেনাকাটা করে গাড়ী বোঝাই দিয়ে দেখলুম, ট্রেনের তখনও অনেক দেরী, ভাবলুম যাই একবার রাস্তা থেকে ভায়ার আমার শ্বশুর-বাড়ীটা দেখে আসি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি থামিল। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

অল্প কাসিয়া বৃন্দাবন পুনরায় বলিতে সুরু করিল, "খুঁজে খুঁজে ঠিক গিয়ে হাজির হলুম। রাস্তার ধারেই দোতলা বাড়ী। রোয়াকে কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করছিল, একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "খোকা এ বাড়ীতে গোপীমোহন থাকে?" ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বললে যে হাঁ থাকে। ঠিক এই সময়ে এক বৃদ্ধ ভদ্দর লোক ঘর থেকে বেরিয়ে আমার মুখের দিকে একবার চেয়েই বললেন, 'আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, আপনি এসেছেন?'

উনিই হচ্ছেন গোপার শ্বশুর। আমাকে দেখেই কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছেন।”

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হল ?”

“না শুনলুম আজ সাত আট দিন হল সে কোন বন্ধুর সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গেছে, ফিরতে বোধ হয় এখনও দিন পনের দেরী হবে।”

নারায়ণী খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁগা ছোট-বৌকে দেখলে ?”

ঈষৎ হাসিয়া বৃন্দাবন বলিল, “দেখ জল-খাবার খাওয়ার সময় একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, জানলার ধারে আধ-ঘোমটা দেওয়া কে একটি মেয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা টেনে দিয়ে সুট্ করে সরে গেল। আমার মনে হয় সেই গোপার বৌ।”

“দেখতে শুনতে কেমন দেখলে ?”

“চোখের পলকে দেখা ত, কিন্তু তাতেই মনে হল অমন সুন্দরী বোধ হয় হাজারে একটি মেলে, গায়ের রঙটা যেন দুধে-আলতায় গোলা, আর মুখখানি যেন পটে আঁকা মা লক্ষীর মুখ, এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া হাসিতে হাসিতে বৃন্দাবন পুনরায় বলিল, “হাজার হলেও তারা আমাদের উকিল, ঠকবার ছেলে সে নয়।”

তাহার কথা শুনিয়া নারায়ণীও একটুখানি হাসিয়া ভাত বাড়িবার জন্য উঠিয়া গেল।

নারায়ণীর মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। তাহার চিঠিখানা নিশ্চয়ই দেবরের হাতে পড়ে নাই। চিঠি পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই সে বাড়ী-ছাড়া। মেয়েলী হাতের ঠিকানা লেখা দেখিয়া ছোট-বৌ নিশ্চয়ই চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়াছে তাহার পর কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া পথে ফেলিয়া দিয়াছে।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা।

সে-দিন ছিল বৃহস্পতিবার। প্রতি বৃহস্পতিবারে নারায়ণী গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য সারাদিন উপোস করিয়া থাকিয়া রাত্রে পাড়ার একজন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া লক্ষীর পূজা করায়। এ-যাবৎ স্বামীই তাহার পূজা করিত। আজকাল তাহার দোকান হইতে ফিরিতে অত্যন্ত দেরী হইয়া যায় বলিয়া বাধ্য হইয়া নারায়ণীকে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

সে-দিন রান্নাবান্নার কোন হাঙ্গামা ছিল না। সকাল বেলা পাট-ঝাঁট সারিয়া স্নান করিয়া নারায়ণী ঘরের রোয়াকে বসিয়া একা লক্ষীর ব্রতকথা পড়িতেছিল, এমন সময় ছইঢাকা গরুর গাড়ী আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটী সুবেশা তরুণীর সহিত দেবরকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া নারায়ণী তাড়াতাড়ি বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া একরকম ছুটিতে ছুটিতেই বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া স্মিতহাস্যে গোপীমোহন বলিল, “দেশে এলুম বৌঠান।”

নারায়ণী কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে গোপীমোহনের পিছন হইতে মেয়েটী আগাইয়া আসিয়া তাহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

নারায়ণীর দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে গোপীমোহন বলিল, “আমার বৌ।”

“তা আর আমায় বলে দিতে হবে না”—এই বলিয়া নারায়ণী ছোট জায়ের চিবুক ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, “জন্ম এয়োস্ত্রী হও।” তাহার পর দেবরের দিকে ফিরিয়া সস্নেহ অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, “না ভাই ঠাকুরপো, এ তোমার ভারী অন্যায়, কোথায় আগে থেকে খবর দেবে, বৌকে বরণ-কোরে ঘরে তুলব, তা—না। তুমি এস ভাই, এস।” এই বলিয়া নববধূর হাত ধরিয়া নারায়ণী তাহাকে বাড়ীর ভিতর টানিয়া লইয়া গেল।

উঠানে পা দিয়াই বধূ মাথার ঘোমটাটা মুখের উপর ঈষৎ টানিয়া দিয়া নিম্নকণ্ঠে নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বড়ঠাকুর কোথা দিদি ?”

হাসিতে হাসিতে নারায়ণী তাহার ঘোমটাটা খুলিয়া দিয়া বলিল, “উনি এখন বাড়ী নেই, আসবারও অনেক দেরী আছে।”

বধূকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নারায়ণী শাশুড়ীর আমলের পুরাতন, পদ্মকাটা আসনখানা পাতিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, তাহার পর সিন্দুক খুলিয়া সিন্দুর-চুবড়ী হইতে একটী রূপার সিন্দুর-কৌটা বাহির করিয়া বধূর সীমন্তে

একতার তরে

১লা জুলাই তারিখে বোম্বাই সহরে 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র আফিস উদ্বোধন কালে সুভাষচন্দ্রের উক্তি : একতালাভের জন্য রাজনীতি ও ধর্ম্মে বিভেদ প্রয়োজন।]

আঙুলে করিয়া সিন্দুর পরাইতে পরাইতে বলিল, "তোমার সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হউক, তুমি রাজরাণী হও।"

বধূ আর একবার তাহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

ঠিক এই সময়ে গোপীমোহন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বৌঠান আশীর্ব্বাদটা যে বড্ড একতরফা হ'চ্ছে।"

হাসিয়া নারায়ণী বলিল, "ওকে আশীর্ব্বাদ করার আগে তোমাকেই যে আশীর্ব্বাদ করলুম ভাই।"

"ওহো তাই বটে" এই বলিয়া গোপীমোহন হো হো করিয়া অনর্থক একচোট হাসিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বধূর দিকে ফিরিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি ভাই, ভুলে গেছি।"

সলজ্জ-কণ্ঠে বধূ বলিল, "শ্রীমতী মঞ্জুরাণী।"

দুপুর প্রায় গড়াইয়া আসিয়াছিল। খানিক আগে গোপীমোহন তাহার বৌঠানের নিকট হইতে তেল ও গামছা চাহিয়া লইয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে। এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে মেয়েরা আসিয়া ঘরের মধ্যে মঞ্জুকে লইয়া বসিয়া বসিয়া জটলা করিতেছে, এমন সময় ভাঙা ছাতাটা মাথায় দিয়া উড়ুনির খুঁটে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বৃন্দাবন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। নিজের ঘরে অতগুলি মেয়েকে একত্রে বসিয়া গুঞ্জন করিতে দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও-ঘরে অত লোক কেন গা বড় বৌ?"

ভাতের ফেন গালিতে গালিতে মুখ ফিরাইয়া নারায়ণী বলিল, "ঠাকুর-পো এসেছে যে।"

বিস্মিত কণ্ঠে বৃন্দাবন বলিল, "কে গোপা এসেছে, কৈ আগে কোন খবর দেয় নি ত?"

"ঘরের ছেলে ঘরে আসবে, তার আবার খবর দেবে কি?"

বৃন্দাবন যেন কতকটা থতমত খাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া পরে বলিল, "যাই দেখা করে আসি।" এই বলিয়া বৃন্দাবন ঘরের দিকে যাইতেছিল। বাধা দিয়া নারায়ণী বলিল, "ও-দিকে কোথা যাচ্ছ? ও-ঘরে ছোট-বৌ আছে।"

"কে? বৌমা, বৌমাও এসেছে না কি?"

ঠিক এই সময়ে ভিজা কাপড়ে মাথা মুছিতে মুছিতে গোপীমোহন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভাইকে দেখিয়াই বৃন্দাবন বলিল, "শুকনো একখানা কাপড় নিয়ে যেতে হয়, এই ভিজে কাপড়ে…নে আগে কাপড় ছাড়।"

কথাগুলি এমন ভাবে বলিল, যেন সে ভাইকে নিত্য দেখিয়া আসিতেছে।

গোপীমোহন কিন্তু কাপড় ছাড়িবার আগেই দাদার নিকটে আসিয়া তাহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল বৃন্দাবন আঙুলে পৈতা জড়াইয়া অস্ফুটস্বরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "কল্যাণ হউক।"

ঘরের রোয়াকে দুই ভায়ে খাইতে বসিয়াছিল। লজ্জায় গোপীমোহন এ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই। ভাতে ডাল ঢালিতে ঢালিতে বৃন্দাবন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কাজকর্ম্ম এখন কেমন চলছে?"

মুখ নীচু করিয়াই গোপীমোহন বলিল, "তেমন সুবিধে নয়, কেস-পত্তর এখন একরকম নেই বল্লেই চলে।"

ভাইকে উৎসাহ দিয়া বৃন্দাবন বলিল, "কেস-পত্তর কি আর একেবারেই হয়, দুদিন পরে দেখিস তখন, হাঁ বাবা, এ আর বেঞ্চিকোর্টে মোক্তারি করা নয়। একেবারে চার চারটে পাস করা কলকেতার উকিল।"

ঠিক এই সময়ে নারায়ণী তরকারী পরিবেশন করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবন বলিল, "জানলে বড় বৌ, উকিল থেকে লোকে হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হয়।"

গোপীমোহনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া হাসিয়া নারায়ণী বলিল, "ঠাকুরপোও একদিন জজ হবে, দেখে নিও।"

তাহাদের খাওয়া শেষ হইলে নারায়ণী জায়ের জন্য ভাত বাড়িয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। মাত্র একটি থালার ভাতবাড়া দেখিয়া মঞ্জু জিজ্ঞাসা করিল "আপনার ভাত বাড়লেন না দিদি?"

নারায়ণী বলিল "আজ বেস্পতিবার, আমার লক্ষ্মীর উপোস।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মঞ্জু বলিল, "আমিও উপোস করবো দিদি, শুধু দু'কাপ চা ছাড়া সকাল থেকে পর আমি

কিছু খাইনি। শুনেছি চা খেয়ে না কি উপোস করা চলে।"

তাহার বলার ভঙ্গিমায় নারায়ণী হাসিয়া ফেলিল, বলিল "আমাদের পাড়াগাঁয়ে তা চলে না ভাই, নাও তুমি খেতে বস।"

তবুও তাহাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নারায়ণী জায়ের আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর আলগা করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাড়া ভাতে অছেদ্দা করতে আছে দিদি? ভাত যে লক্ষ্মী।"

অগত্যা মঞ্জুকে খাইতে বসিতেই হইল। পাশে বসিয়া নারায়ণী তাহার পাতের ভাত ভাঙ্গিয়া ডাল মাখিতে মাখিতে বলিল, "আমাদের বংশের নিয়ম হচ্ছে নূতন বৌ এলে তাকে প্রথম দিন খাইয়ে দিতে হয়। আজ আমি তোমায় খাইয়ে দেব।"

আপত্তি করিয়া মঞ্জু বলিল, "না না দিদি, সে ভারি লজ্জা করে, তা ছাড়া আমি ত আর সদ্য বিয়ের কনে নই যে, খাইয়ে না দিলে কোন অনিষ্ট হবে।"

শান্ত সংযত কণ্ঠে নারায়ণী বলিল, "সদ্য বিয়ের কনে না হলেও তুমি আজ এ বাড়ীতে প্রথম এলে, আমাদের বাড়ীর যা নিয়ম তা পালন না করলে ইষ্ট হবে কি অনিষ্ট হবে তা জানি না ভাই, তবে এটা জানি যে, তাতে বড়দের অসম্মান করা হয়। অন্ততঃ এক গরাসও তোমায় আমার হাতে খেতেই হবে।" এই বলিয়া নারায়ণী ডাল-মাখা এক গ্রাস ভাত তাহার মুখে তুলিয়া দিল।

খাইতে খাইতে মঞ্জু বলিল, "আমার ভারি ইচ্ছে করে দিদি আপনাদের মত উপোস করতে, ছেলে বেলায় একবার শিবরাত্রের উপোস করে ছিলুম, বিকেল বেলায় শিব গড়তে গড়তে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাই, সেই থেকে মা আমায় কক্ষণো আর উপোস করতে দিত না।"

নারায়ণী সকড়ী হাতেই তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানা ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া বলিল, "মঞ্জু তুমি খুব ভাগ্যবতী, শিবপূজা না কোরেই অমন শিবতুল্য স্বামী পেয়েছ।"

আনাড়ীর মত একটুখানি হাসিয়া মঞ্জু লজ্জায় মুখখানা নীচু করিল।

বৈকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া গোপীমোহন অনেকক্ষণ অবধি দাদাকে দেখিতে না পাইয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠান দাদা কোথায়?"

নারায়ণী তখন লক্ষ্মী-পূজার উদ্যোগ করিতে ছিল, দূর্বাগুলি এক একগাছি করিয়া গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "উনি এই মাত্তর দোকানে গেলেন।"

দোকান যাওয়ার অর্থে গোপীমোহন বুঝিল বৃন্দাবন হয়ত নিকটবর্ত্তী কোন দোকানে সওদা করিতে গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে তাই সে দাদার সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় নারায়ণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর-পো আজ ভাই পূজোটী তোমায় করে দিতে হবে। ঘরের বামুন থাকতে আজ আর বাইরের কাউকে বলব না।"

গোপীমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কি এখন আর পূজো করেন না।"

"কি করে করবেন ভাই, পরের চাকরী, তাঁর বাড়ী ফিরতেই রাত দশটা এগারটা বাজে।"

বিস্মিত কণ্ঠে গোপীমোহন বলিল, "চাকরী? দাদা চাকরী করেন না কি?"

"ও মা, তুমি বুঝি জান না ঠাকুরপো?" এই বলিয়া নারায়ণী তাহাকে গরলগাছার মহাদেব কোলের দোকানে বৃন্দাবনের চাকরী করার কথা বলিল।

গোপীমোহন বরাবর দেখিয়াছে তাহাদের আড়াই বিঘার জমিতে যা ধান হয় তাহাতেই কোন রকম করিয়া তাহাদের সংসার চলিয়া যায়। তাই একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "জমিতে এবার ধান হয়নি?"

ফুলগুলি রেকাবীর উপর সাজাইতে সাজাইতে নারায়ণী বলিল, "যা ধান খড় পাওয়া গিয়েছিল সব বিক্রী কোরে জমিদারের বাকী খাজনা মিটাতে হয়েছে।"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গোপীমোহন অন্যমনস্কের মত খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল, তাহার পর পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া ধীরে ধীরে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দোকানে বসিয়া বৃন্দাবন খরিদ্দারের চাল ডাল ওজন করিতেছিল, এমন সময় গোপীমোহন সহসা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে এমন সময় এত দূরে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া বৃন্দাবন

অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হাতের দাঁড়ী-পাল্লাটা চাল ডালের গামলার উপর নামাইয়া রাখিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে গোপা ?"

গোপীমোহন বলিল, "তোমায় এক্ষুণি বাড়ী যেতে হবে।"

"কেন কি হয়েছে ?"

"হয়নি কিছু, এস বলছি।"

বৃন্দাবন নামিয়া আসিল এবং মহাদেবকে বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথে আসিতে আসিতে বৃন্দাবন পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বল না, কোন বিপদ আপদ হয়নি ত ?"

চলিতে চলিতে গোপীমোহন উত্তর দিল "না।"

"তবে হঠাৎ যে দোকানে এসে হাজির হলি ?"

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে গোপীমোহন বলিল "তোমার আর চাকরী করা চলবে না।"

ভায়ের কথা শুনিয়া বৃন্দাবন অন্ধকারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এই কথাটা বলতে এই অন্ধকারে একটা পথ হেঁটে এসেছিস—বোকা ছেলে ?"

গোপীমোহন কোন কথা বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাদার পাশে পাশে পথ চলিতে লাগিল।

বৃন্দাবন তাহার পিঠের উপর সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "তুই একটু গুছিয়ে নিলে তখন কি আর চাকরী করব ? দেখবি তখন ঐ মহাদেব কোলেই আসবে আমার কাছে খোসামোদ করতে, যেন ওর দোকান থেকে জিনিষ পত্তর সওদা করি।"

মুখ নীচু করিয়া গোপীমোহন বলিল, "গুছিয়ে আমি নেবখন যেমন কোরে হোক, তোমার আর চাকরী করা চলবে না কিছুতেই।"

সেদিন রাত্রে গৃহস্থের খাওয়া চুকিতে রাত্রি এগারটা হইয়া গেল। শুইতে গিয়া নারায়ণী দেখিল, বিছানার উপর বসিয়া বৃন্দাবন তখনও পর্য্যন্ত তামাক টানিতেছে। এত রাত পর্য্যন্ত তাহাকে অনর্থক জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "শোও নি যে বড় ?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া বৃন্দাবন বলিল, "গোপা কি বলে জান ?"

"কি ?"

"বলে যে আমার আর চাকরী করা চলবে না।"

হাসিতে হাসিতে নারায়ণী বলিল, "বেশ ত, দুমাস কাজ করতে না করতেই পেনশেন।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "বৌমা কতদিন থাকবে কিছু শুনলে ?"

"ছোট-বৌ এখন এইখানেই থাকবে। সন্ধে বেলায় কুটনো কুটতে কুটতে সে বলছিল নিজেদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে বারমাস বাপের বাড়ী পড়ে থাকতে তার না কি আর ভাল লাগে না।"

প্রসন্ন হাসিয়া বৃন্দাবন বলিল, "হাজার হলেও লেখাপড়া জানা মেয়ে ত, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে।"

নারায়ণী তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ঠাকুর-পোর মুখে শুনলুম বাপের সঙ্গে ছোট-বৌএর না কি মনান্তর হয়েছে।"

গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া সবিস্ময়ে বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"ছোট-বৌএর বাপের না কি মত ছিল না, তাকে এখানে পাঠাবার; পাড়াগাঁ, ম্যালেরিয়ার দেশ, অসুখ-বিসুখ আছে এই সব কারণে। তা ছোট বৌ বলে, "পাড়াগাঁ বলে কি আর শ্বশুর-ঘর করবে না ?"

বৃন্দাবন চুপ করিয়া বসিয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিল।

গোপীমোহন মেসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিল। পরদিন সকাল বেলায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে কলিকাতা যাত্রা করিল। যাইবার সময় বৃন্দাবনের হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিয়া বলিল, "দশটাকা এখন রাখ, আবার আসছে শনিবার আমি আসছি।"

অনেক দিন বৃন্দাবন দশটাকা এককালীন খরচ করিবার স্বাধীনতা পায় নাই। নোটখানা হাতে করিয়া সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, "এত কি হবে, তার চেয়ে বরং তুই এই থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে যা, তোরও ত খরচ-পত্তর আছে।"

গোপীমোহন জানাইল যে তাহার কাছে আপাততঃ যাহা আছে তাহাতেই তাহার এক রকম চলিয়া যাইবে।

বৃন্দাবন ভাইকে রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিল। মোড়ের মাথায় গিয়া বিদায় দিবার সময় বলিল, "শুনেছি ত হোটেল মেসে না কি ভাল খাওয়া হয় না, দুপুর বেলা ভাল কোরে জলটল খাস, বুঝলি ?"

গোপীমোহন নতশিরে দাদার পদধূলি লইয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সে চলিয়া গেলে বৃন্দাবন যতদূর দেখা যায় তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বাড়ী ফিরিবার পথে গ্রামের দেবতা কালীমায়ের তলায় আসিয়া দুহাত জোড় করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে মনে মনে বলিল, "হে ঠাকুর ওকে তুমি নিরোগা রেখো, ওর সব ব্যাধি-অমঙ্গল আমায় দাও, আমি তোমায় ষোল আনা পূজো দেব।"

কথা কয়টি বলিতে গিয়া বৃন্দাবন বার বার কোঁচার খুঁটে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

নারী কি অবলা ?

—শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়

প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ ধারণা আছে মনে হয় যে, নারী "অবলা"। অনেক স্থলে এইরূপ ধারণাবশে অনেক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, বার বার এই কথা শুনিয়া সাধারণে এই কথা সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে। সাধারণের ধারণা পুরুষ নারীকে রক্ষা করিতে চায়, নারীও রক্ষাধীনে থাকিতে চাহেন, কিন্তু এই মনোভাব ক্ষিপ্রগতিতে লোপ পাইতেছে, এমন কি এদেশেও। মনে হয়, যেন এই জাতীয় অপবাদ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াই নারী আজ পুরুষের সহিত সর্ব্বপ্রকার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন। প্রগতিবাদিনী নারী, নরনারীর সাম্য চাহেন, সুতরাং তাঁহার চক্ষে "অবলা" কথাটী আত্মসম্মানহানিকর, বোধ হয় ইহারই কারণে আজ নারী খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক সময় পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। সুতরাং "অবলা" শব্দের মধ্যে "বল" কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি তাহা জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ "বল" অর্থে নিছক গায়ের জোরই বুঝায়, এই অর্থেই সম্ভবতঃ নারীকে "অবলা" বলা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এই অর্থ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। এই অর্থ করা হয় শুধু পুরুষের বৃথা আত্মগর্ব্ব বজায় রাখিবার জন্য এবং নারীর উপর প্রাধান্য করিবার জন্য—অন্য কোন উদ্দেশ্য ইহাতে সিদ্ধ হয় কি না সন্দেহ। কারণ, শুধু বাহু-বলেও অনেক নারী অনেক পুরুষকে পরাস্ত করিতে চিরকাল পারেন, সম্প্রতি যে সব প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই কথা বেশ সহজে বুঝা যায়, পঞ্চনদীর দেশে কুস্তিতেও নারী পুরুষকে পরাজিত করিয়াছেন।

পুরুষের মত বল ও শরীরবিশিষ্টা Amazon জগতে কম বেশী চিরকালই ছিল এবং আছে। পুরাকালে এশিয়ামাইনর প্রদেশে পুরুষের মত দীর্ঘাঙ্গী ও বলশালী Amazon সম্প্রদায়ের বাস ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। তথায় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু নারীই বাস করিত, পুরুষকে তথায় থাকিতে দেওয়া হইত না। সে দেশের রাজকার্য্য হইতে মোটবহন কার্য্য পর্য্যন্ত, নারীরাই সম্পাদন করিত, কেবল মাত্র সন্তানলাভের জন্য ভিন্নদেশের বাছাই করা পুরুষের সাহায্য আবশ্যক হইত। ইহাই এককথায় আমেজন জাতির আদিম ইতিহাস। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আজিও আছে, যাহাদের মধ্যে সম্পত্তি পিতা হইতে পুত্রে না বর্ত্তাইয়া, মাতা হইতে কন্যাতে বর্ত্তায়—যেমন এদেশে রেড্ডি ও নায়ার জাতি। পুরুষ যেমন বহু-বিবাহ করে, অনেক জাতির মধ্যে নারীও তাহা করে। কোথাও কোথাও যে-স্ত্রীর যত অধিক স্বামী থাকে, তাহার মর্য্যাদাও তত অধিক হইয়া থাকে। এরূপ বিস্তর জাতি আছে, যাহাদের মধ্যে নারীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, পুরুষের কোন বিষয়েই প্রাধান্য মানা হয় না, জাভায় বালীরাজ্যে এইরূপ ব্যবস্থা ; আবার আজিকার সভ্যসমাজেও এই ব্যবস্থা সচল। বাস্তবিক কোনদেশে কোনকালেই পুরুষের সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল না, আজিও নাই, এই ছোট কথাটী আজ মনে হয় যেন অনেকে মানিতে চাহেন না। মহাবীর রাজা চন্দ্রগুপ্ত আপনার শরীর-রক্ষীরূপে পুরুষ নিযুক্ত না করিয়া, কতিপয় দীর্ঘাঙ্গী বলিষ্ঠা গ্রীক্ রমণী নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। গত মহাযুদ্ধে রুশিয়াদেশে রমণী-যোদ্ধাদের দল ছিল, ইঁহাদের "মরণ-বাহিনী" অথবা Death Battalion নামকরণ হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা না কি মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। ১৯১৭ সালে সে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়েও রমণীরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চীন ও জাপানদেশে নারী-সৈনিক আজিও আছে। বলিষ্ঠা নারীর অভাব কোথাও নাই, তদুপরি নারীই পুরুষাপেক্ষা অধিক কর্ম্মপটু, অল্প পরিশ্রম তাঁহারা পুরুষের অপেক্ষা অধিক করিতে পারেন, সন্তান-ধারণাদি ব্যাপারে এই শক্তি সামান্য মাত্রই ব্যয়িত হয়; ইত্যাদি। Boadicea. Jeanne d'Arc বা রাণী দুর্গাবতীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সুতরাং বাহুবলেও নারী অবলা নহেন।

সকলেই না হউক, অনেকে মানিবেন যে, মনের বল বাহুবলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ক্ষীণ শরীরেও মনের বল থাকিলে অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়, কিন্তু মন দুর্ব্বল হইলে কুস্তিগীরও অকর্ম্মণ্য হয়। যদিও নারীর স্নায়ুমণ্ডলী (nervous system) পুরুষের অপেক্ষা অধিক অনুভূতিসম্পন্ন, গভীরতর এবং কোমলতর (delicate, sensitive), সুতরাং শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট নারী পুরুষাপেক্ষা অধিক তীব্রভাবে অনুভব করেন, তথাপি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, অস্ত্রোপচার-ঘটিত রোগে নারীর আরোগ্যপ্রবণতা, ধৈর্য্য ও সাহস এবং অস্ত্রোপচার করিবার মত না হইলে অন্য রোগেও নারীর আরোগ্যপ্রবণতা পুরুষের অপেক্ষা অধিক। জীবনমধ্যে নারীর আত্মত্যাগ, সেবা, দরদ, আত্মবিলোপসাধন, পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক। নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘরে ঘরে তাঁহারা সন্তান বা প্রিয়জনের জন্য বা আতুর জনের জন্য যেরূপে অর্থ, স্বার্থ, সুখ-সুবিধা অবহেলে ত্যাগ করিতে পারেন, অধিকাংশ পুরুষেই তাহা পারে না। ধাত্রী পান্না বা Florence Nightingale, মহারাণী স্বর্ণময়ী মহারাণী ভবানী হওয়া নারীর পক্ষে অধিক সম্ভব। Delphic Oracle-এর পবিত্র ত্রিপাদে নারীই অধিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন, দেবতার ভর নারীর উপরেই অধিক ক্ষেত্রে হয়, এদেশেও তাহাই দেখা যায়, মীরা বাঈয়ের কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। Alexandria

নগরে একদা এক ভগবানের জন্য উন্মাদ নারীই, দুই হস্তে সম্মার্জ্জনী ও জলপূর্ণ কলসী লইয়া, উর্দ্ধবাহু হইয়া নাগরিকদের সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, "এই কলসের জলে নরকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিব, এই সম্মার্জ্জনীদ্বারা পৃথিবী হইতে পাপ বিদূরিত করিব।" ধর্ম্ম, লোকাচার, সংস্কার, তাঁহারাই অধিক মানিয়া থাকেন। এ-সমস্তই অল্পবিস্তর স্বার্থ-ত্যাগমূলক। রাজপুত ইতিহাসে জহরব্রত একটী অক্ষয়কীর্ত্তি, চীনা রমণীরাও এইভাবে বক্সার বিদ্রোহের সময় এবং উপস্থিত জাপানের সহিত যুদ্ধেও, প্রাণ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। আজিকার বিচারে এই আত্মোৎসর্গের মূল্য যতটুকু হউক, যাঁহারা প্রাণ অকাতরে দিতে পারেন, তাঁহাদের বিচার করিবার যোগ্যতা কয়জনের আছে? এই সমস্ত দৃষ্টান্ত (আরও বিস্তর দৃষ্টান্ত সহজেই দেওয়া যায়) পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করে যে, নারীর মনের বল পুরুষের অপেক্ষা অধিক, অসাধারণ। কত বড় অসাধারণ তাহা আজ কাল নারী-স্বাধীনতার যুগে কোন পুরুষের বোধ হয় জানিতে বাকি নাই।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর শক্তি অধিক, সেই সব ক্ষেত্রে তাঁহাদের শক্তি কত যে অধিক তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভালবাসার ক্ষেত্রে। তাঁহাদের ভালবাসা কত গভীর, স্থায়ী, ব্যাপক, জীবনব্যাপী ও সার্ব্বভৌমিক, তাহা সাধারণতঃ পুরুষে ধারণাই অনেক সময় করিতে পারে না। আবার শিক্ষা ব্যাপারেও ওহিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপর্য্যুপরি ৪০ বার পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রীরা ছাত্রদের পরাজিত করিয়াছে (Eugenics Review, 1935)। একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহাই সম্ভব। নারীরা অনেক কিছুই intuition দ্বারা বুঝিতে চাহেন, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ইহাতে ভুল যে হয় না, তাহা নহে, কিন্তু ভুল সংশোধনও সহজে হয়। সংসারে আজিও পুরুষে অধিক অর্থোপার্জ্জন করে, সভ্যাতিসভ্য দেশেও তাই, কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় হয় নারীরই সুবুদ্ধি, সদিচ্ছা, অন্ততঃ খেয়াল, সখ বা বিলাসিতার জন্য। ঘর-সংসারে নারীই চিরকাল অবিসংবাদী গৃহিণী ছিলেন এবং আছেন, আজিও ঘর-সংসারই অত্যধিক ক্ষেত্রে মানবজাতির কর্ম্মের কেন্দ্র বা ভিত্তিস্বরূপ। সন্তানের জন্য দায়িত্ব, সন্তানকে সুসন্তান করিয়া গঠন করিবার ক্ষমতা, পিতা অপেক্ষা মাতার অনেক বেশী। অধিক কথা কি—জারজ সন্তান পর্য্যন্ত নিজ মাতাকে অসতী ভাবিতে মরমে মরিয়া যায়। সুতরাং বুঝা যায় যে, জীবনের যাবতীয় প্রধান বিষয়েই নারীর প্রাধান্য আছে।

কিন্তু এই প্রাধান্য আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। নর ও নারীর জন্মরহস্যই এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে সমর্থ। আজ অনেকেই জানেন যে, পিতার বীর্য্যাণু এবং মাতার ডিম্বাণু মাতৃগর্ভে পরস্পর মিলিত হইয়া একটী কোষ সৃষ্ট হয়, ইহাই বর্দ্ধিত হইয়া নর বা নারীরূপে জন্মায়। এই বীর্য্যাণু ও ডিম্বাণু মধ্যে, সন্তানের শরীর ও মন-গঠনকারী বীজস্বরূপ ক্রোমোসোম ও জিনি থাকে। পিতা-মাতা উভয়েই, ২৪টী করিয়া সমানসংখ্যক বীজ সন্তানকে দিতে পারেন। কিন্তু সন্তানের শরীর ও মন গঠনকারী পিতার বীর্য্যাণুর মধ্যে, অর্দ্ধেক থাকে ২৪ এবং অর্দ্ধেক থাকে ২৩টী ক্রোমোসোম-বাহী। (অথবা একটী ক্রোমোসোম শুষ্ক থাকে) গর্ভে সঞ্চারিত হইবার মুহূর্ত্তে, যদি পিতৃদত্ত কম বা শুষ্ক ক্রোমোসোম যে বীর্য্যাণুতে থাকে, তাহা মাতৃডিম্বাণুর পূর্ণসংখ্যার সহিত মিলিত হয় তবে পুত্রসন্তান জন্মে আর যদি মাতার ২৪টি ক্রোমোসোমবাহী ডিম্বাণুর সহিত, পিতারও পুরাপুরি ২৪টী ক্রোমোসোমবাহী বীর্য্যাণুর মিলন হয়, তবে তাহার ফলে কন্যা জন্মে। ইহার অর্থ তাঁহারা বলেন,—জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তান অপেক্ষা, সন্তানের শরীর ও মন-গঠনকারী একটী বীজ কম বা শুষ্ক পাইয়া থাকে, অর্থাৎ সে কন্যা-সন্তান অপেক্ষা অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট হয়। কোন ব্যবস্থা দ্বারা পুরুষের এই নিকৃষ্টতা কাটাইবার উপায় করা সম্ভব হয় না।

এখন দেখা যাউক, এই নিকৃষ্টতার ফল কতদূর সাংঘাতিক হয়। এ যাবৎ তাহার কতকগুলি ফল দেখান হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই নিকৃষ্টতার ফলে, নর ও নারীর শরীরের উপাদানস্বরূপ প্রত্যেক কোষ বিভিন্ন হয়, অর্থাৎ নরের শরীরের প্রত্যেকটী কোষের ধাতু বা প্রকৃতি এবং নারীর শরীরের প্রত্যেকটী কোষের ধাতু বা প্রকৃতি, বিভিন্ন হয়; ইহার ফলে নরের স্নায়ুতন্ত্রী (nervous system) নারীর স্নায়ুতন্ত্রী হইতে বিভিন্ন হয়; তাহার অস্থি, রক্তমধ্যে রঞ্জিত করিবার পদার্থ, লোহিত-কণিকার সংখ্যাও বিভিন্ন হয়; গড়পড়তা নারীই অধিক মেধাবিশিষ্টা হন, কারণ, মেদ স্নায়ুসমূহকে পুষ্ট ও সংরক্ষিত করিতে সমর্থ এবং স্নায়ুই আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেকটী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জীবনভোর নিয়ন্ত্রিত, চালিত ও প্রভাবিত করে, কর্ম্ম বা জনন-শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি করে। এই সমস্ত কারণেই নর ও নারীর মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনতিক্রমণীয় পার্থক্য থাকে, যদিও গড়পড়তা উভয়ের মধ্যে সাম্য বিদ্যমান (Alexis Carrel)।

আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে গায়ের জোরে, খেলা-ধূলায় (athletics), কসরৎ-ব্যায়ামাদিতে প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষ আজিও প্রাধান্য লাভ করে। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, নারীর অস্থি ও মাংসপেশীর প্রাকৃতিক সন্নিবেশ ও গঠন বিভিন্ন প্রকারের, প্রকৃতির বিধানে নারীর শরীর, তাহাকে মাতা হইতে হইবে বলিয়াই গঠিত, মনও তাই। মূলতঃ এবং প্রধানতঃ নারী মাতা ভিন্ন অন্য কিছু হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই (Prof. Max Gruber)। তথাপি "বল" কথাটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। "বালানাং রোদনং বলং" অনেকের ক্ষেত্রে ইহাই ব্রহ্মাস্ত্রবিশেষ। শুধু গায়ের জোরও যেমন আছে, তেমনি বিদ্যা, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, কর্ম্মপটুতা, কর্ম্মক্ষমতা, ক্ষিপ্রকারিতা, ধূর্ত্ততা,

চতুরালি, হাবভাব, রিপুর মোহ, দুর্দ্ধর্ষ বেগ, জিদ, বাক্যবাণ, যশঃ মান্য, অর্থ, প্রতিপত্তি, লোকবল, প্রভুত্ব, এবং বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের অমিত শক্তি যথেষ্ট আছে। আবার অভ্যাস, নিয়মানুবর্ত্তিতা, আইন, শৃঙ্খলা, লোকাচার, সংস্কার, সংস্কৃতি, বংশগতধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ধর্ম্ম, নীতি, বল ইত্যাদি অসংখ্য ধারায় অসংখ্য প্রকারে বলের বিকাশ দেখা যায়, এ-সমস্ত বলই, জগৎব্রহ্মাণ্ড-শক্তিরই বিকাশ। সুতরাং শুধু বাহুবলই "বল" নহে।

কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনে, যদি একান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না থাকে, তবে বলের তারতম্য লক্ষিত হয় এবং বল কার্য্যকরী হয় ত্রিধারায়—রোগ প্রতিহত করিবার ক্ষমতা, রোগ মুক্ত হইবার ক্ষমতা এবং জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যের অনুপাতে। ব্যক্তিগত জীবনে এই তিনটার প্রভাব অমোঘ। কারণ যদিও দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই প্রায় দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার আছে, "বলং বলং বাহুবলম্" "হেরো আপনি সর্ব্বত্রই কার্য্যকরী হয়," তথাপি ব্যক্তিগতভাবে যদি রোগ প্রতিহত করিবার এবং রোগমুক্ত হইবার ক্ষমতা এবং জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য না থাকে, তবে বাহুবলও থাকে না, কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ হয় না, জীবনই মরণাপেক্ষা ভীষণ হয়। এই তিনটী ক্ষেত্রেই নারী নরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান বলিতেছে যে, কেহ বা যে কিছু অধিক জীবনীশক্তিসম্পন্ন, সেই-ই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবে, অন্যথা তাহার অকালমৃত্যু অবধারিত। পুরাকালের অতিকায় Mastodon, Brontosaurus, Megatherium, Titanosaurus প্রভৃতি জীবসমূহ জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য না থাকায়, জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু পিপীলিকা, আরসুলা অথবা পরজীবি (Parasite)-গণ, মানুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে হইতে আজিও সদর্পে জীবন কাটাইতেছে, কারণ, তাহাদের জীবনীশক্তি প্রচুর, অনেক অসাধারণ অভাবনীয় কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহারা স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং বুঝা কঠিন নহে যে, প্রাগুক্ত তিনটী ধারাকেও "বল" অথবা "বলের সহায়ক" বলা অসঙ্গত হয় না। জীববিজ্ঞানসম্মত কথাই বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অস্ত্রোপচার করিবার মত এবং অন্য অনেক রোগে, নারী নরাপেক্ষা অধিকক্ষেত্রে রোগমুক্ত হইতে পারেন। পরীক্ষাতেও দেখা গিয়াছে যে, গড়পড়তা ছোটখাট রোগ যদিও নারীদের অধিক হয়, মারাত্মক রোগ হয় পুরুষেরই বেশী। অধিকক্ষেত্রে নারীদের অপেক্ষা পুরুষের পরিপাক-শক্তির, চক্ষু ও কর্ণরোগ অধিক হয়, তাঁহাদের (নারীদের) ক্ষুধা পরিপাকশক্তি এবং আহারের পরিমাণ অধিক (Ellis)। পাকস্থলীতে ক্ষত, ওষ্ঠের কর্কটরোগ, অন্ত্রনালী বা যকৃতের রোগ পুরুষের অধিক হয়। একমাত্র পিত্তথলিতে কর্কটরোগ বা তাহার স্ফীতি, তরুণ অপেক্ষা তরুণীদের অধিক হইতে দেখা যায়। শ্বাসনালীর কর্কটরোগ, নিউমোনিয়া, হাঁপানি ইত্যাদি পুরুষের অধিক হয়। পায়ের শীতলী, বার্দ্ধক্যজনিত গায়ের বা হৃদযন্ত্রের রক্তবহা নাড়ীর কাঠিন্য, পুরুষের অধিক হইয়া থাকে। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু পুরুষেরই অধিক হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিক সংখ্যায় মৃত হয়। অধিকাংশ সম্প্রদায় মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, বিধবার সংখ্যা বিপত্নীকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, যে সব সম্প্রদায় মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে তথায়ও এই কথা খাটে। ফলে বলা যায় যে, কোন একটি দশ বৎসর বয়সের বালক এবং দশ বৎসর বয়সের একটি বালিকা মধ্যে, বালিকার আয়ুষ্কাল শেষ পর্য্যন্ত তিন হইতে পাঁচ বৎসর অধিক হইবার সম্ভাবনা (Hyojein)। এ সমস্তই গড়পড়তা হিসাবের কথা, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বা বিশিষ্ট স্থানে, কালে, বা সমাজে অন্যরূপ ঘটা বিচিত্র নহে।

আধুনিক কালেও কতকগুলি দেশে, মানুষের আয়ুষ্কাল গত ১৫০ বৎসর মধ্যে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ দেখা যায়, যেখানে আয়ু পূর্ব্বে ৩০ বৎসর ছিল, এখন আয়ু সেখানে ৬২-৬৩ বৎসর দাঁড়াইয়াছে; যদিও পরমায়ুর শেষ বয়স এখনও বৃদ্ধি পায় নাই। উক্ত দেশসমূহে দেখা যায় যে, ৫০-১৫ বৎসর বয়সের পরে যত পুরুষ বাঁচে, নারী তাহাদের অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বাঁচেন। ৭৫ বৎসর বয়সে এই ধারা আরও বিশেষ ভাবে সুস্পষ্ট হয়, এবং ১০০ বৎসর বয়সে জীবিত নারীর সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ হয়। বর্ত্তমান ভারতেও গড়পড়তা আয়ু পুরুষের ২৩।২৫, নারীর ২৬।২৭ বৎসর। এই সমস্ত কথাই ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায় বা স্থান বিশেষে না খাটিতে পারে, কিন্তু স্থানে স্থানে খাটে।

বাস্তবিক দৈনন্দিন জীবনেও অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, নারীর জীবনীশক্তি পুরুষের অপেক্ষা অধিক, তাঁহার কর্ম্মশক্তিও অধিক, অনুসন্ধিৎসা, উৎসাহ অধিক, তিনিই প্রকৃত ভাবে "অপরাজেয় কথা-শিল্পী," স্মৃতিশক্তি, (বিশেষতঃ ছোট ছোট বিষয়ে) তাঁহার অসাধারণ আশ্চর্য্য। জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য ব্যতীত ইহার কোনটীই জাতিগত ভাবে সম্ভব হইতে পারে না। পুরুষ হইয়া জন্মাইলেই জন্মগত নিকৃষ্টতার ক্ষতি বহন করিতেই হয়। এক জন মনীষী এ কথাও বলিয়াছেন যে, দীর্ঘজীবী হইবার একমাত্র নিশ্চিত উপায় নারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করা। ব্যতিক্রম থাকিলেও, এই কথার মূলে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। পুরুষ নারী অপেক্ষা "ঠুনকো"। তবে এ কথাও মানা আবশ্যক যে, নারীরও কতকগুলি রোগ আছে, যাহা পুরুষের নাই বা কমই আছে, যেমন স্ত্রীরোগসমূহ, গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত রোগ, স্নায়ুরোগ ইত্যাদি। ইহার মধ্যে স্নায়ুরোগ নারীদের মধ্যে ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ সভ্যতার মধ্যে গতিবেগবৃদ্ধি, সকল ব্যাপারে হুড়াহুড়ি, তাড়াতাড়ি, অতিরিক্ত শব্দ ও কোলাহল বৃদ্ধি, পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরে নগরে লোকের বাস, নারীদের পুরুষের মত সর্ব্ববিষয়ে প্রতিযোগিতাবৃদ্ধি, নূতন ধারায় নৃত্যগীত, শিক্ষা-দীক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। Adler এবং Jungএর মতে জগতে স্ব-ইচ্ছ স্ব-প্রকৃতিস্থ লোক নাই; Dr H Beardএর মতে সভ্যজগতে অধিকাংশ লোকই স্নায়ুরোগী। ইহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ সর্ব্বত্র আত্মহত্যা বৃদ্ধি, নারীদের মধ্যেও (বিশেষ করিয়া এদেশে) এই ভাব দেখা যায়। আমেরিকাতে স্নায়ুবিকারঘটিত রোগ দিন-দিন অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। সেথায় তরুণ-তরুণীরা অধিকতর সংখ্যায় আত্মঘাতী হইতেছে, কারণ, লোকাচার, সংস্কার,

নৈতিক ধারা এত দ্রুত পরিবর্ত্তন করা হইতেছে যে, তাহার সহিত সমান তালে চলা, অগণিত সুখসুবিধাজনক ব্যবস্থা সত্ত্বেও, অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, অথচ আমেরিকাই "নারীর স্বর্গ।"

অনেকের ধারণা এই যে, পুরুষকে নারী অপেক্ষা অধিক জীবন-সংগ্রাম করিতে হয়, বাহিরের যত কিছু ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়া পুরুষের জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয়, পুরুষ শরীরের উপর বেশী অত্যাচার করে; পক্ষান্তরে নারী গৃহের আওতায় জীবন কাটান, বাহিরের দায়িত্ব, ঝঞ্ঝাট বিশেষ ভাবে তাঁহাদের পোহাইতে হয় না, মারাত্মক প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রাণপাত করিতে হয় না, এই সব কারণেই তাঁহারা পুরুষাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হন। কিন্তু এ সব কথা অনেক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর সত্য হইলেও, উত্তরোত্তর এই সব ভাব কম হইতেছে, এবং বাস্তবিক নারীর দীর্ঘজীবী হইবার অন্য কারণ আছে, তাহা দেখা যাইতেছে। নারীদেরও গৃহ-সংসারে পুরুষাপেক্ষা অধিক কর্ম্ম করিতে হয়, সন্তানধারণ ও পালনে তাঁহাদের দায়িত্ব, উদ্বেগ এবং পরিশ্রম পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক। বাস্তবিক কথা এই যে, তাঁহারা পুরুষাপেক্ষা অধিক জীবনীশক্তিবিশিষ্টা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই প্রকৃতির বিধান। গর্ভসঞ্চার হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নারী পুরুষাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। শিশুমৃত্যু মধ্যে দেখা যায় যে, সংখ্যায় নর-শিশু অধিক মৃত হয়। স্বাধীনতা, বিজ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও ধন-সম্পত্তির লীলাভূমি আমেরিকাতেও হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, যদি ১০০টি নারী-শিশু মৃত হয়, তবে তদনুপাতে ১২৯টি নর-শিশু মরে। ইহাদের কেহই তো বয়স্ক লোকের মত জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত নহে, তথাপি এই রূপ হয়। কারণ, মাতৃগর্ভমধ্যেই যতগুলি সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে অনুপাত থাকে হয় ত ১১০টি নর এবং ১০০টি নারী। এই সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও, পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, গর্ভ সঞ্চার হইতে জন্ম পর্য্যন্ত নয় মাস মধ্যে, প্রত্যেক মাসেই নর-শিশু নারী-শিশুর অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় মৃত হয়। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, জন্ম সময়ে ১০০টি নারী-শিশুর অনুপাতে ১০৬-১০৮টি নর-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সারা জীবন ভোর, বিশেষ করিয়া শিশু ও বাল্যকালে, নর-শিশু নারী-শিশু অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় মৃত হয়। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই কথা সত্য না হইলেও গড়পড়তা হিসাবে ইহাই বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রকাশ।

আবার দেখা যায় যে, যত অস্বাভাবিক, বিকলাঙ্গ, রোগদুষ্ট সন্তান জন্মে, তাহাদের অধিকাংশই পুরুষ। রাতকাণা, বর্ণজ্ঞানহীন, হাবাকালা, কুষ্ঠপদ, hare-lip, cleft palate, খাটো, হাতে পায় পাঁচটির বেশী আঙুল, ট্যারা, বোকা, জড়বুদ্ধি, উন্মাদ, হৃদয়ম্ব বিপরীত স্থানে সন্নিবিষ্ট, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত পুরুষই অধিক হয়। যদিও এখনও প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে (তাঁহারাও অস্বাভাবিক বলিয়া) পুরুষই বেশী হয়। বাস্তবিক কথা এই যে, বংশগতধারা বা প্রকৃতির বিধানেই পুরুষ নারী অপেক্ষা অনেকক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া সদ্গুণরাজি বিষয়ে) নিকৃষ্ট। সুতরাং এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, নারীর "অবলা" আখ্যাটী পুরুষের নিকৃষ্টতামূলক মনোভাব (inferiority complex) কাটাইবার ফন্দীমাত্র—পাল্লা ভারী করিবার বড়যন্ত্রবিশেষ।

জীবজগতে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে পিতার সহযোগ ব্যতীতও অনেক কীট-পতঙ্গ (ভেকাদি পর্য্যন্ত) অগণিত সংখ্যায় জন্মায়। ইহাদের সংখ্যা, সৃষ্টজীবের মধ্যে শতকরা ৯৯টী কিম্বা ততোধিক, এবং ইহারা অধিক ক্ষেত্রে পুরুষ-কীট। ইহারা অনেক সময় জীব-বিজ্ঞানসম্মত কার্য্য সমাধা করিয়া, অর্থাৎ নারী-কীটের গর্ভসঞ্চার করিয়া, মৃত হয় এবং অতি অল্পদিন বাঁচে; ইহাদের স্ত্রী অর্থাৎ নারী-কীট অনেক দিন বাঁচে। এই দৃষ্টান্ত হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রকৃতির চক্ষে পুরুষের মূল্য নারী অপেক্ষা অনেক কম।

সভ্যতার মধ্যে আজিও দেখা যায় যে, নারী জীব-বিজ্ঞানসম্মতভাবেই মনের মানুষ অন্বেষণ করেন, যদিও তাহা অধিক ক্ষেত্রে মেলা অসম্ভব। আজিও নারী কন্দর্প অপেক্ষা বীর, সাহসী, কর্ম্মপটু, বীর্য্যবান, বলশালী অর্জ্জুনকেই অনেক ক্ষেত্রে পছন্দ করেন। কিন্তু সভ্যতা মধ্যে এই সমস্ত গুণরাজির স্থান, আজিকার দিনে "সাফল্য" নামক মনোভাব দখল করিয়াছে। তাই নারী hero-worshipper সাফল্যের জন্য কর্ম্ম-কুশলতার পক্ষপাতী। ইহার মধ্যেই প্রকৃতির অমোঘ প্রেরণা থাকে, কারণ, এই জাতীয় লোকই জীব-বিজ্ঞানসম্মতভাবে সন্তানের জনক হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু সভ্যতার নানাবিধ ব্যবস্থার চাপে Biology আজ অনেকখানি পরাস্ত হইয়াছে; এই কারণেই আজ চাকুরি লোকে আত্মহত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য ধারায় নরনারীর মধ্যে বিজাতীয় বিরোধ ভাব, বিবাহবিচ্ছেদাদি এত অধিক দেখা যায়। এই কারণে এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে, পুরুষের ধৈর্য্য, সংযম কম বলিয়া, অগণিত নারী, জীবনের একটী বিশিষ্ট প্রধান ক্ষেত্রে অতৃপ্ত হইয়া, সাম্যবাদের সুযোগে এত বহির্মুখী ও অস্থির হইয়াছেন। এই সমস্ত কারণেই নিত্য নূতন ধারায় অজস্রপ্রকারে নারীর চিত্তবিনোদন করিবার জন্য পুরুষের আপ্রাণ প্রচেষ্টার অন্ত নাই; কিন্তু তবুও খেদ মিটে না। যথার্থ পক্ষে উহা এই খেদ মিটিবারও নহে, এই বিষয়ে আলোচনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু Soviet Russiaতে নারী-স্বাধীনতার চরম উৎকর্ষই বলুন আমেরিকাকে "নারীর স্বর্গ"ই বলুন, অথবা এদেশের ছেলেদের বিবাহ করিতে ভয় পাওয়ার কথাই বলুন, সমস্তই সপ্রমাণ করে যে, পুরুষ নিজের নিকৃষ্টতা মনে মনে বিলক্ষণ বুঝে, অথবা নিভৃত মনও বুঝে, তাই নারীকে ভয় করে, যদিও প্রকাশ্যে স্বীকার করে না। সুতরাং বলা যায় যে, নারীর "অবলা" অপবাদটীর কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই তাই মহাকবির সহিত সমস্বরে বলিতে হয়—

"কে বলে মা তুমি অবলে? অবলা কেন মা এত বলে?"

সংগ্রহ

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

স্তন্যদান

The Reader's Digest পত্রিকায় ডক্টর অ্যালেক্‌সিস্ ক্যারেল্ (Dr. Alexis Carrel) 'শিশুদিগের স্তন্যপান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ডক্টর ক্যারেল পাশ্চাত্ত্য জীববিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁহার জন্ম ফ্রান্সে, কিন্তু অনেক দিন হইতে ইনি মার্কিণ প্রজা। ডক্টর ক্যারেলের পরীক্ষাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তিনি একটি মুরগী-ছানার হৃৎপিণ্ড গত ২৭॥ বৎসর ধরিয়া জীবন্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। শিশুদিগকে স্তন্যপান সম্বন্ধে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, শিশুদিগকে স্তন্যপান করান ভাল কি না, সে সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রায় প্রত্যেক গৃহেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে। শিশুর স্বাস্থ্যের উপরে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, সুতরাং এই প্রশ্নের সমাধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কৃত্রিম উপায়ে বোতল দ্বারা খাওয়ান মাতার পক্ষে সুবিধাজনক সন্দেহ নাই এবং চিকিৎসকগণও অনেক সময় সুবিধাবোধে এই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বর্ত্তমানে এই কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য প্রয়োগের বিরোধী। বর্ত্তমানে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, স্তন্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য কোন-ব্যবস্থা করিয়া অনুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ কোন দ্রব্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ধনীদিগের মধ্যেই শিশুকে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত করিবার স্পৃহা অধিক দেখা যায়। দরিদ্রের মধ্যে এরূপ মাতার সংখ্যা কম। আধুনিক মাতাগণ অনেকেই শিশুর লালন-পালন-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা।

শিশু যতদিন ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃগর্ভে থাকে, ততদিন মাতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরও কিছুদিন মাতার সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠই থাকা উচিত। তাহাদিগের মধ্যে রাসায়নিক, শারীরিক এবং মানসিক যোগসূত্র অচ্ছেদ্যভাবেই বর্ত্তমান থাকে। স্তন্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে বোতলের সাহায্যে খাদ্য প্রয়োগ করিলে এই যোগসূত্র কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রই অন্যগুলির উপর নির্ভরশীল ও স্বভাববিরোধী কার্য্য কখনও হিতকারী হইতে পারে না; সুতরাং শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেওয়াও আবশ্যক। স্তন্যদান করিলে জরায়ু ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়, কাজেই শিশুর জন্মের পরে জরায়ুর পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্তির সহায়তা করে। শিশুর পক্ষেও ইহার উপকারিতা আছে। স্তন্যপান করিবার কালে শিশুকে বাধ্য হইয়া নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে হয় ও মুখের মাংসপেশীর ব্যবহার করিতে হয়। এই জন্য মুখের গঠন ও কণ্ঠস্বর স্তন্যপানের ফলে ভাল হয়।

শিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বে স্তনের মধ্যে একপ্রকার পীত-বর্ণের পদার্থ প্রস্তুত হয়। শিশুকে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই এই পদার্থের প্রধান গুণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর দ্বিতীয় দিবসে স্তনে দুগ্ধ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। শিশুর প্রয়োজন অনুসারে দুধের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং দুগ্ধ যে-সকল পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। স্তন্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে গোদুগ্ধ বা অন্যান্য দুগ্ধ ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া সম্ভব নহে, কারণ স্তনদুগ্ধে যে পরিমাণ প্রোটিন, ফস্‌ফরাস এবং ক্যালসিয়ম থাকে, তাহাই শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য দুগ্ধে ঐগুলির পরিমাণ কখনই সেরূপ হয় না সুতরাং শিশুর সম্যক্ পরিপুষ্টি হইতে পারে না। শিশুর পুষ্টির জন্য যে পরিমাণে ঐ দ্রব্যগুলির প্রয়োজন, তদনুসারে উহার পরিমাণও কম বেশী হইতে দেখা যায়। শিশু বড় হইলে তাহার বৃদ্ধির হার কমিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় মাতার স্তন্য দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পুষ্টিকর দ্রব্যগুলির পরিমাণও হ্রাস হইয়াছে। গো-দুগ্ধে অজৈব লবণ ও প্রোটিনের পরিমাণ স্তন্য দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী ও

লৌহ কম। ইহা স্তন্য দুগ্ধ অপেক্ষা দুষ্পাচ্য ও ইহাতে বহু প্রকার বীজাণু বর্ত্তমান থাকে। স্তন্য দুগ্ধও দোহন করিয়া পান করাইলে তাহার গুণ কতক পরিমাণে নষ্ট হয় বলিয়া বিশ্বাস।

স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া শিশু-মৃত্যুর হার অনেক হ্রাস পাইয়াছে। শিকগো-তে ডক্টর ক্লিফোর্ড জি· গ্রুলী (Dr. Clifford G. Grulee) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, স্তন্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম খাদ্য দিয়া পরিবর্দ্ধিত

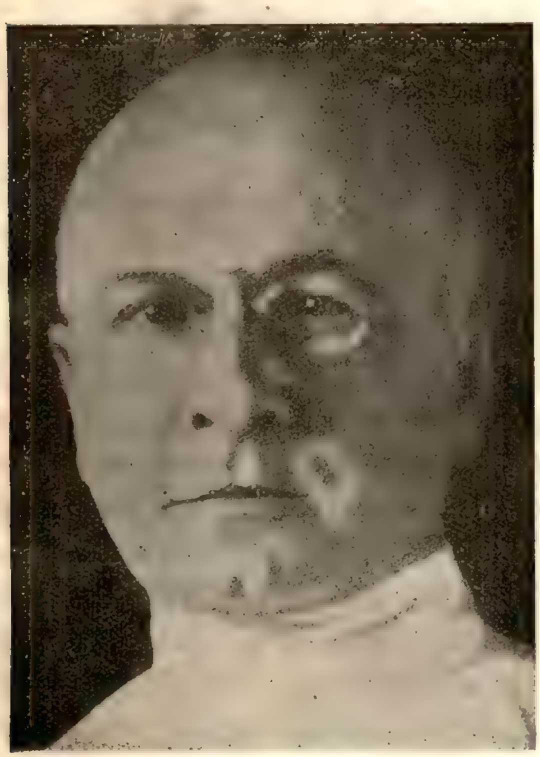

ডক্টর অ্যালেক্সিস ক্যারেল।

শিশুদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার স্বাভাবিক স্তন্যদুগ্ধে পরিবর্দ্ধিত শিশুদিগের অপেক্ষা দশগুণ বেশী। ইংলণ্ডে শিশুদিগকে স্তন্যদুগ্ধ দানের ব্যবস্থা দিয়া গত ৩০ বৎসরে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ৬৩ ভাগ হ্রাস লাভ হইয়াছে।

রোগ-প্রবণতা সম্বন্ধে ডক্টর গ্রুলী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কৃত্রিম খাদ্যে পরিবর্দ্ধিত শিশুদিগের শতকরা ৬৪ জন প্রথম বৎসরেই নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়, কিন্তু স্তন্যদুগ্ধে পরিবর্দ্ধিত শিশুদিগের মধ্যে রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা শতকরা ৩৭ জন মাত্র।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে স্তন্য পান করাইলে শিশুদিগের যে কেবল স্বাস্থ্যোন্নতি হয় তাহাই নহে, ইহাদের সহনশীলতা ও মানসিক সংযমও বর্দ্ধিত হয়।

স্তন্য দান করা মাতার স্বাভাবিক বৃত্তি, সুতরাং ইহাতে কোনও ক্ষতি হইতে পারে না। সযত্নে এই কর্ত্তব্য পালন করিলে ইহার ফল ভালই হইয়া থাকে। উপযুক্ত খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ এবং পরিশ্রম করিলে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয়।

বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্তন্যদানের অনিচ্ছার কারণ প্রধানতঃ তাহাদের শিক্ষা ও তাহার জন্য কতকগুলি বিকৃত ধারণা এবং তাহাদিগের খাদ্যাখাদ্য বিচারের অভাব।

আধুনিক স্ত্রীলোকদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নাই। তাহাদিগের শিক্ষাও পুরুষদের মতই দেওয়া হইয়া থাকে ও সমাজও স্বভাবের নিয়মপালন সম্বন্ধে উদাসীন, সুতরাং মাতৃত্বের মহিমা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

মার্শাল চিয়াং কাই-শেক

'Current History' পত্রিকায় জন গান্থর (John Gunther) চীনের সর্ব্বাধ্যক্ষ মার্শ্যাল চিয়াং কাই-শেক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, চিয়াং কাই-শেক একজন গ্রাম্য ব্যবসায়ীর পুত্র। তাঁহার চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। তিনি নিয়মতান্ত্রিকতার একান্ত পক্ষপাতী; কিন্তু বহু শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছেন ও কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি চীনকে একতাবদ্ধ করিয়াছেন ও তজ্জন্য স্বদেশবাসীর সহিত দীর্ঘ দশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে তাঁহাকে বিশেষ উচ্চস্থান দেওয়া যায় না।

তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করেন ও রাত্রি পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করেন। তিনি শয়ন করিয়া থাকিতেই ভালবাসেন ও যত দূর সম্ভব অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কার্য্য করেন। আহারের পর সামান্য দিবা-নিদ্রা তাঁহার পরম কাম্য।

তিনি মদ্যপান বা তামাক সেবন কখনও করেন না এবং চা বা কফি পান করেন না। বহু বৎসর যাবৎ তিনি

দিনপঞ্জী রাখিয়া আসিতেছেন। একবার সিয়ানে বিদ্রোহী দল তাঁহাকে বন্দী করে, কিন্তু তাঁহার দিনপঞ্জী ও স্ত্রীর নিকট লিখিত কয়েকখানি পত্র পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদল তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ে।

তাঁহার পারিবারিক জীবন অতি শান্তিপূর্ণ এবং তাঁহার স্ত্রী প্রকৃতপক্ষেই তাঁহার বন্ধু, সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী। তথাপি তিনি অত্যন্ত একাকী ও নির্জ্জনতাপ্রিয়।

মার্শ্যাল চিয়াং কাই-শেক।

অষ্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক ডব্লিউ. এচ. ডোন্যাল্ড তাঁহার বিশেষ বন্ধু।

চিয়াং কাই-শেক-এর পাঠানুরক্তি উল্লেখযোগ্য।

কংফুসিয়াসের এই বাণী:—"দেশ শাসন করিতে হইলে প্রথমে নিজের পরিবার শাসন করা আবশ্যক; পরিবার শাসন করিতে হইলে প্রথমে নৈতিক শিক্ষা দ্বারা আপন দেহ নিয়মানুবর্ত্তী করা প্রয়োজন; দেহ নিয়মানুবর্ত্তী করিতে হইলে মনকে সংযত করা আবশ্যক; মনকে সংযত করিতে হইলে আপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অকপট হওয়া প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অকপট হইতে হইলে জ্ঞানার্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক"—মনে রাখিয়া চিয়াং কাই-শেক তদনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে চেকিয়াং প্রদেশের চিকাউ গ্রামে চিয়াং কাই-শেক জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি টোকিওর সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও তৎপরে কয়েক বৎসর জাপানী সৈন্যদলে কার্য্য করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডক্টর সান য়াৎ-সেন-এর সহিত জাপানে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ডক্টর সান য়াৎ-সেনই তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমিকতায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনের বিপ্লবে যোগদান করেন ও পাঁচ বৎসর কাল ডক্টর সান য়াৎ-সেন-এর অধিনায়কত্বে অত্যন্ত বিশ্বস্তরূপে কার্য্য করেন। এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, রাজনৈতিক জীবনে উন্নতি করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী এবং অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সাংহাই-এ দালালি ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় রাজনৈতিক ও সামরিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়েন এবং 'কুয়োমিনটাং'-এর 'ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী'র সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। ডক্টর সান য়াৎ-সেন-এর মৃত্যু হইলে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় সেনাদলের অধিনায়ক পদ প্রাপ্ত হন।

সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া চীনকে একতাবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা তিনি করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ইতি-হাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

চিয়াং কাই-শেক বিপ্লববাদী হইলেও কখনই উগ্রপন্থী ছিলেন না। তিনি কম্যুনিষ্টদিগের সহিত দশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই এবং অবশেষে কম্যুনিষ্টগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া সিয়ান-এ লইয়া যায় ও তথায় তাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিতে পারে যে, চীনের অভ্যুত্থান তাঁহার দ্বারাই

সম্ভব হইতে পারে, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে মুক্তি দেয়। চিয়াং তৎপরে তাহাদিগকে মিত্রতাবদ্ধ করেন। ইহার পরেই চীনের ইতিহাসের নূতন পর্ব্ব আরম্ভ হয়।

চিয়াং কাই-শেক-এর চরিত্রে তাঁহার দৃঢ়তাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি আদৌ কৌশলী নহেন। তাঁহার মতামত সম্বন্ধে, তিনি এতই দৃঢ়বিশ্বাসী যে, অপরে তাঁহার মত গ্রহণ করিবেই ইহা বিশ্বাস করিয়া তিনি সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। চীনের আত্মকলহের সময় তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের বহু শক্তিশালী ব্যক্তিকেও পরাজিত করিয়া তিনি মুক্তি দিয়াছেন ও ফলে বহু সমর্থক সৃষ্টি করিয়াছেন।

চিয়াং অসীম ধৈর্য্যশালী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে চিয়াং জাপানের সকল দাবীই স্বীকার করিয়া লইতেছিলেন। এইরূপে তিনি মাঞ্চুরিয়া ও জিহোল প্রদেশ জাপানের হস্তে সমর্পণ করেন। মঙ্গোলিয়াও জাপানের হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি বহু বৎসর ধরিয়া তিনি জাপানকে কোন বাধাই দেন নাই এবং যাহারা বাধা দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল তাহাদিগকেও শাস্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন কর্ম্মচারীও তাঁহার দুর্ব্বলতা ও জাপান-প্রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তথাপি চিয়াং কিছুই করেন নাই। তৎপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চিয়াংও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সমর্থকদিগের নিকট যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, অবশেষে জাপানের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তিনি যুদ্ধের জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

চিয়াং চীনের প্রসিদ্ধ ধনী সুং পরিবারের কন্যা মেই-লিংকে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী আমেরিকায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। ইনি শৈশবেই চীনের বিপ্লববাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কারণ ইঁহার পিতা ডক্টর সান য়াৎ-সেন-এর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মাদাম চিয়াং তাঁহার স্বামীকে পরামর্শ দেন, বৈদেশিক মতামত জ্ঞাপন করেন এবং বিদেশীদিগের সহিত সংস্রব রাখিবার জন্য দূতীর কার্য্য করেন, কারণ চিয়াং জাপানী ব্যতীত অন্য বৈদেশিক ভাষা জানেন না। মাদাম চিয়াং-এর স্বদেশ-ভক্তি ও স্বামী-ভক্তি দৃষ্টান্তস্থল। কোথাও বিমান আক্রমণ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া আহতদিগের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। তিনি পল্লী-অঞ্চলের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং বিদ্যা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা প্রচারকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

সুং পরিবার অত্যন্ত গোঁড়া খৃষ্টান। চিয়াং যখন প্রথম মেই-লিংকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন মেই-লিংএর মাতা অসম্মতি প্রকাশ করেন, কারণ, চিয়াং খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু চিয়াং বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হন না। ১৯২৭

মাদাম চিয়াং কাই-শেক।

খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তাঁহাদের বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহের পরেই চিয়াং বলেন, "এখন আমি হৃদয়ে শান্তি লইয়া বিপ্লবের কার্য্যে অধিক অগ্রসর হইতে পারিব।" পরে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং এখন তিনি ঐ ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী। সিয়ান প্রদেশে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত মনে করিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকটে শেষ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, "স্বদেশের জন্য প্রয়োজন হইলে আমি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সুতরাং আমার জন্য দুঃখ করিও না। আমি এরূপ কার্য্য কখনও করিব না যাহাতে আমার স্ত্রীর লজ্জিত হইতে হইবে বা যাহাতে

ডক্টর সান য়াৎ-সেন-এর শিষ্যের যোগ্যতা হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। বিপ্লবের জন্যই আমার জন্ম এবং তাহারই জন্য সানন্দে জীবনপাত করিব।"

প্রত্যেক সোমবার প্রাতে তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে একত্রে সম্মিলিত করিয়া ডক্টর সান য়াৎ-সেন-এর প্রতিকৃতির প্রতি তিনবার প্রণাম নিবেদন করেন ও তাঁহার বাণী প্রার্থনার ন্যায় সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করেন। তৎপরে মিনিটকাল নীরব সাধনা হইবার পর চিয়াং একটি বক্তৃতা দেন। তিনি সামরিক অবস্থার আলোচনা করেন এবং কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিগণকে আরও মনোযোগ ও শ্রমসহকারে কার্য্য করিতে বলেন ও দোষগুণের বিচার করিয়া দেখাইয়া দেন।

৩০ বৎসরব্যাপী বিপ্লব এবং আত্মকলহের পর বর্ত্তমানে চিয়াং কাই-শেক চীনে একতা স্থাপন করিয়াছেন। জাপানীরা ঘোষণা করিয়াছে যে, চিয়াং কাই-শেককে বন্দী করিতে পারিলে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করা হইবে। বোধ হয়, খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পরে চিয়াং কাই-শেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি কেহই চীনে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ইহুদি-সমস্যা

The Virginia Quarterly Review পত্রিকায় লিউইস ব্রাউন (Lewis Browne) 'ইহুদিরা কি করিবে?' এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়াতে ইহুদিরা অতি ঘৃণিত ব্যবহার পাইতেছে। ইতালিতেও সেইরূপই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নাৎসীগণ এবং তাহাদের মিত্রেরা অন্যান্য দেশেও যাহাতে ইহুদিদিগের প্রতি ঐরূপই ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য প্রচারকার্য্যে লিপ্ত আছে এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, ইহুদিগণকে তাহারা জাহান্নমে পাঠাইবে।

ইহুদিগণ এই অবস্থায় কি করিবে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় মধ্যযুগের ন্যায় কোন প্রকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এই বিদ্বেষের হাওয়া বহিয়া যাইতে দেওয়া সম্ভব নহে। সে সময়ের ন্যায় নীরবে সনাতন ধর্ম্মের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিয়া কালাতিপাত করাও এখন আর চলে না। সে সময়ে ইহুদিদিগের স্বতন্ত্র কৃষ্টি ছিল, কিন্তু এখন তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন আর নিজেদের লইয়া স্বতন্ত্র থাকিবার অবস্থা বা সঙ্গতি নাই। অধিকাংশ ইহুদি এখন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনযাত্রার ধারা অবগত নহে এবং উহা জানিলেও অনেকেই সে ভাবে চলা অত্যন্ত অসুবিধাজনক মনে করে। অনেকেই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে বহুকাল লালিত পালিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখন হঠাৎ তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইতেছে।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদিগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ২০ বৎসরের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিত্যক্ত স্থানটিকে সভ্যতার আগারে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসরের কিছু বেশীদিন হইল সেখানেও তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহুদিগণ এ বিষয়ে আরবীয়দিগের উপর দোষারোপ করে, আরবীয়গণ ইহুদিগণকেই দোষী মনে করে এবং ইংরাজগণ ইতালিয়দিগের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু সে যাহাই হউক, প্যালেষ্টাইন-এ চার লক্ষ ইহুদি বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন।

অধিকাংশ ইহুদিই যে স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে সেই দেশ ত্যাগ করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে, কারণ তাহারা নিজেদের সেই দেশেরই অধিবাসী মনে করে। জার্ম্মানীতে এত অত্যাচারের পরেও যদি তাহাদের পূর্ব্ব অধিকার দেওয়া হয় তবে এখনই শতকরা ৯০ জন ইহুদি জার্ম্মানীতে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত।

ইহুদিগণ সকলে একতাবদ্ধ ইহা মনে করাও অত্যন্ত ভুল। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহুদিগণকে কখনই অমিশ্র জাতি বলা চলে না এবং এখন ইহুদিগণের জন্য পৃথক্ একটি বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া সকলের তথায় গিয়া বসবাস করাও সম্ভব নহে। ইহুদিদের এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবেই থাকিতে হইবে।

"যদি আমাদের পৃথক করিয়া রাখিবার মধ্যে কোন যুক্তি থাকিত তাহা হইলে আমরা তাহার কারণ

অনুসন্ধান করিয়া সেগুলি অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এই সকল ব্যবহারের কোন কারণই নাই। আমাদিগের প্রতি অযথা কতকগুলি দোষারোপ করা হইয়া থাকে, যথা, আমরা উদ্ধত, আমরা হীন চাটুকার, আমরা কম্যুনিষ্টদলের নেতা, আমরা শ্রমিকগণকে উত্তেজিত করি ইত্যাদি।"

সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই ভাল মন্দ সকল প্রকারের লোকই আছে। ইহুদিদের মধ্যেও বিখ্যাত কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক যেমন জন্মিয়াছেন, সেইরূপ হীন ব্যক্তিও বহু আছে। ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। তথাপি ইহুদিগণকে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হয়। ধর্ম্মই যে ইহার কারণ তাহাও নহে। জার্ম্মানীতে বহু ইহুদি খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু তথাপি তাহারা অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। অনেক স্থলে বলা হইয়া থাকে যে, ইহুদিরা কৃষিকার্য্য করে না, কিন্তু সে জন্য তাহাদিগকে দোষারোপ করা অর্থহীন। যে যেরূপ কার্য্যে উন্নতি করিতে পারে, তাহার সেই কার্য্য করা দোষাবহ হইতে পারে না।

ইহুদিরা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ইহারও কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদিগকে এরূপ স্বতন্ত্র ভাবে দেখা হয় যে, অন্যের সহিত তুলনায় অনেক বেশী যোগ্যতা না দেখাইতে পারিলে তাহাদিগের উন্নতির পথ একেবারেই বন্ধ, সুতরাং ইহুদি-সমস্যার সমাধান অ-ইহুদির দ্বারাই হওয়া সম্ভব এবং ইহুদিরা যে বিধর্ম্মী তাহা ভুলিয়া যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়।

সাধারণতঃ অনেকেই মনে করেন যে, ইহুদিরা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য কখনও হারায় না। ইহা সত্য নহে। তাহার প্রমাণ এই যে, সেরূপ হইলে ইহুদিদের মধ্যে আকৃতিগত বিভিন্নতা এত বেশী দেখা যাইত না। যীশু খৃষ্টের সময়ে মিশরে ১০ লক্ষ ইহুদি ছিল কিন্তু এখন তাহাদের চিহ্নমাত্রও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেইরূপ মধ্য যুগের শেষ ভাগে চীনে বহু ইহুদি একেবারে তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত নিশ্চিহ্ন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। ইতালিতেও বহু ইহুদি ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ৪০ হাজারের বেশী নাই। অবশিষ্ট ইহুদিগণকে হত্যাও করা হয় নাই বা বিতাড়িত করা হয় নাই, তাহাদের অনেকেই ইতালিয়দিগের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

অত্যাচারের দ্বারাই ইহুদিদের পৃথিবী হইতে লোপ করা অসম্ভব এবং এরূপ মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে ক্রমশঃ মানুষের প্রতি মানুষের হিংসাবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই। ইহুদি-সমস্যার সমাধান একমাত্র মৈত্রীর দ্বারাই সম্ভব, সুতরাং ইহুদিরা কি করিবে জিজ্ঞাসা করা অর্থহীন। অ-ইহুদিদের উপরেই এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

জুতা ও পায়ের ব্যথা

Hygeia পত্রিকায় ডক্টর ডাডলে মর্টন পায়ের ব্যথা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পায়ের ব্যথা আধুনিক মানবের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। প্রায় শতকরা ৭০ জন লোক এই ব্যাধিগ্রস্ত। ইহার কারণ খারাপ জুতা ব্যবহার ও পায়ের মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা। গত মহাযুদ্ধের সময় বহু লোকের পা পরীক্ষা করিয়া ডক্টর মর্টন সিদ্ধান্ত করেন, পূর্ব্বোক্ত কারণ দুইটি ব্যতীত পায়ের অস্থিসংস্থানের দোষও ব্যাধির কারণ।

এক মাইল হাঁটিলে পায়ের উপর প্রায় ২৫০ টন চাপ পড়ে, কিন্তু পায়ের অস্থিসংস্থান ও নির্ম্মাণ কৌশল ভার-বহনের পক্ষে এরূপ উপযোগী যে কোন একখানি অস্থির উপর সমস্ত চাপ পড়ে না। আমরা যখন দাঁড়াইয়া থাকি, তখন শরীরের অর্দ্ধেক ভার প্রত্যেক পায়ের উপর পরে এবং talus নামক কীলকাকার অস্থি এই ভারের অর্দ্ধাংশ গোড়ালির উপর ও অপরার্দ্ধ পায়ের পাতায় পাঁচখানি ছোট অস্থির (metatarsals) উপরে ভাগ করিয়া দেয়। সাধারণতঃ পায়ের পাতায় ব্যথা হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক অস্থির উপর চাপের পরিমাণ পরিমাপ করিবার জন্য ডক্টর মর্টন একপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, এই যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পান যে, দেড়মণ ওজনের একজন লোকের প্রত্যেক পায়ে ৩০ সের ভার বহন করিতে হয়। প্রত্যেক পায়ের গোড়ালীতে ১৫ সের ও পায়ের পাতায় ১৫ সের ভার

পড়ে। পায়ের পাতায় যে ১৫ সের ভার বহন করিতে হয়, তন্মধ্যে অঙ্গুষ্ঠের পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র অস্থিখানি আছে তাহার উপর ৫ সের ও অবশিষ্ট চারখানি ক্ষুদ্র অস্থির প্রত্যেকখানির উপর ২॥ সের হিসাবে ভার পড়ে। ব্যথাযুক্ত পা পরীক্ষা করিয়া ডক্টর মর্টন দেখিতে পান যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্গুষ্ঠের পশ্চাতের ক্ষুদ্র অস্থিখানির যে পরিমাণ ভার বহন করা উচিত উহা তদপেক্ষা কম ভার বহন করিতেছে, সুতরাং তাহার পরের অস্থিখানির উপর বেশী চাপ পড়িতেছে। রঞ্জন-রশ্মি সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় অস্থিখানি স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ আকারের হওয়া উচিত তদপেক্ষা বড় হইয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা যে উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে দ্বিতীয় অস্থিখানির উপরে অত্যধিক চাপ পড়ায় ব্যথার সৃষ্টি হয়। পায়ের পাতার প্রথম ও দ্বিতীয় অস্থি দুইখানি (metatarsals) সমান থাকাই স্বাভাবিক ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রথম অস্থিখানি যদি স্বভাবতই ছোট হয় তাহা হইলেও পায়ের ব্যথা হইতে পারে এবং জুতা পায় দিবার জন্যও পা বিকৃত অবস্থায় থাকিয়া অস্থিগুলির উপর চাপ-বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে। অনেকের ধারণা যে, পায়ের খিলান নীচু হইলেই পায়ে ব্যথা হয়, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, যাহারা জুতা পায়ে দেয় না, তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক লোকের পায়ের খিলান নীচু, অথচ তাহাদিগের এই রোগ হইতে দেখা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় পা রাখিতে পারিলে এই রোগের উদ্ভব খুব কমই হয়।

জননী জগদ্ধাত্রী

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

জননী আমার জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী
দেবী আমার এই বসুধার শাশ্বত সুখদাত্রী।
অন্তর হ'তে বাহিরি তোমার, শরণ লভিনু চরণে তোমার,
মেলিনু নয়ন নবীন আলোকে পোহাল প্রথম রাত্রি।
ক্লান্ত কাতর লভিলাম শ্বাস, দিনে দিনে দিনে গেল কত মাস,
কত না বরষ কত না হরষে চলিনু নবীন যাত্রী।
চক্ষে আমার জাগাইলে আশা, বক্ষে ভরিয়া দিলে ভালবাসা,
আশ্বাস দিলে, অভয় দিলে মা শুভসম্ভারদাত্রী।
ত্রিংশৎ কোটী সন্তান যাঁর, উথলিয়া ঝরে সহস্র ধার,
প্রেমের নির্ঝর স্নেহের পাথার নিখিল ধরার ধাত্রী।
গগন চুম্বি ললাটে যাঁহার কিরীট রচিল ধবল তুষার
অরুণ উদয়ে কাটিল আঁধার পোহাল তিমির রাত্রি।
নমো নমো নমো জননী আমার লুটাইয়া মাটী মাখি বারে বার
মৃণ্ময়ী তুমি চিণ্ময়ী তুমি জননী জগদ্ধাত্রী।
দেশে দেশে গেল তব সোনা, অন্ন বস্ত্র বিলালে কত না,
সবারে পরায়ে রাজার মুকুট গৈরিক নিলি গায়ে—
আপন অঙ্গে মাখিয়াছ ছাই, ধূলি চন্দনে ভেদ রাখ নাই
সত্য শিব সুন্দর রূপে রুদ্র পড়িল পায়ে;
বুদ্ধ নিমাই শঙ্কর তাই—খৃষ্ট মহম্মদে ভেদ নাই
তোমাতে মিলিল সব সাধনাই—তুমি সকলের ধাত্রী।

রাম রাঘব কুরু পাণ্ডব - বারে বারে কত রণতাণ্ডব—
রক্ত সে তব চন্দন হ'ল—মুক্তির জয়টীকা।
ধর্ম্মের গ্লানি করিবারে ক্ষয় বজ্রে বজ্রে হ'ল বিনিময়,
দানবেরে হ'তে দেবেরে বাঁচালে তুমি রণ-চণ্ডিকা,
কভু হৃষীকেশ কভু এলোকেশ হও বরাভয়দাত্রী,
নমো নমো নমো জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী।

বীণামুরজ খর তরবাল, বেদ পুরাণ কাব্য রসাল
বক্ষপীযূষ বহিয়া মাতার তটিনী ছুটিয়া চলে,
মণি মরকত খচিতাঞ্চলা সিন্ধু কাবেরী চলচঞ্চলা
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ধৌত গঙ্গাজলে।
(তব) মঙ্গল কল কল্লোল ধারা ধরায় অন্নদাত্রী
নমো নমো নমো জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী।

ত্রিপুরী-রহস্য

ত্রিপুরীর পর ও কলিকাতায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের পূর্ব্বে, 'রাষ্ট্রবাণী'-সম্পাদক এবং খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের যে-পত্র বিনিময় হইয়াছিল, উভয়ের সম্মতিক্রমে তাহা এখানে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৩৯

শ্রদ্ধাস্পদ 'রাষ্ট্রবাণী' সম্পাদক মহাশয়,

আমি আপনার সম্পাদিত 'রাষ্ট্রবাণী'র নিয়মিত পাঠক। রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন ও ত্রিপুরী কংগ্রেস লইয়া যখন বাংলাদেশের সমস্ত পত্রিকায় ক্ষোভ, ক্রোধ, স্তুতি ও নিন্দার অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তখন আপনার 'রাষ্ট্রবাণী'তে সংযত, সুচিন্তিত ও যুক্তিযুক্ত অভিমত ও বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া আনন্দ পাই। বাংলাদেশে আজিকার দিনে যে দিক্‌টা প্রায় অন্ধকার, আপনার লেখা সে দিকে যথাসম্ভব আলোকপাত করে। গান্ধীজীর আদর্শ, মতবাদ ও কর্ম্মপদ্ধতি দেশের লোক প্রায় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে। গান্ধীবাদ চুলায় যাউক, গান্ধীজীকে দিয়া দেশটাকে স্বাধীন করিয়া লইতে হইবে, ইহাই যেন আজিকার দিনের জনমত। আর জনমতই ত ডিমোক্রেসী। এ অবস্থায় 'রাষ্ট্রবাণী'র ন্যায় পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা সমধিক।

আপনার লেখা হইতে আলোক পাই বলিয়াছি। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৫ই ফাল্গুনের 'রাষ্ট্রবাণী'তে "ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে" শীর্ষক প্রবন্ধ, ২২শে ফাল্গুনের "পুনর্নির্ব্বাচন হানিকর কেন?" প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতে পারি। সুভাষবাবুর নির্ব্বাচনের পর গান্ধীজী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া দেন, যখন প্রাদেশিকতার মোহমুগ্ধ বাংলাদেশ "সীতারামিয়াজীর পরাজয়ে গান্ধীজীর পরাজয়" শুনিয়া তাহার গ্রাম্য প্রবাদ স্মরণ করিয়া ভাবিতেছিল "এ যে দেখিতেছি 'ছাগলে কামড়াল সীতায়, মারা গেল যুধিষ্ঠির' সত্য হইয়া উঠিল", তখন আপনার লেখা পড়িয়া অনেক সন্দেহ দূর হইয়াছিল। গান্ধী-নীতি ও সুভাষ-নীতির পার্থক্য আপনি বেশ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আপনার লেখা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে, গান্ধীবাদও বজায় থাকিবে অথচ কূটনীতি (বা ধাপ্পা) প্রয়োগ করা হইবে, ইহা প্রকৃতই চলিতে পারে না। সুতরাং দেশের আবহাওয়া বুঝিয়া সপার্ষদ গান্ধীজী সুভাষবাবুকে পথ ছাড়িয়া দিলেন, যাহাতে সুভাষবাবু দেশবাসীকে তাঁহার নীতি ও কর্ম্মপন্থায় পরিচালিত করিতে পারেন, গান্ধীজীর বিবৃতির ইহাই মর্ম্মার্থ এবং ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, ইহাই বুঝিয়াছিলাম। গান্ধীজী ও তাঁহার অনুগামিগণের সাহায্য হইতে কংগ্রেস বঞ্চিত হইলে যে দেশের সমূহ অনিষ্ট হইবে, দেশবাসীর এই আশঙ্কার সম্বন্ধে আপনি যুক্তিপরম্পরা দিয়া বুঝাইয়াছিলেন, এরূপ আশঙ্কা অমূলক, কারণ "বর্ত্তমানে যাঁহারা গান্ধীজীর কথায় চলিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে কাজের ত শেষই থাকিবে না।"

তাহার পর গান্ধীজী যখন সুদূর রাজকোটের অহিংস সংগ্রামে প্রাণসংশয় সারথ্য-কার্য্যে ব্যাপৃত, আর সেই অবকাশে ত্রিপুরীর কুরুক্ষেত্রে 'অভিমন্যু-বধ' সুসম্পন্ন হইয়া গেল বলিয়া বাংলার শিবিরে যখন দুঃখের, রোষের ও ক্ষোভের সীমা নাই, তখন 'রাষ্ট্রবাণী'র পাতায় এত বড় ব্যাপারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, ইহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই উৎসুক ছিলাম। কিন্তু ৬ই চৈত্রের 'রাষ্ট্রবাণী'তে দেখিলাম যে, "ত্রিপুরীর একটি প্রধান রহস্যাবৃত বিষয়" হইতেছে এই যে, পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটীর মেম্বারগণ তাঁহাদের বিবৃতিতে সুভাষ বাবুর প্রতি পথ ছাড়িয়া দিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার অপালন অপেক্ষাও তাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইয়া কার্য্যতঃ রাষ্ট্রপতির স্বাধিকারে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার পর ১৩ই চৈত্রের 'রাষ্ট্রবাণী' এ সম্পর্কে একেবারে নীরব।

এখন কথা হইতেছে এই, আপনার নিকটও ইহা যদি রহস্যাবৃত হয়, তবে বাংলাদেশে বসিয়া কাহার নিকট হইতে ইহার সমাধান পাইব? এ সম্পর্কে বাংলা যাহা মনে মনে

বুঝিয়া রাখিয়াছে, তাহা হীন ও গ্লানিকর। আপনিও যদি ইঙ্গিতে সেই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া ব্যাপারটাকে রহস্যাবৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তবে গান্ধীবাদের মূলে আঘাত করা হয়। আপনার নিকট ইহা নিশ্চয়ই অস্পষ্ট নহে যে, প্যাটেলপ্রমুখ সদস্যগণের বিবৃতিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মূলে রহিয়াছে গান্ধীজীর বিবৃতিতে দেশবাসীর প্রতি স্বয়ং গান্ধীজীর আশ্বাসবাণী, যাহাকে প্রতিশ্রুতিই বলা চলে। সুতরাং আপনি প্যাটেলপ্রমুখ সদস্যগণকে পরোক্ষে যে অসত্য-ভাষণ ও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের দায়ে দায়ী করিয়াছেন, তাহার কলঙ্ক স্পর্শ করিতেছে সত্যসন্ধ গান্ধীজীকে। ইহাকে 'রহস্যাবৃত' বলিয়া ঘোষণা করিবার পর নীরব থাকা চলে না। এ অপবাদ কূটনীতিভক্ত সুভাষ বাবু বা জয়নারায়ণজীর নামে নহে, যাঁহারা দেশোদ্ধার করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সত্য ও অহিংসার মন্ত্রকে কার্য্যসিদ্ধির সময়োপযোগী উপায় হিসাবে বরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহা ক্ষমতাপ্রিয়তা বা Fascism প্রভৃতির ন্যায় অপবাদ নহে, যাহা মতামতের বিষয়। ইহা গুরুতর বটে, কারণ ইহা গান্ধীজীর কতিপয় অন্তরঙ্গের গান্ধীজীর দোহাই দিয়া একযোগে অসত্য-ভাষণ ও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের অপবাদ। 'রাষ্ট্রবাণী'র পৃষ্ঠায় এ রহস্যাবরণের উদ্ঘাটনকল্পে আলোচনা ও বিশ্লেষণ আপনার নিকট হইতে বাঙ্গালী আশা করে। এ কথাটা যদি এড়াইয়া যাওয়া হয়, তবে 'রাষ্ট্রবাণী'র মারফৎ আপনি যে উচ্চ আদর্শের প্রচার করিতেছেন, তাহা অমূলক বলিয়া মনে হইবে। বড় আদর্শের বিপদও বড়। শত মিথ্যায় Hitlerism এর কোন ক্ষতিই হইবে না, কিন্তু এক মিথ্যায় গান্ধীবাদ ধূলিসাৎ হইতে পারে।

বিনীত

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

সোদপুর, ৩০।৩।৩৯

আপনার পত্র পাইলাম। রহস্যাবৃত বলায় আমি এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উহার হেতু আমি বুঝি নাই। আমি হেতু না বুঝিলেই জিনিষটা খারাপ বা উহাতে কুমতলব আছে, ইহা কদাচ নয়। ত্রিপুরীর পূর্ব্বে গান্ধীজী ও নেতারা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রতিরোধ করিবেন না। কিন্তু পরে প্রতিরোধ করিয়াছেন। হয়ত যথেষ্ট কারণ আছে। প্রতিরোধ করা দোষের নয়। জনসাধারণের হিতের জন্যই প্রতিরোধ না করা স্থির করিয়াছিলেন। পরে হয়ত তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রতিরোধ করাই উচিত, সেই জন্য প্রতিরোধ করিয়াছেন। কিন্তু কেন প্রতিরোধ করা উচিত তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমার না বুঝিতে পারার ভিতর কোনই খারাপ ইঙ্গিত নাই। আমি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। অবকাশ ও সুবিধা হইলে তিনি জানাইবেন। তাঁহার সততা ও কুশলতার উপর আমি নিতান্তই নিশ্চিন্ত ভরসা রাখি। যখন সাধারণকে হেতু জানান প্রয়োজন মনে করিবেন, জানাইবেন। না জানাইলেও আমরা বুঝিব যে হেতু জানান নাই, তবে কার্য্যকালে উহাই—প্রতিরোধ করাই—যোগ্য মনে করিয়াছেন।

আমি ত্রিপুরীতে যাই নাই। তাঁহাদের কাহারও পরামর্শের মধ্যে নাই। গান্ধীজি কেন যে 'not an enemy' বলিয়াছেন, সর্দ্দারজী কেন যে 'harmful' বলিয়াছেন তাহাই কি আমি জানি? জানি না ত। ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি পাঠকবর্গের নিকট তাহা রাখিয়াছি। শেষোক্ত ব্যাপারে প্রতিরোধ করার হেতু আমি এখনও বুঝি নাই, তবে এইটুকু বিশ্বাস রাখি যে, কোনও মন্দ উদ্দেশ্য লইয়া করা হয় নাই, দেশের হিতের জন্যই করা হইয়াছে। ঐরূপ করার ডেলিগেটদের আইনসঙ্গত অধিকারও আছে।

আশা করি আপনি বুঝিবেন যে, আমি বিষয়টী এড়াইয়া যাই নাই। যাহা বুঝি নাই সে সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারি নাই। এখন ত দেখিতেছি যে উহা লইয়া যত আলোচনা হইবে, তত বিষ বাড়িবে। এই জন্যই আপনার পত্রের উত্তর ব্যক্তিগত ভাবেই দিলাম। গান্ধীজীর কৃতি সম্বন্ধে আমার কোনও ভয় নাই, কিছুই গোপন করিয়া বা এড়াইয়া যাইবার নাই। আবার আলোচনা দ্বারা যে স্থানে অহিত হয় সে স্থানে আলোচনাও ত্যাগ করিতে হইবে।

বিনীত

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

কলিকাতা, ৩রা এপ্রিল,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ৩০শে মার্চ্চ তারিখের পত্র পাইলাম। ওই পত্রের ক্ষুদ্র পরিসরে আপনার শান্ত, সংযত, বিশ্বাসী ও কর্ম্মী মনের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। ত্রিপুরী যাইয়া

বাদানুবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, বিশেষতঃ যে আলোচনায় দেশের অহিত হইবে আশঙ্কা হয়, তাহা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ এ বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু আপনি যখন ব্যক্তিগত ভাবে আমার পত্রের উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমার পূর্ব্বপত্রের মর্ম্ম ও আমার মনে যে সংশয় রহিয়াই গেল তাহা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করিতেছি।

ত্রিপুরীতে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে তাহাতে দেশের হিত হইবে কি অহিত হইবে, আমার পূর্ব্বপত্রে সে প্রশ্ন উত্থাপিত করি নাই। দেশহিতের জন্যই প্রথমে প্রতিরোধ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়া, মাত্র কয়েকদিন পরে কোন হেতু না দেখাইয়া দেশহিতের জন্যই প্রতিরোধ করা বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে, কারণ ব্যাপারটী রাজনৈতিক। অসদভিপ্রায়ের কোন কথাও না ওঠাই সঙ্গত। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—ইহাতে সত্যের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষিত হইল কি না, যে অখণ্ডিত, অকুণ্ঠিত সত্য গান্ধীবাদের আশ্রয়। আমি যে ভাবে গান্ধীবাদ বুঝি, তাহা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার অন্যতম উপায় মাত্র নহে, তাহা স্বরাজপ্রাপ্তির অনেক উপরের কথা; তাহা মানবেতিহাসের ভাবরাজ্যে ও কর্ম্মক্ষেত্রে একেবারে পূর্ণ বিপ্লব আনিবার কথা। সে পথে ভারত উপস্থিত স্বাধীন না হইলেও গান্ধীবাদের কিছু যায় আসে না; কেবল ইহার সাহায্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে গান্ধীবাদকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিবার ও গ্রহণ করিবার দিন আগাইয়া আসিবে এইমাত্র। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের আবহাওয়ার মধ্যে যে-গীতা জন্মলাভ করিয়াছিল, সে-দিনে তাহার সাময়িক প্রয়োজন ছিল—অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা, নচেৎ সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়। আজ আমরা জানি, সেই সাময়িক প্রয়োজনের কত ঊর্দ্ধে গীতাবাদের স্থান! গীতা শুনিয়া যদি অর্জ্জুনের মোহভঙ্গ নাও হইত, এবং দুর্য্যোধনই যদি সেদিন বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করিত, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, জগতের ইতিহাসে গীতার কোন ক্ষতিই হইত না। এ কথা সেদিনের দুর্য্যোগে যুধিষ্ঠিরও বুঝিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু এতদিন পরে আমরা তাহা অবশ্যই বুঝি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার চেষ্টার মধ্যে প্রয়োজন হইলে সত্যের অপলাপ বা প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের তিলমাত্র স্থান আছে কি না—অর্থাৎ ইহার মধ্যেও diplomacyর প্রয়োজন অপরিহার্য্য কি না। নগণ্য রাজকোট-রাজ্যের স্থূলবুদ্ধি ক্ষুদ্র রাজা তাঁহার মুষ্টিমেয় প্রজাকে কথা দিয়া কথা না রাখায় যখন গান্ধীজী মরণপণ করিয়া অনশনব্রতী, ঠিক সেই সময় দেশহিতের জন্য ভারতবাসীর প্রতি গান্ধীজীর দেওয়া কথাকে চূর্ণ করিবার প্রাণপণ সঙ্ঘবদ্ধ আয়োজন কি গান্ধীবাদের সৌভাগ্য সূচনা করে? গান্ধীজীর সততা ও কুশলতার উপর আপনার ন্যায় অধিকাংশ ভারতবাসী, 'নিতান্তই নিশ্চিত ভরসা' রাখে। কিন্তু গান্ধীবাদের মধ্যে 'কুশলতাকে' দেশকালপাত্র বুঝিয়া সততার ঊর্দ্ধে স্থান দিবার অবকাশ আছে কি না, এই প্রশ্নই আজ গান্ধীজীর অনুরক্ত বহু অবিসংবাদী নিশ্চিন্তনির্ভর ভারতবাসীর মনে জাগিয়াছে। 'গান্ধীজীর কৃতি সম্বন্ধে কিছুই গোপন করিবার বা এড়াইয়া যাইবার নাই' ইহা গান্ধীবাদের একটি মূলসূত্র। কিন্তু তিনি আপনার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রতিরোধ করণের কোন হেতু দেখান নাই, সাধারণকে যখন জানাইবার প্রয়োজন বুঝিবেন তখন জানাইবেন; 'আর না জানাইলেও আমরা বুঝিব যে হেতু জানান নাই বটে, তবে কার্য্যকালে প্রতিরোধ করাই যোগ্য মনে করিয়াছেন।' প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই সুবিধাবাদী স্বরাজলোভী কংগ্রেস যে গান্ধীজীর উপর এইরূপ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার মেরুদণ্ডহীন ওকালতি চাপাইয়া দেয়, ত্রিপুরী তাহা আর একবার প্রমাণ করিল। ইহাতে স্বরাজ লাভের উপকার যদি হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও গান্ধীবাদ অগ্রসর হইল কি না, ইহাই প্রশ্ন। স্বরাজ-প্রাপ্তির পথ একাধিক থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য ভিন্ন ত গান্ধীবাদের দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। আর গান্ধীবাদই বোধ হয় প্রথম বলিয়াছে যে সত্য কেবল মাত্র পারমার্থিক ও পারত্রিক সিদ্ধির পথ নহে, মাত্র ব্যষ্টিজীবনের সাধ্যবস্তু নহে, সমষ্টিগত জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে, এমন কি রাষ্ট্রজীবনেও, মিথ্যার সহিত তিলমাত্র রফা না করিয়া সরল সত্যপথেই ঐহিক সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। আর সত্যের এই মূর্ত্তিই ভগবানের মূর্ত্তি, অতি সরল তাহার পরিচয়, যদিও কঠিন তাহার সাধনা। গান্ধীজীর অহিংসা বা খদ্দরের অর্থনীতি সম্পর্কে নানা কূট প্রশ্ন, বাদানুবাদ চলিতে পারে, কিন্তু সহজ সত্য ত সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ম্প্রভ, প্রদর্শিত হইবার জন্য সে অপর কোন আলোকের অপেক্ষা

রাখে না। তাহার তেজ আমরা সহ্য করিতে পারি না বলিয়াই তাহার দিকে চাহিয়া জীবনপথে চলিতে পারি না; পদে পদে মিথ্যার ছাতা আড়াল দিয়া তাহার সহিত রফা করিয়া চলি; নচেৎ সত্যকে দেখিতে পাই না বলিয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি, ইহা যথার্থ নহে। আমি যদি আপনাকে সাধারণ ভাবেও কথা দিই যে, কাল আপনার সহিত নিশ্চয় দেখা করিব, তাহার পর দেখাও করিলাম না, যাহাতে দেখা না হয় প্রকাশ্যে তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম এবং সে সম্বন্ধে কোন হেতু আপনাকে বা জানিবার অধিকারী অপর জিজ্ঞাসু কাহাকেও জানাইলাম না, ইহার অন্তরালে যত বড় মহৎ উদ্দেশ্যই থাকুক, ইহা যে-সিদ্ধিকেই বরণ করিয়া আনুক, সত্যকে ভঙ্গ করা, গোপন করা ও এড়াইয়া যাইবার অপবাদ যে আমাকে কলঙ্কিত করিল, এ সম্বন্ধেও কি অন্যমত থাকিতে পারে? বৃহৎ ব্যাপারে মহৎ লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ আচরণকেই diplomacy বলে। রহস্যের আবরণও এইখানে। সুতরাং আমার প্রশ্ন হইতেছে diplomacy বনাম গান্ধীবাদ। আমি ভাবিয়াছিলাম ব্যাপারটি যখন আপনার নিকট 'রহস্যাবৃত' বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে তখন আমার সংশয়ের সমাধান বাংলাদেশে বসিয়া আপনার নিকট পাইব, কারণ আপনার সাধনা ও প্রচার গান্ধীবাদের এইদিকটা বাঙ্গালীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। আপনার পত্রে সে উত্তর আমি পাই নাই, কিন্তু এখনও আশা করি, ইচ্ছা করিলে ইহার সদুত্তর আপনি যথাস্থান হইতে পাইতে পারেন, কারণ বাঙ্গালীর মধ্যে আপনি উদ্যমরহিত হইয়া এ প্রশ্ন তুলিবার ও তাহার উত্তর পাইবার অধিকারী।

আমার নমস্কার জানিবেন।

বিনীত
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

খাদি প্রতিষ্ঠান—সোদপুর—৭।৪।৩৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। ত্রিপুরীর পূর্ব্বে যে কথা পূর্ব্বতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ বলিয়াছিলেন, শেষে সে মত কার্য্য হয় নাই। কেন হয় নাই? কেন এক কথা বলিয়া অন্য মত কাজ পরে করা হইল? এই আপনার প্রশ্ন। আমার জবাব—আমিও জানি না—আমি বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা যে কথা বলিয়াছিলেন কার্য্যকালে ত্রিপুরীতে অন্য প্রকার অবস্থা ঘটিতে দেখিয়া তাঁহারা মত বদলাইয়াছেন। কেন বদলাইয়াছেন তাহা জানি না বলিয়া ইহাতে diplomacy অথবা কুমতলব আরোপ করিব না। তাঁহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছেন এ কথাও বলিব না। কেন না জানি না। তবে তাঁহাদের কার্য্য সাধারণতঃ সত্যসম্মত হয় বলিয়া এই বিশ্বাস রাখিব যে, তাঁহাদের নিকট উপযুক্ত হেতু ছিল। যদি পরে কখনো জানি যে তাঁহারা কুমতলব করিয়াছিলেন অথবা যাহা করিয়াছিলেন তাহাতে বস্তুতঃই সত্যভঙ্গ হয়, তবে তাঁহাদের কৃতি অন্যায় হইয়াছে বলিব। গান্ধীজীকে ইহার সহিত জড়াইব না। গান্ধীজী জানিতেও পারেন, নাও পারেন। তাঁহার মনে আপনারই মত সন্দেহ হইলে তিনি তাহা মিটাইয়া লইবেন। যদি দোষ দেখেন তবে মন্দ বলিবেন। যদি প্রকাশ্যে তাঁহাদিগকে শাসন করার মত গুরুতর অপরাধ পান তবে প্রকাশ্যে তাঁহার মত জানাইয়া দিবেন। তিনি অনেকবার তাঁহার সততার প্রমাণ আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব।

হয়ত ক্রমশঃ সমস্তই সাফ হইবে—তখন জানিতে পারিব, নয়ত খট্‌কাই থাকিয়া যাইবে যে, বুঝিতে পারি নাই। বিপরীত কিছু প্রমাণ না পাইলে অনুমান দ্বারা যদি তাঁহাদিগকে মনে মনে দোষী করি তবে নিজেই দোষ করিব। সত্যাগ্রহীর অকারণ সন্দেহ করিতে নাই।

কংগ্রেসের গুরু ব্যাপারে অনেক কিছু হয়, যাহা আমাদের মত সাধারণের জানার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদিগকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি করিয়া লইয়াছি, তাঁহাদের বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার উপর বিশ্বাস রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। যদি কার্য্যগতিকে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস না করিতে পারি, তবে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসভাজন বলিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা যথাস্থানে থাকিলে বলিব "জনমতের বল তাঁহাদিগের পক্ষে—আমি একলা তাঁহাদের উপর বিশ্বাস হারাইলে কি হইবে? তখনও তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিত সংস্থার আদেশ মানিব।"

ইহাই আমার কথা। আমি ইহাতে তৃপ্তিবোধ করি,

অসন্তুষ্ট হই না এবং সত্য হইতেও পতিত হই না বলিয়া মনে করি। যদি আমার এই মনোভাবও আপনার নিকট দুর্বোধ বা অসন্তোষজনক হয় তবে সাক্ষাৎ করিবেন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আপনাকে বুঝাইতে পারিলে সুখী হইব।

বিনীত আপনার
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ৭।৪ তারিখের পত্র পাইলাম। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মূল প্রশ্নকে আপনি স্বীকার করিলেন না। "ত্রিপুরীর পূর্ব্বে দেওয়া কথা কেন রক্ষিত হইল না," ইহা আমার প্রশ্ন নহে। আমার প্রশ্ন ছিল, আপনি গান্ধীবাদকে যে ভাবে বুঝেন তাহাতে, যে কারণেই হউক, দেওয়া কথা রক্ষিত না হইলে সত্যের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষিত হয় কি না, যে অখণ্ডিত, অকুণ্ঠিত, সত্য গান্ধীবাদের একমাত্র আশ্রয়। বলা বাহুল্য 'জানি না' 'বুঝি না' ইহা আপনার যোগ্য উত্তর নহে। আপনার মনেও অনুরূপ জিজ্ঞাসা উঠিয়াছিল, কিন্তু গান্ধীজীর নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া আপনি দেশ-হিতের জন্য স্থির করিয়াছেন, এ প্রশ্ন কাহারও নিকট, এমন কি নিজের নিকটও, আর উত্থাপিত করিবেন না, সাধারণ সত্যাগ্রহীর ন্যায় কাজ করিয়া যাইবেন। যদি ঘটনাক্রমে জানিতে পারেন ভালই, নচেৎ খটকা রহিয়াই যাইবে, তথাপি বিশ্বাস রাখিবেন যে, ও-পক্ষে কোথাও কোন গোলমাল থাকিতে পারে না।

দীর্ঘদিনের সাধনায় আপনি ওরূপ শান্ত ও সংযত মনোভাবের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু আপনার ন্যায় গান্ধীবাদের একজন অন্তরঙ্গ বাঙ্গালী যখন আমার প্রশ্নটাকেই স্বীকার করিলেন না, তখন সাধারণ বাঙ্গালীর মনে করিতে বোধ হয় বাধা নাই যে, আমার প্রশ্নকে স্বীকার করিবার মধ্যেই তাহার উত্তর নিহিত রহিয়াছে, যে-উত্তর গান্ধীবাদের একান্ত প্রতিকূল। সে উত্তর সম্ভবতঃ এই :—

গুরুতর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অনুচরগণ দেওয়া কথা না রাখিয়া সত্যভঙ্গ করিয়াছেন এবং গান্ধীজীও তাহাতে জড়িত হইয়াছেন। সুতরাং স্বরাজের জালে আজ গান্ধীবাদ বিপন্ন, যে জাতীয় বিপদে স্বয়ং শ্রীভগবানের চক্রে দ্রোণবধের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বিপন্ন হইয়াছিলেন।

আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলে কি আমার প্রশ্নের পূর্ব্বোক্ত রূপ উত্তরের ভুল বুঝিতে পারিব ?

যাহা হউক এখনও ভরসা রাখি, গান্ধীজী সমস্ত অসত্যের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সকলকে অবিলম্বে জানাইবেন—কি সে কারণ যাহাতে তাঁহার পক্ষ হইতেও এমন সত্যচ্যুতি অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদি জানান, আমরা তাঁহারই দেওয়া কষ্টিপাথরে তাঁহার উক্তি যাচাই করিয়া দেখিব। যদি না জানান, কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখিব না যে, তিনি না জানানো উচিত বলিয়াই জানান নাই। কারণ যাহাকে সত্যভঙ্গ বলিয়া বহু সত্যানুরাগী লোক মনে করিতেছে, গান্ধীবাদের মধ্যে তাহার কারণ গোপন করিবার কোন স্থান নাই ; আর গান্ধীবাদ গুরুবাদ নহে।

বিনীত
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সোদপুর, ১।৪।৩৯।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার বিচারে গান্ধী সত্যত্যাগ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছি। আপনার এ জন্য কষ্ট হইয়াছে। হইবার কথা। আমি যাহা জানি না—আপনি বুঝিয়াছেন যে, তাহা আপনিও জানেন এবং আমিও জানি। আমি যে জানি না বলিতেছি তাহার কারণও আপনি বুঝিয়াছেন—গান্ধীজীকে বাঁচান। কাজেই আপনার বিচারে গান্ধীজীর জাত গিয়াছে, আমারও গিয়াছে। আমার জাতটা থাকিত যদি আপনার কথায় সায় দিতাম। যে সত্যাগ্রহী সে আপনার মত যুক্তি করে না। গান্ধীজীকে নানা বিষয়ে সত্যত্যাগী বলা হইতেছে। কয়েকটীর জবাব দিয়াছেন—কেন মিঃ গ্রায়ারের বিচার স্বীকার করেন, কেন লাটের সাথে দেখা করিয়াছেন। উত্তর না দিলেও সত্যত্যাগ করা হইত না। উত্তর দেওয়া না দেওয়ার উপর সত্যরক্ষা বা ভঙ্গ করা নির্ভর করে না।

গুরুবাদের উল্লেখ কেন করিলেন ? আমাকে আঘাত করার জন্য ? গান্ধীবাদ মানে যদি ধর্মজীবনের পথ বুঝিয়া থাকেন তাহাতে গুরুবাদের বিরোধ ত নাই। গুরুবাদী কি গুরুর চুরি গোপন করে নাকি ? যাহাকে অসত্যাচারী মনে করা যায় সে ত আর গুরুই থাকিতে পারে না।

গুরুবাদ হিন্দুধর্মের একটা বড় জিনিষ। উহা কি তাহা যদি বুঝিতে চান বিবেকানন্দকে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। রামকৃষ্ণকে গুরু করিয়াই স্বামীজী যাহা, তাহা হইতে পারিয়াছিলেন। নিজেদের ধর্মের একটা বড় আশ্রয় লইয়া খেলা করায় ভাল নাই। অবশ্য আপনাকে বলিব, গান্ধীজী আমার গুরু নহেন, পূজ্য বটেন।

তাঁহাকে বাঁচাইবার কাজ আমার নয়। তিনি ডুবিলে অর্থাৎ সত্যত্যাগ করিলে আমি তাঁহাকে বাঁচাইব এমন অভিমান আমার নাই। আচ্ছা, দেখা করার কথা—যদি আপনি মনে করেন যে দেখা করায় লাভ হইবে তবে অবশ্য দেখা করিবেন।

আপনাদের
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

কলিকাতা, ১৫ই এপ্রিল, ৩৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। গুরুবাদের উল্লেখ আপনাকে আঘাত করিবার জন্য করি নাই। কোন বিচারযোগ্য কথা নির্বিচারে মানিয়া লওয়া একান্ত অসঙ্গত, ইহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল। এখন বুঝিতেছি, অতবড় ব্যাপক কথা ব্যবহার করা আমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আপনি যদি আঘাত পাইয়া থাকেন, মার্জ্জনা করিবেন।

কিন্তু আসল ব্যাপারে আপনি আঘাত পাইয়াছেন ইহা খুবই সম্ভব। কারণে হউক, অকারণে হউক, আঘাত প্রত্যাঘাতের যুগ চলিয়াছে। অন্ততঃ বাংলাদেশে ব্যথার পরিচয় আজ ঘরে ঘরে। আমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম এবং যে উত্তর দিয়াছি তাহার কোনটিই আমার নহে। দলাদলির গণ্ডীমুক্ত বহু সহৃদয় বাঙ্গালীর মনেও যে প্রশ্নোত্তর চলিতেছে আমি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলাম। বাংলা দেশে একপক্ষের কথাই চলিতেছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, আপনি 'রাষ্ট্রবাণী'তে এবিষয় আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেন, ইহার অপর দিক্ আছে। আপনি আমার কথায় সায় দেন ইহা আমি মোটেই চাহি নাই। বরঞ্চ আমি ভিতরে ভিতরে আশা পোষণ করিতেছিলাম যে, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন যে, গান্ধীজী বা প্যাটেলদলের বিবৃতিতে সে-জাতীয় সত্য ছিল না যাহা রাজনীতি এবং গান্ধীবাদের দিক্ হইতে অবশ্যরক্ষণীয়। আমার প্রশ্নটিকে এ ভাবে গ্রহণ করিলে তাহার উত্তরে এমন তথ্য ও যুক্তি আপনি অবশ্যই দিতেন, যাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এরূপ ঘটিলেই তৃপ্তি পাইলাম। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া, তর্ক করিয়া, যখন কোন উত্তর বা যুক্তি আপনার নিকট হইতে পাইলাম না, তখন অপর পক্ষীয় হীন সিদ্ধান্ত আমার চিত্তের বিশ্বাসকে পরিহাস করিতে লাগিল। আমার পূর্ব্ব পত্র সেই ক্ষুব্ধচিত্তের প্রকাশ, সুতরাং তাহা আপনাকেও আঘাত করিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক।

বিবৃতির সত্যরক্ষা গান্ধীবাদের সত্যরক্ষার পর্যায়ে পড়ে কি না, সে সম্বন্ধে আপনি যখন স্পষ্ট মতামত দিতে চাহেন না বুঝিলাম, তখন গান্ধীজীই এ কথা অচিরে বুঝাইয়া দিবেন এই আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেছি, ইহাও জানাইয়াছি। তিনিও যদি না বুঝাইয়া দেন, তবে প্রকৃত সত্যাগ্রহীদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না ইহা একপ্রকার বুঝিয়াছি; কিন্তু আমাদের ন্যায় বহু বহু নির্ব্বোধ শুভাকাঙ্ক্ষীদের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না এবং আপনাদের পথও হয়ত অপ্রয়োজনে বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে অধিকতর দুর্গম হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্ব পত্রে আপনি লিখিয়াছিলেন, 'সময়ে হয়ত সমস্তই সাফ হইয়া যাইবে'। সেই আশাই করিতে থাকিব।

আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

বিনীত
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পোঃ মুন্সীরহাট (খাদি-কেন্দ্র)
নোয়াখালী, ১লা জুলাই।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনি পত্রগুলি প্রকাশ করিতে পারেন। কোন্ পত্রিকায় দিলেন এবং প্রকাশ হইলে জানাইবেন। বাংলার পরিস্থিতি কিরূপ দেখিতেছেন? কোনও দিন সোদপুর আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ আলোচনা করিয়া সুখী হইব। এক্ষণে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছি। রাজনীতিতে খাদির স্থান কোথায় তাহা বুঝাইবার প্রয়াস করিতে হয় না, যদি কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া খাদি-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। যাহা সব চাইতে সহজ তাহা বুঝান সব চাইতে কঠিন, এমনই দিন হইয়া পড়িয়াছে। নমস্কার জানিবেন।

আপনাদের
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

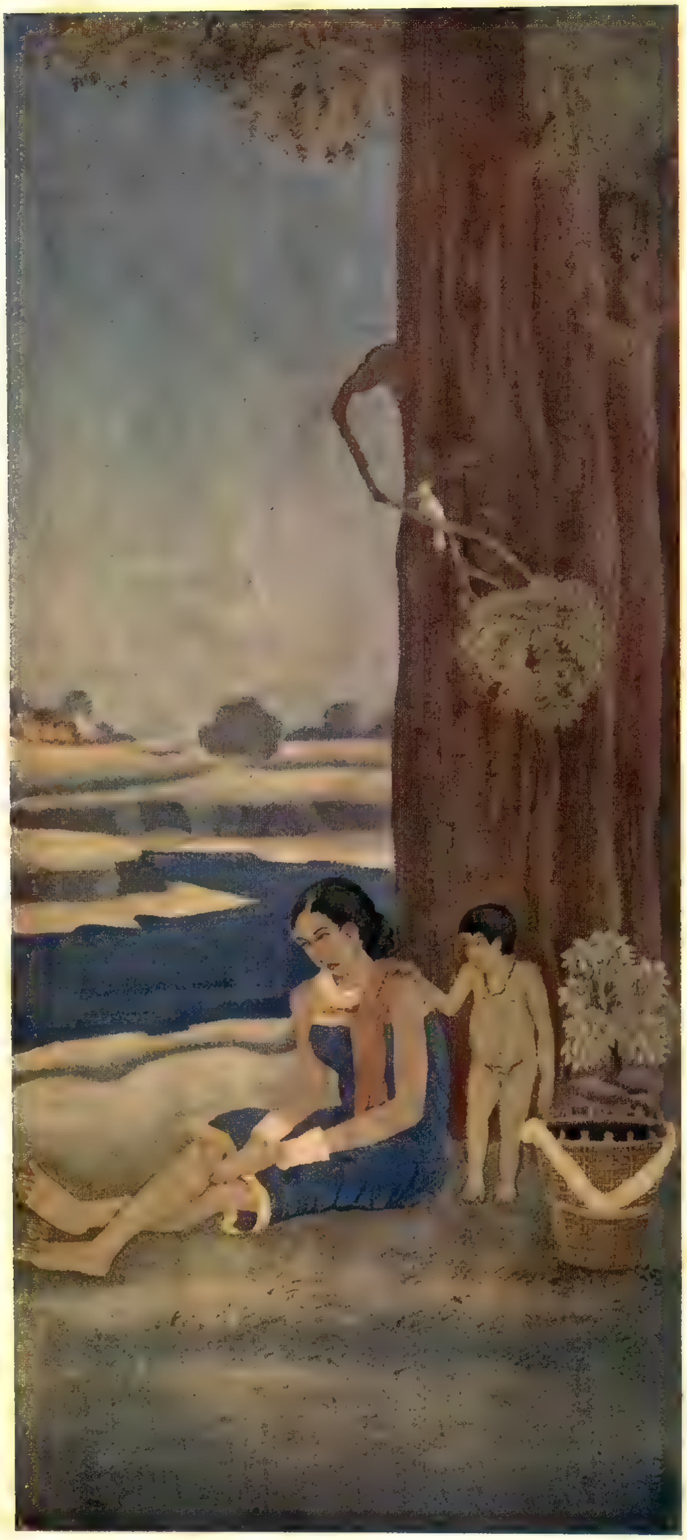

নিরুপায় [শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

আপনার মোটর গাড়ীর জন্য যদি
আপনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট টায়ার
ব্যবহার করিতে চান, তবে
অতঃপর সুবিখ্যাত
কণ্টিনেণ্টাল টায়ারই
ক্রয় করিবেন।

Continental

এজেণ্টস্—ভলকার্ট ব্রাদার্স

গ্যালভ্যানাইসড সীট

ঝকঝকে পাতটিন

শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাসগৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র হাজার হাজার টন ব্যবহৃত হইতেছে এবং নিয়তই উহার চাহিদা রহিয়াছে।

টাটার ঝকঝকে পাতটিন

দুর্ব্বিসহ শীত ও প্রবল বর্ষায় আমাদের আশ্রয় দান করে।

ভারতের সর্ব্বত্র টাটা কোম্পানীর টিনের সরবরাহকারী রহিয়াছে।

TATA

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান।

A NOTE OF APPRECIATION

This is what the beautiful Bowrani of Santosh writes of Oatine products

I feel that Oatine Cream and Snow have become indispensable as part and parcel of my daily toilet.

Beenita Raychowdhury
Bowrani of Santosh

OATINE CREAM the Vitalising skin food and Oatine Snow the all-day-lasting protective vanishing Cream are worthy of the most exclusive - commendation.

We feel the prouder of this appreciation by one of the leading ladies in Bengal Society as it is entirely voluntary and unsolicited.

OATINE CREAM

For regular nightly massage

OATINE SNOW

For all-day lasting protection

THESE TWO ARE ALL YOU NEED FOR BEAUTY,

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

ভাদ্র—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথের "কনগ্রেস"

গত আষাঢ় সংখ্যার "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "কন্‌গ্রেস্" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ চিঠির আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রবাবু এমন অনেক ইতিহাস, তথ্য, মতবাদ ও বিভিন্ন নৈতিক (অর্থাৎ রাষ্ট্র-নৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি) উপদেশের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা প্রচলিত সাধারণ ধারণার অনুরূপ। আমাদের ধারণা প্রচলিত সাধারণ ধারণার বিরোধী। আমাদিগের বিশ্বাস, বর্ত্তমান ভাবুক সমাজ সত্যের নামে প্রায়শঃ কতকগুলি অসত্য ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজেরা চলিতেছেন এবং অপরাপর সাধারণ মানুষগুলিকে চলিবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহারই ফলে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের, তথা ভারতবর্ষের সমস্যাগুলির সাধারণ স্বভাব, কারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কাহারও লক্ষ্যে আসিতেছে না এবং ঐ সমস্যাগুলি ক্রমশঃই জটিলাকার হইতে অধিকতর জটিলাকার ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রই সর্ব্বনাশের লীলা ভীষণাকারে সাধন করিতেছে। প্রচলিত সাধারণ ধারণাগুলি কোথায় কোথায় সত্যের নামে অসত্যাকার ধারণ করিয়াছে, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য সমাজের ভাবুকগণের পক্ষে নিখুঁৎভাবে ধরিয়া উঠা সম্ভব না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা সম্ভব হইবে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। ঐ ভ্রান্তিগুলি যাহাতে ভাবুকগণের নজরে পড়ে এবং তাঁহারা যাহাতে নিজেদের ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া সমাজকে অভ্রান্ত-ভাবে পরিচালিত করিতে উদ্যোগী হন, সমাজের দরিদ্র শ্রেণী-গুলি যাহাতে দুই বেলা দুই মুঠা প্রাণ ভরিয়া খাইতে পারে, যুবকগণ উপদেশানুরূপ ব্রতবিদ্ধ হইয়াও যাহাতে জীবন-ধারণে বিফলমনোরথ হইয়া আত্ম-হত্যায় প্রবৃত্ত না হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুরূপ সহায়তা করাই আমাদিগের সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই রবীন্দ্র বাবুর "কন্‌গ্রেস্"-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা করা আমাদিগের এই সন্দর্ভের প্রধান অভিপ্রায়।

রবীন্দ্রবাবুর কোন রচনা সমালোচনা করিতে বসিলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার লিখনভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালীর দিকে নজর পড়ে। রবীন্দ্রবাবু আজ বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিচিত। আমাদিগের মতে রবীন্দ্রবাবুর লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী বাঙ্গালীগণের সর্ব্বনাশের অন্যতম প্রধান কারণ। এতদ্বিষয়ক সমস্ত কথা বিস্তৃতভাবে খুলিয়া লিখিতে

হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে। তাহাতে সন্দর্ভের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। তাহা এই সন্দর্ভে সম্ভবযোগ্য নহে।

রবীন্দ্রবাবুর লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালীকে কেন নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং কেনই বা উহাদিগকে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমরা এই প্রসঙ্গে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কোন্ লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী সঠিক এবং কি হইলে উহা "অঠিক" অথবা "বেঠিক" হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে হইলে, মানুষ কেন যে বলিতে ও লিখিতে পারে এবং কেনই বা তাহার বলিবার ও লিখিবার প্রণালী একাধিক হইয়া থাকে, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষ যে বলিতে ও লিখিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ, মানুষের অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর কার্য্য। অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর কার্য্যের জন্যই প্রধানতঃ মানুষের ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। রস, তেজ ও বায়ুজনিত আদিম ক্রিয়া ক্রমশঃ কখনও মন-আকারে, কখনও বুদ্ধি-আকারে, কখনও শব্দাকারে, কখনও স্পর্শাকারে, কখনও রূপাকারে, কখনও রসাকারে, কখনও গন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অন্তরস্থিত এই রস, তেজ ও বায়ুর জন্যই মানুষ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে কোন না কোন ক্রিয়ার দাসানুদাস হয় এবং সে কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। বাক্যপদীয়ের প্রথম কাণ্ডের—

"অন্তর্ভাবনিবাপন্নো যঃ ক্রতুঃ শব্দসংজ্ঞকঃ।
বৃত্তিস্তস্য ক্রিয়ারূপা ভাগশো ভজতে ক্রমম্॥"

এই শ্লোকটী এবং গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

এই শ্লোকটির মর্ম্ম যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে, আমাদিগের উপরোক্ত কথা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য, তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। উপরোক্ত দুইটি শ্লোকের মর্ম্ম যে কি, তৎসম্বন্ধে আমরা এখানে কোন আলোচনা করিব না, কারণ— উহাদিগের যথাযথ মর্ম্ম সকলের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। যাঁহারা সংস্কৃতভাষা প্রকৃতভাবে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা উহাদিগের মর্ম্ম অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। আর, যাঁহারা উহা পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহারা আমাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে আমরা তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিব।

মোটের উপর, কোন্ লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী সঠিক এবং কি হইলে উহা "অঠিক" অথবা "বেঠিক" হয় তাহা বুঝিতে হইলে, মানুষের অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর কার্য্যই যে মানুষকে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে ক্রিয়াবান্ অথবা শব্দবান্ করিয়া থাকে, ইহা সতত স্মরণপথে জাগ্রত করিয়া রাখিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষায় মানুষের এই আদিম ক্রিয়া "ধাতুর প্রকৃতি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শিশুগণ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত শব্দ করিয়া থাকে, তাহা শৃঙ্খলিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের এই আদিম "ক্রিয়া" অথবা তাহার ধাতু-প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়। শিশুগণ তিন চার বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত শব্দ করে, তাহা কি করিয়া শৃঙ্খলিত ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহার পন্থা দেখান হইয়াছে ঋগ্বেদে এবং বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে। ইহা ছাড়া "প্রাকৃত ব্যাকরণে" ঋষি-প্রণীত যে সমস্ত সূত্র আছে তাহার মধ্যেও উহার কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ঋক্‌বেদে ও অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে উপরোক্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে।

মানুষের আদিম ক্রিয়া অথবা ধাতু-প্রকৃতি অথবা ধাতু-প্রকাশক শব্দের উৎপত্তির মূল কারণ একমাত্র মানুষের অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর কার্য্য বটে, কিন্তু শব্দের বৃদ্ধির কারণ দুইটী। অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ু যেমন মানুষের শব্দের উৎপত্তি সংঘটিত করিয়া থাকে সেইরূপ আবার ঐ অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ু উহা বৃদ্ধিও করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ুও মানুষের শব্দবৃদ্ধির কারণ হয়। বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ু মানুষের শব্দ-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ুর অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর পরিবর্ত্তন সংঘটিত না করিয়া মানুষের শব্দ-শক্তির পরিবর্ত্তন অথবা পরিবর্দ্ধন করিতে কখনও সক্ষম হয় না। কাজেই, মানুষের শব্দ শক্তির পরিবর্ত্তনের মূল কারণ যেমন দুইটী বলা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার উহাকে একটী বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

মানুষের মূল শব্দ থাকে ক্রিয়ার্থক কিন্তু উহা উপরোক্ত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া যুগপৎ "গুণার্থক" ও "নামার্থক" হইয়া থাকে।

ক্রিয়ার্থক, গুণার্থক ও নামার্থক এই ত্রিবিধ শব্দের উৎপত্তি হইবার পর মানুষের বাক্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর মিলন যে কত অসংখ্য ভাবে মানুষের শব্দ শক্তির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকে তাহা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের বাক্যের সহিত ঐ অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ুর মিলনের সম্বন্ধ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে এবং ঐ "সম্বন্ধ" সর্ব্বদা কতকগুলি নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যে অবস্থায় এবং যে যে কালে যে যে নিয়মে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ুর মিলন এবং বিভিন্ন বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে সেই সেই নিয়মের ব্যভিচার কখনও সংঘটিত হয় না। কোন্ কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ কোন্ কালে, কোন্ কোন্ নিয়মে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ুর কিরূপ কিরূপ মিলন এবং তদনুসারে কিরূপ কিরূপ বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে সেই সেই নিয়ম লইয়াই ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র। অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ুর বিভিন্ন মিলনের বিভিন্ন রূপের নাম শব্দের বিভিন্ন "বৃত্তি", বিভিন্ন "ছন্দ" ও বিভিন্ন "সুর"। কোন্ কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ কোন্ কালে, কোন্ কোন্ নিয়মে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ এবং বায়ু কিরূপ কিরূপ আকারে মিলিত হইয়া থাকে এবং তদনুসারে মানুষের কিরূপ কিরূপ বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে তিনটী বেদে। "সাধনা"-নিরত না হইলে অর্থাৎ "মূল সত্তা" ও তাহার "প্রকাশ" কিরূপ ভাবে সংঘটিত হইতেছে তাহা নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সম্যক্ ভাবে অবহিত না হইলে বেদের ঐ আলোচনা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ঐরূপ ভাবে অবহিত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই ঐ বিষয়ক মোটা কথাগুলি অন্ততঃ পক্ষে যাহাতে মোটাভাবে সাধারণের বোধগম্য হয় তাহার জন্য ঋষিগণ ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। যে যে অবস্থায় এবং যে যে কালে, যে যে নিয়মে অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ু যেরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ ভাবের শব্দের উৎপত্তি করিয়া থাকে সেই সেই নিয়ম লইয়া ব্যাকরণের ধাতুর "তিঙন্ত" প্রকরণ রচিত হইয়াছে। তিঙন্ত প্রকরণের সূত্রগুলি যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে তিঙন্ত শব্দগুলির দ্বারা অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর কোন্ কোন্ রকমের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের কথা অভিব্যক্ত হইতেছে তাহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অন্যথা উহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না এবং তখন তিঙন্ত শব্দমূলক বাক্যগুলির নির্ভুল অর্থও সম্যক্ ভাবে উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া থাকে।

যে যে অবস্থায় এবং যে যে কালে, অন্তর ও বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ু যে যে নিয়মে মিলিত হইতেছে এবং ঐ মিলনের ফলে যে যে নিয়মে শব্দের ও বাক্যের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতেছে, সেই সেই নিয়ম লইয়া ব্যাকরণের কারক, সমাস, তদ্ধিত, কৃদন্ত, নাম ও সন্ধি-প্রকরণ রচিত হইয়াছে মূলতঃ তিঙন্ত-প্রকরণের সূত্রগুলি বুঝিয়া লইয়া এই ছয়টি প্রকরণের বিভিন্ন সূত্রগুলি যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে, যে কোন শব্দ ও বাক্যে, কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ কালে অন্তরস্থিত অথবা বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর কোন্ শ্রেণীর কার্য্যের কথা অথবা কোন্ শ্রেণীর পরিণতির কথা বলা হইতেছে তাহা আমূল ভাবে যথাযথ রূপে বুঝা সম্ভব হইয়া থাকে। অন্যথা কোন শব্দ অথবা কোন বাক্যেরই আমূল মর্ম্ম কখনও যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

শব্দ ও বাক্যের উপরোক্ত বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যমূলক চরিত্রের তারতম্যানুসারে লিখনভঙ্গী ও বর্ণ বিন্যাস-প্রণালীর পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালীর পার্থক্য মূলতঃ দ্বিবিধ; যথা প্রকৃতি মূলক ও বিকৃতিমূলক। প্রকৃতিমূলক লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ বিন্যাস-প্রণালী সর্ব্বদাই একরকমের হইয়া থাকে। এই লিখনভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে সর্ব্বদাই ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণ ছন্দ ও কল্পের নিয়মগুলি অটুটভাবে সুরক্ষিত হইয়া থাকে প্রকৃতিমূলক লিখন-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে কখনও যথেচ্ছাচার প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কারণ তাহাতে সর্ব্বদাই অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ, ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলন-প্রণালী সন্নিবিষ্ট থাকিয়া যায় এবং ঐ মিলন

প্রণালী কখনও এক্যাবস্থায় একাধিক নহে। অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলন-প্রণালী সন্নিবেশ থাকা নিবন্ধন, বাক্যের অথবা শব্দের কোন্ অবস্থায় হ্রস্বের আশ্রয় লইতে হইবে, কোন্ অবস্থায় দীর্ঘের আশ্রয় লইতে হইবে, কোন্ অবস্থায় কোন্ মাত্রার আশ্রয় লইতে হইবে, কোন্ বাক্যে অথবা কোন্ শব্দে কয়টী বর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে, কোথায় কোন্ অঙ্গের স্পর্শমূলক বর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে সর্ব্বদাই এবংবিধ নিয়মাবদ্ধ থাকিতে হয়। এবংবিধ নিয়মাবদ্ধতার ফলে, প্রকৃতিমূলক লিখন-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে যে সমস্ত পদ ও বাক্য রচিত হয় তাহা কখনও একাধিক অর্থযুক্ত হয় না এবং তদনুসারে উহা কখনও জটিলতার নিদান হইতে পারে না। যাহা আপাত ভাবে অব্যক্ত তাহাও এবংবিধ লিখন-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়। এবংবিধ নিয়মাবদ্ধ লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাসের অন্যতম সুফল এই যে, উহা পাঠ করিলে কখনও কাম-ক্রোধাদির উদ্ভব হইতে পারে না, কারণ উহাতে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলন-প্রণালীর নিয়ম সংরক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহার ফলে ঐ রস, তেজ ও বায়ু কখনও উগ্রতা অবলম্বন করিতে পারে না, পরন্তু সমতা পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

বিকৃতিমূলক লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কখনও এক রকমের হইতে পারে না। উহা বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস সাধারণতঃ কোন নিয়মাধীন থাকিতে চাহে না এবং উহার আচার সর্ব্বদাই যথেচ্ছ হইয়া থাকে। ইহার ফলে, উহা সর্ব্বদাই জটিলাকার ধারণ করে এবং উহার যথাযথ অর্থোদ্ধার করা কখনও সম্ভব হয় না। লেখকগণ ও পাঠকগণ অবস্থানুসারে সুবিধাবাদীর মত বিকৃতিমূলক লেখার যে কোন অর্থ সন্নিবেশ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। কাযেই, এতাদৃশ লেখা সর্ব্বদাই ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু, ইহা পাঠ করিলে কাম-ক্রোধাদির উদ্রেক হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, কারণ উহার ফলে অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ু কখনও সমতা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। কাযেই, এতাদৃশ লেখা যে সমাজে আদর পাইয়া থাকে, সেই সমাজের অবনতি ও ধ্বংস যে অনিবার্য্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রবাবুর লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী যে শব্দ-বিষয়ক কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ, ছন্দ অথবা কল্পের নিয়মাধীন নহে এবং তদনুসারে উহা যে বিকৃতিমূলক তাহা বলাই বাহুল্য।

উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রবাবুর দুই-একটী বাক্য ও বর্ণ-বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলে আমাদিগের কথা অপেক্ষাকৃত সুপরিস্ফুট হইবে।

"কঙ্‌গ্রেস" নামক শব্দটীকে রবীন্দ্রবাবু নাম দিয়াছেন "কন্‌গ্রেস্"। অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলনের নিয়মানুসারে শব্দের কোন্ অবস্থায় "ঙ্"তে ও "দন্ত্য ন্"তে যে দুইটী ধ্বনি আছে সেই দুইটী ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা জানা থাকিলে অথবা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "ক্"এর ধ্বনির সহিত "ন্"-কারের ধ্বনি মিলিত হইলে কথঞ্চিৎ বহির্মুখীনতা অথবা উগ্রতার উৎপত্তি হয় এবং তখন আর "ক"-বর্গের প্রথম-"ঘোষ" বর্ণ "গ"এর ধ্বনি আসিতে পারে না। "ন্"-কারের ধ্বনির সহিত "গ"এর ধ্বনি মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত ধ্বনিতে প্রাকৃতিকতা নষ্ট হইয়া বিকৃতি স্থান লাভ করে এবং বুঝিতে হয় যে, এবংবিধ ধ্বনির কর্ত্তা "কাম" "মোহ" ও "মদ" রিপুর পরবশ। অন্যপক্ষে, "ক"এর ধ্বনির পরবর্ত্তী "ঙ"র সহিত "গ"-এর ধ্বনি মিশ্রিত করিলে শব্দের প্রাকৃতিকতা বজায় থাকে এবং তখন আর অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর মিলন অনায়াসে অসমতা লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা স্বকীয় জিহ্বার ক্লিষ্টতা ও স্নিগ্ধতা অনায়াসে অনুভব করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, কয়েক শতবার "কঙ্‌গ্রেস্" এই এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে, জিহ্বার স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর "কন্‌গ্রেস্" শব্দটী উচ্চারণ করিলে, জিহ্বার ক্লিষ্টতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শব্দ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাকরণের এতদ্বিষয়ক সূত্রগুলি জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, "কঙ্‌গ্রেস্" এই শব্দটী ব্যাকরণের নিয়মসঙ্গত এবং কন্‌গ্রেস্ এই শব্দটী ব্যাকরণের নিয়মবিরুদ্ধ।

আজ বিবিধ বিদ্যা এবংবিধ রাহুগণের কবলগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়াই মানুষ "বিদ্যা" অর্জ্জন করিয়াও চরিত্রভ্রষ্ট, পরমুখাপেক্ষী, নফর, ভিখারী ও অন্নহীন হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা কখনও কোন কার্য্যের

হয় চাঁদা সংগ্রহ করিতে অথবা বেতনযুক্ত চাকুরী গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নিঃসঙ্কোচ হইতে পারেন না.. বস্তুতপক্ষে বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার নামে যত কিছু "অবিদ্যা" তাহাই অর্জ্জিত হইতেছে। প্রকৃত বিদ্যা অধুনা মনুষ্য সমাজের সর্ব্বত্রই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার উপরোক্ত "কনগ্রেস্" নামক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—"কিছুকাল আগেই দেশের মন ছিল মরুময়।"

"দেশ" ও "মন" বলিতে কি বুঝায় তাহার সম্যক্ ধারণা (conception) যথাযথ ভাবে অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "দেশে"র প্রাণ পর্য্যন্ত উদ্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের কখনও "মনে"র উদ্ভব হইতে পারে না এবং তদনুসারে দেশের কখনও "মন" থাকিতে পারে না। দেশের মনের কথা বলিতে যাওয়া আর সোনার পাথরের বাটীর কথা বলিতে যাওয়া একই কথা। "মরুময়" ও "মন" এই পদ দুইটীতে কি কি বুঝায় তাহা সম্যক্ ভাবে ধারণা (conception) করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে "দেশ মরুময়" হইতে পারে, "মানুষ মরুময়" হইতে পারে, কিন্তু "ইন্দ্রিয়" অথবা "মন" অথবা "বুদ্ধি" কখনও মরুময় হইতে পারে না। "কিছুকাল আগেই দেশের মন ছিল মরুময়" এবংবিধ বাক্য সম্পূর্ণ ভাবে ভাবাবিজ্ঞান-বিষয়ক উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক। ইহা কাহারও কাহারও কর্ণে শ্রুতিমধুর হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু এবংবিধ বাক্যের অর্থ ধারণা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, অনতিবিলম্বে অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ু অসমতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং "মন" অস্থির হইয়া পড়িতেছে। কাযেই এবংবিধ উচ্ছৃঙ্খল বাক্যের প্রণেতাকে কখনও সমাজের হিতকারী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আধুনিক সুধীসমাজ প্রায়শঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই এবংবিধ বাক্যের প্রণেতাও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন।

ইহার পরই রবীন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—"দিগন্তব্যাপী অনুর্ব্বরতা তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের সম্বন্ধ অবরুদ্ধ করে বহুযুগকে দরিদ্র করে রেখেছিল।"

পাঠকগণ উপরোক্ত বাক্যটীর অর্থ যে কি, তাহা আপনাদিগের কেহ সঠিক ভাবে বুঝিতে পারেন কি? ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণ ও "নিরুক্তে"র জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ বাক্য কতকগুলি শব্দের উচ্ছৃঙ্খল সন্নিবেশ মাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে একাধিক অর্থযুক্ত। কোন্ অর্থে যে লেখক উপরোক্ত বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। এবংবিধ লেখা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন বাক্যকে অযথা ক্লেশ-গম্য করাই লেখকের নিপুণতার পরিচায়ক। "দিগন্তব্যাপী অনুর্ব্বরতা"র পরবর্ত্তী "তার" এই পদটী এতাদৃশ নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, উহা যেমন "অনুর্ব্বরতা"র সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও হইতে পারে, সেইরূপ আবার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের "দেশ" এই পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টও হইতে পারে।

"অনুর্ব্বরতা" এই শব্দটীর বিন্যাসে একটী মস্ত "ব"-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা যেমন অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলন-বিষয়ক নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা-জ্ঞাপক, সেইরূপ আবার উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক। "র্" ও "ব্" এই দুইটী বর্ণের ধ্বনিতে যে অর্থ সূচিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "র্" এই ধ্বনির দ্বারা "বৈশ্বানী"র মধ্যে উগ্রতার লেশহীন "তেজ"কে এবং "ব্" এই ধ্বনির দ্বারা উগ্রতার লেশহীন "রস"কে স্পর্শ করা হইয়া থাকে।

উগ্রতার লেশহীন "তেজ"কে অর্থাৎ "র্" এই বর্ণটীর ধ্বনিকে স্পর্শ করিয়া পরক্ষণেই উগ্রতার লেশহীন "রস"কে কথঞ্চিৎ উগ্র না করিয়া অর্থাৎ "ব্" এই বর্ণটির ধ্বনিকে দ্বিগুণিত না করিয়া স্পর্শ করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, অন্তরস্থিত রস, তেজ ও বায়ু অসমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অনতিবিলম্বেই জিহ্বায় অসাড়তার সূচনা অনুভব করা যায়। এই জন্যই ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "র্" ও "ব্" এই দুইটী বর্ণের মিলন সাধন করিতে হইলে সর্ব্বদাই "ব্" এই বর্ণটীকে দ্বিগুণিত করিয়া লইতে হয়। তাহার অন্যথা করিলে একদিকে যেরূপ শব্দ-বিজ্ঞান-সম্মত পদ-গঠন বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়, অন্যদিকে আবার বিদ্যার্থী বালকগণকে অধিকতর চঞ্চল ও অসার করিয়া তুলিবার পথ সুগম করা হয়।

রবীন্দ্র বাবু তাঁহার লেখায় যে-সমস্ত পদ ও বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা উপরোক্ত ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার অধিকাংশই উপরোক্ত শ্রেণীর অজ্ঞতা

ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক এবং বিদ্যার্থী বালকগণের যুগপৎ অসারতা ও চাঞ্চল্যবর্দ্ধক। পরিতাপের বিষয় এই যে, ইনিই আমাদিগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষাসংস্কারক এবং ইঁহার লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস আমাদিগের যুবকগণের আদর্শ। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশ্রয়স্থল যে যুবকবৃন্দ তাহাদিগের ক্রমিক অবনতি। হইতে-ছেও তাহাই। সুধী-সমাজ যখন আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার এই ভুল প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে এবং এই উচ্ছৃঙ্খল বৃদ্ধের লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণবিন্যাস-প্রণালী সমাজ-কলেবর হইতে মুছিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইবে, তখন আবার বাঙ্গালীর সুদিন উঁকি ঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিবে।

বাঙ্গালী আজ মোহ-নিদ্রায় নিমগ্ন। তাই, তাহার সমাজে যে, "সরস্বতী"র নামে দুষ্ট-সরস্বতী রাজত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে না। বাঙ্গালীর ব্যথায়, তথা সমগ্র মনুষ্যসমাজের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আজ যাহারা কটু ও তিক্ত বস্তুকে নিজদিগের নিত্যসঙ্গী করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালীর নিকট নিজেদের জন্য অর্থ অথবা সম্মানের প্রার্থী নহে। কেহ যখন সত্যস্বরূপ ঋষিগণের রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়াও জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য উচ্ছৃঙ্খল নিয়মের দাসত্ব অথবা বৈশ্য ব্যবসায়ের অনুভবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, অথচ আত্মবোধের জাগরণে জাগ্রত হয়, তখন সে যে কত বৃশ্চিকদংশনের যাতনায় বিব্রত হইয়া পড়ে তাহা কোন আত্মবিস্মৃত মানুষের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। মানুষের দেওয়া ঐশ্বর্য্য অথবা সম্মান তাহার ঐ যাতনা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হয় না। দুষ্ট-সরস্বতীকে পদদলিত করিয়া বাঙ্গালী পুনরায় সরস্বতীর অর্চ্চনানিরত হউক, ইহাই, সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। রবীন্দ্রবাবুকে আমরা এখনও তাঁহার অকীর্ত্তিকর কার্য্যতৎপরতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।

ইহার পর আমরা রবীন্দ্রবাবুর আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্যের সমালোচনা করিব।

আমরা ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, উহা প্রধানতঃ সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত দশটী :—

(১) সর্ব্বব্যাপী অনুর্ব্বরতা বহুযুগ হইতে ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিল এবং বৃহৎ শূন্যতার মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হইয়াছে।

(২) কংগ্রেসের উদ্ভব হইবার অল্পকাল পরেই ভারতবাসিগণ বিবিধ উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। এই বিষয়ে রবীন্দ্র বাবুর নিজের কথা—

"বিরাট জনসাধারণের মন আশ্চর্য্য দ্রুতবেগে বদলে গেল, সেই মন আশা করতে শিখল, ভয় করতে ভুলে গেল, বন্ধন-মোচনের সঙ্কল্প করতে তার সঙ্কোচ আর রইল না।"

(৩) একমাত্র গান্ধীজীর অবিচলিত ভরসার জোরে এতবড় উন্নতিকর পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে।

(৪) এতাবৎ গান্ধীজীর কার্য্যের ফলে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাকে ভারতবর্ষের চরম উন্নতির অবস্থা বলা যায় না। চরম উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে এখনও অনেক কিছু করিতে হইবে। এখনও যাহা যাহা করিতে হইবে তাহার প্রত্যেকটিতে গান্ধিজীর কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে হইবে।

(৫) প্রথম যখন কংগ্রেসের উদ্ভব হইয়াছিল, তখন উহা তামসিকতার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, কারণ তখনও উহা "জনগণের অন্তরের দিকে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি।" তখন উহার "আন্দোলন ছিল বাহিরের দিকে।" তখনকার কংগ্রেসটি "হাত-জোড়-করা" ও "দোহাই-পাড়া ছিল"।

(৬) এই তামসিকতা হইতে কংগ্রেসকে উদ্ধার করিয়াছেন গান্ধিজী। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা—

"হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁইয়ে দিলে সোনার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্মশক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস্র সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে।"

(৭) এক্ষণে কঙ্গ্রেস প্রভৃত শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছে এবং ঐ অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপই তাহার অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্গ্রেস্ কর্ম্মিগণের পরস্পরের মধ্যে এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের, একধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত আর এক ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে।

(৮) স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের উদ্দেশ্যে গান্ধিজীর মনে মনে একটা বিশেষ সঙ্কল্প বাঁধা রহিয়াছে। মনে মনে উহার পথের একটি ম্যাপ তিনি অঙ্কিত রাখিয়াছেন। গান্ধিজীর এই ব্যবস্থাকে তিনি শিথিল হইতে দিতে শঙ্কিত হইয়া থাকেন। ইহারই জন্য তিনি সময় সময় দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া থাকেন। একাধিপত্য-প্রিয়তার জন্য তাঁহার দৃঢ়তা, এতাদৃশ সন্দেহ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৯) প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষমাত্রেরই নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। এই বিশ্বাসকে তাঁহারা ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ধ্রুব করিয়া রাখেন।

(১০) "সামনের যে ঘাট লক্ষ্য করে আজ কর্ণধার নৌকা চালিয়েছেন, সে দিকে তাঁহাকে যেতে দেওয়া হোক। দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মত বলব না তার ঊর্দ্ধে আর ঘাট নেই। আরো আছে এবং তার জন্যে আরো মাঝির দরকার হবে।"

দ্বিতীয়াংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত তিনটী :—

(১) "আমি জানি রাষ্ট্র-ব্যাপার সমাজের অন্তর্গত। কোন দেশেরই ইতিহাসে তার অন্যথা হয় নি। সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হয়ে কোন লাভ নেই।"

(২) "সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের, নানা আয়তনের জয়তোরণের চূড়া, কিন্তু তাদের কোনটারই ভিৎ গাড়া হয় নি বালির উপরে।"

(৩) "যখন লুব্ধমনে তাদের উপরতলার অনুকরণে প্ল্যান আঁকব তখন দেশের সামাজিক চিত্তের গভীরে নিহিত ভিত্তির রহস্যটা যেন বিচার করি।"

তৃতীয়াংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত তিনটী :—

(১) "দেখছি চিন্তা ক'রে মানবজগতে দুই প্রবল শক্তি নিয়ে পলিটিক্সের ব্যবহার। একটির প্রয়োগ বাহিরের দিকে, সেটা যন্ত্রশক্তি, অন্য একটার কাজ মানুষের মন নিয়ে, সেটাকে বলতে পারি মন্ত্রশক্তি।"

(২) "আজ য়ুরোপের সঙ্কটের দিনে এই দুই শক্তির হিসাব গণনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে পদচারণা করছে।"

(৩) "বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই শক্তির কোনটাই সহজসাধ্য নয়, অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগশিক্ষা-চর্চা।"

চতুর্থাংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত পাঁচটী :—

(১) "বহুকাল ধরে আমরা পরের অধীনে আছি, যন্ত্রশক্তির আঘাত কী রকম তা জানি, কিন্তু তার আয়ত্তের উপায় আমাদের স্বপ্নের অগোচর।"

(২) "অত্যাবশ্যক বোধ করলে বাহিরের কোন পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার ফেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। যেরকম মহাজনরা আজও এই গরিব জাতির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়।"

(৩) "ইতিহাসে দেখা গেছে প্রবলের সঙ্গে অসমকক্ষের মিতালি খালকেটে কুমীর ডেকে আনা। তাতে কুমীরের পেট ভরে, অবিবেচক খাল-কাটিয়ের খরচায়।"

(৪) "তা-ছাড়া অমঙ্গল প্রতিরোধের যে-সব জনমনঃশক্তি বহুকালের অব্যবহারে গিয়েছে মরচে পড়ে। ভরসা হারিয়েছি।"

(৫) "কোন একটা নেশার ঝোঁকে মরিয়া হয়ে যদি ভরসা বাঁধি বুকে, তবে সে গিয়ে দাঁড়াবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়।"

পঞ্চমাংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত উক্তিটী :—

(১) "একদিন ছিল যখন সাহস ও বাহুবলের যোগে চলত লড়াই।"

(২) "এখন এসেছে সায়েন্স্, শিক্ষিত বুদ্ধির 'পরে ভর ক'রে।"

(৩) "শুধু বুদ্ধি নয়। তাহার প্রধান সহায় প্রভূত অর্থবল।"

(৪) "অথচ আমাদের লড়তে হবে শূন্য তহবিল এবং এমন জনসংঘ নিয়ে যাদের মন কর্ণবিধানে দৃঢ় নয়, যারা অশাসিত। যাদের শক্তি হয় অচেতন হয়ে থাকে, নয় অন্ধ হয়ে ছোটে।"

(৫) "দেশের পলিটিক্স্ আরম্ভ হয়েছিল এই দুরূহ সমস্যা নিয়ে।"

(৬) "সেই জন্যে প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকো বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চমেন্ট দিয়ে। সেটা দাঁড়িয়েছিল খেলায়।"

(৭) "এই রিক্ত সমস্যা নিয়েই একদিন মহাত্মা এসে দাঁড়ালেন বিপুল শক্তিমান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে, দুঃখ সয়ে ছিলেন, মাথা হেঁট করেন নি।"

(৮) "বিনা যন্ত্রশক্তিতে লড়াই যে চলতে পারে, এইটে প্রমাণ করতে তাঁর আসা।"

(৯) "একটা একটা উপলক্ষ্য নিয়ে তিনি লড়াই সুরু করে দিলেন। কোনোটাতে যে শেষ পর্য্যন্ত জিতেছেন তা বলতে পারি নে। কিন্তু পরাভবের মধ্য দিয়ে জেতবার ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন।"

(১০) "ক্রমে ক্রমে সেই মন তৈরী করেছেন যে-মন তাঁর সঙ্কল্পিত অস্ত্র যথাযোগ্য সংযম ও সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে।"

(১১) "এই অস্ত্র ছাড়া কেবল যে আমাদেরই উপায়ান্তর নেই তা নয়, সমস্ত পৃথিবীরই এই দশা।"

(১২) "হিংস্র যুদ্ধ নিরন্ত; সে একই কেন্দ্রের চারি দিকে ধ্বংস-সাধনের ঘুরপাক খাওয়ায়; তার সমাপ্তি সর্বনাশে।"

(১৩) "হিংস্র যুদ্ধের ফৌজ তৈরী করা সহজ, বছর খানেকের কুচকাওয়াজে তাদের চালিয়ে দেওয়া যায় রণক্ষেত্রে। কিন্তু, অহিংস যুদ্ধে মনকে পাকা করে তুলতে সময় লাগে।"

(১৪) "অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল, তাদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ভাঙ্গা চলে, এমন সিদ্ধি লাভ চলে না যা মূল্যবান্, এমন কি পাশব শক্তির রীতিমতো ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে প্যারে না, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

(১৫) "পৃথিবীতে আজ যেসব জাতি যে কোন রকম লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলেরই জোর সর্ব্বজনীন শিক্ষায়।"

(১৬) আজকের দিনে আমরা দেশের বহু কোটি চোখ-বাঁধা মোহের বাহন নিয়ে এগোতে পারব না।"

(১৭) "মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে জন-শিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি, প্রমাণ পেয়েছেন ভিড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে ওঠে।"

(১৮) "আমার নিজের এত দিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সান্ত্বনা পাই। গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে।"

(১৯) "স্বদেশ-সেবার সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া, যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে, নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায়, আত্মকল্যাণসাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সম্মিলিত হতে পারে।"

ষষ্ঠাংশের উল্লেখযোগ্য কথা দুইটী যথা:—

(১) "আমার সামান্য শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই কাজে (অর্থাৎ পঞ্চমাংশের ঊনবিংশ দফায় কথিত) মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে।"

(২) "দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তি লাভ করে।"

সপ্তমাংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত তিনটী:—

(১) "আজ আমি জানি বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের।"

(২) "সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা

ক'রে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে, আমি পূর্ব্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে—সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে, আমার দেখার শক্তি নেই।"

(৩) "তার (বাংলার) অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা ক'রে আমি সুদৃঢ়সঙ্কল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে।"

উপরোক্ত সাতটী অংশের যে যে উল্লেখযোগ্য কথা দেখা যাইতেছে তাহা চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করিলে কোন্ অংশের বক্তব্য বিষয় কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে আমরা প্রত্যেক অংশের বক্তব্যবিষয়ের কথা আলোচনা করিব।

গান্ধিজী ভারতবর্ষের জন্ম কতদূর করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি কতদূর হওয়া সম্ভব তাহার কথা লইয়া রবীন্দ্রবাবুর আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমাংশ।

পলিটিক্সের মূলভিত্তি কি হওয়া উচিত, তাহার কথা লইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ।

ইয়োরোপে পলিটিক্স্ কি আকারে ব্যবহৃত হইতেছে এবং উহার দুরূহতা কোথায়, তাহার কথা লইয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের তৃতীয়াংশ।

ইয়োরোপের পলিটিক্স্ ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য কি না এবং ভারতবর্ষে উহা ব্যবহার করিতে গেলে পরিণামে কি ঘটিতে পারে, তাহার কথা লইয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের চতুর্থাংশ।

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য কি, তাহা লইয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের পঞ্চমাংশ।

ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে হইলে যাহা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, রবীন্দ্রবাবু যে গত চল্লিশ বৎসর হইতে তাহাই করিয়া আসিতেছেন এবং গান্ধীজীও যে ঘুরিয়া ফিরিয়া রবীন্দ্রবাবুর পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা দেখান আলোচ্য প্রবন্ধের ষষ্ঠাংশের বক্তব্য বিষয়।

সুভাষচন্দ্র যে বিপথগামী হইয়াছেন এবং ঠিক রাস্তায় পরিচালিত না হইলে, তিনি যে রবীন্দ্রবাবুর সহযোগিতা পাইতে পারিবেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই কথা বলাই রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধের সপ্তমাংশ।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রত্যেকাংশের উল্লেখযোগ্য কথাগুলি ও উপসংহার কতদূর যুক্তিসঙ্গত আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমাংশের প্রথম কথার মর্ম্ম—সর্ব্বব্যাপী অনুর্ব্বরতা বহু যুগ হইতে ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিল এবং বৃহৎ শূন্যতার মধ্যে ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি প্রকৃত ইতিহাস-সঙ্গত নহে। কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলার সহিত মিলাইয়া লইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় আশি বৎসর হইতে ভারতবর্ষের জমী অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসিগণও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সত্য বটে এবং ঐ অনুর্ব্বরতা ও দারিদ্র্যের অব্যক্ত সূচনা অনেক যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও সত্য বটে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী অনুর্ব্বরতা যে বহুযুগ হইতে ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সত্য নহে। পরন্তু, আশি বৎসর আগেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ জন-সাধারণ টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণে ধনী না হইলেও প্রকৃত অর্থসম্পদে সম্পন্ন ছিল এবং জগতের সকল জাতি তাঁহাদিগের সম্পদের ন্যায্যাংশ লইবার জন্ম তাঁহাদিগের চারিদিকে মধুমক্ষিকার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত।

পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবাসিগণের আর্থিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল, তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন বাস্তব বৃহৎ শূন্যতার মধ্যে ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয় নাই। ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবে যে "বৃহৎ শূন্যতা" স্থান পাইয়াছে তাহা কাল্পনিক। ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের সূচনা কি অবস্থায়, কাহাদের দ্বারা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ও ইংরাজ এই দুইটি জাতির দুইটি বিভিন্ন মনোভাবের পরিণতিতে এবং এই দুইটি জাতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মানুষের মিলিত চেষ্টায় ভারতীয় কংগ্রেসের পরি-

কল্পনা উত্থিত হইয়াছে। ইংরাজগণের মধ্যে যাঁহাদিগের মনে এই স্থচনার অবস্থায় ভারতীয় কঙ্‌গ্রেসের পরিকল্পনা স্থান পাইয়াছিল; তাঁহারা প্রধানতঃ ভারতীয় প্রজাগণের প্রতি যাহাতে কোন অবিচার স্থান না পায়, তাহার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আর, ভারতীয়গণের মধ্যে যাঁহারা ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরাজগণের সমান প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে পারিলেন না বলিয়া দৈন্যগ্রস্ত ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রচেষ্টা ছিল সর্ব্বতোভাবে ইংরাজের মত হওয়া। ইংরাজদিগের অনুকরণে ইহাঁরা জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচন করিবার কথা অহরহ মুখে বলিতেন বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের কার্য্যকলাপ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ কথা তাঁহাদিগের হৃদয়ে কোন দিন স্থান পায় নাই। ইংরাজদিগের দেশে তাঁহাদিগের জনসাধারণের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর আগেও দুঃখ-দারিদ্র্য অতি উৎকট ভাবে বিদ্যমান ছিল। কাযেই; দুঃখ-দারিদ্র্যমোচনের কথা ইংরাজগণকে মনে প্রাণে ভাবিতে হইত। ভারতবর্ষের ইংরাজী-শিক্ষিতগণ ইংরাজদিগের অনুকরণে ঐ দুঃখ-দারিদ্র্যমোচনের কথা মুখে বলিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত দুঃখ-দারিদ্র্য পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবাসী জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যেই তাদৃশভাবে বিদ্যমান না থাকায় উহার মোচনের কথা মনে প্রাণে ভাবিতে হইত না।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের প্রথমাংশের প্রথম কথাতেই অত্যুৎকট গলদ রহিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের প্রথমাংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথার মর্ম্ম—

কঙ্‌গ্রেসের উদ্ভব হইবার অল্পকাল পরেই তাহার কার্য্যের ফলে ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ দেখা দিয়াছে এবং জনসাধারণ বিবিধ উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। একমাত্র গান্ধিজীর অবিচলিত ভরসার জোরে এত বড় উন্নতিকর পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে।

অথচ, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধের এই অংশের সপ্তম কথাতেই যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্ম—

"... ... ঐ অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার চাপই তাহার অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠিয়াছে ... ...।"

রবীন্দ্রবাবুকে জানিতে হইবে যে, যাহাকে প্রকৃত শক্তি অথবা সংস্কৃত ভাষায় "দৈবী শক্তি" বলিয়া অভিহিত করা যায় তাহা যখন কোন জনসঙ্ঘের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয় তখন ঐ সঙ্ঘ অথবা সমাজ ২১ হাজার বৎসরের মধ্যে কোন অস্বাস্থ্যের কবলে পতিত হয় না। যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, এত অল্প দিনের মধ্যেই কঙ্‌গ্রেসে অস্বাস্থ্যের উদ্ভব হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, কঙ্‌গ্রেসে এতাবৎকালের মধ্যে কখনও কোনরূপ প্রকৃত শক্তির উদ্ভব হয় নাই। যাহা আপাত দৃষ্টিতে শক্তি বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা কঙ্‌গ্রেসের "দৈবী শক্তি" নহে; পরন্তু "আসুরী শক্তি"। এই আসুরী শক্তি আপাত দৃষ্টিতে শক্তি বলিয়া মনে হইলেও উহা কঙ্‌গ্রেসের অথবা ভারতীয় জনসাধারণের কোনরূপ উপকার করা তো দূরের কথা, উহার অনিষ্ট সাধনই করিয়াছে। কঙ্‌গ্রেসের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব রকমের দলাদলির এবং জনসাধারণের ক্রমিক দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য উপরোক্ত সত্যের সাক্ষ্য। এই আসুরী শক্তি অনতিবিলম্বে প্রতিহত না হইলে কঙ্‌গ্রেস্ এবং ভারতীয় জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে চুরমার হইয়া যাইবে।

কাযেই চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রবাবুর এই অংশের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কথাতেও গলদ আছে। গান্ধিজীকে কোনরূপ দৈবীভাবাপন্ন তো বলাই চলে না; পরন্তু তিনি যে একটী অসুরের অবতার তদ্বিষয়ে সুনিশ্চিত হইয়া তিনি দেশের মধ্যে যে ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিহত করিবার জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। কি করিয়া উহা সম্ভব হইবে তৎসম্বন্ধে আমরা ইহার পরে আলোচনা করিব। কি করিলে দেশের বর্ত্তমান বিবিধ সমস্যার পূরণ হইতে পারে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত কার্য্য ভারতবর্ষের ১৯০৪ সালের অবস্থায় যত সহজ-সাধ্য ছিল, তাহার দশাংশের একাংশ সহজসাধ্যও এখন আর নাই। ইহাই ১৯০৪ সালের পরবর্ত্তী নেতাগণের কার্য্যের পরিণাম। গান্ধিজী এই নেতাগণের অন্যতম।

রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের প্রথমাংশের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কথার মর্ম্ম—

"ভারতবাসিগণের ভবিষ্যৎ কার্য্যে গান্ধীজীর কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে হইবে। অহিংস্র-সাধনা গান্ধিজীর আদর্শ। গান্ধিজী যে অহিংস্র-সাধনা তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া-

ছেন তাদৃশ অহিংস্র-সাধনাকেই ভারতবাসিগণকে সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।"

অথচ, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার এই প্রবন্ধেরই পঞ্চমাংশের চতুর্দ্দশ কথায় বলিতেছেন—

"অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল, তাদের নিয়ে দক্ষ-যজ্ঞ ভাঙা চলে, এমন সিদ্ধিলাভ চলে না যা মূল্যবান্, এমন কি পাশব শক্তির রীতিমত ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে পাবে না; ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

এই পঞ্চমাংশের সপ্তদশ কথায় রবীন্দ্রবাবু পুনরায় বলিয়াছেন—

"মহাত্মাজী অসহযোগ-আন্দোলন স্থগিত রেখে জন-শিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি প্রমাণ পেয়েছেন, ভিড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে উঠে।"

আমরা রবীন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, যিনি নিজেই নিজের কার্য্যের স্থিরতা ও সামঞ্জস্য রাখিতে সক্ষম নহেন তাঁহার কার্য্যের সহিত অপরে সামঞ্জস্য রাখিবে কিরূপে? যাদৃশ অহিংস্র-সাধনার কুফল পরিষ্কারভাবে রবীন্দ্রবাবু নিজেই উপলব্ধি করিয়াছেন, তাদৃশ অহিংস্র-সাধনার উপদেশ তিনি কোন্ যুক্তিবলে দেশবাসীকে প্রদান করিতেছেন? দেশবাসিগণ বুঝিয়া লউন—তাঁহাদিগের রবীন্দ্রনাথ কত বাহবা পাইবার উপযুক্ত!

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রথমাংশের সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম কথা পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কথার বিস্তৃতি ও বিশ্লেষণ মাত্র। কাযেই, উহার আর পৃথক্ বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃথা বাড়াইব না। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে,এই চারিটী কথার মর্ম্মও নানারূপ গলদে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয়াংশের উল্লেখযোগ্য কথা তিনটী। ঐ কথা তিনটীর প্রত্যেকটী অসম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণতার জন্যই উল্লেখযোগ্য।

এই অংশের প্রথম কথাতে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত;……।" রবীন্দ্রনাথ "সমাজ" বলিতে কি বুঝেন তাহা পরিষ্কার করিয়া না বলিলে, তাঁহার এই কথা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার বিচার করা সম্ভব হয় না।

বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনে যে সমস্ত কার্য্য করা হয় তাহা যদি সমাজের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান রাষ্ট্র-ব্যাপারকে সমাজের অন্তর্গত বলিয়া ধরা চলে না, অথচ মানুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয় তাহা সমাজের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া রাষ্ট্র-ব্যাপারকে সমাজের অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। কাযেই, রবীন্দ্রনাথের এই কথা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে "সমাজের" সংজ্ঞা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

এই অংশের দ্বিতীয় কথায় তিনি বলিতেছেন :—

"সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারে নানা আয়তনের জয়তোরণের চূড়া, কিন্তু তাদের কোনটারই ভিৎ গাড়া হয়নি বালির উপরে।"

"……তাদের কোনটারই ভিৎ গাড়া হয়নি বালির উপরে"—এই বাক্যের যে কি অর্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বালি এমন অবস্থাবিশিষ্ট হইতে পারে যে, সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ভিৎ তাহার উপর গাড়াই সম্ভব হয়, আবার এমন অবস্থাবিশিষ্টও হইতে পারে যে, তাহার উপর ক্ষণভঙ্গুর ছাড়া আর কোনরূপ ভিৎই গাড়া সম্ভব হয় না, ইহাই আমরা জানি। কোন্ অবস্থার "বালি" তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সুদৃঢ় ভিতের কথা বুঝিবে অথবা ক্ষণভঙ্গুর ভিতের কথা বুঝিবে তাহা নির্ণয় করা যায় না। কাযেই, আমাদিগের চোখে রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটী বালকোচিত অসম্পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয়াংশের উপরোক্ত কথায় বলিতেছেন যে, সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারে নানা আয়তনের জয়তোরণের চূড়া, অথচ ইয়োরোপের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে সর্ব্বপ্রথমে যাহা স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে তাহার নাম "হিংস্র যুদ্ধের ফৌজ ও তাহার সাজসজ্জা।" ইহা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ হিংস্র-যুদ্ধের ফৌজ ও তাহার সাজ-সজ্জাকে জয়তোরণের চূড়া বলিয়া অভিহিত করিতেছেন? অথচ, রবীন্দ্রনাথই তাঁহার এই প্রবন্ধের পঞ্চমাংশের দ্বাদশ কথায় বলিতেছেন—

"হিংস্রযুদ্ধ নিরস্ত; সে একই কেন্দ্রের চারি দিকে ধ্বংস-সাধনের ঘুর-পাক খাওয়ায়, তার সমাপ্তি সর্ব্বনাশে।"

ইহা কি রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালী নহে?

দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় কথাটীও অসম্পূর্ণ, কারণ তাহার মধ্যে "সামাজিক চিত্তের" কথা রহিয়াছে এবং সমাজের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

এই অংশটী উপরোক্তভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই অংশে রবীন্দ্রনাথ পলিটিক্সের মূল ভিত্তি কি হওয়া উচিত, তাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে কিছুই বলিতে পারেন নাই; পরন্তু হেঁয়ালীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বাকী পাঁচটি অংশের সমালোচনা আমরা বারান্তরে করিব।

ফরোয়ার্ড ব্লক ও তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন*

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু প্রবর্ত্তিত ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থন অথবা বর্জ্জন কোন্‌টি দেশহিতকামী ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে বিধেয়, তাহার সন্ধান বর্ত্তমান সন্দর্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথম দেখিতে হইবে, কি প্রকার সংগঠন এতৎকল্পে সমর্থনের যোগ্য, এবং কোন্ সংগঠন উহা নহে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর "ফরোয়ার্ড ব্লক" সমর্থনযোগ্য সংগঠনসমূহের অন্যতম কি না।

বলাই বাহুল্য যে, কোন্ সংগঠন সমর্থনের যোগ্য এবং কোন্ সংগঠন তাহা নহে, তাহার সন্ধান করিতে হইলে, দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর কল্যাণার্থ কোন্ কোন্ সমস্যার অনতিবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন এবং কোন্ সংগঠন এই সমাধানের সহায়ক হইতে পারে, তাহা জানিতে হইবে।

দেশবাসী অধিকাংশের কল্যাণার্থ যে-সকল সমস্যার সমাধান অনতিবিলম্বে প্রয়োজন, তাহারা এরূপ সুস্পষ্ট যে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যকতা নাই। আমরা অনাহার এবং বেকার-সমস্যার কথা বলিতেছি। অপরাপর বহুবিধ সমস্যা এবং তাহার নিবারণার্থ দেশের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন-কার্য্যের কথা উঠিতে পারে, কিন্তু অস্তিত্ব বজায় না থাকিলে, বস্তুতপক্ষে কোন উন্নতি সম্ভব নহে এবং অনাহার-সমস্যা সম্পূর্ণ ভাবে বিদূরিত হইবার ব্যবস্থা না হইলে, মনুষ্য-জাতির অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জোরের সহিতই বলা যাইতে পারে, বিশেষতঃ বর্ত্তমানে, যখন অধিকাংশ দেশবাসীর মুখেই অনাহার ছায়াপাত করিয়াছে। অনাহার-সমস্যার আলোচনায় সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার যে, ইহার কারণ সর্ব্বাবস্থাতেই দুইটির একটি হইতে পারে। যেখানেই সর্ব্বব্যাপক অনাহার-সমস্যা দেখা যায়, তাহার মূলে যে, হয় খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের ঘাটতি কিংবা বিতরণ-ব্যবস্থার ত্রুটি রহিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মনুষ্য সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধুনা, খাদ্য-শস্য উৎপাদনে ঘাটতি এবং বিতরণ-ব্যবস্থার ত্রুটি, উভয়ই বর্ত্তমান এবং তাহারই ফলে সর্ব্বব্যাপক অনাহার দেখা দিয়াছে। সমাজে যখন একই সময়ে এই উভয় কারণেরই উদ্ভব ঘটে, তখন প্রথম উৎপাদনের ঘাটতি নিবারণের জন্যই প্রথম চেষ্টিত হইতে হয়, কেন না, উৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর না হইলে কোন প্রকার বিতরণ-সাম্যের দ্বারাই সমাজের প্রত্যেকে উপকৃত হইতে পারে না। সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই বিষয়টী সম্বন্ধেই সর্ব্বাধিক অবহিত হইতে হইবে। আমাদের মতানুসারে, এই বিষয়ে অনবধানের ফলেই এতাবৎ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই অনাহারের জ্বালা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইতেছে। কম-বেশী সকল দেশেই কৃষিজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা হইতেছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বিতরণ-ব্যবস্থার উন্নতির নিমিত্ত যে-পরিমাণ চেষ্টা হইতেছে, কোন দেশেই যে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ঘাটতি পূরণের জন্য সেরূপ চেষ্টা হইতেছে না, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অধুনাতন সাম্রাজ্যতন্ত্রী ভাবধারা-পরিচালিত দেশসমূহ মোটামুটি ভাবে ইহার দৃষ্টান্ত। ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রশক্তি এই উভয় বিষয়েই আবার অত্যন্ত অনবহিত রহিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় এবং নিজেদের উৎপাদন ও বিতরণ-ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন অপেক্ষা অপর দেশ লুণ্ঠন ও প্রতারণার বিষয়েই তাঁহাদের রুচি অধিক বলিয়া মনে হয়। মোটামুটি ভাবে পুঁজিবাদী ভাবধারা-পরিচালিত দেশসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল তর্ক ছাড়িয়া দিলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, অনাহার-সমস্যার সমাধান এবং তৎকল্পে উৎপাদনের ঘাটতি দূর করিবার কার্য্যেই বর্ত্তমানে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন হইতেছে—কি প্রকার সংগঠন কর্ত্তৃক কাঁচা-মাল ও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ঘাটতি বিদূরিত হইতে পারে। এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ বলেন, দেশ রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বাধীন না হইলে ইহার ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাঁহারা যে সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত, ইহা আমরা বলি না, কিন্তু যখন দেশের প্রত্যেক পরিবার আসন্ন অনাহারের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত, তখন যাহা নাই, তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়াত লাভ নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য। আমাদের মতে, যাঁহারা ঘাটতি-সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অত্যাবশ্যকতার উপর এত জোর দেন, তাঁহারা এই ঘাটতির কি কারণ এবং ইহা পূরণ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু

* ১০ই আগষ্ট তারিখের "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত ইংরাজিতে লিখিত "দি ফরোয়ার্ড ব্লক এণ্ড ইট্‌স্ সিগ্নিফিক্যান্স (The Forward *Bloc* and its significance)"-শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে অনূদিত।

মাত্রও ওয়াকিবহাল নহেন। এই জন্যই তাঁহাদের কার্য্য এবং চিন্তার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায়, তাঁহারা ক্রমাগতই "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করিতেছেন। মেসার্স গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষ এণ্ড্ কোম্পানী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বস্তুতঃ কোন সমস্যার কারণ কি এবং তাহার সমাধান কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা জানা না থাকিলে সেই সমস্যার সমাধানার্থ সংগঠন কিরূপ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা সম্ভব নহে। সুতরাং খাদ্য-শস্যের ঘাটতি-সমস্যার কারণসমূহ এবং উহা কি ভাবে বিদূরিত হইতে পারে, তৎ-নির্দ্ধারণ স্বভাবতই গুরুত্ব লাভ করে।

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধের একাধিকটীতে আমরা যুক্তি-সহকারে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, পৃথিবীব্যাপী জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসই সর্ব্বব্যাপক খাদ্য-শস্য ও কাঁচা-মালের উৎপাদনের ঘাটতির মুখ্য কারণ; নদীসমূহ শুষ্ক হইয়া যাওয়াতেই জমীর এই স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইয়াছে এবং নদীসমূহ যে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতেছে, রেল-রাস্তা, মোটর-রাস্তা, ব্রিজ এবং আধুনিক বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপী সহরের সংক্রমণ দ্বারা নদীস্রোতে বাধা উপস্থিত হওয়াই তাহার মূলে।

সুতরাং দাঁড়ায় এই যে, কাঁচামাল ও খাদ্য-শস্যের ঘাটতি দূর করিতে হইলে, সমাজ হইতে রেল রাস্তা, মোটর রাস্তা, ব্রিজ এবং বাণিজ্যকেন্দ্ররূপী সহরের ক্রমিক বিস্তার ক্রমশঃ বর্জ্জন করিতে হইবে এবং নদী-স্রোতের কোন অংশে বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক, যে কোনভাবে বাধা উৎপাদনকারী সকল ঝঞ্ঝাট পরিহার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, ইহা শুনিলে যত অসম্ভব বলিয়াই মনে হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, বর্ত্তমান গোলক-ধাঁধার কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই। হইতে পারে যে, মেসার্স রায়, সাহা এণ্ড্ কোম্পানী অপর সকল পন্থার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া দেশবাসীকে আশান্বিত করিতেছেন, কিন্তু দেশবাসী অচিরাৎ উপলব্ধি করিবেন যে, এই বৈজ্ঞানিকদিগের কথা সম্পূর্ণ ফাঁকীবাজী ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং তাঁহাদের নিজেদের বক্তব্য নিজেরা না বুঝিয়াই দেশবাসীকে ধোঁকা লাগাইতেছেন। পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলের খ্যাত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখারই জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভারতের এই মেসার্স রায়, সাহা এণ্ড্ কোম্পানীর—নাম তাঁহারা যতই করিয়া থাকুন না কেন—বিজ্ঞান-সম্বন্ধে ধারণা এমনই যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ক্রিয়াকলাপ যে কিরূপ সীমাবদ্ধ, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন। স্যর পি. সি. রায় এবং ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁহাদের কর্ম্ম ও বক্তৃতার দ্বারা যে ভাবে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিতেছেন, তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উভয়েই চিন্তাশক্তি-সামর্থ্য-হীন, আত্মম্ভরি ব্যক্তি এবং দেশের ক্ষতিকারক। দেশের নামের নামে তাঁহারা যে আত্ম-প্রচার করিতেছেন, তাঁহা-দিগকে তাহা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি, ইহা না করিলে জনসাধারণকে অনাহার ও দারিদ্র্য-সমস্যা হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা অবসর গ্রহণে বাধ্য হইবেন।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাই খাদ্য-শস্য ও কাঁচামালের ঘাটতি পূরণের একমাত্র পন্থা, এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলে তৎসাধনার্থ সংগঠনপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে—নদীস্রোতের যে-কোন অংশে বাধা-উৎপাদনকারী যাবতীয় বস্তু এবং রেল-রাস্তা, মোটর-রাস্তা, ব্রিজ এবং নদীবক্ষে বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপী আধুনিক সহরের বিস্তার পরিহার করিতে হইলে কি জাতীয় সংগঠনের প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সন্দর্ভে এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি সন্দর্ভে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, এখানে সেই আলোচনার পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যাহা বলিয়াছি মোটামুটি ভাবে তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপরে যে সকল বাধা অপসরণ এবং বস্তু পরিহারের কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃতভাবে "মিলিত ভারতীয় জাতীয় মহাসভা" সংগঠন ব্যতীত উহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। আমরা যে প্রকৃতভাবে "মিলিত ভারতীয় জাতীয় মহাসভা"র কথা বলিতেছি, বর্ত্তমান ভারতীয় জাতীয় মহাসভা যে তাহা নহে এবং উহা যে আমাদের আদর্শের অনুরূপ নহে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। যদ্যপি বর্ত্তমান ভারতীয় জাতীয় মহাসভাকে "জাতীয়" আখ্যা দান করা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা "জাতীয়" আখ্যা পাইতে পারে না। বর্ত্তমান

কংগ্রেস কয়েকটি দলাদলির পাণ্ডার আস্তানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহারা উহাকে আত্ম-প্রচারের এবং জনসাধারণের অথবা নিজেদের হইয়াও তেমন কোন কাজ না করিয়া যাহাতে জীবিকার্জ্জন চলিয়া যায়, তাহার উপায় হিসাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন। সূচনাতে কংগ্রেসের মূর্ত্তি এরূপ ছিল না। কিন্তু, অতীতে ইহার জনকয়েক নেতার অবিবেচনার কার্য্যের ফলে বর্ত্তমানে ইহার এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। জীবিত নেতাদের মধ্যে মিঃ গান্ধীই কংগ্রেসের এই দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত প্রধানতঃ দায়ী।

কিন্তু, বর্ত্তমান কংগ্রেস যত মন্দই হউক না কেন, ইহার পাশাপাশি মিলিত "ভারতীয় জাতীয় মহাসভা" আখ্যায় কোন নূতন সংগঠন সৃষ্টির চেষ্টা করিলে চলিবে না। কেবল বর্ত্তমান কংগ্রেসের কার্য্যোদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া এবং সামান্যমাত্র দ্বন্দ্ব-কলহের অবকাশ ঘটিতে পারে, এরূপ সকল বিষয় বর্জ্জন করিয়া, কংগ্রেস হইতে তৎস্থলে যাহাতে যে-সকল বিষয়ে দেশ প্রাণে প্রাণে একমতাবলম্বী হইতে পারে তাহারই কার্য্য সূচিত হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। যদি উপরিনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কার্য্যের চেষ্টা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য একমাত্র "সমগ্র মনুষ্য-সমাজের, বিশেষতঃ ভারতের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান" ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, এমন কি, "শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অর্জ্জন"ও নহে। কেন না, স্বাধীনতার অর্জ্জন এবং অপরাপর সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের মধ্যে মতানৈক্য এবং সংঘর্ষের কারণ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কোন মতদ্বৈধই থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের কার্য্য ও বক্তৃতা হইতে যে মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে যে কেহ নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, উপরিনির্দ্দিষ্টভাবে কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ দ্বারা কর্ম্মোদ্দেশ্যের এই পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া সম্ভব নহে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু এই কংগ্রেসেই যাঁহারা এখনও কর্ম্মী মাত্র তাঁহারা এবং জনসাধারণ, ইহাদের যে-কেহ ইচ্ছুক হইলে এই কার্য্য সম্ভব হইতে পারে। এতৎকল্পে যে সকল নেতা অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার না করিবেন এবং তৎসমাধানার্থ প্রয়োগযোগ্য পন্থা উপস্থিত না করিতে পারিবেন এবং স্বাধীনতার অর্জ্জন প্রভৃতি অনৈক্যসূচক প্রস্তাবের উত্থাপনা করিবেন, তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেস, গবর্ণমেণ্ট ও স্বায়ত্ত-শাসন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিনিধিত্ব করিবার নিমিত্ত ভোট লাভ না করিতে পারেন, উপরিলিখিত ব্যক্তিবৃন্দকে তাহাই করিতে হইবে। যদি কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ এবং জনসাধারণ উপরিনির্দ্দিষ্টভাবে মন স্থির করিতে পারেন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, কংগ্রেস, গবর্ণমেণ্ট ও স্বায়ত্ত-শাসনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দ্দ্বন্দ্ব এবং একমাত্র অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে নিয়োজিতপ্রাণ প্রতিনিধিবৃন্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। ইহার ফলে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে আন্তরিক মিলন স্থাপিত হইবে এবং দলাদলির পাণ্ডা এবং আত্ম-প্রচারকামী ব্যক্তিদের আস্তানা স্বরূপ বর্ত্তমান যে কংগ্রেস উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলিত "ভারতীয় জাতীয় মহাসভা"য় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে, তখন কেবল যে আপনা হইতে বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে, এমন কি স্বাধীনতা এবং ভারতের পক্ষে যাহা কিছুর প্রয়োজন, সমস্তই লাভ করা সহজসাধ্য হইবে, কেন না কংগ্রেস মিলিত ভারতবাসীর শুভেচ্ছাসমর্থিত নিঃস্বার্থ এবং অধীতবিদ্য নায়কবৃন্দের মিলনস্থল হইবে।

উপরে যাহা বিবৃত হইল, যথাযথভাবে তাহার অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, এই দুর্দ্দিনে ভারতে কেবল এমন সংগঠনের প্রয়োজন, যাহার কার্য্যকলাপে বিবাদ না উপস্থিত হয় এবং যে সংগঠনে সামান্যমাত্র দ্বন্দ্ব ও কলহের অবকাশ রহিয়াছে, তাহা বর্জ্জনীয়। ইহা রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির দিক্ হইতেও যেরূপ যথার্থ, দর্শনের দিক্ দিয়াও তদ্রূপ যথার্থ।

ভারতীয় ঋষিরচিত মূল দর্শনের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা অবগত আছেন যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উভয়েই সর্ব্বদা যেমন প্রকৃতির কার্য্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনই বিকৃতির কার্য্য দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। বিকৃতির কার্য্য প্রকৃতি-প্রস্ফীত বটে, কিন্তু প্রকৃতি যেরূপ সর্ব্বদাই ঐক্য, উন্নতির এবং সমৃদ্ধির কারণ হয়, সেইরূপ বিকৃতি দ্বন্দ্ব ও কলহের, তথা-

ধ্বংস ও দুর্দ্দশার কারণ হইয়া থাকে। যখন কোন ব্যক্তি প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করেন, মনে হইবে তিনি নিষ্ক্রিয় রহিয়াছেন, কেন না তাঁহার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না এবং কোন বিরুদ্ধতার সম্মুখীন না হইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া চলেন এবং তাঁহার কোনরূপ অকৃতকার্য্যতা দুর্দ্দশা এবং ধ্বংস ঘটে না। অন্যপক্ষে, কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলে, অর্থাৎ বিকৃতির কার্য্যের অধীন হয়, বাহ্যতঃ তাহাকে অত্যন্ত কর্ম্মনিবিষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে, কেন না তাহাকে দ্বন্দ্ব-কলহে মত্ত হইতে হয়। কিন্তু, শেষতঃ ধ্বংস ও দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। এই জন্যই ভারতীয় ঋষিদিগের মতে, জ্ঞানের প্রথম সোপান আরোহণের কার্য্য হইতেছে স্বীয় দেহমধ্যস্থ প্রকৃতির ও বিকৃতির কার্য্যের পার্থক্য-উপলব্ধি।

প্রকৃতি ও বিকৃতিসম্বন্ধীয় এই দর্শন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি হইলে যেখানে দ্বন্দ্ব-কলহ বর্ত্তমান বলিয়া দেখা যাইবে, তথায় যে বিকৃতির কার্য্য চলিতেছে, ইহা বুঝিয়া তাহা বর্জ্জন করিয়া চলিতে হয়। অন্য-পক্ষে, যেখানে ঐক্য এবং উত্তেজনার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তথায় প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে বলিয়া ধরিতে হয় এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সেই কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য হয়।

ইহা হইতে, আমরা যে বলিতেছি, ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এমন সংগঠন প্রয়োজন, যাহা সামান্যমাত্র কলহ ও দ্বন্দ্বের অবকাশ ঘটিতে পারে, এইরূপ বিষয় বর্জ্জন করিয়া যে-সকল বিষয়ে উহা ঘটিবে না, তদনুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইবে, সেই মত ও সমর্থন লাভ করিবে।

এইবার আমরা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তাবিত তাঁহার "ফরোয়ার্ড ব্লক"-এর বিধানসমূহ এবং কার্য্যপন্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, তদ্দ্বারা দ্বন্দ্ব ও কলহ, না মিলন ও একপ্রাণতার উদ্ভব সম্ভব।

এই পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর "ফরোয়ার্ড ব্লক"এর কর্ম্মপন্থা এবং বিধানসমূহ দ্বারা মিলন ও একপ্রাণতার সৃষ্টি না হইয়া দ্বন্দ্ব ও কলহেরই সৃষ্টি হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আমরা এক এক করিয়া মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থা ও বিধানসমূহ পরীক্ষা করিব।

তাঁহার কর্ম্মপন্থার প্রথম দফা হইতেছে :—

"ধর্ম্মমতানুযায়ী পূজা করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতবাসীর থাকিবে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমূলক কোন গুরুকে রাজনীতি অথবা রাজনৈতিক কার্য্যে প্রবেশ দেওয়া হইবে না। রাজনীতিসংশ্লিষ্ট কার্য্য রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।"

তাঁহার কর্ম্মপন্থার এই দফা হইতে প্রমাণ হয় যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু ধর্ম্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতি, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কোনটিই হৃদয়ঙ্গম করেন নাই।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমানে ধর্ম্মমতসমূহের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহারা নিশ্চিত দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টি করিতে বাধ্য এবং সেই জন্য রাজনীতিসংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটী কার্য্যে উহাদিগকে বর্জ্জন করাই বিধেয়। কিন্তু, মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া একটি সত্য হইতেছে এই যে, কোন ব্যক্তিই নিজের অথবা সমাজের হিতকারী কোন কার্য্য তাহার স্ব-নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যতীত পরিচালিত হইতে পারে না। মানুষের এই স্ব-নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধি হইতেছে তাহার পরস্পরের এবং সমাজের সহিত একাত্মানুভূতি এবং সাম্যের প্রতি সহজ টান। ইহাই বস্তুতঃ প্রকৃতির কার্য্য এবং যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধ, তাহা বিকৃতিপ্রসূত। মানুষের এই স্ব-নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধিই অবশেষে মানবধর্ম্মে পরিণতি লাভ করে। ইহার প্রভাব ব্যতিরেকে কোন মানুষই এমন কোন কার্য্য করিতে পারে না, যাহাকে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত এবং হিতকারী বলা চলিতে পারে, এবং যদ্দ্বারা সে সর্ব্বদিকে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে। ধর্ম্মের প্রভাব বাদ দিয়া রাজনীতিসংশ্লিষ্ট কার্য্য-নিয়ন্ত্রণের কথা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এখন বলিতেছেন বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে এই ভাবের নিয়ন্ত্রণে দ্বন্দ্ব ও কলহের সৃষ্টি হইবে এবং অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় তাঁহাকে অভিভূত হইতে হইবে।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যখন সর্ব্বত্র খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের অভাব দেখা যাইতেছে তখন রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কোন কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিলে তাহাতে অনুগ্রহমূলক ব্যবহার প্রশ্রয় পাইবে এবং তাহার ফলে দ্বন্দ্ব ও কলহের সৃষ্টি হইবে।

কার্য্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর এ-বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ছিল।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার দ্বিতীয় দফা হইতেছে :—

"প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সূচিত হইবার পর হইতে যে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা তীব্রতর ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহা বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।"

আমরাও বলিতেছি "হাঁ, ইহা সত্য যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সূচিত হইবার পর হইতে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা তীব্রতর হইয়াছে—এবং যদি দেশবাসী সুভাষিয়ানা ও গান্ধীয়ানা বর্ত্তমানে যে-ভাবে চলিতেছে, সেই ভাবে চলিতে দেয়, তবে উহারা আরও তীব্রতর হইবে, সুতরাং তাহাদিগকে প্রতিবোধ করিতে হইবে।" কিন্তু, আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে, "কি উপায়ে তাহা করিতে হইবে?" মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার ভাবে ভাবিত ব্যক্তিবৃন্দ ইহা হয়তো বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ইহা সত্য যে, প্রকৃত অর্থে "ফরোয়ার্ড ব্লক"এর বিধানানুসরণও একপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা এবং এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতার সাহায্যে অপর কোন শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ-সাধন সম্ভব নহে। এই প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সাধন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে "সমগ্র মনুষ্যসমাজের, বিশেষতঃ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানের কর্ম্মোদ্দেশ্য-গ্রহণ। ভবিষ্যৎ দেখাইয়া দিবে যে, আর যে-কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং তদ্দ্বারা কেবল প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসার-লাভ ঘটিবে।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার তৃতীয় দফা হইতেছে :—

"কংগ্রেসীদিগের মধ্যে বর্ত্তমানে যে-সকল দোষ দেখা যাইতেছে—কংগ্রেসের কোন প্রতিষ্ঠান আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টার ফলেই হউক, অথবা মন্ত্রিত্বগ্রহণের পরিণাম হিসাবেই হউক—তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।"

আপাত ভাবে ইহা শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে যে-কেহ বুঝিতে পারিবেন যে, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইলে ঝগড়াঝাঁটির সূত্রপাত হইবে, কেন না, যাঁহারা কংগ্রেস্-প্রতিষ্ঠান আয়ত্তাধীন করিতে চাহেন এবং মন্ত্রিত্বগ্রহণের সপক্ষে, তাঁহারা নিষ্ক্রিয় থাকিবেন না। ভবিষ্যৎ দেখাইয়া দিবে যে, যদি জনসাধারণকে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের, বিশেষতঃ ভারতের বেকার ও অনাহার-সমস্যা সমাধানের দাবী উপস্থিত করিবার শিক্ষা না দান করা যায়, তবে কংগ্রেসীদের মধ্যে যে গলদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারেই দূর করা যাইবে না।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার চতুর্থ দফা হইতেছে :—

"কায়েমী স্বার্থের প্রভাব হইতে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর কুক্ষি হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে হইবে। কংগ্রেস্ হইতে বর্ত্তমান প্রভুত্বমূলক মনোভাব দূর করিয়া তথায় গণতন্ত্রকে পুনরধিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেই সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে।"

উপরের তৃতীয় দফার ন্যায়ই ইহা আপাতভাবে শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেও বিবাদ-বিসংবাদ অপরিহার্য্য, কেন না, কায়েমী স্বার্থ এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল ইহার বিপক্ষতা না করিয়া থাকিবেন না।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার পঞ্চম দফা হইতেছে :—

"কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারি কার্য্যপ্রণালীকে আমূল বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী করিতে হইবে।"

উচ্ছৃংখল যুবকবৃন্দের এবং তাহাদের নায়কোচিত গুণাবলীর সহিত 'বৈপ্লবিক মনোভাব' সম্পূর্ণ খাপ খায় বটে, কিন্তু ইহাতে বিবাদ-বিসংবাদ বাধিতে বাধ্য। গভীরভাবে ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, যে দিন হইতে সমাজে বৈপ্লবিক মনোভাব প্রসারলাভে সমর্থ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির ভাগ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা, ব্যক্তিগত নফর-গিরী হইতে মুক্তি, মানসিক শান্তি এবং সম্পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার ষষ্ঠ দফা হইতেছে :—

"কৃষক ও শ্রমিকদিগের আর্থিক স্বাধীনতার আন্দোলনকে কার্য্যদ্বারা সমর্থন করিতে হইবে।"

আমরা জানি না, "কৃষকদিগের আন্দোলনকে কার্য্যদ্বারা সমর্থন" বলিয়া মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সমাজে যতদিন "বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি"র প্রভাব বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা

বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন যে কৃষকদের আর্থিক স্বাধীনতার সহায়ক কিছুই করা সম্ভব হইবে না, তাহা আমরা জানি। ইহা বুঝিবার মত মস্তিষ্কের সামর্থ্য মেসার্স সুভাষচন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর না থাকিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখাইয়া দিবে যে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা যথার্থ। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সমাজ বর্ত্তমানে কি নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নিকর্ম্মভাব আগার হইয়া পড়িয়াছে, তাহা না হইলে এই শ্রেণীর নির্ব্বোধ নেতৃমণ্ডলীকে ইহা সহ্য না করিয়া অবিলম্বে ইহাদের নিপাত-ব্যবস্থা করিত।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার সপ্তম দফা হইতেছে :—

"এক পক্ষে কংগ্রেস এবং অন্যপক্ষে কিষাণ-সভা, ট্রেড ইউনিয়ন, যুবক-সঙ্ঘ, ছাত্র-সভা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা রাখিতে হইবে।"

আমাদের জিজ্ঞাস্য, "কি উদ্দেশ্যে?" সমাজ হইতে সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়নার্থ? যদি উদ্দেশ্য ইহাই হয়, তবে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, কণ্ঠ এবং মাংসপেশীর সাহায্যে সংঘর্ষদ্বারা সমাজ হইতে কখনও সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়িত করা যাইবে না। সাম্রাজ্যবাদ সর্ব্বদাই কুশিক্ষাপ্রসূত, এবং শিক্ষার সংস্কার ব্যতীত আর কোন উপায়ের দ্বারাই উহার প্রতিরোধ সম্ভব হইবে না। এই সংঘর্ষের ফলে কেবল বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত হইবে।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার অষ্টম দফা হইতেছে :—

"সমগ্র ভারতে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

বেশ, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে "সমগ্র ভারত জুড়িয়া অনভিজ্ঞ এবং উত্তেজনাপ্রবণ একদল স্বেচ্ছাসেবক গড়িয়া তুলিলে কি কাজ হইবে?" ইহাতে কি কেবল বিবাদ-বিসংবাদের বৃদ্ধি ব্যতীত আর কোনও কার্য্য হইবে?

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার নবম দফা হইতেছে :—

"কংগ্রেস হইতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগের দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আন্দোলনকে কার্য্য-দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে।..."

এই শ্রেণীর আন্দোলনেও কি ক্রমশঃ বিবাদ-বিসংবাদ এবং ছল-চাতুরী বাড়িয়া চলিবে না? গত প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ ভারত ইহা যথেষ্ট করিয়া আসিতেছে। কিন্তু, জনসাধারণের পক্ষে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সেই অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানে ইহা কি বিন্দুমাত্র সহায়ক হইতে পারিয়াছে? ব্রিটিশ ভারতে যে-সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চলিয়াছে সেই সময়ে জনসাধারণের দারিদ্র্যের মাত্রা এবং তীব্রতা কি কেবলই বৃদ্ধি পাইতে থাকে নাই? ইউরোপের অবস্থার প্রতি চাহিলেই বুঝা যাইবে যে, এই সংঘর্ষের মনোভাবের পরিণাম কি। ইহা বাস্তব সত্য যে, ইউরোপে অনাহার এবং বেকার-সমস্যার তীব্রতা অপর কোন দেশ অপেক্ষা অনধিক নহে। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কি চিন্তা-শক্তির সেই সামর্থ্য বর্ত্তমান, যাহাতে বুঝা যাইতে পারে, ইউরোপের এই অবস্থার মূলে কি?

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার দশম দফা হইতেছে :—

"যদি ভারতবাসী জনসাধারণের স্কন্ধে ব্রিটিশ সরকার ফিডারাল ব্যবস্থা ন্যস্ত করিতে চাহেন, তবে এই ফিডারাল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতে হইবে এবং সকল প্রকার শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ের সাহায্যে ইহার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে।"

ইহাতেও কেবল বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইবে মাত্র। আমরা ঘুণাক্ষরেও এমন কথা বলিতে চাহিতেছি না যে, ১৯৩৫ সনের শাসন-তান্ত্রিক আইনের অন্তর্গত ফিডারাল ব্যবস্থা সকল দিক্ দিয়া সমর্থনের যোগ্য, আমাদের বক্তব্য হইতেছে, কোন ভাবেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংঘর্ষমূলক মনোভাব পোষণ করিলে চলিবে না। ভারতবাসীর কর্ত্তব্য হইতেছে, ব্রিটিশ সরকারের যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ ব্যবস্থা শান্তভাবে মানিয়া লওয়া, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেত তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের দরিদ্র ভারতবাসী প্রজাদের প্রত্যেকের কম পক্ষে খাওয়া-পরার পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন, তাহার জন্য প্রার্থনা-জ্ঞাপন। যদি বৃটিশ সরকার এইরূপ ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তবে তাঁহা-দিগকে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে নিজেদের অন্ন নিজেদের ব্যবস্থা করিয়া লইবার অনুমতি দান করিতে হইবে, একথাও তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে। যদি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার চিন্তায় চিন্তান্বিত ব্যক্তিবৃন্দের ভবিষ্যৎ দেখিবার সামর্থ্য থাকে, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে,

রক্তপাত না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ভারতের স্বাধীনতা এবং ঐক্য অর্জ্জনের পথে ইহা একটি ধাপ।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার একাদশ দফা হইতেছে :

"গ্রেটবৃটেন কর্ত্তৃক যাহাতে ভারত কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া পড়ে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যাহাতে সৈন্য কিংবা অর্থাদিরূপ কোন ভারতীয় সংস্থান শোষিত ও কার্য্যকর না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।"

ইহাতেও কেবলই বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইবে। প্রথমতঃ, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায়, ব্রিটিশ সরকার যদি স্বকীয় স্বার্থে সৈন্য এবং অর্থাদিরূপ ভারতীয় সংস্থান কার্য্যে লাগান তবে ভারতের পক্ষে তাহাতে বাধা উপস্থিত করা কখনও সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই চেষ্টায় ভারতবাসীর যে বাস্তব সমস্যা, সেই অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানের কোন প্রকার সাহায্য হইবে না। ইহা কেবল তিক্ততার সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই করিবে না।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার দ্বাদশ দফা হইতেছে :—

"আবার ব্রিটিশ মাল এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রতি জোর দিতে হইবে..."

ব্রিটিশ শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা সামান্য অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের টাকা-কড়ি তৈয়ারীর চাল সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই শ্রেণীর আন্দোলন দ্বারা ব্রিটিশ জনসাধারণ অথবা ব্রিটিশ সরকারের পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের উপর কর্ত্তৃত্ব কোনরূপে খর্ব্ব করা যাইবে না। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, "বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি ব্যতীত এই আন্দোলনের আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?"

যতদূর সম্ভব তীব্রতা ও ব্যাপকতার সহিত অতীতে এই বর্জ্জন-আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশের মধ্য হইতে জনসাধারণের অনাহার ও বেকার-সমস্যা সামান্য ভাবেও দূর করা সম্ভব হয় নাই। ইহা করা দূরে থাক্, দেশের মধ্যে অনাহার ও বেকার-সমস্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই গিয়াছে। এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা সম্বন্ধে প্রমাণ কি ইহাই যথেষ্ট নহে? আশ্চর্য্য যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু আজিও এই সহজ কথাটি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার ত্রয়োদশ দফা হইতেছে :—

"রাজনৈতিক কর্ম্মীদের যথাযথ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

বেশ, কিন্তু আদর্শ স্থির না করিয়া তাহার শিক্ষার চিন্তা করিয়া কি লাভ? দেশবাসীর সম্মুখে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যে কর্ম্মপন্থা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এক কথায়, তাঁহার রাজনীতি হইতেছে, নানা ছলে বিবাদ-বিসংবাদের বৃদ্ধি। তাঁহার পরিকল্পিত রাজনৈতিক শিক্ষাও তাহা হইলে দেশের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ভাববৃদ্ধির সগোত্র হইতে বাধ্য। দেশবাসী কি এই বিষয়ে আজিও যথেষ্ট 'তিত-বিরক্ত' হয় নাই?

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার চতুর্দ্দশ দফা হইতেছে :—

"পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন যাহাতে শীঘ্রই পুনর্গৃহীত হইতে পারে, দেশকে এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

আমাদের কেবল জিজ্ঞাস্য, "কি উপায়ে?" অতীতে এই বিষয়ে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, তাঁহার মনের মধ্যে হয় "আইন-অমান্য" এবং "অসহযোগ", নয় "গরিলা যুদ্ধে"র জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কথা জাগ্রত রহিয়াছে। ইহাদের দ্বারাও কেবলই বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই হইবে না।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ দফা হইতেছে :—

"জাতীয় পুনঃসংগঠনক্ষেত্রে, "ফরোয়ার্ড ব্লক" ভারতের জন্য পরিকল্পনা, বিশেষতঃ যন্ত্র-শিল্পমূলক পরিকল্পনার সমর্থন করিবে।"

যদি "যন্ত্র-শিল্পমূলক পরিকল্পনা" জাতীয় পুনঃসংগঠনের সাহায্য করিয়া কোন দেশের বেকার ও অনাহার-সমস্যা দূর করিতে সমর্থ হইত, তবে অন্ততপক্ষে ইউরোপে কোন প্রকার বেকার ও অনাহার-সমস্যা দেখা যাইত না। অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান দূরে থাক, যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের প্রতি অত্যধিক জোর দিলে, শেষতঃ তাহার ফলে বাজার অধিকার করিবার জন্য ছল-চাতুরী এবং যুযুৎসু মনোভাব জাগ্রত হইতে বাধ্য। ইউরোপ ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মপন্থার

এই দফাও তাঁহার বিবাদ-বিসংবাদের মনোভাবের আর একটি নমুনা।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার ফরোয়ার্ড ব্লকের যে কর্ম্মপন্থা উপস্থিত করিয়াছেন, সমগ্রভাবে তাহা এইরূপে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, ফরোয়ার্ড ব্লককে কোন প্রকারেই দেশের হিতকারী সংগঠন বলিয়া ধার্য্য করা যায় না, সুতরাং যাঁহারা দেশের হিতসাধনের ইচ্ছা পোষণ করেন, ইহা তাঁহাদের সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আমরা ভবিষ্যবাণী করিতেছি যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর এই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' ইহার কর্ম্মপন্থার দিক্ হইতে অচিরাৎ কার্য্যতঃ মৃত্যু লাভ করিবে, কেবল দেশের প্রকৃত উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ একটি বিবদমান দল হিসাবে ইহা বিদ্যমান থাকিবে মাত্র। ইহাতে কেবল প্রমাণ হয়, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ কি পরিমাণ কলহ-পরায়ণ এবং বালকোচিত।

তাঁহার দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড ব্লক' অভিহিত সাপ্তাহিক পত্রিকার গত ৫ই আগষ্টের সংখ্যায় "ফরোয়ার্ড ব্লকের ইতিবৃত্ত (Why Forward Bloc)"-শীর্ষক সন্দর্ভে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায়; মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কি পরিমাণ কলহপরায়ণ এবং বালকোচিত। আলোচ্য সন্দর্ভটী প্রধানতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ দর্শন-বিষয়ক এবং দ্বিতীয়াংশ তাঁহার দর্শনের উপসংহার।

দর্শন-বিষয়ক অংশের মোটামুটি বক্তব্য হইতেছে নিম্নলিখিত রূপঃ

(১) যাঁহারা 'গতিবেগ' (dynamism) এবং বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি হারাইয়াছেন, সুবিধানুযায়ী তাঁহাদের মুখে বর্ত্তমানে যে কোন মূল্যে এবং যে-কোন অবস্থায় ঐক্যের ধুয়া শোনা যাইতেছে। ইহার সুমনোহর আবেদন যেন আমাদিগকে না বিভ্রান্ত করে।

(২) বর্ত্তমানে কংগ্রেসে দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা কর্ত্তব্য নহে এবং সমগ্র ভাবে বর্ত্তমান কংগ্রেস বামপন্থী, ইহা বলা নিতান্ত নির্ব্বোধোচিত ভাষণ।

(৩) সংগঠনের উন্নতির জন্য বামপন্থীর উদ্ভব ও বৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তাঁহার এই দর্শন যথাযথভাবে অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে গতিবেগ ও বিপ্লবাত্মক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির কার্য্য এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বদা উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও বিকৃতিবিষয়ক প্রকৃত দর্শন সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, গতিবেগই হউক আর বৈপ্লবিক প্রবৃত্তিই হউক, উহার একটিও প্রকৃতির কার্য্য নহে উহারা বিকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতি বিভিন্ন অণু সৃষ্টি করে এবং তাহাদিগকে একত্র করে, তাহারই ফলে সত্তার বিকাশ ও বৃদ্ধি সাধিত হয়, অন্যপক্ষে, বিকৃতি বিভিন্ন সত্তার ধ্বংস ও মৃত্যু সাধন করে। সুতরাং গতিবেগ এবং বৈপ্লবিক প্রবৃত্তিকে কখনও ব্যক্তি ও সমাজের হিতকারী বলিয়া যুক্তিযুক্ত ভাবে আখ্যাত করা যায় না।

স্বকীয় দর্শনের যাথার্থ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের উদাহরণ উপস্থিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যের মুখ্য কথা হইতেছে এই যে, গতিবেগ এবং বৈপ্লবিক প্রবৃত্তির জন্যই কংগ্রেসে গান্ধীবাদের উদ্ভব এবং ইহার গতিবেগ ও বৈপ্লবিক প্রবৃত্তির অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই কংগ্রেস আজ গান্ধীবাদের আসন্ন বিলোপের সম্মুখীন হইয়াছে। আমাদের প্রশ্ন এই যে যদি গতিবেগ এবং বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি চিরন্তন বৃদ্ধিরই সহায়তা করিতে পারে, তবে যাঁহারা উহা একবার অর্জ্জন করেন তাঁহারাই আবার উহা হারাইয়া বসেন, এমন ঘটে কেন? মিঃ গান্ধী এই গতিবেগ এবং বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি যদি একবার অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইহাই যদি তাঁহার প্রভাবের হেতু, তবে সেই গতিবেগ এবং বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি এবং তৎসহিত তাঁহার প্রভাব তিনি হারাইতে বসিয়াছেন কেন?

সুতরাং যুক্তিসঙ্গত ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, গতিবেগ এবং বৈপ্লবিক প্রবৃত্তির দ্বারা চিরন্তন বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, ইহা বলা বালকোচিত এবং নিতান্ত অর্ব্বাচিনের। ইহাতে কেবল মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কলহপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের মতে, তিনি অত্যন্ত অপরিণত এবং যে-তথ্য কহিতেছেন, তাহা যে কি, তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানেন না এবং দেশবাসী যদি এই শ্রেণীর অপরিণত ব্যক্তিবৃন্দের কার্য্যকলাপ হইতে আত্মরক্ষা না করেন, তবে তাঁহাদের উন্নতির বিলম্ব হওয়া অনিবার্য্য। মনুষ্য-সমাজের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে মনুষ্যত্বধারী কোন ব্যক্তি কি, যদি তাঁহারা মনুষ্যোচিত বুদ্ধিযুক্ত হন, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারেন?

গত মাসের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা এবং তাহা হইতে জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়*

দেশ কোন্ পথে পরিচালিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে দেশের নেতৃবৃন্দসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী অনুধাবন করার অত্যন্ত প্রয়োজন। ঘটনাসমূহের যথাযথভাবে অনুধাবন এবং তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির কার্য্যকলাপের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলে কোন ব্যক্তিকে দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হয় না। অর্থাৎ, প্রকৃতি কি, কোথা হইতে তাহার উদ্ভব, তাহার বিধি কি, তাহার বিধিবিরুদ্ধ বিবিধ ঘটনাবলীর কিরূপে উত্থান-পতন ঘটে, ইহা যদি কোন ব্যক্তি জানিতে পারেন এবং প্রকৃতির নিয়মসঙ্গত কার্য্যকলাপের গতিবিধিতে যদি তিনি অভ্যস্ত হইতে পারেন, তবে তাঁহার পক্ষে এমন কোন কিছুর সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নহে, যাহাতে তিনি অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজে না বুঝিয়া উঠিতে পারেন প্রকৃতি কি এবং কোথা হইতে তাহার উদ্ভব, কিন্তু যাঁহারা এই সকল তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যে প্রকৃতির বিধিসমূহ জানিয়া তদনুযায়ী নিজকে পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত হন, তবে যাহাকে সমস্যা কিংবা জটিলতা বলা যাইতে পারে, তেমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হওয়া তাঁহার পক্ষে নিশ্চিতরূপে অসম্ভব। অন্য পক্ষে, যে-ব্যক্তির প্রকৃতির উদ্ভব অথবা তাহার বিধি-বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন আয়ত্তের বাহিরে, তাহার জীবন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে বাধ্য।

ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতিরূপী বিভিন্ন ব্যক্তি-সঙ্ঘের পক্ষেও তাহাই সত্য।

এমন ঘটনা যদি ঘটে, যাহাতে একটি মাত্র ব্যক্তি প্রকৃতি কি, কোথায় তাহার উদ্ভব, কিরূপ তাহার কার্য্য, তাহার বিধি কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তবে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ীই তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রকৃতিসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য কিংবা অন্ততপক্ষে মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক চাল-চলননিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক বিধি কি, তাহা তাঁহার সতীর্থগণকে না জানাইতে পারেন, ততক্ষণ সেই ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারেন না। এইরূপে সমগ্র মনুষ্যজাতি অন্ততপক্ষে প্রকৃতির নিয়ম-সঙ্গত কার্য্যকলাপের গতিবিধি বিষয়ে অভ্যস্ত এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ সমস্ত কিছুর প্রতি বীতরাগ হয় এবং অবশেষে জাতির, অথবা, এমন কি, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমস্যাসমূহের সমাধান হয়।

আবার যদি এমন হয় যে, সমগ্র জাতির মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিরও অভাব, যিনি প্রকৃতির উদ্ভব এবং বিধিসমূহ জানিতে পারিয়াছেন, তবে ঐ জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাহার চাল-চলনে উচ্ছৃংখল হইয়া বিপদের পর বিপদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়।

উপরিলিখিত তত্ত্বের উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য আমাদের এই যে, আমরা এমন জগতে বাস করিতেছি, যেখানে একটি মাত্র ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে না, যিনি যথার্থভাবে দাবী করিতে পারেন যে, তিনি প্রকৃতি, তাহার উদ্ভব, উদ্ভব-বিধি এবং প্রকৃতির বিধিসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই আমাদের অবস্থা নিকৃষ্ট হইতে ক্রমশঃ নিকৃষ্টতর হইয়া পড়িতেছে।

উপরিলিখিত তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণার্থ আমরা নিম্নে গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ কালের মধ্যে সংঘটিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার আলোচনা করিব। ঘটনাগুলি এই :—

(১) এ.-আই. সি. সি.-র নিম্নোদ্ধৃত দুইটি প্রস্তাবের প্রতিবাদকল্পে সমগ্র ভারতব্যাপী সভা।
   (ক) সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের কোন লোক কর্ত্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহগ্রহণ নিষেধীকরণ।
   (খ) প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটীসমূহ বনাম কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী।

(২) এ.-আই. সি. সি.-গৃহীত প্রস্তাবদ্বয়ের প্রতিবাদকল্পে সভার অধিবেশন না করিবার নিমিত্ত মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের শেষমুহূর্ত্তের আবেদন।

(৩) মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ইহার প্রত্যুত্তর।

(৪) মিঃ গান্ধীর রাজনীতি হইতে অবসরগ্রহণ উচিত কি না, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে তদ্বিষয়ে বিতর্ক-সভা।

---

* ২০শে জুলাই তারিখের "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "Notable Events of the Past Week and the General People's lessons from them"-শীর্ষক সন্দর্ভের অনুবাদ।

(৫) বোম্বাই সহরে মাদকতা-বর্জ্জনার্থ বোম্বাই সরকারের পরিকল্পনার মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর নিন্দাসূচক বিবৃতি।

(৬) তদুত্তরে মিঃ গান্ধীর বিবৃতি।

(৭) মিঃ ন্যাঠে কর্ত্তৃক মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর সমালোচনা।

(৮) সর্দ্দার প্যাটেল কর্ত্তৃক উহার সমালোচনা।

(৯) 'হরিজন' পত্রিকায় মিঃ গান্ধীলিখিত নিম্নাভিহিত সন্দর্ভসমূহ।

(ক) অহিংসা বনাম হিংসা,

(খ) পার্শি ও মদ্য,

(গ) দেশীয় নৃপতিদের উদ্দেশে।

উপরের এই সকল ঘটনার কোন একটিতেও দেশের হিত সাধিত হইবে কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রকৃতির কোন নিয়মসঙ্গত কি না। প্রকৃতির কোন নিয়মের সহিত এই সকল ঘটনার কোন একটির সঙ্গতি আছে কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে প্রকৃতির মূল নিয়ম কি, অন্ততপক্ষে তাহা জানিতে হইবে। প্রকৃতির মূল নিয়ম কি তাহা জানিতে হইলে আমাদিগকে অন্ততপক্ষে জানিতে হইবে যে, মনুষ্যদেহের মধ্যে প্রকৃতি কি এবং প্রকৃতি কি নহে।

পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতিসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শ্রেণীর কোন সন্দর্ভে উহার সমগ্র ভাগের আলোচনা করা সম্ভব নহে। যদি কাহারও জানা থাকে যে, ইহার বিষয়ভাগ কি এবং তাহার বিস্তৃতি কতখানি, তিনি আমাদিগের উক্তি সমর্থন করিবেন যে, ইংরাজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে-সব কথ্য ভাষা অংশতঃ কয়েকটি সঙ্কেতকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভাষার অন্তর্গত অক্ষরনিহিত শব্দবিজ্ঞানের উপর যাহাদের ভিত্তি গঠিত নহে—যেমন ইহার সমগ্র বক্তব্য প্রকাশ করা যায় না, তেমনই কয়েক শত অথবা কয়েক সহস্র পৃষ্ঠার মধ্যে ইহার আলোচনা শেষ করা যায় না।

প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় সমগ্র জ্ঞাতব্য কেবল সংস্কৃত, অথবা হিব্রু, অথবা আরবী ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু আধুনিক কালের ঐ সকল ভাষার দ্বারা নহে, যে-সময়ে ঐ ভাষাত্রয় সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন উহার স্বরূপ ছিল কেবল তৎসময়ে; কেন না, মাত্র এই তিনটি ভাষারই মূল ভিত্তি ভাষান্তর্গত অক্ষরনিহিত শব্দবিজ্ঞান। আধুনিক কালে এই তিনটি ভাষার যে রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যে প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য প্রকাশ করা যায় না, তাহার কারণ এই যে, ইহাদের অক্ষরনিহিত যে শব্দ-বিজ্ঞান তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে এবং এই তিনটি ভাষায় প্রকাশিত ভাব যে-ভাবে বুঝা উচিত, এখন আর সে-ভাবে বুঝা হয় না। এইবিষয়ক সমগ্র বক্তব্য আলোচনা দূরে থাক্ কথা ভাবছি যে কোন একটিতে ইহার যে-অংশ প্রকাশ করা যায়, তাহা করিতে হইলে আধুনিক বৃহত্তম কোন বিশ্বকোষের আয়তন প্রয়োজন হইবে।

সুতরাং আমরা এখানে কেবল মনুষ্যদেহে প্রকৃতি কি এবং প্রকৃতি কি নহে, তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিব।

মনুষ্যদেহে প্রকৃতি কি এবং প্রকৃতি কি নহে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত 'প্রকৃতি' কথাটির অন্তর্ভুক্ত বর্ণের শব্দ হইতে ইহার কি অর্থ দাঁড়ায়, তাহা জানিবার চেষ্টা করা দরকার। 'প্রকৃতি' কথাটি বাস্তবিক 'ক্রিয়াত্মক' (দ্রব্যাত্মক কিংবা গুণাত্মক নহে), যে ক্রিয়ার ফলে বুদ্ধির কার্য্য সম্ভব হয় এবং যাহা প্রকৃত মানুষের উপযোগী শক্তিসমূহের বিকাশ সম্ভব করে, তাহাই প্রকৃতি। দেহধারণের বহু পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় প্রথম যে-ক্রিয়ার আরম্ভ, বাস্তবিকপক্ষে তাহাই 'প্রকৃতি'। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় এই প্রথম ক্রিয়া কি? মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় বিরাজমান এই প্রথম ক্রিয়া কি, তাহা জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা তেজ, রস ও বায়ুর উগ্রতা-লাভেরও পূর্ব্বের অবস্থার সংমিশ্রিত ক্রিয়াবিশেষ, ইহাই অতঃপর উগ্রতা-লাভ করিয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণ মনুষ্যদেহের বিকাশ সম্ভব করে। উগ্রতাবিহীন তেজ, রস ও বায়ুর বীজাবস্থার এই প্রাথমিক মিলিত ক্রিয়াকেই তাহা হইলে "মনুষ্যের প্রকৃতি" বলিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, তেজ, রস ও বায়ুর মিলিত ক্রিয়াকেই—বিচ্ছিন্নভাবে তেজ, কিংবা রস, কিংবা বায়ুকে নহে, কিংবা এই তিনটি উপাদানের মিলনকে নহে—"মনুষ্যের প্রকৃতি" বলিতে হইবে। মনুষ্যের কার্য্যকলাপ এবং গতি-

বিধি সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যের দ্বারা এমন কোন কার্য্যকলাপ কিংবা গতিবিধি সম্ভব নহে, যাহার মূলে তেজ, রস ও বায়ুর এই মিলিত ক্রিয়া নাই। এই জন্যই ধার্য্য হয় যে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে মনুষ্য নড়িতে কিংবা কার্য্য করিতে পারে না। কেবল মনুষ্যের ক্ষেত্রে নহে, এই পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের কার্য্য ও চালচলন যত্নসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সকল কিছুরই কার্য্য ও চালচলন মূলতঃ এই তেজ, রস ও বায়ুর উল্লিখিত মিলিত-ক্রিয়াবিশেষের ফল। এই জন্যই প্রকৃতিকে সর্ব্বব্যাপক বলা হয়।

মাতৃগর্ভে জ্রূণাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ মনুষ্যদেহ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কি ভাবে মনুষ্য বিকাশ লাভ করে, তাহার অভ্রান্ত পর্য্যালোচনায় বুঝা যাইবে যে; উগ্রতাহীন বীজাকারের তেজ, রস ও বায়ুর মিলিত ক্রিয়ার অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রথমতঃ অব্যক্তের উগ্রতায়-ব্যক্তি, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ তেজ, রস ও বায়ুরূপে ব্যক্তাবস্থা, তৃতীয়তঃ মেদ, চতুর্থতঃ অস্থি, পঞ্চমতঃ মজ্জা, ষষ্ঠতঃ বসা, সপ্তমতঃ মাংস, অষ্টমতঃ রক্ত, এবং সর্ব্ব-শেষে ত্বক্ আকার গ্রহণ করে এবং এই ভাবে মনুষ্য সম্পূর্ণ অবয়ব লাভ করে। প্রকৃতির পরে যাহা কিছু, তাহা প্রকৃতি নহে, বস্তুতঃ প্রকৃতির সৃষ্টি। সুতরাং দেখা যাইবে যে, মনুষ্যদেহে যেমন 'প্রকৃতি' রহিয়াছে, তেমনই আবার অনেক কিছু রহিয়াছে, যাহা 'প্রকৃতি' নহে। মনুষ্যদেহে যাহা প্রকৃতি নহে, প্রকৃতির সৃষ্টি মাত্র, তাহা প্রধানতঃ তাহার তেজ, রস ও বায়ুর উগ্রতা, তাহার মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও ত্বক্ হইতে উদ্ভূত। এই ঘটনা গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতির মূল নিয়ম হইতেছে বিকাশ, ঐক্য এবং বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকলাপে সাম্য।

এইবারে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে মনুষ্যের মধ্যে ক্ষয়, বিভেদ এবং বৈষম্য দেখা যায় কেন। ইহার উত্তর এই যে, মনুষ্যদেহে যেরূপ প্রকৃতির কার্য্য বিদ্যমান, তেমনই অপর কয়টি অংশের (যথা, তেজ প্রভৃতির উগ্রতা, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং ত্বকের স্বীয় কার্য্য (যথা, বাসনা প্রভৃতি) বিদ্যমান। যতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি তাহার প্রকৃতির কার্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, সুতরাং অপরাপর অংশকে তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার সহায়তা করিতে পারে না, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার এই সকল অংশ সর্ব্বদা বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা মিলিত ভাবে নিজেদের চরিতার্থতা সাধন করিতে চাহে। ফলে প্রথমতঃ বৈষম্য, দ্বিতীয়তঃ সংঘর্ষ এবং শেষতঃ ধ্বংস ঘটে। অর্থাৎ যে সকল কার্য্যে সর্ব্বব্যাপী বিকাশ, ঐক্য এবং সাম্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সকল কার্য্যকে প্রকৃতি অনুযায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং যে সকল কার্য্যে ধ্বংস, বিভেদ ও বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সকল কার্য্যকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে-কার্য্যে কোন প্রকার বৈষম্য, সংঘর্ষ ও ধ্বংসের সামান্য মাত্র আভাস পাওয়া যায়, তাহাকে সমাজের পক্ষে অহিতজনক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় এবং যে-কার্য্য সর্ব্বব্যাপী বিকাশ, ঐক্য ও সাম্যের চিহ্ন-প্রকাশক, সেই কার্য্যকে সমাজ, তথা জাতির পক্ষে হিতজনক হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

এই মূল নীতি সম্মুখে রাখিয়া যদি উপরিলিখিত ঘটনা-সমূহের বিবেচনা করা হয়, তবে যে কাহারও নিকট প্রতিভাত হইবে যে, ভারতবর্ষে এমন একটি ঘটনা দেখা যায় না, যাহা তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইবার সহায়ক।

আলোচ্য ঘটনাসমূহের প্রত্যেকটিতে হয় ধ্বংস, নয় সংঘর্ষ, নয় বৈষম্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

এক নম্বর ঘটনার (অর্থাৎ, এ.-আই. সি.-সির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার জন্য সভাসমূহ) যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের মনোভাব ইহার মধ্যে সুপরিস্ফুট, ভারতবাসী জনসাধারণের সেবার মনোভাব হইতে উহা উদ্ভূত নহে।

দুই নম্বর ঘটনার (অর্থাৎ, এ.-আই.সি.-সির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার জন্য সভা স্থগিত করিতে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের শেষ মুহূর্ত্তের আবেদন) যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে স্বকীয় প্রাধান্য বজায় রাখিবার ভাব সুপরিস্ফুট এবং অন্যায়কারীরা যাহাতে স্বতঃই ন্যায়পথে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়, তাহা করিবার সামর্থ্যের কোন পরিচয়ই ইহাতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার মধ্যেও সর্ব্বনাশকর পরিচয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমগ্র

ভারতকে একটি সূত্রে গ্রথিত করিবার মনোভাবের বিন্দুমাত্রও পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় নম্বর ঘটনার (অর্থাৎ ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের আবেদনে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উত্তর) যথাযথভাবে বিশ্লেষণ হইতেও দুই নম্বর ঘটনায় যে-সকল দোষ পরিলক্ষিত হয়, তাহাই ধরা পড়ে।

চার নম্বরের ঘটনার (অর্থাৎ, মিঃ গান্ধীর রাজনীতি হইতে বিদায়গ্রহণ সঙ্গত কি না, ইহা নির্দ্ধারণার্থ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলের বিতর্ক) যথাযথ বিশ্লেষণ হইতে ধরা পড়িবে যে, বিতর্কের প্রত্যেকটি বক্তৃতা সংঘর্ষোন্মুখ এবং নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার ভাব হইতে উদ্ভূত এবং একটিতেও যথাবিহিত ভাবে দেশ-সেবার মনোভাবের সামান্য মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাঁচ, সাত ও আট নম্বরের ঘটনার যথাযথ বিশ্লেষণে অগ্রসর হইলেও ঐ সংঘর্ষোন্মুখতা এবং স্বকীয় প্রাধান্য বজায় রাখিবার ভাবই ধরা পড়ে এবং ইহাদিগকেও অপর কয়টি ঘটনার ন্যায়ই নৈরাশ্যজনক বলিতে হয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, তিনি এবং তাঁহার দল যাহা করিতেছেন, তাহাতেই দেশের হিত, আবার সর্দ্দার প্যাটেলও তাঁহার দিক্ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এবং তাঁহার দল যাহা কিছু করেন, তাহাকে দেশবাসীর প্রশংসা করা উচিত। এই বিকৃতিসমূহের একটিতেও, প্রকৃতপক্ষে দেশের হিত-সাধনকল্পে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার মনোভাব দৃষ্ট হয় না।

ছয় এবং নয় নম্বরের ঘটনার (অর্থাৎ, মিঃ গান্ধীর বিবৃতি এবং সন্দর্ভসমূহের) যথাযথ বিশ্লেষণ হইতে ধরা পড়ে যে, ভাসা-ভাসা-ভাবে উহাদের প্রত্যেকটিই উদার ভাবের এবং দুই পক্ষের মিলন-সংস্থাপনের চেষ্টার প্রকাশক; কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, অপর সকলের বিবৃতিতে যাহা সুস্পষ্ট, মিঃ গান্ধীর বিবৃতি ও সন্দর্ভসমূহের প্রত্যেকটীও সেই একই স্বকীয় প্রাধান্য বজায় রাখিবার মনোভাব হইতে উদ্ভূত। মিঃ গান্ধী এবং অপর সকলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মিঃ গান্ধী যেরূপ বাক্যনিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বকীয় মনোভাব গোপন রাখিবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের কাহারও সেই ক্ষমতা নাই।

সকল ঘটনা একত্র রাখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থরূপে চিন্তা করিয়া আমরা এই উপসংহার করিতে বাধ্য যে, আজিও পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণ দেশকে তাহার যথার্থ লক্ষ্যে পরিচালিত করিবার উপযোগী কোন কার্য্যপ্রণালী গ্রহণ করেন নাই।

এই সব নেতার কার্য্যাবলী এইরূপ কেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার প্রধান কারণ প্রকৃতির উদ্ভব এবং উদ্ভবপ্রণালী সম্বন্ধীয় জ্ঞান দূরে থাকুক ইঁহাদের কাহারও প্রকৃতির মূলনীতিসম্বন্ধীয় সামান্যতম ধারণাও নাই।

উপসংহারে, আমরা দেশবাসীকে এই একটি বিষয়ে অবহিত হইতে বলি যে, তাঁহারা ভ্রান্ত নেতৃমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এবং যদি তাঁহারা ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ না করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের ভবিষ্যতে দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিমাণ এবং তীব্রতার বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নাই। মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়কে তাঁহারা যথেষ্ট লাভ হিসাবে বিবেচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে প্রখর দৃষ্টি অর্জ্জন করিতে পারিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রকে যথার্থ ভাবে কার্য্যকরী করিতে পারিলে, তদ্দ্বারাও দেশের কিছু বাস্তব উপকার হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু যে-ভাবে মেসার্স গান্ধী এণ্ড কোম্পানীর পরিচালনায় উহার কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে ক্রমশঃ তাঁহারা অধিকতর দুঃখ-দুর্দ্দশায় নিপীড়িত হইতে থাকিবেন। অতীতে মিঃ গান্ধীর এই নেতৃত্ব-পর্ব্বে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা যদি তাঁহারা ঠিকমত বিবেচনা করিতে পারেন, তবে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার যাথার্থ্য তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

কোন প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত না করিয়া এই সকল অপদার্থ নেতৃমণ্ডলীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র পন্থা হইতেছে, দেশবাসী সকলে নিতান্ত তাঁহাদের যাহা না হইলে নয়, তাহা পাইতে পারেন, তদুপযোগী কোন পরিকল্পনা নেতাদের নিকট যাচ্ঞা করুন এবং তাঁহাদিগকে বলুন যে, এইরূপ পরিকল্পনা না স্থির করিয়া স্বাধীনতার কথা-উত্থাপন বৃথা। বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দকে রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে

বিদায়গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করিতে হইবে এবং তাঁহারা উল্লিখিত পরিকল্পনা স্থির করিতে সমর্থ না হইলে তাঁহারা যেন জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব যাচ্ঞা না করেন, ইহাও তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে।

ভারতের মুক্তির একমাত্র পন্থা হইতেছে—ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধেই হউক, কিংবা দেশের মধ্যে যাঁহারা ব্রিটিশ জাতির সপক্ষে তাঁহাদের বিরুদ্ধেই হউক, সকলের প্রতি হিংসার ভাব পরিহার করিয়া বর্ত্তমানে যে স্বাধীনতার ধুয়া উঠানো হইয়াছে, অনতিবিলম্বে তাহার বর্জ্জন এবং যে-কার্য্যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকে আর্থিক অভাব, ব্যক্তিগত নকরগিরী, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি, অকাল-বার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ। একমাত্র ভারতেই এই উদ্দেশ্যে কার্য্য সম্ভব, অপর কোন দেশে ইহা সম্ভব নহে, কেন না সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্পর্কে ভারতের অবস্থানে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তাহা অপর দেশের নাই। হইতে পারে, আধুনিক কালের গোঁড়া বৈজ্ঞানিক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, সেই সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণের কেহ ইহা না জানিতে পারেন, কিন্তু ইহা সত্য এবং তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে কার্য্যে অবতীর্ণ হইলে ভারতের যাহা কাম্য, কেবল যে সেই স্বাধীনতাই মিলিবে তাহা নহে, অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্বের শ্রদ্ধার আসনও ভারতের হইবে।

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, ভারতের মুক্তির ইহাই একমাত্র পন্থা এবং বাঞ্ছিত স্বাধীনতা পাইবারও আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই। দেশ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে আমরা যে কথার কথা বলিতেছি না, তাহার প্রমাণ পাইবে।

...কোন্ উপায়ে বর্ত্তমান জগৎকে তাহার জগাখিচুড়ী ও শঙ্কাপ্রদ অবস্থা হইতে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বর্ত্তমান জগৎ কেন এই জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমান জগৎ কেন এই জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইলে, জগতের কোন্ অবস্থাকে তাহার জগাখিচুড়ীর অবস্থা, আর কি হইলে তাহার শান্তি ও শৃঙ্খলাময় অবস্থার উদ্ভব হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

কি হইলে জগৎ জগাখিচুড়ীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আর কখন উহা শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত রহিয়াছে বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহার আলোচনা অতীব বিস্তৃত একটি দর্শন-বিষয়ক।

সংক্ষেপতঃ উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মানুষ বাস্তবতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়গুলি কাম্যবস্তু অথবা অর্থের প্রাচুর্য্যের জন্য, প্রত্যেকের মন শান্তি ও সুখের জন্য এবং প্রত্যেকের বুদ্ধি জগতে কেন কি হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে।

যখন জগতে মানুষের কাম্যবস্তুর প্রাচুর্য্য, মনের শান্তি ও সুখ এবং জগতে কেন কি হইতেছে, তাহা বুঝিবার মত বিদ্যা ও শিক্ষার উৎকর্ষ বিদ্যমান থাকে, তখন উহা শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে হয়। আর তদ্বিপরীত অবস্থার নাম জগাখিচুড়ী অবস্থা।

মানুষের সাধারণ (common) কাম্যবস্তু কি কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের যত কিছু সাধারণ কাম্যবস্তু আছে তন্মধ্যে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘায়ু সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

কাযেই মানব সমাজ যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিরাজিত থাকে, তাহা করিতে হইলে, প্রত্যেক মানুষ যাহাতে খাদ্য ও পরিধেয় প্রভৃতি আর্থিক দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ যৌবন, দীর্ঘায়ু শান্তি, সন্তুষ্টি এবং প্রকৃত বিদ্যা ও শিক্ষা উপভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষ যে আর্থিক অপ্রাচুর্য্য, পরমুখাপেক্ষিতা, অকাল-বার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যু, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, কু-বিদ্যা ও কু-শিক্ষায় জর্জ্জরিত হয়, তাহা কেন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মানুষের ঐ অবস্থা স্রষ্টার প্রদত্ত, অথবা নিজ কর্ম্মফল-প্রসূত, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ অবস্থা সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিজ কর্ম্মফল-প্রসূত। আর্থিক অপ্রাচুর্য্য, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিরুদ্ধাবস্থা যদি স্রষ্টার প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে যে কোন একজন মানুষের পক্ষেও প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, প্রভৃতি সম্ভোগ করা সম্ভবযোগ্য হইত না, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

কি হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘযৌবন, দীর্ঘায়ু, শান্তি, সন্তুষ্টি, প্রকৃত বিদ্যা ও প্রকৃত শিক্ষা সম্ভোগ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য

প্রথমতঃ, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি,

দ্বিতীয়তঃ, পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রার অকৃত্রিমতা,

তৃতীয়তঃ, মানুষ যাহাতে অভিমান অথবা অহঙ্কার বিসর্জ্জিত করিবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি প্রভৃতি উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি লাভ করিয়া জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলায় অবস্থা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।...

হেঁয়ালী নং ৪

—কস্যচিদ্বোদ্ধস্য

আনন বিস্ময়স্মিত, হরষ-বিজলী
খেলে নয়নের কোণে—
মন্ত্রদাতা, করিয়াছ অভিমন্যুবধ
মিলি' সপ্তরথীসনে।
দানিল যে শিষ্য ভক্তি, মান পিতৃজ্ঞানে,
সাধিলে পতন তাঁ'র,
অর্জ্জিলে; কহিছে সবে, পুত্রহত্যা-পাপ,
হেরি' এই ব্যবহার।
শুনিনু করিলে যাত্রা বৃন্দাবন পানে,
ভাবিলাম অনুতাপে,
পরিলে তুলসীমালা, ধর্ম্মে দিলে মন,
ধুইতে সঞ্চিত পাপে।
শুনিনু আবার এক নব বৃন্দাবন
সৃজিত তোমার তরে —
নাহি চিহ্ন সেথা শ্যামসুন্দর রাধার;
নাহি যমুনার তীরে
বংশীবট, নাহি চন্দ্রাবলীকুঞ্জ তথা
নাহি রব মুরলীর,
মোহিনী শকতি যা'র করিল আহত
মর্ম্মস্থল গোপিনীর
সেই তীর্থ যথা তুমি গণনা যা'দের—
মিলিল অনেক চেলা,
হ'ল কোলাহল, পুণ্যস্থলে বিশৃঙ্খল,
তবে সে ভাঙ্গিল মেলা।
পারি কি সুধা'তে যদি নিস্পৃহ সংসারে,
অর্থে কিবা প্রয়োজন ?
কেবা রাখে, কেবা দেখে হিসাব তাহার,
কেবা করে সংরক্ষণ ?
এত অর্থ এত স্থানে করিলে সংগ্রহ,
আছে কি হিসাব তা'র—
কি কার্য্যে করিলে ব্যয়, কাহার লাগিয়া
করিলে কি উপকার ?

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ" হেরি সেই মত
মনোবৃত্তি তব,—ভগবান তুমি যেন
সৃষ্টিস্থিতিলয়রত,
সর্ব্বশক্তিমান্, দাও তাই পদে পদে
শকতির পরিচয়,
কি সাধ্য আমার, কহ, বুঝিব তোমায় ?—
নাম নিতে করে ভয়।
হিসাবের কথা তুলি, সেও ভ্রমবশে,
জান'ত অবোধ আমি,—
হিসাবের ধার' কিবা ধার, উপার্জ্জক
নিজে তুমি গৃহস্বামী।
সাধিলে পতন যা'র মন্ত্রশক্তি বলে,
র'বে কি সে চিরদিন
ভূ-পতিত ? উত্থান, পতন এ জগতে
যদি হে নিয়মাধীন,
চক্রনেমি সম যদি হয় দুঃখ, সুখ
সদা পরাবর্ত্তশীল,
উত্থানে সংশয় কি বা, রহিবে ভারতে
যাবৎ মলয়ানিল ?
একের উত্থানে যদি অন্যের পতন,
কি হ'বে উপায় তবে ?
সংঘর্ষ আবার ? জয়পরাজয়ক্রম
বিধাতার বিধি ভবে।
"বাড়িও না অতি বাড় পড়ে' যা'বে ঝড়ে"
প্রযুক্ত তরুর প্রতি,
বল, বিজ্ঞ, "অতিবৃদ্ধি" হ'লে মানবের,
হয় কি তেমতি গতি ?
নিজে তুমি অবোধ্য হেঁয়ালি যেইরূপ,
কার্য্যের প্রণালী তব
ততোধিক ঘোর। কবে স্বরূপ তোমার
হেরিব মহানুভব ?

দেশের রূপ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

নব-জাগ্রত দেশাত্মবোধের মূর্তি এখনও শরীর গ্রহণ করে নাই, কোনও কালে করিবে কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। অপর দেশের মূর্তির ইহা প্রতিবিম্ব মাত্র—প্রতিবিম্বকে কি পূজা করা চলে? দেশ—আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমাদেরই মত তাহার রক্ত-মাংসের একটি মূর্তি রহিয়াছে। নূতন দেশাত্মবোধের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াও সেই রক্ত-মাংসের মূর্তি পাওয়া যায় না। তাহার সমগ্র অস্তিত্বটাই ধূমল ও ধূসর। কবি-স্বপ্নের 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা' দেশের মূর্তি এই

কাসাই নদী (মেদিনীপুর)।

দেশাত্মবোধের স্পর্শে যেমন ম্লান হইয়া গিয়াছে, তেমনই ইহার কঙ্কালসার মূর্তিও ইহার পরিধির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

দেশের বুকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই কথাই কেবল মনে জাগে। বাঙ্গালার বাহিরে অনেক ঘুরিয়াছি, অনেক ছবি দেখিয়াছি ও আঁকিয়াছি। শিল্প-রসিক লোকের নিকট 'বাহবা' পাইয়াছি। কিন্তু সেই 'বাহবা'র ফাঁকীটা ধরা পড়ে, যখন দেখি, শিল্পী যে-ভাবে দেশকে দেখে, তাহা দেশবাসীর চিত্ত স্পর্শ করে না। কোথায় যেন কি একটা সেতু অনির্মিত রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে দেশের চিত্তে আর দেশের শিল্পে একটি পার্থক্য ঘটিয়াছে।

এই সেতু কবে নির্মিত হইবে জানি না। তথাপি ইচ্ছা করে, দেশকে আমরা যে রূপে দেখি, দেশবাসী তাহা উপলব্ধি করুক। দেশের রাষ্ট্র-নেতাদের নিকট দেশের যে-রূপটা ধরা পড়িয়াছে, সেইটাই যে ইহার সত্যরূপ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। এমন কি, ফোটোগ্রাফারের নিকট দেশের যে-রূপ ধরা পড়ে, সে-রূপও দেশের প্রকৃত রূপ নহে। ফোটোগ্রাফারের ক্ষমতা নাই—দেশের অন্তর ফুটাইয়া তুলিবার, শিল্পীর আছে।

দেশের এই অন্তর দেখিবার জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই—কিন্তু তাহা দেখাইবারও ইচ্ছা হয়।

এইবার মেদিনীপুর গিয়াছিলাম—যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল "ফ্রেস্কো পেন্টিং"। ফিরিবার কারণ, যে-কাজ পাওয়া গিয়াছিল তাহা শেষ হইয়াছে। আর একবার দিন কতকের জন্য যাইতে হইবে, যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হলটির দ্বারোদ্ঘাটন হইবে। সে প্রায় আর মাস দুই আড়াই বাকি আছে।

যে দিন রওনা হইব-হইব, সেদিন এই 'চির-চচ্চোড়ে' কলিকাতার সহর ছাড়িতেও একটু যেন কেমন-কেমন লাগিতেছিল। কিন্তু লাগালাগির ধার ধারিতে গেলে লণ্ড-ভণ্ড ছাড়া কিছুই সুসম্পন্ন ভাবে সমাপ্ত হয় না। অতএব দিলাম পাড়ি; পথ-ঘাট, ঝোপ-ঝাপ, বন-জঙ্গল, গ্রাম ফুঁড়িয়া মেদিনীপুর পৌঁছিলাম। ফিরিয়াছি বর্ষার গাঢ় জমাট মেঘ ঘাড়ে করিয়া; গিয়াছিলাম শীত পার হইয়া বসন্তের আবির্ভাবের সময়।

মেদিনীপুর রেল-ষ্টেশন হইতে কোতবাজার খানিকটা দূর, তবে খুব দূর নয়। কিন্তু নূতন একটা স্থানে গিয়া ষ্টেশন হইতে চট্ করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া যাওয়াটা

যেন কষ্টকর বোধ হয়। আবার সারা বেলার পথ হইলেও বিরক্তিকর বোধ হয়—এই খানিকটা দূর-পথ বেশ।

মেদিনীপুর জায়গাটা ভালই লাগিয়াছে। অনেকে হয়ত বলিবেন, ভালর তো কোনই লক্ষণ পাই না। ইডেন ও গড়ের মাঠ-প্রিয়রা বলিবেন, "হ্যাঁ সেখানে আবার আছে কি—দেশ তো উড়ের, খানিক ধুলো-বালি খেয়ে পেট ভরাও, তা ছাড়া আর সেখানে আছে কি?" এই সকল স্থানেই কিন্তু চক্ষুষ্মান শিল্পীরা দ্রষ্টব্য আবিষ্কার করেন।

স্নানের ঘাট।

কোতবাজারে বন্ধু-শিল্পী শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ী। কোতবাজার হইতে উত্তর মুখে বাজার দীঘি। তাহারই পশ্চিমে ঠাকুরবাড়ী, বাঁধ, ওই বাঁধের সোজাসুজি সুদীর্ঘ পল্লী—ডোবা-চেরা পথটি, শাল মহুয়াপূর্ণ নিস্তব্ধ পাড়া। কোতবাজার হইতে মাইল কয়েকের পথ এই নিস্তব্ধ স্থানটি।

এই সুপরিসর প্রান্তর ও সুদীর্ঘ অবসরের মধ্যে পড়িয়া মনে হইত, মানুষ অদ্ভুত জীব। তাহার ভিতর জন্মিয়া থাকার এত প্রশস্ত স্থান যে, তাহার জন্য তাহাকে কখনও একতলা হইতে দ্বিতল পর্য্যন্ত তুলিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাহিরে মানুষকে আকাশচুম্বী বহু তলাই তুলিতে হইতেছে, তবুও স্থানাভাবের নেশা মিটিতেছে না। মানুষকে নড়িতে হইতেছে জায়গা-জমির জন্য। দৃষ্টান্ত জাপান, চীনের উপর চড়াও হইবার পূর্ব্বে ব্রিটিশকে চোখ রাঙাইয়াছিল, "আমার অষ্ট্রেলিয়া চাই।"—যে হেতু স্থানাভাবে জাপানের ভিতর আর কিছুই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। "আমার চাই"—কিন্তু এই চাহিবার শেষ আছে কি?

আকাশচুম্বী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদাদিতে স্থানাভাব, তাই মালপত্র ঠাসাই করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষের বাঁচিবার পক্ষে একতলাই যথেষ্ট—বাঁচিয়াও স্থান থাকে প্রচুর।

দেশের এই রূপ শিল্পীর নিকট ধরা পড়ে—তাহার-উদার মাঠ, ঘাটের আবেদন শিল্পীর নিকট ইহাই।

সঙ্গী ছিলেন শিল্পী খগেন রায়, বন্ধু-তরুণ শিল্পী বসুদেব রায় এবং খগেন বাবুর জামাইবাবু, বাবু পশুপতি মজুমদার। লোকটি অতি চমৎকার—সংস্কৃতের পণ্ডিত, মহাকবি কালিদাসের পূজারী, কাজে কাজেই রসে পূর্ণ। ডহরাড়পাড়ায় পৌঁছিলাম কড়া রৌদ্রের ঝাঁঝরিতে মাঝামাঝি। সেখানে কিছু 'স্কেচ' করিয়া, আহারাদি সারিয়া খড়ের চালের নীচে বিশ্রামার্থে আশ্রয় লইলাম। বেলা ক্রমশঃই ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। আর একদল লোক আমাদের পাশেই আশ্রয় লইয়াছিল। তিন-চারজনের গলার শব্দ বেশ একটা গুরুগম্ভীর রবের উৎপত্তি হইতেছিল। শেষে তাহারই ভিতর হইতে শোনা গেল, যখন সব শব্দ নিস্তব্ধ—চুপচাপ……

If you love your work, you will find your reward in that.—

তারপর আরও শোনা গেল আনা ক্যারেনিনা না কি অতি কষ্টে তার ছেলেকে…হঠাৎ অন্ত পর্দ্দা, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলাইয়া গেল। অন্ত-দলটি কোনদিকে যে গেল, তাহার কিছুই ঠিক-ঠিকানা পাইলাম না।

দেশের ইহাও এক রূপ। কোথা হইতে কেমন করিয়া কতকগুলি বিদেশী শব্দ আসিয়া আমাদের মনকে, প্রাণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে···

দলবল সহ সেখান হইতে কর্ণগড় নামক একটি নূতন স্থানে রওনা হইলাম, যদিও স্থানটি পুরাতনের চূড়ান্ত। কর্ণগড়ের দেবমন্দিরের অবস্থা প্রথম দেখিলেই ভয় হয়—কিন্তু ভক্তির মাত্রাটাও বেশ হয়। মন্দির নাড়াজোলের মহারাজার নির্ম্মিত। নির্ম্মাণকারী না থাকিলেও বহু পুরাকালের ভক্তি-শ্রদ্ধা নির্জ্জনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। ফাটা-ফাটা আল ধরিয়া ধরিয়া মাঠের কিনারা দিয়া যখন কর্ণগড়ের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, মন্দিরের ফাটা চাঁচা সিঁড়ি, রক্, বেদী তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। তাতের চোটে ঝাঁঝ উঠিতেছে। বসিলাম খানিকক্ষণ।

চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে বহু পুরাতন ইতিহাস—কত দিন, কত কাল এবং এই মন্দির তাহার সাক্ষ্য। দেশের রাষ্ট্রনেতারা কি এই রূপের সন্ধান পাইয়াছেন?

প্রবেশ-দ্বারটির স্কেচ করিব ভাবিতেছি, এমন সময় খগেন বাবুর সঙ্গে তাঁরই পরিচিত একজন ভদ্রলোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন চা খাইতে। তাঁহার বাড়ী মন্দির হইতে দশ পা দূরেই।

বাড়ী তাঁরও নয়, তাঁর এক বন্ধুর। দুঃখের বিষয় বাড়ী, জমি, ক্ষেত, এ সমস্তই যথেষ্ট তাঁর ছিল। স্থানাভাবের অভাব বা অন্যান্য অনটন কিছুই তাঁর ছিল না, হঠাৎ দিন তিনের জ্বরেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। বয়স মাত্র ত্রিশ পার হইয়াছিল। লোকটি যে কি প্রকার প্রকৃতি-পূজারী পুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহার বাড়ী দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। যে ঘরটিতে বসিয়া চা খাইতেছিলাম, তাহার জানালা চিরিয়া সম্মুখে বেলফুলের বিছানা দেখা যায়। আশে-পাশে অন্যান্য ফুল-পাতার টব, বড় বড় ফলের গাছ। পতাকারূপী নারিকেল তাল বাতাসে দোল খাইতেছে। তাহারা কেহই ঘুণাক্ষরেও জানে না, তাহাদের মালিক আছে কি না। বোধ করি, সেদিন বুঝিবে যেদিন তাহাদের যত্নের ত্রুটি হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার আগে নয়।

কি যেন কথায় কথায় একজন বলিয়া উঠিলেন, "কেবল মেদিনীপুরের এই বাড়ীতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা এইরূপ, সমগ্র দেশ ভরিয়া সাজানো ছিল গাছ, ফুল, ফল, লতা, পাতা,—যাহারা এইভাবে সাজাইয়াছিল, তাহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অপোগণ্ডদের পাল্লায় পড়িয়া ইহার আজ এই দুরবস্থা। তাহার পর কি হইল? যাহা হইয়াছে; তাহার জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না। আমাদের নিজেদের দোষ—এখনও ইহার পুনরুদ্ধার হইতে পারে,

ঘর-সংসার।

কিন্তু খিচুড়ীমারা যুবকের দল, যাহারা বুকনি ঝাড়িতে পিছপাও নয়, কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে ভীরু, সাহসহীন, পরের প্রতি হিংসায় জর্জ্জরিত মত্ত, ইহাদের দ্বারা তাহা হইবে না।" লোকটিকে দেখিলাম, আলাপ করিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু হাত দুটি জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এই রূপও দেশেরই।

ফিরিবার পথে, মাঠের পর মাঠ পার হইয়া শাল, মহুঁয়া ঘেঁসিয়া যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, তখন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাস না পাওয়ায় একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করা হইল। এই আমার জীবনে দ্বিতীয় বার গরুর গাড়ী চড়া। গত ১৪।১০।৩২ তারিখে জয়পুর হইতে (রাজপুতানা) শেরপুর পর্য্যন্ত

খিড়কীর পুকুর।

সুদীর্ঘ বন-জঙ্গল পাহাড়ের পর পাহাড় কাটাইয়াছিলাম—এই গরুর গাড়ী করিয়া, তারপর আজ সাত বৎসর পর ভাদ্রতলী হইতে মেদিনীপুরের কোতবাজারে আসিলাম। এ ভ্রমণও বিচিত্র রকম হইয়াছিল। গরুর গাড়ীর এলোমেলো ঝাঁকুনিতে কখনও কিছু ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়, পাকা রাস্তা ছাড়িয়া কখনও কাঁচা রাস্তা দিয়া আমাদের শঙ্কিত করিয়া খাল বিলে গিয়া ডুবিতে চায়।

দেশের রূপকে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাও চলে না।

গাড়ীতে একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকাতে হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁ লাগিল। বাড়ীর যতই কাছে গাড়ী যাইতেছে, বাড়ী যেন ততই দূরে সরিতে লাগিল। চোখ জোর করিয়া চিরিয়া দেখি—সব ঝাপসা —লঙ্কা বাটার মত চোখ কর্ কর্ করিতে লাগিল।

যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম তখন আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মেদিনীপুরের মশার উপদ্রবের তাড়নায় মশারিটা টাঙাইলাম আগে। এই ভাবে একশ' পঞ্চাশ পঞ্চান্ন দিন নিয়মিত ভাবে মশারি টাঙাইতে হইয়াছে।

বি. এন. রেলওয়ের ভাড়া অন্যান্য রেল কোম্পানী হইতে একটু বেশী, বোধ হয় তার কারণ এই অঞ্চলের মশার জন্য। তাহারা অনায়াসে আমাকেও টানিয়া আনিতে পারিত, কিন্তু আমার একগুঁয়েমির জন্যই বোধ হয় পারে নাই।

মেদিনীপুর সহর হইতে বীরসিংহগ্রাম কিছুদূর, বাড়-গ্রামও এই প্রকার এবং রামগড়ও বটে সেখানে শিকারীদের মনোহর একটি আড্ডার আসর।

রাজপুতানায় রামগড় নামক হ্রদে পর্ব্বত পাহাড়ে ঘেরা স্থানটিও এই কার্য্যের জন্য বিখ্যাত। হালেই জয়পুরের মহারাজা রামগড়ে শিকার খেলিবার জন্য এক বিরাট প্যালেস নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দেশের বুকে এই নূতন আমদানীও তাহার বর্ত্তমান রূপের অন্তর্গত।

মেদিনীপুর মন্দ লাগিল না। চট করিয়া মন্দ কিছু বলিতে গেলে মন্দ-অমন্দ ওজন করিয়া দেখা দরকার। কোন্ দিক্‌কার ভার বেশী। কাঁটা-নিক্তিতে ওজন না করিলেও চোখে দেখিয়া অনুভব করিয়া ভালটাই দেখিলাম বেশী। লোকজন বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রকৃতির মহান দৃশ্য চলাফেরার তুলনা করা যায় না এই রূপ প্রকৃতির হাড়ে হাড়ে ঢোকে। যাহার ঢুকে না, তাহাকে চট করিয়া বোঝানো বড়ই শক্ত।

মেদিনীপুর সহরে আধুনিক সবই আছে, না আছে যে তা নয়। সুন্দর একটি লাইব্রেরি আছে, সেটি ১৮৫২ সালে স্থাপিত। তারই সামনে অরোরা সিনেমা হাউস্। সুপ্রশস্ত স্কুল, কলেজ ও তার গায় বিরাট জাতীয় সাহিত্য

পরিষদের শাখাও বেশ জমকালো ভাবে স্থাপিত। হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি সমস্তই আধুনিক।

বাজার-হাট, মাড়োয়াড়ীর গদ্দা তাকিয়া বেশ তাজা আছে। বাড়ীও যে তোলে নাই তা নয়, তবে বড়বাজার কিম্বা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এখনও হয় নাই।

কিন্তু মনে হয়, ইহা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের উপর শস্তা পাউডার ও রুজ—সহজ রক্তাধরের উপর লিপষ্টিকের স্পর্শ। এই আধুনিকতা যেন দেশকে স্পর্শ করে নাই—আলগোছে ছুঁইয়া আছে।

রমণীরূপের কথায় মনে পড়িল, মাদুরী ওদিককার রমণীদের কানের গহনা। পরার ফালা এত প্রশস্ত যে তাহার মধ্যে একটি চড়াই এপার হইতে ওপার অনায়াসে ফুড়ুৎ করিয়া পার হইতে পারে। দক্ষিণ-ভারতের তামিল এবং এই মেদিনীপুরী সাঁওতালদের পরণের সাড়ী ও খোঁপার তোড়জোড় একই। ফুল গুঁজিবার বেলাও তাই—পৃথিবীর বুকে একখানা যেন 'ঝাপটা' হইয়া আছে। পুরুষদিগের হাবভাব, স্বাস্থ্য, সাজ, সব সমান। খাওয়া-দাওয়ায় যথেষ্ট তফাৎ আছে। তামিলরা খায় তেঁতুল প্রচুর পরিমাণে—তার ঝাল, তার ভাজা, তেঁতুলকে প্রবেশের পথ সব জায়গায় খুলিয়া দিতে হইবে। তাই তামিলে তেঁতুলে মিলও বেশ। ঘীয়ের নাম গন্ধ নাই, নারকেল আর তিলের তেল। সাঁওতাল খায় মাছ ভাত, শাক চচ্চড়ি, ডাল ভাত—ঠিক।

কিন্তু বহু পার্থক্যের মধ্যেও ভারতের প্রত্যেক বিভিন্ন প্রদেশের প্রত্যেকটী গ্রামের রূপের অন্তরালে একটি মিলন-সূত্র রহিয়া গিয়াছে। এই মিলনসূত্র অদৃশ্য—ইহাকে তুলি তে ফুটাইয়া তুলাই যায় না, কাব্যে ইহা ধরা পড়ে না। রাষ্ট্রনেতা ইহার সন্ধান পান নাই।

কিন্তু ইহাই দেশের প্রকৃত রূপ। মেদিনীপুরের সহিত জয়পুরের, জয়পুরের সহিত সুলতানপুরের···দেশের এই মিলন-সূত্রটীর রূপ কে দেখিবে?

অভিশাপ

—শ্রীগোপাল ভৌমিক

এ মহা নগরী রক্তে হয়েছে লাল
স্বার্থের সাথে স্বার্থের সংঘর্ষে
মাথার উপরে ধোঁয়াটে আকাশ-জাল,
ধরণীর বুক নীল হ'ল তার স্পর্শে!

তুমি কি জান না নিষ্ঠুর কারাগারে
বন্দীরা সব ঝিমায় ব্যথার চাপে
ক্রন্দন যদি বুকে জাগে বারে বারে
বাষ্প হইয়া উড়ে' যায় শুধু তাপে।

অকরুণ বায়ু, কঙ্করময় পথ
চিম্নীর ধূমে আকাশ হয়েছে কাল
তোমার মনের গতিবেগ কর শ্লথ
কেমনে হেথায় বাসিব বল না ভাল।

মনুষ্যহীন দূর বনে চল যাই
এখানে ত প্রিয়া প্রেমের চিহ্ন নাই।

টিপু সুলতান ও নেপোলিয়ান

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

মহীশূর রাজ্যের হায়দর আলীর পুত্র দুর্দ্দান্ত টিপু সুলতানের নাম ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। মহীশূর পূর্ব্বে হিন্দুরাজ্য ছিল, কিন্তু হায়দর আলী উহা জয় করেন এবং স্বয়ং তথায় মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন। টিপু সুলতানের পতনের পর ইংরাজরা প্রাচীন হিন্দু রাজ-বংশের উত্তরাধিকারীকেই রাজ্য অর্পণ করেন। তবে কয়েকটি জিলা ইংরাজরা মহীশূরকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। মহীশূরের বর্ত্তমান রাজবংশ সেই প্রাচীন বংশেরই ধারা বটে। টিপু সুলতানকে ইংরাজরা বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন। বর্ত্তমানে টালিগঞ্জের নবাব-বংশ টিপু সুলতানের বংশ হইতেই উদ্ভূত। যাহা হউক, টিপু সুলতান কি ভাবে ইংরাজদিগকে দক্ষিণ ভারত হইতে তাড়াইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। টিপুকে একজন সাহসী ও তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনেকে গণ্য করেন।

টিপু সুলতান ইংরাজদিগকে তাড়াইবার জন্ত ফরাসী সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিয় খাস ফরাসী দেশে তিনবার দূত প্রেরণ করেন। ফরাসীর রাজ-সিংহাসনে তখন রাজা ষোড়শ লুই অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবীরা তৎকালে অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং পরিণামে রাজা লুইকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিতে হইয়াছিল। টিপুর প্রথম দূত রাজা ষোড়শ লুই-এর নিকট প্রেরিত হয়। টিপুর পক্ষে প্রথম বার দৌত্য কার্য্য করিয়াছিলেন মুসিয়ে লেজার। ইনি তৎকালে ভারতীয় ফরাসী জমিদারীর প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পণ্ডিচেরীর তৎকালীন গবর্ণর মুসিয়ে ডি. ফ্রেসনে-র সহিত টিপু গোপন কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। ফ্রেসনে লেজারকে তদনুসারে শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রেরণ করেন। লেজার ফার্সি ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। লেজার টিপু সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি নিজেই সুলতানের পক্ষে দরখাস্ত লিখিয়া দেন। দরখাস্ত যথাকালে ফরাসীর রাজ-দরবারে প্রেরিত হয়।

ইংরাজের বিরুদ্ধে যে কোন উদ্যম যে তৎকালে ফরাসী দরবারের মনঃপূত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? টিপু আবেদনে ফরাসী সরকারের নিকট ৬ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন যে, এই সকল সৈনিক ও সেনাপতির জন্ত তিনি যাবতীয় ব্যয় বহন করিবেন এবং উচ্চহারে সৈনিকদিগকে বেতন দিবেন। রাজা লুই-এর মন্ত্রীরা সকলেই একবাক্যে সাহায্য প্রেরণের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু রাজা স্বয়ং বাঁকিয়া বসিলেন, তিনি আমেরিকার দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া সাহায্য প্রেরণ সম্মতি দিলেন না; সুতরাং ৬ হাজার সৈন্য কেন একটী সৈন্যও প্রেরণ করা হইল না।

টিপু দূতের সহিত রাজা ও রাণীর জন্ত কিছু উপঢৌকনও পাঠাইয়াছিলেন। "মেময়ার্স ডি বারট্রাণ্ড ডি মোলভিলে" নামক পুস্তকে এই উপঢৌকনের বর্ণনা আছে। উপঢৌকন দেখিয়া রাজা লুই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন "এইগুলি দ্বারা পুতুল সাজাইলে ভাল হয়।" তৎপরে তিনি বারট্রাণ্ডকে (ইনি ঐগুলি রাজসমীপে পেশ করিয়াছিলেন) বলেন, "এইগুলি তুমি কোন বালিকাকে দাও, সে বড় খুসী হইবে।" উত্তরে বারট্রাণ্ড বলিলেন, "কিন্তু, প্রভু, এই যে কয়েক খণ্ড হীরক আছে।

তদুত্তরে রাজা হাসিয়া কহিলেন, "তোমার যদি বাসনা থাকে তাহা হইলে তোমার টুপিতে বসাইয়া লইতে পার।"

টিপু দ্বিতীয়বার যে দৌত্য প্রেরণ করেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ ফল ফলিয়া ছিল বটে; তবে সমুদ্রে পাড়ি অন্তের হাতে সে সাহায্যে কোনই উপকার হয় নাই। একদা একটি বণিকের একখানি জাহাজ ঝটিকায় বিপর্য্যস্ত হয় এবং উহা ম্যাঙ্গালোর বন্দরে সংস্কারার্থ আনীত হয়। মরিশাস দ্বীপ-বাসী রিপড নামক এক ব্যক্তি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ ছিল। টিপু সুলতানের নৌ-সেনাপতি গোলাম আলির সহিত রিপডের ম্যাঙ্গালোরে আলাপ-পরিচয় হয়। এই ব্যক্তি গোলাম আলিকে বলে যে, সে মরিশাস্ দ্বীপের একজন বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারী, সে সুলতানের মতামত জানিতে আসিয়াছে। সুলতানের ইচ্ছা হইলে ফরাসী সরকারের নিকট হইতে তিনি সাহায্য পাইতে পারেন।

টিপু সুলতান এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বুঝিলেন যে এই ব্যক্তি একজন মিথ্যাবাদী। যাহা হউক, তিনি ১৭ হাজার টাকা মূল্যে উহার জাহাজখানি কিনিয়া লইলেন এবং দেশীয় পণ্যে জাহাজ ভরিয়া পারনড নামক একজন ফরাসী পোতাধ্যক্ষের অধীনে জাহাজখানি মরিশাসে প্রেরণ করিলেন। ঐ জাহাজে বণিকের ছদ্মবেশে টিপুর পাঁচ জন দূতও গমন করিলেন। টিপু দূতদিগকে এই উপদেশ দিলেন যে, রিপডের উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুই জন দূত

সৈন্যদিগকে লইয়া চলিয়া আসিবেন এবং অপর তিনজন দূত প্যারিস সহরে যাইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। টিপুর উপদেশ লইয়া পাব্‌নড্ ও পঞ্চজন দূত শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে মাঙ্গালোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাব্‌নড্-এর নিকট জাহাজের মূল্য স্বরূপে ১৭ হাজার টাকা ছিল। যেদিন জাহাজ ছাড়িবার কথা, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে পাব্‌নড ও টিপুর তিন জন দূত যে কোথায় সরিয়া পড়িল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সুলতান এই সংবাদ অবগত হইয়া রিপডকে পোতাধ্যক্ষ করিয়া অবশিষ্ট দুইজন দূত সহ জাহাজ ভাসাইতে আদেশ দিলেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঐ জাহাজ মাঙ্গালোর বন্দর ত্যাগ করিল। জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়া মাঝ-দরিয়ায় পঁহুছিলে, রিপড জাহাজের অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের সহায়তায় টিপুর দূতদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে টিপুর পত্র বাহির করিতে বলিল। দূতদ্বয়ের নাম হুসেন আলি ও সেখ ইব্রাহিম। তাহারা বিপদ বুঝিয়া অগত্যা পত্রখানি বাহির করিয়া দিল। রিপড পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিয়া দেখিল যে, তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই; সুতরাং সে আর কোন গোলমাল করিল না। জাহাজ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে লৌইস্ বন্দরে উপনীত হইল। স্থানীয় গবর্ণর জেনারেল মালার্টি মহীশূরের পরাক্রান্ত সুলতানের দূত আসিয়াছেন জানিয়া সম্ভ্রম সহকারে দূতদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার ভবনে লইয়া গেলেন। দূতদ্বয়ের সম্মানার্থ দেড়শত বার তোপধ্বনি করা হইল।

রিপডের নিকট টিপু শুনিয়াছিলেন যে, মরিশাসে ৩০ হাজার মূর সৈন্য এবং ১০ হাজার শ্বেতাঙ্গ সৈন্য ভারতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। রিপডের এই কথায় টিপু প্রত্যয় স্থাপন করিতে না পারিলেও কিছু আশান্বিত হইয়াছিলেন বটে। যাহা হউক টিপুর দূতদ্বয় মরিশাসে আসিয়া প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। গবর্ণর মালার্টি সাহায্য প্রেরণের অপর কোন সুবিধা নাই দেখিয়া স্বেচ্ছাসৈনিক প্রার্থনা করিয়া এক সুদীর্ঘ ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন এবং রিপডের জাহাজ রাজধানী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ঐ জাহাজ পথিমধ্যে ইংরাজের 'ব্রেড' নামক যুদ্ধ-জাহাজ কর্তৃক ধৃত হওয়ায় টিপুর বার্ত্তা আর ফরাসী-রাজের গোচরে আনীত হইল না।

গবর্ণর মালার্টির দীর্ঘ ঘোষণা সত্ত্বেও আশানুরূপ স্বেচ্ছা-সৈনিক জুটল না। হুসেন আলি ও সেখ ইব্রাহিমও স্বেচ্ছা-সৈনিক সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। অবশেষে মাত্র ৯৯ জন স্বেচ্ছাসৈনিক সংগৃহীত হইল। দূতদ্বয় অগত্যা এই ৯৯ জন সৈনিককে লইয়া মাঙ্গালোর যাত্রা করিলেন। যথাকালে শ্রীরঙ্গপত্তনে পঁহুছিলে টিপু সৈন্যদিগকে যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাহাদিগের জন্য বাসভবন প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। স্বেচ্ছাসৈনিকরা 'জেকবিন ক্লাব' নামে একটা সমিতি গঠন করিয়া দলের কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয় করিয়া লইল।

টিপু সুলতান যখন তৃতীয়বার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ফরাসী দরবারে আবেদন জানাইলেন, তখন রাষ্ট্রের অধিনায়ক নেপোলিয়ন। নেপোলিয়নের দৃষ্টি ভারতের উপর নিবদ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু তৎকালে ফরাসী-রাজ্যের অবস্থা এরূপ ছিন্নভিন্ন যে, তাঁহার পক্ষে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ বা স্বয়ং ভারত অভিমুখে অভিযান—এই দুইই এক-প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

টিপু সুলতান তৃতীয়বারও দুইজন দূত প্রেরণ করেন। মঁসিয়ে ডুবাক্ নামক একজন পোতাধ্যক্ষ দূতদ্বয়ের সমভি-ব্যাহারে প্যারিস নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। টিপু সুলতানের মৈত্রীবন্ধনের প্রস্তাব নেপোলিয়ন-সকাশে প্রেরিত হইলে নেপোলিয়ন টিপু সুলতানকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

* * * *

"আপনি পূর্ব্বেই অবগত আছেন যে, আমি লোহিত-সাগরের তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছি—আমার বাহিনী অপ-রাজেয়। ইংলণ্ডের লৌহ-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য আমার ঐকান্তিক বাসনা রহিয়াছে। আপনার দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ তাহা যদি আপনি মস্কট বা মোচার পথে আমাকে জানান তাহা হইলে আমি বিশেষ প্রীত হইব।

আমার আরও অভিপ্রায় যে, আপনি যদি আপনার কোন বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান লোককে সুয়েজ বা কায়রো প্রেরণ করেন তাহা হইলে আমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে পারি।—বোনাপার্ট।"

কিন্তু নেপোলিয়নের বাসনা পূর্ণ হইবার আর অবকাশ রহিল না। নেলসনের নিকট নীল নদের সংগ্রামে তাঁহার নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়ায় নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া ফরাসী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। টিপু সুলতানের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা বিনষ্ট হইল।

ছায়া [ফটোগ্রাফ—শ্রীগৌরচরণ বসু

গ্রামের কথা

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পল্লীই বাংলার প্রাণ, পল্লীর উন্নতি না হইলে বাংলার উন্নতি নাই—এ অতি পুরাতন মামুলি কথা। সরকারী প্রচারকদের এবং স্বদেশী নেতাদের বক্তৃতা, লেখা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতিতে ঐ সম্বন্ধে এতই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় যে, এই সব মামুলি কথা শুনিতে আর যেন ইচ্ছা হয় না। পল্লীর সমস্ত অবস্থার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের নিকট এই সব কথা বা আলোচনা নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হয়। পল্লী-বাংলা আজ মরিতে বসিয়াছে। মুমূর্ষু ব্যক্তির ব্যাধি লইয়া গবেষণা চলে না। তাহাকে বাঁচিবার উপায় আগে করিয়া দাও, তারপর যত পার গবেষণা করিও—বাংলার পল্লীর অবস্থা দেখিয়া তথাকথিত 'চিকিৎসক'দের আজ এই কথাই বার বার বলিতে ইচ্ছা হয়।

দুর্ভিক্ষ—অর্থাভাব, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বাংলার কোথাও না কোথাও প্রতি বৎসর লাগিয়াই আছে। একবার অজন্মা হইল, জলপ্লাবন হইল, বারিবর্ষণ প্রয়োজনাতিরিক্ত বা প্রয়োজন অপেক্ষা কম হইল, অমনি দুর্ভিক্ষ নগ্ন মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিবে, এরূপ হইলে জাতি বাঁচিবে কেমন করিয়া? তাই আজ বিজ্ঞজনকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, পুঁজি দিন দিন ফুরাইয়া গিয়া জনগণ বর্ত্তমানে একেবারে রিক্তহস্ত হইয়া পড়িয়াছে কেন, তাহার একবার খোঁজ লইয়াছ কি? ইহার প্রতিষেধক কোন উপায় বাহির করিতে কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছ কি? শুধু সহরে বসিয়া আস্ফালন করিলে বা রাজা-উজীর মারিলে কি ফল হইবে? আজ প্রত্যেক চিন্তাশীল জনহিতৈষীকে এই কথাটিই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে যে, দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশে বারমাসই লাগিয়া আছে, সাময়িক অজন্মা, জল-প্লাবন প্রভৃতি তাহার মাত্রা বাড়াইয়া দেয় মাত্র।

পল্লীর অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন শিক্ষিত জনের আজ যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, এমনটি বোধ হয় কখনও হয় নাই। এই জন্য যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহারই কিছু কিছু নিবেদন করিব। পল্লীবাসীদের চোখে পল্লীর অবস্থা সহসা ধরা পড়িবে না। তাহারা যে ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, যদিও অভাবের বৃশ্চিক-দংশন তাহাদিগকে ক্রমশঃ অসার করিয়া তুলিতেছে। বাহির হইতে হঠাৎ গিয়া কেহ এই অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। বাহিরে থাকিয়াও যাঁহারা এখনও পল্লীর সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতেছেন, এবং কয়েক বৎসর পর পর 'দেশে' গিয়া থাকেন, পল্লীর অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনামূলক ছবি তাঁহাদের চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠে। সাধারণের অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে পল্লীর শ্রী কিরূপ দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে তাহা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না।

দেখিতে দেখিতে কুড়িটি বৎসর চলিয়া গেল। এই বিশ বৎসরের মধ্যে পল্লী-বাংলার কতই না পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! আমি এখানে নিজ অভিজ্ঞতার কথাই আপনাদের কিছু কিছু বলিব। দক্ষিণ বাখরগঞ্জের একটি গ্রামে আমার বাস। কর্ম্মব্যপদেশে 'সহুরে' বনিয়া গেলেও পল্লীর সঙ্গে এখনও যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। এ জন্য পল্লীর রূপ কত-দ্রুত বদ্‌লাইয়া যাইতেছে তাহার সুস্পষ্ট ছবি চোখের সম্মুখে দেখিতে পারিতেছি। সব রকম পরিবর্ত্তনই যে মন্দ এমন কথা কেহই বলে না। কিন্তু পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অবস্থা যদি কেবল মন্দের দিকেই চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহা নিতান্তই আক্ষেপের কারণ হইয়া উঠে। এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, নারিকেল ও সুপারী। এই তিনটিকে কেন্দ্র করিয়া এদিককার ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজ নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এত দিনের গড়া এই ইমারত ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ফলে এতদঞ্চলের লোকের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত।

অন্নজীবী বাঙালীর পক্ষে ধান হইল পরম লক্ষ্মী ইহার আরাধনা সে কায়মনে করে। ধান্য উৎপাদনে জনগণ কোন কষ্টকেই কষ্ট, কোনরূপ পরিশ্রমকেই পরিশ্রম জ্ঞান করে না। কাজেই ইহার জন্য যে তাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিবে

তাহা বলাই বাহুল্য। বাখরগঞ্জের জমিতে সোনা ফলে, সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রবাদ। আজ কিন্তু বাখরগঞ্জ তাহার এই গরিমা হারাইতে বসিয়াছে। আগে যেখানে বিঘাপ্রতি পঁচিশ-ত্রিশ মণ ধান জন্মিত, এখন সেখানে জন্মিতেছে বড় জোর পনর-বিশ মণ। প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট জমিতেই এইরূপ ফসল আগে হইত এবং বর্ত্তমানে কমিয়া ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে, নিকৃষ্ট জমিতে ফসল খুবই কম হয়। বরিশাল নদীবহুল। বাখরগঞ্জের নদীবহুলতা দুর্দ্দম রেল কোম্পানীকেও রেল-পথ বিস্তারে নিরস্ত করিয়াছে। কলিকাতার গঙ্গা হইতেও বড় বড় নদী বরিশালে বিস্তর আছে। এক একটি নদী হইতে বহু বড় খাল অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া জনপদকে প্লাবিত করে। এক একটি বড় খাল হইতে আবার বহু ছোট খাল; নালা বাহির হয়। ধানী জমির মধ্য দিয়া এ গুলি চলিয়া যায়। পল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া লোকের গৃহকোণ পর্য্যন্তও পৌঁছায়। এ অঞ্চলে খাল-নালার প্রাচুর্য্য থাকায় নৌকায় গমনাগমনই প্রশস্ত। নদী-নালা বার মাস বাঙালীর প্রধান খাদ্য মৎস্যের আবাসভূমি। নদী বা খালের তীরবর্ত্তী জমি সাধারণতঃ উঁচু হয়, এই সব উচু জমিকে বলে 'কাঁদি' বা 'ডাঙা'র জমি। তীর হইতে দূরে জমি ক্রমশঃ নীচু হইয়া যায়। এই নীচু জমিকে বলা হয় 'ডর'। অল্প প্লাবনেই এই ডরের জমি জলে ভর্ত্তি হইয়া যায়। প্রায় প্রত্যহই জোয়ার-ভাটায় জল ওঠা-নামা করায় জমিতে পলিমাটি পড়ে, এবং স্বাভাবিক ভাবেই জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া জমিতে যে খড় বা নাড়া পড়িয়া থাকে তাহা পচিয়াও সার হয় এবং জমিতে মিশিয়া যায়। এ অঞ্চলে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কোন জমি- বারমাস চাষ হইত না। পৌষমাসে আমন ধান্য উঠিয়া গেলে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত জমি খালি রাখাই রীতি, এই পাঁচ ছয় মাস গরু স্বাধীনভাবে মাঠে চড়িয়া বেড়ায়। গরুর গোবর জমিতে পড়িয়াও ইহার উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।

এ দিক্‌কার এই যে সহজ অবস্থা তাহাতে আজ বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। কতকটা স্বাভাবিক কারণে, কিন্তু অনেকাংশেই লোকের অজ্ঞতার ফলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির স্বাভাবিক উপায়গুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। স্রোতস্বিনীর-ধর্ম্মই এই যে, সোজা পথই সে নিয়ত খোঁজে। স্রোতস্বিনীর গতিবেগ যে কত বাঁক ভাঙ্গিয়া দিয়া আবহমানকাল জনপদ উচ্ছেদ করিয়া দিতেছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। আজকাল 'River Physic's বা 'River Training' নামক একটি কথা খুবই শুনা যাইতেছে। ইহার মানে যদি এই হয় যে, নদীর মারমুখী স্রোত-শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া তাহা কাজে লাগান, তাহা হইলে ফল কি দাঁড়াইবে, ভাবিবার কথা। নদীর 'রোখ' বা গতিবেগ বদলাইয়া গেলে পূর্ব্ব স্থানে চর পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ও-দিককার খালগুলিও ভরিয়া উঠে। জল সরবরাহের স্বাভাবিক উপায়গুলি এইরূপে বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। আবার জমিতে রীতিমত জল ওঠা-নামা করিতে না পারিলে উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইতে বাধ্য। আর একটি কারণেও এই স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আপাত লাভের মোহে জমির বা পল্লীর অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক নালা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীগুলি বুজাইয়া দিয়া লোকে জমি দুই চারি কাঠা বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। জমি, জনবাহুল্য এবং আয়ের অপ্রাচুর্য্য জনগণকে এইরূপ করিতে বাধ্য করিতেছে, তবুও এ কথা বলিতেই হইবে যে, ইহা দ্বারা নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাতই করিতেছে তাহারা। দুই চারি কাঠা জমি না বাড়াইয়া কিরূপে উর্ব্বরতা অটুট রাখিয়া জমিতে দুইটি ফসল জন্মান যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। জনশিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা এই সব বিষয়ে অজ্ঞ নিরক্ষর সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি? স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জমির উর্ব্বরাশক্তি যেমন একদিকে হ্রাস পাইতেছে, অন্যদিকে আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জল জমিয়া থাকায় নূতন বিলের উদ্ভব হইতেছে। ও অঞ্চলের উর্ব্বর দোআঁশ মাটি বর্ত্তমানে অতি দ্রুত আঁশহীন হইয়া পড়িতেছে। এবারে শুনিলাম, আগে যে সব জমিতে বর্ষাকালে হাঁটুজল হইত এখন সে সব স্থলে এত জল দাঁড়ায় যে, ঠাঁই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। অত্যাবশ্যক ধানগাছের বদলে এখন সেখানে অনাবশ্যক 'শাফলা' বা নাইল প্রচুর জন্মিয়া থাকে। লোকেরা এখন ঠেকিয়া কিছু কিছু শিখিতেছে। কিন্তু জমির ফসল বাড়াইতে হইলে আগেকার খাল ও নালাগুলির আশু সংস্কার যেমন আবশ্যক, আবার প্রাকৃতিক কারণে যে সব স্থলে এগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সেগুলি কাটিয়া দেওয়াও দরকার। ইউনিয়ন বোর্ড এজন্য

সামান্য কিছু করিতে পারে, কিন্তু ব্যাপকভাবে কিছু করিতে হইলে সরকারী সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। বাংলা সরকারের বাজেটে গ্রামোন্নতি খাতে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় খাল নালা কাটিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইবার ব্যবস্থা করিলে যতটা গ্রামোন্নতি হইতে পারে এমন আর কিসে হইবে বুঝি না। বাখরগঞ্জ জেলার অধিবাসী বাংলার প্রধান মন্ত্রীর এ কথা বুঝিতে এত সময় লাগিতেছে কেন?

এক দিকে যেমন জমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়ায় ধানের ফসল দ্রুত কমিয়া যাইতেছে তেমনি ইহাকে কেন্দ্র করিয়া একদা যে বিশেষ শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও আজ ধ্বসিয়া পড়িতে বসিয়াছে। ধান ঢেঁকিতে ভানিয়া চাউল করিবার রীতি বহু দিনের পুরাতন। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে দরিদ্রগণ এই শিল্পে লিপ্ত ছিল। তাহাদের নাম ঢেকিয়াল। চাউলের ব্যবসা যখন জোর চলিত তখন এই ঢেকিয়ালগণ ঘরে বসিয়া চাউল তৈরী করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। চাউলের চালানী ব্যবসার কথা পরে বলিতেছি। চালানী কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ঢেকিয়ালগণের আগের মত রোজগার হইত না বটে, তবে তাহারা একেবারে কর্ম্মচ্যুত হয় নাই। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে এক নূতন জিনিষের আমদানী হইয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের এ কার্য্য একরূপ ছাড়িয়াই দিতে হইতেছে। আগে ঝালকাঠির বন্দরে একটি কি দুইটি ধানের কল ছিল। এখন দক্ষিণ বাখরগঞ্জের এই দিকে অন্যূন একশত ধানের কল হইয়াছে। এক একটি ধানের কলের দাম 'অশ্বশক্তি' হিসাবে দুই হাজার হইতে চারি হাজার টাকা। গ্রামের মহাজন বা অল্প পুঁজিদারগণ এই সব কল স্থাপন করিয়াছেন। যন্ত্রযুগে যন্ত্রকে অস্বীকার করিয়া চলা হয় তো বাতুলতার ব্যাপার। তথাপি ইহার ফলে জনসাধারণের ইষ্ট কি অনিষ্ট হইতেছে তাহাই এখানে বলিতেছি। প্রথমতঃ দেশ হইতে দুই তিন লক্ষ টাকা বিদেশীর পকেটে চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অতি সস্তায় চাউল তৈরী সম্ভব হওয়ায় ঢেকিয়াল শ্রেণী বেকার হইয়া পড়িয়াছে। এক মণ চাউল তৈরী করিতে ঢেঁকিতে যদি খরচ পড়ে আট আনা, কলে পড়িবে সে স্থলে দুই আনা। কাজেই কল ছাড়িয়া লোকে ঢেঁকির শরণ লইবে কেন? আগে বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই ঢেকিয়াল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানগণ ঢেঁকি ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা গ্রহণ করিয়াছে। অনেকে নৌকার মাঝি হইয়াছে। আগে সাধারণ মুসলমানের পক্ষে (গরীব হইলেও) মৎস্য-বিক্রয় নিন্দনীয় ছিল। এখন অনেকে মৎস্য বিক্রয়ও করিতেছে। অবশ্য হিন্দু জেলে ও মুসলমান শিকারীরা বরাবরই মৎস্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

চাউলের চালানী কারবার কিরূপ ছিল এক্ষণে তাহাই বলিব। বরিশালের বালাম চাউলের কথা কে না শুনিয়াছেন? এক সময় কলিকাতায় বালাম চাউলের খুবই আদর ছিল। এখন এই বালাম চাউল কলিকাতায় কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কলেছাঁটা 'দেশী' চাউল এখন ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। চাউল আগে কলিকাতা হইতে বিদেশেও কিছু কিছু চালান যাইত। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে চালানী কার্য্য কমিতে আরম্ভ হয়। বরিশালের বালাম চাউলের কাজ একসময় অতি লাভজনক ব্যবসা ছিল। বাখরগঞ্জের বহু লোক এই ব্যবসায়ের দৌলতে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত। এখানে একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। কলিকাতার শহুরেদের হয় ত ধারণা, পল্লীর প্রত্যেকেরই বিস্তর ধানী জমি ও গোলা-ভরা ধান আছে। বাস্তবিক ব্যাপার এরূপ নহে। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসী ও ধানী জমির সমাহার করিলে দেখিতে পাইবেন, অতি অল্পলোকই ধানী জমীর মালিক। কাজেই অধিকাংশ লোককেই জীবিকার অন্য উপায় খুঁজিতে হয়। আগেও অন্যভাবে জীবিকার সন্ধান করিতে হইত, এখনও করিতে হয়। চাউলের চালানী কাজ যখন চালু ছিল তখন ধনী মহাজন বাদে আড়তদার, দালাল, কয়াল, ফড়িয়া, বেপারী, ঢেঁকিয়াল প্রভৃতি শ্রেণীর বেশ অর্থাগম হইতে ছিল। বিস্তর লোক এইসব কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া পরিবার পরিজনের অন্নের সংস্থান করিত।

ব্যবসা সম্পর্কে যশোহর ও বরিশালের মধ্যে বিশেষ যোগ আছে। 'পথের পাঁচালী'র নায়ক অপু নিশ্চিন্দিপুরের বন্দরে যে বরিশাল হইতে আগত বিস্তর বড় বড় চাউলের নৌকা দেখিত তাহা নিছক কবির কল্পনা নহে। যশোহরের লোহাগড়া, লক্ষীপাশা, বরদিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিস্তর ধনী মহাজন বরিশালের গঞ্জে গঞ্জে চাউল খরিদ করিত এবং

আটশ', নয়শ' মণি নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতায় চালান দিত। কলিকাতার উল্টাডিঙ্গি ও বেলেঘাটায় এইসব নৌকা আসিয়া নোঙর করিত। এইসব স্থলের আড়তে প্রথমে জমা হইয়া ঐ চাউল কলিকাতায় ছড়াইয়া পড়িত, বিদেশেও এখান হইতে চালান হইত। এখন উল্টাডিঙ্গি শ্রীহীন হইয়াছে। বেলেঘাটায় সামান্যই আড়ত আছে। হাটখোলায় এখনও কিছু কিছু চাউলের কাজ হয় বটে, কিন্তু আগেকার তুলনায় তাহা কিছুই নয়।

বাখরগঞ্জের আর দুইটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য নারিকেল ও সুপারী। চাউলের ন্যায় এ দুইটি জিনিষকে কেন্দ্র করিয়াও নানারূপ ব্যবসা গড়িয়া উঠে। নারিকেলের আয়াম আষাঢ় শ্রাবণ মাস—কখনও কখনও ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত নারিকেলের আমদানী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন চাউলের কারবার জোর চলিত তখন আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ধনী মহাজনগণ নারিকেলের কাজেও বিস্তর টাকা খাটাইত। ত্রিশ-হাজারী পঁয়ত্রিশ-হাজারী নারিকেলের নৌকা একটা দর্শনীয় বস্তু ছিল। এইরূপ বড় বড় নৌকা গঞ্জের ঘাটে আসিলে পল্লীবাসীর আনন্দের সীমা থাকিত না। গৃহস্থ, বেপারী, ফড়িয়া, কয়াল, দালাল, আড়তদার সকলেই চাউলের কাজের সময় যেমন বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত, নারিকেলের সময়েও তাহাদের অনুরূপ আয় হইত। বরিশালে এত নারিকেল সুপারী উৎপন্ন হয় যে, স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইয়া একটা বৃহৎ অংশ অনায়াসে বিক্রয় করিয়া ফেলা চলে। আগে তাহা গৃহস্থেরা, হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকলেই করিত। যশোহরের যে-সব অঞ্চল হইতে ধনী মহাজনগণ চাউলের ব্যবসা চালাইত, তাহারাই আবার নারিকেলের আয়ামে নারিকেলের কাজে যোগও দিত। এক এক খানি ত্রিশ-হাজারী, চল্লিশ-হাজারী নৌকায় মহাজনের প্রতিনিধি, গোমস্তা ও দশ বার জন করিয়া পাকা মাঝি-মাল্লা থাকিত। এই মাঝি-মাল্লারা প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। চাউলের সময় নৌকা যাইত কলিকাতার দিকে। নারিকেলের নৌকা কিন্তু অন্যদিকে গমন করিত। উত্তর-বঙ্গে নারিকেলের খুবই অভাব। শুনিয়াছি, জলপাইগুড়ির আলিপুর ডুয়ার্স প্রভৃতি অঞ্চলে এক একটি ডাব এক এক টাকা মূল্যেও কখন কখন পাওয়া ভার হইয়া উঠে। পদ্মার উজান বাহিয়া বরাবর উত্তর-বঙ্গে এমন কি বিহার পর্য্যন্ত বড় বড় নৌকায় নারিকেল চালান দেওয়া হইত। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলেও বরিশালের নারিকেলই পাওয়া যাইত। চাউলের কারবারের মত নারিকেলের কাজও এখন ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়াছে। এখন এই কাজ একরূপ হয় না বলিলেই চলে। এই দুই ব্যবসা মাটি হইয়া যাওয়ায় কত লোক যে বেকার হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন না কি বাখরগঞ্জ হইতে ডাব নারিকেল ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে চালান হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে গৃহস্থ বা বেপারী কেহই আগেকার মত লাভবান্ হইতে পারে না। গৃহস্থেরা দায়ে পড়িয়াই এইসব ডাব বিক্রয় করিয়া থাকে। ডাব অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার জল টক্ আস্বাদ হয়। ঐ কারণেই কলিকাতার বাজারে বাখরগঞ্জের ডাব আমদানী করা সম্ভব নয়। রেল ষ্টীমারে চালান দিলে ডাবের পরতা বেশী পড়ে, অথচ নৌকায় আসিলে দশ বার দিনে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সম্প্রতি দেখিয়া আসিলাম, গৃহস্থেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা জলের দরে ডাব বিক্রয় করিতেছে। আধসের তিনপোয়া জল হয় এমন দুইটি ডাব পর্য্যন্ত এক পয়সায় বিক্রী হইয়া থাকে। অর্থাভাবই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আয়ামে পাকা বা ঝুনা নারিকেলের দর পাইলে হয়ত এরূপ বিক্রয় অনেকটা কমিয়া যাইত। নারিকেলের ব্যবসা মাটি হইয়া যাওয়ায় তাহারা অতদিন অপেক্ষা করা হয়ত যুক্তি-যুক্তও মনে করে না। ডাবের চাহিদা না থাকায় ঐরূপ স্বল্প দামেই উহা বিক্রয় হয়।

চাউল এবং নারিকেলের ব্যবসায়ে বহু দিন পূর্ব্বেই ভাঁটা পড়িলেও সুপারীর কাজ কিছুকাল পর্য্যন্তও বেশ ভালই চলিয়াছিল। সুপারীও আগে আমাদের ও অঞ্চল হইতে চালান হইয়া যাইত। চাউল ও নারিকেলের কাজ একেবারে কমিয়া যাওয়ায় সুপারীর কারবার স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই করিতে আরম্ভ করে। সুপারীর কারবারের সুবিধা এই যে, অল্প পুঁজিতেই এই কাজ আরম্ভ করা যায়। গ্রামের ছোট ছোট মহাজনের নিকট হইতে লোকেরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুপারীর কাজ করিতে আরম্ভ করে। সুপারী রোদে শুকাইয়া 'ছোলদায়'

যারা খোসা ছাড়াইয়া নিকট ও দূরের গঞ্জে গিয়া বেপারীরা বিক্রয় করিত। দশ, বার, চৌদ্দ টাকা দরে হাজার (১ হাজার=সাড়ে দশ হাজারটা সুপারী) কিনিয়া শুকাইয়া মণ দরে বিক্রয় করিয়া বেশ কিছু লাভ থাকিত। এই ব্যবসা চালু হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের বিস্তর লোক জীবিকার সংস্থান করিতে পারিত। এই ব্যবসা কিরূপ অর্থকরী ছিল একটি কথাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এক একটি গ্রামে ছোলদারগণই বৎসরে তেরশ' চৌদ্দশ' টাকা রোজগার করিত। হাজার (অর্থাৎ সাড়ে দশ হাজারটা) সুপারীর খোসা ছাড়াইয়া দিতে পারিলে প্রতি ছোলদার আট আনা করিয়া পাইত। এইরূপে অতগুলি টাকা গ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। পল্লীর নিষ্কর্ম্মা, বেকার, বৃদ্ধ, বিধবা প্রভৃতিরাই প্রধানতঃ এই কার্য্যে লিপ্ত হইত। হিন্দু মুসলমান উভয়েই এই ছোলদার শ্রেণীভুক্ত ছিল। পনর কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ বাখরগঞ্জে এই কারবার ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর জোর চলিবার পর ইহাতেও ভাটা পড়িয়া যায়। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে যখন দেশে মন্দা আরম্ভ হয় তখন এ ব্যবসাও আস্তে আস্তে গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হয়। আজ এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে লোককে ক্বচিৎ দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন এই, এই সব লোক কি উপায়ে অতঃপর তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিতেছে? এ সব অঞ্চলের মুসলমান-সাধারণের প্রধান জীবিকা যেমন কৃষি, হিন্দু জনগণের প্রধান জীবিকা তেমনি কারবার বা ব্যবসা। আবার এই উভয় শ্রেণীই সাধারণ ভাবে উভয় কাজেরই উপর কমবেশী নির্ভর করিয়া থাকে। মুসলমান কৃষক বার মাস চাষাবাদে লিপ্ত থাকে না। উদ্বৃত্ত সময় কোনরূপ ব্যবসায়ে বা অন্যবিধ কাজে ব্যয় করে। আবার হিন্দুদের মধ্যে যাহাদের জমিজমা আছে তাহারাও চাষাবাদের তদারক করা হইতে বিরত হয় না। কৃষি এবং ব্যবসায় দুইটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকিয়া লোকের গ্রাসাচ্ছাদনে সাহায্য করিত। আজ হিন্দুর ব্যবসা অভাবে কৃষি অনাথা। ব্যবসা মাটি হইয়া যাওয়ায় বা অর্থকরী না থাকায় মুসলমান সাধারণ আজ বালকবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে সকলেই চাষের দিকে ছুটিয়াছে। কিন্তু কর্ষণ-কার্য্যে বিস্তর লোকের দরকার হইলেও, সকলকেই তাহাতে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক পাওয়ায় কৃষাণের মজুরী আশ্চর্য্য রকম কমিয়া গিয়াছে। চাষের কাজ যাহারা পায় না তাহারা অন্য ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করে। আগে কৃষি-কর্ম্ম করিয়া উদ্বৃত্ত সময়ে মুসলমানগণ পুকুর-কাটা, বাঁধ-নির্ম্মাণ, ঘর-ছাওয়া, করাতির কাজ, কাঠ-কাটা প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইত। এখনও যে এই সব কাজে লিপ্ত হয় না তাহা নয়, তবে কৃষাণসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের মজুরীও কমিয়া গিয়াছে। যেখানে আগে দৈনিক আট ঘণ্টা খাটিয়া প্রতিজনে আট আনা, দশ আনা আয় করিত এখন সেখানে দিনভর খাটিয়াও চার পয়সা, ছ'পয়সা বা আট পয়সা আয় করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পিতা-পুত্রে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও পাঁচ-ছয় জনের পরিবারের অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না। এতদঞ্চলে নৌকা-মাঝিরা প্রায় সবই মুসলমান। তবে নমঃশূদ্র প্রভৃতি কিছু কিছু আছে। নৌকা ভাড়াদের আয়ও কমিয়া গিয়াছে। আগে যেখানে পনর মাইল জলপথ অতিক্রম করিতে এক টাকা দেড় টাকা লাগিত এখন সেখানে চার পাঁচ আনার বেশী লাগে না, যৌথায় নৌকা করিলে ছ'পয়সা চার পয়সায়ও এই দীর্ঘ পথে যাতায়াত করা যায়।

এমনটি কেন হইল? এই কথার জবাব দিতে হইলেই হিন্দুদের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। পল্লীগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে কতকগুলি বিধি-নিষেধ থাকিলেও আর্থিক সংস্থানে উভয়ের স্থানই একরূপ। হিন্দু মুসলমান হইতে বা মুসলমান হিন্দু হইতে আলাদা হইয়া থাকিতে পারে না। শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং একের নিকট অপরেব অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছে আগে বলিয়াছি, মুসলমান-সাধারণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী এবং হিন্দু-সাধারণ প্রধানতঃ ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত। মুসলমানগণ চাষাবাদ ও অন্যবিধ কর্ম্ম করিয়া জীবিকার সংস্থান করিত, হিন্দুরা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া অভাব পূরণ করিত। কৃষি এবং বাণিজ্য উভয়ই গ্রামকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিত। আজ গ্রাম হইতে ব্যবসা মাটি হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর গৃহে আজ টাকা নাই। কাজেই মুসলমান জনমজুরের আয় যে

কমিয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? মুসলমান হিন্দুর বাড়ীতে জনমজুরী খাটিয়াই তো পয়সা রোজগার করে ?

হিন্দুর অবস্থা যে ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহার বহু কারণ আছে। ব্যবসা-মন্দা প্রধান কারণ সন্দেহ নাই, আনুষঙ্গিক এমন বিস্তর কারণ ঘটিয়াছে যে সম্বন্ধে লোকে আগে কিছুই আঁচ করিতে পারে নাই। ব্যবসা আজ গ্রাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুর অর্থাগমের অন্য উপায় চাকুরি। এই চাকুরিও তাহার আর জুটিতেছে না। হিন্দুরা শিক্ষায় অগ্রসর, সুতরাং সরকারী বেসরকারী সমুদায় চাকুরীই আজ হিন্দু গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—এইরূপ অভিযোগ মুসলমান ভ্রাতাদের মুখে অহরহ শোনা যায়। মুসলমান ভ্রাতারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, গত পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষাবিবরণীতে দেখা গিয়াছে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান পুত্র-কন্যারাই প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে বেশী। পূর্ব্বে মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল থাকায় উচ্চতম শিক্ষা তাহারা বেশী পাইয়াছে, এবং চাকুরীও হয় তো কিছু বেশী লাভ করিয়াছে, কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় ইহা নিরতিশয় সামান্য। পল্লীর কয়জন লোকই বা সরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত থাকে ? আজ সরকারী নির্দ্দেশে সরকারী চাকুরী সম্পর্কে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে যে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বখ্‌রা হইয়াছে তাহাতে পল্লীর হিন্দু সাধারণের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ নাই, কেন না, পল্লীর কয়জন সরকারী চাকুরি আগে পাইয়াছে যে, এখন না পাইলে তাহাদের রুটি বন্ধ হইয়া যাইবে ? তথাপি একটি বিষয় হিন্দুগণকে আজ বেশী করিয়া ভাবিত করিয়া তুলিতেছে। আজ তাহাদের প্রধান জীবিকা যে ব্যবসা তাহা লোপ পাইয়াছে। তাহাদের এমন জমি-জমা নাই, বা ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ তাহাদের পক্ষে এমন সহজসাধ্য নহে যে, অনায়াসে কোন কিছু করিয়া জীবিকার সংস্থানের চেষ্টা করিবে। জমিদার সরকারে কিছু সংখ্যক হিন্দু কর্ম্মে লিপ্ত ছিল। এখন জমিদারীর অবস্থা বিশেষ মন্দ হওয়ায় চাকুরিয়াদের পথে বসিতে হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে চাকুরির যে সামান্য উপায় হিন্দুদের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল তাহাও নাগালের বাহিরে যাওয়ায় তাহারা বিশেষভাবে ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। হয় তো এ পথে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অপর পথ না থাকিলে সহজেই রুদ্ধ পথে যাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে না কি ? এই সব নানা কারণে পল্লীর হিন্দুগণের অবস্থা দুর্দ্দশার চরমে উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এখানে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেন না, এই একটি কারণে হিন্দু-মুসলমান আজ সমান ভাবেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, আর ইহার আজ প্রতিকার না হইলে দুইয়েরই ভবিষ্যৎ নিতান্তই তমসাচ্ছন্ন। গ্রাম্য মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রচার ও নিন্দাবাদ এত হইয়াছে যে, ইহাদের দ্বারা কোন কালে যে কোন লোকের কখনও উপকার হইয়াছে, ইহা যেন আজ শিক্ষিতগণ স্বীকার করিতেই ভরসা পান না। তাঁহারা পল্লীর আবর্জ্জনাস্তূপেই ইহাদের ফেলিয়া দিতে চান। আবহমান কাল এই গ্রাম্য মহাজনগণই পল্লীবাসীর অর্থ জোগাইয়াছে। মহাজনদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে, তবে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী। মহাজনরা সুদে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে টাকা ধার দিত। আমার নিজ গ্রামে হিন্দু-মুসলমান মহাজন দুই-ই ছিল, এবং উভয়েই উভয়কে টাকা ধার দিত ও উভয়ের নিকট হইতে ধার লইত। মহাজনেরা কেহ কেহ যে অত্যাচারী না ছিল তাহা নহে, তবে তাহাদের মধ্যে ভদ্র ও সহৃদয়ও অনেক ছিল। সুদের হার বাজার চল্‌তি হিসাবে বরাবার কিছু চড়াই ছিল। সুদের হার নির্ণয় করিয়া ব্যবসার আইনকানুন প্রণয়ণ কর (যেমন এখন প্রণয়ণ করা হইতেছে,) কিন্তু মহাজন শ্রেণী যাহাতে একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যায় এমন কিছু করিও না। গত ১৯৩৫ সালের ঋণশালিসী আইনে কিন্তু এই ব্যবস্থাই যেন করা হইয়াছে। একে ব্যবসামন্দা হেতু যে-সব মহাজন ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়াছে তাহারা তাহা আর ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। উপরন্তু যাহাদের কিছু লগ্নীপত্র ছিল তাহাও আর আদায় হইতেছে না। অর্থের স্বাভাবিক স্রোত আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলির তহবিল আজ শূন্য। যাহার নিকট দুই শত টাকা পাওনা, বিশ বৎসরে দশ টাকার কিস্তিতে আদায়ের ব্যবস্থা হইল। মহাজন ত এই টাকা খাইয়া ফেলিবে, তাহার শূন্য তহবিল আর পূর্ণ হইবার আশা থাকিবে না। জমির মালিকেরা আপাততঃ কিছু লাভবান্ হইয়াছে, কেন না তাহাদের খায়খালাসী, জায়সুদী বা সর্গেজে

আবদ্ধ জমি আজ তাহাদের হাতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদেরও ত নগদ টাকার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার কোন ব্যবস্থা সরকার তরফে হয় নাই। অথচ পুরাতন গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, মহাজনদের তহবিল শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের এখনও যৎসামান্য আছে (এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম) তাহারাও চাষীকে টাকা দিতে ভরসা পায় না। অথচ হাল লাঙ্গল গরু কিনিতে, জমিদারের খাজনা, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স ও অন্যান্য দায় মিটাইতে এবং যতদিন না ধানের আমদানি আসে ততদিন ডালভাতের সংস্থান করিতে কৃষকের অর্থের একান্ত আবশ্যক। এ অর্থ কে দিবে? কাজেই ইহারা এখন জমির স্বত্ব স্বামিত্ব ত্যাগ করিয়া সাফ্ কবালা দ্বারা নাম মাত্র মূল্যে জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। খোঁজ লইয়া জানিলাম, নিকটবর্ত্তী একটি রেজেষ্ট্রী আপিসে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যত-না কবালা দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়াছে, গত এক বৎসরের মধ্যে তাহা হইয়া গিয়াছে। আজ অর্থাভাবে বহু লোক ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছে। অথচ দুর্ব্বৃত্ত সুদখোর মহাজনদের হাত হইতে কৃষকদের বাঁচাইবার জন্যই না কি এই আইন করা হইয়াছে! চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা স্পষ্টই দেখিতেছেন, পল্লীর সমাজ-ব্যবস্থায় আজ একটা ওলট-পালট হইয়া যাইতেছে।

আর্থিক সংস্থান হিন্দু মুসলমান একই সূত্রে গ্রথিত, এ জন্য বাখরগঞ্জের অধিবাসীরা আজ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই দুর্দ্দশার চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার উপর ক্রমশঃ ফসল কমিয়া যাওয়ায়, অতিরিক্ত প্লাবন হওয়ায় ও অন্যান্য নানা কারণে তাহারা আজ 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিয়া চেঁচাইয়া মরিতেছে। কে তাহাদের অন্ন দিবে? দু'মুঠা চাউল বা দু'এক আনা সাহায্যে তাহাদের দুঃখ দৈন্যের কতটুকু লাঘব হইবে? পল্লী-বাংলার সর্ব্বত্রই, কারণের কতকটা রকমারি হইলেও, দুঃখ-দৈন্য একইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার স্থায়ী প্রতিকারের কোনই চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

নাস্তিক

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সেই দেশ, সেই পথ, সেই শালবন,
সেই শৈলচূড়ে ঘেরা মেঘল গগন,
সে-দিনের সেই প্রিয়া আজও সহচরী,
তবু আর শ্লথচিত্ত নাহি উঠে ভরি।
জানি বন্ধু, তুমি মোর নহ প্রাপণীয়,
তাই কাঁদি চিরদিন—'ধরা দিও, দিও'!
প্রাপ্তি হ'তে বুঝিয়াছি পাব যা-তা মিছে,
পাব না যা তাই সত্য, ছুটি তারি পিছে।

নিশ্চিহ্ন যৌবন ক্রমে দেহে মনে প্রাণে,
উপনেত্রে চেয়ে দেখি ধরিত্রীর পানে—
শ্যামলে শ্যামল নাই, নীলে নাই নীল,
বিস্বাদ বিবর্ণ জীর্ণ প্রাচীন নিখিল!
মহাশূন্যে ধরণীর এই ভগ্ন নায়ে
আমার শেষের দিন আসিছে ঘনায়ে।
আলোকে খুঁজিতে তোমা ছিল আশাভয়,
আঁধারে খুঁজিতে হবে—নিরাশ নির্ভয়।

এ জীবনে যত যাহে হইনু বঞ্চিত
মরণের তীর্থে সবি হ'ল কি সঞ্চিত ?
শৈশব, কৈশোর মোর, অতৃপ্ত যৌবন,
আয়ুঃ শক্তি আশা প্রেম কল্পনা মোহন,
সকলই কি গেছে ভাসি, সেই মহানীরে—
পূর্ণগ্রাস-পুণ্যস্নানে ছুটি যার তীরে ?
শ্বাস রোধি' ডুব দিয়ে, মাথা তুলে' চাব,—
অমনি কি নবরূপে সব ফিরে পাব।

মরণোত্থ বিস্মৃতির স্নিগ্ধ রসায়ন
ফিরে দিবে নগ্ন কান্ত শিশুর জীবন ?
আবার আমারে ঘিরে হাসিবে এ ধরা।
রজনী সাজাবে তার তারার পশরা ?
চিত্তমাঝে অকারণ আনন্দের দোলে
নৃত্যরসে নবতনু পড়িবে কি টোলে ?
সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী ?

মৃত্যুতলে তিলে তিলে উঠিছে যা জমে'
হয়ত ফিরিয়া পাব জনমে জনমে
নব নব রসে রূপে। শুধু জানি হায়
তোমারে পাইনি বন্ধু, পাব না তোমায়।
সকলের আছ তুমি, আমার যে নাই,
হেঁয়ালীর দুঃখ মোর কারে বা জানাই।
আমার কাটিবে কাল চির-তোমাহারা,
নয়ন হেরে না যথা নয়নের তারা।

তুমি ক্ষিতি, তুমি জল বায়ু অগ্নি ব্যোম,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য্য সোম।
স্থাবরের স্থিতি জঙ্গমের গতিধারা;
যেখানে যা কিছু তুমি,—শুধু আমি-ছাড়া।
মাঝখানে দোলে চির-লীলা-পারাবার,
তুমি-আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর তাই,—
হইয়া পরাণ-বন্ধু থাকিয়াও নাই।

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

১৫

সমুদ্রতীরে মালাবার পাহাড়ের উদ্যানই বোম্বে সহরে প্রমোদভ্রমণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। সন্ধ্যায় এই উদ্যানে অপেক্ষাকৃত একটি নিভৃত কুঞ্জের একখানি আসনে রবীন ও মীনা বসিয়া আছে। সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারী সিন্ধুবক্ষ। ফেন-মুকুট উর্ম্মিমালায় তাহাকে নাচাইয়া সে কি সুখশীতলস্পর্শ সমীর-প্রবাহই আসিতেছিল! সুদূর দিগ্‌বলয়ে অস্তগত সূর্য্যের রক্তচ্ছটা ক্ষীণ ক্ষীণতর হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল। আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ তার মৃদু মন্দ করজাল নৃত্যচঞ্চল সেই সিন্ধুবক্ষে আস্তৃত করিয়া সূক্ষ্ম ছায়ার আড়ালে স্নিগ্ধ আলোয় যেন আধ ঘুমের এক স্বপ্নরাজ্য রচনা করিতেছিল। তীরে নগরের কলকোলাহলে পূর্ণা, দীপ্ত আলোকে উজ্জ্বলা মুখরা ধরা হাসিতেছিল। সেই ধরার বাহিরে ঐ যে আধ ঘুমে-আধ ছায়ায় মাখান মোহন মৃদু আলোকের স্বপ্নরাজ্য, ঐ যে সেথায় সাগরবালাদের মিটি মিটি মৃদু হাসি, হাসিতে হাসিতে আধ ঘোমটায় অগণ্য উর্দ্ধশির পাগাড়-খণ্ডের আড়ালে মুখ ঢাকা, আবার ঐ যে মোহন চঞ্চল নৃত্যরঙ্গে গায়ে গায়ে ঢলাঢলি, ঐ যে তাদের স্বপ্নসুরের মৃদু সঙ্গীত—শোনা যায় যায়—যায় না, বোঝাও যায় যায়, যায় না, ওর কাছে কোথায় ধরা, কোথায় তার জাগ্রত মুখর হাসি! সব ঐ স্বপ্নমাধুরীতে ডুবিয়া যাইতেছে। মুখরতা নীরব হইয়া আসিতেছে, জাগরতা ঘুমে এলাইয়া পড়িতেছে। আর সেই হাসি—বাহিরের দীপ্তি তার ম্লান হইয়া পড়িতেছে, অন্তরের প্রাণ কেবল প্রাণের অন্তরে গিয়া সব, আহা, কি মধুময় করিয়াই তুলিতেছে। বিভোর হইয়া মীনা সাগর-বক্ষে উদ্ভাসিত সেই স্বপ্ন-দৃশ্যের দিকে চাহিয়া ছিল।

কতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল "আহা, কি সুন্দর! কি মধুর!"

রবীনও আনমনা হইয়া কি ভাবিতেছিল। হঠাৎ চমকিয়া চাহিল, কহিল, "কি মীনা! কী সুন্দর? কী মধুর?"

"দেখছ না? দেখ ঐ সাগরের দিকে, আকাশের দিক, একটিবার চেয়ে দেখ!"

"ও, ঐ প্রাকৃতিক দৃশ্য? হাঁ সুন্দর বটে, মধুরও বটে। কিন্তু আমি দেখছিলাম ওর চাইতেও সুন্দর, ওর চাইতেও মধুর, আর কিছু।"

"কিছু কি আর এমন আছে?"

"আছে। তোমার কাছে না থাকতে পারে, আমার কাছে আছে। তার ঐ প্রাকৃতিক দৃশ্য তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ধন্য হয়।"

"কী সে?"

"কী সে তা আর কতবার বলব মীনা? বুঝতে পারছ না? আবার বলতে হবে? হাঁ, বলব তবে। হাজার বার, লাখো বার বলব! বলে বলে আমার ক্লান্তি হবে না। বরং যত বলব, তত তৃপ্ত হব, আরও ব'লে আরও তৃপ্ত হতে চাইব, নিবৃত্তি কিছুতে হবে না। বলব তবে? আবার বলব? সে সুন্দর, সে মধুর, আমার মীনা তুমি!" বলিতে বলিতে মীনার হাতখানি হাতে টানিয়া লইয়া অতি আবেগে রবীন চাপিয়া ধরিল।

ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া মীনা কহিল, "ধিক! আজ এই সন্ধ্যায় ঐ আকাশের দিকে সাগরের দিকে চেয়েও মানুষের ছার রূপ—রূপই যদি থাকে—তার দিকে চোখ কারও পড়তে পারে? মনেও সে কথা কারও উঠতে পারে?"

ভাবের একটা আকুল উচ্ছ্বাস প্রকাশে রবীন উত্তর করিল, "যদি আমার মত তন্ময় হয়ে ভালবাসতে মীনা, তার রূপ আমার তেমন থাকত—"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "থাক, দোহাই তোমার, ও কথায় আর কাজ নেই। ভালবাসলে কেবলই কি এ মুখ এমনি করে বলতে হয়? না, সত্যি বলছি, আমার বড় লজ্জা করে।"

"লজ্জা করে? তুমি নারী, নারীর বোধ হয় স্বভাবই এই। কিন্তু পুরুষ আমরা বড় মুখর বড় নির্লজ্জ। আর—আর—ঠিক বলতে পারিনে মীনা, প্রেমের আবেগও তোমাদের চাইতে বোধ-হয় আমাদের অনেক বেশী। তাই তোমরা যত ধীর-সংযত, আমরা তত হতে পারি না, থাকতেও পারি না উদ্দাম সে আবেগকে চেপে, সামলে নিজেদের বেখে। তাই দেখতে পাওয়া যায় প্রেমোন্মত্ত পুরুষই কেবল প্রেমের পাত্রীকে কত কেড়ে নিয়ে গেছে। নারীর একটি দৃষ্টান্তও কোথাও এমন পাবে না। আহা, আজ যদি তেমনি তোমাকে কেড়ে নিয়ে কোথাও যেতে পারতাম মীনা!"

আরও আবেগে ধৃত হাতখানি মীনা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া রবীন কহিল, "না, রাগ করো না মীনা, বিরক্ত হয়ো না। একটু—আর একটু—আর এক মিনিট—একটি কথা আমাকে বলতে দাও। এ অধিকার ত আমি পেয়েছি। পাই নি কি মীনা?"

"তা—হাতটা কেন ছেড়ে দাও না? নাঃ! আচ্ছা, তা নেহাৎ ব'লতেই যদি কিছু চাও, বেশ, ব'লেই ফেল। হাত ছাড়, ভয় নেই, কান আমি চেপে ধ'রব না।"

"না, ছাড়ব না। কেন ছাড়ব? এ হাত যে এখন আমার। নয় কি?" বলিয়া হাতখানি এবার টানিয়া লইয়া রবীন একেবারে তার বুকে জড়াইয়া ধরিল।

"না, ছি! ক'রছ কি? পাগল হ'লে না কি তুমি?"

কেমন একটা কঠোর ধ্বনি মীনার স্বরে উঠিল। রবীন হাত ছাড়িয়া দিল, মীনা একটু সরিয়া বসিল। রবীন চাহিয়া দেখিল, মীনা আবার সেই সাগরের দিকে চাহিয়া আছে, কিন্তু মুখখানি এবার যেন বিষণ্ণ। কিছু অপ্রসন্নও কি? সশব্দে গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস রবীন ত্যাগ করিল। মীনা একবার চাহিয়া দেখিল, তখনই আবার সাগরের দিকে ফিরিল। সাগর-বক্ষের সেই মোহনমধুর শোভা, তার অন্তরালে আর কি সে দেখিতেছিল, কিসের সাড়া পাইতেছিল—যাহা তার সমস্ত প্রাণকে বিভোর করিয়া টানিয়া লইতেছিল?

ধীরে ধীরে অতি কুণ্ঠিত ভাবে ব্যথিত ও পরিতপ্ত স্বরে রবীন কহিল, "রাগ ক'রলে মীনা? আমি—আমি—"

স্থিরদৃষ্টিতে মীনা ফিরিয়া চাহিল। মুখে একটু হাসিও ফুটিল। কহিল, "রাগ? না, তখন একটু হ'য়েছিল বই কি? তা—রাগ ক'রে আর ক'রব কি? সত্যিই বুঝি তোমাদের স্বভাবই এই। তা আমাদের স্বভাবটারও একটু খাতির করে তোমাদের চ'লতে হয় না কি?"

"হয়!—উচিত বটে!—কিন্তু—কিন্তু—পারি না যে!" যেন রুদ্ধ আবেগে, কেমন চাপা স্বরে শেষ কথা কয়টি রবীন উচ্চারণ করিল। মীনা আর একটুখানি সরিয়া বসিল। কহিল, "পারছ না, কিন্তু পারলে ভাল হ'ত। নিজের মনের বেগকেই কেন এত প্রশ্রয় দেবে?"

"শিখিয়ে দাও কিসের বলে সেটা দমন ক'রব।"

"কিসের বলে? জানি না। কখনও ত কেউ বলে নি তা। কেউ ত শেখায় নি তা। আজ কেবল ঐ দিকে চেয়ে মনে হ'চ্ছিল, না, এতদিন যা ভেবেছি, এই পৃথিবীটা, কেবল তার ঐশ্বর্য্যবিলাস, হাসি-খেলা,—তাই মানুষের সর্ব্বস্ব নয়।"

"হাঁ, অবশ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—"

"প্রকৃতির সৌন্দর্য্য! শুধুই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—আমাদের উপভোগের আর একটা বস্তু মাত্র, কৃত্রিম প্রমোদ-বিলাসের অতি-তৃপ্তিতে ক্লান্ত মানব, একটু চোক জুড়োবার তরে; কি বাইরের নতুন একটা আনন্দের তরে, যা কখনও খোঁজে—যাতে ক্লান্ত প্রাণটা তার আবার তাজা হয়ে ওঠে। ছি ছি, রবীন! ঠিক তেমনি একটা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ব'লে আজ ঐ আকাশের সাগরের শোভাকে তুমি দেখছ, আর ঠিক যেন বই-পড়া একটা শেখা বুলির মতই হেলায় তার কথাটা উল্লেখ ক'রছ, ভদ্রতার খাতিরে যেমন না ক'রলে নয় তেমনি!"

রবীন কহিল, "যা দেখছি, যেমন দেখছি, চোখে যেমন লাগছে, তাই ব'লছি। তার বেশী তুমি কি দেখছ মীনা? ব'লতেই বা কি চাও?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া মীনা কহিল, "কি দেখছি! সে ত ব'লতে পারিনে রবীন! না, ঠিক বুঝি দেখছি না, দেখতেই প্রাণটা আকুল হ'য়ে উঠছে! যেমন আগে—না, ঠিক এমন কখনও ত আর হয় নি। কত কথাই আজ মনে উঠছে, যা আগে কখনও ওঠে নি, উঠতে দিই নি। কেউ বল্লেও হেসে উড়িয়ে দিইছি। হেসে উড়িয়ে দিইছি মুখে। আজ বুঝতে পারছি, ঠিক মনে মনে কখনও হাসতে পারি নি। মনে কেমন খোঁচা একটা গিয়ে লাগত; তখন ঠিক ধ'রতে পারি নি, আজ পারছি।"

বলিতে বলিতে মীনা হঠাৎ থামিয়া গেল; আবার সেই কেমন বিভোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রবীন বিস্ময়ে অবাক্! এ কি হইল? অকস্মাৎ মীনার একটা কাব্যোন্মাদনা কি—ধর্ম্মোন্মাদনা উপস্থিত হইল না কি?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মীনা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "বরাবরই কেমন যেন একটা ভাব আমার হয়; ঠিক কলকেতায় নয়, বাইরে, দূরে একটু নিরেলা যায়গায় যখন বাবার সঙ্গে যাই। গভীর জোছনা রাত, সব নীরব নিস্তব্ধ,—কোনও সাড়া-শব্দ কোথাও নেই; আকাশে, নদীর ওপর, মাঠে, গাছ-পালায়, দূর দূর—যত দূর দেখা যায়, উপরে নীচে চারধারে কেবলই স্থির একটা জোছনার আলো—তার

আদি নাই, অন্ত নাই, মাঝে কোথাও একটু ফাঁক নাই, নড়াচড়া নাই, কেবলই অখণ্ড অচঞ্চল জমাট একটা জোছনার সুর যেন জগৎ ভ'রে বাজছে। আবার ভোরে যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, লালিম আলোয় আকাশ কেমন মিঠে লাল হয়ে ওঠে, সেই আকাশ ভ'রে মিঠে হাওয়া ছুটে এসে গায়ে লাগে, আলোতে গাছে গাছে কত ফুল হেসে চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে, কুলু কুলু কত পাখী ডাকে, কেউ গাছে গাছে, কেউ বা আকাশে উড়ে; এক দিন শুনলাম, ভিখারী কারা খঞ্জনী বাজিয়ে প্রভাতী গেয়ে যাচ্ছে - গানের পদ মনে নেই, কিন্তু সুর আর কথাগুলি এমন মিঠে লাগছিল।"

মীনা চুপ করিল।

রবীন ডাকিল, "মীনা।"

"উঁ ?"

"ও সব—কি ব'লছ তুমি ?"

"কি বলছি। ঠিক যা মনে হচ্ছে তাই। না বলে যে পারছি নি। বলব না তবে ? শুনবে না তুমি ? শুনতে চাও না ? কী শুনতে চাও তবে ?"

হাসিয়া রবীন কহিল "না, না, বল, বল। যা তোমার মনে হয় বল, তাই যে আমি শুনতে চাই।"

"না, তা চাও না। বলছ কেবল আমি খুসী হব ব'লে। নিজে তুমি শুনতে চাও না।"

গভীর একটি নিশ্বাস মীনা ত্যাগ করিল।

ব্যগ্রভাবে রবীন কহিল, "ক্ষুণ্ণ হ'লে মীনা ? না, না, সত্যি বলছি—বল, সত্যি বলছি বড় সুখী হব।"

মীনা কহিল, "জানি না রবীন, সত্যি বলছ কি না। তবে সত্যি ব'লে বড় ভাল হ'ত। সত্যি কি হয় না রবীন ? ঐ যে আকাশে ঐ বাঁকা চাঁদ, তার উপরে ঐ যে একটি উজ্জ্বল তারা—দেখছ না ? দেখে তোমার সত্যি কি মনে হ'চ্ছে বল ত !"

"হাঁ, বেশ সুন্দর বটে। ঐ সৌন্দর্য্যেই আকৃষ্ট হয়ে বোধ হয় মুসলমানরা ঐ রকম একটি চাঁদ আর তারা তাদের জাতীয় পতাকার চিহ্ন ক'রে নিয়েছে।"

"মুসলমানরা! জাতীয় পতাকার চিহ্ন ? হাঁ! তাই বোধ হয় নিয়েছে। কিন্তু সে আর ওর কতটুকু মহিমা ? শুধু জাতীয় পতাকার চিহ্ন! যে পতাকা তুলে দম্ভে অন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হায়, গর্ব্বে নিজেদের জাতীয় মহিমা দেখাতে হায়, অন্য সব জাতিকে খর্ব্ব করে! সেটা এমন বড় কথা কিছু নয় যুদ্ধ, বিবাদ, কাটাকাটি, রক্তারক্তি—মানুষকে মানুষের নিষ্করুণ প্রহার ? আর ছোট মানুষের এত বড় দর্প, পার্থিব শক্তির বলে মানুষকে অবহেলা—না, না, প্রথমে যিনি ঐ চিহ্ন গ্রহণ ক'রেছিলেন, তিনি বোধ হয় এমন কথা মনেও ভাবতে পারেন নি।—ও যে বিশ্ব-দেবতার ললাটে অমৃত-তিলক।"

"বিশ্ব দেবতা! দেবতা—"

"হাঁ, দেবতা! বিশ্ব-দেবতা! এতদিন ভাবি নি ভাবতে শিখি নি—ভুলই বুঝেছি বড়। আজ মনে হ'চ্ছে, দেবতা—বিশ্ব-দেবতা কেউ আছেন, নইলে এতবড় এই বিরাট বিশ্ব কোথায়, কিসে, কাকে আশ্রিত হ'য়ে আছে ? ঐ যে রূপ, ঐযে মাধুরী, ও কার ? কোথা থেকে আসছে ? কাকে ধরে ফুটে উঠেছে ? কে এই বিশ্ব ভ'রে এমন অজস্রভাবে তা ঢেলে দিচ্ছে ? একটি কথা আজ মনে হ'চ্ছে রবীন। গেল বছর পূজোর সময় প্রভা নেমন্তন্ন করেছিল। গিয়েছিলাম তাদের বাড়ীতে। পূজো হচ্ছিল, পুরুতঠাকুর কি একটা স্তব পড়ছিলেন;—একটা কথা তার ভেতর ছিল, 'অর্দ্ধেন্দুকৃত-শেখরাম্'। একটা ছবি দেখেছিলাম তাদের বাড়ীতে, বড় সুন্দর মহাদেবের ছবি, কপালে অমনি চাঁদের রেখা, আর তার উপরে তার—উপরে—অমনি তারার মত একটি বিন্দু ?"

"আজ হঠাৎ এত কথা তোমার মনে হল কিসে মীনা ?"

"কিসে হ'ল ? আকাশে ঐ যে চাঁদ, আর তার উপরে ঐ তারাটি আর চাঁদের ঐ যে মৃদু জোছনা আকাশ ভরে নেমে এসে অসীম ঐ সাগরের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে, আর এমন মিঠে হাওয়া যেন ঐ জোছনার আমেজ মাখা হ'য়ে গায়ে এসে লাগছে—"

"রোজই ত' এসে লাগে—"

"লাগে। রোজই দেখি, রোজই লাগে। রোজই—এই রকম একটা ভাবের আভাসও পাই। কিন্তু এমন স্পষ্ট হ'য়ে ত কখনও ওঠেনি, এমন একেবারেই বিভোর ক'রে ত আমায় আর তোলেনি, আজ কেন তুলছে। তবে—তবে—হাঁ, একটি কথা ব'লতে পারি।"

"কি মীনা ?"

"দেখ, বাইরে বড় সুন্দর, বড় গম্ভীর, বড় মহৎ যা কিছু যখন দেখি, মনটা আমার যেন কেমন হয়ে যায়,—যেন এই পৃথিবী ছেড়ে কোথায় কোন্ দেশে চলে যেতে চায়—যার সাড়া একটু একটু আলোকে কখনও পায়, স্পষ্ট কিছু দেখতে পায় না, ধরতেও পারে না। প্রাণটা আমার বড় অস্থির পাগল-পারা হয়ে ওঠে। তা চেপে দিই, মনটাকে ফিরিয়ে আনি। যত কিছু অমন দেখেছি, এই রকম ছোট বাঁকা চাঁদ, তার উপরে অমনি একটি তারা, আর সেই চাঁদের অমন মৃদু মিঠে ঘোরালো জোছনা যখন নদীর উপরে পড়ে, আর এমন মিঠে হাওয়ায় জল চিকিমিকি করতে থাকে, দূর বনে কি মাঠে নদী আরও মৃদু আর ঘোরালো জোছনায় মিলে যায়—এমনি কিছু যখনই দেখি, মনটা যে

আমার কি হয়ে যায়, সে আর বলতে পারি না রবীন! একেবারে যেন পাগল হয়ে উঠি, মন ফিরিয়ে নিতে চাইলেও নিতে পারি না। আজ—হাঁ, এখানে আরও ক'দিন এসেছি, আরও বেড়িয়েছি, এখানে আরও বসেছি। কিন্তু আকাশে অমন চাঁদ আর তার অমন মিঠে আলো ত আর এমন দেখি নি। আর অসীম এমন সাগরের বুকে এমন জোছনা—দেখেছি ; কিন্তু এমন মিঠে ত আর কখনও লাগে নি!"

রবীন দেখিল, সাগর-সমীপে এই উদ্যানে আজ আর অধিকক্ষণ মীনাকে লইয়া বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন। যেরূপ অভিপ্রায় তার ছিল, সে রূপ কোনও কথা আজ এই অবস্থায় মীনার কাছে তোলাই যায় না। বরং সময় যত অতীত হইবে, মীনার ভাব-বিকার ততই বাড়িবে। হঠাৎ তখন ঘড়ী দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ইস্। রাত্তির যে ন'টা হ'ল মীনা?"

"ন'টা!—তাইত!—এত সময় চলে গেছে। বাবা বলেছিলেন, ন'টায় ফিরবেন।"

"হুঁ—তা হলে এখন ঘরে ফিরবে কি?"

"হাঁ, চল।" বলিয়া মীনা উঠিল। সমুদ্রের দিকে আবার চাহিল, পঞ্চমীর চাঁদ তখন দিগ্‌বলয়ের দিকে আরও অনেক দূর হেলিয়া পড়িয়াছে। সে ঘরে ফিরিতেছে, আর দেবতাও যেন তাঁর সেই অমৃত-তিলকভাসিত মাথাটি দূর সমুদ্রের রূপালী শয্যায় ধীরে ধীরে ন্যস্ত করিতেছেন। সাগরবালারা ছোট ছোট শুভ্র হাতগুলি তুলিয়া দিতেছে, সেই মাথাটি যত্নে সেই শয্যায় নামাইয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ মীনা চাহিয়া রহিল। তার পর নতজানু হইয়া ধীরে ধীরে ভূতলে শির লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল।

"ও কি মীনা?"

রবীন হাসিয়া উঠিল।

মৃদু একটু হাসি মীনার মুখেও ফুটিল।—কহিল, "ঘরে ফিরে যাচ্ছি, দেবতাও ঐ সাগর-শয্যায় মাথা রেখে এখুনি বিশ্রাম করবেন, তাই তাঁকে প্রণাম করলাম।"

হাসিয়া রবীন কহিল, "ও তাই!—আমি ভাবলাম কি মনে করে হঠাৎ আমাকেই বুঝি একটা প্রণাম করে ফেললে।"

"তোমাকে!—তোমাকেও যদি, আহা অমনি দেবতার মত দেখে প্রণাম করতে পারতাম রবীন!"

"না, দেবতা হয়ে তোমার প্রণাম চাই না মীনা! বরং দেবী বলে সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমাকেই পুজো করতে চাই। সে অধিকার—সে অধিকার—আজ আমাকে দেবে মীনা?"

সহসা রবীন বাহু বিস্তার করিয়া মীনাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।—বিবেব স্পর্শে যেন মীনার সমস্ত দেহ ভরিয়া একটা আগুনের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। আগুনের বেগে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। অধরে রবীন অতি আগ্রহে চুম্বন করিয়াছিল। দুই হাতে জোরে অধর মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিল, "ছি ছি ছি!—তুমি কি উন্মত্ত হয়েছ রবীন?"

"হাঁ, উন্মত্তই হয়েছি। উন্মত্ত তুমিই করেছ মীনা!"

"এতদূর আত্মবিস্মৃত তুমি হতে পারবে কখনও ভাবি নি!"

"আত্মবিস্মৃত! আত্মবিস্মৃত! কিসে আত্মবিস্মৃত মীনা? তুমি আমার, আমি তোমার; প্রেমে আমরা চির-জীবনের মত বাঁধা পড়েছি। মনের সেই বাঁধন দেহের এই বাঁধনে কেন এখন বাস্তব একটা সত্যে পরিণত হবে না? আর তার স্থান ও সময় কি এই নয়—ঐ তোমার দেবতার সামনে—দেবতাকে যখন ভক্তিভরে নত হয়ে প্রণাম করলে, আমাকেও দেবতা বলে প্রণাম করতে চাইলে?"

বলিয়া আবার শক্ত করিয়া হাতখানি চাপিয়া ধরিল, কাছে তাহাকে টানিয়া আনিতে চাহিল। চক্ষেও যেন আগুন জ্বলিতেছিল। কেমন ছটফট করিয়া উঠিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া মীনা কহিল, "ছাড়, ছাড়, হাত ছেড়ে দাও না? সর, সরে দাঁড়াও! ছি! কি করছ তুমি!"

রবীন ছাড়িয়া দিল।—চক্ষু মুখ ভরিয়া যেন আগুন জ্বলিতেছিল। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "কি ভাবছ মীনা? প্রেমে যে আমরা বাঁধা পড়েছি, এই সত্য কি অস্বীকার করতে চাও?"

"না।—তবে—"

"কি তবে? বিবাহ বলে যে একটা convention (লোকাচার) আছে, তার কাছে এখনও মাথা নোয়াই নি? ধিক্! মানব-মানবীর প্রেমকে তুমি কি এত দীন, এত হীন, এমনই অসহায় আর পরবশ বলে মনে কর যে ঐ একটা লোকদেখান, লোকভুলান ফাঁকা অনুষ্ঠানের আশ্রয় ব্যতীত সে আপনাকে তার ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না? কিসের তবে সত্য তার, শক্তি তার, সত্যের আর শক্তির মহিমা তার? কি, চুপ করে রইলে যে? কি উত্তর দেবে এর?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মীনা শেষে কহিল, "উত্তর? না, এতদিন যা শিখেছি, যে ভাবে যে চোখে সব দেখেছি, তাতে কোনও যুক্তি দিয়ে তোমার এ কথার উত্তর আমি এখন দিতে পারব না। কিন্তু আমার মন বলছে, মনে আপনা থেকে উঠছে, না, তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়। এ সব যুক্তি-তর্কের উপরে এমন একটা কিছু সত্য আছে—তত্ত্ব-রহস্য আছে, যাতে ক'রে এই পৃথিবী ভ'রে সকল দেশে সকল

সমাজে বিবাহই মানব-দম্পতির মিলনের ধর্ম্ম হ'য়ে রয়েছে। ছি ছি, অন্য রকম—কী তুমি ভাবছ রবীন। আমাকেই বা কি ভাবাতে চাও? দোহাই তোমার রবীন, তোমাকে ভালবাসি; এখনও ভালবাসি, দোহাই তোমার, সেই ভালবাসাকে দারুণ বিরাগে পরিণত করে তুলো না।"

"বিবাহ? ধর্ম্ম? জান তোমার বাবা কোনও ধর্ম্ম মানেন না? বড় জোর সিভিল ম্যারেজ অনুমোদন করতে পারেন, তাই সেদিন বলছিলেন। সেটা ত আইনের একটা চুক্তি মাত্র। ধর্ম্ম, কি ধর্ম্মে যাকে বিবাহ বলে, তার নামগন্ধও তাতে কিছু নেই। আর সেও ত একটা convention (লোকাচার) মাত্র। ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে একটা সামাজিক মহিমা আছে, তাও তার নেই। মিলনে তার আশ্রয় গ্রহণ প্রেমের আরও বড় অমাননা। প্রেমের এত বড় অবমাননার কথা কি করে তুমি ভাবতে পার, জানি না। আমি—আমি ত পারছি না।"

মীনা একটি নিশ্বাস ছাড়িল, চক্ষে তার জল আসিল। একটুকাল নীরব থাকিয়া শেষে কহিল, "চল, ঘরে যাই।"

"ঘরে—চল তবে। কিন্তু আমার কথাটার একটা জবাব আমি চাই।"

"থাক্ আজ রবীন। দোহাই তোমার। ভালই আমার লাগছে না। চল।"

"এস তবে।" বলিয়া রবীন হাত বাড়াইয়া দিল। মীনা সেদিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া সোজা অগ্রসর হইল। অগত্যা রবীন হাতখানি গুটাইয়া লইয়া পাশাপাশি চলিল।

"হাঃ হাঃ হাঃ!"

বিকট একটা হাস্যধ্বনি অদূরে একটা ঝোপের আড়ালে উঠিল। রবীন ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল। চমকিয়া মীনা কহিল, "ও মা, কে ও?"

"পাগল টাগল কেউ হবে। ভয় নেই, এস।"

বলিয়া আবার হাতখানি ধরিতে গেল। বড় ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু হাত গুটাইয়া একটু ফাঁকেই সরিয়া মীনা সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

১৬

"কি, উড়োপাখী ধরতে এসেছ বিন্দু?"

"আপনি এখানে অতীন বাবু! কবে এলেন?"

বলিয়া বিস্মিতা বিন্দু একটু কি ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া অতীনকে প্রণাম করিল।

হাসিয়া অতীন কহিল, "কি, একেবারে প্রণাম করেই যে ফেললে? তা—করতেও পার। বয়সে, হাঁ, আমি তোমার দিদিরও বড়। আর সম্পর্কে—"

"দিদির দ্যাওর। আমার দাদার মত আপনি।"

"সে এখন দয়া ক'রে যাই বল, প্রণামটা—যখন এই বিদেশে এসে দেখা হ'ল,—করেছ, আমিও গ্রহণ করলাম। আশীর্ব্বাদ চাও? হাঁ, তবে ব'লছি, সুখী হও কিন্তু পথ তার কি ঠাউরেছ? উড়ো পাখী ধ'রে নেবে, নাই ভরসা?"

প্রশ্নটা বিন্দু যেন কানেই তুলিল না। সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এলেন এখানে? ভাল আছেন ত?"

"ভালই—হাঁ, এই চ'লে যাচ্ছে এক রকম। এসেছি এখানে ক'দিন আগে আমাদের অফিসের একটা কাজে। তোমার শ্বশুরমশাই-এর সঙ্গে দেখা হবে এখানে কথা ছিল। জানতাম তোমরাও এখানে আসছ।"

বিন্দু উত্তর করিল, "তিনি ত' বেরিয়ে গেছেন এই কতক্ষণ।"

"শুনলাম তাই। খানিক বাদেই না কি ফিরবেন। তাই এলাম ভেতরে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব ব'লে।"

"বসুন ঐ চৌকিতে।"

"বসছি। তা তুমিও ব'স না?"

"কিছু খাবার আর এক কাপ চা ক'রে নিয়ে আসি আপনার জন্যে।"

"না না, দোহাই তোমার। ও সব উৎপাত আর জুটও না এখন। প্রচুর খাবার আর পুরো দুই কাপ চা এই খেয়ে আসছি। আপত্তি না থাকলে বস ব'সোই একটু। একলা চুপটি ক'রে বাইরে ব'সে থাকব, তার চাইতে তোমার সঙ্গে দুটো কথা-বার্ত্তাই বলা-কওয়া যাক। দেখা—সে একটিবার কেবল চোখের দেখাই ত দেখা নয়, আলাপ-সালাপও একটু চাই।"

"তা বেশ ত', বলুন না।"

বিন্দু একটু দূরে পৈঠতলেই বসিল

"একদম মাটিতেই ব'সলে অমনি—"

একটু হাসিয়া বিন্দু কহিল, "বেশ ব'সেছি। এই ত আমাদের ব'সতে হয়।"

"বটে! একেবারে খাঁটি বাঙালী গেরস্ত বউ।"

"বউ-ই-ত বটি আমি এ বাড়ীতে।"

"তা বটে। শ্বশুর-শাশুড়ীর বউ। কিন্তু সেই বউ যার বাঁধনে—যে তোমাকে এনেছে এ বাড়ীতে—"

"এনেছেন তাঁরাই।"

সলজ্জ আনত মুখে বিন্দু এই উত্তর করিল।

অতীন কহিল, "সেটা হল কথার কথা বইয়ের সামাজিকতার কথা। কিন্তু আসলে এনেছিল প্রেমাক—হতে যার হাত বাঁধা পড়েছিল তোমার—সেই, সেই বাঁধনের টানে। তবে কি না আনতে সে চায় নি; আনতে হয়েছে

তোমাকে টানটা মেনে, না মেনে এদেশের মেয়েরা পারে না তাই।"

মুখখানা বিন্দু ফিরাইয়া লইল।

অতীন চাহিয়া দেখিল; কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "তা সে যাক্। ও কথা বরং থাক্ এখন। কিন্তু এই একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। বলি উড়ো পাখীটিকে ধরতে এতদূর ছুটে এসেছ, পারবে কি না, তার আশা কিছু রাখ?"

বিন্দুর চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার উনি কে? মনে হইল, এই জবাবটিই সে করে। কিন্তু দিদির মেয়ের দেবর, আর এই গৃহে আজ অভ্যাগত। গত বৎসর দুই যাবৎ বিরক্তিকর যাহাই ইহাঁর আচরণে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায়, ব্যবহারের ভাবভঙ্গীতে, লক্ষ্য করিয়া থাক্, বাল্যাবধি ভগার ন্যায় সরল সহজ ভাবে ইহাঁর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কত হাসি গল্প সে করিয়াছে; এখনও একেবারে সে অভ্যাস সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজ এরূপ কোনও প্রশ্ন সে অধিকারেও ইনি করিতে পারেন বই কি? যতই অসঙ্গত মনে হউক; ঠিক চটিয়া উঠিতে সে পারে না। আর ছি, চটিবেই বা কেন? চটিয়া সে অতীনের কাছে নিজেকে হীন করিবে কেন? বেশ ত, করুন না ইনি প্রশ্ন যত খুসী। সরল সহজ ভাবেই সে উত্তর দিবে।—অতীনের কাছে, কি কারও কাছে লজ্জা পাইবার ত কোনও কারণ তার নাই।—অপরাধ আর যাহারই হউক, তাহার ত কিছুই হয় নাই।

"কি, চুপ করে রইলে যে? আমার এই প্রশ্ন বড় আপত্তিজনক বলে মনে হচ্ছে বুঝি?"

মুখ তুলিয়া সহজ দৃষ্টিতে বিন্দু তখন চাহিল; সহজ ভাবেই কহিল, "না, আপত্তির এমন কিছু নাই। কি আশার কথা বলছিলেন না? না, আশা আমি কিছুরই রাখি না।"

"সেটা বুদ্ধিমতীর কাজই করেছ, কারণ রাখবার মত আশা সত্যি কিছু নাই। এটা বোধ হয় জান, রবীন আমার—ঠিক বন্ধু বলতে না পারি—বহু দিনের পরিচিত বটে।"

"শুনেছি তাই।"

"তার সঙ্গে দেখাও আমার হয়েছিল।"

"ভাল আছেন তিনি?"

"ভালই আছে; আর ফুর্ত্তিতেও আছে। তাই বলছিলাম এ পথে আশা তোমার কিছু নাই।"

"আশা আমি কিছুই করি না ত।"

"কিন্তু এসেছ ত এতদূর ছুটে। কেন এসেছ তবে?"

"শ্বশুর মশাই নিয়ে এলেন তাই।"

"ও, শ্বশুর মশাই নিয়ে এলেন! তা হ'লে তাঁর অবশ্য আশা একটা কিছু আছে?"

"থাকতে পারে। তাঁর আশার কথা তিনিই জানেন। আমি কি বলব?"

অতীন কহিল, "তাঁর আশা ঐ উড়ো পাখী ধরে দেবেন তোমাকে। কিন্তু মিছে আশা। এ সব উড়ো পাখী ওভাবে ধরা যায় না। ফাঁদে ফেলে বাঁধতে কোনও মতে পারলেও পোষ মানে না, বাঁধনে ছটফট করে, ছিঁড়েই পালাতে চায়।"

বিন্দু একটু ভ্রূকুটি করিল; যতদূর সাধ্য ধীরে সংযত ভাবেই কহিল, "এ সব কথার প্রয়োজন কিছু আছে?"

"প্রয়োজন—হাঁ, কিছু আছে বই কি। তুমি আত্মীয়া, বহুদিন যাবৎ বন্ধুত্বও আমাদের একটা আছে। তাই ভাবছি, এ অবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য কি, তা কি তুমি বুঝবে না? বুঝে তা করতে প্রস্তুত হবে না?"

বিন্দু উত্তর করিল, "আমার যা কর্ত্তব্য তা বুঝেছি, বুঝে তা করতেও প্রস্তুত আছি। করছিও।"

"কি বুঝেছ? কি করছ? রবীন আজ না হক কাল—তোমরা এসেছ জানতে পারলে হয় ত আজই—তার মীনাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। আর তুমি বুঝি সেকালের সব নাটকের ধারিণী কি বাসবদত্তার মত আহ্লাদ করে গিয়ে তাদের সেই মিলনকে বরণ করে নেবে?"

"পালিয়ে যাবেন! ছি—ছি! এ আপনি কি বলছেন? মীনা—মীনাকে নিয়ে! না, ছি! সে হতেই পারে না।"

"কালই হয়ত শুনবে হয়ে গেছে।"

"অসম্ভব! মীনা সে মেয়েই নয়। এমন একটা ইঙ্গিত করেও আপনি তাকে অপমান করছেন।"

"হতে পারে। তবে এটা বোধ হয় তোমার জানা নেই, যদি মিলতে চায় এ ছাড়া আর গতি তাদের কিছু নাই। কারণ বিবাহ হতে পারে না।"

"পারে না! কেন? বাধা কি?"

"বাধা তুমি।"

"আমি!—না বাধা আমি হতে চাই না।"

"চাও আর না চাও, বাধা তুমি হয়ে রয়েছ। তার বিবাহিতা স্ত্রী রূপে তুমি বর্ত্তমান, এ সত্যটাকে ত আর উল্টে দিতে পার না।"

"তাতে আর কাউকে তাঁর বিয়ে করতে—"

"বাধা আছে। হিন্দুর ঘরে নেই। পুরুষ সেখানে যতটা খুসী বিয়ে করতে পারে। কিন্তু ওরা হিন্দু নয়, ঠিক ব্রেহ্মজ্ঞানী কি খৃষ্টান না হ'ক, হিন্দু একেবারেই নয়। ঐ যে একরকম সাহেবী ধরণের বড়লোক আছে, কিছুই মানে না—"

কিছু উদ্বিগ্নভাবে বিন্দু তখন কহিল, "হাঁ, মীনা বলেছিল বটে, কোনও ধর্ম্ম তারা মানে না।"

মনে পড়িল মীনা সেই একদিন কি সব কথা এ

সম্বন্ধে বলিয়াছিল, জীবনটাকে তারা কি ভাবে দেখে, কি ভাবে সকল ধর্ম্মকে আর আচার-নিয়মকে অবহেলা করিয়া মুক্তভাবে কেবল আপন আপন সুখ-সুবিধা খুঁজিয়া চলিতে চায়। মনে মনে সে শিহরিয়া উঠিল। মুখখানি ভরিয়াও কেমন একটা ভীতিব্যাকুল ভাব প্রকাশ পাইল।

সেটা লক্ষ্য করিয়া একটু হাসি চাপিয়া অতীন কহিল, "না, তারা কিছুই মানে না। নাস্তিকই তাদের ব'লতে পার। আর ওদের মত সবাই প্রায় এমনই নাস্তিক। ওরা যে বিয়ে করে, সে কেবল একটা আইনের চুক্তি, সিভিল ম্যারেজ যাকে বলে—নাম শুনে থাকবে। তা সে সিভিল ম্যারেজ হ'তে পারে না, স্ত্রী কি পুরুষ কোনও এক পক্ষের বিবাহিত স্বামী কি স্ত্রী যদি জীবিত থাকে। সেটা ছাপিয়ে যদি করে, ধরা পড়লে কঠিন দণ্ডের ভাগী হ'তে হয়। সুতরাং মিলতে হ'লে এই ভাবেই তাদের মিল্‌তে হবে। ওরা নাস্তিক, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু মানে না, কেবল সুখ সুবিধাই চায়। সুতরাং খুঁৎখুতিই বা কেন ক'রবে? বরং এও মস্ত একটা বাহাদুরী হ'ল তাই ভাববে।"

বিন্দুর চক্ষে জল আসিল; একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "মীনার সঙ্গে—যদি একটিবার দেখা হত—"

"কি করতে তা হ'লে? খোলাখুলি তাকে ব'লতে তুমি রবীনের স্ত্রী?"

"না। তবে জানি না কি ব'লতাম, কি ক'রতাম, তবু—তবু বড় ইচ্ছে হচ্ছে যদি একটিবার দেখা হত—"

বিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। মুখ চাপিয়া দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতীনের চক্ষু-মুখ যেন বজ্রাগ্নি-শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইয়া ছুটিয়া সে বিন্দুর পেছনে যায়, ধরিয়া তাকে বলে, অবোধ নারী? কেন এই কুশিক্ষার কুসংস্কারের ভ্রান্তিতে বৃথা দুঃখ পাইতেছ? সুখের পথ যেমন ওরা খুঁজিয়া লইতেছে, তুমিও পার। কেন লইবে না? কিন্তু—

অখিল বাবুর সাড়া তখনই পাওয়া গেল। ত্রস্ত অতীন উঠিয়া বাহিরে আসিল।

১৭

বিন্দু ভাবিতেছিল, মীনার সঙ্গে যদি একটিবার দেখা হইত! হয় না কি? হয় না? কোথায় সে আছে? কোনও মতে একটিবার তাদের দেখা কি হয় না? দেখা হইলে সে কি বলিবে, কি করিবে, জানে না। পরিস্ফুট কোনও কল্পনাও তার মনে সে করিয়া লইতে পারিতেছিল না। এই কথাই কেবল মনে হইতেছিল, দেখা হইলে, এমন কিছু একটা ঘটিবে, এমন কোনও কথা হয়-ত সে বলিতে পারিবে, যাহাতে মীনার মনের গতি ফিরিয়া যাইবে! এমন কোনও কুমতি যদি তার হইয়াও থাকে, তা সে ত্যাগ করিবে। বুঝিবে, তার নারী-মর্য্যাদার কত বড় একটা গ্লানি ইহাতে ঘটিবে। ধর্ম্ম সে মানে না, দেবতা মানে না, দেবতার পূজা-অর্চ্চনা মানে না, সদাচারের যে নিয়ম-কানুন প্রচলিত আছে, তাও মানিতে চায় না। তা নাই মানুক, ও সব কতকটা বাহিরের বস্তুও বটে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে ধর্ম্ম আছে, যাতে আশ্রিত হইয়া মানুষ হইয়া নারী হইয়া, সে জন্মিয়াছে, যা চাপা দিলেও চাপা থাকে না, ত্যাগ করিতে চাহিলেও যা কাহাকেও ত্যাগ করিয়া যায় না, সেই ধর্ম্মকে, মানুষের স্বভাবগত আসল সেই ধর্ম্মকে, নারীর তার মর্য্যাদাকে, তার মানিতেই হইবে। চাপা দিয়া সে রাখিতেছে। কিন্তু একবার যদি ফুটিয়া ওঠে, চাপা দিয়া আর রাখিতে পারিবে না। তার সেই ধর্ম্মই তাকে তখন দেখাইবে, কি তাকে করিতে হইবে, কোন্ পথে তাকে চলিতে হইবে। যত ভাবিতে লাগিল, এই ভাবনা, এই কামনা, অতি বেগবতী একটা ইচ্ছা রূপে তার অন্তরের অন্তর হইতে যেন তীব্র একটা তড়িৎ শিখায় ফুটিয়া উঠিয়া সকল মন ভরিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একেবারে অধীর করিয়া তাহাকে তুলিল।

মীনাও ঠিক তখন এইরূপ ভাবিতেছিল। বিন্দুর সঙ্গে একটিবার সাক্ষাতের তীব্র একটা ইচ্ছা প্রাণ ভরিয়া তার জাগিয়া উঠিতেছিল। বিন্দুকে সে বড় ভাল বাসিত। বিতর্ক কি বিদ্রূপ যতই করুক, বিন্দুর কথাগুলিও তার বড় মিঠা লাগিত। সেই যে সে দিন বিন্দু বলিয়াছিল, 'আস্তিকের ধর্ম্ম তার মাথার ভার-বোঝা নয়, বাঁধন নয়, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, পথের আলো। তোকেও মানতে একদিন হবে। তবে ঈশ্বর করুন, সে দিন মানতে যেন পারিস্। পাষাণের যে দেয়াল তুলেছিস্, বৃথা তাতে মাথা খুঁড়ে না ম'রতে হয়।'—কথাগুলি সেদিনও তার মনের অন্তরে গিয়া বেশ একটু ঘা দিয়াছিল। কিন্তু গ্রাহ্য সে করে নাই। আজ দুই দিন কেবলই সেই কথাগুলি তার মনে উঠিতেছিল। ভাবিতেছিল, সত্যই বুঝি ধর্ম্ম কাহারও মাথায় ভার বোঝা নয়, বাঁধন নয়, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, পথের আলো। কিন্তু আজ সে পথের আলো সে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না। কিছু দেখিলেও পথে যে সে আলোতে সে চলিতে পারিতেছে না। পাষাণের যে দেয়াল তুলিয়াছিল, কত মাথা খুঁড়িতেছে, কিন্তু ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতে পারিতেছে না। যে টুকু ভাঙ্গিয়াছে, তার ফাঁকে যে ডিঙ্গাইয়া ও-ধারে যাইতে পারিতেছে না। হায়! বিন্দুর সঙ্গে যদি একটিবার দেখা হইত, জিজ্ঞাসা করিত, কেমন আলোতে কেমন সে তার পথে চলিতেছে, সে পথে সেও কি চলিতে পারে না?

রবীনের ব্যবহারে সেদিন মনে বড় একটা দাগা তার লাগিয়াছিল। প্রাণপণ প্রয়াসেও সে দাগ সে তুলিয়া

ফেলিতে পারিতেছিল না। রবীনের সঙ্গে বিবাহপণে সে বদ্ধা, পিতার সানন্দ অনুমোদনও পাইয়াছে। কিন্তু রবীন কি চায়? পিতাই বা কি চান? কেবল আইনের চুক্তি? ধিক্, সেও কি বিবাহ! কিন্তু আর কিই বা হইতে পারে? হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান, কোনও ধর্ম্ম, কি কারও কোনও নিয়ম যে তারা মানে না। কিন্তু তার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন আজ ডাক দিয়া বলিতেছে, ধর্ম্ম আছে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় ধর্ম্মে। সেই মিলনই বিবাহ। তা ছাড়া পবিত্র, চিত্ত-প্রসাদক, কল্যাণকর মিলন যে আর কিছুই হইতে পারে না। আইনের চুক্তি? তার মধ্যে ধর্ম্মের যে কিছুই নাই। প্রেম? ধর্ম্মই যে তার প্রাণ, ধর্ম্মেই যে তার প্রতিষ্ঠা—জীবন ভরিয়া মঙ্গলের পথে যাহা নব-নারীকে পরিচালিত করিবে। কিন্তু রবীন যে তা মনে করে না। পিতা যে আইনের চুক্তির কথা বলেন, রবীন তাতেও নারাজ। অপেক্ষাও আর করিতে চায় না। তার যেন ইচ্ছা—ইঙ্গিত যাহা সে করে, ইঃ!...মনে করিতেও যে তীব্র একটা বিষের বাণ তার প্রাণের তল পর্য্যন্ত গিয়া বিঁধে, সমস্ত চিত্ত দারুণ বিরাগে তার অভিমুখ হইতে ফিরিয়া আসে।

কিন্তু কী সে করিবে? কী সে করিতে পারে? আলো ধরিয়া কে তাকে ঠিক পথটি দেখাইবে? কে তাকে সে পথে চালাইবে? বিন্দু? বিন্দুই বা কি করিবে, কি করিতে পারে? আর সেই বা বিন্দুকে কোন্ মুখে আজ এত কথা বলিবে? ছিঃ! তাও কি কেউ পারে? তবু—তবু—যদি একটিবার দেখা হইত! হয় ত—হয় ত—এমন কিছু ঘটিত—এমন কিছু একটা আলোক সে পাইত, যাতে—যাতে—

কিন্তু কোথায় বিন্দু! হয় ত তার বিবাহ এত দিন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় বা দূরে আর কোথাও স্বামীর ঘরে সে আছে। কিন্তু সুখে আছে কি? পিতা হাতে ধরিয়া দিয়াছেন, একেবারে অজানা অচেনা এক স্বামীর কাছে সে গিয়াছে। তাতেও না কি অনেকে সুখী হয়। বিন্দু কি হইয়াছে? আহা! যদি একটিবার দেখা হইত! বিবাহিত জীবন তার কেমন কাটিতেছে, কেমন সকলের কাটে, যদি একটিবার জানিতে সে পারিত!

দুই জনের চিত্ত হইতেই এমনই একটা ইচ্ছার টান দুই জনকে টানিতেছিল। এরূপ টান না কি বৃথা হয় না। বাস্তব জীবনের অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা, অনেক যোগাযোগ, না কি এই টানে ঘটে। কেন ঘটে, কোন্ অদৃশ্য অজ্ঞেয় শক্তি ঘটায়, অতিলৌকিক এ সব রহস্যের বিশ্লেষণচেষ্টা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'দৈবাৎ' বলি, তাহা ঠিক সেরূপ 'দৈবাৎ' নহে। আমরা দেখিতে পাই না, মনেও ভাবি না, এরূপ সূক্ষ্ম অবোধ্য ভাবনাতীত কারণেই তাহা ঘটে। সেই কারণ যে বাহিক স্থূল কার্য্যে পরিণত হয়, লোকাতীত চেতন কোনও শক্তিই তার প্রেরণার মূলে রহিয়াছে। তাহাই দেবতার, দৈব; দৈব হইতে ঘটে, তাই 'দৈবাৎ' ইহাকে বলা হয়। ইহা ঠিক অকারণ বা আকস্মিক (accidental) নহে। ঘটনা আকস্মিক বলিয়া যতই মনে হউক, অকারণ কিছুই হয় না। তবে যে কারণ তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে, জ্ঞেয় কার্য্যে যাহা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাই অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয়।

ও দিকে অতীনের সঙ্গে অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া অখিলবাবু বুঝিতে পারিলেন, অথবা অতীন তাঁহাকে বুঝাইল, সহসা একেবারে মোকার্জ্জির বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া সব কথা তাঁহাকে জানান বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। রবীনকে যার পর নাই অপদস্থ তাহাতে হইবে। কোথাও হয় ত পলাইয়া যাইবে। কিংবা কে জানে, অতি শোচনীয় একটা দুর্ঘটনাও ঘটাইয়া ফেলিতে পারে। আর দুই চারি দিন তার গতিবিধি বিশেষ সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। তার পর সুযোগ বুঝিয়া কোনও কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দরকার হয়, রবীনকে গোপনে একটা সংবাদ দিয়াও তিনি দেখা করিতে বলিতে পারেন। খোঁজ লইয়া অতীন যতদূর জানিতে পারিয়াছে, ও দিকে তাড়াতাড়ি বিশ্রী কিছু একটা ঘটিবার, অর্থাৎ মিস্ মোকার্জ্জিকে লইয়া রবীনের কোথাও পলাইয়া যাইবার, সম্ভাবনা তেমন নাই।

তবে এ কয়দিন চিত্তবিনোদনের জন্য সহরের ভাল ভাল যায়গাগুলি বৌমা একটু বেড়াইয়া দেখিতে পারেন। গৃহিণী আছেন, তিনিও সঙ্গে যাইতে পারেন।

অতীন কহিল, "তা বেশ ত, ওঁদের নিয়ে বেড়ান। ওই ত মালাবার পাহাড় র'য়েছে, কোলাবা র'য়েছে—"

"আমি ত চিনি শুনি না ভাল। আর অমন সদরে কোথাও বেরোতেও চাই না এখন। কে জানে হারামজাদার সঙ্গে যদি দেখা হয়, রাগ সামলাতে পারব না। কেলেঙ্কারী একটা ক'রে ফেলব। হিতে শেষে বিপরীত হবে। তুমি যদি একটু সময় ক'রে নিতে পার, বড় ভাল হয়!"

"আচ্ছা দেখি, যদি পারি—"

"হাঁ, তাই দেখ। কেন পারবে না? কাল বিকেলেই তবে ওদের নিয়ে বেরিও।"

"যে আজ্ঞে।"

১৮

পরদিন বৈকালে অতীন বিন্দুকে ও তাহার শ্বশ্রূকে লইয়া মালাবার পাহাড়ে গেল। পাহাড়ে উঠিয়া উদ্যানমধ্যে কত দূর গিয়া কহিল, "আপনারা তাহলে নিজেরাই দেখে শুনে একটু বেড়ান, আমি আসছি। কোনও ভয় নেই। আমার এই লোকটি রইল, ও বেশ চেনে শোনে সব।"

বলিয়া অতীন আড়ালে কোথায় সরিয়া গেল। তার ভয় হইতেছিল, হয়ত রবীন আসিয়া পড়িতে পারে। ইঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে, ইঁহাদের লইয়া বেড়াইতেছে, এটা রবীনের চক্ষে পড়ে, তাহা সে পছন্দ করিতেছিল না।

"আঁা! বিন্দু যে!—বিন্দু! বিন্দু! তুই এখানে কবে এলি?"

হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া মীনা বিন্দুকে জড়াইয়া ধরিল।

"কেবলই ভাবছিলাম কদিন তোর সঙ্গে যদি একটিবার দেখা হত।"

মীনাকে তেমনই বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ হাসি মুখে বিন্দু কহিল, "তাই না কি? আমিও যে ঠিক ঐ কথাই ভাবছি। তা দেখা হল, বেশ হল। ভাল আছিস ত মীনা?"

"আছি এক রকম। তুই ভাল আছিস ত? ইনি কে বিন্দু?"

"আমার শাশুড়ী।"

"শাশুড়ী? ও!" ঢিব করিয়া মীনা বিরাজমোহিনীর পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

"সুখে থাক মা। কে এ মেয়েটি বৌমা? নাম—মীনা বললে না?"

"হাঁ, ওর নাম মীনাই মা।"

চকিত দৃষ্টিতে বিরাজমোহিনী বিন্দুর দিকে চাহিলেন। সলজ্জ চোখে এমন একটু ইঙ্গিত বিন্দু করিল, যাহাতে বিরাজমোহিনী বুঝিলেন, এই সেই মীনা—সেই ডাইনী—যার যাদুজাল হইতে পুত্রকে তিনি উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তীব্র দৃষ্টিতে ডাইনীর আপাদমস্তক তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন।

মীনা কহিল, "তা তোরা সব বেড়াতে এসেছিস বুঝি? তোর স্বামীও এসেছেন তবে?"

বিন্দু সলজ্জভাবে মুখখানি একটু নত করিল। বিরাজমোহিনী কহিলেন, "তা আমি বরং এইখানে একটু বসি। তোমরা দুজনে বেড়াও। দেখা হল অনেক দিন পরে, মন খুলে কথা-টথা কও গে।"

পাশেই বৃক্ষচ্ছায়ায় একখানি বেঞ্চিতে গিয়া তিনি বসিলেন। বুক তাঁহার দুর দুর কাঁপিতেছিল, এই যে উহাদের সাক্ষাৎ হইল, মা দুর্গা জানেন ইহার ফল কি হইবে? দয়া করিয়া যদি ঘটাইয়াছেন, সর্ব্বমঙ্গলা তিনি, মঙ্গলও কি ঘটাইবেন না? মেয়েটিকে ত বেশ ভালই লাগিতেছে। তেমন অজাত বজ্জাত মনে ত হয় না?

আড়ালে একটু দূরে যাইতে যাইতে মীনা কহিল, "ও, শাশুড়ীর সামনে স্বামীর কথা বলতে বুঝি তোদের লজ্জা করতে হয়?"

"তা হয় বই কি।"

"তা উনিও ত বেশ চালাক আছেন। কেমন দিব্বি আমাদের সরিয়ে দিলেন সামনে থেকে। তা স্বামী কই রে? তিনিও এসেছেন অবিশ্যি?"

"না।"

"না! ও—, আর কোথাও কোনও কাজে গেছেন বুঝি?"

মৃদু একটু হাসিয়া বিন্দু কহিল, "তিনি মোটে আসেনই নি আমাদের সঙ্গে এখানে।"

"বলিস কি বিন্দু? আসেনই নি এখানে? কেন রে? সবে এই বিয়ে হল—হাঁ, কদ্দিন হবে?"

"এই ত দিন কুড়ি প্রায় হল?"

"ও মা! এরি ভেতর এত পুরোনো হয়ে গেলি? ওদের মত 'হানিমুন' না থাক, একটা মাসও হয় নি, ছেড়ে তোকে রইতে পারলেন? ও, চাকরী-টাকরী করেন বুঝি কোথাও? ছুটী ফুরিয়ে গেছে, তাই বুঝি চলে গেছেন?"

বিন্দু কোনও উত্তর করিল না। মীনা আবার কহিল, "কি চাকরী করেন রে? কোথায়? কদ্দিনের ছুটী ছিল?"

"না, চাকরী এখনও কিছু করেন না।"

"তবে কেন এলেন না তোদের সঙ্গে? কোথায় আছেন?"

"বেড়াতে গেছেন।"

"বেড়াতে গেছেন? কোথায় বে? তোরা এলি এখানে, তিনি আবার একলা কোথায় বেড়াতে গেলেন?"

"তা—তেমন একটা দরকার কিছু কি তাঁর থাকতে পারে না আর কোথাও?"

"তা পারে বই কি। তা সে দরকারটাই কি এত বড় হল যে তোকে ছেড়েই অমনি চলে গেলেন বিয়েটা হতে না হতেই। সঙ্গেও ত নিয়ে যেতে পারতেন? হুঁ, তিনি কে? নামটিও ত বললিনি। বিয়ের ভেবেছিলাম নিমন্ত্রণ করবি, তা সাড়াশব্দটিও কিছু পেলাম না। কাগজে আজকাল সবার বিয়ের কথা বেরোয়, তাও কিছু চোখে পড়েনি। হাঁ, তা নামটি কি তাঁর?"

"নাম যে নিতে নাই ভাই।"

"ন্যাকা যেন। কেন নিতে নাই? শাশুড়ী ত আর সামনে নেই। বল্ না?"

"না ভাই, সে আমরা পারি না। নাম আছে। তা এত তাড়া কি? পরে যখন হয় জানবি। তিনি ত নেই এখানে—দেখাও হচ্ছে না। হাঁ, তা তোর কি বিয়ে টিয়ে হবে শীগগির?"

"বিয়ে! আমার? তা—হতেও পারে। কেন শুনেছিস্ না কি কারও কাছে কিছু?"

মীনা কেমন একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। বিন্দু ইহা লক্ষ্য করিল; কহিল; "তা হলে হবে বল্। নয় রে?"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া মীনা কহিল, "তা হতেও পারে। তবে—"

"তবে আবার কি লো? বিয়ের সম্বন্ধটা একেবারে পাকা এখনও হয় নি বুঝি?"

"পাকা—তা কথাটা এক রকম পাকাই হয়েছে বই কি। তবে—তবে—বিয়ে—তা এটাকে কি বলব জানি না। জানিস ত' বাবা ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছু মানেন না। তিনি বলছেন কেবল রেজেষ্ট্রি করে সিভিল ম্যারেজ হক। আর রবীন—ঐ যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছে—সে বলছে—"

"কি?"

"সে আবার বাবাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। আইনও মানতে চায় না।"

"কি চান তবে তিনি?"

"তিনি চান—বলেন, অবিশ্যি বাবাকে অতটা খুলে বলেন নি—কেবল আমাকেই বলেন, প্রেম ধর্ম্মের বাঁধনকেও যদি মানবে না, আইনের বাঁধনও মানবে না। বলেন, ও সব কিছুরই দরকার নেই।"

"আর তুই?"

"আমি? আমি—কি যে কি করব ভেবেই কূল পাচ্ছি নি। ওর কোনওটাই আমার ভাল লাগছে না।"

"কি ভাল লাগে তবে?"

"তুই বলিস কি বিন্দু? ধর্ম্ম ছাড়া কি বিয়ে হয়?"

"না।"

"হাঁ, তাই তুই বলবি জানি। তাই—না, কেন ঠিক বলতে পারিনে, কদিন কেবলই মনে হচ্ছিল, তোর সঙ্গে যদি একটিবার দেখা হত।"

"দেখা ত হয়েছে। তা এখন—"

"এখন—কি জানি কি হবে, কি করব, বুঝতেই পারছি নি। তা রবীনের সঙ্গে একটু আলাপ কর্ না তুই? এখুনি আসবে।"

"আসবেন! কোথায় তিনি!"

বিন্দু শিহরিয়া উঠিল; মুখখানি তার শুকাইয়া গেল।

"এই ত নীচে কি কাজে গেল। এখুনি আসবে, এই এল আর কি?"

অতি ত্রস্তব্যস্ত ভাবে বিন্দু বলিয়া উঠিল, "তা হলে আমি আসি ভাই।"

খিল খিল করিয়া মীনা হাসিয়া উঠিল। পলায়মানা বিন্দুর হাতখানি টানিয়া ধরিয়া কহিল, "আ মর! পালাচ্ছিস কেন লো? সে কি বাঘ না ভালুক যে—"

"না, ছিঃ! আমি কি করে তাঁর সামনে বেরোব?"

"ন্যাকা যেন! সত্যিই ত আর একেবারে সেকেলে কনে বউটি নস্ তুই?"

ত্রস্ত দৃষ্টিতে বিন্দু এদিক্ ওদিক্ চাহিল। মীনা তাহাকে টানিয়া লইয়া বৃক্ষ-গুল্মে আবৃত একটা পাহাড়ের টিবি ঘুরিয়া আসিতেই সহসা রবীন তাহাদের সম্মুখীন হইল। ত্রস্ত মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, বিন্দু মুখ ফিরাইয়া লইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

"এ কি! বিন্দু..."—বলিতে গিয়া রবীন একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

চকিত দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া মীনা বলিয়া উঠিল, "এ কি! কি হল! বিন্দুকে তুমি চেন না কি?"

রবীন নীরব। একেবারে স্থাণুবৎ নিস্পন্দ, নিশ্চল। মুখে রক্তের লেশমাত্রও নাই। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া যারপর নাই বিস্ময়ে মীনা কহিল, "কি, হল কি! বিন্দু তোমার কে হয়, রবীন?"

সহসা অতীনও আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। এদিক্ ওদিক্ কিছু ঘুরিয়া কাছেই সে তখন বসিয়া ছিল। অদ্ভুত এই হাস্যকরুণ রসাত্মক নাটকের চরম দৃশ্য উপস্থিত। কৌতূহল সে সম্বরণ করিতে পারিল না, কাছেই আসিয়া দাঁড়াইল। রবীনের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া একটা কম্পন উঠিল। অতীনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কে, অতীন! তুমিও এখানে? ষড়যন্ত্র করেই সবাই তবে এসেছ! মীনা—আমাকে ক্ষমা কর।"

করজোড়ে রবীন মীনার সম্মুখে নতজানু হইয়া পড়িল।

একটু সরিয়া মীনা কহিল, "ক্ষমা! কেন? কিসের ক্ষমা? কি হয়েছে? বিন্দু তোমার কে? উনিই বা কে?"

"কেউ নই, কেউ নই আমি ওঁর।" আর্ত্তস্বরে এই মাত্র বলিয়া ছুটিয়া বিন্দু পলাইতে গেল। ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া মীনা কহিল "না দাঁড়া, কোথায় যাস্! কি! কিছুই যে বুঝতে পারছিনি আমি। বলতে হবে সব আমাকে। রবীন!"

"মীনা!"

"বল, বল কি হয়েছে। বিন্দু তোমার কে?"

"বিন্দু—বিন্দু বাস্তবিক আমার কেউ নয়। তবে—তবে—"

"তবে—কি?"

মীনার হাত দু'টি জড়াইয়া-ধরিয়া কাতর মিনতির স্বরে বিন্দু বলিয়া উঠিল, "মীনা ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্ ওঁকে। সত্যি—সত্যি—আমি ওঁর কেউ নই। সত্যিই উনি ব'লেছেন, কেউ নই।"

"কেউ নস্! না, বড় কেউ একজন। কিন্তু সে কে? কে হতে পারে? তাও—তাও—কি সম্ভব? কি করে

হল ? বল্ বল্ বিন্দু, কে তুই ! আমি যে আর সইতে পারছি নি ! সমস্ত পৃথিবী আমার চোখের সামনে উল্টে যাচ্ছে—ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ছে ! (অতীনের দিকে চাহিয়া) কে আপনি ? আপনি বলুন ! ওরা পারছে না, পারবে না। আপনি জানেন। দয়া করে বলুন—আমাকে রক্ষা করুন !"

একটু কুণ্ঠিত ভাব দেখাইয়া অতীন কহিল, "দৈবাৎ এসে পড়েছি—তা এত বড় অপ্রিয় কথাটা—"

"না না, এর চাইতে অপ্রিয় কিছুই আর হতে পারে না ! বলুন, বিন্দু রবীনের কে ?"

"স্ত্রী, সম্প্রতি বিবাহিতা স্ত্রী।" বলিয়াই অতীন সরিয়া গেল।

"স্ত্রী—সম্প্রতি বিবাহিতা—"

অবসন্ন মীনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বিন্দু কহিল, "বিবাহ করেছেন পিতার জিদে বাধ্য হয়ে; স্ত্রী বলে আমাকে গ্রহণ করেন নি, করবেনও না। আমিও সে অধিকার দাবী করি না।—মীনা ! মীনা !"

"উঁ" !—ভয় নেই !—মূর্চ্ছা যাব না। তুই ওর স্ত্রী—আর এও জানতিস্ যে আমি—আমি—ছি ছি ছি ! ঘৃণায় লজ্জায় যে আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে বিন্দু !"

"কেন, তুই কি করেছিস মীনা ?"

"কি করেছি। ভালবেসে ছিলাম ওকে। বিবাহ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ত জানতাম না ! কবে তোদের বিয়ে হল ? হাঁ, এই পনের কুড়ি দিন আগে। আর ঠিক তখনই—ছি ছি ছি রবীন ! এত হীন, এত বড় শঠ প্রতারক তুমি। বড় দুর্ভাগ্য তোর বিন্দু, এমন লক্ষ্মী মেয়ে তুই ওর হাতে পড়েছিস্। আর আমি—আমি—বুঝি আরও বড় দুর্ভগা, ওকে ভাল বেসেছি। যে দাগা আজ আমার মনে পড়েছে, শুধু বিবাহে ততখানি দাগা তোর মনে পড়তে পারে নি। যাক্ ! আসি তবে বিন্দু। এ অবস্থায় সুখ যদি সম্ভব হয়, প্রার্থনা করি, যেন শুনতে পাই তুই সুখে আছিস্।"

বলিয়াই মীনা ফিরিল।

কাতর স্বরে রবীন বলিয়া উঠিল, "মীনা ! একটি কথা—"

"কি ?"

"অপরাধ আমার অমার্জ্জনীয়। তবু একটি কথা এই মনে রেখো, আমার প্রেমই এই অপরাধে আমাকে প্রেরিত করেছে। বড় ভাল বেসেছিলাম তোমাকে। একেবারে মাতাল, মুগ্ধ, অন্ধ হয়েছিলাম। হিতাহিত বুদ্ধি আমার ছিল না—"

"থাক্ ! আর বলতে হবে না। ভালবেসেছিলে আমাকে ! তাই—তাই বুঝি ছলে ভুলিয়ে পিতার ঘর থেকে কুমারী কন্যা আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে ? তুমি বিবাহিত, বিবাহ আর করতে পার না, করলেও দণ্ডের ভাগী হবে। এ পথ ছাড়া আমার এই নারীদেহটাকে ভোগদখল করবার আর কোনও সম্ভাবনা তোমার নাই। মাতাল, মুগ্ধ অন্ধ, যাই হও এই হিসেবটা এই হিতাহিত বুদ্ধিটুকু ত বেশ ছিল !"

রবীন কহিল, "ভুল বুঝো না মীনা। বিবাহের অনুষ্ঠান যে কিছু করতে চাই নি, তার কারণ—তার কারণ—জ নই ত, কোনও কুসংস্কার, বাজে কোনও রীতি, নিরর্থক কোনও বাঁধন—"

"না, কিছুই মান না ! কিছুরই কাছে মাথা নোয়াতে চাও না ! কিন্তু এই ক'দিন আগে বিন্দুকে কিসে বিয়ে ক'রেছিলে কি ক'রে ? না থাক্, মিছে আর ছল বাড়িও না কৈফিয়ৎ আমি কিছুই চাই না। অপরাধ আমার কাছে এমন বড় একটা কিছু হয় নি। নারীকে নিয়ে পুরুষ এমন খেলা, এমন প্রতারণা, অনেক ক'রে থাকে। হয় ত—হয় ত'—আমরাই তার অবসর দিই। যাক্, আসি এখন। যদি পার, সে ভাগ্য যদি তোমার থাকে বিন্দুর আশ্রয় নিও, তোমার মঙ্গল হবে। যত বড়ই অপরাধী তার কাছে হয়ে থাক—অপরাধী তার কাছেই হয়েছ—ক্ষমা সে তোমাকে ক'রবে। আশ্রয় যদি চাইতে পার, পাবে। আর যদি না পার, তবে—তবে—কি আর ব'লব, দেবতা তোমায় রক্ষা করুন। আসি বিন্দু, যাবার আগে আর একটিবার যেন দেখা হয়।"

ধীরে ধীরে মীনা চলিয়া গেল।

শুধু স্বামী আর স্ত্রী পরস্পরের সম্মুখীন। আর কেহ নাই। বিন্দুর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রবীন বলিয়া উঠিল, "খুব বাহাদুরী করেছ ! অতীনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বুঝি এসেছিলে ? আকস্মিক এই গুপ্ত আক্রমণে আমাকে পরাভূত আজ করেছ, দুর্গ আমার ভেঙে দিয়েছ ! এখন কি ভাবছ ? বিজয়-গৌরবে বেঁধে নিয়ে যাবে আমাকে ?"

"না ! মিছে আমাকে অপরাধী ক'রো না। আজ যা ঘটল, এমন কিছু ঘটবে তা ভাবি নি। সে কামনাও করি নি।"

"কি কামনা ক'রে তবে এখানে এসেছ ?"

"শ্বশুরমশাই নিয়ে এসেছেন, তাই এসেছি। আসতে আমি চাই নি। আজ এখানে অতীনবাবুর সঙ্গে তিনিই বেড়াতে পাঠিয়েছেন। তাঁর অবাধ্য হ'তে পারি নি, তাই আসতে হয়েছে। একলা আমি আসি নি, মাও এসেছেন।"

"কোথায় তিনি ?"

"ওদিকে আছেন। দেখা করবে ?"

"না।" বলিয়া রবীন ফিরিল।

"শোন।"

"কি আবার ?"

"আমার কোনও অপরাধ নিও না। তোমার সুখের পথে বাধা হতে আমি চাই না। মনে ক'রো না, যে সম্বন্ধ তুমি মান্‌তে চাও না, জোর করে কি কোনও কৌশলে তা আমি তোমাকে মানাতে চাই বা কখনও চাইব।"

"কি চাও তবে তুমি ?"

"কিছুই না। কেবল এই একটি প্রার্থনা, ভুল বুঝো না আমাকে।"

"ভুল ? না, একটি সত্য আমাকে আজ স্বীকার করতেই হবে, বুঝতেই তোমাকে মোটে পারলাম না। মীনা যে আজ আগুন হয়ে গেল, সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি—না, ভুল টুলের কোনও কথা নেই। বুঝতেই মোটে পারছি নি তোমাকে।"

"দরকারও ত কিছু নেই।"

কি ভাবিতে ভাবিতে রবীন কহিল, "এদেশে সেকেলে ঐ যে এক ধাতুর পতিব্রতা সতী নারীর আদর্শ আছে, স্বামী পায়ে ঠেললেও তার পায়ে জড়িয়ে গিয়ে পড়ে,আর লোকে ধন্য ধন্য করে, তুমি যে সেই ধাতুর একজন কেউ, তা মনে হয় না। আমার ব্যবহার সম্বন্ধে একেবারেই তুমি উদাসীন। অথচ—অথচ—এই ভাগ্যও বেশ শান্ত ভাবেই, দেখছি, মাথা পেতে নিয়েছ।"

বিন্দু উত্তর করিল; "ভাগ্যে যার যাই ঘটুক, এমনি মাথা পেতেই নিতে হয়।"

"নিতে যেখানে হয়, নেয় লোকে বিরাগে,—অতি অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী চিত্তে। কিন্তু তোমার ত সে রকম কিছু একটা ভাব আছে বলে মনে হয় না। তেমন যে বড় অসুখী তুমি, তাও বুঝতে পারি না।"

"না, অসুখী কেন হব ? অসুখী আমি নই।"

"অথচ আমাকেও চাও না। চাও কি ?"

"না।"

"আর যদি—যদি—আমি কখনও চাই ?"

"চাও পাবে। কিন্তু সে চাওয়াটা আমি খুঁজে কখনও নেব না। যাক্, আর তোমাকে বিরক্ত করব না। প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও। শীঘ্র বোধ হয় আর দেখাই হবে না; প্রণাম করছি।"

একটু অগ্রসর হইয়া রবীনের সম্মুখে বিন্দু নত হইয়া প্রণাম করিল।

"প্রণাম করছ ? কেন ?"

"দেবতাকে প্রণাম করতে হয়।"

"দেবতা!—দেবতার কি দেখেছ আমাতে ?"

মনে পড়িল মীনাও সেদিন তাকে প্রণামের কথা, তার দেবতার কথা কি বলিয়াছিল। নারীর চিত্তরহস্য—আশ্চর্য্য এক প্রহেলিকা বটে!

বিন্দু কহিল, "দেখেছি। তুমি ঢেকে রেখেছ, চেপে রেখেছ, কিন্তু আমার দেবতা তোমাতেই আছেন, তোমাতেই দেখতে পাচ্ছি।—যদি কোনও নিবেদন আমার থাকে, অন্তরের সেই দেবতার কাছেই আছে, বাইরে তোমার কাছে কিছু নেই। আসি।" বলিয়া বিন্দু চলিয়া গেল। অবাক্ হইয়া রবীন চাহিয়া রহিল। প্রাণের তলে কেমন একটা বেদনাও জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া বিন্দুর হাতখানি ধরিয়া বলে—না, কি বলিবে ? এখন কি বলিতে সে পারে ?

পারিবে কি রবীন ? কখনও পারিবে ? সুকৃতি যদি থাকে পারিবে। না থাকে, না পার, দুষ্কৃতির বোঝা আরও ভারী করিয়া যাইবে। যখন ফিরিবে, কি সম্বল লইয়া ফিরিবে ? তাই মীনার মতই বলিতে ইচ্ছা হয়, 'দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন।' আর বিন্দুর অন্তর্নিবেদনে অন্তর্দেবতা তোমার জাগিয়ে উঠুন।

মাতা, পত্নী, কন্যা কি ভগিনী, যে-রূপেই হউক, নারীর ধর্ম্ম, নারীর প্রার্থনা, নারীর আশীর্ব্বাদ, নারীর স্নেহই পুরুষকে রক্ষা করিতেছে, তার ধর্ম্মে তাকে, আর সঙ্গে লোকসমাজকেও ধরিয়া রাখিতেছে। নহিলে পুরুষ-রাক্ষসের দুর্দ্দাম ক্ষুধায়, উচ্ছৃঙ্খল মাদকতায়, নিকৃষ্ট স্বার্থের সংগ্রামে, এ পৃথিবী শ্মশানে—না, কেবল শ্মশানে নয়, নরকে পরিণত হইত। কোন্ সুকৃতির ফলে জানি না, দুইটি—না, তোমার মাতাকে লইয়া তিনটি নারীর আশীর্ব্বাদ তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে। এ আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনে কখনও সার্থক হইবে কি ?

[ক্রমশঃ

ছুটির সাথী

২৭শে জুলাই লণ্ডন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লাট এবং বর্ত্তমানে ব্রিটেনের নাগরিক রক্ষা বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যর জন্ অ্যাণ্ডারসন এই বলিয়া এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে, যাঁহারা এক মাস কি তাহার অধিক সময়ের জন্য ছুটিতে বাহিরে যাইবেন, তাঁহারা যেন সঙ্গে গ্যাস-মাস্ক লইয়া যান।

জুয়াড়ী

গত ২৩শে জুলাই অ্যাবোটাবাদের এক জন-সভায় গান্ধীজী বক্তৃতায় বলেন : হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নহে। আমি আজীবন ইহার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি···কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই।

শিক্ষার দোষ কোথায় ?

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমি ইহার পূর্ব্বে 'সে কালের শিক্ষা'র কথা আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমি বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব। এই শিক্ষা যে দোষযুক্ত সে কথা সকলেই স্বীকার করেন। সম্প্রতি একজন অধ্যাপক লিখিয়াছেন যে, "বর্ত্তমান কালে প্রচলিত শিক্ষার বহু গলদ আজকাল ধরা পড়িয়াছে।" কিন্তু সে গলদ কি এবং কোথায়, তাহা তিনি ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। সেইজন্য আমি বর্ত্তমান কালে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কয়েকটি দোষের কথা আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ এই পদ্ধতির মূলে। শাখা-পল্লবে সে দোষের অনুসন্ধান করিতে গেলে সে-দোষ ধরা পড়িবে না। উহা অনুসন্ধান করিতে হইলে মূলে অনুসন্ধান করিতে হইবে। মূল ছাড়িয়া শাখা-পল্লব ধরিলে চলিবে না। মনুষ্য-প্রকৃতির মোটামুটি তিনটা দিক্ বিদ্যমান। যথা (১) শরীর, (২) মানস, এবং (৩) আধ্যাত্ম।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শারীর শিক্ষার কথা অধিক বলিব না। শারীর বা দৈহিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে শরীরের প্রয়োজন কি, তাহার সম্বন্ধে অগ্রে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। সেই প্রয়োজন যাহাতে সিদ্ধ করা যায়, শারীরী শক্তিকে সেইরূপ ভাবে বিকশিত করার নামই শারীর শিক্ষা (physical culture)। সকলকেই যে স্যাণ্ডো বা শালিবাহন, ভীম বা স্যামসন হইতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই। তবে শরীরকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, উহা যেন শারীরীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সহজে সকল করিতে পারে। সহজে শ্রান্ত বা ক্লান্ত না হয়। তাহার কাজের চাপে দেহের কোন যন্ত্র যেন বিগড়াইয়া না যায়। সেজন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন। সে কালের গাদি, কপাটি প্রভৃতি খেলা, চুরাং তাং, এবং ডন, বৈঠক প্রভৃতি ব্যায়াম এবং প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠান এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সাঁতার দেওয়া, দৌড়াদৌড়ি করা প্রভৃতিও শরীররক্ষার, জীবনরক্ষার এবং সাংসারিক কর্ত্তব্য-পালনের উপযোগী করিয়া দেহের বিকাশ সাধন করে। সুতরাং সেগুলি ত্যাগ করিয়া ব্যয়বহুল ফুটবল, ক্রিকেট, হাই-জাম্প প্রভৃতির প্রয়োজন কি, তাহা বুঝা যায় না। ঐ সকল বিদেশী ব্যায়াম প্রভৃতি করিতে হইলে যেরূপ খাদ্যের প্রয়োজন তাহা আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেরই জুটে না। উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে উহাতে দেহের অপকারই অধিক করে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে দেশীয় ভাবে দৈহিক উৎকর্ষ সাধন করা অপেক্ষাকৃত ভাল। আমাদের এই দরিদ্র দেশের পক্ষে শারীরিক উন্নতি-সাধনের পক্ষে দেশীয় ভাবে ক্রীড়া এবং ব্যায়াম করাই বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি এখানে আর অধিক কথা বলিব না।

তাহার পর মানস শিক্ষা বা মনের শিক্ষা। এই কথাটাই আমার এই প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচ্য। মোটামুটি ভাবে মনের তিনটি দিক্ আছে বলিয়া ধরা যায়। পাশ্চাত্যেরা ইংরাজী ভাষায় প্রথম (intellect), দ্বিতীয় মনোভাব বা চিত্তবৃত্তি (feeling) এবং তৃতীয় ইচ্ছাশক্তি (volition)। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদিতে। তন্মধ্যে সুকুমার সাহিত্যে কতকটা চিত্তবৃত্তির অনুশীলনও হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত চিত্তবৃত্তি জড়িত থাকে। তন্মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে সাহিত্য, কবিতা, গান প্রভৃতির অনুশীলনে মনোভাব বা মনের আবেগ কতকটা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু ভক্তির আর এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভক্তি, শ্রদ্ধা, উচ্চ অঙ্গের প্রেম প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিবার কোন উপায়ই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে নাই। ভগবদ্ভক্তি বিকশিত করিয়া তোলা এই শিক্ষার কল্পনাতীত। তাহার কারণ, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশ-সাধনের কোন ব্যবস্থাই নাই, বরং বিনাশ-সাধনের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই রহিয়াছে। এই শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতি সাধন করে, মনকে

সংশয়াকুল করিয়া তোলে। রামানন্দ রায় উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রাখর্য্যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যা হইতে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারই মন্ত্রী রায় রামানন্দ যে একজন সুশিক্ষিত এবং কুশাগ্রবুদ্ধি লোক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে নিষ্ঠার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভগবদ্ভক্তির অন্তরায় হয় নাই। তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রেমই তাঁহাকে গৌরাঙ্গ মিলাইয়া দিয়াছিল। সেই প্রেমের বা ভক্তির প্রসারতা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র।"

আসল কথা, হৃদয়ের বৃত্তি বা মনোবৃত্তির শক্তি যে কত হয়, তাহা বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতরা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাঁহারা উহাকে আবেগজনিত মনোভাব বা ভাবাবেগ (sentiment) বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু ভাবের প্রভাব যে কত অধিক তাহা তাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন না। তাঁহারা বলেন যে, এই ভাব বিচার-বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়া বুদ্ধিকে ব্যাহত করে। যাহাদের প্রকৃতি কুপথে ধায়, যাহারা চিত্তবৃত্তিকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অথবা ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা সংযত রাখিতে সক্ষম না হয়, তাহাদের ঐরূপ প্রমাদ ঘটে ইহা সত্য। কিন্তু যেখানে বুদ্ধি, ভাব এবং ইচ্ছাশক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেখানে একের উপর অন্যে অযথা প্রভাব বিস্তৃত করিয়া তাহাকে কলুষিত বা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে পারে না। এই জন্য সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষালাভের এবং সাধনার প্রয়োজন। মনের এই তিনটি ব্যাপারের কোন ব্যাপার উপেক্ষণীয় নহে।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে মনের এই ভাবের দিক্‌টা একবার উন্মূলিত করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। উহার ফলে পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে যে ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই ধর্ম্মকে কলুষিত মনোবৃত্তি (sick sentimentality) বলিয়া মনে করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের ঘরে বাহিরে নানা অশান্তি দেখা দিয়াছে। তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক জীবন এবং আন্তর্জ্জাতিক অবস্থাও উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। তবে তাঁহারা যাহার বলে আজও টিকিয়া আছেন, তাহা তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ (patriotism)। তাহাও একটা মনোভাব। যাহা হউক, এক্ষণে পাশ্চাত্ত্য সমাজের কথা আমার আলোচ্য নহে, আমার আলোচ্য আমাদের শিক্ষার দোষ কোথায়।

হৃদয়ের বৃত্তিগুলি, যথা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা প্রভৃতির যে প্রয়োজন আছে, তাহাও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা অস্বীকার করিতে পারেন না। ঐকান্তিকতা বা একাগ্রতাকে অথচ মনোভাবের মধ্যে ফেলেন না। উহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির এবং ইচ্ছাবৃত্তির সংস্রব আছে। কিন্তু উহা প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তিই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি থাকিলে যেমন চিত্তের একাগ্রতা বা ঐকান্তিকতা জন্মে, এমন আর কিছুতেই জন্মে না। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যাইবে যে, যাহার শ্রদ্ধা-বুদ্ধি বিদ্যমান, সেই ব্যক্তিই বিজ্ঞানসাধনায় একনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছে। এই নিষ্ঠার দ্বারা, আলোচ্য বিষয়ে শ্রদ্ধাবুদ্ধির দ্বারাই পাশ্চাত্ত্য খণ্ডের বুধগণ জড়বিজ্ঞানের প্রসার সাধন করিয়াছেন। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিব। জে. এইচ. ফেবার (Fabre) ছিলেন ফ্রান্সের একজন অতি দরিদ্র পাঠশালার শিক্ষক। কিন্তু কৃমিকীটদিগের তথ্য জানিবার জন্য ছিল তাঁহার অতি প্রবল বাতিক। একদা তিনি একটি গিরিনালার পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্তরের উপর বসিয়া একদৃষ্টে একটি স্থানের দিকে চাহিয়া ছিলেন। বিশজন কৃষকবধূ সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া শুভদিন বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে যখন তাহারা তাহাদের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখনও তাহারা দেখিল, সেই ব্যক্তি ঠিক সেইভাবে সেইস্থানে একই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদরোগগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট মনে করিয়া হস্ত দ্বারা বক্ষের উপর ক্রসের ভঙ্গী দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া উহার জন্য দুঃখ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ফেবার সেই স্থানে বসিয়া ভাবাবেগে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া কতকগুলি কীটের আচরণ লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার মনোভাবের দৃঢ় প্রাবল্য লক্ষিত হইয়াছিল। ইহাই প্রকৃত নিষ্ঠা। ইহা ভাব-জনিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। এইরূপ ভাবের

ঐকান্তিকতার দ্বারাই বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের প্রসার সাধিত হইয়াছে। সুতরাং ভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

ভাবের শক্তি যে কত দৃঢ়, তাহা পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিরা জানিতে পারেন নাই। অনেকে দেখিয়াছেন যে, দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারা অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বেলগাছিয়া কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে একটি রোগী ভর্ত্তি হইয়াছিল। তাহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চিকিৎসকগণ স্থির করেন যে, তাহার পা খানি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। সাব্যস্ত হয় যে, তাহার পর দিনই তাহার পায়ে অস্ত্রোপচার করা হইবে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গিয়াছিল যে, সেই ব্যক্তি হাসপাতালের প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছে। তখন তাহাকে ডাকিয়া দেখা গেল তাহার পায়ের হাড় সম্পূর্ণ জুড়িয়া গিয়াছে। সে বলিয়াছিল যে, জগন্নাথ তাঁহার পায়ের হাড় জুড়িয়া দিয়াছেন। সংবাদটি বহু সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবাদ করে নাই। ইহাতে ভক্তি এবং দৃঢ়বিশ্বাস কিরূপ বিস্ময়করভাবে জড়-জগতের উপর কার্য্য করে, তাহা বুঝা যায়। প্রগাঢ় বিশ্বাসের কার্য্যসাধিকা শক্তি কতখানি, তাহা নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারিবেন। স্বর্গীয় প্রভুপাদ বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী একবার কতকগুলি শিষ্য সঙ্গে লইয়া কামাখ্যা গমন করেন। তথায় তাঁহারা অচলানন্দ তীর্থাবধূতকে দেখিতে গিয়াছিলেন। অচলানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার জনৈক সহযাত্রী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"গোস্বামী মহাশয় এবং আমরা উপস্থিত হইলে স্বামীজী বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। তখন অন্যান্য আলাপাদির পর স্বামীজী অধিকার ও বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার কথা তুলিয়া নিজের জীবনের দুইটি পরীক্ষিত সত্য বলিলেন। তিনি বলিলেন,—'আমার যখন শৈশবাবস্থা, তখন একটি সাধু পুরুষ আমাকে দুইটি মন্ত্র দান করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, 'ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।' একটি মন্ত্র দ্বারা কাহাকেও সর্পে কাটিলে, কিম্বা বোলতা কি ভীমরুলে হুল ফুটাইলে কিছু জল মন্ত্রপূত করিয়া সেই ব্যক্তির গাত্রে ও ক্ষতস্থানে সেই জল ছিটাইয়া দিলে বিষ ও বেদনা নষ্ট হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রটি পড়িয়া একটু কচুপাতায় আতপ চাউল রাখিয়া দিবে। সাত দিন পরে স্নান করিয়া উপরোক্ত মন্ত্র জপ করতঃ উহা খুলিয়া যদি দেখিতে পাও উহাতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, তবে জানিও যে শুভ এবং তাহা না হইলে অশুভ জানিবে। কোন ব্যক্তি বিদেশে নিরুদ্দেশ অবস্থায় থাকিলে দ্বিতীয় মন্ত্রটি ব্যবহার করিবে। এই কথা বলিয়া তিনি (অচলানন্দ স্বামী) বলিলেন—'আমি সর্পদষ্ট কোন ব্যক্তিকে পাই নাই কিন্তু বোলতা মৌমাছি প্রভৃতির দংশনে মন্ত্র পড়িয়া জল দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, লোকের জ্বালা নিবারণ হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রটির দ্বারাও তথাকথিত ফল পাইয়াছি। কিছুদিন পরে আমার পিতৃদেব আমাকে টোলে পড়িতে দিলেন। আমি টোলে থাকিয়া ক্রমে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে লাগিলাম। ইহার পর আমার নিকট উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের জন্য যত লোক আসিয়াছিল, আমি তাহাদের অনুরোধে কার্য্য করিয়াছি বটে, কিন্তু একবারও কৃতকার্য্যতা লাভ করি নাই, অর্থাৎ কোনই ফল পাই নাই।'

"তিনি (স্বামীজী) ইহা বলিয়া তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, পূর্ব্বে আমার যে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছিল, তাহা ন্যায়শাস্ত্র পড়ার পর হইতে শিথিল হইয়া গেল। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া তথায় মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়। তাহাতেই বিফলমনোরথ হই।"*

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য এই কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি যে মিথ্যা কথা লিখিয়াছিলেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। স্বামী অচলানন্দ তীর্থাবধূত মহারাজও মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, ইহা কোন মতেই মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ তিনি একজন সাধক ছিলেন। এরূপ বৃত্তান্ত আরও শুনা গিয়াছে। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষার দোষে স্বতঃই সংশয়াকুলহৃদয় সুতরাং তাঁহারা এইরূপ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তিও নাই। যেমন নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ সেইরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধর্ম্মানুরাগ সম্বন্ধেও তাঁহারা অজ্ঞ। এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন শিক্ষা নাই, অভিজ্ঞতাও নাই। শিক্ষা প্রকৃতি মনুষ্যকে যে

* বিজয়া, শ্রাবণ ১৩২১ সাল—১০০২ পৃষ্ঠা।

এই সকল বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে—ইহা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝেন না। ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বিশেষ অভাব।

তাহার পর ইচ্ছা-শক্তির কথা। ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা মানুষ তাহাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। মনের একটা স্বাভাবিক চাঞ্চল্য আছে। মন এক বিষয় হইতে স্বতঃই অন্য বিষয়ে যায়। ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা সেই মনকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে মন আর অন্য বিষয়ে যায় না, মানুষ একনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বকালের শিক্ষায় এই মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সাধনার ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহা নাই। আমি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা জপ করিতে বসিলে তাঁহাদের মন অলক্ষ্যে সেই জপের বিষয় ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে যায়। জপ ঠিক হয় না। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত না হইলেও আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। কে. এইচ. ফেবার যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া কৃমি-কীটদিগের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহাই তাঁহাকে অসাধারণ সাফল্য-লাভে সমর্থ করিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি এবং মনোভাব সমস্ত একমুখ হইয়া তাঁহাকে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ে একাগ্র করিয়াছিল। চিন্তার বিষয়ে যদি প্রীতি ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে চিত্ত তাহাতে একাগ্রভাবে আসক্ত হয়। শিক্ষার দ্বারা এই একাগ্রতা বৃদ্ধি করা যায় এবং ইচ্ছানুরূপ সকল বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত করা সম্ভবে। ইচ্ছার এবং বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়। সেই জন্য ইচ্ছা-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শিক্ষা এবং সাধনা করিতে হয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে সে ব্যবস্থা নাই। সে জন্য শিক্ষা বাঞ্ছিত ফল দিতে সমর্থ হইতেছে না।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ যে সকলেই মনুষ্য-প্রকৃতির এই তিনটি দিকের সামঞ্জস্য-সাধন-পূর্ব্বক উহার বিকাশ সাধন করা আবশ্যক মনে করেন না, তাহা নহে। কেহ কেহ ঐ তিনটি ব্যাপারের বিকাশ সাধন কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। আমি পাদটীকায় একজনের মত উদ্ধৃত করিলাম।* তাঁহার সকল কথার সহিত যে আমাদের মতের মিল হইবে, ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু তিনি বিস্ময়, আনন্দ ভোগ এবং শ্রদ্ধার অনুশীলন করা বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাজে আনন্দানুভব করাই চিত্তবৃত্তির বিশেষ উৎকর্ষ-সাধনের ফল। আনন্দ চিত্তবৃত্তির পরিতোষজনিত ফল। যাহার চিত্ত কলুষিত, সে কু-বিষয়-ভোগেই আনন্দ পায়। যাহার চিত্ত নির্ম্মল,—প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ পথে ধাবিত, সে উন্নত বিষয় ভোগেই আনন্দ পায়। আমাদের মতে ভগবানই সকল আনন্দের আকর।

"সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম।" সর্ব্ব প্রকার আনন্দের মধ্যে ধর্ম্ম সম্পর্কিত আনন্দই নির্ম্মল ও স্থায়ী। এই বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে যে মহাপ্রকৃতির লীলা, তাঁহার আশ্রয় স্বরূপ যে পরম চৈতন্য, তাহাই আনন্দময়। সেই আনন্দের কণিকামাত্র পাইলেই মানুষ ধন্য হইয়া যায়। সেই আনন্দই ধর্ম্মের আশ্রয়। সেই জন্য ধর্ম্মই জীবনকে আনন্দময় করিতে সক্ষম। হৃদয়-বৃত্তিকে বা চিত্তকে সংযত এবং সংহত করিতে পারিলেই সেই আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাস একটা ভাবজাত বিকাশ, এই ধারণাই শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে হওয়াতে এখন আমাদের দেশের নাস্তিকতার একটা প্লাবন আসিয়াছে। আমাদের দেশে হৃদয়ের শিক্ষা শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত হওয়াতে এই নাস্তিক্য ভাবের যত আধিক্য ঘটিয়াছে, য়ুরোপে, বিশেষতঃ গ্রেট বৃটেনে ততটা হয় নাই। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে ভাইকাউণ্ট হালডেন (Haldane) হিব্বার্ট জার্ণালে লিখিয়াছিলেন যে, বিলাতের যুবকগণ অধিকাংশই জড়বাদী নহে। বিজ্ঞানের এবং দর্শনের সহিত ধর্ম্মের বিবাদ বা বিরোধ আছে বলিয়া যে তাহারা ধর্ম্ম শিক্ষা চায় না, তাহা নহে। সে বিশ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল। এখন বিজ্ঞান এবং দর্শনের সম্মুখস্থ দৃষ্টির ক্ষেত্র অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত অনেক বদলাইয়া

---

* There are three voices of Nature. She joins hands with us and says, Struggle, Endeavour. She comes close to us, we can hear her heart-beating, she says, Wonder, Enjoy, Revere. She whispers secrets to us, we cannot catch her words, she says, Search, Inquire. These then are three voices of Nature appealing to Hand and Heart and Head, to the trinity of our Being.

Prof J Arthur Thomson.

গিয়াছে। তাহারা আর ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে না, উহার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে। কিন্তু যে জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা কি বিজ্ঞান কি দর্শন কেহই দিতে পারে না।* আমাদের দেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায় প্রায় অধিকাংশই নাস্তিক বা নামতঃ আস্তিক। তাহার কারণ বিলাতে এখনও কিছু বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়, আমাদের দেশে তাহাও দেওয়া হয় না। সেই জন্য আমাদের দেশের জীবনের একটা প্রধান বন্ধন, একটা শান্তিজনক ব্যবস্থা এলাইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম মানব-জীবনকে সরসতা দান করে। তাহার অভাবে আমাদের শিক্ষাভিমানীদিগের জীবন শুষ্ক মরুকান্তার তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই তাহাদের চরিত্রে মেরুদণ্ডের এবং নিষ্ঠার অভাব লক্ষিত হয়। সামান্য কারণেই তাহারা যেন দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য তাহারা অনেক সময় কু নায়কের ভাঁওতায় পড়িয়া ভুল পথ ধরিতেছে। সেইজন্য ভারতবাসী এখন আর কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত প্রগতি লাভ করিতে পারিতেছে না। যাঁহারা হেলায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরেরা সামান্য প্রলোভনে তহবিল ভাঙ্গিতেছে। প্রবর্দ্ধমান দারিদ্র্যই ইহার উত্তেজক কারণ হইতে পারে। কিন্তু ইহার মূল কারণ যে ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব, চিত্তবৃত্তিকে প্রকৃত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার সাধনার অভাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আসল কথা, এখন এমন শিক্ষার উদ্ভাবনা করিতে হইবে, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি এবং ইচ্ছা-শক্তির সামঞ্জস্য সাধন দ্বারা জীবন গড়িয়া উঠে। এই শিক্ষাপদ্ধতি ভ্রান্ত।

এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ঐহিক এবং পারত্রিক কোন মঙ্গলই সাধিত হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে পারত্রিক মঙ্গল হয় না। আস্থা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতির অভাবে ধর্ম্ম-বিশ্বাস জন্মে না। সুতরাং পারত্রিক মঙ্গল ইহাতে হইতে পারে না। ঐহিক মঙ্গলও ইহাতে হয় না। কারণ এই শিক্ষা কেবল ভাল কেরাণীই জন্মে, ভাল ব্যবসাদার, চাষী, কর্ম্মী প্রভৃতি জন্মে না। তাই এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও অনেক বাঙ্গালী সাধারণতঃ অশিক্ষিত ভাটিয়া, গুজরাটী, মাড়োয়ারীর নিকট পরাজিত হইতেছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে "অশিক্ষিত" লোকেরা আসর জুড়িয়া বসিতেছে বলিয়া শিক্ষিত দিগের একটি অভিযোগ রহিয়াছে। কিন্তু শিক্ষা ও অশিক্ষার পার্থক্য কি কৃতকার্য্যতার বিচারেই মোটামুটি ভাবে করিতে হয় না? শিক্ষিত বাঙ্গালী কেবল জীবনের মানদণ্ড বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছে। তাহাদের অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্যম, সাহস প্রভৃতির অভাব লক্ষিত হইতেছে। বরং যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের মধ্যে এই সকল গুণ যাহা কিছু লক্ষিত হয়, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাহাও হয় না। সেই জন্যই ঐ শিক্ষা নিষ্ফল

* Science and Philosophy have in this century a widened outlook and they seem to look definitely towards religion for something that is needed but which they cannot themselves give.

শিক্ষার যোগ্যতা

...মনঃশক্তি বিষয়ক বিবিধ শিক্ষা চারি শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু শ্রমজীবী ও বৈশ্যগণ উহা অর্জ্জন করিতে কখনও সক্ষম হন না। অপর দুই শ্রেণীর মানুষ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ্যের বীজসম্পন্ন মানুষগুলি উহা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ্য বীজসম্পন্ন মানুষগুলি এতদ্বিষয়ক শিক্ষায় যত আমূল ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে তত আমূলভাবে প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এতদ্বিষয়ক শিক্ষায় ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু মনঃশক্তির দ্বারা জীব-সমাজের হিতজনক যে যে কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য, সেই সেই কার্য্যের অভ্যাসে ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে যত অধিক পরিমাণে কুশলতা লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ্যের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে তাহা সম্ভবযোগ্য হয় না। বুদ্ধিশক্তি বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস চারি শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজনীয় বটে এবং অল্পাধিক পরিমাণে ঐ শক্তি চারি শ্রেণীর মানুষই স্বভাবতঃ লাভ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস একমাত্র ব্রাহ্মণ্যের বীজসম্পন্ন মানুষগুলি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না।...

আদর্শের বিপর্য্যয়

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

১২

সে দিন বালিগঞ্জে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের নিকটেই এক বাটীতে বিরাট সমারোহ। গৃহটি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। এটা অরুণের বাটী। অনেক মোটর গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে জমিয়াছে। শ্যামবাজার, খিদিরপুর, ভবানীপুর হইতে অনেকে আসিয়াছেন। কিন্তু বালীগঞ্জের লোক বেশী নিমন্ত্রিত হন নাই। অরুণের ইচ্ছা ছিল যে, বালীগঞ্জের আধুনিকপন্থী পুরুষ ও মহিলাদের অনেককে নিমন্ত্রণ করে, কিন্তু জগত্তারিণীর ঘোর আপত্তিতে অরুণের ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে। রাত্রি সাড়ে আটটার মধ্যেই সকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। নীলাম্বর বিরাট ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন, নিজে কন্যা-জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন।

বাহিরের ঘরে অরুণের বন্ধু পরেশ ও ভগ্নীপতি হীরেন বাবুতে ঘোর তর্ক চলিতেছে।

পরেশ বলিতেছে, "হীরুদা, একথা আপনি কি করে বলেন যে পণপ্রথা থাকা উচিত?"

হীরেন বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই থাকা উচিত; পিতার যা কিছু সম্পত্তি-টাকা-কড়ি ছেলেই পাবে, তা সে অযোগ্য কি পাষণ্ড হবে তার কোন স্থিরতা না থাকা সত্ত্বেও। আর মেয়ে কি বানের জলে ভেসে এসেছে?"

পরেশ বলিল, "তাই বলে মেয়ের বাপকে পথের ভিখিরী হয়ে, ছেলেদের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে?"

হীরেন বাবু বলিলেন, "তা কেন? পণপ্রথা মানে এ নয় যে, ছেলের বাপ মেয়ের বাপের কাছ থেকে ভেঁড়ে মুষে যা পাবেন আদায় করে নেবেন। মেয়ের বাপ যা পারেন তাই দেবেন, তাই ছেলের বাপকে নিতে হবে।"

পরেশ বলিল, "কই তা হচ্ছে কোথায়? কেবল অর্থাভাবেই মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। অনেকে মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়াচ্ছে, আর কোন উপায় না দেখে। এর উপায় কি?"

হীরেন বাবু বলিলেন, "এর উপায় আছে, কিন্তু দেশের নেতারা কি এ বিষয়ে ভাবছেন? কাউন্সিলে আইন করে এই আইন পাশ করা উচিত যে, কোন ছেলের বাপ মেয়ের বাপের কাছে তার সাধ্যাতীত টাকা দাবী করতে পাবেন না, যদি তা করেন আইনতঃ সাজা নিতে হবে।"

পরেশ বলিল, "তা কি করে সম্ভব?"

হীরেন বাবু বলিলেন, "সম্ভব যাতে হয়, তার জন্য আইন করতে হবে যে, মেয়ে চৌদ্দ বৎসরের বেশী অনূঢ়া থাকলে বা বা ছেলে আঠার কি কুড়ি বছরের বেশী অবিবাহিত থাকলে, কন্যা ও পুত্রের পিতা-মাতার বা অভিভাবকের বা অভিভাবকেরা অভাবে নিজেদের ছয় মাস সশ্রম কারাবাস ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড—"

পরেশ বলিল, "কি যে বলেন হীরুদা তার ঠিক নেই; ছেলেরা ত সব বেকার, তারা বিয়ে করবে কি করে?"

হীরেন বাবু বলিলেন, "মেয়েরাও ত বেকার বিয়ে হচ্ছে না বলে—"

পরেশ বলিল, "ছেলেরা বেকার, নিজেরা খেতে পায় না—স্ত্রীকে খেতে দেবে কি করে?"

হীরেন বাবু বলিলেন, "এ সমস্যার অবশ্য সমাধান করতে হবে। শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে—"

পরেশ বলিল, "কি আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব?"

হীরেন বাবু বলিলেন, "ম্যাট্রিকিউলেশন পর্য্যন্ত ছাত্রকে এমন লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হবে যে, সে পল্লীতে গিয়ে নিজে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে। আর আই-এ বা আই-এস-সি থেকে এম-এ বা এম-এস্-সি পর্য্যন্ত পরীক্ষা এমন শক্ত করতে হবে, যাতে যারা বিশেষ বুদ্ধিমান নয়, তারা কলেজের গেটেই ঢুকতে পাবে না—তা নইলে লাখ লাখ বি-এ, এম-এ, বি-এল, ছাপ মেরে বেকার অবস্থায় ছেড়ে দিলে দেশের অর্থকষ্ট কোন দিনই ঘুচবে না, আর দেশের অর্থকষ্ট

ব্যাপকভাবে দূর না করতে পারলে কোন সমস্যাই—সে মেয়ের বিয়েই হোক আর রাজনৈতিক সমস্যাই হোক—কিছুরই সমাধান হবে না।"

পরেশ চুপ করিয়া ভাবিতেছিল। পরেশকে লইয়া অরুণ বাহিরে গেল।

হীরেন বাবুর কন্যা আসিয়া ডাকিল, "বাবা মা ডাকছেন, মামীমাকে দেখতে—"

হীরেন বাবু উপরে গেলেন। আজ ফুলশয্যার রাত্রি। হীরেন বাবু উপরে গিয়া নীহারিকাকে দেখিলেন। প্রতিমা সত্যই নীহারিকাকে ফুলরাণী সাজাইয়াছেন। হীরেন বাবু বলিলেন, "বাঃ সুন্দর সাজিয়েছ ত"—

কিছু কথাবার্ত্তার পর তিনি গিয়া নিজের ঘরে শয়ন করিলেন।

সমগ্র বাড়ী সজাগ—বাড়ীর নিকট ও দূর আত্মীয়াদের নিদ্রা নাই। দরজা, খড়খড়ি সব ফাঁক আছে। প্রত্যেক জানলা দরজার কাছে মহিলার অভাব নাই। সকলেই বসিয়া আছেন আড়ি পাতিতে। প্রতিমার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তিনি অন্ধকারে দরজার পার্শ্বে এক মহিলাকে দেখিয়া বলিলেন, "কে?"

মহিলা চাপা কণ্ঠে বলিলেন, "চুপ্ হাবি, আমি।"

প্রতিমা চোখ দুটী বড় বড় করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার এ কি কাণ্ড!" বলিয়া—পুনর্ব্বার ধমক খাইবার ভয়ে প্রস্থান করিলেন।

জগত্তারিণী যে আজ কেন অন্ধকারে বসিয়া আছেন আড়ি পাতিতে, তাহা হয় ত প্রতিমা বুঝিলেন না। নারী বা পুরুষ বৃদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু তাহার জীবনে বসন্ত বা যৌবন কখন অতীত হয় না। জগত্তারিণী তাঁহার যৌবন দেখিতেছেন প্রতিমার মধ্যে, প্রতিমা তাঁহার যৌবন দেখিবেন কন্যার মধ্যে। আজ তাঁহার মাতাও যৌবন দেখিতেছেন পুত্রবধূ তরুণী নীহারিকার মধ্যে। ভগবান মানবের জীবনে অনন্ত নব-বসন্ত দিয়াছেন, মানবের আত্মাকে অমর করিয়াছেন পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনীর মধ্যে। এখনও এ-তত্ত্ব হয় ত প্রতিমা বুঝেন নাই, বুঝিবার বয়সও হয় নাই।

১৩

হীরেন বাবুর ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অরুণকেও বেহারে কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে, বেহারে পশ্চিমে এক পর্ব্বত-মালার মধ্যে এক সহরে। নীহারিকা জোড়' হইতে সন্দেই ফিরিয়া আসিয়াছে। জগত্তারিণীর সব কার্য্য যেন নীহারিকা তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে।

ভোর বেলায় সর্ব্বাগ্রে নীহারিকা ঘুম হইতে উঠে—স্নান করিয়া পূজার সাজ করে, তাঁহার গঙ্গাস্নানের কাপড়-গামছা সব ঠিক করিয়া রাখে। আগে বাড়ীর সব কার্য করিয়া জগত্তারিণীর অনেক সময় কাটিত, কিন্তু এখন তাঁহাকে আর রান্নাঘরে পাচকের নিকটে বড় যাইতে হয় না। জগত্তারিণীর একটা রোগ ছিল, ভাবিতেন যে, চাকর, পাচক দাসী সর্ব্বদাই হয় দুধে জল মিশাইতেছে, না হয় মাছ সরাইতেছে, না হয় ভাঁড়ার হইতে ঘি-তৈল অদৃশ্য হইতেছে। এই সব কারণে চাকর-বাকর ও ভাঁড়ার লইয়া তাঁহাকে বড় ব্যস্ত থাকিতে হইত। কিন্তু নীহারিকার ব্যবস্থাতে সে সুযোগ আর দাস, দাসী বা পাচকের নাই। দুগ্ধ সম্মুখে নিজেই নীহারিকা জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া জালের আলমারীতে তালা বন্ধ করে, তৈল ঘি যাহা দরকার, সেইমত একবারে বাহির করিয়া দেয়। ভাঁড়ারের আলমারীর বা ভাঁড়ার-ঘরের চাবী কোন কারণেই ঠাকুরের হস্তে দেওয়া হয় না।

স্বামীর বসিবার ঘর উড়ে চাকর গোরা কখনই ভাল করিয়া পরিষ্কার করে না। যখন বৌমা আসিয়া তাহাকে ঘরের কার্পেট উঠাইয়া রৌদ্রে দিতে বলিল, সে অবাক্ হইয়া গেল। যখন বলিল, ঘর ঝাড় দিয়া বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিতে, সে বিরক্ত হইল। ঘর শুকাইয়া গেলে যখন গোরাকে কার্পেট ঝাড়িয়া পাতিতে বলিল, সে প্রমাদ গণিল। অরুণের বসিবার ঘর, পাঠের ঘর শয়ন-ঘর, সব ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে। ইহারই মধ্যে যেন বাটী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

অরুণ স্ত্রীকে বলে, "তুমি এত খাট কেন? ঘর কাজ কর বেশ, কিন্তু সব কাজ ক'রে আমাকে ফাঁকি দাও কেন?"

নীহারিকা কিছু উত্তর দেয় না। অরুণ বিরক্ত হইয়াছে ভাবিয়া ভীত হইয়া অপরাধিনীর ন্যায় নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়, স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘরের মধ্যে ঘোরে। তখন অরুণ হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লয়।

রাত্রে জগত্তারিণী বাতের কষ্টতে সময় সময় বড় যন্ত্রণা ভোগ করেন। এক ঝি আছে বটে, কিন্তু সে পা টিপিতে

এত বিরক্ত করে ও গায়ের উপর এত ঢুলিয়া পড়ে যে, অনেক সময়ে বাতের যন্ত্রণা এই বিরক্তির চেয়ে ভাল মনে করিয়া তিনি ঝিকে আর ডাকেন না। কিন্তু তাহাকে ছাড়াইতে পারেন না—সে হাবীকে মানুষ করিয়াছে। নীহারিকা যে-দিন এ সংবাদ পাইয়াছে, সেইদিন হইতেই কর্পূর-মিশ্রিত সরিষার তৈল গরম করিয়া শাশুড়ীর পায়ে কোমরে মালিশ করে।

জগত্তারিণী বলিলেন, "বৌমা এমন মালিশ ক'রতে কোথায় শিখলে মা?"

নীহারিকা বলিল, "আমার মার যে বাত আছে, আমাদের ত আর চাকর-বাকর নেই, এক ঠিকে ঝি আছে, মাকে বড় খাটতে হয়, আমি রোজ রাত্তিরে মার পা-কোমর সব টিপে না দিলে,—মা বাবার গা হাত পা কি ক'রে টিপে দেবেন?"

জগত্তারিণী হাসিয়া বলিলেন, "বৌ ত নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।" নীহারিকার কানে এ কথা পৌছাইল না। সে কোন উত্তর দিল না। তাহার মনে হইল, তার মার আজ কতই কষ্ট হইতেছে—সে নাই।

জগত্তারিণী বলিলেন, "বৌমা এবারে আমি ছুটি পেয়েছি। লোকের কন্যাদায় হয়, আমার পুত্রদায় হ'য়েছিল, অরুণকে তুমি দেখো, যদি হাবী তার বড় মেয়ে ও বড় ছেলেকে আমার কাছে রাখে তা হ'লে আমি কলকাতায় থাকব। হীরুর মত আছে, তবে হাবী রাজী হয় না, আমি একবার তীর্থ দর্শনে যাব।"

নীহারিকা বলিল, "মা আমি দিদিকে রাজী করাতে পারব ব'লে মনে হয়।"

জগত্তারিণী বলিলেন, "তা হয় ত তুমি পারবে। যাও বৌমা শোওগে যাও, অনেক রাত হ'য়েছে।"

নীহারিকা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, অরুণ খাটে শয়ন করিয়া কি একটা পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কাঁদিতেছে। সে তাড়াতাড়ি অরুণের নিকটে গিয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ কেন?"

অরুণ বলিল, "ও কিছু নয়, বইটা প'ড়তে প'ড়তে আর না কেঁদে থাকতে পারলাম না।"

নীহারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বই ওটা?"

অরুণ বলিল, "মস্ত ফরাসী লেখক, উপন্যাস-সম্রাট রমাঁ রলাঁর বিখ্যাত বই 'জন্ খ্রিষ্টোফার্'। এমন উপন্যাস জগতে খুব কমই বেরিয়েছে।"

নীহারিকা বলিল, "কাঁদছিলে কেন?"

অরুণ বলিল, "উপন্যাসের নায়ক খ্রিষ্টোফার মাকে ছেড়ে বিদেশে গিয়েছে অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে। প্রকাণ্ড সঙ্গীত-ভক্ত অথচ ফরাসী দেশে তার সঙ্গীত কেউ বুঝছে না। ভয়ানক অর্থকষ্ট, ভাল ক'রে খেতেও পায় না, উপন্যাসে যেখানে আছে যে, খ্রিষ্টোফারের হাতে সেদিন মাত্র ছয় আনা পয়সা ছিল, তার মধ্যে চার আনা পয়সা দিয়ে এক বই কিনে ব'সেছে, সেটা তার রোগ ছিল, আর দুই আনা পয়সা আছে। খাওয়া হয় নি, দু আনায় খাওয়া হতে পারে, কিন্তু তার পরের দিন তার মা লুইসার জন্মদিন, মাকে জন্মদিনে চিঠি লিখবে না, সে কি ক'রে হয়? ক্ষুধার তাড়না ভুলে গিয়ে না খেয়ে দু আনা টিকিটের খরচ রেখে মাকে চিঠি লিখতে ব'সল—রাত্তিরে আর তার খাওয়া হ'ল না। তাই কাঁদছিলাম আনন্দে। আমরা কি ছেলে আর জন্ খ্রিষ্টোফার কি ছেলে!"

নীহারিকা বলিল, "ভারী সুন্দর ত, আমাকে বাংলা ক'রে বুঝিয়ে দেবে?"

অরুণ পুস্তকের বিরাট চার খণ্ড দেখাইয়া বলিল, "এ—কি সোজা? তবে গল্পাংশ যেটুকু তা তর্জ্জমা ক'রে ব'লতে পারি, কিন্তু আমার পারিশ্রমিক?"

নীহারিকা হাসিয়া বলিল, "তুমি ভারী দুষ্টু।"

•

বসন্তের সমাগমে বালীগঞ্জের বৃক্ষরাজি অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হইয়াছে। অরুণ একা ছাদে পায়চারি করিয়া বিবাহের পূর্ব্বে সে কি ভাবে বিবাহ করিতে বাঁকিয়া বসিয়াছিল, সেই কথা ভাবিতেছিল। সেদিনের কথা তাহার মনে পড়িল, যেদিন জননী একরূপ আহার-নিদ্রা ছাড়িয়াছিলেন। অরুণও সুস্থ ছিল না।

অরুণের মনে পড়িল বিবাহের পূর্ব্বে দুই দিন জগত্তারিণীর সহিত নীহারিকাকে লইয়া তাহার বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

হীরেনবাবু তাঁহার শাশুড়ীর দিকে, প্রতিমা, ছোট বোন সেও মার দিকে; সুতরাং বাড়ীতে অরুণের সমর্থক কেহ

ছিল না। অরুণ বিষণ্ণ মনে এই ছাদেরই উপরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মধ্যে চাঁদের আলোকে সেদিন অনেক কথাই ভাবিতেছিল; তাহার তখনও ইচ্ছা ছিল যে তটিনীকে বিবাহ করে। মাঝে মাঝে অবশ্য ভাবিয়াছে, যদিও সত্যই নীহারিকা তটিনী অপেক্ষা সুন্দরী, কিন্তু তাহাতেই বা কি? তটিনী তাহাকে ভালবাসে, কত পত্র লিখিয়াছে, কতদিন হয় ত অরুণের জন্য অশ্রু সিক্ত নয়নে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে, পিতার প্রস্তাবিত পাত্রকে হয় ত অরুণের জন্যই সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আজ যে সে দিল্লীতে পিতা-মাতার বিরাগভাজন হইয়া নির্ব্বাসন লইয়াছে তাহার কারণ হয় ত অরুণ। কি আশ্চর্য্য, তাহার মাতা বা ভগ্নী বা ভগ্নীপতি কেহই তটিনীর দিক্ হইতে ভাবিয়া দেখিতেছেন না। নারী বলিয়াই কি তাহার প্রতি এ অবিচার অত্যাচার চলিবে?

এই সব চিন্তায় যখন তাহার চিত্ত ছিল বিক্ষিপ্ত, প্রতিমা ছাদে আসিয়া তাহার মধুর স্নেহময় কণ্ঠে ডাকিয়াছিল, "দাদা!" "কি রে?" বলিয়া অরুণ তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। "যদি কিছু মনে না কর, তবে একটা কথা বলি।" "কি বল। অত ভনিতা কেন?"

"দাদা, নীরু শ্যামমাধববাবুর নাতনী, বাবা তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, তোমার সঙ্গে তাঁর নাতনীর বিয়ে দেবেন।"

অরুণ বিরক্ত হইয়া কি বলিয়াছিল, তাহাও তাহার স্পষ্ট মনে পড়িল: "বাবার নিজের ছেলেটি ও ছোট মেয়েটিকে এক সঙ্গে খেলা করতে দেখে ভাল লেগেছিল হয় ত? তাই বলেছিলেন একটা কথা, সেই কথাই এত বড় হল? মা বলছেন বটে যে বাবা মার কাছে অনেক বার বলেছিলেন, আমার সঙ্গে নীহারিকার বিয়ে দেবেন, কিন্তু আমার মনে হয় মার সেটা কল্পনা মাত্র। বাবা কবে কি কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে আমায় চলতে হবে। আমার নিজের কি একটা মতামত নেই?"

"মতামত তোমার থাকতে পারে দাদা, কিন্তু যত দেখছি, বি-এ এম-এ পাশ করা মেয়ের অধিকাংশই কেবল মেম-সাহেবী শেখে, আমাদের সংসারে খোপে টেকে না। লেখা-পড়া জানা একটু আধটু দরকার, কিন্তু বি-এ এম-এ পাশ করা মেয়ে আমাদের সংসারে কি দরকার?"

অরুণ তাহাকে বলিয়াছিল, "দেশ কাল পাত্র সব বদলে গিয়েছে হাবি, এখন ওসব সেকেলে মত চলবে কি?"

"দেশ-কাল-পাত্র কিছু বদলায়নি দাদা, যারা গরীব তাদের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে, আর যারা বড়লোক তাদের অবস্থাও খারাপ হয়েছে, শীগ্‌গিরই গরীব হয়ে যাবে।"

"কি করে?"

প্রতিমা—"দাদা পুরুষ মানুষ সাহেব হলে চলে। কিন্তু স্ত্রীকে মেম-সাহেব করতে গেলে ভিটেয় ঘুঘু চরে এবং তাই বড়লোকদের বাড়ীতে হচ্ছে।"

এই সময়ে হীরেনবাবু আসিলেন। আসিয়াই স্ত্রীর কথাটী মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "পুরুষ মানুষ সাহেব হলে চলে। কিন্তু স্ত্রীকে মেম-সাহেব করতে গেলে ভিটেয় ঘুঘু চরে চমৎকার।"

অরুণ বলিল, "দেখ ত' হীরু-দা হাবি বলছে যে, বাবা যা কথা বলে গিয়েছেন তাই রাখতে হবে।"

হীরেনবাবু বলিলেন, "আমার শ্বশুর যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তুমি বি-এ পড়, তখন ম্যাকিন্টশ সাহেবকে বলেছিলেন যে, তুমি এম-এ পাশ করলে তোমাকে ইনকম্-ট্যাক্স অফিসার করে দেবেন, যদি তিনি তখন ভারতে থাকেন। সেই ম্যাকিন্টশ সাহেব পাঞ্জাবে বদলী হয়েও কি চেষ্টা করে তোমাকে এই চাকুরী করে দিয়েছেন। তিনি ত তোমার বাবার কথা রেখেছিলেন?"

"কি যে বল হীরু-দা। চাকরী আর বিয়ের কথা হল, বাবার সঙ্গে আমার মত না মিলতে পারে।"

"খুবই স্বাভাবিক। বাবার সঙ্গে মত না মিলতে পারে। তবে তোমার উচিত প্রথমতঃ এই চাকুরী ছেড়ে দেওয়া ও তোমার বাবার যে সম্পত্তি আছে তা তোমার মার নামে লিখে দেওয়া, তারপর যাকে খুশী বিয়ে করতে পার।"

"বাঃ, বাবার সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নেই?"

হীরেন বাবু তখন বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার অধিকার থাকে বাবার সম্পত্তিতে, তবে তোমার মারও পুরো অধিকার আছে তাঁর স্বামীর মতামত চালাবার। তাতে তোমার কোন রকম বাধা দেওয়ার অধিকার নেই অবশ্য আইনতঃ অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আইনটাই কি সব, আর কিছু নেই? ছাড়তে পারবে টাকা-কড়ি চাকুরী—যা কিছুর সঙ্গে তোমার বাবার নাম জড়িত আছে? ছাড়, ছাড়লে তটিনীরও ভালবাসা কর্পূরের মত উবে যাবে—অদৃশ্য হবে স্বপ্নের মতন। আমি ভাই বিলেতে, কন্টিনেন্টে এ সব এত দেখে এসেছি যে, হিন্দুদের এই মা-মাসীতে মেয়ে দেখে অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রথার বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েছি। তোমার উপাস্য গুরুদের গো, মহর্ষি বারট্রাণ্ড রাসেলের বুড়ো বয়সে স্ত্রী নিয়ে কি কেলেঙ্কারী হল জগৎ-জোড়া নাম নিয়ে—তাতেও চৈতন্য হল না? 'শান্ত মারেজ!' যাও মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে থাইয়ে চাল শ্যামমাধবের মেয়ে দেখতে—তিনি না খেয়ে দু'দিন উপোস করে কেবল কাঁদছেন। তোমার লজ্জা করছে না? শেষ কালে কি বুড়ী মাকে মেরে ফেলবে?"

"দাদা এস, তুমি এত কঠিন, এস, এস," বলিয়া দাদার হাত ধরিয়া প্রতিমা টানিতে অরুণ তাহাকে বলিয়াছিল, "হাবী,

হীরু দা, তোমরা সকলেই ভাবছ যে আমি মাকে ভালবাসি না, পরেশ ত কাল সেই কথাই বললে। মাকে আমি নিজের প্রাণের চেয়ে ভাল বাসি—"

প্রতিমা তাহাতে বলিয়াছিল, "তাইত জানতাম দাদা, মা যা ব'লবেন তার ওপর আর কথা নেই তাই তো জানি—তাই তুমি যখন পরশু মার সঙ্গে অমন ক'রে ঝগড়া ক'রছিলে আমি তো অবাক্ হয়ে চেয়েছিলাম তোমার দিকে যে, এসব কথা তুমি শিখলে কোথায় থেকে, এ ত তুমি জানতে না?"

হীরেন বাবু বলিয়াছিলেন, "অরুণের মতন ছেলে হয়? কিন্তু হলে হবে কি, যত সব মিশবে ঐ রুজ-মাখা আর ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে মেয়েদের সঙ্গে—ঐ যে কিনি—ঐ মিস্ খাস্তাগীর না কি—এম্-এ পাশ করে পাখা বেরিয়েছে কি না—এসেছিলেন করমর্দ্দন করতে, তাও হাতটা ঠিক করে বাড়াতে জানেন না। বাপ-ঠাকুর্দ্দা মানুষ হলেন সুক্তো আর শাকচচ্চড়ি খেয়ে আর মেয়ে-বউ হলেন মেম-সাহেব, মোগলাই রোষ্ট আর খানা খেয়ে টেবিলে। এস অরুণ চল মার কাছে।"

অরুণ তর্ক করিলেও ভগ্নীপতির বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে চিরদিনই শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়াছে। সেদিনও সে ভাব তাহার মধ্যে অদৃশ্য হয় নাই।

অরুণ মাতার ঘরের দ্বারে গিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?"

অরুণ বলিল "মা আমি।" জগত্তারিণী দরজা খুলিলেন।

অরুণ বলিল "মা আমার দোষ হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর। হাবী, হীরু-দা, পরেশ সকলে ভাবে যে তোমায় আমি ভালবাসিনে—মা তোমায় আমি ভালবাসিনে?"

মায়ের মন কি আর স্থির থাকিতে পারে? তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাকে অনেক চেষ্টায় আহার করাইয়া স্থির হইল শীঘ্রই শ্যামবাজারে নীহারিকাকে দেখিতে যাইবেন সকলে।

প্রতিমা, হীরেন বাবু, অরুণ উপরের ঘরে বসিয়া চা খাইতেছিলেন, প্রতিমা বলিল, "নীরুর মত মেয়ে কোথায় পাবে দাদা, দেখো না কি সুন্দর দেখতে, কি ফরসা রং, কি কোমল মুখশ্রী, কি নম্র মেয়ে!"

হীরেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এর মধ্যে নীহারিকাকে দেখেছ না কি?"

প্রতিমা বলিলেন, "না সাত-আট বছর আগে দেখেছি।"

হীরেন বাবু বলিলেন, "বাঃ তাই নিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছ দেখছি।"

প্রতিমা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "সব তাতেই তোমার আমাকে নিয়ে ঠাট্টা, আমি কি মিথ্যে বলেছি, তুমি আমায় বড় ঠাট্টা কর।"

হীরেন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আহা চট কেন!"

"চটতে গেলাম কেন?" বলিয়া প্রতিমা প্রস্থান করিলেন।

পরেশ নীচ হইতে ডাকিল "অরুণ।" হীরেন বাবু বলিলেন, "পরেশ বাবু আসুন, আসুন।" ইতিমধ্যে অরুণও আসিয়া উপস্থিত। পরেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অরুণের মাথা ঠিক হয়েছে?" হীরেন বাবু বলিলেন, "মনে হচ্ছে।"

পরেশ বলিল, "জয় ক্যালকেরিয়া ফসের জয়।"

অরুণ হাসিয়া পরেশকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

অরুণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন আজ সুখের দিনে সেই দুঃখকে লইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছিল, তখন নীহারিকা ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নীহারিকার বাহুলীন হইয়া অরুণ দূরে তাল-বৃক্ষের উচ্চ শির পবনে আন্দোলিত হইতে দেখিল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশে কলিকাতার যিনি সম্রাট্ সেই যন্ত্ররাজ নিদ্রামগ্ন। এই নীরবতায় জীবন-পথের দুই চিরজন্মের নবীন সাথী পরস্পরের প্রেমে বিভোর হইয়া প্রকৃতি দেবীর অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ কাটিলে অরুণ বলিল, "মা ব'লছেন কাশী যাবেন, তুমি সেই পাহাড়ে দেশেতে বাংলোতে একলা কি ক'রে থাকবে? তোমার ভাই পাঁচুর ত থাকলে হয়।"

নীহারিকা বলিল, "সেটা ভাল দেখায় না, বাঁটলেকে রাখ না, সে আমাদের কাছে থাক, মার কাছে লক্ষ্মী থাক।"

অরুণ বলিল, "সেই ভাল, সেই চেষ্টা করা যাক।"

নির্ম্মেঘ আকাশে হঠাৎ এক খণ্ড কালো মেঘ আসিয়া চন্দ্রমাকে ঢাকিয়া দিল। অরুণ বলিল, "আমাদের জীবনে যদি কাল এ-রকম মেঘ উপস্থিত হয়।" তটিনীর কথা হয় ত অরুণের মনে হইয়াছিল।

উত্তরে নীহারিকা কেবল বলিল, "কালো মেঘ কখনও সূর্য্যকে ঢেকে রাখতে পারে, আর নীহারিকা পর্য্যন্ত ত কালো মেঘ পৌঁছতেই পারবে না।"

অরুণ সোৎসাহে নীহারিকার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "তুমি লেখা-পড়া না শিখেও যা জান, আমি লেখাপড়া শিখেও তা জানি না দেখছি।"

নীহারিকা কিছু বলিল না। কেবল স্বামীর বক্ষে নিজের মুখ লুকাইল।

[ক্রমশঃ

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

উনবিংশ শতক হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে নবযুগের সূচনা এবং শ্রীরামপুরে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যে এই নবযুগ প্রবর্ত্তন করাইবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালের এই বিপুল সাহিত্য-প্রবাহের মূল মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য যে কতখানি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। মুদ্রাযন্ত্রকে বাহন করিয়াই এক ব্যক্তির চিন্তাধারা আজ দেখিতে দেখিতে অসংখ্য জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, অজস্র ভাবুকের কল্পনাকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহাদের নব নব ভাবে সাহিত্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান কালের সাহিত্যিকবৃন্দ আজ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণেই সমগ্র দেশব্যাপী প্রশংসা ও নিন্দা লাভ করিয়া উৎসাহিত ও নিরুৎসাহ হইতেছেন। সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র পরিচালিত হইয়া অলক্ষ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের লেখক ও পাঠকগোষ্ঠি সংগঠন করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের এই প্রসার-প্রতিপত্তিতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব যে কত অধিক, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সংক্ষেপে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীরামপুরের মিসনারীগণ যদি এই (শুভক্ষণে কি না জানি না) মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তবে বঙ্গ-সাহিত্য অত্যল্প কালের মধ্যেই এত বিপুল হইয়া উঠিতে পারিত না।

উনবিংশ শতকের প্রথমেই উইলিয়াম কেরীপ্রমুখ মিশনারীগণ কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতকের প্রথমেই ইংরাজ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় এবং এই সাথেই, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রথমেই, বাংলা সাহিত্য তাহার সুদীর্ঘ কৈশোরকাল অতিক্রম করিয়া নবযৌবনে পদার্পণ করে।

খৃষ্টীয় মিশনারীগণ যখন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এই দেশে আপনাদের ধর্ম্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তখন কলিকাতার রাজপুরুষগণ নিশ্চিন্তভাবে উক্ত কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। ইংরাজগণ তখন সবেমাত্র রাজা হইয়াছেন। এই দেশের বিচিত্র রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত্রের সহিত তখনও তাঁহারা ভাল করিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই; সুতরাং ধর্ম্ম-প্রচারে রাষ্ট্র-বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া কলিকাতায় মিশনারীগণকে আড্ডা করিতে দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ডাচ্ অধিকৃত শ্রীরামপুরে গিয়া মিশন স্থাপন করিলেন এবং মিশন স্থাপনার পর আপনাদের ধর্ম্মের কথা, সভ্যতার কথা জনসাধারণকে শুনাইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া বাংলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হইলেন।

কেরী, মার্সম্যান প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাশালী পাদরীর অধ্যবসায়ে ১৮০১ খৃঃ মে মাসে "শ্রীরামপুর মিশন প্রেস" মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। ইহার কিছু পূর্ব্বে ক্যাপ্টেন উইলকিন্স স্বহস্তে একপ্রস্থ বাংলা হরফ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। মিশন-প্রেস স্থাপিত হইলে পর মিশনারীগণ পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক একজন এদেশীয় সুনিপুণ কারিগরের সাহায্যে দেবনাগরী ও বাংলা অক্ষরের একপ্রস্থ উৎকৃষ্ট সীসক-নির্ম্মিত টাইপ প্রস্তুত করাইয়া লন। পঞ্চানন পূর্ব্ব হইতেই সীসক-ঢালাই কার্য্যে অভিজ্ঞ ছিলেন; পরে উক্ত উইলকিন্স সাহেবের নিকট টাইপ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া সীসক অক্ষর নির্ম্মাণ করেন।

অতঃপর টাইপ প্রস্তুত হইলে পর, কেরী সাহেব পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রণ করেন। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে এই মুদ্রিত রামায়ণ-মহাভারত প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণের নিকটে মিশনারীগণ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এদিকে কলিকাতার রাজপুরুষগণেরও রাজকার্য্য চালাইবার সুবিধার জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল এবং এই সূত্রে কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত ইংরাজ রাজপুরুষগণের ঘনিষ্ঠ মিলামিশা হইতে লাগিল। এমনি করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্য্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য

সভ্যতার বিচিত্র ভাবধারা ধীরে ধীরে বাংলার জাতীয় জীবনে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য যে, জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য না থাকিলে সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা নাই। সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসিগণের অদ্ভুত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সংস্পর্শে আসিয়া বাংলার চিরাচরিত সামাজিক জীবন নূতনত্বের উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্ব জীবন-যাত্রার শান্ত স্থির গতি অকস্মাৎ বিদেশী সভ্যতার তীব্র মদিরাপানে আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। সেই শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, রাধাকৃষ্ণের গান, বিদ্যাসুন্দরের ছড়া, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার প্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম্ম-প্রেরণা-সম্ভূত সাহিত্য আর ইংরাজীশিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়কে প্রীত করিতে পারিল না। পুরাতনের ও নূতনের সাহিত্যিক রুচির বিভিন্নতা বিশেষভাবেই প্রকট হইয়া উঠিল এবং এই প্রাচীন ও নবীনের রুচিগত দ্বন্দ্ব উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া চলিয়া অবশেষে নবীনের দল বিজয়ী হয়। এই অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া প্রাচীনপন্থীরা কিছু কিছু যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই রচনা করিয়া প্রাচীন পন্থাকে প্রচলিত রাখিতে যেমন চেষ্টিত ছিলেন, নবীনপন্থীরা তেমনি ইংরাজী-শিক্ষা আরম্ভ করিয়া নূতনভাবে, নূতন ধারায় আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রবল উদ্যমে একের পর এক বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিপুল উৎসাহে নানাবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়া বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বনিয়াদ গঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে নবীন যুগোপযোগী গদ্যভাষা তৈয়ারী হইয়া উঠিতেই প্রায় ৫০।৬০ বৎসর কাটিয়া যায়। বাংলা গদ্যের আজ যে নব নব সৃজন-শক্তিশালী যৌবনশ্রী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতেছি, বৃটিশ যুগের প্রারম্ভে য়ুরোপীয় মনীষীবর্গকে যে কতখানি যত্ন, অধ্যবসায় ও ভালবাসা সহকারে ইহার লালনকার্য্য করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তাঁহাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালীজাতির নমস্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক, মিশনারীগণ প্রধানতঃ আপনাদের প্রয়োজনের খাতিরেই, আপনাদের উপকারার্থেই স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া, বই লিখিয়া, সংবাদপত্র চালাইয়া বাংলা গদ্যের গোড়া পত্তন করিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেব-গণও দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে অনুস্বর-বিসর্গহীন সংস্কৃত ঢঙের একপ্রকার দুরূহ ও আড়ষ্ট গদ্যের প্রবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এবং পাশ্চাত্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দেশীয় সমাজের রীতির দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করাইতে, সরল করিয়া কর্ম্মব্যাখ্যা করিতে ও হিন্দুদর্শনতত্ত্ব বুঝাইতে একদল নব্যশিক্ষিত যুবক তদুপ-যোগী গদ্যভাষার সৃষ্টি করিলেন। মোটের উপর এই দীর্ঘ সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনও সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। কারণ এইটি ছিল নবীন সম্প্রদায়ের প্রস্তুত হইয়া উঠিবার কাল।

লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উইলিয়ম কেরীকে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন এবং এই কেরী সাহেবের উৎসাহে ও প্ররোচনায় একদল শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক বাংলা গদ্যে বিপুল উদ্যমে লেখনী চালনা করিতেছিলেন।

রামরাম বসু, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ মুন্সী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ অধ্যাপকমণ্ডলী এই কলেজে অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

ইঁহাদের মধ্যে রামরাম বসু ১৮০১ খৃঃ প্রতাপাদিত্য চরিত, ১৮০৩ খৃঃ লিপিমালা ও ১৮০৪ খৃঃ রাজাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই 'প্রতাপাদিত্য-চরিত'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্য ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার ভাষায় বাংলা, সংস্কৃত, ও ফার্শী শব্দের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে দেখা যায়।

এই সময়কার বাংলা গ্রন্থ অধিকাংশই সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফার্শী গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ বা অনুলিখন। মৌলিক প্রবন্ধও যে একেবারে না ছিল, এমন নহে, তবে অপেক্ষাকৃত কম।

রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিতে'ই অনেক মৌলিক রচনার নমুনা পাওয়া যায়। কেরী সাহেব 'কথোপকথন' বলিয়া চলিত ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র বই লেখেন। এই ভাষার একটুখানি নমুনা এইখানে দেওয়া গেল। এ দেশীয় কথ্যভাষাতেও এই সাহেবটি যে কতখানি দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন ইহা হইতেই কতকটা বুঝা যাইবে।"—বড় বৌ

আমার দিবি, সত্য কথা বল। কালি দুপুরবেলা ছোট-বৌ রান্ধিয়াছিল ইহার মধ্যে আমার ছ্যালা আগে ভাত খাইয়াছিল, ইহার মধ্যে ঘুঘুধা মাগী আসিয়া কন্দল আরম্ভ করিল।"

"কথোপকথন" রচনার কয়েক বৎসর পরে ১৮১২ খৃঃ কেরীর 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। 'কথোপকথনে'র ভাষা হইতে ইতিহাসমালার ভাষা কিছু সংস্কৃতানুগ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০২ খৃষ্টাব্দে 'বত্রিশ সিংহাসন' ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। মার্শম্যান সাহেবের মতে মৃত্যুঞ্জয়ের মত এমন সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত বাংলায় তৎকালে আর দ্বিতীয় ছিল না, বলিলেই চলে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ভাষা সাধারণতঃ অত্যন্ত কর্কশ, সংস্কৃতবহুল ও লালিত্যহীন, এমন কি স্থানে স্থানে প্রায় অর্থহীন বলিলেও চলে—যথা—

কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়ানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। "প্রবোধচন্দ্রিকা"র ভাষা অবশ্য সর্ব্বত্রই একরূপ নহে, মাঝে মাঝে কথঞ্চিৎ সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে দেখা যায়। কথ্য ভাষা রচনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের দক্ষতা কম ছিল না, তবে স্থানে স্থানে গ্রাম্যশব্দ ব্যবহারে সেগুলি বড়ই গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত' এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' ও চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। 'কৃষ্ণচন্দ্র-চরিতে'র ভাষা তেমন প্রাঞ্জল না হইলেও বেশ বোধগম্য এবং শুধু তাৎকালিক গদ্য-সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া নহে, সে কালের একখানা তত্ত্ব-বহুল ইতিহাস হিসাবেও এই গ্রন্থখানির সমাদর কম নহে। 'তোতা ইতিহাস' একখানি উর্দ্দু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এবং ইহার রচনাও মন্দ নহে। কেরী সাহেব এই সময়ে একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন।

ইহা ছাড়া খৃষ্টান পাদ্রীগণ এই দেশের জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অতি কঠোর পরিশ্রম সহকারে বাংলা ভাষার অনুশীলনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। বাইবেলের ভাষাকে নিপুণ ভাবে অনুশীলন করিতে গিয়া বাইবেলের বঙ্গানুবাদের ভাষা কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত নমুনাটুকু দেখিলেই বুঝা যাইবে।

—"ঈশ্বর বলিলেন জল উদ্ভব করুক, অপরজন্তু ও পক্ষ উড়ুক, পৃথিবীর উপর স্বর্গের আকাশে। সেইমত ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিলেন বড় কুম্ভীর ও সুশপ্রাণি প্রভৃতি যাহা জলে গতি করে তাহাদের জাত্যানুযায়ী ও প্রতিপক্ষ তাহাদের জাত্যানুযায়ী—"

অবশ্য মিশনারীদের কৃপায় এই অদ্ভুত ভাষার নমুনা যে আজও তাঁহাদের নিকট না পাওয়া যায় এমন নহে।

শ্রীরামপুরের মিশনারীগণের অন্যতম কীর্ত্তি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'দিগদর্শন' নামে এক সাময়িক সাহিত্যপত্র ও পরে 'সমাচার-দর্পণ' নামে সংবাদপত্র বাহির করিয়া বাঙ্গালী জনসাধারণের ঘরে ঘরে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য, জীবনী-কথা, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে বাংলার একজন প্রধান মনীষী ও যুগপ্রবর্ত্তক ব্যক্তি আবির্ভূত হইলেন—ইনি রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের বিস্তৃত কর্ম্মজীবন, বিচিত্রমুখী প্রতিভা ও বিশাল কর্ম্মশক্তির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা ভাষার গদ্যশৈলী যে কেমন করিয়া অপূর্ব্ব প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

রামমোহন বেদান্ত-উপনিষদাদি দুরূহ সংস্কৃত দর্শন ও কয়েকখানি শাস্ত্র গ্রন্থাদি বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিয়া স্বকীয় বোধানুযায়ী হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী, আচারভ্রষ্ট জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত পথভ্রান্ত নব্য যুবকসম্প্রদায়কে ঘরের পথে ফিরাইয়া আনিতে অতীত ভারতের উপনিষদী ধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়া নব্য ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বকথা সরল ও সহজভাবে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিবার নিমিত্ত সাময়িক পত্রে ও পুস্তকে নবজাত গদ্যভাষার সাহায্য লইয়া অশ্রান্ত লেখনী চালনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৎকালের ছন্দে-তরঙ্গময়ী পদ্য-সাহিত্যের মধ্যে অকস্মাৎ ছন্দোবন্ধহীন গদ্যের

আবির্ভাবে বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায় যে কতখানি চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ হয়ত তাহা অনুমান সহজ হইবে না, কিন্তু ইহা হইতেই আমরা কতক অনুমান করিতে পারি যে, গদ্য রচনা করাই কেবলমাত্র তখন কঠিন কার্য্য ছিল তাহা নহে, অনভ্যাস প্রযুক্ত জনসাধারণের বুঝিবার পক্ষেও তাহা বিশেষ সুসাধ্য ছিল না। এই জন্যই রামমোহন বেদান্তদর্শনের বঙ্গানুবাদ করিতে গিয়া প্রথমেই পাঠকবর্গকে গদ্য বুঝিবার প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন দেখিতে পাই—"এ-ভাষায় গদ্যতে অদ্যপি কোন শাস্ত্র-বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস-প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। * * * বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এ দুয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে, তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়া অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু একবাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে যাহার সহিত যাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।"

—(বেদান্ত গ্রন্থ—অনুষ্ঠান)

'এই গদ্যভাষাকে' জনসাধারণের কাছে পরিচয় করাইয়া দিয়াই রামমোহন তাহার ছোটখাট গল্প-উপকথা শুনাইতে না বসিয়া আপনার প্রয়োজনমত একেবারেই বেদান্ত, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের সুগভীর তত্ত্বকথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুমাত্র চিন্তা করিলেন না, দ্বিধা করিলেন না, সৃষ্টি করিয়াই তাহাতে অদম্য প্রাণশক্তির সঞ্চারপূর্ব্বক বঙ্গীয় গদ্যভাষাকে সার্থক করিয়া তুলিলেন।

পক্ষান্তরে এই নবধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মেরও আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ব্রাহ্মণ 'পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মপ্রেরণায় ও ধর্ম্মকলহের অজুহাতে বাংলা গদ্য-সাহিত্য অত্যল্প সময়ের মধ্যেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনা এই সময়ের একটি প্রধান ঘটনা। বঙ্গভাষা অনুশীলনকারিগণের এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় যে বর্ত্তমান যুগের আগমনের কতখানি সহায়ক হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাহা হউক, এমনি করিয়া উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ ব্যাপিয়া খৃষ্টীয় মিশনারী, ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজী-শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায় যৎকালে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও লালন পালন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে প্রাচীনপন্থীর দল কিছু কিছু যাত্রা-পাঁচালী গান রচনা করিয়া প্রাচীন রুচিকে সঞ্জীবিত রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন দেখা যায়।

শ্রীধর কথক, গোপাল উড়ে প্রভৃতি টপ্পাওয়ালা এবং দাশরথি রায়, রসিক রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি যাত্রা-পাঁচালীওয়ালাগণের নাম এই প্রাচীনপন্থীর অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। বারান্তরে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

রস সৃষ্টি

…মনুষ্য-শরীর সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রস কোন মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না। রস, তেজ ও বায়ু এই তিনটি বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র প্রকৃতি। সর্ব্বজগৎ পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির কার্য্য বশতঃ রস, তেজ ও বায়ু সর্ব্বদা মনুষ্য-শরীরে আপনা হইতেই বিদ্যমান এবং ঐ তিনটি বস্তুর কার্য্যবশতঃ মনের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় ও মেদ, অস্থি প্রভৃতি সম্বলিত শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার পর বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সংযোগের জন্য মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি সাধন করিয়া থাকে। কাযেই মানুষের ভাব সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য আছে, ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ রস সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা তাহার কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি, ইহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না।…

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

ঘটকালী নং ৩

একদিন বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'একদিন একটি পাত্রী দেখতে পাবে—বাড়ীতে বসেই—'

"আবার কার জন্তে ?"

"সরোজের জন্তে—"

"কার মেয়ে ?"

"পরে বলব—আগে মেয়ে দেখা হোক্—"

"তুমি দেখেছ ?"

"আমি ? তুমি দেখনি,—আগেই আমি দেখব ? আমি তোমার মত অমন স্বার্থপর নই—"

মাসখানেক হইল মেজ-বৌ আসিয়াছেন, সুরুচির দিদিও. পুরী হইতে ফিরিবার পথে দিন কয়েকের জন্তে নামিয়াছেন। একদিন সকালে খড়্গপুর বেড়াইতে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া দেখেন—বসিবার ঘরে একদল ভদ্রমহিলা—তার মধ্যে দুইজন অচেনা—একটি মা—একটি মেয়ে—মেয়েটি কুমারী।

দলের সকলেরই মুখে চোখে কৌতূহল,—মেয়েটি দারুণ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া আছে, মেজ-বৌ চুপি চুপি বলিলেন, "এইটি বোধ হয় রে—"

যথারীতি আদর ও জলযোগাদির পরে বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব,—মেয়েটিকে কাছে বসাইয়া আদর করিলেন—গান গাহিতে বলিলেন—মেয়ের মাথা নীচু হইতে হইতে টেবিলে ঠেকিয়া গেল।

টেবিলে জ্বলিতেছিল একটা 'হ্যাজাক'—সেই আলোতে মেয়েটি ঘরটা যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে—স্বাস্থ্য বেশ ভাল, বয়স প্রায় আঠার উনিশ—মাথার মিশকালো চুলে অতি প্রকাণ্ড এক খোঁপা,—গায়ের রং ঠিক বিদ্যুতের মত,—এমন আশ্চর্য্য উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বাঙ্গালীর ঘরে দেখা যায় না।

সকলে চলিয়া গেলে বিশ্বকর্ম্মা ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন। মেয়ের বাপের বড় সাধ সরোজকে জামাই করিবার,—বড় ভাল মানুষ তিনি—স্ত্রী-কন্যাকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মেয়েটির চেহারা কিছু নেপালী ধরণের হইলেও রংয়ে ও চুলে সকলের মনে এমন ছাপ পড়িল যে, সেই রাত্রেই বিবাহ ঠিক হইয়া গেল এক কথায়। সুরুচির দিদি বার বার বলিলেন, "এমন রং আমি দেখি নি।"

কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। সহসা বদলী হইয়া ছয় মাসের জন্ম ভাবী বেয়াই বর্দ্ধমান গেলেন—অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে।

সরোজের ইচ্ছা দেশে বিবাহ করে,—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মাকে সে কথা বলিবে কে ? বেয়াইয়ের বাড়ী হাওড়া।

একদিন রবিবার দুপুরবেলা তমলুকের এক উকীল আসিয়া উপস্থিত—বিশ্বকর্ম্মাকে ধরিয়া পড়িলেন—তাঁহার মেয়েটিকে সরোজের জন্ম যদি বিশ্বকর্ম্মা না নেন, তবে তাঁর সমূহ বিপদ, কিছুতেই মেয়ের বিবাহ জুটিতেছে না—সরোজকে লক্ষ্য করিয়া এক বছর ধরিয়া আশ করিয়া আছেন—কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে আসিতে পারেন নাই এতদিন। মেয়ের ফটো বাহির করিয়া দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মাকে তেমন করিয়া ধরিয়া পড়িলে তিনি এড়াইতে পারেন না,—চক্ষুলজ্জা ও দুর্ব্বলতায় প্রায় রাজী হইলেন। কিন্তু সুরুচি বাঁকিয়া বসিলেন,—"আমাদের বেয়াই নিশ্চিন্ত রয়েছেন—আর আমরা এ রকম করব ?"

কর্ত্তা বলিল, "এ মেয়ের চেহারা খুব সুশ্রী দেখছেন না ? আর অনেক দেবে—কত বড় ফর্দ্দ এনেছে দেখুন—"

মেজ-বৌ বলিলেন, "সরোজের এই বিয়েই ভাল হতো—ওঁরা কিছুই তো দেবেন না ;—পত্র-পত্র হয় নি, আশীর্ব্বাদ হয় নি—এতে দোষ নেই—"

সুরুচি শুনিলেন না—"টাকার লোভ করবে কেন ? নিজে উপার্জ্জন করবে—অমন বিশ্বাস তাঁদের ভাঙতে পারব না—"

সুরুচির জেদের কাছে শেষে বিশ্বকর্ম্মা পরাস্ত হইলেন—ভদ্রলোক অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

কার্ত্তিক মাসে বর্দ্ধমান হইতে বেয়াই আসিলেন—অগ্রহায়ণে বিবাহ।

ফণী বলিল, "আপনারা রাত্রে হ্যাজাকের আলোতে মেয়ে দেখেছেন বলে অত ফরসা দেখেছেন—দিনে একবার দেখুন।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তুমি যাও।"

সুরুচি বলিলেন, "না তুমি যাও।"

"একবার দেখেছি—আবার কি দেখব? ওরা বলছে যখন—তুমি আর মেজ-বৌ গিয়ে দেখে এস গে।"

"না আমার সঙ্কোচ হয়—ওঁরা ভাববেন কি? ওঁরা অত বিশ্বাস করে রয়েছেন আমাদের ওপর—আমরা অবিশ্বাস করব?"

"ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—তোমার মতন বুদ্ধি কার?"

ফণী আবার পুনঃ পুনঃ বলিল, "ঠাট্টা নয় এক বার ছেড়ে দশ বার দেখলেও দোষ নেই—কাকা না যান, আপনারা দেখে আসুন।"

মেজ-বৌয়ের ইচ্ছা ছিল—কিন্তু সুরুচি রাজী হইলেন না।

তখন ফণী বলিল, "একেবারে স্বর্গ থেকে নেমেছেন দেব দেবী! এ সব কাজের ভার আপনাদের নেওয়া কেন? আমাদের ওপর দিলে আমরা অনেক ভাল করে করতে পারি,—মেয়ে দেখেই অজ্ঞান। দেনা-পাওনার কথাই নেই, লেখা-পড়া শেখাতে খরচ হয় না? নিজেদের মেয়ের বিয়ে দিতে তারা যা চায়, সব তো দিব্যি ধরে ধরে দেন—আর ছেলেদের বেলায় এক পয়সা না! আমাদের বুঝি দাম নেই?" (ফণী বিবাহ করিয়া কিছুই পায় নাই—গহনা অবধি না। সে জ্বালা তার মনে আছে। অবশ্য বিশ্বকর্ম্মা সব গহনা গড়াইয়া দিয়াছেন।)

নীহার উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ফণীবাবু—ঠিক ঠিক—যেমন মা—তেমনি বাবু। মার দোষ বেশী, মা যা বলে বাবু তাই শোনেন—ওঁরা না গেলেন,—চলুন আমি আর আপনি দেখে আসি গে।"

মেজ-বৌ বলিলেন, "তাই যা না—"

ফণী বলিল, নাঃ, কাকা যে মানুষ—জানতে পারলে খেয়ে ফেলবেন—কি মাথা-ব্যথা আমাদের—যা খুসী করুন।"

দুই দেশের রীতি-নীতির অনেক তফাৎ—বিশ্বকর্ম্মা গিয়াছেন অফিসে—সকাল সকাল ফিরিয়া বর লইয়া যাত্রা করিবেন—বিবাহ-লগ্ন শেষ রাত্রে।

বৈকালে বেয়াই আসিলেন—এখান হইতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব না গেলে মেয়ে স্নান করান যায় না—এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বলিতে আসিয়াছেন।

সুরুচিরা এ সব কিছু জানেন না, তাঁদের এ প্রথা নাই-ও, মেজ-বৌয়ের উপদেশ লইয়া বেয়াইকে বলিলেন, "আমাদের দেশে এ সব নিয়ম নেই। এক কাজ করা যাক, আমরা আমাদের মত করি—আপনারা আপনাদের মত করুন—"

বেয়াই যথার্থই ভাল লোক—বেয়ানের দ্বারাই চালিত হওয়া অভ্যাস। বলিলেন, "আমি তাই বললুম—সে তত্ত্ব তো সকালবেলা আসে—তা যখন এল না, তখন স্নান করিয়ে ফেল—তা শুনলেন না—আমায় পাঠালেন—"

বেয়াই চলিয়া গেলে বাড়ীর ডাক্তার দিব্যেন্দুকে সুরুচি ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি বলিলেন, গায়ে হলুদের তত্ত্বটাও বড় খরচ—প্রায় আড়াইশো টাকার ধাক্কা, মেয়ের গহনা কাপড় থেকে খেলনা অবধি দিতে হয়, আর হলুদ, তেল, মাছ, দই, মিষ্টি, সব; কমেও হয়, তবে আপনারা কম দিলে লোকে কি বলবে?"

"যাঃ বেয়াইকে বিদায় করে দিয়েছি এখন কি করি? উনি মজা করে অফিস করছেন, আজকের দিনটা ছুটি নিলে কি চলত না? আমার বুদ্ধিতে এ সব জোটে না—"

মেজ-বৌ বলিলেন, "থাম-থাম, তোকে আর গিন্নীপনা করতে হবে না। আমাদের নাচুনে ঠাকুরটি থাকলে এতক্ষণ ফর্দ্দ গেঁথে বাজারে পাঠাতো, অফিসে আছে ভালই হয়েছে। ছেলের বিয়ে দিতে বসে আড়াই শো টাকার তত্ত্ব পাঠাব না আর কিছু! ওদের যা-খুসী নিয়ম থাক্ গে, আমরা কেন তা মানতে যাব? আমাদের দেশে ননদ-পুঁটলী সবার আগে দেয়, সরোজের পাঁচ ছয় বোন, একটাও দিয়াছে ওরা?"

দিব্যেন্দু বলিলেন, "সে কথা ভাল, আপনাদের মতেই আপনারা চলুন, ও দেওয়া-থোওয়ার শেষ নেই, আমাদের দেশে বিশ্রী নিয়ম, জেরবার হয়ে যেতে হয়।"

সরোজ বসিয়া শুনিতেছে, মুখের ভাব খুব প্রফুল্ল নয়, বোধ হয় ভাবিতেছিল, ভাবী বধূটির জন্য কিছু পাঠাইয়া দিলেই ভাল হইত।

সন্ধ্যাবেলা গাঁদা ফুলের মালা পরিয়া আলো ও ফুলে সাজান ডজন তিনেক মোটরে সমস্ত বরযাত্রী বিশ্বকর্ম্মার নেতৃত্বে রওনা হইল, সব চেয়ে মোটা ও বড় মালাটি বিশ্বকর্ম্মার গলায়। বেয়াই-বাড়ী মাইল দেড়েক দূর।

আণ্ডা-বাচ্ছা শুদ্ধ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। সুরুচি ও মেজ-বৌ বই পড়িয়া, গল্প করিয়া, দশ-পঁচিশ খেলিয়া অবশেষে শুইতে গেলেন। হলের আলোটা সন্ধ্যা হইতেই জ্বলিতেছে, সেই তীব্র আলোর সব ঘরই আলো হইয়াছে। একে শীতের রাত্রি তায় প্রায় চারিটা বাজে, মেজ বৌ শুইবামাত্র অজ্ঞান, সুরুচি নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুয়ারে বিষম ধাক্কা, হলের দুয়ারে। সুরুচি প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন, অমনি ঝড়ের বেগে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।

দুয়ার বন্ধ করিয়া হলের আলো নিভাইয়া ঘরে আসিয়া দেখেন বিশ্বকর্ম্মা নাই, এইটুকু সময়ের মধ্যে গেলেন কোথা? চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে গিয়া শাল পাঞ্জাবী ও ফুলের মালাটি মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। রুমালটা এক কোণে গিয়া পড়িয়াছে। সেগুলি তুলিয়া রাখিয়া সুরুচি বারান্দার দিকের দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন যদি মেজ-বৌয়ের কাছে গিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ ও অন্ধকার। মেজ-বৌয়ের ঘরে গেলেন, তিনি ঘুমাইতেছেন, ঘর অন্ধকার। বারান্দার দরজা খুলিয়া উঠান দেখিলেন, এ দিক্ ও দিক্ দেখিলেন, সব নিঃশব্দ, মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। কুকুরটা তীব্র স্বরে ডাকিয়া উঠিল, সভয়ে সুরুচি বারান্দায় উঠিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন এবং নিজের ঘরে ফিরিতে ফিরিতে ভাবিলেন, "গেলেন কোথা? না বোধ হয় আসেন নি, আমিই স্বপ্ন দেখে উঠে দোর খুলেছিলাম।" মনে করিতেই সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল, "কিন্তু ঐ যে, শাল জামা এল কোত্থেকে, না 'নিশি'র ডাক নয়, সত্যি—"

এমন সময় খাট নড়িয়া উঠিল। মশারির ভিতর দিয়া লেপটা উঁচু-উঁচু দেখায়, বিশ্বকর্ম্মা পাশ ফিরিতেছেন।

"বেশ! বেশ! আমি এই নিশি রাত্রে ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছি এরই মধ্যে লেপ মুড়ি দিছে কখন? শুভ্র আসবে না? তুমি একা এলে? বিয়ে হয়ে গেছে?"

বেশ বোঝা গেল সম্প্রদান-কার্য্যটি শেষ হইবামাত্র বিশ্বকর্ম্মা সকলকে ফেলিয়া চম্পট দিয়াছেন।

লেপের ভিতর হইতে শব্দ হইল, "উহু—উহু শীত—শীত বড্ড শীত, শোও, শুয়ে পড় এসে।"

একটা কথারও উত্তর না পাইয় সুরুচি অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, কিন্তু বাদানুবাদ করিবেন কার সঙ্গে?

সকাল বেলা সকলে ফিরিল, নীহার এক চোট খুব নিন্দা করিল ও-দেশের, আমাদের প্রথায় সঙ্গেই কিছুই না কি মেলে না। বেলা একটার সময় ভেজেন গিয়া বর-বধূ লইয়া আসিল।

পরদিন বৈকালে ফুলশয্যার তত্ত্ব আসিল, বিশ্বকর্ম্মা কি খুসী! সুরুচিও তত্ত্বের কথা বইতে পড়িয়াছেন, কত শুনিয়াছেন, চোখে দেখিলেন এই প্রথম। সাজাইবার বাহাদুরী আছে, যাহাতে সামান্য তুচ্ছ জিনিসও সুন্দর দেখায়। আসিয়াছে জন পনের লোক ও একখানা গাড়ী, এখন? সুরুচি বলিলেন, "অতঃপর কি হইবে কহ মহাশয়?"

"তুমি যা হয় কর আমি কি জানি? এ সব গিন্নীদের কাজ," বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা সোজা পিঠটান দিলেন বাবু অভিমুখে।

মেজ-বৌও ঘরে গিয়া বসিলেন, কণীও চুপ করিয়া রহিল।

নীহার বলিল, "মা ভাবছেন কি?"

"ভাবছি অনেক, কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, দিব্যেন্দুও বাড়ীতে নেই।"

অর্থাৎ সমস্যা এই, এতগুলি লোককে বিদায় করিতে হইবে বকশিশ দিয়া, সেটা ত সহজ কথা। কিন্তু শুধু জলযোগ করাইলেই হইবে, না রাত্রের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে? কাপড়-চোপড় দিতে হয় বোধ হয় নূতন কুটুম-বাড়ীর লোককে, তার পরে এই সব অসংখ্য বাসন-পত্র, ট্রে, ঝুড়ি এ সব কি ফিরাইয়া দিতে হয়, না রাখিতে হয়? গল্পে

উপন্যাসে এ সব কথা খুলিয়া লেখা নাই, বড় জোর শাশুড়ী তত্ত্ব অপছন্দ করিয়া ফেরৎ পাঠান, কিংবা বাহকাদির সাক্ষাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, পরের বার তত্ত্ব যাহাতে ভাল হয়, এইটুকুই লেখা থাকে।

দুই ঘরে দুই সতরঞ্চি পাতিয়া বাহক-বাহিকাদের বসিতে দেওয়া হইয়াছে। সুরুচির অধীত সমস্ত পুস্তকের একটি লাইনও এই কঠিন সঙ্কটে উপকারে আসিল না, সুতরাং বাংলার সমস্ত লেখক-লেখিকাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া এবং ভবিষ্যতে আর নভেল পড়িবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া (কি হইবে পুঁথিগত বিদ্যায়, যা বিপদের সময় কাজ না দেয়?) সহজাত অহঙ্কার ও দর্প লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি যেটা ভাল মনে করি করব; আমরা ছেলের মা, আমাদের কাজে কে দোষ ধরতে পারে? ডাক মেজ-দিকে—"

নীহার লাফালাফি বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া তত্ত্ব দেখিতেছিল ও ভাবিতেছিল, এখন বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা—সেই কথাই ভাল, তাইত, এ কথা মনে হয় নি তো!"

অতঃপর শাশুড়ীগর্বে আটখানা হইয়া এবং সেই আচরণে অজ্ঞতা চাপা দিয়া সুরুচি বাজারে লোক পাঠাইলেন। ফণী বলিল—"এত সব জিনিষ পাঠিয়েছে—এতেই তো ওদের হয়ে যেত—"

"ছি, ওদের আনা জিনিষ ওদেরই খাওয়াব! তোমাদের কি কিছু নেই?"

মেজ-বৌ আসিয়া বলিল, "বাজারে পাঠালি কেন? ঘরেই ত' সব আছে—"

"ছ' রকম মিষ্টি দিতে হবে দিদি—আপনার ভাঁড়ারে ত' চার রকম আছে।"

খুব যত্ন করিয়া দুই যায়ে দাঁড়াইয়া খাওয়াইলেন। প্রধানা ঝিটি ক্যাশ-বাক্সের চাবি দিয়া বলিল, "গহনা মিলিয়ে নিন, আর সব জিনিষও মিলিয়ে নিন—এই ফর্দ্দ—"

আপনা হইতেই আর একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, নীহার একটা মোড়া আনিয়া দিয়া মহা উৎসাহে ঘর-ভরা তত্ত্বের মাঝখানে গিয়া বসিয়া বলিল, "আপনি বসে পড়ে যান—আমি মিলিয়ে নিচ্ছি।"

এর আর মিলাইবেন কি? এ তো নিজেদের ফর্দ্দ ধরা জিনিষ নয়, কন্যা-পক্ষের উপহার। তথাপি—কি জানি হয়তো তত্ত্ব মিলাইয়াই তুলিতে হয় (পুস্তক-বিদ্বেষটা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল)।

সব মিলিয়া গেলে ঝি বলিল, "নতুন বাসনগুলো দানের, আর সব আমাদের আভাড় করে দিন—"

যাক্—বাঁচা গেল! তখন দুই তিনজনকে ডাকিয়া আনিয়া নীহার তাড়াতাড়ি সমস্ত পাত্র খালি করিয়া দিল। সুরুচি সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া সুখী করিয়া বিদায় দিলেন। মেজ বৌ বলিলেন, "তোমরা রাত্রে খেয়ে যাবে থাক—"

তাহারা বলিল, "যা খাইয়েছেন…আর কেন মা, আজ আর কিছু খেতে হবে না—" বলিয়া খুব হাসিমুখে প্রস্থান করিল।

পরে শোনা গেল—তাহারা বেয়াই-বাড়ী গিয়া বলিয়াছে—"এমন কুটুম দেখি নি—এত আদর-যত্ন আমরা কোনও তত্ত্ব নিয়ে গিয়ে পাই নি। শুধু আমাদের আদর করতেই ব্যস্ত—তত্ত্ব ভাল কি মন্দ—'এটা দেয় নি ওটা দেয় নি'—একটা কথাও কইলে না কেউ, চেয়েই দেখলে না ভাল করে—কি দিয়েছ না দিয়েছ।"

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিলেন, "যাক্ শাপে বর। তত্ত্ব চিনলে তো ভাল-মন্দ বলব?"

তার পরে যা হইল কেহ কল্পনাও করিতেও পারিবেন কি? অতি উত্তম! অতি চমৎকার! অতি অপূর্ব্ব!

বৌমা মোটেই বিদ্যুৎবরণা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মাত্র বলা যাইতে পারে। সেই প্রথম রাত্রে বৌমার যে অপূর্ব্ব শুভ্রবর্ণ সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়াছিল—সে রং আদৌ আর দেখা গেল না!—জয় শ্রীযুক্তা বেয়াম ঠাকুরাণীর পেন্টিং-এর জয়! (অসুন্দরী কন্যার মাতারা বেয়াম ঠাকুরাণীর শরণ গ্রহণ করিলে মেয়ের বিবাহের আর ভাবনা থাকিবে না।)

বিশ্বকর্ম্মা ও সুরুচিকে সকলে আচ্ছা করিয়া চাপিয়া ধরিল,—সুরুচি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, মেজ-বৌ বিরক্ত, অপ্রসন্ন; সরোজ অপ্রতিভ, ফণী নিজের অভিজ্ঞতায় পরম উৎফুল্ল, নীহার উল্লম্ফনশীল, বিশ্বকর্ম্মা গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন।

হাওড়া ময়মনসিংহের উপর টেক্কা দিয়াছে।

অতঃপর বাক্যবিভ্রাট।

বিশ্বকর্ম্মা মেদিনীপুর ছাড়িয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার সে বিপুল ভোজ-যজ্ঞের কথা লোকে ভোলে নাই, বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন—বিদেশে সেরূপ বড় কেহ করে না।

বৌয়ের নাম সরোজিনী। দু'একদিন বাপের বাড়ী থাকিয়া আবার আসে। সুরুচি ও বিশ্বকর্ম্মা ছাড়া কাহারও কথা বুঝিতে পারে না—আবার তার কথাও মেজ বৌ বোঝেন না, এক এক সময় রাগ করেন, "যাও কি মাথামুণ্ডু কও, না জানি।"

সরোজিনী লুকাইয়া হাসে, সুরুচিকে আসিয়া বলে।

মেজ-বৌ বলিলেন, "দেখ বৌমা বাপের বাড়ী যেয়ো না কিছুদিন, এখানে থাকতে থাকতে সব বুঝতে পারবে—"

সরোজিনী বলিল, "আচ্ছা কাকীমা।"

মেজ-বৌ বোঝে না—কেমো, মাদুর, আক্, উনান।

সরোজিনী বোঝে না—কারা, সপ্, কুসুর, আখা।

সুরুচি হন দোভাষী। নীহার রাগিয়া বলে, "ভাল এক বৌ জুটল—কথা কইতে জানে না।"

সরোজিনী মেজ-বৌকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা কাকীমা, নীহারদার মাথায় টিকি কেন?"

"ও যে পশ্চিম দেশের মানুষ।"

"কথা যে ঠিক আপনাদের মতন।"

"ও শিখে ফেলেছে, আমাদের বাড়ী গেলে মিশে যায় একেবারে।"

সুরুচি সরোজকে বলিলেন, "বৌ তোর কথা বুঝতে পারে?"

সরোজ চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'ফ্রেঞ্চ লেডী বিয়ে করেছি না কি যে, কথা বুঝতে পারবে না?"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাথা' তোদের সেই রকম মনে হচ্ছে।"

রাগে অন্ধ হইয়া সরোজ কথা খুঁজিয়া পাইল না।

সরোজিনী ফণীকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না, 'মেজ-দা' বলিয়া উল্লেখ করে। ফণী ভারি বেজার, ভাসুরের সম্মান আর থাকে না। শেষে মেজ-বৌকে বলিল।

মেজ-বৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বৌকে বলিলেন, "সে কি বৌমা ভাসুরকে মান্তি কর না?—আমি খেয়াল করি নি এদ্দিন—"

সরোজিনী বলিল, "আমার কাকীমারা বাবার সঙ্গে কথা কন।"

"তা বলুন গে, তুমি এমন কাজ ক'র না। আমাদের বাড়ী তেমন নয়, ভাসুরকে 'দাদা' বলা আবার কি? ও ব'ল না।"

বৌমা সাবধান হইল।

সুধীর বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই, কিছুদিন পরে আসিল, তার আগের দিন বৌমা বাপের বাড়ী গিয়াছে।

দুপুর বেলা সুধীর গেরুয়া পাগড়ী ও জামা পরিয়া ফোঁটা তিলক কাটিয়া জ্যোতিষী সাজিয়া সরোজিনীর পিত্রালয়ে গিয়া উপস্থিত।

হাত দেখাইতে উৎসাহ মেয়েদের অফুরন্ত সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বসিল, সুধীর সরোজিনীর চেহারার বর্ণনা বিশেষ করিয়া শুনিয়া গিয়াছে, বলিল, "মা, আপনার এই মেয়েটির বিয়ে খুব অল্প দিন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

শুনিয়া শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল সকলের। সকলেরই কিছু কিছু ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া সুধীর সরোজিনীকে বলিল, "আপনার একটু খারাপ সময় আসছে আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি, সেই কাজটা করবেন তা'হলে সেটা কেটে যাবে।"

এক টুকরা কাগজ পেন্সিল দিয়া লিখিয়া ভাঁজ করিয়া সুতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া সুধীর বলিল, "রেখে দিন, কাল স্নান করে খুলে পড়বেন; তার আগে নয়।"

জ্যোতিষী পয়সা চাহিল না, উঠিল। ভক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে—সরোজিনীর মা একটা সিকি দিলেন, নেহাৎ ছেলেমানুষ বলিয়া প্রণামটা করিলেন না।

"না—না ও সব কেন? আমি কাঙালী নই" বলিয়া সিকিটি পকেটে পুরিয়া সুধীর ফিরিয়া আসিল।

শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ হাসি, মেজ-বৌ বলিলেন, "এবার যেদিন বৌমা আসবে ঐ পয়সায় খাবার এনে দেব।"

সুধীর বলিল, "কেন? বাড়ীতে খাবার জুটবে না বেচারার?"

"না বাপের বাড়ী থেকে এসে দুস দিন শ্বশুর-বাড়ী খেতে নেই।"

ও দিকে পরদিন সরোজিনী স্নানান্তে শুদ্ধ মনে কাগজটি খুলিয়া দেখে লেখা আছে, "বৌদি, আসব জেনেও আপনি বাপের বাড়ী চলে এলেন কেন? তার শাস্তি এই! ভাল চান ত আজই চলে আসুন, আমি তিন দিনের বেশী থাকব না।" সুধীর।

তাহাদের কি আমোদ! সেইদিন সরোজিনী আসিল। দেবরে বৌদিতে ভারি ভাব—সুধীর অত্যন্ত রঙ্গপ্রিয়, অষ্ট-প্রহর সরোজিনীকে জ্বালাতন করিয়া মারে, বলে, "খুড়িমা, বৌদিকে কি দিয়ে নিরীক্ষণ করা হয়েছিল?

"ব্রোচ দিয়ে।"

"একটা কলসী দিয়ে করা উচিত ছিল, বৌদের জল আনবার নিয়ম, আগেই দিয়ে রাখতে হয়।"

সরোজিনীর শ্বশুরবাড়ীর দেশের ভাষা শিখিবার খুব সাধ—বলিল, "নিরীক্ষণ কি?"

সুরুচি বলিলেন, "তোমরা যাকে 'পাকা দেখা' বল।"

নীহার বলিল, "তিন দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন। নাঃ এ বৌ ভাল না। কথা বুঝাবার জন্যে মাইনে দিয়ে লোক রাখতে হবে।"

মেজ-বৌ কুটনা কুটিতেছেন, সরোজিনী আসিয়া বলিল, "কাকীমা থ্যাংরাটা খুঁজে পাচ্ছি না, বড্ড আরশোলা উড়ছে ভাঁড়ার ঘরে।"

মেজ-বৌ অবাক হইয়া বলিলেন, "কি পাচ্ছ না? কি উড়ছে?"

সরোজিনী হাসিয়া বলিল, "ফিরে চেয়ে দেখুন।"

"ও আমার কপাল, ও ত' তেলাপোকা? তুমি কি বললে? থ্যাংরা? তেলা পোকার নাম থ্যাংরা?"

সুধীর কোথা হইতে একটা ঝাঁটা আনিয়া বলিল, "বৌদি থ্যাংরা খুঁজছিলেন না? এ জিনিষটা শাশুড়ীর হাতে মানায় বেশী, বৌয়ের পিঠে পড়ে, মা ধর দেখি, একবার রণরঙ্গিনী রূপ দেখাও বৌকে।"

"বালাই—বৌ আমার লক্ষ্মী! ঝাঁটা পড়বে তোর বৌয়ের পিঠে।"

"পেলে ত?" বলিয়া সুধীর পলাইল।

বৌমা একদিন সখ করিয়া রাঁধিতে বসিল। ঝি আসিয়া বলিল, "আর একটু চিনি দাও বড়-মা।"

"আমি ডালের আন্দাজ চিনি দিয়েছি।"

"আরও লাগবে বললে বৌদি।"

"ঐ যে নিয়ে যা—" মেজ-বৌ পূজার আসনে বসিয়াছেন।

খানিক পরে আবার ঝি দেখা দিল, "আর একটু চিনি দাও।"

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিলেন, "কৌটো ধরে নিয়ে যা।"

নীহার এই সময়ে মেজ-বৌয়ের কাছে বসিয়া কথা বলে, সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া মেজ-বৌ নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন।

ঝি আবার আসিল, "কৌটায় চিনি কই?"

"একটুখানি ছিল, দাঁড়া দিচ্ছি," বলিয়া মেজ-বৌ কৌটায় খানিকটা চিনি ঢালিয়া দিলেন।

নীহার বলিয়া উঠিল, "পিঠে পরমান্ন হচ্ছে না কি? সের খানেক চিনি তো গেল।"

"ছেলে মানুষ ইচ্ছে মত করুক কিছু বলিস নে।"

"নাই বললাম, আমার কি দরকার? ফণীবাবু, সরোজ বাবু দেখাবে মজা। ঠাকুর তুমি যা রাঁধবে আমাকে দিও, ও সব আমার খাওয়া চলবে না।"

নূতন বৌয়ের রান্না সকলে পরম আদরে ভক্ষণ করিলেন, বিশেষ বিশ্বকর্ম্মা। কিন্তু পরদিন সরোজিনী আবার রাঁধিতে চাহিলে ফণী মেজ-বৌকে বলিল, "যদি চিনি লুকিয়ে রাখ তবে, নইলে আমাদের ঠাকুরই ভাল।"

ছেলেমানুষের কষ্ট হইবে বলিয়া সরোজিনীকে আর রান্না করিতে দেওয়া হইল না।

সরোজ মাঝে মাঝে ছুটিতে আসে, সে তমলুকে থাকে। সেই উকীল বাবু সরোজের উপর ভারি চটা, দেখা হইলে কথা বলেন না। সরোজ সে মেয়েটিকে দেখিয়াছিল—খুব সুন্দরী।

সরোজিনী মেজবৌয়ের ঘর হইতে সেই মেয়েটির ফটোখানি আবিষ্কার করিয়াছে, "এ কে কাকীমা?"—

"তোমার সতীন।"—

"বলুন না কে?"

মেজ-বৌ সব বলিলেন।

সরোজিনীর কপালে কুঞ্চন-রেখা পড়িল, "এত যদি ভাল—একেই কেন আনলেন না?"—

"সবারই ইচ্ছে ছিল—তোমার ছোট শাশুড়ী বাগ ধরে বসল তোমার জন্যে।"

"বাগ কি কাকীমা ?"

"জেদ্—তোমরা যাকে জেদ্ বলে।"

মেজ-বৌ চোরা চাহনীতে চাহিয়া দেখেন সরোজিনীর মুখ বিলক্ষণ ভারী, বুঝিলেন, আজ সরোজের কপালে কিছু আছে। জানিতে পারিয়া সুরুচি ফটোখানা লুকাইয়া রাখিলেন। বয়স যত কমই হোক্ মেয়েরা নিজের অধিকার বজায় রাখিতে বিলক্ষণ পটু।

সরোজ খবর দিয়া আসে না, কিন্তু যখনই আসে অমনই শ্বশুর আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যান, কিরূপে খবর পান কে জানে। নিমন্ত্রণ শুধু জামাইটিকেই—বিশ্বকর্ম্মার বরাতে আর বেয়াই-বাড়ীর অন্ন দ্বিতীয় বার জুটে নাই।

মেজ-বৌ বলিল, "এ দেশে মেয়েটি আর জামাইটি,—আমাদের ওদিকে জামাই-বাড়ীর গুষ্ঠীশুদ্ধ নিমন্ত্রণ ক'রে তবে জামাই,—একা জামাইকে বলবেই না।"

সরোজ একদিন বলিল, "রাত্তিরে লুচি আমার ভাল লাগে না।"

"শাশুড়ীকে বলিস্ নে কেন ?"

"বলেছি—শোনে না।"

"ওঁরা ভাবেন জামাইকে ভাত দেওয়া লজ্জার কথা—লুচির দেশ কি না ?—তোরা যে ভাতের এত ভক্ত তা জানেন না।"

সত্য সত্যই সরোজ সেদিন নিমন্ত্রণে গেল না। সুরুচি বার বার বলিলেন—সরোজ বলিল, "না, আমার ভারি অসুবিধে হয় এত মিষ্টি রান্না, কোন্‌টা ডাল কোন্‌টা পায়েস বুঝতেই পারিনে—আর পায়েস একদিন খেলে বুঝতে পারতেন—চালে, জলে প্রাণপণে ঘেঁটে সাগুর খিচুড়ী!—দুধ আছে কি নেই।"

সুরুচি বলিলেন, "যেটা ভাল না লাগে না খেলেই হয়—লজ্জা কি তোর অত ?"

"আমার লজ্জা-টজ্জা নেই, আমি সব বলি, তিনি আর যাচ্ছিনে।"

পরদিন ভোরবেলা বেয়াই আসিলেন ব্যস্ত হইয়া। সুরুচি বলিলেন, "বেয়াই মশাই, আপনার জামাইটি বড্ড বেভবো, আপনারা যাকে বলেন 'বাঙালের পো'। তবে কখনও রাত্রে লুচি দেবেন না, আর রান্নায় বেশ ঝাল দেবেন, মিষ্টি মোটেই না। 'অষ্টগণ্ডার দেশের ছেলে' তা জানেন না ?

বেয়াই একটু অপ্রতিভ বলিলেন, "ও, জানতুম না। আচ্ছা তাই হবে বলে দেব, আজ রাত্রে সরোজকে নিশ্চয়ই পাঠাবেন।"

সুরুচি সরোজকে বলিলেন, "নে এবার নির্ভয়ে যা সব বলে দিয়েছি।"

শুনিয়া সরোজ খানিকটা লম্ফ ঝম্ফ করিল, "কেন, কেন বলতে গেলেন, ওরা ভাববে কি ? আমি যাই কি করে ?"

"ছেলে হেঁটে। মনে সাধ, মুখে লাজ। যা, যা, বেয়াই অনেক করে বলে গেছেন।"

অত পর সরোজ লুচি ও চিনির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল।

ভাব ও রস

...রস "প্রকৃতি"জাত এবং "ভাব" মানুষের "স্বভাব"জাত। মানুষের সমস্ত ভাব কখনও যুগপৎ উদিত হয় না। শিক্ষা ও সাধনার তারতম্য বশতঃ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পটুতা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং ঐ পটুতার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগে বিভিন্ন রকম ভাবের উৎপত্তি হয়। ভাবের বিভিন্নতার সহিত মূল আটটি রসের সম্বন্ধ বিভিন্নাকার ধারণ করে। সুশিক্ষা ও সুসাধনার দ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলে মানুষ সাধারণতঃ তাহার ভাবের সহিত অন্তঃস্থিত সূক্ষ্ম রসের যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।...

সংগ্রহ

—শ্রীনীলরতন কর

[জার্মান প্রাণিবিভাবিৎ আর্নষ্ট হেকেল্ (১৮৩৪—১৯১৯) তদানীন্তন জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণের নিকট বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের পর য়েনা সহরের জু-লজিক্যাল্ ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ ব্যতীত তাঁহার জীবনের অধিকাংশকাল য়েনাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রাণীর জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনায় তিনি প্রভূত পরিশ্রমের ফলে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সাহায্যে বিভিন্ন জীববর্গের অভিব্যক্তির বংশানুক্রমিক ধারা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় চার্লস্ ডারউইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ জার্মানীতে প্রতিষ্ঠালাভ করে। অভিব্যক্তির সিদ্ধান্তকে দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত তিনি 'Die Weltraetsel' বা 'The Riddle of the Universe' গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৯৯ অব্দে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পণ্ডিতমহলে প্রচুর মতদ্বৈধের সূত্রপাত করে। ইহা বর্ত্তমানে পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। নিম্নে অতি সংক্ষেপে গ্রন্থটির বক্তব্য যথাসম্ভব তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অনুসারে বিবৃত করা গেল।]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবের অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হইলেও তাহা আমাদের বিশ্বের সাধারণ ও দার্শনিক দৃষ্টিপটে আশানুরূপ রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন গবেষণার শাখার মধ্যে নিজদিগকে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, এবং বিশ্বের মহান রহস্যসমূহের সমাধানের কার্য্য প্রজ্ঞানবিদ্যাবিৎ (metaphysician)গণের নিস্ফল প্রয়াসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। একদিকে বৈজ্ঞানিকগণের সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ মননশীলতা, অপরদিকে বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রণালীর অসারতার বিরুদ্ধে আমি সর্ব্বদা প্রতিবাদ করিয়াছি। তাই আমি, আবিষ্কারের তথ্যসমূহ সংকলন পূর্ব্বক তাহা আমাদের অস্তিত্বের মহান সমস্যাগুলির সমাধানে কি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ফলে দুইটি মহৎ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রথমটি বস্তু ও শক্তির অবিনাশিতা এবং দ্বিতীয়টি অভিব্যক্তির ধারা-বিষয়ক। এক্ষণে ইহা সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছে যে, সমস্ত বস্তুর মূলীভূত পদার্থ (substance) অবিধ্বংসী; তাহা অভিব্যক্তিপ্রণালী অনুসারে ক্রমাগত রূপান্তরলাভ করিতেছে। দৃশ্যমান প্রাতিভাসিক রূপসমূহের (appearances) পশ্চাতে অনন্ত পদার্থের চিরন্তন বিকাশশীলতা রহিয়াছে, বিজ্ঞান ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা বিশ্বের একটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। তাহা এই যে, বিশ্বের মধ্যে বস্তু এবং আত্মা (spirit) কি দুইটি বিশিষ্ট ও পৃথক্ মৌলিক পদার্থ? (দ্বৈতবাদীগণ এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন); অথবা তাহারা একই চরম সত্ত্বার (fundamental reality) দুইটি বিভিন্ন দিক্? শেষের উক্তিটি আমি অদ্বৈতবাদ (monism) নামে অভিহিত করিয়াছি এবং ইহাকেই আমি নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করি।

মানবশরীরের গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইহা জৈবক্রমপরিণতির পরাকাষ্ঠা মাত্র। শারীর-সংস্থানবিদ্যা (anatomy) সমগ্র প্রাণিজগতের বিভিন্ন জীববর্গের শারীরিক গঠনের মধ্যে অদ্ভুত ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে, মানবদেহ অপরাপর জন্তুরই ন্যায় কোটী কোটী কোষদ্বারা সংগঠিত। এইদিক্ হইতে মানব-শরীরের গঠন বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা তাহার ভিতর মেরুদণ্ডী প্রাণীর সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থিসমূহ অপরাপর মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্থিসমূহের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলনা করিলে তাহার মূল এবং আদি উৎপত্তিদাতা চতুষ্পদ বলিয়া বুঝিতে পারি।

উন্নত শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবগণের তুলনামূলক পর্য্যালোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মনুষ্য যথার্থতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণী (mammal)। তাহার সহিত কপিগণের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। বৃহদ্‌কায় বানরের শরীর-গঠনের সহিত মানুষের যত অধিক সাদৃশ্য আছে, সেই তুলনায় তাহাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই অল্প।

দৈহিক গঠনের পর আমরা জীবনের প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য দিব। শরীর-বিধান-বিদ্যা (physiology) যান্ত্রিক

মূলসূত্র অনুসারে প্রাণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, আমরা এক্ষণে প্রাণশক্তি-বাদের প্রাচীন সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি,—প্রাণশক্তি-বাদ অনুসারে প্রাণকে বাস্তব প্রকৃতির অতিরিক্ত কোনও শক্তি বলিয়া অনুমান করা হইত। শারীরবিধান-বিদ্যা অনুযায়ী বলিতে গেলে মানুষ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং উচ্চতর বানরেরা তাহার নিকট-আত্মীয়। মানুষের ভ্রূণের পরিণতির ধারা এই উক্তির সমর্থন করে। প্রাথমিক স্তরে মানুষ অপরাপর প্রাণীদের ন্যায় বীজকোষ হইতে বিকাশলাভ করে। তাহার ভ্রূণের পরিণতির অবস্থা-পরম্পরা নিম্নতর কোন-কোনও প্রাণীর সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া যায় যে, কেবল বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অপরের পক্ষে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ দুঃসাধ্য।

লামার্ক ও ডারউইন্ এই উপমানসমূহকে অভিব্যক্তির তথ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চার্লস্ ডারউইন্ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ (natural selection) সাহায্যে এই সিদ্ধান্তটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং আমি বহুসংখ্যক নিবন্ধে বিভিন্ন জীববর্গের পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক শাখা-প্রশাখা অঙ্কিত করিয়া তাঁহারই ধারণার অনুসরণ করিয়াছি। প্রত্নজীববিদ্যা (palaeontology) বা অতীত জীবের প্রস্তরীভূত নিদর্শনসমূহের তুলনা এবং ভ্রূণতত্ত্ব ও তুলনামূলক শারীর-গঠনতত্ত্ব বা বর্ত্তমান প্রাণীসমূহের অঙ্গ সংগঠনের তুলনা হইতে এই বংশধারা নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা উচ্চতর বানরের সহিত মানুষের জ্ঞাতি-সম্পর্ক দেখাইয়াছি। মানুষ ও বানরের মধ্যবর্ত্তী নিরুদ্দিষ্ট বংশধারার সংযোগ সূত্রটি বহুকাল অনুসন্ধানের পর ১৮৯৪ অব্দে উদ্ধার হইয়াছে। পিথেকানথ্রোপাস্ বা জাভার 'নর-বানরে'র (Apeman) যে অস্থিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর বানরের মাঝামাঝি বলিয়া অনুমিত হয়।

২

দেহের অভিব্যক্তি হইতে মনের অভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা অপেক্ষাকৃত কম সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এইখানে অদ্বৈতবাদের সহিত দ্বৈতবাদের প্রবল দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, মানুষের মন অথবা প্রাণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা (natural phenomenon), তাহা নিম্নতর জীবে মনের অভিব্যক্তি হইতে আসিয়াছে। আমরা ইহাকে বহুসংখ্যক মানসিক সক্রিয়তার সমষ্টি-নির্দ্দেশক নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করি এবং অপর সকল ঘটনার ন্যায় ইহারও অধিষ্ঠান-ভূমি বস্তু বলিয়া স্বীকার করি। দ্বৈতবাদীর বিশ্বাস, প্রাণ অতিপ্রাকৃত পদার্থ (spiritual substance) এবং তাহা দেহের ধ্বংসের পরেও থাকিবে। মনস্তাত্ত্বিক অনুভাবন-প্রণালী সাহায্যে অদ্বৈতবাদের সমস্যার সমাধান করা দুষ্কর হইয়াছে। ভাবসমূহের মধ্যে ইহা এরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছে যে কাণ্ট, হ্বির্খ্, হ্বাবোয়া, রেমণ্ড প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও অবশেষে তাঁহাদের প্রথম বয়সের অদ্বৈতবাদের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আমরা অপেক্ষাকৃত নিশ্চয়াত্মক প্রণালী সাহায্যে সমস্যাটির সম্মুখীন হইব। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানের প্রণালী, বা মানবের মানসিক ক্ষমতার সহিত অপর প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার তুলনা। ইহার সহিত আমরা প্রাণীর ভ্রূণতত্ত্বের আলোচনাও যুক্ত রাখিব। যদি ব্যষ্টির পরিণতির ধারা তাহার পূর্ব্বপুরুষের সমগ্র বংশানুক্রমিক ধারার সংক্ষেপে পুনরাভিনয় করে, (আমরা এইরূপই বিশ্বাস করিয়া থাকি), তবে শিশুর মনের ক্রমবিকাশ হইতে আমরা অনেক রহস্য জানিতে পারিব। নিকৃষ্ট জাতিসমূহের (Race) মানুষের মনের তুলনামূলক পর্য্যালোচনা সমস্যাটির সমাধানের পক্ষে আর একটি চমৎকার উপায়। অবশ্য, তুলনামূলক জন্তুমনোবিজ্ঞান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সদুত্তর আশা করা যায়।

জন্তুজগৎকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে জীবকুলের স্তরভেদ অনুসারে আমরা তাহাদের মানসিক অবস্থার স্তরভেদের অস্তিত্ব অনুধাবন করিতে পারি। ইহাদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র সন্ধান করাই আমাদিগের লক্ষ্য। মনের বাস্তব ভিত্তি psychoplasm বা nerveplasmএর ঐক্য হইতে আমরা এ বিষয়ে প্রথম ইঙ্গিত পাই। ইহারই উপর সমস্ত মানস-জীবন নির্ভর করিতেছে। এই অদ্ভুত ধরণের plasm আণুবীক্ষণিক জীবনের নিম্নতম স্তরে পৃথক্‌ভাবে বিকাশ লাভ করে না; ইহাদের সমগ্র শরীর সমানভাবে চেতন-প্রবণ থাকে। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরের প্রাণীদিগের শরীরের উপরিতলে স্নায়ুকোষসমূহ বিকাশ লাভ করে। আরও উন্নত

স্তরে জন্তুর স্নায়ুকোষসমূহ নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের আকার গ্রহণ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে একত্র সম্মিলিত হয় ও তাহা প্রাথমিক মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করে। প্রাণী-জগতে উন্নতির পরবর্ত্তী স্তরে সম্মিলিত স্নায়ুগুলী বা কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত অত্যন্ত কৃতকার্য্যতাসহকারে সংবাদের আদান-প্রদান করে। উন্নত ধরণের মস্তিষ্কযন্ত্র প্রকাশ পাইলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ ছাপগুলির সম্মিলিতরূপ চেতনাসম্পন্ন প্রত্যক্ষবোধ (conscious perception) জন্মাইয়া থাকে। মানুষের মধ্যে চৈতন্য বিশেষভাবে পরিণতি লাভ করিলেও বিচারবুদ্ধি (reason) কেবল তাহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। উন্নত শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ইহা বিদ্যমান আছে। ভাষা ও মানসিক আবেগ (emotion) নিম্নতর প্রাণীদিগের মধ্যে অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। ইচ্ছার স্বাধীনতা কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে আছে বলিয়া দাবী করা হইলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনোবিৎ ও প্রকৃতিবিৎ এই প্রকার দাবী অগ্রাহ্য বলেন; এমন কি কোন কোনও প্রখ্যাত আস্তিক্যবাদী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন।

আমরা যে ভাবে দেহের পরিণতির ধারা পর্য্যালোচনা করি, ঠিক সেই ভাবে জন্তু-জগতের মনের প্রগতিধারা আলোচনা করিব। আমাদিগকে প্রস্তরীভূত জীবদেহ পর্য্যবেক্ষণ, নিম্নতর প্রাণী-গোষ্ঠীর সহিত উচ্চতর প্রাণীর ভ্রূণাবস্থার তুলনা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করিতে হইবে। এই তিনটিই অভিব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

ইহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, মানুষের বীজ-কোষ (germ) এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবের সদৃশ; তাহার সংবেদনশীলতা অত্যন্ত মৃদু। নিম্ন-জাতীয় বহুকোষী জীবের অনুরূপ উপায়ে এই এককোষী বীজ ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় কোষে বিভক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রত্যেক কোষটির ব্যষ্টিগত প্রাণ বজায় থাকে, কাজেই তাহাতে আমরা সমবায়ী প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। বীজের ক্রমবিভক্ত কোষগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়া বিধানতন্ত্র (tissue) আকারে বিস্তার লাভ করে; প্রত্যেক বিধানতন্ত্রর একটি সমবায়ী প্রাণ আছে বলা যাইতে পারে। এখানে প্রাণ শব্দটি মানস প্রক্রিয়াসমূহের সমষ্টি (sum of psychic activities) অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই অর্থে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলিতে হইবে; প্রকৃত পক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উদ্ভিদ্‌জগতের অদ্ভুত সংবেদনশীলতা বিষয়ে জানা গিয়াছে।

অবশ্য, জন্তুদের ভিতরেও মনুষ্যভ্রূণের সদৃশ প্রণালীতে এই অবস্থায় কতকগুলি কোষ স্নায়ুর (nerve) আকার ধারণ করে ও তাহা প্রবাল অথবা জেলী মাছের ন্যায় অবস্থা পাইয়া থাকে। অতঃপর অনুভব-যন্ত্রটি মাথার মধ্যে প্রকাশ লাভ করে ও দেহটি কীটের শরীরের ন্যায় দীর্ঘতা লাভ করে। ইহার পৃষ্ঠদেশে একটি স্নায়ুরজ্জু আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং তাহাকে রক্ষার নিমিত্ত একটি ঝিল্লীময় আবরণ গঠিত হয়; ঝিল্লীটি ক্রমশঃ অস্থিতে পরিণত হয়। স্নায়ুরজ্জুর শীর্ষদেশ বিস্ফারিত হইয়া মস্তিষ্করূপে বিকশিত হয়; এই সময় ভ্রূণটি নিম্নজাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী অথবা মৎস্যের আকার গ্রহণ করে। মৎস্য অবস্থা হইতে ক্রমে মণ্ডূক, আদিম সরীসৃপ ও ক্যাঙ্গারু সদৃশ আকারের মধ্য দিয়া আমরা নিম্ন-জাতীয় বানর ও খর্ব্বপুচ্ছ কপির আকার গ্রহণান্তর অবশেষে মনুষ্যস্তরে পৌঁছিয়া থাকি। উচ্চশ্রেণীর বানর এবং লেমুরের মস্তিষ্কের সংগঠন ও মানসিক বৃত্তিতে যতটা প্রভেদ, মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর বানরের মস্তিষ্কের সংগঠন ও মানসিক-বৃত্তির তদপেক্ষা পার্থক্য কম। অতএব মানবমনের উৎস সন্ধানে আমরা অভিব্যক্তি-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য দিব। চৈতন্যকে তদ্ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের মন্তব্যটি আরও দৃঢ় ভিত্তি প্রাপ্ত হয়। দেকার্ত্তে বলিতেন যে, চৈতন্য কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। ব্যক্তিগত ভাবে আমি স্বীকার করি যে, যেখানে কেন্দ্রীভূত স্নায়ুমণ্ডলী আছে সেই খানেই চৈতন্য বিরাজিত। ইহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের মানসপ্রণালীকে আমি অচেতন বলিয়া গণ্য করি এবং কেবল সেই অর্থে কোষ ও এমন কি পরমাণুর প্রাণ আছে বলা যাইতে পারে।

মানবের চেতনার পরিণতি তাহার মস্তিষ্ক-মধ্যবর্ত্তী ধূসর-বর্ণ স্নায়বিক বস্তুর পরিমাণ ও তাহার জটিলতার সহিত সংশ্লিষ্ট, আধুনিক গবেষণার ফলে ইহা জানা গিয়াছে। কপালের ঊর্দ্ধাংশে যে মস্তিষ্ক-স্তরটি রহিয়াছে মোটের উপর বলিতে সেইটিই বোধ হয় চেতনার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। মস্তিষ্কের

ব্যাধি, মাদকদ্রব্য এবং অনুভবলোপকারী দ্রব্য মনকে যে ভাবে প্রভাবান্বিত করে, তাহা আলোচনা করিলে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য হই যে, চৈতন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীত অপর কিছু নহে।

৩

মানবের অভিব্যক্তি ঘটনা প্রমাণিত করিয়া তাহাকে আমরা সমগ্রের সহিত একত্বসূত্রে গ্রথিত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা রহস্যের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের উপর কি আলোকপাত করিতে পারি, তাহা নিজদিগকে প্রশ্ন করিতেছি। তাহার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি আত্মার অবিনাশিতা-বিষয়ক। প্রাচীন গ্রীসের কোন কোন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং অষ্টাদশ শতকের ফরাসী মনীষিগণ আত্মার অবিনাশিতা অস্বীকার করিয়াছেন। মস্তিষ্কতত্ত্ব ও পরীক্ষাময় শারীরতত্ত্বে অভিজ্ঞতার প্রগতি এবং অভিব্যক্তির সিদ্ধান্ত এই অস্বীকৃতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করিয়াছে। লৌকিক বিশ্বাস অনুসারে আত্মাকে আমরা যদি অল্পবিস্তর বাস্তব ভাবে ধারণা করি অথবা আধ্যাত্মিক দার্শনিকগণের প্রজ্ঞানতাত্ত্বিক বাক্যানুসারে কল্পনা করি, কিংবা তাহাকে যদি ইথর অথবা বায়ুভাবে কল্পনা করি, অথবা তৎসম্বন্ধে বিশুদ্ধ বস্তুনিরপেক্ষ তত্ত্বে পৌঁছাই, যাহাই করি না কেন, ইহা মস্তিষ্কেরই প্রক্রিয়ারূপে অবস্থান করে এবং মস্তিষ্কের ধ্বংসের সহিত অদৃশ্য হইয়া যায়। এতদ্‌সম্পর্কীয় যুক্তিসমূহের পশ্চাতে প্রায়শঃ একটা দ্যোতনাময় আকাঙ্ক্ষা অথবা ভিত্তিহীন বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে।

প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রণালীর উপর মানসপ্রক্রিয়া কি ভাবে নির্ভর করিতেছে এবং নিম্নতর জন্তুদের মন হইতে মানব-মন কি ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা যখন আমরা অবগত হই, তখন আমাদের দেহের বিনাশের পর আর কিছু জীবিত থাকিবে এইরূপে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়। মনকে আমরা বিশ্বের সহিত যে একত্বের সূত্রে গ্রথিত করিয়াছি, তাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কারসমূহের আলোকে চিন্তা করিব।

বস্তু এবং শক্তির অবিনাশিতা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত দুইটি প্রধান বিধি। বিধি দুইটি প্রধানতঃ বিশ্বের দুইটি বিভিন্ন আকৃতির সহিত সম্বন্ধবদ্ধ। অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে বিধি দুইটি প্রকৃতপক্ষে একই, কেবল প্রয়োগে বিভিন্ন; ইহাকে পদার্থের বিধি (law of substance) নামে অভিহিত করিয়াছি।

স্পিনোজা ও গ্যেটের পরিকল্পনা অনুসারে আমরা সমস্ত অস্তিত্বকে এরূপ এক মূলীভূত নিত্য পদার্থরূপে (fundamental and constant substance) কল্পনা করি, যাহার মধ্যে বস্তু এবং আত্মা দুইটি পৃথক্ আকৃতি বা গুণ হিসাবে অবস্থান করিতেছে। মনের মধ্যে যে শক্তিগুলি কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহা সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞান প্রকৃতির শক্তিসমূহকে যেমন একই মূলীভূত শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে, সমস্ত আকারের বস্তুসমূহকে তেমনই একই মূল আকারের বস্তু হইতে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের বর্তমান অনুসন্ধান-কার্যক্রমে এই মূলীভূত বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তথ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া এক অবিচ্ছিন্ন অজটিল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে; পরমাণুগুলি তাহারই ঘনতাসাধন ফলে উৎপন্ন। ঘনীভূত কেন্দ্রগুলি তারল্য বস্তুর আকার গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে তারল্য ইথর বেষ্টিয়া আছে। ঘনীভূত হওয়ার ফলে ইথরের উপর যে চাপ অথবা টান পড়িতেছে তাহাই সকল শক্তির উৎস। ইথর সংকোচ-প্রসার-ধর্মী জেলীর ন্যায় এরূপ এক পদার্থ যাহা পরমাণুতে বিভক্ত হয় নাই, পরন্তু মহাকাশের অনন্ত বিস্তার ব্যাপিয়া আছে। এই পদার্থটির মূল ও পরিণতির প্রশ্নের মধ্যে বিশ্বসম্পর্কীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যাটি নিহিত রহিয়াছে। সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা সকল সামগ্রীর মূলে একটা সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার নির্দেশ দিয়া থাকি, কিন্তু অভিব্যক্তির সিদ্ধান্ত এই ক্রিয়াকে সংযত করিয়াছে। বাইবেল-উক্ত সৃষ্টি বা Genesis-এর বিবরণ অথবা কুভিয়েরের catastrophic theory-র ন্যায় বহুসংখ্যক অবান্তর সৃষ্টি-প্রক্রিয়াবলীতে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এক্ষণে বিশ্বাস করেন না। কেহ কেহ অজৈবজগৎ ও জীবজগতের উৎপত্তির নিমিত্ত পৃথক্ সৃষ্টি-ক্রিয়া আরোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের উপাদানসমূহের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি মাত্র সৃষ্টিক্রিয়া নির্দেশ করার প্রয়াস চলিতেছে। তদনুসারে একই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিপ্রণালী

ফলে মন, প্রাণ ও বিশ্বের যাবতীয় উপাদানের উৎপত্তি হইয়াছে। অতিপ্রাকৃত ধারণার সমর্থক নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের সৃষ্টি আমাদের জগদ্‌তত্ত্বে স্বীকৃত হয় না। পদার্থের বিধি অনুসারে বস্তু এবং গতি কখনও সৃষ্ট অথবা ধ্বংস হয় না; জগতের অভিব্যক্তি বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্ত উক্তিই এ-কথার সমর্থন করে। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনন্ত পদার্থের শাশ্বত অভিব্যক্তি-ধারার নির্দেশ দেয়। আদিম পদার্থ ঘনীভূত হইয়া বস্তু এবং শক্তির উৎপত্তি হয়। অতঃপর ভারবিশিষ্ট বস্তু পুঞ্জীভূত হইয়া নীহারিকা উৎপন্ন হয়, নীহারিকা জমাট বাঁধিয়া সূর্য্য ও তারকা গঠিত হয় এবং তাহা হইতে গ্রহাদি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গ্রহ যথেষ্ট শীতল হইলে তাহার উপর জল সঞ্চিত হয় এবং জলমধ্যে আদিম প্রাণ প্রকাশিত হয়।

প্রাণের প্রণালীসমূহকে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক শক্তি অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিজ্ঞান প্রাণের স্বতঃজনন সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। শারীর-বিধান-সম্পর্কীয় রসায়ন-তত্ত্ব প্রাণপদার্থকে প্রকৃতির সাধারণ মৌলিকসমূহে পর্য্যবসিত করিয়াছে এবং অদ্ভুত সম্মেলন-ধর্ম্মশীল 'কার্ব্বন্'কে প্রাণের প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির প্রধান মৌলিক বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছে। যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বা বস্তু ও শক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্যমূলক অথবা রচনাকৌশলমূলক প্রাচীন ধারণাকে অপসারিত করিয়াছে। যন্ত্রের মধ্যে যে অর্থে উদ্দেশ্য আছে বলা চলে, কেবল সেই অর্থে জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে উদ্দেশ্য আছে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাহার মধ্যে কোনও অদ্ভুত vital force বা প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে এরূপ বলা চলে না।

অতএব অবশেষে আমরা বিশ্বের শেষ সমস্যায় উপনীত হইলাম; সমস্যাটি জগৎ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ক। উচ্চস্তরের ধর্ম্মগুলি নানাধরণের বহুঈশ্বরবাদ হইতে একেশ্বর-বাদে পৌছিয়াছে। উচ্চস্তরের ধর্ম্মে ঈশ্বরকে বিশুদ্ধ চৈতন্য-রূপে (pure spirit) ধারণা করা হয়; কিন্তু তাঁহার ক্রিয়া-বলীতে এখনও নরত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে।

সর্ব্বেশ্বরবাদ অথবা অদ্বৈতবাদ জগৎ হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহা সকল সামগ্রীর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণের ভিতর এই ধারণার সূত্রপাত হয়; গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যে ইহা বহুল প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক কালে স্পিনোজা ও গোটের মধ্যে ইহা চমৎকার প্রকাশভঙ্গী পাইয়াছে। ইহার সহিত আমাদের অদ্বৈতবাদের সর্ব্বাংশে মিল আছে। নাস্তিক্যবাদ ইহারই নেতিমূলক দিক্। সোপেন্‌হাওয়ারের উক্তি অনুসারে "সর্ব্বেশ্বর বাদ, শিষ্ট আকারের নাস্তিক্যবাদ।"

৪

সত্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাই সমস্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বহির্জ্জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর যে ছাপ প্রদান করে, এই জ্ঞান চরমে তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ। লকের ভাষায় "ইন্দ্রিয়ে প্রথমে যাহা ছিল না, এমন কিছুই বুদ্ধিতে থাকিতে পারে না।" কিন্তু আমাদের দোষযুক্ত ইন্দ্রিয় যন্ত্রসমূহের ভিতর দিয়া বাহ্য জগতের যে অসম্পূর্ণ জ্ঞান আমরা আহরণ করি, চিন্তক তাহাতে তৃপ্ত থাকেন না। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছাপগুলিকে ভাবের আকারে গঠিত করেন এবং এই জ্ঞানের অন্তর্বর্ত্তী ফাঁকগুলি তিনি যাহা দ্বারা পূরণ করেন, তাহাকে বিস্তৃত অর্থে বিশ্বাস (faith) বলা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত (theory) ও পূর্ব্ব-পরিকল্পনা (hypothesis) আকারে এই বিশ্বাসের ব্যবহার ব্যতিরেকে বিজ্ঞান অগ্রসর হইতে পারে না।

অবশ্য বিশ্বাস শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ এমন অদ্ভুত অথবা অতিপ্রাকৃত কিছুতে আস্থা স্থাপন বুঝায়, যাহা সুপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিধির ব্যতিক্রম করে। ইহা সর্ব্বদাই মানুষীভাব আরোপকারী (anthropomorphic) এবং ক্রমাগত পরি-বর্ত্তনশীল; এতদ্দ্বারা অতীতে অপরিমেয় হিংস্রতা ও রক্তপাত ঘটিয়াছে। কেবলমাত্র নিরপেক্ষ ও ধীরভাবে প্রকৃতির অনুধ্যান দ্বারা সত্য তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে।

অদ্বৈতবাদ ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিলনসূত্র স্বরূপ। এতদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন হইবে। আমাদের যুক্তিপূর্ণ দাবী ও চিত্তবৃত্তির নৈতিক আকাঙ্ক্ষা উভয়কেই ইহা পরিতৃপ্ত করে।

জার্ম্মানীতে প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পার-স্পরিক বিরুদ্ধাচারিতা যে তিক্ততা বহন করিয়াছে, তাহা

ধর্ম্মে মিথ্যা সারবত্তা আরোপের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের এরূপ শান্তিময় ও প্রগতিশীল ধর্ম্ম প্রয়োজন, যাহা প্রকৃতির পর্য্যালোচনা ও সদ্গুণের অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সদাচরণের অদ্বৈতবাদী আদর্শ বিশুদ্ধ খৃষ্টধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে যে কঠোর আত্মপীড়ন ও সৌন্দর্য্যকে অবজ্ঞা করার ভাব দেখা যায়, তাহার সহিত আমাদের মতানৈক্য আছে। অদ্বৈতবাদীর ধর্ম্ম হইতেছে সত্য, শিব ও সৌন্দর্য্যের অনুশীলন। তাহার উপাসনা-মন্দির সমগ্র মহান প্রকৃতির সমব্যাপী।

অদ্বৈতবাদীর নিকট নৈতিক জগৎ জড়জগৎ হইতে পৃথক্ নহে। উভয়ে একই সদ্বস্তুর বিভিন্নরূপ। জন্তুদের সামাজিক সহজসংস্কারের (instinct) মধ্যে আমরা নৈতিক বোধের আরম্ভ দেখিতে পাই। হার্বার্ট স্পেনসর অভিব্যক্তিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া অদ্বৈতবাদী নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকালে ইহাই দেখাইয়াছেন।

এই উপায়ে আমরা স্বার্থকামী ও পরহিতব্রতী দাবীর মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে পারি—নীতি-শাস্ত্রে প্রায়শঃ ইহাদের পরস্পর-বিরোধী ভ্রমে স্থাপন করা হইয়া থাকে। সামাজিক সহজসংস্কারগুলি আমাদিগকে মুখ্যভাবে এই সারনীতিতে লইয়া আসে—"তোমার প্রতিবাসীকে আত্মজ্ঞানে ভাল বাসিবে।" এই নীতি খৃষ্টেরও পূর্ব্বে চীনা ও গ্রীকগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

আমাদের কঠোর আত্মনিপীড়ন পরিহার করিতে হইবে, প্রাণীদিগের প্রতি সদয় আচরণে প্রণোদিত হইতে হইবে, ইহজীবনকে আনন্দোজ্জ্বল করিবার সন্ধান করিতে হইবে, পরিবারকে সমাজের ভিত্তিরূপে পোষণ করিতে হইবে এবং শিক্ষার উন্নতির প্রতি অধিকতর উদ্যোগী হইতে হইবে।

একটি সর্ব্বব্যাপক রহস্য অমীমাংসিত রহিল, তাহা পদার্থের প্রকৃতির রহস্য। বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক যাহাকে প্রকৃতি কিংবা বিশ্ব বলিয়া থাকেন, ভাববাদী দার্শনিক যাহাকে পদার্থ অথবা ভাবলোক বলিয়া থাকেন, ভক্ত বিশ্বাসী যাহাকে স্রষ্টা অথবা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, সেই বিরাট বিস্ময়কর জগতের প্রকৃত স্বভাব কি? আমরা একথা স্বীকার করি যে, পদার্থের অন্তরতম প্রকৃতি এখনও অভেদ্য হইয়াছে। কিন্তু এই আদর্শ অপচ্ছায়ার নিমিত্ত বিষাদে পরিত্যাগ করিয়া আমরা বরং আমাদের কৃত উন্নতিতে আনন্দিত হইব। সম্ভবতঃ বিংশ-শতাব্দী আমাদের এই বহুকালাকাঙ্ক্ষিত বিশ্বের ধারণার ঐক্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইবে।

অণু ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান

...পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নির্ম্মিত কৃত্রিম পদার্থের মধ্যে 'অণু'র সন্ধান করিতে থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত অণুকে সর্ব্বতোভাবে বুঝা তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইবে না। 'অণু'কে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে কৃত্রিম পদার্থ ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিতে ও তাহাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। 'টেষ্ট টিউব' ছাড়িয়া দিয়া স্বকীয় অন্তর বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি ও অভিনিবেশ জাগ্রত না হইলে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। যতদিন 'টেষ্ট টিউব', 'মাইক্রস্কোপ' ও 'টেলিস্কোপ' প্রভৃতি লইয়া বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবার মূঢ়তা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত বিজ্ঞান কুজ্ঝটিকাময় হইয়া থাকিবে এবং নানা রকমে মোহমুগ্ধ মানুষগুলির বিস্ময় উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।...

মুক্তি

—শ্রীসুশীলকুমার দত্ত

দুধ খেতে পাওয়া ভাগ্যের কথা ; আবার এমনও আছে, যাকে দুধ খাওয়ান মস্ত একটা সমস্যা ; সেই ছেলে মুক্তি। মুক্তির ছোট দুটী ভাই আছে, ছিটু ও পিটু ; তাদের স্বভাব কিন্তু তার মত নয়, বরং বলা চলে ঠিক তার বিপরীত।

ছিটু-পিটুর বেয়াড়া রকম খাবার তাগিদে সুজাতা সকাল থেকে ব্যতিব্যস্ত। দাসী দুর্গা ওরফে দুগী তাই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মুক্তির দুধ নিয়ে বার-বাড়ীতে এসে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল মাষ্টারবাবুর বের হওয়ার অপেক্ষায়। দুর্গা সহর থেকে আনা ভদ্রঘরের মেয়ে। তার একটী ছেলে ছিল; দাসীবৃত্তি নেওয়ার পূর্ব্বেকার সুদিনের সঙ্গে সেটীও গেছে।

মাষ্টারমশাই চলে যেতেই সে ঘরে ঢুকে মুক্তিকে সতর্ক ক'রে বললে, "আজ আর হাঙ্গামা ক'রো না ; মা ছিটু-পিটুর বায়নায় জ্বালাতন হ'য়ে আছেন। চুপ-চাপ খেয়ে নাও।"

খেয়েছে সে অনেক দিন। তার অধিকাংশই অবশ্য প্রহারের সঙ্গে ; কিন্তু খাওয়ার ফল যে কি তা' আজ পর্য্যন্ত তার চোখে পড়ল না। কাল-পরশু সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এবং যদিও পরে মায়ের রুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে চোখকাণ বুজে গিলেছে, তবু মনে আশা ছিল, এখনকার মত এটাকে সে এড়িয়ে যাবে। উপরন্তু সুজাতার সেই মুখচ্ছবির ইঙ্গিতে সে দুগীর ওপর হাড়ে হাড়ে জ্বলে গেল। বইগুলি গুছিয়ে রাখার ছলে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সরোষে বললে, "মা যদি এখন রোজ রোজ জ্বালাতন হয়, তা' বলে কি আমাকেও রোজ রোজ খেতে হবে না কি ?"

বস্তুতঃ কথাটা তাই। মতিবাবু সকালে চোখে-মুখে কোন রকমে চারটী গুঁজেই তাঁর অন্নদাতার কি হচ্ছে ভাবতে ভাবতে সহরের দিকে ছোটেন। চাকরি বজায় ক'রে সেখান থেকে ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা হ'য়ে যায়। ছুটীর দিন অল্প। তাও তাঁর অফিসের কাজেই কাটে,—সেখানে সময়ে কুলিয়ে ওঠে না বলে বাড়ীতে খাতাপত্র এনে সে' কাজ সুসম্পন্ন করেন। স্বামী যার চাকরি নিয়ে এমনি ব্যস্ত তার পক্ষে অগোছাল হওয়া একটা অভিশাপ। স্বেচ্ছায় সেরূপ অভিশপ্ত জীবনের পক্ষপাতী আর যেই হোক্ সুজাতা নন। সুতরাং সংসারের সকল দিক্ তাঁকে দেখে চলতে হয়, ছেলেদের দুধ খাওয়ান থেকে গরুকে জাব দেওয়া পর্য্যন্ত। অতএব বাবা-বাছা করে খাওয়াবার মত সময় নেই তাঁর।

তেমন অপর্যাপ্ত সময় সংসারী মানুষের খুব অল্পই থাকে ; দুগীরও নেই। তবু সে তাকে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে চলে ; সেই আশায় মৌন ছিল। কিন্তু মুক্তির অদৃষ্টে তা' সইল না। মুক্তি আপন মনে গজগজ করে দুধের বাটীতে চুমুক দিতেই সর সমেত বিকৃত মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বমির ওয়াক-ওয়াক শব্দে ও হেঁচে-কেসে এমনি সোরগোল পাকিয়ে তুলল যে, বদ্ধ কালা ব্যতীত ভিতর-বাড়ীতে শুনতে কারও বাকী থাকে না।

শুনে সুজাতা এসে হাজির হলেন। ব্যাপার দেখে সশঙ্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও যে সর মোটেই খেতে পারে না দুগী ! এ ত তোর না জানবার কথা নয় ?"

"জানি। এই দেখ না বাটী ; সর কোথায় ? সবটাই তুলে রেখে এসেছি। একটুখানি—ছিঁটেফোঁটা কোথায় যে লেগেছিল চোখে পড়েনি।"

কথা সত্য কিন্তু মুক্তি এই সঙ্কট থেকে রেহাই পাবার আশায় কণ্ঠকে ছাপিয়ে মহা কলরবে বলতে লাগল, "না মা, একটু নয় ; এতখানি, এতখানি মা, এতখানি।"

তার হাতে দেখানর পরিমাপটা দুধের বাটীর তিনগুণ। সুতরাং বিশ্বাস করার কথা নয় ; সুজাতাও করিলেন না, মুখে লাগা সরের কুচিটা আঙুলের ডগায় নিয়ে বললেন, "এইত এতটুকু, এখানে নর্দ্দমাও নেই আবর্জ্জনাও নেই, আর কোথায় ?"

"আর সব আমি গিলে ফেলেছি।"

"হাঁ—গিলে ফেলবার ছেলে তুমিই বটে।" কথাটার কানায়-কানায় অবিশ্বাস। তিনি আরও বললেন, "সবটাই যদি গিলে ফেলতে পারলে, তবে এইটুকুর জন্যে এত হাঙ্গামা

কেন? তোর বয়স পেরিয়ে আমি আমার বয়সে পৌঁছেছি, বুঝলি? আমাকে ভুল বোঝাতে চাসনে। নে, দুধটা খেয়ে নে; আমি দেখে যাই।"

অন্যদিন হলে হয়ত এমন মিথ্যা ধরা পড়ার পরেই ভয়ে মুক্তি দুধটা নিঃশেষ করে পালিয়ে যেত। কিন্তু যে বাটিতে একবার সব বেরিয়েছে তা'তে আবার চুমুক দেওয়া তার সব ভাবনার বাইরে। সে মিনতি জানিয়ে বলল, "ওটায় নয় মা, তুমি অন্য বাটিতে অন্য দুধ দাও; আমি কিছু বলব না, চোখকাণ বুজে খেয়ে নেব, ওটা আমি কিছুতেই খেতে পারব না; ও' ছিটু-পিটুর জন্যে থাক।"

তারপর সুজাতা তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে যত বলেন, "দুধ ভাল জিনিষ, সর তার চেয়েও ভাল; এমনই কি গোঁ—ওই দুধ তুই খাবি না!" মুক্তি ততই ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, "ওটা নয় মা, অন্য বাটি করে অন্য দুধ দাও; 'ও' দুধ খেলেই আমার বমি হয়ে যাবে।"

অবশেষে প্রহার এবং প্রহারের পর দুধ, দুই-ই খেতে বাধ্য হল সে। এবার চুমুক দিতেই তাড়াতাড়িতে বিষম খেয়ে হেঁচে-কেসে চোখমুখ রাঙা করে যা বাধিয়ে বসল তা দেখে নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, এই না খাওয়াটা তার ইচ্ছাকৃত নয়। দুগী বলতে গেল, "ও যখন পারবেই না, তখন মিথ্যে জোর করে খাইয়ে—"

"তুই থাম দুগী। এই বয়সে ওর এমনই কি গোঁ যে, সেই গোঁ-টাকেই বজায় করতে হবে? এর কুফল যে কি তাও ত তোর না জানবার কথা নয়?" ব'লেই তিনি চ'লে গেলেন। যাওয়ার ভঙ্গিতে যেন এই ভাবটাই বেশীর ভাগে প্রকাশ পেল, তার বাধা দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও।

অথচ এই দোষের ভয়েই সে এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুঝি একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। মুক্তির ফুলে ফুলে কান্না দেখে তারও চোখে জল এল। কারণ তার এ স্থানটা বড় দুর্ব্বল। কিন্তু সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের প্রতিবাদটুকুও চলে না; চালানো আর এক প্রকার ভয়ের কারণ। তাই সে আরও খানিক্ষণ স্তব্ধ থেকে যেন দোরটাকে উদ্দেশ করে বললে, "আপনি দু-তিন ছেলের মা হয়ে নিজের জিদ্ বজায় করতে পারলেন, আর ও' পাবে না! তারপর সস্নেহে মুক্তির চোখ-মুখ মুছে দেওয়ার সময় সে হাজার চেষ্টাতেও মনে মনে না বলে পারল না, "ঈশ্বর, তুমি এমন মমতাকে ছেড়ে দাও কেন, কেনই বা আমার কাছ থেকে তাকে তুমি কেড়ে নিলে?"

মুক্তির কান্না তখন দ্বিগুণ হারে বেড়ে গেল।

২

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। বিড়ালের বিস্মরণ সম্বন্ধে যেমন জনশ্রুতি আছে, তাকে যতই মারধর কর না কেন, আড়াই পা যেতে না যেতে সে সব ভুলে যায়; তেমনি মুক্তি। তার জীবনে এটা নতুন কিছু নয়। ধাত-সওয়া হয়ে গেছে।

তার পাঁচ দিন পরে এল এক শনিবার। শনিবারে মধ্যাহ্নে ছুটী। ছুটীর পর সে এবং তার সহপাঠীরা জৈষ্ঠের নিস্তব্ধ দুপুরকে কল-কোলাহলে মুখরিত করে বাড়ী ফিরছে। দলের মাঝ থেকে একজন বলে উঠল, "মুখুজ্জেদের আমবাগানে মালী নেই। নুন, লঙ্কা, সরষে আর কাঁচা আম বেটে কলাপাতায় নিয়ে—"

বাকীটা আর বলতে হল না। প্রায় সকলের পক্ষেই জিভের জল সংবরণ করা বেশ কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু সত্য খবরটা তাদের জানা ছিল না; মুক্তি বলল, "মালী এসেছে; আমি কাল দেখে এসেছি।"

স্বচক্ষে দেখার বড় প্রমাণ নেই। জলন্ত প্রদীপটা দমকা হাওয়ায় যেন নিবে গেল। এর কারণ কাঁচা আম ছেঁচে খাওয়ার রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য যত না হোক তার চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয় মাতামাতিটা। এমন যে একটা দুপুর, একে কি ব্যর্থ হতে দেওয়া যায়? এই এক প্রশ্ন প্রত্যেকটি মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই ছেলেটিই আবার একটা প্রস্তাব পেশ করল, "মাঠে-ভাত লাগালে কেমন হয়?"

প্রদীপশিখা এবার জ্বলে উঠল, বহুগুণ তেজে। চাল-মশলা সংগ্রহের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ঝ'গড়া ঝগড়া অবশ্য কিছু রইল কিন্তু তা' আর তাকে নিবতে পারল না। কাট ছাঁটের পর এই প্রস্তাব পাশ হল যে, গ্রামের সীমানায় বুড়ো বটগাছের ছায়ায় লুচি ও আলুর দম হবে এবং শেষে মিষ্টিমুখ করবার জন্যে হবে পায়েস।

পায়েসের দুধ যোগাবার ভার নিয়ে মুক্তি বাড়ী ফিরে দেখলে, তার অনুমানই ঠিক। চাবি-দেওয়া রান্নাঘরের দুয়ারে গরম উনুনের উপর জালতি-ঢাকা দুধের কড়া বসান রয়েছে। বড়-ঘরে ঘুমন্ত ছিটু-পিটুর পাশে তার মাও অন্য-দিনের মত একবার গড়িয়ে নিচ্ছেন। দুগী তাকে দোর খুলে দিয়ে তাঁর পায়ের দিকে খাগ্গা ক'রে নিলে। দুগীর ঘুমানর অপেক্ষায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে একটা বড় বাটীতে দুধ নিয়ে পালাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই মায়ের সঙ্গে হয়ে গেল মুখোমুখি। ভয়ে তার মুখখানা হ'য়ে গেল ফ্যাকাশে।

ঘুমন্ত পিটুর হাত-পা ছোঁড়ার জ্বালায় প্রায়ই তাঁর ঘুম হয় না, আজও হয় নি; তিনি চক্ষু বুজে প'ড়েছিলেন। খুট-খাট্ আওয়াজ পেয়ে ভেবেছিলেন, দুধের কাছে কুকুর এসেছে। শুধালেন, "অত দুধ কি হবে?"

"খাব আর চড়ুই-ভাতির জন্যে—"

"সকালে তুই খাস নি?"

তাঁর কণ্ঠস্বর রুক্ষ; তাকে খেতেও তিনি দেখেছেন—সুতরাং অস্বীকার করবারও উপায় নেই। মুক্তি বলল, "হাঁ, খেয়েছি; এখন আবার খাব। একবার খেলে আর খেতে নেই বুঝি?"

"দাঁড়া, খাওয়াচ্ছি।" বলে তিনি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

বেগতিক দেখে মুক্তি সাবধানে বাটিটা নামিয়ে রাখছিল। অতর্কিতে সর-তোলা কঞ্চিটা সজোরে তার পিঠের ওপর পড়তেই সে কুকুরের মতই তীব্র একটা আর্তনাদ তুলে পালিয়ে গেল।

এ শব্দে আর যা-ই হোক ঘুম হয় না। প্রায় ছুটে এসে হাজির হল দুগী। পলায়মান মুক্তি ও দুধ-মাখা উপুড়-করা বাটী দেখে সে বলল, "ওর দুধ-খাবার বাটীর চেয়ে এটা অনেক বড়। এতখানি দুধ সে যে খায় না বা খেতে পারে না, তা'তে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল?"

"চড়ুই-ভাতির জন্যে! বাঁদর বললে কি না, 'চড়ুই-ভাতির জন্যে নিয়ে যাব আর খাব'। আজকাল মুক্তি বড় মিথ্যেবাদী হ'য়েছে; খবরদার ওকে আস্কারা দিসনে।" ব'লে তিনি দুধের কড়া ঘরে ঢুকিয়ে রাখবার জন্যে রান্নাঘরের তালা খুলতে লাগলেন।

পাড়ায় মুক্তির সত্যবাদিতার সুনাম আছে। দুধ দেখে সে ভেবেছিল, ঘণ্টা দুই পরে তার খাবার সময়। ওখানে রান্না ক'রে খেতে কোন না চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে? এখানে কেউ জেগে উঠলে নিয়ে যাওয়া হবে না; সুতরাং যাওয়ার পথে চুমুক দেওয়াই শ্রেয়। দুগী বলল, "আপনি কেবল তার মিথ্যেটাই দেখতে পান; আর কিছুই আপনার চোখে পড়ে না। খিদের জ্বালায় মানুষ অখাদ্যও খায়; খাবার ইচ্ছে না থাকলে সে খাবে আর নিয়ে যাবে দুই-ই বলবে কেন?"

"আমাকে ভুল বোঝাবার জন্য।"

"আপনি ওই গরবেই গেলেন। গাছের গোড়া কেটে মাটি চাপা দিলে কি গাছ মরে? মরে না। মারতে হ'লে মাটী খুঁড়ে শেকড় তুলতে হয়।"

তার বক্তব্য বেশ স্পষ্ট। কিন্তু সুজাতা সেদিকে একবার কর্ণপাতও করলেন না। তিনি বললেন, "আমার শীলে ব'সে, আমার নোড়া দিয়ে, তুই আমারই দাঁত ভাঙবি এত বড় তোর স্পর্দ্ধা! ছেলে-মেয়ে মা-বাপকে ভয় করবে না, এ আবার কোন্-দেশী কথা! তোমার সহরের বাহাল্লি সহরে গিয়ে ক'রো বাপু, এখানে ওসব বাহাল্লিপনা চলবে না।" বলেই তিনি সদ্যখোলা তালা-চাবি আছড়ে ফেলে বড়ঘরের দিকে চ'লে গেলেন, সেখানে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ছিটু-পিটু কাঁদছে।

তাঁর আগে দুগী পা বাড়িয়েছিল তাদের কাছে যাবার জন্যে। ইঙ্গিতের রূঢ়তায় তার মুখটা যেন ঝলসে গেল। এখন আর কোন দিক্ দিয়ে বোঝাবার উপায় রইল না, তাঁরই সম্মুখে মতিবাবুর জোর ক'রে দেওয়া মাইনে ফেরৎ দিয়ে সে এক-সময় বলেছিল, যে হাতে সে টাকা নেবে তার সেই হাত কিছুতেই থাকবে না, পুড়ে যাবে; পোড়ার যন্ত্রণা সে সইতে পারবে না।

৩

মুক্তি পালিয়ে যাওয়ার পর সদরে সেইমাত্র খিল পড়েছে, তখনো তার খাবার সময় হয়নি; বাইরে থেকে ডাক এল, "বন্ধু!"

এই ডাক এ বাড়ীর পরিচিত; সে সত্য—তার সহপাঠী, বয়সে কিছু বড়। মেয়েদের সই পাতানোর মত তারা 'বন্ধু' পাতিয়েছে, বন্ধুত্বের আকর্ষণে নয়। বুড়ো বটগাছের হাওয়ায় তাদের দলটী অপেক্ষায় অধৈর্য্য হয়ে তাকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে। সুজাতা গম্ভীর মুখ কালো ক'রে জবাব দিলেন, "মুক্তি বাড়ী নেই।"

বাড়ীতে সে সব সময় থাকে না, থাকবার কথাও নয়। সত্যর কর্ত্তব্য স্থির না হ'তে দুর্গী এসে দোর খুলে, তাকে ডেকে বলল, "মায়ের কাছে মার খেয়ে সে পালিয়েছে; সেদিনকার মত তোমাদের বাড়ীতে যায়নি? তবে গেল কোথায়?"

সেদিন অনুরূপ এক পলায়নের পর মুক্তি সত্যদের বাড়িতে গিয়ে ক্ষুন্নিবারণ করেছিল। সত্য বললে, "তা জানি না। মাঠে আমাদের এক ভোজ হচ্ছে, আমি সেখান থেকে আসছি।" কিন্তু দুধের অভাবে এমন একটা ভোজ মাটী হ'তে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়; খুলে বললে তার মা নিশ্চয় বুঝবেন সুতরাং সেই দুধ নিয়ে যাবে এবং যাবেও এই পথে। সে আরও ব'লে গেল, "আচ্ছা, আমি বাড়ী থেকে খবর নিয়ে ব'লে যাচ্ছি।"

বাড়ী তার দূরে নয়; দেরীও বেশী হল না। দুধ-ভর্ত্তি বাটী হাতে হাজির হ'য়ে সে বলল, "মুক্তি আমাদের বাড়ীতেই গিয়েছিল, গিয়ে মায়ের কাছে খাবার চেয়েছিল। কিন্তু মা তার পিঠের দাগ দেখে এবার খেতে দিতে সাহস করেন নি।"

সেবার তাকে খেতে দিয়ে তার শাস্তিটাকে ব্যর্থ করার অপরাধে সুজাতার বিকৃত মুখে বলা, "দরদ-উলী আমার," সম্বোধনটা মোটেই শ্রুতিমধুর ছিল না। এবং যেহেতু মায়ের অপরাধে ছেলের আয়ুষ্কালকে সংক্ষেপ করার দুর্নীতি তাঁদের নারী-সমাজে দুর্লভ নয়, তাই সত্যর মাকে তা' নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, সত্য তাঁর একমাত্র সন্তান।

সত্য মাঠের দিকে চ'লে গেল। কিন্তু তার হাতের দুধপূর্ণ পাত্রের দিকে চেয়ে দুর্গীর উদ্গত অশ্রু কিছুতেই আর বাধা মানল না। বাড়ীতে যার দুধ রোচে না; আহারকে এড়িয়ে চলা যার স্বভাব, সেই মুক্তি কি না খিদের জ্বালায় মুখ ফুটে চেয়েছিল! এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক আর কি হতে পারে!

৪

খাবার ইচ্ছায় বাধা না পেলে সে কতখানি খেতে পারত তা' যদিও সঠিকভাবে বলা যায় না, তবুও তার পেটে কিছু যে পড়ত তা'তে সন্দেহ নাই। নইলে সে সত্যদের বাড়ীতে যেত না। সেখানেও কিছু বাধা পেয়ে তার মনকে সরাসরি ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাঠ-ভোজের দিকে। কিন্তু দুধ যোগানোর অক্ষমতার লজ্জা বড় কম নয়! সে কি ক'রে মুখ দেখাবে তাদের কাছে? অতএব নিরুদ্দেশের যাত্রী হবে সে। হয়েও ছিল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্য্যন্ত। তখন নিরুপায় হ'য়ে হঠাৎ স্থির ক'রে ফেললে, তার ভাগ্যে যত শাস্তিই থাক, মায়ের দুর্ব্যবহারের কথা বাবাকে সে জানাবে। তিনিও যদি অবিচার করেন, তাহ'লে, কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তার সত্যকার নিরুদ্দেশের যাত্রা হবে সুরু।

তার এই দুঃসাহসের মূলেও সেই সুজাতা। পূর্ব্বে ছেলেদের কান্নায়, বায়নায়, অথবা অব্যবস্থার গোলমালে বিচলিত হ'য়ে হাতের খাতা ফেলে প্রায়ই মন্তিবাবু সংসারের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে আসতেন আর তার ফলে, খাতার ভুলের জন্ম অফিসে একদিন কিছু টাকা দণ্ড দিতে হল। তার ফলে বাড়ীতে সুজাতার এই আদেশ জারি হয়েছিল যে তাঁকে কোন কাজে কেউ বিরক্ত করবে না; এমন কি তিনি না ডাকলে ছেলেরাও যেন তাঁর কাছে না যায়। শুনে সহসা মনে হয়, রাগে বলা মন্তিবাবু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; তিনিও ভেবেছিলেন তাই। পরে দেখলেন, সেটা স্বভাব। ক্রোধকে মিষ্টি কথায় মুছে নেওয়া যায় কিন্তু মরতে বসলেও যে মানুষের স্বভাব যায় না। তবু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে লঘু অপরাধের গুরু দণ্ডটা গুরুতর-র কোঠায় গিয়ে পৌঁছত। অগত্যা তাঁকে নীরব হ'তে হয়েছে।

তিনি জল খেয়ে সুস্থির হ'য়ে সন্ধ্যার পর বার-বাড়ীতে খাতা নিয়ে বসেছিলেন, তন্ময় হ'য়ে পড়েছেন; এমন সময় মুক্তি সটান তাঁর সম্মুখে এসেই ফর-ফর ক'রে এক নিঃশ্বাসে কি যে সব ব'লে গেল, বুঝতে না পেরে কলম রেখে সোজা হ'য়ে বসলেন, বললেন, "স্পষ্ট ক'রে বল, কি বলছিস।"

বাইরে পদশব্দ শুনে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হ'য়ে সে তখন

দরজার দিকে ঘন-ঘন তাকাচ্ছিল। ভয়ে ভাবনায় কেঁদে ফেলে সে সংক্ষেপে শুধু বলতে পারল, "দুধ না খেলে মা মারে, আবার চাইলেও মারে।"

"খেলেও মারে আবার না খেলেও মারে?"

দ্রুতপদে প্রবেশ করল দুগী; বলল, "হাঁ, ঠিক তাই।" তার বাপের বাড়ীতে মতিবাবুর সহযোগীর দাসী এক কালে কাজ করত। তার বিয়েও হয়েছিল সেই দাসীর ঘটকালিতে এবং সেই সহরেই; ঘটকালিতে পাপ ছিল না, তাই সুদিনে সে যেমন হাত পেতেছিল তেমনি দুর্দ্দিনে তার দুরবস্থাও ব'লে বেড়িয়েছিল। সেই সূত্রে তার এ বাড়ীতে আসা। আসবার পূর্ব্বে সে কখনও ভাবতে পারে নি, অপরের সংসারে এমনি-ভাবে জড়িয়ে পড়বে, নইলে সকল কাজের মধ্যে থেকেও মনটা মুক্তির জন্য এরূপ উদ্গ্রীব হ'য়ে থাকত না। দুগী আরও বললে, "আমাকে দাসী রাখবেন ব'লে এনে আপনি মেয়ের মত রেখেছেন; এ ভোলবার কথা নয়, ভুলতেও কোনদিন পারব না। কিন্তু আর না, আপনি কাল আফিস যাবার সময় দয়া ক'রে আমাকেও নিয়ে গিয়ে সহরে পৌঁছে দেবেন; যা হোক ব্যবস্থা একটা দেখে নেব, এ সব আর আমি সইতে পারি না।"

"এ সব মানে?"

"এই ছেলেদের প্রহার করার কথা বলছি।"

প্রথম মাসের মাইনে দিতে গিয়ে তিনি তাকে চিনেছিলেন। তার সম্বন্ধে তাঁর সেই ধারণা আজকার অজ্ঞাত ঘটনায় আছে কি না জানবার ছলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু যে মারে সে ত তাদের মা?"

"সে আপনি জানেন; আমি জানি, সব মায়ের প্রকৃতি সমান নয়। অনেক সৎমা জননীকে ডিঙিয়ে যায়; এর 'মায়ে'র মা হবার যোগ্যতা নেই।"

শুনে অসীম বিস্ময়ে মতিবাবু স্তব্ধ হলেন। তাঁর ধারণাকে সে অনেকখানি ব্যবধান রেখে ডিঙিয়ে গেল। অপর দিকে, যে কারণটা তার মত মেয়েকে সুজাতার বিরুদ্ধে বড় বিশেষণ বসাতে বাধ্য করেছে সে'ও বড় কম নয়। খানিক পরে তিনি বললেন, "আমার মনে হয়, তোমার ধারণা হ'য়ে গেছে, মুক্তির মা ভাল মুখে শাসন করতে জানে না; কেমন তাই নয়?"

"হাঁ।"

এই 'হাঁ' বলার দৃঢ়তায় তিনি আবার থতমত খেয়ে চুপ করলেন। পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ধারণা ভুলও ত হ'তে পারে?"

দুগী বুঝতে পারল, তার চ'লে যাবার কথায় তিনি ব্যথা পেয়েছেন এবং সুজাতার স্বভাবকে সংযত করা সহজসাধ্য ব'লে তিনি তা' প্রত্যাহার করাতে চান। সে বলল, "আমারও ত চোখ আছে এবং এ বিষয়ে আপনার চেয়ে আমার দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় বেশী।"

অপরে যা দেখে খেতে দিয়ে দোষী হ'তে ভয় পেয়েছে, প্রমাণ হিসাবে সেটা নিশ্চয় কম নয়; মুক্তির পিঠের সেই দাগ দেখিয়ে সে আবার বলল, "আমি যা বলছি তার জলন্ত প্রমাণ এইখানে, এ সব কি সহ্য করা যায়? ছেলে-শাসন ব্যাপারে ভালমন্দ জ্ঞান থাকলে মা ছেলেকে কি এমন ভাবে ঠেঙাতে পারে?" প্রহারের জঘন্যতায় তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

কঞ্চির আঘাতে জামা ফুঁড়ে পিঠের ওপর দাগ হ'তে পারে এ জ্ঞান মুক্তির ছিল না। সত্যদের বাড়ীতে গিয়ে আঘাত-প্রাপ্ত জ্বালাপূর্ণ স্থানটা সে যখন জামা তুলে হাত বুলাচ্ছিল, তখন সত্যর মা তার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তা দেখে নিয়েছিলেন; তাকে জানান নি। আপন পিঠের অজ্ঞাত প্রহারচিহ্ন অন্যের দ্বারা উদ্ঘাটিত হওয়াটা মুক্তির চোখে যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের, বিশেষতঃ এইরূপ এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে। দুগীর ওপর তার প্রসন্নতার সীমা-পরিসীমা রইল না।

মতিবাবু কিন্তু তা' দেখবা মাত্র শিউরে উঠলেন; বললেন, "চল ত দেখি।"

তাদের নিয়ে তিনি বড়ঘরের দুয়ারে রাখা লণ্ঠনের আলোয় গিয়ে দাঁড়ালেন; ডাকলেন, "সুজাতা!"

সুজাতা ছিটু পিটুকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। বোধ হয় তাঁরও একটু তন্দ্রা এসেছিল; অন্ধকার কক্ষ থেকে উত্তর এল, "কি—কে?" সাড়া না পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন।

তখন মতিবাবু বললেন, "ছেলেদের নাওয়ান, খাওয়ান, এমন কি তাদের শাসনও দুগী করবে। কাল থেকে তুমি

ছেলেদের গায়ে হাত দেবে না, ছুঁতে পর্য্যন্ত পাবে না; বুঝলে ?"

বুঝতে কোনরূপ অসুবিধা অথবা বিলম্ব সুজাতার হবার কথা নয়; তবু একটু হ'তে পারত যদি না এমন খোলা-কথা শুনতেন। মুক্তির পর দুগীর ও তাঁর মুখপানে চেয়ে তিনি আরো গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "হাঁ, বুঝেছি।" ইতিপূর্ব্বে তিনি দুগীর নামে নালিশ জানিয়ে তাঁর কাছে কোন সাড়া পান নি। সেই ক্ষোভে গম্ভীর মুখ রাঙা ক'রে তিনি বললেন, "আমাকে না শুধিয়ে আমার কথা বিশ্বাস করতে তোমার বাধল না! তোমার কি একটু চক্ষুলজ্জাও নেই ?"

"না, নেই। তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।"

শুনে সুজাতার রাঙামুখ পরাজয়ের গ্লানিতে ক'লো হয়ে উঠল। পরমুহূর্ত্তে তিনি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে মুক্তির মুখে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলেন। চড়টা লাগল অস্থানে। সে টাল খেয়ে মাটীতে পড়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বার দুই আঁ-আঁ করে স্তব্ধ হল। অনেকটা এইরূপ এক ঘটনায় ফকির বাগ্দীর ছেলে অল্প বয়সে মদ্ ধরার অপরাধে ক্রুদ্ধ পিতার প্রহার খেয়ে পটল তুলেছিল। তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু কখনও কারও মূর্চ্ছা দেখা তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, যেমন মুক্তি সেদিন দেখতে পায় নি তার মুখে কতখানি সর লেগেছিল। তিনি সভয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ঢোক গিলে পুত্রের কঠিন দেহের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, "তোরা কেবল আমার মারটাই দেখলি দুগী, আর কিছু দেখতে পেলিনে! মুক্তি, ও মুক্তি! তুই আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলি বাবা! আমি তোকে মেরে ফেললুম, এ যে আমি ভাবতে পারিনে—"

এখানে বলা বোধহয় বাহুল্য নয় যে, তাঁর পুত্র হারানোর ভয় এবং মুক্তির সর গিলে ফেলার আতঙ্কের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। মূর্চ্ছিত মুক্তির মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র, স্পর্শ করে দেখার দরকার হল না, দুগী মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে বুক-সমান দুয়ার থেকে হতজ্ঞান হয়ে উঠানে পড়ে গেল।

৫

গোলমাল শুনে প্রতিবাসীরা এসে তাদের সাহায্যে দুগী ও মুক্তিকে শয্যায় তুলে মতিবাবু চোখে-মুখে জলের ঝাপটা এবং বাতাসের ব্যবস্থা করলেন। তাতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মুক্তির জ্ঞান ফিরল, কিন্তু সমস্ত রাতটা কেটে গেল তবু দুগীর মূর্চ্ছা ভাঙল না। তা দেখে তিনি পাঁচজনের কথায় আর স্থির থাকতে না পেরে রাজ্যের ডাক্তার ডেকে জড় করলেন। দেখে শুনে সকলেই একবাক্যে বলে গেলেন, "অন্তরে বড় বেশী ব্যথা পেয়েছে, উপরন্তু বুক-প্রমাণ উঁচু থেকে পড়ে গেছে; এ যাত্রা এর রক্ষা পাওয়া ভার।"

তখন তাঁর দেখাদেখি অনেকের চোখের কোল জলে ভরে গেল। তাঁরা বলাবলি করলেন, "আহা, মেয়েটা বড় ভাল।"—"আপন-পর জ্ঞান নেই; পরকে আপন করতে জানে।"—"ভারি বুকদার মেয়ে!" সুজাতাও কি তাই বললেন ? মুক্তি তার শয্যা ছেড়ে নড়তে চাইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে কয়েক জন বৃদ্ধা প্রতিবাসী বিভিন্ন কথায় যা জানালেন তার মর্ম্মার্থ এই যে, "দুগী এখন রুগী। রুগীর কাছে সারাক্ষণটা থাকলে স্বাস্থ্যলাভ অপেক্ষা মুক্তির অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেকগুণে বেশী: অনাত্মীয় একটা দাসীর জন্ত এত কেন ?"

উত্তরে কান্নার আবেগে অনুতপ্ত সুজাতার মুখে কথা ফুটল না, অশ্রু মুছে তিনি মনে মনে বললেন, দুগী মরে গেলে তাঁকে অশেষ পাপের ভাগী হতে হবে; তার ওপর সে যদি মুক্তিকে না দেখে মরে তা হলে তিনি সেই সীমাহীন পাপ থেকে কোন কালেও মুক্তি পাবেন না।

জবাব না পেয়ে সেই প্রশ্নটা কিছুক্ষণ এ দিকে-ওদিক ঘুরে অবশেষে বৃদ্ধদের মারফতে মতিবাবুর কাণে গিয়ে পৌছিল। তিনি সকাতরে বললেন, "আহা থাক,—ওকে হারানোর তুলনায় ওর শিয়র ছেড়ে মুক্তির নড়তে না-চাওয়াটা কিছুই নয়; মায়ের ওপর অভিমান করে মুক্তি এই দু-দিন যে শুধু দুধ খেয়ে আছে তা' জানি; আর জানি, মরণকালে জ্ঞান ফিরলে মুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দুগী অনেকখানি শান্তি পাবে নতুবা মরেও মুক্তি পাবে না—সে জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে।"

সিপাহী যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

দেশীয় রাজন্যবর্গ : কোম্পানী : জনসাধারণ

দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেককেই ষড়যন্ত্রকারীরা শত চেষ্টাতেও কোম্পানী বাহাদুরের বিরুদ্ধতা করাইতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বহু নৃপতির গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ-বিশেষ ভাবে সাহায্যদানের কথা সূর্য্যকুমারের ডায়েরীতে উল্লিখিত আছে :

"কাশীর রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ নানা মতে সাহায্যদানে সতত প্রস্তুত। কেবল কাশীতে নহে কাশীর বাহিরেও আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব সূত্রে যেখানে তাঁহার প্রভাব কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা সেখানেও কোম্পানীর পক্ষে তিনি নিশ্চেষ্ট নহেন।

"গোয়ালিয়রের হোল্কার-মহিষী রাজাবাই উজ্জয়িনীর বহু সৈন্য, পদাতিক ও অশ্বারোহীসহ আগরার দুর্গ রক্ষার্থ তথায় অবস্থিত। নিজ রাজ্যে প্রায় অর্দ্ধ কোটি সৈন্য সজাগ হইয়া আছে। প্রয়োজন হইলে তাহারাও কোম্পানীর স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে। ভরতপুরের রাজা বয়সে নবীন হইলেও সিংহ-বিক্রমে মথুরা রক্ষা করিতেছেন। জঙ্গ বাহাদুর (নেপাল রাজের প্রধান সেনাপতি) ষড়যন্ত্রকারীদের কেহ কোনও উপায়ে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সাধারণের চিত্তবিক্ষোভ জন্মাইতে কিছুতে না পারে, তন্নিবারণার্থ তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য পর্ব্বত-পাদমূলে সশস্ত্র ও সতর্ক অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন।

"অযোধ্যার রাজকুমার মানসিংহ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া জৌনপুরের নিকট ছাঁওনী বাঁধিয়া সতর্ক হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন।"

এই প্রকার অনেকানেক ব্যক্তির সাহায্যদানের উল্লেখ দিনলিপিতে আছে। সিপাহী-যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় চতুর্দ্দিক্ সামলান কোম্পানীর পক্ষে দায় হইয়া পড়িলেও এবং বহু-স্থলে তাহাদের অবস্থা অসামাল হইয়া দাঁড়াইলেও বন্ধুনৃপতি-গণের নৈরাশ্যের কোনও চিহ্ন দেখা যায় নাই। বিপদ্কালে এই বন্ধুত্ব, এই বিশ্বস্ততা অমূল্য। এই অবস্থায় কোম্পানীর পদস্থ ব্যক্তিগণের কাহারও কাহারও এবং শ্বেতাঙ্গ জন-সাধারণের প্রায় সকলেরই প্রত্যেক দেশীয়ের উপর ঘোর অবিশ্বাসের ভাব পোষণ ও তাহাদের সম্বন্ধে তদনুরূপ ব্যবহার করায়, মীর সাহেব ও নানাসাহেবের ন্যায় অনেক অনেককেই দেশবাসীকে উত্তেজিত করিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়, সূর্য্যকুমারের এই অভিমতের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

এই অভিমতের পোষকতা যদুনাথের 'তীর্থভ্রমণে' পাওয়া যায় এই ভাবে। কাশীর দশক্রোশ উত্তরে ডুবি নামে এক ক্ষুদ্র সহর, সহরে রঘুবংশী ক্ষত্রিয় প্রবল। দুষ্টের প্ররোচনায় ডুবি যুদ্ধ ঘোষণা করে। যাহারা যুদ্ধে ধৃত হইয়া বন্দী হয় তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সেই আদেশ সম্বন্ধে রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ কর্ত্তৃপক্ষকে জানান :

"ডুবির রণধৃত ব্যক্তিবর্গের প্রাণদণ্ড স্থগিদ হইলে ভাল হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছে সকলেই রঘুবংশী ক্ষত্রিয়। ইহারা জমিদার এবং আমার অমাত্য।"

জমিদারদিগকে কাশীরাজ জানাইলেন :

"আমার মানস সকলের সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়। * * * রাজার সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কেবল ধন-প্রাণ হানি আর সম্পূর্ণ ক্লেশ ভিন্ন অন্য কিছুমাত্র লাভ নাই। * * * * যদি ক্ষান্ত হইয়া উভয়ের মনোমিলন হয় তাহা হইলে ভাল হয়।"

কাশীরাজের চেষ্টায় জমিদারবর্গ এবং কোম্পানীর পক্ষে বারাণসীর জজ্ মিঃ গবিন্স্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং কমিশনার মিঃ টগরের মধ্যে মিলন-সভা আহুত হয়। কোম্পানীর মুখ-পাত্রেরা অপর পক্ষকে বলেন :

"তোমাদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তোমরা লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না। তোমাদের গৃহাদি দগ্ধ এবং দ্রব্যাদি সৈন্যগণে লুট ফেসাদ করিয়াছে। এজন্য তোমাদের মন দুঃখিত হইয়াছে। অতএব তোমাদের তিন বৎসর খাজনা মহকুপা করিয়া দিলাম।"

কোম্পানীর তরফের আন্তরিকতায় "বড় ফেসাদ" মিটিয়া যায়। জমীদারবর্গ কোম্পানীর বন্ধুদলের অন্তর্ভুক্ত হন। মিলন-উৎসবে কোম্পানী-পক্ষ জমীদারবর্গের পাগড়ীর মূল্য যথোপযুক্ত ভাবে দিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান দান করেন। অযথা সন্দেহের কারণে যাঁহারা বিগড়াইয়া গিয়াছিলেন, খোলাখুলি কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের অতি সহজে মিল হইয়া গেল। ডাক্তার সূর্য্যকুমার এই সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই :

"ষড়যন্ত্রকারীদিগের প্রতিপত্তি ও অর্থবল উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। বাড়াইয়া দিতেছে অপর পক্ষের কাহারও কাহারও দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত চালচলনে। সিপাহীপক্ষের হত্যা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিশোধ লওয়াইবার জন্য তাহাদের জাতক্রোধ ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। কোন দেশীয়ের দ্বারা 'পান হইতে চুণ খসিলে' তাহাকেও চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়, ইহাই তাহাদের সতত চেষ্টা। তাহাদের চক্ষে 'কালা-আদ্‌মী' মাত্রেই যখন সয়তান, তাহার ঝাড়ি-বাচ্ছা এক-গাড় না করিলে কি রক্ষা আছে! সৌভাগ্যের বিষয় কোম্পানীর এভাবের মস্তিষ্ক-বিকৃতি এ অবস্থাতেও হয় নাই প্রতিশোধকামীরা তাই 'রাশ তত আল্‌গা' পাইতেছে না। বৃহৎ ব্যাপারে অবশ্য ইহার এদিক-ওদিক অল্প-স্বল্প হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বাড়াবাড়িও যে কোথাও কোথাও হইতেছে না, তাহাও নহে। তাহারই ফলে 'বন্ধু বিগড়াইয়া গিয়া' ব্যাপার সঙ্গীন করিয়া তুলিতেছে। দেশীয়ের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি এখনও কোম্পানীর পক্ষপাতী। তাহাদের মধ্যে প্রভাবশালী যাঁহারা তাঁহারা না থাকিলে, একযোগে তাঁহারা জনসাধারণকে ফুটেরা অভিসন্ধি বুঝাইয়া না দিলে এই সময়ের মধ্যেই কোম্পানীর পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা দুরূহ হইত।"

"কালা আদ্‌মী" সম্বন্ধে এই মনোভাব রজ্জুতে সর্পভ্রমের ব্যাপারেরই তুল্য। গোলযোগ প্রায় সর্ব্বত্র। কোম্পানীর পক্ষে মার্শাল ল জারি সে-সকল স্থানে সুতরাং প্রয়োজন হইয়া পড়ে। "গ্রাম দোষে" কত নিরীহ প্রজাও তাহাতে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করে এমন কি কেহ কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতও হয়। এই সামরিক আইনের কথা উল্লেখ করিয়া যদুনাথ "তীর্থভ্রমণে" বলিতেছেন :

"এত শাসনেও (বিদ্রোহ) নিবৃত্ত হয় না বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।"

সূর্য্যকুমার তাঁহার দিন-লিপিতে বলিতেছেন :

"অবস্থাচক্রে নির্দ্দোষীর শাস্তিতে পারিপার্শ্বিক অসন্তোষ এবং তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সিপাহীদিগের লোকবল ও অর্থ-বল বৃদ্ধির প্রমাণ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তেই পাওয়া যায়। যেখানে কোম্পানীর বন্ধু প্রবল সেখানে কোনও প্রকারে সামলাইয়া যাইতেছে।"

'সামলাইয়া যাওয়াইতে' দেশীয় রাজন্যবর্গের সৈন্য ও অর্থসাহায্য এবং অন্যান্য বন্ধুগণের নানা উপায় উদ্ভাবনের অনেক দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। সে সকল উপায়ের মধ্যে সিপাহী-পক্ষের কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ এবং ইতস্ততঃ মতি ব্যক্তিবর্গকে তাহার ফলাফল দেখাইয়া দেওয়া অনেক স্থলে খুবই কার্য্যকরী হয়। 'তীর্থভ্রমণে' যদুনাথ দেখাইয়াছেন :—

"(যুদ্ধের কারণে) দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া সহর, গ্রাম এবং নগরের পথে ভয়ানক ব্যাপার করিয়া রহিল। কাহারও কোথাও গমনাগমনের ক্ষমতা রহিল না। পথিক ব্যক্তি দেখিলেই তাহার সকল দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া, এক কৌপীন পরাইয়া বিদায় করিয়া দেয়। স্ত্রীলোক হইলে কৌপীনও দেয় না, বিবস্ত্রা করিয়া পাঠায়। তাহাতে জোরজবরদস্তি করিলে প্রাণদণ্ড করে।"

সূর্য্যকুমারের দিনলিপিতে প্রকাশ :

"এই দস্যুবৃত্তি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে অরাজকতার সীমা নাই। গাজীপুরেও এ অশান্তি অল্প-বিস্তর আছে। তবে সুবিধার মধ্যে এই যে, সামরিক ও অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এবং জনমত একযোগে থাকায় ইহার বাড় এখানে বাড়িতে পাইতেছে না। অরাজকতা যাহাদের দ্বারা হইতেছে তাহারা সিপাহী পক্ষের, সাধারণের ধারণা। এ ধারণা একেবারে সঠিক না হইলেও অনেক স্থলেই দস্যুরা সিপাহীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। দেশবাসীর ধনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়া সিপাহীরা রাজ্যগ্রহণে সচেষ্ট। মূলেতেই যখন তাহাদের দেশবাসীর উপর এত অত্যাচার, রাজ্যলাভে তাহারা সকলেরই 'হাতে মাথা কাটিবে'—এ ভয় হওয়া ত স্বাভাবিক। এই ভয়ের কথা কোম্পানীর হিতকামীরা সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা

যত্নেষ্ট করিতেছেন। ইহাতে সুফলের আশা আছে—মন্দের ভাল।"

জৌনপুর অভিযানে কোম্পানীর কর্ম্ম-পরিত্যক্ত বিদ্রোহী পদাতিকগণের সহিত স্থানীয় কয়েকজন জমিদার এবং বহু অসৎ ও গুণ্ডাপ্রকৃতি ব্যক্তির সহযোগিতার উল্লেখ ডাঃ সর্ব্বাধিকারী করিয়াছেন। সিপাহীদিগের এই অভিযানের ভীষণতা ইতোপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেই ভীষণতার আবর্ত্তে স্বয়ং কমিশনর নির্ম্মমভাবে হত হন। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গের হতাহতের সংখ্যাও ভয়াবহ। অভিযানে নিযুক্ত বিপুল সিপাহী-বাহিনী তাহাদের সাফল্যে উল্লাসেও আনন্দে মত্ত, সেই সময়ে মিঃ গবিন্স্ ক্ষুদ্র এক শ্বেতাঙ্গ-বাহিনী লইয়া জৌনপুর উদ্ধারার্থ তথায় উপস্থিত হন। যদুনাথ সেই ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গ-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা—"তিন শত গোরা সৈন্য (ও) আট হস্তী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের অসীম বীরত্বে বিরাট বিপক্ষবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহার পরে তাহারা আবার মিলিত হইয়া এবং জনবল আরও বৃদ্ধি করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করে।

এ দিকে কোম্পানীর পক্ষে এক কঠোর আদেশ জারি হইল। যদুনাথের ভাষায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"গভর্ণমেণ্টের এই আদেশ আইল, এমত দুরাচার বদমায়েস এবং কোম্পানী বাহাদুরের অনিষ্টকারী, সরকারের মন্দকারী, পদাতিকগণের সাহায্যকারী এবং মন্দকারী সৈন্যগণ যৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইবে, তৎক্ষণাৎ গলরজ্জু, কি শস্ত্র, কিংবা তোপের গোলা দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিবে। এ জন্য বারংবার অনুমতি লইবার, প্রয়োজন করে না।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে 'দুরাচার বদমায়েস' ধরিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত হয়। শ্বেতাঙ্গ সমাজের দেশীয়দের সম্বন্ধে ঘোর সন্দিগ্ধভাব সত্ত্বেও কোম্পানী বাহাদুর বাছিয়া বাছিয়া দেশীয়দিগকেই গোয়েন্দা-পদে নিযুক্ত করেন। 'তীর্থভ্রমণে' গোয়েন্দা গোকুল থানাদারের নাম পাওয়া যায়।

দেশীয়ের গোয়েন্দা নিয়োগ উপলক্ষ্য করিয়া শ্বেতাঙ্গের মধ্যে কেহ কেহ পরে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণাঙ্গের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষের কথা অতিরঞ্জিত। অবস্থা সে প্রকারের হইলে দায়িত্বপূর্ণ গোয়েন্দা পদে কি দেশীয় নিযুক্ত হইত।"

সূর্য্যকুমার তাঁহার দিনলিপিতে সেই সময় লিখিয়া রাখেন—"দেশীয় দিগের প্রতি শ্বেতাঙ্গ বণিক সমাজ ও অন্যান্য ব্যক্তির ঘোর সন্দেহ থাকিলেও দেশীয়কে গোয়েন্দা-পদে কোম্পানীর নিযুক্ত করায় সে পক্ষ হইতে কোনও আপত্তির কথা শুনা যায় নাই। দেশীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও এ কার্য্যে কোম্পানী নিযুক্ত করিলে বুদ্ধিমত্তার কার্য্য হইত না। শত্রুপক্ষের ভিতরের কথা জানা কোনও বিদেশীয়ের পক্ষে এখন আদৌ সুবিধাজনক নহে—নিতান্ত বিপজ্জনক।"

দেশীয় কোনও কোনও গোয়েন্দার হস্তে কোনও কোনও সজ্জনেরও নিগ্রহ হওয়ায় অবশ্য কোম্পানীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য গোয়েন্দার কারচুপি কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাও সামলাইয়া লইতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই এবং সে কার্য্য করিয়াছেন কোম্পানীর প্রকৃত দেশীয় বন্ধুরা।

এই বন্ধুত্ব লাভ করিতে এবং তাহা রক্ষা করিতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে শাসকদলের মধ্যে ঘোর মতবিবাদ ও সেই বিবাদ পার্লামেণ্টের সদস্যদের দুই ভাগে বিভক্ত করার ঘটনার কথা সূর্য্যকুমারের ডায়েরী হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এক দলের কাছে লর্ড ক্যানিং বিশেষ অপ্রিয় হইয়া উঠেন। এমন অপ্রিয় হন যে, সিপাহীযুদ্ধ অবসানে ভারতে সামরিক ও অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে যুদ্ধশেষের জন্য পার্লামেণ্টসভায় ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাবসূত্রে বিরুদ্ধ দল ধন্যবাদার্হের মধ্যে লর্ড ক্যানিং-এর নাম রাখিতে ঘোর অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ডাঃ সূর্য্যকুমার সিপাহী যুদ্ধ-বিষয়ক বহু ঘটনার কথা স্বয়ং জ্ঞাত হওয়ায় দিনলিপিতে কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি একাধিক স্থানে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

লর্ড ডারবির পদত্যাগ ও লর্ড পামারষ্টোনের ইংলণ্ডের রাজ্যচালনার ভার গ্রহণের অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে সিপাহীযুদ্ধও একটি প্রধান কারণ; রাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইহা অভিমত।

ভাগ্যবতী

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুস্তফী

রাত্রি বেশী নয়—দশটা হইবে প্রায়। বসিয়া বসিয়া ভাত খাইতেছি, স্ত্রী তদারক করিতেছে। পাখার বাতাস করিতে করিতে অক্লান্তভাবে বকিয়া চলিয়াছে, "দিন দিন ও কি খাওয়ার ছিরি হচ্ছে, শুনি? অমনি করে বুঝি লোক মাছের মুড়ো খায়? কি পেটে গেল? সবই ত' ফেলে দিলে। অম্বলটুকু দিয়ে ও-ভাতকটা খেয়ে নাও। না, তোমাকে নিয়ে পারবার জো নেই। ঐ খেলে কখনও শরীর ভাল থাকে? সারাদিন তো গাধার মত খাট। অন্ততঃ খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দিতে হয়।"

এমন সময়ে আমার কন্যা বীণা পাংশুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে কহিল, "মা!"

তাহার কণ্ঠ বহিয়া আর হয় ত শব্দ নিঃসৃত হইল না। স্ত্রী ও আমি যুগপৎ তাহার মেঘাচ্ছন্ন মুখের পানে তাকাইলাম। আমি কহিলাম, "কি হয়েছে বীণা মা?"

বীণা কহিল, "ওদের বাড়ীর বৌটা মারা গেছে বাবা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দূর পাগলি, মলে এতক্ষণ কান্না-কাটি হত।"

বীণা প্রতিবাদ করিল, "সত্যি বাবা! ওরাই বলা-কওয়া করছে—মারা গেছে।"

আমি কাণ খাড়া করিয়া হৃদয়ের ক্ষীণ স্পন্দনধ্বনিটি পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম; কিন্তু কোন প্রিয়জনবিচ্ছেদজনিত বেদনা-বিধুর শোকার্ত্ত ক্রন্দনশব্দ শুনিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্য হইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, "কেউ ত কাঁদছে না রমা!"

রমা অর্থাৎ আমার স্ত্রী কহিল, "কাঁদবে আর ছাই কে?"

আমি কহিলাম, "আশ্চর্য্য!"

রমা কহিল, "ওগো পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।"

স্ত্রীর আদেশ পালন করিলাম। কিন্তু কেন জানি না আমার গলা দিয়া আর ভাত নাবিল না। আমার মনটা ঐ দুঃখিনী, অনাদৃত, মৃত্যুপথগামী বধূটির জন্য বড়ই ব্যথিত হইয়া গেল। স্ত্রী কহিল, "ও ভাতকটা কি দিয়ে খাবে? দুধ দেব?"

কহিলাম, "কিছু দিতে হবে না রমা। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।"

"ওমা এরি মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল কি করে গো? সে-কি হয়? ঐ মাখা ভাতকটা খেয়ে ফেল।"

"সত্যি রমা আর একটি ভাতও আমি খেতে পারব না।"

"কেন শুনি?"

"অমনি।"

রমা বীণাকে ধমক দিল, "পোড়ারমুখী আর এ সুখবর দেবার সময় পেলেন না! লোক যে খেতে বসেছে সে হুঁস নেই! আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, এসব শিখবি কবে?"

বীণা কাঁদিয়া ফেলিল, অল্পেই সে কাঁদে। আমি তাহার হইয়া ওকালতী করিলাম, "তুমি যে ওকে বকছ বড় ওর কি দোষ?"

রমা কহিল, "তুমি থাম দিকি। আস্কারা দিয়ে মেয়েটার মাথাটা খাচ্ছ।"

অগত্যা আমি নীরব হইলাম, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে উপরে উঠিয়া গেলাম। স্ত্রীর দুঃখ আমার খাওয়া হইল না এই কথা ভাবিয়া, কিন্তু যে বেচারা বধূটি মরজগতের সমস্ত মায়া-মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়া চিরতরে পৃথিবীর পরপারে বিদায় লইয়াছে কই তাহার কথা তো একবারও ভাবিল না? গত তিনমাস যাবৎ পাশের বাড়ীটি খালি পড়িয়াছিল। উহারা সম্প্রতি দিন কুড়ি হইল ভাড়া আসিয়াছে। আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। ধীরে ধীরে জানালার পর্দা সরাইয়া পাশের বাড়ীর দিকে তাকাইলাম। রুগ্না বধূটির ঘরে টিপ্ টিপ্ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলিতেছিল। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর একটি অপরিচ্ছন্ন মলিন চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বধূটি পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার সর্ব্ব-শরীর স্থির, অনড়। আজ কয়দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছি, সে এমনই করিয়াই অকাতরে পড়িয়া থাকে। হয় ত মাঝে মাঝে অস্ফুট কাতরোক্তি ভাসিয়া আসে, "আর যে পারি না মা! উঃ হুঃ।"

তাহার বক্ষ দলিয়া পিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আর সেই কাতরোক্তি নাই। সারা বাড়ীটিতে নীরবতা, নিঃশব্দতা বিরাজ করিতেছে। ভাবিলাম, হয় ত আজ সে একটু ভাল আছে, বীণা যাহা শুনিয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোথাও ত মৃত্যুর এতটুকু ছায়াপাত হয় নাই। একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নক্ষত্রখচিত দূর নীল বিরাট আকাশের পানে তাকাইলাম—সেই শুভ্র অন্তহীন ছায়াপথ, অসংখ্য তারকাপুঞ্জ—ধ্রুব নক্ষত্র—বশিষ্ঠ—কালপুরুষ—সপ্তর্ষিমণ্ডল। দক্ষিণের উদাস বাতাস রহিয়া রহিয়া দূরান্তরের গন্ধ বহিয়া মন্থর গতিতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি জ্বলন্ত উল্কা হাউই-বাজির মত আকাশের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি আলোক রেখাপাত করিয়া পৃথিবীতে খসিয়া পড়িল। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কে দেখিল কে শুনিল ?

এমন সময়ে বধূটির শাশুড়ী এবং শ্বশুর চুপি চুপি কথা বলিতে বলিতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শ্বশুর বলিল, "ওর কাছে একটু বস গে যাও না তুমি। একা ত ফেলে রাখতে নেই।"

"আমি পারব না। আমার বড় ভয় করছে।"

"তবে এই রাতে কি করি বল দিকি ? বৌমা আর খোকা কখন যে বায়স্কোপ থেকে ফিরবে তার কোন ঠিক নেই। আমি আর একা কতদূর পারব ? এত রাতে এখন কোথায় লোকজন পাই ? সৎকার তো করতে হবে ?"

আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। বুঝিলাম, বীণার কথাই সত্য। দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করিয়া বধূটি আজ চিরনিদ্রা যাইতেছে। রাত্রে তাহার ঘুম হইত না—সারা-রাত্রি খুক্ খুক্ করিয়া কাশিত, গোঙাইত, কাতরস্বরে চীৎকার করিত, "মাগো" !

তাহার চেহারা হইয়াছিল কঙ্কালসার, দেখিলে ভয় করিত। সংসারে সে ছিল বোবার মত। তাহার সহিত কাহাকেও কথা বলিতে শুনি নাই। দেখিয়াছি, সকলেই তাহাকে এড়াইয়া চলিত। সে বড় একটা তাহার অন্ধকূপ ঘর হইতে বাহিরের আলোকে আসিত না।

আমার স্ত্রী আসিয়া তাকের উপর দুধের বাটি রাখিয়া বলিল, "কি দেখছ গো ?"

বলিলাম, "বাড়ীতে এমন বাড়াবাড়ি অসুখ জেনেও ছোট ছেলেটা বৌ নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে গেছে। বলিহারি মানুষ !"

স্ত্রী কহিল, "মানুষ নয় আস্ত চামার। শোন নি কালকের কথা ?"

"কি ?"

"কাল দুপুরে বৌটার অভাগী মা এসে কি কান্নাটাই না কাঁদল। বৌটা ভুগছে থাইসিসে।"

"থাইসিস্ !"

"হাঁ। মা তাই সেবা করবে বলে দুদিন থাকতে চাইল। ওরা বলল, সেবা করবার অতটা ইচ্ছে থাকলে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেবা করুক।"

"তাই নিয়ে গেল না কেন ?"

"পাগল। সে কি খায়, কোথায় থাকে তার ঠিক নেই। বিধবা, গরীব, কেউ আপনার বলতে নেই। আছে এক দূর-সম্পর্কের ভাই। থাকে সেখানে, সারাদিন ঝির মত কাজ ক'রে দুবেলা যাহোক করে দুমুঠো খেতে পায়। সেখানে ত আর ঐ রুগী তোলা যায় না।"

"তুমি এ সব জানলে কি করে, রমা ?"

"জানব আর কি ? মাগী নিজেই বলল। ঠিক দুপুর বেলা ত ওরা তাকে বাড়ী থেকে বার করে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি আবার বীণাকে দিয়ে ডেকে আনিয়ে একটু মিষ্টিমুখ করালুম। এই মেয়েকে কোলে নিয়ে সে বিধবা হয়েছিল। এমন যে অসুখ তাই এরা খবর দেয় নি। কার মুখে খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। হাজার হোক মা ত, বত্রিশ নাড়ী মোচড় দিয়ে ওঠে যে।"

রমা আঁচলে চক্ষু মুছিল। আমার চক্ষুও ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, অশ্রুকণায় সমস্ত কিছু ঝাপসা হইয়া আসিল। বলিলাম, "এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে ?"

"ভেবে কি করবে বল ? শোবে চল বরং।"

অগত্যা স্ত্রীর কথামত শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম হইল না সহজে। যতবার ঘুমাইতে যাই, ততবারই ঐ বধূটির রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়ে আর মনে পড়ে সেই দুটি করুণ আঁখি। কাঁটার মত বিছানা গায়ে বিঁধিতে লাগিল। গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোরবেলা উঠিয়াই ছুটিয়া সেই জানালাটির নিকট গেলাম। দেখিলাম মৃতা বধূটি সর্ব্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া গত কালের মত চুপটি করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্ত্রীকে কহিলাম, "এখনও সৎকার হয়নি রমা ?"

"সৎকার করবে কে ?"

"কেন, লোক পাচ্ছে না ?"

"ডোম ডাকতে গেছে। যা বিচ্ছিরি রোগ! ওদের আত্মীয়-স্বজন কেউ না কি যেতে রাজি হচ্ছে না।"

"তাই বলে বেচারাকে ডোমে নিয়ে যাবে ? বেঁচে থাকতে তো একদিনও সুখ পায় নি।"

"সুতরাং মৃত্যুর পর তাকে সুখী করতে চাও ? দরদ দেখে আর বাঁচি নে।"

"বেচারার ছোটঠাকুর-পো কি করছে ?"

"তিনি ও তাঁর শ্রীমতী চায়ের উদ্যোগ করছেন। বুড়ো ছুটেছে ডোম ডাকতে।"

কেন জানি না ঐ অসহায়া দুঃখিনী বধূটির জন্য আমার করুণার উদ্রেক হইল। কতই বয়স ? বড় জোর চব্বিশ কি পঁচিশ। অকালেই সে সরিয়া পড়িল। তাহার জন্য কেহই বেদনা বোধ করিল না, পরন্তু তাহার চিরবিদায় দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। মরিয়া হইয়া কহিলাম, "রমা আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"কি চেষ্টা করবে ?"

"সত্যি, পাড়ার এ্যামেচার ড্রাম্যাটিক ক্লাবে খবর দিলে তারা এখনই আনন্দের সঙ্গেই বেচারার সৎকার সুসম্পন্ন করবে। তারা ঐ চায়।"

তৎক্ষণাৎ গায়ে পাঞ্জাবীটি ফেলিয়াই ছুটিলাম। বলিবামাত্র সকলেই কাঁধে গামছা ফেলিয়া আসিল।

বধূটির শ্বশুর বিহারীবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইল। আমাদের বহু কষ্টে পাঁচটি টাকা দিল খরচার জন্য।

বেলা তখন আটটা। আমরা সৎকার আয়োজন করিলাম। রমা কহিল, "বেশ চওড়া লাল পাড় শাড়ী দিও গো। দু'খান সিঁদুর কিন, ছুটো ফুলের তোড়া দিতে ভুলো না যেন, এক শিশি আলতাও নিও।"

বলিলাম, "অত কি করে হবে বল ? সম্বল তো সবে পাঁচটা টাকা।"

"তাই বলে যা তা করে চাপা দিয়ে নিয়ে যাবে ? এয়োমানী ভাগ্যবতী ও। অমন করে স্বামী রেখে ড্যাং ড্যাং করে মরা কজন মেয়ে মানুষের কপালে জোটে শুনি ? মরণ দেখলেও হিংসে হয়। আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে!"

"এগো মৃত্যুকামী, আশীর্ব্বাদ করছি যেন তুমি আমার আগে এমনি করে ড্যাং ড্যাং করে মরতে পার।"

মুহূর্ত্তে রমা ঢিপ করিয়া আমায় প্রণাম করিল, গলবদ্ধ হইয়া কহিল, "ওগো দেবতা তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক. তোমার কথাই যেন সত্য হয়।...আমি তোমায় চালা লাল শাড়ী দিচ্ছি দু'খান সিঁদুর দিচ্ছি নিয়ে যাও। পা দুটোতে বেশ ভাল করে আলতা দিও।"

অগত্যা স্ত্রীর নিকট হইতে শাড়ী ও সিঁদুর লইয়া গেলাম। সকলে বলিল, "এবার বার করা যাক, কি বলেন দাদা ?"

"হাঁ হাঁ আর দেরী করা উচিত নয়। খাট ভাল করে বাঁধা হয়েছে তো ? নইলে মাঝ-পথে ঝুলে পড়বে।"

"ও আপনাকে বলতে হবে না। আমরা সব গুছিয়ে নিয়েছি।"

আমরা বধূটির ঘরে প্রবেশ করিলাম। তখনও টিম টিম করিয়া প্রদীপটি জ্বলিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহা নিবাইয়া দিলাম। সারারাত্রি কেহই এ-ঘরে প্রবেশ করে নাই বধূটি স্থির হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, চোখের মণি যেন ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে···মৃত্যুর সময়ে হয় ত অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, হয় ত কাহাকেও দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। দু'কস বাহিয়া রক্ত পড়িয়াছিল তাহা জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। অসংখ্য লাল পিঁপড়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘরটি বিশ্রী উৎকট গন্ধে পূর্ণ। একজন শিশি খুলিয়া সেন্ট ঢালিয়া দিল। দেখিলাম, বধূটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ নয়, বছর আঠার-উনিশ হইবে। মুখটি অত্যন্ত কচি। এই বালিকা বধূটির পশ্চাতে কত দীর্ঘ অত্যাচার-অনাদরের ইতিহাস গোপন রহিয়াছে। দীর্ঘ দিন ভুগিয়া ভুগিয়া আজ তাহার ব্যাধি নিরাময় হইয়াছে, তাই সে নিবিড় শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে। অযত্ন করিয়া করিয়া চুলে জট পাকাইয়া ফেলিয়াছে···মাথার সিঁথিতে এতটুকু সিঁদুর নাই ছেঁড়া চটের উপর খান কয়েক খবরের কাগজ পাতিয়া

অভাগিনীর শয্যা রচনা করা হইয়াছে। ঘরের মেঝেতে বহুদিন ঝাঁট পড়ে নাই, ইতস্ততঃ ভাঙ্গা ঘটি বাটি পড়িয়া আছে। একটি চটের মাথায় বালিশ বহুদিন ব্যবহার করিয়া করিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। এক পাশে আধ-বাটি বার্লি। তাহা পচিয়া গন্ধ বাহির হইতেছে। ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ ফাঁক। তাহার মধ্য দিয়া মুক্তার ন্যায় একটি চক্‌চকে দাঁত দেখা যাইতেছে। সতীশ বলিল, "আর দেরী কেন ?"

বলিলাম, "না, দেরী আর কিসের ? এস তোলা যাক। এই নূতন কাপড়টা যে পরিয়ে নিতে হবে। তার আগে মুখের রক্তটা কিছু দিয়ে মুছিয়ে দাও।"

আমার মৃতদেহ বাহির করিয়া আনিলাম, একজন বলিল, "কে মুখাগ্নি করবে, শুনি ?"

"ছেলে যখন নেই তখন স্বামীই করুক।"

শাশুড়ী কহিল, "সে কি পারবে বাবা ? সে নিজেই পাগল মানুষ।"

ভাবিলাম, পত্নীশোকে হয় তো স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছে। শাশুড়ী ডাকিলেন, "ওরে হেবো।" হেবো অর্থাৎ বধূটির "পতি পরম গুরু" আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় তাহার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পরণে একটা লুঙ্গি, গায়ে একটি ভি-গলা গেঞ্জী। আমরা সবিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলাম। শাশুড়ী তাহাকে বলিল, "পারবি বোয়ের মুখে আগুন দিতে ?"

হেবো একগাল হাসিয়া বলিল, "আমায় একটা টম্‌টম্ দিবি ? দুটো শাদা ঘোড়া একটা লম্বা ছিপ্‌টি ?"

শাশুড়ী বলিল, "তবে ওদের সঙ্গে যা।"

"ইস্। কক্ষনো যাব না। ওরা তো মড়া নিয়ে যাচ্ছে, ওদের আমি ছোঁব না। টিকটিকি বাঘের আঁচড়।" বুঝিলাম সে বদ্ধ পাগল।

সতীশ বলিল, "ও পাগলকে সঙ্গে দেবেন না। আপনার ছোট ছেলেকে পাঠান বরং।"

"সে কি করে যাবে বাবা ? সে তো নতুন বাড়ী দেখতে বেরিয়েছে। কালকেই বাড়ী বদল করতে হবে। এখানে আর ত থাকতে পারব না, তোমরাই বল বাবা ?"

সতীশ বলিল, "তা ত নিশ্চয়। যা বিচ্ছিরি রোগ। কাউকে আপনার পাঠাতে হবে না। আমরাই ব্যবস্থা করে নেব।"

আমরা প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া উঠিলাম, "বল হরি, হরি বোল।"

নিজের শব্দে নিজেই চমকিত হইলাম। কে যেন দু'হাত দিয়া আমার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে।

আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া কাহাকে কখনও এমনি নিঃশব্দে চুপি চুপি মরিতে দেখি নাই।

কৃষি-বিজ্ঞান

…আধুনিক তথাকথিত কৃষি-বিজ্ঞানের পাতা যাঁহারা উল্টাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ঐ বিজ্ঞানে কৃষির উন্নতি-পরিকল্পে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ অস্বাভাবিক উপায়ে প্রসবিণী শক্তি বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা। এই অস্বাভাবিক উপায়ের ফলে প্রথমতঃ কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক ও ধনিকদিগের মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং ক্রমশঃ স্বাধীন কৃষির বিলুপ্তি ঘটিয়া কৃষকদিগকে চাকুরীজীবী হইতে বাধ্য হইতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর ফসলের পরিমাণ কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ের ফলে জমীর উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং মাঝে মাঝে জমীকে অনাবাদী না রাখিলে সন্তোষজনক পরিমাণে ফসল পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে; তৃতীয়তঃ জমী হইতে যে সমস্ত ফসলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা স্বাস্থ্য-সাধনের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।…

ধাত্রী

'ফরোয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র সম্পাদকীয় সন্দর্ভে তাঁহার দল সম্বন্ধে ভরসা প্রকাশ করিয়াছেন : এই ভাবে এবং এমতাবস্থায় যাহার জন্ম, তাহার কখনও মৃত্যু হইতে পারে না...।

নকলে নাকাল

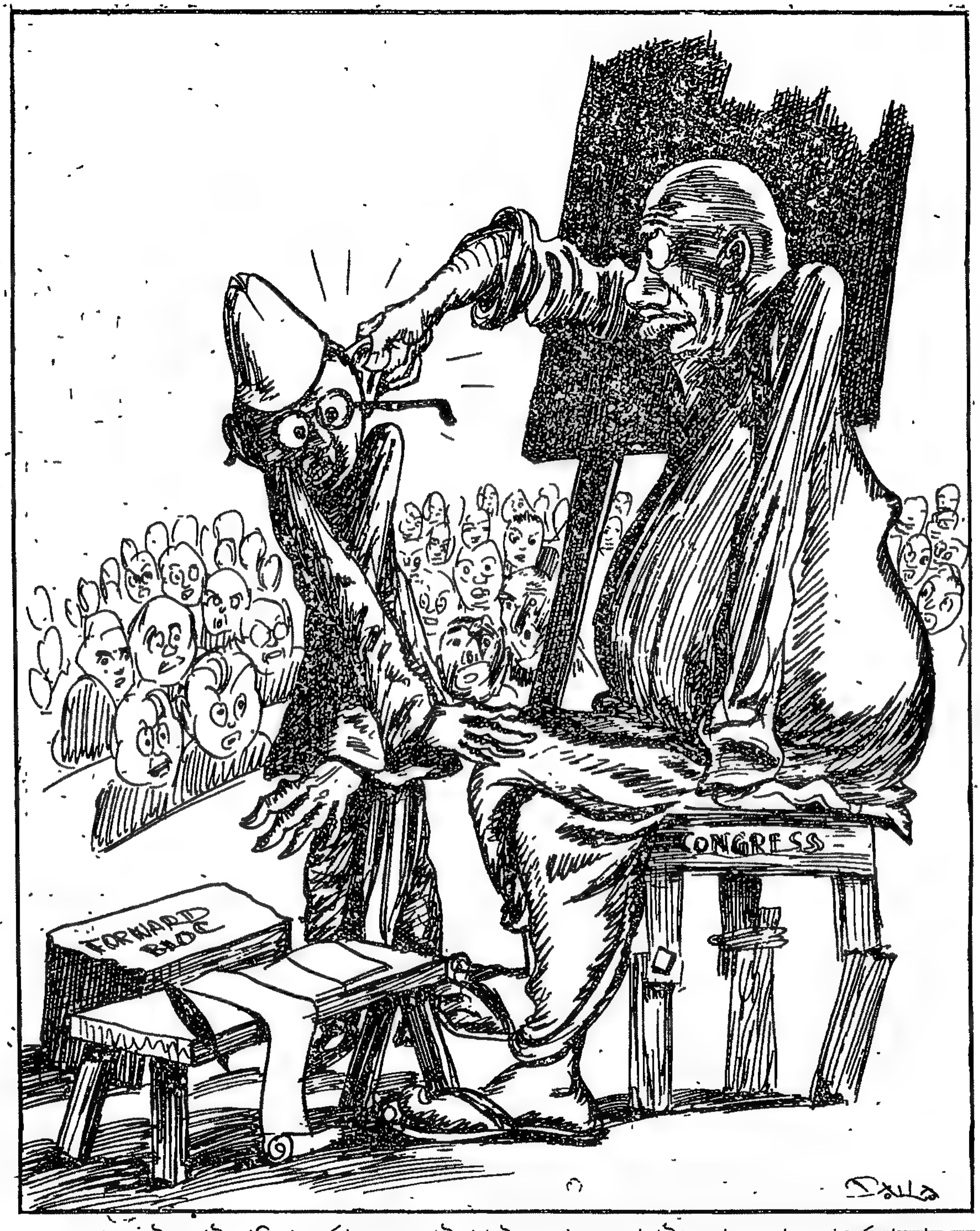

গত ১৬ই জুলাই তারিখে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সুভাষচন্দ্র বোম্বাই সরকারের মাদকতা বর্জ্জনান্দোলনের বিরুদ্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহার সমালোচনায় বলেন :—পার্শীরা গান্ধীজীর নিকট যে আবেদন প্রেরণ করেন, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, সুভাষচন্দ্রের বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশ তাহারই নকল।

দেশ-প্রেমী বঙ্কিমচন্দ্র

—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ভট্টশালী

আধুনিক কালের সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে অনেকে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, আধুনিক সাহিত্যের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন বিশিষ্ট স্থান নাই। মাঝে মাঝে লিখিতভাবে না হইলেও, মৌখিক তাঁহারা এই মতবাদ বা সমালোচনামূলক যুক্তি প্রকাশেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের সেই যুক্তির অর্থ বোধ হয় এই যে, আধুনিক সাহিত্যে তাঁহারা যেরূপ রস পান, বঙ্কিমের রচনাপাঠে তাহা পান না; কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে যে তাঁহারা নিজেদের চিন্তা ও কল্পনা-শক্তির খর্ব্বতা উপলব্ধি করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেরাই যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হন, কালের আবর্ত্তনে নিশ্চয়ই তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, উহা সাহিত্যের দর্শন-বিষয়ক গভীর সমালোচনার বিষয়বস্তু। আধুনিক সাহিত্যের সহিত বঙ্কিম-প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দুঃসাধ্য; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে যে তাঁহার সাহিত্যের ভিতর দিয়াই ভিন্ন একটি অপরূপ দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে, সেই বিষয়েই কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

সামান্য একটু চিন্তা দ্বারাই বুঝা যায় যে, সাহিত্যে যুক্তি অপেক্ষা রস-বোধের মূল্য অনেক বেশী। যে প্রাণ রসশূন্য তাহাতেই নানাবিধ অকর্ম্মণ্য, অর্থহীন যুক্তির উদ্ভব হইতে সাধারণতঃ দেখা যায়। আবার একেবারে যুক্তিহীন, নিছক আবেগাপ্লুত মনও ভাল নয়, কারণ সে মন কতকটা আপাত-মধুর লালসার বশবর্ত্তী। সুতরাং প্রাণের অন্তর্নিহিত রস-বোধ এবং বিচার-বিবেকসম্পন্ন যুক্তি যেখানে অনেকটা হরিহর আত্মা, সেইখানেই সত্যকার সাহিত্য-রস বোধগম্য হইয়া থাকে। সাহিত্যের আদর্শ মানবের মনে আনন্দরস ও সুখ-শান্তির সঞ্চারণ করা। কাজেই প্রাণে যদি রসোপভোগ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে শুধু যুক্তিজালে সাহিত্যকে বিধ্বস্ত করিলে তাহার ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইবে না। সত্যকার সমালোচনা, creative (সৃষ্টিমূলক), তাহা কখনও destructive (ধ্বংসমূলক) নয়। সমালোচনার স্বাভাবিক রীতি হইতেছে, আলোচনার পূর্ব্বাহ্ণে সাহিত্যরস উপভোগ করিবার মন লইয়া কবিতা বা উপন্যাস, প্রবন্ধ বা গল্প পড়া, তবেই স্বচ্ছদৃষ্টিতে পাঠকের নিকট তাহার আনন্দ বা শান্তি প্রকাশ পাইবে। নতুবা পাঠারম্ভের প্রথম ভাগেই যদি রচনা-বিশেষের প্রতি পাঠকের কটুদৃষ্টির কুটিল কটাক্ষপাত হয়, তবে রস-সাহিত্যের রস অন্তর্নিহিতই থাকিয়া যায়, এবং তখন তাহা নানারূপ অসুন্দর ও অরুচিকর বাক্যজাল বলিয়াই ভ্রম হয়, তাই সর্ব্ব প্রথম রসগ্রহণ বা উপভোগ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া তৎপরে রচয়িতার লিখনভঙ্গী বা প্রতিভাকে বিচার করিতে হয়। নতুবা সাহিত্যের মুখ্যতম আদর্শকে দূরে রাখিয়া শুধু আনুষঙ্গিক অবান্তরকে লইয়াই টানাটানি করা হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র আজ পরপারে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি যথোচিৎ শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত, তাঁহার আজীবন-আরাধিত দেশাত্মবোধের পুণ্যমন্ত্র দেশবাসীর মনপ্রাণে সঞ্জীবনী বাণীর ন্যায় সার্থক করিয়া তুলিবার বাসনায় এ পর্য্যন্ত অনেকানেক প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ কোন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা নাই, সেইরূপ টান নাই—প্রাণের দরদ নাই। তাঁহার প্রাণের বাসনা ছিল ত্রিংশ কোটী নরনারীর হৃদয়কে অপূর্ব্ব মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক অভিনব চেতনা জাগ্রত করা, সকল প্রাণশক্তি একসূত্রে গ্রথিত করিয়া জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করা।

সেই বঙ্কিম নাই। কিন্তু তাঁহার আরাধিত মাতৃমন্ত্র আমাদের ঘরে ঘরে প্রত্যেকের প্রাণে প্রেরণা দেয়। আমরা শুনিয়াও শুনি না, বুঝিয়াও বুঝিতে সচেষ্ট হই না। অনেকে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে তিনি ঔপন্যাসিক; কেহ বলেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধে। কিন্তু যদি বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবোধের দীক্ষাগুরু বা দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক, তথাপি তাঁহার পরিচয় বোধ হয় কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় না; অধিকন্তু এই দৃষ্টিতে দেখিলে

যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, প্রবন্ধ, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় তদপেক্ষা সুচারু রূপে পরিচিত হন।

বঙ্কিম-পূর্ব্ব বাংলাসাহিত্যের পরিচয় কি?

"আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোমপ্যাচার নক্‌সা", ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল এই ত। কিন্তু তাহার অবস্থাই বা কি, ব্যাপ্তিই বা কতটুকু! সেই সাহিত্যের বিস্তার ছিল না—বৈশিষ্ট্য ছিল না—ছিল শুধু অস্তিত্ব। তবুও তখনকার সেই সময়ের সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার কতকটা দূর হইয়াছিল—ঘন মেঘের ফাঁকে বিজলীর একটু চমক খেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার জীবনীশক্তি ছিল অতি অল্প। সাহিত্যের সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন আসিল মাইকেলের অচিন্তনীয় প্রতিভাবলে—কাব্য-সাহিত্যে ভাবের একটা জোয়ার আসিয়া পড়িল এবং বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ বাঙ্গালী প্রথম বুঝিল—

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন"।

সেই যে চেতনা, তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ পরবর্ত্তী বঙ্কিম সাহিত্যের ভাবধনিতে। বাঙ্গালীর সাহিত্যের সহিত পশ্চিমের ভাবধারার যোগাযোগ সংস্থাপনের প্রথম উন্মেষ মাইকেল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সেতু প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিমের প্রতিভা উদয়ের সাথে সাথে বাঙ্গালীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল; কোথা হইতে যেন রূপ, রস গন্ধ ও স্পর্শানুভূতির প্রবল আকর্ষণে বাঙ্গালীর মনঃপ্রাণ আচ্ছন্ন হইল। বাংলা সাহিত্যের এই সময়কার অবস্থা বর্ণনে প্রতিষ্ঠান্বিত লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—

"১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে অগ্রে কেহ দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে 'বিজয়-বসন্ত' 'কামিনী কুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী-ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য-পুস্তক-প্রচার সভার প্রকাশিত 'হংসরূপী রাজপুত্র', 'চকমকির বাক্স' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং 'আরব্য উপন্যাস' প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা-গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিয়াছিলাম। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার মধ্যে একটু নুতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনীতে' যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা,—সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"

ঠিক এইরূপে বঙ্কিমপ্রতিভা বাঙ্গালীর সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সব কিছুর উপরেই অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তখন যাঁহারা দুই ছত্র ইংরেজী লিখিয়া নিজেদের ধন্যজ্ঞানে কৃতার্থ হইতেন অথবা সভার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন, তাঁহারা বুঝিলেন, বিজাতীয় সাহিত্যে উন্নতি করা সহজসাধ্য নয়, তাহাদের সেই আচ্ছন্ন তন্দ্রা যখন ছুটিল তখন তাঁহারা দেখিলেন, মাতৃভূমির মাতৃভাষা তাঁহাদের জন্য মণি-মুক্তা-রত্নখনি-বিভূষিতা হইয়া রহিয়াছে আর তখন তাঁহারা সেই বঙ্গভাষাকে হেয় জ্ঞান করিয়া পশ্চিম-প্রীতির রহস্য-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলেন।

পশ্চিমের রঙিন্ হাওয়ায় পাল তুলিয়া বাঙালী যখন নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ভুলিয়া গিয়া পশ্চিমের দ্বারে আত্মবলিদানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, ঠিক সেই অতি আবশ্যকীয় মুহূর্ত্তে বঙ্কিম উদিত হইলেন তাঁহার অমিত তেজশালিনী মহতী প্রতিভা লইয়া। বাঙ্গালীর প্রাণে বিলুপ্ত চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। জাতীয় জীবনের মোড় ফিরিল। সেই আলগা স্রোতে কত ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছে, কতক শিক্ষা পাইয়া আত্মকৃত মহাপাতকের জ্বালায় আজীবন তুষানলে দগ্ধ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সে ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিয়াছিল। তৎকালীন প্রচলিত ধারাকে সহজেই অতিক্রম করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত দেশের সেই পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, কাহার সাধ্য সেই প্রচণ্ড শক্তির প্রভাব এড়াইয়া বিপথে যায়। তাই বলি, বঙ্কিমের সমগ্র পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার নভেল বা প্রবন্ধরাজি শুধু রসদৃষ্টিতে বিচার করিলেই চলিবে না, তাঁহাকে জানিতে হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহার সাহিত্যের অন্তর্নিহিত স্বাদেশিকতা। সেই সাধকের হৃদয়াভ্যন্তরে বাঙ্গালীকে

তাহার বাঙ্গালীত্ব বুঝাইবার কি সেই অনন্ত আগ্রহ—কত-বড় ব্যাকুল প্রয়াস। স্রোতে ভাসমান্ ধ্বংসোন্মুখ একটা জাতির রক্ষণের ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত বড় বিরাট ব্রতগ্রহণ তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু শুধু নিজস্ব মহত্ত্ব বা বিরাটত্বই তাঁহাকে একাজে ব্রতী করায় নাই—বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের কথা মনে করিয়া তাঁহার দেশাত্মবোধী প্রাণ কাঁদিয়াছিল। সেই অতীত যুগের মহা-মানবদের স্মৃতি-কথা স্মরণ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর তৎকালীন অন্তরের দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন; বাঙ্গালীর ক্ষমতা অসীম অথচ তাহাকে নানা ভাবে বিধ্বস্ত, ধ্বংস হইতে হইতেছে—নানাপথে কুহকের মায়াজালান্ধ বাঙ্গালী আপন ভুলিয়া স্বীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা সব কিছুই বিসর্জ্জন দিয়া শুধু নিছক প্রলোভনের বশে বিচার-বিবেকহীন হইয়া পশ্চিমের অনুকরণ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে অথচ প্রকৃত পথ দেখাইবার তাহাদের কেহ নাই; বঙ্কিম "রাত্রির অন্ধকার হানিবারে যাত্রীর মশাল" লইয়া সেই বন্ধুর পথের প্রদর্শকের কাজ লইলেন। দেশমাতৃকার নীরব বেদনার স্মৃতি যখন বাঙ্গালীর মনে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, দেশপ্রেম আচম্কা হওয়ায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্কিমই শস্যশ্যামলা মাতার অন্তরের ক্রন্দন শুনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণের অশ্রুসমুদ্র শৃঙ্খলিতা, নিপীড়িতা মাতার পরাধীনতার ক্রন্দনে উথলিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি মায়ের দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন—হৃদয়ের গভীর মর্ম্ম-স্থল হইতে শোকের বান ডাকিয়াছে—

—"সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।"

আজ আমরা ত্রিশকোটিরও অধিক। বঙ্কিমের এই সকাতর ক্রন্দন কি আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে না। সপ্তকোটিরই যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন, ত্রিশকোটি দেখিলে না জানি তাঁহার হৃদয়-বীণা কি সুরেই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত! আধুনিক-পন্থী যাঁহাদের নিকট বর্ত্তমান কালে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নাই, তাঁহারা যেন এই মর্ম্মবেদনার মূল্য বুঝিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কে বুঝিবে, কে শুনিবে? বাঙ্গালী আজ আপন ভুলিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তিতে নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করিয়াছে। হীন স্বার্থবোধ বাঙ্গালীর অগ্রগতির পথে বাধা দিতেছে। কিন্তু এই ধ্রুবসত্য আমাদিগকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর সুপ্রভাত আসিবে, ভুল ভাঙ্গিলে জ্ঞানালোকে হৃদয়াভ্যন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তাই আজ আবার বঙ্কিমকে স্মরণ করি, যেন তাঁহার আদর্শানুসারে আমরা সত্যের পথ পাই—সকলেই যেন আমরা ভাবিতে পারি—"অবলা কেন মা এত বলে"।

বঙ্কিমপ্রতিভার উৎসই হইতেছে তাঁহার দেশাত্মবোধ। দেশকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা তিনি দেশের মঙ্গলের নিমিত্তই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে কঠোর সমস্যা করালরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা একটা জাতির সমস্যা। দেশীয় সাহিত্যকে ধরাবাঁধা সীমাবদ্ধ গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া তাহার বিস্তৃতিসাধনের নিমিত্ত তিনি সুকঠোর সাধনা করিয়া-ছিলেন। পশ্চিমের সাহিত্য, দর্শন, কলাশিল্পাদির সংস্পর্শে আসিয়া সচকিত বাঙ্গালী মনঃপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহার মধ্যে যেমন ভালমন্দগুলিও ছিল, তেমন আবর্জ্জনাসকলও ছিল। পশ্চিমের সবকিছুই বাঙ্গালীর সমাজ, সাহিত্য ও সনাতন প্রথার সহিত মিল খাইত না। কিন্তু সেই ঘূর্ণাবর্ত্তের সময়ে বিচার দ্বারা সার গ্রহণ করিয়া অসারকে বাদ দিয়া দেশীয় সাহিত্যকে পুষ্ট করিবার মত মনুষ্যের অভাব যখন পরিলক্ষিত হয়, তখনই বঙ্কিম তাঁহার প্রতিভাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন সেই মহান্ কার্য্যে। পশ্চিমের ভালকে তিনি যেমন মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন অনাবশ্যকীয় আবর্জ্জনাগুলিকেও ঠিক-সেইরূপ বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই কারণেই পশ্চিমের সাধনার ধারা প্রাচ্যের বাংলাসাহিত্যের ক্রমোন্নতির অন্তরায় না হইয়া সহায়কই হইয়াছিল। বাংলাসাহিত্যকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়া জাতির নবীন প্রাণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার অন্তরের বুভুক্ষা। দেশাত্মবোধী যে সকল উৎসুকচিত্ত সেই সময় জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠার সাধন-পরিকল্পনায় অগ্রসর হইতেন, বঙ্কিম তাঁহাদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া তাঁহাদের শক্তি-বিকাশের

উদ্দীপনা যোগাইতেন। আবার কাহাকেও যদি দেশের অবমাননা করিয়া ভ্রান্তপথে ধাবমান্ দেখিতেন, তবে তাঁহাকে বিদ্রূপবাণ বিধ্বস্ত করিয়া ভুল পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দেশের সনাতন সাধনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। বঙ্কিমের অনতিপরবর্ত্তী খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট যথেষ্ট উৎসাহ এবং সাহস পাইয়া বাংলাসাহিত্যের ভিত্তিগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এক দিকে যেমন তিনি মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইতেন বা ভ্রান্ত পথিকের সত্যপথ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন, অন্যদিকে নিজে যেমন সৃজন করিতেন অপরকেও সেই সনাতন চিরসত্য সাধনায় যোগদানের নিমিত্ত আকুলকণ্ঠে আহ্বান করিতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যপথের একনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী। জাতিকে সকল দিক্ দিয়া জাগ্রত করার কর্ম্মযোগে কোনকালেও তাঁহার ক্ষুণ্ণতা প্রকাশ পায় নাই। আজীবন সেই পথে তিনি কর্ম্মযোগের সাধনাই করিয়াছেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বাংলাসাহিত্যের যে ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, আজও সেই জ্ঞানালোকবর্ত্তিকা আমাদিগকে পথ দেখায়। ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করিবার অসীম আকাঙ্ক্ষা ছিল বলিয়াই তিনি জীবানন্দ, ভবানন্দ ও সত্যানন্দের মত পুত্র ও শান্তি দেবী ও কল্যাণীর মত কন্যা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। আবার ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া কাতরোক্তি না করিয়াও পারেন নাই—

"হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?"

কেন এ আক্ষেপ? তিনি চাহিয়াছিলেন জীবানন্দ, সত্যানন্দের মত পুত্র, শান্তি ও কল্যাণীর মত কন্যারত্ন বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে জন্ম লউক। ভবানন্দ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ রজনীতে সান্দ্র মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বন্দনার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল "মাতা কে?"

ভবানন্দ উত্তর না করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীম্
সুহাসিনীম্ সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ-ত মা নয়।"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী।"

মহেন্দ্রের অন্তর প্রথমে বন্দনার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার হৃদয়ের প্রেমনিঝরিণীর স্রোতোপথ তখনও শৈবালাচ্ছন্ন, দেশাত্মবোধ তখনও সুপ্ত। ভবানন্দ বুঝাইলেন, মহেন্দ্রও বুঝিলেন। ভবানন্দ, জীবানন্দ ও সত্যানন্দের প্রভাবে আসিয়া মহেন্দ্রের দেশাত্মবোধ যে ভাবে জাগরিত হইয়াছিল, লাঞ্ছিতা, অত্যাচারিতা দেশমাতার প্রতি প্রেমসিক্ত মহেন্দ্র যেমন সব কিছু ভুলিয়া সন্তানধর্ম্মে যোগদান করিয়া অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; তিনি চাহিয়াছিলেন, 'আনন্দমঠের' দ্বারা ত্রিশকোটী নরনারীর প্রাণে দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া জাতিকে বরেণ্য করিয়া তুলিতে। মানস-কন্যা শান্তিকে তিনি শরীরচর্চ্চায়ও অভ্যস্তা করিয়াছিলেন; ভট্ট, কুমার, রঘু, মুগ্ধবোধ প্রভৃতিও শিক্ষা দিয়াছিলেন—আবার সন্তানধর্ম্মে স্বামীর সহিত প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপেও দাঁড় করাইয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃসমীপে পাঠচর্চ্চা ও শরীরচর্চ্চায় শান্তিকে নিপুণা করিয়া তুলিয়াছিলেন কেন? তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন আদর্শ প্রাচ্য রমণী। নিছক কল্পনার সাহায্যে মনগড়া কন্যা শান্তি নয়—তিনি জানিতেন চাঁদ সুলতানা, পদ্মিনী, দুর্গাবতী ও লীলাবতীর কীর্ত্তিকাহিনী। দেশাত্মবোধী বঙ্কিমের আসল অন্তরের রূপটি ধরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer aud nation builder. Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he was the inspirer and the political *guru*."

এই বঙ্কিমের সত্য পরিচয়। তাঁহার নানা ক্ষমতাই ছিল কিন্তু সকলের উপর তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রহস্যাচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য্যবহুল চরিত্রসকলের আদর্শানুসারে তিনি তাঁহাদের মহত্ত্ব নিজ

নিপুণ হস্তে জীবন্ত করিয়া মোহমুগ্ধ বাঙ্গালীর মনকে তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রচনায় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের সবকিছুই ভাল নয়, আমাদের মধ্যেও তদপেক্ষা উত্তম অনেক কিছুই লোকচক্ষুর সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে হইবে, এই চেতনা তাঁহার প্রাণেই পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গালীকে শুধু বাঙ্গালী হইয়া গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, সত্যকার মনুষ্যসাধনায় যোগদান করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মহামানবতার পথ খুঁজিতে হইবে। ইহাই ছিল তাঁহার বাণী, অন্তরের তাঁহার মূলমন্ত্র। এই চিরন্তন মনুষ্যত্বের আদর্শ পথ বাহির করিবার নিমিত্তই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শমানবরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমকে যাঁহারা অবাস্তববাদী বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন লক্ষ্য করেন, এই খানেই তাঁহার বাস্তব আদর্শবাদিতার সুন্দর দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীকে মানুষ করিবার ব্যাকুল বাসনা লইয়াই তিনি বাঙ্গালার ইতিহাস খুঁজিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী তাহার ইতিহাস ভুলিয়াছে; অতীতের অন্তান্ধকারে গৌরবময় জীবনেতিহাসের সেই যশোগীতি বিস্মৃত, মলিন হইয়া আসিয়াছে। তিনি মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন বাঙ্গালী তাহার ইতিহাস না জানিলে মানুষ হইবে না। বাঙ্গালী যদি তাহার অতীত জীবনের ইতিহাস ভোলে তবে আর সে অতীতের শক্তি-পাথেয়ে পরিপুষ্ট হইতে পারিবে না। পিতৃপিতামহের বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যুগ্র সাধনা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি দিশাহারা বাঙ্গালীর জীবনে প্রতিফলিত করিবার বাসনায় তিনি সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাই তিনি সম্মুখে অতীতের ইতিহাস উন্মোচন করিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন—"কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার, চৈতন্যের ধর্ম্ম, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়, জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের বাক্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও অনেক জাতি পৃথিবীতে আছে, কোন্ দুর্ব্বল, অসার জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে?" বাঙ্গালীর গৌরবে তিনি গৌরব বোধ করিতেন, বাঙ্গালী ছিল ঘুমঘোরে অচৈতন্য, তাহাদের মোহনিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই, বঙ্কিম দেশপ্রেমের ধ্বজা উড়াইয়া ডঙ্কানিনাদ সহকারে বাঙ্গালীর প্রাণে মাতৃমন্ত্রের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। যে বীজ তখন তিনি সাহিত্য-মধ্যে বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই আজ বহু-বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাময় হইয়া জাতীয় আন্দোলনকে মহীরুহে পরিণত করিয়াছে। নিছক উপন্যাস বা প্রবন্ধের রচনার নিমিত্তই তিনি আমাদের মধ্যে প্রাণবন্ত নন্—সভ্যতাস্রোত-ঘূর্ণীর বিপাকে দোদুল্যমান, আদর্শহারা সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যদর্শনের রক্ষাকর্ত্তা ও নবীন স্রষ্টিকর্ত্তা, একাধারে এই দুই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই আজ শতবর্ষ পরেও সেই লোকোত্তর মহাপুরুষকে স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে বুঝিবার, ভাল করিয়া জানিবার জন্য মন পাগল হইয়া উঠে। যে দেশমাতার সাধনা তিনি আজীবন করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন ত্রিংশকোটি নরনারী সেই সাধন-যজ্ঞে আহুতি দিয়া ধন্য হউক! বঙ্কিম কি স্বপ্নই তুমি দেখিয়াছিলে! বাঙ্গালীর জীবনে সে স্বপ্ন সত্য হউক!

বঙ্কিমের প্রতিভাবিষয়ে এতখানি তলাইয়া চিন্তা করিয়া, দেশ-কাল সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়াও যিনি বলেন যে, আধুনিক সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান নাই, তিনি যে কত বড় অজ্ঞান তা নিজেই বুঝুন। আধুনিক সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান নির্ণয় করিতে হইলে তিনি যে সময় স্বেচ্ছায় সাহিত্য সাধনায় রত হইয়াছিলেন সেই সময়ের কথা ভাবিতে হইবে। প্রাণ-শক্তিতে তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে, শুধু মত প্রকাশ করিলেই চলিবে না, চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের আবেগ-নির্ঝরিণীর মূল উৎস কোথায়? কাহার পাথেয় পরিপুষ্ট হইয়া বাংলা-সাহিত্য আজ এতখানি সমৃদ্ধ। বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে করিতে যদি তাঁহার সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত ভাষা খটমট ঠেকে, ভাবিয়া দেখিতে হইবে বঙ্কিম-পূর্ব্ব বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কত বড় ভাষার সংস্কার তিনি করিয়া গিয়াছেন, এইরূপভাবে বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। ভাষার একটু অপ্রিয়তা সাহিত্যে বঙ্কিমের অপরিসীম দানের নিকট কত তুচ্ছ, কত নগণ্য। সামান্য একটু ভাষার তারতম্য লক্ষিত হয় বলিয়াই বা সেইরূপ লিখনভঙ্গী শ্রুতি-মধুর নয় বলিয়াই যদি তাঁহার প্রতি আমরা অকৃতজ্ঞ হই, তবে তাহাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কিছুই নাই।

বঙ্কিম বাংলাসাহিত্যের সম্রাট্, শুধু উনবিংশ শতাব্দীর নন্ আধুনিক সাহিত্যেরও—আর থাকিবেনও চিরকাল। ভবিষ্যতের অদৃশ্য কালগর্ভে কি নিহিত বলা যায় না, নতুবা এইরূপ যুগস্রষ্টা, ঋষিকল্প প্রতিভার আবির্ভাব সময়সাপেক্ষ, জাতির যুগযুগান্তরের তপস্যালব্ধ। বন্দে-মাতরম্!

বর্ত্তমান জগৎ

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

জার্ম্মানী কি ডানৎসিক আক্রমণ করিবে? আবার কি মহাযুদ্ধ বাধিবে? কবে বাধিবে? এই চিন্তা আজ ইউরোপের জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রনায়কদের পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলের অভিমত এই যে, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিনটি মাস ইউরোপের পক্ষে কঠিন সময়। ডানৎসিক সম্বন্ধে জার্ম্মানীর অসঙ্গত জেদ এবং তাহার সৈন্য-সমাবেশ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জার্ম্মানী যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইতেছে।

মিঃ নেভিল চেম্বারলেন

অধিকাংশ বৃটিশ এবং ফরাসী রাষ্ট্রনায়কেরই তাহাই অভিমত। কেবল মিঃ অ্যাণ্টনী ইডেনের বিশ্বাস, বৃটেনের সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হইবার পর জার্ম্মানী কখনই ডানৎসিক আক্রমণে সাহস করিবে না। জার্ম্মান পত্রিকাগুলির আস্ফালন ফাঁকা আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই চালবাজির সাহায্যে তাহারা চেকো-শ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াছে। মিঃ ইডেন আরও বলেন যে, মিঃ চেম্বারলেনের দৃঢ়তার অভাবই হের হিটলারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র এবং পূর্ব্বে মিঃ চেম্বারলেন যদি হের হিটলারের সঙ্কল্পের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করিতেন, তাহা হইলে চেকো-শ্লোভাকিয়ার কখনই এমন সর্ব্বনাশ হইত না।

মিঃ ইডেনের এই কথা আংশিক ভাবে সত্য। হের হিটলার যে বৃটেন ও ফ্রান্সের দুর্ব্বলতার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে হয়ত সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন দৃঢ়তা দেখাইলেই যে হের হিটলার ভয় পাইয়া পিছাইয়া যাইতেন তাহাও সত্য নহে। মিঃ চেম্বারলেনও আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। কমন্স সভায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, চেকো-শ্লোভাকিয়ার সম্বন্ধে তিনি যদি দৃঢ়তা দেখাইতেন, তাহা হইলে মহাযুদ্ধ না বাধিয়া যাইত না। বৃটেনের অস্ত্রবলকে জার্ম্মানী যে মোটেই ভয় করে না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় না হইলে মিঃ চেম্বারলেনও বোধ হয় চেকো-শ্লোভাকিয়ার সর্ব্বনাশে সম্মতি দিতেন না।

ব্রিটিশ 'প্রেষ্টিজ'

বস্তুতঃ পক্ষে বৃটিশ 'প্রেষ্টিজ' বলিয়া যে বস্তু এতকাল বিশ্ব-সংসারে প্রচলিত ছিল, জার্ম্মানী-জাপান-ইতালী ত' দূরের কথা, স্বয়ং বৃটেনও এখন সে সম্বন্ধে উদাসীন। একদা বৃটেনের একটা হুমকিই যেখানে যথেষ্ট ছিল, এখন তাহার বহুবিঘোষিত জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-বাহিনীর সমাবেশও সেখানে কুলায় না। বৃটেনকে এখন আর কেহই ভয় করে না। যেটুকু শ্রদ্ধা ও ভীতি কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও দুর্ব্বল জাতিদের মনে ছিল, চোখের সামনে বৃটেনকে পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইতে দেখিয়া তাহার টুকরামাত্রও আর কাহারও মনে অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না।

সত্য বটে জার্ম্মানী আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জাপান

এবং ইতালীও আজ দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু বৃটিশ প্রেষ্টিজের মৃত্যুর জন্য তাহারা দায়ী নয়, দায়ী মিঃ চেম্বারলেনের পররাষ্ট্র নীতি, ইহাই বহু রাষ্ট্রনায়কের অভিমত।

পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন

মিঃ ইডেন এবং মিঃ ডাফ কুপার সেই নীতির বিরোধিতা করিতে গিয়া পদচ্যুত হন। মিঃ চেম্বারলেন তখন জার্ম্মানী ও ইতালীকে খুশী করিয়া শান্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। অবশেষে "appeasement" নীতিও সফল হইল না। বরং অনুকূল বাতাসে তাহাদের লোভের আগুন বাড়িতেই লাগিল। চেম্বারলেনকে পিছু হটিতে হইল, এবং যে নীতি একদা তিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন আবার তাহাকেই মাথায় তুলিয়া লইতে হইল। পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সঙ্গে চুক্তি হইল। ডানৎসিক কোন ছলেই আক্রমণ করিলে বৃটেন যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে না তাহাও জার্ম্মানীকে জানাইয়া দিলেন। ইঙ্গ-পোলিশ চুক্তির পরেও সামান্য ডানৎসিক লইয়া মহাযুদ্ধ বাধার বিরুদ্ধে তাঁহার দলের মুখপত্র "টাইম্‌সে" যে অভিমত প্রকাশিত হইত, এখন তাহাও বন্ধ হইয়াছে। বৃটেন ডানৎসিকের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এমনও শোনা যাইতেছে যে, অচিরেই বৃটিশ মন্ত্রিসভায় মিঃ চার্চ্চিল এবং মিঃ ইডেনও স্থান লাভ করিবেন। আরও একটা বড় কথা এই যে, পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করা সম্বন্ধে বৃটেনের সমস্ত দলই একমত।

"Warning Week"

জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহটিকে বিলাতের "টাইম্‌স্‌" পত্রিকা "Warning Week" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'হুঁসিয়ারী সপ্তাহই' বটে! সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স, মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ ইডেন এবং শ্রমিক দলের মিঃ গ্রীনউড সকলেই পাইকারীভাবে হের হিটলারকে হুঁসিয়ার করিয়া দিয়াছেন, যেন তিনি ডানৎসিক আক্রমণ করিয়া মহাযুদ্ধের হেতু না হন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ডানৎসিকে জার্ম্মান সৈন্য ও সমরাস্ত্র নামার বিরাম নাই। ছোট-খাটো দুর্ঘটনাও ঘটিতেছে।

সম্প্রতি ডানৎসিকে একটি পোলিশ রেল কর্ম্মচারীকে উদ্দীপরা নাৎসীরা প্রহার করিয়াছে। এবং শিকাগুজেটির বার জন শ্রমিককে জার্ম্মান বন্দীনিবাসে (concentration camp) প্রেরণ করিয়াছে। অপর দিকে জনৈক পোলিশ কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পলায়ন করার চেষ্টা করায় একজন জার্ম্মান গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে। কোনিগস্‌বার্গ-বার্লিন এক্সপ্রেস ধ্বংস করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। ড্রাইভারের তৎপরতায় ট্রেনখানি বাঁচিয়া যায়। ওদিকে চেক-পোলিশ সীমান্তেও জার্ম্মান সৈন্য সমবেত হইতেছে, এবং সীমান্ত হইতে দুই শত গজ দূরে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া ঘেরা হইতেছে। ইহার পরে পোলিশ গবর্ণমেণ্ট যত শান্ত

হের হিটলার

ভাবই অবলম্বন করিয়া থাকুন, এ কথা কিছুতেই বলা চলে না যে, চেম্বারলেনের হুমকিতে হের হিটলার ভয় পাইয়াছেন।

১০ই জুলাই তারিখে মিঃ চেম্বারলেন কমন্স সভায় আবার বলিয়াছেন:

"We have guaranteed to give our assistance to Poland *in case of a clear threat to her independence* which she considers it vital to resist with all her national force and we are firmly resolved to carry out this undertaking."

মিঃ চেম্বারলেনের এই কথার মধ্যে যদি কোথাও দ্ব্যর্থ থাকে, তাহা একটি মাত্র জায়গায় "in case of clear threat to her independence," কারণ কোন্‌টা clear threat, কোন্‌টা নয়, তাহা যথাসময়ে স্থির করা সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু ডানৎসিক যে পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সেখানে অন্য শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে পোলাণ্ডের সমুদ্রপথ বন্ধ করিয়া তাহার সমূহ ক্ষতি করিতে পারে তাহাও মিঃ চেম্বারলেন পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন।

ইহার পরে তাঁহার উক্তিতে আর দ্ব্যর্থ কোথাও থাকে না।

নূতন ইঙ্গিত

তবু এই বক্তৃতাতেও মিঃ চেম্বারলেন নূতন একটা মীমাংসার ইঙ্গিতও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন।

"I have said that while the present settlement is neither basically unjust or illogical, it may be capable of improvement. It may be that in a clearer atmosphere the possible improvement could be discussed."

ইহা appeasement-এর কথা। চেকো-শ্লোভাকিয়া ধ্বংসের পূর্ব্বেও এমনি একটা উদ্দেশ্য লইয়া তিনি মিউনিক-চুক্তি করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই শোনা যাইতেছে, জার্ম্মান-বিরোধিতা হ্রাস করিবার জন্য পোলাণ্ডের খবরের কাগজে ডানৎসিকের সংবাদ আর বড় করিয়া ছাপা হয় না। ওয়ারসতে একটা শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টির তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কে জানে মহাযুদ্ধের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য মিঃ চেম্বারলেন দ্বিতীয় একটা মিউনিকের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন কি না।

ইঙ্গ-রুশ আলোচনা

ইঙ্গ-রুশ আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। সন্ধির চুক্তিও হাওয়ায় ঝুলিতেছে। মিঃ চেম্বারলেন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে যেন একটা পর্দ্দা ঝুলিতেছে। বৃটেন যে সত্য সত্যই আক্রমণ বন্ধ করিতে চাহে তাহা রাশিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। রাশিয়ার বিদেশ-সচিব মঃ মোলোটফ এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, "অনেকে আক্রমণের গতিটা অন্য দিকে (অর্থাৎ রাশিয়ার দিকে) মোড় ফিরাইতে ইচ্ছুক"। তাঁহার আশঙ্কা, রাশিয়াকে অন্য রাজ্য রক্ষার কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই বৃটেন এই চাল চালিতেছে।

মিঃ চেম্বারলেন রাশিয়ার এই মনোভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির সহিত পরিচিত তাঁহারা বিস্মিত হইতেছেন না। এমন কি "মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পর্য্যন্ত সখেদে স্বীকার করিয়াছেন:

"We are stiil paying a price for the way in which we helped to thrust Russia out of the settlement of Munich."

হিটলারের একটা কথায় চেম্বারলেন যে-ভাবে রাশিয়াকে মিউনিক-আলোচনা হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন, রাশিয়া সহজে সে কথা ভুলিতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চেম্বারলেন শুধু ইতালী, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সকে লইয়াই ইউরোপ সম্বন্ধে যাবতীয় কাজ করিয়া আসিয়াছেন। রাশিয়াকে মিঃ চেম্বারলেন বরাবর দূরেই রাখিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের একটানা তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে রাশিয়ার মনে বৃটেনের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা বোধ হয় অস্বাভাবিক নহে? সেই সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব বৃটেনেরই, এবং এ পর্য্যন্ত তাহার জন্য বৃটেন দুইটি কাজ করিয়াছে যাহাকে সে revolutionary মনে করে: প্রথম, বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রকে (পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া) রক্ষার প্রতিশ্রুতি-দান, দ্বিতীয়, বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহ। কিন্তু রাশিয়ার সম্বন্ধে বৃটেনের মনোভাব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য বোধ হয় তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই।

রাশিয়ার দাবী

সোভিয়েটের দাবী—পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার রক্ষার জন্য যেমন রাশিয়া প্রতিশ্রুতি দিবে, বিনিময়ে ফ্রান্স এবং বৃটেনকেও তেমনি বালটিক রাজ্যগুলিকে (ফিনল্যাণ্ড, এষ্টোনিয়া ও লাটভিয়া) রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। উক্ত তিনটি রাজ্যই নিরপেক্ষ রাজ্য বলিয়া পরিচিত। ছোট ছোট রাজ্য,—না আছে সৈন্যবল, না আছে কিছু। ফিনল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব জানাইয়াছেন, তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে কোনো প্রতিশ্রুতি চাহেন না। এষ্টোনিয়া ও লাটভিয়া জার্ম্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের পক্ষেও রক্ষার কোনো প্রতিশ্রুতি লওয়া

অসম্ভব। এমন অবস্থায় বৃটেনের বক্তব্য, যাহারা নিজেরা কোনও প্রতিশ্রুতি লইতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কি হেতু থাকিতে পারে ?

রাশিয়া বলিতেছে, বাল্‌টিক রাজ্যগুলির চুক্তি ভঙ্গ করিয়া প্রতিশ্রুতি চাহিবার অধিকার নাই। কিন্তু গ্রীস রক্ষা করিতে বৃটেনের যে স্বার্থ, উহাদিগকে রক্ষা করিতে রাশিয়ার স্বার্থ তাহার চেয়ে বেশী। এগুলি রুশ-সীমান্তে অবস্থিত এবং চুক্তির প্রতি জার্ম্মানীর যে প্রকার শ্রদ্ধা তাহাতে যে কোনও সময় এই সকল দুর্ব্বল রাজ্য গ্রাস করা জার্ম্মানীর পক্ষে স্বাভাবিক। তাহাতে রাশিয়ার সমূহ বিপদ। সুতরাং উহারা প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করুক আর না করুক, রাশিয়ার নিকট বৃটেনকে সে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

এই সমস্যার এখনও মীমাংসা হয় নাই।

সম্রাট্‌দম্পতির সফর

সম্রাট্‌দম্পতি কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। উভয় স্থানেই তাঁহারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। কানাডা স্বায়ত্ত-শাসনশীল উপনিবেশ। সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে বৃটিশের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র। সুতরাং এই ভ্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ড-রাজের বিরুদ্ধে তখন তাহাদের বিদ্বেষের অন্ত ছিল না :

"A Prince whose character is marked by every act which may define a Tyrant is unfit to be the ruler of a free people."

তৃতীয় জর্জ্জ আর নাই, সে স্মৃতিও অবলুপ্ত। ইংলণ্ডের সে রাজতন্ত্রেরও অবসান হইয়াছে। তথাপি "রাজা" সম্বন্ধে গণতন্ত্রী মার্কিনের যদি কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকেও, ষষ্ঠ জর্জ্জের কল্যাণে তাহাও বিদূরিত হইয়াছে। রাজা যখন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে পারেন এবং বিনা মুকুটেই ওয়াশিংটনের রাজপথে বাহির হইতে পারেন, তখন রাজা সম্বন্ধে গণতন্ত্র-বিরোধী কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা সম্ভব নহে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহাদের এই বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন :

"Well, at last I greet you. How are you? I am glad to see you."

ইঙ্গ-জাপান আলোচনা

চীনকে বৃটেনের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জাপান পুনঃ পুনঃ বৃটেনকে অপমানিত করিবার নীতি

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ

অবলম্বন করিয়াছে। বৃটেনের আর সে দিন নাই যে, এই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিবে। তবু সে এই অপমান নিঃশব্দে এবং দৃঢ়ভাবে অনেকদিন সহ্য করিয়াছে। কিন্তু শেষে অপমান যখন তাহার নারী-জাতি এবং শ্বেতাঙ্গকেও স্পর্শ করিল, তখন তাহা সহন-সীমা অতিক্রম করিল। ১৭ই

জুলাই পর্য্যন্তও মিঃ চেম্বারলেন কমন্স সভায় যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। ২২শে তারিখে অকস্মাৎ সংবাদ আসে, বৃটেন জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। চীনের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পর যে-সকল অঞ্চল জাপানের হাতে আসিয়াছে তাহা শাসন করিবার অধিকার জাপানের আছে; জাপানী-সৈন্যের সাবধানতার জন্য অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক বিবিধ আদেশ জারী করিবার অধিকারও তাহার আছে; মিঃ চেম্বারলেন এ-কথা শিরোধার্য্য করিয়া জাপানের সহিত প্রাথমিক আলোচনার পথ প্রশস্ত করিলেন।

অপমান ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বৃটেন অনেকদিন হইতেই একটা চুক্তির সুযোগ খুঁজিতে-

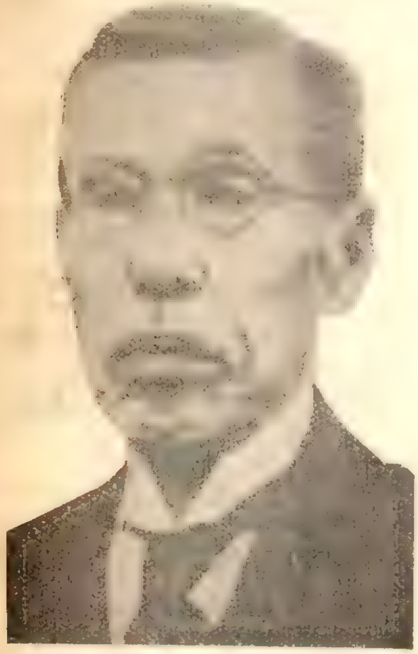

ব্যারন হিরানুমা

ছিল। জাপান দাবী করিয়াছিল, বৃটেন যতদিন তাহার চীন-বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া জাপানের মৌলিক দাবী মানিয়া না লইতেছে, ততদিন আপোষের কোনো কথাই উঠিতে পারে না। তিয়েনৎসিনের অত্যাচারও সমানভাবে চলিবে। নিরুপায় বৃটেন অবশেষে তাহাতেই সম্মতি দিয়াছে। তাহার ফলে এখন টোকিওতে ইঙ্গ-জাপান আলোচনার বৈঠক সম্ভব হইয়াছে।

বৈঠক সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু অপমান এবং অত্যাচারের জের তাহাতেও মিটে নাই। যতদিন ইঙ্গ-জাপান বৈঠক শেষ না হইতেছে এবং বৃটেন সেই বৈঠকের সমস্ত সর্ত্ত তাহাদের এলাকায় অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন না করিতেছে, ততদিন তিয়েনৎসিনে ইংরাজ নর-নারীর লাঞ্ছনা আগের মতই চলিবে।

টোকিও বৈঠক

টোকিও বৈঠক সমানে চলিতেছে। কি কি সর্ত্তে সেখানে আলোচনা চলিতেছে এবং তাহার ফলাফলই বা কি হইতেছে, এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। জাপানী সংবাদপত্র হইতে জানা যায়, জাপানের দাবী এইরূপ:

(১) তিয়েনৎসিনের শুল্ক বিভাগের কমিশনার মিঃ চেং শি-কাংকে হত্যা করিবার অপরাধে যে চারিজনকে সন্দেহ করা হয় তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে হইবে;

(২) তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকায় আইনভঙ্গকারীদের দমনের জন্য কঠোর পুলিসের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেখানকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(৩) বৃটিশ এলাকায় জাপান-বিরোধী সঙ্ঘগুলি খানাতল্লাস করিতে হইবে;

(৪) মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য অফিস হইতে জাপান-বিরোধী চীনা কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত করিতে হইবে;

(৫) বৃটিশ এলাকার চীনা ব্যাঙ্কে যত রৌপ্য মজুত আছে সমস্ত জাপানের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে;

(৬) চীনা মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে;

(৭) জাপানের অধীনে যে চীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে তাহার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট প্রচলনের সাহায্য করিতে হইবে; এবং

(৮) অন্যান্য এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের তহবিলে যত চীনা অর্থ মজুত আছে তাহা জাপানকে পরীক্ষা করিতে দিতে হইবে।

এই সমস্ত সর্ত্তের প্রত্যেক দফায় জাপানের জবরদস্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গায়ের জোরে জাপান এগুলি বৃটেনের ঘাড়ে চাপাইতে চাহে। বৃটেন কি করিবে তাহা দেখিবার বিষয়।

আমেরিকা ও জাপান

অবস্থা যখন এই রকম, ঠিক সেই সময় আমেরিকা অকস্মাৎ ১৯১১ সালের জাপ-মার্কিণ বাণিজ্য ও নৌচুক্তি বাতিল করিয়া দিয়া বিশ্বশুদ্ধ সকলকে তাক লাগাইয়া দিল। ১৯৪০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হইবে।

তখন হইতে আর আমেরিকার কাঁচা মাল জাপানে রপ্তানী হইবে না। জাপানী বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসিতে পারে। আর জাপান হইতে প্রতি বৎসর ৪১॥ কোটী ডলার মূল্যের যে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমেরিকায় রপ্তানী হয় তাহাও বন্ধ হইবে। অবস্থাটা জাপানের পক্ষে খুব সুবিধা-জনক হইবে না। আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে নূতন আর একটা বাণিজ্যচুক্তি অবশ্য হইতে পারে, তবে না হইবার আশঙ্কাই অধিক।

"নিউইয়র্ক টাইমস্" এই প্রসঙ্গে আমেরিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন :

'The United States' action means that if Japan through the present series of face-slappings of Americans by Japanese soldiers in China is deliber_tely seeking to make the United States lose face in the Far East, the entire Orient might as well know that the United States intends to assert her prestige vigorously and will meet Japan with the only language a military-dominated Government seems to understand."

বলা বাহুল্য "নিউইয়র্ক টাইমস্" যে চপেটাঘাতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আস্বাদ আমেরিকানদের কোনদিন গ্রহণ করিতে হয় নাই। জাপান আর যাহার উপর যে অত্যাচারই করিয়া থাকুক, আমেরিকার ক্রোধকে সকল সময়ই সভয়ে এবং সযত্নে এড়াইয়া চলিয়াছে। "প্যানে" দুর্ঘটনার জন্য জাপান যে শুধু ক্ষতিপূরণ দিয়াছে তাহাই নয়, জাপান-সম্রাট্‌কে পর্য্যন্ত বেতারযোগে আমেরিকার জনসাধারণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিয়েনৎসিনেও জাপানী সৈন্য আমেরিকানদের সঙ্গে সসম্মান ব্যবহার করিয়াছিল।

বস্তুত পক্ষে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই ব্যবস্থায় জাপানীরা হতচকিত হইয়া গিয়াছে। এক্সচেঞ্জের বাজারে শেয়ারের দর সঙ্গে সঙ্গে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপানীরা যুদ্ধের জন্য যে সামরিক ব্যয়ভার তাহাদের উপর চাপিয়াছে তাহাও আর বহিতে পারিতেছে না। তথাপি তাহাদের বিশ্বাস ছিল, আমেরিকা পরোক্ষভাবে জাপানের সামরিক নীতি সমর্থন করে। সুতরাং এই ব্যবস্থার একটা প্রতিক্রিয়া অবিলম্বেই তাহাদের উপর দেখা দিবে। আমেরিকার সমর্থন লাভ করিয়া বৃটেনও এখন তাহাদের হৃত মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারে।

ইতিমধ্যে জাপান জার্ম্মানীর সঙ্গে একটা বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহা আমেরিকার ব্যবস্থার প্রত্যুত্তরেই

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

করা হইয়াছে, যদিও আমেরিকার ব্যবস্থায় যে ক্ষতি জাপানের হইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহাতে অল্প সান্ত্বনাই মিলিবে।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন

পার্লামেণ্টের গ্রীষ্মাধিবেশন শেষ হইল। সাধারণত এই সময়েই ইহা বন্ধ হয় এবং শরৎকালে পুনরায় খোলে। কিন্তু এবারে এই অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য অনেক সদস্য অধিবেশন বন্ধ রাখার বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের কথা টিকে নাই। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, এই সুযোগে আগামী দুই মাস কাল মিঃ চেম্বারলেন নিশ্চিন্তে তাঁহার "শান্তিনীতি" চালাইবেন। সুদূর প্রাচ্যের নীতির আমূল পরিবর্ত্তন, ডানৎসিকেরও যাহোক একটা সুব্যবস্থা জার্ম্মানীকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা প্রভৃতির ব্যবস্থা এই অবসরে

হইয়া যাইবে অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন। পার্লামেণ্টের বৈঠক চলিতে থাকিলে এই সব কার্য্যে বহু বাধার সম্ভাবনা থাকিত, অনেক অসুবিধাজনক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইত। এখন আর সে-সব ঝামেলা রহিল না। ভালয় ভালয় নিঃশব্দে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেলে তখন ভোটের জোরে মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে সব ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন।

মিঃ চেম্বারলেনের নীতির যে পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাতে এই সন্দেহ একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। একটু ভরসা এই যে, তিনি বলিয়াছেন, পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অক্ষম। তবে গবর্ণমেণ্ট যদি সেরূপ কোন সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তিনি পার্লামেণ্টের বৈঠক আহ্বান করিবেন।

স্পেনে পুনরায় রাজতন্ত্র

ইতিমধ্যে একটা সংবাদ শোনা যাইতেছে, জেনারেল ফ্রাঙ্কো না কি স্পেনের বিতাড়িত রাজা আল্‌ফোন্‌সোকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার পক্ষ হইতে রাজতন্ত্রীদলের নেতা ডিউক অফ মাউরা না কি ভূতপূর্ব্ব রাজা আল্‌ফোন্‌সোর সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য লোজান যাত্রা করিয়াছেন।

জার্ম্মানী-ইতালীর প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্পেনে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সেই আবহাওয়াকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে পারে।

ফরাসী ব্যাঙ্কে স্পেনের গণতন্ত্রীদের ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের যে স্বর্ণ মজুত ছিল ফরাসী আদালতের নির্দ্দেশে তাহা ব্যাঙ্ক অফ স্পেনে প্রত্যর্পিত হইয়াছে।

মায়ের সন্ধান

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

মা গো তুমি দুষ্টু মেয়ে,
দেখতে পাও না তাই
তোমার ছোট্ট খুকু কাঁদে
কেনই সর্ব্বদাই!
যেদিন তুমি গেলে চ'লে
আমায় কিছু নাহি ব'লে,
সেদিন থেকে চক্ষে আমার
নিদ্রা যে গো নাই!
মা গো তুমি দুষ্টু মেয়ে,
দেখতে পাও না তাই!

মা গো তুমি আছ বুঝি
তারার হাসির মাঝে
আকাশ পানে তাকিয়ে রই
নিদ্রা আসে না যে!
তন্ন ক'রে সকল তারা
খুঁজি, চোখের পলকহারা,
বুঝি তোমায় দেখতে পাব
একটি বারও সাঁঝে!
মা গো তুমি আছ বুঝি
তারার হাসির মাঝে?

মা গো তুমি আছ বুঝি
স্বপন-পরীর দেশে?
রাত্রি-দিবস বেড়াও বুঝি
ফুলের হাসি হেসে?
তুমি কেমন হাসছ নিতি,—
এ-কী তোমার স্নেহের রীতি?
অশ্রুজলে যায় বুঝি তাই
খুকুর দু'চোখ ভেসে?
মা গো তুমি আছ বুঝি
স্বপন-পরীর দেশে?

মা রে আমার বল্ না মোরে,
কোথায় আছিস্ তুই?
কোথায় গিয়ে কেমন ক'রে
তোর ঐ চরণ ছুঁই?
এখন আমার নেইকো ভয়,
সর্ব্ব ভয়ে করেছি জয়!
একলা এখন খুঁজতে পারি
আকাশ পাতাল ভুঁই!
মা রে আমার বল না মোরে
কোথায় আছিস তুই?

একটি মুখ [শিল্পী—শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

মিছিল

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

আফিসে সারাদিন হিসাবের খাতা ঘাঁটিয়া, প্রায় টলিতে টলিতে, বাড়ী আসিয়া সবেমাত্র জুতাজোড়াটা খুলিতেছি, এমন সময় আমার ছোট মেয়েটী হাতে একখানি চিঠি লইয়া, একরূপ নাচিতে নাচিতে আসিয়া কহিল, "বাবা, দিদি আর জামাইবাবু কাল সকালে আসছেন।"

ঘাড় তুলিয়া কহিলাম—"তাই না কি, কই দেখি?"

পত্র দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম না। জামাতা বাবাজীবন দিন কয়েকের জন্য সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিতেছেন, উদ্দেশ্য বেড়ান। চিঠিখানি হাতে লইয়া, গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কন্যা-জামাতা আসিতেছে শুনিয়া বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইলাম না—শুধু মনের মাঝে নানা রকমের খরচের কথা বার বার উঁকি দিয়া যাইতে লাগিল—ভাল খাবার, ভাল মাছ, এখানে-ওখানে যাওয়ার খরচ, কিছু কাপড়-চোপড়, তথা সিনেমা-থিয়েটার প্রভৃতি খরচের কথাগুলি, বিশেষতঃ এই দুর্দ্দিনে, মাসের শেষে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায়। সারাদিনের পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কের উপর এই চিন্তা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। পত্রখানি হাতে করিয়া আফিসের সাজশুদ্ধ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

কোন্ সময় অরুণা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল, আসন্ন দুশ্চিন্তার মধ্যে তাহা লক্ষ্য করি নাই। অরুণার গলার শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম।

"এ কি, এখনও জামা-কাপড় ছাড় নি, ওদিকে চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।" নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, "হাঁ, এই যে।"

অরুণা কোলের ছেলেটীকে লইয়া আমার নিকটে আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, আফিস থেকে এসে, গুম্ হয়ে কি ভাবছ? দিন-রাত অত ভাবনা কেন বাপু।"

"ভাবনা! ভাববার কি সীমা আছে অরু? মাসের শেষ, এক পয়সাও হাতে নেই, অথচ মেয়ে-জামাই আসছে,—কোথেকে যে কি হ'বে।" অরুণা চুপ করিয়া রহিল।

অরুণা জানে, বোঝে। মাস শেষ হইয়া মাহিনা পাইতে এখনও কিছু দেরী আছে, অথচ ঘরে সমস্ত জিনিষই বাড়ন্ত। যাহা যৎসামান্য আছে, তাহাতে কোনক্রমে নিজেদেরই চলে, কিন্তু তাহাতে জামাতা বাবাজীবনের মান রক্ষা করা চলে না। অথচ দোকানে নূতন করিয়া ধার করাও অসম্ভব। এমনই অনেক টাকা বাকী—প্রত্যেক মাসে তাই আমার লম্বা চওড়া ফর্দ্দখানি উঁহারা নির্ম্মমভাবে কাটিয়া-ছাঁটিয়া, যাহা সরবরাহ করে, তাহাতে নিজেদেরই সঙ্কুলান হয় না। ঘরে কাহারও হাতে এক পয়সা নাই, যাহা আছে তাহা অতি সামান্য। এখন উপায় কি? এমন কিছু সোনার গহনা নাই যে, বাঁধা দিয়া উপস্থিত দায় উদ্ধার হওয়া যায়। অফিসের সময় হইলে, জমাদারের কাছে কিছু ধার করিবার চেষ্টা করিতাম—কিন্তু তাহারও এখন উপায় নাই। সকালের গাড়ীতে মেয়ে-জামাই আসিতেছে, চাল ডাল, মিষ্টি, মাছ-তরকারী সবই সকলেই প্রয়োজন, কিন্তু হাত শূন্য, এ-ক্ষেত্রে গালে হাত দিয়া চিন্তা করা ভিন্ন অন্য পথ কি?

চা আর সামান্য জলখাবার মুখে বিস্বাদ ও তিক্ত লাগিতে লাগিল। আসন্ন দুর্ভাবনায় আপাদমস্তক ব্যথিত হইয়া উঠিল। মাত্র একটী রাত—সামান্য কয়েক ঘণ্টা বই ত নয়।

অরুণার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, মেয়ে-জামাইয়ের আগমনের আনন্দে তার সমস্ত দেহ যেন উৎসাহের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র সরাইতেছে, সাজাইতেছে, গুছাইতেছে। আমি আমার ভাঙ্গা ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায়, তামাক টানিতে টানিতে সবই লক্ষ্য করিতেছিলাম। সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলিয়া উঠিল, ছেলেরা কোলাহল করিতে করিতে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। দিদি-জামাইবাবু আসিতেছে শুনিয়া উহারা মাতামাতির পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দিল—থিয়েটার, বায়স্কোপ, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি কিছুই যে না দেখিয়া ছাড়িবে না, উচ্চ কণ্ঠে সকলকে জানাইয়া দিল কিন্তু আমি অন্ধকারে তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে শুধু মাত্র ধোঁয়াই দেখিতে লাগিলাম।

অরুণার কথায় চমক ভাঙ্গিয়া গেল—"আচ্ছা, তোমার কে

একজন বন্ধু, সত্যেনবাবু—সেই দশটা টাকা গত মাসে ধার নিয়েছিলেন—ফেরত দেন নি তো। তা একবার যাও না কেন?"

অরুণা আমার কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ধকারে তামাকের ধোঁয়ার মাঝে, যেন আলোক দেখিতে পাইলাম। আকাশের সুদূরবর্ত্তী চাঁদ যেন হাতের কাছে আসিয়া পড়িল। অস্ফুট শব্দে কহিলাম, "ঠিকই ত—দাও, জামাটা দাও।" না, এখনই যাইতে হইতেছে—সত্যেন আচ্ছা লোক বটে। আজ দুই মাস হইতে চলিল, দশটা টাকা লইয়া গিয়াছে, কিন্তু ফেরৎ দিবার নামগন্ধ নাই, অথচ এখন দিব্য চাকরী করিতেছে, অসময়ের বন্ধুর ঋণ এখন মনে থাকিবে কেন?

অস্থির ভাবে, গায়ে জামাটা চাপাইয়া হাসিয়া কহিলাম, "বলে ফেল গো—কি কি আনতে হবে—মানে যা না আনলেই নয়—এই ধর ঘি ময়দা-মশলা-টশলা। খাবার সকালে আনলেই হবে, কি বল? এখন কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখি। সকালে আবার আফিসের তাড়া, বুঝলে না।" অরুণা মুখে মুখে, জিনিষের নামগুলি বলিয়া দিল, মনে মনে জিনিষগুলির নাম আবৃত্তি করিয়া কহিলাম—"এই ত, এ মনে থাকবে এখন। লিখে নেবার দরকার নেই। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও, ছেলেদের খাইয়ে দিও—এখন ওরা পড়াশুনা করুক।"

দরজার বাহিরে পা দিয়াছি, অরুণা ডাকিয়া কহিল, "বুঝলে, ভাল আম কিছু এন।" ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, "আম—আচ্ছা নিশ্চয়ই আনব।"

রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে জিনিষগুলির নাম আর একবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম—ঘি, আটা, সুজি, ছোট এলাচ, মৌরী, সুপারি, কিন্তু তারপর, তারপর! ঠিক মনে হইয়াছে—পাঁচফোড়ন আর লঙ্কা। না, ভুলি নাই দেখিতেছি, সকালে শুধু মিষ্টি, দুধ, মাছ, আর তরিতরকারী কিনিলেই হইবে। এসব ওরা আসিবার পর কিনিলেই চলিবে কিন্তু সকালে ষ্টেশনে যাওয়া উচিত বোধ হয়? না, প্রয়োজনটাই বা কি? কিন্তু সত্যেনের আক্কেলটা বলিহারী, আশ্চর্য্য লোক, দুই মাস হইতে চলিল, টাকা দিবার নাম গন্ধ নাই। টাকা লইবার সময় কি কাকুতি-মিনতি; দিন কয়েকের মধ্যে ফেরৎ দিব বলিয়া দুই মাস শেষ করিয়া দিল—যার কথায় ঠিক নাই তার মূল্যই বা কি? সত্যই সংসারে লোক চেনা খুবই মুস্কিল। "কেন রে বাপু, এখন ত বেকার নস, চাকরী করছিস—দিব্বি কড়কড়ে টাকা পাচ্ছিস, এ দশটা টাকা ফেলে দিলেই ত হয়, ল্যাঠা চুকে যায়।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম এবার হইতে, আর ধার দিব না, ধার দেওয়া বড়ই খারাপ কাজ।

দ্রুত হাঁটিতে লাগিলাম; বড় রাস্তা ছাড়িয়া সত্যেনের বাসার গলি-পথ ধরিলাম। গলিটার মধ্যে আসিয়া মনে হইল, এ যেন কলকাতার রাস্তা নয়। না আছে আলো, না আছে বাতাস। রাস্তা অন্ধকার, আর আবর্জ্জনাময় ড্রেনের পচা গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়া আসিতে চায়। নাকে কাপড় দিয়া হাতের লাঠিগাছটা ঠুকিতে ঠুকিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, হঠাৎ একটা কথা মনে উঁকি দিল। এই পচা গলির মধ্যে, সত্যেন কি আজও বাস করিতেছে? এখন চাকরী করিতেছে, মাসে মাসে মাহিনা পাইতেছে, এখন কোন্ দুঃখে এই নরককুণ্ডে পচিয়া মরিবে, হয় ত অন্যত্র গিয়াছে, এখন উপায়?

আমার সমস্ত শরীরে একটা শীতল শিহরণ খেলিয়া গেল, ভাবিলাম, এখন উপায় কি? রাত্রি হইয়া উঠিয়াছে, এই রাত্রে কোথায় টাকা পাইব, অথচ টাকা চাই-ই, অরুণা আমার ভরসায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে। ঘি-আটা-মিষ্টি-তরী-তরকারী এ সব কোথা হইতে আসিবে, না, কোন উপায়ই নজরে পড়ে না। স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুতে আমার সমস্ত শরীর ভিজিয়া গেল, দেশলাই জ্বালাইয়া বাড়ীর নম্বর দেখিয়া, দরজার কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে নাড়িতে হাঁক দিলাম, "সত্যেন, সত্যেন আছ না কি"? চীৎকার করিয়া ডাকাত-পড়ার মত হাঁক ছাড়িতে লাগিলাম কিন্তু কোথাও বিন্দুতম আলোর রেখা বা মানুষের সাড়া-শব্দ কিছুই নাই। বুঝিলাম, সত্যেন নাই। কিন্তু তাহার ছেলে-মেয়েরাই বা গেল কোথায়?

কি করিব ভাবিতে ভাবিতে, আর একবার কড়া নাড়িতে নাড়িতে হাঁক দিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, নিশ্চয়ই সত্যেন আমার গলার শব্দে চুপ করিয়া রহিয়াছে, টাকা দশটা ফাঁকি দিবার মতলব।

আর যদি কখনও এক আধলা কাউকে দিই—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাস্তায় নামিতেই, একজনের সহিত গায়ে

ধাক্কা লাগিয়া গেল। গলির ওধারের আলোর সামান্য রেখা লোকটার মুখে পড়িয়াছে,—চিনিতে দেরী হইল না, এই সত্যেন। কিন্তু তার এ কি বিশ্রী চেহারা? সত্যেন কহিল, "কে, যতীশ না কি? আয় ভাই।"

নিঃশব্দে সত্যেনের পিছু পিছু তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরের মাঝে টিম্ টিম্ করিয়া, একটি আলো জ্বলিতেছে, চারিদিকের অন্ধকারের মাঝে সে আলো যেন আরও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। একতলা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে ঘর, আলো নাই, বাতাস নাই। চারিদিকে নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ, অথচ সত্যেন চাকরী করে; কিন্তু এই অবস্থা কেন? কোথাও বিন্দুতম শ্রী নাই, দারিদ্র্যের ভয়াবহ রূপ যেন রাক্ষসের মত হাঁ করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বের অবস্থার বিন্দুতম পরিবর্ত্তন নাই, সেই ঠাণ্ডা ভিজা মেজের উপর একটি ছেলে সামান্য একখানি কাঁথার উপর শুইয়া রহিয়াছে, আর তাহার শিয়রে, সত্যেনের বৌ ঘোমটা দিয়া বসিয়া বাতাস করিতেছে।

"বস ভাই।"—সত্যেনের কণ্ঠে অপরিসীম ক্লান্তি। কোনরূপে বসিলাম।

"ওর কি অসুখ?"

ম্লান হাসিয়া সত্যেন বলিল, "অসুখ! আজ এই দু'মাস হতে চলল, যমে মানুষে টানাটানি চলছে। পারি নে আর, সে দিন কোলেরটা শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু এইটে আর মেয়েটা। কিন্তু এও বাঁচবে না, চাকরী একটা জুটিয়েছিলাম ভাই, কিন্তু তাও নেই।"

কহিলাম, "ডাক্তার দেখছে তো?"

"ডাক্তার—কোথায় পয়সা পাব বল। সকাল সন্ধ্যা ঘর আর ডাক্তার-বাড়ী করলাম, কিন্তু কারুর দয়া হল না।" সত্যেনের ঠোঁটে বিবর্ণ হাসি। ঘোমটার অন্তরালে সত্যেনের বৌ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কান্নার শব্দে সত্যেন চীৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার কান্না নয়, চুপ—একদম চুপ কর। ভাল লাগে না, কান্না।"

সত্যেনের চীৎকার ও তাহার বৌয়ের কান্নায় ঘরের মধ্যে ছোট মেয়েটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার মায়ের কাছে আসিয়া কহিল, "মা ক্ষিদে পেয়েছে।"

সত্যেনের সমস্ত রাগ তাহার উপর পড়িল, "ক্ষিদে পেয়েছে, খা আমাকে—ফের যদি কাঁদবি তো—দে এক লাথি।"

দেখিলাম সত্যেন দারিদ্র্যের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ছেলেটি বিছানার মাঝে নির্জ্জীব কঙ্কালের মত শুইয়া রহিয়াছে, চেতনা আছে কি না—বা প্রাণধারা বহিতেছে কি না, বোঝা যায় না। আর ঐ মেয়েটির গায়ে এক টুকরা কাপড় নাই, চোখে মুখে ক্ষুধার চিহ্ন, খাদ্য অভাবে হাত পা সরু-সরু। সত্যেনকে দেখিলে মনে হয়, কত বৎসর যেন ঘুমায় নাই, কত বৎসর যেন অন্নের মুখ দেখে নাই। ছেলেটির শিয়রে জীর্ণ বসনে আবৃতা সত্যেনের স্ত্রী, ক্লান্ত ক্ষুধায় ব্যথিত মানসিক অশান্তিতে, শোকে দুঃখে পাষাণ হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে নিঃসীম ভয়াবহতা। মাঝে মাঝে মেয়েটি কাঁদিতেছে, ক্ষুধার তাড়নায় পেট চাপিয়া ধরিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, ঘরে মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটি দুঃসহ রোগের জ্বালায় অতি মৃদুভাবে মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিতেছে।

চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উপরে আকাশের রূপ দেখা যায় না, বাতাসের স্পর্শ অনুভব হইতেছে না, কোথাও বিন্দুমাত্র আলো নাই। ঘরে দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণ চিহ্ন—বস্ত্র নাই, সামান্যতম গৃহের কোন উপকরণ নাই। সম্মুখে যেন মৃত্যুপথযাত্রী কয়টী নরনারী বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মুখে, চোখে অবসাদের আর অসহায়তার রেখা, আর অপমানে মাথা যেন মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সেই নিঃশব্দতা সত্যেন ভাঙ্গিল, "এ রোগ ভাল হবে না ভাই। এই রোগই ওকে শেষ করবে। আর ওর দেহে কি আছে?"

মেয়েটী মাঝে মাঝে কাঁদিতেছে মায়ের নিকট যাই, মুখের কাছে মুখ লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাওয়ার জন্য, তাগাদা দিতেছে, কিন্তু কোথায় ক্ষুধার অন্ন!

সত্যেন আবার চীৎকার করিয়া কহিল, "আবার কান্না, ফের যদি কাঁদবি ক্ষিদের কথা বলবি দেব চড়। যা দূর হ' ওটার সঙ্গে যা, নিশ্চিন্তি হই।"

সত্যেন হাঁপাইতে লাগিল—ওর দুই শুষ্ক চোখে কান্নার বন্যা নামিয়া আসিয়াছে।

"ভাই, তোমার টাকাটা অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু সবই দেখছ, ঘরে একটা চাল নাই, ছেলেটা মরতে বসেছে"

সত্যেন হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "দেব নিশ্চয়ই, ফেরৎ দেব, তুমি আমার বড় অসময়ের বন্ধু।"

মেয়েটি ক্ষুধিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, আমার সমস্ত দেহে একটা তীব্র বেদনা যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমার ছেলেমেয়েকয়টীর মুখ সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম, পিছনে পিছনে সত্যেন আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। পকেটে হাত দিয়া, দেখিলাম,মাত্র একটি আধুলি পড়িয়া রহিয়াছে, সেটি সত্যেনের হাতে দিতেই ও অবাক্ হইয়া গেল।

বলিলাম,"আগে চাল-ডাল কেন। মেয়েটা যে মারা যাবার মত হয়েছে, যাও। নিজেরা খাও, মেয়েটাকে খাওয়াও গে।"

সত্যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলাম, "আমার সাধ্য খুব কম, তবুও—পয়লা তারিখে সন্ধ্যার পর একবার এস।"

সত্যেন অস্ফুটভাবে চোখের জলের মধ্যে কি জানি কি বলিয়া যাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "সত্যিই যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সেদিন এস, যা পারি দেব, আর আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব।"

"যাও আলো নিয়ে যাও। রোগীকে অন্ধকারে রাখতে নেই।" সত্যেন বলিল, "ভাই তোমার ঋণ—"

"থাক্ ওসব কথা, যাও বাড়ীর ভেতর যাও।"

বড় রাস্তায় আসিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত আলোর মধ্যে সত্যেনের ঘরের অন্ধকার যেন আমার চোখে লাগিয়া আছে। পথে লোক চলিতেছে; সত্যেনের মত হাজার হাজার লোক, যেন সকলেই অবনত মুখে দুঃখ-দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় মাটীর সহিত মিশাইয়া চলিতেছে। ঘরে আলো নাই, বস্ত্র নাই, অন্ন নাই। সকলেই যেন বুভুক্ষিত—দুঃখে দারিদ্র্যে পীড়িত। আমরা যেন সকলেই মিছিল করিয়া ধ্বংস-পথের দিকে অগ্রসর হইতেছি। চারিদিকে কদর্য্যতা, অন্নের জন্য হাহাকার, দুঃস্থতা, অস্বাস্থ্য। সহরের সভ্যতা আর বিলাসিতার মাঝে, এই অভ্রংলিহ প্রাসাদ আর বিলাসী নরনারীর মাঝে, আমাদের ক্রন্দন যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের ক্ষুধার জন্য কাতর আর্ত্তনাদ, রোগের জন্য দুঃসহ ব্যথা সবই যেন এই নাগরিক সভ্যতার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। আমার মনের আকাশ হইতে, মেয়ে-জামাইয়ের আগমন, মিষ্টি মাছ ঘি আটা আর টাকার চিন্তা সকলই লুপ্ত হইয়া গেল, শুধু রহিয়া রহিয়া এক অন্ধকার ঘরের ছবি, অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত সত্যেনের মুখ, এতটুকু একটি বালকের আসন্ন মৃত্যুদশা, আর একটী ছোট্ট মেয়ের ক্ষুধিত লুব্ধ দৃষ্টি—আমার চোখের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল।

আমি জানি অরুণা অপ্রসন্ন হইবে, জানি সকালে মেয়ে জামাই আসিবে, টাকার প্রয়োজন, তবুও শেষ সম্বল আধুলিটী সত্যেনকে দিয়া আমার সমস্ত দেহ মন যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দে তরঙ্গায়িত ও সুমধুর হইয়া উঠিল।

মনে হইল এই আকাশ-নক্ষত্র-নীহারিকাপুঞ্জ, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সকলের উপর বিশ্বের সকল কোলাহলের উপরে এক আনন্দসঙ্গীত যেন ধ্বনিত হইতেছে।

রাত্রি হইয়াছিল—শ্রান্ত পা দুখানি টানিয়া টানিয়া চলিতে লাগিলাম—

ভারতবাসীর দুঃখ

…ভারতবাসিগণের দুঃখ-কষ্টের মুখ্য অথবা গৌণ কারণ যে ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, ইহা আমরা স্বীকার করি না। আমাদের মতে, ইংরাজী-শিক্ষিত যে ব্যক্তিগণ ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বই ভারতবর্ষের দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা মূর্খ ও কাপুরুষ। ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে ঐ ভাবসঙ্কর ভারতীয়গণের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বে যে ভারতবাসীদিগকে অধিকতর বিব্রত হইতে হইবে, তাহার সাক্ষ্য অদূরভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে। আমাদের মতে, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে ভারতবাসিগণের দুঃখ-কষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ব্যতীত কখনও উহার অবসান হইবে না। পরন্তু সমগ্র মানব-সমাজের দুঃখ-কষ্টের কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিয়া উহা দূর করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যেরূপ কর্ণ ধরিয়া টানিলে মাথা আপনা হইতেই নিকটবর্ত্তী হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বও আপনা হইতেই ভারতবাসিগণের করতলগত হইয়াছে।…

একজন রোগী আসিয়া বলে যে, প্রায় প্রত্যেক সোমবারেই তাহার হাতে একজিমার (eczema) প্রকোপ প্রকাশ পায়। চিকিৎসক তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, একটি যুবতীর সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে ও প্রত্যেক রবিবারে সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় ও বিবাহের দিন স্থির করিতে বলে, কিন্তু তাহার ভাবী পত্নী দিন স্থির করিয়া বলিতে চাহে না। এই হতাশার পরেই সোমবারে তাহার ঐ রোগ প্রকাশ পায়।

সেই হাঁসপাতালেই একজন হাঁপানী রোগী আসে। কয়েক সপ্তাহ চিকিৎসার পর তাহার অবস্থার অনেক উন্নতি হয় এবং তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে বিদায় দিবার দিন স্থির করা হয়। হঠাৎ তাহার বিদায় লইবার পূর্ব্বদিন রোগ বৃদ্ধি পায়। পুনরায় চিকিৎসা আরম্ভ করা হয় ও তাহার রোগের অনেক উপশম হয় ও অবশেষে তাহাকে বিদায় দিবার দিন স্থির হয়; কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বদিন পুনরায় তাহার রোগ বৃদ্ধি হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, রোগী একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তাহার সহিত বিদ্যালয়ের পরিচালক-মণ্ডলীর মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে ও তজ্জন্য সম্ভবতঃ তাহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য তাহার পক্ষে কার্য্যে যোগ দেওয়া বড়ই উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে ও হাঁসপাতালের আশ্রয়ে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে হওয়ায় তথা হইতে বিদায় লইবার দিন আসন্ন হইলেই পুনরায় রোগের আক্রমণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, মনের সহিতও শারীরিক ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে দেখা যায়। অনেক চিকিৎসক এই প্রকৃতির ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে বলেন যে "রোগ হইয়াছে ইহা ভুলিয়া যাও তাহা হইলেই সুস্থ হইবে", কিন্তু এইরূপ উপদেশ কদাচিৎ কার্য্যকরী হয়।

প্রথমে রোগীকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইবে। পুরাকালের গৃহ-চিকিৎসগণ এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কারণ তাঁহারা রোগীকে বহু বৎসর ধরিয়া দেখিতেন ও তাহার সম্বন্ধে বহু তথ্যই জানিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ডক্টর এস্. ওয়্যার মিচেল এই প্রকার রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বর্ত্তমানে এই প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা বিষয়ে কেহ কেহ পারদর্শী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম।

শরীরের উপর মনের প্রভাব সম্বন্ধে বর্ত্তমানে চিকিৎসকগণ গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ফ্লাণ্ডার্স ডানবার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নিউইয়র্কের প্রেসবীটেরিয়ান হাঁসপাতালে হৃদ্‌রোগ ও বহুমূত্র রোগাক্রান্ত কতকগুলি রোগী লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহারা অর্দ্ধেকের বেশী রোগীর মানসিক উত্তেজনাবশতঃ রোগ বৃদ্ধি পাইতে দেখেন।

ক্রমশঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক উদ্বেগ শারীরিক রোগের আকারে প্রকাশ পায় এবং এই উদ্বেগের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই অনেক ক্ষেত্রে রোগী আরোগ্যলাভ করে।

ডক্টর আরউইন মুস্ (Dr. Erwin Moos) একটি রোগীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ফুসফুসের রোগাক্রান্ত হইয়া ঐ রোগী তাঁহার নিকট আসে। ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনই ফল হয় নাই, কিন্তু পরে ডক্টর মুস্ জানিতে পারেন যে, রোগী তাহার স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল ও বর্ত্তমানে স্ত্রীর সহিত কোন সংস্রবই রাখে না। ডক্টর মুস্ তাহার স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য দূর করিয়া দেন ও তৎপরে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে থাকে। কয়েক বৎসর পরে ডক্টর মুস্ তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিতে পান।

বোষ্টনের ম্যাসাচুসেট্‌স জেনারল হাসপাতালে ডক্টর ষ্টানলি কব্ (Dr Stanley Cobb) এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মী হাঁপানী, গ্রন্থিপ্রদাহ এবং আমাশয়-রোগাক্রান্ত কতকগুলি রোগী লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহারা দেখিতে পান যে, অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক উদ্বেগ বর্ত্তমান আছে।

শিকগো মনোবিশ্লেষণ বিদ্যালয়ে হাঁপানীর সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হইলেই রোগও বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। একটি স্ত্রীলোক বিশেষ যোগ্যতার সহিত সহকারীর কার্য্য করিবার ফলে তাহার পদোন্নতি হয় ও তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার অর্পিত হয়। ইহার ফলে তিন মাস পরে তাহার হাঁপানী রোগ প্রকাশ পায়। চিকিৎসক অনুমান করেন যে, দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ফলে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধিই তাহার রোগের কারণ। চিকিৎসক তাহাকে পুনরায় সহকারীপদে কার্য্য করিতে উপদেশ দেন ও ঐরূপ করিবার ফলে তাহার রোগ অনেকাংশে প্রশমিত হয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, আদিম মানবকে সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। যুদ্ধ করা অথবা পলায়ন করা ভিন্ন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না, সুতরাং তাহাদের শরীরও তদুপযোগী গঠিত হইয়া উঠিত। ভয় অথবা ক্রোধের উদ্রেক হইলে শরীরের ভিতরে বহু পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীগুলি উত্তেজিত হইয়া দ্রুত সঞ্চালিত হইতে থাকে, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক এবং হস্ত-পদাদির পেশীতে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং শরীর যুদ্ধ অথবা পলায়ন করিবার জন্য তৎপর হয়। শরীরের ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। গ্রন্থি এবং মস্তিষ্কের প্রান্তভাগ হইতে রস নির্গত হয় এবং শরীরকে কার্য্যতৎপর করে। বর্ত্তমান যুগে মানুষের বিপদ ঠিক আদিম যুগের মানবের ন্যায় নহে। আধুনিক মানবের শরীরে ঐ সমুদয় রস নির্গত হইয়া যুদ্ধ অথবা পলায়ন ক্রিয়ার সাহায্য করে না, সুতরাং উপযুক্ত কার্য্যে ব্যয়িত না হওয়ায় শরীরের মধ্যে থাকিয়া বিষের ক্রিয়া করে ও বিপ্লব ঘটায়।

ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় আয়বৃদ্ধির উপায়

The National Weekly নামক পত্রিকায় ব্রুস বার্টন (Bruce Burton) লিখিয়াছেন :—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

সঙ্কলন

গণতন্ত্র

আর্থার গারফিল্ড হেজ (Arthur Garfield Hays) "গণতন্ত্র" সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

অধিকাংশ ব্যক্তির মত গ্রহণ করিয়া শাসনতন্ত্র পরিচালনা করাই "গণতন্ত্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু শাসনতন্ত্র পরিচালন অপেক্ষা গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবগ্রহণই অধিক আবশ্যক। অধিকাংশের মতে শাসনতন্ত্র পরিচালিত হইলেই যে তাহা সমর্থনযোগ্য বা তদ্বারা দেশ সুশাসিত হইবে তাহা বলা চলে না। ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেই যে উপযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা স্থান পাইবেন তাহা বলা যায় না কিছুদিন ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রচার-কল্পে কার্য্য করিয়া মিঃ হেজ যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই, কিন্তু একনায়কাধীন দেশ, যথা ইতালি, জার্ম্মানী, রুশিয়া প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তাঁহার এই অভিজ্ঞতা লাভ হয় যে, পূর্ণ-স্বাধীনতা একটি আদর্শ মাত্র, যাহা কখনও প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে এবং ঐ সকল দেশের তুলনায় আমেরিকায় বেশী পরিমাণে স্বাধীনতা আছে। বাঁচিতে হইলে যেরূপ খাদ্য ও বায়ু আবশ্যক সেইরূপ স্বাধীনতাও আবশ্যক। ফ্যাসিষ্ট বা কমিউনিষ্ট সমাজে হয় ত লোকে শারীরিক সুখ ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু মানসিক উৎকণ্ঠা তাহাদিগকে অনেক বেশী ভোগ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক দেশে সকলেরই নিজের মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে ও মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টাও অনায়াসে করা যাইতে পারে। শাসনতন্ত্রের পরিচালকগণ যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারেন না এবং তাঁহারাও সাধারণ লোকের ন্যায় একই নিয়মাধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, কিন্তু একনায়কাধীন দেশে এরূপ হয় না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশে ধনী দরিদ্র সকলেই সমান ও একই নিয়মাধীন। গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া নূতন নূতন চিন্তাধারা এবং জীবনধারণ-প্রণালী পরীক্ষিত ও প্রচলিত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে ও এই কারণেই গণতান্ত্রিক দেশগুলি অধিকতর উন্নত। এই সকল দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় না বলিয়া বহুপ্রকার দ্রুত পরিবর্ত্তনও বিনা রক্তপাতে করা সম্ভব হইতেছে।

গণতন্ত্রের কার্য্যপন্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দলের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, কারণ, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রবৃত্তি না থাকিলেও পুনরায় নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইবার আশায় তাঁহারা নিজের সমর্থকদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন না। আয়কর ও শ্রমিক আইনগুলিই ইহার প্রমাণ। ধনীরাই ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন, কিন্তু, তথাপি দরিদ্রদিগের প্রতিনিধিগণের ইচ্ছায় এই আইন প্রণোদিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশের কার্য্যপন্থা যে সর্ব্ববিষয়েই ভাল, তাহা বলা যায় না। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যাহা অতি সহজেই করা যায়, তাহা জটিল করিয়া সময়ের অপব্যবহার করা হয়। একজনের অধিনায়কত্বে কার্য্য করিলে তাহা শীঘ্র ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধিনায়ক হইবার উপযুক্ত যে-সকল গুণ তাহার সবগুলির সমাবেশ কাহারও মধ্যে দেখা যায় না বলিলেই চলে। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যক্তির পক্ষেই অধিনায়কত্ব শোভা পায় ও তাহা হইলে শাসনতন্ত্র উৎকৃষ্টরূপে পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু, সেরূপ ব্যক্তি দেখা যায় না।

আমেরিকায় কৃষিব্যবস্থা-

The Country Home Magazine পত্রিকায় জর্জ্জ কেন্ট (George Kent) আমেরিকায় কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে গত ১০ বৎসর যাবৎ সরকারী কর্ম্মচারী এবং বে-সরকারী ব্যক্তিগণও দক্ষিণের কতকটা অংশে তুলার চাষ কমাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ও কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কৃষকদিগকে তুলার চাষ কমাইয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। গত বৎসর ৪২,০০০ পরিবার এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে ও ইহার ফলে ২ কোটি ডলার মূল্যের নূতন ফসল উৎপন্ন হয়। কৃষকদের উৎসাহ দিবার জন্য যে কৃষক শস্য উৎপাদন-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল দেখাইতে পারে, তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। যাহারা পুরস্কারলাভ করিতে পারে না, তাহারাও এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে, সুতরাং পুরস্কৃত হয়। যাহাতে পূর্ব্বে তুলার চাষ হইত, সেইরূপ ৩ লক্ষ একর (তিন বিঘা—১ একর) জমিতে গত বৎসর শাকসব্জি, সোয়াবিন (শিম-জাতীয় একপ্রকার খাদ্য) এবং নানাপ্রকার খাদ্য শস্য রোপণ করা হইয়াছিল ও এক কোটি ডলার মূল্যের খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কৃষকদিগের অবস্থা ও স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা গিয়াছিল। দেশের উন্নতি করিতে হইলে অবশ্য জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

উদ্বেগজনিত রোগ

'Harper's Magazine' নামক পত্রিকায় George W. Gray উদ্বেগের জন্য কিরূপ অদ্ভুত ব্যাধি সৃষ্ট হইতে দেখিয়াছেন-তাহারই কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন। হঠাৎ একদিন সোমবারে হাঁসপাতালে

আমেরিকার দুইদল রাজনৈতিক আয়বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ভীষণ তর্কে লিপ্ত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং তাঁহার সমর্থকগণ বলেন যে, শাসনতন্ত্র পরিচালনার ব্যয় হ্রাস, করভার কমান এবং ব্যবসায়ে দেশের লোককে উৎসাহিত করিলেই ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনজন যুবক ব্যাঙ্ক হইতে ১০,০০০ ডলার লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। ব্যবসায়ের প্রারম্ভে মাত্র ১৪ জন লোক ইহাতে কাজ করিত। বর্ত্তমানে ঐ ব্যবসায়ে ৬৫০ লোক কার্য্য করিতেছে। এই তিনটি যুবকের অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি ঐ ১০,০০০ ডলার হইতে কত লক্ষ লক্ষ ডলার আয় এবং কতগুলি লোককে কার্য্যে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁহার সমর্থকগণ বলেন, রাষ্ট্র-ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণে কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে ১০,০০০ ডলার ব্যক্তিগত ঋণ হইতে কত আয় বৃদ্ধি এবং কত লোকের অন্ন সংস্থান হইয়াছে। রাষ্ট্র-ঋণ বৃদ্ধি পাইলে কর বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং ব্যবসায়িগণকে ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে। এরূপ অল্প সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত ঋণ এবং রাষ্ট্র ঋণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে করভার লাঘব করা আবশ্যক।

রকফেলার ফাউণ্ডেশন

Forum পত্রিকায় এডউইন মুলার (Edwin Muller) রকফেলার ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জন ডি. রকফেলার (John D. Rockefeller) মানবের হিতার্থে কার্য্য করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। এই তহবিল হইতে ঐ উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত ৩২ কোটি ডলার ব্যয় করা হইয়াছে। ৮৮টি দেশে এই তহবিল হইতে অর্থ দান করা হইয়াছে। কোন ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক মতামত বা শাসনতন্ত্রের ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া অর্থ দেওয়া হয় নাই। কেবল মানব-জাতির কল্যাণ সাধনই এই ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্য। একদিকে যেমন যুদ্ধবিগ্রহে মানব জাতির যথেষ্ট অহিত সাধিত হইতেছে, অপর দিকে তেমনই এই দানবীরের প্রদত্ত অর্থে মানবের কল্যাণের জন্য নানা দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি নীরব সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন।

কৌশলী এস্কিমো

Natural History পত্রিকায় ডক্টর এডওয়ার্ড ওয়ার (Dr. Edward Weyer) কয়েক বৎসর আলাস্কা এবং গ্রীনল্যাণ্ডে এস্কিমোদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের কর্ম্মকৌশল পর্যবেক্ষণ করিয়া সেই সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এস্কিমোরা বন্য হরিণ আহার করে, কিন্তু নেকড়ে বাঘ ঐ গুলিকে হত্যা করিয়া আহার করে, এ জন্য তাহারা নেকড়ে বাঘ শিকার করে। নেকড়ে বাঘগুলির দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধি এত প্রখর যে, তাহাদের নিকটে গিয়া শিকার করা অসম্ভব। বিশেষ কোন অস্ত্রশস্ত্র এস্কিমোদের নাই।

সুতরাং নেকড়ে বাঘ শিকার করিবার জন্য ইহারা তিমির একখণ্ড ছোট হাড় দুই দিকে বেশ তীক্ষ্ণ করিয়া স্নায়ুতন্তু দিয়া বাঁধিয়া ধনুকের আকারে পরিণত করে। তৎপরে তাহার উপরে উত্তম-রূপে চর্ব্বি মাখাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ঐ চর্ব্বি জমাইয়া এমন স্থানে ফেলিয়া রাখে যে, নেকড়ে বাঘ সহজেই উহা দেখিতে পায়। উহা দেখিলেই নেকড়ে বাঘ গলাধঃকরণ করে। পাকস্থলীর ভিতরে গিয়া চর্ব্বি গলিয়া গেলেই তিমির হাড়খানি হঠাৎ সজোরে সোজা হইয়া যায় ও নেকড়ে বাঘটিকে ভিতর হইতে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে।

এস্কিমোরা সীল (seal) আহার করে, ইহার চর্ম্ম বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে এবং ইহার তৈল দ্বারা আলো জ্বালায়। সীল শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। উহারা জলের ধারেই উঠিয়া বায়ু ও রৌদ্র সেবন করে, কিন্তু উহারা এত সতর্ক যে, নিকটে গেলেই জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এস্কিমোরা বুকে হাঁটিয়া একপ্রকার যন্ত্র দ্বারা সীলেরা বরফ আঁচড়াইয়া যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ শব্দ উৎপন্ন করিয়া উহাদের প্রতারিত করিয়া নিকটে যায় ও ছুরিকাঘাতে সীলগুলিকে হত্যা করে।

এস্কিমোদের বর্শার দ্বারা জলহস্তী (walrus) শিকার করিয়া উহা জল হইতে তুলিয়া আনা বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। এক একটি জলহস্তীর ওজন প্রায় ১ টন (প্রায় ২৭ মণ), অথচ এরূপ গুরুভার উত্তোলন করিবার কোনরূপ যন্ত্রাদি তাহাদের নাই। কেবল কৌশল দ্বারাই তাহারা এই কার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

কাষ্ঠের উপর সীলচর্ম্ম জড়াইয়া তাহারা একজনের ব্যবহারের উপযোগী একপ্রকার নৌকা প্রস্তুত করে। ইহাতে পা রাখিবার জন্য একপ্রকার গর্ত্ত করা থাকে। নিজের পরিহিত জল প্রতিরোধক পোষাকের এক অংশ দ্বারা নৌকাটি জড়াইয়া বাঁধিয়া তাহারা জল-জন্তুর ন্যায় জল-বিহার করে। বড় বড় ঢেউয়ের সম্মুখে পড়িলে নৌকাটি কৌশলে উল্টাইয়া ফেলিয়া ঢেউয়ের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে এবং ঢেউ চলিয়া গেলেই পুনরায় সোজা হইয়া নৌকা চালাইতে থাকে।

দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইবার সময় এস্কিমোরা জলহস্তীর চর্ম্ম জলসিক্ত করিয়া উহার দ্বারা কতকগুলি সামন (salmon) মৎস্য জড়াইয়া ঠাণ্ডায় জমাইবার জন্য বাহিরে রাখিয়া দেয়। জমাট হইলে বরফখণ্ড একত্রিত করিয়া স্লেজগাড়ীর ন্যায় একপ্রকার যান প্রস্তুত হয়। পায়ের জুতার ভিতর খড় দিয়া ইহারা ঠাণ্ডা নিবারণ করে খড় প্রত্যহই পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন খড় ব্যবহার করে। রাত্রে আলোক এবং উত্তাপ সৃষ্টি করিবার জন্য সীলের তৈল সঙ্গে লইয়া বাহির হয়।

রাত্রিবাস করিবার জন্য এস্কিমোরা পথে বরফের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লয় ও ইহার ভিতরে গিয়া নগ্নগাত্র হইয়া থাকে। এই গৃহের

ভিতরে সীলের তৈলের প্রদীপ জ্বালিয়া উত্তাপ এবং আলোক সৃষ্টি করে। ইহারা দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার জানে না, ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়াই প্রদীপ জ্বালিয়া থাকে।

ভ্রমণে বাহির হইয়া নেকড়ে-বাঘ শিকার এস্কিমোদের একটি বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। ইহারা তীক্ষ্ণ ছুরিকার ফলকে রক্ত মাখাইয়া বরফে প্রোথিত করিয়া রাখে। কেবল ফলকের অগ্রভাগ বাহিরে থাকে। নেকড়েবাঘ রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ছুরিকার তীক্ষ্ণ ফলক লেহন করিতে থাকে। ইহাতে উহাদের জিহ্বা কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে ও সেই রক্তের গন্ধে উন্মত্ত হইয়া অনবরত ঐ ফলক লেহন করিতে থাকে এবং প্রচুর রক্তপাতের ফলে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন ইহার মাংস এস্কিমোরা পরম তৃপ্তির সহিত আহার করে।

ভ্রমণশেষে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া ইহারা জলহস্তীচর্ম্মনির্ম্মিত স্লেজখানি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে সামন মৎস্যগুলি বাহির করিয়া ভোজন করে।

এস্কিমোদের এই সরল জীবনযাত্রার মধ্যে কিরূপ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়; অথচ, ইহারা কখনও কোন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে নাই বা আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্পর্শেও আসে নাই।

গণতন্ত্রের সম্মেলন

Union Now নামক পুস্তকে ক্ল্যারেন্স কে. ষ্ট্রেট (Clarence K. Streit) গণতান্ত্রিক দেশগুলির সম্মেলন সংঘটিত হইলে জগতের কিরূপ হিত সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

মিঃ ষ্ট্রেট তাঁহার পুস্তকে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা উচিত। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অধিবাসীই এই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ করিলে একটি বিরাট জাতির সৃষ্টি হইবে। রাষ্ট্রশাসন-প্রণালীও আমেরিকারই অনুকরণে গঠন করা যাইবে এবং বিদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহাতে কোন রাষ্ট্র পৃথক্‌ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পৃথক্ রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সম্পর্কিত বিষয়গুলিও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পরিচালনাধীন থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নিজেদের আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্য নিজেরাই পরিচালিত করিবে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় মিঃ ষ্ট্রেট, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ডস, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডকে একত্রিত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। এই রাষ্ট্রগুলির মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২৮ কোটি। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক ৫ লক্ষ লোকের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। তাহা হইলে মোট প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় ৫৫০ জন হইবে। ইহার মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে আমেরিকার প্রায় ২৫২ জন প্রতিনিধি থাকিবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি থাকিবে, সুতরাং আমেরিকা বা গ্রেট ব্রিটেন কেহই একাকী সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইতে পারিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য মিঃ ষ্ট্রেট-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী সিনেট (Senate)-এ প্রত্যেক ২।০ আড়াই কোটি লোকের ২ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে, কিন্তু যে সকল রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ২।০ আড়াই কোটি অপেক্ষা কম; তাহাদেরও ২ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে।

এই যুক্তরাষ্ট্রে ডাকবিভাগ এবং পৃথক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শুল্কপ্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে এবং সকল রাষ্ট্রে একই মুদ্রা প্রচলন করিতে হইবে।

এইরূপ একটি যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক ক্ষমতা অপরিসীম হইবে। পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্রগুলি বর্ত্তমানে পৃথিবীর মোট চাহিদার শতকরা ৯৯ ভাগ নিকেল, ৯৫ ভাগ রবার, ৭৩ ভাগ স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ধৃত লৌহ (iron ore), ৭২ ভাগ স্বর্ণ এবং টিন, ৬৬ ভাগ তৈল, ৬৫ ভাগ কয়লা এবং ৬৫ ভাগ তুলা সরবরাহ করিয়া থাকে এবং রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে ব্যবসারের বাধা অন্তর্হিত হইলে আরও আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সকল দ্রব্যেরই মূল্য হ্রাস হইয়া যাইবে ও লোকের জীবনযাত্রা-প্রণালী আরও উন্নত হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে এবং এই রাষ্ট্রগুলির কৃষিজাত দ্রব্যও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইবে। বেকার-সমস্যারও কিঞ্চিৎ সমাধান হইবে বলিয়াই মিঃ ষ্ট্রেট মনে করেন। এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী থাকিবে এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ ও সামরিক ব্যয়ও অনেক কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমান জগতে যে যুদ্ধভীতি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও তিরোহিত হইবে, কারণ, এইরূপ শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার উপযুক্ত সাহস কোন একনায়কাধীন রাষ্ট্রেরই হইবে না, সুতরাং পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

কেশ-পতন

Hygeia পত্রিকায় মিঃ লুই ম্যাটক্স মিলার (Lois Mattox Miller), কেশ-পতন সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহাই প্রমাণিত করিয়াছেন। সূর্য্যকিরণ কেশোদ্গমের সহায়তা করে—এইরূপ একটি ধারণা অনেকের মনেই আছে, কিন্তু ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগের ডক্টর সি. এচ. ড্যানফোর্থ (Dr. C. H. Danforth) এবং ডক্টর মিলড্রেড ট্রটার (Dr. Mildred Trotter) ১২টি বালিকার মাথার ও পায়ের কেশ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ও গণনা করিয়া লইয়া সমস্ত গ্রীষ্মকাল রৌদ্র সেবন করাইয়া তৎপরে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, কেশের সংখ্যা বা বৃদ্ধির হারের কোন প্রভেদই হয় নাই।

অনেকে মনে করেন যে, মুণ্ডন করিলে কেশ শক্ত হয় ও বৃদ্ধির হারও বর্দ্ধিত হয়। উপরোক্ত চিকিৎসকদ্বয় এ বিষয়েও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইঁহারা ৩ জন বালিকার এক পায়ের লোম ৮ মাস ধরিয়া সপ্তাহে দুইবার করিয়া মুণ্ডন করাইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া কোনই প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। মুণ্ডনের পর প্রথমাবস্থায় যখন কেশোদ্গম হয় তখন তাহা শক্ত মনে হয়। কেশের দৈর্ঘ্যের সহিত ব্যাসের অনুপাতের পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ, এই শক্ত কেশও কিছুদিন বৃদ্ধি পাইতে দিলে কোমল মনে হইবে।

টুপী পরিলে বা কেশ ভিজা থাকিলেই যে কেশ পতন হইবে তাহারও কোন কারণ নাই। কেশপতন নিবারণের যে সকল ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে সেগুলিরও বিশেষ কোন ফল নাই—ইহাই বিশেষজ্ঞদিগের মত।

হস্তপদের অঙ্গুলির নখের ন্যায় কেশও মস্তকের ত্বকের অংশবিশেষ। ত্বকের অন্তরতম প্রদেশের ক্ষুদ্র কোষবিশেষের মধ্য হইতে কেশ উৎপন্ন হয় ও একটি দৃঢ় নলের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে। কেশের বর্ণ ইহার কোষের মধ্যে অবস্থিত রঞ্জক কণিকাগুলির বর্ণের উপর নির্ভর করে। এই রঞ্জক পদার্থবিশিষ্ট কণিকাগুলির অভাব হইলেই কেশ বিবর্ণ অর্থাৎ সাদা হইয়া যায়। বার্দ্ধক্যের জন্য রঞ্জক কণিকাগুলির ক্রমশঃ অভাব হইতে থাকে। দুশ্চিন্তায়ও ঐরূপ হইতে পারে, কিন্তু এক রাত্রিতে সমস্ত কেশ সাদা হইয়া যাওয়ার যে সকল কাহিনী শুনা যায় তাহা সত্য কি না, প্রমাণসাপেক্ষ।

একবার কেশ বিবর্ণ হইলে তাহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার কোন উপায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদিত নহেন।

বিশেষজ্ঞগণ কেশ-বৃদ্ধির মূল রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই, তবে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করিলে চুল ভাল থাকে ইহাই বলেন। ত্বক সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত, কারণ মাথায় খুস্‌কি হইলে চুল উঠিয়া যায়। মাথা ভিজা রাখা উচিত নহে কারণ তাহা হইলে খুস্‌কি জন্মাইবার সুযোগ পায়। মস্তকের ত্বক্ উত্তমরূপে ঘর্ষণ করা উচিত। তাহা হইলে ত্বকের নীচে যে চর্ব্বি-উৎপাদক কোষসমষ্টি আছে তাহাদের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, ত্বকের নীচের চর্ব্বি বার্দ্ধক্যে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই কেশপতন আরম্ভ হয়। মধ্য বয়সেও যদি কোন কারণে এই চর্ব্বি নষ্ট হইতে আরম্ভ করে তাহা হইলেও ঐরূপই হইয়া থাকে। এই চর্ব্বির অভাব হইলে মস্তকের ত্বক মস্তকের অস্থির সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া পড়ে ও ইহার ফলে যে নলগুলির ভিতর হইতে কেশ বাহির হয় ঐগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং কেশপতন আরম্ভ হয়। এই মত অনুসারে, স্ত্রীলোকদিগের কেশ পতন কদাচিৎ হইবার কারণ এই যে স্ত্রীলোকদিগের মস্তকের ত্বকের নীচের চর্ব্বির স্তর পুরুষদিগের চর্ব্বির স্তর অপেক্ষা অনেক স্থূল।

কেশহীনতা দুই প্রকার দেখা যায়। কখনও কখনও অসুস্থতার পরে কেশহীনতা হয়। এই প্রকার কেশহীনতা অনেক ক্ষেত্রে কিছু দিন পরেই আরোগ্য হইয়া যায় ও পুনরায় কেশোদ্গম হয়। ইহা কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকেও আরোগ্য হয় কিন্তু সাধারণতঃ যে কেশহীনতা দেখা যায় তাহা আরোগ্য হয় না এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে এখনও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

গণতান্ত্রিকতা

··· গণতান্ত্রিকতার বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে প্রধান প্রধান কর্ম্ম-সচিবগণের কাহারও কার্য্যকাল কোন দীর্ঘ সময়ের জন্য সুনিশ্চিত থাকে না এবং প্রায়শঃ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দল-রক্ষা ও দল-পুষ্টির জন্য ব্যাকুল থাকিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্ববিধ লোকহিতকর কার্য্যের অবসর কমিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় এবং কোন কার্য্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এইরূপে যে অভিনিবেশ ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী সাধনার ফলে প্রকৃত লোকহিতকর কার্য্যের পন্থা আবিষ্কার করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, সেই অভিনিবেশ ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী সাধনা বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টসমূহের কর্ম্মকর্ত্তাগণের পক্ষে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে এবং ইহারই ফলে যে-সমস্ত পন্থা আবিষ্কৃত ও গৃহীত হইলে প্রকৃতপক্ষে মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কৃত ও গৃহীত হইতে পারিতেছে না।

কাজেই বলিতে পারা যায়, রাষ্ট্রীয় গঠনে নিছক গণতান্ত্রিকতার মতবাদ মানুষের আর্থিক মুক্তিলাভ করিবার পক্ষে ভ্রান্তিযুক্ত এবং গণতান্ত্রিকতার দ্বারা এমন কি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা, শান্তি ও সন্তুষ্টি রক্ষা করা সম্ভব নহে।···

খুদিরাম

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত দিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল মাত্র একটু বৃষ্টি ধরিয়াছে—খুদিরাম তাহার শতচ্ছিন্ন কাঁথাখানি গায়ে জড়াইয়া ঘরের দাওয়ায় আসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া তাহার ছেলে দুঃখীরাম ওরফে 'দুখু'কে ডাকিয়া বলিল, "যা ত' বাবা একবার মুদির দোকানে, এক পয়সার বার্লি নিয়ে আয়, সমস্ত দিন কিছু মুখে দিতে পারিনি, জ্বরটা এখন একটু কমেছে।"

দুঃখীরাম মুদীর দোকানে যাইতে নারাজ। মুদী পূর্ব্বের বাকির জন্য তাহাকে বার বার তাগিদ দিয়াছে; সে তাহার দোকানে পূর্ব্বের প্রাপ্য না পাইলে আর আধ পয়সার জিনিষও দিবে না। সেই কারণে দুঃখীর আর দোকানে যাইবার মোটেই ইচ্ছা নাই। তাই সে পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে পিতার ধমক খাইয়া আবার দোকানের দিকে গেল।

খুদিরামের স্ত্রী সমস্ত দিন পরে খুদিরামকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ, জ্বরটা কি একটু কমেছে? বাইরে এসে বসেছ, আবার ঠাণ্ডা লাগবে।"

খুদিরাম বলিল, "ঠাণ্ডা আর লাগবে না, গায়ে কাঁথা আছে; তুমি একটু জল দাও ত', মুখখানা ধুয়ে ফেলি, মুখটা বড় বিস্বাদ হয়ে গেছে।"

খুদিরামের স্ত্রী এক গাড়ু জল আনিয়া খুদিরামের পার্শ্বে রাখিল। আর সেই সঙ্গে ঘর হইতে একটা কাঁচা পেয়ারা আর একটু নুন আনিয়া খুদিরামের হাতে দিয়া বলিল, "এই পেয়ারাটা একটু নুন দিয়ে চিবিয়ে ফেল, মুখটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

খুদিরাম পেয়ারাটা হাতে লইয়া বলিল, "পেয়ারা কোথায় পেলে?"

"দুখু আমাকে খেতে দিয়েছিল—তা ভাবলাম যে জ্বরের মুখে ওটা দিলে তোমার মুখটা ভাল হয়ে যাবে তাই রেখেছিলাম।"

খুদিরাম মুখ ধুইয়া কাঁচা পেয়ারাতে নুন সংযোগ করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া দাওয়ার নীচে ছিবড়ে ফেলিতে লাগিল।

এমন সময় আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। খুদিরাম আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ছেলেটা ভিজল দেখছি,—বোধ হয় মুদী বেটা বার্লি দেয় নি। আচ্ছা উঠি আগে জ্বর থেকে। গত বার বাঁধ ভেঙ্গে জমি ডুবে গিয়েই ত আজ খুদিরামের এই দশা নইলে—"

পুঁটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ঘরের মধ্যে গিয়ে বসগে। জলের ছাঁট লাগছে। বার্লি নিয়ে আসতে আসতে বৃষ্টি নেমেছে—দাঁড়াবে'খন এক বাড়ী।"

অনেকক্ষণ পরে দুখু বার্লি লইয়া বাড়ী ফিরিল। খুদিরাম জিজ্ঞাসা করল "কিরে, এত দেরী হল যে,—"

দুখু ব্যথিত কণ্ঠে বলল, "দিতে চায় না। বলে, 'ঢের বাকি হয়ে গেছে। আর বাকি দেব না। আজ জ্বরের জন্য বার্লি —তাই দিলাম।' আরও কত কি বলল—আমি আর যাব না ওর দোকানে—বেটা ভারি পাজী।"

খুদিরাম উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আর কি বলল রে—"

দুখু বলিল, "কি সব বলল, সব কি আমি বুঝি। বলল, আর দশ টাকা বাকি হলেই বাকি আর আদায় হবে না,—সব বেটাই মহাজনদের ফাঁকি দিতে বসেছে—কি সব সালিশী না কি সব বলল—"

খুদিরাম—"ও বুঝেছি এখন নালিশ করলেই সকলে ঋণ-সংলিশী দিয়ে মহাজনদের ফাঁকি দেয়, ওরে খুদিরাম তেমন বাপের বেটা নয় যে, ফাঁকি দেবে। এবার ধান হলেই তার পয়সা আমি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব। বেটা বড় নেমক-হারাম,—"

পুঁটি বলিল, "আচ্ছা থাম না, মুদী ত আর শুনছে না যে চেঁচাচ্ছ।"

সমস্ত দিন জ্বরে ভুগিয়াছে, তারপর সারাদিন উপবাস গিয়াছে। খুদিরাম উত্তেজিত হইয়া বলিল, "দেখ পুঁটি, সেবার ও-বেটার ছোট ছেলেটার জ্বর-বিকার—রাত্রে ত যায় যায়,

তখন সেই উল্লাপাড়া থেকে অত রাত্রে বড় ডাক্তার ডাকতে আর কেউ যায় নি; এই খুদিরাম ছিল তাই। থাক বেটা বড় নেমকহারাম” বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

পুঁটি বার্লি আনিয়া সম্মুখে রাখিল, খুদিরাম উঠিয়া বসিল কিন্তু দেখিল, বার্লি হইতে তখনও ধোঁয়া উঠিতেছে—অপেক্ষা করিতে হইবে। সে এই অবসরটুকু কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না—বলিল, “দেখ পুঁটি, এবার ধানের অবস্থা ত মন্দ দেখছি না, তবে বুনানীটা বড় দেরীতে হয়েছে এই যা ভয়—জল এসে শেষে সব ডুবিয়ে দিয়ে না যায়।”

পুঁটি আশ্বাস দিয়া বলিল, “ভগবান কি বার বারই মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন? তা নেবেন না। তুমি ভেব না। নাও বার্লি ঠাণ্ডা হয়ে এল—খাও।”

খুদিরাম বার্লিটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া বলিল, “আঃ—বড় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।”

মুখ ধুইয়া খুদিরাম তাহার ময়লা গামছা দিয়া মুখখানা বার বার পরিষ্কার করিয়া বলিল, “পুঁটি দেখত একটু তামাক, আজ সমস্তদিন খাওয়া হয় নি,—”

পুঁটি তামাকের ভাঁড় হইতে খুঁজিয়া-পাতিয়া যে একটু তামাক সংগ্রহ করিতে পারিল—তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে যাইয়া দেখিল দিয়াশলাই নাই। কলিকা দাওয়ায় রাখিয়া নারিকেলের ছোবড়াকে দুই হাতে তাল পাকাইতে পাকাইতে পাশের মণ্ডলদের বাড়ীতে গেল।

মণ্ডলদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া পুঁটি বলিল, “একটু আগুনই কি দেশে পাওয়ার উপায় আছে—একটা দেশলাই আনলে তা পাঁচদিন চলে না—আগে একটা দেশালাই কতদিন চল্‌ত” —বলিয়া ধোঁয়া-উঠা ছোবড়াখানাতে বার বার ফুঁ দিতে লাগিল। কলিকাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া খুদিরামের হাতে দিতেই খুদিরাম বলিল—“তোমাদের আজ কি হ’ল—ঘরে ত চাল ছিল না। দুখুটা কি খেয়েছে?”

পুঁটি বলিল “দুখু দুটো পান্তা ছিল তাই খেয়েছে।”

খুদিরাম—“আর তোমার বুঝি কিছুই হয়নি? আজ কয়-দিন জ্বরে না ভুগলে তোমাদের এত কষ্ট হ’ত না—সবই অদৃষ্ট।”

পুঁটি বাধা দিয়া বলিল—“তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, মণ্ডলের-বৌ এখন এক কাঠা চাল ধার দিয়েছে—আমি তুলে দিতে যাচ্ছি।”

খুদিরাম আশ্বস্ত হইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, একদিন এমন দিনও গিয়াছে যে, ঘরে চাল মজুত থাকিত। পূজার সময় আউশধান বেচিয়াই সেবার পুঁটির একখানা ভাল শাড়ী কেনা হইয়াছিল,—হায় রে দিন। খুদিরাম আর চিন্তা করিতে পারিল না—মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অদৃষ্টকে বার বার দোষারোপ করিতে লাগিল।

পুঁটি ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া চাল ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া বলিল, “ঘুমিয়েছ?”

খুদিরাম—“না, ঘুমোইনি, দুখু কোথায় গেছে?”

পুটি—“সে মণ্ডলদের পচার সঙ্গে খেলতে গেছে।” খুদিরাম ভাঙ্গা তক্তপোষের পার্শ্বে দেখাইয়া বলিল—“বস না এখানে, আমার কপালটার একটু হাত বুলিয়ে দে।”

পুঁটি খুদিরামের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। খুদিরাম আজ বেশী উত্তেজিত হইয়াছে, বলিল—“পুঁটি তোকে কত কষ্ট দিচ্ছি; তোর যদি বড়গ্রামের পালানের সাথে বিয়ে হ’ত তা হলে”—বলিতেই পুঁটি খুদিরামের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল “আবার সেই কথা। তুমি যদি অমন কর আমি চলে যাচ্ছি—”

খুদিরাম হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা আর বল্‌ব না”—

২

বর্ষার জল নদীতে পড়িয়াছে, গ্রামের বালকদের আর আনন্দের সীমা নাই। তাহারা ছুটাছুটি করিয়া সকল বন্ধু জুটাইয়া খালের মুখে যেখানে জল আসিতেছিল—সেখানে কেহ “চাবো”, কেহ “রাবানি”, কেহ “দোয়াড়”—প্রভৃতি মাছ-ধরিবার যাহার যে যন্ত্র ঘরে ছিল তাহা লইয়া মাছ ধরিবার আয়োজন করিতেছে। নদীর তীরে ভাঙ্গা নৌকাগুলি গ্রামের মিস্ত্রী সারিতেছে। সেখানে নৌকার মালিকরা নৌকা কতদূর সারা হইল—তদ্বির করিতেছে।

গ্রামের দক্ষিণে মস্ত মাঠ—প্রায় বিশহাজার বিঘা জমি। এই খালের মুখ দিয়া জল যাইয়া মাঠটি ভরাট হইবে। গ্রামের লোক সমবেত হইয়া অসময়ে মাঠে যাহাতে জল না পড়ে নদীতে বাঁধ দিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। গ্রামের এই কাজে প্রত্যেকের কিছু কিছু দিতে হয়। কেহ বাঁশ, কেহ টাকা-পয়সা; আবার কেহ কেহ শুধু কায়িক পরিশ্রম দ্বারা বাঁধ দিবার সাহায্য করে।

খুদিরামের আর কিছু সামর্থ্য নাই, শুধু কায়িক পরিশ্রম করিতে পারিত। সেদিন জ্বর আসে নাই—শরীর দুর্ব্বল। কিন্তু তবু খুদিরাম ধীরে ধীরে খালের ধারে গেল। সকলে কেমন করিয়া বাঁধ দিতেছে, তাহা না দেখিয়া খুদিরাম থাকিতে পারিল না। এই বাঁধের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।

বাঁধ দিয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। খুদিরাম বাড়ীতে আসিয়া এলাইয়া পড়িল। পুঁটি আসিয়া কাছে বসিয়া বলিল—"কেন এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলে বল ত ?"

খুদিরাম একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "দেখ এ দশের কাজ, দশজন না গেলে হয় না। দক্ষিণের মাঠে আমারও ত জমি আছে। তার পর আমি একটা বাঁশ কি একটা টাকা কিছুই দিতে পারলাম না। নিজেও যাব না, সে ভাল দেখায় না। দুধু কোথায় গেছে তাকে ত দেখছি না।"

পুঁটি বলিল, "সে মাছ ধরতে গেছে।"

খুদিরাম—"নূতন জল এসেছে, সারাদিন ভিজে একটা জ্বরটর করবে দেখছি"। কথা শেষ হইতে না হইতে দুধু একটা মস্ত বোয়াল মাছ ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

মাছ দেখিয়া খুদিরামের বড় লোভ হইল—বলিল, "দেখ, আজ এই মাছটা রান্না কর, আমি দুটো ভাতই মুখে দেব।" পুঁটি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু খুদিরামের যখন এত লোভ হইয়াছে তখন আর আপত্তি করিতে পারিল না, রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

খুদিরাম দুধুকে বলিল, "দুধু, তোর মাকে একবার ডেকে দে ত।" পুঁটি আসিলে বলিল, "মণ্ডলের বাড়ী মাছের অর্দ্ধেকটা পাঠিয়ে দাও। নইলে ভাল দেখায় না, অত বড় মাছটা।"

মাছ কোটা হইলে পুঁটি মাছের অর্দ্ধেকটা লইয়া মণ্ডলের ছোট মেয়ে লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে লক্ষ্মী, তোর মা কোথায় রে ?" লক্ষ্মী মণ্ডলের স্ত্রীকে ডাকিয়া দিল।

রান্না-ঘরের বারান্দায় মাছ রাখিয়া পুঁটি বলিল, "দিদি দুধু এই এতবড় একটা বোয়াল মাছ ধরেছিল, তাই অর্দ্ধেকটা এনেছি" বলিয়া মাছের দৈর্ঘ্যটা নিজের হাত প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া দিল।

মণ্ডলের স্ত্রী হাসিতে হাসিতে মাছ তুলিয়া লইল। পুঁটিও তৃপ্তির আনন্দে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

৩

সাতদিন পরের কথা। নদীতে জল বাড়িয়া ভরিয়া গিয়াছে, গ্রামে যাহার যাহার নৌকা আছে, তাহা জলে ভাসান হইয়াছে। দুই একখানি নৌকা সংস্কার অভাবে তখনও জলে ভাসান হয় নাই। যাহার যাহার নৌকা আছে তাহারা নৌকাতে চলাফেরা, হাট-বাজার করিতে পারিতেছে। যাহাদের নৌকা নাই তাহারা এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী পরের নৌকার আশায় নৌকা-চালককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পারাপার, হাট-বাজার করিবার অপেক্ষা করিতেছে।

গ্রামে সেদিন হঠাৎ সংবাদ রটিয়া গেল, বাঁধের উপর দিয়া জলের স্রোত মাঠে যাইয়া পড়িতেছে, কোন উপায় নাই। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। যদি স্রোতের চাপে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ত সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। গ্রামের সকল লোকের আশা, সমগ্র বৎসরের ভরসা একদিনে শেষ হইয়া যাইবে।

খুদিরামের সেদিন আবার জ্বর আসিয়াছিল। সে ভাবিল, হায় হায় যদি এবারও সব ডুবিয়া যায়, তবে পুঁটি-দুধুর কি দশা হইবে ? বেশী ভাবিতে পারিল না। উত্তেজনায় চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। পুঁটি ঘরে আসিয়া দেখিল খুদিরাম জ্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। পুঁটি ঘরে আসিয়া খুদিরামের মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ঘরের পাখাখানি বহুদিনের—বহুদিন পূর্ব্বে মেলা হইতে আনা হইয়াছিল, তাহাতে এখন বাতাস করিলে বাতাসের চেয়ে শব্দ হয় বেশী—রোগীর আরামের পরিবর্ত্তে বরং বিরক্তির কারণ হইয়া উঠে, তবু তাহাই দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাতরাইয়া খুদিরাম ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিল, গ্রামের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল হু হু করিয়া মাঠে পড়িতেছে। খুদিরাম তার চোখের উপর দেখিতেছে, জমির তরুতাজা ধানগুলি জলের নীচে দম বন্ধ হইয়া হাজিয়া উঠিয়াছে। খুদিরামের যেন নিজেরও নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার হইবার উপক্রম হইল। খুদিরাম লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "পুঁটি আমার কোদালখানা দে ত—বাঁধ দিতে হবে।" বলিয়া সত্য সত্যই খুদিরাম চীৎকার করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীর তাহার উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

পুঁটি অন্য ঘরে ছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া খুদিরামকে ধরিয়া শোয়াইল। খুদিরাম—"সব গেল, সর্ব্বনাশ হল" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার

—শ্রীহরিদাস মিত্র

(ক্রমিক) আলোচ্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সংস্থান *

নদী-মাতৃক বঙ্গদেশের উত্থান-পতন এবং সংস্কৃতির ইতিহাসের সহিত, ভাগীরথী যেরূপ নিবন্তর নিবিড় ভাবে জড়িত, মধ্য-বঙ্গের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ভৈরব-নদের অচ্ছেদ্য ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার মর্ত্যে আনয়ন নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হয় ত, আর্যগণ কর্তৃক বঙ্গ-দেশে সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী, এই ভাবে সূচিত হইতেছে।

ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাকে সঙ্গে লইয়া, ভগীরথ চলিলেন পথ-প্রদর্শক রূপে। ধর্মশাস্ত্রের অলঙ্ঘ্য বিধানে, ব্রহ্মশাপ গ্রস্ত ভস্মীভূত সগববংশাত্মজ-গণের শ্রাদ্ধ-পিণ্ডে অধিকার ছিল না। পিতৃপুরুষ-গণের দেহাবশেষ কোথায় কোথায় ছিল, তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া, ভগীরথ সন্দেহাকুল হইলেন। তখন ভক্তের বিপদ দেখিয়া, দ্রবময়ী গঙ্গা, অকস্মাৎ আপনাকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিপুল প্লাবনে সমগ্র অঞ্চল ভাসাইয়া লইলেন। এইরূপে, প্রত্যেক হতভাগ্য সগর-সন্তানই কৃপাময়ীর করুণা-স্পর্শ লাভ করিল। কেহই আর উদ্ধার লাভে বঞ্চিত হইল না।

ভগীরথ পিতৃপুরুষ-গণের উদ্ধারকর্তা বলিয়া স্মরণীয় হইলেও, বিশেষজ্ঞ কেহ কেহ তাঁহাকে, প্রাচীন পূর্ত্ত-বিদ্যা-বিশারদ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, এবং ভাগীরথী প্রভৃতি নদী, তৎ কর্তৃক খনিত কৃত্রিম পয়োপ্রবাহসকল নির্দেশ করে, এই নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কল্পনা-বহুল আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণিত হওয়ার জন্য, হয় ত' ভারতীয় প্রাচীন পৌরাণিক এবং অন্যান্য উপাখ্যান বা কাহিনীসকলের প্রকৃত মর্ম্ম কিংবা তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সহজ ব্যাপার নহে। এই হেতু, অনেক সময়ে ঐগুলিতে নানারূপ ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা ও অবসর আছে।

এই রূপে সীতাহরণের পরে, তাঁহার অন্বেষণে গিয়া, অঙ্গদ কর্তৃক পূর্ব্ব-সাগরের বর্ণনা, এক ইয়োরোপীয় মনীষী সম্পূর্ণ নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এক ভারতীয় বিশেষজ্ঞ অগস্ত্যের সমুদ্র-শোষণ ব্যাপার অভিনব ভাবে বুঝাইয়াছেন। যাহা হউক, ভাগীরথীর প্রবাহ সৃষ্টি যে অতি প্রাচীন কালের ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অবশ্য ইহারই সমসময়ে বা ঈষদুত্তর কালে 'ভৈরব' নদ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। করুণাময়ী মাতা 'গঙ্গা' এবং ভীম-কান্ত 'ভৈরব' আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ পরিকরসকলও, নদনদীরূপে পরিকল্পিত হইলেন। উপ-বঙ্গে বা মধ্য-বঙ্গে—কুমার (কার্ত্তিকেয়), গৌরী, যমুনা, (নবগঙ্গা), (বীর-)ভদ্র, শ্রী (লক্ষ্মী), হরি, হরি-হর প্রভৃতি কেহই আসিতে বাকি রহিলেন না। বস্তুতঃ, এই সকল নদনদীগুলির নাম পরিকল্পনা, আকস্মিক ভাবে বা হঠাৎ, এবং কোন সাধারণ-সামান্য ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কোন ক্রমেই মনে হয় না।

পুরাণাদিতে উক্ত এবং পূজা-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত স্নান-মন্ত্রে প্রাচীন তীর্থ নদ রূপে, 'ভৈরব' প্রথমেই পঠিত হইয়াছেন। 'ভৈরব'-নদের প্রাচীনতার ইহাই এক প্রধান এবং অবিসংবাদী প্রমাণ। এই অদ্বিতীয়-নামা ভৈরব-নদ মধ্য-বঙ্গের মধ্য বা মেরুদণ্ড-স্বরূপে অবস্থিত ছিল। মাতা 'গঙ্গা' করুণা-প্লাবনে, উপ-বঙ্গ তথা মধ্য-বঙ্গের পশ্চিমাংশ সঞ্জীবিত করিতেন। আর 'ভৈরব,' নদ রূপে সে অমৃত ময়ী ধারাকে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-ভাগে বিপুল রূপে প্রবাহিত করিতেন। বলিতে গেলে, প্রাচীন কালে, মিশর-বাসি-গণের 'সমৃদ্ধি' যেরূপ নীল-নদের সলিল-রাশির উপর নির্ভর করিত, অথবা (আসিরিয়ন) ব্যাবিলন-দেশীয়-গণ যেরূপ টাইগ্রিস এবং ইয়ুফ্রেটিস নদ-দ্বয়ের উপর নির্ভর করিত—উপ-বঙ্গ তথা মধ্য-বঙ্গের ক্ষেত্রেও গঙ্গা-ভৈরবের স্থান তদ্রূপ। উপ-বঙ্গ তথা মধ্য-বঙ্গের স্রষ্টা-স্রষ্ট্রী বা জনক-জননীর স্থান এই গঙ্গা-ভৈরব অধিকার করিয়াছেন।

ভূ-গর্ভের স্তরে স্তরে, আজিও তাহার প্রাচীন প্রমাণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

"শ্রুতকীর্ত্তি মহানদ" (মহানন্দা?) "পড়িয়াছে, তাহারই অপর পারে যেন সেই নদই ভৈরব নাম ধারণ পূর্ব্বক বাহির হইয়াছে।"

"জলঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আখেরীগঞ্জের নিকট হইতে ভৈরব বহির্গত হইয়া, পূর্ব্ব পারে মেহেরপুর রাখিয়া, কাপাসডাঙ্গার নিকট মাথা-ভাঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছে।"

বস্তুতঃ আখেরীগঞ্জের নিকট ভৈরবের এই উদ্গম-স্থান, বালুকা-রাশি ও তট ভঙ্গ হেতু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন বা সঞ্চরণ-শীল। পূর্ত্ত-বিভাগের ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যায়, এই আখেরীগঞ্জে তদ্বিভাগের একটি উপকেন্দ্র অবস্থিত। মুর্চাঘাট বলিয়া এক ঘাটও এইখানে আছে। নাড়াঘাট, দামুকদিয়াঘাট, চাবঘাট, লালগোলাঘাট প্রভৃতি পদ্মানদী প্রভৃতির তীরের এইরূপ অনেক ঘাট সকল, অদূরে দূরে, মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাচীন তীর্থসকল নদ-নদীকূলে, সমুদ্রতীরেই প্রতিষ্ঠিত হইত। স্নানান্তেই, পূজার্চ্চনা-শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান বিধি।

"পদ্মা ও গঙ্গা হইতেই মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরের সমস্ত নদীর উৎপত্তি। ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী বা খড়িয়া, মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণী, গড়ুই বা মধুমতী বা বলেশ্বর কিম্বা হরিণঘাটা সমস্তই পদ্মা বা গঙ্গার শাখা। ভাগীরথী গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে এবং উহাতে পতিত হইবার পূর্ব্বে জলঙ্গী বা খড়িয়া এবং মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণী-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। নবদ্বীপ বা নদীয়ার নিম্নে জলঙ্গী বা খড়িয়া ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ ভাগীরথীর নিম্নাংশ ইংরেজ হুগলী নামে অভিহিত করেন। মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণী ও রাণাঘাটের নিম্ন দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। যমুনা নদী ভাগীরথী হইতে উঠিয়া ইচ্ছামতীর সহিত মিশিয়াছে। দক্ষিণাংশে যমুনাকেই আমরা পাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভৈরব পদ্মা হইতে উঠিয়াছে। এই ভৈরবই মাথাভাঙ্গা ও জলঙ্গীর জন্মের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনার মধ্য দিয়া বলেশ্বরের সহিত মিশিয়া সমুদ্রে গিয়াছে। যখন জলঙ্গীর জন্ম হইল, তখন জলঙ্গী ভৈরবকে ভেদ করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে পদ্মার যে-স্থান হইতে জলঙ্গী উদ্ভূত হইয়াছে, সে স্থানে চড়া পড়িয়া গেল। এবং বর্ষার অন্তে ভৈরবের জলই জলঙ্গীকে জীবিত রাখিতে লাগিল, কিন্তু জলঙ্গীকে জীবিত রাখিতে গিয়া ভৈরব আত্মবিসর্জ্জন দিল। বর্ষাকালে জলঙ্গীর শুষ্কপ্রায় মুখ দিয়া পদ্মা হইতে যে যৎসামান্য জল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে এবং স্থানীয় বৃষ্টির জলদ্বারা নদীয়া জেলার ভৈরব কোনও প্রকারে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে। ঐ ভৈরব পরে মাথাভাঙ্গায় প্রবেশ করে। ভৈরব মাথাভাঙ্গায় প্রবেশ করিয়া মাথাভাঙ্গারই উপকার সাধন করে। মাথাভাঙ্গাও ভৈরব অপেক্ষা পশ্চাৎ-উদ্ভূত নদী। মাথাভাঙ্গাও ভৈরবকে ভেদ করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। মাথাভাঙ্গা বর্ত্তমানে নদীয়ার সুবলপুর ও সুলতানপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভৈরবের প্রাচীন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভৈরব ঐ সুলতানপুর অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ রেলের 'দর্শনা' ষ্টেশনের নিকটে ও তৎপরে নদীয়ার জীবননগর দিয়া যশোহর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার প্রায় ২।৩ মাইল স্থান সমভূমি হইয়া গিয়াছে, খাতের কোনও চিহ্ন নাই। পরে ভৈরব খালিশপুর, মহেশপুর কোটচাঁদপুর, তাহেরপুর, কৃষ্ণডাঙ্গা, চূড়ামণকাটী, যশোহর, রূপদিয়া, সিঙ্গিয়া, নপাড়া দিয়া বর্ত্তমান খুলনা জেলায় প্রবেশ করিয়া বলেশ্বরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কপোতাক্ষ তাহেরপুরের নিকট ভৈরব হইতে উৎপন্ন হইয়া ঝিকরগাছা, ত্রিমোহিনী, সাগড়দাঁড়ী, কপিলমুনি, রাড়ুলী কাটীপাড়া প্রভৃতি স্থান দিয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে।

যশোহরের পূর্ব্বাংশ-বাহিনী গড়ুই কুষ্টিয়ার নিকট পদ্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া মধুমতী, বলেশ্বর ও হরিণঘাটা নাম পাইয়া নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও বরিশাল দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। যশোহরের কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা সকলেই মাথাভাঙ্গা হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এখন মাথাভাঙ্গার সহিত সংযোগ নাই; মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মধুমতী এখন প্রকাণ্ড নদী কিন্তু পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র-কায় ছিল, তখন নবগঙ্গারই প্রাধান্য ছিল। যশোহরের অন্যান্য নদী, যেমন, হরিহর, ভদ্রা, মুক্তেশ্বরী, হানু, বেগবতী, আফরা, গোবরা, ঘোড়াখালি, আত্রাই, মুক্তখালি ইত্যাদি সমস্ত নদীই পূর্ব্বোক্ত নদীসমূহের শাখা। যশোহরের পূর্ব্বাংশের বারাসিয়া নদী এখন মৃতপ্রায়. বর্ত্তমানে তাহার উভয় মুখেই মধুমতী। যশোহরের অধিকাংশ নদীর জীবনই মাথাভাঙ্গার জীবনের উপর নির্ভর করে। মাথাভাঙ্গার সহিত যদি পদ্মার অবাধ সংযোগ থাকে এবং যশোহরের কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা, ভৈরব প্রভৃতির সহিত যদি মাথা-ভাঙ্গার অবাধ সংযোগ থাকে, তাহা হইলে যশোহরের এই সকল নদীর মরণের ভয় থাকে না। যশোহরের স্বাস্থ্যের ও ধনসম্পদের যে এত অবনতি তাহার প্রধান কারণ, যশোহরের নদীগুলির অকালমৃত্যু বা মৃতপ্রায় অবস্থা।"

কাহিনী

—শ্রীচারুলতা রায়চৌধুরী

শীতের সন্ধ্যা—পাঁচটা না বাজতেই অন্ধকার। ঘরে আমি একা আপন মনে পায়চারি করছি আর ভাবছি এত বড় সন্ধ্যাটা কাটাই কেমন করে। চাকরির খাতিরে বিদেশে বাস। চাকরি ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে নি, ইচ্ছাও বিশেষ ছিল না। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস মনটাকেও যেন বরফের মত ঠাণ্ডা করে দিচ্ছিল। ভাল লাগছিল না কিছু। একটা বই হাতে করে পড়তে সুরু করলাম, পাতায় রইল চোখ কিন্তু মন রইল তার বাইরে। বুঝলাম এ বৃথা চেষ্টা, তাই বইটিকে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে দিলাম। আপনা থেকে একটা আলোয়ান টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী ছেড়ে—উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে। সামনে যে পথ পেলাম সেইটে ধরেই এগিয়ে চললাম, খেয়াল ছিল না কোথায় যাচ্ছি। বাতির সংখ্যা এবং লোক-চলাচল কিছু বেশী হওয়ায় বুঝলাম বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। পা আর অগ্রসর হতে চাইলে না, অথচ মনও শূন্যগৃহে ফিরে যেতে নারাজ। এ অবস্থায় কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় আমার পথের অনতিদূরে অতিরিক্ত বাতির সংখ্যা ও লোকের ভীড় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিষ্কর্ম্মা আমার মন একটা কিছু হুজুগের গন্ধ পেয়ে বললে, চল ঐ দিকে এগিয়ে এবং পদযুগল সে হুকুম মানতে দ্বিধা করলে না। নিকটে এসে দেখি, আমি একটি ছবিঘরের সামনে এসে পড়েছি। মোটরগাড়ীর ভীড় দেখে বুঝলাম, ছবির গুণ যদি নাও থাকে সুনাম আছে যথেষ্ট। অতএব কর্ম্মহীন সন্ধ্যাটা এখানে কাটিয়ে গেলে মন্দ হয় না। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম মুদ্রা যা আছে তাতে ছবি দেখা চলতে পারে। টিকিট-ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম। যেদিকে টিকিটের মূল্য কিছু কম সেদিকে লোকের ভীড় আরও বেশী, মাথার আড়াল কাটিয়ে টিকিটের গর্ত্তটি আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য, অন্ততঃ আমার মত আনাড়ীর পক্ষে।

টিকিট সম্বন্ধে যখন কতকটা হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন দেখি মাথারূপ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কি যেন একটা নড়াচড়া ক'রছে। এ হেন জীবটি কি জানবার জন্যে বেশ একটু কৌতূহল হওয়ায় ভাল করে দেখবার উদ্দেশ্যে আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সিঁড়ির ধাপে উঠলাম। তারপর যা দেখলাম তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। একটি লোক শোয়া অবস্থায় মাথার উপর দিয়ে টিকিট-ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। যে দুর্ভাগাদের মাথাকে পথ করে তিনি চলেছেন তারা না পারে এগিয়ে যেতে, না পারে পিছিয়ে আসতে। মনুষ্য-সমুদ্রের ধাক্কা এসে তাদের নিষ্কৃতির সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। অগত্যা উপরের মানুষটিকে না মেনে তাদের উপায় রইল না।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, ভাবলাম আমি কি স্বপ্ন দেখছি। চোখ দুটিকে ভালরূপে ঘষে নিয়ে আবার সেই জনারণ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, দেখলাম, দৃশ্যপটের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি, তেমনি সত্যভাবে বিরাজ করছে। আমি হতভম্বের মত এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি এমন সময় একটা লোক আমায় ধাক্কা দিয়ে বললে, "মশাই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কেন? দেখছেন না ভীড় ক্রমেই এগিয়ে আসছে, প্রাণের মায়া যদি থাকে সরে পড়ুন।" আমি ধাক্কাটুকু সামলে নিয়ে যেই ওপর দিকে তাকিয়েছি, দেখি মাথার উপর চলমান সেই লোকটা ততক্ষণে টিকিট-ঘরের সীমানায় এসে পৌছিয়েছে। আমি তার উপস্থিত-বুদ্ধি দেখে স্তম্ভিত। বাম হস্ত প্রসারিত করে সে তখন টিকিট-ঘরের গরাদে ধরেছে এবং পদযুগলের একটি তাহারই মত টিকিট-প্রত্যাশী একজনের গ্রীবার উপর নিঃসঙ্কোচে ন্যস্ত করে তার প্রয়োজন মত টিকিট কিনতে মনসংযোগ করছে। শুনলাম, এই টিকিটগুলি ফিরে এসে অতিরিক্ত মূল্যে ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করবে। এই হল তার পেশা। এ দিকে যে-বেচারি তার পায়ের চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে অক্ষম তার অবস্থা দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। মুখে বেশ বড় একটি হাঁ, চোখ দুটী ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে অথচ নড়বার শক্তি নেই; চারি-

দিকের মানুষ তার চারিপার্শ্বে যে ব্যূহ রচনা করে রেখেছে, সে ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসে এমন সাধ্য তার নাই। আমি দেখছি আর ভাবছি মানুষের ওপর মানুষের এ কি অন্যায় অত্যাচার। এতক্ষণে মাথার উপরকার লোকটীর টিকিট কেনা শেষ হওয়ায় সে অন্য লোকটির গ্রীবাকে মুক্তি দিয়ে আবার পূর্ব্বের ন্যায় মাথার উপর দিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ করে নিতে সুরু করে দিলে এবং পদভারমুক্ত ব্যক্তিটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজের বেশভূষার ত্রুটি সংশোধনে নিযুক্ত হল। যেখানে ভীড় সেখানেই দর্শক। আশ্চর্য্য এই, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একটি লোকও এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে বাক্যস্ফুরণ করে প্রতিবাদ করুলে না, অথচ তামাসাটা সকলেই উপভোগ করলে।

আমি বাঙ্গালী—দেহের পরিমাণ যষ্টিসম বললে অত্যুক্তি হয় না। মাথা হেঁট করে স্বীকার করছি, জোরে বাতাস দিলে নিজেকে সামলে রাখা আমার পক্ষে শক্ত হয়। এহেন আমার রক্ত তখন গরম হয়ে উঠছে, শীতের দিনে আলোয়ান গায়ে রাখা কঠিন হল, অথচ দর্শকমণ্ডলী স্থির, এতটুকু চাঞ্চল্য তাদের মধ্যে দেখা গেল না। মাথার উপরকার লোকটী মঞ্চ থেকে অবতরণ করা মাত্র আমি তার গলাধাক্কা দিয়ে সজোরে তাকে এক চড় কসিয়ে দিলাম এবং তারপর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, জনতার সকলেই দর্শক মাত্র ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তারই দলের লোক। চড়-মারা মাত্র তাদের লক্ষ্য আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হল এবং তারা দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি জানি, একা আমার শক্তি কতটুকু, সুতরাং কালবিলম্ব না করে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের চেষ্টা করলাম। মজা এই, যাঁদের পক্ষ অবলম্বন করার জন্যে আমার এই অবস্থা তাঁহাদের কেহ আমার সাহায্যে ত এলেনই না, উপরন্তু অনেকের মুখে একটু মুচকি হাসি দেখা গেল। ভাবখানা যেন 'যেমন লাগতে গিয়েছিলে এখন মজা টের পাও।'

আমি তখন একটী অন্ধকারযুক্ত গলিকে আশ্রয় করেছি, তারই সাহায্যে কোন গতিকে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে সে যাত্রা স্বশরীরে গৃহে ফিরলাম এবং কবির ভাষা অনুকরণ করে মনে মনে বললাম—

> "কোটি কোটি সন্তানের ভারত-জননী
> রেখেছ 'স্বদেশী' করি মানুষ করনি।"

ইংলণ্ড ও ভারত

ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি যে ভারত সাম্রাজ্যের দ্বারা প্রসূত, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে, একমাত্র শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারাই যে সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে—তাহা বলা চলে না, কারণ ভারতের কৃষিকার্য্য তখনও পর্য্যন্ত জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। এই বিষয়ে একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, তখনও পর্য্যন্ত ভারতের কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই বলিয়া, অথবা তখনও পর্য্যন্ত ভারতের কৃষিসম্পদ্ কথঞ্চিৎ পরিমাণে অপ্রতিহত ছিল বলিয়া ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের পক্ষে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, সেইরূপে আবার ইংলণ্ডের সহিত যে যে দেশ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরও অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তলাইয়া চিন্তা করিলে আরও দেখিতে পাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের কৃষিসম্পদ্ সম্পূর্ণভাবে এখনকার মত নাড়া চাড়া পায় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ও তাহার সখ্যসূত্রে আবদ্ধ অন্যান্য দেশগুলিকে বেকার ও অর্থাভাবের জন্য বিব্রত হইতে হয় নাই এবং যেদিন হইতে ভারতের কৃষক ও কৃষিকার্য্য টলটলায়মান হইয়াছে, সেইদিন হইতে ভারত সাম্রাজ্য ও বৈজ্ঞানিক শিল্প-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড এবং তাহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ দেশসমূহকে আবার বিব্রত হইতে হইয়াছিল...

যাযাবর ইহুদী

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

প্যালেষ্টাইন দেশ এবং ইহুদী সম্প্রদায় খৃষ্টান মাত্রেরই সুপরিচিত। খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক 'যীসাস' ছিলেন নেজারেথ-বাসী ইহুদী, নেজারেথ প্যালেষ্টাইনেরই অন্তর্গত। ইহুদী যীশু যে ধর্ম্ম প্রচার করেন কালক্রমে তাঁহার পরাক্রমশালী শিষ্যবর্গ তাহা সমগ্র পৃথিবীময় প্রচার করে। ইহুদীরাও পরে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে প্যালেষ্টাইন হারাইয়া নানা দেশে বসবাস আরম্ভ করে, কিন্তু ক্রাইষ্টকে 'মেসায়া' বলিয়া স্বীকার তাহারা কোনদিনও করে নাই।

যীশু খৃষ্টের জন্ম-সময় প্যালেষ্টাইনের মহাসঙ্কট কাল। রোমের 'স্বর্ণ-ঈগল' ক্রমশঃ তাহাদের মন্দিরের চূড়ায় বসিবার উপক্রম করিতেছে। রোমান রাস্তা প্যালেষ্টাইনের দুর্ভেদ্য দুর্গম প্রদেশগুলিকে 'লেজনেয়ার'দের পক্ষে সুগম করায় স্বাধীনতাকামী ইহুদীদের আশা-ভরসা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছিল। এতদিন ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার দ্বারদেশরূপে তাহাকে নানা অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এস্‌ড্রিলনের (Esdraelon) লাল মাটির সমতল ভূমির অন্য নাম আর্মাগেডন (Armageddon)। মিশরীয়, আসিরীয়, বাবিলোনীয়, গ্রীক, রোমান সকলেরই রক্তে এই সমতল সিঞ্চিত। কিন্তু পূর্ব্বে সাম্রাজ্যকামীরা যুদ্ধ ও কর লইয়াই ক্ষান্ত থাকিত। ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান ছিল বিরল। এ ক্ষেত্রে জাতির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম, কাজেই পুরোহিতরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসন করিতেন।

এক জাতির সহিত অন্য জাতির সংঘর্ষের ফলে একের বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ অন্যের জীবনে অঙ্গীভূত হয়। ইহা উভয়তঃ সত্য। অসভ্য জাতি সভ্য হয়; সভ্যজাতির মধ্যে অসভ্যতা প্রবেশ করে। যাযাবর পশুপালন বৃত্তিসম্বল ইহুদীরা এইরূপে ক্যাননাইটদের সংমিশ্রণে ব্যবসায়ী ও চাষী হয়। প্রবল পরাক্রমশালী রোমান সভ্যতা তাহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ক্রমশঃ 'রোমানাইজ' করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। পূর্ব্বে একবার গ্রীকরা তাহাদের 'হেলেনাইজ' করিবার চেষ্টা করে। ধর্ম্মপ্রাণ

অ্যান্টনিয়ো সিজেরী অঙ্কিত (গ্যালারি অব আর্ট, ফ্লোরেন্সে অবস্থিত) যীশুখৃষ্টের বিচারকালীন পাইলেট কর্তৃক জনতাকে তাঁহার নির্দ্দোষিতার কথা ঘোষণা।

ইহুদীরা সেদিন দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম এবং দেশকে বিধর্ম্মীর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ম্যাক্যাবীদের নেতৃত্বে সেদিনের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্যের কথা এই দুর্দ্দিনে গোধূলির আলোর মত এক নব প্রভাতের সন্ধান দিয়া জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহ-বিবাদের

সুত্রপাতে তাহারাই রোমানদের ডাকিয়া আনিয়াছিল। রোমানরা প্যালেষ্টাইনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—কিন্তু ক্রমশঃ নানা দলে বিভক্ত হইয়াও ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার সংগ্রামে মরে নাই।

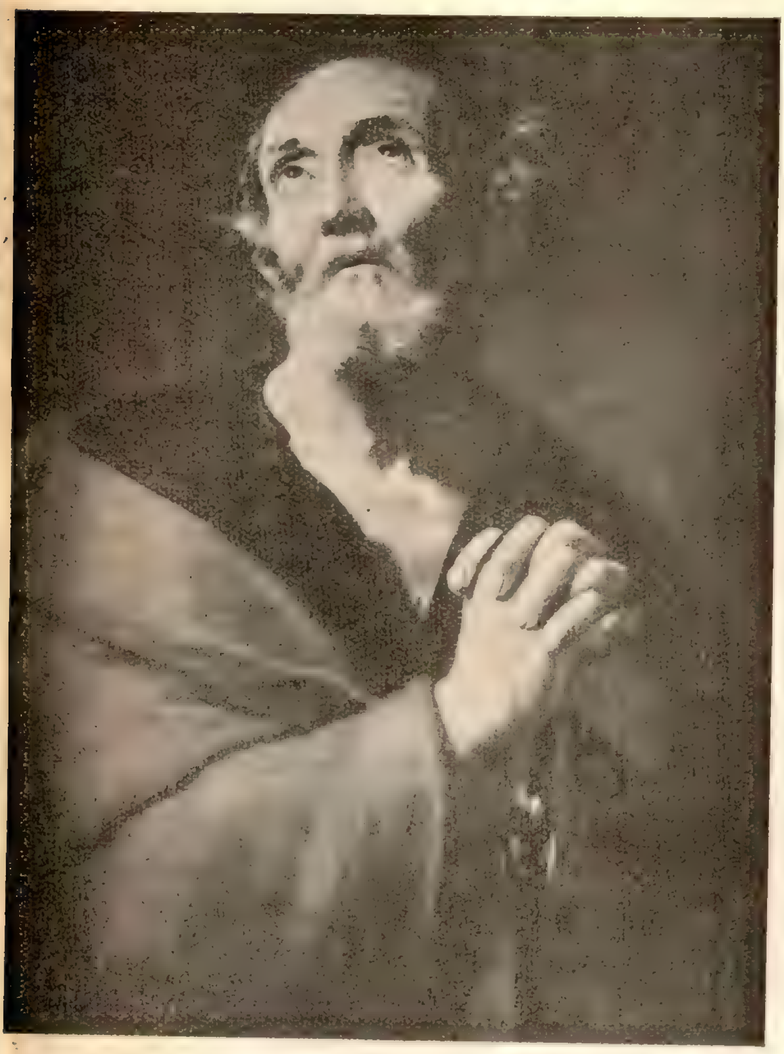

লিণ্ট (১৬০৬—১৬৯০ ফ্লেমিশ শিল্পী) অঙ্কিত পিটার।

প্রধান দল—স্যাড্ডুসিরা (Sadducees)। ইহারা অভিজাত শ্রেণী, অর্থবান এবং পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত। হেলেনিজম্ ইহাঁদের অপ্রিয় নয়, বরং পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার প্রধান উপায়। প্যালেষ্টাইনের সহিত তিনটি মহাদেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার ফলে কূটরাজনীতিতে ইহারা বিশেষ দক্ষ ছিল। রোমান অধিকার তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে কণ্টক না হওয়ায় তাহারা প্রকারান্তরে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণে প্রস্তুত ছিল না। হাই প্রিষ্টরূপে সুপ্রাচীন আইন মানিয়া চলিত এবং পরবর্ত্তী যুগের নিবন্ধকারদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিল না। একদিকে উদারমনা, অন্যদিকে সঙ্কীর্ণচেতা সাড্ডুসিরা এই আসন্ন দুর্য্যোগে বিশেষ বিচলিত হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে বিচলিত হইয়াছিল ফারিসিরা। ভাগ্য ও ভগবানে বিশ্বাসী এই ইহুদীদল ক্ষমতায় কম হইলেও সংখ্যায় ছিল বেশী। ধর্ম্মে এবং জীবনে বিদেশীর প্রভাব বৃদ্ধি ইহাদের চক্ষুশূল ছিল। কিন্তু এজন্য অস্ত্র ধারণ করা তাহাদের চিন্তায় আসে নাই। পাপের বোঝা আরও গুরুতর হইলে ভগবান নিশ্চয় আবার দেখা দিবেন; স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথাও শাস্ত্রেই রহিয়াছে; তখন দুঃখী অভাগা ফারিসিদের ডাক পড়িবে—মৃতেরা লাভ করিবে নবজীবন। ভগবান তাঁর প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা মেসায়াকে কখন পাঠাইবেন, তাহারই অপেক্ষায় তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া রোমানদের অত্যাচার সহ্য করিতেছিল।

অত্যাচার তখন প্রায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। 'হেরড দি গ্রেট' (খৃঃ পূঃ ৩৭—খৃঃ পূঃ ৪) ক্রমশঃ তাঁহার অধিকার সমগ্র প্যালেষ্টাইনে বিস্তার করিয়াছেন। সাধারণতন্ত্রী রোমের মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। টলেমী, সিজার, অ্যান্টনী—প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বাভাস, ঘন কৃষ্ণ মেঘের মত—প্যালেষ্টাইনের ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এখন

সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া অক্টেভিয়সের আগমনে রোমান গৌরব আরও সমুজ্জ্বল। রোমে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কালে চক্রী হেরড তাঁহার ক্ষমতা সুদৃঢ় করিয়াছেন—বশ্যতা স্বীকারের পর অক্টেভিয়স তাঁহাকে প্যালেষ্টাইন শাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই। বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া হেরড গৃহ-শত্রু দমনে ব্যস্ত। অত্যাচারী রাজার সর্ব্বত্রই শত্রু। নিরপরাধ নিজ পুত্র-পত্নীকে হত্যা করিতে হেরড দ্বিধা করেন নাই—অন্যান্য চক্রান্তকারীর নিধনে মায়া-মমতা দেখাইবেন কি করিয়া!

চক্রান্ত এবং হত্যা ব্যতীত হেরডের আর একটি কাজ ছিল—শহর স্থাপনা। সিজারে বন্দর তাঁহারই স্থাপিত। সামারিয়া শহর, জেরুজালেমের অপূর্ব্ব মন্দির তাঁহার কীর্ত্তি। শহর তৈয়ারী করিতে অর্থ লাগে। প্যালেষ্টাইনের মত ছোট গরীব দেশে টাকা আদায় করিতে হেরড যে নানারূপ করের ব্যবস্থা করেন, তাহার চাপে জনসাধারণের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হয়। সেই ধূমায়মান বিদ্রোহ-বহ্নি প্রশমিত করিবার জন্য হেরডের প্রসিদ্ধ জেরুজিলাম মন্দির। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ইহুদীদের উপর ইহাও এক নূতন অত্যাচার। মন্দিরের পার্শ্বেই ছিল—থিয়েটার এবং অ্যাম্ফিথিয়েটার এবং তথায় প্রতিযোগিতায় ধাবমান রথের ঘর্ঘর শব্দ, গ্ল্যাডিয়েটরদের ক্রীড়া দেখিয়া উল্লসিত নরনারীর চীৎকার নিত্য তাহাদের প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটাইত। উপরন্তু, মন্দিরের প্রবেশপথে তোরণের উপর 'স্বর্ণ-ঈগল' প্রতিক্ষণ ধর্ম্মহীন পৌত্তলিক রোমান অধিকারের কথা স্মরণে আনিত।

জন দি ব্যাপ্টিষ্ট জর্ডান নদীর যেখানে যীশু খৃষ্টকে দীক্ষা দেন বলিয়া প্রকাশ, বর্ত্তমান কালে সেখানকার লোক-সমাগমের দৃশ্য।

হেরডের রাজত্বের প্রধান ঘটনা—যীশুর জন্ম। গণৎকারের মুখে হেরড জানিতে পারেন "ইহুদীদের রাজা" জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; অঙ্কুরে তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য বেথলেহেমের শিশুদের হত্যা তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য।

তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর হইতে "স্বর্ণ-ঈগল" ফেলিয়া দিল। মহাপুরুষের

আগমন-সম্ভাবনায় সকলেই চঞ্চল—স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত।

প্যালেষ্টাইনের দুঃখ-রজনী তখনও শেষ হয় নাই। হেরডের এক পুত্র নয় বৎসর ধরিয়া জুডিয়ায় অত্যাচারের

যীশু খৃষ্টের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জার (চার্চ্চ অব নেটিভিটি বলিয়া প্রখ্যাত) ঘণ্টা। প্রতি বৎসর এখানে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে সেখানে জন-সমাগম হয়। এই সময়ে এই ঘণ্টা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই বাজানো হয়।

বন্যা আনে। অবশেষে রোমান সম্রাট্ তাঁহাকে প্রজাদের আবেদনে পদচ্যুত করেন। ফলে জুডিয়া রোমান শাসনে আসে। রাজ্য-শাসন, মৃত্যুদণ্ড এবং করগ্রহণ শাসনকর্ত্তা প্রোকিউরেটরের ছিল প্রধান কর্ম্ম। সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে ইহুদীদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই শাসনভার পড়িল 'স্যানহেড্রিন' জেরুজালেম-এর প্রধান বিচারালয়ের উপর। একাত্তর জন লইয়া এই সভা। প্রত্যেক দিন সভা বসিত। প্রত্যেক নগরে পৃথক্ "সানহেড্রিন" সাতজন সভ্য লইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা মীমাংসা করিত। কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে জেরুজালেমের আদালতে মীমাংসার জন্য বিষয়টি পাঠান হইত। এই আদালতের সব ক্ষমতা রোমান অধিকারে বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা রোমানরা নিজেদের হাতে রাখিয়া সানহেড্রিন শক্তিশালী করায় কূটনীতির ফল ফলে নাই, এমন নহে। ইহুদীরা মূর্ত্তি-বিরোধী বলিয়া মুদ্রায় খোদিত মূর্ত্তি থাকিত না। এমন কি জেরুজালেমে অবস্থিত রোমান সৈনিকদের সম্রাটের মূর্ত্তি-অঙ্কিত ধ্বজা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ দিয়া রোমান সাম্রাজ্যের শাসন ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইতেছিল। সাড্ডুসিরা রোমান অধিকার হেরডের রাজত্ব অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিত।

পাঁচজন প্রকিউরেটরের মধ্যে জুডিয়ার পন্টিয়াস পিলেটই (Pontius Pilate) সমধিক পরিচিত। তাঁহার রাজত্বকালে এমন অনাচার নাই যাহা ঘটে নাই। ইহুদীদের নিকট তখন এই অত্যাচারী প্রতিনিধিই শ্রেয়ঃ; সম্রাটের নিকট অভিযোগের ভয় দেখাইলে তিনি ইহুদীদের ঘরোয়া ব্যাপারে

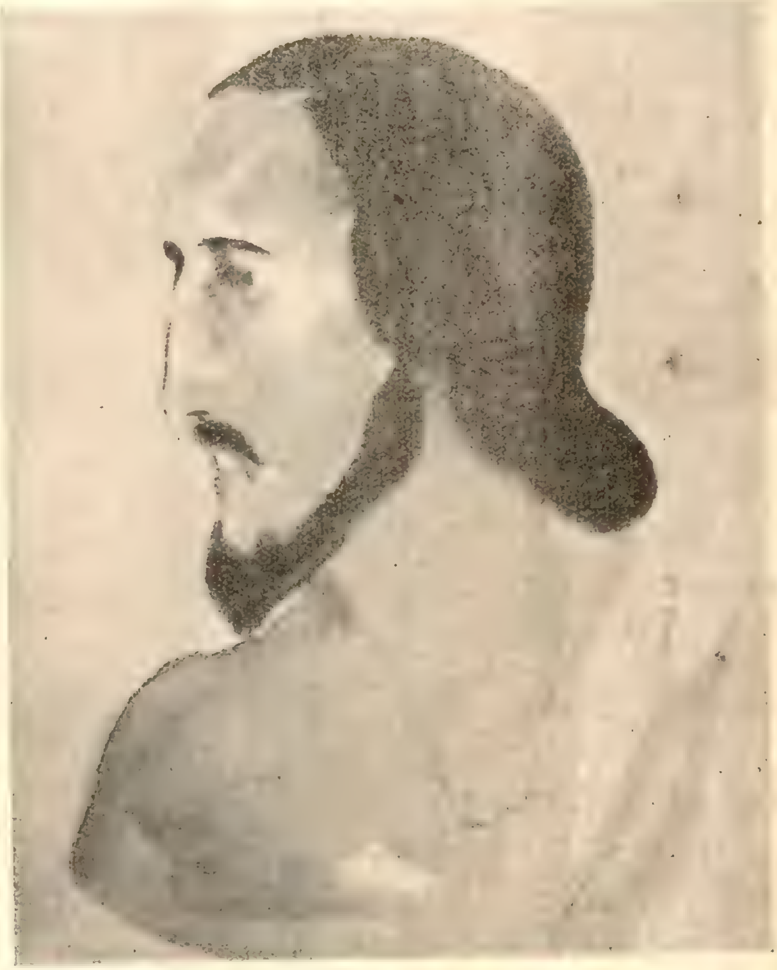

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত রোমের একটি ফ্রেস্কোতে অঙ্কিত এই মূর্ত্তি যীশু খৃষ্টের আদিমতম মূর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮৪৭ সনে ইহা টমাস হিকি নামে জনৈক ব্রিটিশ শিল্পী কর্ত্তৃক অনুকৃত হইয়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থান লাভ করে।

কোন প্রকার বাধা দিতেন না। কিন্তু বিচারকালে সম্রাটের নিকট নালিশের ভয় দেখাইয়াই ইহুদীরা যীশুর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

হেরডের অন্য এক পুত্র গ্যালিলী এবং পেরিয়ার শাসনভার লাভ করেন। সম্রাট টিবেরিয়াসের সহিত বাল্যকালে রোমে অবস্থান সময়ে বন্ধুত্ব থাকায় এখন তিনি বিশেষ ক্ষমতাবান্। হেরডের ন্যায় নূতন সহর প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অনুরাগ সুবিদিত। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ পৌত্তলিক। গ্রীক সংস্কৃতি ব্যতীত কিছুতেই তাঁহার রুচি ছিল না। রোমে অবস্থান-কালে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতার পত্নী হেরডিয়াসকে ভালবাসিয়া ফেলেন, ফলে নিজ পত্নী ত্যাগ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের পর হেরডিয়াসকে বিবাহ করেন। জন দি ব্যাপটিষ্ট সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে এই বিবাহের নিন্দা করিলে পত্নীর প্রীত্যর্থে এবং অনেকাংশে প্রজাদের বিদ্রোহ আশঙ্কায় তিনি জনকে নিজ প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের একটি দুর্গে বন্দী করেন। জনের মৃত্যুতে ইহুদী জাতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়।

যীশুর দীক্ষা হয় জনের নিকট। স্যাডুসিরা জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিত, ফ্যারিসিরা অক্ষরে অক্ষরে অনুশাসন মানিয়া চলিত, এ জন্য অজ্ঞ জনসাধারণদের তাহারাও ঘৃণা করিত। 'মেসায়া' আসিয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন, জাতি আইন মানিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলে। এই অজ্ঞ লোকেরা তাহার পথে পরম বিঘ্ন। কিন্তু পরম ভক্ত জন এবং তাঁহার শিষ্য যীশু উভয়েই এই অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের মুক্তির বার্ত্তা প্রচারে কুণ্ঠা করেন নাই।

রোমানদের অধিকৃত প্রদেশ বৈদেশিক শাসনরীতি ক্রমশঃ ইহুদীদের মনে বিকার আনিতেছিল। হেরডের অনুচরবর্গ

ব্যাসকুচিয়ো অঙ্কিত খৃষ্টের জীবনের একটি ঘটনা—তিনি ধীবর জাতিকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "মনুষ্য জাতির ধীবর হইবার ব্রত গ্রহণ কর।"

হেরোডিয়ানরা বিশ্বাস করিত রোমানাইজড্ হইলে বৃহত্তর প্যালেষ্টাইনের স্বপ্ন সফল হইবে। সমস্ত রোমান সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া ইহুদী রহিয়াছে, সংখ্যায় তাহারা সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। অর্থের প্রাচুর্য্য আছে। কূটচক্রে হেরড অদ্বিতীয়। টিবেরিয়াসের মৃত্যুর পর

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কষ্টকল্পনা নয়। এ স্বপ্ন হেরডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। তখন এই কল্পনা ছিল বলিয়াই জন-এর হত্যার পর হেরড যীশুর বিরুদ্ধে কোন প্রকার চক্রান্ত করেন নাই পাছে ইহুদীরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

জেথ্‌সিমেনের অন্ততঃ ৯০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া খ্যাত একটি জলপাই বৃক্ষ—এই স্থানে বসিয়া যীশু খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যরা পরামর্শ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

করে। ইহুদী নেতারা হেরডের দলকে যখন বিশেষভাবে জানাইয়াছেন যীশুর সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, তখনই হেরড যীশুর মৃত্যুদণ্ডের জন্য তৎপর হন।

হেরোডিয়ান দল হেরডের কূট বুদ্ধিতে শক্তি সঞ্চয় করাতে ফ্যারিসি দল বিশেষের আক্রোশ ছিল বেশী। ইহারা 'জেলট'। ফ্যারিসিদের নিষ্ক্রিয় ভাগ্য ও ভগবানের অপেক্ষা জাতিকে সান্ত্বনা কোন দিতে অক্ষম। করভারে প্রপীড়িত, দেশী এবং রোমান অত্যাচারে পদদলিত প্যালেষ্টাইনবাসী এরূপ ভাগ্যবাদী হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে ইহা তাহাদের ঐতিহ্য-বিরোধী। যুদ্ধ ছিল ইহাদের ব্যসন। সে জাতি এত শীঘ্র বশীভূত হইবে, ইহা সম্ভব নয়। মাকাবীয় যুগের কথা জাতির স্মৃতিপথ হইতে অবলুপ্ত হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দুর্দ্দিনেও ইহুদীরা পশ্চাৎপদ ছিল না। গ্যালিলীবাসী জুডাসের নেতৃত্বে রোমান এবং ইডোমাইটদের হাত হইতে (হেরড ছিলেন ইডো-মাইট) দেশকে মুক্তি দিবার প্রচেষ্টা ক্রমশঃ বলবান হইল। ফ্যারিসি হইলেও ইহারা বিশ্বাস করিত ভগবানের মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাহারা অগ্রসর হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাদের সাহায্য করিতে বিমুখ হইবেন না। স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহারা দেবতার জন্য প্রাণোৎসর্গে প্রস্তুত হইলে যীশুকে ইহারা দলপতি করিতে চাহিয়া-ছিল, কিন্তু যীশু এ নেতৃত্ব অস্বী-কার করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পর জেলটরা সমস্ত প্যালেষ্টাইন ব্যাপিয়া বিদ্রোহ করে। রোমান শক্তির কাছে ইহুদীদের শোচনীয় পরাজয় এবং প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া বাধা দানের পর ভেস্‌-পিয়ানের পুত্র টিটাসের হাতে জেরুজালেমের ধ্বংস ইতি-হাসের কথা; ইহার পর হইতেই ইহুদীরা পরবাসী।

ইজ্‌রেল জাতি উপযুক্ত নেতৃত্বের-অভাবে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইল। জেকবের অপর নাম ইজ্‌রেল। দুই হাজার বৎসর ধরিয়া যে জাতি আপনার সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহ করিবার জন্ম আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, মোজেস তাহাদের মিশর হইতে প্যালেষ্টাইনে আনেন। সিনাই পর্ব্বতে ভগবানের সহিত সাক্ষাতের পর তিনিই ত ক্যানান অধিকার করিতে মোজেসকে আদেশ দেন। তাহারাও মোজেসের অনুশাসন মানিয়া চলিতেছিল—জিহোবা ব্যতীত অন্য ঈশ্বর তাহারা কখন মানে নাই, মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সংগ্রাম করিয়াছে, তবে কেন বিধাতার রুদ্ররোষ তাহাদের উপর পড়িবে? সল এবং ডেভিড যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তাহা কি জিহোবার ইচ্ছাবিরুদ্ধ—তবে কেন জিহোবার প্রতিশ্রুত পুত্র, মেসায়া যীশু এই রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিমুখ হইলেন। স্বর্গরাজ্য আসিবে মৃত্যুর পর, ইহা শরীরধর্ম্মী রাজার রাজত্ব নহে, আধ্যাত্ম-জগতের কথা। এ সকল কথা আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনায় বিচলিত ইজরেলদের সান্ত্বনা দিতে পারে না। জাতি ধ্বংস হইবে এক মহত্তর মানবতার প্রতিষ্ঠায়, তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া এই ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিবে—রোমান ও ঘৃণিত এডমবাসীদের হস্তে ইজরেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে ইহা কেমন করিয়া সম্ভব। তাই জাতীয়তাবাদী ইহুদীরা যীশুকে ইজরেলের নির্দ্দিষ্ট মেসায়া বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। ইজরেলের ধর্ম্ম, নীতি, রাজত্ব—তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যীশুকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই। জিহোবা, যিনি দারুণ দুর্দ্দিনে মোজেসকে পথনির্দ্দেশ দেন, তিনি ইহুদীদের ত্যাগ করিবেন, তাঁহার প্রেরিত মেসায়া ইজরেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন, ইহা হইতে পারে না। ধর্ম্মপ্রাণ জাতীয়তাবাদী ইহুদীরা এ জন্যই অপর এক মেসায়ার অপেক্ষায় রহিল। সে মেসায়া আজও আসে নাই।

ইহুদী জাতি এখনও যাযাবর।

প্রসিদ্ধ স্পেনীয় শিল্পী মুরিলো কর্ত্তৃক অঙ্কিত যীশু খৃষ্ট সহ পিতা-মাতার মিশরে পলায়নের দৃশ্য।

বাঁকা হাসি

—শ্রীকণা দত্ত

মামীমার বাঁকা হাসিটুকুকে এড়াইতে পারিলেই যেন মানু বাঁচে, কিন্তু সময়ে সময়ে এমন অপ্রত্যাশিত কারণে মামীমা তাঁহার স্বভাবজাত বাঁকা হাসিটি হাসিয়া ফেলেন, যাহাকে এড়ান রীতিমত কঠিন।

সে দিন ঠিক অমনিধারা এক অপ্রত্যাশিত সময়েই, মামীমার মুখের বাঁকা হাসিটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মানু তখন সবে বাজার করিয়া ফিরিয়াছে।

বাজারের থলিটা আর মাটীতে নামাইয়া রাখিবারও তর্ সহিল না। হাসিয়া, বকিয়া, লাফাইয়া মানু অস্থির।

"একটা গোটা কাঁকড়া আজ ফাউ পেয়েছি, জান মামীমা! এত বড় লাল লাল বিন্দুতে ভরা সমুদ্দুরে কাঁকড়াটা, অমনিই দিয়ে দিলে সে।"

রান্নাঘরের ভিতর হইতে রন্ধনরতা সুভদ্রা ধমক দিয়া উঠিলেন, "ছেঁাচার মত চেয়েছিলি নিশ্চয়! পাজী ছেলে এত খায়! খেয়ে খেয়েও ওর আশ মেটে না মোটে।" একমাত্র পুত্রটীকে লইয়া বিধবা যাঁহার গলগ্রহ হইয়া আছেন, শেষের কথাকটি তাঁহাকেই সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ মানুর মামীমাকে।

মায়ের ধমক কিন্তু মানু গ্রাহ্যই করিল না, অধিকতর চঞ্চল ভাবে, উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসিয়া উঠিল।

"না গো না, মেছুনীটা বলে কী জান? বলে, খোকাবাবু! দেশে আমার একটা ছেলে আছে ঠিক তোমার পারা দেখতে, কাঁকড়া খাবার তার ভারী সখ, তাই এটা তোমায় আমি খেতে দিলুম।—মেছুনীটা ভারী ভাল মানুষ, না মা?" মানুর ঠিক এমনিধারা আনন্দের মুহূর্ত্তে, মামীমার মুখে সেই ভয়াবহ বাঁকা হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একে তাহার জীবনের প্রিয়তম খাদ্য, তাহাতে আবার বিনা পয়সায় সংগ্রহ করিয়া আনা, একটু বাহবা পাইবার আশাতেই মানু আগ্রহভরে মামীমার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল এবং পরক্ষণেই অপ্রস্তুত ভাবে মুখখানা পুনরায় নামাইয়া লইল। ঐ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপভরা শ্লেষ-হাসিটুকু তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণটুকুকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে।

"যে দেয়, সেই ত তোমার কাছে ভাল।"

মামীমা চটের থলিটী হাতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মানু ততক্ষণে সিঁড়ির তলার অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরীটুকুতে পলাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। তিনতলা বাড়ীখানির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া একমাত্র এই কুঠুরীখানিই, মামীমা স্নেহের দান স্বরূপ সুভদ্রা ও তাঁহার পুত্রের উপযোগী বিবেচনায় অক্লেশে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু ছাড়িয়া দিতে ভুলেন নাই। সুভদ্রা নিরামিষ হেঁসেলের ভার এবং মানু প্রাত্যহিক বাজারের ভারটুকু পরম গৌরব-সহকারে বহন করিয়া চলিয়াছে, ভারবাহী গর্দ্দভের মতই অকাতর দীনতায়। ঠিকে চাকর পয়সা চুরি করে, মানু সেটুকু পারিবে না। মামীমার এক একটী চাহনীতে তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া ওঠে। মামীমা তাহা জানেন, আর জানেন বলিয়াই বাজারের পয়সাকয়টী পরম নিশ্চিন্ততায় মানুর হাতে তুলিয়া দেন।

মামীমার মুখের বাঁকা হাসি, মনে শঙ্কা জাগাইয়াছে বটে, কিন্তু কাঁকড়ার কথাও বারে বারেই স্মরণে পড়িতেছে। আজ অনেকদিন পরে তাহার অদৃষ্টে আমিষ জুটিবে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে মামীমা পাতের পাশে একটুকরো মাছ ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে মাছটুকু ভাঙ্গিয়া মুখে দেওয়ারই যা অপেক্ষাটুকু। পেটে প্রচুর ক্ষুধা থাকা সত্বেও মানু সেদিন আর একগাল ভাতও মুখে তুলিতে পারে নাই। পচা বোট্কা একটা দুর্গন্ধে তখন সারা গা গুলাইয়া উঠিয়াছে। মাছটা বোধ হয় দুদিন আগে বাজার হইতে সে-ই কিনিয়া আনিয়াছিল। সমস্ত ভাত ফেলিয়া মানু উঠিয়া পড়িয়াছিল। মুখে চিরপরিচিত বাঁকা হাসিটুকু ফুটাইয়া মামীমা বলিয়াছিলেন, "নবাবপুত্তুর, গরীবের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।"

ভাই-এর বৌকে খুশী করিবার অভিপ্রায়ে সুভদ্রা সেদিন ছেলেকে মারিয়াছিলেন পর্য্যন্ত! কিন্তু সে কথা থাক।

তা মামীমা রাঁধেন ভালই। লেখাপড়ার দিকে সবিশেষ মনোযোগ ছিল না, তাই রন্ধন-বিদ্যায় হাতটা ভালই পাকাইয়াছেন। মানু অবশ্য তাঁহার হাতের রান্না কোনও দিনই খাইয়া দেখে নাই। কারণ আমিষের তরফে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি মুখরোচক রান্নাই তিনি সচরাচর রাঁধিয়া থাকেন।

না! মামীমার সেদিকে বিশেষ বুদ্ধি আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। মুখরোচক খাদ্য মাত্রেই যে পেটের পক্ষে সবিশেষ অপকারী, তাহা তিনি জানেন। সুতরাং সদ্য পাড়াগাঁ হইতে আগত এই গরীবের ছেলেটা যাহাতে গুরুপাক আহারে, অসুখে না পড়ে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য এবং সাবধানতা। নিজের ছেলেদের শরীর অপেক্ষা যেন মানুর শরীরের ভাল-মন্দের প্রতিই তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ। কাজেই, একই বারান্দায়, ছাঁটা ফুলের ঝালর-লাগানো পশমের আসনে বসিয়া মামীমার ছেলেরা হাঁদু, বান্টু যখন শরীরের পক্ষে বিষম অপকারী ডিমের ডালনা ও মাছের কালিয়া সহযোগে ভাত খায়, তাহারই অদূরে হাঁটুর মধ্যে চিবুক গুঁজিয়া পায়ের উপর উঁচু হইয়া বসিয়া মানু মায়ের তরফের নিরামিষ অড়র ডাল আর একছিটে কুমড়ো ছেঁচকি মাখাইয়া পরম তৃপ্তি সহকারে আঁকাড়া মোটা চালের ভাত গুলি গিলিয়া যায়।

অবিশ্যি বাড়ীতে কি আর আসন ছিল না, না, বাজারে ছাঁটা চালের অভাব? কিন্তু পায়ের উপর উঁচু হইয়া বসিয়া খাইলে পাকযন্ত্রে হজমের কাজ না কি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এবং ছাঁটা চাল খাইয়া অকারণে বেরীবেরী বাধাইবারও কোনও প্রয়োজন নাই, সুতরাং এই ব্যবস্থাই ভাল!

তা সে যাহাই হউক, ছোট ছেলের মন ত? কাজেই নিজের বিজ্ঞানসম্মত আহারটুকুর সময়ে মানু মাঝে মাঝে অপর পাতগুলির পানে এক-আধবার আড়চোখে না চাহিয়াই পারে না। আর একথা অন্যায় হইলেও সে না মনে করিয়াই পারে না যে, হাঁদু-বান্টুর পাতের ডিমের ডালনা, মাছের কালিয়া তাহার পাতের অড়র ডাল কুমড়ো-ছেঁচকী অপেক্ষা ঢের বেশী উপকারী এবং সেই তরকারীগুলির কাঁচা হলুদের মত সোনার রংই তাহার মনে স্পষ্ট ধারণা ধরাইয়া দিয়াছে যে, মামীমা রাঁধেন অতি চমৎকার!

কাঁকড়াটি মামীমাই রাঁধিবেন, এবং একান্তই তাঁহারই জন্য রাঁধিবেন। মামীমার বাজারের পয়সা দিয়া কেনা নয়, একজন শুধু তাহাকেই খাইবার জন্য অতবড় কাঁকড়াটি সাধিয়া দিয়াছে। মামীমা যতই তাঁহার স্বভাবজাত বাঁকা হাসিটি হাসুন না কেন, মানুর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে—মেছুনীটা সত্যই ভাল লোক।

সিমেন্ট-উঠা স্যাঁতসেতে মেঝের উপর শতছিন্ন অর্দ্ধমলিন কাঁথাখানা বিছান। এমনি মেঝেতে বসিবার জো নাই, ঠাণ্ডায় গা-হাত-পা টাটাইয়া, ব্যথা করিয়া উঠে। কাঁথাখানির উপর শুইয়া শুইয়া মানু যে কত কথাই ভাবিল, কোনও ভাল জিনিষই সে একা খাইতে পারে না। অপরকে ভাগ দিয়া খাইলে যেমন আনন্দটি উপভোগ করা যায় এমন আর কিছুতেই যায় না; কিন্তু মানুর জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা যিনি প্রিয়, তিনিই মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না। আচ্ছা! মা যে কেন মাছমাংস খান না। মানুর বড় আশ্চর্য্য লাগে। জিজ্ঞাসা করিলে মা কাণে হাত দেন।

"দূর পাগল! উনি গত হয়েছেন আর কি মাছমাংস ছুঁতে আছে? বিধবা যে।"

একজন মরিয়াছে বলিয়াই আর একজনকে চিরজীবন অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হইবে, এ ব্যবস্থা কিন্তু মানুর মোটেই পছন্দ হয় না। লুকাইয়া খাইলে দোষই বা কী? যে মরিয়াছে সে কী আর দেখিতে পাইবে? মা কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না। সেই একবেলা একমুঠি খাইয়া আর অপর বেলা প্রায় উপোষ দিয়া জীবনের সব রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া একজন মৃতব্যক্তির শোকে নিজেও প্রায় অর্দ্ধমৃত জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছেন।

পৃথিবীতে একমাত্র মানু ছাড়া যে আর কোনও তুচ্ছতম জিনিষটির প্রতি তাঁহার আকর্ষণ আছে, তাহা তো মনে হয় না।

মা কাঁকড়া খাইবেন না, হাজার সাধিলেও না। মানু হাঁদু, বান্টুকে খানিকটা তরকারী খাইতে দিবে। মামীমাও কাঁকড়াটি দেখিয়া বিশেষ খুসী হইয়াছেন মনে হইল। তিনিও যেন নিজের জন্য একটুখানি আলাদা করিয়া রাখেন। হ্যাঁ, মানুই তাঁহাকে বলিয়া দিবে অবশ্য! মেছুনীটা মানুকেই খাইতে দিয়াছে কি না, না বলিয়া দিলে মামীমা হয়ত নিজের জন্য তুলিয়া রাখিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন।

ঘড়িতে আটটাও বাজে নাই। সিঁড়ির মাঝখানের পেটা ঘড়িটায় আটটা বাজিতে পোনেরো। অন্যদিন দশটা বাজিলেও স্নান করিবার ইচ্ছা জাগে না, চিরপরিচিত অড়র ডাল আর কুমড়ো-ছেঁচকী মনে পড়িলেই স্নানের ইচ্ছা যেন কোথায় দূরীভূত হইয়া যায়। আজ কিন্তু ক্ষুধার চোটে পেটের যন্ত্রপাতিগুলো পর্য্যন্ত যেন তুমুলস্বরে কলরব বাধাইয়া দিয়াছে।

পাঁচ মিনিট ধরিয়া গুণিয়া গুণিয়া ঘড়ির সময়টুকু নির্ণয় করিয়া মানু আবার হতাশভাবে ঘরে ফিরিয়া এলাইয়া পড়িল। কাছেই রান্নাঘর; মা ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কোমরে আঁচলখানি গুছাইয়া জড়াইয়া লইয়া মামীমা হেঁসেল-ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। ঘরে ফিরিবার পথে আড়চোখে চাহিয়া সে তাহা দেখিয়া লইয়াছে। মামীমা যখন ঢুকিয়াছেন—

হইলও তাই!

"ও ঝি! এই কাঁকড়াটা একটু কুটে ধুয়ে দিয়ে যাও ত বাছা। আর একটু পেঁয়াজও কুচিয়ে দিও ঐ সঙ্গে।"

আগ্রহাতিশয্যে মানু এখন উঠিয়া বসিয়াছে। বাহিরে ঝিয়ের কাংস্যকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল:

"ও মা এ যে দেখি দিব্যি বড় কাঁকড়াটা গো, তা হাঁ গা! ক'পয়সা নিলে গা?"

পরক্ষণেই মামীমার মধুর স্বর শোনা গেল।

"পয়সা টয়সা নয় বাছা, রোজ এত এত মাছ কেনা হয় কি না, তাই এক দিন একটা মাছ ফাউ দিয়ে গেছে।"

"তা এটা পয়সা চারেকের খুব হবে গো, সমুদ্দুরের টাটকা জানোয়ার।"

মানুর বুকখানা আনন্দে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাঁদু-বাদুও মাছ খায় বটে, কিন্তু সে সব তো সমুদ্দুরের মাছ নয়, খাল বিল পুকুর; নয়ত বড় জোর নদীরই মাছ।

সমুদ্দুরের মাছ নিশ্চয় নদীর মাছের অপেক্ষা ঢের বেশী সুস্বাদু দাঁড়াইবে, কারণ মানু শুনিয়াছে সমুদ্দুর নদীর চেয়ে ঢের ঢের বড়। হাজার হাজার নদী মিলিয়া তবে না কি একটি সমুদ্দুর গঠিত হয়।

প্রবল উত্তেজনা কারাগৃহের মত কুঠরীটা আর মানুকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হঠাৎ একসময় দেখা গেল, চাতালটির এককোণে বঁটি পাতিয়া ঠিকা ঝি কদম কাঁকড়াটির অঙ্গচ্ছেদে নিবিষ্ট, আর তাহারই অদূরে বসিয়া মানু একাগ্রচিত্তে সেই ক্ষতবিক্ষত সামুদ্রিক জন্তুটির পানে তন্ময় চোখে চাহিয়া আছে। তাহাদের দেশ পোড়াবাড়ীর ধান-ক্ষেতের গোড়ায় গোড়ায় সঞ্চিত জলে গর্ত্ত বাঁধিয়া প্রচুর কাঁকড়া পরম নিশ্চিন্তে দিন যাপন করে বটে, কিন্তু তাহারা নিতান্তই তেলে কাঁকড়ার জাত। তাহাদের প্রতি মানুর তেমন ভক্তি নাই। শরীরেও তাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং লাল ঘি বলিয়াও কোন পদার্থ তাহাতে বর্ত্তমান নাই।

একটিমাত্র কাঁকড়া! কুটিতে দেরী হইবার কথা নহে। কলতলার ঠোঙার মুখে ঘিলুগুলি সামলাইয়া কদম যত্নসহকারে কাঁকড়াটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধুইয়া ধুইয়া তুলিল। বাবুর বাড়ী। বলিতে নাই, কাঁকড়াটি দেখা অবধি কদমেরও রসনা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। চকিত গতিতে একটি টুকরো হয়তো পেট-কাপড়ে লুকাইয়া ফেলা চলিত, কিন্তু ছেলেটা যা আদেখলার মত চাহিয়া আছে।

মনে মনে মানুর চোদ্দপুরুষের নিপাত কামনা করিয়া কদম বাসনটি সমেত কাঁকড়াটি রান্নাঘরে প্রত্যর্পণ করিল।

দরজার সম্মুখেই উনান। মামীমা কড়ায় তেল চড়াইয়া একরাশ পিঁয়াজকুচি ছাড়িয়া দিলেন, তার পরেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি, তারপরেই আদা, রসুন, লঙ্কা প্রভৃতি হরেক রকমের মশলা।

মানুর সারা শরীর পুলকে শিহরিয়া উঠিল। মামীমা তরকারী কষিয়া জল ঢালিয়া দিয়াছেন। আঃ! চমৎকার সুগন্ধ! ঠিক সমুদ্দুরের মাছই বটে।

তরকারী চড়াইয়া মামীমা বাহিরে আসিয়াছেন। "কি রে? এখেনে হাঁ করে বসে আছিস যে? যা যা ঘরে যা। হাঁদু-বাদুর জুতোয় তিনদিন কালি লাগান হয় নি; মামার পালঙ্ক ঝেড়েছিস?"

মামীমা যতই কাজের ফরমাস করুন না কেন, মানু আজ কিছুতেই পিছ-পা নয় বরং কাজে কাজে যত শীঘ্র সময়টা অতিবাহিত হয় ততই ভাল।

কাজটি শেষ হইলেই স্নান। স্নানের পরেই ভাত। কাঁকড়াটার যা ঘিলু! ভাতগুলি রাঙ্গা হইয়া যাইবে। মাটা যেন ক্ষী। এমন জিনিষ খাইতেও তাঁহার সখ হয় না।

আজিকার দ্বিপ্রহরের আহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে মানু জুতোর কালীর নূতন কৌটাটী উজাড় করিয়া জুতোয় লাগাইল। মনের ভুলে মামাবাবুর রেশমের গলাবন্ধ গেঞ্জীটা লইয়াই পালঙ্কের ঝুল-ধুলাগুলি মুছিয়া মুছিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া পুনরায় আলনায় টাঙ্গাইয়া রাখিল। কাজ তাহার শেষ হইয়াছে, জুতোগুলি ঝক্‌ঝকে করিয়াছে, পালঙ্কও তাই।

সিঁড়ির পেটা ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। বাস্! আর মানুকে পায় কে? স্নানের ঘরে হাঁদু-বাদু সোরগোল তুলিয়াছে। মানু সেখানে স্নান করে না। মোজেক পাথরের মেঝে, হটওয়াটার, কোল্ড ওয়াটার ওয়েভ, বাথ-টাব, বেসিন, টার্কিশ টাওয়েল, শাওয়ার বাথ, হাঁদু-বাদু সে সব অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। মানুর ওসব ভাল লাগে না, আর ভাল লাগিলেও মামীমা সে স্নানের ঘরে মানুকে ঢুকিতে দিতে একান্তই নারাজ। পাড়াগেঁয়ে ভূত ত! হয় ত মুখ ধুইবার বেসিনেই কুল-কুচোটী ফেলিয়া মুখ ধোওয়া সারিবে।

রান্নাঘর হইতে হাত পাতিয়া একপলা সরিষার তেল চাহিয়া লইয়া মাথায় থাবড়াইয়া খোলা উঠোনের কল-তলাটায় মানু বসিয়া পড়িল। এককোণে একটা হাড়িতে গঙ্গার পলিমাটী জড়ো করা ছিল, আর একটা হাঁড়ীতে সরিষার খোলও ছিল। অন্যদিন হইলে তাহাই এক খাবলা তুলিয়া লইয়া মানু গায়ে মাখিত। মামীমা বলিয়া দিয়াছেন, খোল এবং পলিমাটী মাখিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, বর্ণ উজ্জ্বল হয়, আর তাহা ছাড়া স্বদেশীও বটে।

মামীমার উপদেশগুলি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মানুর একটী বিষয়ে বড়ই আশ্চর্য্য লাগে; নিজের ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সত্যি সত্যি মামীমা যেন নিতান্তই উদাসীন। মামীমা নিজে, ছেলেপিলেরা, মামাবাবু, মামীমার ভাই, সকলেই দামী সাবান মাখিয়া মাখিয়া ফুরাইয়া দেয়। হাঁদুকে একদিন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই সে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া পলিমাটী ও খোল মাখাইয়া ছিল, মামীমা জানিতে পারিয়া সেদিন তাহার দুইটী গালে পাঁচটী আঙ্গুলের ছাপ সুস্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। এবং তাহার অপেক্ষাও যাহা ভয়াবহ সেই বাঁকা ব্যঙ্গ হাসির শ্লেষটুকু।

"হাদুকে তোর মত চাষাড়ে ভূত পেয়েছিস না?"

কিন্তু আজিকার দিনে এসব কথা মনে করিবার অবসর নাই। স্বদেশী সাবান, পলিমাটী ও খোল অনাদরে দূরেই পড়িয়া রহিল, মানুর আজ আর সেদিকে চাহিয়া দেখিবারও অবকাশ কম।

ঐ ত ঝালর-লাগান ছাঁটাফুলের আসন পাতিয়া মা জল রাখিয়া গেলেন।

হাঁদু-বাদু লাইমজুসে নিষিক্ত চুলের সুবাস জাহির করিয়া আসনে বসিয়াছে।

তবে সত্যই এবার আহারের চিরবাঞ্ছিত মুহূর্তটী আসিয়াছে। নিজের কলাইকরা গ্লাসে একগ্লাস জল ঢালিয়া লইয়া মানু বসিয়া পড়িল। আজ আর পায়ের উপর বসিয়া খাওয়া নহে, মানু আজ পদ্মাসন করিয়া খাইবে। কানা-উঁচু এনামেলের বাসনে মা ভাত বাড়িয়া দিয়া গেলেন। অন্যদিন এই ভাত ফুরানো মুস্কিল। কিন্তু আজ!

"আর দুটী ভাত দাও না মা!"

মিনতিভরা দৃষ্টি মানু সুভদ্রার পানে মেলিয়া ধরিল।

"বড্ড দুটীখানি দিয়েছ মা।"

সুভদ্রা রান্নাঘরের পানে চকিত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া লইলেন। মানুর মামীমা দেখিতে পাইলেই সেই চির-প্রচলিত বাঁকা হাসিটুকু হাসিয়া বলিবেন।

"খেটে খেটে জীবন পাত হয়ে গেল গো! অত খাটুলে—নিশ্চয় ক্ষিদে তো পাবার কথাই। দাও গো দাও, ছেলেকে তোমার আরও দু'মণ চাল বেঁধে দাও। বাবাঃ! পেট নয়ত, যেন ভুমি ছালা, গিলেই চলেছে ক্রমাগত! শেষ আর কিছুতেই হয় না।"

কথাগুলি শুনিতে নিতান্ত খারাপ লাগিলেও মুখ বুঁজিয়াই সহিয়া যাইতে হয়। প্রতিপক্ষ যেখানে অর্থশালী, প্রতিবাদ সেখানে একান্তই নিরর্থক! শ্বশুরকুলে আশ্রয় যোগাইবার মত কেহই বাঁচিয়া নাই, অশেষ প্রকার দীনতা ও গ্লানি সহ্য করিয়া তাই এখানেই টিকিয়া থাকিতে হয়।

ত্বরিত গতিতে এদিক-ওদিক চাহিয়া সুভদ্রা একমুঠো ভাত ছেলের পাতে ফেলিয়া দিলেন।

"আর চেও না, লক্ষ্মী বাবা আমার, ঘরে টিনের বাক্সে খই আছে, ক্ষিদে পেলে তাই খেও।"

পরশু একাদশীর উপবাস ছিল। মামীমা একপয়সার খই আনাইয়া দিয়াছিলেন, নিজে একমুঠো খাইয়া সুভদ্রা তাহাই মানুর জন্যে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

অন্যদিন মানু এ খবরে নিদারুণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, আজ কিন্তু তাহার সেদিকে কোনও আকর্ষণ আছে বলিয়াই বোধ হইল না।

রান্নাঘর হইতে বাটী হাতে মামীমা আগাইয়া আসিলেন, মানুর মনে হইল সত্যি, লক্ষ্মীঠাকুরুণের মতই রূপ তাহার মামীমার। সুগৌর তনুটী বেড়িয়া রাঙ্গাপাড় ধব্‌ধবে সাদা শাড়ী, আঁচলে চাবির গোছা, একহাত শাঁখা আর সোনার চুড়ি, হাতে ঝকঝকে কাঁসার জামবাটী। লক্ষ্মীঠাকুরুণের চেহারাটা মানু ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হইতেছে অনেকটা এই ধরণের চেহারাই বটে!

মামীমাকেও যেন বেশ একটু খুশী খুশী দেখাইতেছে। পাতে পাতে ডাল ঢালিয়া মামীমা মানুর পানে চাহিয়া হাসিলেন। আশ্চর্য্য! বাঁকা হাসি নাই, উজ্জ্বল নির্ম্মল একরশ্মি আনন্দের হাসি।

"মানু আজ নতুন তরকারী রে!"

মামীমার কথার জবাবে মানু একগাল ভাত মুখে পুরিয়া কৃতার্থতার হাসি হাসিল। একমাত্র তাহারই জন্য আজ এই নূতন তরকারীটি রাঁধা সম্ভব হইয়াছে।

ডালের পালা ফুরাইলে মামীমা বাটি হাতে আবার পরিবেশন সুরু করিলেন। বাজারের নূতন পটল উঠিয়াছে, তাহারই ডালনা! শুধু ডালনা নয়—তাহাতে আবার গাওয়া ঘিয়ের সম্বরাও দেওয়া আছে।

কিন্তু যতই যাহা থাকুক, মানু বেশীর ভাগ ভাত সরাইয়া রাখিবে ঐ লাল টকটকে কাঁকড়ার তরকারীটুকুর জন্য?

হাঁদু বাদু নিরামিষ আদপেই পছন্দ করে না। তা ছাড়া যাহারা লেখাপড়া শিখিতেছে, মাছ খাওয়া না কি তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বলিয়া দিয়াছেন, মাছের মাথায় ফস্‌ফরাস আছে, বুদ্ধি বাড়াইতে তাহা অতিশয় কার্য্যকরী।

"এ আর বেশী নেই রে, উনি বড় ভালবাসেন, তাই ভাল করে রেঁধেছি তোরা অল্প অল্প খা।"

কাঁকড়ার তরকারী, হাঁদু-বাদুর পাতে মামীমা অল্প অল্পই ভাগ করিয়া দিলেন।

মানু তখন ডালনা খাওয়া শেষ করিয়া পাতের অবশিষ্ট শুক্‌নো ভাতের রাশি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। আশ্চর্য্য! মামীমা তাহার কাছ দিয়াও হাঁটিয়া গেলেন না। হাঁদু-বাদুর পাতের নিকট হইতে সরিয়া সোজা রান্নাঘরে ঢুকিয়া, তাকের মাথায় জামবাটিটী ঢাকা দিয়া রাখিয়া, বাহিরে আসিলেন।

আসিয়াই মানুর পাতের কাছে হাজির। "কি রে অতগুলো ভাত, না খেয়ে, নাড়াচাড়া করছিস্ যে? তোকে বাপু আমি কাঁকড়া দিলাম না। গরীবের ছেলে যা তা অপকারী জিনিষ খেয়ে শেষটায় পেটের গোলমাল বাধাবি, আর তোর মা কেঁদেকেটে আকুল হবে'খন। আর একটু পটলের ডালনা দিই না হয়, ভাতকটা মাখিয়ে নে, ভাল গাওয়া ঘি দিয়ে সম্বরা দিয়েছি। কি রে দেব?"

নুন দিয়া চটকাইয়া ভাতগুলি গিলিতে গিলিতে মানু মাথা নাড়িল। গাওয়া ঘিয়ের তরকারী তাহার মুখে অকস্মাৎ বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে।

মামীমার মুখে সেই বাঁকা হাসিটী আরও বাঁকারূপে ফুটীয়া উঠিয়াছে।

"তা ঘিয়ের তরকারী মুখে রুচবে কেন? কুকুরের পেটে কী ঘি সহ্য হয়?"

রান্নাঘরে, হাঁদু-বাদুর ক্ষীরের বাটী সাজাইতে বসিয়া, সুভদ্রা চোখের জল ফেলিয়া লবণাক্ত করিয়া ফেলিলেন না তো?

ক্ষয় রোগ

—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

যক্ষ্মা, শোষ, উরঃক্ষত নামক পীড়ার হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের অভ্রান্ত মত এই সন্দর্ভে লিখিত হইল। এই পীড়াত্রয় নামতঃ পৃথক্ হইলেও প্রচলিত ভাষায় তিনটিকেই 'থাইসিস' বলা হয়। ভারতবর্ষ উক্ত পীড়ায় ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুখের বিষয় ইহার প্রতিকারকল্পে মাননীয়া লেডি লিন্‌লিথগাও সাহেবা অগ্রণী হইয়া "যক্ষ্মা-নিবারণী ফাণ্ড" খুলিয়াছেন। সে মতে ইহার সুচিন্তিত গবেষণার জন্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

যক্ষ্মার হেতু

"বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মাগদো হেতুচতুষ্টয়াৎ॥"

বাত,মূত্র পুরীষের বেগধারণ, অধিক মৈথুনাদি,ক্ষয়, অধিক বলপ্রয়োগাদি সাহসিক কর্ম্ম, অল্প, অধিক বা অকাল-ভোজন ইত্যাদি এবং শ্লেষ্মা-প্রধান স্থান ও গৃহাদিতে বাস, তথা শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর হেতু ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি কারণ হইতে রস-বাহিনী নাড়ী রুদ্ধ হইলে রক্ত-মাংস প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু পোষকাভাবে ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ আহারীয় রস হইতেই সমুদয় ধাতু পুষ্ট হয়। সুতরাং রস ও স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা-নামক রস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক হৃদয় ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে রুদ্ধ হয়। তখন ঐ রস বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া তথায় অবস্থান করে ও মুখ দ্বার কাশরূপে বহুভাবে নিঃসৃত হয়। ইহার নাম অনুলোম ক্ষয়

পুষ্টিকর খাদ্যবিহীন অত্যধিক মৈথুনাসক্ত মানবের শুক্রাদি ধাতু অধিক ক্ষয় হওয়ায় পর্য্যায়ক্রমে মজ্জা, অস্থি ইত্যাদি ধাতু ক্ষয় হয়। ইহাকে প্রতিলোম ক্ষয় বহে।

প্রথমোক্ত হেতু-চতুষ্টয়ের মধ্যে অনেকে বুদ্ধির দোষে বা অজ্ঞতানিবন্ধন মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করে ও অনেকে অফিস-আদালতে চাকুরী-নিবন্ধন ও সভা-সমিতিতে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে অসুবিধায় পড়িয়া মলমূত্রের বেগ ধারণ করে। ছাত্রদের পক্ষে অনেক নিম্ন শ্রেণীর স্কুল পাঠশালার কাণ্ডজ্ঞান-হীন শিক্ষকদের দোষে পরীক্ষার সময় মলমূত্রের ছলনায় নকল করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ছাত্র-ছাত্রীকে মলমূত্র ত্যাগের জন্য সময় মত ছুটি না দেওয়ায় বহুলোকের পীড়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

সেইরূপ অজ্ঞতা-নিবন্ধন অতিরিক্ত মৈথুনাদি বা শুক্রক্ষয়-রূপ মেহাদি পীড়া হইতেও ইহার উদ্ভব হয়। দুঃসাহসিক বলপ্রয়োগাদিও পীড়ার অন্য কারণ বটে।

উপবাস, অল্প, অধিক বা অকাল-ভোজন অন্যতম কারণ। তদুপরি দেশের দারিদ্র্যই বিশেষভাবে দায়ী বলা যাইতে পারে এবং ক্ষীর ঘৃতাদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবও কারণ বটে। সেইহেতু আয়ুর্ব্বেদে শরীরের রসায়নের জন্য নিত্য ক্ষীর (দুগ্ধ) ও ঘৃতপানের ব্যবস্থা আছে, দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে অনেকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়া উঠে না।

শোষ

অতিরিক্ত ব্যবায় (মৈথুন), শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথ-পর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত), উরঃক্ষত এই সমুদয় কারণ হইতেও শোষ রোগ হয়। প্রথমোক্ত তিনটি কারণ ব্যতিরেকে ব্যায়াম ও পথ-পর্য্যটন শব্দে পুষ্টিকর আহার বিহীন কৃষক শ্রমিক ও সর্ব্বসাধারণের অপরিমিত পরিশ্রম বুঝিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিতামূলক অতিরিক্ত সন্তরণ, অতিরিক্ত দৌড় বা ক্রীড়ার নিমিত্ত অতিরিক্ত শ্রম ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

ব্রণ, ক্ষত অর্থাৎ শরীরের যে কোন স্থানের বা যে কোন ক্ষত উপেক্ষিত হইলে সেই ক্ষতের জন্যও ক্ষয় রোগের উদ্ভব হয়, উরঃক্ষতজনিত ক্ষয়ের প্রতিও বল-বদ্ধিগ্রহাদি বা ভার-বহনাদি বা অধিক শ্রমজনক কার্য্য, তথা অধিক বলপ্রয়োগ, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে বহুদূর গমন, দূর-লম্ফন, শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন ইত্যাদি অন্যান্য অনুক্ত কঠোর কর্ম্ম সম্পাদনে বক্ষঃস্থলে ক্ষত হইয়া ক্ষয় রোগের উদ্ভব হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে এক পীড়া হইতেও অন্য পীড়ার উদ্ভব হয়। সে মতে যে দেশে উপযুক্ত আলো বাতাস নাই, বা উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাব হেতু দেশ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া জল-বায়ু

প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সেই দেশে, সেইরূপ স্থানে, সেরূপ গৃহে আমাদের দারিদ্র্যনিবন্ধন অবস্থান ও আমাদের টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, বিষম জ্বর ও কালাজ্বর ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া কোন কোন রোগীর ক্ষয়রোগ জন্মায়। শ্রেষ্ঠ নরপতি রামচন্দ্রের আমলে উত্তর ও পশ্চিম দ্বারবিশিষ্ট ঘরের খাজনা ছিল না। কারণ উহা বাসের পক্ষে দুঃখজনক, অনুপযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর। বর্ত্তমান যুগে আমাদের অজ্ঞতা বা অভাব হেতু ঐরূপ গৃহের অভাব নাই। সে মতে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে উল্লিখিত সমুদয় কারণ হইতে ম্যালেরিয়াদি নানাপ্রকার বিষাক্ত জ্বরের উদ্ভব হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে আভ্যন্তরীণ রক্ত ও অন্যান্য ধাতুগত ক্রিমি রোগের উদ্ভব হইয়াও (যাহাকে অ্যালোপ্যাথি মতে জীবাণু বলে) জ্বর রোগ হয়। স্থান-কাল-ভেদে যেমন কোন জলে প্রথমে একরূপ জীবাণু হইয়া পরে ঐ দূষিত জলেই নানা প্রকারের জীবাণু দেখা যায়। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে অবস্থিত মানব-দেহেরও রস-রক্তাদি জলীয় ধাতুতে প্রথমে এক প্রকার জীবাণু, পরে নানা প্রকারের জীবাণুর সৃষ্টি হইয়া জীবাণু-বিশেষের খাদ্য-স্বরূপ রস, রক্ত, বক্ষ ইত্যাদি ধাতু ও স্থানের খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকে ক্রমে বহু জীবাণুর উদ্ভব হইয়া মানবের জীবন নাশ করে। চিকিৎসা দ্বারা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি কোন জীবাণু নষ্ট না হইলে তাহাই প্রবল হইয়া দেহকে মৃত্যুমুখে আনয়ন করে। আবার জীবাণুজনিত পীড়া হইতে অন্য পীড়ার উদ্ভব হইয়া পূর্ব্বজীবাণু বা পীড়া স্বতঃই নষ্ট হয়। কোনও ক্ষেত্রে উভয়েই বিদ্যমান থাকে। আয়ুর্ব্বেদে সেই জন্য উক্ত আছে :

জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্তমুদীর্য্যতে
রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শোষশ্চাপ্যুপজায়তে।

অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত কারণে উদ্ভূত জ্বর-সন্তাপ হইতে রক্ত-পিত্ত হয়। তাহা হইতে শোষ (consumption) হয়, যেমন ম্যালেরিয়া হইতে অনেকের ক্ষয় রোগ উপস্থিত হয়।

এইরূপ পূর্ব্বোক্তরূপ আলোবাতাসবিহীন ঠাণ্ডা স্থান হইতে কালপাত্রভেদে উৎপন্ন প্রতিশ্যায় (catarrhal fever) হইতে ব্রঙ্কাইটিস হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে :

"প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।"

অর্থাৎ প্রতিশ্যায় হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয়, থাইসিস বা কনজাম্শন (consumption) হয়। এইরূপে কোন পীড়া হইতে কোন পীড়ার উদ্ভব হইয়া পূর্ব্ব পীড়া নষ্ট হয় বা কখনও উভয় পীড়াই বর্ত্তমান থাকিয়া গুরুতর ব্যাধিশঙ্কর উপস্থিত করে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহু কারণ হইতে এই পীড়ার উদ্ভব হয়। যথা—অতিরিক্ত ধূমসেবন, ধূলিসেবন ইত্যাদি। সহর প্রভৃতিতে এই দুইটী কারণ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর সুব্যবস্থা দ্বারা এই কারণদ্বয় হ্রাস করা যায়। কিন্তু মফঃস্বলে ধূম না থাকিলেও ধূলার অভাব নাই, তাহার নিবারণ করা সহজসাধ্য নয়। এই জন্যই নদীর চর প্রভৃতি উন্মুক্ত বায়ুপ্রধান স্থানেও পীড়ার উদ্ভব দেখা যায়। পীড়া সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতগুলি কারণ উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্যবিহীন রুক্ষ ও অল্প-ভোজনই আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিতে হইবে। একদিকে অন্নসংস্থানের জন্য কঠোর শ্রমজনক কার্য্য, অন্যদিকে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, এই উভয় কারণ সর্ব্বোপরি স্বীকার করিতে হইবে এবং কর্ম্মকার ও ধুনকরের আবাসভূমি ও কাপড়ের কল, সূতার কল, গেঞ্জির কলের সূতার ধূলি ও অন্যান্য ধূলিযুক্ত ব্যবসায় এই পীড়া উদ্ভবের আংশিক কারণ বটে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই পীড়াকে বিশেষরূপে সংক্রামক বলিয়াছেন। এজন্য রোগীর মুখের পার্শ্বে প্রসঙ্গ, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, সহভোজন, এক শয্যায় শয়ন, এক বস্ত্র পরিধান, এক মাল্য বা অলঙ্কার ধারণ, এক পাত্রে তৈলাদি রাখিয়া সকলে সেই পাত্রের তৈল অনুলেপন ইত্যাদি নিষেধ। এই কারণ হইতেই, অর্থাৎ রোগ সংক্রামিত না হইবার জন্যই হিন্দুদিগের অস্পৃশ্যতা নামক আচার-বিচার সমাজ-দেহে বিসর্পিত হইয়াছে। উহা আজ সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে সত্য। কিন্তু আজকাল বিলাতি ঔষধ পত্রের বা খাদ্য-দ্রব্যের লেবেলেও 'হস্তদ্বারা স্পর্শিত নয়' লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং হিন্দু আদর্শ অস্পৃশ্যতার তাৎপর্য্য প্রণিধান-যোগ্য।

যাহা হউক, এই জনসংহারক পীড়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ। দুঃখের বিষয়, সরকারী রিপোর্টও ভ্রমাত্মক। কারণ, আমরা জানি,

এই রোগ পূর্ব্ব হইতেই আছে—ইহা জানিলে, জীবন বীমা কোম্পানী হইতেও টাকা দেয় না, সে জন্য অনেকে রোগ গোপন করে। অধিকন্তু বিবাহ-সম্বন্ধ নির্ণয়ে বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ উভয়ের ক্ষয় রোগের বংশ বিচার করায়, উক্ত ব্যাপারেও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পেও অনেকে এই রোগ গোপন করিয়া থাকে। সুতরাং সরকারী রিপোর্ট যে ভ্রমাত্মক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সংক্ষিপ্ত লক্ষণ

অনেক চিকিৎসক এই পীড়া সম্বন্ধে যথেষ্ট ভুল করিয়া থাকেন। গলা চিরিয়া বা যে কোন কারণে মুখ দিয়া একটু রক্ত পড়া দেখিলেই তাহাকে ক্ষয়রোগ বলেন; বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। রক্ত পড়া বা যত প্রকার লক্ষণ থাক না কেন, আয়ুর্ব্বেদোক্ত

> "অংশপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ।
> জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥"

অর্থাৎ, স্কন্ধ ও পার্শ্বের বেদনা, হাত-পায়ের উত্তাপ-বৃদ্ধি ও সর্ব্বদা জ্বর লাগিয়া থাকা, এই তিন লক্ষণ বিশেষরূপে থাকিলে তবে ক্ষয়রোগ বলা যায়। তন্মধ্যে যত প্রকার লক্ষণই হউক বা না হউক, "অবিচ্ছেদ জ্বর" থাকিলেই তাহাকে ক্ষয় বা যক্ষ্মা বলা যায়।

দুঃখের বিষয়, অনেক চিকিৎসক জ্বরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া একটু রক্ত দেখিলেই যক্ষ্মা বলেন। তবে ইহা বিশেষ-রূপে স্বীকার্য্য যে, উপেক্ষিত হইলেই কালে উহা ক্ষয়ে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ তখন জ্বরও দেখা দিবে। জ্বর আরোগ্য ও শরীরের ক্ষয় না হইয়া ওজন বৃদ্ধি হইলেই আরোগ্যের পথে বুঝিতে হইবে। আর রক্তনিষ্ঠীবন, জ্বর, স্বরভঙ্গ, দুর্ব্বলতা, বুকের পার্শ্বে বেদনা, উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণও সাংঘাতিক বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা

এই রোগে যত প্রকার ঔষধই থাক, আয়ুর্ব্বেদ মতে স্বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্রে স্বর্ণের গুণ লিখিতে গিয়া "রসায়ন" ইত্যাদি অনেক গুণের সঙ্গে "রাজযক্ষ্মঘ্ন" এই শব্দ উল্লেখ আছে। আমরাও সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা দ্বারা উহার সত্যতা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি।

এখানে জানিবার বিষয় এই যে, তরল স্বর্ণ ইনজেকশন বা যে কোন ভাবে ব্যবহার অপেক্ষা "স্বর্ণভস্ম" ব্যবহারের উপ-কারিতা অধিক ইহাই আমার মত। স্নায়ু-দুর্ব্বলতা, বায়ু, বাত ও উন্মাদ রোগেও স্বর্ণের তুল্য উপকারী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। 'ডাইলিউশন' অনুসারে হোমিওপ্যাথি ঔষধের যেমন শক্তিবৃদ্ধি ও গুণাধিক্য হয়, আয়ুর্ব্বেদের লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু পদার্থের সম্বন্ধেও সেইরূপ যত অধিক ভস্ম করা যাইবে, তত অধিক গুণদায়ক হইবে।

যেমন সহস্রপুটিত, লক্ষপুটিত লৌহ প্রভৃতি ধাতুসমূহ অমৃততুল্য, ইহা পরীক্ষা দ্বারা অনেকেই অবগত আছেন। স্বর্ণ সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। এবং সহজপাচ্য হইয়া রোগ-প্রশমনে ইহা শীঘ্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে ক্ষয় চিকিৎসায় 'ক্যালসিয়াম' বা মণি-মুক্তা প্রভৃতির ভস্ম ও স্বর্ণভস্ম যোগে অনেক ঔষধের উল্লেখ আছে।

অ্যালোপ্যাথি মতে ইদানীং উহা উক্ত পীড়ায় পৃথক পৃথক ভাবে ইনজেকশনরূপে বা সেবন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও বহু ধাতু সংমিশ্রণে তৈয়ারী আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের গুণ ক্ষেত্রবিশেষে অধিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

এই পীড়ায় স্বর্ণাদি ও মণিমুক্তাদি সংমিশ্রণে তৈয়ারী "জয়মঙ্গল রস" ও "বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র" ঔষধদ্বয় অন্যান্য মতের ঔষধ অপেক্ষা অধিক গুণদায়ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অ্যালো-প্যাথিমতে যে স্বর্ণ ও ক্যালসিয়াম ইনজেকশনরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় শোধন ও ভস্ম করার পর, ঐ চূর্ণ মুখে সেবন করিলে ফল অধিক হইবে। গভর্ণমেণ্ট বিভাগের কর্ত্তাগণ এবিষয়ে অবহিত হইলে সুখী হইব। কিন্তু তরল করিয়া ভিন্ন ইনজেকশন, পাউডার ইনজেকশন চলে না, তরল করিলে স্বাভাবিক স্বর্ণের ন্যায় ফলদায়ক হইতে পারে না। ভস্মস্বর্ণ সেবন অপেক্ষা উহার ফলও অনেক কম হইবে। ভস্ম করিয়া সেবন করিলে যেরূপ সূক্ষ্মস্রোত-গামী সহজে হইতে পারিবে, স্বাভাবিক "পাকা চিনাপাত" বা অবস্থান্তরিত তরল স্বর্ণ সেবন বা ইনজেকশনরূপে ব্যবহৃত হইলে সেরূপ শীঘ্র ফল হইবে না। এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত দুইটি ঔষধের ন্যায় ভস্মস্বর্ণ ও মণিমুক্তা প্রভৃতি ক্যালসিয়াম হইতে ঔষধ এই রোগের জন্য অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী, সকল মতের চিকিৎসকগণই প্রস্তুত করিতে পারেন।

এই রোগে উদরাময় উপস্থিত হইলে অতি শীঘ্রই রোগীর জীবননাশ ঘটে, কারণ উভয় দিক্ হইতে ক্ষয় আরম্ভ হয়। সে মতে উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র আরোগ্যের চেষ্টা করিতে হইবে।

এই রোগে উন্মুক্ত স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান এবং বিশুদ্ধ বায়ুসেবন বিশেষ উপকারী। সমস্ত অনুকূল থাকিয়াও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব থাকিলে, রোগ প্রশমনের আদৌ আশা নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নিত্য দুগ্ধ ও ঘৃত পানের অভাব হওয়ায় ও অস্বাস্থ্যকর গৃহাদিতে বাস হেতু এই দেশে এই পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হইতেছে। দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যাই উহার একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই। রাজদৃষ্টি পতিত হইলে সকল সমস্যারই সমাধান হইতে পারে।

যক্ষ্মা নিবারণকল্পে যে কাণ্ড হইয়াছে, উহা দ্বারা গবেষণার সাহায্য, যক্ষ্মা-নিবাস, ও কিরূপ গৃহে বাস করা উচিত বা অনুচিত, অধিক মাত্রায় জানালার উপকারিতা, উত্তর ও পশ্চিম দ্বার বিশিষ্ট গৃহের অপকারিতা সম্যক্‌রূপে দরিদ্র নিরক্ষর দেশবাসীকে ছায়ালোক, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা ইত্যাদি প্রচার দ্বারা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সহযোগিতায় স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ প্রচারক নিযুক্ত করিয়া কি হইবে?

বসুমতী

—শ্রীহরিপদ দত্ত

মাতঃ বসুন্ধরে, সত্য রত্নপ্রসবিনী
ছিলে তুমি একদিন, তব গর্ভবাসে
রজত, কাঞ্চন, মরকত আদি মণি
ছিল কত, লোভী নর সঞ্চয়ের আশে
নিরত হরণে তা'র রাজার ভাণ্ডার
পূর্ণ তাহে কত শত সংখ্যা নাহি তা'র।

গর্ভজাত তব লৌহ, অঙ্গারের রাশি
হরিছে কতই নর নির্ম্মম অন্তরে,
দস্যুদল গৃহস্থের গৃহে যথা পশি'
অসহায়, সবলে সকল ধন হরে।
লুটিয়া জঠর হ'তে তৈলের ভাণ্ডার,
করিল বিশুষ্কপ্রায় অন্তর তোমার।

উরসের শোভা তব সরিতের হার
হ'য়ে গ্রন্থিচ্যুত শত এবে শুষ্কপ্রায়,
প্রকটিত নীরসতা দেহেতে তোমার,
বিলুপ্ত শ্যামল শোভা সে কারণে হায়!
তাই বুঝি ক্ষোভজাত তব অশ্রুজল
প্লাবিত বন্যার রূপে করে বক্ষস্থল!

তেজরস বিরহিত, বিগতবৈভব,
হারাইছ জঠরের শকতি আপন
বসুমতি! অসমর্থ করিতে প্রসব
ধান্য, শস্য রাশি রাশি পূর্ব্বের মতন।
হাহাকার চারিদিকে ক্ষুধার তাড়নে
হয় কি ক্ষুধার শান্তি হীরককাঞ্চনে?

বিজ্ঞান করিল নরে বিরহিতজ্ঞান—
বিজলীর করিয়া বশ্যতাসম্পাদন,
ব্যোমপথে করিয়া উড্ডীন ব্যোমযান,
স্রোতস্বতী সেতুযোগে করিয়া বন্ধন,
অঙ্গার হইতে বাষ্প করিয়া সঞ্চয়,
বিফল গৌরবে স্ফীত হইল হৃদয়।

বধির শ্রবণ, অন্ধ থাকিতে নয়ন,
নাহি দেখে, নাহি বুঝে সাধিছে অপায়
তেজ, রস বসুধার করিয়া হরণ,
মেঘের বর্ষণে, জন্মে হ'য়ে অন্তরায়।
ক্ষিতি-উর্ব্বরতা-লোপ যা'দের কারণে
অচিরে অঙ্গার, ভস্ম পড়িবে বদনে।

সংবাদ ও মন্তব্য

ক্ষুধার জ্বালা

জুলাই মাসের মধ্যভাগে সুভাষচন্দ্র অ্যাবোটাবাদের এক জন-সভায় বক্তৃতায় বলেন : স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধান না হইলে অন্ন-সমস্যা মিটিবে না। পরবর্ত্তী সপ্তাহে বাঙ্গালার বরিশাল জেলা হইতে নিম্নের সংবাদটি পাওয়া গিয়াছে, গৌরনদী থানার অন্তর্গত হোসনাবাদ গ্রাম হইতে একটি মর্ম্মান্তিক হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, একটি মুসলমান মজুর ক্ষুধার জ্বালায় দুই তিন রাত্রি পর-পর অন্ধকারে প্রতিবেশী একটি দরিদ্র পরিবারের ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহ চুরি করিয়া খাইত। এক রাত্রিতে এই অবস্থায় গৃহের লোকজন জাগিয়া উঠিয়া সোরগোল তুলে এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া এই হতভাগ্যকে এমন ভাবে মারপিট করে যে, লোকটি মারা যায়।

•

স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধান না হইলে যে অন্ন-সমস্যা মিটিতে পারে না, এই সংবাদ হতভাগ্যের নিশ্চয়ই জানা ছিল না। সাঁইত্রিশ কোটি লোকের অধিকাংশই যে-দেশে এইরূপ হতভাগ্য হইতে চলিয়াছে, সে-দেশে সুভাষচন্দ্র-প্রমুখ নেতারা স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা যত পারেন করুন, তাহাতে স্বাধীনতা-সমস্যারও সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান এই যে, অন্ন-সমস্যা মিটাইবার কাজেই মানুষের প্রথম হাতে খড়ি—ব্যক্তিগত জীবনেও যেরূপ, সমষ্টি-গত জীবনেও সেইরূপ। ইতিহাস ভাল করিয়া পাঠ করিলে সুভাষচন্দ্রের ইহা জানা থাকিতে পারিত যে, আজ যে-সকল দেশ স্বাধীন বলিয়া নিজেদের মনে করে—যদিও বস্তুতঃ তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে—তাহারাও যে-সামান্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা অন্ন-সমস্যা মিটাইবার চেষ্টাতেই অর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু স্বকীয় মাতৃস্তন দুগ্ধহীন হওয়ায় যে-শিশু 'ফিডিং-বট্‌ল'-এ কিংবা অপর শিশুর মাতার স্তন্যে পালিত হয়, তাহার স্বাধীনতা যে-স্তরের, এই সকল স্বাধীন জাতির স্বাধীনতাও সেই স্তরের। আমরা ক্রমাগত বলিতেছি যে, এই শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্যই জাতিতে জাতিতে আজ হিংসা-দ্বেষের এত আতিশয্য দেখা দিয়াছে। এমনটি ঘটিতে পারিত না, যদি তাহারা স্বকীয় দেশে থাকিয়া অন্ন-সমস্যার সমাধান করিবার শিক্ষা লাভ করিত। এ কথা বুঝিবার জন্য যে-অবস্থা দরকার, ভাগ্যচক্রে সুভাষচন্দ্র সেই অবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহার চারি পার্শ্বে এমন পরিজন লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে নিজের পেটের ভাতের জন্য তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হয় নাই, সুতরাং আজীবনই তিনি নকল-স্বাধীনতার বুলি আবৃত্তি করিয়া যাই-তেছেন। কিন্তু আজ হউক কাল হউক, যতদিন না দেশ-বাসী বুঝিতে পারিবে যে, অন্ন-সমস্যাই দেশের প্রকৃত সমস্যা এবং তাহার সমাধান-পন্থায় মনঃ সংযোগ না করিলে আর কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না, ততদিন দেশের কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, কংগ্রেসকে ভারতবাসীর অন্ন-সমস্যার সমাধান-কল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান করিয়া গড়িয়া তুলিবার দরকার। কংগ্রেসের কার্য্য-পন্থা যদি ইহাই বলিয়া গৃহীত হয়, তবে অচিরাৎ দেশবাসীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্য কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে এবং যে সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যের পথে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা আসিবে, সে-পথে কংগ্রেস পা বাড়াইতে পারিবে। নূতন দলের সৃষ্টি করিয়া সুভাষচন্দ্র ইহা করিতে পারিবেন না, তাহাতে আরও অনৈক্য বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহাকে কংগ্রেসের কার্য্য-পন্থা সংস্কারে মনোযোগী হইতে হইবে। কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে আমাদের কথা বুঝিতে সুভাষচন্দ্রের এত সময় লাগিত না।

গান্ধীজীর নৈরাশ্য

অ্যাবোটাবাদের এক জনসভায় গত ২৩শে জুলাই তারিখে মিঃ গান্ধী বক্তৃতায় বলেন : হিন্দু-মুসলমানের একতা ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা হইতে পারে না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, আজীবন আন্তরিক চেষ্টা করিয়াও এই ঐক্যস্থাপনে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

*

"হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপিত হউক"—অবিরত সাধু ভাষায় এই বক্তৃতা দিলেই যদি উহার জন্য আজীবন চেষ্টা

করা হইয়াছে বলিয়া মিঃ গান্ধী মনে করিতে চাহেন, তাহা তিনি করুন, কিন্তু উহাকে ঐ কার্য্যের জন্য 'আন্তরিক চেষ্টা' আমরা বলিতে পারিব না। কংগ্রেস যে-নীতিতে কার্য্য করিতেছে, তাহাই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক। ভারতের জন্য কল্পিত একটি বিশেষ ধরণের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু কিংবা মুসলমানের তেমন তাগিদ্ নাই, যত তাগিদ্ তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে যাহা স্বাধীনতা, তাহার জন্য। এই কল্পিত "স্বাধীনতা অর্জ্জন" কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি হওয়ায় শাসকজাতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে, অথবা পরোক্ষভাবে হউক, কংগ্রেসের ধ্বংস কামনা করিতে তাঁহারা স্বভাবতঃ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। তাহার ফলও ফলিয়াছে—কেবল হিন্দু-মুসলমানের অমিলন নহে, কংগ্রেসেও ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে। সংখ্যায় না হউক, সামর্থ্যে শাসকজাতি ভারতে আজ গুরু। সেই গুরুত্বকে অস্বীকার করিবার কোন তাৎপর্য্যই থাকিতে পারে না। ইহার প্রয়োজনও নাই। প্রকৃতির নিয়মে ভারতীয় কংগ্রেসের সূচনা হইয়াছিল এবং এই কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ভারতবাসীর বাঁচিবার পন্থা আবিষ্কারার্থ বৃটিশজাতি অগ্রসর হইয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এই ইতিহাস ভুলিয়া যাহারা পরে বৃটিশ-জাতিকে জব্দ করিবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে উভয় জাতির মিলন-মণ্ডপের পরিবর্ত্তে কলহের আস্তানায় রূপান্তরিত করিয়াছে, বিকৃত মনোভাব হইতে তাহাদিগকে দেশবাসীর যে অংশ প্রাধান্য দান করিয়াছে, সে-অংশ দেশবাসীর অত্যন্ত নগণ্য অংশ। বাস্তব দুঃখ-দুর্দ্দশার দিক্ দিয়া না দেখিয়া স্বাধীনতার অভাবস্বরূপ একটি কাল্পনিক দুঃখ সৃষ্টি করিয়া তাঁহারাই নিজেদের গলার জোর এবং লেখনীর জোরের প্রতিযোগিতায় আসরে নামিয়াছেন। তাহারই ফলে দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। সেই বর্দ্ধমান দুঃখ-দুর্দ্দশার সমাধান-পন্থার উদ্যমের মধ্যেই কংগ্রেসের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং সেই মুক্তি-সাধনাতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সূত্র বাঁধা রহিয়াছে। মিঃ গান্ধীর ইহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই, তাই আজীবন চেষ্টা করিয়াও এই মিলন-সূত্রের তিনি সন্ধানলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জন্য আমাদের দুঃখ নাই, দুঃখ এই যে কংগ্রেসের তিনি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। মিঃ গান্ধীকে কংগ্রেসের কর্ণধারত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়া এই মিলন-সূত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলেই কংগ্রেস বাঁচিতে পারে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি।

মিঃ গান্ধীর মনোযোগ

ঐ একই বক্তৃতায় মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন যে, সীমান্ত প্রদেশের ক্রম-বর্দ্ধমান দারিদ্র্যের প্রতি কয়েকজন কর্ম্মী তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে ইহা দূর করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতে অনুরোধ করেন।

*

সাবাস! এই ক্রম-বর্দ্ধমান দারিদ্র্যের কথা তবে গান্ধিজীর জানা ছিল না? ইহার সমাধান-পন্থার জন্য তিনি যে উপায় বাৎলাইয়াছেন, তাহা অভিনব হইলেও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহার সকল কার্য্যের মূল নীতিই হইতেছে সেই কার্য্যকল্পে কোন বাস্তব চেষ্টা না করিয়া তৎসম্বন্ধে কেবল শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন। কেবল শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন দ্বারা যদি কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারিত, তবে তাঁহার ন্যায় পুরোহিতেই চলিত, কিন্তু সকল কার্য্যই একটি বিশেষ রীতি-নীতির অধীন। সেই রীতি-নীতির অধীন না হইলে কার্য্য বাস্তবভাবে সাধিত হইতে পারে না। দারিদ্র্য একটি বাস্তব সমস্যা। তাহার সমাধান-পন্থা বাস্তব রীতি নীতির অধীন। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সেই বাস্তব রীতিনীতির প্রকাশ। দেশবাসীর দারিদ্র্য মিটাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথম কৃষিজাত দ্রব্যের প্রয়োজন—চরখা, হরিজন কিংবা মাদকতা বর্জ্জন দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইবে না। উপবাস করিয়া ভাগবৎ বাণী প্রচারের প্রবঞ্চনা দ্বারা উহার উৎপাদন সাধিত হইলে, মিঃ গান্ধী উহা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। কাটা-ছাঁটা নিয়ম দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সাধিত হয়। সে নিয়ম কি, তাহা মিঃ গান্ধী আজিও জানিতে পারেন নাই, কোন দিন জানিতে পারিবেন বলিয়াও আমরা মনে করি না। তথাপি তিনি দেশ-বাসীর সমস্যা সমাধানের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত! এই স্বতঃপ্রবৃত্ত দুশ্চিন্তা হইতে তিনি মুক্তি গ্রহণ করিলে দেশবাসীর কোন ক্ষতি নাই, পক্ষান্তরে ইহার মধ্যে তাহাদের প্রচুর লাভ বর্ত্তমান।

মিঃ গান্ধীর জবাব

২২শে জুলাই তারিখের হরিজন পত্রিকায় মিঃ গান্ধী জনৈক পত্র-লেখকের এক প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। পত্র-লেখকের প্রশ্ন ছিল: "প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সূচিত হইবার পর প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না?" মিঃ গান্ধী জবাবে লিখিতেছেন: যদি দেশের এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে কংগ্রেসের কার্য্য বিফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিবার সকল প্রকার চেষ্টার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

*

আমরা আশা করি, পত্রলেখক তাঁহার এই জবাব পড়িয়া নিরতিশয় খুশী হইবেন। প্রশ্নের উত্তর তাঁহার মিলিয়াছে তো? প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাবধি প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার না করিলেও মিঃ গান্ধী তাঁহার জবাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পরোক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে যে, যে প্রাদেশিকতা ইহার ফলে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, কোন প্রাদেশিক ভাব প্রকাশ পাইলে তাহার বিরোধিতা করিতে হইবে। আমরা জানি, কোন্ কার্য্যের কি পরিণাম, তাহা মিঃ গান্ধী তাঁহার বহু "সত্যানুসন্ধান" সত্ত্বেও আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কংগ্রেস হইতে বর্ত্তমান তন্ত্রে যখন মন্ত্রিত্বগ্রহণ মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম, ইহার ফলে দেশের মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি পাইবে। সেই অনৈক্য যখন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন তাহা না বৃদ্ধি পাইলেই ভাল, এ কথা বলার কোন অর্থ হয় কি? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, ইহাই নিয়ম। হাত পুড়িবার পর যদি বলা হয়, ইহা না পুড়িলেই ভাল, তবে সে-কথার কোন অর্থ হয় না।

মিঃ নেহেরুর যুক্তি

গত ২১শে জুলাই তারিখে মিঃ নেহেরু কলম্বোয় এক বক্তৃতায় ফরোয়ার্ড ব্লকের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলেন, "কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী দলের স্থাপনাবধি তাহারা বুঝিতে দিয়াছে যে, তাহারা কংগ্রেসে প্রাধান্য চাহে। ইহা নির্ব্বোধোচিত হইয়াছে। ইহার ফলে যাহারা সমাজতন্ত্রী নহে, তাহারা সাবধান হইয়া গিয়াছে।"

*

মিঃ নেহেরু যে-যুক্তি দিয়াছেন, তাহার সারার্থ দাঁড়ায় এই যে, কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, যাহাতে বিরোধ ঘটিবার অবকাশ না থাকে, সেই জন্য প্রতিপক্ষকে তৎসম্বন্ধে কোন কিছু বুঝিতে না দেওয়াই ভাল। এই হিসাবে যদি বলা যায় যে, কংগ্রেস হইতে ভারতের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জনই কংগ্রেসের কাম্য, এই ঘোষণা করা নির্ব্বোধোচিত হইয়াছে, তাহা হইলে মিঃ নেহেরুর তৎপক্ষে কি বলিবার আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সমস্যা

গত ২৯শে জুলাই ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শরীর, মন ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন এবং উচ্চশিক্ষা লাভ হইলেও, মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।" অতঃপর তিনি উপাধিলাভার্থ সমবেত ছাত্রদের আহ্বান করিয়া বলেন, "আমি নিশ্চিত জানি যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নিগ্ধ ও নিরাপদ ক্রোড় হইতে বাহিরে গিয়া তোমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে।"

*

অর্থাৎ? যে শিক্ষা ছাত্রেরা তাঁহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছে, সেই শিক্ষায় তাহারা এমন কিছুই লাভ করে নাই, যাহাতে তাহারা বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইতে পারে, ইহাই কি তিনি স্বীকার করিতেছেন না? কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় কুত্রাপি তিনি আলোক পাত করেন নাই। আমাদের মতে, প্রচলিত শিক্ষার এই দোষত্রুটি কর্ম্মকর্ত্তারা রাখিয়া-ঢাকিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন বলিয়াই, দেশের ছেলেরা অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া এবং জলের মত অর্থব্যয় করিয়াও যে-শিক্ষা লাভ করিতেছে, সেই শিক্ষা তাহাদিগকে দুই বেলার দুই মুষ্টি অন্ন মুখে তুলিয়া দিতে সমর্থ হইতেছে না। সকল বিভাগে এই শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্য্য-পরিচালনার ফলেই দেশের সমস্যা চারিদিকে আজ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, বর্ত্তমানের বিভাগীয় নেতাদের লইয়া। এই নেতারাই এক একটি প্রকৃত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাই যখন সমস্যা, তখন দেশের কোন্ সমস্যা তাঁহারা সমাধান করিবেন?

মৃত্যু সাংবৎসরিক

সংপ্রতি শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যু সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সহরের বহু বিশিষ্ট লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য ব্যারণ ক্লাইভের প্রিয় দেওয়ান মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর শোভাবাজারে যে রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই রাজবংশে রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি মহারাজা স্তর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কে, সি, আই, ই'র পুত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র। মহারাজ নবকৃষ্ণ রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কার লোক ছিলেন। বিদ্যার্জ্জনের স্পৃহা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী ছিল।

রাজা বাহাদুর বাল্যকাল হইতেই সাতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহাকে বাল্যকালে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হয়, সেখান হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে বি-এ, এম-এ, এবং শেষে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য সরকারী চাকরীও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া হুগলীর সেসন জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যশের সহিত কাজ করায় তাঁহাকে statutory civilian বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছিল। হুগলীতে অবস্থান কালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। সেই সময় তাঁহার পিতা মহারাজা স্তর নরেন্দ্রকৃষ্ণের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। তিন বৎসর পরে মহামান্য সম্রাট্ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজা বাহাদুর বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশনের সহকারী সভাপতি রূপে বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এবং রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। বহু দরিদ্র তাঁহার দয়ায় উপকৃত হইয়াছিলেন, বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহচর্য্য, সহানুভূতি এবং আর্থিক আনুকূল্যে পরিপুষ্ট হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ্চ রাজা বাহাদুর পরলোক গমন করেন।

কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ, ৺কুমার শচীন্দ্রকৃষ্ণ এবং কুমার রবীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার তিন পুত্র। কুমার কপিলেন্দ্র, কুমার সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ও কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার পৌত্র।

যাত্রা [শিল্পী—শ্রীহিমাদ্রি সেন

সহরের আধুনিকতম আমোদ

গ্রে হাউণ্ড রেসিং

হস্যোজ্জ্বল আনন্দমুখর

গরীব ও ধনীর সমান উপভোগ্য।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিবেন

তাঁহারা অধিক আনন্দ পাইবেন।

—রেস আরম্ভ—

প্রতি রবিবার—	সন্ধ্যা—৬টা
প্রতি বুধবার—	সন্ধ্যা—৭টা
প্রতি বৃহস্পতিবার—	সন্ধ্যা—৭টা
প্রতি শুক্রবার—	সন্ধ্যা—৭টা

দি ন্যাশনাল স্পোর্টস্ ক্লাব লিঃ

ষ্টেডিয়াম—বেহালা

ট্রাম ও বাস পাওয়া যায়।

A NOTE OF APPRECIATION

This is what the beautiful Bowrani of Santosh writes of Oatine products

I feel that Oatine Cream and Snow have become indispensable as part and parcel of my daily toilet.

Benila Roy Chowdhury
Bowrani of Santosh

OATINE CREAM the Vitalising skin food and Oatine Snow the all-day-lasting protective vanishing Cream are worthy of the most exclusive commendation.

We feel the prouder of this appreciation by one of the leading ladies in Bengal Society as it is entirely voluntary and unsolicited.

OATINE CREAM

For regular nightly massage

OATINE SNOW

For all-day lasting protection

THESE TWO ARE ALL YOU NEED FOR BEAUTY.

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

আশ্বিন—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথের "কন্‌গ্রেস"

(গত সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

রবীন্দ্রনাথের "কন্‌গ্রেস" নামক প্রবন্ধের তৃতীয়াংশের উল্লেখযোগ্য কথা নিম্নলিখিত তিনটী :—

(১) "দেখচি চিন্তা করে মানব-জগতের দুই প্রবল শক্তি নিয়ে পলিটিক্‌সের ব্যবহার। একটার প্রয়োগ বাহিরের দিকে, সেটা যন্ত্রশক্তি, আর একটার কাজ মানুষের মন নিয়ে, সেটাকে বলতে পারি মন্ত্রশক্তি।"

(২) "আজ য়ুরোপের সঙ্কটের দিনে এই দুই শক্তির হিসাব গণনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে পদচারণা করছে।"

(৩) "বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই শক্তির কোনটাই সহজসাধ্য নয়, অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগশিক্ষা-চর্চ্চা।"

আগেই দেখান হইয়াছে যে, রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের তৃতীয়াংশের প্রধান উদ্দেশ্য—ইয়োরোপে পলিটিক্‌স্ কি আকারে ব্যবহৃত হইতেছে এবং উহার দুরূহতা কোথায় তাহা দেখান।

এই তৃতীয়াংশের প্রথম কথাটীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তি নামক মানুষের দুইটী প্রবল শক্তি আছে এবং ঐ দুইটী শক্তি লইয়াই মানুষের পলিটিক্‌সের ব্যবহার। মনুষ্যের যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তি যে কি বস্তু, তাহা রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার ভাবে বুঝান নাই। কাযেই আমরা ঐ দুইটী শব্দ বুঝিবার জন্য আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির আশ্রয় লইব। বিজ্ঞান, শিল্প ও যুদ্ধ-বিগ্রহে যত কিছু যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকেই আমরা "যন্ত্র-শক্তি" ধরিয়া লইব। আর, শিক্ষা বক্তৃতা ও কূটনীতি প্রয়োগে যে সমস্ত বাক্য ব্যবহৃত হয় তাহাকে আমরা "মন্ত্র-শক্তি" বলিয়া গ্রহণ করিব।

আমাদিগের প্রথম প্রশ্ন—যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তি লইয়াই মানব-জগতে পলিটিক্‌সের ব্যবহার চিরদিন হয় কি না?

"যন্ত্র-শক্তি" কতদিন মানব-জগতে দেখা দিয়াছে তাহার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মানব-জগতের কোন দেশেই আজকাল যাহাকে যন্ত্র-শক্তি

বলা হয় তাহার কোনরূপ ব্যবহার আড়াই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যখন দেখা যাইতেছে যে, "যন্ত্র-শক্তির" আবিষ্কারই আড়াই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে, তখন পলিটিক্‌সের ব্যবহার যে চিরকালই "যন্ত্র-শক্তি" লইয়া হইতে পারে না তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে।

এইরূপ আবার আধুনিক "মন্ত্র-শক্তি" কতদিন মানব-জগতে দেখা দিয়াছে তাহার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, মানব-জগতের কোন দেশেই তথাকথিত "মন্ত্র-শক্তির" কোনরূপ ব্যবহারও আড়াই শত বৎসরের অধিক নহে। কাযেই "মন্ত্র-শক্তি" লইয়াও যে মানব-জগতে পলিটিক্‌সের ব্যবহার চিরদিন হয় নাই তাহা ধরিয়া লইতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, "যন্ত্র-শক্তি" ও "মন্ত্র-শক্তি" লইয়া মানব-জগতে পলিটিক্‌সের ব্যবহার চিরদিন হইতে পারে না এবং হয় না।

যদি বলা হয় যে, "যন্ত্র-শক্তি" ও "মন্ত্র-শক্তি" লইয়া মানব-জগতে পলিটিক্‌সের ব্যবহার চিরদিন হইতে পারে না বটে, কিন্তু আধুনিক কালে ঐ দুইটী শক্তি লইয়াই পলিটিক্‌সের ব্যবহার হইতেছে, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহাও সত্য নহে। ইহার কারণ, পলিটিক্‌সের যাহা প্রকৃত ব্যবহার তাহা কখনও আধুনিক "যন্ত্র-শক্তি" ও "মন্ত্র-শক্তি"র দ্বারা সু-সাধিত হইতে পারে না। আমাদিগের এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে Politics এই শব্দটার আধুনিক অর্থ কি এবং উহার প্রকৃত ব্যবহারই বা কি, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য আমরা The State and the Individual নামক আধুনিক গ্রন্থের প্রণেতা Dr. W.S. Machechnie, M.A. Ph. D. মহাশয়ের ঐ বিষয়ক কথা উদ্ধৃত করিব তিনি বলিয়াছেন, "Politics is the art, science and philosophy of Government. Rightly considered, political theory is co-extensive with all those branches of knowledge which treat of the eternal principles on which depend the happiness, prosperity and moral elevation of mankind grouped into kingdoms, states or nations."

Dr. Machechnie র কথাগুলি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে স্থায়ীভাবে মানব-জাতির সুখ-সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সংঘটিত হইতে পারে, তাহা লইয়াই মূলতঃ পলিটিক্‌সের ব্যবহার। অন্যথা পলিটিক্‌সের অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে। শুধু Dr. Machechnie যে এই কথা বলিয়াছেন তাহা নহে, পাশ্চাত্ত্য Political Economy-র প্রণেতাগণের মধ্যে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য তাঁহাদিগের বিভিন্ন কথাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহাঁদিগের কেহই Politics-এর প্রকৃত ব্যবহার যে কোন্ পন্থায় হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু Politics-এর মূল ব্যবহার যে মানব-জাতির সুখ-সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি লইয়া, তদ্বিষয়ে সকলেই প্রায়শঃ এক-মত।

মানব-জাতির সুখ-সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতির জন্যই যে পলিটিক্‌সের ব্যবহার, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে আধুনিক যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তিতে যে পলিটিক্‌সের প্রকৃত ব্যবহার হইতে পারে তাহা কোন ক্রমেই বলা চলে না। কারণ আধুনিক যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তিতে মানব-জাতির সুখ, সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতির উত্থান হওয়া তো দূরের কথা, পতনই ঘটিয়া থাকে। কাযেই, আধুনিক যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তিতে পলিটিক্‌সের অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে, ইহাই ধরিয়া লইতে হয়। তাহাই যদি না হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপে আজ সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইতে পারিত না।

এই অংশের তৃতীয় কথাটির দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, রবীন্দ্র বাবুর মতে উপরোক্ত "যন্ত্র-শক্তি" ও "মন্ত্র-শক্তি" বড়ই আকাঙ্ক্ষণীয়—"অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগশিক্ষা-চর্চ্চা" বলিয়া যেন বড়ই আপশোষের বিষয়। অথচ রবীন্দ্র বাবুই আবার তাঁহার পঞ্চমাংশের দ্বাদশ কথায় বলিতেছেন যে, "হিংস্র যুদ্ধ নিরন্ত ; সে একই কেন্দ্রের চারিদিকে ধ্বংস-সাধনের ঘুরপাক খাওয়ায় ; তার সমাপ্তি সর্ব্বনাশে।"

আসল কথা, আধুনিক "যন্ত্র-শক্তি" ও "মন্ত্র-শক্তি"র ব্যবহারে পলিটিক্‌সের কু-ব্যবহার হইয়া থাকে। পলি-

টিক্সের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করা। তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করা, মানুষ যাহাতে দ্বন্দ্ব-কলহ এবং রাগ-দ্বেষ সংযত করিতে প্রবৃত্ত হয় তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করা, এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যাহাতে স্বভাবানুগ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া শৃঙ্খলিত ভাবে যথাক্রমে (১) প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারে; (২) আত্মোপলব্ধির সাধনায়, (৩) কৃষি, কুটীর-শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে, ও (৪) শ্রম-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। এই কয়টী কার্য্য না করিয়া আর যাহাই করিবে তাহাতে মানুষের সর্ব্বনাশ ছাড়া আর কিছুই সংঘটিত হইবে না।

রবি বাবুর চতুর্থাংশের উল্লেখযোগ্য কথাগুলি চিন্তা করিয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার মতে যন্ত্র-শক্তির উন্নতি বিধান করিতে পারিলে দেশের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় উহার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে এবং ঐ কারণেই যন্ত্র-শক্তির উন্নতি বিধান করিবার কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

চতুর্থাংশের অন্যতম বক্তব্য এই যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার কার্য্য অন্য কোন শক্তিসম্পন্ন জাতির সহায়তায় সাধিত হইতে পারে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর মতে তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

আমাদিগের মতে আধুনিক যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তির উৎকর্ষের দ্বারা কখনও জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব নহে এবং উহার উৎকর্ষ সাধন করা সাধ্যায়ত্ত হইলেও উহাতে কখনও প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নহে। আধুনিক যন্ত্র-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তির দ্বারা যদি জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব হইত তাহা হইলে ইয়োরোপে সঙ্কটকালের উদ্ভব হইত না।

চতুর্থাংশের অন্যতম বক্তব্য সম্বন্ধে আমাদিগের কথা এই যে, অন্য কাহারও পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করা কখনও সম্ভব হয় না। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার একমাত্র উপায় স্বাধীনতা-কামীর স্বাধীনতার উপযোগিতা অর্জ্জন করা এবং তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে দ্বন্দ্ব-কলহের ও রাগ-দ্বেষের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে সংযত করা। ভারতবাসীর ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে। ইংরাজ যতই ভুল করুক না কেন, ভারতবাসী যতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজের ভুলগুলিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া ইংরাজকে সংশোধিত করিয়া লইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা ভারতবাসীর পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইবে কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে।

রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের পঞ্চমাংশে যে উল্লিখিতটী উল্লেখযোগ্য কথা আছে তাহা চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, উহার মুখ্য বক্তব্য দুইটী, যথা :—

(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে বিনা যন্ত্র-শক্তিতে কি করিয়া অহিংস লড়াই করিতে হয় তাহা জানিতে হইবে ও শিখিতে হইবে।

(২) বিনা যন্ত্র-শক্তিতে কি করিয়া অহিংস লড়াই করিতে হয় তাহা জানিতে হইলে ও শিখিতে হইলে "বোলপুরে"র মত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার সাধন করিতে হইবে।

আমাদিগের মতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে রবীন্দ্র বাবু ও গান্ধীজীর মত নেতৃবর্গকে সর্ব্বপ্রথমে লড়াই-এর ভাব সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জিত করিতে হইবে এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ব্যক্তি কোন্ কোন্ অভাব পূরণের জন্য লড়াই-এ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। ঐ নির্ণয়ের কার্য্যে উদ্যোগী হইলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ব্যক্তি যে লড়াই-এর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ দুইটী। একটী বাস্তব ও আর একটী কাল্পনিক। বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন জাতির লড়াই-এ প্রবৃত্ত হইবার বাস্তব কারণ সর্ব্বব্যাপী খাদ্যাভাব ও কাঁচা-মালের অভাব। আর কাল্পনিক কারণ মানাপমান ও জয়-পরাজয়ের ভাব। বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন জাতির লড়াই-এর বাস্তব কারণ দূর করিতে হইলে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের খাদ্যাভাব ও

কাঁচা-মালের অভাব যাহাতে বিদূরিত হয়, তাহা করিতে হইবে এবং উহা ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে পারিলে সম্ভবযোগ্য হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন জাতির লড়াই-এর কাল্পনিক কারণ দূর করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজে যাহাতে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত অভ্যাস প্রসার লাভ করিতে পারে এবং মানুষের রাগ-দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি যাহাতে সংযত হয় তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এই দুইটি কার্য্য সম্পাদিত করিতে না পারিলে, শুধু ভারতবর্ষে কেন, জগতের কোন দেশেই প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা সাধন করা সম্ভব হইবে না।

আমরা মনে করি যে, সভ্য জাতির মধ্যে শুধু ভারতবর্ষই পরাধীন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বস্তুতঃ পক্ষে শুধু ভারতবর্ষ কেন, জগতের প্রত্যেক দেশই অধুনা পরাধীন; কারণ প্রত্যেক দেশের ব্যক্তিবৃন্দকে জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রায়শঃ চাকুরীর মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব দেশের অর্থনৈতিক অভাব পূরণের জন্য অন্যান্য দেশের বাজারের প্রতি নির্ভরশীল থাকিতে বাধ্য হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত নেতৃবর্গ উপরোক্ত দুইটী অভাব পূরণের পন্থা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বতোভাবে লড়াই-এর প্রবৃত্তিহীন না হইতে পারিবেন, অথবা যাঁহারা ঐ দুইটী অভাব পূরণের পন্থা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বতোভাবে লড়াই-এর প্রবৃত্তিহীন হইতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে যতদিন পর্য্যন্ত দেশের নেতৃত্ব অর্পিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করা কখনও সম্ভব হইবে না—ইহা আমাদিগের অভিমত।

বোলপুরের মত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কখনও রাগ-দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির সংযম সাধন করা সম্ভব হইবে না। রাগ-দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সংযত করিতে হইলে বোলপুরের মত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মত রচনাসমূহকে সর্ব্বতোভাবে দেশের কলেবর হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এই মুছিয়া ফেলিবার কার্য্য দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না। সূর্য্যের উদয় হইলে যেরূপ তারকার রশ্মি আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত অভ্যাসসমূহের যথাযথ প্রচলন আরম্ভ হইলে আপনা হইতেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বোলপুরের মত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের রাগ-দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহ-বর্দ্ধক শিক্ষা মুছিয়া যাইবে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত অভ্যাসসমূহের যথাযথ প্রচলন আরম্ভ হইলেই দেশের "কু-শিক্ষা" বিদূরিত করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের অন্নাভাব তিরোহিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত অভ্যাসসমূহ প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবপর নহে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের এই অংশের নিম্নলিখিত দুইটী কথা বিশেষ ভাবে সমালোচনার যোগ্য:—

(১৮) "আমার নিজের এতদিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সান্ত্বনা পাই। গণ-দেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে।"

(১৯) "স্বদেশ-সেবায় এই পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া, যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে, নির্ম্মলকে আহ্বান করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায়, আত্মকল্যাণ সাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে, সম্মিলিত হতে পারে।"

উপরোক্ত দুইটি কথার প্রথম কথাটি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে হয় যে, রবীন্দ্র বাবু গণ-দেবতার পূজায় অভ্যস্ত হইয়াছেন। আমাদিগের মতে গণ-দেবতার পূজায় অভ্যস্ত হওয়া তো দূরের কথা, "গণ দেবতা" কাহাকে বলে, এবং "গণ দেবতার পূজা" ই বা কি বস্তু, তাহা পর্য্যন্ত রবীন্দ্র বাবু এই বৃদ্ধ বয়সেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র বাবু হয় ত জানেন না, কিন্তু শাস্ত্রের কথা এই যে, যাঁহারা দেব, দেবী, দেবতা ও তাঁহাদিগের পূজা সম্বন্ধে মনুষ্য-সমাজকে কোনরূপে বিপথগামী করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিপথ-চালনার মাত্রানুসারে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যথাক্রমে রোগ, শোক, দুঃখ ও হতশ্রী প্রাপ্ত হওয়া এবং নির্ব্বংশ হওয়া। আধুনিক তথাকথিত হিন্দু ব্রাহ্মণগণ দেব,

দেবী, দেবতা ও তাঁহাদিগের পূজা সম্বন্ধে মনুষ্য-সমাজকে কয়েক সহস্র বৎসর হইতে বিপথে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাঁহারা প্রায়শঃ রোগ, শোক, দুঃখ ও হতশ্রী প্রাপ্ত এবং নির্ব্বংশ হইয়া আসিতেছেন।

রবীন্দ্র বাবুর উপরোক্ত দুইটী কথা পড়িলে মনে হয় যে, তাঁহার মতে "গণদেবতার পূজা" বলিতে বুঝায় "জনসাধারণের সেবা"। যে সমস্ত তন্ত্রে দেব, দেবী, দেবতা ও তাঁহাদিগের পূজা সম্বন্ধে বুঝান হইয়াছে, সেই সমস্ত তন্ত্রের একখানিও যথাযথভাবে বিন্দুমাত্র পরিমাণেও বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রবাবুর উপরোক্ত ধারণা সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্তিময়। "মা" শব্দের দ্বারা যেরূপ "মা" ছাড়া "বাবা" "খুড়া" প্রভৃতি অপর কাহাকেও বুঝায় না, অথবা এক কথায়, "মা" শব্দের যেরূপ শব্দান্তরনিহিত একটী স্বাভাবিক অর্থ আছে, সেইরূপ "গণদেবতা" ও "গণদেবতার পূজা এই দুইটী শব্দেরও শব্দান্তরনিহিত একটী স্বাভাবিক অর্থ আছে। "মা" শব্দের যেরূপ যথেচ্ছ অর্থ ধরা যায় না, সেইরূপ "গণদেবতা" ও "গণদেবতার পূজা" এই দুইটী শব্দেরও যথেচ্ছ অর্থ ধরা যায় না। শব্দের স্বাভাবিক অর্থ কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বেদাঙ্গ ও বেদের সাহায্যে সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে "পূজা" শব্দে "আমরা যাহা কিছু বুঝি ও শ্রবণ করি তাহা তাদৃশ ভাবে বুঝি ও শ্রবণ করি কেন ইহা প্রত্যক্ষ করিবার কার্য্য"কে বুঝিতে হয়। আর "গণদেবতা" বলিতে বুঝায় "মস্তিষ্কমধ্যস্থ রস-বিকাশক এমন কিছু বস্তু যাহার কার্য্যের ফলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এবং চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।" "গণদেবতার পূজা" বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত অনুভূতিমূলক কার্য্য, যে-সমস্ত কার্য্যের দ্বারা মানবাবয়বে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এবং চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় কেন, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। গণদেবতার পূজা যে সকল পূজার আরম্ভে তাহা খুবই সত্য, কিন্তু "গণদেবতা" ও "গণদেবতার পূজা" বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা যথাযথ ভাবে না বুঝিতে পারিলে গণদেবতার পূজা অথবা অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা সার্থক হয় না।

দেব ও দেবীর পূজা কি বস্তু তাহা জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে প্রকৃতির বিকাশ ও বৃদ্ধি যে সমস্ত প্রকরণের সাহায্যে হইতেছে, সেই সমস্ত প্রকরণের এক একটির নাম এক একটী "দেব" এবং ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক প্রকরণ হইতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত শক্তির এক একটীর নাম এক একটী "দেবী"। দেব ও দেবীর পূজা বলিতে বুঝায় প্রাকৃতিক প্রত্যেক প্রকরণ ও প্রত্যেক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা অথবা এক কথায় প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিবার নাম "দেব-দেবীর পূজা।" চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হয় কি করিয়া এবং চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া তাহা যথাযথ ভাবে স্বকীয় অবয়বমধ্যে অনুভব করিতে না পারিলে প্রকৃতির কোন প্রকরণ ও উহার কোন শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য প্রত্যেক দেব-দেবীর পূজার আরম্ভে গণদেবতার পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "গণদেবতার পূজা"র অর্থ কি তাহা যথাযথ ভাবে না বুঝিয়া "গণদেবতার পূজা" বলিতে "জনসাধারণের সেবা" বুঝিতে হয়, ইহা প্রচার করিলে "প্রকৃতি"-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় এবং পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করা হয়।

রবীন্দ্র বাবুর উপরোক্ত কথার দ্বিতীয় কথাটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্র বাবুর মতে মানুষ যাহাতে সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয় এবং আত্ম-সম্মানে দীক্ষিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে মানুষ যাহাতে সুস্থ, সবল ও বহির্ম্মুখীনতা দমন করিতে শিক্ষিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু মানুষের যে শিক্ষায় বহির্ম্মুখীনতা উত্তেজিত হয়, সেই শিক্ষা যেরূপ বিষবৎ পরিত্যাজ্য, সেইরূপ আবার যে সমস্ত অনুষ্ঠানে মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়, অথবা আত্ম সম্মানে দীক্ষিত হয়; সেই সমস্ত অনুষ্ঠানও সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। ভারতীয় ঋষিদিগের কথা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আমাদিগের অভিমত তাঁহাদিগের উপদেশেরই অনুরূপ। আনন্দে মাতোয়ারা হইবার এবং আত্ম-সম্মানে দীক্ষিত হইবার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দুঃখ। ইহারই জন্য ভারতীয় ঋষিগণ একদিকে যেরূপ দ্বেষ-দ্যোতক বিষয়গুলি পরিত্যাগ

করিবার উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ আবার রাগ-দ্যোতক বিষয়গুলিও পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহাদিগের উপদেশ—রাগ-দ্বেষ সংযত করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে প্রণোদিত হওয়া।

"ব্রহ্মকে" "সচ্চিদানন্দময়" বলা হইয়াছে বলিয়া আধুনিক আচার্য্যগণ মনে করেন যে, আনন্দের উপাসনা করা ব্রহ্মোপসনারই অনুরূপ এবং উহা ঋষির পরামর্শ-সঙ্গত। ঋষির শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক আচার্য্যগণের এই ধারণা ভ্রান্তিময়। "ব্রহ্মকে" "সচ্চিদানন্দময়" বলিলে বুঝায় যে "ব্রহ্ম" সত্তার স্রষ্টা এবং সত্তা চিত্তের (অর্থাৎ রাজসিকতার) স্রষ্টা এবং চিত্ত আনন্দের (অর্থাৎ তামসিকতার) স্রষ্টা। ব্যাকরণোক্ত সমাসের নিয়মগুলি যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত ব্যাখ্যা যে সর্ব্বতোভাবে সঠিক, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে কোন আনন্দের উপাসনা না করিয়া অথবা কোন আনন্দে মাতোয়ারা না হইয়া মানুষের আনন্দের উৎপত্তি হয় কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অনুভব করা যাইবে যে, প্রত্যেক আনন্দের মূলে রহিয়াছে "চিত্তে"র কার্য্য। তখন আবার "চিত্তে"র কার্য্যে মাতোয়ারা না হইয়া চিত্তের বিভিন্ন কার্য্যপ্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয় কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। চিত্তের বিভিন্ন কার্য্যপ্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয় কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অনুভব করা যাইবে যে, চিত্তের প্রত্যেক কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে "সত্ত্বার কার্য্য।" "সত্ত্বার কার্য্য" উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলে তখন আবার সত্ত্বার কার্য্যে মাতোয়ারা না হইয়া সত্ত্বার কার্য্যের উৎপত্তি হয় কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। সত্ত্বা ও সত্ত্বার কার্য্যের উৎপত্তি হয় কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। উপরোক্ত "কেন"র সন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া কাহারও কার্য্যে অথবা অপর কাহারও উপসনায় মাতোয়ারা হইলে কখনও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় না—ইহাই ঋষিগণের উপদেশ।

উপরোক্ত দ্বিতীয় কথাটির অপরাংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে রবীন্দ্রবাবুর মতে সুন্দরকে ও নির্ম্মলকে আবাহন করিলে আত্ম রক্ষা করা, আত্ম-কল্যাণ সাধন করা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। আমাদিগের মতে সুন্দর ও নির্ম্মলকে আবাহন করিলে কখনও আত্ম রক্ষা করা, অথবা আত্ম-কল্যাণ সাধন করা, অথবা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আত্ম রক্ষা করিতে হইলে, অথবা আত্ম-কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, অথবা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হইলে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য্য কিরূপ ভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয় এবং সর্ব্ববিধ রাগ-দ্বেষের ভাব সংযত করিয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সর্ব্বদা প্রকৃতিসম্মত কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়।

রবীন্দ্র বাবুর রচনায় এতাদৃশ বিভ্রান্তিকর কথাগুলি বিদ্যমান থাকে বলিয়াই আমরা জনসাধারণকে রবীন্দ্র বাবুর রচনা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিয়া থাকি।

রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের ষষ্ঠাংশের অন্যতম কথা—"দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই, যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।"

পাঠকগণ প্রথমতঃ এই বাক্যটীর অর্থ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করুন। এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ বাক্যটীর কোন অর্থ হয় না এবং উহা কতকগুলি পদের সমষ্টি মাত্র। শব্দশাস্ত্রে বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "শক্তি" কখনও "ব্যক্ত" এবং কখনও "অব্যক্ত" থাকে বটে, কিন্তু উহা কখনও "অবরুদ্ধ" থাকিতে পারে না। যে "কার্য্য" দ্বারা "কর্ম্ম" হইতে যুগপৎ "গুণ" ও "দ্রব্যে"র বিকাশ সাধিত হয় তাহার নাম "শক্তি"। উহা সর্ব্বদাই বিকশিত। উহা সর্ব্বদা বিকশিত হইলেও কখন কখন উহাকে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। যখন "শক্তি"কে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, তখন উহাকে "অব্যক্ত" বলা হইয়া থাকে। উহা "অব্যক্ত" হইলেও কখনও "অবরুদ্ধ" নহে, কারণ উহা সর্ব্বদাই বিকশিত। "শক্তি"র পূজা ও "শক্তি"র কথা সাধারণতঃ দুরূহ এবং উহা সকলের

উপলব্ধিযোগ্য নহে। "শক্তি" ও "মুক্তি"র কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "শক্তি" স্বভাবতঃই "মুক্ত"। "শক্তি"র মুক্তিহীনতার কথা বলা চতুষ্কোণযুক্ত বৃত্তের (angular circle) কথা বলিবার অনুরূপ।

আমাদিগের মতে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় চাকুরী না করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারা, কোন ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য না লইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারা, কোন বহির্বিষয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বকীয় মনঃসংযমের দ্বারা শান্তি ও সন্তুষ্টি রক্ষা করিতে পারা। স্বাধীনতা দুই প্রকার, ব্যক্তিগত ও জাতিগত। উপরোক্ত সংজ্ঞাটী ব্যক্তিপক্ষে প্রযোজ্য। আর জাতিগত স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সেইরূপ অবস্থা, যাহাতে দেশস্থ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে। দেশস্থ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যবস্থা না হইলে দেশের শাসনকার্য্য দেশীয় লোকের দ্বারা সাধিত হইলেও দেশকে স্বাধীন বলিয়া মনে করা চলে না। আর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, দেশের শাসন-কার্য্য অপরদেশীয় লোকের দ্বারা সাধিত হইলেও দেশকে স্বাধীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—ইহা আমাদিগের অভিমত। এই অভিমত ঋষি-বাক্যের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ কিরূপ ভাবে সারাজীবন মনুষ্য-সমাজকে মোহগ্রস্ত হইবার সহায়তা করিয়া আসিতেছেন তাহা পাঠকগণ লক্ষ্য করুন।

বাঙ্গালায় হিন্দু-সংগঠন আন্দোলন

হিন্দু-সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য বাঙ্গালায় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গত ৯ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে নব-গঠিত বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার উদ্যোগে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ এস. কে. রায় চৌধুরী, মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জ্জী, মিঃ এন. কে. বসু, মিঃ এইচ. পি. ঘোষ, মিঃ এন. সি. চ্যাটার্জ্জী, মিঃ এস. সি. রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী বেদানন্দ এবং স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য সভায় বক্তৃতা করেন।

তাঁহাদের বক্তব্য হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা হিন্দু-সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত সংগঠন চাহেন, কিন্তু সংঘবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা কি পন্থা বা কি প্রণালী অনুসরণ করিবেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নাই। ইহা বলিবার স্বপক্ষে আমাদের যুক্তি এই যে, এখনও পর্য্যন্ত কথিত সংগঠনের কোন কার্য্যপন্থা প্রকাশিত হয় নাই।

আমাদের এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য তিনটি; (১) কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দুসম্প্রদায়কে এইরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে সংগঠন-চেষ্টার ফলাফল কি দাঁড়াইতে পারে, জনসাধারণকে তাহা বুঝান; (২) হিন্দু-সংগঠনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তাহা প্রদর্শন; (৩) এই সভার উদ্যোক্তারা (অর্থাৎ সভাপতি ও বক্তাগণ)—তাঁহাদের বক্তৃতা হইতে যেরূপ বুঝা যায় এবং তাঁহাদের যোগ্যতা-বিচারে—কি করিবার সামর্থ্য রাখেন, তাহা প্রদর্শন।

বঙ্গীয় হিন্দুসভা পর্য্যায়ের সংগঠনের ফলাফল কি দাঁড়াইতে পারে

আমরা বলিয়াছি যে, বঙ্গীয় হিন্দুসভার কার্য্যপন্থা কি, তাহা আমরা সঠিক ভাবে জানি না। ইহা না জানিলে জনসাধারণের উপর ইহার ফলাফল কি হইবে, তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নহে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু, বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসভার কার্য্যপন্থা কি হইবে, তাহা সঠিক ভাবে না জানা থাকিলেও, এই সভায় সভাপতি এবং বক্তারা যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহার সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যাইতে পারে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নের তিনটি মন্তব্য হইতে ঐ কার্য্যপন্থার কিয়দংশ অনুমিত হইতে পারে :—

(১) বাঁচিয়া থাকিতে হইলে হিন্দু-সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

(২) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন এবং কথিত ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানা-নির্দ্ধারণ, এই দুইটি মূল বিষয়কে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অবিরাম আন্দোলন চালাইতে হইবে।

(৩) হিন্দু সংস্কৃতির প্রসারার্থ এবং সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিকল্পে, বিশেষতঃ, মধ্যবিত্তগণের তীব্র বেকার-সমস্যা নিবারণার্থ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুদৃঢ় একটি কার্য্যপন্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতার এই কয়েকটি কথা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা সংগঠনের উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে নিম্নানুযায়ী পাঁচটি হওয়া সম্ভব :—

(১) বাঙ্গালার, তথা ভারতের হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা।

(২) হিন্দু-সংস্কৃতির প্রসার।

(৩) সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতিবিধান, বিশেষতঃ মধ্যবিত্তগণের তীব্র বেকার-সমস্যা নিবারণ।

(৪) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন সাধন।

(৫) কথিত ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার-পরিবর্ত্তন অথবা ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানার পুনর্নির্দ্ধারণ দ্বারা কি লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে, কিন্তু উপরের ১,২ ও ৩ দফায় যাহা কথিত হইয়াছে, সেই তিনটি উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধই থাকিতে পারে না।

এইবারে আমরা দেখিব যে, উপরের ৪ ও ৫ নম্বরের দফায় কথিত; যথা—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন সাধন এবং ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানার পুনর্নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলে, তৎসহিত ১,২ ও ৩ দফায় কথিত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সফল হওয়া সম্ভব কি না। আমাদের মতে, ইহার উত্তর, 'না'। আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন, কিংবা ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানার পুনর্নির্দ্ধারণার্থ আন্দোলন করা হয়, তবে হিন্দুদের ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই হউক, অথবা হিন্দু-সংস্কৃতির প্রসারই হউক, অথবা সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতিবিধানই হউক, ইহার কোনটির একটিরও বিন্দুমাত্র সাধন সম্ভব নহে।

আন্তরিক ভাবে কোনরূপ ঐক্যবদ্ধ হইতে হইলে জনসাধারণকে যথাসম্ভব দ্বন্দ্ব-কলহ, তথা রাগ-দ্বেষপ্রবৃত্তি সংযত করিবার শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে, এই তত্ত্বের উপর আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত গঠিত। এই তত্ত্বের প্রতিবাদ করিবেন, এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া ইহা সত্য যে, অপর কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার দ্বেষ-হিংসা পোষণ করিলে, কোন সংগঠনে কোন প্রকারেই আন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দ্বেষ-হিংসার প্রবৃত্তি পোষণ করিলেও কোন কোন সংগঠনে রাষ্ট্রীয় ভাবের ঐক্য, অর্থাৎ কয়েকটি স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে দল-গঠন সম্ভব বলিয়া দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কিংবা উহার বাহিরের কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার দ্বেষ অথবা অবজ্ঞার ভাব বর্ত্তমান থাকিলে, সমগ্র ভাবে সমাজের হিতসাধনার্থ যে ঐক্য প্রয়োজন, তাহার সাধন কখনও সম্ভব হয় না। মনুষ্য-সমাজ-সংগঠনের প্রত্যেকটি ইতিহাস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে। ইহার কারণ সন্ধানেও বেগ পাইতে হইবে না। যদি কোন সংগঠন হইতে অপর কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে দ্বেষ অথবা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা হয়, পরস্পরকে দুর্ব্বল করিবার জন্য এই দুইটি বিরোধী দলের মধ্যে পার্থক্য-সৃষ্টির প্রয়াস আপনা হইতেই জন্মলাভ করে। এই জন্য পৃথিবীর যুদ্ধসমূহের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে, যুযুৎসু দলের মধ্যে উৎকোচ অতিমাত্রায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

উপরের এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন সাধন এবং ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানার পুনর্নির্দ্ধারণ, এই উভয়ের জন্য আন্দোলনের ফলে যেমন অধিকাংশ মুসলমানের পক্ষ হইতে, তেমনই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইহার বিরোধিতা উপস্থিত হইতে বাধ্য। কেন না, উভয়েই ইহাদের স্বপক্ষে। ইহার ফলে, অচিরাৎ হিন্দুদের

মধ্যে অনৈক্য দেখা দিবে, কেন না, মুসলমানেরা নিষ্কর্ম্ম থাকিবেন না এবং তাঁহারা স্বভাবতই মনোনয়ন, চাকুরী, ও উপাধি বিতরণের সাহায্যে হিন্দুদিগের শক্তি-হ্রাসের নিমিত্ত সচেষ্ট হইবেন। তদুপরি, কংগ্রেসের অধিকাংশ সংখ্যক সদস্য হিন্দু হওয়ায়, ইহাতে কংগ্রেস হইতে যে বিরোধিতা উপস্থিত হইবে, তাহার ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে হিন্দুদের মধ্যেও অনৈক্য উপস্থিত হইবে। সুতরাং বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন কিংবা ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গলার সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইলে, হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইবে। হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা এই ভাবে অসম্ভব হইবার ফলে,—হিন্দু-সংস্কৃতির প্রসারও অসম্ভব হইবে, কেন না হিন্দু-সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তি হইতেছে দ্বন্দ্ব-কলহ, তথা রাগ-দ্বেষ প্রবৃত্তির সংযমন, এবং সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিবিধান, এমন কি, মধ্যবিত্তগণের বেকার-সমস্যার নিবারণও অসম্ভব হইবে, কেন না, সর্ব্বব্যাপক অনাহার-সমস্যার সমাধান না হইলে মধ্যবিত্তগণের বেকার-সমস্যার সমাধান যেমন সম্ভব নহে, তেমনই কোন প্রকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি-বিধানও সম্ভব নহে। সর্ব্বব্যাপক অনাহার-সমস্যার সমাধান-পন্থা কি হইতে পারে, তাহা জানিলে বুঝা যাইবে যে, কলহ প্রবৃত্তির তিরোধান এবং মুসলমান-হিন্দু-খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জন-সাধারণের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য-প্রবৃত্তির উন্মেষ সাধিত না হইলে ঐ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর নহে

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারিলে, অচিরাৎ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন-সাধন এবং ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানার পুনর্নির্দ্ধারণের জন্য কোন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিলে, হিন্দুদের ঐক্য-প্রতিষ্ঠা, হিন্দু-সংস্কৃতির প্রসার এবং সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিবিধান ইত্যাদি কোন উদ্দেশ্যই—বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা সংগঠন—যত মধুর করিয়াই উচ্চারিত হউক না কেন, সাধন করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন হইতেছে যে, যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই প্রকার আন্দোলন দ্বারা জন-সাধারণের কোন হিত সাধিত হওয়া সম্ভব নহে এবং ইহাতে নিশ্চিত ভাবে দ্বন্দ্ব-কলহ অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তখন দেশের মধ্যে এই প্রকার আন্দোলনের মনোভাব কেন দেখা যায়? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, এই প্রকার আন্দোলনের মনোভাবের প্রধানতঃ দুইটি কারণ :—(১) সাগরপারের রাষ্ট্র-নৈতিক ধুরন্ধরগণ ভারতে যে ভেদনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার সাফল্যের জন্য তাঁহাদের চেষ্টা, এবং (২) দেশে অভিজাত বলিয়া অভিহিত যাঁহারা সাগরপারের রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরগণের কোন প্রকার সংস্পর্শের আওতায় রহিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা।

আমাদের এই উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যদি হিন্দুদের আন্দোলন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন এবং ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালার সীমানা নির্দ্ধারণের সাধনে কৃতকার্য্যও হয়, তবে তাহার প্রত্যক্ষ ফল কি দাঁড়াইতে পারে।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, হিন্দুদের এই প্রকার আন্দোলনে অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানদের সহিত অচিরাৎ বিরোধিতা উপস্থিত হইতে বাধ্য। কিন্তু যদি হিন্দুদের এই আন্দোলন সার্থক হয় এবং বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন এবং সীমানার পুনর্নির্দ্ধারণ সাধন সম্ভবও হয়, তবে দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রত্যক্ষ ফল দাঁড়াইতেছে, হিন্দুরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতেছেন। প্রথম যে প্রত্যক্ষ ফল (অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানে অনৈক্য), তাহাতে বস্তুতঃ ভেদনীতির সাফল্য সমর্থিত হইবে—এই ভেদনীতি ভারত সরকারেরও পরিকল্পিত নহে, প্রাদেশিক সরকারসমূহেরও নহে, ইহা সাগরপারের ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরগণের পরিকল্পিত। দ্বিতীয় যে প্রত্যক্ষ ফল (পরিষদে হিন্দুদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ), তাহা ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু সদস্যগণের মন্ত্রিত্ব-লাভের এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের মুসলমান-সতীর্থগণের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ বর্ত্তমান, তাহার পূরণের সহায়ক হইবে। ইহার ফলে ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় হিন্দু-সদস্য তাঁহাদের পুত্র এবং আশ্রিতদিগের জন্য অধিকতর সংখ্যায় সরকারী চাকুরী লাভ করিতে পারিবেন মাত্র। তর্ক উঠিতে পারে যে, হিন্দুরা অধিক সংখ্যার দ্বারা মন্ত্রিত্ব-গঠনে সমর্থ হইলে

হিন্দু জন-সাধারণও বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হইবে। এই তর্ককে আমরা মূল্যদান করি না। ইহার উত্তরে, আমাদের বলিবার কথা এই যে, জন সাধারণের যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা অচিরাৎ দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা ভ্রান্ত। আমরা বারংবার বলিব যে, যে মন্ত্রিসভা, হিন্দু অথবা মুসলমান, উভয়ের কাহারও সমর্থন-লাভে অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে জন-সাধারণের কোন হিত সাধিত হইবে না। যে-মন্ত্রিসভা হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ, উভয়েরই সমর্থন-লাভে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহাদের দ্বারাই কেবল জন সাধারণের হিত সাধিত হওয়া সম্ভব। জন-সাধারণের কল্যাণসূচক জীবন-যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপার্জ্জনার্থ কি প্রয়োজন, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই আমরা ইহা বলিতেছি। সে জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমর্থন করিবেন। যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহারা যে, দেশের প্রত্যেকে যাহাতে জীবন-যাপনের নিমিত্ত ন্যূনতম ভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে অজ্ঞ, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

আমরা উপরে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিতে হইলে দেখা যাইবে যে, বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসভার পরিণাম দাঁড়াইবে কেবল নিশ্চিত ভাবে নিম্নলিখিত তিন প্রকার:

(১) জন-সাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি।

(২) ভেদনীতির সাফল্যের সহায়তা।

(৩) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যাঁহারা সদস্য তাঁহাদের পুত্র ও আশ্রিতদের কাহারও কাহারও (সকলের নহে) কয়েকটি চাকুরী-লাভ।

অর্থাৎ, হিন্দু জন-সাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া মহাসভার উদ্যোক্তাদের কয়েকজন জনসাধারণের কোন উপকার না করিয়াও নিজেদের স্বার্থ এবং হীন অভিসন্ধি সাধন করিবেন।

মহাসভা সংগঠনে হিন্দু-জনসাধারণ তথাপি সম্মতি দান করিবেন?

হিন্দু সংগঠনের উদ্দেশ্য কি হওয়া বিধেয়

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার হইয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে কার্য্যপন্থার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা যে হিন্দু জনসাধারণের কোন স্বার্থই সাধন করিবে না, আমরা উপরে নিশ্চিত ভাবে তাহা প্রমাণ করিয়াছি। হিন্দু আখ্যায় যাঁহারা চলিতেছেন, এই প্রকার কোন কার্য্যপন্থা বরং তাঁহাদের নিশ্চিত সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। সুতরাং পরবর্ত্তী প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই যে, হিন্দু সংগঠনের উদ্দেশ্য কি হওয়া বিধেয়। ইহার উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য হইতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress) হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠন করিবার সময় এখনও আসে নাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, দেশের মধ্যে একটিমাত্র সংগঠনের প্রয়োজন। দেশের প্রত্যেকে যাহাতে জীবনযাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় নিয়োজিত—ভারতীয় জাতীয় মহাসভা হইতেছে সেই সংগঠন। বর্ত্তমানে দেশবাসীর চিন্তায় এবং কার্য্যে একটিমাত্র আন্দোলনের বিষয় জাগ্রত থাকা প্রয়োজন,—কি করিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্য্যকলাপ বিন্দুমাত্র কলহের আভাস-সম্ভাবনা হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং তাহার উদ্দেশ্য দেশের প্রত্যেকের পক্ষে জীবনযাপনের উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ ব্যতীত আর কিছুই না হয়। ইহার নিমিত্ত, কংগ্রেস হইতে—এমন কি মেসার্স গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষ এণ্ড কোম্পানীর পাণ্ডাগিরির অবসান করিয়া, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে উপরিলিখিত একমাত্র উদ্দেশ্যপূরণের ব্যবস্থা ও পন্থা বিষয়ে যাঁহারা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও জন্য কংগ্রেসে স্থান করিতে হইতে পারে।

হিন্দুদের নিমিত্ত পৃথক্ সংগঠনের যখন সময় আসিবে, এবং যাঁহারা ইহার অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-প্রথমে "হিন্দু" কথাটির যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তাহার সন্ধানী হইতে হইবে, কেন না, "হিন্দু" বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি ধারণা করিতে হইবে, তাহা না জানা থাকিলে যথার্থ কোন হিন্দু-সংগঠন সম্ভব নহে।

"হিন্দু" বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি ধারণা করিতে হইবে, তাহা জানিবার প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণের একটিমাত্র গ্রন্থের একটি স্থানে (মেরুতন্ত্র-এর ত্রয়োবিংশ প্রকাশে) "হিন্দু" কথাটির ব্যবহার রহিয়াছে।

এতদনুযায়ী "হিন্দু" কথাটির বর্ণবিন্যাস "আরব্য ভাষা"র শব্দ-রূপান্তরের নিয়মানুগ এবং ইহার অর্থে কোন "ধর্ম্ম" কিংবা "কর্ম্ম" ধরিতে হইবে না, ইহার অর্থে, যে-প্রদেশ অব্যক্তের উদ্ভব এবং "অব্যক্ত" ও "ব্যক্ত"-এর বিকাশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের সাহায্য করে, সেই প্রদেশের একটি "জাতি"কে বুঝিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ অব্যক্তের উদ্ভব, দ্বিতীয়তঃ অব্যক্তের বিকাশ, তৃতীয়তঃ ব্যক্তের বিকাশ, এবং চতুর্থতঃ এই তিনটি-বিষয়ক জ্ঞানলাভের সহায়ক যে-প্রদেশ, ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ব-জগতে 'অব্যক্ত' কি, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জ্জনে প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, যাহা কিছুর কোন আকার কিংবা অবয়ব বর্ত্তমান, তাহাদের কোন কিছুই সম্পূর্ণ "অব্যক্ত" নহে, কেবল সকল প্রকার উগ্রতাহীন তেজ, রস ও বায়ুর সংমিশ্রণ ও রূপান্তরের ক্রিয়া সর্ব্বাবস্থায় "অব্যক্ত"। উগ্রতাহীন এই তেজ, রস ও বায়ুর ধারণা করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু যখন উগ্রতাসম্পন্ন তেজ, রস ও বায়ুর বিদ্যমানতা রহিয়াছে, তখন যে শূন্য-পরিমাণের উগ্রতাসম্পন্ন তেজ, রস ও বায়ুর বিদ্যমানতাও থাকা সম্ভব, ইহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে। প্রাকৃতিক সত্তার উদ্ভব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কোনরূপ মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইলে, অব্যক্তের (অর্থাৎ যখন তেজ, রস ও বায়ুর বিন্দুমাত্র উগ্রতা থাকে না) জ্ঞানকেও মূল্য দান করিতে হইবে, কেন না, এতদ্ব্যতীত কোন প্রাকৃতিক সত্তারই বৃদ্ধি ও অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। অব্যক্তের উদ্ভব, তথা অব্যক্ত ও ব্যক্তের বিকাশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকেই তাহা হইলে প্রকৃত বিজ্ঞান-বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান বলিতে হইবে। সুতরাং "হিন্দু" কথাটির অর্থ যে প্রদেশ প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের সাহায্য করিতে পারে, সেই প্রদেশের একটি জাতি। পরবর্ত্তী জিজ্ঞাস্য এই যে, সে কোন্ প্রদেশ, যাহা প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞান-লাভের সহায়তা করিতে পারে? ইহা হইতে কাহারও কাহারও মনে নিম্নের প্রশ্ন দুইটি উত্থাপিত হইতে পারে :—

(১) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলই প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে সহায়তা করিতে পারে, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত কি?

(২) পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলেই প্রকৃত বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতে পারে, ইহা মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে?

উপরের প্রশ্নদ্বয়ের একমাত্র উত্তর হইতেছে এই যে, বিশ্ব-জগতের সকল ঘটনা যেরূপ পৃথিবীর সকল অঞ্চল হইতে লক্ষ্যণীয় নহে, কোন একটি বিশেষ ঘটনা চাক্ষুষ করিতে হইলে যেমন ঐ ঘটনা এবং যে-স্থান হইতে দেখিতে হইবে সেই স্থানের—মধ্যস্থ দূরত্ব এবং কোণ অনুযায়ী বিশেষ একটি ক্ষেত্রের প্রয়োজন, সেইরূপ পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলেই প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিকশিত হইতে পারে না। সূর্য্য এবং চন্দ্র হইতে বিশেষ দূরত্ব এবং কোণসম্পন্ন স্থানই প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিকাশের সহায়তা করিতে পারে। বর্ত্তমান জগৎ যখন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞানের ধারণা করিতে পারিবে, তখন দেখা যাইবে যে, কেবল ভারতবর্ষই প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জ্জনে সহায়তা করিতে পারে, কেন না, সূর্য্য ও চন্দ্রের অপেক্ষা ভারতের যেরূপ দূরত্ব ও অবস্থান, পৃথিবীর অপর কোন দেশের সেইরূপ নহে। আমাদের এই কথা শুনিয়া ডক্টর মেঘনাদ শ্রেণীর আধুনিক বৈজ্ঞানিকবৃন্দ পরিহাস করিতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য্যসহকারে আর কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিলে অদূরভবিষ্যতে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, আমাদের উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য।

বাস্তবিক পক্ষে একদিন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিল এবং বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি ঘটনার নিদানস্বরূপ হেতু ও পরিণামের যথাযথ ব্যাখ্যায় সমর্থ ছিল এবং সেই জ্ঞান ভারতীয় ঋষি-রচিত বেদ ও তন্ত্র প্রভৃতি মূল গ্রন্থে অদ্যাবধি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আজ যে ভারতবাসী কেহই উহা পরিজ্ঞাত নহেন, তাহার কারণ ঋষিগণ যে-ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই ভাষার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। এই বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার হইলে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে যে, পাশ্চাত্ত্য পদার্থ-বিদ্, রসায়নবিদ্, জ্যোতির্ব্বিদগণ কি নির্ব্বোধ-তত্ত্বসমূহ প্রচার করিতেছেন এবং জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি-ব্যপদেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কি সর্ব্বনাশের কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

"হিন্দু" কথার অর্থ কি হইবে আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছিলাম। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, হিন্দু বলিতে ভারতের এমন একটি জাতিকে বুঝিতে হইবে, যাহারা উগ্রতাবিহীন তেজ, রস ও বায়ুর উদ্ভবের, তথা উহাদিগের ব্যক্তির ধারা সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের সহায়তা করিতে সমর্থ। এক কথায় "হিন্দু" হইতেছে ভারতবাসী সেই জাতি (যে-কোন জাতি নহে), যাঁহারা প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিদিত।

"হিন্দু" কথাটার এই তাৎপর্য্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ভারতে আজ এমন একটি ব্যক্তি নাই, যাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে "হিন্দু" অভিহিত করা যায় এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ভারতের হিন্দুর নামে কোন ধুয়া উত্থাপন সম্পূর্ণ নিরর্থক। ভারতে বর্ত্তমানে হিন্দু আখ্যায় যাঁহারা আখ্যাত, তাঁহাদিগকে হিন্দুজাতির সন্তান-সন্ততি বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা আর যাহাই হউন, "হিন্দু" নহেন।

যে-সকল ব্যক্তি "হিন্দু" কথাটির তাৎপর্য্য পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের ধুয়া উত্থাপন করিতেছেন! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "হিন্দু"-অভিহিত কোন ধর্ম্ম কোনদিন ছিল না। ভারতীয় ঋষিগণের ধর্ম্মের আখ্যা 'মানবধর্ম্ম'। ইহার উৎকর্ষে আকৃষ্ট হইয়া সম-সাময়িক প্রত্যেকটি মানব-সমাজ এই মানবধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিল।

হিন্দু-সংগঠন বলিতে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এমন সংগঠন, যাহার সাহায্যে জন-সাধারণ প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধীন হইতে পাবে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য নিম্নানুযায়ী হওয়া বিধেয়:—

(১) তেজ, রস, ও বায়ুর সর্ব্বব্যাপক প্রভাব অনুসরণ।

(২) বিভিন্ন প্রকার উগ্রতাসম্পন্নতায় তেজ, রস ও বায়ুর সংমিশ্রণ ও রূপান্তর-বিধির অনুসরণ।

(৩) শূন্য-পরিমাণ এবং তন্নিম্ন পরিমাণের উগ্রতাধীন তেজ, রস ও বায়ুর উপলব্ধির পন্থার অনুসরণ।

(৪) শূন্য-নিম্ন পরিমাণ উগ্রতাসম্পন্ন তেজ, রস ও বায়ুর সংমিশ্রণ ও রূপান্তর-বিধির অনুসরণ।

(৫) তেজ, রস ও বায়ুর মূল উপাদানের সন্ধান।

হিন্দু-সংগঠনের উদ্দেশ্য যাহা হওয়া বিধেয় বলিয়া উপরে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, যথাযথভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ঐ প্রকার সংগঠন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিষয়ক অপেক্ষা শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়কই অধিক।

আমরা ইহা আগেই বলিয়াছি যে, উপরিনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রকৃত হিন্দু-সংগঠন—যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী প্রত্যেকে তাহার জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অর্জ্জন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া মানসিক শক্তিলাভ না করিবে, ততদিন সম্ভব হইবে না। জনসাধারণ কি তথাপি অন্ততঃ ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিবে না যে, তাহাদের চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালীতে ত্রুটি রহিয়াছে এবং ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন?

বক্তৃতাসমূহের বিশ্লেষণ

আমরা উপরে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে প্রমাণ হইবে যে, তথাকথিত হিন্দু-সংগঠন আন্দোলনের—"হিন্দু" শব্দটির মৌলিক অর্থের সহিতও যেমন সামঞ্জস্য নাই, তেমনই ইহার দ্বারা জনসাধারণেরও কোন হিত সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট হইবে যে, এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাদিগের অধিকাংশই জনসাধারণের হিত সাধনের উপায়-সন্ধান, এবং সহযোগিতার প্রবৃত্তি অপেক্ষা রাগ-দ্বেষ ও প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি দ্বারা অধিক প্ররোচিত। চিন্তা-বিশৃংখলা এবং দূরদৃষ্টির অভাবের নিদর্শনও যে তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য তাহা নহে। আমাদের মতের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য আমরা একে একে বক্তৃতাসমূহের বিশ্লেষণ করিব।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের কার্য্য-প্রস্তাব যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহারা (বাঙ্গালার অধিবাসিবৃন্দ) কেবল নিজেদের জন্যই আন্দোলন করেন নাই, স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মিলনের জন্যও আন্তরিক ভাবে এবং কঠোরভাবে চেষ্টা করিয়াছেন।" যদি ভারতবাসী বস্তুতঃ ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিত, তবে এই উক্তিকে মূল্যবান্

মনে করা যাইত। ইহা কি সত্য নহে যে, ১৯০৪ সালে যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে বিবাদ-বিসংবাদ ভাবতে তদপেক্ষা অনেক প্রবল? যখন পরিণাম দাঁড়াইয়াছে বিপরীত, বক্তার পক্ষে তখন ঐক্যবিষয়ক কার্য্যের কথা বলা বস্তুতঃ লজ্জাহীনতা ও চিন্তাহীনতার পরিচায়ক।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য উক্তি:

> "ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে লিখিবার সময় যখন আসিবে, তখন বাঙ্গালী হিন্দুর (তাঁহাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) অভিনীত ভূমিকা তাহার একটি অধ্যায়ে উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"

সমগ্র দেশ যখন অনাহার, বেকার ও বিবেকহীনতার আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন মনুষ্যোচিত বুদ্ধি থাকিলে বিগত আন্দোলনকে "উজ্জ্বল" বলিয়া অভিহিত করা যায় না। বক্তা যে নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য উক্তি হইতেছে:—

> "বিগত আড়াই বৎসরকাল ধরিয়া মন্ত্রিসভা যে নীতিতে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য হিন্দুদিগকে খর্ব্ব করা..."

বাস্তবিকপক্ষে ইহা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাপ্রসূত। সামান্য রাষ্ট্রীয় বিচক্ষণতা থাকিলেই ধরা পড়িবে যে, হিন্দুদিগের কোন খর্ব্বতা যদি সাধিত হইয়া থাকে, তবে সেই খর্ব্বতার জন্য, সাগরপারের ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরগণ পরিকল্পিত ১৯৩৫ সালের আইন দায়ী—মন্ত্রিসভা-অনুসৃত নীতি নহে। জনসভায় দণ্ডায়মান হইয়া রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পক্ষে বক্তা যে নিতান্ত বালকোচিত, তাঁহার এই উক্তি তাহাই সাক্ষ্য প্রদান করে। এই প্রকার বক্তৃতাতে কেবল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগ্রত হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ ভারতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকল্পে যে ভাবের কার্য্য করিতেছেন, ইহা তাহারও অন্যতম নিদর্শন। জনসভায় দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ যেন অধিকতর শিক্ষা ও বিদ্যা অর্জ্জন করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের যদি কোন যোগ্যতা কিংবা পদার্থ থাকিত, তবে তৎপরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ যাহাতে বেতনভোগী চাকুরী-সন্ধানী ক্রীতদাস না হইয়া তদপেক্ষা সম্মানার্হ জীবন যাপন করিতে পারে, সে-ব্যবস্থা তিনি নিশ্চিত করিতে পারিতেন। প্রকৃত "হিন্দু" হওয়া দূরে থাক, যদি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের কোনরূপ হিন্দুত্ব থাকিত, তবে যে-ডক্টর মেঘনাদ এতদূর দায়িত্বজ্ঞানহীন যে, বেদ ও সংস্কৃত ভাষার একটি মাত্র বর্ণও প্রকৃতপক্ষে না জানিয়া উহাদিগকে ব্যঙ্গ করেন, তাঁহাকে তিনি নিশ্চিত পরিহার করিতেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে অতি অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, যে-ব্যক্তি বেদকে ব্যঙ্গ করে, তাহার কার্য্যের জন্য অনুতাপ বোধ না করিলে, নিজের কিংবা ছাত্রদের সে ব্যক্তির সঙ্গ—করায় সম্মতি দান করিতে—যিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি কখনও পারিবেন না। হিন্দুর নামে যে সংগঠন পরিচালিত, এইরূপ ব্যক্তি যে তাহার সভাপতিত্ব করিবার অধিকার লাভ করেন, ইহা পরিতাপের বিষয়। ইহাতেই প্রকাশ পায় যে, বাঙ্গালার তথাকথিত হিন্দুগণ অত্যন্ত পাপী এবং দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভের দাবী তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও নাই।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

এই বক্তৃতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বক্তৃতার একমাত্র উল্লেখযোগ্য উক্তি হইতেছে, বক্তা বলিয়াছেন, তিনি সভার উদ্দেশ্য সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

সন্দর্ভের প্রথমাংশে আমরা দেখাইয়াছি যে, এই শ্রেণীর সংগঠনের পরিণামে কি শ্রেণীর সর্ব্বনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং বলিতে হয় যে, কোন বিজ্ঞ এবং বয়স্ক ব্যক্তির সমর্থন-লাভের ইহা অযোগ্য। আমরা কি ইহাই বুঝিব যে, মিঃ চ্যাটার্জ্জীর বয়ঃক্রম এতই হইয়াছে যে, তিনি এই অবোধোচিত সংগঠনের পরিণাম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই? জনসাধারণের সেবাক্ষেত্র হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, ইহাই আমাদের মনোগত বাসনা, নচেৎ জন-সাধারণকে কি ভাবে তিনি পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাহা দেখাইয়া দিতে আমরা বাধ্য হইব।

মিঃ এস. কে. রায়চৌধুরীর বক্তৃতা

এই বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য উক্তি নিম্নলিখিত রূপ:—

(১) দেশবাসীকে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গঠনমূলক কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(২) পরিতাপের বিষয় যে, যখন হিন্দুদের নারীজাতির ধর্ম্ম নাশ হইতেছে, প্রতিমা ধ্বংস হইতেছে এবং মন্দির কলুষিত করা হইতেছে, তখনও তাহারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভাব এবং শত্রুদের প্রতি প্রেমের ভাব চর্চ্চা করিতেছে। ইহা কিন্তু গীতার শিক্ষার বিরোধী, গীতা শারীরিক ও মানসিক, আত্মোৎকর্ষের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন।

উপরিলিখিত দুইটি দফার প্রথমটিতে প্রমাণ হয় যে, বক্তা গ্রামের অবস্থার সংবাদ রাখেন না। গ্রামে বাস করিয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় না পাইলে জন-সাধারণ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতে একদিন ছিল, যেদিন দেশবাসী গ্রাম ব্যতীত আর কোথাও বাস করিত না। ক্রমশঃ গ্রামে জীবন-যাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘটায়, তাহারা একে একে কষ্টে পড়িয়া গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। গ্রামে জীবিকার্জ্জন চলিতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা কিংবা তাহার পন্থা নির্দ্দেশ না করিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলা নিরর্থক। মিঃ. এস. কে. রায় চৌধুরীর বক্তৃতার দ্বিতীয় দফা হইতে বুঝা যায় যে, এ বিষয়েও তাঁহার প্রচুর ভ্রান্তি বর্ত্তমান। মুসলমানদের সহিত দ্বন্দ্ব কলহের মনোভাবের পরিচয় দান করিয়াও তিনি একই সঙ্গে গীতার নির্দ্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে গীতার সাধক হন, তবে তাঁহাকে অবশ্য উপলব্ধি করিতে হইবে যে, কোন প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে, এমন কি শত্রুর বিরুদ্ধেও দ্বন্দ্ব-কলহের মনোভাব পোষণ করিলে চলে না। তাঁহার কি জানা নাই যে, গীতায় নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ?—

(১) …ভব…নির্দ্বন্দ্বো…

(২) … দ্বন্দ্বাতীতো…কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে

(৩) নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

হিন্দু-মন্দিরকে কলুষিত করিবার দোষ, হিন্দু প্রতিমার ধ্বংস করিবার দোষ, হিন্দুনারীর ধর্ম্মনাশ করিবার দোষের জন্য মিঃ রায় চৌধুরী মুসলমানগণকে দায়ী করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সমস্তই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কিন্তু তথাপি আমরা বলিব, এই সমস্তের দায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরই অধিক।

হিন্দুরা যদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টভাবে নারীকে শিক্ষিত করিতে পারিত, হিন্দু পুরুষ যদি তাহাদের নারীদের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপনের পক্ষে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিত, যদি তাহারা তাহাদিগের নারীজাতিকে উপার্জ্জনের কার্য্যে না নিযুক্ত করিত,- যদি হিন্দুনারীকে স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত ব্যবহারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচরণ-রক্ষায় প্রবৃত্ত করা হইত, যদি হিন্দু বালিকাদিগকে কালেজী-শিক্ষা হইতে এবং পুরুষদিগের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান এবং সম্মেলনে যোগদান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা হইত, যদি পাশবিক লালসার বলি হইবার উপযোগী বয়ঃক্রমে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই হিন্দু নারীর বিবাহ দেওয়া হইত, তবে হিন্দু-নারীর ধর্ম্মনাশের একটি মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারিত না, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়। উপবিনির্দ্দিষ্ট ভাবে না চলিতে পারার জন্য হিন্দুরাই কি দায়ী নহে ?

তদুপরি, যদি হিন্দুরা তাহাদের প্রতিমা বস্তুতঃ কিসের প্রতীক তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারিত এবং বিভিন্ন প্রতিমা-সমূহ যে বস্তুতঃ মনুষ্যদেহ এবং বহির্জ্জগতস্থ প্রকৃতির বিভিন্ন অব্যক্ত ক্রিয়ার প্রতীকস্বরূপ, ইহা যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পৃথিবীবাসীকে বুঝাইতে পারিত যে, বিভিন্ন প্রতিমার পূজা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মূলনীতির সাধনা, তবে এই জগতে প্রতিমা এবং তাহার পূজাকে সম্মান কে না করিত ? হিন্দুরা যে তাহা করিতে পারে নাই, ইহা কেবল প্রমাণ করে যে, হিন্দুরা নিজেরাই তাহাদের প্রতিমা এবং মন্দির সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করিতে সমর্থ নহে। এই অবস্থায় অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন কি নিরর্থক নহে ?

কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্য সম্পর্কে মিঃ রায় চৌধুরী অধিকতর দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দান করিয়াছিলেন এবং এই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের মনে শ্রদ্ধার ভাব আছে। এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক সংগঠনের কার্য্যের যদি তিনি সহায়তা করেন, আমরা বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে নিরাশ হইব।

মিঃ বি. সি. চাটার্জ্জী এবং মিঃ এন. সি. চাটার্জ্জী প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দের হিন্দুত্ব সম্বন্ধে ধারণা তাঁহাদের দৈনন্দিন

জীবনযাত্রা হইতেই সুপ্রকাশ এবং উহা এরূপ সুবিদিত যে, আমাদের সমালোচনার যোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের সরল বক্তব্য হইতেছে, ভারতীয় ঋষিনির্দ্দিষ্ট হিন্দুত্ব বিষয়ে অজ্ঞতা, বর্ত্তমান হিন্দুগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট, নচেৎ তাঁহারা এই শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দকে—তাঁহারা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে অধিকতর শিক্ষা-দীক্ষা লাভ না করিলে,—হিন্দু-আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসাবে সহ্য করিতেন না।

উপসংহারে আমাদের পাঠকবৃন্দকে বলিতেছি যে, এই হিন্দু-সংগঠন আন্দোলনের সহিত মূল হিন্দুত্বের কোন সম্পর্কই নাই। ইহার উদ্ভব রাজনীতি হইতে এবং ইহা প্রকৃত হিন্দুত্বের স্বার্থ নষ্ট করিতে বাধ্য। যদি হিন্দু জনসাধারণ নিজেদের বাস্তব সমস্যার সমাধান চাহেন, তবে ইহার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে সাবধানতা অবলম্বন করিতেই হইবে। আমরা মুসলমান জনসাধারণকেও কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হইতে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনই জনসাধারণের প্রত্যেকের জীবন-যাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান-বিষয়ে প্রকৃত সহায়ক হইতে পারে না। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুদের সহিত আন্তরিক মিলন ব্যতীত উহা লব্ধ হইতে পারে না। উপরন্তু মুসলমানদের পক্ষ হইতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক আন্দোলনও ভেদনীতির কৃতকার্য্যতার সহায়ক হইবে। যে-সকল মুসলমান ব্যবস্থাপক সভা কিংবা সরকারী চাকুরী-বিভাগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততি এবং আত্মীয়দের ইহা আরও কয়েকটি মাহিনাভোগী চাকুরী দিতে পারে, কিন্তু মুসলমান জন-সাধারণের অধিকাংশের সমস্যার ইহাতে সমাধান হইবে না। আমরা যাহা বলিতেছি, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কি ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করিবেন না?

সর্ব্বশেষে, যে-সকল সংবাদ-পত্রিকা কংগ্রেস তথা সাম্প্রদায়িক সংগঠন আন্দোলন উভয়েরই সমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে আমরা অবহিত হইতে বলি। কোনরূপ উন্নতি-প্রয়াসী হইলে, এই সকল বৈনাশিকতুল্য পত্রিকার বর্জ্জন বিধেয় নহে কি?*

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে

শৃঙ্খলা-রক্ষক দণ্ড

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি দৃশ্যতঃ অত্যন্ত গুরু যে-দণ্ডাদেশ হইয়াছে, তাহার অপরাধ কাহার,—তাহার সন্ধান দান এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ আমাদের অভিপ্রায়। আমরা গত মাসের আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড ব্লক'-এর কার্য্যপন্থাকে দেশবাসীর মূল্য দান করিবার কিছুই নাই এবং ইহাতে দেশের উপকার দূরে থাক, সমূহ অপকার সাধিত হইবে। তাঁহার 'ফরোয়ার্ড ব্লক'-এর কার্য্য-পন্থায় যে-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি যখন তাঁহার কলহ-প্রবৃত্তির এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন, তখন তাঁহাকে আমাদের অপরিণতবয়স্ক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তথাপি নেতা হিসাবে আমরা তাঁহাকে ভালবাসি, কেন না, আর কোনও নেতার মধ্যে তত্তুল্য দৃঢ়চিত্ততা, কার্য্যানুরাগ, নির্ভীকতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা আমরা দেখিতে পাই না। হয়ত সুভাষচন্দ্রও জনসাধারণের প্রকৃত হিতপক্ষে কিছুই করিতে অসমর্থ হইবেন, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুভাষচন্দ্র অকৃতকার্য্য হইলে বর্ত্তমানের অপর কোন নেতাই কৃতকার্য হইবেন না। আমরা বলিতে চাহি যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে হয় ত' বিগত জীবনে তিনি যাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার অনেক কিছুই ভুলিতে হইবে এবং হয় ত' শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে তিনি অসমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি তিনি বর্ত্তমানে ভারতে অপর যে-সব নেতা রহিয়াছেন, তাঁহাদের যে-কাহারও অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আমাদের মতে, জন সাধারণের প্রত্যেকের জীবন যাত্রার

* 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী'র ১৭ই আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজীর অনুবাদ।

পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের অপর কোন নেতা অপেক্ষা, সুভাষচন্দ্রের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অধিক। হয় ত' তিনিও অসমর্থ হইবেন, কিন্তু যদি তিনি কলহ-প্রবৃত্তি এবং কূটনীতির প্রতি মমত্ব পরিহার করিতে পারেন, তবে দেশবাসীর তাঁহাকে কার্য্যসুযোগ দান করা উচিত। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে আমরা 'ওকালতী' করিতেছি বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু কাহারও পক্ষেই আমরা 'ওকালতী' করিব না, পাঠককে ইহা আমরা বলিয়া রাখিতে পারি। মিঃ গান্ধী যদি পশুচিত প্রতিহিংসা-প্রবণ ও পয়লা নম্বরের ডাহা-মিথ্যাবাদী না হইতেন, তবে মিঃ গান্ধীর স্বপক্ষেও আমরা একই কথা বলিতাম। মিঃ গান্ধীর অতীত বিভিন্ন রচনা ও কার্য্যাবলী হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণিত হইতে পারে যে, তিনি পশুচিত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে ইহা আমাদের দ্বারা প্রমাণিত হইবে। আমরা জানি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের মুক্তির জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন কি, তদ্বিষয়ে মিঃ গান্ধী অজ্ঞ, কিন্তু এই অজ্ঞতার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করিবার আমরা পক্ষে নহে, কেন না, আমরা ইহাও জানি, বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তির যে-জ্ঞান নাই, ভবিষ্যতে সে-জ্ঞান তাঁহার হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য মিথ্যাবাদীর দ্বারা সাধিত হইতে পারে না এবং যে-মিথ্যাবাদী কেবল জনসাধারণকে নহে, নিজকে এবং নিজের পরিজনকে ধাপ্পাবাজী দান করিতে অভ্যস্ত, তাঁহার স্বভাব-পরিবর্ত্তন অসম্ভব; বিশেষ করিয়া এই ব্যক্তি যখন কৃতিত্বের সহিত জন-সাধারণের একাংশের বিশ্বাসযোগ্য করিয়া ধোঁকাবাজী দানের তথাকথিত নৈপুণ্য লাভ করেন, তখন ইহা আরও কষ্টকর হয়। মিঃ গান্ধী এই শ্রেণীর মিথ্যাবাদী এবং এই জন্যই আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, তাঁহার স্বভাবের কখনও পরিবর্ত্তন হইবে, কিংবা তিনি কখনও আমাদিগকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবেন।

মিঃ জওহরলাল নেহরু যদি এত বৈদেশিক ভাবাপন্ন না হইতেন, কিংবা পুঁথি-পড়া অর্থনীতিবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্ না হইতেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল হইত। কিন্তু তাঁহার আচরণে ও কার্য্যে তিনি এতখানি-সংস্কারবদ্ধ যে, তিনি আত্ম-বিশ্লেষণে অসমর্থ এবং তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তনের প্রত্যাশা নিরর্থক।

এই ভাবে অধুনাতন সকল নেতার গুণাবলীর বিশ্লেষণে ধরা পড়িবে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কয়েকটি অপরিবর্ত্তনীয় ত্রুটি বিদ্যমান, বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ, তাহার মূল এই যে, তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি ও রাজনীতির গোঁড়া সাকরেদ্। সুভাষচন্দ্রেরও নিজস্ব ত্রুটি বিদ্যমান, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি আত্ম-বিশ্লেষণে সমর্থ এবং ইচ্ছা করিলে স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। সেই জন্যই বলিতেছি যে, যদি তিনি তাঁহার কলহ-প্রবৃত্তি এবং কূটনীতির প্রতি মমতা পরিহার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তবে তাঁহাকে দেশবাসীর কার্য্য-সুযোগ দান করা উচিত।

যদি সুভাষচন্দ্র এই ভাবে মনঃস্থির করেন, তবে তাঁহাকে তদনুযায়ী সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতে হইবে এবং দেশবাসীকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, যে-কার্য্যপন্থায় ভারতবাসী কিংবা ব্রিটিশ, কাহারও সহিত সামান্য মতদ্বৈধের সম্ভাবনা, সে কার্য্যপন্থায় স্বীকৃত হওয়া অপেক্ষা তিনি কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া কার্য্য করাই অধিকতর পছন্দ করিবেন। অতঃপর, তাঁহাকে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া কংগ্রেস-নেতা এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উপর চাপ দিতে বলিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা বড়লাট এবং প্রাদেশিক গবর্ণরদিগের নিকট দাবী করেন যে, হয় তাঁহারা, ভারতবাসী প্রত্যেকে যাহাতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখিবার উপায়স্বরূপ জীবন-যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার কার্য্যকরী কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করুন, নয় ভারতবাসীরা নিজেরা যাহাতে নিজেদের অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে, এমন কি নোট ব্যবহারের স্বাধীনতা এবং বিদেশীদের সহিত সম্বন্ধ-রক্ষা বিষয়েও,—পূর্ণ সুযোগ প্রদান করুন।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এখনও কি এই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে পশ্চাদ্‌পদ থাকিবেন? *

---

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ১৭ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজীর অনুবাদ।

'চক্রকে'র নিদর্শন

গত ১৯শে আগষ্ট শনিবার তারিখে কলিকাতায় মহাজাতিসদনের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা সমাধা করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি একটি বক্তৃতা দান করেন। কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক তাঁহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বক্তৃতাটির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা ইহাতে যাহাকে 'চক্রক তর্ক (vicious circle)' বলা হয়, তাহার সাক্ষ্য এবং তত্ত্বসমূহের অস্পষ্ট ধারণা ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার কয়েকটি নিদর্শন ব্যতিরেকে আর কিছুই পাই নাই।

আমাদের এই মতবাদ যাথার্থ্য প্রথমতঃ ডক্টর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ সঙ্কলন করিব।

তাঁহার বক্তৃতা মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে বর্ত্তমান বাঙ্গালার অগ্রগতির পথে যে-সব বিষয় সাহায্য করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে, কি আদর্শে বাঙ্গালায় আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ডক্টর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রথমাংশের উল্লেখযোগ্য উক্তিসমূহ নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথমে বাংলা দেশের অন্তঃকরণ গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল, নানা দিক্ থেকে বিচলিত করেছিল তার মন।

(২) মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠ্‌ল পূর্ব্বযুগের অজগর নিদ্রা থেকে।

(৩) আচার, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রীয় সাধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্ব্ব প্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল।

(৪) অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিময়ী হয়ে উঠ্‌ল বাংলা ভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবন-সঞ্চারে।

(৫) চিত্রকলা বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতা লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণাচরণচক্রবর্ত্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হোলো।

(৬) গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার করে নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে, তার আশুফলের বিচার করবার সময় হয় নি; কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নব নবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হোতে পারে।

(৭) রাষ্ট্র-মুক্তিসাধনার সর্ব্ব প্রথম কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাংলা দেশ।

(৮) যে দুর্য্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারা-প্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন, তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্য বধ-বন্ধনের মুখে নির্ব্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেই এরকম ঘটে নি।

(৯) এ ঘটনাকেও (৮ম দফায় কথিত) ফলের দ্বারা বা শান্ত সুবুদ্ধির আদর্শে বিচার করব না। বিচার করব মুক্তির জন্যে দুঃসহ বেদনার মূল্য অনুসারে।

(১০) বাংলা দেশে সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ দুর্ঘকাল কারা-নির্ব্বাসনে আপন দীপ্তি নির্ব্বাপিত করেছে, জানি সেই জন্য আজ বাংলা দেশের আকাশ অনুজ্জ্বল, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, যে মাটিতে এদের জন্ম সেই মাটিতে দুঃখ-জয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে, তার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সমাহিত হয়ে ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে।

ডক্টর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) আজ এই মহাজাতিসদনে আমরা বাঙ্গালী জাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প করেছি, তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সংশয়-কণ্টকিত।

(২) চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সভ্যতা লাভ করে।

(৩) বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য, কর্ম্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান।

(৪) অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক্।

(৫) বাংলা দেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নব প্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে আশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্দ্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি-সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্ত্তিরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক।

(৬) বাঙালির বাহু ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালি স্বৈর বুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কারণেই নিজেকে অকৃতকার্য্য যেন না করে।

ডক্টর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশের অনেক বিষয় সম্বন্ধে আমরা সম্যক্ ধারণা গঠনে অসমর্থ হইয়াছি, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয়াংশের দ্বিতীয় দফা ধরা যাউক। এখানে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ "চিত্ত"কে আহ্বান করিবার কথা বলিতেছেন এবং ইহার "সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যের" কথা বলিয়াছেন। "মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি"র দ্বারা "অকৃত্রিম সভ্যতা" অর্জ্জনের কথাও তিনি বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, লেখকের "চিত্ত", "আতিথ্য", "মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি" অথবা "অকৃত্রিম সভ্যতা", ইহাদের কোনটির সম্বন্ধেই ধারণা নাই। "চিত্ত", "আতিথ্য", "মুক্তি" ও "সভ্যতা", এই কয়েকটি কথাই মূল সংস্কৃত এবং যথেচ্ছভাবে যে কোন অর্থে ব্যবহার করা চলে না, কেন না, প্রত্যেকটি সংস্কৃত কথার ধারণা তদন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন মূল শব্দানুযায়ী করিতে হয়। সংস্কৃত কথার ধারণা করিবার এই রীতি অনুযায়ী "চিত্ত" কথাটির ধারণা করিতে সমর্থ হইলে দেখা যাইবে যে, ইহার অর্থ হইতে মনুষ্যদেহস্থ (অপর কোন জীব কিংবা তরুলতার নহে) রসের (রক্ত এবং অস্থি প্রভৃতির নহে) সেই ক্রিয়া (অপর কিছু নহে), যদ্দ্বারা "মন" ও "অনুভূতি"র যোগ আনয়ন করে। "চিত্ত" নামক ক্রিয়ার দ্বারাই মনুষ্যের মেদ, অস্থি প্রভৃতির বিভিন্ন অণুর সংযোগ রক্ষিত হয়। কোন ব্যক্তি "চিত্ত" এর উপলব্ধিতে সমর্থ হইলে তিনি কি ভাবে তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি পরস্পর-সংযুক্ত তাহাও অবশেষে উপলব্ধি করিতে এবং জানিতে পারেন। অর্থাৎ "চিত্ত"-এর জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি শরীর-বিধান, শরীর-গঠন এবং মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন্। "চিত্ত"-এর উপলব্ধির সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় সামবেদে এবং ঐ সম্বন্ধীয় মোটামুটি জ্ঞাতব্য সাধারণ্যে "যোগ দর্শন" আখ্যাত "পাতঞ্জল-সূত্রে" লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এতন্নির্দ্দিষ্ট উপায়ে "চিত্ত"-এর ধারণা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "চিত্ত"-এর কথনও "আতিথ্য" সম্ভব হয় না এবং "চিত্তের আতিথ্য" এবংবিধ কথা অর্থহীন। "চিত্ত" সম্বন্ধে "আতিথ্যে"র কথা বলা যেরূপ অর্থহীন, সেইরূপই "সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি"র দ্বারা "অকৃত্রিম সভ্যতা" অর্জ্জনের কথা বলাও অর্থহীন। "সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি" বলিতে কোন ধারণা অর্জ্জিত হইলে দেখা যাইবে যে, "অকৃত্রিম সভ্যতা" অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি ব্যতীত কোন রূপেই "সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি" সম্ভব নহে। সুতরাং "অকৃত্রিম সভ্যতা"র দ্বারা "সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি" অর্জ্জনের কথা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু "সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি"র দ্বারা "অকৃত্রিম সভ্যতা" অর্জ্জনের কথা বলা সঙ্গত হয় না।

এই রূপে ডক্টর রবীন্দ্রনাথের সকল দার্শনিক ও সাহিত্যিক উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই অর্থহীন এবং প্রকৃত দর্শন ও সাহিত্য-বিষয়ক অজ্ঞতার নিদর্শন। এই ভাবেই তিনি আজীবন মনুষ্য-সমাজকে বিপথে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, এবং তিনি যে ইহা করিয়া আসিতে পারিতেছেন, তাহার হেতু হইতেছে, আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শঃই সম্পূর্ণ রূপে মস্তিষ্কহীন হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের সর্ব্ব-ব্যাপক

দুর্দ্দশা হইতেই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শঃই মস্তিষ্কহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কে যদি কোন সার পদার্থ থাকিত, তবে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপযোগী অন্ততঃ একটি পরিকল্পনাও বর্ত্তমান জগৎ দেখিতে পাইত।

অতঃপর আমরা ডক্টর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিষয়ভাগ আলোচনা করিব।

ডক্টর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রথমাংশের ১, ২ ও ৭ দফা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতা এবং জাতীয় স্বাধীনতার একজন বড় পাণ্ডা এবং তিনি ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পদার্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। অতঃপর তাঁহার বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশের প্রথম দফা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি যে-"রাষ্ট্রশক্তি" "শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সংশয় কণ্টকিত" তাহার প্রাধান্য দেখিতে চাহেন না। তিনি একবার "ইউরোপীয় সভ্যতা" এবং "জাতীয় স্বাধীনতা"র অর্জ্জন-প্রয়াসের উচ্চ প্রশংসা করিতেছেন এবং একই নিশ্বাসে যে "রাষ্ট্রশক্তি" "শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয়-কণ্টকিত" তাহার অর্জ্জন-প্রয়াস পরিহার করিতে বলিতেছেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়াও যায় যে, ডক্টর রবীন্দ্রনাথের উক্তিদ্বয় সামঞ্জস্য বর্ত্তমান, তবে বর্ত্তমানে ইউরোপে "শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয়-কণ্টকহীন" "জাতীয় স্বাধীনতা"র অস্তিত্ব বর্ত্তমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা স্বতন্ত্র। অধুনা ইউরোপে এমন একটি "রাষ্ট্রশক্তি" নাই, যাহা শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সন্দিগ্ধ নহে। তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গতভাবে বলিতে হয় যে, হয় আমাদিগকে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সংস্করণের জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে হইবে, নয়, যে শক্তি শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সংশয়হীন নহে, তাহা অর্জ্জনের চিন্তা পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ইহার বিপরীতাচরণই করিয়াছেন, ইহা স্বমত-খণ্ডনের পরিচায়ক নহে কি?

অতঃপর ডক্টর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশের ষষ্ঠ দফা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, তিনি যে-কার্য্যে কেবল সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ঐক্য সাধিত হইবে কেবল তাহাই নহে, যাহাতে সর্ব্ব-ভারতীয় এবং সর্ব্ব-মানবের ঐক্য-সাধনের সহায়তা হয়, তাহারই কথা বলিয়াছেন। ইহা প্রশংসনীয় এবং এই শ্রেণীর উচ্চ ও কল্যাণকর আদর্শ পোষণ করেন বলিয়া ডক্টর রবীন্দ্রনাথকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু এই সর্ব্বজাতীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার উপযোগী মহৎ ধারণা সার্থক করিবার উপযোগী কার্য্যের কথা বলিলেও, তিনি একই নিঃশ্বাসে যে সব নেতা এবং তাঁহাদের অনুচরবৃন্দ বৃটিশজাতির সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং তাঁহাদিগকে হত্যার প্রয়াস দ্বারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন (৮ম ৯ম ও ১০ম দফা দ্রষ্টব্য), তাঁহাদের কার্য্যেরও প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে, কোন ব্যক্তির সহিত মিলন, তাহার সহিত দ্বন্দ্ব-কলহে এবং তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনের অথবা প্রাণনাশের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলেও সাধন-যোগ্য? ইহাও কি ডক্টর রবীন্দ্রনাথের শঠতা, স্বমত-বিরোধিতা এবং চক্রক-তর্কের অন্যতম পরিচয় নহে?

ডক্টর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রথমাংশের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ দফা মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি নিম্নোদ্ধৃত বিষয়সমূহের স্বপক্ষে বলিয়াছেন:—

(১) বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা,
(২) বর্ত্তমান ইউরোপীয় শিক্ষা,
(৩) বর্ত্তমান ইউরোপীয় রীতি-নীতি,
(৪) বর্ত্তমান ইউরোপীয় ধর্ম্মহীনতা,
(৫) বর্ত্তমান ইউরোপীয় স্বাধীনতা,
(৬) বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা,
(৭) বর্ত্তমান বাঙ্গালা চিত্রকলা,
(৮) বর্ত্তমান বাঙ্গালা সঙ্গীতকলা।

এইবারে আমরা দেখাইব যে, ইহার প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথের ঘটনা ও তত্ত্ববিষয়ক অপরিণত ধারণা-সঞ্জাত এবং জনসাধারণকে বিপথগামী করিবার নিদর্শন।

সভ্যতার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদিগের অতি-আধুনিক কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বাস্তবতঃ তাঁহারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সহিত সৌভ্রাত্র এবং

সমবেদনায় ভরপুর, কিন্তু বস্তুতঃ উহা নিতান্ত শূন্যগর্ভ এবং স্বার্থপরতা, তথা শঠতা, চৌর্য্য এবং সাধারণের প্রতি দস্যুতার ভাববিশিষ্ট ব্যতীত অপর কিছুই নহে। ইউরোপীয়গণ যে এই সকলের প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই সকল কার্য্য করেন, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে নিজেদের ডাল-রুটি উপার্জ্জনের নিমিত্তই বাধ্য হইয়া এইরূপ করিতে হয়; কেন না, ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই উহা অপ্রতুল। ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিগণের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এই মত প্রকাশ করিতেছি বলিয়াই আমরা এমন মনে করি না যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল কার্য্যের প্রতি বীতরাগ নহেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই এরূপ বিবেকহীন যে, যুদ্ধ এবং বিগ্রহের নামে নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত নহেন। ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিগণের প্রত্যেকের মন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ এমন কাহাকেও পাওয়া যাইবে, যিনি সমরবাদের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট নহেন। এইভাবে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বিশ্লেষণ করিলে ধরা পড়িবে যে, ইহা আন্তরিকতার অভাব এবং শঠতা ও সমরলিপ্সার প্রভাবে ভরপুর। আমরা পাঠকগণকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি যে, এই শ্রেণীর সভ্যতা একেবারেই গ্রহণীয় কি না এবং যাঁহারা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সভ্যতার এই প্রকার রূপের স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, অথবা আমাদের সমাজে ইহা আমদানী করিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের প্রশংসার যোগ্য কি না।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বিপক্ষে বলিলেও পাঠক মনে রাখিবেন যে, আমরা মধ্যযুগের ধর্ম্মধ্বজীরা যে কূপমণ্ডূকত্ব এবং কর্ম্মশৈথিল্যের জন্ম দান করিয়াছিলেন, তাহার স্বপক্ষে নহি। যে সভ্যতা ভারতীয় ঋষিগণের চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট, আমরা কেবল তাহারই অনুরাগী। তাঁহাদের মতে, প্রকৃত সভ্যতার চরম আদর্শ হইতেছে, সগোত্র হিসাবে সমগ্র মনুষ্যজাতির হিতসাধনেচ্ছার প্রাধান্য এবং সমর-লিপ্সা ও ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ। কি করিয়া ইহা সার্থক হইতে পারে, তাহা দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ, এখানে স্থানাভাবে উহার আলোচনা সম্ভব নহে।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রথার শিক্ষার মূলনীতি জ্ঞানার্থী হইলে দেখা যায়, মূলতঃ উহা নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) কতিপয় বর্ণ, বাক্য ও পদ মুখস্থ করণ এবং তাহাদের লিখন কৌশল অর্জ্জন, অথচ কি জন্য বর্ণসমূহ ঐরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, কি জন্য উহাদের ক্রম ঐরূপ, এক একটি বাক্যের এক এক প্রকার অর্থ কেন হয় এবং বর্ণ ও বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থের ধারণা কি ভাবে সম্ভব, তদ্বিষয়ক অজ্ঞতা। এক কথায়, অনেকগুলি বাক্য সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু তাহার বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিন্দুমাত্রও জ্ঞান অর্জ্জিত হয় না।

(২) বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্ব মুখস্থ করণ, অথচ উহাদের সত্যতা কিংবা কি ভাবে উহাদের মূল সত্য পরীক্ষা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক অজ্ঞতা।

(৩) বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা আখ্যাত কয়েকটি পদ্ধতির অনুসরণ, কিন্তু ঐ সকল পদ্ধতি সমাজ অথবা ব্যক্তির হিত অথবা সর্ব্বনাশ সাধক তদ্বিষয়ক অজ্ঞতা।

বর্ত্তমান শিক্ষাদান-প্রণালী মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে যেরূপ শিক্ষার্থীকে তাহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপলব্ধি-সম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের চেষ্টা নাই, সেইরূপ শিক্ষার্থীর মন ও বুদ্ধি বস্তুতঃ উন্নত করিবার চেষ্টাও নাই। তদুপরি আরও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ সম্বন্ধীয় সামর্থ্যের পার্থক্য বিচার না করিয়াই নির্ব্বিচারে সকল শিক্ষার্থীর স্কন্ধেই এই তথাকথিত শিক্ষার একই প্রকার পদ্ধতি ও একই শ্রেণীর পুস্তকের চাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

এই শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সংকীর্ণ বুদ্ধি, মস্তিষ্ক-স্ফীতি, বিবেকহীনতা, সম্বন্ধ-গ্রথিত অসত্যবাদিতা, তথা যুক্তি; সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং প্রকৃত সত্যানুরাগের অভাব। বিগত ৪০ বৎসর কালে পৃথিবীব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দের বাস্তব অবস্থাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবে। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই প্রকার শিক্ষার বিন্দুমাত্র সমর্থন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান কালের শিক্ষা-প্রণালীর বিপক্ষে বলিলেও আমরা স্বীকার করি যে, মধ্যযুগে বিভিন্ন ধর্ম্মধ্বজীদের চেষ্টায় যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সমর্থনেরও কোন যুক্তি

নাই। আমরা পাঠককে ভারতীয় ঋষি-পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার সন্ধান করিতে বলি। উহার সন্ধান পাইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, ইহা যেরূপ মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্ম্মধ্বজীদের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেইরূপ বর্ত্তমান জগতের আধুনিক শিক্ষা-ধুরন্ধরদের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ভারতীয় ঋষি-পরিকল্পিত শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কেবল এই শিক্ষার দ্বারাই শিশুকে প্রকৃত ভাবে নর কিংবা নারী হিসাবে গঠিত করা যায়। আমরা এই শিক্ষার সমর্থক, অপর কোন শিক্ষার নহি।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় রীতি-নীতির মূল যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহারা জীবনযাপন পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, কিন্তু তদধীনতায় ইন্দ্রিয়সামর্থ্য হ্রাস পাইতেছে, অথবা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে কি না, উহার পশ্চাতে তৎসম্বন্ধীয় বিবেচনা নাই। বিশদ করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভোজনসুখভোগার্থই যেন জীবন ধারণ করেন, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নিমিত্তই বিবাহ করেন, সাজ-সজ্জা দেখাইবার জন্য প্রেম করেন, আত্ম-বিজ্ঞাপনার্থই বিনয় প্রকাশ করেন এবং এই ভাবেই তাঁহাদের সকল আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহারই ফলে বেশ্যাবৃত্তিও আইনের প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং বিলাসভোজ্য হিসাবে বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার স্থান পাইয়াছে। অপরকে আকর্ষণ করিবার কিংবা মন-গড়া সৌন্দর্য্য বাড়াইবার ইচ্ছা লইয়াই তাঁহারা যেরূপ ব্যক্তিগত সাজসজ্জা করেন, তেমনই বাড়ীঘর-দ্বারও সেই ভাবে সাজাইয়া থাকেন—ঐ সাজসজ্জা এবং আসবাব-পত্র মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি সাধন করিতেছে কি না, তাহার বিচার করেন না। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই তলাইয়া বুঝিলে বর্ত্তমান ইউরোপের এই সকল রীতি-নীতির সমর্থন করিবেন না। রীতি-নীতির দিক্ হইতেও পাঠক যদি ভারতীয় ঋষিদিগের মতের সন্ধান করেন, তবে দেখিবেন যে, ঋষিগণ এই সব বিষয়ে এমন সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, যাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং সম্পূর্ণ রূপে বিজ্ঞানসম্মত। যে-সকল রীতি-নীতি মধ্যযুগীয় ধর্ম্মধ্বজীরা অনুসরণ করিতেন, ঋষি-প্রবর্ত্তিত রীতিনীতির সহিত তাহাদের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা গেলেও উহাদের অধিকাংশের সহিতই ইহাদের মিল নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্ম্মমতসমূহের মূলনীতিসমূহ মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, তাহারা বিজ্ঞান অপেক্ষা কয়েকটি সংস্কারের উপর অধিক গঠিত, ফলে এই সকল ধর্ম্মমত কেবল ঐ সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীদের মধ্যে সঙ্কীর্ণচিত্ততা এবং অন্ধতার সৃষ্টি করে এবং যুক্তিপ্রবণ চিত্তের উপর উহারা কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মমত-বিরোধিতার মূলে। দৃশ্যতঃ মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে ধর্ম্মমতের প্রতি উদাসীন হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞান-সম্মত ধর্ম্মের মূলনীতির সন্ধান-লাভে সমর্থ হইলে বুঝা যাইবে যে, "ধর্ম্ম" এই বাক্য-নিহিত শব্দানুযায়ী ইহার একটি বিশেষ অর্থ বর্ত্তমান। এই বাক্য যথেচ্ছ অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। বাক্যনিহিত শব্দানুযায়ী ইহার যে বিশেষ অর্থ হয়, তাহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মের অর্থ মনুষ্যদেহস্থ বুদ্ধি, মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সমান ভাবে "তেজে"র যে ক্রিয়া চলিতেছে, সেই ক্রিয়া-বিশেষ। ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার কথা অনেকে বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু "ধর্ম্ম" এই বাক্যটির অর্থ যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ধর্ম্ম ব্যতীত মানুষের চলে না। ধর্ম্মের বিধিসমূহ প্রকৃতিসঞ্জাত, স্বেচ্ছাকৃত নহে। যে ব্যক্তি "ধর্ম্ম" কি, তাহা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের বিধিসমূহ মানিয়া চলিতে পারেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ, তথা মন ও বুদ্ধি কখনও অকালে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া কিংবা "ধর্ম্ম" কি তাহা উপলব্ধি না করিতে পারিলে, কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের বিধিসমূহ মানিয়া চলিতেও পারেন, না-ও পারেন, ফলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহের সামর্থ্য, তথা বুদ্ধি ও মনের দৃঢ়তার স্থিতিকাল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার কারণ ঘটে।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ যে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উত্থাপিত সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রশংসার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি শ্রোতৃবৃন্দের কিয়দংশের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অর্থহীন। ইহারই ফলে ক্রমশঃ বিপর্য্যয়ের

পর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম কি এবং তাহার প্রাকৃতিক বিধিসমূহ কি, তৎসম্বন্ধে যতদিন না গবেষণা করা হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধীয় মনোভাব বরং ক্ষান্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান ইউরোপের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ইহা লাভের ইচ্ছায় জনসাধারণের মধ্যে কলহ এবং শাঠ্য ব্যতীত আর কিছু প্রসার লাভ করিতে পারে না। সুতরাং ইহার জন্য চেষ্টা করা কখনও সঙ্গত হইবে না।

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালার মূল সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক বাঙ্গালার উন্নতির নামে ভাষা-বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা অস্বীকারের চেষ্টা হইতেছে এবং তাহার ফলে, পদ ও বাক্য ব্যবহারের এবং বাক্যের বানানের যাহা বিধিবিরুদ্ধ, তাহাই বিধিবদ্ধ হইতে চলিয়াছে। পরিণাম দাঁড়াইতেছে, রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গী-অনুগামী আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা ভাব-প্রকাশের সহায়ক না হইয়া ভাব-গোপনের সহায়ক হইতেছে।

তথাপি কি বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার গঠন প্রকৃত ভাষার উন্নতির সহায়তা করিবে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

আধুনিক চিত্রকলার প্রশংসা কথা শুনিতে মন্দ না লাগিতে পারে, কিন্তু চিত্রকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক চিত্রকলা প্রশংসা অপেক্ষা অধিকতর নিন্দার যোগ্য। চিত্রকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি হইতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল চিত্রকলারই উদ্দেশ্য শেষতঃ শিক্ষাবিষয়ক এবং মন যদি বহিরঙ্গের তথাকথিত সৌন্দর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হয়, অথচ অন্তঃসৌন্দর্য্যের সন্ধানপ্রয়াসী না হয়, তবে প্রকৃত শিক্ষা অসম্ভব হয়। চিত্রকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত তিন প্রকার:—

(১) বহিরঙ্গের তথাকথিত সৌন্দর্য্য উপভোগের ভাব-হ্রাসের সহায়তা সাধন;

(২) অন্তঃসৌন্দর্য্যের সন্ধানী ভাব-গঠনের সহায়তা;

(৩) অন্তরস্থ কারণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের, অর্থাৎ অব্যক্ত কি ভাবে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতেছে, তাহার জ্ঞানের সহায়তা।

এই মানদণ্ডের সাহায্যে বর্ত্তমান কালের কোন চিত্রকলা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের প্রায় কোনটিই উপরের তিনটি উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়তা করে না, বরঞ্চ তাহারা বিপরীত উদ্দেশ্য সাধন করে। বস্তুতঃ, যতদিন পর্য্যন্ত না অব্যক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকৃত অনুসন্ধান সম্ভব হয়, ততদিন পর্য্যন্ত হিতকারী চিত্রকলার গঠন সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় এতৎসম্বন্ধীয় কথা বলা নিরর্থক। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ যে তথাপি বর্ত্তমান চিত্রকলার আধুনিক ভঙ্গীর গৌরবে গৌরবান্বিত, তাহার কারণ হইতেছে, তিনি চিত্রকলা সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও জানেন না।

আমাদের শেষ বক্তব্য হইতেছে, আধুনিক কালের সঙ্গীত বিষয়ে। আধুনিক কালের সঙ্গীত কোনও ব্যক্তি কি সমাজের পক্ষে হিতসাধক হইতে পারে কি না, তাহা জানিবার জন্য আমাদিগকে প্রথমতঃ সঙ্গীতের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তাহা জানিতে হইবে। ইহারও উদ্দেশ্য শিক্ষা এবং ইহার উদ্দেশ্যও চিত্রকলার উদ্দেশ্যানুরূপ, যথা:—

(১) বহিরঙ্গের তথাকথিত সুমিষ্ট শব্দলহরী উপভোগের বাসনাহ্রাসের সহায়তা সাধন।

(২) শব্দোচ্চারণসামর্থ্যের অন্তরস্থিত কারণসমূহের সন্ধানলিপ্সার সহায়তা সাধন।

(৩) শব্দোচ্চারণসামর্থ্যের অন্তরস্থিত কারণ উপলব্ধির সহায়তা সাধন।

বর্ত্তমান সঙ্গীতের সহিত যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারাই বিদিত আছেন যে, এই সঙ্গীত এই সকল উদ্দেশ্যের কোনটিই পূরণ করিতে পারে না। বরং বর্ত্তমান সঙ্গীত ইন্দ্রিয়-সুখ-উপভোগের ভাব-জাগরণের সহায়তা সাধন করে। সুতরাং বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান সঙ্গীত, ব্যক্তি, তথা সমাজের হিত অপেক্ষা অধিক অহিত সাধন করিতেছে। বাঙ্গালার পক্ষে ইহা লজ্জার বিষয় যে, "মহাজাতিসদন"এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনার্থ ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি মিলিল না।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বলিতে

হইলে দাঁড়ায় এই যে, বর্ত্তমান জগৎ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির পথে নহে—সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছে এবং যে কোন দিক্ হইতেই দেখা যাউক না কেন, ইহার নিন্দা করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। এই জন্যই বিগত কয়েক বৎসর কাল ধরিয়া সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা সমাজবক্ষে ঘুণ ধরাইয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে আমাদের সম্মুখেই ইহার শেষ-বিচারের দিন সমাগত। যদি এখনও জনসাধারণ এই কথা না বুঝিতে চাহে, তবে নিষ্কৃতি-লাভের যোগ্যতা অপেক্ষাও তাহাদের পাপ অধিক, ইহাই বুঝিতে হইবে।

উপসংহারে আমরা পাঠকবৃন্দকে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ, মিঃ গান্ধী, স্যর পি. সি. রায় এবং ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি ব্যক্তিবৃন্দের যিনি যাহাই বলুন না কেন, তাহা উপেক্ষা করিতে বলি। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই, কিন্তু তাঁহাদের উক্তিসমূহ ও কার্য্যাবলী হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব গর্হিতভাবে বিপথগামী করিতেছেন। প্রশংসা নহে, সর্ব্বথা তাঁহারা নিন্দার যোগ্য। জনসাধারণ কি এখনও তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ লাভের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবে না? আমরা বেকার ও অনাহার সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন হইতে অনুরোধ করিতেছি।*

ইহা কি বৃটিশ রাজনীতিবেত্তৃত্ব?

১২ই আগষ্ট হইতে ২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যায় "ষ্টেট্‌সম্যান"-পত্রিকা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর বিবিধ দুষ্কার্য্যের সম্পর্কে মোট ছয়টি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকটিই সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান লাভ করিয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে :—

১২ই আগষ্ট তারিখে—দি ফরোয়ার্ড ব্লক (The Forward Bloc)

১৩ই আগষ্ট তারিখে—স্পষ্টতর চিন্তাধারার প্রয়োজন (Clearer Thinking Needed)

১৪ই আগষ্ট তারিখে—চৌরাস্তার মোড়ে (At Cross Roads

১৬ই আগষ্ট তারিখে—ইতিহাসের সতর্ক-বাণী (A Warning From History)

১৯শে আগষ্ট তারিখে—বিপ্লবাত্মক কার্য্যপন্থা (Revolutionary Programme)

২২শে আগষ্ট তারিখে—দুইটি আদর্শ (Two Ideals)

আমাদের মতে, অপরাপর উদ্দেশ্যের সহিত এই সকল সন্দর্ভে নিম্নলিখিত ইঙ্গিতসমূহ করা হইয়াছে :—

(১) মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু বিপ্লবী মনোভাববিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি জনসাধারণের বিশ্বাসের যোগ্য নহেন। তাঁহার দল সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) মিঃ গান্ধী এবং কংগ্রেসের হাই-কম্যাণ্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সুস্থচিত্ত ব্যক্তি এবং তাঁহারা দেশবাসীর পরিচালনার যোগ্য। বর্ত্তমানে কংগ্রেসপন্থীয় ব্যক্তিরাও যেন সুবিবেচক হইয়াছেন।

(৩) বাঙ্গলার মহাজাতিসদন-এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনকালে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বমানবীয় ঐক্যের কথা বলিয়াছেন এবং এই জন্য তিনি নাবিকদের শ্রদ্ধাভাজন।

(৪) পৃথিবীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় সর্ব্বমানবীয় ঐক্যই ভারতবাসীদের চিন্তা ও কার্য্যের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

"ষ্টেট্‌সম্যান"-পত্রিকায় যখন মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়, তখন তাহার সঙ্গতি আমরা বুঝিতে পারি। যখন ইহাতে সর্ব্বব্যাপক ঐক্যের গুরুত্বের আলোচনা দেখি, তাহারও সঙ্গতি আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু যখন ইহার সম্পাদক মিঃ গান্ধী অথবা কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড সংশ্লিষ্ট অপরাপর সদস্যের এবং মিঃ গান্ধীর অনুচরবৃন্দের স্থিরচিত্তত্বের উল্লেখ করেন, তখন আমরা ইহার বক্তব্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ডক্টর রবীন্দ্রনাথই বা কি জন্য সর্ব্বব্যাপক উন্নতির

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ২৮শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজীর অনুবাদ।

কথা বলিয়াছেন বলিয়াই সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন পদবী লাভ করিতে পাবেন,—যদ্যপি দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কার্য্যপালনে রত থাকা কালীন কতিপয় নির্দ্দোষ ব্রিটিশ রাজ-কর্ম্মচারীর হত্যার পাপে লিপ্ত ব্যক্তিবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা করিতে তাঁহার বাধে না —ইহাও আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই সমস্তই আমাদের নিকট হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায়, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বব্যাপক ঐক্যই যদি ভারতবাসীর মূলমন্ত্র হওয়া বিধেয় হয়, তবে "অসহযোগ", "আইনঅমান্য" এবং "স্বাধীনতা" আন্দোলনের মন্ত্রদাতা ও প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ কি করিয়া কোনক্রমেই ভারতবাসী জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন বিবেচিত হইতে পারেন, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহা বুঝিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না যে, যতদিন "অসহযোগ", অথবা "আইন-অমান্য," অথবা "স্বাধীনতা"র মনোভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন দেশের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে না, কেন না, প্রকৃতির নিয়মে সকল দেশেই সকল কালে ঐ সকল ভাব-বিরোধী বহু ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কয়েকটি সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক দেশে, দেশের বর্ত্তমান সরকারের প্রতি নির্ভরশীল, বশ্য এবং সহযোগিতার জন্য উন্মুখ বহু ব্যক্তি থাকিতে বাধ্য। যদি মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ চিরকালের জন্য উপরি-লিখিত আন্দোলনের মনোভাব পরিহার করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইত, আমরা "ষ্টেট্সম্যান"-সম্পাদকের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিতাম যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে এবং তাঁহারা চিত্তস্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু মিঃ গান্ধী অথবা তাঁহার কোন অনুচরই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের নজরে পড়ে নাই। বস্তুতঃ, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, স্বকীয় দল বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের গদীতে সাময়িক ভাবে আসীন হইয়াছে বলিয়াই মিঃ গান্ধী বর্ত্তমান অবস্থা সরকার-বিরোধী তৎ-প্রবর্ত্তিত কোন আন্দোলনের উপযোগী নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মিঃ গান্ধী যদি দল-প্রাধান্য বজায় রাখিতে না পারেন কিংবা রাষ্ট্রশক্তি-চালনার ক্ষমতা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়, তবে মিঃ গান্ধী আবার তাঁহার সেই সাধের আন্দোলনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন দেখিলে আমরা বিস্মিত হইব না। আমরা ক্ষণেকের জন্যও ভাবিতে পারি না যে, "ষ্টেট্সম্যান"-পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ এই সকল কথা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আমরা মনে করিতে বাধ্য যে, যদ্যপি বাহিরে "ষ্টেটস্ম্যান" সর্ব্বব্যাপক ঐক্যপ্রতিষ্ঠার পরামর্শ দান করিতেছেন, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা যে-দল দেশের মধ্যে নিশ্চিত তীব্র অনৈক্যের সৃষ্টি করিবে, তাহারই সমর্থক। অর্থাৎ, ভারতে যে-নীতির প্রবর্ত্তনের দায় কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা প্রাদেশিক সরকার সমূহের কাহারও উপর ন্যস্ত করা যায় না, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মারফৎ সাগরপারস্থ ব্রিটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ যাহার নিমিত্ত দায়ী, "ষ্টেট্সম্যান"-পত্রিকা সেই "ভেদনীতি"র সমর্থক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু ভারতে এই নির্ব্বোধ "ভেদনীতি" প্রবর্ত্তনের মূলে যে-সকল রাজনৈতিক ধুরন্ধর বর্ত্তমান, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান্, কেন না, তাঁহারাই জগদ্বাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেবার দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ দেশকে কি ভাবে সামান্য একটি বণিক জাতি জয় করিয়া লইতে পারে। পরবর্ত্তী যুগের বালকোপম ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ পলাশীর যুদ্ধে ভারত-জয়ের কাহিনীর কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদেরই রচিত ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হইবে যে, ভারতবর্ষের পরাজয় অস্ত্রবল-সাহায্যে সংঘটিত হয় নাই, সংঘটিত হইয়াছে ব্রিটিশ বণিক কর্ত্তৃক ভারতবাসীদের একটি প্রধানাংশের হৃদয়-জয়ের সাহায্যে,— তাঁহাদের আপদ্‌কালে ব্রিটিশগণ বিবিধ ভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই। অতঃপর অধিকার সম্পূর্ণ করিবার কার্য্যে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত-বাসীদের হৃদয়ের উপর ব্রিটিশরা প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এবং ব্রিটিশরা এতদ্দেশবাসীর এই ভাবে সেবাকার্য্যের দ্বারা হৃদয়-জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে, বর্ত্তমান যুগের ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণের প্রতি বর্ত্তমান ভারতবাসীদের, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারত-

বাসীদের যে আন্তরিক সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা নাই। বিভিন্ন নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতেই ইহা সুস্পষ্ট—ব্রিটিশপক্ষের কোন কথাই ভারতবাসী ভোটারগণের অধিকাংশ শুনিতে চাহেন না এবং ব্রিটিশ-বিরোধী সকল কিছুই তাঁহারা প্রায়শঃ সমর্থন করেন।

আমাদের মত এই যে, বর্ত্তমান ব্রিটিশগণের পূর্ব্বপুরুষরা এ দেশে যে-সকল কার্য্যের প্রতি মমত্ব বোধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যকার ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ সেই সকল কার্য্যে ব্রতী হইলে আজিও অধিকাংশ ভারতবাসীর তাঁহারা আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন। আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, যদি ব্রিটিশগণ ভারতবাসী শতকরা নিরানব্বই জনের অন্তরাত্মা যে বেকার ও অনাহার-সমস্যার জন্য বিশুষ্কপ্রায়, সেই সমস্যার সমাধান জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহারা ভারতবাসীর হৃদয়ে আজিও সুদৃঢ় আসনলাভে সমর্থ হইবেন এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চিরকালের জন্য স্থায়ী হইবে।

আমরা জানি যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ এবং বৈজ্ঞানিকবৃন্দ যে-উপায়ে ভারতবর্ষের, তথা ইংলণ্ডের জনসাধারণের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এই নিমিত্তই তাঁহাদের ইচ্ছা থাকিলেও ইহা করিতে তাঁহারা অসমর্থ। তাঁহাদের সর্ব্বাধিক ভ্রান্তি এইখানে যে, মিথ্যা মর্য্যাদা-বোধের অধীন হইয়া তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া তাঁহাদের এই অসামর্থ্যের বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন না এবং যাঁহারা ভারতবাসী ও ব্রিটিশ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত ও অকৃত্রিম সেবক, তাঁহাদের সাহায্য বাঞ্ছা করিতে পারেন না—কেবল মনুষ্য-সমাজের কলঙ্কস্বরূপ যে-সকল প্রতারক ব্যক্তি দল বাঁধিতে পারে, সেই সকল দলের—কখনও ইহাদের, কখনও উহাদের সমর্থন করেন।

হইতে পারে, বর্ত্তমান যুগের ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ "ভেদনীতি"র দ্বারা এতাবৎ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, ইহা সত্য, কিন্তু যাঁহারা অব্যক্ত হইতে কি ভাবে ব্যক্তের বিকাশ সাধিত হয়, তাহা দেখিবার অধিকারী, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, সে-সময়ের বিলম্ব নাই, যখন সর্ব্বব্যাপক অনাহার ভারতবাসী ও ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে এমন আন্দোলনের সূত্রপাত করিবে, যাহাতে জনসাধারণই এই রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের জারিজুরি ধরিয়া ফেলিবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে সর্ব্বব্যাপক বিশৃংখলা।

আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমরা ইহার অনুরাগী। এই জন্যই আমরা বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে এবং "ষ্টেট্‌সম্যান"-পত্রিকার অন্ত সম্পাদকীয় বিভাগকে সতর্ক করিতেছি যে, সময় থাকিতে তাঁহারা সাবধানতা অবলম্বন করুন। আমরা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ সত্যভাষী হইতে বলি—ইহাই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নীতি এবং বর্ত্তমানের ঐতিহ্য; অন্ততঃ ভারতবাসী তাঁহাদের সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণাই পোষণ করেন। আমরা চাই তাঁহারা যেন কুত্রাপি সত্যকে অসত্য-মিশ্রিত না করেন। তাঁহারা যদি এই নীতির প্রতি অবহিত থাকেন, তবে তাঁহারা জন-সাধারণের অনুরাগলাভে সমর্থ হইবেন। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদি তাঁহারা রূঢ় সত্য বলিবার নীতি অবলম্বন করেন, তবে তাঁহারা ভারতের প্রত্যেকটী রাষ্ট্রনীতির পাণ্ডাকে—গান্ধীই হউন, আর সুভাষই হউন, আর রবীন্দ্রনাথই হউন—অভিশাপ দিতে বাধ্য হইবেন।

সত্যভাষণে এই দ্বিধা কি কাপুরুষোচিত এবং অব্রিটিশোচিত নহে? *

বাঙ্গালা সরকারের ভ্রান্তির নিদর্শন

বাঙ্গালা সরকারের পূর্ত্ত ও সেচ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর নদীয়া ও উত্তরবঙ্গের 'নদীসমূহের সফর' আমরা মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করিয়াছি। সফর শেষ করিয়া রাণাঘাট আসিয়া তিনি একটি বিবৃতি দান করেন।

সেই বিবৃতির উল্লেখযোগ্য উক্তিসমূহ নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) অনাবৃষ্টি কিংবা বন্যা, যাহাই হউক, তাঁহার বিভাগের কর্ত্তব্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

* "দি-উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ২৪শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভের অনুবাদ।

(২) গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নদীসমূহের সংস্কার বিষয়ে কোন মনোযোগ দান করা হয় নাই এবং জেলাসমূহের নদী ও খাল প্রভৃতির দুরবস্থা এই পঞ্চাশ বৎসরের আলস্য এবং অকর্ম্মণ্যতা সঞ্জাত।

(৩) সরকার এখন জন-সাধারণের, সুতরাং তাঁহারা এই ত্রুটি কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন।

(৪) গত তিন বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশের অধিবাসিগণ যে-বন্যাপ্রকোপ ভোগ করিতেছেন, তাহা ভবিষ্যতে বার্ষিক ব্যাপারে পরিণত হইবে। জন-সাধারণকে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

(৫) পূর্ব্ববঙ্গে যে-শ্রেণীর শস্যোৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে, জলও যত উঠে, তাহারাও তত বাড়ে, চাষীদিগকে সেই শ্রেণীর শস্য রোপণ করিতে হইবে।

(৬) জন-সাধারণের বাস-গৃহের দাওয়ার উচ্চতা বাড়াইতে হইবে।

(৭) বিশেষজ্ঞেরা এই প্রদেশের জলসেচ-বিষয়ক সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন।

(৮) হাজা-মজা নদী ও খাল-বিল খনন করিলে বন্যার তীব্রতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার খাল ও নদীসমূহের বুজিয়া যাওয়ার প্রকৃত কারণ হইতেছে বিভিন্ন প্রদেশ—বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহার—কর্ত্তৃক সেচোদ্দেশ্যে বৃহৎ খাল খননে গঙ্গানদীর সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ। এই সকল খাল ঐ সকল প্রদেশকে উর্ব্বরা করিয়াছে।

(৯) এই সকল প্রদেশের (৮ম দফায় উল্লিখিত) সহিত তাঁহার বিভাগের পত্র আদান-প্রদান চলিতেছে এবং তাঁহারা বাঙ্গালার খাল ও নদীসমূহের শুষ্কতাপ্রাপ্তি-নিবারণের জন্য পরস্পর একটি বুঝা-পড়ার চেষ্টা করিতেছেন।

(১০) পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল সেচ-খাল খননের উপকারিতা বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাহাদের যথেষ্ট হিত সাধিত হইয়াছে।

(১১) পূর্ত্ত-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কিং বিস্তৃত ভাবে সমগ্র প্রদেশের জন্য ক্ষুদ্র রাস্তা-পুষ্ট প্রশস্ত রাস্তা-নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ছাব্বিশটি জিলাতেই তদনুযায়ী কার্য্য সূচিত হইয়াছে।

(১২) এই সকল (১১শ দফায় কথিত) রাস্তা যখন সম্পূর্ণ হইবে, তখন যাতায়াত-ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইবে এবং প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে ও দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ে বিলম্ব হইবে না। ফলে সমগ্র প্রদেশের কল্যাণ হইবে।

মহারাজার বিবৃতির এই দফা কয়টী মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের অধিকাংশই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রতিধ্বনিমূলক এবং ভ্রান্ত ধারণা-পরিপূর্ণ। আমাদের বক্তব্যের অর্থ পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

মহারাজার বিবৃতির প্রথম দফায় বলা হইয়াছে যে, "অনাবৃষ্টি কিংবা বন্যা যাহাই হউক, তাঁহার বিভাগের কর্ত্তব্য হইতেছে প্রকৃতির বিপক্ষে যুদ্ধ।" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, মহারাজার বিভাগ যদি বন্যা কিংবা অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য সচেষ্ট হন, তবে তাঁহাদিগকে প্রথমে "প্রকৃতি" কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার রীতিনীতি পরিজ্ঞাত হইতে হইবে এবং এই সকল রীতিনীতিকে লঙ্ঘন না করিয়া উহাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক বন্যা ও অনাবৃষ্টি নিবারণ-ব্যবস্থায় অগ্রসর হইতে হইবে। কার্য্য ও তাহার ফলের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহার পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যে-কোন কার্য্যের পরিণাম প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অবসাদ এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে বিফলতা; আবার প্রকৃতির রীতিনীতির সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষাপূর্ব্বক কোন কার্য্য চালিত হইলে দেখা যাইবে যে, তাহা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে চলিতেছে এবং তাহা সফল হইয়াছে। "প্রকৃতি" কি, তাহা একবার সযত্নে জানিয়া লইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, দৃশ্য জগতের প্রত্যেকটি ঘটনার অভ্যন্তরে যেরূপ "প্রকৃতির কার্য্য" বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ "বিকৃতির কার্য্য"ও বিদ্যমান। ইহাও দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকটি জীব যে বর্দ্ধিত এবং বিকাশ

প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা "প্রকৃতির কার্য্য" বশতঃ এবং যেখানে অকালে হ্রাস কিংবা মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, সেখানে "বিকৃতির কার্য্য" বর্ত্তমান। প্রত্যেক জীবের মধ্যস্থ প্রকৃতি ও বিকৃতির কার্য্যের পার্থক্য বুঝিয়া লওয়া বহু অধ্যয়ন ও উপলব্ধিসাপেক্ষ। এই বিষয়ক অজ্ঞতার নিমিত্তই বর্ত্তমান বিজ্ঞান সূচনাবধি সমাজ-সংগঠনে ক্রমাগত বিপর্য্যয় উপস্থিত করিতেছে। উল্লিখিত অধ্যয়ন ও উপলব্ধি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলে স্পষ্ট হইবে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকবৃন্দ মস্তিষ্কহীন, দাম্ভিক এবং বন্যা ও অনাবৃষ্টির নিবারণ বিষয়ে সামান্য ভাবে কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশ্য থাকিলেও এই বৈজ্ঞানিকবৃন্দকে—তাঁহারা ইঞ্জিনীয়ার কিংবা বিশেষজ্ঞ যে নামেই অভিহিত হউন না কেন—নরখাদক জন্তু হিসাবে লৌহ-গরাদবেষ্টিত কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। অতঃপর প্রকৃতি-বিরোধী ব্যবস্থা পরিহার করিয়া যে ব্যবস্থা প্রকৃতি-সঙ্গত তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

বিবৃতির দ্বিতীয় দফায় মহারাজা বলিয়াছেন যে, "গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নদীসমূহের সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় নাই, ইত্যাদি।" ইহা যথার্থ নহে। এই বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, গত পাঁচ হাজার বৎসর মধ্যে পৃথিবীর নদীসমূহের সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় নাই এবং পাঁচ শত বৎসর হইতে নদীসমূহ যাহাতে বিশেষ অনিষ্টসাধক হইয়া উঠে, তদ্রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সকল অনিষ্টজনক কার্য্য গত একশত বৎসর হইতে বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জীনিয়ারগণের কল্যাণে চরমে উঠিয়াছে। কোন দেশের নদীসম্পর্কিত ইষ্টই বা কি অনিষ্টই বা কি, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই জনসাধারণের চক্ষে আমাদের উক্তির সত্যতা উদ্ভাসিত হইবে।

বিবৃতির তৃতীয় দফায় মহারাজা বলিয়াছেন, "এখন সরকার জনসাধারণের, সুতরাং তাঁহারা এই ত্রুটি কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন।" বাস্তব অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা স্তোক-বাক্য মাত্র। আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটী দেশের সরকার অনাহারক্লিষ্ট জন-সাধারণকে সান্ত্বনাদানের জন্য এই প্রকার চেষ্টার কথা বলিয়া থাকেন, অথচ ইঁহাদের কেহই আন্তরি ভাবে এই কার্য্যের জন্য সচেষ্ট হন না। আমরা বলিতেছি এই জন্য যে, আমরা জানি নদীবিষয়ক সম নিবারণার্থ কোন প্রকার আন্তরিক চেষ্টা করা হই মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে ইহার ফল নিশ্চিত ঘটিতে বা এবং সমগ্র দেশ পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে আ স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ হইতে বাধ্য। অর্থাৎ, আমাদের ম কথা হইতেছে এই যে, মহারাজা যে-আসনে উপবিষ্ট আছে সেই আসনে সমাসীন কোন ব্যক্তি যদি ভারতীয় নদীসমূহে সমস্যা-সমাধানের নিমিত্ত আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হইতে তবে এই সময়ের মধ্যে ভারতের অনাহার ও বেকার-সমস্যা অন্ততঃ আংশিক সমাধানও সম্ভব হইত। হইতে পা যে, মহারাজার নদী-সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা আছে, এ কি ইহাও হয়তো সত্য যে, তজ্জন্য, তিনি তাঁহার ইচ্ছাপূরণ আজ এই ব্যবস্থা এবং কাল সেই ব্যবস্থার প্রতি ধাবি হইতেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি যথাযথ অধ্যয়নে দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে যে-ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব, তাহা জন্য চেষ্টিত হইতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা নদী-সমস্যার সমাধানে প্রকৃত প্রস্তাবে সচেষ্ট হইয়াছে ইহা বলা চলে না। হইতে পারে যে, তাঁহার চীফ ইঞ্জীনিয়া তাঁহার পাঞ্জাবী 'দক্ষ', এবং ডক্টর মেঘনাদ সাহার সবজান্তা বিশেষজ্ঞ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনীয়ারি পরিকল্পনার কথা উঠাইয়াছেন এবং মহারাজকে বুঝি দিয়াছেন যে, নদী-সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকৃত চে হইতেছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখাইয়া দিবে যে, বিশেষ নামধারী ঐ-সকল ব্যক্তি মনুষ্য-সমাজের পক্ষে স্থায়ীভা হিতসাধক কোন কার্য্যের কিছু সম্বন্ধেই কোন জ্ঞা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। শাসনকার্য্য-পরিকল্পনার প তাঁহাদের কেহ কেহ উপযোগী হইতে পারেন, কিংবা মনু হিসাবেও তাঁহারা ভাল হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ হিতকারী কার্য্যের যোগ্যত অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার বর্ত্তমান চী ইঞ্জীনিয়ার, ডক্টর এন. কে. বসু এবং ডক্টর মেঘনা সাহার উক্তিসমূহ এবং রচনাদি হইতে আমরা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহাদে

মধ্যে কাহারও উপর যদি নদীসমূহের সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদের কোনরূপে নির্ভর করিতে হয়, তবে তাঁহারা নদীসমূহে অধিকতর বিপর্য্যয় বাধাইয়া তুলিবেন এবং প্রদেশের অবস্থা নিকৃষ্টতর হইয়া পড়িবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের উক্তি এবং রচনাদি হইতে আমরা প্রমাণ করিব যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা ঠিক।

নদী-সমস্যার সমাধান বিষয়ে কিছু করিতে যদি মহারাজা উৎসুক হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে এবং তাঁহার মন্ত্রি-মণ্ডলীর সতীর্থগণকে প্রাদেশিক গবর্ণর, তথা বড়লাট বাহাদুরের নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিতে হইবে যে, যেমন তাঁহাদের কেহই, তেমনই কোন ভারতবাসীই—তাঁহাদিগকে নোট ছাপাইবার অধিকার না দিলে নদী-সমস্যার, সুতরাং দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের উপযোগী কোন পরিকল্পনা সন্ধানে কৃতকার্য্য হইতেছেন না। তাঁহাদিগকে উঁহাদের (অর্থাৎ গবর্ণর ও ভাইসরয়ের) নিকট হইতে এমন কার্য্য-পরিকল্পনা প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকটি ভারতবাসী, তথা ব্রিটিশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রাজ-প্রতিনিধিবৃন্দ যেন তাঁহাদের রীতি অনুযায়ী বিলম্বিত কার্য্যপ্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ না করেন।

প্রথম সোপান হিসাবে মহারাজা যদি এই ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, এই বিষয় সম্পর্কে দেশবাসী সকলে অনতিবিলম্বে মিলিত হইয়াছেন এবং সাগর-পারস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি-ধুরন্ধরগণকে—তাঁহারাই প্রধানতঃ মনুষ্য-জাতির বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল—হয় একটি সবল ও সাধ্য কার্য্য-পরিকল্পনা দাখিল করিতে হইবে, কিংবা নোট ছাপাইবার সম্পূর্ণ অধিকার-সহ ভারতবাসীদিগের উপর ইহার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভারতবাসী, তথা ব্রিটিশজাতির সর্ব্ব-ব্যাপক দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান-পন্থা-বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র ভারতের নদীসমূহের সমস্যার সমাধান ব্যতিরেকে ইহার সমাধান কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। আরও দেখা যাইবে যে, সমগ্র ভারতকে বাদ দিয়া কেবল বাঙ্গালার নদী-সমস্যার সমাধানের কথা বলা চিন্তালেশ-হীনতার পরিচায়ক এবং ইহা নিতান্ত ছেঁদো-কথা। আমাদের মত হইতেছে যে, সাগরপারস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ অনেক দিক্ হইতেই ভাল লোক, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বব্যাপক দারিদ্র্য-সমস্যা, তথা ভারতের নদী-সমস্যার সমাধান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই সমাধান-পন্থার জ্ঞান দূরে থাক, তাঁহারা ভারতের নদী-সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। বস্তুতঃও দেখা যায় যে, তাঁহারা এই সমাধান-পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ তো বটেই, উপরন্তু তাঁহাদের বিজ্ঞান যে, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম কার্য্যোদ্দেশ্য হইবে, সাগর পারস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাবৃন্দের সর্ব্বপ্রধান সমস্যার সমাধান পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই উদ্দেশ্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে অবশিষ্টাংশ আপনা হইতেই কার্য্যকরী হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে, সমগ্র ভারতের নদী-সমস্যার সমাধান বাদ দিয়া বাঙ্গালার নদী-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। যদি এই বিষয়ের কারণ সম্বন্ধে কাহারও জানিবার ঔৎসুক্য থাকে, তবে তাঁহাকে আমরা সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি। সমগ্র ভারতের নদী-সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র পন্থা হইতেছে, নদী-স্রোতকে অব্যাহত প্রবাহিত হইতে দেওয়া এবং নদীগর্ভে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ না করা। রাস্তার প্রসার (যথা রেলরাস্তা, মোটরকারের রাস্তা, এবং গো-যান চলিবার রাস্তা), তথা সেচের জন্য বাঁধ, ব্রিজ এবং পাহাড়ের উপর শহর-নির্ম্মাণ প্রভৃতিও সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। এই সকল প্রস্তাবের কথা শুনিয়া অনেকে হয় ত শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাঁহাদিগকে এই পন্থায় অগ্রসর হইতেই হইবে। তাঁহাদিগের প্রাণ লইয়া বাঁচিতে হইলে এই সকল বিলাস-বাহুল্য পরিহার করিতেই হইবে—দুইটির মধ্যে একটি গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করিতে হইবে। যদি তাঁহারা প্রাণ-ধারণের জন্য ব্যগ্র না থাকেন, তবে রাস্তার বিস্তার এবং শৈলাবাস বাড়াইয়া চলুন। আর যদি প্রাণধারণে ব্যগ্র থাকেন, তবে এই সকল বিষয়ে বিস্তারের বাধা, যে উপায়ে সম্ভব, উপস্থিত করিতে হইবে।

তথাকথিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ ইহা ছাড়া আরও অনেক পন্থার কথা উঠাইতে পারেন, কিন্তু জন-সাধারণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সকল বিশেষজ্ঞই তাঁহাদিগকে

বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং অন্য কোন উপায়েই স্বদেশের দারিদ্র্য-সমস্যা, তথা নদী-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। একবার যদি জন-সাধারণ কৃতসঙ্কল্প হইতে পারেন যে, নদীস্রোতে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না, কিংবা রাস্তার বিস্তার, সেচের জন্য বাঁধ ও শৈলাবাস নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইবে না, তবে নদীস্রোত প্রবল হইয়া কতিপয় বৎসর কালের মধ্যে ব্রিজ, নদীকূলে নির্ম্মিত শহর এবং রাস্তা উড়াইয়া দিবে। বর্ত্তমানে যে-প্রকার যাতায়াত ও আদানপ্রদান-ব্যবস্থা রহিয়াছে, ইহার ফলে তাহাতে বাধা উপস্থিত হইবে, এবং বৎসর দুই কালের জন্য অনেক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সাময়িক ক্ষতি উপস্থিত হইবে, তথা জনসাধারণকে যাতায়াত ও আদান-প্রদানের কার্য্যেও কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহা ষ্টিম লঞ্চ ও মোটরবোটের সহায়তায় সাময়িক ব্যবস্থা দ্বারাই দূর হইতে পারে। যে-সকল সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, সরকার ইচ্ছা করিলেই আরও নোট ছাপাইয়া সহজেই তাঁহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিতে পারিবেন। অনেক চাষীর শস্যের ক্ষতি হইতে পারে এবং তজ্জন্য শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদেরও সাময়িক ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু সরকার ইঁহাদিগেরও ক্ষতি পূরণ করিতে পারেন। দেখা যাইবে যে, এই ভাবে যানবাহন-ব্যবস্থার এবং ক্ষতিপূরণ-নিমিত্ত সরকারের যাহা ব্যয় করিতে হইবে, তাহা বর্ত্তমানে সরকার সাহায্য-ব্যবস্থায় তিন বৎসর কালের মধ্যে যে পরিমাণ ব্যয় করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা অধিক হইবে না। কিন্তু, এই ভাবে তিন বৎসর কালের জন্য সমগ্র নদীসমূহের স্রোত অব্যাহত রাখিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান কালের সর্ব্বব্যাপী বন্যা অতীতের ইতিহাস হইয়া পড়িয়াছে এবং জমি তাহার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। যদি একবার ভারতের জমি তাহার স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরিয়া পায়, তবে তাহার ফলে এমন প্রচুর শস্যোৎপাদন সম্ভব হইবে যে, কেবল ভারতই অবশিষ্ট পৃথিবীর কাঁচামাল সরবরাহ করিতে পারিবে। অতঃপর, যদি দেশমধ্যে যথাযথ দ্রব্য-বিনিময়-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা যায়, তবে অবশিষ্ট পৃথিবীকে নামমাত্র মূল্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিলেও ভারতের সমৃদ্ধি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। যান-বাহন-ব্যবস্থাতেও কোন অতিরিক্ত বেগ সহ্য করিতে হইবে না, কেন না সমগ্র নদীতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্রোত থাকিবে এবং বর্ত্তমানে স্থলের উপর দিয়া যান-বাহনের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে জলপথে ঐ ব্যবস্থা অতি সহজেই করা সম্ভব হইবে। কেবল ইহাই নহে, বৃষ্টিপাতের অনিয়ম এবং দূষিত বায়ুর প্রাধান্যও অতীতের ঘটনা হইয়া পড়িবে, কেন না, জল ও স্থল উভয়ই সর্ব্বদা স্বাস্থ্যপ্রদ ভাবে সিক্ত থাকিয়া মেঘ গঠন করিতে পারিবে, তথা বায়ুতে ইষ্টসাধক বাষ্প সঞ্চার করিয়া ব্যাধির জীবাণু নষ্ট করিতে পারিবে।

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, নদীসমস্যা, তথা মনুষ্য-জাতির দারিদ্র্য-সমস্যার একমাত্র সমাধান-পন্থা ইহাই এবং এতদ্ব্যতীত আর সকল পন্থাই বিফল হইবে। আমরা এত জোরের সহিত এই কথা বলিতেছি এই জন্য যে, ভারতীয় ঋষিগণ অথর্ব্ববেদে মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রকার দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং সকল সম্ভবযোগ্য পন্থার বিচার করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সাহায্য-গ্রহণের পন্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিয়াছেন। মহারাজা এই পন্থানুসরণ করিবেন, ইহা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে, তিনি জনসাধারণকে স্তোক-বাক্য দিতেছেন।

বিবৃতির চতুর্থ দফায় মহারাজা বলিয়াছেন, "গত তিন বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশের অধিবাসিগণ যে বন্যার প্রকোপ ভোগ করিতেছেন, তাহা ভবিষ্যতে বার্ষিক ব্যাপারে পরিণত হইবে। জনসাধারণকে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।"

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, মহারাজার তৃতীয় দফার আলোচনায় আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, অনতি-বিলম্বে তাহা ব্যবস্থিত না হইলে, বন্যার প্রকোপ যে কেবল বার্ষিক ব্যাপারে পরিণত হইবে, তাহা নহে, উহার তীব্রতাও অঙ্কশাস্ত্রের 'সমান্তর শ্রেণী (arithmetical progression)' অনুযায়ী প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহা কেবল দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রাণ লইয়াই ক্ষান্ত হইবে না, শেষ পর্য্যন্ত মহারাজা, রাজা, মন্ত্রী, নাইট-উপাধি বিভূষিত ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার, শিল্প-নায়ক, ষড়্‌যন্ত্রে চতুর বীমা-কোম্পানীর ম্যানেজার এবং বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদেরও তদবস্থা

হইতে হইবে। মহারাজা "জনসাধারণের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে" বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। আমরা অতঃপর দেখাইতেছি যে, মহারাজা-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত অবস্থা ও ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য-বিধান সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং উহার কোন মূল্যই নাই। আমাদের মতে, ইহা মহারাজার স্তোক-দানের অন্যতম নিদর্শন এবং মন্ত্রিত্বপদে আসীন থাকায় মহারাজার যে দায়িত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, ইহা তাহার অভাব সূচিত করে।

মহারাজার বিবৃতির পঞ্চম দফায় তিনি বলিয়াছেন যে, "পূর্ব্ববঙ্গে যে শ্রেণীর শস্যোৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে, জল যত বাড়ে, তাহারাও তত বাড়ে, চাষীদিগকে সেই শ্রেণীর শস্য রোপণ করিতে হইবে।"

বাঙ্গালার বিভিন্ন শস্যের বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় না গিয়া, আমরা ইহার উত্তরে কেবল বলিব যে, যদি পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিবাসীরা বন্যার বর্ত্তমান প্রকোপ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ শস্য লাভ করিতে পারিতেছে দেখা যাইত, তবে ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত। পূর্ব্ববঙ্গ যে-ব্যবস্থার সাহায্যে তাহার শস্যোৎপাদন অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই, সে ব্যবস্থার কথা বলিয়া লাভ কি?

ষষ্ঠ দফায় মহারাজা বলিয়াছেন, "জনসাধারণের বাসগৃহের দাওয়া উচ্চ করিতে হইবে।"

যদি জনসাধারণের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত এবং যদি তাহাদিগকে এমন স্থানের সন্ধান দিতে পারা যাইত, যেখানে এমন বিস্তৃত পরিমাণ মাটি পাওয়া যাইবে, তবে এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। বাস্তব ঘটনা যখন বিপরীত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাও একটি স্তোক-বাক্য।

মহারাজার বিবৃতির সপ্তম দফায় প্রকাশ যে, "বিশেষজ্ঞরা এই প্রদেশের জল-সেচ-বিষয়ক সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন।"

অপর কোন প্রদেশ অথবা দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা, জল-সেচ বিষয়ক সমস্যার এই প্রকার সমাধান-চেষ্টার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া যদি দেখা যাইত, তবে জনসাধারণের প্রাণে এই কথায় আশার সঞ্চার হইতে পারিত। প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি লইয়া যথাযথ ভাবে পরীক্ষায় অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান কালের জল-সেচ-পরিকল্পনার দ্বারা কুত্রাপি দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। ইহা বলিলে নির্ভুল কথা বলা হইবে না যে, পাঞ্জাব, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের জনসাধারণের দারিদ্র্য কোন ক্রমেই কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস পাইয়াছে। সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া লক্ষ্য করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকটির জন-সাধারণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে। কেবল ইহাই নহে, এই জল-সেচ পরিকল্পনার ফলে চাষের ব্যয় প্রত্যেক প্রদেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কুত্রাপি উৎপন্ন শস্যের আধিক্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। যেখানে যেখানে বর্ত্তমান প্রথার জলসেচ-প্রণালী গৃহীত হইয়াছে, তথায় কয় বৎসরের জন্য—ধরা যাউক, ১০ বৎসরের জন্য—উৎপাদনের হ্রাসে বাধা উপস্থিত করিয়াছে বটে, কিন্তু অতঃপর আবার জমীর উৎপাদন-সামর্থ্যের হ্রাস বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। এক পক্ষে, আধুনিক জল-সেচ-প্রণালীর দরুণ যেরূপ এই সকল অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায়, অন্যপক্ষে ইহা যেখানে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই স্থানই অস্বাস্থ্যের এবং অনিষ্টকর শস্যের আগার হইয়া উঠে। এই জন্যই আমরা মনে করি যে, বিশেষজ্ঞেরা বাঙ্গালার জল-সেচ-প্রণালী লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এই সংবাদে জনসাধারণের উৎফুল্ল হইবার স্থান কিছুই নাই। উৎফুল্ল হওয়া দূরে থাক, ইহা দুঃসংবাদ, কেন না ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালা দেশ এমন সকল ব্যক্তির মন্ত্রিত্বে পরিচালিত হইতেছে, যাঁহাদের দূরদর্শিতা নাই এবং যাঁহাদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব বর্ত্তমান।

মহারাজার বিবৃতির অষ্টম ও নবম দফার অন্তর্গত আলোচ্য বিষয় নিম্নানুযায়ী:—

(১) ইহা বলিলে কি যথার্থ বলা হয় যে, বন্যার প্রকোপ হাজা-মজা নদী ও খালের খনন দ্বারা কিয়ৎ পরি-মাণে হ্রাস পাইতে পারে?

(২) ইহা বলিলে কি সত্য বলা হয় যে, বাঙ্গালার নদী ও খালের মজিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ হইতেছে অপর সকল প্রদেশ, বিশেষতঃ যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহার, জল-সেচের জন্য বৃহৎ বৃহৎ খাল খনন

> করিয়া গঙ্গার সম্পূর্ণ সহযোগ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই এবং যাহার ফলে এই সকল অঞ্চলের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ?

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আমরা স্বীকার করি, ইহা বলা যথার্থ যে, হাজা-মজা নদী ও খাল খনন করিলে বন্যার প্রকোপ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু তথাপি আমাদের বক্তব্য হইতেছে, সে-হ্রাসের পরিমাণ যৎসামান্য মাত্র এবং ইহার স্থায়িত্ব দুই বৎসরের অধিক কাল নহে। সুতরাং এই খাতে অর্থ ব্যয় করা সমীচীন নহে।

দ্বিতীয় বিষয়টির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইতেছে, এরূপ বিবেচনা বিজ্ঞজনোচিত নহে যে, বাঙ্গালার নদী ও খালের মজিয়া যাওয়ার মূল কারণ পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের জলসেচ সম্পর্কিত কার্য্য এবং তাহাদের দ্বারা গঙ্গার জল ব্যবহার। হইতে পারে যে, ইহা একটি অতি গৌণ কারণ, কিন্তু ইহাকে বিন্দুমাত্রও উল্লেখযোগ্য কারণ বলিয়া মনে করা যায় না। যদি পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের জলসেচ-সম্পর্কিত কার্য্যই বাঙ্গালার নদী ও খাল-সমূহের মজিয়া যাওয়া ও ধ্বংসপ্রাপ্তির মূল কারণ হইত, তবে এই সকল প্রদেশে জলসেচ কার্য্য হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার নদী ও খালসমূহকে মজিয়া যাইতে কিংবা ধ্বংস হইতে দেখা যাইত না। যথাযথ ভাবের অনুসন্ধান দ্বারা দেখা যায় যে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে জলসেচ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার অধিকাংশ নদী ও খালের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আরও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার নদী ও খালসমূহ অন্যান্য প্রদেশের নদী ও খালের তুলনায় অদ্যাবধি অর্দ্ধেক মজিয়া যায় নাই, কিংবা ধ্বংস হয় নাই এবং বাঙ্গালায় বন্যার যে প্রকোপ, তদপেক্ষা অপরাপর প্রদেশে বন্যার প্রকোপ কিঞ্চিন্মাত্রও কম নহে।

পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের জলসেচ কার্য্যের ফলে ঐ সকল প্রদেশের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই প্রকার বিবৃতি-দান প্রকৃত তথ্যের অভাবপ্রসূত। মস্তিষ্কহীন কিংবা স্ফীত-মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞেরা যাহাই ইচ্ছা তাহাই বলুন না কেন, যদি কোন বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ চাষীর নিকট সুকৌশলে জ্ঞাতব্যের সন্ধান করা যায়, তবে সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে যে, "এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকটিতে একর-প্রতি শস্যের উৎপাদন-হার গত ত্রিশ বৎসর হইতে ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে এবং জলসেচ-কার্য্যের কোন পরিকল্পনা দ্বারাই তাহার রোধ সম্ভব হয় নাই। ইহা সত্য যে, সার দ্বারা কখনও কখনও ফল লাভ হয়, কিন্তু ইহার ব্যয় এত অধিক যে, কৃষকের পক্ষে কৃষি তৎসাহায্যে লাভজনক করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আমরা মহারাজকে প্রাদেশিক কলহ উপস্থিত হইতে পারে, এমন কোন বিষয় আলোচনায় সতর্ক হইতে বলি। তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯০৫ সালের আইনের সাগরপারস্থ প্রবর্ত্তকদিগের অভিসন্ধি ভেদনীতির সাফল্যার্থ অপর সকল অনৈক্যের সহিত প্রাদেশিক কলহের সৃষ্টি। গভীর ভাবে কারণ অনুসন্ধান না করিয়া অপরের স্কন্ধে দোষারোপ কখনও প্রবীণোচিত কার্য্য নহে।

বিবৃতির একাদশ ও দ্বাদশ দফায় মহারাজা আশার সঞ্চার করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, সরকার কর্ত্তৃক বিস্তৃত ভাবে রাস্তা-নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত শ্রাবণ সংখ্যার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'বাঙ্গালায় রাস্তার বিস্তার' শীর্ষক সন্দর্ভে আমরা অখণ্ডনীয় যুক্তিসহকারে দেখাইয়াছি যে, এই রাস্তা-বিস্তার পরিকল্পনায় বাঙ্গালার জন-সাধারণের কোন কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কল্যাণ-সাধন দূরে থাক, ইহাতে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও যে, মহারাজা তাঁহার রাস্তার বিস্তার-পরিকল্পনার উচ্চ প্রশংসা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, ইহাতেই প্রকাশ পায় যে, আমাদের মন্ত্রিমণ্ডল, তাঁহাদের প্রজাবৃন্দ তাঁহাদের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করে, তাহা গ্রাহ্য করেন না এবং তাঁহাদের সদসদ্-বিচার-বুদ্ধিগত যুক্তি অনুধাবনের সামর্থ্য পর্য্যন্ত নাই।

স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আজিও দেশের প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির শ্রদ্ধাভাজন রহিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে এই ভাবে কথা বলিতে হইতেছে, ইহা পরিতাপের বিষয়।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী কু-সঙ্গে পড়িয়াছেন বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে এবং তাঁহার মজ্জাগত বোধ অপেক্ষা তাঁহার সংসর্গ তাঁহার উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। বর্ত্তমানে তিনি যে বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দান করিতেছেন, তদপেক্ষা তাঁহার বিচার-বুদ্ধি উন্নত হউক, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি। এইভাবে দুর্নাম না কিনিয়া বরং তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দান করুন—আমরা তাঁহাকে এই পরামর্শ দান করি।*

* "দি-উইকলি বঙ্গশ্রী"র ৩১শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভের অনুবাদ।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন ও স্যর এন. এন. সরকার

গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে রবিবার দিবস কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটুট হলে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন" নামে একটি ভাবাবেগময়ী সভার অনুষ্ঠান হয়। বাঙ্গালার "কংগ্রেস জাতীয় দলে"র উদ্যোগে এই সভার অধিবেশন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ মাধব শ্রীহরি আনে সভার সভাপতিত্ব করেন। যাঁহারা সভার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জনকয়েক কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বাদ দিলে ভারতের উল্লেখযোগ্য হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন। হিন্দু ব্যতীত একজন মুসলমান এবং একজন খৃষ্টানের নামও সভায় যোগদানকারী হিসাবে উল্লেখযোগ্য। সভাপতি ব্যতীত যাঁহারা সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) স্যর পি. সি. রায় (২) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (৩) মিঃ এন. সি. সেন (কলিকাতার মেয়র) (৪) ডক্টর এচ. কে. মুখার্জ্জী (৫) রেজাউল করীম (৬) পণ্ডিত আর. কে. মালবীয় (৭) ডক্টর রাধাকমল মুখার্জ্জী (৮) ডক্টর বি. এস. মুঞ্জে (৯) স্যর এন. এন. সরকার (১০) স্যর এম. এন. মুখার্জ্জী (১১) মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জ্জী (১২) ডক্টর এস. পি. মুখার্জ্জী (১৩) ডক্টর পি. এন. বানার্জ্জী, এম. এল. এ (সেণ্ট্রাল)।

অপরাপর প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সভায় গৃহীত হয়:—

(১) "এই সভা হইতে সরকারের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ক সিদ্ধান্তের—যে-সিদ্ধান্তের নাম সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেওয়া ভুল হইয়াছে,—তীব্র প্রতিবাদ করা হইতেছে, কেন না:—

(ক) ইহা পৃথক্ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের রক্ষা ও বিস্তার সাধন করিয়াছে, জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের উন্নতির পক্ষে ইহা মারাত্মক বাধা-স্বরূপ। দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেবল জাতীয় ভিত্তিতে নির্ব্বাচনের উপরই গঠিত হইতে পারে।

(খ) ইহাতে পৃথক্ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-কেন্দ্র-সহ আইন-রক্ষিত সংখ্যা-গরিষ্ঠের ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছে, দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার মূল ভিত্তির ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী।

(গ) ইহাকে সাধারণ জাতীয় বোধ-গঠনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ এবং সাম্প্রদায়িক তিক্ততার আতিশয্য-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করা যায়।

(ঘ) ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে; বিশেষতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা, এবং বাঙ্গালা, পাঞ্জাব ও আসামের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় সংখ্যার অনুপাতে তাহাদিগের সদস্য-সংখ্যা কম ধার্য্য হইয়াছে।

(ঙ) ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ও আসামে, হিন্দু ও মুসলমানের অনিষ্টজনক ভাবে অত্যধিক সদস্য-সংখ্যা ধার্য্য করা হইয়াছে।

(২) সম্মেলনের মত এই যে, দায়িত্বশীল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কেবল যুগ্ম-নির্ব্বাচন কেন্দ্রের উপর গঠিত হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ন্যায় জাতীয়তা-বিরোধী নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার উপর ইহা গঠিত হইতে পারে না।

(৩) তদুপরি সম্মেলন গত কয় বৎসরে এই বাঁটোয়ারার কার্য্যের যে শোচনীয় পরিণাম দাঁড়াইয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে চাহে যে, ইহাতেই বুঝা যায়, যেরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা চরম পরিমাণে সত্য হইয়াছে।

এই বাঁটোয়ারা সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িক তিক্ততার বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, বিশেষতঃ, বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে জনমত, ন্যায়বিচার এবং শুভবুদ্ধি অগ্রাহ্য করিয়া এমন সকল আইন, শাসন ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক। এইরূপ ব্যবস্থার মধ্যে অতি অল্পকালের মধ্যে সংঘটিত হিসাবে কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন আইন এবং সরকারী

চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক সংখ্যা-রক্ষার ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৪) এই সম্মেলন সকল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক সংঘকে মিলিত হইয়া বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে সম্মেলন কংগ্রেসের এই প্রশ্ন সম্বন্ধীয় মনোভাব সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং এতৎসম্বন্ধীয় কংগ্রেসের নীতির পরিবর্ত্তন এবং বাঁটোয়ারার রদ সাধনের জন্য চেষ্টিত হইতে বলিতেছে।

উপরের প্রস্তাবসমূহ হইতেই সম্মেলনের "আশু উদ্দেশ্য" সুপরিস্ফুট। "আশু উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে আমরা বলিতেছি বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার কোন "নিগূঢ় উদ্দেশ্য"ও থাকিতে পারে। আমরা প্রথমে "নিগূঢ় উদ্দেশ্য"-এর আলোচনা করিব না। প্রথমতঃ আমরা সন্ধান করিবার চেষ্টা করিব যে, সম্মেলনের "আশু উদ্দেশ্য"সমূহ জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণজনক অথবা অকল্যাণজনক হইবার সম্ভাবনা। ইহাদের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহার সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জন-সাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে "দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান।" এই দুইটি সমস্যার সমাধান-সহায়ক সকল কিছুকেই জন সাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা স্মরণ করিব, "বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান"-এর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কি। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিব, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলন "দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান"-এর সাহায্য করিবে কি না। আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানের পক্ষে অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে দেশমধ্যে সর্ব্বব্যাপক ঐক্যের মনোভাব সঞ্চার—কেবল ভারতবাসী জন-সাধারণের পরস্পরের মধ্যে নহে, ব্রিটিশ জন-সাধারণের সহিতও। যদি ভারতের জন-সাধারণের সংগঠনসমূহের অধিকাংশ—যে-সকল বিষয়ে মতানৈক্য উপস্থিত হইতে পারে, সেই সকল বিষয় সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সাগর-পারস্থ ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণের নিকট—ভারতবাসী ও ব্রিটিশ জনসাধারণের বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যার যদ্দ্বারা সমাধান হয়, এরূপ পরিকল্পনা দাবী করেন, তবেই ইহা সম্ভব হইতে পারে।

অতঃপর আমরা দেখিতে চাহি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন দেশমধ্যে সর্ব্বব্যাপক ঐক্যের ভাব বিস্তার-সহায়ক হইবে, না ইহা দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি করিবে।

এইবারে আমরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের উদ্দেশ্যসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলোচ্য সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ হইতে এই আন্দোলনের আশু উদ্দেশ্যসমূহ সুপরিস্ফুট। এই সকল প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সম্মেলনের আশু উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে ভারতের জাতীয়তা গঠনের বিরোধী, এই "তথ্য" সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা ;

(২) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে দায়িত্বশীল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠনের প্রতিবন্ধক, এই "তথ্য" সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা ;

(৩) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে দেশমধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জন্যই কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল প্রভৃতি হিন্দুদের সর্ব্বনাশকর কার্য্য সম্ভব হইয়াছে, এই "তথ্য" সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা ;

(৪) বাঁটোয়ারা রদ করিবার চেষ্টায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইবার বোধ জন-সাধারণের মধ্যে জাগ্রত করা।

আমরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতি প্রেমাবিষ্ট নহি, কিন্তু উপরের উদ্দেশ্যসমূহের সাহায্যে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলন" দ্বারা দেশমধ্যে কিরূপে 'ঐক্য' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

পয়লা নম্বরের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে ভারতে জাতীয়তা-গঠনের বিরোধী, এই "তথ্য" সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে গেলে, প্রত্যক্ষ ভাবে ইহা দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত করিবে না বটে, কিন্তু ইহা ঐক্য-ভাবেরও বৃদ্ধি সাধিত করিবে না, কেন না, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবর্ত্তক

এবং সমর্থকগণ তাহার বিরুদ্ধাচারণ অন্তরের সহিত পছন্দ করিবেন না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভারতে জাতীয়তা গঠন সম্ভব হইবে না, তাহা বলাও ঠিক নহে। বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য, যথা "দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা"—জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্যজাতির প্রত্যেকের অন্তরাত্মা যাহাতে শুষ্কতা লাভ করিতেছে—তাহার সমাধানার্থ ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিলে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অস্তিত্ব সত্ত্বেও ভারতের জাতীয়তা-গঠনে কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না।

দুই নম্বরের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে দায়িত্বশীল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠনের বিরোধী, এই "তথ্য" সম্বন্ধে জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে গেলে, তাহাতে দ্বন্দ্ব-কলহ বাধিতে বাধ্য, কেন না যাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সত্ত্বেও সরকার গঠনের স্বপক্ষে, তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা পছন্দ করিতে পারেন না। ভারতের প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমূহকে অপকৃষ্ট অভিহিত করিবার পশ্চাতে কোন যুক্তিযুক্ততা যদি থাকে, তবে ইউরোপীয় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকেও অপকৃষ্ট অভিহিত করাও যুক্তিযুক্ত হইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, কেবল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার স্কন্ধে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বহীনতার কারণ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। যদি মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ নিজদিগকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে শিক্ষিত এবং তাহা পালন করিতে পারেন, তবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারের অস্তিত্ব সত্ত্বেও প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দায়িত্বহীনতার মূলে মন্ত্রিসভা এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের, তথা শাসকবৃন্দের কুশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নহে।

তিন নম্বরের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশে ইতিমধ্যেই সাম্প্রদায়িক অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে, জনসাধারণকে এই "তথ্য" সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে গেলে দেশমধ্যে নিশ্চিত মতানৈক্য সৃষ্ট হইবে, কেন না, যাঁহারা ইহা মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা দেশের মধ্যে এই ভাব প্রচার পছন্দ করিতে পারেন না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই সকল সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের মূলে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সৃষ্টির বহু পূর্ব্বেই রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইহা জোর করিয়া বলা চলে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের মূল কারণ নহে। ইহা হওয়া দূরে থাক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ফল বলিতে হইবে। যদি ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিবিদগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য না থাকিত, তবে সাগরপারস্থ বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবর্ত্তনে সাহসী হইতেন না। ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌গণের নিরতিশয় বুদ্ধিহীনতার জন্যই ভারতবাসী জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দ্বারা প্রপীড়িত হইতে হইতেছে—যদি ইহাকে অবশ্য কোনক্রমে প্রপীড়ন বলা চলে।

মুসলমান ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপনার্থ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের পরিবর্ত্তনে হিন্দুদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে, ইহা বলাও ভুল। হইতে পারে যে, মুসলমান ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সৃষ্ট হওয়ায় মুষ্টিমেয় অভিজাত হিন্দু, যাঁহারা যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়াও কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের স্বার্থের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু খাঁটি সত্য কথা বলিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, ইহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও আসিয়া যায় নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের হিন্দু-শাসনের অধীনে তাহারা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বসিয়াছে, নূতন করিয়া তাহাদের খোয়াইবার কিছুই নাই। যদি লক্ষ্য করা যায়, কলিকাতা-বাস বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে বৎসরের ৩৬৫ দিবস কিরূপ অস্বাস্থ্যজনক হইয়া পড়িয়াছে, যদি লক্ষ্য করা যায়, কলিকাতার আনাচে-কানাচে রাজ-যক্ষ্মা, রক্তের চাপ; আমাশয়, উদরাময়, কলেরা ও বসন্ত রোগ কি ভাবে প্রাদুর্ভাব বিস্তার করিতেছে, যদি লক্ষ্য করা যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্যাক্সের হার কি ভাবে হ্রাস লাভ না করিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, যদি লক্ষ্য করা যায়, বাঙ্গালী হিন্দুর সম্পত্তি কি ভাবে অবাঙ্গালীর হস্তগত হইয়া চলিয়াছে, তবে কলিকাতা কর্পোরেশনের হিন্দু-শাসনের মধ্যে গৌরব বোধ করিবার কিছুই পাওয়া যাইবে না।

সুতরাং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের পরিবর্ত্তন উল্লেখ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কুফল হিসাবে তাহার

দৃষ্টান্ত দান করা জনসাধারণের মধ্যে অনৈক্য-সৃজনার্থ জনমত উত্তেজিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বলাই বাহুল্য যে, চার নম্বরের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বাঁটোয়ারা রদ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে জনমত উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টার ফলে অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রনেতার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বাধ্য, কেন না তাঁহারা বাঁটোয়ারাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত হইবে বটে, কিন্তু বাঁটোয়ারার রদ-বদল হইলেও তদ্দ্বারা দরিদ্র হিন্দু জনসাধারণের কোন লাভই হইবে না। আমরা "বাঙ্গালার হিন্দু সংগঠন আন্দোলন" শীর্ষক সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, এমন কি যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রদ-বদলও হয়, তদ্দ্বারা হিন্দুরা কেবল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন মাত্র। ইহার দ্বারা যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারিবেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততি এবং তাঁবেদারগণ (তাহাও আবার সকলে নহে) কয়েকটি বেতনভোগী নকরগিরি লাভ করিতে পারিবেন মাত্র।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলনের এই ভাবাবেগময়ী সভার চারিটি উদ্দেশ্যের পরিণাম সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, এই আন্দোলন দ্বারা দরিদ্র হিন্দু জনসাধারণের কোন হিত সাধিত হইবে না। হিত সাধন করা দূরে থাক, ইহাতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বাধ্য, যাহার ফলে জনসাধারণের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানে বিলম্ব ঘটিতে বাধ্য। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণের নিকট যত শ্রদ্ধেয়ই হউন না কেন, দেশের তাঁহারা পরম শত্রু।

যে-সম্মেলনে স্যর নৃপেন সরকার যোগদান করিয়াছেন, সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এই ভাবে কথা বলিতে হইতেছে, ইহা গভীর দুঃখের বিষয়। স্যর পি. সি. রায় কিংবা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় পেশাদার আন্দোলকারীদের নিমিত্ত আমাদের কোন দুঃখ নাই। স্যর পি. সি. রায় এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের যদি মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক-সামর্থ্য থাকিত, তাঁহারা অন্ততঃ এতদিনে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের চিন্তাধারায় কোন ভ্রান্তি বর্ত্তমান, নচেৎ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা যে আন্দোলন ও নেতৃত্ব চালাইয়া আসিতেছেন, তৎসত্ত্বেও কেবল দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার বিস্তার ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইত না। বিবেচনা দাবী করিতে পারে, এরূপ মস্তিষ্ক-সামর্থ্য যদি তাঁহাদের থাকিত, তাঁহারা ইতিমধ্যে অন্ততঃ বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের চিকিৎসা-কার্য্য সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ রোগীদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা জন-সভায় কি পত্রিকায় তাঁহাদের অধিকতর সামর্থ্য প্রদর্শন হইতে ক্ষান্ত হইতে পারেন। জনসাধারণ শীঘ্রই উপলব্ধি করিবে যে, এই সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং তাঁহারা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে যে, যাঁহারা নিজদিগকে হিন্দু বলেন, তাঁহারা এমন হিন্দু-আন্দোলনে যোগদান করেন, যাহার নেতৃত্ব-ভার—বর্ণাশ্রমের পশ্চাতে ভারতীয় ঋষিগণের কি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত তাহার বিন্দু-বিসর্গও না জানিয়া তৎসম্পর্কে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে যাঁহারা সামান্য দ্বিধা বোধ করেন না, সেই স্যর পি. সি. রায় ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে রহিয়াছে?

আমরা প্রার্থনা করি যে, এই সব পাপাশয় ব্যক্তি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া তাঁহাদের কুকার্য্যের ফল ভোগ করিয়া যান এবং বুঝুন যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া তৎসম্বন্ধে কথা বলা নিতান্ত নিরাপদ নহে।

অপরাপর সকলের কার্য্যের বিরুদ্ধে আমাদের বলিতে বাধ্য হইতে হইতেছে বলিয়া আমাদের দুঃখ নাই, কিন্তু স্যর নৃপেন সরকারের ক্ষেত্রেও আমাদিগকে তাহাই করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণ করি, কেন না তিনি আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কিছু করিবার ন্যায় মস্তিষ্ক-সামর্থ্য রাখেন; ইহার আমরা প্রত্যাশা রাখি। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিষয় যথোচিত না হইলে মহৎ ব্যক্তিও নিজেকে সময়ে, তিনি যাহা, তদপেক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া দেখাইতে বাধ্য হইতে পারেন। আমরা তাঁহাকে অতি স্পষ্ট ভাবেই জানাইতে চাহি যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলন তাহার নিমিত্ত নহে, কেন না দেশ যখন সর্ব্বব্যাপক অনাহার ও দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জ্জরিত এবং যাহার ফলে

মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব-রক্ষা বিষয়ে পর্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, তখন যে-সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈধের আশঙ্কা বর্ত্তমান, সেই সকল বিষয়ে দেশবাসীর লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। স্যর নৃপেন যখন হাইকোর্টে কিংবা কেন্দ্রীয় আইন-সভায় বক্তৃতা দান করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার বক্তৃতার যুক্তিসমূহ সযত্নে লক্ষ্য করিয়াছি এবং দেখিয়াছি, তিনি কদাচিৎ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু এই সম্মেলনের সভায় সেই স্যর নৃপেনের বক্তৃতাতেই যুক্তির ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, "সাম্প্রদায়িক" এই কথাটিকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলনকে কোন ক্রমেই "সাম্প্রদায়িক" বলা চলে না। তাঁহার "সাম্প্রদায়িক" কথাটির সংজ্ঞা নিম্নলিখিত রূপ:

"আমি 'সাম্প্রদায়িক' কথাটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রকৃত 'সাম্প্রদায়িক' জাতির কথা বিস্মৃত হয়। সে তাহার সম্প্রদায়ের দাবীসমূহের সমর্থনে সতত প্রস্তুত, এমন কি এই সকল দাবী যখন অপর সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্যায় এবং সমগ্র জাতির পক্ষে ক্ষতিকর তখনও। অন্যপক্ষে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা 'জাতীয়' ধুয়ার প্রভাবে পড়িয়া ভুলিয়া যান যে, 'জাতি' বলিতে কয়েকটি সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাহাদের প্রত্যেকের বিবিধ দাবী সমগ্র জাতির ক্ষতি যাহাতে না হয়, তদ্রূপ ভাবে শোভন ও সঙ্গত উপায়ে পূরণের প্রয়োজন।"

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, "সাম্প্রদায়িক"এর এই সংজ্ঞা বিচক্ষণোচিত। কিন্তু আমরা বুঝিতে অক্ষম যে, যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলন দেশের মধ্যে নিশ্চিতভাবে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া দেশবাসীর দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার—ইহারা জাতীয় সমস্যা—সমাধানে বাধা উপস্থিত করিবে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তখন ইহাকে কেন "সাম্প্রদায়িক আন্দোলন" বলা চলিবে না। "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলন" যে "সাম্প্রদায়িক" নহে, এই সিদ্ধান্তকে তাহা হইলে অযৌক্তিক বলিতে হয় এবং এই আন্দোলন যে "সাম্প্রদায়িক," সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমরা মনে করি, স্যর নৃপেনের এই যে যুক্তির ত্রুটি, ইহা কেবল তিনি অনুচিত বিষয়ের স্বপক্ষে বলিতে গিয়াছেন বলিয়া। "যাঁহারা 'জাতীয়' ধুয়ার প্রভাবে পড়িয়া ভুলিয়া যান যে, জাতি বলিতে কয়েকটি সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাহাদের প্রত্যেকের বিবিধ দাবী সমগ্র জাতির ক্ষতি যাহাতে না হয়, তদ্রূপ ভাবে শোভন ও সঙ্গত উপায়ে পূরণ করা প্রয়োজন"—এই যুক্তি হইতেই ধরিতে হয় যে, হিন্দুদিগকে তাহাদের মুসলমান দেশবাসীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত চেষ্টিত হইতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা নিজদিগকে একজাতিভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া হিন্দুদিগকে মুসলমানদের সম্মুখে তাঁহাদের বিবিধ দাবী শোভন ও সঙ্গত ভাবে পূরণের জন্য উপস্থিত করিতে হইবে—যতদিন না মুসলমানরা নিজদিগকে একজাতিভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন, ততদিন হিন্দুদের ইহা করা উচিত হইবে না, কেন না, তৎপূর্ব্বে এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে জাতিগত অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে। স্যর নৃপেন একগুঁয়েমি দেখাইবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি এবং তাঁহার সুবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রবণতার সহায়তায় এই সর্ব্বনাশকর আন্দোলন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের বিশ্লেষণ দ্বারা যেরূপ প্রমাণিত হয় যে, সম্মেলনের আশু উদ্দেশ্যসমূহ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অকল্যাণজনক, সেইরূপ ইহা সন্দেহ করিবারও কারণ রহিয়াছে যে, সম্মেলনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য হইতেছে বাঙ্গালী হিন্দুর একটি আড্ডা গঠন করিয়া তৎসাহায্যে ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আগামী নির্ব্বাচনে কতিপয় আসন সংগ্রহ। দরিদ্র জন-সাধারণই বিচার করুন যে, যাঁহারা স্বীয় উদ্দেশ্যপূরণে স্পষ্ট পন্থাগ্রহণে পরাঙ্মুখ, সেই সকল ব্যক্তিকে তাঁহারা উৎসাহিত করিবেন কি না। আমাদের মতে, বাঙ্গালীরা অতীতে এই শ্রেণীর বিবিধ কৌশলে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কৌশলই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং ফলে জন-সাধারণের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে চলিয়াছে।

এই সভায় কতিপয় বক্তা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে, ইহা হিন্দুদের প্রতি ব্রিটিশদের ঘোরতর অবিচার। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ব্রিটিশজাতি যদি এই শ্রেণীর

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সৃষ্টি না করিয়া কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন, তবে তাঁহাদিগকে সুচতুর বলা যাইতে পারিত, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমগ্র ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যাইবে যে, মুসলমান কিংবা ব্রিটিশ অপেক্ষা হিন্দুরাই এই বাঁটোয়ারার নিমিত্ত অধিক দায়ী। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের এই বক্তব্য প্রমাণ করিব।

"বাঙ্গালার হিন্দু-সংগঠন আন্দোলন" সন্দর্ভে আমরা "হিন্দু" শব্দের যেব্যাখ্যা দান করিয়াছি,তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে আজ প্রকৃত হিন্দু একজনও নাই। যে ভারত একদিন "হিন্দু"র আবাসস্থল ছিল, তথায় আজ একজনও "হিন্দু" নাই, এই অবস্থা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা বুঝিতে পারিলে উপলব্ধি হইবে যে, "হিন্দু"রা নিজেদের প্রতি যে অবিচার সাধন করিয়াছে, তেমন অবিচার আর তাহাদের প্রতি কেহই করে নাই।

এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলন সেই নির্ব্বুদ্ধিতারই অন্যতম প্রকাশ। আমরা জন-সাধারণকে সময় থাকিতে ইহার বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেছি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যদি আমাদের প্রত্যেকটি চালচলন সম্বন্ধে আজিও সাবধানী না হই, তবে মনুষ্য জাতির সমগ্রাকাশে যে দুর্দ্দিনের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের চরম সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।*

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য, জার্ম্মানীর সহিত ইংলণ্ডের এই যুদ্ধকালীন ভারতীয় জাতীয় মহাসভা, তথা ভারতবাসী জন-সাধারণের কর্ত্তব্য কি, তাহার সন্ধান নির্দ্দেশ। এই সন্দর্ভ রচনা-কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় মনোভাব বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, আমরা মনে করি, জন সাধারণ যে-সকল ঘটনার সম্মুখীন হন, তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জন-সাধারণের কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে পরামর্শ-দান সাংবাদিক মাত্রেরই দায়িত্ব। সুতরাং আমাদের মূল বিষয় (অর্থাৎ বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার এবং ভারতবাসী জন-সাধারণের কি কর্ত্তব্য) সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি একে একে আমরা আলোচনা করিব :—

(১) যুদ্ধে কার্য্যতঃ কোন সহায়তা দান হইতে বিরত থাকিয়া এই সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করা উচিত কি না।

(২) যুদ্ধে কার্য্যতঃ কোন সহায়তা দান হইতে বিরত থাকিয়া বাহ্যতঃ ঔদাসীন্য পোষণ করা এবং ব্রিটিশজাতির পরাজয়কল্পে আমাদের সাধ্যমত সামান্য সামান্য কার্য্য গোপনে করা উচিত কি না।

(৩) ব্রিটিশজাতির জয়লাভকল্পে আমাদের সাধ্যমত সম্ভব কার্য্যতঃ সহায়তা দান উচিত কি না।

(৪) ব্রিটিশজাতির জয়লাভকল্পে আমাদের কার্য্যতঃ সহায়তা দানের বিনিময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা উচিত কি না।

(৫) জার্ম্মানদের বিপক্ষে যাহাতে নিশ্চিত জয়লাভ সম্ভব হয়, তৎপক্ষে ব্রিটিশজাতির আমরা বাস্তবতঃ কি সাহায্য করিতে পারি।

উপরের পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইংলণ্ড এইবার পণ্যদ্রব্যের বাজার কিংবা সাম্রাজ্য-বিস্তাররূপ বাস্তব লাভের উদ্দেশ্যে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইংলণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে, "হিটলার-তন্ত্রে"র বিলোপ-সাধন। "হিটলার-তন্ত্র" বলিতে আমরা বুঝিয়াছি, "সংঘর্ষের ভাব এবং ফলতঃ দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব" ও "অনুরূপ উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টায় বলপ্রয়োগ।" সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণায় ইংলণ্ডের একমাত্র

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ৩১শে আগষ্টের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভের অনুবাদ।

উদ্দেশ্য হইতেছে, মনুষ্যজাতির মধ্য হইতে পাশবিক প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন। এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ ইংলণ্ড প্রধানতঃ চারিটি পন্থার সাহায্য লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: (১) জার্ম্মানীর বিমান-বাহিনীর উচ্ছেদ, (২) জার্ম্মানীর নৌ-বাহিনীর উচ্ছেদ, (৩) জার্ম্মানীর স্থল-বাহিনীর উচ্ছেদ, এবং (৪) জার্ম্মানীর আর্থিক কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া তাহারা যাহাতে আহার্য্য ও কাঁচামালের অভাবে পড়িয়া যুদ্ধে অধিকতর অগ্রসর হওয়া হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয় তাহা করা। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ঘোষণার উদ্দেশ্য যে মনুষ্যত্ব-সূচক এবং সকল দিক্ হইতে প্রশংসনীয়, তাহা সকল কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। এই মনুষ্যত্বসূচক উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তদ্বিষয়ক আলোচনা গভীর বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। আমরা সন্দর্ভের পরবর্ত্তী অংশে এই আলোচনা করিব।

অধুনা আমাদের প্রথম প্রশ্ন হইতেছে,—যুদ্ধে কার্য্যতঃ কোন সহায়তা দান হইতে বিরত থাকিয়া এই সম্বন্ধে আমাদের, সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করা উচিত কি না।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সমগ্র ভাবে ভারত যুদ্ধে কার্য্যতঃ কোন সহায়তা দান হইতে বিরত থাকিতে পারে না কিংবা এই সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াও থাকিতে পারে না, কেন না, ইংলণ্ড এই যুদ্ধে অগ্রণী হইয়াছেন এবং এই দুই দেশের বর্ত্তমান আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার দিক্ হইতে ইংলণ্ড ও ভারতের ভাগ্য সমসূত্রে আবদ্ধ। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ দ্বারা সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিবার মনোভাব পোষণের কথা বলা আত্ম-প্রতারণামূলক হইবে। উপরন্তু, আর্থিক অথবা নৈতিক দিক্ হইতেও, ভারতের বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে অবিচলিত কিংবা উদাসীন মনোভাব পোষণের চেষ্টা করা উচিত নহে। নৈতিক দিক্ হইতে ইহা অনুচিত—কেন না, ইংলণ্ডের যে উদ্দেশ্য, মনুষ্য-জাতির মধ্য হইতে পাশবিক প্রবৃত্তির উচ্ছেদ-সাধন, তাহা মনুষ্যত্বসূচক এবং প্রত্যেক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন জাতি ও ব্যক্তির ইহা সকল ভাবে সমর্থনযোগ্য। আর্থিক দিক্ হইতে অনুচিত—কেন না, যদি ইংলণ্ড যুদ্ধজয়ে বিফল হয় এবং সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়, তবে ইংলণ্ড ও ভারত, উভয় দেশেরই মুদ্রামান ও ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার, তথা প্রচলিত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্মতিসূচক হইলে, তাহার ফলে ভারতকে কপটাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহা পাপ এবং অভারতীয়োচিতও বটে। কেবল তাহাই নহে, ইহাতেও প্রচলিত অর্থনীতি-সম্পর্কিত ভারতবাসিগণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে, কেন না ব্রিটিশজাতির পরাজয়ে ভারতে প্রচলিত বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থারও সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও অসম্মতিসূচক হওয়া উচিত।

তৃতীয় আলোচ্য হইতেছে—ব্রিটিশজাতির জয়লাভকল্পে আমাদের সাধ্যমত সম্ভব কার্য্যতঃ সহায়তা দান উচিত কি না।

প্রথম এবং দ্বিতীয় আলোচ্যপ্রসঙ্গে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তৃতীয় আলোচ্যেরও অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, যতদূর সম্ভব আমাদিগের যুদ্ধে কার্য্যতঃ সহায়তা দান করা নিশ্চয় উচিত এবং ব্রিটিশ জাতির জয়লাভকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

চতুর্থ আলোচ্য হইতেছে, ব্রিটিশজাতির জয়লাভকল্পে আমাদের কার্য্যতঃ সহায়তা দানের বিনিময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা উচিত কি না।

আমরা নৈতিক, আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক দিক্ হইতে এই বিষয়টির আলোচনা করিব।

ব্রিটিশজাতি যখন সমূহ বিপদাপন্ন অবস্থায় জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য হইয়াছেন, সেই অবস্থায় তাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা উচিত কি না, নৈতিক দিক্ হইতে এই বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইলে, নিজদিগকে ব্রিটিশজাতির অবস্থায় রাখিয়া আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে, আমাদের বিপদাপন্ন অবস্থায় ব্রিটিশজাতি যদি আমাদের সহিত এইরূপ দর-কষাকষি করিতে সুরু করিতেন, তবে আমরা তাহা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতাম। কোন ব্যক্তি কিংবা জাতির বিপদাপন্ন অবস্থায় তাহাদের উপর চাপ প্রয়োগ নিশ্চয়ই কেহ পছন্দ করিতে পারে না। এই

অবস্থায় যাহারা এইরূপ চাপ-প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের আচরণ যে বন্ধু অপেক্ষা দস্যুর পক্ষে অধিকতর শোভনীয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং এই বিষয়ে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যতদিন যুদ্ধ চলিতে থাকিবে, ততদিন নৈতিক দিক্ হইতে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা উচিত হইবে না। উপরন্তু আমাদিগের আচরণ দিয়া প্রমাণ করা উচিত যে, আমরা ব্রিটিশজাতির দুঃসময়ের বন্ধু এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আমরা তাঁহাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারি, তাহার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।

আর্থিক দিক্ হইতেও, এই সময়ে আমাদিগের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা সঙ্গত হইবে না। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগের আর্থিক মুক্তি সাধনের, অর্থাৎ আমাদিগের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হইতেছে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংস্কার এবং নদীস্রোতের বাধাসমূহ সম্পূর্ণরূপে অপসৃত না হইলে ইহার সংস্কার সম্ভব নহে।

কি উপায়ে নদীস্রোতের বাধা অপসৃত হইতে পারে, এ বিষয়ে আমরা যদি চিন্তা করি, তবে দেখিব যে, ভারতে ব্রিটিশ জাতির প্রভূত পরিমাণে স্বার্থ ন্যস্ত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ না করিতে পারিলে, উপরিলিখিত অপসরণ-কার্য্য অবিলম্বে সাধিত হইতে পারে না। নদীস্রোতের বাধা অপসরণের কার্য্য-প্রচেষ্টায় আমরা যদি ব্রিটিশজাতির সহযোগিতার পরিবর্ত্তে ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণ লাভ করি, তাহার ফল দাঁড়াইবে এই যে, যতশীঘ্র আমাদিগের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান আমরা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি, তত শীঘ্র উহা সাধিত হইবে না, ফলতঃ সেই অবস্থায় আমাদিগের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ একেবারে অর্থহীন হইয়া পড়িবে; অন্য পক্ষে এই দুঃসময়ে যদি ব্রিটিশজাতির প্রতি আন্তরিক বন্ধুত্বের পরিচয় আমরা দান করিতে পারি এবং নদী-স্রোতের বাধা অপসরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করাইতে সমর্থ হই, তবে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষাও যাহাতে আমাদের অধিকতর প্রয়োজন, দরিদ্র জন-সাধারণের সেই আহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আমাদের রহিয়াছে। সুতরাং আর্থিক দিক্ হইতে, পূর্ণ স্বাধীনতার পুরস্কার প্রার্থনা অপেক্ষা, আমাদের নদীস্রোতের বাধাসমূহের অপসরণার্থ অধিকতর আন্দোলন করা উচিত।

এই সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করা উচিত কি না, রাষ্ট্রিক দিক্ হইতে ইহা বিবেচনা করিলে আমাদিগকে প্রথমতঃ চিন্তা করিতে হইবে যে, পূর্ণ স্বাধীনতার পুরস্কার লাভ করিলে,—অবশ্য অপর কাহারও ইচ্ছায় এই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ যদি সম্ভব হয়, দেশের শাসন-দায়িত্ব কাহাদের উপর ন্যস্ত হইতে পারে। এই বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, রাজনীতি, তথা অর্থনীতি, তথা শাসননীতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জনেও অসমর্থ জনকয়েক ব্যবহারজীবী, কিংবা জনকয়েক চিকিৎসাব্যবসায়ী, কিংবা জনকয়েক স্বার্থপর বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ব্যক্তি আমাদের কর্ণধার হইতেছেন; তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহে যেরূপ হইয়া আসিতেছে, সমগ্র দেশের মধ্যে সেইরূপ সম্পূর্ণ বিশৃংখলা ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে কেবল যে আমাদের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে ব্রিটিশজাতির বাস্তব দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, আর কোন উপকার সাধিত হইবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে শাসন-ব্যবস্থায় শিক্ষাদান-পন্থা আবিষ্কারে আমরা সমর্থ না হই, ততদিন ব্রিটিশজাতিকে যেরূপ আমাদের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান বিষয়ে বাস্তব দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিদান আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না, সেইরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করাও সঙ্গত হইবে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা অধুনা দেশের শাসন-সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল পদ-সমূহ অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারাও যে যথাযথভাবে শাসন-নীতিতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, ইহা বলা চলে না, কেন না, তাঁহারা যদি প্রকৃত শাসক হইতেন তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি, দারিদ্র্য এবং বেকারের ক্রমশঃ এরূপ ক্রমিক বিস্তার দেখা যাইত না। হইতে পারে যে, শাসন-কর্ত্তৃত্ব-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নহেন, কিন্তু দেশের শাসন-নীতিসমূহের নির্দ্দেশ-ব্যবস্থায়, তথা তাহার শিক্ষাব্যবস্থায় যে ত্রুটি বর্ত্তমান, ইহা

স্বীকার করিতেই হইবে এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দেশবাসীকে বর্ত্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে গভীর চিন্তায় দেখা যাইবে যে ইউরোপীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইলে কোন দেশেরই শাসন যথাযথ ভাবের হইতে পারে না, সুতরাং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রথার আবিষ্কার প্রয়োজন। ইহাও অবশ্য মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এই কার্য্য কঠিন আয়াসসাধ্য এবং মিঃ গান্ধী, মিঃ জওহরলাল নেহেরু, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, মিঃ জিন্না, মিঃ অ্যানে কিংবা মিঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনিই হউন, তাঁহাদের কাহারও ইহার যোগ্যতা নাই। আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, কংগ্রেসের, তথা মুসলিম লীগের, তথা হিন্দু মহাসভার যে-সকল বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের স্কন্ধে, পূর্ণ স্বাধীনতা লব্ধ হইলে, দেশের শাসন-দায়িত্ব ন্যস্ত হইবার সমধিক সম্ভাবনা, তাঁহাদের কাহারও এই দায়িত্ব পালনোপযোগী যোগ্যতা নাই। আমাদের বিশ্বাস, দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমরা যথাযথ শাসননীতির শিক্ষা ব্যবস্থিত করিতে সমর্থ না হই, ততদিন পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তর্ক উঠিতে পারে যে, জলে অবতীর্ণ হইবার বিপত্তি ব্যতিরেকে সন্তরণ-শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। এই যুক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সন্তরণ-শিক্ষার্থ জলে অবতীর্ণ হইবার পরও কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি কিংবা দ্বিতীয় বস্তুর আশ্রয়ের প্রারম্ভে প্রয়োজন আছে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না আমরা প্রারম্ভিক কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হই এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন করিবার নিমিত্ত যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার সন্ধানে কৃতকার্য্য হই, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশজাতির সহায়তাগ্রহণে আমাদিগের লজ্জিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

পঞ্চম আলোচ্য হইতেছে—জার্ম্মানদের বিপক্ষে যাহাতে নিশ্চিত জয়লাভসম্ভব হয়, বাস্তবতঃ তৎপক্ষে ব্রিটিশ জাতির আমরা কি সাহায্য করিতে পারি?

জার্ম্মানদের বিপক্ষে ব্রিটিশজাতির জয় যাহাতে নিশ্চিত সম্ভব হয়, বাস্তবতঃ তৎপক্ষে ব্রিটিশজাতির আমরা কি সাহায্য করিতে পারি, তাহার সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ পর পর নিম্নলিখিত দুইটী বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে:—

(১) সাধারণতঃ যুদ্ধ-জয় বলিতে কি ধরিতে হয়।

(২) যুদ্ধে জয়লাভের সাধারণ উপায় কি।

উপরিলিখিত দুইটী বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, জার্ম্মানদের, তথা ব্রিটিশদের বর্ত্তমান অবস্থান কিরূপ। তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিব যে; জার্ম্মানদের পরাজিত করিতে হইলে ব্রিটিশজাতিকে কোন্ নির্দ্দিষ্ট পন্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে (অর্থাৎ জার্ম্মানদিগকে পরাজিত করিতে হইলে, ব্রিটিশজাতি কোন্ নির্দ্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে, স্পষ্টই বুঝা সম্ভব হইবে যে, ভারতবাসিগণ কর্তৃক জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশজাতির যুদ্ধ-জয়ার্থ কি প্রকার সাহায্যদান সম্ভব।

যুদ্ধ-জয় বলিতে সাধারণতঃ কি বুঝায়, তাহা স্থির করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, কোন্ উদ্দেশ্যে দুইটি দল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে, যে-দল ব্যক্তিগত কিংবা সম্পত্তির দিক্ হইতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি স্বীকার না করিয়া স্থায়ীভাবে স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয়, সেই দলকেই উৎকৃষ্ট ভাবে জয়ী বলিয়া ধরিতে হইবে।

প্রথমতঃ ইহার অর্থ এই যে, যদি কোন দল উদ্দেশ্যসাধনার্থ ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া স্থায়ী ভাবে স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয়, তবে তাহাকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জয়ী বলিয়া অভিহিত করা চলে না। এই দলকে বিজয়ী অভিহিত করা যায় বটে, কিন্তু সে বিজয় নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ ইহার অর্থ হইতেছে যে, যে-দল শত্রুপক্ষের কিংবা স্বপক্ষের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত ক্ষতি ব্যতীতই স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয়, উভয় দলের মধ্যে তেমন দলই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জয়ী, কেন না, উদার ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র মনুষ্যজাতি স্বভাবতঃ পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, কাহারও ক্ষতি হইলে শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে অপর সকলেরও পরিণামে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইবে বাধ্য।

তৃতীয়তঃ ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, যখন কোন দলই স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয় না, কিন্তু তথাপি উভয়

দলের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত ক্ষতি করিয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে যুদ্ধকে পাশবিক বলিয়া অভিহিত করিতে হয়।

যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সাধারণ ভাবে গৃহীত পন্থা কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমতঃ সন্ধানের চেষ্টা করিতে হইবে যে, পৃথিবীতে লিখিত ইতিহাসের মধ্যে এরূপ কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে কি না, যাহাতে কোন পক্ষের কোনরূপ জয় লাভ হইয়াছে। এরূপ কোন যুদ্ধের দৃষ্টান্তলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আমাদের পরবর্ত্তী সন্ধানের বিষয় হইবে, এই যুদ্ধে জয়লাভার্থ বস্তুতঃ কোন্ কোন্ উপায় গৃহীত হইয়াছিল। লিখিত ইতিহাস-কালে এরূপ কোন যুদ্ধের সন্ধানলাভে আমরা যদি অসমর্থ হই, যাহাতে কোন পক্ষ স্থায়ীভাবে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছে, তবে আমাদিগের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, লিখিত ইতিহাস-কালের মধ্যে মনুষ্যজাতি পরস্পর কেবল পাশবিক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে এবং ইহাদের গৃহীত পন্থাসমূহের অনুসরণে কোন উপকার হইতে পারে না। এমত ক্ষেত্রে যুদ্ধ-পরিচালনার এরূপ কোন ব্যবস্থা সম্ভব কি না, যদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জয়লাভ সম্ভব, তাহার সন্ধানকল্পে আমাদিগকে প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের মতে, লিখিত ইতিহাসের প্রারম্ভ-কাল খ্রীষ্টজন্মাবধি, কেন না তৎপূর্ব্ব কালের প্রচলিত ইতিহাস বিশৃংখলা ও পরস্পর-বিরোধিতায় পূর্ণ,—কার্য্য-কারণ পরীক্ষা বিচারে উহা টিকিতে পারে না। লিখিত ইতিহাস-কালের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, নিম্নের তালিকায় তাহা পাওয়া যাইবে:—

(১) খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠাকল্পে 'ক্রুসেড' (ধর্ম্ম-যুদ্ধ)সমূহ।
(২) রোমান সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ প্রাচীন রোমান জাতিদের যুদ্ধ।
(৩) মুসলমান ধর্ম্ম, তথা তুরস্ক সাম্রাজ্যর প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠাকল্পে মুসলমানগণের যুদ্ধ।
(৪) পাঠান সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ পাঠানগণের যুদ্ধ।
(৫) মোগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ মোগলগণের যুদ্ধ।
(৬) প্রুশায় সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ প্রুশীয়গণের যুদ্ধ।
(৭) ইস্পাহান সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ স্পেনের যুদ্ধ।
(৮) পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ পর্ত্তুগালের যুদ্ধ।
(৯) ওলন্দাজ সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ হল্যাণ্ডের যুদ্ধ।
(১০) ফরাসী সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ ফ্রান্সের যুদ্ধ।
(১১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, তথা উহাকে দৃঢ়ভিত্তিকরণার্থ ইংলণ্ডের যুদ্ধ।
(১২) রাজ্যবিস্তারপ্রয়াসে বর্ত্তমান জার্ম্মানীর যুদ্ধ।

যে-উদ্দেশ্যে উপরিলিখিত যুদ্ধসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষতঃ উহাদের যে ফল ফলিয়াছে, সযত্নে তাহা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ড এবং বর্ত্তমান জার্ম্মানীর ক্ষেত্র ব্যতীত, আর কেহই স্থায়ীভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্যলাভে কৃতকার্য্য হন্ নাই এবং প্রত্যেকটিতেই ব্যক্তিগত এবং সম্পত্তিগত ক্ষতি প্রচুর হইয়াছে। তাঁহাদের কাহারও উদ্দেশ্য স্থায়ীভাবে সাধিত হইলে, আমরা আজিও তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করিতাম। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। এমন কি, ইংলণ্ড ও বর্ত্তমান জার্ম্মানীর ক্ষেত্রেও, ইহা সত্য যে, এ পর্য্যন্ত এই দুই শতাব্দীকাল ধরিয়া তাঁহারা দৃশ্যতঃ কৃতকার্য্যতালাভে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু কে জানে ভবিষ্যতে ইহাঁদের অদৃষ্টেও কি আছে। সুতরাং ইহা সুনির্দ্দিষ্ট ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, লিখিত ইতিহাস-কালে সংঘটিত যুদ্ধসাহায্যে উৎকৃষ্ট বিজয়লাভ সম্ভব হয় নাই। ফলে উপরিলিখিত যুদ্ধসমূহে গৃহীত কোন পন্থাই অনুকরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ভারতীয় ঋষিগণের অথর্ব্ববেদ ও মনুসংহিতা যথাযথভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা উৎকৃষ্ট বিজয়লাভার্থ তিনটি পন্থার উল্লেখ করিয়াছেন। যথাক্রমে তাহাদের নাম:—

(১) ব্রাহ্ম-যুদ্ধ।
(২) ক্ষাত্র-যুদ্ধ।

(৩) বৈশ্য-যুদ্ধ।

বেদের নির্দ্দেশানুযায়ী ভূমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল লইয়া যে অণু-নিষ্পন্ন জগৎ, অথবা খণ্ডমণ্ডল* (বিশ্বজগৎ নহে), তাহার চতুষ্পার্শ্বে সূর্য্যের ক্রিয়া-ফল-লব্ধ সর্ব্বোচ্চ তেজোসম্পন্ন একটি প্রাগণুক জগৎ, অথবা অখণ্ডমণ্ডল বর্ত্তমান। চতুষ্পার্শ্বস্থ এই সর্ব্বোচ্চ তেজোসম্পন্ন অখণ্ডমণ্ডলের অস্তিত্ব, যিনি স্বকীয় মস্তিষ্কমধ্যে কি ভাবে দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হইতেছে, সম্পূর্ণ ভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহার দৃষ্টিমধ্যস্থতাতেও প্রমাণিত হইতে পারে। পৃথিবী এবং উপরিলিখিত চতুষ্পার্শ্বস্থ সর্ব্বোচ্চ তেজোসম্পন্ন অখণ্ডমণ্ডলের দূরত্ব, সূর্য্য এবং পৃথিবীর পরস্পর অবস্থান ও দূরত্বের তারতম্যানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ এই সর্ব্বোচ্চ তেজোসম্পন্ন অখণ্ডমণ্ডলই পৃথিবীর সকল জীবের প্রধান উপাদান যে তেজ ও রস তাহার আদি জনক। উল্লিখিত এই সর্ব্বোচ্চ তেজোসম্পন্ন অখণ্ডমণ্ডল এবং পৃথিবীর মধ্যস্থ দূরত্ব যখন সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে, তখন কোন প্রকার জ্বালানীর সাহায্য না লইয়াই বায়ু হইতে তেজ অথবা শক্তির উৎপাদন সম্ভব হয়। এই ভাবে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে যে তেজ অথবা শক্তির উৎপাদন সম্ভব হয়, তাহা আধুনিক বিদ্যুৎশক্তির ন্যায় মনুষ্য-প্রাণ-সংহারক হয় না, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই ইন্দ্রিয়জ্ঞান-বিলোপে তাহা সমর্থ হয়।

ব্রাহ্ম-যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হইতেছে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে উৎপন্ন এই তেজ অথবা শক্তির ব্যবহার। ব্রাহ্ম-যুদ্ধে প্রথমতঃ সমগ্র শত্রুব্যূহ ঘেরিয়া এই বায়ু-উৎপন্ন তেজ ও শক্তির একটি আবেষ্টনী রচনার প্রয়োজন, যাহাতে শত্রুপক্ষ এই আবেষ্টনী অতিক্রমে সমর্থ না হয়। বায়ু-উৎপন্ন তেজের এই আবেষ্টনী স্পর্শমাত্র মনুষ্যের ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় না বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হয়। এই ভাবে শত্রুপক্ষের বিহ্বলতা সাধিত হইলে, উভয় পক্ষের কোন ব্যক্তিগত কিংবা সম্পত্তিগত ক্ষতি সাধন না করিয়াই বিপক্ষকে আজ্ঞাদান সম্ভব হয়। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্ম-যুদ্ধ সর্ব্বদা সম্ভব নহে, কেন না, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে তেজোৎপাদনের কার্য্য সর্ব্বদা সম্ভব হয় না, এবং এমন কি, যখন এই নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে তেজোৎপাদন-কার্য্য সম্ভব হয়, তখনও যে-কেহ এই কার্য্য করিতে পারেন না। ব্রাহ্ম-যুদ্ধের এই বিষয় শুনিলে প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু অথর্ব্ববেদের অধ্যায়সমূহ শুদ্ধভাবে অধ্যয়ন এবং সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইহা পৃথিবীর আর সকল বস্তুর ন্যায়ই সত্য।

ক্ষাত্র-যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হইতেছে যোদ্ধার শরীরস্থ চতুর্দ্দশ অংশে সর্ব্বোচ্চ শক্তি-জননের সামর্থ্য। যে-যোদ্ধা এইভাবে তাঁহার দেহস্থ চতুর্দ্দশ অংশে সর্ব্বোচ্চ শক্তি-জননে সমর্থ হন, তিনি প্রতিপক্ষকে অন্ধ না করিয়াই তাঁহার স্বকীয় চক্ষুর শক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষের দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা লোপ করিতে পারেন। প্রতিপক্ষের কোন স্থায়ী অনিষ্ট না করিয়াই তিনি তাঁহার বাহুব, কিংবা পদদ্বয়ের, কিংবা অপরাপর সামর্থ্যেরও লোপ সাধন করিতে পারেন। এইভাবে শত্রুপক্ষের প্রাণ সংহার না করিয়া কিংবা কোনক্রমেই তাহার সম্পত্তিগত ক্ষতি সাধন না করিয়া শত্রুপক্ষকে আজ্ঞাবহ কিংবা পরাস্ত করা সম্ভব হয়। যোদ্ধার দেহস্থ চতুর্দ্দশাংশে উপরিলিখিত এই "সর্ব্বোচ্চ শক্তিজননে"র সামর্থ্যের বিকাশ কেবল তখনই সম্ভব, যখন চতুষ্পার্শ্বস্থ সর্ব্বোচ্চ তেজোসম্পন্ন অখণ্ডমণ্ডল পৃথিবী হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের গণ্ডী অতিক্রম করে না। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ক্ষাত্র-যুদ্ধ ব্রাহ্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা পরিশ্রমসাধ্য এবং ব্রাহ্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা ইহাতে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করিতে সময় অধিক অতিবাহিত হয়। ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ক্ষাত্র-যুদ্ধ সর্ব্বদা সম্ভব নহে, কেন না যোদ্ধার দেহস্থ চতুর্দ্দশাংশে সর্ব্বোচ্চ শক্তি-জনন-সামর্থ্যের বিকাশ—সূর্য্য এবং পৃথিবীর একটি নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের উপর নির্ভর করে।

যে-কালে ব্রাহ্ম-যুদ্ধ কিংবা ক্ষাত্র-যুদ্ধ সম্ভব হয় না, সেইকালে বেদের নির্দ্দেশ হইতেছে বৈশ্য-যুদ্ধ। বৈশ্য-যুদ্ধের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হইতেছে যে, আহার্য্য ও কাঁচামালের অভাব অথবা রাগদ্বেষ-উন্মেষকারী কুশিক্ষার প্রভাব ব্যতিরেকে বিপক্ষের যুযুৎসু ভাব উপস্থিত হইতে পারে না। বৈশ্য-যুদ্ধের প্রকরণে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যখন সূর্য্য ও

* এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য গত পৌষ সংখ্যার সম্পাদকীয় সন্দর্ভ "সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষা-জ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক হিন্দুয়ানী" দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর দূরত্ব-নিবন্ধন কিংবা মনুষ্যজাতির অজ্ঞতা-নিবন্ধন ব্রাহ্ম অথবা ক্ষাত্র-যুদ্ধ অসম্ভব হয়, তখন পৃথিবীব্যাপী সর্ব্বত্র আহার্য্য ও কাঁচামালের অভাব এবং রাগ-দ্বেষ উন্মেষ-কারী কুশিক্ষার প্রভাব উপস্থিত হয়। এই সময়ে প্রত্যেক দেশে যুযুৎসু ভাব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহা নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, বিপক্ষের নিকট আত্ম-সমর্পণ এবং সে যে-বাঞ্ছা যাচ্ঞা করে, তাহাই তাহাকে প্রদানে স্বীকৃতি—যদি অবশ্য সেই রাজ্যস্থ প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূরীকরণে সমর্থ কোন প্রয়োগ-যোগ্য পরিকল্পনা সে উপস্থিত করিতে পারে। শত্রু-সমক্ষে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে অবিলম্বে তাহার ফল দাঁড়ায় এই যে, জগতের অপর সকল জাতি শত্রুর বিপক্ষে আন্তরিক ভাবে মিলিত হয় এবং সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, যে-পক্ষ যুযুৎসু মনোভাব পরিচালিত কিংবা শারীরিক বলের দম্ভে স্ফীত, সে কখনও যে-পরিকল্পনা দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূরীকরণে সমর্থ, তাহা গঠন করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে না। উপরিলিখিত প্রস্তাবের ফল সুতরাং দাঁড়ায় যে, সমগ্র জগৎ সংঘর্ষোন্মুখ জাতির বিরুদ্ধে মিলিত হয় এবং সমগ্র রাজ্যের অধিকার লাভ করিলেও সংঘর্ষোন্মুখ জাতি যে, যে-রাজ্য-জয়ের জন্য তাহার সংঘর্ষ, সে-রাজ্যের সু-শাসন ব্যবস্থিত করিতে অসমর্থ, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। এই ভাবে উভয় পক্ষের কোন প্রকার ব্যক্তিগত অথবা সম্পত্তিগত ক্ষতি সাধন না করিয়াও শত্রুপক্ষের সংঘর্ষোন্মুখতার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধিত হয়।

ইহাকেই বৈশ্য-যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান জগতের, তথা ইউরোপীয় যুদ্ধের সমগ্র অবস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় বেদ-নির্দ্দিষ্ট বৈশ্য যুদ্ধের এই যথার্থ ক্ষণ এবং যদি ব্রিটিশ-জাতি যুদ্ধের এই পন্থা গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা যাহাতে অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত জয়ী হইতে পারেন, তৎকল্পে ভারত যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

আমরা দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, সে পন্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহা বলের বিপক্ষে বল-প্রয়োগের সমার্থক, এবং তাহাতে কোন পক্ষের নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেও, উভয় পক্ষস্থ বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণনাশের এবং প্রচুর সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা জ্ঞাত আছি যে, জার্ম্মান শাসকবৃন্দ যে পাশবিকতা-গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইবার সম্ভাবনা এবং তাঁহারা কোনরূপ বিবেচনা-বুদ্ধির ধার ধারিবেন না। কিন্তু আমরা ভরসা রাখি যে, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ-স্তরস্থ হইয়া সময় থাকিতে সতর্কতা অবলম্বনে সমর্থ হইবেন।

* "দি উইকলি বঙ্গশ্রী"র ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভের অনুবাদ।

তাণ্ডবনৃত্য

…পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব লইয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখন কাল পৃথিবীর সমস্ত চরাচর জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে। তখন মানুষ ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্ববুদ্ধি, জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পড়ে এবং তাহার জীবন প্রায়শঃ কান্নাময় হইয়া থাকে। ইহারই নাম মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য। ইহার পর আবার যখন পৃথিবী ক্রমশঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করে, তখন আবার কাল পৃথিবীর সমস্ত চরাচর জীবের পক্ষে ক্রমশঃ মঙ্গলপ্রদ হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখন মানুষ তাহার অজ্ঞানতাবশতঃ গরলকে অমৃত মনে করে এবং অমৃতকে গরল মনে করে। তাহার ফলে, তখন মানুষের ভাগ্যাকাশে কান্নাই থাকিয়া যায়। ইহারই নাম মানুষের তাণ্ডবনৃত্য। এই সময় মানুষ যদি প্রকৃত বুদ্ধি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সতর্ক হইতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসেই আবার তাহার হাসির দিন উপস্থিত হয়। নতুবা মানুষে মানুষে দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ এবং রক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং ঐ রক্তপাতসহকারে শ্মশানভূমির উপর আবার মানুষের সুখের দিন উপস্থিত হয়। আমাদের মনে হয়, পৃথিবী আবার ক্রমশঃই চন্দ্র ও সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।…

একটি গ্রীক উপাখ্যান

—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুনীল ভূমধ্যসাগরের বুকে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সাইপ্রাস দ্বীপ। দ্বীপের দক্ষিণে সুন্দরী আমাথাস্ নগরী। দক্ষিণা বাতাসে নীল সাগরের ছোট ছোট ঢেউ আসিয়া তাহার পায়ে টলিয়া পড়িতেছে। শাদা, লাল নানা রঙের বাড়ীগুলি নগরীর বুকে বহু বিচিত্র কুসুমের সুগ্রথিত একখানি মালার মত বিলম্বিত রহিয়াছে। পশ্চাতে বনানী-মণ্ডিত ভূমি ক্রমে উঁচু হইয়া পাহাড়ে মিশিয়াছে।

এই আমাথাস নগরে ভাস্কর পিগম্যালিয়নের শিল্পাগার। শিল্পী এরূপ একাগ্রমনে চিরজীবন শিল্পসাধনা করিয়া আসিয়াছে যে, পৃথিবীতে আর কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-প্রমোদ কিছুই তাহাকে শিল্পের সাধনা হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। কাজের ভীড়ে অন্য কিছুরই ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসরও ছিল না। পিগম্যালিয়নের সৃষ্ট পাষাণ-প্রতিমা অভিজাত-মণ্ডলীর প্রমোদোদ্যানের, বিলাসগৃহের, সকল দেব-দেবীর মন্দিরের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। গ্রীসের পুরাণ-কাহিনী পিগম্যালিয়নের এমনই নখ-দর্পণে যে, সেই সকলে বর্ণিত দেব-দেবী, গন্ধর্ব্ব, বীরপুরুষ ও সুষমাময়ী নারীর মূর্ত্তি তাহার চোখে যেন জীবন্তই ছিল, সে ভালরূপেই জানিত সেগুলিকে কি করিয়া পাষাণ-ফলকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয়। তাই অন্য কোন শিল্পীর কার্য্য লোকের মনে ধরিত না। যশ ও অর্থের তাহার সীমা ছিল না, কিন্তু শিল্পী পিগম্যালিয়নের সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। গুরুর নিকট শিক্ষানবিশী করিতে করিতে কখন কিরূপে যে যশস্বী ও স্বাধীন শিল্পী হইয়া উঠিয়াছে তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত বলিতে পারিত না। প্রকৃতি তাহার অজ্ঞাতে তাহার দেহের উপর কাজ করিয়া চলিয়াছে। বালক পিগম্যালিয়ন যে কখন বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের মোহময় কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাহার একাগ্র সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইতে কেহ তাহার আশ্রমে আসিয়া তাহাকে বিড়ম্বিতও করে নাই।

সে সমুদ্রজলে সাঁতার দিতে ভালবাসিত, তীর-ধনুক লইয়া বনে বনে হরিণের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত, কিন্তু কেহ কোনদিন তাহাকে শিকার করিয়া আনিতে দেখে নাই। সে ফুলফল লতাপল্লবে তার উদ্যানখানি স্বপ্নের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিত, ও যখন সে ভাস্কর্য্যশালায় ব্যাপৃত থাকিত না, তখন কোন লতাকুঞ্জের মধ্যে নব দূর্ব্বাদলের উপর তার তরুণ কন্দর্পের মত তনুখানি বিছাইয়া কবিতার মধ্যে ডুবিয়া যাইত। কবিতার রাজ্য যে কখন কল্পনার রাজ্যে মিশিয়া যাইত তাহা সে জানিতে পারিত না; নীলাকাশে নক্ষত্রের পংক্তি জ্বলিয়া উঠিলে জ্ঞান হইত যে কবিতা পড়িতে পড়িতে আপনার মনের কল্পনায় ডুবিয়া গিয়াছে।

বসন্তের প্রথম চুম্বনে আজ প্রকৃতির সারা দেহ ব্যাপিয়া একটা অপূর্ব্ব মাদকতা জাগিয়া উঠিয়াছে, গাছগুলি অহেতুক সারা অঙ্গে কুসুমের আভরণ পরিয়া যেন কার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, সাগরতীর হইতে একটা মাতাল বাতাস স্খলিত-পদে আসিয়া পুষ্পিত লতাগুলির কাণে কি যেন বলিয়া যাইতেছে, আর তাহারা আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। একটা অহেতুক বিষাদে আজ পিগম্যালিয়নের মনটা ভরিয়া উঠিয়াছে। সে বুঝিতে পারিতেছে না কোন্ অজ্ঞাত ব্যথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ব্যর্থতায় তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা আজ ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ শূন্যতা ত' সে কোনদিন অনুভব করে নাই।

তাহার মনে হইল, সারাদিন কবিতা পড়িয়া বৃথা কল্পনা-বিলাসে কাটাইয়াই বোধ হয় এত খারাপ লাগিতেছে। বাড়ীতে গিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া কাজে লাগিবে ভাবিয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই মুক্তদ্বার-পথে ভাস্কর্য্যশালার ভিতরে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার নিজের হাতের কাজ চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত,—কোন মূর্ত্তির কতকটা খোদাই হইয়াছে, শ্বেতপঙ্কে প্রস্তুত কয়েকটা নমুনা অনুমোদনের অপেক্ষায় এক কোণে সাজান আছে, খোলা

জানালা দিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে, সদ্য-আনীত এক খণ্ড নাতিবৃহৎ দুধের ফেণার মত শাদা মার্ব্বেল, প্রস্তরের উপর, ঋজু ভাবে দাঁড় করান আছে। সে মৃদু পদবিক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িতে লাগিল কোন্ পৃষ্ঠপোষকের আজ্ঞায় কোন্ মূর্ত্তিটি সে গড়িয়াছে, মনে পড়িতে লাগিল মূর্ত্তিটিকে কল্পনার গড়িয়া তুলিতে তাহাকে কত গ্রন্থ ঘাঁটিতে হইয়াছে, কত আলোচনা—কত সাধনা করিতে হইয়াছে। এই আজ্ঞাবহের কাজ, এই পরের মনের অস্পষ্টতাকে নিজের বুকের রক্তে রঞ্জিত করিয়া স্পষ্ট করিয়া তোলার গ্লানি আজ তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, চিরকাল কি ফরমায়েসই খাটিব, আমার নিজের কি কিছুই করিবার নাই, নিজের আত্মাকে তৃপ্ত করিবার জন্য কি কিছুই সৃষ্টি করিতে পাইব না? শ্বেত মার্ব্বেলখানার দিকে চাহিতেই একটা বাসনা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল। কয়েকদিন পরেই আফ্রোদিতি দেবীর বাৎসরিক উৎসব, আমাথাসের মদনোৎসব। অদৃশ্যা রতিদেবীকে সম্বোধন করিয়া পিগ্‌ম্যালিয়ন বলিয়া উঠিল,—দেবী, অধম সেবককে কৃপা কর, এই জড় পাথরখানা হইতে এমন সুন্দরী নারীমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিব, যেমন জগতে আর কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না। বলিয়াই যন্ত্র লইয়া জড় পাথরখানাকে লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া সূর্য্যের শেষ রশ্মি প্রস্তরখণ্ডটাকে আলোকিত করিয়া রাখিল। ক্রমে ভাস্কর্য্যশালার অন্যান্য মূর্ত্তি ঘনায়মান সান্ধ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। যে যখন কার্য্য ত্যাগ করিয়া উঠিল, তখন সেই জড় প্রস্তরের ভিতর হইতে একটি মূর্ত্তির অস্পষ্ট আকার দেখা যাইতেছে।

কয়েকদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম চলিতে লাগিল। বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কেহ ডাকিয়া সাড়া পাইল না। ভিতরে কার্য্যের শব্দ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু শিল্পী তন্ময়, কোন আহ্বান তাহার কাণে পশে না। সকলে বিফল হইয়া ফিরিয়া গেল। শিল্পী সমস্ত জীবন ধরিয়া যত কিছু সৌন্দর্য্য তিলে তিলে আহরণ করিয়াছে, কাব্যে পড়িয়াছে, চোখে দেখিয়াছে, কল্পনায় আঁকিয়াছে, সমস্ত যেন পুঞ্জীভূত হইয়া এই পাষাণ-প্রতিমায় স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিতেছে। শিল্পীর অন্তর-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তি দেখা দিল। এতদিন শিল্পী যখনই ক্লান্ত দেহে সুসজ্জিত উদ্যানে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছে, তখন কিছুই সে দেখিতে পায় নাই, ধ্যাননেত্রে সেই অসম্পূর্ণ পাষাণ-পুত্তলীর দেহই দেখিয়াছে, উত্তপ্ত দেহে যখন স্নিগ্ধ সাগর-সলিলে নামিয়াছে তখন সেই পাষাণময়ীর শীতল স্পর্শই পাইয়াছে। ক্রমে সকল চেষ্টার অবসান হইয়া আসিল, মূর্ত্তি সুসম্পন্ন হইল। বামহস্তে একটি মৃণাল অর্দ্ধস্ফুট লীলাপদ্ম, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উন্নত ও সম্মুখে প্রসারিত, মুখে অনির্ব্বচনীয় কোমলতা ও মাধুর্য্য, প্রোদ্ভিন্ন স্ফুরিত অধরের অবকাশে কুন্দদন্তশ্রেণী অল্প দেখা যাইতেছে। শিল্পী শেষ দিনে চোখ দুটিতে শেষ টান দিয়া দুটি কজ্জলের স্থূলবিন্দু দিয়া দৃষ্টিদান করিল। কি সুন্দর দৃষ্টি—দৃঢ়তা, কোমলতা, শান্তি, পবিত্রতা ও অসীম অগাধ প্রেম। এ দৃষ্টি আমাদের জগতের, আবার আমাদের জগতেরও নয়।

দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া শিল্পী তন্ময় হইয়া গেল, তাহার দুই হাত হইতে কখন যন্ত্রপাতি পড়িয়া গেল। সে পাষাণ-প্রতিমার পদতলে বসিয়া পড়িল। "তুমি এসেছ! আমার হৃদয়ের কোন্ অন্তঃপুরে এতদিন তুমি অসূর্য্যম্পশ্যা হয়েছিলে? আমি যে সারা জীবন তোমাকেই খুঁজেছি! পাথর কেটে কেটে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। এই হাত দিয়া কত কিছু মূর্ত্তিই বেরিয়েছে, কোথাও তোমার অবয়বের এক টুকরা পেয়েছি, ঐ হাত দু'খানি বা ঐ চরণ দু'খানি, কোথাও ঐ গ্রীবার ভঙ্গীটি মাত্র। ও দৃষ্টি কোথাও পাই নাই! সম্পূর্ণ করে যে তোমায় কোথাও পাই নাই! কেবলই চেয়েছি, কেবলই চেয়েছি, সমস্ত হৃদয়, আমার সমস্ত অস্তিত্ব তোমার জন্যে ব্যথিয়ে উঠেছে, দেখা পাই নাই। কেবলই আরাধনা করেছি, তপস্যা করেছি। এতদিনে সময় হল! দেখা দিয়েছ?" আরও কত কি প্রলাপ বলিয়া যাইতে লাগিল তাহার হিসাব নাই, যেন এ পাষাণ-প্রতিমা সত্যই জীবন্ত নারীমূর্ত্তি!

ভাস্কর্য্যশালার প্রাকৃতজনের চোখের সামনে এই মানস প্রতিমাকে রাখিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, আপনার গ্রন্থাগারে লইয়া গেল। এই খানেই গ্রীসের অতীত তাহার কাছে মূর্ত্ত হইয়া উঠিত, ইহা শিল্পীর সাধনার আসন। সারি সারি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, বিখ্যাত কবিগণের, শিল্পীগণের মূর্ত্তি, চিত্র চারিদিকে সজ্জিত। একটি নাতি-উচ্চ বেদিকার উপর সে মূর্ত্তিটি স্থাপিত করিল, ও সম্মুখে একটি বেদিকা রাখিল। শিল্পী আপনার উদ্যান হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ সুগন্ধ সদ্যস্ফুট কুসুম আনিয়া প্রতিমার পদতলে সাজাইয়া দিল। ধূপাধারে সুগন্ধ ধূপ জ্বালাইয়া দিল, সমস্ত কক্ষটি সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শিল্পী সমস্ত নগর খুঁজিয়া বহুমূল্যে দুষ্প্রাপ্য সুন্দর অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া প্রতিমার সারা অঙ্গ সাজাইল, মাথায় স্বহস্তে সযত্নে রচিত পুষ্পপল্লব-জড়িত সুন্দর মুকুট বসাইয়া দিল।

এই কয়দিন যে কোথায় দিয়া কাটিয়া গিয়াছে শিল্পী তাহা জানিতে পারে নাই। আমাথাসে আফ্রোদিতি উৎসব মদন মহোৎসব। সুসজ্জিত রথে রতিদেবীর প্রতিমা চড়াইয়া নগরে যুবক-যুবতীরা শোভাযাত্রা করিয়া গীতবাদ্য সহযোগে

আসিতেছে। এই শব্দে এতদিন পরে আজ বাহ্যজগৎ পিগম্যালিয়নকে স্পর্শ করিল। আমাস্থাসের মন্দিরের এই আফ্রোদিতি মূর্ত্তি ত' তাহারই সৃষ্টি—লোকে বলে এরূপ সুন্দর দেবীমূর্ত্তি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। নাগরিকেরা তাহাকে কি সুন্দর করিয়াই না সাজাইয়াছে, আর কি সুন্দর গানই না তাহারা আজ গাহিতেছে। গানের সুরে কোন্ ভাব প্রকাশ হইতেছে বোঝা যায় না, ভক্তি, না ভালবাসা, না অনুরাগ, না উপাসনা।

পিগম্যালিয়নের ইচ্ছা হইল এই শোভাযাত্রায় সেও যোগ দেয়। বেশভূষা করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। নগরের ও নগরের উপকণ্ঠে সমস্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় শোভাযাত্রা আফ্রোদিতি মন্দিরে ফিরিয়া আসিল। আলোকমালা, সঙ্গীত ও নৃত্যগীতের মধ্যে পূজা সমাপন হইয়া গেল। একে একে পূজারীর দল বিদায় লইতে লাগিল। যাহাদের বিশেষ কামনা আছে তাহারা তখনও মন্দিরে রহিয়া গেল। প্রতিমার সম্মুখে যজ্ঞকুণ্ডে অঞ্জলি ভরিয়া গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া যে যাহার কামনা জানাইতে লাগিল। পিগম্যালিয়ন বাছিয়া বাছিয়া মৃদুগন্ধোদ্গারী কয়েকটি দ্রব্য লইয়া অঞ্জলি পুরিয়া আহুতি দিল—"দেবি! আজ আন্তরিক আগ্রহে যে যাহা প্রার্থনা করে, তুমি তাহা পূর্ণ কর। আমি হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষ করিয়া এক পাষাণ-কুমারী গড়িয়াছি। তুমি তাহাকে প্রাণের স্পর্শ দাও, যেন সে আমার জীবনের সঙ্গিনী হয়।" হোমকুণ্ডের অগ্নি ইন্ধন-স্পর্শে জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নিজিহ্বা দেবীর ললাট পর্য্যন্ত উঠিয়া নির্ব্বাপিত হইল ও সুগন্ধি ধূমে দেবীপ্রতিমা অদৃশ্য হইয়া গেল। পিগম্যালিয়ন চাহিয়া দেখিল সকলে চলিয়া গিয়াছে, মন্দিরে সে একা, দ্বাররক্ষী দ্বার বন্ধ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহারই হাতে গড়া সুন্দর শীতল পাষাণ-পুত্তলী। পিগম্যালিয়ন বাহির হইয়া আসিল।

সে ধীর পদে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে হইতেছিল আজ যেন দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে সে জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্য্যশালার দিকে চাহিয়া মনে হইল সে যেন বহুদিন সেখানে প্রবেশ করে নাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার মনে পড়িল সে এইখানেই কাজ করিয়াছে। কিন্তু এসব ত' সে কিছুই দেখে নাই। ধূলিতে ঘরটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, পরিষ্কার করার কথা ত' তাহার একবারও মনে হয় নাই। অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি ও মৃদবয়বগুলির দিকে চাহিয়া মনে পড়িল সে কত লোকের কাজের ভার লইয়া রাখিয়াছে কিছুই করা হয় নাই। অন্যমনস্কভাবে বাসগৃহের দিকে চলিল। পাশেই গ্রন্থাগার। এই কয়দিনের অক্লান্ত সাধনার ফল তরুণী মূর্ত্তিটি দেখিতে একবার দ্বার খুলিল।

কিন্তু এ কি? সে মূর্ত্তি ত' নাই। কোথায় গেল, কে হরণ করিল? শিল্পীর মনে হইল তাহার জীবনের এক অংশ কে যেন জোর করিয়া ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন সময় শুনিতে পাইল তাহার পাশেই বীণানিন্দিত কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "এই যে আমি এসেছি।" ফিরিয়া দেখিল তাহারই সৃষ্ট পাষাণ-বালিকা, তাহারই প্রদত্ত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহারই দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, —যেমনটি সে তৈয়ারী করিয়াছিল। পরণে যে বাসন্তী রঙের সাড়ীটি মন্দিরে আফ্রোদিতি মূর্ত্তির অঙ্গে জড়ান ছিল তাহাই। কিন্তু এ কি, তাহার নয়নে পলক, কণ্ঠে স্বর, মৃদুশ্বাসে সুগঠিত বক্ষ স্পন্দিত হইতেছে। পিগম্যালিয়ন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "তুমি আমায় এত করে চেয়েছিলে, আমি এসেছি। আমাকে কি আর তুমি চাও না?" পিগম্যালিয়নের চমক ভাঙ্গিল। দেবী তাহার আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, পাষাণ-প্রতিমার প্রাণের স্পর্শ দিয়াছেন। বালিকার প্রসারিত হস্তে হস্ত দিয়া বুকে টানিয়া লইল। "তোমায় যে সারা-জীবন ধরে' চেয়েছি। দেহের প্রতি অণু-পরমাণু দিয়ে, রক্তের প্রতি কণিকা দিয়ে, আমার জীবনের সকল সাধনা দিয়ে, জন্মজন্মান্তরের সকল বাসনা দিয়ে তোমায় চেয়েছি। তোমায় পেয়ে আমার জীবন পূর্ণ হ'য়ে উঠল, চরিতার্থ হ'ল, সার্থক হ'য়ে উঠল।" তার পরই, "বল ত আমায় তুমি কি করে' এলে। আমি তোমার পাষাণ-মূর্ত্তি দেখে গিয়েছিলাম।" বালিকা বলিল, "সব ত জানি না। আমি জেগে দেখলাম আমি তোমার পড়ার ঘরে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছি ও আমার সামনে এক মহামহিমময়ী সুন্দরী দাঁড়িয়ে আমার ললাট স্পর্শ করছেন। আমার চোখ খুলতেই পরম স্নেহে আমার ললাটে একটি চুম্বন দিয়ে বললেন, 'গালাতিয়া, তুমি জেগে ওঠ, পিগম্যালিয়ন তোমার জন্য অপূর্ব্ব তপস্যা করেছে। তার জীবন পরিপূর্ণ করে তুলো।' বলেই আমায় তাঁর পরিচ্ছদ পরিয়ে দিলেন। সে চুম্বনে যে কি আছে জানি না, আমার সারা অঙ্গ ভরে' সেই চুম্বনের আনন্দ এখনও হিল্লোলিত হচ্ছে। মনে হ'ল যুগযুগান্তের অবসাদ আমার অঙ্গ থেকে সরে গেল, আর তোমার জন্য প্রাণ উতলা হ'য়ে উঠল।" পিগম্যালিয়ন আবার বলিয়া উঠিল, "গালাতিয়া, তুমি আমার জীবন সার্থক করে তুললে।"

গালাতিয়ার মুখে একটু বিষাদের ছায়া খেলিয়া গেল, "তা' ত জানি না। তুমি আমায় যা' দিয়েছ তা-ই আমার দেওয়ার আছে, তার বেশী ত' কিছুই নাই। তাইতে যদি সার্থকতা খোঁজ ত পাবে।" অজ্ঞাতে পিগম্যালিয়নের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। শিল্পের ইতিহাস অনন্তকাল এই অজ্ঞাত দীর্ঘশ্বাসটি বহন করিয়া আসিতেছে।

ভারতীয় পিগ্‌ম্যালিয়ন

ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পণ্ডিত নেহেরুর রচিত। মিঃ গান্ধী তাঁহাকে ভারতীয় অপেক্ষা ইংরাজ ভাবাপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতের 'আত্ম-চরিত' পাঠ করিতে গিয়া ইহা অনেকের মনে হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে ব্রিটিশজাতির দায়িত্ব বর্ত্তমান, কেন না তাঁহারাই তাঁহার চরিত্র ও প্রচণ্ড জাতীয়তা-বোধের জন্মদাতা। মিঃ গান্ধী সত্যই বলিয়াছেন.

মা

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জগুবাবুর বাজারের মোড়টায় ব্যোমকেশ নিমের মাজন বিক্রি ক'রত, সকালে বিকালে। নামে না চিন্‌লেও ও-তল্লাটে প্রায় সব লোকই ওর মুখ চিনত। তার কারণও ছিল। বাউলদের মত বিপুল গোঁফ-দাড়ি। তাতে হাত প'ড়েনি নর-সুন্দরের, অর্থাৎ নাপিত ভায়ার,—সে বহু-কাল;—বোধ হয় সেই জেল থেকে বার হওয়ার পর থেকেই। মিশ্‌-কালো থেকে "কটিয়ে" শেষ পর্য্যন্ত সাদায় এসে দাঁড়িয়েছে—তাও আবার তামাকের ধোঁয়া আর তেলের কৃপায় বর্ত্তমানে কতকটা যাত্রা-দলের ব্রহ্মার চুলের আকার ধারণ করেছে।

বয়স হ'য়েছে, তাই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে কষ্ট হয়। একটি নীচু টুলের উপর ব'সে ব্যোমকেশ হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে একটু হেসে—চোখ দুটির পাশ কুঁচ্‌কে মিনতি-ভরা মিঠে সুরে রাহীকে বলে: 'মশাই শুনচেন!'……শালিক-ছাতার-চড়াই-এর কিচির-মিচিরের মধ্যে—"বৌ কথা-কও" যেমন সুস্পষ্ট মধুর—এ তেমনি। ভিড়ের কোলাহলের মধ্যে তোমাকে একবার দাঁড়িয়ে ফিরে দেখতে বাধ্য ক'রবেই ক'রবে। গোল সুরেলা আওয়াজটি।

"এই মাজন, এই নিমের মাজনে—দাঁত শক্ত হয়, চক্‌চকে হয়, মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক ক'রতে থাকে—দাঁত পড়ে না; ব্যথা হবে না, শুলো……এই, এক পয়সা, দু'পয়সা, চার পয়সায় বড় কৌটা……একবার ব্যাভার ক'রলে…… চির কাল……"

তা যেন যত জরুরী কাজেই চ'লেছ তুমি; থম্‌কে দাঁড়াতেই হবে আর ব্যোমকেশ মুস্তফির সেই আবেগময়ী আবেদন-বাণী তোমার মনকে একটু বিভ্রান্ত, একটু নুইয়ে নিয়ে—পকেটে হাতখানা পুরে—একটা পয়সা ফেলে দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে শেষ পর্য্যন্ত ব'ল্‌বে তুমি……কিন্তু এ ঢের ভাল—বুড়ো তো ভিক্ষে ক'রলেই পারত!

ব্যাপারটা এইখেনেই শেষ হয় না। মনের চাকাটা চ'লতেই থাকে। তাই তো। বিস্ময়; কৌতূহল—তার পর প্রশ্ন ওঠে—জগতের খোদ-কর্ত্তার ওপর। এই বয়সে—কেন ছেলে-পুলে কেউ নেই? ব্যাপার কি?

ব্যাপারটা কি তাই বলি:—

ব্যোমকেশের বাড়ীতে আছে একটি বিধবা মেয়ে। নাম মুছি। মেয়েটির বয়স ঠাহর করা শক্ত; সতেরো হ'তে পারে—আবার সাতাশ হ'লেও আশ্চর্য্য হওয়ার বিশেষ কিছুই নেই।

আশ্চর্য্য হওয়ার আসল ব্যাপারটা কিন্তু তার গতোর। তাঁত-ঘরের চর্‌কির মতো তার নেই এক তিল অবসর। বুড়ো বাপ আর অন্ধ এক ভাই। নাম তার গোমদা।

মুছি আর গোমদা শুনে যদি কেউ মনে করে যে, ব্যোমকেশের কাব্য ছিল না, তা' হলে ব্যাপারটা অত্যন্ত অবিচারে গিয়ে দাঁড়ায়।

একদিন ব্যোমকেশের জীবনেও এসেছিল বসন্ত, তার নব নব আনন্দের বিলাস এবং আতিশয্য বহন ক'রে… যৌবন-স্বপ্নের সেটি সোনালি ফানুস।

তার বাবা ছোট আদালতে আনাগোনা ক'রে বেশ দু-পয়সা ঘরে আনতেন। বস্তি-মহলে একখানা বাড়ীও উঠেছিল: আর একখানা ছ্যাকড়া ঠিকেগাড়ীও; ভাড়াও খাটত আর রাত-বিরেতে মুনিবের কাজেও লাগত।

সেই সময় ব্যোমকেশ বিপর্য্যয় ভাবে প্রেমতন্তুতে জড়িয়ে বাপকে ডোন্ট-কেয়ার ক'রে তফাৎ হ'য়ে গেল।

মেঘ-মেদুরতা না কাটতেই অন্ধ গমক এলেন; জ্ঞান-যোগের ডম্বরু বাজিয়ে। তারপর, মূর্চ্ছনা…চোখের গোল না থাকলেও, কানে খাটো। তারপর জীবন-সঙ্গীতে তেহাই বরদাস্ত হ'ল না। ব্যোমকেশ বিপত্নীক হ'ল।

গমক-মূর্চ্ছনা যে কি ক'রে গোমদা আর মুছিতে পরিণত হ'তে পারে সে চিন্তা করার লোক এ-দেশে আছে। পাঠক দয়া ক'রে—সেই তথ্যটা তাঁদের কাছে সংগ্রহ ক'রবেন।

পদ্মপুকুরের কাছাকাছি একট এঁদো গলিতে একখানা ওসাবে খাটো, লম্বায় বড় তেতালা-বাড়ীর উপর-তলায় থাকৃত বাড়ীওয়ালা নিজেই। কেশো রুগী। ঐ বাড়ীখানার প্যাটার্ণে সেও ঠিক ওসারে খাটো, লম্বে দিগ্‌ধড়িয়া। আবার সেই সঙ্গে হাস্তরসিকের, অর্থাৎ শ্রীমান্ ভগবানের পরম পরিহাস—গিন্নীটি ছিলেন একটি মাংসের পিণ্ডাকৃতি। অতিবিক্ত মেদের উৎপাতে চলার শক্তি পর্য্যন্ত রহিত।

এই যে ব্যাধির নিগড়ে পরস্পর-বাঁধা দম্পতিটি—এদের হেফাজতের ভার ছিল আমাদের কর্ম্মতৎপর শ্রীমতী মুছির হাতে। তার পুরস্কার স্বরূপ নীচের তালায় দক্ষিণ-পশ্চিম চাপা উত্তরে খোলা একটি অন্ধকূপ দর-দালান—তারা অমনি থাকৃতে পেয়েছিল।

এ ছাড়া আরও কিছু-কিছু মুছি যা পেত তা খুশীর সওদা; খুসবক্‌তি—যাকে বলে বক্‌শিশ্। তার খোঁজ ব্যোমকেশের থাকৃত না।

গোমদাকে রাত চারটের সময় তুলে, নাইয়ে, গুড় ছোলা খাইয়ে মুছি দিয়ে আসত বালিগঞ্জের মোড়ে একটি বেঁটে, ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায়।

গোমদা সেখানে বসে, দাঁড়িয়ে গাড়ি একখানা এলেই চীৎকার করে বলত "বাবু অন্ধকে দয়া করুন···ভগবান তোমার ভাল করবেন···"

তার আশমানি রং-এর হাতকাটা জামাটা আলোবাতাসে ফিকে হয়ে গেলে মুছি আবার রঙ্গিয়ে দিত।

ব্যোমকেশের ইচ্ছে বিকেলেও গোমদা ভিক্ষেতে বেরোয়; কিন্তু তা ভাই-বোনের ইচ্ছে নয় বলে ঘটে উঠত না।

গোমদা একটু ভোজন-বিলাসী ছিল; তা ছাড়া সারা সকালটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্ষিদেয় নাড়ী তার জ্বলে যেত। তাই তার-খোরাকও ছিল একটু গিয়ে বিপর্য্যয় ধরণের।

খাওয়ার পর, মাদুর পেতে শুইয়ে দিলে, সে-খানিকটা কুম্ভকর্ণের মত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিলে, মুছি চারটের পর তাকে কলতলায় বসিয়ে রাজ্যের পোড়া বাসন দিয়ে বলত লক্ষ্মীটি আমার; দাদাটি আমার! তখন গোমাদা নিষ্প্রভ চোখ দুটোর সাদাটা বার করে দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে বাহুবলের একটা কসরৎ দেখিয়ে দিত। এই দিনের শেষ কাজ; তারপর, সে একটা ছোট ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে যেত ওস্তাদের বাড়ীতে গান শিখতে।

এই খেনেই ভাই-বোন কল্পনায় ভবিষ্যতের একটি কল্পলোক গড়ে মহানন্দে বাস করত। সেখানে বুড়ো ব্যোমকেশের কোন প্রবেশই ছিল না।

দোতালার ফ্লুটে কোকিল এক একদিন আচম্বিতে ডাকৃতে সুরু করে দিলে গোমদার মুখ হর্ষ বিকশিত হয়ে উঠত। তার আলোহীন চোখের কাল পর্দ্দায় যে-সব অদ্ভুত ছবি ফুটে উঠত, তার সন্ধান শুধু জানা ছিল কিছু কিছু মুছিরই।

সে তার পিঠে আদর করে হাত দিলে ঢুলি-পড়া চোখ দুটো ডাগর করে—এক গাল হাসি হেসে গোমদা বলত··· "আচ্ছা মুছি একদিন এমনি দিনে দুজনে সিনেমায়···"

"চুপ—চুপ ··বাবা শুনতে পাবে···"

বাবা ছিল তাদের প্রকাণ্ড একটা বাধা। যেন অরালি পর্ব্বত!

গোমদা আবার কি বলতে যায়। থাবা দিয়ে মুছি তার মুখ বন্ধ করে দেয়।

সন্ধ্যের পর ব্যোমকেশ গোবিন্দ ঘোষালের গলিতে একটা কীর্ত্তনের দলের গায়নের কাজ করে রাতে এক থলি প্রসাদের ঘি ভাত নিয়ে বাড়ী ফিরত।

এমনি করেই ত অচলদের দিন চ'লে যায়!

সকালের ফেরিওয়ালাব চন্দ্রপুলির স্বপ্ন দেখ। বেলা বাড়লে মাছের মুড়ো;—পুঁইশাক চিংড়ি। দুপুরে কাপড়ে ওয়ালাদের রংবেরং। চীনের সিঁদুর। দিনশেষে কুলপি বরফ নিয়ে দাঁড়িয়ে হামেহাল তোমার দোর গোড়ায়। তোমার যদি পয়সা না থাকে ত দোষ কার? তারপর রিকশার ঠং ঠং, ঘুমিয়েও তোমার গতির নেই অবধি। অচল, কিন্তু চারিদিকের চলাতে তোমার গতিরও অভাব নেই ত!

জলে যেমন করে জলের বিম্ব উঠে জলেই মিশিয়ে যায়—তেমনি মুছির মনে কিসের যেন একটা সাধ উঠে আবার মনেই লয় পেয়ে যেত।

এক আধ দিন গোমদাকে বলার চেষ্টা ক'রে সে চমকে গেছে। ওর চোখ নেই বলে চক্ষুলজ্জার বালাইও নেই।

সোজা কথা এ। সব বোনই ভাইকে বলতে পারে: 'দাদা একটা বৌ নে এস ঘরে···"

গোমদাটা চিরকালই গিয়ে একটু বে-পাগলা : কিন্তু বয়সও ত হচ্চে !

তাই কেমন যেন মুছি লজ্জায় মরে যায় !

আর লজ্জার কারণও ছিল তার তরফের ;—সে অনেক দিনের কথা :—

তাঁতি-পাড়ায় নিত্যধন মোক্তার থাকত তাদের পাশের বাড়ীতে। নিত্যধনের ব্যোমকেশ হয়ে দাঁড়াল এক গেলাসের ইয়ার।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু !

ব্যোমকেশ কুণ্ডুদের গোমস্তার কাজ করতে করতে—হাত ফসকে কি পা ফসকে টাকাকড়ির তছরূপের তাল সামলাতে না পেরে সটান্ চলে গেল শ্রীঘরে !

ফিরে এসে দেখলে খাঁ-খি নিত্যধন মুছির সঙ্গে তার ছেলের বে দিয়ে দুটো সংসারকে বেমালুম এক করে ফেলেছে।

অত সইবে কেন? বিনোদ বেটা মবল হাঁসপাতালে লিবার পেকে আর নিজে হার্ট ফেল করে।

মুছির যা দশা হল। ঘর-পোড়া গরুর মত লাল মেঘ দেখে সে কেঁপে মরে !

এই সব হুড়ুদ্দুমের মধ্যে কোথা দিয়ে সংসারটা এসে অবতীর্ণ হল—ব্যোমকেশের কাঁধের ওপর। নিঃসম্বল, অসহায়—

হঠাৎ মুছি হল একাই একশ। যেমনি গতোর তেমনি স্বাস্থ্য—রূপও হয়ত ছিল : কিন্তু ছাই-চাপা আগুনের মতই ধিকি ধিকি নিভে যাওয়ার মুখে।

সে দিন ভারি গরম। অনেক রাতে ব্যোমকেশ ফিরে খাবলা-খাবলা করে নেহাৎ উপরোধেই বসেছে খেতে। একটা হাত-পাখা নিয়ে মুছি হাওয়া করতে করতে হঠাৎ কেমন থেমে যাচ্ছে।

ব্যোমকেশ সহজে বড় কথা কইতে চায় না। সেদিন কেমন্ যেন একটু সদয় হয়ে বললে : "ঘুম পাচ্চে বুঝি?"

"না বাবা।"

"তবে? এমন তোকে থমথমে দেখায় কেন মুছি?"

লজ্জায় মুখটা তার লাল হয়ে উঠে। কম আলোতে দেখা গেল না, কিন্তু সে সাম্‌লাবার জন্যে তাড়াতাড়ি কি বলতে কি বললে; চল বাবা, আমরা বৃন্দাবনে চলে যাই এ আর ভাল লাগে না। সেখানে গোমদার বে দিয়ে…বৌ করবে সংসার…"

"আর তুই?"

"আমি কোন মন্দিরে দাসীর কাজ করব…তোমাদের সংসার চলে যাবে। মানুষের দাস্যবৃত্তি আর ভাল লাগে না বাবা!"

"নিত্যি টিক্, টিক্;…পারিনে আর…"

"কে রে—কে মুছি? ওই বুড়টা বুঝি?"

"দুই সমান, এ বলে আমার দেখ, ও বলে…কখন বা করি নিজেদের…তার ওপর টানাটানি…তুমিও পারনি কমাস কিছু দিতে…আর গোমদা বোধ হয় জমাচ্চে!"

বুড়ো বললে : "তা গেলে হয়…কিন্তু তোর কপাল যাবে কোথায়? দিন কতক সবুর কর…চোখ বুজতে দে আমায়। ফিরে যাবে কপাল তোদের…"

"আঃ! বাবা!"

সে রেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

ঘরের মধ্যে থেকে বলতে বলতে বেরিয়ে এল : "দুধটা নষ্ট হয়ে গেছে গরমে :—বাবা এই পেঁপের মোরব্বা…তুমি তো…"

খুশী হয়ে উঠল ব্যোমকেশ। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে : "দেখ তোকে সুখ দিতে পারলুম না কোন দিন, কিন্তু সমস্ত মন দিয়ে আশীর্ব্বাদ…বাপের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয় না, শুনেছি কখন…যে কটা দিন আমি আছি…"

"আর ঐ গোমদা?"

"তদ্দিনে ও যাবে ওস্তাদ হয়ে।"

"না বাবা!—ওর একটা কালকোলো মেয়ের সঙ্গে… নির্ঝঞ্ঝাটে সংসার করবে…তা হলে আমার হাত খালি হলে…"

"কি করবি?…"

নিজেকে চেপে মুছি বললে—"একটা পানের দোকান…"

"ছি-ই, ছি-ই, ছি-ই—তাই কি হয়, মুছি…তুই যে গিয়ে ভদ্দোর ঘরের মেয়ে…"

"ভদ্দোর না হাতী! ঐ মাজন! মাজন বেচে কে? যাদের টাকা নেই তাদের কিছু নেই…জাত নেই, ইজ্জৎ নেই, সে আমি জানি, খুব ভাল করেই…"

রাগ করতে করতে মুছি চলে গেল।

গিন্নী খেতেন বোগা আর ছেলে হবার ওষুধ, আর কর্ত্তার লাল মিষ্টি ওষুধ কিনে আনতে হ'ত দোকান থেকে। পথে মুছির সেদিন দেখা হ'য়ে গেল সোদুর সঙ্গে। সোদু তার ছেলেবেলাকার "গঙ্গাজল"।

সে বললে : "গঙ্গাজল, ভাই ভালই হ'ল. তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে। মনে করছিলুম যাব আজই সময় ক'বে। একটা কাজ ক'ছবি?"

"কি ভাই?"

"দেখ, ভাল কাজ, কখন সময় হবে?"

মুছি হিসেব খতিয়ে বল্‌লে : "তিনটে চারটে……"

"বেশ, বেশ; আমিই আসব—তোর কাছে ভাই—সেই বাড়ীতেই তো আছিস্?"

"আর কোথায় যাব ?"

সোদুও বামুনের মেয়ে। বিধবা নয়। অনেকগুলি ছেলে-পুলে। স্বামী পোর্ট কমিশনারের কি একটা ছোট-খাট কাজ করে।

গিন্নী জমিদার। বেলতলায় মস্ত বাড়ী। তাঁর মেয়ে মারা গেছে চার দিনের ছেলে রেখে। মানুষ ক'রতে হবে তাঁকেই।

সোদু মুছিকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

"এই মা, এই আমার গঙ্গাজল—যার কথা ব'লেছিনু…"

গিন্নী চশমার মধ্যে দিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে ব'ল্‌লেন : "কি-গা…পারবে ?"…সোদুর দিকে চেয়ে ব'ললেন—"বুঝিয়ে ব'লেচিস্ তো সব ?"

ছেলে মানুষ করার কথা শুনে মুছির বুকটা কাঁপতে লেগেছে—যেন ফেটেই বা যায়। ঠিক যেন সেই দশা—খেয়ো খাবি ? না, হাত ধোব কোথায় ?

মুছি নিজেকে সামলে শান্ত কণ্ঠে ব'ল্‌লে : "মা, কি করতে হবে ব'লে দেবেন,……"

"ছেলে-পুলে হ'য়েছিল ?"

মাথা নীচু ক'রে মুছি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লে…তার বুকের উপর দু'ফোঁটা জল কিন্তু গিন্নীর লক্ষ্য এড়িয়ে গেল না।

একটুখানি সময়ের জন্যে দু'জনের বুকের মধ্যে ভাবের আবেগ দোলা দিয়ে গেল। গিন্নী-মার মনে নিলে, ঠিক মানুষটি এসে পৌঁছে গেছে—তাঁর কাছে।

"সমস্ত ভার নিতে হবে কিন্তু……"

"নেব মা।"

মুছি যেন ভাগ্যদেবতার দরবারে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। যা' জীবনে পায় নি সে—তাই হাতের কাছে আসি আসি ক'রছে……তার দম বন্ধ হ'য়ে যায় আর কি।

"বেশ, কবে আসিব মা ?"

"আজই।"

"কিন্তু, আমি যে একলা নই মা।"

গিন্নী জিজ্ঞাসার দৃষ্টি ফেলে জানতে চান,—তবে ?

"বুড়ো বাবা আছেন, আর অন্ধ ভাই একটি।"

"আহা!" ব'লে গিন্নীর দু-চোখ ছলছলিয়ে এল।

"তা'……আমার নীচের ঘরে থাকবেন একটায়…ব্রাহ্মণ সন্তান—গোপালের তাই ইচ্ছে আর কি।"

মুছির বুকের জমাট রক্ত যেন আল্‌গা হ'য়ে এলিয়ে গেল—সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল—যেন অগ্নিপরীক্ষার শেষ হ'ল।

"তা বাছা—কি নেবে ?"

আপনার যা অভিরুচি……

"তাই কি হয় ? তুমি কাজ করবে, তুমি না ব'ললে হয়……"

"আমিতো জানি নে মা,—শুধু এই জানি যে, যা এতদিন মনে মনে……"

গিন্নী একগাল হেসে ব'ললেন : "বেশ আমিই দর করি : —প্রথম ছ'মাস দশ টাকা—তার পর তোমার কাজে সন্তুষ্ট হ'লে……"

"ঐতো আমার ঢের হবে……"

"না, প'নেরো।"

মুছি প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে…"বাবাকে ব'লে আসি ?…"

"যাও…আজই তো আসছ ?"

"নিশ্চয়।"

ব্যোমকেশ মুস্তফি আছড়ে গিয়ে কেঁদে প'ড়ল কর্ত্তার পায়ে—তেতলায়।

বুক চাপড়ে হাউ মাউ ক'রে চেঁচিয়ে কেঁদে ব'ল্‌লে : "সর্ব্বোনাশ হ'য়ে গেছে বাবা। মুছি আমার মটর চাপা প'ড়ে হাসপাতালে মরো-মরো…কি হবে বাবা।"

কর্ত্তার কাশির স্প্রিং চাগিয়ে উঠল।

এদিকে গিন্নী আঁচল থেকে তাড়াতাড়ি একটা দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে ব'ল্‌লে :…"যান্ যান্ দেরি করবেন না…"

"আপনাদের কি হবে ব্যবস্থা ?"

"প্রাবেন একটা লোক দেবেন।"

সোদুরা সেই বাড়ীতে উঠে এল। কিন্তু সে যে মুছির গঙ্গাজল সে কথা ব'লে ফেলার মত মেয়েই নয় সে।

ফুলের কুঁড়ির উপর সকালের রোদ্দুর যেমন ক'রে ঝুঁকে প'ড়ে তাকে চুমু খেয়ে জাগায়—মুছি ঠিক তেমনি ক'রেই এতটুকু ছেলেটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে বল্‌লে :—"ওরে আমার একটুখানি—ওরে আমার। মনজোড়া সেই সাত-রাজার ধন এক মাণিক।"

তার মনের সমুদ্রে জোয়ার এসে যেন চারিদিকে ফেণায় ফেণায় ভরিয়ে দিলে—তার মধ্যে হাঁকপাঁক ক'রে কি যেন ব'লতে ইচ্ছে হয় : কিন্তু কথা যোগায় না।

সারা রাত জেগে-ঘুমিয়ে কাটল। ভোর বেলা সে দেখতে পেলে যেন হামাগুড়ি দিয়ে তার গোপাল ডাকছে—"মা!"

অনারেব্‌ল মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের বিবৃতি···কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা এবং কর্ত্তৃ ব্যাপারে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীকে জনপ্রিয় বলিতে হয় বটে, কিন্তু তাঁহার এই জনপ্রিয়তা কতখানি সদ্‌ভাবে অর্জ্জিত, সে-প্রশ্নের আলোচনায় প্রয়োজন নাই···

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের প্রত্যুত্তর···আমি জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি কি না, আমার কার্য্যে ও আচরণে কেবল স্বার্থাভিলাষ লইয়াই কোন দলের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়াছি কি না, এ বিষয়ে বাঙ্গালার জনসাধারণের— অনারেব্‌ল মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের যাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার সাহস নাই বিচার আমি সোল্লাসে স্বীকার করিয়া লইব···

বিশ্ব-পাঠাগারে

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

করিতেছি অধ্যয়ন মানব-চরিত্র যত ব্যগ্র হয়ে বিশ্ব-পাঠাগারে,
তাহাদের কেহ আজো দিলনাক আনন্দের মাধুরিমা মোর মর্ম্মমাঝে।
প্রতিটী জীবন-গ্রন্থে হেরিলাম যত দৃশ্য, সবি রহে গাঢ় অন্ধকারে;
সারমেয়-চিত্তবৃত্তি চারিত্রিক চিত্র-পটে গ্লানিমায় মগ্ন হয়ে আছে।
দম্ভ আর আস্ফালন, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব কোলাহল বক্ষ্য শোন জৈব যাত্রাপথে,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা ভদ্রতার আবরণে চলিতেছে দুর্ব্বার নির্ভয়ে।
শ্রমিকের রূপ ধরি প্রস্তর কাটিছে প্রভু,—পুত্তলিকা শোভে ভগ্নরথে,
নাহি আত্মসমর্পণ দেবতার পদপ্রান্তে, নাহি শির নত দেবালয়ে।

যে যত শিক্ষিত বেশী তাহার চরিত্রকূপে পাইয়াছি পঙ্কিল পল্বল,
কন্দর্পের রূপসাজে ভ্রমিতেছে স্বার্থান্বেষী নিঃস্ব করি অজ্ঞ পান্থজনে।
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর রূপ ধরি সর্ব্বনাশ করে নর পরিয়া বল্কল,
মঠের ভিতরে চলে মোহান্তের স্মরক্রিয়া সঙ্গোপনে শিষ্যাণীর সনে।
বিদ্যাকেন্দ্রে উপাধ্যক্ষ হেরিলাম শিবাসম ধূর্ত্ততার জীবন্ত-প্রতীক,
হেরিলাম আচার্য্যেরে অজ্ঞানের ভস্মস্তূপ—প্রজ্ঞানের লেশমাত্র নাহি;
দেশ-দ্রোহী হেরিলাম শতাব্দীর কালসর্প স্বার্থলোভে সান্ধিবিগ্রহিক,
হেরিলাম দলকেন্দ্রী দেশনেতা জলৌকার সম চলে চিত্তনদ বাহি।

কৃষকের দুঃখ যারা বোঝে নাই কোন দিন, মিশে নাই শ্রমিকের সাথে,
নগ্নপদে চলে নাই পল্লীপথে, কহে নাই কোন কথা পল্লীবাসী সনে,
দুঃখের কুটীরে যারা করেনিক পদার্পণ, তাহাদের চিত্ত আজি মাতে
নগরীর রঙ্গমঞ্চে ঘুচাতে দেশের দুঃখ বক্তৃতায় নাচি ক্ষণে ক্ষণে।
ঐশ্বর্য্যের অপহারী মহামানবের রূপে প্রচারিছে দর্শনের বাণী,
অহংকারী অভিজাত মাতিয়াছে দেশোদ্ধারে শুনাইয়া দৈন্য হাহাকার।
কৌলীন্য মর্য্যাদা লভি কুলটার স্পর্দ্ধা হেরি,—পদে তার রহে ভক্ত প্রাণী,
পাপের হিমাদ্রি হেরি সমাজের শীর্ষে বসি কহে—'আমি ঈশ-অবতার'।

সামান্য অর্থের লোভে দাসত্ব শৃঙ্খল পরি' মসিজীবী করে আত্মদান,
পদের উন্নতি লাগি' আপন প্রভুরে দেয় গৃহলক্ষ্মী সম্ভোগের তরে;
জীবনের গ্রন্থে তার উন্নতির পৃষ্ঠা নব রচনায় জাগে ফুল্লপ্রাণ,
পশ্চাতের ঘৃণ্যবৃত্তি চাপা রহে স্মৃতিস্তূপে সৌভাগ্যের বিধাতার বরে।

পণ্যরূপে দিল দেখা ধর্ম্ম অর্থ বিদ্যা বুদ্ধি, সংযাত্রিক সে পণ্যেরে আনে
করিবারে বিকি কিনি বিশ্বের বন্দরে যত দর কষি' হয়ে আত্মহারা।
দণ্ডনীতি ভেদনীতি কূটনীতি সর্ব্বদিকে চলিতেছে শতাব্দীর গানে
উদগ্র আবেগে চলে মানবের রণ-হিংসা, দুর্ব্বলের ঝরে রক্তধারা।

চলে গেছে সন্ধ্যা-ভাষা, পদাবলী-রসামৃত, মুছে গেছে শব্দ মাধুরিমা
বিজাতীয় মুক্তছন্দে বিজাতীয় চিন্তাস্রোতে কলুষিত ভাবের জাহ্নবী,
কে বুঝিবে বর্ত্তমানে শব্দ ব্রহ্মশক্তি কত ?—বুঝিবার নাহি শক্তি সীমা।
অবাস্তব কল্পনায় নির্লজ্জ সাহিত্যসেবী আঁকিতেছে অমঙ্গল ছবি।
আদর্শ-সাহিত্য নাহি, চিন্তার দারিদ্র্য হেরি, ভারতীর হেরি বীভৎসতা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রেরণায় যে ভাষা জনম লভি' রুগ্ন রহে আতুর আশ্রমে,
জনম-পত্রিকা তার পত্রাকীরিষ্টিতে ভরা আনে মোর চিত্তে বিষণ্ণতা,
নবীনের উন্মাদনা সেই রুগ্ন শিশু নিয়া মুর্ত্ত হোলো স্বপন বিভ্রমে।

সাহিত্যে সঙ্গীতে কাব্যে সাধনার চিহ্ন নাহি, আছে শুধু স্ত্রৈণভাবোচ্ছ্বাস,
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা ধনগর্ব্বী কবি বন্ধু ভুলিয়াছে দেশের মাটীরে,
জাতির মঙ্গলকাব্য তার চিত্তে নাহি জাগে, শুধু জাগে কল্পনা বিলাস,
ছন্নছাড়া করে তার ছন্দোময়ী কাব্যলক্ষ্মী জীবনের মৌন সন্ধ্যা তীরে।
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে দিনান্তের পথপ্রান্তে দীর্ঘশ্বাসে বাজাইয়া শঙ্খ,
মাটীর বন্ধনে বাঁধা অহল্যা পাষাণে কাঁদে স্তব্ধতায় মাথা করি' নীচু,
দুর্গতির মলিনতা শতাব্দীরে ঢেকে আছে দিগম্বরে জাগিছে আতঙ্ক,
গোধূলি গিরির তলে নির্ঝর কাঁদিছে বসে, মায়ামৃগ কাঁদে তার পিছু।

কালের রাখাল বন্ধু! এ যুগ প্রান্তর হ'তে দিন-ধেনু নিয়ে চল তব,
কি হবে বাজায়ে বেণু প্রতিটী মুহূর্ত্ত ধরি', সুরে সুরে ভরিয়া ভুবন।
নবরূপী অসুরের নিত্য যেথা লীলা চলে মৃত্যু-যন্ত্র রচি' নব নব,
সেথা তব কে শুনিবে—কে বুঝিবে বংশীধ্বনি সমর্পিয়া ধ্যানশান্ত-মন!
দূর কোন্ অতীতের স্বর্ণযুগ সমাহিত ধরণীর অতল গহ্বরে,
তাহারে তুলিয়া কেহ আনিল না বিশ্বমাঝে, তার কথা ভাবিল না কেহ।
সে যুগের পদচিহ্ন বক্ষে করি' কাঁদে পৃথ্বী—সুমহান্ সভ্যতার তরে,
যারা সব এসেছিল সে দিনের পথচারী বিশ্বে নাহি তাহাদের গেহ।

মানবের রাজ্য হ'তে বন্ধু মোরে নিয়ে চল হাত ধরে' করুণা প্রকাশি'—
যে পথে চলেছে পাখী আকাশের নীড় হ'তে, সেই পথে নিয়ে চল মোরে।
মানব-চরিত্র আর পড়িতে চাহে না প্রাণ, সে চরিত্র করেছে উদাসী
আমার হৃদয় মন—আমার পথিক-চিত্ত—আমি ভাসি নয়নের লোরে।
যে পথে ফুলের গন্ধ অন্ধ করে পান্থজনে সেই পথ নহেক আমার,
যেথা ওঠে লোকারণ্যে জীবনের দাবানল সেথা আর রহিব না আমি।
ভুলে যাক্ বিশ্ব মোরে, তাহে মোর নাহি ক্ষতি, চাহি না ক' সমাজ-সংসার—
যে সংসারে অনাদরে ঘৃণা আর অপমানে যাপিলাম দীর্ঘ দিবা-যামী।

সঙ্কলন

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

গণতন্ত্রের ঋণভার

Harper's Magazine পত্রিকায় Roy Helton গণতন্ত্রের ঋণভার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

ঋণের উদ্দেশ্যই উপযুক্ত সময়ে উহা গ্রহণ করিয়া এরূপ কার্য্যে ঐ অর্থ প্রয়োগ করা যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে, কোন যুবক ঋণ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে গেল; তাহার উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষালাভ করিলে উপার্জ্জনক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে; অশিক্ষিত থাকিলে সে যাহা উপার্জ্জন করিত তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পরিবে। ব্যবসায়ক্ষেত্রেও এই সূত্রই প্রযোজ্য। কিন্তু যখন উপার্জ্জন-ক্ষমতা কমিয়া যাইবে তখন ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা আর্থিক উন্নতির সহায়ক হইতে পারিবে না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও ইহা যেরূপ সত্য, জাতির পক্ষেও তাহাই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই সূত্র অনুসারেই প্রথম কার্য্য আরম্ভ হয়। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার রেলপথ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্যবসায় বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধি বাড়িবে ইহাই মনে করিয়া ক্রমশঃ রেলপথ বিস্তার আরম্ভ করা হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চরম বৃদ্ধি পাইয়া উহার অগ্রগতি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ঋণভারও এই সঙ্গে বাড়িয়া চলে অথচ তদনুপাতে আয় বৃদ্ধি হয় না, উপরন্তু কালক্রমে যন্ত্রাদির মেরামত ও পরিবর্ত্তন ইত্যাদির ব্যয় বড়িয়াই চলে সুতরাং এক্ষেত্রে ঋণভার বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঐরূপই ঘটিয়াছে ও গত ৩০ বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রঋণ প্রায় ১০ গুণ বাড়িয়াছে।

পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টির হইল—সুতরাং ক্রমশঃ আয় কমিয়া গেল অথচ ঋণভার বাড়িয়াই চলিল। সকল দেশেই ঋণভারে লোক অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল ও মনে বিদ্রোহের সূচনা হইল। ইহার চরম বিষময় ফলই বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ।

এই ঋণভার-লাঘবের উপায় করভার বৃদ্ধি করা। কিন্তু গণতন্ত্রে করভার বৃদ্ধিতে অনেকেই আপত্তি করেন সুতরাং জাতীয় ঋণের অশান্তি সহ্য করিতে না পারিয়াই গণতন্ত্রের অবনতি হইয়া থাকে। করভার বৃদ্ধি হইলেই রাষ্ট্রঋণ সম্পর্কে সকলে সচেতন থাকিয়া কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, ইহা মূলসূত্র অনুযায়ী খুবই ঠিক, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কেহই সানন্দে ইহাতে সম্মত হইতে পারে না।

কূট রাজনীতি লইয়া সকলেই ব্যস্ত কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল আয়-বৃদ্ধির উপায় লইয়া ব্যস্ত থাকিবার ফলেই এইরূপ কঠিন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব দেশের মঙ্গলের জন্য নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখাই প্রধান কর্ত্তব্য।

জাপানের খাদ্য-ব্যবস্থা

The Commentator পত্রিকায় Edgar Laytha জাপানের খাদ্য-বিষয়ে Dr. Tadasu Saiki-র পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

জাপানের লোকসংখ্যা-অনুপাতে ভূমির পরিমাণ এতই কম যে, খাদ্য-সংস্থান হওয়া কঠিন। ডক্টর তাদাসু সাইকি স্বদেশজাত খাদ্য-দ্রব্যের দ্বারা এবং অল্প ব্যয়ে কিরূপে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, তাহা বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা করিতে-ছেন। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ অজন্মা হইলে খাদ্যাভাবে প্রাণহানি না হয়; দ্বিতীয়তঃ, যদি কখনও জাপানকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলেও খাদ্যাভাব যেন না ঘটে। বর্ত্তমানে ভরণপোষণের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় জাপানে মজুরীর হার কমিয়াছে ও এই জন্যই জাপান অন্যান্য দেশের অপেক্ষা কম মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে।

ডক্টর সাইকি স্বদেশজাত প্রায় ছয় হাজার প্রকার খাদ্য-দ্রব্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও ঐগুলির পরিপোষক ক্ষমতা ও তাপ-উৎপাদক ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়াছেন। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ,

স্ত্রীলোক ও বালকদের কাহার কিরূপ আহার হওয়া উচিত, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া ডক্টর সাইকি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছেন ও বেতারযোগে প্রচার করিতেছেন।

খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে গিয়া ডক্টর সাইকি অখাদ্য খাইয়া অসুস্থও হইয়াছিলেন। তাঁহার খাদ্য-তালিকায় জলীয় সাপও স্থান পাইয়াছে। জাপানে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সুতরাং বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। খড় ও হরিৎপত্র হইতে তিনি রুটি প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাঁহার মতে ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য। নানা প্রকার শৈবাল এবং ফুলও তিনি পরীক্ষা করিয়া খাদ্য-তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তিনি যত প্রকার উদ্ভিদ্ জাপানে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, সকলগুলিই পরীক্ষা করিয়াছেন ও যে উদ্ভিদের যে অংশ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

চীনে জাপানের অধিকৃত প্রদেশগুলিতেও যে সকল উদ্ভিদ্ আছে, ডক্টর সাইকির সহকর্ম্মিগণ সেগুলিও পরীক্ষা করিতেছেন। উদ্ভিদ্ ব্যতীত নানারূপ প্রাণীও খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে ডক্টর সাইকি পরীক্ষা করিয়াছেন। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, শামুক, বেঙ ও ফড়িং লইয়া তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন ও সবগুলিই তাঁহার খাদ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, খাদ্য হিসাবে মাছ অপেক্ষা ফড়িং-এর মূল্যই বেশী। মাছের আঁশ, কাঁটা, চামড়া প্রভৃতিও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ গুলি খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী। বর্ত্তমানে ঐ গুলি গুঁড়া করিয়া টিনে ভরিয়া চীনে জাপানী সৈন্যদের আহার্য্য হিসাবে পাঠান হইতেছে।

কিরূপ কার্য্য করিলে কিরূপ খাদ্য খাওয়া আবশ্যক তাহাও ডক্টর সাইকি পরীক্ষা করিতেছেন।

ডক্টর সাইকি বলেন যে, জাপানে যতদিন সয়বীন (এক প্রকার সিমজাতীয় উদ্ভিদ্) ও মৎস্য থাকিবে ততদিন খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না। তাঁহার মতে আধ-সের সয়বীন এক সের মাংস অপেক্ষাও অধিক পুষ্টিকর।

কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানে এই ধারণা প্রচলিত হইয়াছিল যে, জাপানের খাদ্য শরীর-পুষ্টির উপযোগী নহে। শরীর পোষণের উপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমেরিকা ও জার্ম্মানী হইতে বিশেষজ্ঞও আনা হইয়াছিল। তাঁহারা আসিয়া গম প্রভৃতি শস্যের চাষ এবং গৃহপালিত পশুর চাষ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু জাপানের জনসাধারণ তাঁহাদের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। তাহারা তাহাদের আড়াই হাজার বৎসরের অভ্যস্ত খাদ্য ভাত ও মাছ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

আমেরিকানরা মনে করেন যে, ডক্টর সাইকির খাদ্য পরিকল্পনা অকৃতকার্য্য হইবে না।

পোল্যাণ্ড

Raymond Leslie Buell তাঁহার Poland : Key to Europe নামক পুস্তকে পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

ভবিষ্যতে পোল জাতির বিরাট শক্তিমান্ হইবার সম্ভাবনা আছে, কারণ পোল্যাণ্ডের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার য়ুরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য পোল্যাণ্ড য়ুরোপের সামরিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পোলজাতি অতিশয় বুদ্ধিমান। পৃথিবীর কৃষ্টি-ক্ষেত্রে পোল্যাণ্ডের দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপারনিকাস্ ও মাদাম কুরী, সমর-নীতিতে কাউণ্ট পুলাস্কি ও জেনারল কসিয়ুস্কো, সাহিত্যে সীনকিউইক্জ এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় শপ্যাঁ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও প্যাদেরিউস্কি, রুবিনষ্টাইন, কনর‍্যাড, রেমণ্ট প্রভৃতি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

পোল্যাণ্ডের অর্থ-নৈতিক সমস্যাই বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যদিও ইহা সকল দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য তথাপি য়ুরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্রের সংখ্যা পোল্যাণ্ডে অনেক বেশী। এই দারিদ্র্য কেবল অর্থের দিক্ দিয়া, আহার্য্যের দিক্ দিয়া নহে। ইহার কারণ, পোল্যাণ্ডে যন্ত্র-শিল্পের বিশেষ প্রসার হয় নাই সুতরাং শিল্প-জাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অন্য দেশ হইতে অর্থাগম বিশেষ হয় না; কিন্তু কৃষি-প্রধান দেশ হওয়ায় খাদ্যাভাব পোল্যাণ্ডে কমই দেখা যায়। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে য়ুরোপের অন্যান্য দেশকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলা চলে না, কারণ জন-সাধারণের খাদ্যাভাব সকল দেশেই বিদ্যমান।

বিগত ষোড়শ শতাব্দীতে পোলদের রাজ্য বল্টিক সাগর হইতে ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন পোল্যাণ্ড উত্তর য়ুরোপের কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল। কালক্রমে পোল্যাণ্ডের পতন হইল। ইহার কারণ একটি অদ্ভুত প্রথার উদ্ভব। প্রথাটি এই যে, জাতীয় পার্লামেণ্ট-এর যে কোন ডেপুটি পার্লামেণ্টের গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী রদ করিতে পারিবেন। ইহার ফলে রাজ্য-শাসন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং রাজার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইল। কয়েকজন ধনী নিজেদেরই শাসক মনে করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভিতরে ক্রমে ঈর্ষার ভাব উদিত হইল ও বিবাদ আরম্ভ হইল। এই গৃহ-বিবাদের ফলে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইল। এই সুযোগে রুশ, প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া পোল্যাণ্ডকে ভাগ করিয়া অধিকার করিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পোল্যাণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ রুশ, প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত হইল। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশও রুশের রক্ষণাধীন একটি পৃথক্ রাজ্যরূপে রহিল।

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ড ঐ অবস্থাতেই ছিল। রুশের সহিত দুই বৎসরব্যাপী যুদ্ধ করিয়া ও মহাযুদ্ধের সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে পোল্যাণ্ড স্বাধীন হয় এবং পূর্ব্ব রাজ্যের তিন-পঞ্চমাংশ ফিরিয়া পায়।

গত মহাযুদ্ধে পোল্যাণ্ডের বহু ক্ষতি হইয়াছিল। প্রায় ২০ লক্ষ গৃহ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। ১ কোটি ১০ লক্ষ একর (৩ বিঘা=১ একর) জমি অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং ৬০ লক্ষ একর জঙ্গল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গৃহহারা, অন্নহীন ও রোগক্লিষ্ট লোকের সংখ্যা যে কত হইয়াছিল তাহা অনুমান করাই কঠিন। কিন্তু মহাযুদ্ধের পরে অতি অল্পদিনেই পোল্যাণ্ড অনেক উন্নতি করিয়াছিল। তিন ভাগে বিভক্ত থাকায় লোকের মধ্যে যে মানসিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমে দূর হইয়া বর্ত্তমানে সকলেই অনেকটা একতাবদ্ধ হইয়াছে; তবে এখনও পোল্যাণ্ডে ৭॥০ লক্ষ জার্ম্মাণ, ৩৩ লক্ষ ইহুদি, এবং ৫০ লক্ষ ইউক্রেনিয়ান অধিবাসী আছে। সুতরাং ইহাই পূর্ণমাত্রায় একতা-সংঘটনের বাধাস্বরূপ। জার্ম্মাণগণ জাতীয় সোশ্যালিজম্-এর পক্ষপাতী, তবে ইহারা একতাবদ্ধ হইতে সমর্থ হয় নাই, ইহুদীগণও ঐরূপই। কেবল দক্ষিণ-পূর্ব্বের ইউক্রেনিয়ানগণই সঙ্ঘবদ্ধ। পোল্যাণ্ড, রুশ এবং রুমানিয়া-নিবাসী ইউক্রেনিয়ানরা স্বাধীনতা লাভের জন্য বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। যদিও তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই তথাপি পোল্যাণ্ড কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে এই ইউক্রেনিয়ানদের জন্য অনেক দুর্ব্বল হইয়া যাইবে।

পোল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র আমেরিকা বা জার্ম্মানীর মত নহে। পোল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে একটি দলের প্রভাবই বেশী এবং সৈন্যেরাও এই দলেরই সমর্থন করে। রাজ্যশাসন বিষয়ে কখনও ডিক্টেটর-শাসিত দেশের ন্যায় কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারেও জেলে রাখা হয় আবার অপর দিকে বিরুদ্ধ দলের সভা, সমিতি ও প্রচারকার্য্যেও বাধা দেওয়া হয় না। জার্ম্মানীর ন্যায় ইহুদী-দলন নীতি এদেশে সমর্থন করা হয় না, যদিও পোল্যাণ্ডে ইহুদীর সংখ্যা য়ুরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পোল্যাণ্ডের এক পাশে নাৎসী জার্ম্মানী এবং অপর পাশে সোশ্যালিষ্ট রুশ। এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া পোল্যাণ্ডের অবস্থা অতি ভয়াবহ। পোল্যাণ্ড এই দুইটি বিরোধী মতবাদের কোনটিই সমর্থন করে না এবং পোলজাতির চরিত্র-বল যেরূপ দেখা যায় তাহাতে তাহারা ইহার কোন মতবাদই গ্রহণ করিবে না মনে হয়; সুতরাং পোল্যাণ্ডের বৈদেশিক নীতি এই দুইটি দেশকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকিবে এবং চরিত্রের দৃঢ়তার জন্যই পোলজাতি শত বিপদের মধ্যেও কখনও আপন বিশেষত্ব হারাইবে না।

মানবের শত্রু মাছি

Your Life পত্রিকায় Alan Devoe মাছি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

গ্রীষ্মকালে সকলেই মাছির উপদ্রব অনুভব করেন, কিন্তু ইহা যে কত সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু ছড়াইয়া দেয় সে বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করেন না। কলেরা, টাইফয়েড, ট্রাকোমা, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু প্রধানতঃ মাছিরাই বহন করিয়া বিস্তার করে।

বহু প্রকার মাছি আছে। সাধারণতঃ বাড়ীতে আমরা যে মাছি দেখিতে পাই তাহার জীবনকথা বড়ই কৌতূহল-জনক। পচা জিনিষের স্তূপের উপর প্রথমে স্ত্রী-মাছি অতি ক্ষুদ্র ডিম প্রসব করে। ঐ ডিম চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যে পদবিহীন একটি স্বচ্ছ কীটে পরিণত হয়। তৎপরে একদিন অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ কীট এত বৃদ্ধি পায় যে উহার বহিরাবরণ ফাটিয়া যায়। চতুর্থ দিনে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বচ্ছ হইতে প্রায় সাদা হয়। এই সময়ে ঐ কীট তাহার বাসস্থান হইতে সরিয়া গিয়া মাটিতে ছোট গর্ত্ত করিয়া তথায় বাস করে। এই অবস্থায় ঐ কীট প্রায় তিন দিন থাকে। এই সময়ে উহার গায়ে ডোরা কাটা দাগ হয়, ছয়টি পা দেখা দেয় এবং মুখ ও চোখ গঠিত হয় এবং গুটি কাটিয়া মাছিটি বাহিরে আসে। ডিম হইতে পূর্ণাবয়ব মাছিতে পরিণত হইতে দশ দিনেরও কম সময় লাগে। মাছিতে পরিণত হইলেই স্ত্রী-মাছি অণ্ড প্রসবযোগ্য হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রথম প্রসব করে। এক বারেই ইহারা একশত বা ততোধিক অণ্ড প্রসব করে এবং দশ দিন অন্তরে প্রসব করিতে থাকে কিন্তু সবগুলি মাছিতে পরিণত হয় না। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মাছির নবম পুরুষ পর্য্যন্ত জন্মিয়া যায়।

অপরিষ্কার পচা জিনিষ খাইতেও মাছির যেরূপ রুচি দেখা যায় ভালজিনিষ সম্বন্ধেও সেইরূপই। সর্ব্বদাই নানারূপ খাদ্যের উপর ইহাদের উড়িয়া পড়িতে দেখা যায়।

মাছির সর্ব্বাঙ্গ অতি সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা। পাখা ও পায়েও ঐরূপ লোম আছে। উপরন্তু পায়ের নীচে বেশ স্থূল লোমের গদি আছে। ইহার জন্যই অতি মসৃণ স্থানের উপর দিয়াও মাছি অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। অপরিষ্কার স্থানে বসিলে পায়ের এই লোমে লক্ষ লক্ষ জীবাণু আটকাইয়া যায় এবং পরে মানুষের খাদ্যের উপরে বসিয়া সেই জীবাণু খাদ্যের মধ্যে মিশাইয়া দেয়। সাধারণ মাছির মুখে দুইটি মাংসবহুল অংশ আছে। ইহাদের মুখে চর্ব্বণ করিবার কোন যন্ত্র নাই। সুতরাং কিছু খাইতে হইলে সেই জিনিষটিকে নরম না করিলে ইহারা খাইতে পারে না। খাদ্য নরম করিবার জন্য ইহারা প্রথমে মুখ হইতে দুই এক বিন্দু জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া ঐ খাদ্যে ঢালিয়া দেয়। তার পর খাদ্য নরম হইয়া আহারের উপযোগী হইলে তখন খায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক হেল্‌থ সার্ভিস পরীক্ষাগারের ডক্টর এল. ও. হাওয়ার্ড বলেন যে, পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, অন্যূন ৩০টি রোগ মাছির দ্বারাই বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। আমেরিকার আরও অনেক চিকিৎসকেরও এই মত।

মাছির দ্বারা এইরূপ ভয়ানক অপকার সাধিত হয় দেখিয়া মাছি কি প্রকারে তাড়ান যায় সেই চিন্তাও আমেরিকার চিকিৎসকদের মনে উদিত হইয়াছিল। কেবল সহরগুলি পরিষ্কার রাখিলেই যে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে তাহা নহে, কারণ দেখা গিয়াছে যে ইহারা প্রায় ১৩ মাইল উড়িয়া যাইতে পারে; সুতরাং বহুদূরেও অপরিষ্কার স্থান থাকিলে তথায় মাছি জন্মিবে ও উড়িয়া আসিবে। তথাপি বাড়ী যতদূর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব তাহা করা উচিত। কয়েকজাতীয় পাখী, মাকড়শা এবং টিকটিকি মাছি খাইয়া ফেলে সুতরাং এইগুলি বাড়ীতে থাকিলেও মাছির সংখ্যা কমিয়া যায়। ইহারা মাছির স্বভাব-শত্রু, সুতরাং অস্বাভাবিক উপায় চিন্তার পূর্ব্বে স্বাভাবিক উপায়ে মাছির উপদ্রব কমাইবার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার ডক্টর শুস্‌নিগ

Hans Schmidt শুস্‌নিগ সম্বন্ধে Paris-Soir পত্রিকায় লিখিয়াছেন :

এক বৎসর যাবৎ অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার কুর্ট ফন শুস্‌নিগ ভিয়েনার হোটেল মেট্রোপোল-এ বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহাকে বন্দী করিবার পর হের হিটলার মাত্র একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শুস্‌নিগ এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার ক্রিয়া-কলাপের তদন্ত হইবে। তার পর আর কোন সংবাদই প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে স্মিট্ যে সামান্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ করিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানদের অধিকারভুক্ত হইবার পর শুস্‌নিগ কয়েকদিন তাঁহার বাসস্থান বেল্‌ভিডিয়ার ভিলায় ছিলেন। জার্ম্মানী সৈন্যদলের অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশের পরও শুস্‌নিগ বিমানযোগে পলায়ন না করিয়া দেশের দুর্ভাগ্যের সহিত নিজে দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অত্যুগ্র নাৎসীও বিস্মিত হইয়াছিল।

এই সময়ে তাঁহার চিঠিপত্র ও দলিল প্রভৃতি নাৎসীরা লইয়া অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মান পুলিশের কেন্দ্র-হোটেল মেট্রোপোল-এ পাঠাইয়াছিলেন।। নাৎসীরা আশা করিয়াছিল যে, রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ করিবার প্রমাণাদি ঐ সকল কাগজপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া চ্যান্সেলার শুস্‌নিগকে অভিযুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া তাহারা নিরাশ হয়। শুস্‌নিগ প্রায় সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন।

একদিন প্রাতে তাঁহাকে জার্ম্মান পুলিশের কেন্দ্রে তাঁহার পত্রের কতকগুলি বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য ডাকিয়া লওয়া হয়। তৎপর তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হয় নাই।

হোটেল মেট্রোপোল-এ তাঁহাকে বন্দী করা হয়। তাঁহার ব্যবহারের জন্য একখানি শয়নগৃহ এবং একটি স্নানাগার দেওয়া হইয়াছে। শয়নগৃহের একপার্শ্বে একটি ঘরে প্রহরীরা থাকে এবং অপর পার্শ্বে আর একটি ঘরে তাঁহাকে মাঝে মাঝে লইয়া প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করা হয়।

হোটেল মেট্রোপোল-এ তাঁহাকে জার্ম্মানীর বন্দীশালার সকল নিয়মই মানিয়া চলিতে হয়। তাঁহাকে ধূম পান করিতে দেওয়া হয় না এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গে কোন সংস্রবই রাখিতে দেওয়া হয় না। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বৃদ্ধ পিতা, ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র এবং ভাবী পত্নী কাউণ্টেস ভেরা জারনীন-এর কোন সংবাদই তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

জার্ম্মানদের অষ্ট্রিয়া অধিকারের কিছুদিন পূর্ব্বে কাউণ্টেস ভেরা জারনীন-এর প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়। তৎপরেই শুসনিগ তাঁহাকে বিবাহ করিবার অনুমতির জন্য Holy See-র নিকট আবেদন করেন। তিনি বন্দী হইবার পরে অনুমতি-পত্র পাওয়া যায়। তাঁহার একজন বন্ধু এই সময়ে শুসনিগের ভ্রাতা আর্থারকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। জার্ম্মান পুলিস কর্ম্মচারিগণ এই বিবাহের বিষয় ডক্টর শুসনিগকে জানায় নাই এবং তিনি তাহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে এইরূপ আশা দিতে থাকে।

খ্রীষ্টমাস-এর কিছু পূর্ব্বে কাউণ্টেসকে সাক্ষীর সম্মুখে তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়। এই সময়ে শুসনিগ প্রথম জানিতে পাবেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র কার্লসবাড্-এ জেস্যুইট (Jesuit) কলেজ-এ আছে এবং তাঁহার ভ্রাতাকে বন্দী-শিবিরে রাখা হইয়াছে।

নয় মাস পরে এই প্রথম জার্ম্মান অত্যাচারী ব্যতীত অন্য লোকের মুখ দেখিয়া তিনি বহির্জ্জগতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তখনই পুলিশ তাঁহার স্ত্রীকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নিষেধ করে। ইহাতে শুসনিগ প্রায় উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠেন।

তাহার পরে এখনও পর্য্যন্ত শুসনিগ সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই; বহুদিন পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন। এখন উঠিয়া লাঠিতে ভর দিয়া পাশের ঘরে তাঁহার প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইতে পারেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা এখনও খুবই খারাপ। পরিপাকশক্তি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে এবং তিনি এখন শুভ্রকেশ বৃদ্ধে পরিণত হইয়াছেন।

[সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তাঁহাকে না কি গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।]

ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব

…কালের আবর্ত্তনে ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা বেতনভোগী নফর, তাঁহারাই প্রায়শঃ মন্ত্রী, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ প্রভৃতিরূপে অন্যান্য ভারত-বাসিগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে নফরের সংখ্যা মোট অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় শতকরা ৩ জনের বেশী হইতে পারে নাই এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে ক্রমশঃ শতকরা ৮০ জন নফর হইয়া পড়িয়াছেন। এত অধিক বৈষম্যের কারণ, ভারতবাসী কৃষকগণের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁহারা বেতনভোগী নফর হইয়া পড়েন নাই, অথচ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কৃষকগণের অধিকাংশই বেতনভোগী শ্রমজীবীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।…

বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বিগত ১৩৪৫ সালে যে-সকল প্রবন্ধ বাংলা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, পরিচয়, বঙ্গশ্রী, বসুমতী এবং বিচিত্রা—বর্ত্তমানে মাত্র এই ছয়টি পত্রিকার প্রবন্ধই এখানে সন্নিবেশিত হইতেছে। সাময়িকগুলি সবই মাসিক। প্রবন্ধ ব্যতীত গল্প এবং কবিতা ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিয়াছি—কারণ আমাদের বোধ হয় এই ধরণের কার্য্যে তাহাদের বিশেষ কোনই উপযোগিতা নাই।

প্রবন্ধগুলি কি ভাবে ভাগ করা এবং সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা কোন মৌলিক প্রণালী অবলম্বন করি নাই। Mr. Melvil Dewey প্রবর্ত্তিত দশমিক বর্গীকরণ (decimal classification) পদ্ধতিই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়াছে। Mr. Dewey প্রথমে সমস্ত বিষয়গুলি দশটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

০০ সাধারণ, ১০ দর্শনশাস্ত্র, ২০ মোক্ষধর্ম্ম,
৩০ সমাজতত্ত্ব, ৪০, ভাষাতত্ত্ব, ৫০ বিজ্ঞান,
৬০ ব্যবহারিক-শিল্প, ৭০ কলা,
৮০ সাহিত্য, এবং ৯০ ইতিহাস।

ইহাই প্রথম বর্গীকরণ। ইহাদের আবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সেই বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা এ বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত বাংলা "দশমিক বর্গীকরণ" পুস্তকখানিকে (পৃঃ ৷৹+৯৪, প্রকাশক শ্রী প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, মূল্য ১৲) অনুসরণ করিয়াছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রবন্ধগুলির সন্নিবেশ-পদ্ধতির বোধার্থে যাঁহারা Mr. Deweyর দশমিক বর্গীকরণ প্রণালী অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উক্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন।

আমরা গৃহীত পত্রিকাগুলির গত ১৩৪৫ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধসকল গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু উক্ত সাময়িকগুলির প্রত্যেকের বর্ষারম্ভই বৈশাখে নয়, কাজেই অনেক পত্রিকার দুই বর্ষের অংশবিশেষ গৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বিত হইলেও আমার সন্ধান যে নির্ভুল হইয়াছে, এরূপ দাবী করি না। স্থানে স্থানে ভুল ঘটা সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠান্তেই আমরা যথাসাধ্য তাহার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছি। কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ বিরল নয়, যাহা স্থূল বিষয় লইয়া আলোচনা করায় একাধিক শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

এই প্রকার বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী প্রতি বৎসর বাহির করিবার ইচ্ছা আছে। পুরাতন প্রবন্ধগুলি প্রতি পাঁচ বৎসর হিসাবে এক একটী খণ্ড প্রকাশ করিব। উপস্থিত ১৩৪০–৪৪ প্রবন্ধপঞ্জী সুরু করিয়াছি। এই প্রণালী সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে তাহা "বঙ্গশ্রী" সম্পাদক মারফৎ জানাইলে বাধিত হইব।

প্রবন্ধে নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি—

প্র=প্রবাসী (বর্ষারম্ভ বৈশাখ, উপস্থিত ৩৮শ বর্ষ চলিতেছে)

ভা=ভারতবর্ষ	"	আষাঢ়,	"	২৫।২৬শ	"	
প=পরিচয়	"	শ্রাবণ,	"	৭।৮ম	"	
বং=বঙ্গশ্রী	"	মাঘ,	"	৬।৭ম	"	
ব=বসুমতী	"	বৈশাখ,	"	১৭শ	"	
বি=বিচিত্রা	"	শ্রাবণ,	"	১১।১২শ	"	

পৃ=পৃষ্ঠা

সংখ্যাগুলি বর্ষ, খণ্ড এবং প্রকাশ-সংখ্যাবোধক ; যথা—
বং ৬।২।১=বঙ্গশ্রী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

বলাই বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর কার্য্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে অত্যন্ত। কি কি বিষয়ে বাঙ্গালার সাহিত্যে বর্ত্তমানে কি চিন্তাধারা চলিতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য এই শ্রেণীর পঞ্জী অপরিহার্য্য। ছাত্র এবং সমালোচক, অধ্যাপক এবং সাংবাদিক, পাঠক ও লেখক, প্রত্যেকের পক্ষেই ইহা প্রয়োজনীয়। একাকী এই কার্য্যসাধন সম্ভব নহে। বিভিন্ন ব্যক্তির তজ্জন্য সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

সাধারণ

০২ গ্রন্থাগার

মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগারিকের স্থান—শ্রীনক্ষত্রলাল সেন
প্র ৩৮।২।৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৬১-৬৩)

০৩ বিশ্বকোষ

ইংরেজী অভিধানে বাঙ্গালা শব্দ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৯৭-৯৮) ।

০৬ প্রতিষ্ঠান পরিষদ

১৯৩৯ ঃ তত্ত্ববোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর—শ্রীযোগানন্দ দাস
প্র ৩৮।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৫ (৮০০-৪০) ।

০৯ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একখানি সচিত্র পুঁথি—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু
প্র ৩৮।২,৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫৯২-৯৫) ছবি ৮ ।

"চৈতন্য চরিতামৃতে"র রচনা কাল—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত
বি ১২।১।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫০-৫৬) ।

জ্বর মন্ত্র—শ্রীনলিনী নাথ দাশ গুপ্ত,
বি ১১।২।৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ পৃঃ ৫ (৬১৪-১৮) ।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্র ৩৮।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (২৫৫) ।

দর্শন শাস্ত্র

১০ দর্শন, সাধারণ

আধুনিক দার্শনিক মতবাদ—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বং ৬,২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ , পৃঃ ২ (৯৫-৯৬) ।

১১ তত্ত্ববিদ্যা

অনিত্য জগৎ ও নিত্যধাম—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ
প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬২৭-৩২) ।

১৩ দেহ ও মন

প্ল্যানচেটের ভূত—যাদুকর পি. সি সরকার
ভা ২৫।২।৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৯৫৬-৫৯) ।

১৫ মনস্তত্ত্ব

অন্তর্নিহিত রসধারা—ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬২৯-৩২) ।

অপরাধীর মনস্তত্ত্ব—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ; ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৪৮-৫০) ।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে গলদ—শ্রীসতীশচন্দ্র বৈদ্য
ভা ২৬।১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৯৫৫-৫৬) ।

১৫ মনস্তত্ত্ব

মানুষের মন, মগজ ও আত্মা—শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প ৮।১।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ পৃঃ ১০ (৩২৬-৩৫) ।

১৭ শীলধর্ম্ম

আচার্য্য ফ্রয়েড্ ও আমরা—শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৪৯৭-৫০৪) ।

ইউরোপের চিঠি—অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
ভা ২৫।২ ৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৯৬০-৬৩) ।

নারী-মেধ—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ।
বং ৬।১।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫৭৪-৮০) ।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি—শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ
বি ১২।১।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২-৬) ।

বর্ণাশ্রম তত্ত্ব—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী—
বং ১৭।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৩৭৪-৭৬) ।

সেবাধর্ম্ম—শ্রীহরিহর শেঠ
বি ১২।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ , পৃঃ ২ (২৩৯-৪০) ।

১৮ হিন্দু দর্শন

অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর—শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী
বং ৬।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (১৩১-৪০) ।

এমার্সন ও বেদান্ত—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
ব ১৭।২।১ , কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৭৬-৮২) । ছবি—১

কার্য্যকারণ-বাদ—শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বং ৬।১।৩ , আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৫২-৫৫) ।

দর্শন এবং ধর্ম্ম—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্যায়বাগীশ
বি ১২।১।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৭৪-৭৮)

দর্শন-পরীক্ষা—ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী
পি-এচ-ডি, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪১৮-২০) ।

দর্শনের নিকষ—ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (১—৪) ।

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প ৭।২।৩	প ৮।১।২	প ৮।১।৪
আষাঢ় ১৩৪৫	ভাদ্র ১৩৪৫	কার্ত্তিক ১৩৪৫
পৃঃ ৮ (১১০৭-১৪)	পৃঃ ৮ (১০১-০৮)	পৃঃ ১০ (৩০১-১)
প ৮।১।১	প ৮।১।৩	প ৮।১।৫
শ্রাবণ ১৩৪৫	আশ্বিন ১৩৪৫	অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
পৃঃ ৮ (৪১-৪৮)	পৃঃ ৯ (২৩৩-৪১)	পৃঃ ৭ (৪২৩-২৯)
৮।১।৩		৮।২।৩
পৌষ ১৩৪৫		চৈত্র ১৩৪৫

১৮ হিন্দু দর্শন

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পৃঃ ১১ (৫২১-৩১) পৃঃ ১৩ (১৯৭-২০৯)

৮।২।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (১-১০) চলিতেছে

৮-২-২ , ফাল্গুন ১৩৪৫ , পৃঃ ৭ (১৪৭-৫৩) ।

নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা—অধ্যাপক শ্রীকালীপদ আচার্য্য

ভা ২৬-১-৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮১৭-২৩) ।

প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের দৃষ্টি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প ৭-২-৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (১০০৭-১৬) ।

বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

প ৮-১-৩ , আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ (২০১-১৭)

বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

প ৮-১-১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২৪ (১-২৪) ।

৮০০ খৃঃ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা

বেদান্তাচার্য্য গৌড়পাদ—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

ব ১৭-১-১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬৮-৭৩) ।

বৈশেষিক দর্শন—শ্রীগুণমণি দাশ

ভা ২৬-২-৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪০৭-০৯) ।

বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

প ৮-১-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৫ (৩৯৭-৪১১) ।

ভারতে অধ্যাত্ম-দর্শন—শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব ১৭-১-৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (৩৮০) ।

মহাভারতের দার্শনিক মত—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

ব ১৭-২-৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৯১৮-২১) ।

শব্দব্রহ্মবাদ—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

প ৮-২-৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৪ (২৪৪-৫৭) ।

সাংখ্যের সাংপরায় (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প ৭-২-৪ , বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৯৩৫-৭৫) ।

স্থিরমতির ত্রিংশিকা ভাষ্য—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

প ৮-১-৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ (৫৬২-৭৮) ।

প ৮-২-২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৫ (১০১-১৫) ।

স্মৃতিশাস্ত্রের পরিচয়—শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য্য

ব ১৭-১-৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ , পৃঃ ২ (৭৬৯-৭০) ।

মোক্ষধর্ম্ম

২০ ধর্ম্মতত্ত্ব, সাধারণ

ধর্ম্ম ও সংসার—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

বি ১২-১-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৬৩৭-৩৮) ।

২০ মোক্ষধর্ম্ম সাধারণ

পুরোহিত—শ্রীমতিলাল দাশ

বং ৬-১-৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৬৯৯-৭০১) ।

মা ও ছেলে, মাতৃভাবে ব্রহ্মসাধন—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

প্র ৩৮-২-৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৮০৫-০৮) ।

২৫ ধর্ম্মতত্ত্ব

ভারতে মুক্তির আদর্শ—শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব ১৭-১-৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৬৮০-৮১) ।

শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

ব ১৭-২-২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৩১০-১২) ।

২১ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম

প্রতিমা—শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বি ১২-১-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৪৬৬-৬৯) । ছবি—১

২১ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম

ভারতে প্রতিমা পূজা—শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব ১৭-১-২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (২১৫-১৬) ।

২২ হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন

শ্রীঅরবিন্দ এবং সাধনাচার্য্য—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব ১৭-১-৫ , ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮৭১-৭৩) ।

ইচ্ছাময়ী দুর্গাপূজার পৌরোহিত্য ও ধ্যান—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৬-২-৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ । পৃঃ ৬ [২৮৯-৯৪] ।

ঋগ্বেদে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ব ১৭-১-৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৮৮৫-৯০] ।

কোন্ পথ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বি ১২-১ ৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৫৯০-৯৪] ।

গীতা ও বেদ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব ১৭-১-৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৯৪০-৪৭) ।

গীতা ও শাস্ত্র—শ্রীঅনিলবরণ রায়

বি ১১-২-৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ [৭৫৩-৬১] ।

গীতার ধর্ম্ম—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বি ১২।১।২ , ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (১৯১-৯৬)

গীতা বিচার (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ব ১৭।১।১ ব ১৭।১।৪ ব ১৭।২।১ ব ১৭।২।৪

বৈশাখ ১৩৪৫ শ্রাবণ ১৩৪৫ কার্ত্তিক ১৩৪৫ মাঘ ১৩৪৫

পৃঃ ৭ (১-৭) পৃঃ ৮ (৫৪১-৪৮) পৃঃ ৩ (১-৩) পৃঃ ৫ (৫৪১-৪৫)

ব ১৭।১।২ ব ১৭।১।৫ ব ১৭।২।২ ব ১৭।২।৫

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ভাদ্র ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ফাল্গুন ১৩৪৫

পৃঃ ৩ (১৮১-৮৩) পৃঃ ৬ (৭১৭-২২) পৃঃ ৭ (৩৮১-৮৭) পৃঃ ৮ (৭১৭-২৪)

২২ হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন

গীতা বিচার—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ব ১৭।১।৩ ব ১৭।২।৩ ব ১৭।২।৬

আষাঢ় ১৩৪৫ পৌষ ১৩৪৫ চৈত্র ১৩৪৫

পৃঃ ৫ (৩২৭-৬১) পৃঃ ৬ (৩০৩-০৮) পৃঃ ৭ (৯০৮-১৩)

গীতায় শাস্ত্রবিধি—শ্রীঅনিলবরণ রায়

বি ১২।১।৪ কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৪৪০-৪৬)

গৃহস্থের দৃষ্টিতে গীতা—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী

বি ১২।২।৩ , চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৪০৫-১৪) ।

দেবী ভ্রমরবাসিনী—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ

ব ১৭।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৯২৫-২৮) ।

দ্বিজশঙ্করের সত্যনারায়ণের পাঁচালী—শ্রীনলিনীকান্ত দাশ গুপ্ত

ভা-২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৩৬৭-৭১)

নীলাচলের নীলমাধব—শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার

বি ১২।১।৬ , পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৭৪৫-৪৯) ।

পালিপিটকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কথা—শ্রীধীরেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৫০৭-১১) ।

বেদে পৌরাণিক দেবতা—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

ব ১৭-১-৬ ; আশ্বিন ১৩৪৬ ; পৃঃ ৩ (৯৫৪-৫৬) ।

বেদে বাল্যবিবাহ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভা ২৬-২-১ ; পৌষ-১৩৪৫ ; পৃঃ-৩ (১১৩-১৫) ।

ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব ১৭-১- ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৭৭০-৭১) ।

ভাগবতধর্ম্ম—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বি ১১-২-৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬৬৮-৭৩) ।

ভারতীয় সাধন প্রণতি ও পৌরাণিক শিক্ষা—শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

বি ১২ ২-৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬(৪১৫-২০) ।

শক্তি ও শাক্ত—শ্রীদেবদেব ভট্টাচার্য্য

ব ১৭-১-৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৭৬৬-৬৮) ।

শক্তি-সাধনা—অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ব ১৭-১-৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (১০৪৭-৪৮)

শঙ্করাচার্য্য ও বসুবন্ধু—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

ব ১৭-১-২	ব ১৭-১-৩
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫	আষাঢ় ১৩৪৫
পৃঃ ৪ (২১৯-২২)	পৃঃ ৩ (৩৬৯-৭৪)

ব ১৭-১-৪ ;
শ্রাবণ ১৩৪৫ ;
পৃঃ ৮ (৫৫৭-৬৪) ।

সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক হিন্দুয়ানী
—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৬ ২-৬ ; পৌষ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪১ (৭৩১-৭১) ।

২২ হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন

সার জন্ উড্রফ্ ও তান্ত্রিক সৃষ্টিরহস্য—শ্রীদেবদেব ভট্টাচার্য

ব-১৭-২-২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (২৪২-৪৪) ।

হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব ১৭-২-৪	১৭-২-৫
মাঘ ১৩৪৫	ফাল্গুন ১৩৪৫
পৃঃ ১৩ (৬৫৫-৬৭)	পৃঃ ৮ (৮০৭-১৪)

হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ—শ্রীঅনিলবরণ রায়

বি ১২-২-২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ , পৃঃ ১২ (১৩৯-৫০) ।

হৃদয় কাশী—স্বামী ভূমানন্দ

বং ৬-২-২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (২১৯-২০) ।

২৩ হিন্দুধর্ম্ম মধ্যযুগীয়

খেতুরীর মহামহোৎসব ও নরোত্তমদাস—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চৌধুরী

বং ৬-২-৪ , কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫২৬-২৮) ।

চণ্ডীদাস চরিত—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র-৩৮-১-৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৪২৬-২৭) ।

চণ্ডীদাস সমস্যা—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

ব ১৭-১-৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪৩৩-৩৫) ।

ঝুলন—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভা-২৬-১-৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৬২-৬৫) ।

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের বাঙ্গালা 'হরিভক্তিবিলাস'—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

ভা—২৫ ২-৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ—৩ (৮৮১-৮৩) ।

দীনা—শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

বং ৬।১।৩ আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮১৮-২১) ।

দেওধানী—স্বামী ভূমানন্দ

বং ৬-২-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৪৮৮-৯১] । ছবি-১

প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ কি একই ব্যক্তি?—অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য

ভা—২৫।২।৩ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ—৪ [৯০৭-১০] ।

বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কবি—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বং ৬-২-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ [৬৬৪-৭৪] ।

বাদল অভিসার—রায়বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ব ১৭-১-৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [১০০৪-০৬] ।

বৈষ্ণবমতবিবেক [পূর্ব্বানুবৃত্তি]—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

ব ১৭-১-১	ব ১৭-১-৪	ব ১৭-২-৫
বৈশাখ ১৩৪৫	শ্রাবণ ১৩৪৫	ফাল্গুন ১৩৪৫
পৃঃ ৫ (৪৪-৪৮)	পৃঃ ৫ [৬৬৪-৬৮]	পৃঃ ৬ [৮৭-৯২]
ব ১৭-১-২	ব ১৭-১-৫	ব ১৭-২-৬
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫	ভাদ্র ১৩৪৫	চৈত্র ১৩৪৫
পৃঃ ৪ [২৪২-৪৫]	পৃঃ ৩ [৭৮৬-৮৮]	পৃঃ ৭ [৯৬৬-৭২]

২৩ হিন্দুধর্ম্ম মধ্যযুগীয়

বৈষ্ণবতত্ত্ববিবেক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

ব ১৭-১-৩ ব ১৭-১-৬

আষাঢ় ১৩৪৫ আশ্বিন ১৩৪৫

পৃঃ ৪ [৪১৪ ১৭] পৃঃ ৬ [৯২৯-৩৪] ছবি-২

বৈষ্ণব মুসলমান [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]—স্বামী ভূমানন্দ।

বং ৬ ১-৪ , বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃঃ ৭ [৫০২-০৮]।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ব ১৭ ২ ২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ [২২৪-৩০]

ব ১৭ ২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৩১৩-১৮]

ব ১৭-২-৪ , মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৬০০-০৩]।

মহাজনপদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত—শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

বি ১২-২-১ ; মাঘ ১৩৪৫ পৃঃ ৮ [১-৮]।

মহাজন পদাবলী ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

বি ১২-২-৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ [৪-৩৫২-৫৫]।

রাসলীলা—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

বি ১২ ১ ৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ , পৃঃ [৬-৪২৫-৩০]।

ভামানন্দবিলাস—শ্রীরামশশী কর্ম্মকার।

বং ৬ ২-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৭১৪-১৬]।

সহজ ধর্ম্ম—শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ।

বি ১২-১-১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৩৭-৪১].

২৪ বৌদ্ধধর্ম্ম

গৌড়পাদ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

প্র ৩৮-১-৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ [পৃঃ ৪-৩২৩-২৬]।

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ—শ্রীললিতমোহন হাজরা

বং ৬।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৩৮-৪০)

যোগাচার বা বিজ্ঞান বাদ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

বং ৬-২-২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২৬৯-৭২)

শূকর-মদ্দব-সমস্যা—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বং ৭-১-৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৩৯৪-৯৮)

২৬ জৈনধর্ম্ম

জৈনগুরু মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

ভা ২৬-২-২ ; মাঘ ১৩৪৫ , পৃঃ ৮ [১৭৮-৮৫]

জৈন দর্শনে জ্ঞান—শ্রীকালীপদ মিত্র

ভা-২৬-১-১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ-৬ (১-৬)

২৯ অন্যান্য ধর্ম্ম

জরথুস্ত্র—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

বং ৬-২-১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৩৫ ৩৭]।

সুফী ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি—শ্রীনীরদকুমার রায়

প্র ৩৮ ২-৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৬৪৩-৪৮]।

সমাজ-তত্ত্ব

৩০ সমাজ-তত্ত্ব সাধারণ

অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু-সমাজ—আশানন্দ নাগ

প ৮।২।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (২২০-২৭)

দারিদ্র্য কাহার ?—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৬।২।২ , ভাদ্র ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (১৪৫-৪৮)

বিহারে বাঙ্গালী—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৪৬৮-৭১)

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৮ (৫৬১-৫৭৮ ঘ)

৩০ সমাজতত্ত্ব—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়

ভা ২৬।১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৯১৬-১৯)

সেকালের সমাজ—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বং ৭ ১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৭০-৭৩)

সংখ্যাতত্ত্ব

কৃষি-গবেষণায় সংখ্যাবিজ্ঞানের স্থান—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

বং ৬।২।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ , পৃঃ ১০ (৪৩১ ৪০)

রেখাচিত্র সম্বলিত

জনসংখ্যা কি সত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে ?—শ্রীহরকুমার ভট্টাচার্য্য

ভা ২০।২।২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (২০৫-০৭)

প্রাথমিক সংখ্যা-বিজ্ঞান—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

বং ৬।১।৪ ; বং ৬।১।৫ , বৈশাখ পৃঃ ৪ (৫৪৫-৪৮) জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৬৫৯-৬২)।

পৃঃ ৪ (৫৪৫-৪৮ । ছবি-রেখাচিত্র

লোক-সমস্যা—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ

বং ৬।২।১ , শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮৮-৯৪)।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

"বৌদি শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে জান? পদ্মার মধ্যে দিয়ে ইষ্টিমার যায়—কূল-কিনারা দেখা যায় না—সাঁতার জান?"

সরোজিনী ভীত ভাবে বলিল "সত্যি মেজ কাকীমা?"

"সত্যি বই কি—"

"তবে কি হবে?"

"কি আবার হবে—দিলে কেন তোমার বাবা এদেশে মেয়ের বিয়ে?—মা যাচ্ছে না? আর লোক যাচ্ছে না?"

মেজ-বৌ বলিলেন, "নীহার তুই আর ওকে ভয় দেখাস্ নে, বৌমা তুমি সাঁতার জান না?"

"না।"

সরোজিনী মেদিনীপুর, হাওড়া ও বর্দ্ধমান ভিন্ন অন্যদেশ দেখে নাই।

"এবার দেশে গেলে সাঁতার শেখাব।"

"জলে নেমে?"

"তবে কি শুকনো ডাঙ্গায় সাঁতার দেবে? কথা শোন! এই কলের চৌবাচ্চার একটুখানি জল দেখে দেখে তোমাদের মনটাও অমনি ছোট হয়ে গেছে, ঘরের দুয়োরের বাইরে পা বাড়াতে ভয় পাও। এক দেশ আছে—জল বিক্রয় হয়, তোমরাও যেন ঠিক তারাই। নদী নালা দেখনি তো, এ দেশে কি নদী আছে?"

"কেন কাঁসাই।"

সুরুচি বলিলেন, "কংসাবতী। তমলুক থেকে একবার গেঁয়োখালি বেড়াতে গেছলাম, রূপনারায়ণ নদের ওপর দিয়ে। মোহনা দেখেছি অকূল সাগরে মিশেছে, যদি দেখতে, বুঝতে পদ্মা ঠিক অমনি—মেজ-দি দেখেন নি—সেই মোহনা?"

"দেখব না কেন, গঙ্গাসাগরে নাইতে গেছি কবার। নদী নদী, সাগর সাগর! এলোমেলো ঢেউ আর বিশ্রী নোনা জল—আমাদের পদ্মা, যমুনা ব্রহ্মপুত্তুরের মতন নদী কি আর হয়? সে জলে চান কর—খাও—বেড়াও—ভয় নেই।"

মেজ-বৌ ভয়ঙ্কর স্বদেশ-প্রিয়া।

সরোজিনীর মায়ের ধারণা চাকুরে ছেলের হাতে মেয়ে দিয়াছেন, শ্বশুরবাড়ী যাইবে কেন, নিজের শ্বশুর-শাশুড়ী নাই। এরা সবাই কাকা খুড়ীমা বই নয়। সরোজিনীরও সেই ধারণা। বাড়ীর ঝি সারদা আভাস পাইয়াছে বোধ হয়, সে বলিল, "বৌদি দেশে যাবে কেন, দাদাবাবুর কাছে যাবে না?"

মেজ-বৌ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেশের লোক বৌ দেখবে না? ওদের পিসী মানুষ করলে, বৌকে দেখতেও পাবে না? এ কথা কে বললে তোকে? এখানে ঠাকুরপো মস্ত ভোজ-যজ্ঞ করে বৌভাত করলে, ওতে কি হয়েছে? যতক্ষণ না বৌ সরিকের পাতে অন্ন দিচ্ছে ততক্ষণ সমাজে উঠবে না যে, দেশে গেলে তবে পাক-স্পর্শ হবে।"

এবার সরোজিনীর মুখে সুস্পষ্ট ভয়ের ছায়া ফুটিল।

সরোজিনী পাঁচ ছয় দিন থাকে, অমনি বেয়াই আসেন; "আজ আমার বড় জামাইটি এসেছে ওকে একবার পাঠাতে হবে" বলেন খুব নম্র বিনীত ভাবে। অমনি সরোজিনী যায়, পাঁচ ছয় দিন পরে আসে। এইরূপ যখন তখন—আজ বড় বোন আসিয়াছে, কাল ছোট খুড়ীমা, কি মামা বা কাকারা কেহ, এমনি সংবাদ মাসে পাঁচ ছয় বার। এদিককার সুবিধা অসুবিধা কিছুমাত্র দেখেন না।

বেয়াই-বাড়ীর ঝি আসে, "দিদিমণি কবে যাবে তমলুক, একা একা জামাইবাবুর কষ্ট হচ্ছে যে?"

বেয়ানও একে-তাকে জিজ্ঞেস করেন মেয়ে কবে তমলুক যাইবে?

মেজ-বৌ বলিলেন, "ওরা ভারি চালাক, মেয়ের কি বা কাজ—দুটো পান সাজা আর জলখাবারটা ধরে দেওয়া, তাইতেই এত? কলকাতায় মেয়ে বিয়ে দিলে দিত তারা যখন তখন গাড়ী হাঁকিয়ে বাপের বাড়ী যেতে? ওরা আমাদের বোকা ভেবেছে, যেমন তুই তেমনি ঠাকুরপো। ওরা মানুষ চেনে। 'সরোজের কষ্ট হচ্ছে।' মায়ের চেয়ে মাসীর

দবদ। বড় মেয়ে তো শুনি এক মস্ত গেরস্ত-ঘরে পড়েছে, কই তাকে তো জামাইয়ের কাছে পাঠান না, আট বছর শ্বশুর ঘর করেছে, বছরে একবার বাপের বাড়ী যায়। বছরে ছ'বার তত্ত্ব দিয়ে সে বেয়ানকে খুসী রাখতে হচ্ছে।"

সুরুচি বলিলেন, "যাক্ যাক্, মা-বাপ নিতে চাইলে বারণ করতে পারি না, এবার নিয়ে যাক না সরোজ, সত্যিইতো আমরা নিজের শ্বশুর-শাশুড়ী নই।"

ভদ্রমহিলারা বেড়াতে আসেন, বেয়ান-বাড়ীতেও তাঁদের যাতায়াত আছে, বলেন "কবে পাঠাবেন বৌকে তমলুক ?"

"সবে তিন মাসও বিয়ে হয় নি, এখনি এত ব্যস্ত কি ?"

ইতিমধ্যে সুরুচির হইল অসুখ, সরোজিনী পিত্রালয়ে। মেজ-বৌ বলিলেন, "বৌ আসুক তোর কাছে একটু বসুবে আমি বসতে পারিনে বেশীক্ষণ।"

"আনাই তবে।"

সরোজিনী আসিল।

কয়েক দিন পরে ছোট ভাই আসিল, "দিদিমণি যেতে হবে—মেজ-কাকীমা এসেছেন।"

বৈকালে বেয়াই আসিয়া কন্যা লইয়া গেলেন।

আট নয়দিন পরে ফণী আনিতে গেল, বেয়ান বলিলেন, "আমি হাওড়া যাব মেজ-মায়ের সঙ্গে ও আমার সঙ্গে যাবে।" ফণী আগে হইতেই বিরূপ, বলিল, "কাকাকে না জিজ্ঞাসা করে নিয়ে যাবেন কেমন করে ?"

"কেন মেয়ে তো বিক্রী ক'রে দিই নি।"

"দিয়েছেন যখন দান করে, বিক্রীই হল। হাওড়ায় মেয়ে বিয়ে দিলে একথা বলতে পারতেন না"—বলিয়া ফণী চলিয়া আসিল।

বেয়ান মেয়েকে আর হাওড়ায় লইয়া গেলেন না বটে, কিন্তু পিতার সেবার জন্য খালি বাড়ীতে রাখিয়া নিজে চলিয়া গেলেন।

সুরুচি বলিলেন, "এখন থাক্ মেজ-দি, বেয়াইয়ের কষ্ট হবে।"

মেজ-বৌ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "থাক্।"

পনের দিন পরে বেয়ান ফিরিলেন—ফণী আর যাইবে না, সুরুচি নীহারকে খবর আনিতে পাঠাইলেন।

বেয়ানের খুব মাথার অসুখ—সরোজিনী এখন আসিলে চলে না।

দিন পাঁচেক পরে নীহার গেল—বেয়ান ভাল হইয়াছেন, তবে ছোট বোনটীর আমাশয় হইয়াছে, বোনটি সরোজিনীর দু'বছরের ছোট।

গেল আর কয়েক দিন।

আবার সুরুচি খবর পাঠাইলেন, বোনটি ভাল হইয়াছে, ভাইটির অসুখ।

এবার সুরুচির রাগ হইল।

রাগী বলিয়া সুরুচির ভয়ানক দুর্নাম। নুতন কুটুম্বরা সে পরিচয় না পাইলেই ভাল। আবার সাত দিন পরে নীহার গেল।

ইন্দোরে সরোজিনীর ছোট কাকা থাকেন, তিনি বিবাহের সময় আসিতে পারেন নাই, তাঁহার আসিবার কথা আছে, আসিলে তাহার পরে সরোজিনী আসিবে।

সুরুচি চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "আহা।"

মেজ-বৌ বলিলেন, "ধন্যি ধন্যি। কাকা এলে কি গিয়ে দেখা করতে পারত না ? বৌকে আমরা যা ভেবেছি তা নয়—মায়েদের মতনই; আমরাই বৌ-বৌ করে মরি।"

কথাটা মিথ্যা নয়। বৌয়ের মায়ায় বাঁধা পড়িয়াই এই দশা।

"থাক মেজদি, থাক্—আমাদের ছেলের বৌ হলে কি এই রকম হত ? ভাসুরপো-বৌ বলেই এমন ধারা করছে।"

বিশ্বকর্ম্মা এসব খেয়াল করেন না। উত্তর দিলেন, "মাথা নেই তার মাথাব্যথা।"

পরের দিন তত্ত্ব আসিল, বেলা প্রায় এগারটার সময়। নীহার উল্লসিত হইয়া সবে গাড়ীর নিকট ছুটিয়া যাইতেছে, সুরুচির ডাক শুনিয়া ফিরিল।

"নীহার সব ফিরিয়ে দাও, একটি জিনিষও যেন না নামায়।"

"কেন মা ? লোকে বলবে কি ?"

"যা খুসী বলুক গে—বৌকে রাখবে আটকে, তাদের জিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক কি ? দাও ফিরিয়ে দাও, গেট বন্ধ করে দিয়ে চলে এস।"

বেয়াইয়ের ঝি নামিয়া আসিয়া বলিল, "কি মা, কেন মা, কি হয়েছে মা?"

"কিছু হয় নি, তত্ত্ব আমরা নেব না, বেয়ানকে গিয়ে বলো।" বলিয়াই সুরুচি গিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ঝি মলিন মুখে ফিরিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিবার সময় নীহারকে বলিল, "বুঝতে পেরেছি রাগ হয়েছে। নাই বা হবে কেন? আমাদের দেশে হলে বৌ আর নিতই না। মেয়ের মা যেন কি; এমন শ্বশুর-ঘর, এত আদর, তবু মেয়ে আটকে রাখবে।"

ফণী উপস্থিত ছিল, পরম খুসী মনে ঠিক দুপুরে বেড়াইতে বাহির হইল। বোধ হয় ব্যাপারটার প্রচার-কার্য্যের জন্ম।

বৈকালে বিশ্বকর্ম্মা আসিলে নীহার দূত সংবাদ দিল। তিনি বলিলেন, "ভাল করনি।"

"বেশ করেছি, একটা কথা বলবে ত' আজই আমি চলে যাব। আমাদেরই যেন মেয়ে, ওদের ছেলে। কেন, এত তাচ্ছিল্য সইব কেন? আমাদের মনের দিকে ওঁরা চান একটু?"

বিশ্বকর্ম্মা আর কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যাবেলা বেয়াই আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে দেখা হইল বসিবার ঘরে। বলিলেন, "আমি আফিসে যাচ্ছি এমন সময় তত্ত্ব ফেরৎ গেল, আমরা অবাক্, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলাম না। ভারি ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সবে আফিস থেকে ফিরে এই আসছি।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমিও কিছু জানি নে, আমি আজ সাড়ে দশটায় আফিসে গেছলাম।"

"তবে যাই পাঠিয়ে দিইগে, সব তেমনি সাজান আছে।"

"দাঁড়ান, আমি জেনে আসি।"

সুরুচি বলিলেন, "না কিছুতে না।"

"আমি পারব না বারণ করতে।"

"আমি বলছি" বলিয়া সুরুচি বেয়াইয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন।

বেয়াই অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি, কিছু বুঝতে পারছি নে। এমনটা কেন করলেন?"

"আপনারাই করালেন। এক মাসের বেশী হল বৌ আনতে দিচ্ছেন না, আমার অসুখ আজও সারে নি। আপনার জিনিষের সঙ্গেই কি সম্পর্ক? বৌয়ের সঙ্গে নয়? শেষ, মেয়ে আপনাদের কাছেই থাক; সরোজ যদি নিয়ে যায় তো যাবে আমার আর দরকার নেই।"

"ও—আমরা বুঝতে পারি নি, আপনারা এত রাগ করবেন জানলে—"

"অনেক আগেই আমাদের রাগ করা উচিত ছিল বেয়াই মশাই, সেটা করিনি বলে এই রকম হচ্ছে। আপনারা যখন নিতে চান, যত অসুবিধা হক তখনি যেতে দিই, কিন্তু আনতে গেলে ফল হয় উল্টো। যে দিন সে গেল আমি বিছানা থেকে উঠতে পারি নে, একটি মাসের মধ্যে একবার সময় হল না আসবার?"

"ও যাক—যাক্, বড় অন্যায় হয়েছে, তবে এবার তত্ত্বটা পাঠিয়ে দিইগে।"

"না, ও আর না।"

"কি করব তবে অতগুল জিনিষ?"

"অতগুল আর কি? জামাই-মেয়ের কাপড় চোপড়, সুগন্ধি? সে সব রেখে দিন গে, ওরাই নেবে। আর কতকগুলি মিষ্টি মেঠাই বাজারের কেনা এই ত? গরীব-দুঃখী ডেকে দিয়ে দিন গে।"

"গরীব দুঃখীর জন্যে ত কিনি নি, আপনাদের জন্যে কিনেছিলাম।"

"আমাদের কল্যাণে গরীবেরা পেয়ে যাক না, আপনার জিনিষের সদ্ব্যবহার হবে। সত্যি ত তাদের দিতেন না, এই সুযোগে কিছু পেয়ে যায় ত ভালই। আর দেখুন, আমাদের দেশেও দেবার প্রথা আছে। মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী যা'র সময় মেয়েকে আনবার সময় অনেক জিনিষ-পত্র নিয়ে যান। সে সব এই বাজারের খেলো, সস্তা, বাসি জিনিষ নয়। ফরমাস দিয়ে তৈরি করাতে হয়। আপনাদের মেঠাই, সত্যি বলতে কি, বাড়ীর কেউ খায় না, পাড়ায় বিলিয়ে দি, সে কাজটা এবার আপনিই করুন।"

বেয়াই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তবে সরোজিনীকে কবে পাঠাব? কাল কি?"

"সে আমি কিছু বলতে পারি নে, আপনাদের অসুখ-বিসুখ ভাল হোক তখন দেখা যাবে।"

বেয়াই চলিয়া গেলে সুরুচি উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন, মনটা অতি উৎফুল্ল। যেন খুব বড় একটা কাজ করিয়াছেন। হঠাৎ মনে হইল, কলিকতায় ত এ নিয়ম আছে, তত্ত্ব অপছন্দ হইলেই ফিরাইয়া দেয়, সেই কাজটা তিনিও করিয়া ফেলিলেন না কি? তবে ত একটা মস্ত কাজ করিয়াছেন। আহা, ঝি-টার কথা মনে হইয়া কষ্ট হইতেছে, সে বেচারীর দোষ কি? কেমন মলিন মুখে চলিয়া গেল। যাক, সে ত প্রায়ই বেড়াইতে আসে, এবার আসিলে খুশী করিয়া দিবেন। লাইব্রেরীর বইগুলি খুলিয়া দেখিলেন; নাঃ কোন কথাই লেখা নাই—তত্ত্ব ফিরাইয়া দিয়া ছেলের মার মনের ভাব কি এই রকম উল্লসিত হয়? লেখিকাদের উচিত এ সম্বন্ধে বেশ বিশদ করিয়া একখানা নভেল লেখা, তা তাঁহারা লিখিবেন না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ঘড় ঘড় করিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী একেবারে বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকিয়া পড়িবার শব্দ হইল। সকলেই শুইয়াছিল, কেহ আসিল ভাবিয়া সুরুচি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

নীহার আসিয়া বলিল, "তত্ত্ব এসেছে।"

"কেন? আমি বারণ করে দিয়েছিলাম, আবার?"

বিশ্বকর্ম্মা কথা বলিলেন না। নীহার বলিল, "ঝি বললে, বাবু না কি বলে দিয়েছেন।"

"তুমি বলেছিলে?"

বিশ্বকর্ম্মা খুব শান্তভাবে বলিলেন, "ঠিক বলি নি, বেয়াই অনেক করে বললেন, অনেক অনুরোধ করলেন, আমি বললাম, 'ওঁরা যখন অমত করেছেন, আমি কি করব', তবু ছাড়লেন না। তখন বললাম, 'কাল দেখা যাবে', তা দিয়েছেন যখন পাঠিয়ে, তুলে রাখ্ নীহার, কাল বিলিয়ে দিস্।"

"বুঝেছি, যা খুসী করগে নীহার; আমি জানি নি।"

মেজ-বৌ আসিয়াছেন, বলিলেন, "তা জানি, নাচুনে ঠাকুর নইলে এমন কাজ করবে কে? ওঁর জন্যেই লোকে এমনি করতে সাহস পায়। এমন মানুষ আবার শ্বশুর!—শ্বশুর না শ্বশুর!"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "শ্বশুর নয় তবে কি?"

"শাশুড়ীর আরদালী", বলিয়াই মেজ-বৌ অন্তর্দ্ধান।

সুধীরের ছবি-আঁকার হাত আছে, একদিন একখানা ছবি সরোজিনীকে দিল।

সুরুচির জ্বর, শুইয়া আছেন, সরোজিনী বলিল, "দেখুন কাকীমা।"

একটি ভুটিয়ানী পিঠে কমলা লেবুর লম্বা ঝোড়া বাঁধিয়া উঁচু পাহাড়-পথে উঠিতেছে, চুলের ফ্যাসন ও খোঁপাটি ঠিক সরোজিনীর মত। নীচে লেখা—পরম পূজনীয়া বৌদি, শ্রীশ্রী সরোজিনী।

"এ কি? তুমিও একটা ছবি আঁক, ঠিক যেন কুলী—মাথায় মস্ত একটা মোট, মুখটা ঠিক বলের মত করে আঁক।"

"আমি যে আঁকতে পারি নে, ও ভারি দুষ্টু, সব সময় সবার সঙ্গে লাগবে।"

কাগজ ও পেন্সিল লইয়া সুরুচি একটা ছবি আঁকিলেন, সেটা এত কিম্ভূতকিমাকার হইল যে, মানুষ, না জন্তু, না কোন্ পদার্থ, বোঝা দায়। সরোজিনী খুসী হইয়া ছবিটির তলায় লিখিল,—স্নেহের ঠাকুরপো শ্রীমান্ সুধীর।

সুধীর দেখিয়া বলিল, "ঠিক হইয়াছে একেবারেই যেন আমি।"

তার পরে পুকুর খুঁজিয়া সুধীর একটা কচ্ছপ-শিশু ধরিয়া আনিল এবং হাত পাঁচেক লম্বা একটা নারিকেল দড়ি সেটার পায়ে বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রান্ত সুরুচির খাটের সামনের দিকের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। কার্য্যটা সকলের অগোচরে ও অতি নিঃশব্দে সম্পন্ন করিল।

সন্ধ্যার সময় শুইয়া থাকিতে নাই। সুরুচি বাহিরে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবে আসিয়া শুইয়াছেন, নীহার আসিয়া আলো জ্বালিল।

অন্ধকারে কচ্ছপটা বোধ হয় এক কোণে লুকাইয়া ছিল; আলো ও মানুষের সাড়া পাইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল।

নীহার চমকিয়া উঠিয়া "ওরে বাবা, এটা কি রে", বলিয়াই এক লাফ দিয়া বারান্দায় গিয়া পড়িল, সুরুচিও সভয়ে উঠিয়া বসিয়া "দিদি দিদি" বলিয়া ডাকাডাকি লাগাইলেন।

নীহারের চীৎকারে সকলে আসিয়া জুটিল, ভয়ে কেহ ঘরে ঢোকে না, মেজ-বৌ বলিলেন, "সেই লক্ষীছাড়ার কাজ, তাকে ডাক না।"

সুধীর আসিয়া নির্ভয়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়া কচ্ছপটির গতিবিধি দেখিতে লাগিল।

"অত কাছে যাস্ নে, যদি কামড়ায়? ওদের কামড় বড় শক্ত।"

"ইস্ কামড়াবে", কচ্ছপটাকে উল্টাইয়া দিয়া হাতের উপরে করিয়া নাচাইতে নাচাইতে সুধীর বলিল, "দেখলে? ও আমার ভাই, আমাকে ভালবাসে।"

সুরুচি বলিলেন, "তোর ভাই হল কি করে?"

"ও কচ্ছপ, আমরা কাশ্যপ; ভাই নয়? নে নীহার একটু আদর কর।"

"বাবা রে, গেছি রে" নীহার ঠাকুরকে ডিঙ্গাইয়া ছুটিল।

"দে খুলে দে, কষ্ট দিস নে, কোথা থেকে আনলি?"

"জল থেকে, আমি ভেবেছি ও আজ আপনার কাছে থাকবে। দিই? ভয় নেই ও ভারি শান্ত।"

"ও বাবা, খবরদার খাটের উপর দিস নি" সুরুচি সরিয়া গেলেন।

মেজ-বৌ পিছন হইতে এক চড় বসাইলেন।

"দে লক্ষ্মী ছেড়ে দিয়ে আয়, ভারি ভয় করে আমার।"

"ছেড়ে দেব? রাত্রে 'কারী' হবে, আপনিও একটু খেয়ে দেখবেন।"

মেজ-বৌ জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কচ্ছপ খায় কসাইরা, যে কষ্ট দিয়ে মারে। তোরা না বোষ্টম? ভাল চাস তো ছেড়ে দে, নইলে ঠাকুরপোকে ডেকে আনাচ্ছি, আর সব চুলোয় গেল, এখন কচ্ছপ খাবে। এই না ভাই বললি? ভাইকে খাবি? তা যে দিন কাল পড়েছে ভাই ভাইকে আগে খাচ্ছে। কথা শুনলি? গেলি?"

সুধীর মাছ-মাংস আদৌ পছন্দ করে না, কেবল মাকে ক্ষেপায়। বলিল, "ছেড়ে দেব, কি দেবে আগে বল।"

সুরুচি বলিলেন, "যা চাস তাই।"

"আর ছবি আঁকবেন? আমার মাথায় তিনমণ বস্তা চাপাবেন?"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "না।"

তখন কচ্ছপ-শিশুর দড়ি খুলিয়া লইয়া সুধীর পুকুরে ছাড়িতে গেল, আলো লইয়া জন চার পাঁচ তাহার অনুসরণ করিল।

ফাল্গুনের শেষ, বিশ্বকর্ম্মা শ্বশুরালয়ে, এক মাসের ছুটী।

বাড়ীর নাম আনন্দ-কুটীর, পুকুরের নাম শ্যামা-সরোবর। আনন্দ-কুটীরবাসিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বাড়ীর কর্ত্তা মহাশয় জেদী-স্বভাব, গম্ভীর-প্রকৃতি এবং নিষ্ঠাবান্ শুদ্ধাচারী। গৃহ-বিগ্রহ ব্রজগোপালের প্রসাদ ভিন্ন অন্ন কিছুতে রুচি নাই।

সমস্ত দিনটা কাটে পূজা-আহ্নিক, গো-সেবা এবং গাছ-পালা লইয়া। কোন্ আনাচে কানাচে এতটুকু একটা কিসের চারা জন্মিয়াছে, অমনি নজরে পড়িল, তৎক্ষণাৎ সেটা তুলিয়া আনিয়া উত্তম স্থানে স্থাপন, ঘেরা টোপ তৈরী এবং নিত্য সেবা, ফলে ছয় মাস পরে দেখ সুন্দর সতেজ গাছটি! বাড়ীর সামনে ফুল ও পিছনে ফলের বাগিচা। কাশীর কুল, পেয়ারা, আতা, পশ্চিমের, মালদহের বিখ্যাত আম, সিঙ্গাপুরের আনারস ইত্যাদি যেখানকার যে ভাল ফল, সব বাগানে।

গোশালাটাকে একটা ডেয়ারী ফার্ম্ম বলা চলে—সমস্ত দিন গরু-বাছুর হাওয়া খায়। বিশুদ্ধ হাওয়া। এখান হইতে ওখানে বাঁধা, ওখান হইতে সেখানে। ছায়া, কচি ঘাস ও খোলা বাতাস, এই তিন সুবিধা যেখানে বেশী, সেই খানে বাঁধা হয়। সকালে ও বিকালে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া খড়-ভূষি খায়, গোয়াল-ঘরের পাশে প্রকাণ্ড হাঁড়ীতে চাল ও কলাই একত্র সিদ্ধ হয়, বড় বড় লাউ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, পানীয় জলের জন্ম আলাদা পাত্র, রীতিমত দেবসেবা। আকার প্রকারও তেমনি, এক একটা গাই সিন্ধুকের মত দেখিতে।

আশ পাশের দশ বিঘা জমিতে ছড়ান গৃহস্থালী, কর্ত্তা সর্ব্বত্র আছেন। এই দেখিলে পুকুরপাড়ে নারিকেল ও কলা গাছের গোড়ায় ঘুরিতেছেন, এই দেখ, বাগান হইতে এক কোঁচড় লেবু লইয়া আসিলেন; এই খড়-কুচান দেখাইয়া দিতেছেন, এই আবার ফুলগাছের শুকনা পাতা ছিঁড়িতেছেন। কাস্তে বা পাঁচন একটা হাতে আছেই। দরকারী কথা বলিতে আসিয়া দিদি সারা বাড়ী ঘুরিয়া বাবাকে না পাইয়া রাগিয়া বলেন, "নাঃ, বাবা বড্ড অস্থির, এক দণ্ড এক জায়গায় নেই, কেবল গাছ আর গাছ, বাড়ীটাকে ত শিবপুরের বাগান বানিয়ে ফেলেছেন তবু সখ মেটে না।"

পিতা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করেন, নিয়মানুবর্ত্তিতায় ও অনলস কর্ম্ম-নিষ্ঠায় একমাত্র দিদিই পিতার সন্তানের যোগ্য।

বাড়ীতে রান্নার দুই মহল, এক গোপালের, অন্যটা মচ্ছি-ভোজী অর্থাৎ অনাচারীদের। তাহারা শুদ্ধ না হইয়া গোপালের আঙ্গিনায় আসিতে পারে না। বাড়ীতে জামাতা বা আত্মীয়-কুটুম্ব আসিলে আমিষ মহলে পর্ব্বদিন উপস্থিত হয়, সেই খরচের সমান হিসাব করিয়া গোপালের ঘরেও দ্বিগুণ মহোৎসব, "বাঃ গোপাল ছেলে-মানুষ, পাওনা ছাড়বেন কেন?" সে-সময় প্রফুল্লরা পড়ে বিপদে, কোন্ মহলে অতিথি হইবে? কলিকালের মানুষের খাইবার শক্তিটা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। জামাতারা বুদ্ধিমান, দুই দিক্ বজায় রাখেন।

প্রফুল্লের বিবাহের আগে সব শুদ্ধই আহারে পিতার মত শুদ্ধাচারী ছিল, কিন্তু বউ দুটি তেমনি, মাছের গন্ধ না হইলে অন্ন উঠে না। পিতা নিজের তদারকে অবিলম্বে আমিষ মহল বসাইয়া সুচারু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সে দিকে লীলার কর্ত্তৃত্ব। দিদি এক এক দিন স্নানে যাইবার সময় উঁকি দিয়া দেখিয়া যান, সে-দিনের বউ কেমন গিন্নী হইয়াছে।

এ-দিকে ভোর হইতে ব্রজগোপালের ভোগের আয়োজন —পিতার প্রিয় নিম, পলতা, ডুমুর, হেলঞ্চা, গিমে, পাট পাতা, পেঁপে, নিজেই একটার পর একটা হাতে করিয়া আনিয়া দিতেছেন। দিদি বলেন, "তিতো খেতে খেতে গোপালের অরুচি ধরে গেল।"

প্রফুল্ল বলে, "গোপালের ম্যালেরিয়ার ভয় নাই আর।"

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "গোপালকে না দিলেই হয়।"

"ও বাবা! প্রসাদ না হলে বাবা স্পর্শ করবেন কিছু?"

প্রফুল্ল বলে, "ভক্তের হাতে পড়ে ভগবান্‌কে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়, এ আর বেশী কি?"

কবিরাজী শাস্ত্রে ত্রিফলা অমৃতস্বরূপ। পিতা প্রতি সকালে ত্রিফলার জল পান করেন। গুণ-বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমায় একটু দিন তো।"

সুরুচি সবে মাত্র গ্লাসটা পিতার হাতে দিয়াছেন, তাপসী আসিয়া বলিলেন, "জামাইবাবু একটু ত্রিফলার জল চাইলেন, আছে?"

"আছে একটু ঐ যে।"

পিতা বড় সন্তুষ্ট, "কৈ দেখি কতটুকু? না ওতে হবে না, দে আমি দিচ্ছি, গ্লাসটা আন্। খাওয়াই উচিত, ওর যা আহার, রোজ একটু করে ত্রিফলার জল দিস, তোরা নিজেরাও খাবি নে, অন্যকেও দিবি নে ঐ তো তোদের দোষ," বলিয়া নিজের গ্লাস হইতে অর্দ্ধেকটা ঢালিয়া দিলেন।

দিদি বলিলেন, "যে অমৃত ওর আবার কম বেশী।"

তার পরে রোজ সকালে জিজ্ঞাসা করেন, "ওকে দিয়েছিস? না সবটা আমায় দিলি? বেশী করে ভেজাসনে কেন? নেই না কি?"

"নেই? ছ'মাসের আছে, আজ এক হাঁড়ি ভিজিয়ে রাখব। এ বাড়ীতে আপনার জন্যে ওষুধ-পত্রের অভাব নেই, কেউ যদি ডাক্তারি কি কবিরাজী করতে চায়—এখানে থেকে বিনা খরচে করতে পারে।"

পিতার অত্যন্ত তিক্ত-প্রীতি সন্তানদের উপরে বর্ত্তিয়াছে উল্টা ভাবে।

সুরুচির বড় বোন বড়-লোকের বৌ, সংসারও বড়। কিন্তু তিনটি কাজ লইয়া তাঁহার দিন কাটে, এক, বিচার— ছুঁই-ছুঁই—আনন্দ-কুটীরে এ ভাবটা তিনিই দিয়াছেন। দুই —সন্ধ্যা, পূজা, জপ, বেলা চারিটায় স্বহস্তে হবিষ্যান্ন গ্রহণ —পরম বৈষ্ণবী। তিন, বই, পুস্তক-প্রীতি, বই পাইলে অচৈতন্য। সংসারের কোন কিছুতেই তিনি নাই। পিতা বলেন, "হেমন্তটার বুদ্ধি-শুদ্ধি আর হবে না।"

মেজ-দির দেশের বাড়ী পদ্মা-গর্ভে। পিতৃদত্ত জায়গায় আনন্দ-কুটীরের সঙ্গেই বাড়ী করিয়াছেন। আরও একখানা ভাল বাড়ী পিতা দান করিয়াছেন। মেজ-দির হাঁপানী রোগ, দশ বৎসরের চিকিৎসায় সর্ব্বস্বান্তপ্রায়। এখনও কোন দৈব বা পার্থিব ঔষধির খোঁজ পাইলেই আনা চাই বা যাওয়া চাই। মেজ-দির স্বামী ও সন্তানদের ধারণা যে, জগতে একটি মাত্র কাজ আছে, সে হইল হাঁপানীর চিকিৎসা। এই চিকিৎসার যদি ত্রুটি হয় তবে জীবন ধারণ বৃথা। পিতা বলেন, "রামপ্রাণের জীবনটা হিরণ একেবারে নষ্ট করে দিলে, সারা জীবনে একটু শান্তি পেলে না, ও আবার বিয়ে করুক।"

দিদি বলেন, "হ্যাঁ, বাবার খুব ভাল বুদ্ধি, জামাইবাবু আবার বিয়ে করুন, আবার আর এক পাল ছেলে পিলে আমার ঘাড়ে চাপান।"

মেজ-দির স্বামী, সন্তান, সংসার, দিদির হাতে।

সেজ-দি সরযু, অর্থাৎ দিদি, বাড়ীর গিন্নী, বিদ্যাবুদ্ধি, কাজ-কর্ম্মে তাঁর জুড়ি নাই, অসময়ে তিরিশ জন অতিথি আসিলেও বাজারে ছুটিতে হয় না। আশ-পাশের যত দুঃস্থ তাঁর আশ্রিত, শিশুপালনে অদ্বিতীয়া। অনেক পিতা-মাতা নিজেদের ছেলে-পিলে তাঁহার কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "শিশুর ডিপো।"

দিদির সব চেয়ে ভয় টাকার হিসাব রাখিতে ও লিখিতে, সেই সুযোগটা সব চেয়ে বেশী গ্রহণ করে দ্বিজেন।

প্রফুল্লের ঝোঁক ব্যবসায়ে, মাঝে মাঝে এক একটা ব্যবসা আরম্ভ করে, বেশ মোটা রকম টাকা লোকসান দিয়া কিছু দিনের মত নিশ্চিন্ত থাকে। দ্বিজেনের মেজ খুড়-শ্বশুরের পার্ব্বতীপুরে মস্ত সাবানের কারখানা, প্রফুল্ল সেখানে শিখিয়াছে সাবান তৈরী এবং চৌমহনী ও কটকে রংয়ের কাজ। কৃষি-কলেজে পড়ার দরুণ বাগানের গাছপালার স্বাভাবিক আকারকে বৃহত্তম করিতে পারে—যথা, একটা মটরশুঁটি একটা বড় সীমের আকার হয়, একটি লঙ্কা একটি কলার মত। বলা বাহুল্য, পাড়া-পড়শীর শাক-সব্জীর অভাব হয় না বা পাকা ছাপ-দেওয়া রঙীণ খদ্দর এবং সাবানও তাহারা কেনে না।

দ্বিজেন এক জায়গায় ঠিক থাকিতে পারে না, সমস্ত বাংলা দেশ ঘুরিয়া বেড়ায়, বেশীর ভাগ বাড়ী ও কলিকাতা। অষ্ট প্রহর তার টাকার দরকার হয়।

"ছোড়-দি একটা টাকা দাও তো, টিকিট, কার্ড আনব।"

"খুচরো টাকা আর নেই।"

"নেই? পরশু সন্ধ্যাবেলা যে সুদের তিরিশ টাকা পেলে?"

"সে হিসেব ধর্ না, হাটে আট টাকা, তিন জোড়া কাপড় পাঁচ টাকা, বোষ্টমী দিদি দু'টাকা, নিমুর বিস্কুট এক টাকা দশ আনা, হলো না?"

"জামাইবাবু শুনুন।"

"শুনেছি, দিদির এমন সূক্ষ্ম হিসাব, এমন কড়ায়-গণ্ডায় মিল, কেউ পারবে না এ রকম।"

দিদি কিছু সন্দিগ্ধা হইয়া বলিলেন, "মেলে নি? কিছু কম পড়েছে কি? তা হবে, নিমুর শেলেট এনেছিল দু আনার।

"এবার ঠিক মিলে গেছে।"

দিদি নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিজেন বলিল, "কার কাপড় কিনলে তুমি? সব্বার কাপড় আমি এনে দিয়েছি।"

"আমানের বৌ আর ছেলে-পিলের।"

আমান একজন গরীব চাষী।

"আর বোষ্টমী দিদিকে টাকা দেওয়া কেন? একা মানুষ, দুটো আম বাগান—তোমার টাকা ঐ করে যায়।"

দ্বিজেন এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে কলিকাতা হইতে জামা-কাপড় আনাইয়া বিক্রী করিয়া চল্লিশ টাকা লাভ পাইয়াছে।

পরের দিন হাটে যাইবার সময় এক গরুর গাড়ী আসিল এবং দ্বিজেন দিদির কাছে টাকা চাহিল না।

পিতা বলিলেন, "গাড়ী কিসের?"

"সুমু হাটে যাবে।"

"হাটে যাবে তার জন্যে গাড়ী? বেটা তো আচ্ছা নবাব হয়েছে!"

"ও নিজে ভাড়া দেবে।"

"তবে যাক্—আমি বলি পাল্কী করে যাক্।"

ঘরের ভিতরে বিশ্বকর্ম্মা ও দ্বিজেন, দ্বিজেন কর্দ্দ লিখিতেছে, বাহিরের বারান্দায় পিতা ও মেয়েরা।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "শোন্।"

পিতা বগুড়ায় করতোয়া স্নানে যাইবেন, ষ্টেশনে যাইবার জন্য দ্বিজেন পাল্কী লইয়া আসিল।

পিতা বলিলেন, "পাল্কী কেন?"

দিদি বলিলেন, "সুমু এনেছে, গরুর গাড়ীর ঝাঁকানীতে আপনার কষ্ট হবে।"

"আমার কষ্ট হবে? কে বললে? আমি কি রোগী? ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি? আমি গাড়ীতেই যাব, সুমুর দরকার থাকে ও পাল্কীতে যাক্।"

পাল্কী ফেরৎ গেল।

বগুড়া হইতে ফিরিয়া পিতা বলিলেন, "সুমু যে বেজায় খরচ করতে আরম্ভ করেছে, টাকা পায় কোথা ও? তোর সব ওরাই লুট করলে।"

পিতা দিদিকে আলাদা পঞ্চাশ বিঘা জমি ও টাকা দিয়াছেন। ব্যাঙ্ক হইতে সেই টাকার সুদ দিদি মাসে মাসে পান।

"না, আমার টাকা নয়" বলিয়া দিদি দ্বিজেনের চল্লিশ টাকা লাভের বৃত্তান্ত বলিলেন।

"কই সে টাকা? আন্ দেখি।"

টাকা দিদির কাছেই ছিল, আনিয়া দিলেন।

পিতা বলিলেন, "তিন দিনে পনের টাকা খরচ করেছে, বেটা ভারি বাহাদুর।"

বলিয়া টাকা লইয়া উঠিয়া গেলেন। বাড়ীর সামনেই ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী প্রফুল্ল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া একটা পাশ-বুক দিদির কাছে ফেলিয়া দিলেন।

পিতা চলিয়া গেলে দ্বিজেন বইটা খুলিয়া দেখে, চার বছরের আগে একটী পয়সা তুলিতে পারা যাইবে না।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "নাও এখন গাড়ী কর, পাল্কী কর।"

তেজেন স্বভাবতঃ শান্ত, কিন্তু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেই বিপদ, যতক্ষণ সে কথা বলিবে কাহার সাধ্য একটা কথা কয়। সে একাই একশ।

বছর কয়েক আগে যখন এখানকার স্কুলে পড়িত, একদিন স্কুলে গিয়াছে, তাহার এক সহপাঠীও সাত আট দিন পরে সেই দিন স্কুলে আসিয়াছে।

হেড্ পণ্ডিত ভয়ানক রাগী স্বভাব, অত্যন্ত গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন, সেই ছেলেটিকে।

তেজেন বলিল, "ওর অসুখ করেছিল পণ্ডিত মশায়—"

"আট দিনের মধ্যে একটা খবর দিতে পারল না। আমার ছাত্রেরা সংস্কৃতে কাঁচা থাকবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।"

"হঠাৎ ওর জরটা খুব বেড়ে গেছল।"

"তুমি থাম, ওকে আমি একঘণ্টা আটক রাখব আজ।"

"কেন পণ্ডিত মশায়? সত্যিই যে।"

"তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি।"

"আমি দু'রাত নার্স করেছি।"

রক্ত চক্ষে পণ্ডিত বলিলেন, "চুপ কর তুমি, বলছি ওকে, তুমি কেন জবাব দাও? ওর পড়ায় আদৌ মন নেই! দেখাচ্ছি আজ।"

"পড়বে কি করে? সে দিন থেকে—"

"চুপ করবে কি না তুমি?"

"করছি। চার ডিগ্রী জর তবু ও—"

গর্জ্জিয়া পণ্ডিত বলিলেন, "তবু চুপ করলে না তুমি? ওঠ, দাঁড়াও বেঞ্চির উপরে।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তিন দিনে জর ছাড়ল, শেষে।"

ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র তেজেনের পিঠে সপাং করিয়া এক বেত বসাইয়া দিয়া পণ্ডিত বলিলেন, "কে বলেছে তোমাকে ওর পক্ষে ওকালতী করতে?'

"বগুড়া থেকে ডাক্তার এসে—"

হাল ছাড়িয়া হতাশ হইয়া পণ্ডিত বসিয়া পড়িলেন, বেত ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আজ থেকে তোমার নাম দিলাম উকীল।"

সেই হইতে ছেলেরা তেজেনকে 'উকীল' বলিয়া ডাকে। তেজেনের গায়ে কেহ কখন হাত দেয় নাই। দিদি দুঃখ করিলে তেজেন বলিল, "পণ্ডিত মশায় মেরেছেন ত কি হয়েছে? নিজের ছাত্রকে মারবেন না?"

দ্বিজেন ও তেজেনের একটু একটু জর হয়, লিভারের দোষ হইয়াছে।

পিতা ভোরে উঠিয়া সকলকে ডাকিয়া তোলেন, যে বেলা করিয়া ওঠে তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না।

দ্বিজেনের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, পিতার খড়মের শব্দ পাইবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তেজেনের ঘুম ভাঙ্গে নাই।

"এই গোপু ওঠ, ওঠ, লক্ষীছাড়া কোথাকার, রোজ ডেকে তুলতে হয়, বাড়ী এসে লেখা-পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, দিন-রাত খালি ঘুম! যা আজ রাত্রেই তুই কলকাতায় যা।"

তার পরে কাঁচা পেপে পাড়াইয়া আনিয়া তাহার আঠা ও চিনি একত্র মিশাইয়া স্বহস্তে দুই বড়ি তৈরী করিলেন, "মনু, মনুটা কই? দেখছিনে যে, সেটা ত এত সকালে ওঠে না ডাক্ তাকে।"

একজন দ্বিজেনকে পুকুর-ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিল, চোখে মুখে জলের চিহ্নও নাই, যেন কতক্ষণ আগে উঠিয়া বেড়াইয়া আসিল।

"নে, দুই ভাই দুটো বড়ি খেয়ে ফ্যাল্, লিভারের এমন ওষুধ আর নেই।"

তেজেন মুখ ভারি করিয়া বসিয়া আছে, একে বিছানা হইতে গালাগালি খাইয়া উঠিল, তার উপর প্রাতঃকালে এই উত্তম প্রাতরাশ।

যা হোক, দুই ভাই দুই বড়ি গিলিলে পর পিতা নিজের কাজে গেলেন।

তেজেন বলিল, "আমার সব ঠিক ঠাক করে দাও দিদি, আজ আমি যাব।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তা যাবে বৈ কি, মনে কষ্ট হয় বৈ কি, এম্. এ-পড়া ছেলে তার এই অপমান? তবে ছুটি এখন রয়েছে তোমার, আমার সঙ্গেই যেয়ো, দু'চার দিন দেরি বই আর কি।"

দিদি বলিলেন, "বাবার কথায় কি রাগ করে? বাবার আদর ভালবাসাই ঐ। জন্মে কখন শুনিনি মেয়েদের 'মা লক্ষ্মী' কি ছেলেদের 'বাবা সোনা' বলে কথা বলতে বাবাকে।"

পরের দিন পিতা উঠিবার আগে দ্বিজেন উঠিয়া জামা কাপড় পরিতেছে। সুরুচিরা ভোর রাত্রে উঠিয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যান, তাঁহারাও উঠিয়াছেন, বলিলেন, "ওষুধ খেয়ে যা।"

"ও আমি পথে খেয়ে নেব।"

"পেঁপে পাবি কোথা?"

"গাছ থেকে একটা পেড়ে পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"চান?"

"দোকান থেকে এক পয়সার কিনে নেব।"

দিদি বলিলেন, "যত ছিষ্টিছাড়া বুদ্ধি, চালাকি রেখে ওষুধ খেয়ে যা নইলে বাবা ধরে পিটবেন আজ।"

"তবে আর বাড়ীতে আসছিনে," কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া বলিল, "সত্যি যাব বাবাকে ব'লো।"

দিদি বলিলেন, "নাঃ দুহুর সঙ্গে আর পারিনে।"

বিশ্বকর্ম্মার উপস্থিতি উপলক্ষে সে দিন থিয়েটার। জায়গা ছোট—থিয়েটার হয় কিন্তু চমৎকার। ছেলেদের চেহারাও ভাল, সাজ-পোষাকের ঘটাও খুব।

এক তেজেন ছাড়া সকলেই ষ্টেজে নামে।

সুভদ্রা-হরণ থিয়েটার। পিতা টাকা দিতে আপত্তি করেন না, কিন্তু কোন দিন দেখিতে যান না।

সে দিন সকলে ধরিয়া পড়িল, শেষে দেখিতে রাজী হইলেন।

প্রফুল্ল সে সময় বাড়ীতে আসিয়াছিল, শুনিবামাত্র নিজের যুধিষ্ঠিরের পার্টটা অপর একজনকে দিতে গেল। দ্বিজেন কিছু জানে না। সে অর্জ্জুন সাজিবে। থিয়েটারের পরে একটা ছোট ফার্স।

সুভদ্রাহরণ শেষ। পিতা উঠিয়া আসিলেন, সুরুচিরাও উঠিলেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে, কে ফার্স দেখে?

পিতা বড় সন্তুষ্ট, তবে তাঁহার সন্তুষ্টি বড় প্রকাশ পায় না। অর্জ্জুন সাজিয়া দ্বিজেন সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। পিতা বলিলেন, "ব্যাটাকে সত্যিই রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছিল।"

নিমু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দেখিয়াছে। অনেক কিছু মনে রাখিয়াছে।

পর দিন ছোট্ট একটা গামছা পরিয়া অবিকল ফার্সের নকল বৃদ্ধ মুসলমান সাজিল, মাথায় সাদা ন্যাকড়া জড়াইয়া বাঁধিল, লীলা যাইতেছে স্নান করিতে, তাহার সামনে গিয়া হাত নাড়িয়া গান ধরিল—

"ছুন্দলী লো ছুন্দলী,
মুখখানি তোল্ ফুল কলি"

এক বৃদ্ধ মুসলমানের সুন্দরী পৌত্রী বাদসাহের নজরে পড়িয়াছে, বেগম করিবেন। বৃদ্ধ মহোল্লাসে পৌত্রীর চিবুক ধরিয়া গান করিয়াছিল।

"সুন্দরী লো সুন্দরী
মুখখানি তোর ফুলকুঁড়ি।"

হঠাৎ এই মুখখানি দেখিয়া বাদশা-ভ্রমর পাগল হইয়াছেন।

নিমু তো মায়ের মুখ নাগাল পায় না—হাত ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে।

"পাজি ছেলে, দিদি দেখুন" লীলা রাগিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

দিদি বলিলেন "ও মা ছি-ছি, ঘেন্নায় মরি, বাপ-কাকারা থিয়েটার করে, ছেলে দেখে দেখে কি শিক্ষাই হচ্ছে, রাম রাম, বাবা দেখলে হয়, ভাল চায় তো দুহুরা থিয়েটার বন্ধ করুক।"

নিমু মাকে ছাড়িয়া আসিয়া পিসিমার হাত ধরিল—

"ছুন্দলী লো ছুন্দলী"

বিশ্বকর্ম্মা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "সাবাস! সাবাস! দাঁড়াও নিমু দাঁড়াও, তোমার বাবা-কাকাকে ডাকি—একটু দেখুক্। সব থেকে ভাল হয় নিমু, যদি তোমার দাদামণিকে এইটে একটিবার মাত্র দেখাতে পার।"

দ্বিজেন বিবাহ করিয়াছে ঢাকা জেলার চান্দহর গ্রামে বোসেদের বাড়ী। চাকরীর উপর তাঁহারা বড় বিরক্ত—প্রায় সবাই ব্যবসা করেন, ধানের ও ধনের অভাব নাই। গ্রামের নামটা লইয়া দিদিরা বড় বিপদে পড়িয়াছেন চান্দহর না হরচান্দ আজও ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বন্ধুবা অবশ্য বলেন "চান্দের।"

দ্বিজেনের স্ত্রী পদ্মাকে এ পর্য্যন্ত সুরুচি বিশ্বকর্ম্মা দেখেন নাই। দিদি দুঃখ করিলেন, "চৈত্রি মাস পড়ল, নইলে আন্‌তাম।"

পদ্মা বড়-ছোট, বাপ-কাকাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেয়ে, সবচেয়ে আদুরে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় বাপ-কাকারা চারি ভাই মিলিয়া গলা ছাড়িয়া কান্না জুড়িয়া দেন। অতএব পদ্মা প্রায়ই পিত্রালয়ে যাতায়াত করে। পিতাই পাঠাইয়া দেন, বলেন, "আর একটু বড় হোক।"

বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া বলিলেন, "বটে, কাকা-মহারাজদের তো বড় কোমল প্রাণ, তাঁদের অবস্থাটা কেমন?"

দিদি বলিলেন, "এক কাকা এম্. বোস, পার্ব্বতীপুরে সাবানের কারখানা, আর এক কাকা এস্. বোস সোদপুরে ডাক্তার, ছোট কাকা বিলেতে গেছে।"

"তবে আপনাদের সাবান ওষুধ কিনতে হয় না।"

"না আপনাদেরও হবে না,—এস্. বোস প্রায়ই আসেন—অব্যর্থ ওষুধ তাঁর।"

ভগবান্ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। এস্. বোস একদিন আসিয়া উপস্থিত, ছোট্ট মানুষটি, মুখে চোখে দীপ্ত প্রতিভা। সাদা-সিধা ধরণ, সাদা-সিধা বেশ।

নিজের বহু পেটেণ্ট ঔষধ। দিনে দু'শো মণি অর্ডার পান, আয়ের সীমা নাই। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এ ছত্রিশ হাজার টাকার জায়গা কিনিয়াছেন, বাড়ী করিবেন। এক লাখেরও বেশী টাকা বাড়ীর এষ্টিমেট।

নিজেদের দেশের যত দুঃস্থ দরিদ্রকে নিয়মিত সাহায্য পাঠান, যেমন মণিঅর্ডার আসে তেমনি যায়। নীরব দান, খবরের কাগজে ওঠে না।

অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, একদণ্ড অবসর নাই। যত কথা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে।

পেটেণ্ট ঔষধ, লাভ, আর এ সব গেল বাহিরের কথা—ব্যবসার দিক্। প্রকৃত কথা, তিনি নিজে ঔষধের ভক্ত নহেন, তাঁহার চিকিৎসার উপাদান বায়ু, মাটী, জল, মহাত্মা গান্ধীর মত।

মেজদির উৎকট হাঁপানী এক মাসে পনের আনা কমাইয়া দিয়াছেন, বালুস্তূপের ওপর খোলা জায়গায় শয়ন, গায়ে মাটী মাখা ও কাঁচা দুধ পথ্য।

নিমু ও নিমুর ছোট বোন্ হাসি দু'জনের ভীষণ পেটের অসুখ, এ যাবৎ দেশে-বিদেশে চেঞ্জে ও চিকিৎসায় ঘুরিয়া নিজেদের টাকার গলায় দড়ি এবং ডাক্তারদের তেতালা বাড়ী ছাড়া কোন ফল হয় নাই, সেই অসুখ সারিয়া গিয়াছে এস্. বোসের চিকিৎসায়, পেটে মাটী মাখা, ও সকালে বিকালে একটি করিয়া ক্ষীরের নাড়ু এবং চিনি সেবনে।

সুরুচির পিতার কিছু ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অন্ততঃ পিতার ধারণা। এবার আসিয়া এস. বোস্ তাঁহার ব্যবস্থা দিলেন, সকাল নয়টায়—বিকাল চারটায় আকাশের নীচে ছায়ায় মাটীতে উপুড় হইয়া শয়ন দশ মিনিট কাল।

তিন দিনে আরোগ্য।

সে দৃশ্য বড় সুন্দর, পিতা মাটীতে শুইয়া আছেন দুই পাশে নিমু ও হাসি নিজের নিজের ছোট বালিশ লইয়া শুইয়া; দাদামণি যা করিবেন তাহাদেরও তাই করা চাই। এই বয়সেই বেতের আগা, পাটপাতার স্বাদ বেশ বুঝিয়াছে; মুখশুদ্ধি করে হরিতকীতে। একটা ঘড়ি মাথার কাছে থাকে, দশ মিনিট পরে তিনজন ধূলিধূসর হইয়া উঠেন।

এস্. বোস বলিলেন, "আমাদের আহার-প্রণালীটাই সমস্ত রোগের কারণ, কাঁচা অপক্ক খাদ্য খেলে কোন অসুখ আসতে পারে না, তবে মানুষে সেটা পারে না, আপনি যদি আধ সিদ্ধ আহার অভ্যাস করেন, সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন।"

পিতা বলিলেন, "আমি সেটা পেরে উঠব না, আমার হয়ে ওটা আপনিই খাবেন। আধসিদ্ধ তো খানই, এবার নয় কাঁচাই ধরবেন, অভ্যাস আছে আপনার, কষ্ট হবে না।"

এস্. বোস প্রফুল্লকে বড় ভালবাসেন। দিন কয়েক পরে প্রফুল্ল গেল বেড়াইতে।

খোলা ফাঁকা মাঠে এস্. বোসের প্রকাণ্ড বাড়ী, উত্তর

দেশ. তখনো বেশ শীত। রাত্রি প্রায় দশটায় পৌঁছিল, সব ঘর খালি, কেহ নাই। ব্যাপার কি?

একটা প্রকাণ্ড চাতাল বা খোলা ছাদে স্তূপাকার বালুকা-রাশি, সেই বালুকার মধ্যে এদিক্ ওদিক্ ছোট ছোট মাথা, কেহ ঘুমাইয়াছে, কেহ জাগিয়া পুতুলের মত টিপ টিপ করিয়া চাহিতেছে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ গলা পর্য্যন্ত বালুকায় ঢাকা, শুধু মুখগুলি জাগিয়া আছে।

ব্যাপার দেখিয়া প্রফুল্ল একেবারে হতভম্ব।

এস্ বোস্ বলিলেন, "এই আমার ব্যবস্থা, এরা রোগে ভোগে না। জীব-জগতে পশুপক্ষীদের দেখ, একেবারে স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতির কোলে লালিত হয়, শয্যা নাই, পক্ক খাদ্য খায় না, ব্যাধি-পীড়াও নাই। ওদের দৃষ্টান্ত মানুষের নেওয়া উচিত, অন্ততঃ আংশিকভাবে। আকাশ, বাতাস, জল, মাটী, যা নিয়ে আমাদের পঞ্চভৌতিক দেহ নির্ম্মিত ঠিক সেই ভাবে জীবনও যাপন করতে হয়, আমরা কৃত্রিমতার ভিতর ঢুকে পড়েছি, সুতরাং কষ্ট-দুঃখ আমাদের অনিবার্য্য।"

প্রফুল্লের মনের ভাব তখন অবর্ণনীয়। এস্. বোসের সংসারে নিরামিষ, অর্দ্ধপক্ক ভোজন-ব্যবস্থা। সে যাহাই হোক, এক রাত্রি না খাইলে বিশেষ অসুবিধা হয় না, কিন্তু এই শীতের রাত্রে বালু-শয্যার ব্যবস্থা হইলে ত বড় সাংঘাতিক কথা। ফিরিবার গাড়ীও নাই আর।

এস্. বোস প্রফুল্লের মনের ভাব বুঝিলেন কি না কে জানে, বলিলেন, "এস, তোমার ঘর দেখিয়ে দি, বিছানা হয়েছে, চল খেয়ে আসবে।"

যাইতে যাইতে প্রফুল্লের একবার মনে হইল সন্ধ্যাকে দেখা গেল না—সেও বোধ হয় অন্য কোথাও খুড়ীমার সহিত বালুর মধ্যে ঢুকিয়া আছে।

এস্. বোসের স্ত্রী স্বামীর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, আধ-সিদ্ধ নিরামিষে ও বালুর বিছানায় তিক্ত বিরক্ত হইয়া এক এক বার বাপের বাড়ী চলিয়া যান। এস. বোস ছেলেদের যাইতে দেন না। তাহারা পিতার ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ হইতেছে।

আমি কবি কাঁদি বেদনায়

—শ্রীকণকভূষণ মুখোপাধ্যায়

মোর গ্রামে ভালবাসি, ভালবাসি প্রতি ধূলিকণা
ভালবাসি গাঁয়ের বাথান—
শ্যাওলার দল ঢাকা বড়-দীঘি বাড়ায় বেদনা
মনে পড়ে রাখালের গান।

মনে জাগে ঝাউ গাছ পাখী সব সুখে গান গায়
পাশে চলে কতই পথিক—
রাখাল পাঁচনি হাতে যেন ওই চলে'ব মায়ায়
চেয়ে রয় ভুলাইয়া দিক্।

বধূরা স্নানের ছলে চলে দূর সরানের পার
প্রাণভরা মুখে মুখে বোল—
সবুজ শালের বন দোলে যেন সোহাগে যাহার
বধূ খেলে ঘাটে জলদোল।

শোভাময়ী গ্রাম মোর আজও আছে দেখি প্রাণহীন
আছে নিয়া রূপ অপরূপ—
জনে জনে অবহেলি মাধুরীরে করিল মলিন
দিল আনি দহনের স্তূপ।

কবিতা লিখিতে যাই ভ'রে ওঠে গ্রাম-বেদনা যে
আমি কবি কাঁদি বেদনায়—
আবার দেখিব মোর গ্রাম-মায়ে কবে রাণী সাজে?
রহি সেই আশার আশায়।

বাঙ্গালীর লঙ্কা-বিজয়

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়

বাঙ্গালীর অনেক নিন্দা শোনা যায়। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। শশাঙ্ক, পাল-সম্রাটগণ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জয়দেব, চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, রঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্য, জীব-গোস্বামী, রামমোহন প্রভৃতি বঙ্গভূমিকে যুগে যুগে গৌরবমণ্ডিত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর একটী শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি লঙ্কা-বিজয় ও সিংহল রাজ্য এবং রাজবংশের স্থাপনা। এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

গ্রীসে যখন মাত্র জ্ঞানালোচনার আরম্ভ, রোমের তখন অপোগণ্ডাবস্থা; সেই সময়ে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালী লঙ্কা-বিজয় করিয়া তথায় রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালীর সভ্যতা, সমৃদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্য কত পুরাতন ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহাকে ইউরোপীয়েরা antiquity বলেন, তখন হইতেই বাঙ্গালীর ইতিহাসের আরম্ভ। পরবর্ত্তী যুগে রোম ও গ্রীসের যে প্রভাব ও প্রতাপের কথা শুনা যায়, তাহা বাঙ্গালী সেই পুরাকালেই বিস্তার করিয়াছিল। এ কি সামান্য গৌরবের কথা? বাঙ্গালীর ইহা ভুলিলে চলিবে না। তাই আজ সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছি।

ব্রহ্মজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, গণিত, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিতে ভারতীয়গণ বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস, জীবন-চরিত সম্বন্ধে তাঁহারা যেন বড়ই উদাসীন ছিলেন। ইতিহাস আখ্যার যোগ্য গ্রন্থ—ভারতে দুইখানির বেশী পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহা কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিণী' ও সিংহলের 'মহাবংশ'। এই 'মহাবংশে' সিংহল রাজবংশের ন্যূনাধিক সহস্র বৎসরের ইতিহাস লিখিত আছে। এই রাজবংশ সেই আদিম কালে স্থাপিত হইয়া প্রায় অবিচ্ছেদে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ রাজদণ্ড পরিচালিত করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লুপ্ত হয়। এই বংশকে 'মহাবংশ' আখ্যা না দিলে আর কোন্ রাজবংশকে তাহা দেওয়া যাইতে পারে? একাদিক্রমে কোনও রাজবংশ এত দীর্ঘকাল রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

এই বংশ বাঙ্গালীর ইহা ভাবিয়া কি বাঙ্গালী গৌরব অনুভব করিবে না?

'মহাবংশ' হইতে জানা যায় যে, কোন বঙ্গ-রাজের দৌহিত্র, রাঢ় অঞ্চলের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়-সিংহ নিজ ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত পিতৃ-বিতাড়িত হইয়া ৭০০ অনুচর সহ নৌবাহিনীযোগে সদা-ঝটিকা-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল বারিধিবক্ষে এক সহস্রাধিক মাইল অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-সমুদ্রের কণ্ঠমণি শ্রীলঙ্কায় অবতীর্ণ হন এবং তাহা বাহুবলে অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিজয়সিংহ অধিকৃত দ্বীপটিকে নিজ বংশের উপাধি অনুসারে 'সিংহল' নামে অভিহিত করেন। তাঁহার বংশ এবং তাঁহাদের ভাষাও 'সিংহলী রাজবংশ' ও 'সিংহলী ভাষা' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ'-প্রদত্ত বিবরণ ভিন্ন লঙ্কার এই সিংহল নাম এবং ভাষা ও জাতির সিংহলী নাম অমরকীর্ত্তি বিজয়সিংহের এই বিজয়বার্ত্তা চিরদিন জগতে ঘোষিত করিতে থাকিবে। তবে সে-দেশবাসীরা এখন পর্য্যন্তও এই দেশকে শ্রীলঙ্কা অথবা 'লঙ্কাবো' এই প্রাচীন নামেও অভিহিত করিয়া আসিতেছে।

এই বংশ বঙ্গের রাঢ় অঞ্চল হইতে গিয়াছিল, এ কথা 'মহাবংশ' হইতে জানা যায়। ঐ রাঢ় অঞ্চলে এখনও সিংহ উপাধি বিরল নহে, এবং সিংহভূম, বীরভূম, মানভূম, মালভূম বা মল্লভূম—এই সকল নাম দেশবাসিগণের বীরত্ব-গৌরবই সূচিত করিতেছে। সিংহলী ও বাঙ্গালীদের আকৃতিতে সাদৃশ্যও অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কলিকাতায় বহু সিংহলী থাকেন। উত্তরকালে

নয়া হুকুম

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ জহরলাল নেহেরু রেঙ্গুনে এক বিবৃতিতে বলেন—পুরাতন ব্যবস্থা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে·· নূতন ব্যবস্থা আগতপ্রায়।

[দি-উইক্লি বঙ্গশ্রী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ঐ প্রদেশ হইতেই রাজা শশাঙ্ক উত্তর-ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী হন ও মহোদয়শ্রী কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত জয় করেন।

সিংহল ও সিংহভূম এই দুইটি শব্দ যেন পরস্পরের প্রতিধ্বনি। 'বিজয়সিংহ' এই নামটীও বাঙ্গলা নাম। সিংহলে এখনও বিজয়রত্ন প্রভৃতি বাংলা নাম প্রচলিত আছে। ভারতের দুই প্রধান বিভাগ দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্ত, বা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত। উত্তর ভারত যে আর্য্য-অধ্যুষিত এবং আর্য্যভাষা-ভাষী, তাহা তাহার আর্য্যাবর্ত্ত নামেই প্রকাশ করিতেছে। উত্তর ভারতের কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, কচ্ছি, গুজরাটী, মারাঠী, পশ্চিম ও পূর্ব্ব হিন্দি, বাংলা, আসামী, উৎকলী – এ সকল ভাষাই সংস্কৃতজাত আর্য্যভাষা (Aryan language); পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত ভাষা—তামিড় বা তামিল, মালয়ালম, তেলেগু, কানাড়ী সংস্কৃতজাত নহে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অনার্য্যভাষা (Non-Aryan tongue)। কিন্তু অতি বড় বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, দাক্ষিণাত্যের যে-অংশে বিজয়সিংহ ও তাঁহার বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন – তথায় সংস্কৃতজাত আর্য্য (Aryan) সিংহলী ভাষা বিদ্যমান। ইহা অপেক্ষা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ঐ দেশে অধিকার ও তথায় উপনিবেশ সংস্থাপনের অধিকতর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? সমগ্র দক্ষিণ ভারতে (লঙ্কাও দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত) একমাত্র সিংহলী ভাষাই আর্য্যভাষা, লঙ্কার উত্তরাংশেও অনার্য্য তামিল ভাষা প্রচলিত।

কেহ কেহ মনে করেন যে, গুজরাট অঞ্চল হইতে বিজয়সিংহ লঙ্কায় গিয়াছিলেন। ইতিহাস 'মহাবংশ' হইতে দেখা যায় যে, কলিঙ্গের সহিত বিজয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে, বিজয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণের বসতি ভারতের পশ্চিম উপকূলে না থাকিয়া কলিঙ্গের সমীপবর্ত্তী বঙ্গেই থাকা সম্ভব। তাহার পর 'মহাবংশ' হইতে জানা যায় যে, বিজয়সিংহের মাতামহী মগধযাত্রী কোনও বণিক-দলের সহিত পলাইয়া যাইতেছিলেন। ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ মগধের নিকটবর্ত্তী বঙ্গ হইতেই এই বণিক্ দল যাইতেছিল, গুজরাট হইতে যাইতেছিল না। তাহার পর 'মহাবংশ' স্পষ্ট বলিতেছেন যে, বিজয়সিংহ সুপ্পারকে অবতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথা হইতে তাম্রপর্ণির দিকে গমন করেন। তাহা হইলে তিনি গুজরাট অঞ্চল হইতেই গিয়াছিলেন এরূপ অনুমান হয় না। 'মহাবংশে' কিছু কিছু অলৌকিক বৃত্তান্ত থাকিলেও, মোটামুটি এই বৃত্তান্ত অবিশ্বাস করার হেতু নাই। তাহার পর শুধু যে 'মহাবংশে' বিজয়সিংহের বঙ্গদেশ হইতে লঙ্কায় আগমন বৃত্তান্ত জানা যায় তাহা নহে—লঙ্কাবাসীদের মধ্যে এ কথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে যে, বঙ্গদেশ হইতেই বিজয়সিংহ লঙ্কায় গিয়াছিলেন—গুজরাট হইতে নহে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সিংহলী ভাষার যে গুজরাটী অপেক্ষা বাংলার সহিত অধিকতর মিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী তামিল ভাষার সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল নাই, তাহা নিম্নের সিংহলী, বাঙ্গালা, গুজরাটী ও তামিল শব্দের তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে।

সিংহলী	বাঙ্গালা	গুজরাটী	তামিল
পিয়া	পিতা	পিতা; বাপুজী	আপ্পা
মাউ, মাবো	মা, মাও (উঃ বাংলা)	মা	তাই
সহোদরেয়া	সহোদর	ভাই, বন্ধু	আয়েন
সহোদরী, আক্কা	সহোদরা	বেন	আক্কা
মনুস্সেয়া	মনুষ্য, মানুষ	মনুষ্য, মানস	অলি
প্যানী	গেহিনী বা গৃহিণী	গৃহিণী, গৃহলক্ষ্মী	পন্ডুব
আত	হাত, আত (পূঃ বাংলা)	হাত	কাই
হিসা	শীর্ষ	মাথু	তালে
নেত	নেত্র	নেত্র, নয়ন	কান
এস্	অক্ষি	আখেঁ	কান্
নাসে } নাহে }	নাসা } নাক }	নাক্	মুক্ক
কর্ণ	কাণ, কর্ণ	কান	কাদ
মূময়, খট	মুখ	মোঁডু	ওয়াই
কতা, বচন	কথা, বচন	বাতচিৎ	পেচ
কাই	খায়	খাবেঁ	তিন্নয়ন্দ
কাকুলুয়া	কাঁকড়া	খেঁকড়া	—

সিংহলী	বাঙ্গালা	গুজরাটী	তামিল
গিয়া	গিয়াছে (গিধা + আছে)	গযা	পনদু
গ্রীষ্মকাল, উষ্মকাল	গ্রীষ্মকাল	উনাড়ো	কাঙ্গ
গে	গৃহ, গেহ, ঘব	ঘর, গৃহ	উড়
গঙ্গা	গঙ্গা, গাঙ্গ,	নদী	আতু
হস্তিয়া, এতা	হাতী, হস্তী	হাতী	য়ানে
গজ	গজ	গজ	—
নাগ,	নাগ	নাগ	—
বর	ভার	ভারে, ওজন	সেদে
গোণা, ষাঁড়	গো, গরু	গায়	মাতু
এলদেন	ধেনু	ধেনু	পশিমাতু
র্যা, রাত্রি	রাত্রি	রাত	ট্রাউ
পুত	পুত্র, পুত	পুত্র, বাড়ক, দিকরী	মগন
আপে	আপন, নিজের	ডিকরী, হুঁ	ইঙ্গল, উত
পোকর, পোকুন	পুকুর, পুষ্করিণী	তলাও	তেজ্জকুলম
নাঙ্গী	ছোট ভগ্নী	—	—
পিট	পিঠ, পৃষ্ঠ	পিঠ	মুদোপকম্
নুয়র, নগর	নগর	নগর, সহের, গাম	—
নাহা	নাহি	নোহি, না	ইল্লেই
না-নৌধা	নাওয়া	নয়ড়াও, নাবু	কলিকয়ছু
মা, মম	মুই, মম	হুঁ	আম
মাগে	মোর, আমাগো (পূঃ বাংলা) মাবো		নাম্মও
রাট	রাষ্ট্র	রাষ্ঠ	পুর
পোদক	কতক, কত, কতেক	কেতলা, বৌ	ত্রাৰ্জিল
গহ, গস্, গচ্ছ	গাছ	জাড়	মরম
লঙ্কা	লঙ্কা	—	ইলঙ্গাত্তিকি
এক	এক	এক	অণ্ডু
দেক	দুই	দো	বেণ্ডু
তুনাই	তিন	এণ	মুন্নু
হাতরাই	চারি	চার	নান্নু
পাহাই	পাঁচ	পাঁচ	আঞ্জি
হায়াই	ছয়	ছ	আৰু
হাতাই	সাত, হাত (পূঃ বাংলা)	সাত	ইয়েন
আটাই	আট	আট	—
নামেয়াই	নয়	নও	ওমপছ
দাহায়াই	দশ	দশ,	পাত্তু
রক্ত, লে	লোহিত, রক্ত	লোই	পব্ব
শুনক	কুকুর	কুত্তরু	নাই
কুকুর	কুকুর	কুত্তরু	—
নাব	নাও, নৌকা	নাও, ওবান	কাপ্পল
সুরিয়	সূর্য্য	সূরজ	সুরিয়া
তাক	তারা	তারা	নীলা
হন্দ, চান্দ্র	চন্দ্র	চন্দ্র, চন্দ্রমা	চন্দ্রম্
জলে, দলে, উদক, প্যান	জল, উদক, পানি	পানি	নীলু
স্বামীবা, সওয়ামিথা	স্বামী, বর, সোয়ামী	বর	পুরুষেণ
ভারিয়া	ভার্য্যা, পত্নী	পত্নী, গৃহিণী, বন্ড	পন্দুলে
মম (I) আপি (we)	আমি, আমরা	হুঁ	—
উম্ব, তামুসে	তুমি, তোমরা	তমে	নি

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, সিংহলীগণের ভাষার সহিত তাহাদিগের প্রতিবেশী তামিলগণের ভাষার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই, বরং, অসংস্কৃত অনেক সিংহলী শব্দের অনুরূপ শব্দ বাঙ্গালায় বিদ্যমান, কিন্তু গুজরাটীতে নাই, যেমন :– (সিংহলী 'মাউ' বা 'মাবো' ও উত্তর-পূর্ব্ব-বাঙ্গালার 'মাও', যেমন সিংহলী 'মাগে' ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার 'আমাগে' ইত্যাদি)।* ইহা কি লঙ্কায় যাইয়া বাঙ্গালীর অধিকার ও উপনিবেশ স্থাপনের অখণ্ডনীয় প্রমাণ নহে? ভাষাতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই জানেন মাতৃ-ভূমির সহিত উপনিবেশিগণের দুই সহস্র বৎসরকাল বিচ্ছিন্নতা থাকিলে উভয় স্থানের অধস্তন পুরুষগণের ভাষার মধ্যে কত পার্থক্য উপস্থিত হয়। সেই জন্যই সিংহলীর ও বাঙ্গালীর মধ্যে অনিবার্য্য পার্থক্য জন্মিয়াছে, কিন্তু তথাপি উভয় ভাষা আলোচনা করিলে তাহারা যে এক মূলোদ্ভূত তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। কালিদাস লিখিয়াছেন "বঙ্গান্ নৌ সাধনোদ্যতান্।" উপরে বর্ণিত ইতিবৃত্ত তাহারই সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। পরবর্ত্তীকালেও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় বন্দর হইতে সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াতের অনেক প্রমাণই পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপে যে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তি দৃষ্ট হয় ও ভারতীয় উপনিবেশ ও রাজ্যের নিদর্শন সকল পাওয়া যায়, তাহাতে বাঙ্গালীর হাত কতদূর কি ছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়।

* আরও দৃষ্ট হইবে যে, উপরের তালিকায় বহু সিংহলী শব্দ আছে, যাহার অনুরূপ শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। কিন্তু গুজরাটীতে নাই, অথচ উপরের সুদীর্ঘ তালিকায় এমন একটিও সিংহলী শব্দ দৃষ্ট হইতেছে না, যাহা গুজরাটীতে আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় নাই।

বাদল

—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

দেশের সহিত সম্পর্ক অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে।

সম্পর্ক কোন দিন ছিলই বা বলি কি করিয়া—অদ্যাবধি দেশ নামটির সহিত পরিচিত থাকিলেও তাহার রূপটি কচিৎ কখনও দেখিয়াছি—ভাসা-ভাসা: দুর্বোধ্য ইংরাজী চলচ্চিত্রের ছবির মত মনে কোন স্থায়ী দাগ রাখিয়া যায় নাই।...

শুনিয়াছিলাম, পিতাঠাকুর একদা পারিবারিক অশান্তিতে উত্যক্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়াছিলেন, আর কোন দিন ওপথ মাড়ান নাই। দেশ সম্বন্ধে তিনি আমাদের কাছে এক প্রকার নির্ব্বাক্ ছিলেন।

মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় কাঠ-খোট্টা চেহারার দুই একজন ব্যক্তির সমাগম হইত। দেখিয়াই বহুশ্রুত, অবজ্ঞাত 'পাড়া গাঁয়ের চাষা'দের কথা মনে পড়িত। সত্যই, ঐ হাড়-মোটা, চোয়াল-ভাঙ্গা লোকগুলি কি বিশ্রী! সাধে আর লোকে উহাদের 'অজ পাড়া-গেঁয়ে' বলে! যেমনি জোরে জোরে কথা বলে, তেমনি জোরে জোরে হাসে! এত বোকার মত হাসিতেও পারে উহারা! আর নোংরাও তেমনি, গায়ের গন্ধে ভূত-প্রেত পালাইয়া যায়। হাঁটুর উপর উঁচু হইয়া বসিয়া তামাক টানে! 'ডিসেন্সী'-জ্ঞান একেবারেই নাই!

কিন্তু আশ্চর্য্য, দেশের প্রতি বাবার যে এত বীতরাগ উহারা আসিলে তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইত, আপনাকে তিনি আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। সারা দিন ব্যস্ত-ভাবে উহাদের পরিচর্য্যায় লাগিয়া থাকিতেন, যেন গৃহে গুরুঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে। স্নান-আহার করিবার অবসরটুকু পাইতেন না; কখন হাসিয়া, কখন গম্ভীর হইয়া কখন বা ফিস্-ফিস্ করিয়া ঐ 'অসভ্য' লোকগুলির সহিত কি যে সুখ-দুঃখের কথা কহিতেন, আমরা তাহার মাথামুণ্ড কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতাম না। বাবার এবংবিধ রুচিবিকারে রুষ্ট হইয়া দাদা মায়ের নিকট অভিযোগ করিতেন। মা হাসিতেন।...

জীবিতাবস্থায় বাবা নির্লোভ থাকিয়া দেশের প্রতি যে পরিমাণ আন্তরিকতা পোষণ করিতেন, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে আপত্তি থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কোন দিন কিছু বলিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহারই মত নির্লোভ থাকিয়া উক্ত মহদ্গুণের পরিচয় দিবার মত দুর্ব্বলতা বা উদারতা আমাদের নাই। দেশের নিকট আমাদের পাওনা-গণ্ডা আমরা সময় মত, সুবিধা মত আদায় করিয়া ক্ষান্ত হই। এবং এখন যেটুকু সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা ঐ নিমিত্তই।...

দাদা চিরকালই পিট্-পিটে। পাড়া-গাঁয়ের নামে তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হয়। তাঁহার অনুনাসিক সুর দেশ-মাতৃকার গুণ-বর্ণনে মুখরিত হয়, কিন্তু দেশে যাইবার কথায় তিনি লাফাইয়া উঠিলেন: "কেন, আমি ছাড়া ঐ জঙ্গলে যাবার আর লোক পেলে না মা? ভারি ত ছ'পয়সার বিষয়, বিক্রী করে দিলেই চুকে যায়! তা'নয়, সময় নেই, অসময় নেই কাদাহেঁচড়ে ঠেলে ছোটলোকদের সঙ্গে লাঠালাঠি করতে ছোট্! কি দরকার ছিল রে বাপু ঐ ধাধ্ধাড়া-গোবিন্দপুরে বিষয় করে? এখন ছোট্ তোরা, তাতে প্রাণ যাক, আর থাক্!"

স্থিরদৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া মা কহিলেন, "কর্ত্তারা না হয় ভুল করে গেছেন কিন্তু তাই বলে তো আর করা বিষয়-আসয়গুলো উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

উত্তোলিত জলের গ্লাসটা সজোরে নামাইয়া দাদা কহিলেন, "যায় না ত বুকে করে পড়ে থাক। হুঁ ভারি ত' বিষয়, উড়ে পুড়ে গেলে বাঁচা যায়! যায় কই? হয়রানির এক-শেষ: আজ খাল কাট, কাল রাস্তা কর, পরশু পুকুর কাট, কি না, প্রজা-মহাপ্রভুরা খাজনা দিচ্ছে না! সাত ঝক্কিয়ৎ লেগেই আছে!"

শান্ত কণ্ঠে মা কহিলেন, "ইচ্ছে করলে বিক্রী করে দিতে পার, তোমাদের যদি না ভাল লাগে, সে তোমরা বোঝ। আমার বলবার দায় বলে দিলুম—অনেক দিনের বাকি খাজনা

পড়ে আছে, এখন থেকে সেগুলো আদায়ের ব্যবস্থা না করলে শেষে একেবারেই পাওয়া যাবে না।"

দাদা যেন কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। মনে মনে অতগুলি অনাদায়ী টাকা তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরও ঘুরিয়া গেল—কহিলেন, "ঐ ত বেটাদের দোষ, একটু আল্‌গা দিলেই পেয়ে বসে, একটি পয়সা ঠেকাবার নাম করে না। ঐ জন্যেই বেটাদের উন্নতি নেই, কেবলই কাঁদুনী গাইতে শিখে রেখেচে: হয় বন্যা, না হয় অনাবৃষ্টি!—বেটাদের হাড়ে হাড়ে কুবুদ্ধি! য়্যা অতগুল টাকা বাকি ফেলেছে! দেখ দেখি কি মুস্কিল, বাবা ছাই আমাদের কিছু জানিয়ে যান্ নি—কোথায় কি যে করে গেছেন, কিছুটি বোঝবার উপায় নেই—মহা মুস্কিল! এই ত তুমি না বললে গেছল ত অতগুলো টাকা!"

মা কহিলেন, "তোমরা তো কোন দিন বোঝবার চেষ্টা কর নি!"

দাদা অন্য পথ ধরিলেন: "সে যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন টাকাগুলো আদায় করবার উপায় কি বল দেখি মা, আমার তো মাথায় কিছু ঢোকে না ছাই! ভাল কথা, এক কাজ ক'রলে হয় না, তোমার মেজ-ছেলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখ না, সে ত কিছু খবর-টবর রাখে। তোমার বউ যেন এক দিন বলছিল বটে, মেজ-ঠাকুরপো বিষয়-কর্ম্ম বেশ বোঝেন! তা' তুমি তাকে বলে দেখ না। সত্যই ত, এতগুলো টাকা যাক্ বললেই ছেড়ে দেওয়া যায় না!"

গম্ভীর ভাবে মা বলিলেন, "কেন, বৌমা ত আমাদের পাকা জমিদারের মেয়ে, এতদিনে আর তোকে এই সামান্য বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে পারেন নি?" খোঁচাটা দাদা বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, "ওর কথা বাদ দাও, ও কি যে বলে আমি কিছুই বুঝতে পারি না। যাক্ গে, তুমি বরং সুবোধকে বল, ও দিন কতক দেশে ঘুরে আসুক্।"

"তার ত এই ক'দিন বাদে শেষ পরীক্ষা, এখন এদিক ওদিক্ ক'রলে পড়া-শোনার ক্ষতি হ'তে পারে। তুই বরং কিছু দিনের ছুটী নিয়ে ঘুরে আয়।"

দাদা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ছুটি! ক্ষেপেছ মা, গাছের ফল না কি! সুবোধের পরীক্ষার ত এখন দেরী আছে, এই ফাঁকে দিন কয়েক ঘুরে আসলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আমরা কি কখনও পরীক্ষা দিই নি ভেবেছ!...আর সে যখন এ সব ব্যাপার ভাল বোঝে!"

মা বলিলেন, "তার শরীরটা আবার তেমন ভাল যাচ্ছে না! এই সময় আবার—"

দাদা মুখাইয়া ছিলেন, কথাটি লুফিয়া লইয়া কহিলেন, "এ কথা এতক্ষণ বলতে হয়...আরও আগে বল নি কেন, ও এখনি যাক, হাওয়া বদলান হবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে পাড়া-গাঁটা ভাল, প্রচুর বাতাস, বেড়াবার দিব্যি খোলা মাঠ। যদি ভাল চাও ত সুবোধকে এখুনি পাঠিয়ে দাও, দিন কতক বেড়িয়ে আসুক। এক ঢিলে দুই পাখী, বুঝলে না মা।"

মা চুপ করিয়া উঠিয়া গেলেন। দাদা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সুবোধ যাবার আগে যেন কবরেজ মহাশয়ের দোকান থেকে 'অব্যর্থ ম্যালেরিয়া-নাশক পিল' নিয়ে যায়, কাগজে দেখছিলুম ওষুধটার খুব নাম হয়েছে, ভদ্রলোক এর মধ্যে বাড়ী তুলতে আরম্ভ করেছে!"

অতঃপর জ্যেষ্ঠাগ্রজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের 'অব্যর্থ ম্যালেরিয়া-নাশক' পকেটস্থ করিয়া কূটবুদ্ধি আত্মীয়-বন্ধুদের লুটিয়া পুটিয়া খাইবার বৃহৎ পাত্রে স্বহস্তে ছাই দিতে এবং প্রজাবৃন্দের একজোট নষ্টামী এবং বেয়াদবীকে হার মানাইয়া পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইতে দেশে রওন হইলাম।

সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় বসিয়া আমার এই একক অভিযানের নিমিত্ত মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিতে-ছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার সাজ-সজ্জার এই অপ-রূপত্ব, এই সাড়ম্বর সফর না-জানি দুঃস্থ দেশবাসী কি বিস্ময়ের চোখে দেখিবে! অভিভূত হইয়া ভাবিবে, না-জানি এই নবাগত ব্যক্তিটি কতবড় উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত!

সারা পথ আপন মহিমার কল্পনায় আপনি উত্তপ্ত হইতে লাগিলাম। কেবলি মনে হইতে লাগিল, ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে যাত্রীদল দীন দর্শকের মত আমারই কামরায় উৎসুক, নির্ব্বোধ, বিহ্বল দৃষ্টি পাঠাইয়া দেয়। মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবে, আমি কে? উহাদের কত উচ্চে আমার আসন! ইচ্ছা করিলে হয় ত উহাদের

শির লইতে পারি, কাহাকেও বাঁচাইতে পারি, কাহাকেও আবার পদতলে দলিত করিতে পারি!

নির্ব্বিঘ্নে দেশের ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম, একটি পত্রাঘাতে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে: আত্মীয়গণ সহসা আগমন স্বচক্ষে না দেখিলেও পাইক পাঠাইয়া আমার স্বর্গত পিতার সম্মান বজায় রাখিয়াছেন। দুই দুই জন শীর্ণকায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশীয় পাইক সশব্দে সেলাম ঠুকিয়া আপনাপন দেহের চতুর্গুণ পরিমাণ আস্ত বংশদণ্ড নামাইয়া রাখিয়া আগাইয়া আসিল। আমি নামিতে বিদেশী কায়দায় বিনীত অভিবাদন করিল।...

দেশে আসিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আত্মীয়গণ আমার এই 'চড়ওয়া' উপস্থিতিতে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু মনের বিরক্তিটুকু বাচনিক না করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে সৌজন্য প্রকাশ করিতেছেন। আমার পান হইতে চুণ না খসে, সে দিকে তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি আছে। অনেকগুলি অপরিচিত ভ্রাতৃজায়া রসিকতা করিতে আসিয়া আমাকে বেরসিক দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু নেপথ্যে আক্রমণ চলিতে লাগিল।

"বাঃ বা! কলকাতার মানুষ! ও ছোট-বৌ, পালিয়ে আয়, বেফাঁস কি আবার বলে ফেলবি! সাহেব লোক, তোদের মত মুখ্‌খুকে কি আর পছন্দ হয়—আচ্ছা বেহায়া তো তোরা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্‌ দেখ্‌ছিস্‌ না কি! ঢঙ্‌ দেখলে গা জ্বলে যায়!"

গাত্রদাহ প্রত্যক্ষ হয় না, নতুবা দেখিতাম যে, আমি কলিকাতাবাসী এবং এই বিষয়ের একজন অংশীদার বলিয়া ইহাদের সকলেরই গা জ্বালা করিতেছে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইহাই স্বাভাবিক বোধ হয়।...

পিতৃব্যগণ অহিংসভাবেই অসহযোগ করিলেন। সুতরাং খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনার দ্বারা পাওনা-গণ্ডা আদায়ের কোন উপায়ই দেখিলাম না। প্রথম হইতেই তাঁহারা আমাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন, আমিও উপযাচক হইয়া তাঁহাদের সে সূক্ষ্ম সম্মানবোধে ঘা দিলাম না। চেষ্টা না করিয়া দেখাইলাম যে, শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের খাতিরে জন্মস্থানে এতদিন পরে হাওয়া বদল করিতে আসিয়াছি। তাই যখন-তখন যাহার-তাহার সঙ্গে বেপরোয়া ভাবে জন্মভূমির ক্ষুৎ-পিপাসা-বর্দ্ধিনী শক্তির আলোচনা করি; "এ রকম জল-হাওয়া আর কোথাও দেখলুম না—এই খেয়ে আবার খেতে ইচ্ছে করে। জলে এত 'আইরন' আর বাতাসে এত বেশী খাঁটি 'অক্সিজেন', বাঙ্গালা দেশে আর কোনখানে নেই—এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি।"

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বাজী রাখিবার আবশ্যকতা হইত না। কেন না, যাঁহাদের সঙ্গে উক্ত দুই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা হইত, তাঁহারা কেহই রসায়নবিদ্‌ নহেন। অপিচ তাঁহারা বিস্ময়ে আপন দেশের জল-বাতাসে উক্ত দুই অশ্রুত এবং অভূতপূর্ব্ব গুণের সমাবেশ দেখিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। কেহ কেহ আবার গম্ভীর সমঝদারের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিতেন; "জলে আর কি থাকা ভাল?"

মুখে যাহা আসিত তাহা বলিয়া বুঝাইয়া দিতাম। ধাতু-গোষ্ঠীর প্রত্যেক নামের আদ্যক্ষর সহযোগে স্বরবর্ণ হানি করিয়া দুর্ব্বোধ্য একটা কিছু উচ্চারণ করিয়া দিতাম। পিতৃব্যগণ মনে মনে আমাকে নির্ব্বিষয়ী ধারণা করিয়া খুসী হইয়া আমার স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেন। আমিও চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তাঁহাদের প্রতারিত করিয়া গোপনে গোপনে প্রজাদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

সকাল-সন্ধ্যায় আমার এতদ্রূপ বহির্ম্মুখ-প্রবণতায় পিতৃব্যগণ বিচলিত হইয়া ইতস্ততঃ করিবার পূর্ব্বেই আমি সহজ এবং সরল ভাষায় জানাইয়া দিতাম, "স্বাস্থ্যের জন্য আহারেরও যেমন প্রয়োজন, প্রাতঃকালীন এবং সান্ধ্য বায়ু সেবনেরও তেমন প্রয়োজন আছে, বরং বেশী। অক্সিজেন না হ'লে হজম হয় না একেবারে, বুঝলেন না? এত অক্সিজেন যে দেশে, সে দেশে আবার চাই কি? শুধু খেলেই তো আর হ'লো না!"

সুতরাং সন্দেহের আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু আমার অবস্থা দিন দিন সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। গোপনে প্রজাদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে চক্ষু যথেষ্ট পরিমাণে স্থির হইল এবং আহারে অরুচি ধরিল। সকল প্রজাই প্রায় এক বাক্যে নিবেদন করিল যে, তাহারা সকলেই তিন সনের খাজনা আগাম দিয়া রাখিয়াছে।

প্রতিবাদ করিবার মুখ নাই, সাক্ষ্যস্বরূপ তাহারা প্রত্যেকেই বাবার নিজ হাতের দস্তখত করা দাখিলা বাহির করিল।

কিন্তু আপন বংশজদের এরূপভাবে ফাঁকি দিয়া কর্ত্তব্যের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়ায় মনে মনে স্বর্গত পিতার প্রতি বিরক্ত হইলাম। প্রকারান্তরে ইহা তো আমাদের অপমান করা, তাঁহার ঔরসজাত এমনই অপটু জমীদার বংশোদ্ভব আমরা? মনে হইল, আত্মীয়-বান্ধবকে অন্যায় অপহরণের পাপ হইতে বাঁচাইতে আসিয়া নিজেই মস্তবড় ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছি। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পরোক্ষ ইচ্ছাটা ভিতর হইতে পীড়া দিতে লাগিল। মুকুরে মুখখানা বিশুষ্ক মনে হইল।

উপস্থিত মত দেশের সহিত সম্পর্ক তো চুকিল। এখন করি কি? কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, এমন সময় দাদার দীর্ঘ পত্র আসিল। উপর-ওয়ালার পত্র বিধায় উপযুক্ত মনোযোগসহকারে পাঠ করিলাম। 'পরে' দিয়া আরম্ভ করিয়া দাদা অনেকখানি পূর্ব্বের কথা লিখিয়াছেন।

> তোমার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাল নয়। উপযুক্ত দৃষ্টি রাখিবে, পরীক্ষা আসন্ন। স্বাস্থ্যের পক্ষে পল্লীগ্রাম উপযোগী জানিবে···প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় প্রচুর বায়ু সেবন করিবে··তোলা জলে স্নান করিবে ···প্রতিষেধক হিসাবে মাঝে মাঝে কবিরাজের 'অব্যর্থ ম্যালেরিয়া নাশক' ব্যবহার করিবে···মশারি খাটাইয়া শুইতে কদাপি ভুল করিও না—কারণ, মশকের দংশনে ম্যালেরিয়া হয়,···এ দিকে তোমার বৌদি ত' ভাবিয়া খুন···বিশেষ সাবধানে থাকিও···

পরের অংশটুকু বিস্তৃত করিয়া জানাইয়াছেন :—

খুব কড়া ভাবে তাগাদা দিবে···বেটাচ্ছেলেরা অতিশয় পাজি। নাকে দড়ি না পরাইলে সহজে বাগে আসিবে না··· মায়া-কান্নায় কখনও ভুলিবে না···দরকার হইলে মারধোর করিতে কসুর করিবে না—উহাই উহাদের উপযুক্ত ঔষধ। কাকাদের একেবারেই বিশ্বাস করিবে না। নিজের বুদ্ধিতে যাহা ভাল হয় করিবে···সব আলাদা ব্যবস্থা করিয়া আসিও, ইত্যাদি।

অকূল পাথার! নূতন করিয়া আর কি ব্যবস্থা করিব, তাহা ত আগামী তিন বৎসরের জন্য হইয়াই আছে এবং তাহার মুনাফা বোধ করি, আমাদের লোহের সিন্দুকে এত দিনে সশাবক বিরাজ করিতেছে। ভাবিয়া পাইতেছি না, একটি মুরগী কয় বার জবাই করিব? আর একালের মুরগী-রাই বা তাহা শুনিবে কেন? কে জানে ইহাকেই হয় ত জমিদারী বুদ্ধি বলে।··

আর নয়, ঢের শিক্ষা হইয়াছে, এইবার ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরিতে পারিলে হয়। মনে মনে নাক-কান মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, জন্মে-আর এরূপ বদ স্থানে পদার্পণ করিব না। যে স্থানে অহরহ বুদ্ধির এতদূর কসরৎ চলে, সে খানে না যাওয়াই ভাল। নির্ব্বোধ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহারা কখনও পাড়া-গাঁয়ে বাস করিতে চাহে না।···

যে দিন ফিরিব তাহার ঠিক পূর্ব্বের দিন বৈকালে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলাম। গ্রামের মাঝামাঝি মোড়ল-পাড়ার তেমাথা রাস্তায় আসিয়া পদদ্বয়ের গতি সহসা মৃদু হইয়া আসিল। আজই যেন খেয়াল হইল, একটি লোক প্রত্যহ ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া সকাল-বিকাল আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য দিন বৈষয়িক কাজে এতদূর ব্যস্ত থাকিতাম যে, অন্যদিকে চাহিবার বা অন্য কথা ভাবিবার অবসর পাইতাম না। কি জানি কেন, আজ গ্রাম সম্বন্ধে আমার কৌতূহল প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি, বৈষয়িক কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি বলিয়াই মন আমার অন্তর্মুখী হইয়া জন্মস্থানের স্বরূপটি দেখিয়া লইতে চায়। সারা সকাল কৌতূহলে দৃষ্টি মেলিয়া এখানে এমন একটি মুখও খুঁজিয়া পাইলাম না, যাহাতে স্বাস্থ্য-সুখের কিছুমাত্র চিহ্ন আছে। সব মুখগুলিতে 'নাই নাই'-এর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছাপ, যেন অস্বীকৃত "ডেড্-লেটারের" বহিরাবরণ, ঠিকানার রাশিচক্রে কণ্টকিত। অথচ ইহাদের প্রায় সকলকেই জমিদারকে তিন বৎসরের খাজনা আগাম দিয়া রাখিতে হয়। আশ্চর্য্য!

চোখ তুলিয়া চাহিতে লোকটি ভক্তিভরে যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া অভিবাদন করিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে উদ্গত কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে আপনি আমায় চিনবেন না, আপনার পিতাঠাকুর খুব চিন্‌তেন। তেনার মত শিবতুল্যি লোক আর হয় না!"

বলিয়া আর এক দফা যুক্তকর শূন্যে ঠেকাইল। এক ফাঁকে লোকটিকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম : হাঁটুর উপর একখানি গামছার মাপে মলিন, শতছিন্ন বসন কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে— গাল ভর্ত্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্য হইতে চোয়ালের হাড় দুইটি উদ্ধত ভাবে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আছে, দুই পার্শ্বের চিবুক এবং চোয়ালের মধ্যবর্ত্তী স্থান ঠাহর করা যায় না, মধ্যস্থলে দুইটি গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, চক্ষু দুটি যে কোথায় এবং কি ভাবে অবস্থান করিতেছে, বোঝা কঠিন। লম্বা চোয়াল-ভাঙা মুখখানার মধ্যে কেবল নাসিকাটি হঠকারিতার অগ্রদূত।

আমি জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে কহিল, "আজ্ঞে আমার নাম, শ্রীবাদলচন্দ্র মণ্ডল, আপনাদেরই ছিচরণের দাস।"

কহিলাম, "বেশ, বেশ, তুমি বুঝি আমাদের জমি চাষ কর?" ইহাতে সে যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিল, কহিল, "আজ্ঞে, আগে করতুম, এখন আর করি না, তিন-চার বছরের খাজনা আগাম কোত্থেকে দিই বলুন দিকি?" বলিয়া ম্লান হাসিল।

উপদেশ দিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করিয়া গেলাম। কেমন যেন মনে হইল, ইহাকে ইহাদের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার বাঁধা-ধরা মূলসূত্রগুলি শুনান নিষ্প্রয়োজন। আর যে কেহ থাকুক না কেন, ইচ্ছা করিলেও এ ব্যক্তি সুসময়ে অপচয় করিয়া অসময়ে দুঃখকষ্টে পড়িতে পারে না।

দুজনেই চুপ করিয়া আছি, এ ক্ষেত্রে কিরূপ আলাপ সময়োচিত হইবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে-ই অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত প্রশ্ন করিল, "জায়গাটা আপনার কেমন লাগছেন?" পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইল; "আপনারা কলকাতার লোক, আপনাদের কী এ আর ভাল লাগে? বলে কিসে আর কিসে, সোনায় আর সীসে!"

মুখে কহিলাম, "না। বেশ ভালই লাগছে।" মনে হইল ইহাতে বাদল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি পিট্ পিট্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার আমার মুখের উপর এমন ভাবে দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল, যেন আমার কথা তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। আমরা কলিকাতাবাসী বলিয়া আমাদের রুচির উপর ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং ভয়।

বাদল কহিল, "এখন দেশে আর কি আছে বলুন? তেমন দুধ নেই···মাছের তো মুখ দেখাই যায় না। আসতে পারেন বড়দিনের ছুটীতে, খেয়ে ফুরোতে পারবেন না।"

প্রচুর আহার্য্যের প্রতি আমার লোভ কোন দিন নাই; চুপ করিয়া গেলাম।

বাদল সোৎসাহে কহিল, "জানেন, কর্ত্তাদের আমলে কিছুরই অভাব ছিল না, পুকুরে মাছ, গোলা-ভর্ত্তি ধান, দুধ...মাঠে তো তখন সোনা ফলতকৃ, তেনারাও গেছেন, দেশের সুখস্বচ্ছন্দও গেছে।"

কথায় কথায় হাঁনামগরার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। বাদল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই দেশের অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে। অথচ লোকটিকে দেখিয়া এমন মনে হয় না যে, সে কখনও কোন দিন সে-ঐশ্বর্য্যের এতটুকু অংশমাত্র পাইয়াছে। এমন একটি বঞ্চিত লোকের মুখে এ হেন আড়ম্বরের কাহিনী প্রবঞ্চনার মত বোধ হয়। ইহাকে থামাইবারও কোন উপায়ও খুঁজিয়া পাইতেছি না। আচ্ছা মুস্কিলে প'ড়িয়াছি যাহা হউক। এক সময় কহিলাম, "তুমি তা'হলে এখন কাদের জমি কর?" এবারেও দেখি বাদল বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। মাথা চুলকাইয়া কহিল, "জমিটমি আর করি না। আগাম খাজনা দিতে পারি না, আমায় আর কে জমি দেয় বলুন?"

"এখন তুমি তা'হ'লে কি কর?"

বেশ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বাদল জবাব দিল, "এর-তার জন খাটি।"

"তাতে তোমার চলে?"

দিন চলার কথায় সহসা অস্থির ভাবে আপনার চারি পাশ উৎসুক ভাবে দেখিয়া লইয়া বাদল ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "পরের গোলামীতে কি আর পেট ভরে? আর আজকাল জনমজুরের কি দাম বলুন? টাকায় পাঁচটী, তাও আবার সব দিন মেলে না।"

মনে মনে ভয় পাইলাম, বাদলচন্দ্র বুঝি বা এবার আপন দুর্দ্দশার কাহিনী সুরু করিবে। পা চালাইয়া হাঁনামগরা

পার হইয়া সরকারদের বাঁশ-বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বুঝিতে পারি না, জমিদার-পুত্রের সহিত বাদলের মত প্রজার সুখ-দুঃখের কি সম্বন্ধ আছে। ভাল উপসর্গ জুটিল যাহা হউক; এ দিকে মুখ ফুটিয়া বিদায়ও করিতে পারিতেছি না।

মৌন ভাবে পথ চলিতে চলিতে ভদ্রতার খাতিরে কহিলাম, "তা' হ'লে তো বড় মুস্কিল তোমাদের!" বিনীত ভাবে বাদল কহিল; "আজ্ঞে, তা যখন বলছেন দুঃখের কথা, কি আর বলব, সব দিন পেটে ভাত পড়ে না।" একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ কাণে আসিয়া বাজিল। যাহা ভয় করিতেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইল, হঠাৎ বাদল আমাকে মস্ত বড় বাবু ঠাহর করিয়া ফেলিল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "যদি আপনাদের কলকাতায় একটি-আধটি চাকুরি যোগাড়-যন্তর করে দেন।"

তাড়াতাড়ি ও-প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম, "আমাদেরই আজকাল চাকুরি জোটে না।"

তবুও বাদল নিবৃত্ত হইল না, কহিল, "আজ্ঞে আপনাদের চাকুরি আর আমাদের চাকুরি অনেক তফাৎ!"

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "তুমি কি চাকুরি ক'রতে চাও?"

"আজ্ঞে, এই ফাই-ফরমাজ খাটা, বাজার-হাট করা, ছেলে-পুলে নেওয়া। চক্কোত্তি মশায় বলছিলেন কলকাতায় আজকাল অমন লোকের অনেক দরকার!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সংবাদই দিয়া থাকুন না কেন, আমি তো জানি, ওদিক দিয়া বিশেষ সুবিধা হইবে না। দেশের লোক দিয়া কখন চাকরের দুঃখ ঘুচিবে না, তাহার জন্ম উৎকল, রাঢ়, গুর্জ্জর প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দই যথেষ্ট। মুখে কহিলাম, "তাতে আর ক' টাকা পাবে—বড় জোর পাঁচ-সাত টাকা!"

আশান্বিত হইয়া বাদল কহিল, "আজ্ঞে ঐ যথেষ্ট। খেয়ে পরে ঐ বা আসে কোথেকে? দেশের যা অবস্থা হচ্ছে দিন দিন!"

এ দেখি নাছোড়বান্দা। কহিলাম "চাকরি তো আর বাপু ঘাটে-মাঠে পড়ে থাকে না। যদি সন্ধান পাই তো খবর দেব'খন।"

বাদলচন্দ্র গলবস্ত্র হইয়া সপ্রণাম কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইল।

চাহিয়া দেখি; গ্রাম-সীমানার বুড়া বটগাছটার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখর দিবসের সহসা এমন নিস্তব্ধতা পূর্ব্বে কখনো অনুভব করি নাই। মনে হইল, পল্লী-প্রহরী নিষ্কম্প বটগাছটীর হঠাৎ শ্বাসরোধ হইয়া গেছে—যেন তার সেই রুদ্ধ নিঃশ্বাস সমস্ত দেহ, সমস্ত পল্লব ফুঁড়িয়া বাহির হইতে চায়। আকাশের পশ্চিম কোণে তখনও সঞ্চরমান একটি পাখী আপন দেহে সন্ধ্যার নিষ্প্রভ আলো মাখিতে মাখিতে ধীরে ধীরে পক্ষ সঞ্চালিত করিয়া দিক্‌চক্রবালের উপর কাল আস্তরণ মেলিয়া দিতেছে। অদূরে গ্রামে আস্তে আস্তে একে একে জ্বলিয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপালোকগুলি যেন বেলাশেষের শেষ আরতি। সহসা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—মনে হইল, আমার পশ্চাতে কাহারা যেন হা হা অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিল। সম্মুখেও যেন অনেকগুলি কায়াহীন ছায়ামূর্ত্তি ছুটিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল—কাহারা যেন চাপা কণ্ঠে আমার আশে-পাশে জটলা করিয়া তুমুল কোলাহল করিতেছে।* * *

বাড়ী ফিরিয়া দেখি, বাহিরের ঘরের রোয়াকের উপর একটি ছায়া-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমার সাড়া পাইয়া মূর্ত্তিটী হাসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমি ভুবন!"

সুতরাং আমি আশ্বস্ত হইতে পারি—ভুবন নামধেয় ব্যক্তিটী আমার এমনই পরিচিত!

ঘরে ঢুকিতে ভুবন দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া কহিল, "বেড়িয়ে এলেন বুঝি? কদ্দুর গেছ্‌লেন?"

জামা ছাড়িতে ছাড়িতে রুষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলাম, "কেন?"

অপ্রতিভ হইয়া ভুবন কহিল, "না—তাই জিজ্ঞেস করচি। রাস্তা-ঘাট তো আপনার জানা নেই, তায় এই অন্ধকার!"

দেখিতেছি ভুবনের ভাবনার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে! কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া ভুবন কহিল, "বাদল বুঝি আপনার সঙ্গে গিছল?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, কেন বল তো?"

মাথা চুলকাইয়া ভুবন কহিল, "না। তাই বলচি।"

"তুমি বাদলকে চেন না কি?"

উৎসাহিত হইয়া ভুবন কহিল, "ও শালাকে আর চিনি না—শালার হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি!"

বাদলের হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি থাকিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কহিলাম, "বাদল তোমার কেউ হয় বুঝি!"

তাচ্ছিল্যের স্বরে ভুবন কহিল, "ও শালা আবার আমার কে হবে! খুড়োমশায়ের পুত্তুর···কুড়ের একশেষ, কেবল গিলতে জানে—অকর্ম্মার ধাড়ি! যে পাতে খাবে সেই পাত ছিঁড়বে। সেবারে চৌধুরীদের জামাইবাবুর কি ক্ষতিটাই না করলে, যদি জানতেন।"

বাদলকৃত চৌধুরী-জামাই-এর ক্ষতি-কাহিনী শুনিবার আগ্রহ আমার নাই, কহিলাম, "ওঃ, তাই না কি! বড় পাজী লোক তো!"

"আর বলবেন না, ওর জ্বালায় গেরামে তিষ্ঠোন দায়!—শালা শয়তানের একশেষ! চৌধুরী-জামায়ের···"

তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিলাম, "ও, সব বুঝতে পেরেছি!"

ভুবন কিন্তু নাছোড়বান্দা, অন্য কথা ধরিল, "ওকে না কি আপনি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন? অমন কাজও করবেন না।···ওসব লোককে তিন্-সীমানায় ঘেঁস্‌তে দিতে আছে—পাজীর পাঝাড়া। আপনার লোকের দরকার হয়তো আমার সম্বন্ধীকে পাঠিয়ে দিই, খুব কাজের ছেলে, কিছু দেখতে শুনতে হবে না—যেমনি চালাক তেমনি শান্ত—সাত চড়েও মুখে কথা বেরোয় না!"

এতক্ষণে ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম হইল। কহিলাম, "আচ্ছা দরকার হলে খবর দেব!"

ভুবন গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন বৈকালের ট্রেণে রওনা হইলাম। মনের কোণে কোথায় যেন কি একটা বাজিতেছিল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় দেখি বাদল হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার বাঁ বগল-দাবায় একটি গামছার পুঁটুলী, ডানহাতে শুভ্র-মস্তক একটি ছাতা—পরণের আট-হাতি কাপড়টি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত, দাড়ি-গোঁপ কামাইতে চোয়ালের হাড়-দুটি এবং গালের গর্ত্তদুটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

পড়ি-কি-মরি করিয়া লাফাইয়া ফুটবোর্ডের উপর সে উঠিয়া পড়িল। আমার কামরার হাতল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে উৎসুক চোখে কাহাকে যেন খুঁজিল, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক্‌, শালা আসে নি দেখচি তা হ'লে!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?" বাদল খিঁচাইয়া কহিল, "কে আবার, শালা ভুবনের সুমুন্দি ও'ৎ পেতেই ছিল! বাঃ বস্, সেটাদের আচ্ছা ভোগা দিয়েছি যা হোক!"

বাদল যে পরিমাণ উত্তেজিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে আর বেশীক্ষণ ঝুলিতে দেওয়া উচিত নয়—ট্রেণটিও তখন পুরাদমে চলিতে সুরু করিয়াছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া লইলাম, পরের ষ্টেশনে নামাইয়া দিলে চলিবে। বাদল ক্লান্ত হইয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে সহসা উঠিয়া পড়িয়া শীর্ণ দক্ষিণ হস্তটী মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চলমান ট্রেণের বাহিরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "শালাদের একদিন আমি খুন করব!" তাহার চোখ দুটী জ্বলিতে লাগিল।

অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, হঠাৎ বাদল এবং ভুবনের মধ্যে এমন কি স্বার্থের সাংঘাতিক সংঘর্ষ বাধিল, যাহাতে একজনের খুন না হইলে চলে না?

বাড়ি পৌঁছিতে দাদা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; অকর্ম্মণ্য, অপদার্থকে লইয়া তিনি ইতিমধ্যে অত ধিক ঝালাপালা হইয়া উঠিয়াছেন, আর নয়। মেজভাইটা লেখাপড়া শিখিয়া যে এতদুর মুর্খ হইয়া উঠিবে, তিনি কল্পনাও করেন নাই।

"বললেই হ'লো প্রজারা খাজনা আগাম দিয়েছে, না, তা কখনো কেউ দেয়? বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখালেই হ'লো আর কি! হারামজাদাদের মুখে তুই গুণে গুণে পঞ্চাশ জুতো লাগিয়ে এলি নে কেন?"

"তারা সবাই যে বাবার হাতের রসিদ দেখালে!"

ইহাতে দাদা খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন, কিন্তু নিবৃত্ত হইলেন না। কহিলেন, "এটা আর বুঝলে না, কাকাদের কারসাজি! বাবা কোন দিন হাত পেতে খাজনা নিয়েছেন? সব জাল জুয়াচুরি, মুখের উপর একথা বলে এলি না কেন?"

মুখের উপর কথা বলিবার মুখ ছিল না—চুপ করিয়া রহিলাম।

হঠাৎ বাদলের উপর দৃষ্টি পড়ায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?"

বাদল জড়সড় হইয়া হেঁট-মস্তকে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। আমি কহিলাম, "বাকি থাকুন।…"

দাদা কি বুঝিলেন কে জানে, মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "তাই বুঝি কলকাতায় এসেছে কাঁদুনী গাইতে—শালারা সব হাবামজাদার একশেষ। জেলে দিতে হয়।"

বাদল বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলাম, "না, চাকুরি খুঁজতে এসেছে,—ও আমাদের প্রজা নয়।"

দাদা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। আপাততঃ এই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া পিতৃব্যগণকে যে আজই জেলে পাঠাইতে হইবে, তাহার আভাস দিয়া গেলেন।

এদিকে বাড়ীর কুকুর বেড়ালটা পর্য্যন্ত জানিয়া গেল যে, তাহাদের মেজ-বাবুটীর মত নির্ব্বোধ ব্যক্তি দুনিয়ায় আর নাই, কোথাকার কে, তাহাকে সমাদর করিয়া আনিয়াছে চাকরি দিবার জন্য। দাদা সর্ব্বদা নেপথ্যে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এক সময় আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার যে এ রকম বুদ্ধি হবে, তা তো জানতুম না। দেখ দেখি, কোথাকার কে, তাকে এনেছ চাকরি দেবে বলে। কলকাতার খরচ বোঝ? ওই একলাই তো দেড় সের চালের ভাত খাবে। আর কোথায় থাকবে বল দেখি? শীগগির বিদেয় কর, জঞ্জাল রাখতে আছে।"

আমাকে চিন্তিত দেখিয়া দাদা কহিলেন, "তা যখন এনেছ, কি আর করবে। লিখে পড়ে তো আর দাওনি। বলে দাও চাকরি-টাকরি হলো না। চাকরি কি খোলাম-কুচি না কি?—আচ্ছা আব্দার যা হ'ক।"

কি জানি কেন, হঠাৎ বাদলের প্রতি মায়া পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি যে বাদলের চাকরি জুটিতেছে না তাহার জন্য আমিই বিশেষভাবে অপ্রস্তুত হইয়া রহিলাম। বাদলের প্রসঙ্গ উঠিলে ব্যস্ত হইয়া উঠি।

কিন্তু ইহারও যেন কোন হেতু নাই, ইচ্ছা করিলে নিজ-মূর্ত্তি ধরিয়া দাদাকে ক্ষান্ত করিতে পারি—বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই তটস্থ করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য্য, যতই মনে মনে বাদলের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি, ততই যেন নিজের অধিকার সম্বন্ধে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। কিছুতে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, করুণার পাত্রের প্রতি মমতা প্রদর্শনে মনে এত দুর্ব্বলতা বোধ করি কেন? কেন মনে হয়, সবার চক্ষে আমি একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি! প্রকাশ করিতে চাই—তৃতীয় ব্যক্তি বাদলের প্রতি আগ্রহ আমার এতটুকু নাই—যখন ইচ্ছা উহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিতে পারি।

মাঝে মাঝে লুকাইয়া বাদলকে দেখিয়া লই। মনে হয় বলি, তাহার কোন ভয় নাই। আমি থাকিতে তাহার ভয় কিসের। কিন্তু এ কি?

পল্লীর শ্যাম-কোমল পট-ভূমিকায় যে বাদলকে দেখিয়া-ছিলাম, এতো সে বাদল নয়। সত্যই কি বাদলকে সে দিন এত রুক্ষ দেখিয়াছিলাম? এ যেন পূর্ণ-নিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ড! দারিদ্র্য তাহার জন্মগত, কিন্তু তাহা কি সেদিন আমার চোখে রস-লেশহীন মনে হইয়াছিল? ভুলিয়াও কি ভাবিতে পারিয়াছিলাম, মোড়ল-পাড়ার তেমাথা রাস্তার উপরটীতে উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া উন্মুক্ত আকাশ, অসংখ্য সংলগ্ন খড়ের চাল আর পানা পুকুরের আবেষ্টনীর মধ্যে যে ব্যক্তিটী দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে একেবারে মানায় নাই? কোনরূপ কৌশল অবলম্বন না করিয়াই তাহাকে অপসারিত করিলে পল্লী পট-ভূমির এতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই?

হয় ত হইত। কিন্তু আজ মনে হইতেছে, মহানগরীর এ পট-ভূমিতে বাদল নেহাৎ-ই বেমানান—একেবারে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে।

ভিতরে ভিতরে সন্ধান করিয়া কোন বন্ধুর বাড়ী বাদলের একটা চাকরী ঠিক করিলাম। বাদল যেমনটি চাহিয়াছিল: ফাই-ফরমাস খাটা, ছেলে-ধরা, বাজার-হাট করা—অবসর সময়ে বাবুদের গা-হাত পা টিপিয়া দেওয়া। খোরাক-পোষাক ও ছ'টি টাকা মাহিনা, পরে উন্নতির আশা আছে।

বন্ধুর মা আমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখেন। বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখো বাবা; বিশ্বাসী লোক ত! আমার এই ছিষ্টির সংসার কোথায় কি থাকে, তার ঠিক নেই। তুমি ত জানই সব।"

সে বিষয়ে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলাম। তবুও তাঁহার আশঙ্কার অন্ত নাই, কহিলেন, "তা কাজ-টাজ তেমন পারবে ত' না, দু'দিন বাদেই সবে পড়বে? দেখো বাবা।… ভাল কথা, মাইনে কত দিতে হবে?" উপযাচক হইয়া

চাকরি পাওয়াতে বাদল অপেক্ষা আমি কম উপকৃত হই নাই। কহিলাম, "সে যা হয় আপনি একটা ঠিক করে দেবেন, আমি আর কি বলব।"

"না, তোমার লোক, তুমি বলাই ভাল। আমি সাদা-সিধে মানুষ, গোড়াতেই ঠিক হয়ে থাকা ভাল।"

এ ক্ষেত্রে যে কি বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে, ভাবিয়া পাইতেছি না। চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। বন্ধুর মা-ই কহিলেন, "তা উপস্থিত চার টাকাই নিগ্‌গে, পরে না হয়—" কহিলাম, "দেখুন ওর বড় অভাব, আরও গোটা কয়েক টাকা যদি দেন—"বোধ হয় আমাকে একটু স্নেহ করেন বলিয়া একেবারে ছ'টাকা দিতে রাজী হইয়া গেলেন। আমিও আর উচ্চ-বাচ্য না করিয়া বাদলকে কাজে বাহাল করিয়া দিলাম।

মাঝে মাঝে খবর লই, বাদল মন দিয়া কাজ করিতেছে। বন্ধুর মা যেমনটী চাহিয়াছিলেন, ঠিক তেমনটী পাইয়াছেন: মুখে একটী কথা নাই—হাতে পাতের কোন কিছুতে বাদলের অরুচি নাই।

কর্ত্তা-গৃহিণী সকলেই সন্তুষ্ট, মনের মত লোক এত দিনে মিলিয়াছে। মনে মনে পুলকিত হইলাম, অচিরাৎ বাদলের মাহিনাও বাড়িবে। তাহার ভাঙা সংসার, ভাঙা মন আবার জোড়া লাগিবে। আবার হয় ত তার ভাঙা ঘরে চাঁদের হাট বসিবে। পল্লীপ্রান্তের পরিজন পরিত্যক্ত কুটীরটিতে নিবু নিবু দীপ-শিখা হয় ত আবার জ্বলিয়া উঠিবে—সবার মধ্যে একজন হইয়া বাদল হয় ত আবার সমাদর পাইবে।

চোখের সম্মুখে বাদলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কত সুখ যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলিয়া বাদল হাসিয়া আমাকে অভিবাদন করিতেছে।

*

মাস খানেক পরে বাদলের সমস্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া সংবাদ পাইলাম—বাদল কাহাকেও কিছু না বলিয়া পালাইয়া গেছে।

ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বন্ধুর মা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কহিলেন, "দেখলে ত বাবা, গোড়ায় আমি বলেছিলুম। এদিকে তোমার কথায় পুরোনো ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিয়েও কি কাণ্ডটা না করলুম।" লজ্জায় আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না—অধোমুখে তাঁহার কথা শুনিয়া গেলাম।

"তা যাবি যাবি, বলে গেলেই ত পারতিস্। তোকে কি আমরা ধরে বেঁধেছিলুম? ভাল মানুষের কাল নেই, ঘোর কলি। ··সত্যি বাবা তোমার লোক না হলে বেটাকে জেলে দিতুম—"

কহিলাম, "যা হবার হয়ে গেছে। ও হারামজাদাদের কথা আর বলবেন না—খেতে না পেলে পায়ে ধরবে, খেতে দিলে চোরখুটি বেড়ে যায়। কিছু নিয়ে যায়নি ত?"

"এখন ত কিছু বুঝতে পারচি না, ছিষ্টির সংসার আমার এলো পড়ে থাকে। কে জানে কি নিয়ে গেচে।"

"না, না খেলার কথা নয়।—আপনি ভাল করে সব দেখুন। কিছু যদি নিয়ে যায়, ত হারামজাদার তেল আমি ভাঙব।" ইহাতে বন্ধুর মা সুর একটু নামাইলেন, কহিলেন, "আর দেখ দেখি বাবা, গেলি ত গেলি, আমায় এমন জব্দ করে যাবার কি দরকার ছিল।—দু'দিন পরে গেলেই ত পারতিস্।" তাঁহার অসুবিধাটা আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। বাদলকে যদি হাতের কাছে পাইতাম টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। কহিলাম, "সত্যি-ই ত। এই জন্যই দেশের লোকের উন্নতি নেই—যে পাতে খায়, সেই পাত ছেঁড়ে।"

"উনি তো ভেবেই অস্থির—কলকাতায় নতুন এয়েচে, আবার কোথায় চাপা-টাপা পড়লো কি না, কে জানে। পুলিসে ডাইরী করার জন্য ঝোলাঝুলি, আমি ঠেকিয়ে রাখি—তোমাকে কিছু না জিগ্যেস করে কি কিছু করা যায়?"

বলিবার কিছু ছিল না—চুপ করিয়া রহিলাম।

"ভয়ে তো সারারাত আমাদের ঘুম হয় নি। লোক রেখেও বাপু স্বস্তি নেই, আমার হ'য়েচে এক জ্বালা। কোথায় গিয়ে পড়ল কে জানে।"

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলাম, "কোথায় আর যাবে? কোন চুলোয় কি বেটার জায়গা আছে। কুকুরের জাত, শুঁকে শুঁকে ঠিকই বাড়ী পৌঁছবে। আপনি মিছে ভাববেন না।"

"মা কালী যেন তাই-ই করেন বাবা।—ভয়ে তো আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।"

তাঁহাকে অভয় দিয়া বাদলের অকৃতজ্ঞতায় রুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। হতভাগা লোকগুলোর কখনও ভাল

করিতে নাই। মিছামিছি তাহাদের ভালর চিন্তা করিয়া আপনাকে ব্যস্ত করিয়া তোলা বই তো নয়। যেটুকু মান-সম্ভ্রম থাকে, ইহাদের জন্য শেষ পর্য্যন্ত খোয়াইতে হয়।—ঘরে-বাহিরে নিজেকে হাস্যাস্পদ করা ছাড়া অন্য কি আর পুরস্কার আশা করা যায়? নিমকহারামের দল সব!

যাক্ আপদ গেল,—এতদিনে সত্য সত্যই ঘাড় হইতে ভূত নামিল। কোথাকার কে, বাদল, তাহাকে লইয়া কি বিপদেই না পড়িয়াছিলাম! উঃ ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।

* * *

কিন্তু আমি ছাড়িলেও বাদল আমাকে ছাড়িল না। দিন সাত আট পরে বাদলের একখানি পত্র পাইলাম। অত্যন্ত বিনয় এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার চাকুরি ছাড়িয়া দিবার হেতুটী নিবেদন করিয়াছে। পত্রটীর গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার প্রতি তাহার একান্ত আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে।

পত্রটী পড়িয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলাম। চাকর হইয়া এত আব্দার করিলে কাহার বা সহ্য হয়?—"আমাকে এঁটো বাসন মাজিতে হইত…প্রত্যহ মেয়েদের ছাড়া কাপড়ও কাচিতে হইত…তবু কাহারও মন পাইতাম না, সর্ব্বদাই গিন্নী মা ট্যাক্ ট্যাক্ করিতেন…ইহা আমার দ্বারা সম্ভব নয় বলিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছি…আপনাকে জানাইয়া আসিতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা করিবেন। * * দেশে খুব বর্ষা নামিয়াছে…এ-বৎসর আবাদ ভালই হইবে…ক্ষেত্র কয়ালের জমি আবাদ করিবার কাজটা ভুবনে পাইয়াছি—আপনাদের বাড়ীর ছোটবাবু বিঘে দুই জমি দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন…ইত্যাদি।"

অর্থাৎ দেশে ফিরিয়া বাদল কিঞ্চিৎ গুছাইয়া লইতে পারিয়াছে। চিঠির প্রতি ছত্র তাহার ভাবী সুখ-সম্ভাবনার আভাস দিতেছে, কিন্তু হঠাৎ বাদলের অবজ্ঞাত জীবনের এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল কিরূপে? তাহার কলিকাতা আগমনের সহিত ইহার কি সম্পর্ক আছে ভাবিয়া পাইলাম না! ছোট-কাকার, ক্ষেত্র কয়ালেরই বা বাদলের মত একটা অপদার্থকে হঠাৎ এতখানি দয়া করিয়া ফেলিবার কি হেতু ঘটিল? দেখিতেছি, ভুবনের কথাই ঠিক—বাদলের হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি, সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে এই শীর্ণ হাড়ে ভেল্কী খেলাইতে পারে!…

তথাপি বাদলের এবংবিধ অবস্থা পরিবর্ত্তনে মনের কোণে কোথায় যেন আরাম বোধ করিতেছিলাম। আমাকে এবং বন্ধুমাতাকে সে যতখানি প্রতারিত করিয়া যাক্ না কেন, তাহার এ আচরণ যেন তাহার যোগ্যই হইয়াছে। এই সামান্য চাকুরিতে লাগিয়া থাকিলে সে আপন আত্মমর্য্যাদার লাঘব করিত—পল্লী-কৃষকের বৈশিষ্ট্য হইতে আপনাকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিত। অবস্থা-বিপর্য্যয়েও পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার গোপন ইচ্ছা পোষণ করিয়া সে আপন গৌরব বজায় রাখিয়াছে।

নববর্ষা-সমাগমে রুক্ষ বাদল সরস হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষীণ দেহটী হয় তো তাহার লাঙ্গলের ফলার চেয়েও শক্ত হইয়া দিগন্ত-বিস্তারিত জল-সঞ্চিত উন্মুক্ত মাঠে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে; ঊর্দ্ধপুচ্ছ বলীবর্দ্দের পশ্চাদ্ধাবনে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কে জানে হয় তো সে এখন সঙ্গীদের হাঁক ছাড়িয়া রহস্য করিতেছে:

"বৌ-এর আবার বায়না দেখ, মল দিতে হবে! বলে কোথায় কী! হাই গা জলে মলের বাজনা শুনিস্ কানাই? হা-হা-হা! শালার গরু নড়ে না!……ক্ষেত্তর খুড়ো কি কয়! আরে তামুক খাও খুড়ো, গা গরম হবে! নয় তো যাও পান্তা খেয়ে কাঁথা মুড়ি দাও—হা-হা-হা!! বলি কলকাতায় যাবি সুদর্শন, কলের জল আর এলাকৃটি নাইট—কত মজা! বউ ধরেছে? আরে আবার রগড় দেখ! সত্যি আমি যাব সেথাকে আবার, ইন্দ্রপুরী না খুড়ো! ওরে কানাই বউ এর কাপড়-কাচা শেখ আগে…বললে না পেত্যায় যাবি…হেট্-হেট্, শালার গরু ছোটে দেখ! ইঃ, ইঃ, র্ র্ র্-র্!!…"

বর্ষে বর্ষে নববর্ষা সমাগমে বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে নিরন্ন কৃষক-কুলের নিমিত্ত যে বৃহৎ পটভূমিকার সূচনা হয়, তাহার তুলনায় আশু ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা লইয়া ছয়টাকা মাহিনার পটভূমিটা ম্লান মনে হয় না কি?

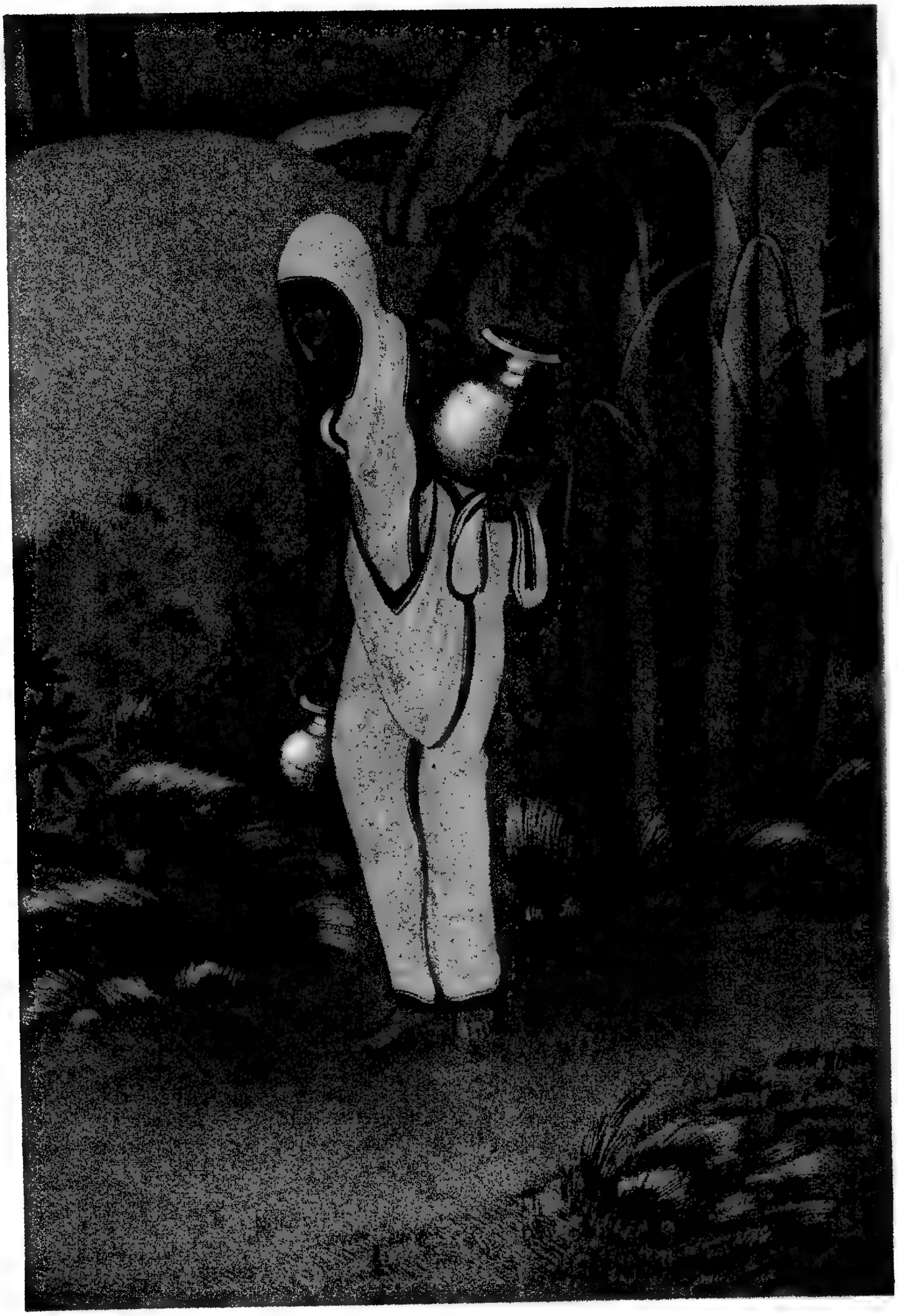

স্নানার্থিনী [শিল্পী—শ্রীইন্দু গুপ্ত

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

১৯

সন্ধ্যার পরেই অতীনের কাছে ও গৃহিনীর কাছে সব কথা অখিলবাবু শুনিলেন। পূর্ব্বেই সংবাদ যাহা তিনি লইয়াছিলেন, তাহাতে এই ধারণা তাঁহার হইয়াছিল, পিতৃগৃহের এবং আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আবেষ্টনীর প্রভাবে চাল-চলন যেমনই হইয়া উঠুক, জাত স্বভাবে মেয়েটি মন্দ নয়। এখন অতীনের মুখে ও গৃহিণীর মুখে মাগাবার পাহাড়ের এই ঘটনার বিবৃতি যাহা শুনিলেন, তাহাতে আন্তরিক একটা শ্রদ্ধাই মীনার প্রতি তাঁহার জন্মিল। বধূকে ডাকিয়াও তাহার ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক সংবাদও নিলেন; সেদিন নিভৃতে তাহাদের কথাবার্ত্তা কি হইয়াছিল, তাহাও কতক কতক শুনিলেন। হাঁ, মেয়েটি অতি সরল ও মধুর স্বভাবের সুবুদ্ধি একটি মেয়েই বটে, কুশিক্ষায় ও কুদৃষ্টান্তে ধাত বদলায় নাই, বাহিরে আদব কায়দার উন্মার্গ গতি ভিতরের মতিকে উন্মার্গগামী করিয়া তুলিতে পারে নাই। যেমন তাঁহার বৌমা, আসলে তেমনই একটি লক্ষ্মী মেয়েই বটে। নহিলে সত্য তাঁহার বৌমার সঙ্গে এমন আন্তরিক প্রীতির সম্বন্ধ তাহার হইতে পারিত না। যেমন শ্রদ্ধা, তেমন একটা দরদও তাঁহার চিত্ত ভরিয়া জাগিয়া উঠিল। আহা, এমন মেয়েটি, আর তাকে কি না তাঁর ঘরের ঐ কুলাঙ্গার এমন করিয়া মজাইতে বসাইয়াছে! আঃ! যদি পারিতেন টুকরা টুকরা করিয়া আজ এখনই হতভাগাকে হাতের নখে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। তবে যাহাই হউক, দাগা আজ যত বড়ই একটা পাক, মেয়েটি বাঁচিয়া গেল। আর তিনিও এ যাত্রা এক রূপ বাঁচিয়া গেলেন। ওখানে আর ভয় কিছু নাই। ওবাড়ীর ত্রিসীমানায়ও বাঁদরটা আর ঘেঁসিতে পারিবে না। কিন্তু ঘরেও ভিড়িবে কি?—সম্ভব নয়। আরও রাগ বাড়িয়া গেল, জিদও বাড়িয়া যাইবে। আবার কোথায় কার সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া জুটিবে, স্থির কি? সত্যকার কোনও টানে না হউক, তাঁহাদের জব্দ করিবার অভিপ্রায়েও এরূপ সে করিতে পারে। করিত, গোল্লায় যাইত, নিজের কর্ম্মফল নিজে ভুগিত, ভাবিতেন না। অমন কুপুত্র থাকা না থাকা সমান। থাকা অপেক্ষা না থাকাই বরং ভাল। কিন্তু ঐ বৌমাটি—সংসারে যে তার সুখের একমাত্র আশ্রয়, অবলম্বন, ঐ হতভাগা..। অন্ততঃ তার খাতিরেও চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হইবে, ফিরাইয়া যদি তাহাকে ঘরে আনিতে পারেন কিন্তু পারিবেন কি? যদি না পারেন, জন্ম জন্ম এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতে হইবে। কিন্তু কি চেষ্টা করিবেন? আপাততঃ সম্ভব কিছুই হইবে না। যে উপায়েই যাহা করিতে চান, সব ব্যর্থ হইবে। মীনার কাছে অপদস্থ আজ হইয়াছে, তাও আবার বিন্দুর সম্মুখে। ওখানে পাত্তা আর না পাক, মাথা হেঁট করিয়া ঘরে ফিরিবে আর বৌ-এর সঙ্গে একটা মিল এখনই আসিয়া করিয়া লইবে, সে ধাতুরই ছেলে রবীন নয় রবীন কেন, কেহই সহজে তাহা পারে না।

এই ঘটনার পর কোথায় এখন গা-ঢাকা দিবে, বোম্বে ছাড়িয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে কি না, তাহও কিছু বুঝা যাইতেছে না। হাতে বেশ কিছু টাকাও আছে; পাসপোর্ট যদি পাইয়া থাকে হয়ত বিলাত চলিয়াও যাইতে পারে। গিয়া সেখানে অভাব জানাইয়া যদি চাহিয়া পাঠায় টাকা কি তিনি না দিয়া পারিবেন?

আবার কে জানে, ঐ মেয়েটির কাছে আমল সহজে না পাক, গোপনে ঐ মোক্তার্জিটার সঙ্গেই একটা রফা করিয়া লইবার চেষ্টা করিবে কি না তাহারই বা ঠিক কি। ঝানু হিসাবী লোক—এমন একটা ছেলে হাতে পাইয়া সহজে ছাড়িতে চাহিবে না—এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রাহ্যই হয় ত কিছু করিবে না—কম লোকই করিয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ? —সিভিল-ম্যারেজ হয় না, হিন্দুমতে হয়। গরজে উহারা সব করিতে পারে। হয়ত তাহারই চেষ্টা করিবে কিন্তু

এক জাতি উহারা নহে, বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এই যা রক্ষা!

যাহা হউক, এই যাহা আজ ঘটিল, তাহার পর অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, হতভাগা কি করে না করে, না দেখিয়া না বুঝিয়া এখনই তিনি ফিরিয়া যাইতে পারিতেছেন না। কয়েকটা দিন আর তাঁহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। কিন্তু কয় দিন? দেখা যাউক। মামলাটা রহিয়াছে, তেমন জরুরী ডাক যদি আসে, অতীনের তত্ত্বাবধানে পরিবার রাখিয়া যাইবেন। সে-ই খবরাখবর যাহা নিতে হয় নিবে, যা করিতে হয় করিবে, তেমন দরকার হয় 'তার' একটা পাইলেই আবার তিনি চলিয়া আসিবেন। আর কি দুর্ভোগেই পড়িয়াছেন! কেবল ঐ বৌমাটি—নইলে থোড়াই কেয়ার তিনি করিতেন। যা খুসী তাই করিত, জাহান্নামে যাইতে বলিয়াছে, যাইত, ফিরিয়াও তিনি চাহিতেন না। রাত্রিটা ভরিয়া এইরূপ অনেক কথাই অখিলবাবু ভাবিলেন।

পরদিন সকালের কাগজে বাহির হইল: যে ব্যাঙ্কের কাজে আসিয়াছিলেন কাজ করিতে করিতে বৈকালেই মিষ্টার মোকার্জ্জি হঠাৎ অতি অসুস্থ বোধ করিতে থাকেন এবং দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে গৃহে আনা হয় এবং রাত্রি এগারটায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। চিকিৎসকরা বলেন, রক্তের চাপ (blood-pressure) অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই শোচনীয় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। মিষ্টার মোকার্জ্জি নিজে ইহা সম্ভবতঃ ভাল বুঝিতে পারেন নাই, এবং যথাপ্রয়োজন সতর্কতাও তাই সময়মত অবলম্বন করেন নাই। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ এই ঘটনায় একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

সংবাদটা পড়িয়া অখিলবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যে ঘটনাসূত্রে যে-পরিচয় উঁহার পাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য প্রীতিকর কি শ্রদ্ধাকর্ষক কিছুই নহে, তবু পরিচিত একজন স্বদেশবাসী ভদ্রলোক ত'! পরম শত্রু হইলেও দূর এই প্রবাসে আত্মীয়-স্বজনগণ-বিরহিত অবস্থায় কাহারও আকস্মিক এরূপ মৃত্যু-সংবাদ সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণে গিয়া তীব্র একটা বেদনায় আঘাত দেয়। তারপর উঁহাকে যে চক্ষেই এতদিন দেখিয়া থাকুন, কন্যাটির প্রতি গভীর একটা শ্রদ্ধা ও দরদ, তাহার দুঃখে আন্তরিক একটা সহানুভূতি, কেবল এই পূর্ব্বরাত্রিতেও সকল চিত্ত ভরিয়া তাঁহার জাগিয়া উঠিয়াছিল। আর, সেই কন্যাটিরই ত' পিতা ইনি, একই দরদে দরদী। সেই দরদে একটা দরদের টান অলক্ষিতভাবে তাঁহার প্রাণের তলে জাগিয়া উঠিতেছিল। স্পষ্ট সেই দরদটা তখনও উপরে ভাসিয়া না উঠুক, বিরাগের ভাবটা একবারে অপসৃত হইয়া গিয়াছিল, যদিও ভবিষ্যতে তাঁহার হইতে নূতন কোনও বিপদের কিছু আশঙ্কাও উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেল। কিন্তু আজ তাঁহার অতি শোচনীয় আকস্মিক এই মৃত্যু-সংবাদে ওসব কথাই কিছু আর মনে হইল না, প্রচ্ছন্ন দরদটাই জাগিয়া উঠিল, দরদী বান্ধবের ন্যায়ই তীব্র একটা বেদনা তিনি অনুভব করিলেন।

কন্যাটির জন্যও বড় দুঃখ হইল। আহা বেচারী! আর অমন লক্ষ্মী মেয়েটি! অপরিচিত এই প্রবাসে, কয় দিনই বা আসিয়াছে, সহসা এই ভাবে পিতাকে হারাইয়া একেবারেই অসহায় হইয়া পড়িল। একটি মাত্র ভাই বিলাতে রহিয়াছে, নিকট আত্মীয়বান্ধব কলিকাতায় আর কেহ আছে কি না, কিছুই তিনি জানেন না। কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে পর তখন যা হয় হইবে। কিন্তু এখানে কেহই ত' আর নাই যে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার আজ গ্রহণ করিতে পারে। বৌমা আছেন। কিন্তু না, আজই তাহাকে ওখানে পাঠান যায় না। কে জানে ঐ সংবাদ পাইয়া ঐ হতভাগাই যদি আসিয়া জুটিয়া থাকে! তবে তিনি গিয়া একটা সংবাদ লইতে পারেন। সেটা অতি বড় একটা কর্ত্তব্যও বটে। এই দূর দেশে নবাগত একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে অকস্মাৎ এত বড় একটা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, জানিয়া শুনিয়া তিনি কি উদাসীন থাকিতে পারেন? প্রবাসী বাঙ্গালী এই সহরে আরও অনেক আছেন। কিন্তু কে জানে কেহই হয়ত উঁহাকে চেনেন না, সংবাদ লওয়াও প্রয়োজন বোধ করিবেন না।

বসিয়া কতক্ষণ ভাবিলেন; শেষে উঠিয়া বৌমাকে সংবাদটা দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন ব্যাঙ্কের লোক-দের চেষ্টায় বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং শবযাত্রার আয়োজন হইতেছে। সংবাদ লইয়া জানিলেন, বিলাতে ইহাঁর পুত্রের নিকট এবং কলিকাতায় তাঁহার আফিসে টেলিগ্রাম গিয়াছে। কন্যাটির প্রবীণা পরিচারিকাটি

সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আছে এবং ব্যাঙ্কেরই প্রধান একজন কর্ম্মচারীর পত্নী ও তাঁহার সুপরিচিত একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের স্ত্রীও আসিয়াছেন। উঁহারা এই কন্যাটির তত্ত্বাবধান যেরূপ প্রয়োজন করিতেছেন। বড় একটা স্বস্তি তখন অখিল বাবু অনুভব করিলেন। অন্য সকলের সঙ্গে শবানুগমন করিয়া তিনি বাসায় ফিরিলেন।

পরদিন দুপুরে আহারাদির পর বিন্দুকে নিজে তিনি গিয়া পৌঁছিয়া দিয়া আসিলেন। বলিয়া দিলেন, কলিকাতা হইতে আপনার লোক কেহ আসিয়া যে কয়দিন ওকে না লইয়া যাইতে পারে, দরকার হইলে বিন্দু ওখানে থাকিবে, সকাল বিকাল তিনি গিয়া সংবাদ লইবেন। দরকার যাহা কিছু হয়, সব তিনি করিবেন, নিঃসঙ্কোচে যেন তাঁহাকে জানান হয়।

শোক-দুঃখের প্রথম আঘাতে যতই অভিভূত হইয়া লোকে পড়ুক, একটু ভাবিবার অবসর হইলে অতি বড় বিপদে একটা ধীরতা লোকের আসে, বিশেষ যদি বুঝিতে পারে এই বিপৎপাত কতদূর অসহায় তাহাকে করিয়া ফেলিয়াছে। মীনা বেশ বুঝিয়াছিল, পিতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে পিতৃগৃহই তার ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ীখানিও তাঁহার নিজের নয়, ভাড়া দিয়া থাকিতেন, লোকজন সব বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র। অতি নিকট আত্মীয়স্বজন কেহ নাই, অন্ততঃ এরূপ কাহাকেও সে কখনও দেখে নাই। এক মাত্র ভ্রাতা দূর প্রবাসী; কবে সে ফিরিবে, ফিরিয়াই কি করিবে কিছুই সে জানে না। এই মাত্র সে শুনিয়াছিল, হিসাব-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতে বিলাতে গিয়াছে, শিক্ষান্তে যোগ্যতা লাভ করিয়া যখন ফিরিবে, পিতার আফিসে তাঁহার সহযোগী হইয়া বসিবে, পরে সেই আফিসেরই ভার লইবে। শুনিয়াছিল, শেষ পরীক্ষা শীঘ্রই দিবে, পাশ হইলে কাজ-কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আরও কিছুকাল ওখানে থাকিবে। কিন্তু এখন সে কি করিবে, কিই বা করিতে পারে, কিছুই সে জানে না, বুঝিয়া উঠিতেও কিছু পারিতেছে না। আপাততঃ কলিকাতায় তাহাকে ফিরিতে হইবে। আফিসের কোনও লোক আসিয়া অবশ্য তাহাকে লইয়া যাইবে। কিন্তু কোথায় কার তত্ত্বাবধানে কি অবস্থায় সে থাকিবে? ও বাড়ীতে গিয়া একা সে থাকিতে পারে না, বাড়ী ও বাড়ীর ঐ গৃহস্থালীও সে রাখিতে পারে না। ভাই ফিরিয়া আসিলে তবু একটা বল তাহার হয়, একটা আশ্রয় যেমনই হউক, সে পায়। কিন্তু যত দিন না ফেরে, তত দিন—তত দিন—কি সে করিবে! কোথায় গিয়া সে দাঁড়াইবে? কে তাহার কি জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবে?

মীনা অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে, অকস্মাৎ এই ভাবে স্নেহময় পিতাকে হারাইয়া যতই অভিভূত হইয়া পড়ুক, একটু ভাবিবার অবসর হইলেই, নিজের দারুণ এই অসহায় অবস্থাটা সে উপলব্ধি করিল, করিয়া এই সব চিন্তা যত তাহার মনে উঠিতে লাগিল, শোকবেগ তত শমিত হইয়া একটা ধীরতর ভাবই চিত্তে দেখা দিতে লাগিল। শোক দুঃখে সব ছাড়িয়া দিয়া লোকে থাকিতে পারে, যদি না প্রিয়জনের অভাবে কঠিন কোনও দায়িত্ব মাথায় আসিয়া পড়ে, অথবা সে দায়িত্বটা যদি না বা যতক্ষণ উপলব্ধি কেহ করিতে পারে। উপলব্ধি করিলেই শোকের ব্যথাটা কমিয়া এই দায়িত্বের চিন্তাটাই বড় হইয়া উঠিবে এবং একটা ধীরতাও সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে দেখা দিবে। মীনারও তাই দিতেছিল।

২০

বিন্দু যখন গিয়া পৌঁছিল, বেলা তখন প্রায় দুইটা। দেখিল, বেশ একটু ধীর ভাবেই মীনা গৃহতলে আস্তৃত একখানি কম্বলের উপরে বসিয়া রহিয়াছে। পিতৃবিয়োগে হিন্দুকন্যাকে কি করিতে হয়, কি নিয়মে চলিতে হয়, মীনা কিছুই জানিত না। তবে বাঙ্গালী যে ভদ্রলোকের স্ত্রী আসিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যেরূপ নির্দ্দেশ করিলেন, সেই ভাবেই সে চলিল। মোক্তার্জ্জি হিন্দুসন্তান ছিলেন, প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মান্তরও কিছু গ্রহণ করেন নাই; সৎকারও হিন্দু আচারেই সম্পন্ন করা হয়।

ধীর ভাবেই বিন্দুর দিকে চাহিয়া মীনা কহিল, "এসেছিস্! আয় বিন্দু! তোর কথাই ভাবছিলাম—ভাবছিলাম যদি—যদি—"

বলিতে বলিতে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, আর পারিল না; দুই হাতে মুখ চাপিল; অর্দ্ধস্ফুট একটা রোদনধ্বনি উঠিল। বিন্দু গিয়া কাছে বসিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিল, দুটি হাত তুলিয়া মীনাও বিন্দুর গলাটি জড়াইয়া ধরিল, বক্ষে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কতক্ষণ কাঁদিল। নিজেই শেষে উঠিয়া

বসিল, চক্ষু মুছিয়া কহিল, "তোরা ভাল আছিস্ সবাই বিন্দু?"

"হাঁ।"

"খবর পেয়েছিস বুঝি কাগজে?"

"হাঁ, শ্বশুর মশাই দেখে আমাকে জানান। কাল তিনি এসেছিলেনও এখানে।"

চক্ষে জল আসিল। মুছিয়া মীনা কহিল, "আমার প্রণাম তাঁকে দিস। তাহ'লে তিনিই বুঝি তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

"হাঁ। নিজেই আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

"তোর শাশুড়ী ছিলেন, সে-দিনকার খবরও তাহ'লে সব জানতে পেরেছেন?"

"হাঁ। তার পর তোর খুঁটিনাটি অনেক কথাই জিজ্ঞেসা ক'রে ক'রে আমার কাছে শুনলেন। মনে হ'ল, মনে মনে তোর উপরে বড় একটা শ্রদ্ধাও তাঁর জন্মেছে। বড় ভাল মানুষ তিনি, বড় ভাল আমাকে বাসেন। তোর উপরেও বড় একটা মমতার দরদ তাঁর হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। পৌঁছে দিয়ে গেলেন, আর যে ক'দিন এখানে তোকে থাকতে হয়, আমিও তোর কাছে থাকব ব'লে দিয়েছেন। দু'বেলা এসে খবরও তিনি নেবেন।"

চক্ষু দুটি ভরিয়া অশ্রুধারা বহিল, যুক্ত দুটি কর তুলিয়া নিঃশব্দে মীনা নমস্কার জানাইল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিন্দু কহিল, "হাঁ, একটি কথা। এই যে ঘটনাটা হ'ল, এর পর উনি—"

মীনা উত্তর করিল, "হাঁ, এসেছিল একবার কাল বিকেলে। আমি দেখা করি নি। তার জিনিস-পত্র যা ছিল সব নিয়ে যেতে ব'লে পাঠালাম। নিয়েও গেছে। ভয় নেই কিছু, নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখানে থাকতে পারিস্। থাকতেই যে হবে, নইলে কি ক'রব আমি একা? একটি মারাঠী মেয়ে আর বাঙ্গালী একটি ভদ্রলোকের স্ত্রীও এসে র'য়েছেন। যত্নও খুব ক'রছেন। কিন্তু হাজার হ'লেও পর। মন খুলে দু'টি কথা কব, কাছে ব'সে একটু কাঁদব, এমন যে একটি মানুষ আর নেই এখানে।"

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আবার বিন্দুর গলাটি জড়াইয়া ধরিল। বিন্দু তাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতে করিতে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

অতি আয়াসে কথঞ্চিৎ সংযত আপনাকে করিয়া বিন্দুর গলাটি ছাড়িয়া দিয়া মীনা আবার সোজা হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "ফিরে এলাম, এসেই দেখি, অসাড় অজ্ঞান হ'য়ে বাবা প'ড়ে আছেন। ব্যাঙ্কের লোকেরা বাড়ীতে তখন তাঁকে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার কে কে এসে দেখছে, লোকজন সব ছুটাছুটি ক'রছে। উঃ। সে যে কি একটা অবস্থাই এসে দেখলাম বিন্দু!"

বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। সামলাইয়া আবার কহিল, "একটি কথাও আর শুনলাম না, কৎ একটা কিছু ব'লতেও পারলাম না, কাছে গিয়েও ওরা একটু কাল ব'সতে দিল না। রাত এগারটায় সব শেষ হ'য়ে গেল। শেষ যখন হ'য়ে আসে, ডেকে ওরা কাছে নিয়ে বসালে। মুখের ওপর প'ড়ে 'বাবা' 'বাবা' ক'রে কত ডাকলাম। সেই বাবা আমার একটু সাড়াও দিলেন না, চোখ খুলেও একটি বার চাইলেন না, হাত তুলে শেষ একটিবার গলাটি আমার জড়িয়ে ধরলেন না!"

"আর আর মীনা—দোহাই তোর! আর বলিস নি! শুনতেও যে আর পারছি নি!"

কাঁদিয়া মীনা কহিল, "সইতেও যে আমি আর পারছি নি! বুক ভরে উঠছে—দু'দিন চেপে র'য়েছি—কারে বলব? কাকে বলে বুকের ভার একটু হালকা করব! আজ তোকে পেয়েছি—আর যে আমার কেউ নেই বিন্দু!"

কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল, একটুকাল নীরব থাকিয়া মীনা আবার বলিয়া উঠিল, "না, কেউ নেই—কোথাও কেউ নেই! বন্ধুও এমন আর কেউ নেই, দরদে আমার দুঃখটা বুঝবে, দরদ ক'রে আমার দুঃখের কথা শুনবে!"

ধীরে ধীরে বিন্দু তখন কহিল, "ক'লকেতাতেই ত ফিরে যাবি এখন?"

"হাঁ, আফিস টেলিগ্রাম করেছিল, অনুবাবু আসছেন, তিনি এসে আমায় নিয়ে যাবেন।"

"অনুবাবু?"

"বাবার আফিসে কাজ করেন, আগে আমায় পড়াতেন, বড় ভালবাসতেন বাবা তাঁকে। বড় বিশ্বাসী আর অনুগত একজন কর্ম্মচারী; নির্ভরও তাঁর উপরে খুব ক'রতেন। নাম

২৭শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটুট হলে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে অপরাপর হিন্দু-নেতার মধ্যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জ্জী উপস্থিত ছিলেন। সভার মূল বক্তা ছিলেন স্তর এন. এন. সরকার।

[দি-উ কৃত্তি বঙ্গশ্রী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অশুতোষ লাহিড়ী। তিনি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কার কাছে গিয়ে উঠব! কেউ যে আর আমার নেই।"

"কেউ নেই!"

"না, খুড়ো-জ্যাঠা কেউ নেই। মামা কি মেসো-পিসে—কাউকে কখনও দেখি নি। ছিলেন না কি কেউ কেউ—সে-কেলে হিন্দু সমাজের লোক; কারও সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ বাবা রাখতেন না। এক দাদা আছেন—বিলেতে, তারে খবর গেছে, জবাব কিছু এখনও আসে নি। কবে আসবেন, কি ক'রবেন, কিছুই জানি না।"

"তোদের যে বাড়ী আছে ক'লকাতায়—"

"ভাড়াটে বাড়ী। মাইনে করা কতকগুলি লোক আছে। আমি কি ক'রে সে বাড়ী রাখব? একাই বা কি ক'রে সেথায় থাকব? আর সেই খরচপত্তর, তাও ত নেহাৎ কম নয়। ব'লব কি বিন্দু, বাবা—আমার অমন বাবা, কি ভালই যে বাসতেন—কি আদর করেই না রেখেছিলেন—যা যখন চেয়েছি, পেয়েছি, এতটুকু মেয়েটির মত কি আবদারই না ক'রেছি, হাসিমুখে সব সয়েছেন, যা বলেছি করেছেন—সেই বাবা আমার চলে গেলেন, সে দুঃখের চাইতেও এই ভাবনা আমার আজ বড় হ'য়ে উঠেছে।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিন্দু কহিল, "ভাবনাটাও ত' কম নয় মীনা। দুঃখু যা আছে, মনে; মনের দুঃখু মনের বলে বরং সওয়া যায়, চাপা দিয়েও রাখা যায়। কিন্তু এই সব ভাবনা যা নিয়ে, সে ত' চাপা দিয়ে রাখবার কি এড়িয়ে চ'লবার মত কিছু নয়। বুঝতেই পারছি নি মীনা, তুই এখন কি ক'রবি, আপন জন কারও আশ্রয় ছাড়া কোথায় কার কাছে গিয়ে থাকবি, কে তোকে দেখবে!"

"কেউ নেই! কেউ নেই! তবে কলকাতায়ই যেতে হবে এখন ফিরে। এখানে ত' থাকবার যো নেই। দেখি, দাদা কি লেখেন? আর অশুবাবু আমাকে নিয়ে যাবেন, দেখি আফিসের লোকেরাই বা কে কি ব্যবস্থা করেন কিছু একটা ক'রবেনই। হয় ত বাবার কোনও বন্ধুর বাড়ীতে আমায় রেখে দেবেন কি তাঁরাই কেউ যেচে এসে বাড়ীতে নিয়ে আমায় রাখতে চাইবেন। তার পর দাদা ফিরে এসে যা করেন। কিন্তু পরের বাড়ী, পরের কাছে গিয়ে কি ক'রে থাকব? একটি দিন যে বাবাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে আর থাকি নি বিন্দু!"

বিন্দু কি ভাবিয়া কহিল, "বলতে ত পারি না মীনা, তবে আমার কাছে নিয়ে রাখতে পারতাম। শ্বশুর শাশুড়ী আপত্তি ত ক'রতেনই না, বরং—"

"না, না! ছি! তাও কি হয়? কত দয়া তাঁরা ক'রেছেন, তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে কিন্তু আমার ত' একটা লজ্জা আছে! কি ক'রে কোন্ মুখ নিয়ে ওখানে থাকব? তার পর কে জানে, যদি—"

একটু লজ্জা পাইয়া বিন্দু তখন কহিল, "সে আশঙ্কা শীগ্‌গির বড় কিছু নেই। তবে—না থাক্, সেটা তুই পারবি না বুঝি। তবে দেখ্, ক'লকাতায় ত যা, দেখ্ অশুবাবুরা কি করেন, তোর দাদাই বা কি লেখেন। আমরাও বোধ হয় শীগ্‌গিরই যাব, গিয়ে খবর নেব।"

"দাদার কোনও খবর এখনও এল না। তাই ভাবছি—"

ঠিক তখনই একজন ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম লইয়া আসিল। সই দিয়া রাখিয়া খামটা খুলিয়া মীনা পড়িল, পড়িতে পড়িতে কেমন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কাগজখানি হাত হইতে পড়িয়া গেল।

"তার তার এল? তোর দাদার?"

"হাঁ।"

"কি লিখেছেন?"

"দেখ্ প'ড়ে।"

বিন্দু তুলিয়া পড়িল। মীনার দাদা ধীরেশ লিখিয়াছে, প্রিয়তম পিতার আকস্মিক এই মৃত্যু সংবাদে যারপরনাই দুঃখিত সে হইল। মীনাকেও তাহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু এখনই সে দেশে ফিরিতে পারিতেছে না। পরীক্ষার সময় নিকট, পরীক্ষাটা দিয়া পাশ না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ তাহার পক্ষে হইবে না। সম্প্রতি সে ওখানে বিবাহ করিতেছে, তাহার শ্বশুর মিষ্টার সরকার স্ত্রী রেজিনাকে লইয়া আগামী মেলেই রওনা হইতেছেন। তাঁহারা গিয়া মীনার ভার গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে যাহা কর্তব্য হয়, আফিসে সে তার করিলে, আফিসের লোকেরাই সব করিবে।

"কে ইনি মীনা? এই মিষ্টার সরকার?"

"জানি না।"

"মেয়েটির নাম লিখেছে রেজিনা—"

"হাঁ।"

"ওর মা কি ওখানকার কোনও মেম?"

"হবেও বা। কিছুই জানি না। তবে ওরকম নাম এদেশের লোকেও কেউ কেউ রাখে।"

"তা বিয়ে হল বিলেতে?"

"সে অনেক এমন হয়। পরিবার নিয়ে অনেকে বিলেতে যায়। ওখানে ছেলে বাবা পড়ে কি কাজ-কর্ম্ম করে; ভাবসাব হলে কেউ কেউ মেয়ের বিয়েও দেয়।"

"তা তোর বাবাকে একটিবার জানালেও না কিছু?"

"জানান অন্ততঃ উচিত ছিল। তবে দরকার মনে করে নি, জানায় নি। কি করব?—বাবাও বলতেন, ভালবাসা, বিয়ে এসব বিষয়ে ছেলে-মেয়েরা স্বাধীন ভাবেই চ'লতে পারে।"

গভীর একটা নিশ্বাস বিন্দু ছাড়িল। মীনা কহিল, "তবে আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আগে এসব কথা বড় ভাবি নি। এবার ভাবতে শিখেছি; কিন্তু বড় অসময়ে।"

"অসময়ে নয় মীনা, এসব ভাব্‌বার, ভেবে চলবার সময়ই তোর এই।"

"চলবার পথ যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি বিন্দু।"

"যিনি ভাবিয়েছেন, পথও তিনি দেখাবেন।"

"কে তিনি বিন্দু! কোথায় আছেন? হাঁ, ছুদিন ধ'রে মনে মনে কত ডাকছি! কেঁদে কেঁদে কত ডাকলাম। কিন্তু, কৈ, সাড়া ত কিছুই পেলাম না!" বিন্দুর গলাটি ধরিয়া কাঁদিয়া মীনা তার বুকে মুখখানি রাখিল।

বুকে মীনাকে চাপিয়া ধরিয়া বিন্দু বলিল, "ডাক্, এম্‌নি ক'রে আকুল প্রাণে ডাক্, সাড়া পাবি! দয়াময় তিনি, দয়া কর'বেন, পথও দেখাবেন।"

কাঁদিতে কাঁদিতে মীনা বলিল, "আগে বুঝিনি বিন্দু। শুনতাম, মনেও হত, এই পৃথিবীটা ছাড়া আর কিছুই নাই, সুখ যা কিছু এইখানেই আছে। আছে; কিন্তু তার মূল্য কি! সুখ ব'লে মানুষ যা আঁকড়ে ধ'রে থাকে, এম্‌নি ক'রে মুহূর্ত্তে তা ভেঙ্গে পড়ে! আশায় যা ধ'রতে চায়, নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ক'রে তা দূরে স'রে যায়, মরীচিকার মত শূন্যে মিলায়! মানুষের মিছে বড়াই! কি সে করতে পারে? কিছু না—কিছু না! কোন্‌টা সে ব'লতে পারে আমার, আমি গড়েছি, আমি ধরে রাখব, আমি চেয়েছি চাইতে পারি। পাব? জানি না, এ পৃথিবীর বাইরে কি আছে, উপরে কে আছেন। তবে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর সুখ যদি এমনই অসার হয়, আর জীবনটা সত্যই যদি বহন ক'রেই মানুষকে চলতে হয়, তবে তার সত্যিকার সুখের আশ্রয় সেই বাইরে—সেই উপরে যিনি আছেন তাঁতেই—বোধ হয় রয়েছে। নইলে এ জীবনটা কেবলই একটা দুঃখের ধারা—যত শীগ্‌গির শেষ হ'য়ে যায় ততই ভাল।"

"না না, তা নয় মীনা! তুই আমি হয়ত বুঝব না। তবে আমার দিদি, দেখেছি, এই পৃথিবীতে সুখের অবলম্বন সব হারিয়েও বাইরের সেই আশ্রয়কে ধ'রে, সেই মহাদেবের চরণে শরণ নিয়ে, বড় আনন্দে, বড় শান্তিতেই সে আছে।"

"তিনি ত বিধবা?"

"হাঁ। কিন্তু তবুও মনে করে বড় ভাগ্যবতী।"

"একটিবার বড় দেখতে ইচ্ছে হয় তাঁকে।"

"বেশ ত' যা কলকাতায়। একদিন নিয়ে যাব তাঁকে।"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া মীনা কহিল, "দাদা ত এলেন না, শীঘ্র আসবেনও না। ওঁরা শ্রাদ্ধের কথা কি ব'লছিলেন, ব'লছিলেন আমাকেও কাল কি ক'রতে হবে।"

"হাঁ, হিন্দু মেয়েরা তিন রাত কেটে গেলে, চার দিনে একটা শ্রাদ্ধ করে ঠিক শ্রাদ্ধও নয়, ব্রাহ্মণকে একটা দানটান কিছু করে, যে যেমন পারে। নিয়মও তার একটা আছে। তা তোরা ত' ঠিক হিন্দু নস্।"

"কিছুই নই আমরা। তবে ওঁরা ধরে নিয়েছেন আমরা হিন্দু। যা ব'লছেন, তাই করছি, যা করাবেন তাই ক'রব। কেন ক'রব না? সত্যি যদি দেহের সঙ্গেই সব শেষ না হ'য়ে গিয়ে থাকে—হ'তে পারে বলেই আজ মনে হচ্ছে না বিন্দু—দেহটা ছেড়ে গেলেও আত্মায় বাবা জীবিত আছেন, বাইরের সেই অদৃশ্যলোকে। হয় ত তাঁর তৃপ্তি এতে হবে। কেন ক'রব না? তুই ত থাকবি?"

"থাকব।"

"বেশ। আমার ভাল লাগবে। হাজার হলেও ওঁরা অচেনা নতুন লোক। বন্দোবস্ত সব ওঁরাই ক'র দেবেন। কাছে তুই থাকবি।"

২১

পরদিন অনুতোষ আসিয়া পৌছিল। অনুতোষ বয়সে যুবা এবং দেখিলেই বেশ একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সপ্রতিভ এবং কর্ম্মঠ যুবা বলিয়া মনে হইবে। স্বভাবেও সে ছিল যারপরনাই সরল, অমায়িক, সদাশয় ও সদানন্দচিত্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পূর্ব্বে স্কুলে পড়িবার সময় মীনাকে সে পড়াইত। তখন এইসব গুণের পরিচয় পাইয়া এবং তাহাতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া মোকার্জ্জি সাহেব তাঁহার আফিসের কাজে তাহাকে গ্রহণ করেন। অল্প দিনেই যোগ্যতায় ও বিশ্বস্ত সেবায় তাঁহার প্রধান একজন কর্ম্মচারী হইয়া সে দাঁড়ায়। অনুতোষ আসিয়া পৌছিল এবং পরদিনই মীনাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।—অত ভাড়া দিয়া, এত লোকজন সহ ঐ বাড়ী এখন রাখা সম্ভব নয়, নিষ্প্রয়োজনও বটে। মোকার্জ্জি সাহেবের প্রধান সহকারী জানকীনাথ বাবু তাই স্থির করিয়াছিলেন, ধীরেশ যতদিন না ফিরিয়া আইসে, কোনও বাড়ীর অংশ অথবা একটা ফ্লাট্ ঐ পাড়াতেই কোথাও লইয়া মীনাকে তাহার পরিচারিকা, একটি পরিচারক ও একটি পাচক সহ রাখিয়া দিবেন এবং তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া আসিয়া তাহার সঙ্গে থাকিবেন।—কিন্তু ধীরেশের টেলিগ্রাম যখন আসিল, মনে হইল আপাততঃ এরূপ একটা পরিবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে ঠিক হইবে না। ধীরেশের স্ত্রী আসিতেছে, সেই এখন পরিবারের কর্ত্রী। কর্ত্রী কেবল নহে, ধীরেশ যত দিন না ফেরে, সে অথবা তাহার পিতা কর্ত্তাও বটে, কেবল পরিবারের নহে, অফিসেরও। তাঁহারা আসিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা যাহা হয় করিয়া লইবেন। তিনি মাত্র জানাইতে পারেন ব্যবসায়ের আয় এখন কত হইতে পারে এবং তাহা হইতে কত টাকা মাসে তাঁহারা খরচপত্রের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন। ধীরেশকে মাসে যাহা পাঠাইতেই হইবে, তাহার উপরে যাহা বাঁচিবে—খুব বেশীও বাঁচিবে বলিয়া মনে হয় না—তাহাই মাত্র তাঁহাদের সম্বল—যদি ব্যবসায়টা নূতন এই কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিয়া তাঁহারা চালাইতে পাবেন। সেই সম্বলে যেরূপ সম্ভব হয় ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের বলিবার কিছুই নাই। এক মীনা। কিন্তু মীনার তাঁহারা কি করিতে পারেন? তাহার সম্বন্ধে বলিতেই বা কি পারেন? মোকার্জ্জি সাহেবের এই ব্যবসায়ের, এবং কোনও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়া থাকিলে তাহারও, উত্তরাধিকারী এখন ধীরেশ; মীনার অভিভাবক এখন ধীরেশ, ধীরেশের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার পত্নী এই বেজিনা মোকার্জ্জি। কন্যার জন্য পিতা বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন কি না, কিছুই তাঁহারা জানেন না। করিয়া যদি না গিয়া থাকেন, মীনাকেও সম্পূর্ণ-রূপে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর উপরে নির্ভর করিতে হইবে। এই নির্ভরতা তাহার সুখের হউক, এইমাত্র কামনা তাঁহারা করিতে পারেন।

যাহা হউক, পিতার গৃহেই আপাতত মীনাকে তাঁহারা রাখিলেন এবং জানকীনাথ বাবুর ভ্রাতৃবধূই আসিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন।

ধীরেশের শ্বশুর মিষ্টার কে. সরকার (কান্তিলাল সরকার) যুক্তপ্রদেশে বড় কোনও সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলেই পুরা সাহেবী কায়দায় জীবন কাটাইয়াছেন, বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ বড় কিছু ছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে কখনও একা কখনও বা সপরিবারে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিতেন। বাল্য বয়সের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের এবং ঐরূপ আত্মীয়-স্বজন দুই একজনের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ তখন কিছু হইত। অবসর গ্রহণের পর স্ত্রী ও কন্যা বেজিনাকে লইয়া তিনি ইয়োরোপ-ভ্রমণে বাহির হন, অনেকেই অধুনা এইরূপ হইয়া থাকেন। পয়সা থাকিলে কেনই বা না হইবেন? ও-দেশের আবহাওয়ায় দেহের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, উন্নত সব সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে মতি-গতি উচ্চতর একটা আদর্শের প্রেরণা পায়, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা মানসিক পুষ্টির বহু খোরাক যোগায়, মনোভূমিকে উদার ও প্রসারিত করিয়া দেয়। আরও কত সুখ-সুবিধা আসিয়া জোটে। সাধ্যায়ত্ত হইলে এরূপ সুযোগ কে ছাড়ে? অর্থবল থাকিলে তাহার সার্থকতা ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে?

অন্যান্য দেশে কিছুদিন ঘুরিয়া সরকার সাহেব ইংলণ্ডে গিয়া কিছুদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ধীরেশের

সঙ্গে তখন তাঁহার পরিচয় হয়। ধীরেশকে তাঁহার বড় ভাল লাগিল। কুশল অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, ধীরেশের পিতা কলিকাতার বিশিষ্ট একজন হিসাব-ব্যবসায়ী এবং ঐ বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী। ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন তিনি করেন, উঁচু কায়দায় সাহেব-পাড়ায় থাকেন এবং কলিকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বেশ একটা মর্য্যাদাও তাঁহার আছে। পুত্রকে হিসাব-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন, দরাজ হাতে খরচ-পত্রও তাহাকে পাঠান। শেষ পরীক্ষা নিকট, পাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া পিতার সহযোগী হইয়া বসিবে, যথা সময়ে তাঁহার ব্যবসায় সে উত্তরাধিকার লাভ করিবে। খাসা একটা catch (পাকড়াই মাল) বটে, পাকড়াইতে পারিলে রেজিনার ভবিষ্যৎ একদম উজ্জ্বল। তাঁহাদেরও কলিকাতায় খাসা একটা আস্তানা হয়। নামটা যেমনই হউক, রূপে গুণে আকর্ষণী শক্তি নামানুরূপ তেমন কিছু রেজিনার আছে, পিতা-মাতা হইয়াও এমন কথা তাঁহারা বলিতে পারিবেন না।

আর্থিক আকর্ষণও এমন বেশী কিছু তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই, যাহাতে বিলাতপ্রত্যাগত পদস্থ কোনও যুবা সহজে আসিয়া ধরা দিবে। কন্যার বয়সও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চেহারায় ও ব্যবহারে কেমন একটা রুক্ষতা দেখা যাইতেছে। বিবাহ সম্বন্ধে কেমন একটা নিরাশার ভাবই যেমন তাঁহাদের তেমন রেজিনার নিজের চিত্তেও জাগিয়া উঠিতেছিল। রেজিনার দৈহিক ও মানসিক রুক্ষতা যেন ইহাতে বাড়িয়াই উঠিতেছিল। দেশে আর বিবাহের সুবিধা হইতেছিল না। তবে ইউরোপে, বিশেষ বৃটিশ দ্বীপে, বাঙ্গালী ছেলে অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালী কন্যা অতি কম। দুই চারিটি কচিৎ কখনও যাহারা যায়, প্রবাসী এই যুবকগণের বিশেষ একটা আকর্ষণের বস্তু তাহারা হইতে পারে। আবার নূতন আবহাওয়ায় নূতন সব আবেষ্টনীর মধ্যে প্রমোদ-ভ্রমণে রেজিনার যে সব ত্রুটি আছে ও আরও দেখা দিতেছে, তাহা হয়ত কিছু চাপা পড়িয়া যাইবে অথবা চোখেও তেমন হয়ত সকলের পড়িবে না। কে জানে হয়ত একটি সুপাত্র লাভ ঘটিয়াও যাইতে পারে। রেজিনাকে লইয়া যে তাঁহারা ইউরোপে যান, ইহাও তাহার গূঢ় একটি লক্ষ্য ছিল। ধীরেশকে দেখিয়া এবং আলাপে ও অনুসন্ধানে তাহার পরিচয় সব পাইয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে হইল, হাঁ, আশার অতিরিক্ত অতি খাসা একটি catch ই বটে এই যুবা!—যাওয়া আসা করিত খুব; মনে হইত রেজিনার প্রতি বেশ একটু আকৃষ্টও যেন হইয়া উঠিতেছে। জাল তাঁহারা ফেলিলেন; জালে ধীরেশ বাঁধা পড়িল। বাঁধা যখন পড়িল, আর ছাড়া হইতে পারে না, ছাড়িয়া যাইবার অবকাশও আর দেওয়া যায় না। আলাপে বুঝিলেন, ধীরেশের পিতা অতি উদার মতাবলম্বী এবং পুত্র-কন্যাদের প্রেম-বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

ধর্ম্ম কি ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির গুরুত্ব কিছু মানেন না। বিবাহে তাঁহার অনুমোদনের প্রয়োজন কিছু আছে, তাহাও ধীরেশ মনে করে না। কোনও রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়া অনায়াসে বিবাহ সে করিতে পারে। তার পর যখন হয় পিতাকে সংবাদটা জানাইলেই হইবে। অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, আনন্দে তিনি তাহাদের অভিনন্দনই তখন করিবেন। যার পর নাই প্রীত হইয়া সরকার সাহেব ব্যবস্থা সব করিয়া ফেলিলেন এবং ওখানেও যুবা-মহলে তেমন জানাজানি একটা হইবার আগেই রেজিনার সঙ্গে ধীরেশের বিবাহ হইয়া গেল। 'মধুমাসে'র মধুর ভ্রমণে ও মাধুরী উপভোগে ধীরেশ এতই মাতিয়া রহিল যে, পিতাকে সংবাদ দিবার একটা তাগিদও তাহার হইল না; কথাটা মনে কখনও উঠিলেও ভাবিত, তা দেওয়া যাইবে যখন হয়, এত তাড়া কি!

উড়ো ডাকে (air mail-এ) ধীরেশ মীনাকে ও আফিসের জানকীনাথ বাবুকে জানাইয়াছিল, তাহার শ্বশুর শাশুড়ী মিষ্টার ও মিসেস সরকার তাহার স্ত্রীকে লইয়া রওনা হইয়া গেলেন। অমুক তারিখে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিবেন। সে যতদিন না ফিরিতে পারে, উঁহারাই রেজিনাকে ও মীনাকে লইয়া কলিকাতায় থাকিতে সম্মত হইয়াছেন। পিতার অভাবে বৈষয়িক যে সব দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাহার উপরে আসিয়া পড়িল, রেজিনা ও তাহার অভিভাবক-স্বরূপ মিষ্টার সরকারই সব পালন করিবেন। জানকীনাথ বাবু যথা-প্রয়োজন সাহায্য তাঁহাকে করিবেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা যাহা করিতে হয়, আফিস হইতে করিয়া দিবেন।

যথা সময়ে ইঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন। অনুতোষ ষ্টেশনে গিয়া ইঁহাদের লইয়া আসিল। মীনা বালিকা মাত্র,

তাহাতে আবার মনভাঙ্গা। জানকীনাথ বাবু নিজে আসিয়া বাড়ীতে ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মীনার সঙ্গেও প্রথম পরিচয় এবং যথারীতি সম্ভাষণ ও প্রীতি-সম্ভাষণ ইঁহাদের হইয়া গেল।

মীনা মনভাঙ্গাই ছিল, আজ যেন আরও মনভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সেই পিতা, আর আজ তাঁহার অভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত এ কাহারা তাহার পিতৃগৃহের কর্তৃত্ব ও তাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিবে! এ অবস্থায় মনটা যে তার আশাহীন অতি গভীর একটা বিষাদ-ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িবে, আর বেশ হাসি-খুশী ভাবে ইঁহাদের এই আগমনকে অভিনন্দন সে করিতে পারিবে না, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জানকীনাথ বাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন, পিতৃহীন এবং একান্ত ভাবে আশ্রয়াধীনা এই বালিকার প্রতি তেমন একটা স্নেহের কি সহানুভূতির সাড়া ইঁহাদেরও ব্যবহারে কি কথায়-বার্ত্তায় ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল না। মনে হইল, তেমন সুনজরেও যেন মীনাকে ইঁহারা দেখিলেন না। কথাটা সত্য, সত্যই সুনজরে মীনাকে ইঁহারা দেখিলেন না। মৌখিক একটু মিষ্ট হাসি ও শিষ্ট আপ্যায়নের মধ্যে দৃষ্টির এই চাপা অপ্রসন্নতা জানকীনাথ বাবু কি অনুতোষ কি পুরাতন পরিচারক দুই একজন যাহারা উপস্থিত ছিল, কাহারও চক্ষু এড়াইল না। চাপা একটি নিশ্বাস সকলেরই বুক ভরিয়া উঠিল। মীনার চক্ষু দুটি ফাটিয়াও অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল; একটু কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া নতশিরে নমস্কার জানাইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কন্যার নূতন এই সংসারে মীনার অস্তিত্বটাই তাঁহাদের বড় ভাল লাগে নাই। একটা দায় ত' বটে। কি ভাবে এই দায়টা তাঁহারা বহন করিতে পারেন, কতটা সুখের সেটা হইবে, তাঁহাদের স্বচ্ছন্দতা কতটা তাহার উপস্থিতিতে চলিতে পারে ইত্যাদি অনেক আলোচনাও তাঁহারা করিয়াছেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, মীনা অতি সুন্দরী, সঙ্গীতাদি বিদ্যায় অতি পারদর্শিনী বলিয়াও শুনিয়াছিলেন। এখন এই গৃহে মীনা যে রেজিনাকে একেবারে আঁধারে ফেলিয়া রাখিবে! গৃহে কি বাহিরে সামাজিক সম্মেলনে মীনার দিকেই লোকে বেশী চাহিবে, অনেক বেশী আদর তাকে করিবে; গৃহের কর্ত্রী রেজিনা থাকিবে যেন কোণঠাসা হইয়া! সুতরাং ইহা সম্ভব নয় যে, সুনজরে তাঁহার মীনাকে দেখিবেন।

জানকীনাথ বাবু কহিলেন, "এবার মেলে ধীরেশের চিঠি পেয়েছি। আজ বড় হয়রান আছেন, সুবিধা বোধ হয় হবে না। কাল দুপুরে একবার আফিসে যাবেন। অনুতোষ এসে নিয়ে যাবে। হিসাবপত্র আর বর্ত্তমান অবস্থায় কাজকর্ম্ম কি ভাবে চ'লতে পারে, আয়-ব্যয়ের কি বরাদ্দ হ'তে পারে সব আপনাকে বুঝিয়ে দেব। তাঁর personal assets, liabilities (ব্যক্তিগত পাওনা-দেনা) কি আছে তাও সব আপনাকে দেখিয়ে দেব, অবিশ্যি আমরা যতদূর জ্ঞাত আছি। বাড়ীতে তাঁর দেরাজ টেরাজ সব 'সীল' করা আছে। আপনাদের সামনে সব খুলে দেখতে হবে যদি উইল-টুইল আর অন্য জরুরী কাগজপত্র কিছু থাকে। রেজেষ্ট্রী করা উইল কিছু নাই, খবর আমরা নিয়েছি। ও বেলা আমি আসব। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত আজকার মত সব ক'রে রাখা হ'য়েছে। তা হ'লে আমরা আজ এখন বিদায় হ'তে পারি।"

সরকার সাহেব কহিলেন, "আজ্ঞে, কি আর ব'লতে পারি? এখন আসতে পারেন বই কি ক্লেশ যথেষ্ট ক'রলেন আমাদের সুবিধার জন্যে। আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের জানবেন।"

করজোড়ে জানকীনাথ বাবু কহিলেন, "আজ্ঞে ও সব আর কেন ব'লছেন। আপনারা এসেছেন, ওঁর অভাবে এ সব ত আপনাদেরই এখন দেখতে হবে। এখন এদিক্‌কার ভার-টার সব আপনার হাতে বুঝিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

হাসিয়া সরকার সাহেব কহিলেন, "ভার সব আসলে আপনাদেরই হাতে আছে, আপনাদেরই হাতে রাখতে হবে। তবে কি না ধীরেশ যদ্দিন না ফিরতে পারে, সংসারটার দায় আমাকেই মাথায় রাখতে হবে। ওঁর মেয়েটিও দেখছি নিতান্ত বালিকা। রেজিনাও নতুন এই জায়গায় এসে আমাদের উপদেশ ছাড়া একা এই সংসারটা চালাতে এক্ষুণি পারবে না। আচ্ছা আসুন তবে, নমস্কার!"

জানকীনাথ বাবু অনুতোষকে লইয়া বিদায় হইয়া গেলেন। বাড়ীটা তখন ইহাঁরা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। বাঃ! খাসা বাড়ী! আর বেশ আপ-টু-ডেট কায়দায় চমৎকার সাজানও বটে! বেশ আরামেই এখানে থাকা যাইবে। ধীরেশ ফিরিয়া আসিলেও, এত বড় বাড়ীতে তাঁহারাই বা কেন না থাকিতে পারিবেন? তবে ঐ মেয়েটি—কিছু অসুবিধা তাহাকে লইয়া হইবে। কলেজে ত' পড়ে, হোষ্টেলেও বোধ হয় রাখা যাইতে পারে। দেখা যাক্‌ কি হয়? অবস্থা বুঝিয়া যাহা দরকার করা যাইবে। রেজিনাই এখন কর্ত্রী। সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া সংসারের ব্যবস্থা সে যাহা করিবে, ধীরেশকে তাহা মানিয়া চলিতেই হইবে।

[ক্রমশঃ

সুইডেনের স্মৃতি

—শ্রীমতিলাল দাশ

য়ুরোপের উত্তরাপথ নরওয়ে ও সুইডেন—তুষার-মৌলি গিরি, বনস্পতি-শ্যামল অধিত্যকা ও উপত্যকা দেশটিকে প্রকৃতির বিলাস-ভবন করিয়াছে। অস্‌লো হইতে ট্রেন চলিল।

বিচিত্র, বিবিধ দৃশ্যরাজি যেন কোনও মায়াবীর চিত্র-গৃহে প্রদর্শিত হইতেছে, জনপদ-বিরল পথে মন পাইন-গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রীতি-ভরা মানুষের গেহ সন্ধান করে। তুষারের শোভা চোখে নূতন ও মনোহরণ লাগে।

দুপুরের খাওয়া রেস্তরাঁয় হইল। একজন নাবিকের সহিত আলাপ হইল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী জানে—তাহাতে আলাপ চলে না। অস্‌লো ও ষ্টকহলম প্রায় বার ঘণ্টার পথ। ভাবিয়াছিলাম, রাত্রিতে পাড়ি দিব, সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। নহিলে প্রকৃতির এই মূর্ত্তি দেখা ঘটিত না।

গাড়ী যখন ছাড়ে তখন দেখি মুক্তাবিন্দুর মত শিশিরকণা জমির ধানে ও গাছের পাতায় নূতন রূপ দিয়াছে। খানিক পরে দেখি, জলরেখা রূপালি রেখায় পরিণত হইয়াছে, যতই চলি ততই তুষারের দিব্যসুন্দর খেলা।

এ শোভা কখনও দেখি নাই, তাই চোখে দিল যেন নূতন যাদু। দিগন্তে ধূসর আকাশ—সরল বনের সবুজ পাতায় সাদার বাহার দীর্ঘ জলাশয়ের সাদা বুক, সকলে মিলিয়া মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিল।

ট্রেনের কণ্ডাক্টার খুব ভাল লোক। আমাকে যথা-সাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিল—কখন কোথায় গাড়ী থামিবে, কয় মিনিট থামিবে, সকল খুঁটিনাটি মাঝে মাঝে আসিয়া আমাকে বলিতেছিল।

গাড়ী চলিল, সঙ্গে চলিল বন ও কান্তার, নদ ও নদী, তড়াগ ও হ্রদ, প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দেখি, মানুষের হস্তস্পর্শ—তার আবাস, তার কাঠের বাড়ী, সকলে মিলিয়া আনিতেছিল নূতনত্বের মধু, অপূর্ব্বতার আস্বাদ।

যতই চলি ততই দেখি, তুষারের বিচিত্র লীলা। বৃষ্টির মত তুষার পড়িল। জমাট হইয়া ঘর-বাড়ী ছাইয়া ফেলিল, মাঠ ঘাট ভরিয়া গেল, সে অদ্ভুত ব্যাপার; আশ্চর্য্য ছবি।

ষ্টকহল্‌ম: পার্ক।

উঠিলাম পার্ক হোটেলে—বেশ সুন্দর হোটেল। বাড়ীতে এই হোটেল হইতে চিঠি দিলাম। সে চিঠির কিয়দংশ তুলিতেছি "পার্ক হোটেল মন্দ নয়, রোজ খরচ লাগবে আট নয় টাকা। নরোয়ে ও সুইডেনের লোক বেশ ধনী, এখানে খরচ একটু বেশী পড়ে, তার উপায় নাই। তবে এ দেশের ব্যবহারে একটু মধুরত্ব আছে, অবশ্য

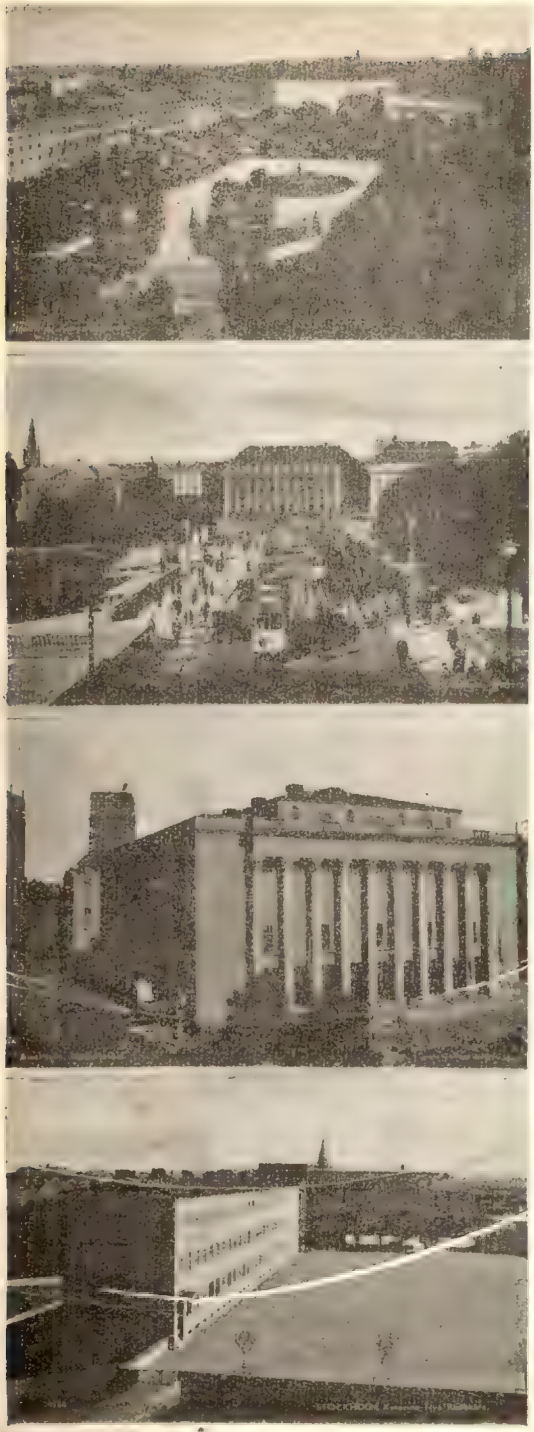

ষ্টকহলম :—বিভিন্ন দৃশ্য। উপর হইতে নিম্নে সকল চিত্র লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে কি ভাব স্থাপত্যের প্রাচীন ভাবধারা হইতে আধুনিক ভাবধারার ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে।

পয়সার জন্যই সব, তবু তাহারই মধ্যে একটু দরদ দেখি।

বিদেশীকে ইহারা কেবল ডাকিতেছে, বিদেশীর আগমনে যথেষ্ট আয় হইতেছে, তাই বিদেশীর মন ভুলাইতে আপ্রাণ চেষ্টা।

ভারতবর্ষে এই ধরণের চেষ্টা হওয়া মন্দ নয়, তবে আমাদের জীবনের ধারার সঙ্গে ইহাদের জীবন-ধারায় অনেক তফাৎ। তাহাদের জন্য পশ্চিমাদের একটু অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সেটা বাধা হইবে না, বৈচিত্র্যই উহাদের ডাকিবে।

পৌঁছিয়া হোটেল হইতে P. E. N. ক্লাবের সম্পাদক কার্ল বিয়র্কম্যানের খবর টেলিফোনে লইলাম। তাঁর স্ত্রী ফোনের উত্তর দিলেন, পরদিন পুনরায় ফোন করিতে বলিলেন।

সকালে উঠিয়া ডাক-ঘরে চলিলাম। বাড়ীতে চিঠি দিয়া রাজোদ্যান হইয়া রাজবাড়ী দেখিতে চলিলাম। ইতালীয় রেনেসাঁস যুগের স্থাপত্য-রীতিতে রাজা দ্বাদশ চালর্স এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সুইডেনের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলয়।

বাল্টিক সাগরের একটি শাখা মালার হ্রদে পরিণত হইয়াছে। এই মালার হ্রদের মাঝখানে বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া ষ্টকহলম নির্ম্মিত। এই জন্য ইহাকে মালার-রাণী বলে। কেহ কেহ ইহাকে উত্তরের ভিনিস বলেন। রাজপ্রসাদ দেখিয়া ইহাদের পার্লামেণ্ট ভবন দেখিলাম।

তারপর রাজকীয় অপেরা ভবন দেখিয়া ইহাদের জাতীয় যাদুঘরে আসিলাম। তারপর ইহাদের বিচারালয়গুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। তারপর Nordske Museum, Biological Museum এবং Open Air Museum দেখিয়া ইহাদের প্রধান পাঠাগার দেখিলাম।

হোটেলে ফিরিলে সংবাদ পাইলাম যে, সন্ধ্যা ছয়টায় ডিনারের নিমন্ত্রণ। লেখক-সংঘ এই ভোজ দিবেন। পরক্ষণে হোটেলের লোক বলিল যে, আজ নয়, কাল। সন্ধ্যায় আহার আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় পেন ক্লাবের সভ্য থুজিলন আসিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী এক সঙ্গে আহার করিলেন।

একজন সাংবাদিকও আসিলেন। তিনি আমার সঙ্গে খানিক আলাপ করিলেন। আমার কাছে বাণী চাহিলেন, আমি ক্ষুদ্র লোক বাণী দিবার দুঃসাহস আমার নাই। তবে সংবাদপত্রের লোক কৌশলী, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার মতামত খানিকটা টুকিয়া লইলেন। আমার একটি ছবিও তুলিলেন।

বলিলেন, পরদিনের কাগজে এই সংলাপ বাহির হইবে এবং আমাকে উহা পাঠাইয়া দিবেন। আমি আমার

বার্লিনের ঠিকানা দিয়া সেখানে পাঠাইতে বলিয়াছিলাম। পাই নাই, হয় সম্পাদক আমাদের কথোপকথনকে মূল্যহীন মনে করিয়াছিলেন, না হয়, সাংবাদিক বন্ধু তাঁর কর্ত্তব্য করেন নাই।

যাহা বলিয়াছিলাম তাহার সারার্থ—ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামেও সে আত্মিক বলের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। অহিংসার জয় বিশ্বজগতের দৃষ্টিভঙ্গীকে নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত করিবে এবং মানুষের ভবিষ্যৎ হিংসা-জর্জ্জর না হইয়া শান্তির অমৃতসিক্ত হইবে।

থুজিলন ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার অনুলিপি নাই। আমি বেশী দিন সুইডেনে থাকিতে পারিব না জানিয়া উহাঁরা দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, বিয়র্কম্যান ফিরিলে উঁহারা আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেন। পুনরায় সুইডেনে ফিরিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাঁদের নিকট গল্প শুনিলাম—এখানকার পাহাড়ে একজন বাঙ্গালী সাধু থাকেন। তিনি যখন কিছু খাদ্য পান খান, নচেৎ উপবাস করিয়া থাকেন। এই বাঙ্গালী যোগীর সন্ধান করিবার কৌতূহল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সময় ছিল না।

আহারাদি শেষে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বিদায় লইলেন। আমি নিকটবর্ত্তী একটি থিয়েটারে ইবসেনের নাটক পুতুল-ঘর (Doll's House) দেখিতে গেলাম। এই নাটকটি য়ুরোপীয় সাহিত্যে যুগান্তর আনে।

স্বামীর গৃহই নারীর একমাত্র আশ্রয়, পতিপূজাই নারীর একমাত্র ধর্ম্ম। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় সমাজ-নীতির ইহাই ছিল মূলমন্ত্র। পুতুল-ঘরের নায়িকা নোরা একদিন বুঝিল স্বামীর গৃহে তাহার জীবনে পুতুল-ঘরের খেলার মত নিরর্থক। আত্ম-বিকাশই নারীর কাম্য।

ই বসেনের য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই মতবাদের ভিত্তিতে সাহিত্যে ও সমাজে নানা বিপ্লব আনিয়াছে। সেই ভাবধারা আমাদের জীবনের তীরেও তরঙ্গাঘাত করিয়া বিপ্লব বাধাইয়াছে।

ভাষা জানি না বলিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না—পাশের একটী ভদ্রলোক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলিতে পারেন। তিনি অল্প কিছু কিছু বুঝাইয়া দেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া Ridderholen ও Kyrkan দেখিতে গেলাম। ইহা রাজকীয় সমাধি-মন্দির। লণ্ডনের যেমন ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবি—ইহাও তেমনই। ইহার ভিতর রাজাদের স্মৃতি-চিহ্ন এবং মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রভৃতি আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বন্ধ থাকায় দেখিতে পাইলাম না।

তারপর Nobility House দেখিতে গেলাম—তাহাও

ষ্টকহলম: বিভিন্ন দৃশ্য। প্রভাতের শান্ত নগরোদ্যান শোভা হইতে মধ্য-দিবসের কর্ম্মব্যস্ত ও কর্ম্মক্লান্ত এবং মধ্যরাত্রের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য-সমাবেশ।

বন্ধ থাকায় কুকের আফিসে গিয়া বার্লিনের প্লান নিলাম। তারপর ট্রামে করিয়া সহরটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম।

পরে রেলওয়ে মিউজিয়াম দেখিলাম। কেমন করিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হয়—দুরারোহ পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা গড়া হয়, নক্সা ও মূর্ত্তি করিয়া তাহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝাইয়া দেওয়া আছে। টানেলের নির্ম্মাণ-প্রণালীও বেশ চমৎকার ভাবে দেখান হইয়াছে।

বরফ-আবৃত পথে কেমন করিয়া গাড়ী চলিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহাও সংক্ষেপে দেখানো হইয়াছে। মোটের উপর ব্যাপারটী বেশ শিক্ষাপ্রদ মনে হইল। উহাদের

ষ্টকহলম: নিসর্গ।

একজন অধ্যক্ষ অনেকগুলি বিষয় আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া হোটেলে আসিলাম। খাওয়ার পরে ট্রেণ ধরিতে চলিলাম। আধুনিক হর্ম্মাদির মধ্যে ষ্টকহলমের পৌরভবন বেশ সুন্দর লাগিয়াছিল। ইহা মাত্র ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। ইহার অত্যুচ্চ চূড়ায় সুইডেনের রাজদণ্ডের প্রতীক তিনটী মুকুটের গাঁথুনি আছে।

ষ্টকহলম বেশ চমৎকার নগর। পত্রবহুল বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় ইহার রথ্যা এবং বাসভবন সুরঞ্জিত—নদী ও তড়াগের নীল জলধারার মাঝে ভবনগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক।

ষ্টেশনে আসিয়া যে গাড়ীতে উঠিলে পরিবর্ত্তন না করিয়া সমুদ্রতীরে পৌছিতে পারিতাম, ভিড় দেখিয়া সেখানে উঠিলাম না। কাজেই মাঝপথে গাড়ী বদল করিতে হইল।

ট্রায়লবার্গে sleeper টিকিট কিনি নাই বলিয়া নামিয়া জাহাজে উঠিতে হইল। গাড়ীগুলি পাটির উপর দিয়া একেবারে জাহাজে তোলা হয়।

শেষরাত্রি, ঘুমে চোখ কাতর। কাজেই এক ক্রোণার দিয়া ক্যাবিনে ঘুমাইলাম। অনেক সহযাত্রী ঘুমাইল—অন্য সকলে পয়সা দিল বলিয়া মনে হইল না। হয়ত বক্‌সিসকে ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া আমার নিকট আদায় করিয়া নিল।

সুইডেন নরোয়ের মত পর্ব্বত-বন্ধুর নহে। আসিবার পথে ইহার উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র নয়নানন্দকর ছবি মেলিয়াছে দেখিলাম। নদী-গুলি প্রশস্ত—সমুদ্রে পড়িবার মুখে তাহারা বৃহৎ হ্রদে পরিণত হইয়াছে। সুইড জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী এবং কাঠুরিয়া। নোবেল প্রাইজ দাতা আলফ্রেড নোবেলের জন্মভূমি বলিয়া সুইডেনকে আমাদের বিশেষ মনে রাখিবার কথা।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ব্যাপী কীর্ত্তি প্রচারের মূলে নোবেল পুরস্কার। সেইজন্য সুইডেনের সহিত আমাদের হৃদ্যতার সম্বন্ধ রহিয়াছে। নোবেল স্থপতি-বিদ্যাবিশারদ রাসায়নিক ছিলেন। মারণাস্ত্র ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু সঞ্চিত বিত্ত তিনি মানব-সেবায় দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বৃত্তি নানা দেশের নানা জাতির মনীষীদিগকে উৎসাহ দিয়া বিশ্বপ্রীতির উদ্বোধনে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। সুইডেনে তাই তীর্থযাত্রীর মত ভক্তিমান চিত্তে গমন করা উচিত।

আশা ছিল, আরও কয়েক দিন থাকিয়া এই নিসর্গ-নিকেতনের অলৌকিক সৌন্দর্য্যোপভোগ করিয়া যাই, কিন্তু নির্দ্ধারিত সূচীর তাড়না সে শুভ ইচ্ছাকে সফল করিতে দেয় নাই। অতিথি-বৎসল সুইডদের দেশে আমাদের দেশের প্রত্যেক য়ুরোপযাত্রী যেন কয়েকদিন অবস্থান করেন, এই অনুরোধ করি।

সুবোধ মাষ্টার

—শ্রীঅমলা দেবী

ভাঙ্গা পেটাঘড়িতে ঝন্ ঝন্ করিয়া ছুটীর ঘণ্টা বাজিবামাত্র বদনগঞ্জ হাইস্কুলের ছেলেরা এক সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন পথে গৃহে ফিরিতে লাগিল। শিক্ষকেরাও একে একে প্রস্থান করিল। কেবল তৃতীয় শিক্ষক শশধর পান কাঁধে ছাতা ফেলিয়া স্কুলের সাম্‌নে বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সহকারী প্রধান শিক্ষক সুবোধ বোস হাতে মুখে খড়ি মাখিয়া, জামার হাতায় মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া বলিল—"দেরী হয়ে গেছে, না? চলুন—।"

দুইজন স্কুলের সামনে কাঁচা-রাস্তা দিয়া পাশা-পাশি ক্লান্ত-পদে বাড়ীর দিকে চলিল। শশধর এই গ্রামেরই লোক। সুবোধের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার কোনও এক পল্লীগ্রামে। এইখানে আসার পরই ইহাদের প্রথম পরিচয়। বৎসর তিন ধরিয়া একই স্কুলে কাজ করিয়া, একসঙ্গে স্কুলে আসিয়া ও বাড়ী ফিরিয়া এবং একই গ্রামে কাছাকাছি বাস করিয়া এই পরিচয় ক্রমে গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শশধর কহিল, "শুনেছেন খবর?" সুবোধ জিজ্ঞাসু মুখে শশধরের মুখের দিকে তাকাইল। শশধর কহিল, "একজন নূতন লোক নেওয়া হচ্ছে যে—" সুবোধ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "নূতন লোক! কেন?" শশধর কহিল, "কি জানি" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "সেক্রেটারীর গুরুপুত্তুর, এ-বছর বি. এস-সি. পাশ করেছে; তাঁরই শুভাগমন হচ্ছে শুনছি—" সুবোধ কহিল, "শুভাগমন তো হচ্ছে, মাসিকী জুটবে কেমন করে?"

শশধর শুষ্ক মুখে কহিল, "আমার চাকরীটী যাবে আর কি—।"

সুবোধ কহিল, "পাগল না কি!"

শশধর কহিল, "পাগল নয়, সত্যি! সেক্রেটারীর নাতিকে পড়াইও না, হেড্‌মাষ্টারের কীর্ত্তনের আসরে দোহারীগিরিও করি না। তা ছাড়া কে হেড্‌মাষ্টারকে বলেছে যে, আমি মুরগী খাই—।"

সুবোধ হাসিল।

শশধর করুণ-স্বরে কহিল, "হাসছেন? কিন্তু ওতেই আমার সর্ব্বনাশ হবে। হেডমাষ্টার তো আজকাল ভাল করে কথাই বলে না, কাছে গেলে নাকে কাপড় দেয়, আমাকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না, বলে মনে হচ্ছে—।"

তার পর দুইজন নিঃশব্দে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সুবোধ কহিল, "আমাদের কেউ যদি অন্যত্র চলে যায়, তা'হলে তো আপনার ভয় থাক্‌বে না?"

শশধর কহিল, "কে আর যাচ্ছে বলুন?"

ঈষৎ হাসিয়া সুবোধ কহিল, "ধরুন, আমি—।"

সন্দিগ্ধ স্বরে শশধর কহিল, "সত্যি না কি?" সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না—না এমনি কথার কথা বলছিলাম—।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর সুবোধ স্বীকার করিল যে, সে বর্দ্ধমান স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করিয়াছে। তাহার এক আত্মীয় লিখিয়াছে, তাহার না কি কিঞ্চিৎ আশা আছে।

শশধর মুখ কালো করিয়া প্রশ্ন করিল, "কত মাইনে?"

সুবোধ কহিল, "একশ' টাকা—।"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া শশধর কহিল, "বলেন কি! একেবারে ডবল্!" টানিয়া টানিয়া হাসিয়া কহিল, "ভারী আনন্দ হচ্ছে শুনে—।"

সুবোধ বাধা দিয়া কহিল, "আগে হোক তার পর আনন্দ করবেন—।"

শশধর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হবে, নিশ্চয় হবে আপনার—।"

সুবোধ কহিল, "কাউকে বলবেন না কিন্তু—এমন কি বাড়ীতে পর্য্যন্ত না—।"

গম্ভীর হইয়া শশধর কহিল, "পাগল হয়েছেন? এখন আবার কাউকে বলে!"

দিন চার পরে। সকাল নয়টা। বাহিরের ঘরে বসিয়া সুবোধ সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা দেখিতেছিল, এমন সময়ে রাস্তা হইতে "নমস্কার" হাঁক শুনিয়া চাহিয়া দেখিল এক ভদ্রলোক দুই যুক্ত-হস্ত কপালে ঠেকাইয়া উর্দ্ধমুখে হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে। ভদ্রলোক এ তল্লাটে সকলেরই সু-পরিচিত—নাম কন্দর্প, লোকে নাম দিয়াছে কচ্ছপ, কারণ যাহাকে কামড়াইয়া ধরে কিছু একটা অঘটন না ঘটা পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। কন্দর্প করিত-কর্ম্মা ব্যক্তি, একাধারে কম্পাউণ্ডার ও ভারত-বন্ধু জীবন-বীমা কোম্পানীর দালাল। দেখিতে বেঁটে ও মোটা, গায়ের রং তামাটে, চৌকোনা মুখ—খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে একটী বড় "বাথস্পঞ্জ"-এর মত দেখাইতেছে, মাথায় ঢেউখেলানো তেড়ী।

আসিয়া হাজির হইতেই সুবোধ সভয়ে কহিল, "আসুন, বসুন—।" একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কন্দর্প কহিল, "মস্ত চাকরী বাগিয়েছেন শুনছি—সহরের স্কুলে—মোটা মাইনে—" সন্ত্রস্ত ভাবে সুবোধ কহিল, "কে বললে আপনাকে ?"

মুচকি হাসি হাসিয়া কন্দর্প কহিল, "কে আর বলবে? গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে, ছেলে-বুড়ো কারও জানতে বাকী নেই—।"

সুবোধ সভয়ে কহিল, "তাই না কি ?"

কন্দর্প ঘাড় হেলাইয়া দুই চক্ষু অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া মুখে এজেন্ট-সুলভ পেটেন্ট হাসি ফুটাইয়া যুক্ত-হস্তে কহিল, "আমারটা তা' হলে এবার হুকুম হোক—।"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া সুবোধ কহিল, "আপনার আবার কি ?"

স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়া কন্দর্প কহিল, "কেন? ভারত-বন্ধু কোম্পানীর পলিশিটা! কতবার এসেছি, প্রত্যেক বার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এবার আর সহজে উঠছি না—।"

সুবোধ কহিল, "পাগল হয়েছেন আপনি! খেতে পাইনে, দেনা করে সংসার চালাচ্ছি, আমি করব পলিশি!"

কন্দর্প ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "এখন আর ও সব বললে চলছে কই, মশাই! মোটা চাকরী বাগিয়েছেন; সহর যায়গা, টিউশানী করেও মাসে না হোক্ পঞ্চাশ টাকা রোজগার হবে।" হাত যোড় করিয়া কহিল, "দোহাই ধর্ম্ম! এবার ফেরাবেন না।"

সুবোধ কহিল, "কে যে এ কথা রটিয়েছে বুঝতে পারছিনে, কিন্তু সত্যি বলছি এ কথা মিথ্যে।" কন্দর্প ঘাড় বেঁকাইয়া দুই চক্ষের একাগ্র দৃষ্টি সুবোধের মুখে স্থাপিত করিয়া কহিল, "মশায়! সকাল বেলায় বামুনের ছেলেকে ধাপ্পা দিচ্ছেন! আপনি চাকরী পেয়েছেন, দু'চার দিনের মধ্যে রওয়ানা হচ্ছেন, এ খবর যদি গাঁয়ের একটা লোকেরও জানতে বাকী থাকে তো আমার কান মলে দেবেন" বলিয়া কানে হাত দিল।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া সুবোধ ভাবিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া কন্দর্প কহিল, "চমৎকার পোজ্ দিচ্ছেন কিন্তু! শিশিরও হার মেনে যায়। মাষ্টারী না করে থিয়েটারে এ্যাক্টো করলে ঢের বেশী নাম করতেন যে" ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "যাই করুন, আর যাই বলুন পলিসি না করিয়ে একটী পাও নড়ছিনে আজ।" হতবুদ্ধি ভাবে সুবোধ কহিল, "আপনি বিশ্বাস করুন।" বাধা দিয়া কন্দর্প কহিল, "কিছুতেই বিশ্বাস করব না; আপনি বাজে বকে মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। তার চেয়ে সব ঠিক করে এনেছি" বলিয়া পকেট হইতে এক গাদা কাগজপত্র বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একটা কাগজ লইয়া সুবোধের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "একটা সই করে দেন দেখি, এখনই সুড়সুড় করে সরে পড়ছি।"

হাতটা ঠেলিয়া দিয়া সুবোধ সকাতরে কহিল, "কি বিপদ দেখুন তো?" কাগজ খানা টেবিলে রাখিয়া, খাড়া হইয়া বসিয়া কন্দর্প বলিতে লাগিল "আপনার বিপদ কিসের মশায়! বিপদ আমার। মাসে পাঁচ টাকা মাইনে তাও আবার ডাক্তার বাবু দু'মাস উপুড়-হাত করেন নি। রুগী পত্তর নেই বললেই হয়। আজ দু মাস একটাও কেশ দিতে পারি নি বলে কোম্পানী কড়া তাড়া দিয়েছে। অনেক আশা করে এসেছি আজ, যদি ফিরিয়ে দেন তো সত্যি বলছি আপনার সামনে আজ ব্রহ্মহত্যা হবে" বলিয়া পকেটে হাত দিয়া একটা মোড়ক বাহির করিল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুবোধ কহিল, "ও কী মশাই!"

কন্দর্প জবাব না দিয়া মোড়ক খুলিতে লাগিল। সুবোধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া তাহার দুই হাত

চাপিয়া ধরিতেই কহিল "হাত ধরছেন কেন মশায়! পাঞ্জা লড়বেন না কি? ছেড়ে দিন।" সুবোধ হাত ছাড়িয়া দিয়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোড়কের দিকে তাকাইয়া সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কন্দর্প মোড়ক খুলিয়া এক টিপ নস্য লইতেই সুবোধ কহিল, "ওঃ এই! আমি ভেবেছিলাম"—দুই নাকে নস্য গুঁজিতে গুঁজিতে কন্দর্প হাসিয়া কহিল, "কি, বিষ? তারই অভাব আছে না কি? পকেটেই আছে।"

সুবোধ নিশ্চিন্ত হইয়া চেয়ারে বসিতেই কন্দর্প কহিল, "আর কতক্ষণ খেলবেন? ডাঙ্গায় উঠুন দয়া করে, একটা সই দিন।" সুবোধ কহিল, "পরে আসবেন, বাড়ীতে একটু বুঝে দেখি।"

কন্দর্প দুই হাত যোড় করিয়া মিনতির সহিত কহিল, "পরে আসতে আপত্তি নাই, কিন্তু দয়া করে বাড়ীতে বুঝবার কথা বলবেন না। বার বছর ধরে দালালী করছি কিন্তু বাড়ীতে বুঝে কারও সুবুদ্ধি হয়েছে, আজ পর্য্যন্ত দেখি নি।"

কন্দর্পকে কোন মতে বিদায় করিয়া ঘরে যাইতেই পত্নী সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ! গা! কে এসেছিল?"

সুবোধ কহিল, "লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট কন্দর্প বাবু।"

"কি, বলছিল কি?"

"যা বলে চিরদিন—লাইফ ইন্সিওরেন্স করতে" দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুধা কহিল, "তোমার না কি ভাল চাকরি হয়েছে বলছিল?" ঈষৎ হাসিয়া সুবোধ কহিল, "হ্যাঁ, কে না কি গাঁয়ে গুজব রটিয়েছে।"

সুধা কহিল, "গুজব কেন? সত্যিও তো হতে পারে।"

সুবোধ কহিল, "সত্যি হলে আমি জানতাম না?" বিরক্ত হইয়া সুধা কহিল, "নাই বা জানলে তুমি? গাঁয়ের লোক কি আর মিথ্যে রটাচ্ছে?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কদিনই আমার বাঁ চোখ নাচছে। তোমার ঠিক চাকরী হয়েছে, তুমি দেখো।" সুধার আশাদীপ্ত মুখের পানে তাকাইয়া তাহাকে নিরাশ করিতে সুবোধের কষ্ট হইল। কহিল, "তা' হতে পারে, দেখা যাক্" দুই যুক্তহস্ত কপালে ঠেকাইয়া সুধা কহিল, "মা কালী করুন, তাই যেন হয়। যে দিন ঠিক খবরটা পাব সেই দিনই পাঁচ টাকার পূজো দেব আমি।"

সেই দিন স্কুলে টিফিনের সময়ে সুবোধ শিক্ষকদের ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল, "এই যে সুবোধ বাবু, কবে যাওয়া হচ্ছে?" কেবল শশধর একটা পুরাতন খবরের কাগজের মধ্যে বেমালুম তলাইয়া রহিল। সুবোধ আড় চোখে তাহাকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, "কোথায়?" একজন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "গোপন করছেন কেন, মশায়? কেউ কেড়ে নেবে না কি?" আর একজন কহিল, "খাওয়াচ্ছেন কবে? ফাঁকি দিলে চলবে না কিন্তু।" আর একজন কহিল "ডুব-সাঁতার দিয়ে পাড়ি দিলেন, মশায়! টেরটুকু পর্য্যন্ত পেতে দিলেন না!" কে একজন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সক্ষোভে কহিল, "আমাদেরই পাথর-চাপা কপাল, চেপ্টেই রইল চিরদিন, ভুলেও একবার নড়বার নাম পর্য্যন্ত করল না—।" হেড-পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ ধ্যানাবিষ্টের মত মুদ্রিত চক্ষে তামাকু সেবন করিতে ছিলেন, শেষ টান দিয়া, ধোঁয়া ছাড়িয়া, চোখ খুলিয়া কহিলেন, "বলেছিলাম না বৃহস্পতি আপনার তুঙ্গে, উন্নতি ঠেকায় কার সাধ্যি, কথাটা ফলল তো?"

সুবোধ এইবার ফাঁক পাইয়া কহিল, "আমার তো চাকরি হয় নি—।" রসিকতা ভাবিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিল। সুবোধ কহিল, "সত্যি বলছি—বিশ্বাস করুন—।" এবার সকলে একসঙ্গে মুচকি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"নিশ্চয়ই তা' বিশ্বাস করতে হবে বৈ কি!"

বাড়ী ফিরিবার পথে সুবোধ শশধরকে কহিল, "আপনাকে এত করে বল্লাম কাউকে বলবেন না আর ঢাক পিটে দিয়েছেন!"

শশধর দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "কে ঢাক পিটেছে? আমি? পাগল হয়েছেন?"

সুবোধ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তবে এ খবর কে রটালে?"

শশধর কহিল, "কি করে জানব বলুন? আপনি-ই হয় তো আর কাউকে বলেছেন। যে পেট-আলগা মানুষ!"

সুবোধ কহিল, "সত্যি বলছি, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলি নি—"

শশধর কহিল, "আপনার দিব্যি বল্‌ছি, যে দিন থেকে শুনেছি, ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে বসে আছি, নাড়ি নি পর্য্যন্ত। আমি পিটব ঢাক—ছিঃ—"

দুই জনে নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর হেড্‌মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া সুবোধ দেখিল, কীর্ত্তন অনেকক্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মাষ্টারদের প্রায় সকলেই উপস্থিত, এমন কি শশধর পর্য্যন্ত। সকলেই হাততালি দিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন গাহিতেছে। হেড্‌ মাষ্টার তাহাকে দেখিয়া ইঙ্গিতে বসিতে বলিলেন। সুবোধ কীর্ত্তনে নিয়মিত ভাবে হাজিরা না দিলেও, আগে যে দিনই আসিয়াছে, হেড্‌মাষ্টার তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া নিজের পাশে বসাইয়াছেন। আজ আর তাহা করিলেন না এবং করিবার উপায়ও ছিল না। কারণ সে স্থান আজ বেদখল হইয়া গিয়াছে। যিনি দখল করিয়াছেন, তিনি নবাগত। বয়স বাইশ তেইশ, দীর্ঘ-গঠন চেহারা, গায়ের রং ফর্সা, মুখের চেহারা মেয়েলী ধরণের, গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন মুখ, মাথায় কোঁকড়া চুলের মাঝখানে মেয়েদের মত সিঁথি। ভাব-গদ্‌গদ ভাবে সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্ত্তন গাহিতেছেন। এক একটি রসাল আখর দিতেছেন, আর হেড্‌মাষ্টার মহাশয় "মরি মরি" "হায়, হায়" বলিয়া রসোপলব্ধি প্রকাশ করিতেছেন। সুবোধ শশধরের পাশে বসিয়া পড়িয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিল।

কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন শেষ হইলে শশধর কহিল, "সুবোধ বাবু কিন্তু দেরী করে এসে ঠকেছেন, এমন কীর্ত্তন জীবনে শুনি নি —"

হেড্‌ মাষ্টার কহিলেন, "সত্যি; চমৎকার জমেছে আজ। কতদিন ত কীর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু আজকার মত—" ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "কখনও না—"

হেড্‌ পণ্ডিত কহিলেন, "হবে না কেন? সাক্ষাৎ নিত্যানন্দের বংশধর যে, ওঁদেরই ত জিনিষ—" বলিয়া উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করিলেন।

হেড্‌মাষ্টার কহিলেন, "সত্যি। আমাদের অনেক ভাগ্যের ফলে এঁকে পেয়েছি, কিন্তু স্বপ্ন যে এমন সত্য হয় তা' আগে জানতাম না—"

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, "কি স্বপ্ন?"

শশধর লজ্জিত ভাবে কহিল, "থাক্ থাক্ ও আর বলে কাজ নাই—"

হেড্‌ মাষ্টার কহিলেন, "তাতে আর লজ্জা কি? তুমি বৈষ্ণব বংশের ছেলে, অনাচার, অত্যাচার করে পাপের পথে ছুটেছিলে; স্বয়ং প্রভু যদি এসে তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে ত' সৌভাগ্যের কথা—"

সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "শুনুন, সে দিন ভোরে শশধর স্বপ্ন দেখে যে, একজন দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, ওর বুকের উপর বসে গলা চেপে ধরে বলছেন, 'আর কোন দিন অনাচার করবি?' শশধরের তখন দম বন্ধ হয়ে আসছে, কোন মতে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না', তখন ওকে ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'সৎপথে থাক, মন্ত্র নে, রাতদিন হরিনাম কর, না হলে তোর মঙ্গল হবে না' বলেই তিনি অন্তর্দ্ধান করলেন। তার পরদিনই আমাদের ইনি এলেন। এঁকে দেখেই শশধর আশ্চর্য্য হয়ে গেল। যাঁকে সে দিন স্বপ্নে দেখেছিল, অনেকটা তাঁর মত এঁর চেহারা। আমাকে যখন সব পরিচয় দিল, শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল—"

এই কথা শুনিয়া সকলেই গায়ে কাঁটা দিবার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, "সত্যি!"

হেড মাষ্টার বলিতে লাগিলেন, "আমি বললাম শশধরকে, আর দেরী ক'র না। এর কাছেই শিষ্য হও। তা' ও রাজী হয়েছে," শশধরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, বুঝলে? মাথাটা মুড়িয়ে একটু গোবর-টোবর খেতে হবে। অনাচার ত কম করিনি।"

শশধর নতমুখে কহিল, "আজ্ঞে, তা' করতে হবে বৈ কি।" হেড মাষ্টার কহিলেন, "সুবোধ বাবু ত চলেই যাচ্ছেন ওকে বলা বৃথা।" সুবোধ বাধা দিয়া কহিল, "কে বললে আমি যাচ্ছি।" হেড মাষ্টার তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "কীর্ত্তনের আসরে মিথ্যে কথাটা নাই বা বললেন, সুবোধ বাবু।"

তারপর পূর্ব্বের কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আমরা যে কজন স্কুলে চাকরী কচ্ছি, সকলেরই উচিত ধর্ম্মপথে চলা ধর্ম্ম আলোচনা করা। আমাদের দেখে গ্রামের অন্য সবাই ভাল পথে চলবার চেষ্টা করবে। গ্রামের মধ্যে শিক্ষিতই বলুন আর মানুষই বলুন, আমরাই ত?" সকলেই

সায় দিয়া কহিল, "সত্যিই ত।" সুবোধ নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিতেই সুধা কহিল, "হ্যাঁ গা তুমি বলছিলে গুজব, সবাই বলছে, সত্যি।"

সুবোধ প্রশ্ন করিল "কে বলছে?"

সুধা জবাব দিল "সেক্রেটারী-গিন্নী, হেড মাষ্টার-গিন্নী। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল কবে যাওয়া হবে।"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললে?"

সুধা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, "কি করে আর বলি যে, আমি দাসী, বাঁদী, আমার কিছু জানবার যো নাই, দেশশুদ্ধ সবাইকে জানিয়ে যদি মনে পড়ে, দয়া হয়, তবে আমি জানতে—পাব একটা কিছু বলতে হল বানিয়ে" বলিতে বলিতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, "কেউ ত জানে না, কত ভালবাসা তোমার আমার ওপর! ভাবে আর সকলের যেমন তেমনি। আমার যে মরণ হয় না কেন তাই-ভাবি" বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন সকালে, বিশেষ জরুরী কাজের জন্য সেক্রেটারী প্রাণ গাঙ্গুলী সুবোধকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেখানে পৌছিয়া সুবোধ দেখিল, গাঙ্গুলী মহাশয় বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে উঁচু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সুবোধকে দেখিয়া কহিলেন, "আসুন"। পার্শ্বে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "বসুন"। সুবোধ বেঞ্চির অন্যপ্রান্তে সম্মানসূচক ব্যবধান রাখিয়া বসিল। গাঙ্গুলী মশায় অনেকক্ষণ নীরবে তামাকু সেবন করিয়া কহিলেন, "কবে যাচ্ছেন?" সুবোধ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "কোথায়?" গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন, "কেন? বর্দ্ধমান! ভাল চাকরী পেয়েছেন, সত্যি, ভারী সুখী হয়েছি শুনে, গুণী লোক আপনি আমাদের এই পাড়াগাঁ-এর গরীব স্কুলে থাকা কি পোষায়?"

সুবোধ বাধা দিয়া কহিল, "চাকরী ত পাই নি, দরখাস্ত করেছিলাম বটে।"

গাঙ্গুলী মস্তক-উত্তোলন করিতে করিতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কেন গোপন করছেন? সব খবর পেয়েছি আমরা। আমার গুরুদেবের ছেলে কাল বর্দ্ধমান থেকে এসেছেন যে! নিজে সব শুনে এসেছেন—।"

সুবোধ ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুনে এসেছেন?"

"কে একজন বোস, এম-এ. পাশ, চাকরী পেয়েছে। আপনিও তো বোস, এম-এ. পাশও, আপনি ছাড়া আর কে হবে? বিশ্বাস না হয় নিজে জিজ্ঞাসা করে দেখুন" বলিয়া হাঁক দিয়া ডাকিলেন—"নিত্যানন্দ!" ডাক শুনিয়া 'আজ্ঞে যাই' বলিয়া একজন যুবক বাহিরে আসিল। সুবোধ বিস্ময়-বিহ্বল চক্ষে দেখিল—কাল রাত্রিকার সেই কীর্ত্তনীয়া যুবক, স্বয়ং নিত্যানন্দের বংশধর, শশধরের ত্রাণকর্ত্তা।

গাঙ্গুলী কহিলেন, "ইনিই বি. এস-সি. পাশ, অঙ্কে অনার—" যুবককে কহিলেন, "কি শুনে এসেছেন বলুন তো?" যুবক গাঙ্গুলীর কথা হুবহু পুনরাবৃত্তি করিল। সুবোধ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "আমি তো কিছুই খবর পাই নি—এখন পর্য্যন্ত" গাঙ্গুলী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "পাবেন, পাবেন, দু'একদিন দেরী হচ্ছে," যুবককে কহিলেন—"আপনি যান।" যুবক প্রস্থান করিলে গাঙ্গুলী কহিলেন, "আপনার যাবার কথা শুনে আমি তো এক বাঁও জলে গিয়ে পড়লাম। কি করি! কোথায় মনের মত লোকটী পাই! আমার নিজের ঘরে যে এমন উপযুক্ত লোক রয়েছে, কিছু মনে ছিল না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ডেকে বললাম, "প্রভু তোমার উপরেই আমার ভরসা—তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।" প্রভু যেন স্বকর্ণে শুনলেন আমার কথা। দেখি পরদিনই নিত্যানন্দ এসে হাজির। কিছু জানতেন না আগে, এমনি বেড়াতে। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম—।" সুবোধ নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিল। গাঙ্গুলী কহিলেন, "আপনার দিন দিন উন্নতি হোক, মহাপ্রভুর কাছে আমরা নিত্য কামনা করব, কিন্তু আমাদের একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল—।" সুবোধ লজ্জিত ভাবে কহিল, "আমি এমনি দরখাস্ত করেছিলাম—আশা করি নি চাকরী হবে—এখনও হয়েছে কি না তা'ও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—।" কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী কহিলেন, "যাক্‌গে ও সব কথা, আমরা স্থির করেছি, নিত্যানন্দকেই আপনার যায়গায় রাখব, কিন্তু প্রভুর কত কৃপা আমার উপর দেখছেন?" সুবোধ জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। গাঙ্গুলী কহিলেন, "বিজ্ঞানের মাষ্টার রাখতে হবে, সরকার তো হুকুম দিয়েই খালাস। কোথায়

পাব টাকা—একবার ভাবলাম, শশধর গাঁয়ের ছেলে, চাষবাস আছে, অবস্থা ভাল, ওকে সরিয়েই ওর যায়গায় রাখা যাক্। কিন্তু কিছু করতে হোলো না। প্রভু আমার নিজের হাতে সব ভার তুলে নিলেন। আপনাকে ভাল চাকরী দিয়ে সরিয়ে দিলেন, ভাল একটী লোক এনে দিলেন, শশধরেরও চাকরী বজায় রাখলেন।" কিছুক্ষণ দম লইয়া কহিলেন, "তা' হলে আপনার যাওয়া হচ্ছে কবে ?"

সুবোধ চিন্তিত ভাবে কহিল, "একটা খবর না পেলে কি করে যাই ?"

গাঙ্গুলী কহিলেন, "খবর পাবেন দু'চার দিনের মধ্যেই। আমি বলি, শুধু আমি কেন, সকলেরই তাই মত, আপনি আজই রিজাইন্ দিয়ে দিন, নিত্যানন্দ আ'জ থেকেই কাজ আরম্ভ করুন। আপনি একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবেন। আর এক কথা, আপনার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা সব হিসেব করে রেখেছি আজই হেডমাষ্টারের কাছে পাবেন।"

সবই যখন স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন প্রতিবাদ করিয়া লাভও নাই, প্রবৃত্তিও হইল না। কাজেই সুবোধ নমস্কার করিয়া বিষণ্ণ মুখে বাড়ী ফিরিল।

সেইদিনই কাজে ইস্তফা দিয়া, মাহিনা ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বাবদ কিছু টাকা পকেটে লইয়া, সুবোধ যখন শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিল, দেখিল, সুধা তাহারই পথের দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সুধা দরজা খুলিয়া দিল এবং কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে কিসের প্রত্যাশায় তাকাইয়া রহিল। কিন্তু সুবোধ অন্যমনস্ক ভাবে জামা, জুতা খুলিতে লাগিল, ফিরিয়া তাকাইয়াও দেখিল না। সুধা মুখ ফিরাইয়া লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। স্কুলের কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া খোলা গায়ে সুবোধ বিষণ্ণ মুখে একটা চেয়ারে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সুধা আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "একটা কথা জানতে চাই, দয়া করে বলবে কি ?"

মৃদু কণ্ঠে সুবোধ জবাব দিল "বল।"

"এখানের চাকরী কি আজ শেষ হয়ে গেল ?"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হাঁ।"

"কবে আমাদের এখান থেকে যেতে হবে ?"

"কাল।"

সুধা কহিল, "ভাল চাকরী পেলে লোকে আনন্দ করে, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। এই পাড়াগাঁ-এর চাকরী যদি এতই ভাল লেগেছিল ত চেষ্টা না করলেই পারতে।" সুবোধ নিরুত্তর রহিল।

সুধা তীব্রকণ্ঠে কহিল, "আমার লজ্জা নাই, তাই যেচে বার বার কথা কইতে আসি" বলিয়া অভিমানে চোখের জল সামলাইতে সামলাইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন সকালে সুবোধ উৎকণ্ঠিত মুখে পিয়নের আগমন প্রত্যাশায় বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে পিয়নকে আসিতে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। এবং পিয়ন যখন সত্যই একটা খামে আঁটা চিঠি হাতে দিল, তখন উত্তেজনায় তাহার মাথার মধ্যে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতে লাগিল, মুখ, চোখ, কাণ, গরম হইয়া উঠিল ও সর্ব্বদেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কোন মতে চিঠি খুলিয়া পড়িতেই সুবোধের মাথা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল এবং দুই চক্ষর সম্মুখে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে রাশি রাশি হরিদ্রাবর্ণের সর্ষপপুষ্প ফুটিয়া উঠিল। চিঠিতে লেখা ছিল তাহার চাকরী হয় নাই, স্কুলের কর্ত্তাদের একজনের আত্মীয় চাকরীটি পাইয়াছে।

সম্বিত লাভ করিয়া সুবোধ দেখিল, সামনে চেয়ারে বসিয়া কন্দর্প হাঁপাইতেছে। কহিল, "ছুটতে ছুটতে আসছি মশায়!" সুবোধ জবাব দিল না।

কন্দর্প কহিল, "আপনি না কি আজই চলে যাচ্ছেন ?"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। কন্দর্প উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, "তা'হলে আমার সেইটার কি হবে ?"

সুবোধ নীরস কণ্ঠে কহিল, "আজ আপনি আসুন, আমি অসুস্থ।"

কন্দর্প সোৎসাহে কহিল, "অসুস্থ! তার আর চিন্তা কি ? শুধু কি এজেণ্ট, ডাক্তারও যে! কি অসুখ বলুন। ম্যালেরিয়া ? ডেঙ্গু ? ইনফ্লুয়েঞ্জা ? বলে ফেলুন। ওষুধ আমার সঙ্গেই" বলিতে বলিতে দুই পকেট হইতে ছোট বড় ছয় সাতটী শিশি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

সুবোধ বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "আমাকে মাপ করুন কন্দর্প বাবু! কোন ওষুধের দরকার নাই, একটু একলা থাকলেই আমি সুস্থ হব।"

কন্দর্প তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "একলা থাকলেই সেরে উঠবেন? বেশ বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়াচ্ছি।"

সুবোধ তিক্ত কণ্ঠে কহিল, "না না একটু দাঁড়িয়ে কাজ নাই। আজ আপনি আসুন।"

কন্দর্প অপ্রতিভ ভাবে কহিল, "বেশ। তাতে আর কি, চলেই যাচ্ছি, কিন্তু কখন আবার আসব বলুন।"

সুবোধ কহিল, "এসে আর কি করবেন।" চমকিয়া উঠিয়া কন্দর্প কহিল, "কেন? অসুবিধে কিসের?"

সুবোধ ক্লান্ত-স্বরে কহিল, "অসুবিধে অনেক। এখন বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমাকে মাপ করুন।"

অনুযোগের স্বরে কন্দর্প বলিতে লাগিল, "মাপ না হয় করলাম সুবোধ বাবু। কিন্তু আপনাদের মত বুদ্ধিমান্ লোক যদি অবুঝের মত কাজ করে ত দুঃখ রাখি কোথায় বলুন দেখি" শিশিগুলা পকেটে ঢুকাইতে ঢুকাইতে কহিল, "মিথ্যে সকালটা নষ্ট হল। এক বেটা রোগীকে রাস্তায় বসিয়ে রেখে এসেছি সে রৈল; না ডাক্তার বাবুর খপ্পরে পড়ল, কে জানে।" তারপর নমস্কার করিয়া কহিল, "ও বেলা হয় ত দেহটা একটু চাঙ্গা হতে পারে, তখনই একবার আসব, কি বলেন?" সুবোধ জবাব দিল না।

কন্দর্প যাইতে না যাইতেই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর একটি ছেলে আসিয়া, নমস্কার করিয়া কহিল, "আজ বেলা তিনটার সময়ে আপনার বিদায় উপলক্ষে ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিদায়-সভা আহ্বান করা হবে। আপনি দয়া করে ঠিক সময়ে উপস্থিত হবেন।" ছাত্র বিদায় লইতে না লইতেই পাওনাদারের দল একে একে হিসাব লইয়া হাজির হইতে লাগিল। তাহাদিগকে বিদায় করিতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। তার পর স্নান করিয়া, নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া সুবোধ বিদায়-সভায় হাজিরা দিতে ছুটিল।

স্কুলের উঠানে সভার আয়োজন করা হইয়াছে। ছাত্রেরা ও শিক্ষকেরা সকলেই উপস্থিত। সেক্রেটারী মহাশয় সভাপতির আসনে বসিলেন এবং ছাত্রেরা ধরাধরি করিয়া সুবোধকে তাঁহার পাশের চেয়ারে বসাইয়া দিল। যথারীতি গান গাহিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। শিক্ষকেরা একে একে অম্লান বদনে মামুলী ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তার পর আসিল ছাত্রদের পালা। প্রায় সকল ছেলেই ফুলস্ক্যাপ কাগজে বিদায়-বিদীর্ণ হৃদয়ের কাহিনী পদ্যে লিখিয়া বা লেখাইয়া আনিয়াছিল। একে একে পাঠ করিয়া, নত শিরে কাগজটী সভাপতির সামনে টেবিলে রাখিয়া প্রণামান্তে বিদায় লইতে লাগিল। এমনি করিয়া প্রায় তিন ডজন বিদায়-গাথা পাঠ হইবার পর হেডমাষ্টার মহাশয় আদেশ দিলেন, "আর পড়িবার সময় নাই। তোমাদের যাহার কাছে যাহা আছে টেবিলে জমা করিয়া দাও। সুবোধ বাবু পরে পড়িয়া লইবেন।" ছাত্রেরা ভিড় করিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া কাগজ জমা দিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে টেবিলের উপর বিদায়-গাথা রাশীকৃত হইয়া উঠিল।

বিদায়-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইয়া সুবোধ একবার চারিদিকে চাহিল। দেখিল প্রিয় সহকর্ম্মিগণ বিচ্ছেদ-ব্যথায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। ছাত্রদের অধিকাংশই শুষ্ক, বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছে। তিন বৎসর ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে তাহার যে স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার সহসা সমাপ্তিতে হয় ত তাহাদের সত্যই দুঃখ হইয়াছে, কিংবা হয় ত সারাদিন হৈ হৈ করিয়া তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে। যাই হোক, তাহারা হাসিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে না। একবার তাহার মনে হইল, ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া বলে, 'তোমরা ভাবিতেছ, আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহা সত্য নহে। তোমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকগুলি দল বাঁধিয়া চক্রান্ত করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।' কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মামুলী ভাষায় ধন্যবাদ দিল, বিচ্ছেদ ব্যথা জ্ঞাপন করিল, ছাত্রদের কল্যাণ কামনা করিল, এবং নিজের ত্রুটী ও বিচ্যুতির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। সর্ব্বশেষে পাণ্ডা ছাত্রটি জানাইয়া দিল যে; ছাপা 'বিদায়-অভিনন্দন' ও উপহারের দ্রব্যাদি আনিতে সহরে লোক পাঠান হইয়াছে। এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। সন্ধ্যা নাগাদ আসিয়া পৌঁছিলে সে নিজে গিয়া সুবোধ বাবুর হাতে পৌঁছাইয়া দিবে।

দুই মাইল দূরে ষ্টেশন এবং রাত্রি দশটায় শেষ ট্রেন। সুধা ও শিশু পুত্রকে পাল্কী করিয়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া

এবং দুইখানা গরুর গাড়ীতে যাবতীয় জিনিষ-পত্র বোঝাই করিয়া সুবোধ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। কয়েকজন ভক্তিমান্ ছাত্র তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গ লইল।

ট্রেন আসিতেই তাড়াতাড়ি সুধা ও পুত্রকে একটা কামরায় তুলিয়া দিয়া এবং জিনিষ-পত্রগুলার ব্যবস্থা করিয়া সুবোধ ছাত্রদের কাছে শেষ বিদায় লইবার জন্য গাড়ী হইতে নামিল। ছাত্রেরা একে একে প্রণাম করিল। সুবোধ প্রত্যেককে পরম স্নেহের সহিত বুকে টানিয়া লইয়া, মাথায় হাত দিয়া সত্য সত্যই আশীর্ব্বাদ করিল। শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং সুবোধ গড়ীতে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুবোধ খোলা দরজার সামনে ছাত্রদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে ছাত্রদের ম্লান মুখগুলি অস্পষ্ট হইয়া আসিল, ষ্টেশনের আলোগুলি ক্রমে ম্লান, ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইয়া বাঁকের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ট্রেনের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। সুবোধ দরজা বন্ধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার সামনে বসিয়া পড়িল।

সুধা ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছিল। উঠিয়া আসিয়া পাশে বসিল। কহিল, "আজ ভারী আনন্দ হচ্ছে, না?"

সুবোধ কহিল, "হুঁ।"

সুধা কহিল, "কোন দিন স্বপ্নে ভাবি নি যে, এই পাড়াগাঁ ছাড়তে পারব, মা কালী অনেক দিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন—"

সুধা কহিল, "তাড়াতাড়িতে মা কালীর পূজো দিতে পারলাম না। দেশে গিয়েই দিতে হবে। যেখানেই পূজো দাও, ঠাকুর তো সব এক, কি বল?"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল, "আমরা এখন দেশে যাচ্ছি তো?" সুবোধ জবাব দিল, "হাঁ।"

সুধা কহিল, "আমি কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে বর্দ্ধমান যাব না। মাকে দেখতে যাব। তুমি একা গিয়ে বাসা ঠিক ক'রে আমাকে নিয়ে যাবে—না?"

সুবোধ কহিল, "তাই হবে।"

সুধা অনুযোগ করিয়া কহিল, "তুমি আজ ক'দিন অমন মন ভার ক'রে আছ কেন বল দেখি? সত্যিই খুব মন খারাপ হয়েছে? আমারও যে মন কেমন করছে না, তা নয়—অনেকদিন ছিলাম, কিন্তু তোমার যেন বাড়াবাড়ি।"

সুবোধ জোর করিয়া মৃদু হাসিল। এমন সময়ে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। সুধা কহিল, "কি জানি, বাপু! কিছু বুঝিনে—"বলিয়া খোকার কাছে গেল এবং তাহার পাশে শুইয়া অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল।

সুবোধ নির্নিমেষ নেত্রে বাহিরে প্রবহমান অন্ধকার স্রোতের দিকে তাকাইয়া রহিল। এ কয়দিন বাহিরের ঘটনাশৃঙ্খল তাহার চিন্তা ও ভাবনার ভিড়কে যেন আটকাইয়া রাখিয়াছিল। আজ যেন ছাড়া পাইয়া তাহারা, ষ্টেশনে গেট খোলার পর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মত, তাহার মনকে এক যোগে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। দেশে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু পৈত্রিক বাড়ী খানি এখনও খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, না, ভূমিশায়ী হইয়াছে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থা ভাল নহে, সেখানে আতিথ্য মিলিতে পারে কিন্তু আশ্রয় মিলিবে না। স্কুল হইতে যে টাকা পাইয়াছিল, পাওনাদারদের দেনা মিটাইয়া সামান্য কয়েকটা টাকা উদ্বৃত্ত আছে, তাহাতে একমাস কোন মতে চলিতে পারে। কিন্তু তার পর? তার পর দিন কয়েক চাকরীর জন্য নিষ্ফল চেষ্টা এবং অবশেষে স্ত্রী ও পুত্রের হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা অথবা সপরিবারে আত্মহত্যা, সেই নিদারুণ অথচ সুনিশ্চিত পরিণামের কথা ভাবিয়া সুবোধের দুই চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল।

সংগ্রহ

[খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক ও লেখক Clive Bell (১৮৮১—)-এর Civilization নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত।]

—শ্রীনীলরতন কর

খৃঃ ১৯১৪ অব্দের আগষ্ট হইতে ১৯১৮ অব্দের নবেম্বর অবধি গ্রেটবৃটেন ও তাহার মিত্রপক্ষীয়গণ সভ্যতার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়াছে। যে সভ্যতাকে উপলক্ষ্য করিয়া বহুকাল হইতে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ও রক্তপাত চলিয়াছে এবং চলিতেছে তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা কখনই অসমীচীন হইবে না।

প্রারম্ভেই এ কথা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সভ্যতা শ্রেয়স্কর। নচেৎ ইহার জন্য এত আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন কি? সভ্যতা শ্রেয়স্কর হইলে হয় তাহা আমাদের চরম উদ্দেশ্য হিসাবে শুভ, অথবা তাহা কোনও হিতকর লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়। আমরা অনেক সময়ে সভ্যতার দোষ এবং অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, সভ্যতা আমাদের উদ্দেশ্যলাভের উপায় মাত্র। সভ্যতা স্বয়ং 'নিঃশ্রেয়স্' নহে শ্রেয়োলাভের একটি পন্থা মাত্র।

আপাততঃ আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, মনের সু-অবস্থা লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য এবং সভ্যতা মনের সেই অবস্থা প্রাপ্তির উপায়। অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সভ্যতা শ্রেয়োলাভের উপায় হইলেও একমাত্র উপায় নহে। যে কোনও প্রকার মানসিক অবস্থা পাইতে হইলে প্রাথমিক প্রয়োজন জীবন ধারণ, অতএব তাহা শ্রেয়োলাভের একটি উপায়। রৌদ্র এবং বৃষ্টি জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, অতএব তাহাও শ্রেয়োলাভের উপায়। জীবন, রৌদ্র ও বৃষ্টি ব্যতিরেকে সভ্যতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহারা সভ্যতা নহে। প্রকৃতপক্ষে জীবন, রৌদ্র, বৃষ্টি, অন্ন, সুরা, সৌন্দর্য্য, বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সকলই সুখপ্রাপ্তির উপায়। সুখপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় সৌন্দর্য্য, পরোক্ষ উপায় সভ্যতা এবং দূরস্থিত কিন্তু অত্যাবশ্যক উপায় রৌদ্র, বৃষ্টি এবং জীবন।

সভ্যতা সুখলাভের একমাত্র উপায় হইলে যাহা কিছু শুভ সমস্তই সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ হইত। যোগ্য পাত্রে এবং উপযুক্ত অবস্থায় সুরা ও বাইবেল সুখলাভের উপায় সন্দেহ নাই, তথাপি ইয়োরোপীয় বণিক ও মিশনারীগণ অসভ্যদেশে যাহা বহন করিয়া আনেন, তাহাকে সভ্যতা আখ্যা দেওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ আছে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, পরস্পর-বিরোধী ও অযৌক্তিক বিশ্বাস, অন্ধ দেশপ্রেম ও রাজভক্তি মনের উদাত্তভাব আনয়নের উপায় হইয়াছে, অতএব তাহা মঙ্গল কিন্তু তাহা সভ্যতা নহে। যাহা কিছু আমাদের ঈপ্সিত অথবা সম্মানার্হ, তাহাকেই যেন সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে না করি। সভ্যতার অভ্যন্তরে আমাদের সমুদয় শ্রেয়-গুণগুলি বিদ্যমান আছে এরূপ অনুমান করিব না। এক টুকরা শূল্যমাংস গলাধঃকরণ করাকে হয়ত অনেকে অধ্যাত্ম বিদ্যা অধ্যয়ন অপেক্ষা পছন্দ করিতে পারেন, কিন্তু সেইহেতু প্রথম কার্য্যটি শেষোক্তটির অপেক্ষা অধিক সভ্যতার নিদর্শন এরূপ মন্তব্যে পৌছান হঠকারিতার পরিচায়ক হইবে।

সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে সভ্যজনসমষ্টির রচনা। ইহার প্রকৃতি বিষয়ে জানিতে হইলে অথবা ইহার অস্তিত্বের হেতু প্রদর্শন করিতে হইলে ইহার স্রষ্টা ও পোষক মানবের প্রসঙ্গের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। সাধারণ বুদ্ধিসাহায্যে এ কথা অনুধাবন করা যায় যে, কোনও সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের অপেক্ষা কোনও ব্যক্তির বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা সহজ। জন্স্মিথের রুচি অথবা হিসিঙ্-এর স্বভাব বিষয়ে কতকটা নির্দ্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়, কিন্তু গ্রেটবৃটেনের স্বার্থ অথবা চীনের সম্মান বলিলে ঠিক সেইরূপ সুনির্দিষ্ট কিছু বুঝা যায় না। কারণ, গ্রেট বৃটেনের সকলের স্বার্থ সমান নয়, অথবা প্রত্যেক চীনবাসীর বোধের

ক্ষমতা একরূপ নয়। এমত অবস্থায় সভ্যতার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমে সভ্য ব্যক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু একটি কারণে এ পথে অগ্রসর হওয়াতে বাধা আছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট সমাজ সভ্য হইয়াছিল এ কথা যেরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত, ব্যক্তি-বিশেষ সম্পর্কে সকলকে সেরূপ একমত হইতে দেখা যায় না। এই হেতু সভ্য ব্যক্তিকে পরীক্ষার পূর্ব্বে সভ্য সমাজ লইয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে এই উভয় পন্থাকেই পরিহার করিয়া প্রথমে সর্ব্ববাদী ক্রমে অসভ্য বলিয়া পরিগণিত সমাজের প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, কোন্‌টি সভ্যতা নহে। বর্ব্বর সমাজের কোন বিশেষত্বই সভ্য সমাজের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক হইতে পারে না। কোন্‌টি সভ্যতা নহে, তাহা আবিষ্কার না করা পর্য্যন্ত এখানে সভ্যতার মূল প্রকৃতি আবিষ্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইবে না। বর্ব্বর সমাজে যে-সকল বিশেষত্ব নাই, অথচ সভ্য সমাজে যে-সকল বিশেষত্ব সাধারণ, তাহাকেই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। এই আলোচনাকালে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ব্বরসমাজের কোনও গুণ যতই সমাদরযোগ্য হউক না কেন, তাহাকে সভ্যতার বিশেষত্ব বলিলে চলিবে না। যদি সভ্যসমাজেও সেই গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে তাহাকে হয় সমগ্র মনুষ্যজাতি-সামান্যের সাধারণ ধর্ম্ম অথবা বর্ব্বরতার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই আলোচনার তথ্যসমূহের জন্য Westermarck-এর "Origin and Development of Moral Ideas" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি প্রামাণিক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২

সম্পত্তির স্বত্বাধিকার, ভেদবুদ্ধি, অকপটতা ও সারল্য-পরিচ্ছন্নতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, শৌর্য্য, অব্যভিচারিতা, দেশ-প্রেম প্রভৃতি গুণগুলি সুখ ও শান্তির উপায় হইলেও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নহে। অধ্যাপক ওয়েষ্টারমার্ক দেখাইয়া-ছেন যে, বহু বন্যজাতির মধ্যে নিজ এবং অপরের সম্পত্তির পার্থক্যবোধ যে-কোনও ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা ন্যূন নয়। শ্বেত জাতিগণের আগমনের পূর্ব্বে আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের ভিতর চৌর্য্যবৃত্তি প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। অসভ্য জাতিদের সত্যবাদিতা অনেক সময়ে বিদেশপর্য্যটকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে। সিংহলের ভেড্ডাগণ সত্যবাদীর আদর্শ বলিয়া অভিহিত হয়। আন্দামানের আদিম অধিবাসী ও আফ্রিকার বুশম্যানগণ মিথ্যাকথা বলা গর্হিত পাপ বলিয়া গণ্য করে। পক্ষান্তরে গ্রীক ও ক্রেটানগণের এ বিষয়ে সুখ্যাতি ছিল না। ইয়োরোপখণ্ডে গ্রেট্‌বৃটেনের বিশ্বাসভঙ্গকারী বিশেষণ সুপ্রসিদ্ধ।

অসভ্যগণ কেবল সত্যবাদী নহে, তাহারা পরিচ্ছন্ন। গোল্ডকোষ্টের অসভ্য মেগিজাতি দিনে দুই তিনবার স্নান করে। অথচ রোমক সাম্রাজ্যের অন্তকাল হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল অবধি ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে কয়জন ব্যক্তি বৎসরে একবার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিনিবাসীর ন্যায় বর্ব্বর জাতিও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। অসভ্যগণের মধ্যে নাস্তিকতা অতিশয় বিরল।

অনেক সাধারণ জনসভায় মহিলাগণকে এরূপ বলিতে শুনা গিয়াছে যে, কোনও সমাজে স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইতে সেই সমাজের সভ্যতার মানদণ্ড নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বুশম্যান, আন্দামানের আদিম অধিবাসী এবং ভেড্ডা-গণের ন্যায় পশুর নিকটপর্য্যায়ভুক্ত অসভ্য জাতিরা স্ত্রীলোকদিগকে যতটা অধিকার দিয়া থাকে, অ্যারিষ্টটলের কালে এথেন্সের নারীগণ তাহা পায় নাই। অনেক-অসভ্য জাতির পুরুষ স্ত্রৈণ, এ কথা স্বীকার করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে নিজেদের সমকক্ষ জ্ঞান করে। কিন্তু চীনা সভ্যতার তাঙ্ ও সুঙ্ যুগে স্ত্রীলোকগণ গৃহপালিত জন্তুর অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। নরখাদক মনুষ্যজাতির ভিতরেও স্বজাতিপ্রীতি, মহানুভবতা, আতিথেয়তা, সাধুতা, কর্ম্মতৎপরতা ইত্যাদি বহু সদ্‌গুণ দেখা যায়।

বহু অনুন্নত জাতির মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে

নৈতিক বোধ এরূপ প্রবল যে, প্রগতিশীল পাশ্চাত্য জাতিগণ তাহা ঈর্ষার সহিত দেখিয়া থাকেন। ব্রেজিল ও ক্যালিফোর্ণিয়ার বন্যজাতিগণের মধ্যে কোনও পুরুষ কখনও একাধিকবার দারপরিগ্রহ করে না। কাডিক জাতির দলপতিরা পর্য্যন্ত বহু বিবাহ করে না; তাহাদের যেরূপ বহু ক্রীতদাস থাকে, সেইরূপ বহু ক্রীতদাসী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সংসর্গ করাকে ইহারা মর্য্যাদার হানিকর ঘৃণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করে। নিকোবরের আদিম অধিবাসীদের ভিতর অসতীত্ব ঘোরতর পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং কেহ ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইলে তাহার নির্ব্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড হইয়া থাকে। সিংহলের ভেড্ডা, লুজঁর ইগোরোট্ এবং কোনও কোনও অষ্ট্রেলীয় জাতির মধ্যেও এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত। অত্যন্ত হীন অবজ্ঞাত অসভ্য জাতিও ব্যভিচারকে গর্হিত পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, অথচ পৃথিবীর অতিশয় গৌরবময় যুগসমূহে ইহা সামান্য ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্লেটো স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ ভোগাধিকার সমর্থন করিয়াছেন। মেডিসি উদ্যানে অথবা স্যাঁল্যাতে, ভলটেয়ার, হেলভিসিয়ুস্ ও দিদেরো নব intellectual orderএর রূপ দিয়া ভোগসুখবাদ প্রচারকালে সতীত্বকে কিছুমাত্র মর্য্যাদা দেন নাই। সক্রেটিস্ ও সেক্স্পিয়র, রাফাএল ও টিসিয়ান্, সিজর ও নেপোলিয়ন, ডিউক অব ওয়েলিংটন্ ও জর্জ এলিয়ট যেরূপভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা লুজোঁর ইগোরোট্স্ সমাজে বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। চীনা সভ্যতার স্বর্ণ যুগেও নৈতিক অবস্থা ইহাপেক্ষা উন্নত ছিল না। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, অব্যভিচারিতা ও সতীত্ব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নহে।

দেশপ্রেমও সভ্যতার গুণ বলা চলে না। সভ্য ইয়োরোপের যে কোনও জাতির স্বদেশপ্রেমের সহিত উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ান, পশ্চিম-আফ্রিকার ইয়োরুবা এবং সলোমন ও ফিজি দ্বীপের অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেম তুলনা করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নানারূপ কৌশলময় যান্ত্রিক সাজসজ্জার ভিতরে সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোনও দেশ শিল্প-ব্যবসায়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগে জার্ম্মানীর সমকক্ষ হয় নাই। কিন্তু তৎকালীন জার্ম্মানী ফ্রান্সের অপেক্ষা অনেক অধিক সুসভ্য ছিল, এরূপ কথা কাহাকেও বলিতে শুনা যায় নাই। পেরিক্লিসের এথেন্স্ অপেক্ষা বর্ত্তমানের মেলবোর্ণ অধিক সভ্য, ইহা কেহ কল্পনাও করে না। ফরাসীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পেরিক্লিসের কালের এথেনস্ অপেক্ষা বর্ত্তমানের প্যারিস সভ্যতায় কম উন্নত। আবার শিক্ষিত আমেরিকানরা বলিয়া থাকেন যে, আধুনিক প্যারিস নিউইয়র্ক অপেক্ষা অধিক সভ্য। অথচ প্যারিসের পথঘাট, আলোকসজ্জা প্রভৃতি এখনও আধুনিকতার বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহা সুবিদিত।

কেহ কেহ মনে করেন যে, যে-সমাজে নিঃস্ব, পঙ্গু ও উন্মাদদিগের জন্য সুব্যবস্থা নাই, তাহাকে কখনই সভ্য বলা যায় না। আর এক শ্রেণীর লোক মনে করেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের ভোটাধিকার না থাকিলে সে-সমাজকে সভ্য বলা চলিবে না। আবার অপর শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃত সভ্য সমাজের প্রত্যেক কলাবিদ্‌কে বাৎসরিক পাঁচশত মুদ্রা দান করা ও প্রদেশের সহরে সহরে ছবির গ্যালারী স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কোনও এক সৈনিক বলিয়াছিলেন "সভ্যতা কি তাহা আমি বলিতে না পারিলেও কি হইলে কোনও রাজ্যকে সভ্য বলা হয় তাহা বলিতে পারি। সভ্যতা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে সাহিত্য ও ললিতকলায় জাপান অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জাপান একটি প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীয় শক্তিকে পরাজিত না করিয়াছে, ততদিন কোনও সংবাদপত্রে তাহাকে সভ্য বলিয়া গণ্য করা হয় নাই।" পরিহাসটি অত্যুত্তম। কিন্তু ধ্বংসকারী সামরিক নৈপুণ্যকে সভ্যতা বলিলে রোমান সাম্রাজ্য লুণ্ঠনকারী বর্ব্বরগণ এবং গুপ্ত বংশ উচ্ছেদকারী ও মধ্য-এশিয়ার মুসলমান সংস্কৃতি ধ্বংসকারী তাতারগণকে সভ্য বলিতে হয়।

কোনও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সভ্যতার সহায়ক হইতে পারে আবার না হইতেও পারে। অনেক বন্যজাতির মধ্যে যেমন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত সেইরূপ অনেক অসভ্য জাতির ভিতর গণতান্ত্রিক শাসনও বিদ্যমান দেখা যায়। সুসভ্য এথেন্সে যখন স্বাধীন নাগরিকের oligarchy বা শ্রেণী-শাসন-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল, তখন তাহা ভোটাধিকার-বর্জ্জিত ক্রীতদাসের দ্বারাই পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে প্রায় একচ্ছত্র রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কাজেই এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভোটাধিকারকে সভ্যতার নির্ণায়ক বলা চলে না। যাঁহারা দয়াদাক্ষিণ্য-প্রদর্শক প্রতিষ্ঠানকে সভ্যতার মাপকাঠি মনে করেন, তাঁহাদেরও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, শিক্ষিতগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুসভ্য বলিয়া পরিগণিত জনসমাজে এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করে নাই। সভ্যতার ভিত্তি শাসন-পদ্ধতি অথবা দয়া-প্রদর্শক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাও অধিকতর মূলগত অপর কিছুর উপরে নির্ভর করিতেছে।

৩

মূল্যজ্ঞান (sense of value) এবং বিচারবুদ্ধির (reason) উপর নির্ভরশীলতা উচ্চস্তরের সভ্যতার মূল। ইহা হইতেই সভ্যতার অপরাপর গুণগুলি শাখাপ্রশাখারূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। গত দুই শত বৎসর যাবৎ সভ্য মানুষ এবং প্রশংসনীয় অসভ্য মানুষের মধ্যে যে বৈপরীত্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা এই কথাই সূচিত করে যে, সভ্যতা সহজ-সংস্কার দ্বারা লব্ধ নহে; শিক্ষার ফলে প্রাপ্ত। মানবজাতির শেষ অর্জ্জিতগুণ অহংপ্রত্যয় (self-consciousness) ও সমালোচনা-বৃত্তির (critical spirit) ভিতর ইহার সন্ধান করিতে হইবে।

অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম অনবদ্য সুখের প্রত্যাশায় যাঁহারা করতলগত আপাতসুখ পরিহার করিতে সমর্থ তাঁহাদের প্রকৃত মূল্যজ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা কোনও রূপ ব্যবহারিক উদ্দেশ্য অথবা কুসংস্কারের বশীভূত না হইয়া সৌন্দর্য্যবোধের নিমিত্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা সংযত রাখেন, তাঁহাদেরই মূল্যজ্ঞান হইয়াছে বলা যায়। লাভজনক অর্জ্জনের উপায় শিক্ষার অপেক্ষা জীবন-যাপনের প্রকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সুসভ্য মনোবৃত্তির আর একটি লক্ষণ। প্রত্যেক বিষয়েরই চরমে একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপ মনোভাব গঠিত হইলে বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

যাঁহার মূল্যজ্ঞান হইয়াছে, তিনি শিল্পকার্য্য ও জ্ঞানার্জ্জনকে, মনের সু-অবস্থা-লাভের মুখ্য উপায় হিসাবে মূল্যবান বলিয়া গণ্য করিবেন, কোনও সম্ভাবিত ব্যবহারিক কার্য্যে প্রয়োগ-উপযোগী বলিয়া নহে। শিল্প-কার্য্য হইতে মুখ্যভাবে সৌন্দর্য্যানুভূতি-জনিত আনন্দ উদ্রেক হওয়াতে তাহা সুখ-প্রাপ্তির মুখ্য উপায়। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যের অনপেক্ষ অনুসরণ ও অবধারণ এই একই কারণে ললিতকলার সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের মূল্য ভিন্ন প্রকার। ইহার ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। জ্ঞান পুষ্টিকর আহার্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারে; কল্পনা ও বুদ্ধিসাহায্যে পরিপাক হইলে তবে ইহার মূল্য অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার অভাবে বুদ্ধি ও কল্পনা পরিশুষ্ক হইয়া যায় এবং মৃত্যুর কবলিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

মূল্যজ্ঞান হইতে উদার শিক্ষা প্রণালীর উপর আকর্ষণ ও আস্থা জন্মে। উদার শিক্ষা-প্রণালী আমাদের জীবনকে আনন্দময় করিতে শিখায় এবং ব্যবহারিক শিক্ষা-প্রণালী নিজের অথবা অপরের উপভোগ্য বিষয়সমূহ অর্জ্জন করিতে শিখায়। জীবনকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ আকারে প্রাপ্ত হওয়া এবং প্রগাঢ়ভাবে ও সর্ব্বাধিক পরিমাণে পরমোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতাসমূহ লাভ করা প্রত্যেক সভ্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য। এই আকাঙ্ক্ষার জন্য সে পরিপূর্ণরূপে আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রকাশের প্রয়াস করে। যাহারা চিন্তা করিতে, অনুভব করিতে ও পরস্পরের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি নির্ণয় করিতে শিখিয়াছে, বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রত্যেক বিষয়ের-উপর মুক্তভাবে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছে এবং সর্ববিধ বিষয়ের সংঘাতে মানসিক আবেগকে যথাযথভাবে সাড়া দিতে শিক্ষিত করিয়াছে, তাহারাই এই প্রয়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারে। এ জন্য জ্ঞানের

প্রয়োজন; কারণ জ্ঞান ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং মানসিক আবেগ বৈচিত্র্যহীন অপচিন্তায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। চিন্তা ও অনুভব-ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন এবং সত্যানুসন্ধান ও জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্তি সভ্য মানুষের বিশেষত্ব।

উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে পার্থক্য-বিচারের ক্ষমতা এবং মূল্যজ্ঞান মানুষকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী (individualist) করিয়া তুলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজনীন মৈত্রীভাব, এবং গোষ্ঠী বা দলগত গণ্ডী হইতে মুক্ত মনোবৃত্তি সভ্যতার স্তরে অগ্রগতির অব্যর্থ লক্ষণ। সভ্য-মানব দেশ-জাতি-কুলনির্বিশেষে অপর সভ্য মানবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। সভ্য মানবের দৃষ্টি দেশাত্মবোধকে জগতের হিতকামনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে না। যখন জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পথে বাধাস্বরূপ হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র সার্ব্বভৌম মৈত্রীভাবই সভ্যতার রক্ষাকল্পে দাঁড়াইতে পারে।

পরমতসহিষ্ণুতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে অপ্রবৃত্তি সভ্যতার আর একটি লক্ষণ। আমরা যাহা কিছু বিশ্বাস করি, সকলই সত্য নহে, যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা করি সকলই শুভ নহে এবং অনেক সমস্যারই এখনও সমাধান হয় নাই, এই তিনটি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া সভ্য মানব পরমতসহিষ্ণু হইবে। কেহ কুসংস্কারবর্জ্জিত এবং পরমতসহিষ্ণু হইলে তাহার মধ্যে ক্রূরতা বা নৃশংস প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত মানুষের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অসভ্যগণকেও কৌতূহলী হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের কৌতূহল সহজ সংস্কার হইতে উৎপন্ন, যুক্তি, বিচারপ্রসূত নয়; তাহাদের কৌতূহল-প্রবৃত্তি হইতে কখনও জ্ঞানের প্রকাশ হয় না।

প্রকৃত সুখানুভূতি সর্ব্বদাই মঙ্গলকর। যাহা পরিণামে অশুভ অথবা বৃহত্তর মঙ্গলের পথে বাধাস্বরূপ, সভ্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তাহার দ্বারা সুখবোধ প্রত্যাশায় কখনই চালিত হইবে না। যাহা মানুষকে বিচারবুদ্ধিহীন এবং অপরিণামদর্শী করে, এরূপ কোনও প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার সভ্যমানবের পক্ষে লজ্জাকর। স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তিতে লিপ্ত হইলে তাহা অসভ্যতার পরিচায়ক।

বিচার-বুদ্ধি ও মূল্যজ্ঞান সভ্যতার মুখ্যধর্ম্ম। সত্য ও সৌন্দর্য্যে নিষ্ঠা, পরমতসহিষ্ণুতা ও ক্ষমা-বুদ্ধি, মানসিক-মিথ্যাচারে অপ্রবৃত্তি, পরিমার্জ্জিত, নিখুঁত রুচি, রহস্য ও পরিহাসপ্রিয়তা, সদাচরণ, অশ্লীলতা, পশ্বাচার, উগ্রতা ও আতিশয্যে বিরক্তি, কুসংস্কার ও কপট আচরণ হইতে মুক্তি, নির্ভীকচিত্তে জীবনের মঙ্গলপ্রদ বিষয়গুলি গ্রহণ, পূর্ণ আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা, উদার শিক্ষালাভে প্রবৃত্তি, কূপমণ্ডূক মনোবৃত্তির প্রতি ঘৃণা—এক কথায় স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্য এবং দীপ্তি সভ্যতার গৌণ গুণ হিসাবে বিকাশলাভ করিয়াছে।

যে সকল সমাজ বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই সর্ব্বতোভাবে এই সকল গুণ-সমন্বিত হইতে পারিয়াছে। এই নিমিত্ত বহু সভ্যসমাজের অস্তিত্ব থাকিলেও অতিশয় সুসভ্য সমাজের অস্তিত্ব খুবই কম দেখা যায়। কোনও সমাজে বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকিলে এবং সেই সকল গুণের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলে তবেই সে সমাজ সুসভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতে পারে।

৪

সমাজ নিজেকে প্রকাশিত করে তাহার আচরণ, রীতি-নীতি, লোকাচার, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া, সর্ব্বোপরি তাহার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ভিতর দিয়া। কোনও সমাজের আত্মস্ফুরণে যে মনোবৃত্তি তাহার সৌগন্ধ প্রদান করে, উপমা সাহায্যে বলিতে গেলে তাহাকেই সভ্যতা বলা যায়। এই সৌগন্ধের উৎপত্তি ও উৎস কোথায়? নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত লোকের মনে। কিন্তু একটি মানুষের মন সমাজের মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য।

যেমন একটি কোকিলের আগমনে বসন্ত সমাগত হয় না, সেইরূপ একটি সভ্য মানুষের অস্তিত্বে সভ্যতার সম্প্রসারণ হয় না। বিগত তিন হাজার বৎসরের কোনও কালে হয়ত পৃথিবীতে সভ্য মানুষের অভাব হয় নাই; অন্ধতামস যুগেও হয়ত দুই একটি সভ্যমানুষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহারা সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এককালে বহু সভ্যমানুষের সমাবেশ হইলে তবে সভ্যতার

কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়া জনসমাজে তাহার আলোক ও মাধুর্য্য সম্প্রসারিত হয়।

সভ্যতার কারণ অনুসন্ধান করিতে আমরা কোনও আইন-কানুন, সভা-সমিতি অথবা কলকজার কৌশলের নিকট ধাবিত হইব না, মানুষের মনের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে। কারণ মানুষের মনই ধারণা করে, সৃষ্টি করে, পরিচালনা করে। বহুসংখ্যক মনের চিন্তা ও সম-অনুভূতি যুগে যুগে মানুষের অজ্ঞাতসারে ও অনভিপ্রেত রীতিতে সমাজকে সংগঠিত করিতেছে।

যে প্রকার মানুষকে সভ্য মানুষ বলিয়া অভিহিত করা যায়, তিনি ভাল মানুষ অথবা অকৃত্রিম মানুষ নহেন; তিনি শিল্পদক্ষ মহামানব, সন্ন্যাসী অথবা দার্শনিক না হইতেও পারেন। কিন্তু তিনি শিল্পরসিক, সত্যের পূজারী, নিজের কর্ত্তব্য বিষয়ে সজাগ ও জীবনকে পরিপূর্ণ সুখপ্রদ করিতে সচেষ্ট; এই উদ্দেশ্যলাভের নিমিত্ত তাঁহার প্রধান উপায়, অতিশয় সু-সংস্কৃত চিন্তা ও অনুভবের ক্ষমতা। তাঁহার মানসিক কৌতুহল সীমাহীন, নির্ভীক ও অনাসক্ত। তিনি সহিষ্ণু, উদার ও মূঢ়তাবর্জ্জিত। তিনি উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয়ে সমর্থ বলিয়া বিষয়সমূহকে শুধু ব্যবহারিক কার্য্যকারিতার দ্বারা বিচার করেন না, মানসিক আবেগের উপর তাহার প্রভাব দ্বারা বিচার করেন। তিনি সমালোচনাপ্রবণ ও আত্মসচেতন। মন, ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি জীবনকে যথাসম্ভব কু অভ্যাস ও রিপুসমূহ হইতে সংযত রাখেন।

অসভ্য সমাজে সর্ব্বত্র অতিপ্রাকৃত হইতে ভীতি সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতা এবং বৈচিত্র্যহীনতার প্রাদুর্ভাব হেতু কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার সমর্থন ও আকাঙ্ক্ষা করেন না। স্বাভাবিক বন্য মানুষের হয়ত অনেক সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অসংযত প্রবৃত্তির জন্য সেরূপ জীবনযাত্রা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

সভ্য সমাজের জনগণের মধ্যে যাঁহারা সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার মূলকেন্দ্র ,তাঁহাদের বাদ দিলে এরূপ বহুসংখ্যক অবশিষ্ট থাকে, যাহাদের সমালোচক মনোবৃত্তি সামান্যমাত্র বিকাশলাভ করিয়াছে এবং পরম উৎকর্ষতার অভিমুখে কেবল প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সমাজকে সভ্য করিতে হইলে সভ্য মানুষ গঠনের অনুকূল অবস্থা-সমূহ আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

অতিশয় সুসভ্য জীবন যাপন করিতে হইলে জীবনের রক্ষণোপযোগী বস্তু সরবরাহের উদ্বেগ হইতে মুক্ত থাকিতে হয়। তাহার প্রয়োজনীয় অন্ন, অগ্নি, আশ্রয়, বিচরণের স্থান, অবসর ও স্বাধীনতা আবশ্যক। প্রাথমিক প্রয়োজনের চিন্তা হইতে অবসরপ্রাপ্ত একশ্রেণীর ব্যক্তি-সমষ্টির পোষণের নিমিত্ত সভ্যসমাজের এক অংশকে তাহাদের উদ্বৃত্ত সময় ও শক্তির কিয়দংশ ব্যয় করিতে হইবে। এরূপ অসাম্যকে যদি কেহ অসহনীয় মনে করেন, তবে তাঁহার সভ্যতার আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হইবে। মানব-সমাজে প্রত্যেকের সর্ব্বতোভাবে সাম্য পরিপূর্ণ বর্ব্বরতা ব্যতিরেকে আসিতে পারে না।

নিরাপত্তা, অবসর ও স্বাধীনতার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আবার অর্থ দ্রব্যোৎপাদক পরিশ্রম ব্যতীত আসিতে পারে না। কিন্তু প্রায় সর্ব্ববিধ অর্থোপার্জ্জনের পন্থা মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির অবস্থার পরিপন্থী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুকুমার শিল্পের সাধককে যদি দৈনিক ছয় ঘণ্টাকাল পাথর ভাঙ্গিতে হয় তাহা হইলে তাহার সৃষ্টিমূলক সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি লোপ পাইবে। কাহাকেও যদি কেবল জীবিকার্জ্জনের জন্যই শিক্ষিত করা হয়, তবে জীবন যাপনের উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের উপযুক্ত শিক্ষা সে পাইবে না। বিস্তারিত ভাবে উদার শিক্ষা-প্রণালী লাভ করিতে হইলে অন্ততপক্ষে চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর কাল সেই শিক্ষা-কল্পে ব্যয় করিতে হয় এবং শিক্ষালাভের কাল অতিবাহিত হইবার পরেও তাহার যথেষ্ট অবসর আবশ্যক হয়। কারণ কেবল মুক্ত অবকাশের অবস্থার মধ্যেই সুশিক্ষিত সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনোবৃত্তি সঞ্জীবিত থাকিতে পারে। আইন-ব্যবসায়া, রাজকর্ম্মচারী ও পণ্য-ব্যবসায়িগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে শতসহস্র ব্যক্তি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ত্রিশ বৎসর যাবৎ কৃতকার্য্যতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে কালযাপনের পরে সুরামত্ততাজনিত কামপ্রবৃত্তি, কৃত্রিম ভাবপ্রদর্শনকারী বক্তৃতা, সস্তা উপন্যাস,

সস্তা ছবি, অশ্লীল সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র এবং গল্‌ফ্‌ ও ধূমপান গৃহের গল্প ব্যতীত আর কিছুই উপভোগ করিতে সমর্থ থাকেন না। যিনি বলেন যে, সারাদিন খনিতে কাজ করা, শিকার করা, গুলি ছোঁড়া প্রভৃতি কার্য্যের পর কেহ মনের সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহের পরিশীলনে সমর্থ হইবেন, তিনি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে পটু হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। যিনি কখনও প্রভুর মনোরঞ্জন করিতে অথবা সহকর্ম্মীর মন সুপ্রসন্ন করিতে বাধ্য হন নাই, কেবল তিনিই সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ সাধুতা বজায় রাখিয়া চিন্তা ও অনুভবের ক্ষমতা রক্ষা করিতে এবং নিরাসক্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ।

সভ্যতাকাঙ্ক্ষী জনসমাজকে সভ্যতার নিমিত্ত ব্যয় করিতে হয়। তাহাকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়ম ও ছবির গ্যালারির জন্য খরচ করিতে হয়, সেইরূপ অবসরপ্রাপ্ত একটি জনসমষ্টির পোষণেও ব্যয় করিতে হইবে। এই জনসমষ্টিই সভ্যতার মূল-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবেন। যদি কেহ ইহাকে অসাম্যসূচক মনে করেন তবে বলিব, এই অসাম্যই মঙ্গলের উপায়। প্রত্যেক সভ্যতাই অসাম্যের উপর দাঁড়াইয়া আছে।

সভ্যতা সমাজতন্ত্রবাদের পরিপন্থী নহে। কোনও সোস্যালিষ্ট ষ্টেট্ সভ্যতা চাহিলে তাহাকেও বিদ্যালয়, বীক্ষণাগার প্রভৃতির জন্য একটি অবসরপ্রাপ্ত শ্রেণীর পোষণ করিতে হইবে। কি ভাবে এই শ্রেণীর নির্ব্বাচন করা হইবে তাহাই জিজ্ঞাস্য। বর্ত্তমানে ইহা উত্তরাধিকার-সূত্রে করা হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রথা অত্যন্ত স্থূল ও অযৌক্তিক। ধনীর সন্তান হইলেই সে অসামান্য বুদ্ধিমান ও সংবেদনশীল হইবে এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানের অবকাশপ্রাপ্ত শ্রেণীর খুব সামান্য অংশকেই সুসভ্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে যে-সকল অবসরভোগী ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করে, আশা করা যায়, ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনার কার্য্যফল তাহার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশকে বহিষ্কৃত করিবে

ভবিষ্যৎ সমাজের সভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র অথবা শিশুদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের অবসরপ্রাপ্ত শ্রেণীর সভ্য করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই অবসরপ্রাপ্ত শ্রেণী বলিতে মোটা মাহিনায় পুষ্ট চাকুরীজীবী অথবা শাসক শ্রেণীদের বুঝাইতেছে না। যাঁহারা বাণিজ্য অথবা চাকুরীর সাহায্যে বহু সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করেন, সাধারণত তাঁহারা প্রাপ্যের অতিরিক্ত বেতনভোগী ক্রীতদাসের তুল্য। অবশ্য ইহার মধ্যে দুই একটি ব্যতিক্রম থাকিতে পারে। ইঁহাদের জীবন-ধারাই ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ সুসভ্য হইতে বঞ্চিত রাখে। শিল্প-ব্যবসায়ের কর্ণধার অথবা শ্রমিকের নিয়োগ-কর্ত্তাকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইঁহারা সাধারণতঃ নিজের অর্জ্জিত অর্থকে অধিকতর অর্থ-উপার্জ্জনে, প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষায়, প্রতিদানের প্রত্যাশায়, আড়ম্বর-প্রদর্শনে এবং বর্ব্বর ও পাশবিক আমোদপ্রমোদে ব্যয় করেন। ইঁহাদের নিকট হইতে সুসভ্যতার আশা করা যাইতে পারে না। যাঁহাদের অর্থ উপার্জন করিতে হয় না, এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত শ্রেণীর নিকট হইতেই সভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে পারে। উদার চিন্তাধারা ও সমাজতন্ত্রবাদের সিদ্ধান্তসমূহ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

যদি সভ্যতা-গঠনকারী অবসরপ্রাপ্ত শ্রেণীর প্রতি শাসকশ্রেণীর সহানুভূতি ও বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে এই অসাম্য মানুষের ঈর্ষা ও মূঢ়তাকে উত্তেজিত করিয়া সেই সভ্যতার কেন্দ্রের উচ্ছেদ সাধন করিবে এবং সমাজকে পুনরায় বর্ব্বরতার স্তরে লইয়া আসিবে। কি ধরণের শাসন-ব্যবস্থা সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। মানুষের ঈর্ষা ও সন্দিগ্ধ মনোবৃত্তি বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে ইহা কি ধারণাসাধ্য যে, মানুষ কখনও তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একদল উপজীবিকাহীন, সুখী ও সুবিধাভোগী সুসভ্য মানুষের পোষণে সম্মত হইবে? এ প্রশ্নের নিষ্পত্তির ভার রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও পুলিশ কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পণ করিয়া আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, মানুষ যতদিন ইহার সমর্থনযোগ্য উদার বৃত্তিসম্পন্ন না হইবে, ততদিন গণতন্ত্র (democracy) ও সভ্যতার

মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকিবেই। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কোথাও সভ্য গণতন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। গ্রীস ও ইতালীর তথাকথিত ডেমোক্রেসী কেবল একটা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর হাতে ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গণতন্ত্রের অভিমুখে অবিরত আন্দোলন চলা সত্ত্বেও বিংশ শতকের পূর্ব্ব অবধি কোনও দেশে সমস্ত পরিণতবয়স্কেরা মাত্র একটি করিয়া ভোটাধিকার পাইতেও সমর্থ হয় নাই।

গত মহাযুদ্ধ এই সত্য প্রকাশিত করিয়াছে যে, সামরিক যথেচ্ছাচার এখনও শুধু সম্ভব নয়, আগামী পঞ্চাশ বৎসর কাল ইহাই সম্ভাবিত শাসন-প্রণালী রূপে বিদ্যমান থাকিবে। প্রকৃত ক্ষমতাপ্রয়োগের কৌশল হিসাবে আবহমানকাল যাহা চলিয়া আসিয়াছে, গত মহাযুদ্ধ তাহারই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহা এই যে, রাজকর্ম্মচারীদের অনুগত এক শ্রেণী অস্ত্রসজ্জা ও সামরিক শিক্ষার প্রভাবে জনগণের ইচ্ছাকে তুচ্ছ করিয়া দেয়। আপোষে মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ নিজের ইচ্ছাকে অপরের উপর সম্পূর্ণরূপে চাপাইতে চাহে, তবে তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে যে, তাহার আদেশ অমান্যকারীর একমাত্র গতি নির্য্যাতন এবং মৃত্যু। আমরা দেখিয়াছি, মিলিটারী সার্ভিস অ্যাক্ট অনুসারে কি ভাবে হাজার হাজার লোককে তাহাদের গৃহ, কর্ম্ম ও আমোদ-প্রমোদ হইতে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুর পথে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহাদের ইহা মানিতে হইয়াছিল কারণ অমান্য করিতে তাহাদের সাহস ছিল না।

রাজত্ব করিতে ও শাসন করিতে রাষ্ট্রের অধিনায়ককে একদল অসামরিক ও সামরিক কর্ম্মচারী সংহত করিতে হইবে। অধিনায়ক যদি আগষ্টাস্, লেনিন, মুসোলিনী অথবা নেপোলিয়ন হন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে ইহা করিতে হইবে। কিন্তু যে-সামাজিক গণতন্ত্র স্বেচ্ছায় সভ্যতার পরিপোষক উপায়গুলিকে সাহায্য করিবে, একমাত্র সেইরূপ শাসনতন্ত্রই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। অবশ্য এই প্রকার সুসভ্য গণতন্ত্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত আমরা যত সভ্যতার কথা শুনিয়াছি, তাহা হয় কোনও স্বেচ্ছাচারী রাজার দ্বারা সমাজের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অথবা কোনও শ্রেণীর শাসনের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছে। সভ্যতা ও শান্তির রক্ষণাবেক্ষণে ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু অপরের উপর জোর করিয়া সভ্যতা চাপাইবার জন্য তাহার আবশ্যকতা নাই। প্রকৃত সভ্যতা বলপ্রয়োগ দ্বারা কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। কোনও সমাজকে সভ্য করিতে হইলে তাহাকে এই তথ্য আবিষ্কারের সুযোগ দিতে হইবে যে, প্রত্যেকেই উন্নততর জীবনধারা অবলম্বনে সমর্থ হইতে পারে।

হিতৈষী শাসনতন্ত্র যদি অবকাশপ্রাপ্ত অনুশীলনশীল সামাজিক শ্রেণীকে পোষণ করে, সকলের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করে, শিল্পে, চিন্তায় ও জীবনে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয় এবং কর্ম্মসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, তথাপি সভ্যতার অস্তিত্বকল্পে আর একটি প্রয়াসের প্রয়োজন; তাহা হইতেছে সভ্য হইবার ইচ্ছা। সভ্য হইবার ইচ্ছা কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইলেও দেশ ও কালভেদে ইহার তীব্রতা ও কার্য্যকারিতা বহুল পরিমাণে কমবেশী হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মজুর শ্রেণী ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে কেবল সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য ব্যতীত সর্ব্ববিষয়েই একপ্রকার মানসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। বিপ্লবী খনির মজুর ও তাহার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভু উভয়েরই মনে যেরূপ জীবনধারা যাপনের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। প্রাতরাশের পূর্ব্বে বম্ ও দুগ্ধ, আহারের সহিত চারিপ্রকার ব্যঞ্জন, দিনের বেলা শিকার করিয়া বেড়ানো অথবা কোনও ক্রীড়া-কৌতুক, মধ্যাহ্ন ভোজে শ্যাম্পেন, আহারান্তে একটি দীর্ঘ সিগার, অপরাহ্ণ কালে সিনেমা, মাঝে মাঝে মিস্ করেলী, মাইকেল আর্লেন, বিরার, জনবুল, কিংবা ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন পাঠ, বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা বিষয়ে অব্যবহারিক বিশ্বাস এবং বৈদেশিকদিগকে অবজ্ঞা করিবার প্রবৃত্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে সামান্য মজুর ও উচ্চশ্রেণীর অভিজাত উভয়েই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। উভয়েই সমরূপে মন্দধী, অশিষ্ট, বিক্ষিপ্তচিত্ত, লোভী ও অনুভূতিশূন্য। সিংহলের ভেড্ডা অথবা গোল্ড কোস্ট্‌এর মেগিদিগের ভিতর হয়ত সভ্য হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে কিন্তু ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে তাহার কোনও চিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

আদর্শের বিপর্য্যয়

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

১৪

প্রায় পাঁচ ছয় মাস অতীত হইয়াছে। বিহারে পাহাড়ে এক সহরে অরুণ কর্ম্মস্থলে আসিয়াছে। তাহার বেশ লাগে এই পাহাড়ে ঘেরা সহর।

কাছারীর নিকটে পাহাড়, বাজারের নিকটে পাহাড়, বাংলোর নিকটে পাহাড়ে। সন্ধ্যার সময় বা চাঁদিনী রাতে অরুণ নীহারিকা ও বাঁটুলকে লইয়া মোটরগাড়ীতে পাহাড়ের পথে অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া আসে।

নীহারিকার প্রতি বাঁটুল বেশ আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঁটুলের বয়স বারো, নীহারিকার বয়স পনেরো। বাঁটুল হইয়াছে তাহার খেলার সঙ্গী। দুজনের অনেকটা সময় এঁকা-বেঁকা গিরি-নির্ঝরিণীর তটে বসিয়া কাটিয়া যায়। বাঁটুল কখনও আগ্রা বা নৈনিতালের বা সিমলার গল্প বলে, নীহারিকা অবাক হইয়া শোনে ও বাঁটুলের বিরাট অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হয়। বাঁটুলকে সে অত্যন্ত যত্ন করে, তাহাকে আদর-যত্ন করিয়া সে তাহার ভ্রাতাদের অভাব ভুলিতে চেষ্টা করে। বাঁটুলের মধ্যে সে যেন পঁচুকে খুঁজিয়া পায়।

অরুণ চিরকালই পুস্তকানুরাগী। এখানে আসিয়া সে অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছে। কখনও একাকী কখনও বা ইংরাজী বিখ্যাত উপন্যাস-এর অনুবাদ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত নীহারিকাকে অরুণ বুঝাইয়া দেয়। ভবভূতির গৌরীর রূপের মাধুর্য্য যে কি ; তাঁহার প্রতিভা যে কত বড়, কেন সমগ্র জগৎ শ্রদ্ধার সহিত গৌরীর রূপকে গৌরবের বস্তু মনে করে তাহা স্ত্রীকে বোঝায়।

এইরূপে তাহাদের জীবন কাটিতেছে। মা কলিকাতা ছাড়িয়া পুত্রের নিকটে থাকিতে চাহেন না। অরুণ বাড়ীর নীচের তলা ভাড়া দিয়া মাকে কর্ম্মস্থলে আনিতে চাহে—কিন্তু, মাতা বসতবাটী ভাড়া দেওয়া হীন মনে করেন। ভাড়াটিয়ার সহিত থাকিতে, এমন কি অল্প দিনের জন্যও, তাঁহার আভিজাত্যে বাধে। তিনি তাঁহার নাতনীকে লইয়া বালীগঞ্জের বাটীতে আছেন। তিনি বলেন বটে যে, কেহ বাড়ীতে না থাকিলে বাড়ী নষ্ট হইয়া যাইবে। অরুণ কিন্তু মনে-মনে ভাবে যে, মা ইচ্ছা করিলে কি এই চার পাঁচ মাসের মধ্যে একবার আসিতে পারিতেন না। তাহার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে বিবাহের সময় তটিনীকে বিবাহ করিবে, এই মত প্রকাশ ও তর্ক করায় মাকে সে যে ব্যথা দিয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে হয়তো তিনি ভুলিতে পারেন নাই।

তবে নীহারিকাকে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, পূজার সময় তিনি নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিবেন। নীলাম্বর পত্র লিখিয়াছেন, জামাইষষ্ঠীতে অরুণের আসা যখন সম্ভব হইল না, তখন পূজার সময় জামাতা ও কন্যাকে আসিতেই হইবে।

হিন্দু পরিবারে পূর্ব্বে ছিল (এখনও যে একেবারে নাই তাহা নহে, তবে যাহাতে তাহা লুপ্ত হয় তাহার চেষ্টা লক্ষিত হয়), বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থাকিলেও শাশুড়ী, শ্বশুর, দেবর, ননদ, ভাসুর ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সহিত প্রায়ই তাহাদের থাকিতে হইত। তাহাতে বিবাহিত জীবনে প্রথম হইতেই সংযম, সংকোচ, লজ্জা কতকটা উভয়কে বাধ্য হইয়া রক্ষা করিতে হইত এবং বাধ্য হইয়া বধূকে অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, স্বামীর ক্ষেত্রেও তাহাই। এই স্বার্থত্যাগের পথটাকে বধূ-নির্য্যাতনরূপ প্রথারই আকারে অধুনা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। হয়তো কতক ক্ষেত্রে বধূরা শাশুড়ী কর্ত্তৃক নির্য্যাতিতা হন, কিন্তু তাহার কারণ অনেক সময়েই পুরুষের অস্বাভাবিক স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতা। শুধু নারীর দোষ দেওয়া উচিত নহে। স্বামীর বা শ্বশুরের সহানুভূতি না থাকিলে কোন হিন্দু পরিবারে বধূ বা শাশুড়ীর নির্য্যাতন সম্ভব নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির মোহে আমরা আজ বিবাহিত জীবনে নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া গণ্ডী সৃষ্টি ও বাস করিবার রীতিতে আস্থাবান—এমন কি সহোদর ভ্রাতা বা ভাগিনেয়

সঙ্গে থাকিতে চাহিলেও অনেক সময় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ফেলি। কিন্তু ইহার যে কি বিষময় ফল, তাহা অনেক পরিবারের জীবনযাত্রার ইতিহাস লইলে পরিস্ফুট হইবে। যে স্ত্রী নিজে শাশুড়ী, দেবর, ননদ, ভাসুর লইয়া ঘর করেন নাই, তিনি যে নিজের পুত্রবধূ, বিবাহিতা কন্যা লইয়া ঘর করিতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না এবং তাহার দৃষ্টান্তও আমাদের সমাজে বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য নহে। যেখানে গৃহকর্ত্রীর নিজের এ শিক্ষা বা সাধনা নাই, সে স্থলে নিজের পুত্রবধূ, পুত্র, বিবাহিতা কন্যা, জামাতা প্রভৃতিকে লইয়া বাদ-বিসম্বাদ, দুঃখ-অশান্তি, কলরব আসিয়া দেখা দিলে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

বাঁটুলের উপস্থিতি সেই কারণে অরুণের সংসারে বিশেষ প্রয়োজন ছিল—বাঁটুলকে লইয়া নীহারিকার এক ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। কোথায় তাহার কাপড়-চোপড়, পুস্তক থাকে তাহার ঠিক থাকে না, বিছানায় অনেক সময়ে পুস্তক ছড়াইয়া থাকে, দাঁত মাজিতে সে চাহে না, সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিতে চাহে না, ভোরে কিছুতেই বাঁটুল উঠিবে না, এই সব নীহারিকাকে দেখিতে হয়।

চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর গৃহ চাকুরীর প্রভাবে গড়িয়া উঠে। গৃহস্থ যেখানে কেবল চাকুরীয়া, সেখানে গৃহিণী চাকুরীয়ার চাকুরীর ন্যায়ই অলঙ্কারস্বরূপ বিরাজ করে, গৃহটা সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। অরুণের সেই গৃহে বাঁটুল যেন পারিবারিক প্রতীক্ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উপস্থিত।

পশ্চিমে বাঙ্গালীরা যদি পদস্থ কর্ম্মচারী হন্ তাঁহারা বিশেষ ইঙ্গ-বঙ্গ চাকচিক্যে প্রভাবিত হন। তাহার সুন্দর প্রতিষেধক স্বরূপ বাঁটুল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অরুণ ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার, পদস্থ কর্ম্মচারী, ধনীর পুত্র। তদুপরি মোটরগাড়ী, তাহাও আবার সদর সাবডিভিসনাল অফিসার অপেক্ষা যথেষ্ট বড় ও দামী। বাড়ীতে তাহার মা বা বোনের উপস্থিতি নাই, অথচ তাহার স্ত্রী মেমসাহেব নহেন, স্বামীর মোটরে গিয়া চাপরাশীর সহিত বাজার করেন না, বা দোকানে গিয়া জিনিষপত্র লইয়া ক্রেডিট্ মেমোতে সহি করেন না। বাড়ীতে মুর্গীর ঘরে মুর্গী না রাখিয়া সে-ঘর 'অস্পৃশ্য' হিসাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, এই সব ব্যাপারে স্থানীয় পদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে অরুণ ও অরুণের স্ত্রীকে লইয়া অনেক হাসাহাসি, বিদ্রূপ চলে, কিন্তু বিদ্রূপ ও হাসির মধ্যে কেহ কেহ যে চিন্তা করেন কি না যে, অরুণ হয় তো ঠিক পথেই চলিতেছে—তাহাও বলা কঠিন।

জেলার বড় হাকিমের স্ত্রী মিসেস্ চ্যাক্‌লাদার কি উকীল, কি সাহেব, কি অফিসার, সকলের সহিত কেমন আলাপ করেন। বাড়ীতে পার্টি দেন, সকলেই সুখী, কিন্তু অরুণ অমন সুন্দরী স্ত্রী লইয়া ঘরের মধ্যে আছেন, ইহা মিসেস্ চ্যাক্‌লাদারের দুঃসহ বোধ হইয়াছে। তিনি জোর করিয়া দুইবার নীহারিকাকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গিয়াছেন। অরুণ নেহাৎ দায়ে পড়িয়া ভদ্রতার খাতিরে স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নীহারিকার মোটে ভাল লাগে নাই, মিসেস্ চ্যাক্‌লাদারের নাকি মিহি সুরে মেম সাহেবের ন্যায় "বয় বয়" ডাক তাহার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। তাহা ব্যতীত কয় দিন গিয়া মিসেস্ চ্যাক্‌লাদারের শাশুড়ী যে কি নির্য্যাতিতা ও অপমানিতা হন তাহা দেখিয়া সে আর কিছুতেই ও বাড়ীতে যাইবে না, এইরূপ স্থির করিয়াছে। চ্যাক্‌লাদারের মা যে ভাবে বাড়ীতে আছেন তাহাতে চ্যাক্‌লাদারের স্ত্রীর বিশেষ লজ্জিত হওয়া উচিত বলিয়া নীহারিকার মনে হইয়াছে। কিন্তু ইহাও যেন মিসেস্ চ্যাক্‌লাদারের অগণিত গৌরবের আর একটা গৌরব, এই ভাবই তিনি দেখাইয়াছেন।

সে দিন মিসেস্ চ্যাক্‌লাদার নীহারিকাকে লইয়া সহর হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক মেলায় যাইবেন বলিয়া আসিয়াছেন। মিঃ চ্যাক্‌লাদার বাহিরে বসিয়া অরুণের সহিত গল্প করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই মিসেস্ চ্যাক্‌লাদার মুখ লাল করিয়া বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইলেন। স্বামীকে বলিলেন, "চল, আর আসব না এখানে।"

অরুণ তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, "কেন? কেন মিসেস্ চ্যাক্‌লাদার, আপনি চটলেন কেন?"

মিসেস চ্যাক্‌লাদার বলিলেন, "মিসেস রায় বললেন যে আমি বড় শাশুড়ীকে নির্য্যাতন করি। যতদিন আমার শাশুড়ীর কষ্ট দূর না হয় তিনি আমার বাড়ীতে যাবেন না এবং আমার সঙ্গে মেলামেশা করবেন না।" মিঃ চ্যাক্‌লাদার অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

মিসেস্ চ্যাক্‌লাদারকে কোন মতে বুঝাইয়া বিদায় করিবে

বলিয়া অরুণ ভাবিতেছিল, কিন্তু তিনি ইহা লইয়া একটা বুঝা-পড়া করিবেন, এমন ভাব দেখাইতে অরুণেরও মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। দুই পক্ষে বেশ গোলমাল বাধিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত অরুণ তাহার পোষাকী ভব্যতার আবরণও রাখিতে পারিল না এবং অতি স্পষ্ট করিয়াই মিসেস্ চ্যাক্লাদারকে নীহারিকার হইয়া জানাইয়া দিল, "সে সবল, তার মনে যে কথা লেগেছে, খুবই স্পষ্ট করে সেটা যদি জানিয়েই থাকে তো সে কী অন্যায় করেছে? Excuse me (ক্ষমা করবেন), মিসেস্ চ্যাক্লাদার আমি নিজেই দেখেছি যে, আপনার চাপরাশীদের খোদ কর্ত্তা বা গিন্নী কোন ফরমায়েস ক'রলে তৎক্ষণাৎ তারা দৌড়তে দৌড়তে সে কাজ করে, আর আপনার শাশুড়ী যদি কোন কাজ ক'রতে বলেন, তারা বসে বসে গল্প করে, খৈনী খায়, যদি দয়া হল আধ ঘণ্টা পরে সে কথায় কান দেয় বা অনেক সময় শুনেও শোনে না।"

মিঃ চ্যাক্লাদার বলিলেন, "মিঃ রায়, এর মধ্যে কথা আছে।"

অরুণ—"কোন কথা নেই মিঃ চ্যাক্লাদার। আপনাদের এই ভাব চাকর-বাকর দেখে। আপনারা যাকে খুব শ্রদ্ধা করেন না। তা নইলে চাকর-বাকর সাহস করে? করুক্ তো আমার বাড়ীতে দেখি।"

মিঃ চ্যাকলাদার বলিলেন, "মিঃ রায়, এটা ঘরোয়া ব্যাপার, এ নিয়ে—"

অরুণ বলিল, "ঘরোয়া বটে, কিন্তু এটা এত সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সাধারণ প্রশ্ন হিসাবেই একে দেখা দরকার এবং জনমতের চাপে একে দূর করা দরকার। Excuse me Mr. Chakladar, if I am guilty of any offence, that is, for holding brief for your old mother. (যদি আপনার বুড়ী-মার হয়ে দু'টো কথা বলে কোন অপরাধ করছি বিবেচনা করেন, তবে মিঃ চ্যাকলাদার আমাকে ক্ষমা করবেন)।"

মিসেস চ্যাকলাদারকে আবার অরুণ বলিল, "ক্ষমা করবেন আমায়—সত্যি কথা বলে ফেলাই ভাল।"

মিসেস চ্যাকলাদার বলিলেন, "সব দোষই আমাদের স্থির হয়ে গেল! এক তরফা বিচার স্বামী-স্ত্রী করে বসলেন।"

অরুণ বলিল, "আপনাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম যে, আপনার সঙ্গে আমার স্ত্রীর খাপ খাবে না। তা ঐ মুর্গীর ঘর তাড়ানো ব্যাপারেই বুঝতে পারেন নি?"

মিঃ চ্যাক্লাদার বলিলেন, "ও একটা সামান্য ব্যাপার। আমাদের ডেপুটী কমিশনারও যে ভেজিটেরিয়ান্। তাঁর বাড়ীর লোকদের সঙ্গে যদি খাপ খায় তো আপনাদের সঙ্গে খাপ খাবে না কেন?"

অরুণ বলিল, "এই জন্য খাপ খাবে না যে, আপনার সঙ্গে আমাদের আদর্শ নিয়ে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। আপনারা ভাবছেন আমার স্ত্রী লেখা-পড়া জানেন না, রুচিজ্ঞান (culture) নেই। আপনারা তাকে আলোক-প্রাপ্তা করতে চেষ্টা করছেন। তিনি মনে করেছেন যে, আপনারা সব ভুল পথে যাচ্ছেন, এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার (western culture) গুরুগিরি (patronage) সে সহ্য করতে পারে না। যাক্ ওসব নিয়ে তর্ক না করাই ভাল। এখন চা-র সময়, দয়া ক'রে একটু চা খাবেন কি?"

মিসেস চ্যাক্লাদার বলিলেন, "ক্ষমা করবেন। আমাদের বিশেষ কাজ আছে; চল।" উত্তরে প্রস্থান করিলেন।

অরুণ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, "মিসেস চ্যাক্লাদারকে অন্য কোন কারণ দেখিয়ে ব'লতে পারতে যাবে না, একটু রেখে ঢেকে কথা ব'লতে শেখ। আমি একে রেখে ঢেকে কথা ব'লতে পারি না, সেই জন্য তোমার আরও সেটা দরকার। হয় তো মিঃ চ্যাক্লাদারের সঙ্গে এই থেকে বিবাদ হয়ে গেল।"

নীহারিকা বলিলেন, "তুমি জান না যে, কি দায়ে প'ড়ে আমার এ কথা ব'লতে হয়েছে। নিজে গিন্নী কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কম দামের শাড়ী পরেন না, আর শাশুড়ী তিন টাকা কি চার টাকা দামের পাতলা থান শাড়ী চেয়েছেন, অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন মোটা কাপড় আর টানতে পারেন না, এই জন্য কি অপমানটা আমার সামনে শাশুড়ীর ক'রলেন।"

অরুণ শুনিয়া কেবল বলিলেন, "রাধামাধব! ওদের সঙ্গে আর আলাপ না করাই ভাল।"

১৫

শশধর ও তাঁহার স্ত্রী প্রায় একমাস হইল অরুণ ও নীহারিকার নিকটে আসিয়াছেন। শশধরের স্ত্রীর দারুণ ম্যালেরিয়া হইয়াছিল। অত্যন্ত রুগ্ন হইয়াছিলেন, এখন প্রায় পূর্ব্বের শরীর দেখা দিয়াছে। শশধর নীলাম্বরের বাটীতে শ্রীরামপুরে নীহারিকার বিবাহের পর আর পদার্পণ করেন নাই, অথচ নীহারিকা ও অরুণের সহিত ইতিমধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। জগত্তারিণী দেবীর নিকটেও প্রায় গমন করেন, তাঁহার মোটর গাড়ীতে ভ্রমণও করেন। নীলাম্বর সৌদামিনী সবই খবর পান ও মনে মনে হাসেন। এরূপ হাসি হাসিবার সুযোগ অনেক সময়ে আমাদের নিজেদের জীবনের খুঁটী-নাটী সমালোচনায়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়, অথচ অন্যের ক্ষেত্রে তাহা দেখিলে হাসি আসে। হাসিবার কোন কারণ নাই, যাঁহারা জীবন-ভোর ধনী আত্মীয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত, যাঁহারা জীবনে নিজের অবস্থা লইয়া সন্তুষ্ট নহেন, যাঁহারা ধনীর আত্মীয়তাকে গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করেন এবং সে আত্মীয়তা বজায় রাখিতে হীনতাকে সত্যকারের আত্মমর্য্যাদার অভাব মনে না করেন, আমরা তাঁহাদের বিশেষ দোষ দিতে পারি না, সে আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান যে এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে লুপ্তপ্রায়—সেই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আমরা হাসিতে পারি, কিন্তু সে হাসিতে যেন ঘৃণা মিশ্রিত না থাকে।

দরিদ্রের, মধ্যবিত্তের অনেক বন্ধু আছে—কিন্তু ধনী অর্থে সমৃদ্ধ হইলেও সত্যকারের বন্ধু তাহার নাই—এক ধনী আর এক ধনীর মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিবে না, আর মুরুব্বিয়ানা না করিলেও বা ধনীদের জীবন সুখে কাটিবে কি করিয়া? এ ক্ষেত্রে ধনীর সুখে জীবন যাপন করিবার একমাত্র অবলম্বন এই ধরণের আত্মীয়; তাহা না হইলে বেচারী ধনীরা যাইবে কোথায়? তাহা হইলে শশধরেরও সমাজে এইরূপ ধনী আত্মীয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও প্রলোভনের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

সুতরাং তাঁহারা অরুণ ও নীহারিকার বাড়ীতে এক মাস কেন তিন মাস থাকুন, তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন ও অরুণের বিরাট মোটর গাড়ী চড়িয়া পর্ব্বত-শিলার, গিরি-নির্ঝরিণীর দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া দেখুন, আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

নীহারিকা কি সেবা-যত্নই তাঁহাদের করিতেছে! খুড়ীমাও তাহার সেবা ও প্রচুর দুগ্ধ পান করিয়া বেশ সবল সুস্থ হইয়াছেন। শশধর দেখিতে সুপুরুষ না হইলেও শরীর যথেষ্ট ভাল হইয়াছে এবং কালো হওয়ার দরুণ রক্তের প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডলে বেগুনে রং প্রতিভাত হইতেছে।

বাংলোতে চাকর-বাকরের প্রাচুর্য্য নাই। না থাকিলেও সকলেরই আদব-কায়দা খুবই ভাল, তাহাতে নীহারিকা অপেক্ষা অরুণের কৃতিত্বই বেশি। বাড়ীতে বাবু ও মা'জীকে বেশি খাতির করিতে হইবে, যেহেতু তাহাদের বাড়ী ও তাহারাই বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী, চাকর-ঝি বাবু ও মাইজীর আত্মীয়ের কি অবস্থা তাহা গোপনে জানিয়া ক্রমশঃই তাহাদের হুকুম তাচ্ছিল্যের সহিত তামিল করা ও খাদ্যের বিলি-ব্যবস্থায় কর্ত্তা-গিন্নীর সহিত পার্থক্য করা—এই সব সর্ব্বনেশে রেওয়াজ অরুণের বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই। অরুণ অভিজাত অঞ্চলে এই রেওয়াজ এত ঘৃণার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে যে, তাহার বাসাতে এ ব্যবস্থা যাহাতে অলক্ষিতেও প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে সে বিশেষ সচেতন ছিল। জগত্তারিণীর জীবিতাবস্থায় কলিকাতার বাটীতে যে এ ব্যবস্থা কোন দিন প্রবেশ করিবে না, সে বিষয়ে অরুণ এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল। যেদিন শশধর স্ত্রীসহ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন, সেদিন হইতেই তাঁহারা রাজার হালে রহিয়াছেন। সহর ষ্টেশন হইতে চল্লিশ মাইল দূরে হইলেও এবং বিশেষ সুবিধাজনক বাস-সার্ভিস থাকিলেও অরুণ নিজে গাড়ী লইয়া তাঁহাদের লইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

তদবধি শশধর ও তাঁহার স্ত্রী বেশ আনন্দেই আছেন। মাঝে মাঝে অরুণ, নীহারিকা, বাঁটুল, শশধর ও তাঁহার স্ত্রী অনেক দূর দূর গণ্ডগ্রামে বেড়াইতে যান—কোন সময় বা ডাকবাংলোতে গিয়া পাহাড়ের ধারে সময় কাটান—গিরি-নির্ঝরিণীর এঁকা-বেঁকা পথের মধ্য হইতে উত্থিত পাহাড়ের মধ্যে গরিমাময় সূর্য্যাস্ত দেখেন।

একদিন অরুণ বিশেষ আগ্রহ করিয়া তাঁহাদের লইয়া প্রায় দেড়শো মাইল দূরে একটি সুরম্য স্থানে গেল। ঠিক ছিল সেখানে নীহারিকা খিচুড়ী রাঁধিবে, শশধরের

স্ত্রী ছানার ডালনা রাঁধিবেন। বাড়ী হইতে প্রচুর ক্ষীরের মালপো আনা হইয়াছে ও বাড়ীর সন্দেশ ও পশ্চিমে মহিষের দুগ্ধের ঘন বাদাম দেওয়া দধি, তাহার সব প্রায় তিন ইঞ্চি মোটা। গব্যঘৃত অতি উত্তম, বলাই বাহুল্য। ইন্‌কাম-ট্যাক্সের হাকিম অরুণ, মাড়োয়ারী আর যাহাকে যে প্রকারই ঘি দিক, অরুণের জন্য বাড়ীতে সর জ্বালাইয়া ঘি তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে। আর, সকলেই জানে যে, বিনা পয়সায় কাহারও নিকটে এক কাণা কড়িও সে গ্রহণ করে না। যাহা ন্যায্য দাম তাহাই দেয়। এ-ক্ষেত্রে গব্য ঘৃত যে ভাল হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নিকটেই জলপ্রপাত। তাহাতে স্নানেরও ব্যবস্থা আছে। সকলেই তাহাতে স্নান করিলেন, কেবল শশধরের স্ত্রীকে অরুণ নিষেধ করিল, বোধ হয় ম্যালেরিয়া আবার হয় তো ধরিতে পারে এই আশঙ্কায়।

অরুণের সঙ্গে ভাল উইনচেষ্টার রাইফ্‌ল্‌ও ছিল—কেন না বাঘ এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য মোটেই নহে।

শশধর বিশেষ ভোজনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মেয়েদের মধ্যে কি রকম তাঁহার রন্ধনের জ্ঞান তাহাই দেখাইতে রান্নার স্থলে তাঁহার হুকুম লইয়া খাড়া রহিয়াছেন। বাঁটুল "গুল্‌তী" হস্তে তাহার পরম বন্ধু বাংলোর মালীর পুত্র হরিয়'কে লইয়া কাঠবিড়ালীর সন্ধানে বাহির হইয়াছে। অরুণ কি করিবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পাহাড়ের ধারে জলপ্রপাতের নিকটে যেখানে অনেকটা জমি নীচু হইয়া-গিয়াছে সেইখানে ঘুরিতেছিল।—

স্নান-আহার সমাপন হইলে সকলে বিশ্রামের আয়োজন করিল। বাঁটুল চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহে। সে যে একটাও কাঠবিড়ালী মারিতে পারে নাই কেন, তাহার কারণ সকলকে সবিস্তারে বলিয়া সকলকেই ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। ড্রাইভার আসিয়া বলিল যে, গাড়ীর ফুটলাইট্‌ থাকিলেও পার্কলাইট্‌ নাই—এ-রাস্তায় বড় বাঘের ভয়, সুতরাং আধঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে। অরুণ বলিল, "ভয় নেই—চাঁদনী রাত আছে—তবুও নাও—চা তাড়াতাড়ি সারো।"—বাংলোর মালী জানিত সাহেব ছাগলের দুধে চা খাইতে ভালবাসেন। সে দুধ জোগাড় করিয়াছিল—সুরভি, সু-গন্ধ সোনালী রং-এর চা খাইয়া সকলেই রওনা হইলেন।

ড্রাইভার গাড়ী চালাইতে চালাইতে প্রায় প্রত্যেক নদী বা কুণ্ডের কাছে আসিয়া বাঁটুলকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত এই সব স্থানে বাঘ কবে কোন্‌ সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল, কোন্‌ মেমসাহেবের কোল হইতে বাঘ কিরূপে হঠাৎ শিশু লইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল, এই সব গল্প করিতেছিল। কিন্তু তাহাতে বাঁটুল কিছু মাত্র দমিত বা ভীত না হইয়া নৈনী-তালের বাঘের উপদ্রবের কথা ড্রাইভারকে বলিয়া তাহাকে বিস্মিত করিতেছিল। এই সব আলোচনা অরুণের উপভোগ্য হইলেও শশধর ও শশধরের স্ত্রী ও নীহারিকার মুখমণ্ডলে আনন্দ অপেক্ষা ভীতির লক্ষণ পরিস্ফুট হওয়ায় অরুণ এ প্রসঙ্গ থামাইতে বলিল।

গাড়ী যখন সহর হইতে প্রায় সত্তর মাইল দূরে পাহাড়ের নিকটে সমতল ক্ষেত্রে একটি অশ্বত্থ গাছের নিকটে পৌঁছাইয়াছে, তখন দেখা গেল, একটি মোটরগাড়ী ধাক্কা খাইয়া সম্মুখের দিক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। কাঁচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একজন লোক (বোধ হয় ড্রাইভার) অজ্ঞান, পাঞ্জাবী এক ভদ্রলোক দূর হইতে জল লইয়া আসিতেছেন। অনতিদূরে এক মহিলা আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন। মুখে, কপালে রক্তের দাগ। প্রায় অজ্ঞান অবস্থা, মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে-ছেন। অরুণ নামিয়া নিকটে গিয়া ভূপতিত রমণীকে দেখিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ কি, তটিনী!"

রমণীটি ভয়ানক ভাবে আহত হইলেও তখনও তাহার জ্ঞান ছিল। অরুণকে সে চিনিতে পারিল। ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাহাকে নিকটে বসিতে বলিল। অরুণ কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল, হাত জোড় করিয়া তাহাকে তটিনী নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। নিকটে গেলে অরুণকে তটিনী অস্ফুট স্বরে বলিল, "তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, এই শেষ। বড় বেদনা, বড় বেদনা, বুকে। ঘাড়ও ভেঙ্গে গিয়েছে বোধ হয়। উঃ! নিজে বাহাদুরী ক'রে গাড়ী চালাতে গিয়ে......উঃ, পাঞ্জাবী ভদ্রলোক? উনি আমার......" অরুণ এক দৃষ্টে তটিনীকে দেখিতেছিল। খানিক পরে তটিনী বলিল, "তোমার স্ত্রী আছেন এই গাড়ীতে? নীহারিকা?" নীহারিকাও গাড়ী হইতে নিকটেই আসিয়া

দাঁড়াইছিল। অরুণ তাহাকে কাছে আসিতে বলিল। তটিনী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "সুন্দর, এস ভাই।" নীহারিকা কাছে আসিতে তটিনী তাহার হাত ধরিল।

অরুণ সে স্থান হইতে সরিয়া গিয়া শশধরকে বলিল, "কাকা আপনি এখানে জল দিন এদের মাথায়। আমি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনি—"

তারপর? তারপর ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন। স্থানীয় হাসপাতালে (যদিও তাহাকে হাসপাতাল বলিলে লজ্জা পাইতে হয়) অরুণের গাড়ীতে তটিনীকে লইয়া যাইতে যাইতেই অবস্থা তাহার ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল।

অরুণ একবার জিজ্ঞাসা করিল, "সহর প্রায় এখান থেকে সত্তর মাইল ডাক্তার সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসব?"

ডাক্তার বলিলেন, "দেখছেন না, ঘন ঘন রক্ত-বমি আরম্ভ হয়েছে, জোর আধ ঘণ্টা।"

তটিনীর মর্ম্মভেদী চীৎকার ও ক্রন্দন হাসপাতালের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল। অরুণ ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আরও কিছুক্ষণ......অরুণের হাত ধরিয়া তটিনী কি বলিতে যাইতেছিল, বলিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে তটিনীর মরজগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। সেই পর্ব্বতমালার বেষ্টিত গ্রামে গিরি-নিঝরিণীর তটে ধীরে ধীরে তটিনীর দেহ ভস্মীভূত হইল।

[সমাপ্ত

তোমার উপমা

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আকাশ দেখিতে সাগরের মত
অগাধ অতল পবিধিহীন
অনবচ্ছেদ, অনন্তরাল,
শূন্যে পূর্ণ পূর্ণে লীন।
সাগর দেখিতে আকাশেরই মত
ঊর্ম্মিমুখর সলিলে ভরা
শুধু নীলিমায় নীলিমা মিশায়
যাহার কন্যা বসুন্ধরা।

লাল ফুটিয়াছে রক্ত জবায়
সবুজ বরণ দূর্ব্বাদলে
পীত বিকশিত অতসীর গায়
শ্বেত শতদল সরসীজলে।
স্বরূপের ছায়া মুকুরের গায়
প্রাণঘন রূপ ফোটে না কভু
তবু উপমায় কবিরা বুঝায়
তোমার উপমা তুমিই প্রভু।

বর্ত্তমান জগৎ

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ইউরোপে অবশেষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহাকে এখনই মহাযুদ্ধ বলিলে ভুল হইবে। কারণ এখনও ইহা একদিকে ফ্রান্স, বৃটেন ও পোলাণ্ড এবং অন্যদিকে একা জার্ম্মানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, যুদ্ধ যদি দীর্ঘকাল চলে, তাহা হইলে আজও যাহারা নিরপেক্ষ আছে, তাহারাও এক পক্ষে অথবা অপর পক্ষে যোগদান করিতে বাধ্য হইবে। এই আন্তর্জ্জাতিকতার যুগে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে নিঃসঙ্গ থাকিবার উপায় নাই। কি সুদূর প্রাচ্যের জাপান, কি আটলান্টিকের অপর তীরবর্ত্তী আমেরিকা, এই যুদ্ধের ফলাফল সকলকেই স্পর্শ করিবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কথায়:—

"When peace was broken anywhere the peace of all countries is endangered. Passionately though we desire detachment, we are forced to realise that every word that comes through the air, every ship that sails the seas, every battle that is fought does affect the American future."

অবস্থা যেখানে এই প্রকার, সেখানে আজ এই যুদ্ধ কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে ইহা মহাযুদ্ধে পরিণত হইবে কি না কে জানে।

মিঃ চেম্বারলেনের বাণী

জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ সেপ্টেম্বরেই বাধিত যখন জার্ম্মানী চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। মিঃ চেম্বারলেনের তোষণ-নীতির জন্য তাহা বাধিতে বাধিতে বাধে নাই। মিউনিকে চেকরাজ্য হিটলারের হস্তগত হওয়ায় সে যাত্রায় পৃথিবী যুদ্ধের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধই অবশেষে বাধিল, অথচ জার্ম্মানীকে অনর্থক শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করা হইল।

বৃটেন কেন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল, সে সম্বন্ধে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বেতারযোগে মিঃ চেম্বারলেন জার্ম্মান জাতির নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে:

"আমাদের স্বার্থ ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত কিন্তু তথাপি পূর্ব্বসীমানার কোন শক্তিকে রক্ষা করিবার কি প্রয়োজন হইল? অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইহার একমাত্র উত্তর আমার দেশের কেহই আপনাদের নেতার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

"আমরা জার্ম্মান জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি না, সংগ্রাম করিতেছি একটি কৃতসঙ্কল্প অত্যাচারী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই শাসন-ব্যবস্থা স্বদেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং আপনাদের ও আমাদের নিকট যাহা কিছু বরণীয় তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।"

মিঃ চেম্বারলেন আরও জানাইয়াছেন: "আপনাদের গবর্ণমেণ্ট প্রথমে স্বাধীন পোলাণ্ড আক্রমণ করিয়া তথায় বোমাবর্ষণ করিয়াছে। ইংলণ্ড পোলাণ্ডকে রক্ষা করিতে বাধ্য। বৃটিশ 'নোটে'র পরেও যখন আপনাদের সৈন্যবাহিনী অপসৃত করা হইল না, তখন যুদ্ধ ঘোষিত হইল।"

যুদ্ধ বাধিল কেন?

ইটালী পশুবলের সাহায্যে আবিসিনিয়া দখল করিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ বাধে নাই। স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংস হইয়া গেল, তাহাতে যুদ্ধ বাধে নাই। অষ্ট্রিয়া গেল, চেকরাজ্য গেল, মেমেল গেল, তাহাতে যুদ্ধ বাধে নাই। এশিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্তে চীনের উপর নৃশংস আক্রমণ চলিতেছে, উদ্ধত জাপান বৃটিশ নরনারীর উপর পর্য্যন্ত জঘন্য অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করে নাই, তাহাতেও বৃটেন অস্ত্রধারণ করে নাই। আর আজ সামান্য ডানজিগ্ (যাহার সহিত বৃটেনের বিন্দুমাত্র স্বার্থও সংশ্লিষ্ট নয়) লইয়া যুদ্ধ বাধিবার হেতু কি? অত্যাচারীর রথচক্র নিরঙ্কুশ নির্ম্মমতায় এতটা পথ আসিয়া অকস্মাৎ

ডানজিগে পৌছিয়া মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং তাহার সুপবিত্র জন্মগত অধিকার বিপন্ন করিল কেন?

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। এবং একমাত্র উত্তর এই যে, বৃটিশ জাতি হিটলারের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আর নিঃশঙ্ক বোধ করিতে পারিল না। পোলাণ্ডের সহিত বৃটেন এবং ফ্রান্স সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ। যে কোন কারণে কেহ পোলাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন করিলে উভয়েই তাহার সাহায্যে অস্ত্রধারণ করিতে প্রতিশ্রুত। জার্ম্মানী প্রথমে পোলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে। অবিলম্বে সৈন্য অপসৃত করিবার জন্য বৃটেন জার্ম্মানীকে চরমপত্র দিয়াছিল। জার্ম্মানী সৈন্য অপসৃত করে নাই। বৃটেন এবং ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু এমন চুক্তিতো ফ্রান্স এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যেও ছিল। সেবারে যুদ্ধ বাধে নাই।

হিটলার-চেম্বারলেন পত্রাবলী

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে হের হিটলার ও মিষ্টার চেম্বারলেনের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয় জন-নায়কের মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। পোলাণ্ড সম্বন্ধে মিঃ চেম্বারলেনের দৃঢ়তা অবলম্বনের কারণস্বরূপ এই জানা যায় যে, ১৯১৪ সালে বৃটেন জার্ম্মানীকে তাহার মনোভাব সুস্পষ্ট করিয়া জানাইলে যুদ্ধ বাধিত না বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন। এই ধারণা সত্যই হোক আর ভ্রান্তই হোক, এবারে বৃটেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করাই স্থির করে। মিঃ চেম্বারলেন যুদ্ধের প্রাক্কালে শান্তির জন্য যে-সকল সুদীর্ঘ পত্র হিটলারকে লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকখানিতে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছিলেন যে, বৃটেন পোলাণ্ডকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা পালন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। যে কোন কারণে জার্ম্মানী পোলাণ্ডের সীমানায় হানা দিলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য।

হের হিটলার মিঃ চেম্বারলেনের এই কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না, জানি না। স্পেন, অষ্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ক্ষেত্রে বৃটেন যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে অনেকেই ইহাকে শূন্যগর্ভ হুমকি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিটলারের পক্ষেও সেই ভুল করা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া রুষ-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ চুক্তিও তাঁহার দম্ভ অনেকখানি বৃদ্ধি করিয়াছে। চেম্বারলেনের পত্রে ১৯১৪ সালের যে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, ১৯১৪ সালের তুলনায় এবার জার্ম্মানী অনেক বেশী শক্তিশালী। রুশের সহিত বিনা সর্ত্তে অনাক্রমণ চুক্তি হওয়ার ফলে জার্ম্মানীকে আবার একটি মাত্র সীমান্তে যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া রুশের নিকট হইতে যে খাদ্য শস্য আসিবে, তাহাতে যুদ্ধ দীর্ঘকাল থাকিলেও তাহার খাদ্যাভাব হইবে না। সম্ভবতঃ এই ভরসাই তাহাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে।

মিঃ নেভিল চেম্বারলেন।

রুশ-জার্ম্মান চুক্তির ফল

রুশ-জার্ম্মান চুক্তির ফলে পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতিতেই প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যদি প্রস্তাবিত ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ চুক্তি সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে দুই সীমান্তে তিনটি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে জার্ম্মানী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস করিত কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে রুশ নিজেও কম নিরাপদ বোধ করিতেছে না। এক দিকে জাপান, অন্যদিকে জার্ম্মানী তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। এখন ইচ্ছা

করিলে সে অবাধে চীনকে সামরিক সাহায্য দান করিতে পারে। চীন ইহার ফলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইহার সব চেয়ে বড় ফল কোমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল। কমিউনিজম্ অর্থাৎ রুশের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী ইটালী ও জাপান যে চুক্তি করিয়াছিল, তাহার শেষ হইয়া গেল। জাপান রীতিমত বিব্রত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে বৃটেনের বিরুদ্ধে তাহার পূর্ব্বতন নীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। রুশ-জার্ম্মান চুক্তি সম্পর্কে

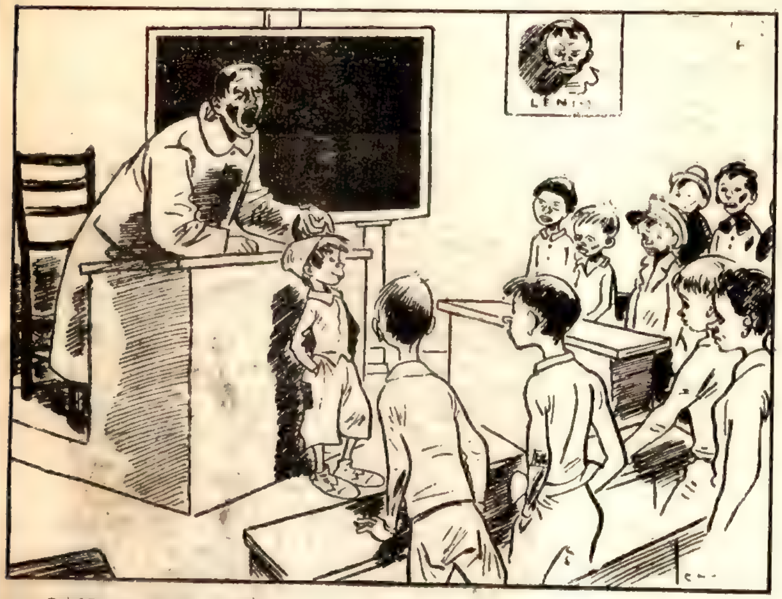

আধুনিক শিক্ষার আদর্শ (ব্যঙ্গচিত্র)

মাষ্টার মশায়।—ধর আইভান পেট্রফ, তিনি কৈশোরে স্কুলের জানালা ভাঙ্গিতেন, হেডমাষ্টারকে মারিতেন, এমন কি পরিষদগৃহে আগুন পর্য্যন্ত লাগাইয়াছিলেন…

জাপান শাসাইয়াছে যে, রুশের কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যদি চীনে তাহার স্বার্থহানি হয়, তাহা হইলে সে দেখিয়া লইবে।

বিপদ তাহার কম হয় নাই। জাপান রুশের চিরন্তন শত্রু। মাঞ্চুরীয় ও মঙ্গোলীয় সীমান্তে উভয়ের মধ্যে ছোট-খাটো খিটিমিটি লাগিয়াই আছে। এখন জার্ম্মানীর আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া যদি জাপানের বিরুদ্ধে চীনের সহিত সম্মিলিত হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে তাহার একাধিপত্য বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যেই কথা উঠিয়াছে, চীন হইতে সৈন্য অপসারণ করিলে এখনও চীনের মিত্রতা লাভ করা সম্ভব কি না। তাহা হইলে জাপান, চীন ও বৃটেন পূর্ব্ব-এশিয়ায় রুশকে সংযত রাখিতে পারে।

অপর দিকে জার্ম্মানীর মধ্যস্থতায় রুশ-জার্ম্মান চুক্তির অনুরূপ রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তির জন্যও একটা চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে চীনের সমূহ বিপদ। বৃটেনও যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িবে। জাপান এখনও নিরপেক্ষ আছে। শেষ পর্য্যন্ত কোন্ দিক্ অবলম্বন করে তাহারই উপর সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। প্রবল সাম্যবাদ-বিদ্বেষ সত্ত্বেও রুশ-জার্ম্মান চুক্তি সম্ভব হইয়াছে। তথাপি অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় না, রুশ-জাপান চুক্তি সম্ভব হইবে।

পোল্যাণ্ডের ইতিহাস

স্বাধীনতার জন্য যত দুঃখ পোল্যাণ্ড সহ্য করিয়াছে, তত দুঃখ ইউরোপের আর কোন রাষ্ট্রকে সহ্য করিতে হয় নাই। ১৭৭২ সালে পোলিশ গণতন্ত্র ধ্বংস হয়। ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ সালে পর পর তিনটি চুক্তিতে পোলিশ গণতন্ত্রকে প্রুশিয়া, রুশ ও অষ্ট্রিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ড জয় করিয়া উহাকে অর্দ্ধ-স্বাধীনতা দান করেন। ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ড অর্দ্ধ-স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। কিন্তু ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতনের পরেই আবার প্রুশিয়া, রুশ এবং অষ্ট্রিয়া উহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়।

১৮১৫ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত এই এক শতাব্দী কাল ত্রিধা-বিভক্ত পোল্যাণ্ডের উপর তিনটি বিদেশীয় প্রভুর শাসন জবরদস্ত ভাবে চলিতে থাকে। পোল্যাণ্ড সেই শাসন কোনো দিনই মানিয়া লয় নাই এবং সমানে তাহার বিরুদ্ধে

আন্দোলন চালাইয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মার্শাল পিলসুড্স্কির আবির্ভাব হইল। বর্ত্তমান পোল্যাণ্ডের তিনিই জনক। তাঁহার নেতৃত্বে পোল্যাণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের পরে রুশীয় পোল্যাণ্ড

হিটলারের স্বরূপ। (ব্যঙ্গচিত্র)

স্বাধীনতা লাভ করে এবং অবশিষ্ট অংশও মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মান পক্ষাবলম্বন না করার জন্য ভার্সাই চুক্তিতে স্বাধীনতা লাভ করে। মার্শাল পিলসুড্স্কির জীবিতকালে পোল্যাণ্ড এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, হিটলারও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন। সে চুক্তি অবশ্য এখন কাগজখণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

পোলরা বীরের জাতি। সামরিক শক্তিতেও দুর্ব্বল নয়। অস্ত্র নির্ম্মাণের জন্যও তাহাদের নিজেদের কারখানা আছে। দুর্জ্জয় সাহস এবং সুদক্ষ বিমান-চালনার জন্য তাহারা বিখ্যাত। পোল্যাণ্ডের সৈন্য-বাহিনীতে ১৮ হাজার সামরিক অফিসার আছে। বিমানবাহিনীতে আট হাজার যোদ্ধা আছে। নৌ-শক্তিও তদনুরূপ। বর্ত্তমান যুদ্ধেও তাহারা যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। এমন কি, তাহাদের বিমানবাহিনী একবার বার্লিনও আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে।

ইটালী কি করিবে

ইটালী এখন পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ আছে। পোলাণ্ড আক্রমণ করার প্রাক্কালে হের হিটলার সিনর মুসোলিনীকে এতাবৎ কালের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছেন, এখনও জার্ম্মানীর পক্ষে ইটালীর সহযোগিতার প্রয়োজন হয় নাই। যখন হইবে তখন ইটালীর সহযোগিতা যে সুনিশ্চিত পাওয়া যাইবে, সেই বিশ্বাসে পূর্ব্বাহ্ণেই ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

বৃটেন বালটিক ও উত্তর-সাগর অবরোধ করিয়া কীল-খালে জার্ম্মাণ রণপোত আক্রমণ করিয়াছে। ফ্রান্স তাহার ম্যাজিনো লাইন হইতে আক্রমণ চালাইতেছে। এই দুইটিই প্রথম শ্রেণীর শক্তি। অপর দিকে পোলাণ্ডও যে দুর্ব্বল নয়, রাতারাতি তাহাকে পরাস্ত করা যে সম্ভব নয় তাহারও প্রমাণ প্রত্যহই পাওয়া যাইতেছে। এমন অবস্থাতেও যদি ইটালীর সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে, তবে কবে থাকিবে? ইটালীর নিরপেক্ষতা সত্যই রহস্যজনক। "এক্সিস্ পাওয়ারের" এক্সিস্ কি এত সহজেই ভাঙ্গিয়া গেল? অথচ এতদিন পর্য্যন্ত আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, মুসোলিনী হিটলারের মুঠার মধ্যে আসিয়া গিয়াছেন। হিটলারের প্রভাব অতিক্রম করিয়া মুসোলিনীর না কি নড়িবার উপায় নাই। সে কি সবই মিথ্যা?

রুশের সমস্যা

এতদিন পর্য্যন্ত রুশের সন্দেহ ছিল, জার্ম্মানীতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। অনাক্রমণ চুক্তির পর সে সন্দেহের অবসান

হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনী।

হইয়াছে। রুশ আজ নিরপেক্ষ। মনের আনন্দে বিভিন্ন দেশে পণ্য সরবরাহ করিতেছে। তথাপি তাহার সমস্যা যায় নাই। এই যুদ্ধে জার্ম্মানী যদি হারিয়া যায়, সে একেবারে একা পড়িয়া যাইবে। যদি জার্ম্মানী জয় লাভ করে, তাহা হইলে ইউক্রেনের উপর যে পরিমাণ তাহার লোভ, কতদিন

যে সে অনাক্রমণ-চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে বলা কঠিন। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াও তাহার পক্ষে নিরাপদ নয়,—ওদিকে জাপান ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং নিরপেক্ষ থাকিলেও সে একেবারে নিশ্চিন্ত নয়। সেও যুদ্ধে যোগ দিবে, কি দিবে না এই উভয় সমস্যায় দুলিতেছে। তাহার অবস্থাও জাপানেরই মত দাঁড়াইয়াছে।

আমেরিকার নিরপেক্ষতা

জাপান, রুশ ও ইটালীকে বাদ দিলে বড় শক্তির মধ্যে আর বাকী থাকে আমেরিকা। বিশেষ প্রয়োজন না পড়িলে

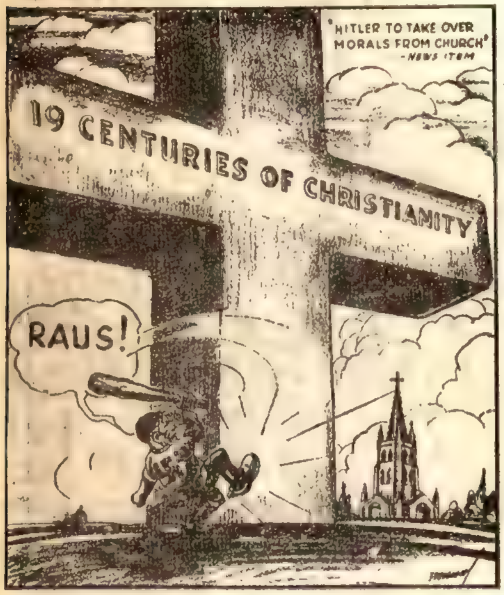

হিটলারের চেষ্টা। (ব্যঙ্গচিত্র)

ইউরোপের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে আমেরিকা বড় একটা হস্তক্ষেপ করে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, যুধ্যমান পক্ষকে নগদমূল্যে রণসম্ভার বিক্রয়ের আইন পাশ করিতে। আবিসিনিয়া এবং স্পেনের ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম হয় নাই, বৃটেন এবং জার্ম্মানীর ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম করিতে সেনেট রাজি হন নাই। রুজভেল্টের অসামান্য প্রভাবও হার মানিয়া গিয়াছিল। অনেকে আশা করিয়াছিল, ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই মার্কিণ রাষ্ট্রপতি পুনরায় উক্ত আইন পাশ করাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে এবং কোনও পক্ষকেই কোনও প্রকার সমরসম্ভার বিক্রয় করিবে না,—ধারেও না, নগদেও না। কেবল যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কাঁচামাল বিক্রয় করিবে।

অবশ্য যুদ্ধ কেবল আরম্ভ হইয়াছে। এখনই রণসম্ভারের প্রয়োজন কাহারও হইবে না। পরে হইবে। তখন আমেরিকা কি করিবে তাহাই দেখার বিষয়।

স্পেন

স্পেনে গণতন্ত্রী সরকারের উচ্ছেদ করিয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে জার্ম্মানী সৈন্য দিয়া সমরসম্ভার দিয়া, অর্থ দিয়া বহু সাহায্য করিয়াছে। অনেকের মনে তখন আশঙ্কা হইয়াছিল, হিটলারের পৃষ্ঠপোষিত ফ্রাঙ্কো মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীকে সাহায্য করিবে এবং তাহাতে উভয় দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া ফ্রান্সের বিপদ বাড়িবে। সে সময় চেম্বারলেন এবং লর্ড হ্যালিফ্যাক্স উভয়েই বলিয়াছিলেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধে যে পক্ষেরই জয় হোক, ফ্রান্স এবং বৃটেনের তাহাতে বিন্দুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের অনুমানই সত্য। সুদীর্ঘকালের গৃহযুদ্ধে জয়ী হইলেও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শক্তি ক্ষীণ। স্পেনের আভ্যন্তরীণ শাসন সুব্যবস্থিত করিতে হইবে। এমন অবস্থায় মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য এবং অবসর কোনটাই তাঁহার নাই। এখন হয় তো হিটলার ভাবিতেছেন, স্পেনের জন্য এত রক্ত ও এত অর্থব্যয় করাটা সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই।

ছোট ছোট রাজ্যের অবস্থা

ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে প্রায় সকলেই শান্ত এবং নিরপেক্ষ আছে। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই বাধিয়াছে। এই সকল নল খাগড়া যেটুকু চঞ্চল হইয়াছে, তাহা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য। কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাইতেছে, যুগোশ্লাভিয়া না কি সৈন্য-সমাবেশের তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে জার্ম্মানী কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের একটা কথা উঠিয়াছিল। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌গণ

আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সকলের উৎকণ্ঠ দৃষ্টি যখন ডান্‌জিগের উপর নিবদ্ধ, তখন সকলকে চমকিত ও বিভ্রান্ত করিয়া হিটলার অকস্মাৎ যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিতেও পারেন। ইহাই হিটলারের পক্ষে সম্ভব।

কিন্তু তাহা হইল না। হিটলার পোল্যাণ্ডই আক্রমণ করিলেন। আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা এখন আর যুগোশ্লাভিয়ার নাই। তথাপি এখনও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যুগোশ্লাভিয়ার উপর হিটলারের লুব্ধ দৃষ্টি রহিলই। সুতরাং এই সময়ে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে আশঙ্কার মূলোৎপাটন হইবে না। বোধ হয়, এই ভাবিয়াই যুগোশ্লাভিয়া সমরায়োজন করিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ-আফ্রিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি ডোমিনিয়ন। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও ইহা সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন। এমন কি বৃটেনের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করা না করাও তাহার ইচ্ছাধীন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে দক্ষিণ-আফ্রিকা বৃটেনের পক্ষে যোগ দিবে কি, দিবে না, তাহা লইয়া প্রধান মন্ত্রী জেনারল হার্টজগের সহিত জেনারল স্মাটসের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। জেনারল হার্টজগ যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী নন। জেনারল স্মাটসের অভিমত জার্ম্মানী যখন একবার দক্ষিণ-আফ্রিকা উপনিবেশ ফেরৎ পাইবার দাবী জানাইয়াছে, তখন সে-দাবী সহজে সে ত্যাগ করিবে না। এখন বৃটেনকে সাহায্য না করিলে তখন বৃটেনও সাহায্য করিবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকা পরাক্রান্ত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে একা পড়িয়া যাইবে। জেনারল হার্টজগ সে ভয় করেন না। তাঁহার সুনিশ্চিত বিশ্বাস, বৃটেন জিতিয়া যাইবে। সুতরাং জার্ম্মানীর নিকট হইতে ভয় করিবার কিছুই নাই।

সে যাই হোক, ভোটে জেনারল হার্টজগের পরাজয় হইয়াছে। তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন এবং নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। শোনা যাইতেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট এ যুদ্ধে বৃটেনের পক্ষে যোগ দিবেন।

বৃটেনের অন্যান্য মিত্ররাজ্যের মধ্যে মিশর এবং ইরাক জার্ম্মানীর সহিত কূট-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। আয়ারল্যাণ্ডের অবস্থা হইয়াছে সব চেয়ে কৌতুককর। দক্ষিণ-আয়ারল্যাণ্ড অর্থাৎ এইরে যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড অর্থাৎ আলষ্টার যুদ্ধের পক্ষপাতী। উভয় দেশের সীমান্তবর্ত্তী এমন অনেক গ্রাম আছে, যাহার অর্দ্ধেক

মার্শাল স্মিগ্‌লি রিজ।

এইরের অন্তর্গত, অর্দ্ধেক আলষ্টারের অন্তর্গত। এমন অনেক বাড়ী আছে যাহার বাহিরের বসিবার ঘর এইরের অধীন এবং শয়নকক্ষ আলষ্টারের অধীন। তাহারা দিনে যুদ্ধ-বিরোধী এবং রাত্রে যুদ্ধের পক্ষে। আলষ্টার "black out"-এর আদেশ দিলে দুইটা ঘরে আলো নির্ব্বাপিত হয়, আর দুইটা ঘরে জ্বলে। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ডাক পড়িলে ইহারা কি করিবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

বাংলা দেশে মেষ-চাষ

—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার

ভারতবর্ষে যে যে স্থানে ছাগল পালিত হয়, প্রায় সেই সেই সকল স্থানে মেষও পালিত হইয়া থাকে। পয়ঃপ্রণালী-যুক্ত উচ্চ উদ্ভিদ্‌বহুল প্রদেশেই মেষের উপযুক্ত বাসভূমি, সেই জন্ত উচ্চ কাঁকুরে পার্ব্বত্য ঢালু দোআঁস জমিতে মেষজাতির আবাসভূমি ও এইরূপ স্থানেই মেষ পোষা উচিত। আমাদের দেশে নানা জাতীয় মেষ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে পার্ব্বত্য মেষজাতির লোম লম্বা ও নরম হয়; এইরূপ মেষ, নাভা, গাড়ওয়াল, কাশ্মীর, তিব্বত, কুলু, নেপাল, ভূটান আদি দেশে জন্মায়। সমতল ভূমিতে যে-সকল জাতীয় মেষ পোষা হয়, তাহাদের লোম কড়া এবং আঁইসও ক্ষুদ্রতর হইয়া থাকে। গয়া, পাটনা, পালামৌ, ছোটনাগপুর, মির্জ্জাপুর, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, আসাম আদি দেশে এইরূপ মেষ পালিত হইয়া থাকে। মাংস ও পশম উৎপাদন বিষয়ে ইহারা খুবই উপযোগী ও পটু। আফগানিস্তান দেশজাত দুম্বার ও দক্ষিণাত্যের মেষজাতি-দ্বয়ের সঙ্কর ব্যতীত অপর কোন মেষই পশমবহুল নহে। দুগ্ধের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে ভারতীয় মেষ একেবারেই অপদার্থ বলিতে হয়। মিশ্রিত ডেয়ারি ফারমে মেষপালন একটি প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশের উচ্চ এবং নিম্ন অংশে বহুপ্রকার মেষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু নির্ব্বিচার প্রজননে অপর সকল জাতীয় গৃহপালিত পশুদের মত তাহাদেরও অবনতি ঘটিয়াছে; এ-সম্বন্ধে উন্নতির পথ-চিন্তন আমাদের দেশের নিঃস্ব ও অজ্ঞ মেষপালকদের আদৌ নাই; এবং সেদিকে অপর শিক্ষিত স্বদেশবাসীর চেষ্টা ও লক্ষ্য নাই। বিলাত, ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে, এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, কেপকলোনী, দক্ষিণ-আমেরিকা, মিশর, সামোয়া, মেক্সিকো ও কানাডা প্রদেশে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান ও ষ্টেটের সাহায্যপুষ্ট অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

মেষ দেশের আগাছা নষ্ট করে এবং জমিতে "লাদী" দিয়া তাহাকে উর্ব্বর করে। ইহাদের লোম কম্বল, আসন, গালিচা, পট্টু, ফ্লানেল-আদি শীতবস্ত্র প্রস্তুতের উপাদান প্রদান করে। খাঁটী দুই বৎসর বয়স্ক মেষই প্রজনন-কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মেষীর ঋতুমতী অবস্থা তিন দিন পর্য্যন্ত ছাগীদের মতই থাকে। বহুপ্রকার মেষ পাশ্চাত্ত্য ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে পাওয়া যায়, লোমের হিসাবে নিম্নলিখিতগুলিই উৎকৃষ্টতর:—

১। (উত্তম লোমজাতীয়):—আমেরিকান মেরিণো, ডিলেন মেরিণো, রাম্বুলেট্।

২। (মাঝারি লোমজাতীয়):—সাউথ্ ডাউন, শ্রপ্-শায়ার, অক্সফোর্ড ডাউন, ডর্সেট্‌হর্ণ, সাফক্ এবং চিভীয়ট্।

৩। (মোটা লম্বা লোমজাতীয়):—কট্‌স্‌ওল্ড, লিঙ্কন, লিষ্টার, কেণ্ট বা রমণি মার্শ।

মেষপালনে লোম এবং মাংস এই উভয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কট্‌স্‌ওল্ড, লিঙ্কন, লিষ্টার, কেণ্ট বা রম্‌ণি মার্শ জাতীয় মেষগুলির লোম লম্বা লইয়া থাকে। আমেরিকা দেশীয় মেরিণো, ডিলেন মেরিণো, রাম্বুলেট্ জাতীয় মেষগুলির লোম অতি নরম ও সূক্ষ্ম হয় এবং সাউথ ডাউন, শ্রপ-শায়ার, অক্সফোর্ড, ডর্সেট্‌হর্ণ, সাফক্ এবং চিভীয়ট্ জাতীয় মেষ মাঝারি বা মধ্যম লোম (wool) উৎপাদক জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় পরিবারভুক্ত-গুলিকে উল বা লোমশ জাতীয় মেষ এবং প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীগুলিকে মটন (mutton) বা "মাংসল" পরিবারভুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই সকল জাতীয় মেষ ছাড়া কাবুলী, আঙ্গোরী এবং বোখারার সন্নিকটস্থ কারাকুল জাতীয় মেষেরও নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল জাতীয় মেষের সাহায্যে ভারতীয় খর্ব্বাকৃতি ও অপকর্ষ মেষজাতির বিশেষ উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। হিমালয় প্রদেশের পার্ব্বত্য দেশের মেষজাতির লোম সমতল ক্ষেত্রের মেষের অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও বেশী লম্বা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যদি কেহ সবিশেষ জানিতে

চাহেন, তিনি নাম-ধামসহ সডাক পত্র "বঙ্গশ্রী"র কেয়ার-অফে আমাকে লিখিতে পারেন।

আমাদের দেশে প্রত্যেক জেলায় জেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মেষজাতি দৃষ্ট হয়; দেশের গরীব চাষী ও কৃষকগণ জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও সার-প্রয়োগের জন্য মেষপালকদের (গোড়েরীদের) অগ্রিম পয়সা দিয়া নিজ নিজ ক্ষেতে মেষ বসাইয়া থাকে। উপরে লিখিত উত্তম বিলাতী জাতীয় মেষের সহিত আমাদের দেশের হীন-অবস্থাপ্রাপ্ত (deteriorated) মেষীর সংযোগে ভারতীয় মেষজাতির সবিশেষ উন্নতি-সাধন করা যাইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়। গো, ছাগ, মেষ, মহিষাদির উৎপাদকগণের এ কথা বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পশুদের নির্ব্বাচন, পৃথকীকরণ ও জোড় মিলনের উপর তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের মূলমন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পশুদের ঘেঁষাঘেঁসী ও এক সঙ্গে একই বাসাতে কদাচ রাখা উচিত নহে। অথবা তাহাদের অপরিষ্কার অবস্থায় রাখা উচিত নহে।

ভিন্ন ভিন্ন গৃহপালিত পশুর গর্ভকাল ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অশ্বী ৩৬০, মহিষী ও গাভী ২৮৩ হইতে ২৮৫, ছাগী ও মেষী ১৫০ দিনে শাবক প্রসব করিয়া থাকে।

শিক্ষানবীশ মেষপালক গ্রীষ্মের সময়েই বাছিয়া বাছিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট মেষ ক্রয় করিয়া নিজ পাল সংগঠন করিবে। দেশ, কাল, পাত্র ও স্থানের এবং জল-বায়ুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া মেষ বা ছাগের পাল সংগঠন করিবে। এশিয়া দেশের মধ্যে আঙ্গোরা, পারস্য, বোখারা, কারিকাল এবং আফগানিস্তান দেশের দোম্বা ও ভেড়া প্রসিদ্ধ। জোয়ান দুই বৎসরের মেষের সহিত তিন, চারি বা পাঁচ বৎসরে পরিণতবয়স্কা তেজী মেষীর সঙ্গে সংযোগে নবীন পালক ছানা তুলিয়া তাহার পাল সংগঠন করিতে পারেন; ইহাতে ব্যয় কম পড়িবে। গবাদি পশুর ন্যায়, ছাগ ও মেষেরও বয়স দাঁত দেখিয়া মোটামুটী নির্ণয় করা যাইতে পারে। নরজাতীয় মেষশাবকের নিম্নের পাটীতে দুধে দাঁত (milk teeth) উঠে। এক বৎসর বা চৌদ্দ মাস হইলে মাঝখানে দুটা বড় ও মোটা স্থায়ী দাঁতের উদ্গম হয়। দুই বৎসর বয়স হইলে এইরূপ আর দুটা—মোট চারিটা দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর যত বয়স বাড়িতে থাকে, এই দাঁতগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে এবং খসিয়া যাইতে থাকে এবং দাঁতগুলির মধ্যস্থ স্থানগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফাঁক ফাঁক হইতে থাকে। তিন বৎসর বয়স হইলে ছয়টি স্থায়ী দাঁত দেখা যায়। তাহার পর চারি বৎসর বয়স হইলে কোণের দাঁতের উদ্গম হয় এবং তখনই মেষ বা ছাগলের মুখ পূর্ণ (full) হয়। ৬।৭ বৎসর বয়স হইতেই স্থায়ী দাঁত ভাঙ্গিতে থাকে এবং ৮।৯ এবং কখন কখন দশ বৎসরের মধ্যে সকল দাঁতই ক্ষয় হইয়া বা ভাঙ্গিয়া যায়। মেষী খরিদ সময় দাঁট এবং কোমল পালান দেখিয়া ক্রয় করা উচিত।

পালের মধ্যে যত মেষী থাকিবে, তাহার তৃতীয়াংশ খাঁটী ও তেজস্কর উত্তম জাতীয় মেষ রাখিবে। বৃদ্ধা বা বয়স্কা মেষীদের ৫।৬ বৎসর পরেই মোটা করিয়া হাটে পাঠাইবে। এই ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইলে আমার মনে হয় যে, ৫০ বা ১০০টি মেষ লইয়া করাই সমীচীন। নবীন পালকের প্রধান কর্ত্তব্য যে, প্রত্যহ স্বচক্ষে নিজ পশুদের পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা—ইহা না বলিলেও চলে।

মেষী ১৪৫ হইতে ১৫০ দিন গর্ভ ধারণ করিয়া শাবক প্রসব করে; ছাগীরও গর্ভকাল ঐরূপ এবং মহিষীর গর্ভকাল গাভীর মত। কিন্তু ভারতের কোন কোন দেশে মুড়া, সুরাটী ও বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম বা পাঞ্জাব দেশীয় মহিষা এগার চান্দ্র মাসে, অর্থাৎ ৩০৮ হইতে ৩১২ দিনে ছানা প্রসব করিয়া থাকে। দক্ষিণী মহিষীগণ ২৮৩ হইতে ২৮৮ দিনে ছানা প্রসব করে। ইহারা গ্রীষ্মের শেষে বা হেমন্ত কালে ঋতুমতী হয় এবং এক হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত ঋতুমতী থাকে এবং মেষ সংযুক্ত না হইলে পুনরায় ১ হইতে ১৬ দিনে পুনরায় "উষ্ণ" (comes in heat) হয়। সংযোগ হইবার অন্যূন এক বা দুই মাস পূর্ব্ব হইতে মেষ ও মেষীগণকে পৃথক্ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য, যেমন খই, যব, গমের ভুষা, কড়াই, মটর, বরবটী আদি খাইতে দিতে হয়। এইরূপ খাদ্য দিলেই তাহারা স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সংজনন-কার্য্যের যোগ্য হয়। এক বৎসরের কম-বয়স্ক ভেড়াকে ৫ হইতে ১৫টি মেষীর, এক বৎসরের অধিক-বয়স্ক নর-মেষকে ১৫ হইতে ২৫টি মেষীর, এবং তেজী, পূর্ণযৌবনযুক্ত সাড়ে তিন বা চারি বৎসর বয়স্ক মেষকে ৪০ হইতে ৬০টি মেষীর সহিত সংযোগ করিতে পারা যায়। যদি বেশী সংখ্যক মেষী পালে থাকে,

তবে আবশ্যক মত উত্তম জাতীয় খাঁটী মেষ এই রূপে সংজনন-ক্রিয়ার জন্য পালাপালি নিযুক্ত করিবে। নবীন পালক তাহার মেষীদের আনুমানিক প্রসবকাল নির্ণয় করিয়া তাহাদের প্রতি ঐ সময়ে বেশী মনোযোগ দিয়া যেন বিশেষ পরিচর্য্যা করেন। ইহাদের স্বাস্থ্যকর, উচ্চ, নির্ম্মল বায়ুচলাচলযুক্ত ঘরে দিবা-রাত্রি রাখিতে হয়। প্রত্যেক ছাগ ও মেষশালায় "জনন-পঞ্জিকা" (মৎপ্রণীত 'গোপাল-বান্ধব' পুস্তক দ্রষ্টব্য) ঝুলাইয়া রাখিবে। ইউরোপ, আমেরিকা দীনেমার ও ওলন্দাজ দেশের মেষ-পালকগণ তাহাদের মেষ-গৃহের সামনে এই রূপ "জনন-পঞ্জিকা" টাঙ্গাইয়া রাখে, ইহাতে অনেক সুবিধা হয়। ইহাদের বিস্তীর্ণ মাঠে বা ঘাসবহুল চারণভূমিতে চরান দরকার এবং ধান্য আদি হৈমন্তিক শস্য মাঠ হইতে কাটা হইলে পর, মাঠে ধানের "পড়ো" (stubble) খাওয়াইবার জন্য সেই সব ক্ষেতে ছাড়িয়া দিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে মেষ-স্বামীগণ "চরাণ" (grazing) ব্যতীত স্বতন্ত্র খাদ্য দিবারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ছাগল বা মেষকে মেষ-পালকগণ স্বতন্ত্র শস্য বা শস্যের ঝাড়াই কুঁড়াদি (roughage) খাদ্য রূপে দেন না; তাহার কারণ যে আমাদের দেশের মেষপালকগণ নিঃস্ব। ছাগ ও মেষকে "খাশী" করা (castrate) একটি লাভজনক ব্যবসা। খাশী ছাগ বা দোম্বা পূর্ব্বকালে মুসলমান বাদসাহ ও ওম্‌রাহগণের "দস্তরখান" পরিশোভিত করিত। মুষ্ক ছেদন করিয়া ক্ষত আরোগ্য হইলে পর খাশীকে খাওয়াইয়া মোটা করিয়া বেশী দামে বাজারে বিক্রয় করা এই ব্যবসায়ের অন্যতম শাখা আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। গর্ভিণী ছাগী, মহিষী, গাভী এবং মেষীর প্রতি সবিশেষ যত্ন ও পরিচর্য্যা কর্ত্তব্য। বেশী সংখ্যক বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট শাবক জন্মিলেই পালক বেশী লাভবান্ হইয়া থাকে। পোকা এবং উকুনের আক্রমণ হইতে পালক সদাই তাহার পশুদের রক্ষা করিবেন। এইজন্য সময় সময় মশলাযুক্ত জলে (dip-in solution) স্নান করাইতে হয়।

শীত বা হেমন্ত কালে মেষগণকে এরূপ যত্ন করিতে হইবে, যাহাতে মাঘের শেষে তাহাদের গায়ে বেশী পরিমাণ দীর্ঘতন্তুবিশিষ্ট (long-fibered) লোম বা উল্ জন্মায় এবং তেজস্কর ছানাও উৎপন্ন হয়: তেজস্কর এবং বেশী সংখ্যায় উৎপন্ন শাবকই হইতেছে মেষ-পালকের লাভের প্রধান মূলমন্ত্র। মেষীদের সংযোগের মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে যেমন খইল, জই ও সামান্য মকাচূর্ণ ঘটিত তেজস্কর খাদ্য দিবার কথা উপরে বলিয়াছি, সেইরূপ তাহাদের প্রসবের বেদনা উপস্থিত হইলে মেষীকে স্বতন্ত্র পৃথক্ স্থানে রাখিতে হয়। যেখানে মেষীগণ সর্ব্বদা রাত্রে বাস করে, সেই ঘরেই এক ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোঁয়াড় প্রস্তুত করিয়া প্রসবের ব্যবস্থা করিলেই চলে।

মেষী-দুগ্ধ খুবই পুষ্টিকর। সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধের মধ্যে মেষীর দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর, কারণ উহার মধ্যে ছানাজনক পদার্থ বা পনীরময় ও মেদময় অংশ উভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। মেষী-দুগ্ধ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদকারগণ বলিয়াছেন যে, ইহা লবণ-মধুর রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, গরম, পাথুরীনাশক, বিস্বাদ, তৃপ্তিজনক, কেশবর্দ্ধক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, ও কফ এবং পিত্ত-বৃদ্ধিকর, ইহা বাতজ কাশবায়ুরোগে বিশেষ হিতকর। মেষ সম্বন্ধে দীনেমার, ওলন্দাজ, বিলাত এবং আমেরিকা দেশে বহু পুস্তক ও বুলেটিন এবং পত্রিকাদি প্রচলিত আছে। আমাদের এই দেশে সে সব বালাই কিছুই নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু সংস্কৃত পুথি নাড়া-চাড়া করিলে দেখা যায়, এ বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা আমাদের দেশে একদিন হইয়াছিল। আজ আমরা আত্ম-বিস্মৃত, সমস্ত ভুলিয়া বসিয়াছি।

কৃষিটাকে আমাদের দেশের লোক এখন জাতে ঠেলিয়া রাখিতে চাহে। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-বিভাগ ও কৃষি-বিভাগ ইহার উন্নতির দিকে আদৌ মনোযোগ দেন না, কাজেই এইরূপ অবস্থা। পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যেক রাষ্ট্র বা ষ্টেট কৃষির উন্নতি বা অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ আছে। এমন কথা বলিব না যে, উহাদের সমস্ত কিছুই আমাদের অনুকরণ করিতে হইবে—কিন্তু উহাদের এই চেষ্টাটার প্রশংসা করিতে হয়। আমাদের দেশে সেসব কিছুই নাই, যাহা যৎসামান্য আছে তাহা ভুয়া কাজে খরচ হয়। তাহাতে সাধারণ কৃষককুলের কোনই উপকারে আইসে না। ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ, পাখী, মাছি, গো, গাধা, অশ্ব ইত্যাদি পালন "কৃষি"র অন্তর্গত এবং সেই সকল কলা-বিদ্যা শিখিবার জন্য

অবতরণ

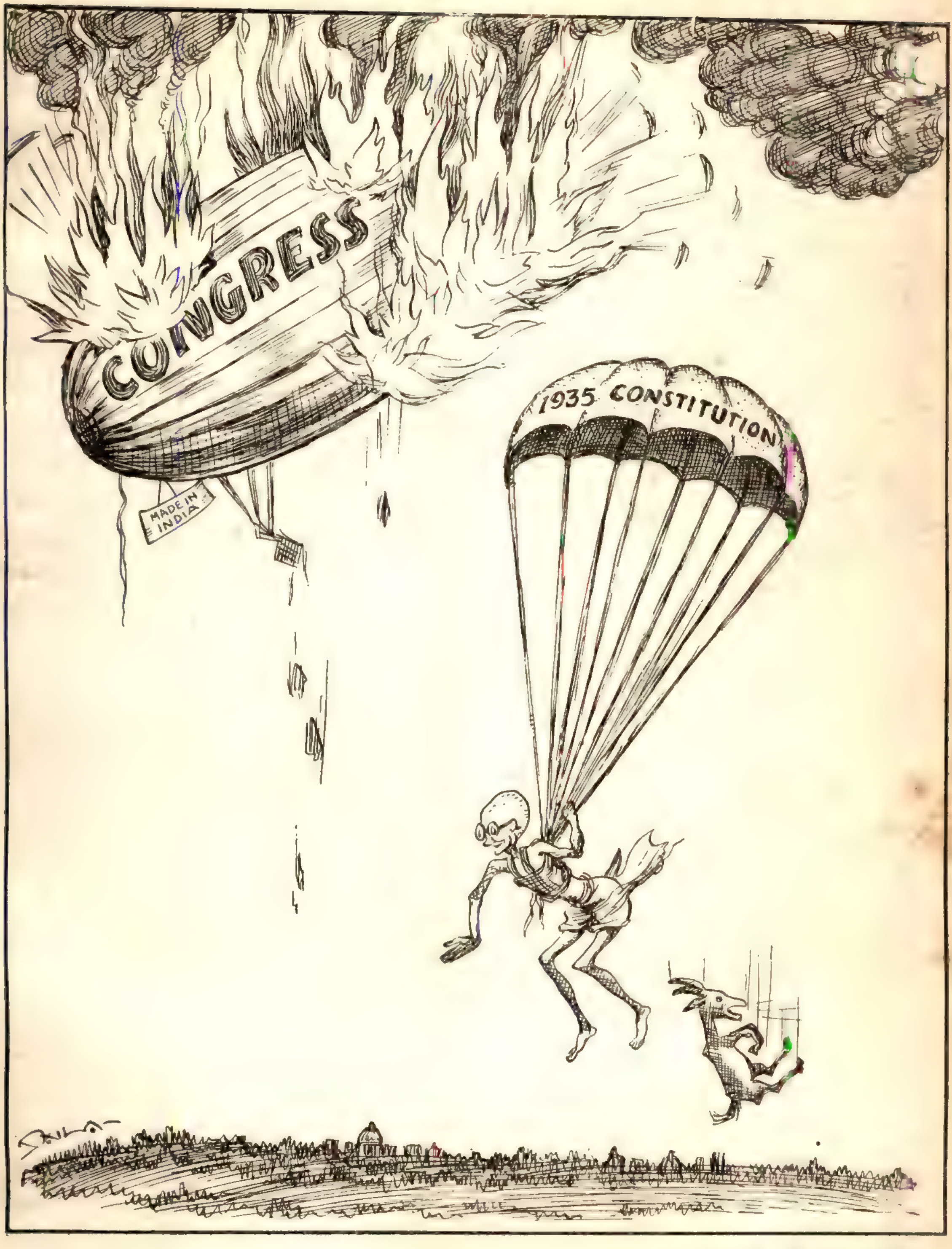

[দি-উইক্‌লি বঙ্গশ্রী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ঐ সকল দেশে লেক্‌চার শিপ আছে। এইগুলির কোনটি "দীর্ঘ" এবং কোনটি "স্বল্প" কালব্যাপী (long and short course lectureships.)। কৃষকপুত্রগণ ইহা শুনে এবং শিক্ষা করে। হাতে-কলমে শিখিবার জন্য প্রত্যেক শাখায় এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল্ ষ্টেশান (experimental station) প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের দেশে এসব কিছুই নাই। আছে কেবল আত্ম-কলহ, ফাঁকীবাজী, আত্মীয়-পোষণ, ভুয়া প্রাধান্যস্থাপন, নাম-ক্রয় এবং সাধারণের টাকা আত্মসাৎ।

মেষকে বড় বড় পালে বিভক্ত করিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিবারও ব্যবস্থা মার্কিন দেশে বহুল দেখা যায়। টেক্‌সাস্, কালিফর্ণিয়া, উইস্কনসিন্, কানেডা, নর্থ-ডাকোটা, ফ্লরিডা, জর্জ্জিয়া আদি ষ্টেটে এইরূপ, গো, মেষ, ঘোড়া, গাধা, পেরু, পাতিহাঁস আদির "র‍্যাঞ্চিং(ranching)" ব্যবস্থা অনেক আছে। আগেই বলিয়াছি, সংস্কৃত পুঁথি দেখিয়া মনে হয়, এই সব ব্যবস্থা আমাদেরও ছিল। কিন্তু এখন এই অভিশপ্ত দেশে এ সব কিছুই নাই। এইসব কলাবিদ্যা শিখিবারও কোন প্রতিষ্ঠান নাই, আছে কেবল চক্ষে ধূলি দিয়া পরস্বাপহরণ বিদ্যা ও স্বার্থ।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বড় দরের গো ও মহিষ এবং ছাগল ও মেষপালক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে তাহারি মধ্যে আমার জানাশোনা হিসাবে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত কটোরিয়া থানার লছমীপুর ষ্টেটের অন্তঃপাতী ও যমদাহা পরগণায় মধ্যস্থ খানগাড় মৌজানিবাসী বাবু দরশন সিংহ এইরূপ "র‍্যাঞ্চ" পদ্ধতিতে তাঁহার কয়েকটি গ্রামে মেষ, মহিষ, ছাগল এবং গাভী রাখিয়া বেশ ধনবান্ হইয়াছেন। তাঁহার আদর্শ চাষী মাত্রেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও পৃথক্ পৃথক্ মাঠে মেষগুলিকে চরান কর্ত্তব্য; তাহা হইলে তাহাদের কোনপ্রকার সংক্রামক রোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। গবাদি পশুদের যে-সকল রোগ হইতে দেখা যায়, মেষদেরও সেই সকল রোগ হইয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসাও তদনুরূপ করা কর্ত্তব্য এবং ঔষধের মাত্রাও কম, অর্থাৎ গবাদিকে দেয় ঔষধের ⅓ বা ½ অংশ মেষ ও ছাগলকে দিতে হয়; মেষ, গাভী ও ছাগলাদির চিকিৎসা-বিধি বিস্তারিতরূপে ২-৭ ভাগ "কৃষি-লক্ষ্মী" পত্রিকাস্তম্ভে লিখিত আছে। এই সকল অনুশাসন দেখিয়া, মেষ, ছাগ, গো-মহিষাদি পালন করিলে গোমেষাদি-পালক নিশ্চয়ই লাভবান্ হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষানবীশ পালকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, নিজে না খাটিলে সহজে ধনাগমের ও রাতারাতি বড়-লোক হইবার কোন সহজ উপায় নাই। হিংস্র জন্তু মেষ, ছাগল, গো, মহিষাদি গৃহপালিত পশু ও তাহাদের শাবকদের বড় শত্রু; এইজন্য ইহাদের সদাই তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। ছানাদের কন্‌ষ্টিপেশান (কষা বাহ্য) হইলে, ছানাগণ মল-ত্যাগে কোঁথ্ পাড়ে; তখন এক চা-চামচ পূর্ণমাত্রায় খাঁটী রেড়ির তৈল খাওয়াইয়া দিলে তাহা আরোগ্য হয়। সময়ে সময়ে ছানাদের বেশী দুধ খাইয়া সাদা আমাশয় রোগ ধরে। ইহা অতি মারাত্মক রোগ। ইহা পালে দেখা দিলে খুব সাবধানে রোগীকে রাখিতে হয় এবং তাহাকে পৃথক স্থানে রাখিতে হয় এবং সিকি আউন্স সোডা, এক আউন্স ম্যাগ-সালফ্, শুঁঠচূর্ণ এক চিম্‌টি (pinch) সামান্য ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া দুই বা তিন বারে মাত্রা, আন্দাজ ও আবশ্যক মত খাওয়াইলে ইহা সারিয়া যাইতে আমি দেখিয়াছি। এই ঔষধ খাওয়াইবার চারি ঘণ্টা পরে অল্প মাত্রায় তিষির তৈল খাওয়াইয়া, তাহার কিছুক্ষণ পরে সামান্য রেড়ীর তৈল খাওয়াইয়া দিতে হয়। অজীর্ণ রোগে বা পেট ফাঁপিলে আন্দাজমত রেড়ীর তেল খাওয়াইয়া দিতে হয়। ক্ষুধা নষ্ট হইলে রোগী কিছু খাইতে চাহে না এবং মুখে ফেনা দেখা দেয়; ঠাণ্ডা লাগিলে বা আঘাত লাগিলে ছানাদের চোখ ফুলিয়া উঠে, লাল বর্ণ হয় এবং জল পড়িতে থাকে; তখন ফিট্‌কিরির জল বা সিল্‌ভার নাইট্রেট্‌দ্রাবণ অথবা ১৫ p. c শক্তির আর্গিরোল (Argyrol) চক্ষে ফোঁটা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ২।৫ বার এইরূপ প্রয়োগে চক্ষুর পীড়া উপশমিত হইতে পারে। মাড়িতে বা মুখে ঘা হইলে তুঁতের জলে ২।৪ বার দিনে মুখ ধুইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

প্রসবের পর মেষীকে নিয়মিত দোহন করিতে হয়, যাহাতে উহার স্তনের মধ্যে "ঠুন্‌কা" বা বীচির মত কঠিন পদার্থ

জন্মিতে না পারে। ছানাগুলি নিয়মিত পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ পাইলে ও শীঘ্র বর্দ্ধিত হইলে মেষস্বামীর লাভের পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

ছানা হইবার পর গ্রীষ্মের দিনে, অর্থাৎ ফাল্গুন কিংবা চৈত্র মাসে এবং সূর্য্য উদয় হইলে পর লোম কাটিতে হয়। প্রথমে লোমগুচ্ছ (dung locks) গুলির "জট" কাটিয়া বাদ দিয়া তবে ভাল লোম কাটিতে হয়। আমাদের দেশে হেঁসোর দ্বারা লোম কাটা হয়; তাহাতে অনেক বেশী পরিমাণ ভাল লোম নষ্ট হয়; কিন্তু বিলাত, আমেরিকা, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়াদি দেশে কল সাহায্যে (shearing machine) লোম কাটা হয়। ঐ সকল দেশের মেষপালকদের ব্যবহারোপযোগী উত্তম মেষের যন্ত্রপাতি অনেক অল্প মূল্যে দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

লোমকাটার পর মেষগণকে দ্রাবণে স্নান করাইয়া পোকা, উকুন, যঁুই ইত্যাদি রহিত করিতে হয়। গ্রীষ্মের ও রৌদ্রের দিনে সকালেই স্নান করাইবে যাহাতে সহজেই লোম শুষ্ক হইয়া যায়। তাহা আগেই বলিয়াছি। মেষের গায়ে বেশী লোম থাকে বলিয়া ইহাদিগকে পোকা, উকুন ইত্যাদি সময়ে সময়ে বড়ই বিরক্ত করে। প্রথম স্নানের ৩।৪ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় বার স্নান করাইবে। লোম কাটার ১০।১২ দিন পরেই প্রথম স্নান করানই সমীচীন, কারণ তাহা হইলে ক্ষতাদি সব সারিয়া গেলে স্নান করান কষ্টকর হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দ্রাবণ মেষগণের স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়; দেশ-কাল ও পাত্র-ভেদে দ্রাবণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু—যে দ্রাবণ আজ এক স্থানে উপকার-প্রদ হইতেছে, তাহা অন্য স্থানে অন্য দিনে অন্য মেষপালের পক্ষে উপকারপ্রদ নাও হইতে পারে। সেই জন্য উপযুক্ত দ্রাবণ নির্ব্বাচন করা একটু বিশেষ বিবেচনা ও বুদ্ধি প্রয়োগের দরকার। আর্সেনিক (arsenic), চুণ-গন্ধক (lime-sulphur), নীকোটীন্ (nicotine) প্রভৃতি দ্রাবণই পাশ্চাত্য দেশীয় মেষপালকগণ দ্বারা বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আল্‌কাৎরা-ক্রীয়োসোট (coaltar-creosote) ঘটিত দ্রাবণও ব্যবহৃত হয় এবং সময়ে সময়ে চুণ-গন্ধক—আর্সেনিক (lime-sulphur-arsenic dip) ঘটিত দ্রাবণও ইউরোপীয় ও বিলাতী মেষপালকগণ বহু ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন বিলাতী জিনিষই নির্ব্বিচারে লইবার আমরা পক্ষপাতী নহি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যাহাতে উপকার দর্শিয়াছে, তাহারই কথা আমি এখানে বলিতেছি। কেহ যদি এই শ্রেণীর দেশীয় দ্রাবণের সংবাদ দিতে পারেন, তবে উপকৃত বোধ করিব।

এইবার প্রয়োজন-বোধে সংক্ষেপতঃ এই দ্রাবণগুলির প্রস্তুতপ্রণালী বিবৃত করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। লাইম-সালফার-আর্সেনিক দ্রাবণ (lime-sulphur-arsenic dip) :—ষ্টাণ্ডার্ড শক্তি + ½ ষ্টাণ্ডার্ড শক্তি আর্সেনিক ডিপ্ মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ১১ পাউণ্ড সদ্য টাট্‌কা গলা বাঁখারি চুণ এবং ২৪ পাউণ্ড ফুল গন্ধক মিশাইয়া পেষ্টের (paste) মত প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিতে চড়াইয়া ৩০ গ্যালন জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিলে যখন গন্ধকগুলি গলিয়া মিশিয়া যাইবে, তখন তাহা নামাইয়া ঠাণ্ডা করিলে কাদার মত পদার্থ তলায় বসিয়া যাইবে। প্রত্যেক ত্রিশ গ্যালন্ এইরূপ প্রস্তুত দ্রাবণে ৭০ গ্যালন্ গরম জল মিশ্রিত করিয়া তাহা ঠাণ্ডা হইলে, কুসুম কুসুম গরম থাকিতে ভাল করিয়া স্নান করাইতে হয়; তাহাতে সব পোকা, আঁঠুলি উকুন ইত্যাদি ঝরিয়া যাইবে। জ্বাল দিবার সময় চুণও গন্ধকটিকে অনবরত নাড়িতে থাকিবে, যাহাতে মশলাগুলি বসিয়া জমিয়া না যায়। যদি জ্বাল দিতে দিতে ভাসমান গন্ধকচূর্ণ জলের সহিত মিশিয়া না যায়, তাহা হইলে ঐরূপ টাট্‌কা চুণ কিছু মিশাইয়া নাড়িতে থাকিলে গন্ধকটি মিশিয়া যাইবে। দ্রাবণ প্রস্তুত হইলে কেবল মাত্র থিতান জলটুকু মৃদু টানিয়া লইয়া তাহাতে উপরে কথিত ৩০ গ্যালনে ৭০ গ্যালন্ গরম জল মিশাইয়া, মেষগণকে সেই জলে ঠাণ্ডা হইলে স্নান করাইয়া দিবে। এই জল অতিশয় বিষাক্ত; তজ্জন্য খুব সাবধানে কাজ করিতে হয়। এইরূপে লাইম-গন্ধক দ্রাবণ প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপে ক্রীয়জোট্ দ্রাবণ মিশাইলেই লাইম-সাল্‌ফার-ক্রীয়জোট দ্রাবণ প্রস্তুত হইল। ক্রীয়জোট দ্রাবণ নিম্নলিখিত রূপে প্রস্তুত করিবে এবং প্রত্যেক ৫০০ গ্যালনে তাহা মিশাইবে :

ক্রীয়জোট দ্রাবণ (creosote solution) :—

একটি বড় এনামেলের কেট্‌লিতে ১২ পাউণ্ড জল ফুটন্ত গরম করিয়া তাহাতে ১২ পাউণ্ড সোডা (sal-

soda) যোগ করিবে ; তাহা এই জলে দ্রব হইয়া যাইলে তাহাতে ৪ পাঃ সাদা আর্সেনিক (white arsenic) চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া জ্বাল দিয়া গলিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত প্রতি ৫০০ গ্যালনে এই শেষোক্ত দ্রাবণ মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দ্রাবণটি নাড়িয়া ব্যবহার করিবে।

গ্রীষ্মের শেষে ছানাগুলি যখন স্তন ছাড়িবে, তখন দুর্ব্বল বা অকেজো বা যে-গুলির পর বৎসরে সংজনন জন্য আবশ্যক হইবে না, তাহাদের হাটে পাঠাইবে। বন্ধ্যা, দুর্ব্বল, অঙ্গহীন, স্বল্প-দুগ্ধবতী, দুর্ব্বল মেষের মাতা বা কম লোম উৎপাদিকা মেষী কিম্বা মেষকে বাছাই করিয়া মোটা করিয়া হাটে পাঠাইবে। তাহাদের স্থান এক বৎসর বয়স্ক ছানাদের মধ্য হইতে পূরণ করিবে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাছাই করিয়া পালক নিজ পালকে সংস্কার করিয়া উত্তম পাল সংগঠন করিবে। গ্রীষ্মের দিন মধ্যাহ্নের রৌদ্র হইতে মেষগুলিকে ছায়ায় বা আচ্ছাদিত স্থানের নিম্নে রক্ষা করিবে।

মেষ, ছাগল, মহিষ, গো, পাখী ফার্ম্মিং-এর ব্যবসা খুবই লাভজনক। এই গুলি নিজে দেখিয়া ও খাটিয়া করিতে পারিলে কদাচ লোকসান হয় না। পাখী-চাষ সম্বন্ধে "হানাফী," "কৃষিলক্ষ্মী" এবং "কৃষক" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সেইগুলির অনুশাসন মতে কাজ করিলে কদাচ লোকসান হইবে না। Animal husbandry এবং poultry farming ব্যবসায়ে সাফল্যের মূলমন্ত্র হইতেছে অধ্যবসায়, নম্রতা, পরিশ্রমপটুতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। লেখাগুলি যত্নে পাঠ করিয়া ও সম্যক্ প্রণিধান করিয়া যিনি এই ব্যবসা করিবেন, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কদাচ হইবেন না। পাতিহাঁস, ছাগল, ভেড়া, রাজহাঁসের চাষ করিতে কোন হিন্দু বা মুসলমান কৃষকের বারণ বা প্রতিবন্ধক নাই। ভেড়াদির চাষে বেকার-সমস্যা আশু অংশতঃ সমাধান হইতে পারে।

কৃষি-বিজ্ঞান

…পাশ্চাত্য ও মার্কিন জাতিগণের কৃষিসম্বন্ধীয় জ্ঞান যে অন্তঃসারশূন্য, তাহা ঐ ঐ জাতির কৃষকদিগের দুরবস্থা এবং উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ প্রয়োজনানুরূপ কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অনেকে মনে করেন, ফরাসী, জার্ম্মান, রাশিয়ান এবং মার্কিনগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দেশীয় কৃষির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনানুসারে ইহা একটী মতবাদ মাত্র এবং কার্য্যতঃ অর্থহীন।

কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইলে কৃষকগণ স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়। যে দেশে কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়, সেই দেশে কৃষকের অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যা থাকিতে পারে না যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, জগতের কোন দেশেই এখন আর শ্রমজীবী-কৃষক স্বাধীন-ভাবে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যেক দেশেই কৃষকের অন্নাভাব রহিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যাও যথেষ্ট, তখন কোন দেশে প্রকৃত ফলপ্রদ কৃষি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব রহিয়াছে ইহা মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

প্রকৃত (আ-মূল) কৃষি-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণের গ্রন্থে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ সাধ্যমত অধ্যয়ন করিয়া আমাদের যাহা মনে হইয়াছে, তদনুসারে বলিতে হয়, প্রায় বার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের আরাধ্য, দেবোপম ঋষিগণ প্রকৃত কৃষি বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে সারা জগতের জমীর উর্ব্বরাশক্তির যাহাতে উন্নতি সংঘটিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন এবং সাধারণকে তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের প্রত্যেক কৃষক কিছুদিন পূর্ব্বেও স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। প্রকৃত কৃষি বিজ্ঞান তখন প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই সমাজের অধিকাংশ লোক তখন কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিত এবং কৃষকের উপর ও কৃষিজাত দ্রব্যের বণিকের উপর নির্ভর করিয়া অবশিষ্ট লোকেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইতে পারিত। ভারতীয় ঋষির এই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি ব্যবস্থার ফলে ভারতবাসী সহস্রাধিক বৎসর হইতে রাষ্ট্র-পরিচালনায় পরাধীন হইলেও সেদিন পর্য্যন্ত আর্থিক স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে। জগতে বর্ত্তমানে আমরা যাঁহাদিগকে সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের মধ্যে এমন একটী জাতি অথবা দেশ নাই—যাঁহাদের উদরান্নের জন্য ভিন্ন জাতির দ্বারস্থ হইতে হয় না, অথবা কিছু না পাইয়াও অপর জাতিকে কিছু দান করিলে যাঁহারা বিপন্ন হন না।…

হেঁয়ালী নং ৫

—কস্যচিদবোধস্য

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিয়া প্রচার,
ইইলেন ধরাতলে
পরিচিত অবতাররূপে বুদ্ধদেব—
সিদ্ধ শুদ্ধ কর্ম্মফলে।
"দক্ষিণ গণ্ডেতে কেহ করিলে আঘাত,
দিবে ফিরাইয়া তা'রে
বাম গণ্ড," ধাতার আত্মজ খ্যাতি যাঁ'র,
এই নীতি-অনুসারে
পূজিত মানবকুলে ঈশা। আবির্ভূত
একাদশ অবতার
ভারতে বুঝি বা তুমি—করিলে প্রচার
এক শ্বাসে এইবার
অহিংসা, অসহযোগ পীড়নবিহীন,
ক্রিয়াহীন প্রতিরোধ,—
স্বাভাবিক আবেগের বশে মত্ত যত
ভারতীয় হীনবোধ।
চেয়েছিলে রাজতন্ত্র করিতে নিশ্চল
নিষ্ক্রিয় নিরোধ বলে;
কি ফল ফলিল হায়!—জমিদারকুল
ডুবিছে অতল জলে,
জর্জ্জরিত মধ্যবিত্ত, কৃষকসমাজ
দারিদ্র্যের কশাঘাতে
অর্দ্ধাশন, অনশন, বসনহীনতা,
বারি সম বরষাতে,
উপনীত সর্ব্ব ঠাঁই, অবনতশির
ঋণভারে সবাকার
আকুল সচিববর্গ উপায় সন্ধানে
থর্ব্বতা করিতে তার।
না জানিয়া, না বুঝিয়া হইবে কেমনে
মঙ্গলবিধান দেশে;
অর্ব্বাচীনসম কার্য্য করেছ সাধন
আত্মম্ভরিতা বশে।

হিতকার্য্য সাধনের ভারত সন্তানে
দেখাইয়া প্রলোভন,
প্রভূত অহিত তুমি সাধিয়াছ তার
মিথ্যা কি হে এ বচন?
বন্যায় ডুবিছে দেশ প্রত্যেক বৎসর,
করেছ কি নির্দ্ধারণ
কারণ তাহার, করিয়াছ চিন্তা কভু
কিসে হবে নিবারণ?
নিরুপায়, মৃতকল্প কৃষকের কুল,
বন্ধ শস্য-উৎপাদন,
কেমনে সবার হ'বে আহার সংগ্রহ
ভেবেছ কি কদাচন?
দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখে, ঘোর হতাশায়
হ'য়ে যদি ক্ষিপ্তপ্রায়
আগত কৃষককুল প্রতিবিধিৎসায়,
হবে তবে কি উপায়?
অহিংসার নীতি তব আজিও না বুঝি—
নহে হিংসাপ্রণোদিত
পরশ্রীকাতর ভাব, নিষ্ক্রিয় নিরোধ?
না জান কি অবিহিত
রাজার শাসনে নিত্য বিঘ্ন-উৎপাদন?
নহে কি হে হিংসাময়
অসহযোগিতা রাজপুরুষের সনে?
ভাবিতেও বুদ্ধিলয়।
নিষ্ক্রিয় নিরোধ, আর অসহযোগিতা
করিয়াছ পরিহার
হ'তেছে প্রতীতি মম—করিছ আশ্রয়
মাঝে মাঝে রাজদ্বার।
উষ্ণ যে কখন্ তুমি, কখন্ শীতল,
নাহি বুঝি কোন ক্রমে—
দুর্ভেদ্য হেঁয়ালী, চাই বুঝিতে যখনি,
প'ড়ে যাই মহাভ্রমে।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ধান্যশ্রী

কার্ত্তিক—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

দুর্গাপূজা ও বর্ত্তমান কাল

আবার দুর্গাপূজার দিন আসিয়াছে। অথচ, যাঁহার পূজার জন্য আজ আমরা উদগ্রীব তিনি যে কে এবং তাঁহার পূজা যে কি বস্তু, তাহা আমাদিগের জানা নাই। তাই প্রাণে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, "মা, তুমি কে?"

শুনিয়াছি তুমি "অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে" অর্থাৎ যে বীর্য্যের জন্য পুরুষের পুরুষত্ব সেই বীর্য্যের সহিত তোমার সম্বন্ধ অলঙ্ঘ্য। কাযেই বুঝিতে হয়, তুমি আমার সর্ব্বশরীরেই রহিয়াছ এবং আমার "অস্মাত্ব" তোমারই সৃষ্টি। তুমি আমার এত নিকটে রহিয়াছ, অথচ আমি তোমাকে উপলব্ধি করিতে পারি না।

শুনিয়াছি তুমি "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা, মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি" অর্থাৎ বিকশিত বস্তুর বিকাশের সঙ্গে তোমারই বিকাশ জড়িত রহিয়াছে বলিয়া তুমিই জগতের জগতত্বের একমাত্র আধার। কাযেই দেখা যাইতেছে, তুমি যে একমাত্র আমার সর্ব্বশরীরে রহিয়াছ তাহা নহে। যে জগৎ রহিয়াছে বলিয়া আমি বিদ্যমান আছি সেই জগতেরও সর্ব্বকার্য্যে তুমি রহিয়াছ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার বিকাশের ভিতরেও তুমি এবং আমার বাহিরেও তুমি, অথচ আমি এতই মূর্খ যে তোমাকে উপলব্ধি করিতে পারি না।

শুনিয়াছি "অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়া এতৎ আপ্যায্যতে কৃৎস্নং" অর্থাৎ "রসের রসত্ব বিকাশের মূল কারণ তোমার দ্বারা বুদ্ধির বিষয়ীভূত সমস্ত বস্তু বোধগম্য হইয়া থাকে।" ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, যে-বুদ্ধি লইয়া অপরজীব হইতে আমার বৈশিষ্ট্য সেই বুদ্ধিও তোমারই দান এবং ঐ বুদ্ধি যে কি করিয়া উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে পারিলেও তোমাকে বুঝা সম্ভব হয়। অথচ, আমি তোমাকে উপলব্ধি করিতে পারি না।

শুনিয়াছি "ত্বং বৈষ্ণবী-শক্তিরনন্তবীর্য্যা" অর্থাৎ "যে শক্তির বলে 'অম্বু' হইতে 'বহ্নি'র সহায়তায় 'রসের' উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ 'রস' সর্ব্ববিধ উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত করিয়া থাকে, সেই শক্তিই তুমি।" ইহা হইতে বুঝিতে হয়, তুমি যে কেবল আমার বিকশিত অঙ্গের মধ্যেই রহিয়াছ তাহা নহে, আমার অব্যক্ত অথবা অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য আত্মার মধ্যেও তুমি রহিয়াছ। অথচ, আমি তোমাকে চিনিতে পারি না।

শুনিয়াছি "বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া, সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ" অর্থাৎ "হে দেবি যাদৃশ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার জন্য সর্ব্ববিষয়ে সম্মোহন অথবা মুর্খতার উৎপত্তি হইয়া থাকে তাদৃশ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার বীজ যে 'পরমা-মায়া,' তুমিই সেই 'পরমা-মায়া'। শরীরস্থ রসের অনুভূতি লাভ করিয়া তোমার সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলে মুক্তিলাভ করা অথবা রাগ-দ্বেষাতীত হওয়া সম্ভব হয়।" এই কথাটী হইতে বুঝিতে হয় যে, দুনিয়ায় আমি যে-সমস্ত অসঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি সেই সমস্ত অসঙ্গত কার্য্যের প্রবৃত্তি উদ্ভব হয় কেন তাহা বুঝিতে পারিলেও তোমাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। অথচ, আমি এতই মূর্খ যে তোমাকে চিনিতে পারি না।

শুনিয়াছি—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥"

অর্থাৎ "হে দেবি, তোমার ভেদসমূহ অথবা তোমা হইতে যে সমস্ত কর্ম্ম, গুণ ও দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে সেই কর্ম্ম, গুণ ও দ্রব্যসমূহের কার্য্য-কারণ-সঙ্গতি বিদিত হইতে পারিলে জগৎ বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা সমস্তই আমুলভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। চালচলনযুক্ত (অম্বয়া) একমাত্র তোমার সহায়তায়ই জীবের পূরণ অথবা অস্তিত্ব ও জ্ঞান সম্পাদিত হইতেছে। যাহার নাম তোমাকে উপলব্ধি করা তাহারই নাম পরাপর অথবা কার্য্য-কারণ-সঙ্গতি উপলব্ধি করা।"

ইহা ছাড়া আরও শুনিয়াছি—

"সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥"

অর্থাৎ "হে দেবি, যখন সর্ব্বভূতা তোমাকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য লাভ করিয়া স্বকীয় স্বত্বা, তাহার উন্মেষ ও বিকাশকে প্রত্যক্ষ করা এবং রাগ-দ্বেষাতীত হওয়া সম্ভব হয়, তখনই প্রকৃতির কার্য্য অনুভব করিয়া যাঁহাকে "পরম" অথবা বিশ্বের মুল কারণ বলা হইয়া থাকে তাঁহাকেও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত দুইটী কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, কোন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মাত্মক বস্তু বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ৺মা চণ্ডীকে স্বকীয় অবয়বাভ্যন্তরে উপলব্ধি করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া আরও বুঝিতে হয় যে, ৺মা চণ্ডীকে স্বকীয় অবয়বাভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিলে একদিকে যেরূপ ব্যক্ত জগদ্বিষয়ে পরাপর সমস্ত জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়, অন্য দিকে সেইরূপ আবার ব্যক্ত জগতের মূল কারণ সম্বন্ধেও সমস্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, ৺মা চণ্ডীকে স্বকীয় অবয়বাভ্যন্তরে উপলব্ধি করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। অথচ আমরা এতই মূর্খ যে, ঐ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও প্রযত্নশীল হই না।

"মা" যে কে, তাহা জানিবার জন্য যখনই প্রাণে প্রশ্ন উঠে—তখনই দেখা যায় যে, তাঁহার সহিত এই দুনিয়া ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে বিশ্ব-দুনিয়া সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই যথার্থ ভাবে লাভ করা সম্ভব হয় না। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দুই পাতা পড়িয়া অথবা ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্রগণের কচ্-কচি অভ্যাস করিয়া অথবা মারণ-কার্য্যে লাইসেন্স লাভ করিয়া নিজদিগকে জ্ঞানী, পণ্ডিত ও ভিষগ্ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয়ত অনেকেই আমাদিগের কথায় হাসিয়া উঠিবেন। তাঁহারা মনে করেন যে, মাকে বিন্দুমাত্র ভাবে উপলব্ধি না করিয়াও বিশ্বদুনিয়ার অনেক কথা, অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। তাঁহাদিগের মতে—তাহাই যদি না হইত অর্থাৎ 'মা'কে উপলব্ধি না করিয়া বিশ্ব-দুনিয়া সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই যথার্থভাবে লাভ করা যদি সম্ভব না হইত—তাহা হইলে তাঁহাদিগের পক্ষে জ্ঞানী, পণ্ডিত ও ভিষগ্ হওয়া সম্ভব হইত না।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্য কতটুকু তাহা অবধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে চাই। খুবই সত্য যে, তাঁহারা বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, বিবিধ যান-বাহন, বিবিধ শিল্প-যন্ত্র, বিবিধ উপভোগোপকরণ, বিবিধ বাণিজ্য-কৌশল, বিবিধ রাষ্ট্রীয়-কৌশল, বিবিধ অর্থনৈতিক-কৌশল আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু কই, মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় যে আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘজীবন তাহার কোনটী ত বিন্দুমাত্র পরিমাণেও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না। পরন্তু, প্রত্যেকটী ত' উত্তরোত্তর হ্রাস পাইয়া মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থা দেখিলে বলিতে হয় না কি যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের আস্ফালন সম্পূর্ণ শূণ্যগর্ভ ও মূঢ়তা-প্রসূত। তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অস্ত্র-শস্ত্র সম্পূর্ণভাবে মানুষের মারণ-কার্য্যে সক্ষমতাসম্পন্ন বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিমাণেও জীবন-দান কার্য্যে সাফল্যযুক্ত নহে; বিজয়ী ও বিজিত উভয়েই প্রায় সমানভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যান-বাহন আপাত দৃষ্টিতে যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করে বটে, কিন্তু মানুষ যে জীবিকার্জ্জনের জন্য যানবাহনের সহায়তা লইয়া যাতায়াত করিয়া থাকে, সেই জীবিকার্জ্জন ক্রমশঃই কৃচ্ছ্র-সাধ্য হইয়া পড়ে। বাণিজ্য-কৌশল, অর্থনৈতিক-কৌশল, রাষ্ট্রীয়-কৌশল প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করিলেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে। কাযেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন সাধনে সম্পূর্ণ মূল্যহীন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে সম্পূর্ণ মূল্যহীন তাহা বুঝিতে পারিলে মাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের যে আস্ফালন তাহাও যে সম্পূর্ণ শূণ্য-গর্ভ তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারা যায়।

যাঁহারা ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্রগণের কচ্-কচি অভ্যাস করিয়া নিজদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের মূল্য কতটুকু তাহা অবধারণ করিবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে চাই। ইহাঁরা কথার ফোয়ারায় এক একটী দিগ্‌গজ হইয়া থাকেন, তাহা খুবই সত্য, কিন্তু ইহাঁদিগের কথার মূল্য কতটুকু? ইহাঁদিগের কথার যদি কোন প্রকৃত মূল্য বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে ইহাঁদিগের প্রায় সকলেরই নিজদিগকে ও সন্তান-সন্ততিগণকে নফর-গিরীর জন্য অথবা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য অথবা পরমুখাপেক্ষিতায় লালায়িত হইতে হইত না এবং ইহাঁরা অর্থাভাবে, স্বাস্থ্যাভাবে, অশান্তিতে,

অসন্তুষ্টিতে, অকালবার্দ্ধক্যে এবং অকাল-মৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইতেন না। কাযেই বলিতে হইবে যে, এই পণ্ডিতগণের কচ্ কচিও সম্পূর্ণ শূণ্য-গর্ভ ও মূল্যহীন এবং ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা মাকে উপলব্ধি করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে আস্ফালন করিয়া থাকেন তাঁহারা মূঢ়।

সর্ব্বশেষে যাঁহারা মারণ-কার্য্যে লাইসেন্স্ লাভ করিয়া ডাক্তার অথবা কবিরাজ নামে ভিষগ্ বলিয়া বিকাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও আমরা তাঁহাদিগের বিদ্যার মূল্য কতটুকু তাহা অবধারণ করিতে অনুরোধ করিতে চাই। নানাবিধ চিকিৎসা-কৌশলে তাঁহাদিগের নিপুণতা প্রসারলাভ করিতেছে, তাহা খুবই সত্য, কিন্তু মানুষের অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুও যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ইহা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, এই ভিষগ্‌গণেরও আস্ফালন সম্পূর্ণ শূণ্যগর্ভ এবং তাঁহাদিগের বিদ্যা সম্পূর্ণ মূল্যহীন ?

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, মা-কে উপলব্ধি না করিয়াও যথার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, এতাদৃশ মতবাদ সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। কাযেই, আবার প্রশ্ন আসিতেছে—মা, তুমি কে ? তোমায় কি করিয়া উপলব্ধি করা যায় ?

শুনিয়াছি তোমার পূজায়, তোমার ধ্যানে, তোমার জপে, তোমার স্তবে, তোমার কবচে তোমাকে চেনা যায়, তোমাকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু কই, যে পুরোহিত ও যজমানগণ তোমার পূজা, ধ্যান, জপ, স্তব ও কবচ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তো তোমাকে চেনেন অথবা উপলব্ধি করিতে পারেন বলিয়া মনে করা যায় না। তোমাকে চিনিতে ও উপলব্ধি করিতে পারিলে দুনিয়ার যথার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় এবং দুনিয়ার যথার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, এই কথা দুইটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তো পুরোহিত ও যজমানগণ ঐ অর্থাভাব প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের কেহই তো অর্থাভাবাদির একটীর হাত হইতেও প্রায়শঃ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। ইহা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, এই পুরোহিত ও যজমানগণের পূজা, ধ্যান, জপ, স্তব ও কবচ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটীই ভ্রমাত্মক হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই জন্য উহার প্রত্যেকটীই নিষ্ফল হইতেছে ? বাস্তবিকপক্ষেও আধুনিক পুরোহিত ও যজমানগণের পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইতেছে। ঐ নিষ্ফলতার জন্যই পুরোহিত ও যজমান এই উভয়েরই দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ নিষ্ফলতার জন্যই অধুনা মানুষ পূজার নামে নানাবিধ হৈ চৈ বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপ স্থিতয়া ত্বয়া, এতৎ আপ্যায্যতে কৃৎস্নং অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী-শক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।

উপরোক্ত দুইটী শ্লোক যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "দেবী" আমাদিগের শরীরাভ্যন্তরস্থ অব্যক্ত ভাগে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধি অথবা আত্মা-গ্রাহ্য অংশে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। চক্ষু মেলিয়া তাঁহার বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। পূজার নামে হৈ-চৈ করিলে অথবা উচ্ছ্বাসের বন্যা ভাসাইয়া দিলে তিনি কুজ্ঝটিকার মত অস্পষ্ট হইয়া পড়েন। চক্ষু বুজিতে না জানিলে তাঁহাকে উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব হয় না।

তাঁহাকে নিখুঁৎভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রধান প্রধান উন্মেষ ও বিকাশ কোন্ কোন্ কার্য্যে অথবা কোন্ কোন্ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

এই পরিজ্ঞানের প্রথম উপায়—

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি-সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমঃ অস্তু তে॥

ইহার অর্থ—

হে দেবি! "হে নারায়ণি! (অর্থাৎ মানুষের ভূত ও ভাব-প্রকাশিনি!) সর্ব্ববিনয়ক বুদ্ধি জীবের রূপের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া হৃদয়ে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশের কারণ কি তাহা অনুভব-প্রয়াসী হইলে স্বকীয় তেজ ও ইন্দ্রিয়শক্তির উদ্ভব ও বিনাশ হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং ঐ উপলব্ধিকার্য্যে পারদর্শী হইলে তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে"।*

ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ যথাযথভাবে মনোগ্রাহ্য করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে মানুষের চেহারায় যাহা যাহা দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত কেন তাদৃশ রূপ গ্রহণ করে তৎসম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা লাভ করিতে হয়। এই ধারণা লাভ করার নাম "বুদ্ধি"কে অনুমান করা, তাহার পর ঐ বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত হৃৎ-যন্ত্রের কি সম্বন্ধ তাহা অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে "দুর্গা"র মুখ্য উন্মেষ ও বিকাশ যে, কি রূপে প্রতিনিয়ত শরীরাভ্যন্তরে সংঘটিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

"দুর্গা"র উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার দ্বিতীয় উপায়—

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি—
বিশ্বস্য উপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমঃ অস্তু তে।

ইহার অর্থ—

"হে নারায়ণি! ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার সংযমসাধনে সক্ষম হইয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ কার্য্যগুলি কোন্ ক্রমে ঘটিতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তোমার উন্মেষ-বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।" ইহা হইতেও বুঝিতে হয় যে—মানুষ যে-সমস্ত ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় কেন, তাহার অনুভবে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের শরীরের মধ্যে যে-সমস্ত কার্য্য প্রতিনিয়ত চলিতেছে, সেই সমস্ত কার্য্যের ক্রম-বিভাগ অর্থাৎ কোন্‌টীর পর কোন্‌টী, অথবা কোন্‌টীর আগে কোন্‌টী ঘটিতেছে, তাহা অনুভব করা সম্ভব হয় এবং তখন দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়"।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার তৃতীয় উপায়—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমঃ অস্তু তে॥

ইহার অর্থ—

"হে গৌরি! (অর্থাৎ চক্ষুর তেজসম্প্রদায়িনি!) হে নারায়ণি! যাহাকে যে ভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহার মূলে কোন্ নয়নভঙ্গীবশতঃ কোন্ স্পর্শ ও কোন্ রূপ বিদ্যমান থাকে, যে সমস্ত রাজসিকতার কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায়, তাহার মূলে কোন্ রস বিদ্যমান থাকে, যাহাকে যে নামে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে ঐ নাম কেন প্রদান করা হয়, যখন যে ভাল কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায়; তাহার মূলে কোন্ তেজ ও রস বিদ্যমান থাকে, যখন যে অভিমানাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায়; সেই অভিমানের শরীর-গঠন-গত মূল কারণ কি, তাহা অনুভব করিতে পারিলে তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে"।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার চতুর্থ উপায়—

সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং শক্তি-ভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি ন-মঃ অস্তু তে॥

ইহার অর্থ—

"হে সনাতনি! (অর্থাৎ সত্ত্বার উন্মেষ ও বিকাশ বুঝিবার যোগ্য বুদ্ধি-প্রদানকারিণি!) হে নারায়ণি! অবয়বের মধ্যে যে-সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ প্রতিনিয়ত সাধিত হইতেছে, তাহার কোন্টা কোন্ অঙ্গের কোন্ শক্তিবশতঃ হইতেছে, যাহা গুণহীন অব্যক্ত ছিল, তাহা গুণযুক্ত হইয়া কিরূপে ব্যক্তি লাভ করিতেছে, যাহা সত্ত্ব-গুণযুক্ত ছিল, তাহা কিরূপে রাজসিক ও তামসিক গুণময় হইয়া পড়িতেছে, এই সমস্ত অনুভব করিতে পারিলে তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে"।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার পঞ্চম উপায়—

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি-হরে দেবি নারায়ণি ন-মঃ অস্তু তে॥

ইহার অর্থ—

"হে দেবি! হে নারায়ণি, যে তেজ ও রস-বশতঃ জীবের কর্ম্ম-শক্তির উদ্ভব হয়, সেই তেজ ও রস জীব কি করিয়া প্রাপ্ত হয়, রসনার যে আতিশয্যে জীবের দুঃখপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, সেই আতিশয্য কিরূপে উদ্ভব হয়, তাহা অনুভব করিতে পারিলে এবং উহাদিগের সংযমে অভ্যস্ত হইলে সকল শ্রেণীর দুঃখের মূল কারণ বুঝিয়া লইয়া উহা দমিত করিবার পন্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে"।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার ষষ্ঠ উপায়—

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি ন-মঃ অস্তু তে॥

ইহার অর্থ—

"হে দেবি! হে নারায়ণি, ব্যোমের সহিত জীবের সত্ত্বার কি সম্বন্ধ এবং ঐ সত্ত্বার রসের কার্য্য কিরূপে সংঘটিত হয়, শরীরস্থ রসের সহায়তায় বিভিন্ন রূপের বিকাশ কিরূপে সাধিত হয়, প্রাকৃতিক

কার্য্যের ফলে মল-মূত্র ও স্বেদ কিরূপে নির্গত হয়, তাহা অনুভব করিতে পারিলে তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে" ।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার সপ্তম উপায়—

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ণি ন-মঃ-অস্তু তে ॥

ইহার অর্থ—

"হে নারায়ণি। প্রত্যেক জীবের শরীর কোন্ নিয়মে মস্তিষ্ক, বক্ষস্থল ও পাকস্থলী-রূপ ত্রিধা বিভক্ত হয়, প্রত্যেক জীব কোন্ নিয়মে তেজ প্রাপ্ত হয়, প্রত্যেক জীবের শরীরাভ্যন্তর কোন্ নিয়মে সর্পের গতির মত রসের গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অনুভব করিতে পারিলে, প্রত্যেক জীব কিরূপে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্য্যের সহায়তায় ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে তমসা ও কর্ম্মশক্তি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে" ।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার অষ্টম উপায়—

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরে অনঘে।
কৌমারী-রূপসংস্থানে নারায়ণি ন-মঃ-অস্তু তে ॥

ইহার অর্থ—

"হে নারায়ণি। বায়ুজাত তেজ হইতে প্রাকৃতিক বুদ্ধির উৎপত্তি হয় কি করিয়া, তাহা শরীরস্থ রসের সহায়তায় অনুভব করিতে পারিলে, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশে বিভিন্নতা সম্পাদন করে কি করিয়া, তাহা শরীরস্থ তেজের সহায়তায় অনুভব করিতে পারিলে, ব্রহ্ম-রূপের উন্মেষ ও বিকাশের ফলে পৌরুষেয়তার ও রসনার বিভিন্নতা হয় কি করিয়া, তাহা অনুভব করিতে পারিলে, জীবের প্রাথমিক রূপের উদ্ভব হয় কি করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে" ।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার নবম উপায়—

শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-গৃহীত-পরমায়ুধে।
প্রসীদ-বৈষ্ণবীরূপে-নারায়ণি ন-মঃ অস্তু তে ॥

ইহার অর্থ—

"হে নারায়ণি। সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত বায়ুর সহিত প্রাণ-বায়ু, জীবের অন্তঃস্থিত প্রাকৃতিক তেজ, জিহ্বার প্রাথমিক রূপ, এবং চক্ষুর তেজময় রূপের কি সম্বন্ধ তাহা অনুভব করিতে পারিলে হৃৎ-পিণ্ডের কার্য্যের সহিত প্রাকৃতিক পৌরুষেয়তা এবং সত্ত্বার প্রাথমিক কার্য্যের কি সম্বন্ধ তাহা জিহ্বার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিলে, তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে" ।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার দশম উপায়—

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি ন-মঃ অস্তু তে ॥

ইহার অর্থ—

"হে নারায়ণি! প্রাকৃতিক তেজের সহিত জীবের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ তাহা চক্ষু ও বায়ুর সহায়তায় অনুভব করিতে পারিলে, দন্ত ও মাংসের সহিত কি সম্বন্ধ তাহা তেজের সহায়তায় অনুভব করিতে পারিলে, প্রাথমিক তেজের সহিত রূপের কি সম্বন্ধ তাহা রসের সহায়তায় উপলব্ধি করিতে পারিলে, তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার একাদশ উপায়—

নৃসিংহরূপেণ উগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি ন-মঃ অস্তু তে।

ইহার অর্থ—

"হে নারায়ণি! শরীরের মধ্যে প্রকৃতির প্রাথমিক যে সমস্ত কার্য্য রহিয়াছে সেই সমস্ত কার্য্যের সহায়তায় বিকৃতির কার্য্যগুলিকে সংযত করিবার জন্য যত্নপরবশ হইলে, শরীরাভ্যন্তরস্থ বৈকৃতিক কার্য্য-গুলিকে অনুভব করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইলে তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে"।*

দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার দ্বাদশ উপায়—

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি ন-মঃ অস্তু তে॥

ইহার অর্থ—

"হে নারায়ণি! বিকৃত বুদ্ধির কার্য্যের সহিত জীবের স্বকীয় উন্মেষ ও বিকাশের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার ফলে রসময় কর্ণপটহে কিরূপ তেজ সঞ্চারিত হয় তাহা অনুভব করিবার চেষ্টা করিলে সত্ত্বার সহিত তেজের মিশ্রণে কিরূপে চক্ষুর ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয় তাহা উপলব্ধি-প্রয়াসী হইলে, রস ও তেজের বৈষম্যে কিরূপে মৃত্যু সংঘটিত হয় তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিলে মনের বহির্গামিতা কিরূপে উচ্ছৃঙ্খলা আনয়ন করে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে তোমার উন্মেষ ও বিকাশ মনোগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকে"।*

---

* দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার উপায় দেখাইবার জন্য আমরা যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা সমস্তই "চণ্ডীর" একাদশ অধ্যায়ের। এই শ্লোকগুলির যে ব্যাখা আমরা প্রদান করিয়াছি তাহা প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে বিভিন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রায়শঃ অর্থহীন ভাবমূলক। তাহাতে কর্ম্ম-মূলক অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কথা নাই। আমাদিগের ব্যাখ্যা অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে আগাগোড়া বিবিধ কর্ম্ম-পদ্ধতির এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বিবৃত হইয়াছে। ভাবমূলক কথার তুলনায় কর্ম্ম-পদ্ধতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূলক কথাগুলি যে অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং গ্রন্থকর্ত্তাগণের বৈজ্ঞানিকতার পরিচায়ক, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রচলিত ব্যাখা গ্রহণ করিলে চণ্ডীর প্রণেতা ঋষিকে ভাবপ্রবণ মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর আমাদিগের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ঐ ঋষি যে আশ্চর্য্য রকমের বৈজ্ঞানিক ছিলেন তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে হয়। ঋষিগণ ভাব-প্রবণ ছিলেন অথবা বৈজ্ঞানিক ছিলেন তৎসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ভার আমরা পাঠকগণকে অর্পণ করিব।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থসমূহ যথাযথ অর্থে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার উপায় অসংখ্য। কাযেই, ঐ সমস্ত উপায় সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করা এই প্রবন্ধের সাধ্যায়ত্ত নহে। যে কয়টী উপায়ের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটী আত্মোপলব্ধিমূলক এবং উহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু যাঁহারা আত্মোপলব্ধিতৎপর তাঁহাদিগের পক্ষে দুর্গার উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। দুর্গার মুখ্য উন্মেষ ও বিকাশ কোন প্রকারে একবার প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে "দুর্গা"কে প্রত্যক্ষ করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

"দুর্গা"কে প্রত্যক্ষ করিবার নাম "দুর্গার পূজা"। প্রত্যেক দেব-দেবীর পূজার প্রধান অঙ্গ তাঁহার বীজমন্ত্র অথবা নাম "জপ" করা। "জপ" শব্দটীর অর্থ "জপস্তদর্থভাবনং" অর্থাৎ "নাম অথবা বীজমন্ত্রের মধ্যে যে 'ধ্বনি' নিহিত থাকে সেই ধ্বনিরূপী কার্য্যের ফলে জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে কিরূপ তেজের উদ্ভব হয় এবং ঐ তেজোদ্ভবের ফলে বায়ুর পরিণতি কি কি রূপে ও কোথায় কোথায় হয় তাহা উপলব্ধি করা"। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, সম্যক্‌ভাবে শব্দোপলব্ধিই জপের প্রধান উদ্দেশ্য। একমাত্র জপের দ্বারাই প্রত্যেক দেব-দেবীকে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইয়া থাকে। পদ-স্ফোটের নিয়মানুসারে 'দেব' ও 'দেবী' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মস্তিষ্ক, মুখগহ্বর ও কণ্ঠমধ্যস্থিত কতকগুলি 'কর্ম্মে'র নাম "দেব" এবং ঐ কর্ম্মগুলি হইতে যে যে শক্তির উৎপত্তি হয় সেই সেই শক্তির এক একটী 'শক্তি'র নাম "দেবী"। মস্তিষ্ক, মুখগহ্বর ও কণ্ঠমধ্যস্থিত যে যে কর্ম্মগুলিকে এক একটী "দেব" বলিয়া আখ্যাত করা হয় সেই কর্ম্মগুলি যেরূপ মস্তিষ্কে, মুখগহ্বরে এবং কণ্ঠে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার বায়ুমণ্ডলেও পরিব্যাপ্ত থাকে। কাযেই, দেব ও দেবীগণ যেরূপ জীবের মস্তিষ্ক, মুখগহ্বর এবং কণ্ঠে বিদ্যমান থাকেন সেইরূপ আবার বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকেন। "দেব" ও "দেবী" এই দুইটী শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "দেব-দেবী"র পূজা করার অর্থ বায়ুমণ্ডলে যে-সমস্ত প্রকরণ নিহিত থাকে সেই সমস্ত প্রকরণকে প্রত্যক্ষ করা এবং সেই সমস্ত প্রকরণ জীব-শরীরের উপর

মনে রাখিতে হইবে ভাব-প্রবণতা সমাজের অনিষ্টকারী ও নিন্দনীয় আর প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতা সমাজের উপকারী ও শ্রদ্ধেয়। ব্যাকরণের দিক্ দিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে যে, প্রচলিত ব্যাখ্যা নানা রকম দোষে দুষ্ট। প্রচলিত ব্যাখ্যায় "হৃদি-সংস্থিতে", "স্বর্গাপবর্গদে" প্রভৃতি পদগুলি "সম্বোধন" বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা ঐ পদগুলিকে "অধিকরণার্থে" গ্রহণ করিয়াছি। বেদাঙ্গান্তর্গত শিক্ষার নিয়মানুসারে ঐ শ্লোকগুলিকে আবৃত্তি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "হৃদি-সংস্থিতে", স্বর্গাপবর্গদে" প্রভৃতি পদগুলি "নাম-ধাতুপ্রক্রিয়া"র অন্তর্গত। ঐ পদগুলিকে সম্বোধনার্থে গ্রহণ করিলে উহাদিগের ধাতুত্ব নষ্ট হইয়া যায়, এবং উহারা কেবলমাত্র নামত্বে পর্য্যবসিত হব। কাযেই, উহাদিগকে সম্বোধনার্থে গ্রহণ করা ব্যাকরণের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে হয়। ইহা ছাড়া "পদ-স্ফোটের" নিয়মানুসারে প্রত্যেক পদটীর অর্থ গ্রহণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পদগুলিকে সম্বোধনার্থে গ্রহণ করিলে ব্যাখ্যাগুলির কার্য্য-কারণসঙ্গত অর্থ লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে প্রয়োজন হইলে আমরা দেখাইয়া দিব যে, আমাদিগের ব্যাখ্যাই অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র-পাঠ ও নিরুক্তের নিয়মানুগ এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা এই সমস্ত নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

কিরূপে কার্য্যকরী হয় তাহা প্রত্যক্ষ করা। কাযেই বলিতে হইবে যে, দেব-দেবীর পূজার অন্যতম উদ্দেশ্য প্রকৃতভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ধার করা। মানুষ এই পূজা ভুলিয়া গিয়াছে। দেব-দেবীর আসল পূজা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই মনুষ্য-সমাজ দুঃখসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে এবং কি করিয়া সমাজের প্রত্যেকে অর্থাভাবাদি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি, মানুষের হিতসাধনপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন মূল্য নাই এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে কোন ক্রমেই প্রকৃতভাবের "বিজ্ঞান" বলিয়া আখ্যাত করা যায় না। কাযেই বলিতে হইবে যে, মনুষ্য-সমাজকে অর্থাভাবাদি হইতে রক্ষা করিতে হইলে দেব-দেবীর আসল পূজা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আগেই দেখাইয়াছি যে "দুর্গা"র আসল পূজা করিতে হইলে "দুর্গা-নাম" জপ করিতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "দুর্গানাম" জপ করিলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন্ অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে? আজকালকার টিকিধারিগণের অনেকেই তো দুর্গানাম জপ করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মূর্খ বলিলেও বলা যাইতে পারে। আগেই বলিয়াছি, জপ-শব্দের অর্থ "জপস্তদর্থভাবনং"। কেবলমাত্র নাম উচ্চারণ করিলেই জপ করা হয় না। আজকালকার পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের আচার্য্যগণ জপকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঋষিপ্রণীত মূল শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত জপ কখনও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয় না। উহা সর্ব্বদাই এক, উহা কখনও শ্রেণীবিভক্ত হয় না। জপের মুখ্য কার্য্য ধ্বনিরূপী কার্য্যের ফলে জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে কিরূপ তেজের উদ্ভব হয় এবং ঐ তেজোদ্ভবের ফলে বায়ুর পরিণতি কি কি রূপে ও কোথায় কোথায় হয় তাহা উপলব্ধি কবা। জপের কার্য্য খুবই সূক্ষ্ম তাহা সত্য, কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম কার্য্যে পারদর্শী না হইতে পারিলে প্রকৃতপক্ষে "জপ" করা হইয়াছে, ইহা মনে করা সম্পূর্ণ মূর্খতা ও প্রতারণা। তদ্দারা নির্ব্বংশ ও শ্রীহীন হওয়া সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য নামাবলীধারিগণ অনেক দিন হইতে নির্ব্বংশ ও শ্রীহীন হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উদ্ধার করা সম্ভব হইতেছে না।

জপের মুখ্য কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া দুর্গা-নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় তেজ-স্পর্শের উদ্ভব হয় যাহা কেবলমাত্র চক্ষু-গোলকের পশ্চাতে এবং জিহ্বা-মূলীয় কণ্ঠমধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া থাকে। তখন চক্ষু-গোলক ও জিহ্বামূলীয় কণ্ঠের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ তাহাও পরিষ্কার ভাবে প্রতিঘাত হয় এবং ক্রমে ক্রমে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ও রসনার রসগ্রহণশক্তি যে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। এমন কি, মস্তিষ্কের মধ্যে যে কত রকমের কার্য্য চলিতেছে তাহাও স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই জপ-কার্য্য চলিতে থাকিলে নিকটস্থিত বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্য প্রতিভাত হয় এবং তখন ক্রমে ক্রমে বায়ুমণ্ডলের কার্য্যকে শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হয়।

এইরূপে দুর্গার প্রকৃত পূজার অথবা দুর্গানামের আসল জপের সহায়তায় বায়ুমণ্ডলের কার্য্যের শ্রেণীবিভাগরূপী প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং জীবের শরীরবিধানের (physiology-র) কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান উদ্ধার করা সম্ভব হইয়া থাকে। শুধু যে উপরোক্ত বিজ্ঞানই উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহা নহে, যাঁহারা দুর্গানাম জপ করিতে শিক্ষা করেন তাহাদিগের শরীরে বিবিধ রোগের আশঙ্কা তিরোহিত হয় এবং তাঁহাদিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা লাভ করে; কারণ দুর্গানামজপের ফলে জিহ্বাভ্যন্তরে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে, অক্ষিগোলকে এবং জিহ্বামূলীয় কণ্ঠে যে তেজ-স্পর্শের উদ্ভব হয়, সেই তেজ মুখ্যপক্ষে মস্তিষ্কের, চক্ষুর ও জিহ্বার স্নিগ্ধতাসাধক এবং গৌণপক্ষে সর্ব্ববিধ রোগের নিরাময়ক। ইহারই জন্য ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে দুর্গা-নাম জপের এত প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, ধ্বনিরূপী কার্য্যের ফলে জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে কিরূপ তেজের উদ্ভব হয় এবং ঐ তেজোদ্ভবের ফলে বায়ুর পরিণতি কি কি রূপে ও কোথায় কোথায় হইয়া থাকে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে দুর্গানামজপ কখনও সম্যক্‌ভাবে সাফল্য প্রদান করিতে পারে না।

শব্দ-স্ফোট ও পদ-স্ফোটের নিয়মানুসারে দুর্গা এই পদটার অর্থ গ্রহণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, "দুর্গা" বলিতে বুঝায় সেই তেজাত্মক প্রাকৃতিক কর্ম্ম-শক্তি যদ্দ্বারা রসনার রসগ্রহণশক্তি ও চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তির সৃষ্টি ও স্থিতি সাধিত হয়। এতদনুসারে দুর্গা-পূজা বলিতে বুঝায়—"যে তেজাত্মক প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তির দ্বারা রসনার রসগ্রহণশক্তি এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি ও স্থিতি সাধিত হইয়া থাকে সেই তেজাত্মক প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তিকে প্রত্যক্ষ করা। দুর্গানাম যথাযথভাবে জপ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার দ্বারা ঐ তেজাত্মক প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, চক্ষুগোলকদ্বয় এবং জিহ্বামূলীয় কণ্ঠের মধ্যে একটী গিরিপৃষ্ঠাকারসদৃশ তেজোময় সমতল বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে উপরোক্ত তেজাত্মক প্রাকৃতিক কর্ম্মশক্তির উদ্ভব হইতেছে এবং রসনার রসগ্রহণশক্তি ও চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি ও স্থিতি সাধিত হইতেছে। এই গিরিপৃষ্ঠাকারসদৃশ তেজোময় সমতলকে সংস্কৃত ভাষায় "হিমালয়" বলা হইয়া থাকে। শব্দ-স্ফোট ও পদ-স্ফোটের নিয়মানুসারে 'হিমালয়' শব্দটার অর্থ গ্রহণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থে মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থিত গিরিপৃষ্ঠাকারসদৃশ তেজোময় সমতলকেই বুঝিতে হয়। ইহারই জন্য পুরাণে হিমালয়কে দুর্গার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

দুর্গার সম্যক্‌ পূজা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সম্ভবযোগ্য নহে। কারণ, চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গে বিশেষ অবস্থানে অবস্থান-বিশিষ্ট না হইতে পারিলে যে-তেজাত্মক প্রাকৃতিক কর্ম্ম-শক্তিকে "দুর্গা" বলা হয়, সেই তেজাত্মক প্রাকৃতিক কর্ম্ম-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কেবলমাত্র বাঙ্গালাদেশে ও বৎসরের মধ্যে চারি দিবসে দুর্গার প্রকৃত পূজা সম্ভবযোগ্য হয়। ইহারই জন্য বাঙ্গালা দেশেই এই পূজা ঋষিগণ প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং এখনও যাহা দুর্গা-পূজা নামে প্রচলিত আছে তাহা বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। মানুষ দুর্গা-পূজার প্রকৃত অর্থ পরবর্ত্তী কালে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য দেশেও উহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

দুর্গানাম-জপ বলিতে কি বুঝায়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে, উহা অত্যধিক

সূক্ষ্ম-উপলব্ধিমূলক এবং প্রযত্নসাধ্য। উহার সহায়তার জন্য ধ্যান, স্তব ও কবচের প্রণয়ন করা হইয়াছে। যথাযথভাবে জপ করিতে আরম্ভ করিলে যে উপলব্ধির পর যে উপলব্ধি পাওয়া যায়, তাহার ক্রম ধ্যানে লিপিবদ্ধ থাকে। জপে সিদ্ধ হইলে প্রধান প্রধান অঙ্গে ও মনে যে যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় তাহা যথাক্রমে স্তব ও কবচে লিপিবদ্ধ থাকে। স্তব ও কবচে অঙ্গের ও শরীরের যে যে অবস্থার কথা নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার উদ্ভব না হইলে বুঝিতে হয়, জপ অথবা পূজা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় নাই। ধ্যান, স্তব ও কবচ যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে পূজায় কখনও ভ্রমপ্রমাদ প্রবিষ্ট হইতে পারে না এবং মানুষ প্রকৃত পূজা না করিয়াও পূজা করিয়াছেন মনে করিয়া আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হইতে পারেন না। আজকালকার পুরোহিতগণ প্রায়শঃ ধ্যান, স্তব ও কবচের অর্থ বুঝিতে পারেন না বলিয়া আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হইয়া নিজদিগের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন।

আমরা এতাবৎ যে দুর্গাপূজার কথা বলিলাম তাহার নাম দুর্গার সিংহবাহিনী-মূর্ত্তিপূজা। আগেই বলিয়াছি, এই পূজা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। প্রকৃত সাধক না হইলে এই পূজা সম্পাদন করিতে পারেন না। চক্ষু বুজিতে না জানিলে অর্থাৎ মন যাহাতে অন্তর্ম্মুখীন হয় তাহা না করিতে পারিলে কোন দেব-দেবীর পূজা আসলভাবে করা সম্ভব হয় না। কাজেই, আসল পূজায় লিপ্ত হইতে হইলে মন যাহাতে অন্তর্ম্মুখীন হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। মন যাহাতে বহির্ম্মুখীনতা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখীন হয় তাহা করিবার জন্য সাধারণ পক্ষে দুর্গার চণ্ডী-মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা আছে। চণ্ডী-মূর্ত্তির পূজায় আসল দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু উহার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। বাঙ্গালাদেশে আজ-কাল সাধারণতঃ যে দুর্গামূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে তাহা দুর্গার চণ্ডী-মূর্ত্তি। মনে রাখিতে হইবে যে, চণ্ডী-মূর্ত্তিপূজার প্রধান উদ্দেশ্য মনকে অন্তর্ম্মুখীন করা এবং আসল দুর্গাপূজার অধিকারী হইবার চেষ্টা করা।

"চণ্ডী-মূর্ত্তি" আমরা গত বৎসর ব্যাখ্যা করিয়াছি। এবার আর তাহার ব্যাখ্যা করিব না।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য (২)

গত সংখ্যায় আমরা এইবিষয়ক নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ কয়টি আলোচনা করিয়াছি :—

(১) যুদ্ধে কার্য্যতঃ কোন সহায়তা-দান হইতে বিরত থাকিয়া এই সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করা উচিত কি না।

(২) যুদ্ধে কার্য্যতঃ কোন সহায়তা-দান হইতে বিরত থাকিয়া বাহ্যতঃ ঔদাসীন্য পোষণ করা এবং ব্রিটিশ জাতির পরাজয়কল্পে আমাদের সাধ্যমত সামান্য সামান্য কার্য্য গোপনে করা উচিত কি না।

(৩) ব্রিটিশ জাতির জয়লাভকল্পে আমাদের সাধ্যমত সম্ভব কার্য্যতঃ সহায়তাদান উচিত কি না।

(৪) ব্রিটিশ জাতির জয়লাভকল্পে আমাদের কার্য্যতঃ সহায়তাদানের বিনিময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা উচিত কি না।

(৫) জার্ম্মানদের বিপক্ষে যাহাতে নিশ্চিত জয়লাভ সম্ভব হয়, তৎপক্ষে ব্রিটিশ জাতির আমরা সম্ভবতঃ কি সাহায্য করিতে পারি।

প্রথম চারিটি প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, ব্রিটিশ জাতির পরাজয়ের সহায়ক কোন কিছু করা দূরে থাক্, ব্রিটিশ জাতির জয় যাহাতে দ্রুত সাধিত হয়, তাহারই জন্ত আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং বর্ত্তমানে ব্রিটিশ জাতির জন্ত আমরা যাহা করিব, তাহার বিনিময়ে কোন কিছু দাবী করা আমাদের উচিত হইবে না।

পঞ্চম প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত কোন প্রকার ক্ষতি সহ্য না করিয়া উদ্দেশ্যসাধনকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিজয় আখ্যাত করিতে হইবে। লিখিত ইতিহাস-কালের মধ্যে যে-সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই যে প্রকৃত বিজয়লাভ সম্ভব হয় নাই এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত তেমন কোন ক্ষতি সহ্য না করিয়া বিজয়-লাভের এক মাত্র পন্থা যে, বেদ-নির্দ্দিষ্ট বৈশ্য-যুদ্ধের উপায়-অবলম্বন, তাহাও এই একসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত ভীষণ মারাত্মক ক্ষতি সহ্য না করিয়াও কোন্ বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ জাতির দ্রুত বিজয়লাভকল্পে উপরিলিখিত বৈদিক পন্থাপ্রয়োগার্থ কার্য্যতঃ কিরূপে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহারই প্রদর্শন।

গত সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, রুশীয়গণ পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং জাপান, তুরস্ক ও ইটালীর জার্ম্মান পক্ষাবলম্বনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্য্যকরী সমিতি ব্রিটিশ জাতির এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচলাভের প্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ জাতির কর্ত্তব্যসমাধানের ব্যাপার পূর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবতঃ আয়াসসাধ্য হইয়াছে, কিন্তু শত্রুপক্ষ পোল্যাণ্ডের সরকারকে পোল্যাণ্ড হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। এমন কি, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'ষ্টেট্স্ম্যান্' পত্রিকা পর্য্যন্ত 'কাম্ দি ফোর-কর্ণার্স্' ('Come the Four Corners') শীর্ষে লিখিয়াছেন, "ব্রিটিশ জাতিসঙ্ঘ (Commonwealth of Nations) যাহা কিছুর স্বপক্ষে, তাহা সমস্তই যাহারা ইহার স্বাধীনতার প্রতি ঘৃণা এবং ইহার ধৈর্য্যশীলতার প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে, তাহাদের দ্বারা বিপন্ন।"

সুতরাং সকল সমস্যা অতিক্রম করিয়া সমস্যা দাঁড়াইতেছে —"আসন্ন বিপৎপাত হইতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-ভুক্ত জাতিসমূহকে রক্ষা করিয়া, ইহার ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত ক্ষতি বিন্দুমাত্রও সাধন না করিয়া ইহাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কার্য্যতঃ কি করা যায়?" ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্গণ ইতোমধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, উপরিনির্দ্দিষ্ট সমস্যার সমাধানার্থ তাঁহারা প্রধানতঃ চারিটি উপায় অবলম্বন করিবেন,—যথা (১) শত্রুপক্ষের বিমানবাহিনীর ধ্বংসসাধন, (২) শত্রুপক্ষের নৌবাহিনীর ধ্বংসসাধন, (৩) শত্রুপক্ষের স্থলবাহিনীর ধ্বংসসাধন, এবং (৪) শত্রুপক্ষের আর্থিক কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া তাহারা যাহাতে আহার্য্য ও কাঁচামালের অভাবগ্রস্ত হইয়া যুদ্ধে অধিকতর অগ্রসর হওয়া হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়, তাহার সাধন। শেষ পর্য্যন্ত এই চারিটি উপায়ই সার্থক হইবে বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি, কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য্য যে, উপরিলিখিত চারিটি উপায়ের প্রত্যেকটির কৃতকার্য্যতার মূলে শত্রুপক্ষ অপেক্ষা অধিকতর পশুশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন এবং ইহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সত্য যে, গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ব্রিটেন সাধারণতঃ পশুশক্তি অপেক্ষা আর্থিক ব্যবস্থার এবং সংস্কৃতিমূলক চর্য্যার উন্নয়নকার্য্যে অধিকতর ভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, অপরপক্ষে শত্রুপক্ষ ইহার অধিকাংশ সময় বিজ্ঞান আখ্যায় পরিচিত মনুষ্য-জীবনের ধ্বংসসাধক অস্ত্র-শস্ত্রের নির্ম্মাণেই সোদ্যমে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

এমন কি, জার্ম্মাণী অপেক্ষা ইংলণ্ড পশুশক্তির উন্নয়নকার্য্যে অধিকতর ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া যদি প্রমাণিতও হয় এবং তৎসহায়ে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্গণের এই চারিটি উপায় দ্বারা যুদ্ধজয়ে কৃতকার্য্য হইলেও, তথাপি তাহার অর্থ দাঁড়াইবে এই যে, প্রচুর মনুষ্য-জীবন এবং প্রচুরতর বিষয় সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিয়া যুদ্ধ-জয় সম্ভব হইবে।

কেবল ইহাই নহে, যুদ্ধ চলিতে থাকিলে প্রত্যেক দেশে সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর মাত্রাতে টাকা-আনা-পাইয়ের প্রচলন-বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে যে বন্যা ও

অনাবৃষ্টি-বিধ্বস্ত কৃষিগত দুরবস্থা চলিতেছে, তাহাতে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ-সংখ্যক অধিবাসী যে দরিদ্র জন-সাধারণ, তাহাদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ইহা লক্ষ্যের বহির্ভূত রাখিলে চলিবে না যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব অপেক্ষা বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশে বিঘা-প্রতি কৃষিগত দ্রব্যোৎপাদনের অনুপাত অনেক অনধিক এবং ইহার ফলে সর্ব্বত্র অধিকতর মাত্রায় আভ্যন্তরীণ বিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। উপরিলিখিত সমগ্র তথ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উহাদের দ্বারা ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন না করিয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে শীঘ্র জয়ী হইবার প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণিত হইতেছে।

আমাদের মতে, যুদ্ধ-বিরতির নিমিত্ত শত্রুপক্ষ যে-সব চুক্তি উপস্থিত করিবার দুঃসাহস দেখাইতেছে, ইংলণ্ড যদি তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রস্তাব করেন যে, ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে 'জনমত গ্রহণ' (plebiscite) করা হউক, তবে যুদ্ধে জয়লাভ, কেবল দ্রুত নহে স্থায়ী হইতে পারে। 'জনমত' গ্রহণ বলিতে আমরা প্রত্যেক দেশের শ্রমজীবী সাধারণের মত-গ্রহণ বুঝাইতেছি। উদাহরণ-সাহায্যে আমরা আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা পাইব। ধরা যাউক, শত্রুপক্ষ ব্রিটিশ জাতির নিকট হইতে ভারতের শাসনভার নিজেরা লইতে চাহে, তদুত্তরে এই বিষয় সম্পর্কে একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ভারতবাসী দরিদ্র জন-সাধারণের মত-গ্রহণ-ব্যবস্থার প্রস্তাব ইংলণ্ডকে আনয়ন করিতে হইবে এবং জানাইতে হইবে যে, যদি ভারতবাসী দরিদ্র জন-সাধারণের অধিকাংশ শত্রুপক্ষের নিকট এই দায়িত্ব-অর্পণ সমর্থন করে, ইংলণ্ড তাহা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইবেন। অন্যপক্ষে, যদি অধিকাংশ দরিদ্র ভারতবাসী এই অর্পণের প্রতিবাদ করে এবং ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে শত্রুপক্ষকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি ইংলণ্ড আন্তরিক ভাবে এবং একান্ত চিত্তে এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তবে শত্রুপক্ষের এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। যদি শত্রুপক্ষ স্বীকৃত না হয়, তবে দেখা যাইবে যে, মনোবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী মতবৈষম্য সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে শত্রুপক্ষে অনৈক্য দেখা দিয়াছে, ফলে বর্ত্তমান অপেক্ষা তাহারা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, সুতরাং বর্ত্তমান সংঘর্ষোন্মুখ ভাব বজায় থাকিলে যুদ্ধজয়ে যে-সময় লাগিত, তাহার অপেক্ষা জয় দ্রুত সাধিত হইবে। অন্যদিকে যদি শত্রুপক্ষ উপরের প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে ইংলণ্ডকে কালমাত্র অপেক্ষা না করিয়া কি ভাবে ভারতের দরিদ্র সাধারণের প্রত্যেকের জীবনযাপনার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যার্জ্জন সম্ভব হইতে পারে, তাহার শিক্ষালাভ করিয়া অনতিবিলম্বে সেই সকল ব্যবস্থায় অগ্রসর হইতে হইবে; অতঃপর প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন-যাপন-পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যলাভ যাহাতে সুনিশ্চিত হইতে পারে, ইংলণ্ড তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই বিষয়ে ভারতবাসীকে সচেতন করিবার নিমিত্ত প্রচারকার্য্যে অবহিত হইতে হইবে। বলাই বাহুল্য যে, যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী জীবনযাপনার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারে, বাস্তবতঃ সেইরূপ কোন ব্যবস্থায় যদি ইংলণ্ড অগ্রসর হইতে পারেন এবং তৎসঙ্গে যদি ভারতবাসীদিগকে এই বিষয়ে সচেতন করিতে পারেন, তবে বৃটিশজাতি তাঁহাদের স্বপক্ষে সমগ্র ভোটসংগ্রহে সমর্থ হইবেন, কেননা, প্রকৃতির নিয়ম হইতেছে, যাঁহারা দরিদ্রকে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন, তাঁহাদের প্রতি তাহারা কৃতজ্ঞ থাকে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ড যতখানি ভারতবাসীদের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হইবেন, শত্রুপক্ষ কদাপি তাহার সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন না, কেননা, ভারতবাসী ব্রিটিশ জাতির যে-পরিচয়-লাভে সমর্থ হইয়াছে, শত্রুপক্ষের সে পরিচয় লাভ করে নাই এবং ভারতের ইহার কার্য্য করিবার পক্ষে শত্রুপক্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডের সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেশী। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন জনসাধারণের ভোটগ্রহণব্যবস্থা ইংলণ্ডের সহায়ক হইবে না, কেননা, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ জীবন-যাপনার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিলাভ ব্যতীত অপর অনেক বিষয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহাও লক্ষ্যে রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডকে ভারতবাসীদের প্রতি আচরণে সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান্ হইতে হইবে।

এইভাবে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অস্থায়ী বিজয়লাভ দ্বারাই স্থায়ী বিজয়লাভও সম্ভব হইবে, কেননা, প্রত্যেক ভারত-

বাসীর পক্ষে জীবনযাপনার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুনিশ্চিত করিবার জন্য আন্তরিক ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংস্কারসাধনের দ্বারাই ইহা সম্ভব, এবং যথাযথ প্রকারে ভারতীয় জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংস্কার সাধিত হইলে এক ভারতবর্ষেই এত অধিক পরিমাণে আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন হইতে পারে যে, তাহার উদ্বৃত্তসাহায্যে সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার আহার্য্যের সরবরাহ সম্ভব হইবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে আহার্য্য ও কাঁচামালের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই সেখানে নাৎসিবাদ ও ফাশিস্তবাদের অভ্যুত্থান হইয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা সাধিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হইবে না। ইংলণ্ড যদি ভারতের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বর শক্তির সংস্কারে কৃতকার্য্য হন, তবে ইংলণ্ড ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রত্যেকটীর আহার্য্য ও কাঁচামালের এই অভাবপূরণেও সমর্থ হইবেন, এবং তখন জার্ম্মান-ইতালীয়-রুষীয়-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতির জনসাধারণের উপর ইংলণ্ড আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইবেন, যাহার ফলে সমগ্র ইউরোপের জনসাধারণের সাহায্যে ব্রিটিশ জাতির পক্ষে 'হিটলার-তন্ত্র' প্রভৃতি সকল কিছুর উচ্ছেদ-সাধন রক্তপাত ব্যতীতই অত্যন্ত সহজসাধ্য হইবে।

প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, উপরিলিখিত মতবাদের প্রচার সাধন করা এবং ব্রিটিশ জাতির প্রকৃত বিজয়লাভ দ্রুত সাধিত করিবার ইহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা।

এই মতবাদের প্রতি অনতিবিলম্বে অবহিত হইবার জন্য আমরা প্রার্থনা জানাইতেছি।*

ইহা কি মনুষ্যোচিত না পশূচিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া ?

ব্যবসায়ী-জগতের সর্ব্বত্র ক্রোর ক্রোর এবং লক্ষ লক্ষ মুদ্রাসংগ্রহের জন্য এবং দ্রব্যের মূল্য যথাসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া অধিকতর লাভ সুনিশ্চিত করিবার নিমিত্ত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। ব্যবসায়ী-জগতের এই অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দও ভাগ-বাঁটোয়ারার এই সুযোগে যথাসাধ্য লাভ করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন। চারি পার্শ্বে এই মনোভাবের সাড়া পাইতেছি বলিয়াই পাঠকবৃন্দকে আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানস-নেত্রে কল্পনা করিতে বলিতেছি, যে-সকল দেশ প্রত্যক্ষভাবে সমরায়োজনের প্রকোপাবিষ্ট হইয়াছে, সেই-সকল দেশের নারীজাতি ও শিশুবৃন্দকে কি অবস্থার অধীন হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে অনুমান করিতে বলি যে, যদি তাঁহারা দেখিতেন যে, মূষিকের ন্যায় বিবরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না করাইতে পারিলে তাঁহাদের নারীজাতি ও শিশুর জীবনরক্ষার সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই, তবে তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ হইত। আমরা তাঁহাদিগকে কল্পনা করিতে বলি যে, তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে যদি তাঁহাদের সহোদর ও পুত্রবৃন্দের রক্ত-পাতে মৃত্যু ঘটিত কিংবা তাহারা পঙ্গু ও অন্ধ হইয়া পড়িত, তবে তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ হইত? মনুষ্যজাতির একাংশ যখন এইরূপ দুর্দ্দশা ও মৃত্যুযন্ত্রণার অধীন, তখন মনুষ্যজাতিরই অপর কোন অংশ কর্ত্তৃক ক্রোরপতি এবং লক্ষপতি হইবার বাসনা পোষণ করা কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তি অধিকার করিবার ইচ্ছা পোষণ করা কি মনুষ্যোচিত? ইহা কি সহোদরের হত্যা সাধন করিয়া ধনী হইবার স্পৃহার তুল্য নহে?

তদুপরি আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, ইহা সম্ভবপর নয়; ইহা যদি সম্ভব হইত, তবে গত যুদ্ধের অবসানে আমরা পৃথিবীর একাংশ অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া দেখিতাম। জনকয়েক বুদ্ধিহীন সাংবাদিক এবং অর্থনীতিবিদ্ অর্থনৈতিক দিক্ হইতে যুদ্ধ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ বলিয়া রব উঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত নির্ব্বোধ বলিয়াই এইরূপ রব উঠাইতে পারিয়াছেন।

* 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী'র ২১শে সেপ্টেম্বর-সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভের অনুবাদ।

গত যুদ্ধের সময়, অনেককে ধনবান্ হইতে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, তাঁহাদের প্রায় কেহই গত যুদ্ধ অবসান হওয়ার পর এই বিংশ বৎসর কালের জন্যও সেই ধন-রক্ষায় সমর্থ হন নাই। বরং তাঁহারা অধিকতর দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়াছেন। অনেকেই বর্ত্তমানে পাট, চট ও চটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সুদিন উপস্থিত বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, গত যুদ্ধের সময়েও পাটের মূল্যবৃদ্ধি-হেতু অনেকে যথেষ্ট অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহাদের যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা দরিদ্রতর হইয়া পড়িয়াছেন।

ভ্রাতার রক্তে ভূমি সিক্ত করিয়া ধনবান্ হওয়া কেন সম্ভব নহে, তাহার সন্ধান লাভ করিতে হইলে মনুষ্যোচিত মস্তিষ্কের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে পৃথিবীর মনুষ্যজাতির মধ্যে সেই মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই জন্যই আমরা প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছি—ইহা কি মনুষ্যোচিত না পশুচিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া?

এমন ব্যক্তি হয় তো আছেন, যাঁহারা পাপ পুণ্যের বিচারকে পরিহাস করেন, কিন্তু তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে, পাপ এবং পুণ্য উভয়ই বর্ত্তমান এবং সুবিচারের কাল সমাগত। এই সঙ্কট-কালে পাপাচরণ হইতে বিরত থাকাই বিধেয়।*

* 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী'র ২১শে সেপ্টেম্বরের-সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভের অনুবাদ।

একটী সেকালের গান

—শ্রীহরিপদ দত্ত

জননী আমার, স্বর্গ আমার,
তুমি গো ভারতবর্ষ,
নির্ব্বাণ যেন তোমার অঙ্কে,
দেশ বলি খ্যাত তুমি মহাদেশ,
প্রকৃতিরচিত চারু তব বেশ,
কটীলম্বিত নীল অম্বর
করিছে চরণ স্পর্শ।

বিটপিপুঞ্জ শ্যামাবগুণ্ঠ,
সরিত মাল্য আপাদকণ্ঠ
ভরণ কান্ত, কিরীটে তুঙ্গ
মণ্ডিত তব শীর্ষ।

রম্য ষট্‌ঋতু দানিয়া হর্ষ
পর্য্যায়ক্রমে ব্যাপিয়া বর্ষ,
শ্যামল ক্ষেত্র প্রসবে নিত্য
পুঞ্জ পুঞ্জ শস্য।

পুজিত গৃহে মানবধর্ম্ম,
পীযূষ তুল্য গোধন স্তন্য,
স্বস্তি পূর্ণ আমর শূন্য,
নাস্তি অভাব স্পর্শ।

পূজ্য, মান্য মানবধর্ম্ম;
জীব কল্যাণ সবার কাম্য,
পরিবর্জ্জিত সদা কুকর্ম্ম,
নাহিক পাতক স্পর্শ।

"আমিই জ্বেলেছি দীপ,
ফুৎকারে আমিই তাহা করিব নির্ব্বাণ।"
(ডক্টর গোয়েবল্‌সের দুর্গতিমূলক)

পরাধীনতা

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যতদিন অস্মদ্দেশীয় নরনারীর আয়ুর্ব্বেদে আস্থা ছিল, অর্থাৎ যতদিন দেশ মানিয়া লইয়াছিল, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাম্ প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ, ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল আর মোক্ষই বল,' ধড়ে প্রাণ থাকিলে তবে সব, ততদিন দেশ প্রকৃতিস্থ ছিল, সুখে ছিল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ বিচিত্র জীবনে কত রাজা-রাজত্বের উত্থান পতন ঘটিল, কত দিগ্বিজয়ের প্লাবন আসিল ও নামিয়া গেল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই,' কোনদিন হইবেও না। ভারতীয় সমাজে ও সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল যেন একটা অবান্তর ব্যাপার। ইতিহাসের নানা পরস্পরবিরোধী উপাদানের মধ্যে একমাত্র অবিসংবাদিত সত্য এই যে, ভারতবর্ষ বরাবর বাঁচিয়া আছে, কারণ সে বাঁচিয়া থাকাকেই নরজীবনের স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

গোল বাধিল—বিজাতীয় বৈদেশিক মতের প্রতিধ্বনি করিয়া যেদিন বাঙ্গালী কবি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ?"

অর্থাৎ বাঁচাটা নিতান্তই অপ্রয়োজন যদি স্বাধীনতা না থাকে।

এই 'স্বাধীনতা' শব্দটি কতদিনের তাহা বলা কঠিন হইলেও একথা বোঝা কঠিন নহে যে, ইহা freedom বা liberty জাতীয় বৈদেশিক শব্দের তর্জ্জমা মাত্র। সংস্কৃতে 'স্ব' শব্দও ছিল, 'অধীনতা' শব্দও ছিল, কিন্তু উভয়ের সন্ধিবন্ধন অতি-আধুনিক অনুষ্ঠান। তবে আমাদের জাতীয় প্রতিভা এই শব্দসংযোজনের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা সুকৌশলে স্বীকার করিয়া লইয়াছি 'স্বাধীনতা'র কলেবরেও অধিকাংশটাই 'অধীনতা'। তথাপি কবির প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়া গেল। আমরা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া মনে মনে কবিকে উত্তর পাঠাইলাম যে, 'স্বাধীনতা হীনতায় আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না।' আদর্শ স্থির হইয়া গেল যে,যদিও ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূলে 'বাঁচিয়া থাকা', তথাপি স্বাধীনতা হইতেছে সেই বাঁচিয়া থাকারও উপরের কথা, স্বাধীনতাহীনের আত্মহত্যা করাই সঙ্গত। দল বাঁধিয়া আমরা এখনও যে আত্মহত্যা করি নাই, সে কতকটা আইনের ভয়ে ও বাকিটা পিতৃপুরুষের পিণ্ড-লোপের আশঙ্কায়। নচেৎ এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই যে, বাঁচা বড় কথা নহে, স্বাধীনতাই বড় কথা, আর তজ্জন্য আত্মহত্যা না করা মহাপাপ।

এই স্বাধীনতার ভূত আজ সমগ্র জগতের ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে আত্মহত্যার পথে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশেও প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমরাও এই সুযোগেই মরিব, না সুযোগান্তরের অপেক্ষা করিব? কেহ যদি পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া বলে যে, আদৌ মরিবার প্রয়োজন নাই, সাবেকি প্রথায় পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাইয়া রাখিলে যুগে যুগে আরও কত রহস্য দেখিবার সুযোগ মিলিবে, তবে তাহাকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দেই। জগতে যাহারা স্বাধীন তাহারা দলে দলে মরিতেছে ও মারিতেছে, আর 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!' মানুষ যেন জন্মিতেছে—বাঁচিবার জন্য নহে, মরিবার ও মারিবার জন্য।

ভারতবর্ষ পরাধীন আর ইংলণ্ড স্বাধীন, ইহাতে মতভেদ হইবার অবকাশ নাই। কিন্তু কি স্বাধীনতা কি পরাধীনতা, উভয়েরই স্তরভেদ আছে। জার্ম্মানী বা ইতালীর তুলনায় ইংলণ্ডে যে উচ্চাঙ্গের স্বাধীনতা বিদ্যমান ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। আর ভারতের পরাধীনতাও পূর্ব্বের ন্যায় তেমন নিম্নাঙ্গের নাই, অর্থাৎ "দাসত্বশৃঙ্খল," যাহা "কে পরিবে পায় হে" বলিয়া মহা আপত্তির কারণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা উপস্থিত গলায় উঠিয়া কণ্ঠহাররূপ শোভা পাইতেছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বাঁচিয়া থাকা ও বাঁচিতে দেওয়ার আদর্শে বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ডের স্বাধীনতা তাহার নিজের পক্ষেও কোন সুবিধার কারণ হয় নাই। ভারতবর্ষ তাহার অধীনতার অকাট্য যুক্তিস্বরূপ বলে যে, তাহার মত না লইয়াই ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যুদ্ধে

নামাইয়াছে'; অতএব ঐ যে কণ্ঠহার দেখিতেছ, উহা গলার ফাঁসি। কিন্তু সে হিসাবে ইংলণ্ডেই বা স্বাধীনতা কই! হিট্‌লার ইংলণ্ডের মত না লইয়াই ত' তাহাকে যুদ্ধে নামাইয়াছে। পার্থক্য এই, ইংলণ্ডে দেশের জন্য মরিবার অধিকার সকল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিরই আছে, আর এদেশে সে অধিকার রোগী ও জরাতুর ভিন্ন অপর সকলকে এখনও দেওয়া হয় নাই। ভূতগ্রস্ত না হইলে পরমায়ু থাকিতে মরিবার অধিকারকে কেহ সুবিধার বিষয় বলিয়া মনে করিবে না।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতার আর একটি পরম প্রভেদ আছে। দীর্ঘকাল প্রোপাগাণ্ডা করিয়া স্বাধীনতার বাজার-দর এত চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা আজ হীরামুক্তা, কাম-মোক্ষ অপেক্ষাও মূল্যবান্, সুতরাং তাহার প্রতি লোভ সকল দস্যুর। যে যত স্বাধীনতা-ধনে ধনী, যেমন ইংলণ্ড, সে তত দস্যুভয়ভীত। আর পরাধীনতা? 'এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' পরাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান জওহরলাল স্পেনে, চেকোশ্লো-ভাকিয়ায় গিয়া এই ধন দান করিয়া আসিলেন, সেদিন চীনে গিয়াছিলেন, সেখানেও খুব সম্ভব তিনি কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই—কারণ তাহার পরই জাপানে-রুশিয়ায় একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল, অতঃপর মঙ্গোলিয়ায় বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইবে।

তাহার পর কথা উঠিবে—ভারতবর্ষ পরাধীন থাকায় সমগ্র জগৎ ভারতের বিশিষ্ট দান হইতে বঞ্চিত আছে। পূর্ব্বেই দেখান গেল, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভারতের দান এখনও চলিতেছে এবং সে দান বিশিষ্টও বটে। ইহা ভিন্ন ভারতের বৈশিষ্ট্য—দর্শনে, কাব্যে, বুদ্ধে, চৈতন্যে, গান্ধীতে। পরাধীন ভারতের পক্ষে জগৎকে তাহার দর্শন দান করিবার বাধা কোথায়? বাধা আছে বটে চক্ষুদানে। কাব্যদানও অনায়াসে চলিতে পারে—রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। আর ধর্ম্মের প্রধান কথা অহিংসা এবং সে অহিংসা পরাধীনতা ভিন্ন অন্যক্ষেত্রে কাহারও মনেই আসে না, স্ফূর্ত্তিই পায় না। জগৎ-সভার স্বাধীন জাতিবর্গের বিশিষ্ট দান দেখিয়া দেখিয়া মনে করিবার সময় আসিয়াছে যে, তথাকথিত স্বাধীন দান হইতে জগৎ যত বঞ্চিত হয় ততই মঙ্গল। ভারতের দান চিরদিনই চলিতেছে; বাঁচিয়া থাকিলে বরাবরই চলিতে থাকিবে; আসল কথা বাঁচিয়া থাকা চাই।

স্বাধীনতা নানাবিধ ঐহিক সুখের আকর, এইরূপ একটি প্রতীতি অনেকের মনে বদ্ধমূল। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে—ইহা অবাস্তব। ঐহিক সুখ-পর্য্যায়ে প্রধান হইতেছে খাদ্য-সুখ। অধিকাংশ স্বাধীন দেশ সংবৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন করিতে পারে না। তাহার ফলে স্বাধীন জার্ম্মানীতে আজ কেহ সপ্তাহে অর্দ্ধ-পাউণ্ডের অধিক ময়দা ও এক-পঞ্চাংশ পাউণ্ডের বেশী মাখন পায় না। কবে তাহারা বেশী ঘৃত ভোজন করিয়াছিল এবং তাহার সুঘ্রাণ অদ্যাপি করতলে বর্ত্তমান—ইহাতে নিশ্চয়ই কোন সান্ত্বনা নাই। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ৪ বৎসর ধরিয়া দেশের লোক ময়দার সহিত করাতের গুঁড়া ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিয়াছিল, আবার এমনই দশা উপস্থিত হইয়াছে। সকল স্বাধীন দেশেই এই প্রকার ব্যবস্থা হইতেছে বা অচিরে হইবে। আমাদের পরাধীন দেশের অসুবিধা অন্যবিধ। যে হাটে এতকাল ছাগমাংস বিক্রয় হইত সেখানে কেন প্রচুর গোমাংস বিক্রয় হইবে না, গবর্ণমেণ্টকে এইসব গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিতে হইতেছে। ঐহিক সুখ কোথায় বেশী? প্রশ্ন হইতে পারে এদেশে কত লোক চিরদিন অর্দ্ধাশনে অনশনে আছে—সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? তাহার উত্তরে বলা যায়—আমাদের দেশের লোক হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে অনুদরপরায়ণ। উপবাস না করিলে তাহাদের ধর্ম্মপালন হয় না; অনশনে থাকা তাহারা পুণ্য-কর্ম্ম মনে করে। এদেশের লোক স্বেচ্ছায় অনাহার বরণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কদাপি বলেন নাই যে, তোমরা খাইতে পাইবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি জোর করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতেন তবে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইত। Forced feeding একান্ত নিন্দার্হ ব্যাপার।

যে পৌরুষমূল্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষণ করিতে হয়, ভারতবর্ষ সে মূল্য না দিতে পারায় জগতে না কি হেয় ও কাপুরুষরূপে নিন্দিত হইয়াছে। এই ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পৌরুষ হইতেছে—হত্যা করিবার শক্তি ও হত হইবার ধৈর্য্য। হত্যা করিয়া, হত হইয়া, অপরকে নানা দুঃখ এবং নিজেরা অসীম দুঃখ বরণ করিয়া

স্বাধীনতার খোরাক যোগাইতে হয়। এতদর্থে বহু অন্যায়ের অনুষ্ঠান, বহু মিথ্যার আশ্রয় ও তজ্জনিত বহু গ্লানি ও নিন্দার ভাগী হইতে হয়। অতি প্রত্যক্ষ সত্যের প্রতি অন্ধ হইয়া কল্পনার দ্বারস্থ না হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, ইহাই পৌরুষের প্রকৃত রূপ আর এই পৌরুষ স্বাধীনতার মূল্য। এই মূল্য যে চুকাইয়া না দিবে সেই কাপুরুষ।

কিন্তু পরাধীনতাও ত ফাঁকি দিয়া বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। পরাধীনতা অর্জ্জন বা রক্ষা করিতে হইলেও তিলে তিলে হত হইবার বিরাট ধৈর্য্যের প্রয়োজন। যে সহসা রাগিয়া উঠে সেই অসংযতচিত্ত ব্যক্তি পরাধীনতার সম্পূর্ণ অনধিকারী। চেম্বারলেন্ অনধিকারী বলিয়াই শেষরক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বাধীনতার ন্যায় পরাধীনতার মধ্যেও অসীম দুঃখবরণ করিয়া, বহু অন্যায়ের অনুষ্ঠান ও বহু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর তজ্জনিত বহু গ্লানি ও নিন্দার ভার পরাধীনকেও বহিতে হয়। আমরাও সমুচিত মূল্য না চুকাইয়া পরাধীনতা ভোগ করিতেছি না। প্রভেদের মধ্যে—হত্যা করিবার ও অপরকে অপার দুঃখ দিবার অবাধ অধিকার আমাদের নাই; সে অধিকার আমরা ইংরাজকে ডাকিয়া আনিয়া ইজারা দিয়াছি। পৌরুষে ও কাপুরুষতায় যদি এইমাত্র পার্থক্য হয়, তবে দুঃখ করিবার, লজ্জিত হইবার এমনই বা কি কারণ থাকে? আর্ত্তের রক্ষণ, শরণাগতের প্রতিপালন প্রভৃতি অহেতুকী স্ত্রীজনোচিত পৌরুষের কথা ত' কোন পক্ষেই উঠে নাই।

আসলে স্বাধীনতা এ যুগের মানুষেরও প্রাণের কথা নহে। সে চায়—ন্যাশন্যালিজ্‌ম্—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ চরম স্বার্থপরতা। মানুষ যদি প্রকৃতই স্বাধীনতা ভালবাসিত তবে পাগলা-গারদ বানাইত না। একমাত্র উন্মাদই প্রকৃত স্বাধীন; অবাধ তাহার গতি, অগাধ তাহার চিন্তা, অপার তাহার কার্য্য। সেই পরম-স্বাধীনকে যাহারা বন্দী করিবার ব্যবস্থা করিল, তাহারা স্বাধীনতাপ্রিয়—একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? স্বাধীনতার এই দিব্য রূপ ভারতবর্ষে স্বীকৃত হইয়াছিল। নিতান্ত সুস্থ ব্যক্তি সহসা কৌপিন পরিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া উন্মত্ততাকে বরণ করিত —এই ভারতবর্ষেই। তবে আশার কথা এই যে, আজিকার জগতেও স্বাধীনতার মিথ্যারূপের একাগ্রসাধন করিতে করিতেই সিদ্ধি আসন্ন হইয়াছে, জগৎ ক্রমে উন্মাদের পরম স্বাধীনতা লাভ করিতে চলিয়াছে। অতি শীঘ্র এমন অবস্থা ঘটিবে, যখন গারদের বাহিরে আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না।

এই শুভ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষের স্থিরচিত্তে বিচার করিতে হইবে—কি তাহার কাম্য। ন্যাসন্যালিজম্ ঘটিত স্বাধীনতা তাহার স্বধর্ম্ম না পরধর্ম্ম। যদি পরধর্ম্ম হয় তবে তাহা একান্ত ভয়াবহ। যুগ-প্রয়োজনে আত্মহত্যা যদি সকলের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া থাকে, তবে আমাদের পক্ষে ভগবদ্বাক্য অনুসরণপূর্ব্বক পরাধীনতার স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিধন শ্রেয়ঃ নহে কি?

কিন্তু একালে স্বধর্ম্ম, পরধর্ম্ম প্রভৃতি খাঁটি আর্য্যবাক্য লোকে বুঝিবে না। এখন আমরা সকলেই সুবিধাবাদী। সুতরাং খতাইয়া দেখা মন্দ নহে, কোন্ পক্ষে সুবিধা অধিক— স্বাধীনতায় না পরাধীনতায়?

(ক) স্বাধীনতার ধর্ম্মক্ষেত্র ইউরোপে উপস্থিত পশুমাংস দুর্ল্লভ হওয়ায় নরমাংস একান্ত সুলভ করা হইয়াছে। আর পরাধীনতার লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষে পশুমাংস প্রচুর পরিমাণে সুলভ থাকায় আমরা নিশ্চিন্তমনে নারীমাংস সম্বন্ধে গল্প ও কবিতা লিখিতেছি। কোন্‌টায় সুবিধা বেশী? নরমাংসে না নারীমাংসে?

(খ) এই নিদারুণ হত্যাব্যাপারে আমরা ইচ্ছা করিলেই চাটাই পাতিয়া অহিংস থাকিতে পারি। বড় জোর কিছু কিছু চাঁদা দিলেই রেহাই মিলিবে। আর আমাদের কেদারা-শায়ী বড় বড় সাহেবদের ঘন ঘন ডাক পড়িতেছে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!'

(গ) জন্মভূমি ও জননী স্বর্গাদপী গরিয়সী, সুতরাং মায়ের সম্মান সন্তানে রক্ষা করিবে ইহা নিশ্চয়। কিন্তু মায়ের সম্মানহানির সম্ভাবনা ঘটিলে সন্তানদিগকেই যে স্বহস্তে লাঠি ও স্বখগলে শড়কী লইয়া দস্যুদের সহিত লড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে-সব ইতরসাধারণ অর্থাভাবে লাঠিয়াল দারোয়ান রাখিতে পারে না তাহাদিগকেই বাধ্য হইয়া মাতৃরক্ষণকালে স্বহস্তে লাঠি ধরিতে হয়। স্বাধীন দেশসমূহে সেই বর্ব্বর রীতিই প্রচলিত। কিন্তু আমরা যাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল ডালরুটি যোগাইয়া আসিলাম, বিপদের দিনে তাহারা আমাদের মায়ের রক্ষণভার

গ্রহণ করিবে ইহাই ত' স্বাভাবিক। আর ইহাতে লজ্জার বিষয়ই বা কি আছে?

(ঘ) তর্কের মুখে যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, দস্যুর সহিত লড়ালড়িতে এপক্ষের হার হইতে পারে; তখন মাঁ-এর অদৃষ্টে কি ঘটিবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এখনও ধর্ম্ম আছে, ভগবান্ আছেন, আমরা আছি; দস্যুদেরই হার হইবে। আর যদি এমন অধর্ম্মই ঘটে, যাহা ইতঃপূর্ব্বে বহুবার ঘটিবার হইয়াও ঘটে নাই, তবে আমাদের মা যেমন আছেন তেমনই থাকিবেন। চিন্তার কারণ কোথায়?

(ঙ) আজ যদি জগতে কোন জাতি যথার্থরূপে নিরপেক্ষ থাকিয়া নির্ম্মল আনন্দ ও পুণ্য অর্জ্জন করিতেছে এমন হয় তবে সে জাতি আমরা। প্রতিদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে-সব সংবাদ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার সবগুলিই আমাদের সমান উপভোগ্য। ওয়ার্স'র আক্রমণ, রক্ষণ ও পতন; ফরাসী সৈন্যের অগ্রগমন বা পশ্চাদপসরণ; ইংরাজের বাণিজ্য-তরীর নিমজ্জন বা রণতরীর সাগরসংক্রমণ, জার্ম্মাণীর বোমা নিক্ষেপ বা গোলা ভক্ষণ; মৃত পোলাণ্ডের সদ্গতির সন্ধানে লক্ষ লক্ষ রুশসৈন্যের পথে প্রান্তরে—নিরুদ্দেশ ভ্রমণ,—এ সমস্তই আমাদের ন্যায় এমন পরম নিরপেক্ষতা ও নিষ্কাম আনন্দের সহিত কে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে?

মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আমাদের দেশেও সহসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অসুবিধা ঘটিবার উপক্রম মাত্র, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন। সাধ্যানুযায়ী যত ইচ্ছা তত খাও, কোন বাধা নাই, নিষেধ নাই। ইউরোপে অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একে অপরকে অনাহারে মারিবার ব্যবস্থা করিতেছে। আমাদের পরমারাধ্যা পরাধীনা ভারতভূমির স্বচ্ছলতা কে কবে কাড়িয়া লইতে পারিয়াছে?

সমস্ত স্বাধীন জাতি আত্মরক্ষার্থেই পরস্পর নিরস্ত্রীকরণের শত চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ ভাবে বিফল হইয়াছিল। আর আমরা বিনা চেষ্টায় নিরস্ত্রীকৃত—সুতরাং স্বল্প চেষ্টায় অহিংসী-কৃত হইয়াছি। সেবার মহাযুদ্ধে আমাদের বিবস্ত্রীকরণের যে একটা অশ্লীল সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, এবার ভগবৎ-ইচ্ছায় সে আশঙ্কাও নাই।

পরাধীনতার সমস্ত সুবিধার কথা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে বর্ণমালায় কুলাইবে না, সুতরাং চেষ্টা না করাই ভাল।

এইরূপে উচিত মূল্য চুকাইয়া দিয়া আমরা যে পরাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, আজ তাহার নানাবিধ সুবিধা ও সুফল ভোগ করিবার সময় আসিয়াছে। কথা উঠিতে পারে, এ সমস্তই আপাতঃ সুখ। জগতে কোন্ সুখ আপাতঃ নহে? স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা জন্য সুখও ত' উন্নততর পর্য্যায়ে পড়ে না। তাহারা আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিক সুখভোগ পূর্ব্বে পূর্ব্বে করিয়াছে বটে, কিন্তু সে সুখ যে অচিরস্থায়ী, আর তাহার পরিণাম যে অতিমাত্রায় দুঃখদায়ক ও বিষময় তাহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। বরং পরাধীনের শত্রু নাই এবং সেইজন্য তুলনায় পরাধীনতার সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিতে পারা যায়। মোটাভাত মোটা-কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়া বড় বড় চিন্তায় চিন্তিত হইবার সুযোগ পরাধীনতার মধ্যে অনেক বেশী। সুতরাং plain living and high thinking যদি মানব-জীবনের প্রকৃত আদর্শ হয় তবে সে আদর্শ আমাদের। দুঃখময় মানবজীবনের 'পঞ্চোপরি' স্বাধীনতার 'বিস্ফোটক' সঞ্জাত হইয়া যেন আমাদের অধিকতর যন্ত্রণার কারণ না হয়। আমরা যেন প্রকৃতির মুখ্য আদেশ পালন করিয়া 'নন্দলালে'র ন্যায় বাঁচিয়া থাকিতে লজ্জানুভব না করি। গান্ধীজীরও যদি মত পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি আমরা যেন কদাপি বিস্মৃত না হই যে, হিংসা পাপ, হত্যা মহাপাপ এবং আত্মহত্যা অতিপাতক। 'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য?' লজ্জাই বা কিসের, ভয়ই বা কাহাকে? আমরা যেন বাঁচিয়া থাকি। যতদিন গঙ্গায় গঙ্গাজল থাকিবে, কদলীবৃক্ষে কদলী ফলিবে এবং হিমালয়ে গুহার অভাব না হইবে, ততদিন পরাধীন হইয়াও ভারতভাগ্যবিধাতা জনগণমনঅধিনায়ক রূপে বিরাজ করিবেন। অতএব মা ভৈঃ।

লাভান (ইতালী) হ্রদের সূর্য্যাস্ত।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

হোটেল

সকালবেলা। পট্টবসন পরিয়া দিদি একরাশ দুর্ব্বা বাছিতে বসিয়াছেন—আজ ষষ্ঠী—বেলা দশটায় পুরোহিত আসিবেন। ভোর হইতে রাত্রিপর্য্যন্ত দিদির অখণ্ড অবিরাম গৃহিণী-পনা।

একে একে সকলে উঠিতেছে—মালী উঠান ঝাঁট দিতে আসিল।

"অ মহিম, কয় রোজ তুমি এলে না কাহে?—কা হুয়া থা?"

মহিম কহিল, "জর হয়েছিল দিদি—"

বাড়ীর পূজারী ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া মালী পর্য্যন্ত সকলেই হিন্দুস্থানী। দীর্ঘকাল বাংলা দেশে থাকিয়া তাহারা সুন্দর বাংলা বলে ও বোঝে, কিন্তু দিদি হিন্দী বলিবেনই...

"আচ্ছা, তুম একটু দেরি কর, হাম ওষুধ দেগা।"

"আচ্ছা দিদি।"

"—বোখার হয়েছে তবে এত্‌না সবিরে না এলেই আচ্ছা হতো।"

পূজারী ঠাকুর ফুল তুলিতে চলিয়াছে—

"অ ঠাকুর কাল রাত্তিরে তুমি মন্দিরমে শুয়া নেই?"

"শুয়েছিলাম দিদি"

"আজও গোপালের গহনা খোলা হবে না—আজও তোমাকে রহনে হোগা।"

গোপালের অঙ্গে আটপৌরে গহনা এক সেট থাকে, বিশেষ বিশেষ দিনে পোষাকী গহনা পরানো হয়, সেদিন পূজারী মন্দিরের ভিতর শোয়।

"আমি রোজই মণ্ডপের ভিতর থাকতে পারি, খুব ভাল ঘুম হয়, ভাল ভাল স্বপন দেখি। গোপালের গহনা আর খুলো না দিদি, বড় খালি খালি দেখায়।"

"নেহি ঠাকুর, সে কি হয়? দিনকাল আচ্ছা নেহি,—কে কোন দিন চুরি করকে লেগা, সব্বোনাশ হোগা।"

কিষণ দুধের পাত্র লইতে আসিল।

"দেখ কিষণ, তুমি বল্‌দীকো কভি মৎ ছাড়ো; কাল আমার এক ডালা আমসত্ত খেয়ে ফেলেছে, ভাঁড়ার ঘরে ঢুককে বিলকুল চিজ্‌ নষ্ট করকে দিয়া।"

বলদের মত, প্রকাণ্ড ও দুর্দ্দান্ত একটি সাদা গাই, দিদি নাম দিয়াছেন বল্‌দী।

"আমি ছাড়ি নি দিদি, লেকিন নিমু বাবু দড়ি খুল্‌ দিয়া।"

"নিমু বাবুর বড়া আহ্লাদ হয়েছে। উস্কো হাম আজ মারেগা,—না আজ ষষ্ঠী আজ না, কাল মারেগা।"

নিমু দাদামণির পিছে পিছে যশোদার ননীচোরা গোপালের মত গোশালায় থাকে, গাভীকুলের পেটের নীচ দিয়া অসঙ্কোচে ঘোরাফেরা করে।

"আর সমস্ত রাত্তির বাদুড় ঝটাপটি করকে জামাইবাবুর ঘুম নষ্ট কর দিয়া তুমি এক কাম কর, আজ ষষ্ঠী, আজ থাক্‌, কাল ঐ দুঠো বড়া ডাল একদম কেটে ফেলে দিও।"

উঠানে একটা ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছ, যত না পাতা তত পেয়ারা ধরে। সমস্ত রাত্রি বাদুড় বিষম অত্যাচার করে। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "আহা আনন্দকুটীরের আশ্রম-পক্ষী একটু স্বাধীন তো হবেই।"

"আচ্ছা দিদি কাল আমি কেটে ফেলে দেবো—ভর আঙিনা জঞ্জাল করে দেয়।"

"দুধের বালতিটা পুকুরমে আচ্ছা করকে ধুয়ে নিয়ে যাও।"

"আরে বাপ্‌রে, পুকুরে ছোটা-দিদি গিয়া—অভি বোলেগা 'আস্‌নান করো কিষণ'।"

"ছোট দিদির যন্তরনায় আর বাঁচিনে! চান করে না-কি আবার দুধ দুইতে হবে। তুমি পুব দিকের ঘাটমে যাও, বহুত বেলা হলে বাছুরকা কষ্ট হোগা।"

আসিল সিতিয়া—বাড়ীর ঝি। "দিদি কাল যে দুটাকা দিয়েছ একেবারে অচল, এই দেখ।"

"ও মুন্নু-বাবুকা কাম, সমস্ত ভাল টাকা নিয়ে যত অচল টাকা পয়সা এনে দেয়, হাম টাকা বাজানেকো নেহি

জানতো, উসি আস্তে। তুই টাকা রাখ; উঠুক মুহু, দেখাচ্ছি মজা।"

"আগে কি করবো বলো।"

"আগে উঠানটা নিকিয়ে দে, আল্পনা দেনে হোগা, তার পরে পুজোর বর্তন আচ্ছা করে ধুয়ে নিয়ে আয়, ঘাটে এখন বাসনে, ছোটা-দিদি হ্যায়।"

গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইলেন; পশ্চাতে দ্বিজেন।

"উঠেছেন এত সকালে? অ লীলা, তোমাদের চায়ের কত দূর? তোমার জামাইবাবু উঠেছেন—"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ভোরবেলা ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হলো গোরখপুর কি ছাপরায় রয়েছি।"

দিদি বলিলেন, "ও, স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি? ওরকম হয়, আমি প্রায়ই তো স্বপ্নে দেখি, কাশীতে কি এলাহাবাদে রয়েছি, যেখানে যেখানে যাওয়া যায়—সেই সবই স্বপনেও দেখা যায়।"

"স্বপ্নে কি জেগে ঠিক বুঝলাম না, কিন্তু এমন চমৎকার খাঁটি হিন্দি বাৎ শুনছিলাম—ঠিক যেন পশ্চিম!"

এবার দিদি বুঝিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, "হিন্দী না বললে ওরা বোঝে না।"

অনেকের ধারণা বাংলা শব্দ হইতে হসন্তটি তুলিয়া দিলেই উড়িয়া ভাষা হইয়া যায়। তেমনি দিদিরও ধারণা, প্রতি বাংলা শব্দের সঙ্গে একটি করিয়া আ, গা, মে, কা, কে, ইত্যাদি স্থানবিশেষে জুড়িয়া দিলেই উত্তম হিন্দী হইয়া যায়।

দ্বিজেন বলিল, "ওরা বাংলাই ভাল বোসে, তোমার অপূর্ব্ব হিন্দীই বোঝা মুস্কিল।"

আনন্দ-কুটীরে একটা নারী-সমিতির আয়োজন হইতেছে, সুরুচি ও তাপসী অষ্টপ্রহর ব্যস্ত, পিতা খুব উৎসাহ দিয়াছেন। সমিতির নাম 'মাতৃ-মঙ্গল সমিতি'।

উপদেশ, পরামর্শ সব দিদির।

তাপসী নিজেদের খাতাখানা বিশ্বকর্ম্মাকে দেখাইলেন, "দেখুন তো আমাদের কার্য্যপদ্ধতিটা ঠিক হয়েছে কি না?"

"কি সর্ব্বনাশ! তর্ক-নদী আর তর্ক-বনানীর কাজের ভুল ধরবো আমি? জলে কুমীর জঙ্গলে বাঘের হাতে পড়তে বল?"

"না দেখলেন, কিন্তু আপনাকে মোটা রকম চাঁদা দিতে হবে, ছাড়বো না।"

"চাঁদার খবর আমি কি জানি? মাসের পয়লা তারিখে যা পাই, সব ফেলে দিয়ে তোমার দিদির হোটেলে খাই।"

"ছি জামাইবাবু, ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে কি অমন অসম্মানের কথা বলতে আছে? দিদি কি হোটেল-ওয়ালা?"

"অসম্মান? বিশ্বাস কর ছোটখুকি আমি যখন কলকাতায় পড়ি, গোয়ালন্দে একটি ভদ্রমহিলা হোটেল খুলেছিলেন। গোয়ালন্দের হোটেলগুলো দেখেছ? যাচ্ছেতাই; কিন্তু ইনি, নামটি বোধ হয় ছিল সৌদামিনী, অল্প বয়স, খুব ফিটফাট সাজপোষাক, চেয়ার টেবিলে বসে হিসাব করতেন। আমরা সেই হোটেলে উঠতাম, কি ভিড় ছিল সে হোটেলে। এক দিন রান্না হয়েছে খারাপ, আমাদের দলের একটি ছেলে গিয়ে বললে, লোক ঠকানোর জন্যে হোটেল খোলা? এই রকম খাদ্য দেবেন, আর চার আনা করে নেবেন? সে ভেবেছিল, আমরা দশ জন নেবেছি, চোট-পাট করে কিছু কম দেবে। কিন্তু সৌদামিনী তো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো, বিশ্বাস করবে না, ঠিক তোমার দিদির মতন, হাত নেড়ে বললে, 'যাও যাও পয়সা চাইনে তোমাদের, এক্ষুনি আমার হোটেল ছেড়ে চলে যাও আর কোন দিন এসো না।' তোমার দিদির জুলুমটাও ঐ রকমই—কম খেলেই ঝগড়া সুরু করবেন।"

"সত্যি দিদি?"

"সত্যিইতো—কম খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে না? শরীর ভাল থাকলে খুব মফঃস্বল বেড়াবেন টি. এ.-এর টাকা এনে দেবেন, তবে না আমি দু'হাতে খরচ করবো?"

"শোন তোমার পতিব্রতা দিদির কথা শোন! ওঁর হোটেলে কারো স্বাধীন ইচ্ছা চলে না।"

দিদি বলিলেন, "তা সত্যি—বাড়ীর সঙ্গে আপনার ঠিক খাওয়াটা ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই, হোটেলই বটে—"

প্রফুল্ল বলিল, "কিন্তু যা পান সমস্ত টাকা দিয়ে তবে খান, সেটাও মনে রেখো।"

"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু..."

কবি

—শ্রীঅমলা দেবী

রচন

সময়—সকাল নয়টা; স্থান—কোন ত্রিতল গৃহের একটি কক্ষ। কক্ষটি নাতিপ্রশস্ত—দক্ষিণ দিকে বড় রাস্তার উপরে সার্শি ও খড়খড়িওয়ালা দুইটি জানালা, দুইটিই খোলা। উত্তর দিকে দুইটি দরজা, দুইটিতেই ভারী সবুজ পর্দ্দা ঝুলিতেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই একটি করিয়া জানালা। দক্ষিণ দিকের একটি জানালার পাশে একটি টেবিল। টেবিলের উপর এক রাশি বই, কোনখানি খোলা, কোনখানি বন্ধ; একটি খোলা লেটার-প্যাড, একটা ফাউণ্টেন পেন। টেবিলের সামনে একটা হাতল-বিহীন চেয়ার। টেবিল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা ক্যাম্প-খাট। ক্যাম্প-খাট ও টেবিলের মধ্যে একটা বড় টবে একটি পুষ্পিত হেনার গাছ; তার কাছেই একটি ছোট টেবিলের উপর একটি ঘূর্ণ্যমান টেবিল-ফ্যান। কক্ষে আর কোন আসবাবপত্র নাই। একজন যুবক ক্যাম্প-খাটের উপর শুইয়া আছে, চোখ দুইটি মুদ্রিত, ডান হাতটি আড়াআড়ি ভাবে কপালের উপর ন্যস্ত—মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিতেছে।

হঠাৎ লাফ দিয়া উঠিয়া যুবক সটান আসিয়া চেয়ারে বসিল এবং খোলা লেটার-প্যাডের উপর খচ্‌খচ্‌ করিয়া লিখিতে লাগিল; তার পর লেখা বন্ধ করিয়া কড়ি-কাঠের দিকে তাকাইয়া মাথায় ও কপালে হাত বুলাইতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে "দুত্তোর" বলিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"আমাদের হবে কেন? রবীন্দ্রনাথের কত সুবিধে! পদ্মার উপর বজরা; যে দিকে তাকাও জল আর জল; দূরে দেখা যায় পদ্মার চর; দুই পাশে দুই তীর, কবিকে হাতছানি দিয়া ডাকে—বজরা চলে নদীর ধার ঘেঁসে, গাঁয়ের মেয়েরা নদীতে নাইতে আসে, তরুণীরা ঘোমটার ফাঁকে কবিকে দেখে আর কবিত্বের খোরাক যোগায়। মাথার উপর নীল আকাশ—সেখানে সূর্য্য প্রচুর আলো দেয়; আর মলয় বাতাস দিবারাত্রি হুহু করে বইতে থাকে, অথচ এর জন্য কবিকে মাসে মাসে ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর মোটা বিল মেটাতে হয় না—আর আমার? এই ছোট্ট ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছে—এই সকাল বেলাতেই ঘামে যেন নেয়ে উঠেছি, মলয় বাতাস দূরের কথা, প্লেন শাদা বাতাসের জন্যে মাথা ঠোকাঠুকী করতে হয়, জানালায় মুখ বাড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও এক টুকরো নীল আকাশ দেখবার যো নেই, আর এ দিক্ সে দিক্, যেদিকেই তাকাও, গোঁফ, গোঁফ, শুধু গোঁফ; কি যে করা যায়! অথচ আজই কবিতাটা লিখে ফেলতে হবে। পাঁচটার সময়ে সাহিত্য-সমিতির সভা।" হেনা গাছটার কাছে গিয়া ফুল শুঁকিয়া শুঁকিয়া কহিল, "গন্ধ নেই, সব শুকিয়ে গেছে, আমার অদৃষ্ট! ওঃ ভারী গরম! দিই পাখাটার স্পীড্ বাড়িয়ে" বলিয়া পাখাটার গতি একটু বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "তারই কি যো আছে! ও দিকে ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর বিল চড়চড় করে বেড়ে উঠছে"—বলিয়া চেয়ারে বসিয়া লিখিবার চেষ্টা করিল এবং কি যেন লিখিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। "ঐ আসছে" বলিয়া যুবক মুখ বাড়াইল। একটা মোটর তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিল বড় মক্কেল রামটহল ঝুনঝুনওয়ালা, মাথায় বাসন্তী রং-এর পাগড়ী, গায়ে লম্বা কোট, হাতে লাঠি। মুখ বিকৃত করিয়া যুবক কহিল, "এই রে! ব্যাটা এসেছে! এখুনি দাদার ডাক পড়বে—মুস্কিল। সব গুলিয়ে গেল!" আসিয়া হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "যাক্ আমাকে আর ডাকবে না—" বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুক্ষণ লিখিয়া লেখা পড়িতে আরম্ভ করিল—

পরের প্রিয়া

সে দিন প্রভাতে ঘুম থেকে উঠি,
দাঁড়াইনু আসি মোর জানালার পাশে;

দেখিনু রয়েছে দুইটি গোলাপ ফুটি
গোলাপের গাছে—শিশির পড়েছে ঘাসে।

আবার লিখিতে লাগিল। এমন সময়ে পশ্চিম দিকের কাছাকাছি দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া একজন তরুণী কক্ষে প্রবেশ করিল। সপ্তদশী, রং ধবধবে ফর্সা; সদ্য স্নান করিয়াছে; পরনে কাল-পাড় শাদা মিলের সাড়ী ও পুরা-হাতা শাদা ব্লাউস, দ্বিধা-বিভক্ত সীমন্তে সিন্দুর-রেখা, কপালে সিন্দুরের টিপ, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন, খালি পা—পায়ের পাতা দুইটি যেন শাদা মার্ব্বেল পাথরে তৈরী, শুভ্র, সুন্দর।

তরুণী পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া যুবকের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে যুবকের লেখা পড়িতে লাগিল। যুবক বাহ্যজ্ঞানহীন ভাবে লিখিতেছিল। লেখা পড়িয়া তরুণী ভ্রূ দুইটী কুঁচকাইল, চোখ ছোট করিল, দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইল; তারপর অধরোষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া মস্তক ঈষৎ নাড়িয়া যেমন ভাবে আসিয়াছিল তেমনি ভাবে প্রস্থান করিল।

হঠাৎ পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বিলাতী ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। পৃথিবীতে যত রকমের মোটা ও মিহি, কর্কশ ও মোলায়েম্ সুর আছে সব যেন এক সঙ্গে জোট পাকাইয়া সোরগোল তুলিল। যুবক কলম ফেলিয়া দিয়া কহিল—"দুত্তোর! সময় নেই, অসময় নেই, গ্রামোফোন! ঠিক সুনন্দার কাজ! অপকর্ম্মের ধাড়ী যে!" বলিয়া চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, এ পাশের দরজা দিয়া, পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, গ্রামোফোন বাজিতেছে, কিন্তু কেহ কোথাও নাই। তাড়াতাড়ি গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া দিয়া, ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া কহিল, "সব গুলিয়ে গেল। বেশ ফ্লো এসেছিল" বলিয়া পড়িতে লাগিল:

শিথিল চরণে চলিনু ঘরের দ্বারে
দেখিনু কোথায় রয়েছেন মোর প্রিয়া,
বাথরুমে, রান্নাঘরে, অথবা ভাঁড়ারে,
বাথরুমেই—অতএব ধীরে ফিরিয়া
চশমা পরিনু। মায়োপিক্ মোর চোখ—

কিন্তু এবার মেলাই কি করে? টেবিলের উপর জনৈকা হলিউড্-নিবাসিনী ছায়াচিত্র-তারকা হাতীর দাঁতের ফ্রেমের মধ্যে ঈষৎ চিৎ হইয়া মধুর হাস্য করিতেছিল; পাশেই আর একটি ফ্রেমে জনৈকা বঙ্গদুহিতা স্মিত মুখে যুবকের পানে তাকাইয়া ছিল। তাহাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া যুবক কবিত্বের প্রেরণা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিশেষ সুবিধা হইল না দেখিয়া, বঙ্গ-দুহিতার মুখটি উল্টাইয়া দিয়া যুবক কহিল, "Counteract করছে, নিজের স্ত্রী কি না—" বলিয়া হলিউড-বাসিনীর দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

এমন সময়ে পিছন হইতে ডাক আসিল "হে দাদা বাবু! রৈছ?" "দুত্তোর, সব মাটী করে দিলে" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া যুবক দেখিল, পুরাতন ভৃত্য দীননাথ কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। কাঁধে গামছা, হাতে একটা ঝুড়ি। যুবক হাঁকিয়া কহিল, "রৈছ! কেন? কি করতে হবে কি?" দীননাথ জবাব না দিয়া কাছে আসিয়া কহিল, "ঝি বেটীর জ্বর, বাজারে যেতে লারবেক্, ফর্দ্দ লিখে দেও।" যুবক জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার কি ঐ কাজ! মস্ত বড় মামলা ঝুলছে মাথায়! আর ওর আলু-পটোল-বেগুনের হিসাব লিখতে হবে আমাকে! কেন আর কি সব মরেছে?" অবিচলিত ভাবে দীননাথ কহিল, "মরবেক কেনে? বেঁচেই ত রইছে সব।" মুখভঙ্গী করিয়া যুবক কহিল, "বেঁচেই ত রইছে সব! তবে এখানে এসেছ কেন মরতে?" দীননাথ কহিল, "ফর্দ্দ লিখে দিবে ত দাও—নইলে চললাম আমি" বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই যুবক কহিল, "বৌ-দিদি কোথায়?" দীননাথ চলিতে চলিতে কহিল, "পূজোর ঘরে, যাচ্ছি তেনার কাছে"—যুবক কহিল, "তোর নতুন বৌদি কি করছে?" দীননাথ কহিল, "তেনার আঙ্গুলে দরদ হৈছে, ফেটি বেঁধে বেঁধে আঙুলটী যেন একটি মর্ত্তমান রম্ভা হইছেন, আঙুল নাড়তে লারবেক তিনি"—বলিয়া আবার চলিতে সুরু করিল। যুবক ধমকাইয়া কহিল, "শোন্ ব্যাটা, বেটা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়েছে! শুনে যা!"

এমন সময়ে তীক্ষ্ণ মেয়েলী কণ্ঠে ডাক আসিল, "দীনু!" "যাই দিদিমণি!" বলিয়া দীননাথ দ্রুত প্রস্থান করিল।

"যাক্ বাঁচা গেল, বেটা যেন ভূমিকম্প! সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল, কবিতা লেখার দফা রফা, কিন্তু ইস্কুলের গাড়ীটা! সাড়ে নটা বাজে যে!" হঠাৎ দেওয়ালে ঝোলান ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া কহিল, "ঐ যা! আজ যে

শনিবার! আজ ত মেয়েস্কুল বন্ধ! তবে? কি করা যায়!" বলিয়া চিন্তিত মুখে একটা সিগারেট ধরাইল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া হঠাৎ সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "এসে গেছে" বলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া আবার খচ্‌খচ্‌ করিয়া লিখিতে লাগিল।

যুবকের নাম সুশান্ত। শহরের সেরা উকিল প্রশান্ত বাবুর ছোট ভাই। নিজেও উকীল। অতি অল্প বয়সেই ইহার বাবা ও মা মারা যান। বৌ-দিদি অর্থাৎ প্রশান্ত বাবুর স্ত্রী ইহাকে মানুষ করিয়াছেন এবং বৎসর খানেক পূর্ব্বে নিজের ছোট বোন সুনন্দার সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

বেলা দশটার সময়ে, গায়ে একটা শার্ট ও পায়ে স্যাণ্ডাল পরিয়া টপটপ করিয়া সুশান্ত দোতলা হইতে একতলায় নামিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে পিছন হইতে ডাক আসিল "ঠাকুর-পো!" বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করিয়া সুশান্ত কহিল, "মহা মুস্কিল!" কিন্তু মোলায়েম কণ্ঠে কহিল, "যাই বৌ-দিদি।" রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বৌ-দিদি তরকারী কুটতেছিলেন—সুশান্ত কাছে আসিতেই কহিলেন, "কোর্টে যাবে না?"

"বা রে! কোর্টে যাব না! সারা সকালটা কেস তৈরী করলুম।"

বৌদি কহিলেন, "তবে এখন বেরুচ্ছ যে?"

সুশান্ত জবাব দিল—"অমলের কাছে একবার যাচ্ছি, বিশেষ কাজ, এখনই ফিরে আসছি"—বলিয়া প্রতিবাদের অবসর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল এবং অবিলম্বে একটা সাইকেলে চড়িয়া 'পড়ি কি মরি' করিয়া ছুটিল।

আফিস-ঘরে বসিয়া অমল (তরুণ উকীল সুশান্তর বন্ধু) জন দুই মক্কেলের সঙ্গে মোকর্দ্দমার কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত ছিল। সুশান্ত দরজা হইতে ডাক দিল "শোন।" অমল মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "আরে! সাধু যে! এত বেলায়! কোর্টে যাবি নে?"

"যাব, একবারটী আয়। বিশেষ কাজ আছে।" অমল মক্কেলদের কহিল, "বসুন, এখনই আসছি"—বলিয়া বাহিরে আসিতেই সুশান্ত একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অমল কহিল, "কোথায় যাচ্ছিস্ রে!" সুশান্ত কহিল, "একবারটি বাড়ীর মধ্যে চল্, তোকে একটা জিনিষ শোনাব। অবশ্য তোকে শোনান আর না শোনান একই—তবু কাউকে না শুনিয়ে মনটা বেশ স্থির হচ্ছে না।"

অমল বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কি?"

সুশান্ত কহিল, "বলছি, আয় না।"

অমল থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "না ভাই! যা শোনাতে হবে, এই খানেই শোনা। এখন আমার মরবার সময় নেই। আজ ছ'মাসের পর একটা মোকদ্দমা হাতে পেয়েছি, আজই দিন।"

বিরক্ত মুখে সুশান্ত কহিল, "ইডিয়ট! মোকর্দ্দমা করছে—না এগ্‌জামিনের পড়া পড়ছে! রাত্রে কি করিস্? আর এদিকে"—বলিয়া একটা কোণের কাছে ডাকিয়া লইয়া পকেট হইতে কাগজ বাহির করিল। অমল কহিল, "কি ওটা?"

সুশান্ত কহিল, "কবিতা লিখেছি সাহিত্য-সমিতির জন্যে। কি রকম হয়েছে শোন্।"

করুণ মুখে অমল কহিল, "কবিতা? তাই এখন আমাকে শুনতে হবে?"

সুশান্ত কহিল, "হ্যাঁ" বলিয়া পড়িতে লাগিল—

"সেদিন প্রভাতে ঘুম থেকে জেগে উঠি"

অমল কহিল, "দোহাই ভাই! আমাকে রেহাই দে। বাকী খাজনার মামলায় অন্ততঃ ছত্রিশ পৃষ্ঠা জবাব লিখতে হবে। না হলে মক্কেল বেটা কি দেবে না। তা' ছাড়া আমি এসব বুঝি না, তুই তো জানিস? তুই বরং তোর বৌ-দির কাছে যা—" বলিয়া আফিস-ঘরের দিকে ছুটিল।

অমলের অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া সুশান্ত কহিল, "নিরেট কচ্ছপ! একেবারে বয়ে গেছে। কিছু আশা নেই ওর।" বলিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া, "বৌ-দিদি" বলিয়া ডাকিয়া, একেবারে অমলের শয়ন-কক্ষের মধ্যে আসিয়া হাজির হইল।

বৌদিদি—নিভা—সদ্য স্নান করিয়া আসিয়াছে। শাড়ীটা সর্ব্বাঙ্গে কোন মতে জড়ান। বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছে।

হঠাৎ সুশান্তকে দেখিয়া লজ্জায় ও বিরক্তিতে মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। শাড়ীটা ভাল করিয়া জড়াইতে জড়াইতে

কহিল, "আপনি! আজ এখন!" কিছু লক্ষ্য না করিয়া সুশান্ত অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—"হ্যাঁ, বিশেষ কাজ।" নিভা কহিল, "বিশেষ কাজ? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি" বলিয়া পার্শ্বের কক্ষে ত্বরিৎপদে প্রস্থান করিল।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে, নিভা বিধি ও রীতিসঙ্গত ভাবে সাজিয়া-গুজিয়া ফিরিয়া আসিয়া, ইষৎ হাসিয়া কহিল—"মাপ করুন ঠাকুর-পো—একটু দেরী হোল—"

সুশান্ত এতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। কহিল, "তা হোক। একটা কবিতা লিখেছি সাহিত্য-সমিতির জন্যে। গাধাটাকে শোনাতে এসেছিলুম। তা' ওকে মক্কেলে পেয়েছে। কাজেই আপনাকে একটু শুন্‌তে হবে—"

নিভা মুচকি হাসিয়া কহিল, "কবিতাটা -বুঝি আমাদের সুনন্দার নামে, না ঠাকুর-পো?" চোখ মুদিয়া, ঘাড় নাড়িয়া সুশান্ত কহিল "উহুঁ তা নয়। নাম—'পরের প্রিয়া'" বিস্মিত কণ্ঠে নিভা কহিল, "সে আবার কে? ঘরের প্রিয়া ছেড়ে এখন পরের প্রিয়ার পিছনে ছুটোছুটি করছেন না কি? সুনন্দাকে বলতে হবে তো!" বাধা দিয়া সুশান্ত কহিল—"কবিতা কবিতা, imagination, মানে শ্রেফ্ কল্পনা। সুনন্দাকে কিছু বলতে হবে না—"

নিভা দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "বলতে হবে না! বলেন কি! পরের প্রিয়ার নামে কবিতা লেখা হচ্ছে, ভাল কথা নয়।"

সুশান্ত বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "মুস্কিল! কোন জিনিস কি আপনারা সোজাভাবে নিতে পারেন না বৌ-দি! বলছি কবিতা, কল্পনা—বাস্তবের সঙ্গে কোথাও কোন সম্পর্ক নেই, তবু গোলমাল করছেন। শুনুন না—"

নিভা কহিল, "গোলমাল করব না! যতদিন বিয়ে হয় নি—যা করেছেন, করেছেন। কিন্তু বিয়ের পরেও? ঘরে আমাদের সুনন্দার মত সুন্দরী বৌ—আর কোথায় পরের প্রিয়া কোন এক এক পোড়ামুখীর নামে কবিতা? আজই আমি যাব সুনন্দার কাছে। এখনই এর বিহিত করুক। নইলে পরে পস্তাতে হবে।"

সুশান্ত বিহ্বলমুখে কহিল, "মহা মুস্কিল! আপনি এত চট্‌ছেন কেন? আমি বল্‌ছি সব কল্পনার ব্যাপার।"

নিভা নীরস কণ্ঠে কহিল, "বিয়ের পরে ওসব কল্পনা মাথায় আসবে কেন? ওঁর মাথায় আসুক তো দেখি!"

শুষ্ক মুখে সুশান্ত কহিল, "আমাকে মাপ করুন বৌ-দি! কবিতা লিখেই অন্যায় করেছি। আরও বেশী অন্যায় করেছি আপনাকে শোনাতে এসে। এই কবিতা এখনই ছিঁড়ে ডাষ্টবিনে ফেলে দেব। দয়া করে সুনন্দাকে আর উত্তেজিত করবেন না।" বলিয়া দ্রুত পদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সুশান্ত সটান দামোদর বাবুর বাড়ীতে হাজির হইল। দামোদর বাবু অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ্। ভৃত্য রামচরণ মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, "উকীল বাবু যে! এমন অসময়ে? বাবুকে ডাক্‌তে হবে না কি?"

"হ্যাঁ হে, একবার ডেকে দাও"—বলিয়া সুশান্ত বৈঠকখানায় একটা চেয়ারে অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একজন অপরিচিত ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। আগন্তুক অতীব বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনার কাছেই এসেছি।"

সুশান্ত কহিল, "আমার কাছে নয়—দামোদর বাবুর কাছে। তিনি আসছেন এখনই। আপনি বসুন"—বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

আগন্তুকের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। দেখিতে বেঁটে ও কাহিল। গায়ে গলাবন্ধ তসরের কোট, পায়ে অ্যালবার্ট স্লিপার, চোখে চশমা। মাথার চুলগুলি তেল ও জল দিয়া পালিশ করা। মেয়েদের মত সিঁথির দুই পার্শ্বে চুলগুলি দুইটী সূক্ষ্মাগ্র মহিষ-শৃঙ্গের মত বাঁকিয়া আছে।

ভদ্রলোক পিচ্ছিল কণ্ঠে কহিল, "আপনার নামটী জানতে পারি কি?"

সুশান্ত কহিল, "খুব পারেন। সুশান্ত বোস। মশায়ের নাম?"

আগন্তুক কহিল, "আমার নাম, প্রণয়রঞ্জন প্রতিহার।"

সুশান্ত ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "কি বল্‌লেন? প্রণয়রঞ্জন? খাসা নাম। আপনার চেহারাটীও তো দেখছি রমণীরঞ্জন। কবিতা লেখা আসে বুঝি?"

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া প্রণয় কহিল, "আজ্ঞে না।

ও সব পাঠ আমার নেই। শেয়ারের দালাল আমি। কিছু শেয়ার বিক্রী করবার জন্যে এসেছি।”

সুশান্ত কহিল, “তা এসেছেন, বেশ করেছেন। কিন্তু কবিতা লেখেন না, একথা বলছেন কেন?”

“লিখি না, তা বলব না? বেশ তো!”

“সত্যি বলছেন? জীবনে কখনও কবিতা লেখেন নি?”

“কখনও লিখি নি তা বলব কি করে, মশায়! বিয়ের পর বৌকে দিন কতক কবিতায় চিঠি লিখেছিলুম।”

উল্লাসের সহিত সুশান্ত কহিল, “তাই বলুন! তবে যে বলছেন, লিখি না? আমি দেখেই বুঝেছি—”

বাধা দিয়া প্রণয় কহিল, “আজ্ঞে নিজের মন থেকে লিখি নি, প্রেম-পত্রের বই দেখে লিখতুম—”

“তা হোক। নেই বা লিখলেন মন থেকে! সকলকেই যে মন থেকে লিখতে হবে, তার কিছু মানে নেই। তবে কবিতা বোঝবার ক্ষমতা নিশ্চয় আপনার আছে। আচ্ছা! একটা কবিতা আপনাকে আমি শোনাচ্ছি। শুনে তার সম্বন্ধে আপনাকে মত দিতে হবে। খুব ভাল করে মন দিয়ে শুনুন”—বলিয়া কাগজটা পকেট হইতে বাহির করিল। প্রণয় কাঁচু-মাচু হইয়া কহিল, “কিন্তু আমার শেয়ার-বিক্রীর কি হবে? দামোদর বাবুর সঙ্গে কি দেখা হবে না?”

সুশান্ত কহিল, “নেই বা হোল—কবিতাটা শুনুন না—”

প্রণয় কহিল, “দেখা না হলে—দেখুন আমি এখন উঠি। এখনও অনেক যায়গায় যেতে হবে আমাকে। আপনার ঠিকানাটা বলুন। একদিন গিয়ে বরং শুনে আসব—”

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুশান্ত পড়িতে লাগিল—

“সেদিন প্রভাতে ঘুম থেকে উঠি
দাঁড়াইনু আসি মোর জানালার পাশে”

প্রণয় তখন দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিয়া সুশান্ত কহিল —

“ও মশায়! চলে যাচ্ছেন যে বড়! বেশ ভদ্রলোক তো!” প্রণয় তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া এক লম্ফে তাহার কাছে আসিয়া সুশান্ত কহিল, “দাঁড়ান একটু—দশ মিনিট”—বলিয়া আবার পড়িবার উপক্রম করিল।

প্রণয় দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, “মশায়, হাতজোড় করে বলছি, আজকে ছেড়ে দিন। অনেক কাজ আমার—”

সুশান্ত কহিল, “কাজ! কোথায় কাজ! আচ্ছা চলুন, রাস্তায় শোনাতে শোনাতে যাচ্ছি—”

প্রণয় মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, “মশায় মাপ করুন, ওতে দেরী হয়ে যাবে। নমস্কার”—বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুশান্ত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল,—“Cad! মরগে যা! এক পয়সার শেয়ার বিক্রী হবে না। সবাই তোর শেয়ার কেনবার জন্যে হাত ধুয়ে বসে আছে কি না।” বলিয়া বিরক্ত মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিয়া কহিল, “যেমন চাকর, তেমনই মনিব! কারও দেখা নেই—”

অনতিবিলম্বে দামোদরবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দামোদরবাবুর গান-বাজনায় অত্যধিক ঝোঁক। একটা গানের সুর ভাঁজিতে ভাজিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশান্তকে দেখিয়া পুলকিত কণ্ঠে কহিলেন, “সুশান্তবাবু যে! এমন অসময়ে? বেশ! বেশ! বল দেখি এটা কি? মল্লার না ছায়ানট?” বলিয়া মুদিত চক্ষে সুরটা আবার ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। সুশান্ত বাধা দিয়া কহিল, “একটু কাজ আছে, প্রণববাবুর সঙ্গে। ওঁকে একবার—”

প্রণববাবু দামোদরবাবুর জামাতা স্থানীয় কলেজের ফিলজফির অধ্যাপক শ্বশুর-গৃহেই বাস করিতেছেন।

দামোদরবাবু চোখ খুলিয়া ও সুর ভাঁজা বন্ধ করিয়া কহিলেন, “প্রণবের সঙ্গে দরকার? কিন্তু সে তো এখন বড় ব্যস্ত। কলেজের সময় হয়ে এল। কি দরকার?”

সুশান্ত কহিল, “এমন বিশেষ কিছু নয়—মানে—”

“বিশেষ কিছু না হলে কাজকর্ম ফেলে এমন সময়ে কেউ আসে? গোপনীয় না কি?”

“আজ্ঞে না—একটা কবিতা—”

“ওঃ কবিতা! লিখেছ! বেশ! বেশ! তা আমাকেই শোনাও না। আমরাও কিছু কিছু বুঝি হে—”

সুশান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, “আপনি কবিতা বোঝেন?”

দামোদরবাবু কহিলেন, “বুঝিনে! বল কি! পাঁজীর ‘হরপার্ব্বতী সংবাদ’, কার্ত্তিক বোসের ‘গৃহচিকিৎসা’ আমার কণ্ঠস্থ। শুনবে?”

আধুনিক ইতালী : রোম শহরে মুসোলিনি-ফোরাম।

সুশান্ত কহিল, "আর একদিন এসে শুনব এখন। আজ সময় কম, একবার প্রণববাবুকে —"

দামোদরবাবু কহিলেন, "তোমার কবিতাটা শোনাবে না ?"

"আজ্ঞে, আমার কবিতাটা ঠিক পত্রিকা-প্যাটার্ণের নয়, একটু অন্য ধরণের, আপনার—"

"ভাল লাগবে না ? কি করে জানলে বাপু ? উকীল মানুষ যখন, নিশ্চয়ই মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে কবিতা। কত করে কোর্ট-ফি দিতে হয়, কেমন করে রেজেষ্টারী করতে হয়, নীলাম রদ করবার প্রণালী কি, এমনি সব খবর চতুর্দ্দশ-পদী ছন্দে লিখেছে তো ? তা' এ আমার ভাল লাগবে না, ভাল লাগবে প্রণবের ?"

সুশান্ত কহিল, "দেখুন, মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটা কবিতার বই লিখেছি বটে ! নাম 'মক্কেল-সঙ্গিনী', কৃত্তিবাসী ছন্দ, মূল্য দুই টাকা। কিন্তু সেটা তো আজ আনি নি। আর একদিন নিয়ে এসে শুনিয়ে যাব। আজকের কবিতাটা একটু অন্য ধরণের—মানে, একটু রসাল।"

দামোদরবাবু কহিলেন, "রসাল ? রসগোল্লা, সন্দেশ এই সব বানাবার সম্বন্ধে লিখেছ বুঝি ? বেশ ! বেশ ! মেয়েদের অনেক কাজে লাগবে—"

সুশান্ত কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকটা সেইরকম—"

"তা কি নাম দিয়েছ ? গৃহিণী-সঙ্গিনী ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রায় তাইই—তা' প্রণববাবু কি—"

"বাড়ীতেই আছে। দোতলায় পড়বার ঘরে। কিন্তু প্রণব ওসবের বুঝবে কি ? তুমি বরং আভাকে শোনাও গিয়ে। ওর ওসব দিকে খুব ঝোঁক—"

দোতলায় একটা কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া সুশান্ত ডাকিল, "প্রণববাবু আছেন কি ?" ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "হ্যাঁ আছি, আসুন—"

সুশান্ত কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটী নাতিবৃহৎ। মধ্যস্থলে একটী বড় টেবিল। তাহার উপর মোটা মোটা বই স্তূপীকৃত হইয়া আছে। তাহার সামনে একটা চেয়ারে বসিয়া প্রণব, সামনে একটা খোলা মোটা বই ও একটা খাতা, বোধ করি নোট করিতেছে। ডান পার্শ্বে একটা ঘূর্ণ্যমান শেল্‌ফ, দেওয়ালের কাছে একটা বড় আলমারি বইয়ে ঠাসা, বামপার্শ্বে একটু দূরে একটা ইজিচেয়ার, টেবিলের তিন দিকে তিনখানি হাতলওয়ালা চেয়ার।

সুশান্ত একটা চেয়ারে বসিল।

প্রণব কাজ বন্ধ রাখিয়া কহিল, "এমন অসময়ে ? কি খবর ? আভার কাছে সুনন্দার কোন দৌত্য-কার্য্যে এসেছেন বুঝি !"

সুশান্ত কহিল, "আজ্ঞে না, এসেছি আপনার কাছে এবং নিজের কাজেই—"

প্রণব কহিল, "মাষ্টারের কাছে উকীলের কাজ ! কোন মামলায় পড়েছি না কি ?"

সুশান্ত কহিল, "কোন সম্ভাবনা আছে না কি ?"

চিন্তিত মুখে প্রণব কহিল, "কিঞ্চিৎ আছে। নূতন সাইকেল চড়ছি কি না ! সে দিন একটা রাস্তার কুকুরকে চাপা দিয়েছিলুম। কিন্তু তার যে এত মালিক আছে তা জানতুম না। সকলকে খেসারৎ দিতে প্রায় টাকা দশ গেছে, কিন্তু তার পরেও যে কেস করবে—"

সুশান্ত হাসিয়া কহিল, "মা ভৈঃ! কেস-টেস কিছু নয়। সাহিত্য-সমিতির জন্যে একটা কবিতা লিখেছি। সেটা একবার আপনাকে শুনতে হবে—"

"কবিতা ? ও তো আমি বিশেষ বুঝি নে।" ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, "তা ছাড়া এগারটায় ক্লাস ; কতকগুলো জিনিষ নোট করতে হবে, ছেলেদের তাগিদ। তা' অন্য সময়ে শুনলে হবে না ? আমি বরং আপনার ওখানে গিয়ে শুনে আসব—"

সুশান্ত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "সময় অত্যন্ত কম। আজ পাঁচটার সময় পড়তে হবে, এখনই শোনা চাই—"

"এখনই শুনতে হবে ?" মোটা বইটার দিকে ও ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, "আচ্ছা তাই শোনা যাক।" সুশান্ত কাগজ বাহির করিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই প্রণব কহিল, "দেখুন সুশান্তবাবু, একটা কাজ করলে হয় না ! আমি তো এসব কিছুই বুঝি না। আভা এ সব বিষয়ে ওস্তাদ, রবিবাবুর সব কবিতা ওর মুখস্ত। আপনি—আপনি যদি দয়া করে—"

সুশান্ত কহিল, "বেশ ! আপত্তি নেই। কিন্তু ওরা আবার—আচ্ছা তাকেই ডাকুন—"

প্রণব বাহিরে গিয়া ডাক দিল, "আভা!" নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল—"কেন?"

"একবার শোন"—বলিয়া প্রণব কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রণবের স্ত্রী ও দামোদরবাবুর কন্যা আভা কক্ষে প্রবেশ করিল। বয়স ষোল কি সতের; গায়ের রঙ উজ্জল-শ্যাম; মুখশ্রী চমৎকার; টানাটানা চোখ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জল; মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন; জলসিক্ত হাত দুইটি অঞ্চলে মুছিতেছে; বোধ হয় রান্নাঘরে কোন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সুশান্তকে দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "ওঃ আপনি। এমন সময়ে? সুনন্দা পাঠিয়েছে বুঝি? কি খবর?"

সুশান্ত কহিল, "খবর—মানে—"

প্রণব উত্তর দিল, "উনি ওঁদের সাহিত্য-সমিতির জন্যে একটা কবিতা লিখেছেন—তোমাকে শোনাতে চান—"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া আভা কহিল, "আমাকে কেন? আমি যে কবিতার একজন সমঝদার এ খবর ওঁকে কে দিলে?"

প্রণব লিখিতে লিখিতে কহিল, "আমি।"

আভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া, সুশান্তর দিকে চাহিয়া কহিল, "উনি যখন বলেছেন, তখন আর উপায় কি। কিন্তু আপনি তো সুনন্দাকেই শোনাতে পারতেন—"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া সুশান্ত কহিল, "সুনন্দাকে? বেশ বলেছেন! ও তো কবিতার নাম শুনলে কাণে আঙ্গুল দেয়—"

আভা হাসিয়া কহিল, "আজকালকার কবিতা শুনলে কাণে আঙ্গুল না দিয়ে উপায় থাকে না যে! তা আপনার কবিতা খুব লম্বা নয় তো? আমার আবার সময় কম—ওঁর কলেজ যাবার সময় হয়ে এল—"

সুশান্ত কহিল, "না খুব লম্বা নয়—দশ মিনিটের বেশী লাগবে না—"

আভা কহিল, "তা হলে আসুন পাশের ঘরে। এখানে ওঁকে disturb করে লাভ নেই—"

পাশের ঘরে সুশান্তকে একটা চেয়ারে বসাইয়া আভা দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "পড়ুন—"

সুশান্ত পড়িল—"পরের প্রিয়া"

দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া আভা কহিল, "কি?"

"পরের প্রিয়া—"

"সে আবার কে?"

সুশান্ত কহিল, "কেউ না। পরের প্রিয়া—কবির মনে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে—তারই সম্বন্ধে লেখা হয়েছে আর কি!"

উকীলের জেরা করার ভঙ্গীতে আভা প্রশ্ন করিল, "কবিটি কে? আপনি নিজে বুঝি!"

সুশান্ত কহিল, "যেই হোক কবিতাটা শুনুন—"

আভা কহিল, "কিন্তু সুশান্ত বাবু! পরস্ত্রী দেখলে যে আপনার মন চঞ্চল হয়, সে খবরটা সুনন্দাকে না শুনিয়ে আমাকে শোনাতে এসেছেন কেন? পরস্ত্রী বলেই কি?"

সুশান্ত সক্ষোভে কহিল, "ছিঃ ছিঃ আপনি কি বলছেন? কবি যা লিখবে, তারই সঙ্গে যদি কবির জীবনকে জড়াতে চেষ্টা করেন, তা'হলে কবিতা লেখা বড় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে না কি? ধরুন—রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন—'ওগো! পসারিণী দেখি আর—কি রয়েছে তব পসরায়—' তখন যদি দেশশুদ্ধ লোক চোখ পাকিয়ে ধমকে বল্‌ত—পসারিণীর পসরায় কি আছে—তা তোমার দেখবার দরকার কি বাপু! ভদ্রঘরের ছেলে!—এতো ভাল কথা নয়!—তা হলে এতদিন রবীন্দ্রনাথ লেখনী ছেড়ে লাঙ্গল ধরতেন না কি?"

বাধা দিয়া আভা নীরস কণ্ঠে কহিল, "রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিন। তাঁর লেখার সঙ্গে আপনার লেখা একশ্রেণীভুক্ত করবেন না। আকাশের সূর্য্য—আর কেরোসিনের ডিবরী এক নয় সুশান্ত বাবু—"

অপ্রতিভ কণ্ঠে সুশান্ত কহিল, "না—তা আমি বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি—কবির কবিতার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বকে জড়ান ঠিক নয়—মানে—আমি 'পরের প্রিয়া' কবিতা লিখেছি বলেই, যে আমি—পরের প্রিয়া—মানে—"

ব্যঙ্গ সহকারে আভা কহিল, "মানে পরস্ত্রী—মানে পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের স্ত্রী!—আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত সুশান্ত বাবু! এই সব ছাইভস্ম লিখে আপনি ভদ্রলোকদের সামনে পড়বেন? আপনি কি ভাবেন ছন্দ মিলিয়ে লিখতে পারলেই, যা ইচ্ছে তাই লিখতে হবে, এবং লোকে নির্ব্বিচারে তাই শুনবে?"

সুশান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "ছাইভস্ম! আপনি কি করে জানলেন? না শুনেই—"

"শোনবার দরকার হবে না ; নাম শুনেই বুঝেছি।"

সুশান্ত রাগত ভাবে কহিল, "বেশ! আপনার শুনে কাজ নেই—"বলিয়া কাগজটা পকেটে পুরিবার জন্যে ভাঁজ করিতে লাগিল।

আভা কহিল, "ওটা আর পকেটে রেখে কাজ নেই সুশান্ত বাবু! আমাকে দিন, যথাযোগ্য স্থানে ওকে রাখবার ব্যবস্থা করিগে—"

সুশান্ত কহিল, "মানে?"

"মানে—উনুনে দিইগে। একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যাক। বিন্দুমাত্র ওর যেন বাকী না থাকে—দিন—"

সুশান্ত বিরক্তি চাপিয়া সহজভাবে কহিল, "ধন্যবাদ! আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই পারব—"

"আর সুনন্দার কাছে মাপ চাইবেন। এবং ভবিষ্যতে যদি কবিতা লেখেন তো নিজের প্রিয়ার সম্বন্ধেই লিখবেন—বুঝলেন?"

ঘাড় নাড়িয়া সুশান্ত কহিল, "তথাস্তু—নমস্কার—"

"চলে যাচ্ছেন না কি? একটু চা—"

"ধন্যবাদ। আবশ্যক নেই। বেলা হয়ে গেছে। কোর্টের সময় হয়ে এল—" বলিয়া দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাস্তায় নামিয়া অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত সুশান্ত কহিল, "Prudes! নাম শুনেই সব চোখ ছানাবড়া! এক লাইনও শোনবার ধৈর্য্য হল না কারও। যাক গে—নেই বা শুনল। আমি এমনই পড়ব—"

পলায়ন

বাড়ী ফিরিয়া কবিতার কাগজখানা অতিশয় যত্নের সহিত একটি বইয়ের মধ্যে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া সুশান্ত খাইতে বসিল। বৌ-দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত দেরী হল? উনি তোমাকে খুঁজছিলেন—" সুশান্ত ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে কহিল, "আজ একটা কেসে আমি আর অমল একসঙ্গে আছি কি না—তারই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল—" বৌদি কহিলেন, "তাই না কি!" বলিয়া গরম দুধের বাটীতে পাখা করিতে করিতে কহিলেন, "সুনি আবার কি ফ্যাসাদ্ করেছে! কাল না কি কল চালাতে চালাতে আঙ্গুলে স্চ ফুটিয়েছে। আঙ্গুলে ভয়ানক ব্যথা—ফুলে গেছে। ডাক্তারকে খবর দিতে চাইলুম—তো বললে—থাক্ আপনি সেরে যাবে—"

সুশান্ত অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তাই না কি!"

"কেন? তুমি জান না? কাল সারা রাত্রি না কি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছে—"

সুশান্ত কহিল, "মিথ্যে কথা। কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়েছে সারারাত—"

ঠিক এমনই সময়ে সুনন্দা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। ডান হাতের তর্জ্জনীতে পটি বাঁধা—বাম হাত দিয়া আঙ্গুলটি অতি যত্নে ধরিয়া আছে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটাইবার চেষ্টা।

বৌদি হাসিয়া সুনন্দাকে কহিলেন, "ঠাকুর-পো বলছে কাল না কি সারারাত্রি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়েছিস্।"

সুনন্দা সুশান্তর দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "কুম্ভকর্ণ আমি বৈ কি? গায়ে হাতী চলে গেলেও ঘুম ভাঙ্গে না—"

সুশান্ত সুনন্দার দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া কহিল, "না বৌদি বিশ্বাস কোরো না—কিছু হয় নি ওর—"

সুনন্দা কহিল, "কিছু হয় নি বৈ কি! আমার কি না! নিজের হলে—" বলিতে বলিতে অশ্রুতে কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া আসিল।

বৌদিদি সুনন্দার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "ওর কথা ছেড়ে দে—ঐ রকম! কিছু হুঁস নেই। তোকে তো বললুম ডাক্তারকে খবর দিই। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?"

সুনন্দা স্বীকৃতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

বৌদিদি সুশান্তকে কহিলেন, "দেখ, কোর্ট থেকে ফিরবার সময় ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিও, বুঝলে?"

সুশান্ত ঘাড় নাড়িল।

বেলা চারিটায় কোর্ট হইতে ফিরিয়া, কাপড়-চোপড় না ছাড়িয়াই সুশান্ত কবিতাটি ভাল করিয়া নকল করিবার জন্য বসিল। কিন্তু যে বইয়ের মধ্যে রাখিয়াছিল, তাহা খুলিয়া কাগজটি দেখিতে না পাইয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সেই বইটি রাখিয়া অন্য বইগুলি খুলিল, ঝাড়িল, দোয়াতদান তুলিল, দোয়াত তুলিল, লেটার-প্যাড্ তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও কাগজটির দেখা মিলিল না। হঠাৎ মেঝের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল—সারা মেজে ছাইয়া ছোট ছোট

অজস্র কাগজের টুকরা। ক্ষোভ ও রোষের সহিত কহিল, "কেটে কুচি কুচি করে দিয়েছে—হায়! হায়!" উবু হইয়া বসিয়া কাগজের কুচিগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল, "ঠিক অই সর্ব্বনাশীর কাণ্ড! মজালে আমায়! কি যে লিখেছিলুম সব মনে নেই। তা'ছাড়া পাঁচটার সময়ে সমিতি। নূতন করে লেখবারও সময় নেই। সুইসাইড্ খেতে ইচ্ছে হয় সর্ব্বনাশীর জন্যে—"চেয়ারে হতাশ হইয়া বসিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া কহিল, "কি করা যায়! যাই একবার কাছে। যদি নকল করে রেখেও থাকে, আমাকে জব্দ করবার জন্যে হয় তো তাই রেখেছে। কিছু বিশ্বাস নেই। সব করতে পারে ঐ মেয়ে—"

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতেই সুশান্ত দেখিল—সুনন্দা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত। তাহাকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সুশান্ত কহিল, "কবিতা কোথায়?"

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত সুনন্দা কহিল, "কবিতা? কিসের কবিতা? কার কবিতা?"

"যেটা আমি লিখেছি।"

"কখন?"

"কেন, আজ সকালে?"

ফিক্ করিয়া হাসিবার উপক্রম করিয়াই—মুখ গম্ভীর করিয়া সুনন্দা কহিল, "কাজকর্ম্ম ছেড়ে সারা সকাল আজকাল কবিতা লিখছ বুঝি!"

প্রতিবাদ করিয়া সুশান্ত কহিল, "আজ নয়, আজ নয়, অনেকদিনের লেখা। রাখ নি?"

সুনন্দা অত্যন্ত নিরীহভাবে কহিল, "রাখি নি তো!"

"তা' হলে নিশ্চয় কেটে কুচি কুচি করে ফেলেছ।"

"বা রে! তোমার কবিতাই জানলুম না—কেটে কুচি কুচি করে দিয়েছি আমি? সব দোষ আমার! আমি বলে সারা দুপুর আঙ্গুলের যন্ত্রণায়—" বলিতে বলিতে মুখে মেঘ ও চোখে অশ্রু ঘনাইয়া আসিল এবং বাম হাত দিয়া ডান হাতের তর্জ্জনীটি অতি মমতার সহিত ধরিয়া কহিল, "পাশে পড়ে ছটফট্ করেছি সারারাত, জেগে থেকেও একবার জিজ্ঞেসা করে না—কেমন আছি, তা'ও জিজ্ঞেসা করতে মনে পড়ে না—বিনা দোষে শুধু ধমক—পথ ছাড়—" বলিয়া সুশান্তকে ঠেলিয়া সুনন্দা বাহির হইয়া গেল।

সুশান্ত সুনন্দার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিল। তারপর নিজেদের শয্যার দিকে তাকাইতেই দেখিল—সেখানে গোল ফ্রেমে আঁটা একটুকরা কাপড় এবং তৎসংলগ্ন একটা রঙ্গীন সুতা ও সুচ—সুনন্দা নিশ্চয়ই এতক্ষণ সেলাই করিতেছিল। তবে আঙ্গুলের ব্যথা? স্রেফ ধাপ্পা! বৌদিদিকে ভালমানুষ পাইয়া সুনন্দা তাঁহাকেও ঠকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই এই অপকর্ম্ম সুনন্দা ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়।

কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া, বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সুশান্ত কহিল, "কি করা যায়! শহরশুদ্ধ সবাই জানে আমি আজ কবিতা পড়ব—" বলিয়া চিন্তিত মুখে পায়চারি করিতে লাগিল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"শহর থেকে সরতে হবে এখনই। সাড়ে চারটার ট্রেনে বিমলের কাছে আসানসোল পাড়ি দেওয়া যাক।" বিমল সুশান্তর বন্ধু, কর্ম্মসূত্রে আসানসোলে বাস করে।

সুশান্ত চিঠি লিখিতে বসিল। একটা সমিতির সেক্রেটারীর নামে—"বিশেষ কাজে অন্যত্র যাইতেছি। কবিতা পাঠ করিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।" আর একটা চিঠি লিখিল—বোধ করি সুনন্দার উদ্দেশ্যে, "দেশ ছাড়িয়া চলিলাম, সুখে রাজত্ব কর—তোমার পথের কাঁটা!"

দীননাথকে ডাকিয়া বখশিশ্ কবুল করিয়া, সুশান্ত সেক্রেটারীর চিঠিখানি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল এবং শয়ন-কক্ষে—সহজেই চোখে পড়ে এমনভাবে সুনন্দার চিঠিখানি রাখিল। তারপর একটা সুটকেসে একখানা করিয়া কাপড়, জামা ও তোয়ালে ভরিয়া, সুটকেস হস্তে সটান বৌদিদির কাছে গিয়া কহিল, "বিমলের আজ চিঠি পেলুম, ভারী অসুখ। ওকে একবার দেখে আসি। কালই ফিরব।" বৌদিদি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "তাই না কি? তা যাও কিন্তু খেয়ে যেও।"

সুশান্ত হাত-ঘড়ি দেখিয়া কহিল, "না বৌ-দিদি, আমি কোর্টে খেয়েছি, ক্ষিধে নেই—তা ছাড়া গাড়ীরও দেরী নেই—সাড়ে চারটায় ট্রেন, আমি চললুম—" বলিয়া প্রতিবাদের অবসর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

মেরী মাতা ও শিশু যীশু—জাঁ দেল্ কুর (১৬২৭-১৭০৭) অঙ্কিত।

(বেলজিয়ামের হুই-হ নোৎর্ দাম্ গির্জ্জার মূল চিত্র রক্ষিত আছে)

স্বপ্ন-দেউল

—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

একদা স্বপন দেখিতে দেখিতে গভীর রাত্রি বেলা,
গিয়াছিনু এক অজানা গ্রামের জীর্ণ দেউল-দ্বারে
ব্যথিত মর্ম্মে মন্থরগতি ছন্দের তালে তালে
ঘুম-পাড়ানীর দেশে
দেখিনু সেথায় মানুষের গড়া পুরাতন মন্দির—
ভিতরে তাহার দেব-বিগ্রহ নাই,
অঙ্গনে তা'র বন্দনা আর নাহি উঠে বন্দীর
নিভে গেছে হোম মাটিতে মিশেছে ছাই।

লাঠি হাতে যা'রা রাখিত এ মাটি তাহাদের কঙ্কালে
সুফলা মাটির সোনার বরণ হয়ে গেছে অঙ্গার,
মৃত মানুষের ইতিহাস লয়ে প্রাচীন পঙ্কদীঘি,
মরণের দেশে মারণ-মন্ত্র জপে।
পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা তখনো ফেলে নি ধূসর ছায়া
মুগ্ধ পাখীরা তখনো ফেরে নি নীড়ে,
আমি শুধু একা ক্লান্ত পথিক চাহিয়া দেউল পানে
ভাবিতেছিলাম নামহারা কত কথা
অনামী যুগের কম্পিত ইতিহাস।

কাহিনীর মালা ছন্দে গাঁথিয়া যাহারা কবিতা লেখে
কঠিন কোমল রুদ্র মধুর যে যা'র ইচ্ছামত—
চিরপুরাতন ভাষার অলঙ্কারে,
তাহাদের সাথে প্রভেদ আমার ভাবিতেছিলাম বসি'
আত্মম্ভরী মনের অহঙ্কারে।
সমুখে ভগ্ন ধূলিসাৎ এক অজানা ভিটের বুকে
ঘুঘু-দম্পতী নাচিয়া নাচিয়া তৃণকীট খুঁটে খায়
মরাগাছ হ'তে কাঠ-ঠোক্‌রার ঠক্ ঠকা ঠক্ ধ্বনি
অপরাহ্ণের বাতাসে ভাসিয়া যায়!

এমন সময় ধূলি কাদা মাথা উলঙ্গ এক ছেলে,
শীর্ণ গাভীর শাবক-কণ্ঠে শণের রজ্জু বাঁধি'—
টানিতে টানিতে বিস্মিত চোখে সম্মুখ দিয়া মোর
গান গেয়ে গেয়ে চলে গেল এক বেতালা পল্লীসুরে।
অকারণে মোর পড়ে গেল মনে আধুনিক কলিকাতা
আধুনিকতার চূড়ান্ত লীলা যেথা চলে নিশিদিন,—

ধূলি ধূম আর লৌহে গঠিত ইষ্টক-স্তূপে যেথা
শহরে মানুষ পুতুল-নাচের পুতুলের মত ঘোরে,
কেহ রাজা আর কেহ বা মন্ত্রী কেহ নফরের বেশে
হিসাব করিয়া সাবধানে পথ চলে।
হায় রে জীবন চির-অতৃপ্ত অসীম কল্পনাতে
পথ হ'তে পথে ছুটে চলে নিশিদিন—
লক্ষ্যের শেষ মিলে নাকো হায় মিলে না সুখের বাসা,
যে-প্রেমে পাগল মানব-জীবন সে-প্রেম সর্ব্বনাশা!

উলঙ্গ ঐ পল্লীর শিশু যে-গান গাহিয়া গেল,
যে-গান গাহিল ঘুঘু-দম্পতী ধূলিসাৎ ভিটে-বুকে
শ্মশানের মত আতঙ্কময়ী দেবালয়-অঙ্গনে
স্বপনে আমার গভীর রাত্রিবেলা;
শহরে হয় তো উলঙ্গ শিশু গাহিবে না সেই গান
মধুর বেতালা সুরে—
ঘুঘু-দম্পতী রাখিবে গো শুধু আধুনিকতার মান
সে দিন নাহিক দূরে!

কালের প্রহরী নও তুমি জানি জীর্ণ হে দেবালয়,
অশ্বত্থের ভয়াবহ বীজ ফাটলে ফাটলে তব
ঘোষণা করিছে পঞ্জরভেদী অনিবার্য্যের জয়—
কাল-কীট তা'র শক্তি কী অভিনব?
তবুও তোমার মৃত্যুর বাঁশী ছন্দে ছন্দে বাজে
ছন্দে ছন্দে একদা যেমন মরেছিল বিগ্রহ,
গ্রহচক্রের ঘর্ঘর রোল ছুটিছে ছন্দ মাঝে
সহে না সে কভু নীরস গদ্যে ছন্দের নিগ্রহ।

ওগো দেবালয়, অকারণে আমি অট্ট হাসিয়া উঠি'
সে হাসি শুনিয়া চমকিয়া উঠে উন্মাদ মহাকাল,
তাঁর কথা তব মনে কি পড়ে না বিস্মৃতি-জাল টুটি'
মনে কি পড়ে না গঙ্গার ঢেউয়ে সিক্ত সে জটাজাল?
সে পাগল তাই দেশ কাল জুড়ে লেলিহ রসনা মেলি'
আগুনের মত ক্রুদ্ধ বিকট জিজ্ঞাসু আঁখিপাতে
খুঁজিছে গরল, তীব্র গরল, অমৃত হেলায় ফেলি'
আলোকাণুময় বিরাট বিশ্ব কাঁপে তাঁর পদাঘাতে।
মানুষের গড়া ধ্বংসযাত্রী হে প্রাচীন দেবালয়,
কষ্টি-পাথরে খোদিত সে তব পাষাণ দেবতা নয়?

ফেনিল মত্ত গরল সিন্ধু পৃথিবীর চারিদিকে
উত্তাল বেগে উথলিয়া উঠে অন্ধ ছন্দোহারা
কালের পিপাসু অধরের সম্মুখে।
ওগো দেবালয়, তুমি আমি আর গ্রহ তারা রবি শশী
ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য যে তাঁর ফুরাবো জঠরে পশি'।

হঠাৎ স্বপন ভেঙ্গে গেল মোর ঘন রোমাঞ্চ লেগে,
গভীর রাত্রি নীরব চন্দ্র ভাসায়ে স্বপ্নতরী—
শুক্লারাতের সুর-ঝঙ্কারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহে—
"ওরে ও অভাগা মানুষের দল, ঘুমা, ঘুমা, ও রে ঘুমা!"
গভীর সুপ্তি নামিয়া আসিল চোখে—
আকাশে কেবল জাগিয়া রহিল অনামী লক্ষ তারা!

হেড্‌লাইন

—শ্রীরাঘবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেবদারু পাতা মোড়া বাঁশের গেটে লাল শালুর কাপড়ে বড় সাদা হরফে লেখা, 'কুমারী-সঙ্ঘ'। আমাদের পাড়ার

"আমাদেরই শাস্ত্রে আছে—মেয়েরা শক্তি। এই মহীয়সী শক্তি বাড়ীর চারটে দেওয়ালের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বন্ধ করে রেখেই দেশ আজ পরাধীন, অন্নহীন, শক্তিহীন…"

এ মেয়ে-ইস্কুলটি একমাত্র মিসেস্ মহিমা বিশ্বাসের অদ্ভুত পরিশ্রম এবং তাঁর আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্বের ফলেই আজ দশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী হারানোর পরে মিসেস্ বিশ্বাস তাঁর অদম্য কর্ম্মশক্তি অতিশয় একান্ত ভাবে এ-রকম একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্যে নিয়োগ করেন। যাঁরা আজ কুমারী-সঙ্ঘের কর্ম্মী বলে দেশে পরিচিত, তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, মিসেস্ বিশ্বাসের আশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তি তাঁদের মনে এত বড় কাজ করবার প্রেরণা এনেছিল। দু' পাঁচজন দুষ্ট লোক বলে থাকে, স্বামী মারা যাওয়ায় উঠ্‌তে বসতে তাড়া দেবার কাউকে না পেয়েই না কি মিসেস বিশ্বাসের 'কুমারী-সঙ্ঘে'র পরিকল্পনা—কিন্তু সে সব লোকের কথায় কাণ দেওয়া উচিত নয় এবং কেউ বোধ হয় দেয়ও না।

আমাদের মনে আছে—'কুমারী-সঙ্ঘে'র উদ্বোধনের দিন পার্কে মিসেস্ বিশ্বাসের বক্তৃতা :

> আমাদেরই শাস্ত্রে আছে—মেয়েরা শক্তি। এই মহীয়সী শক্তি বাড়ীর চারটে দেওয়ালের মধ্যে যুগ যুগ ধ'রে বন্ধ করে রেখেই—দেশ আজ পরাধীন, অন্নহীন, শক্তিহীন। এই প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের শিক্ষা হবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যা কিছু ভাল তাই মিলিয়ে। মেয়েরা হবে প্রতীচ্যের সহাসিকা, অথচ প্রাচ্যের সুগৃহিণী। উপযুক্ত বর পেলে স্বয়ম্বরা হবার সাহস তাদের থাকবে অথচ ডিভোর্স চাইবে না। যুক্তিহীন ভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করে দেশে নতুন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করবে না—কিন্তু বর্ব্বরকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকবে। এক কথায় তাহাদের আদর্শ হবে ওই—"

ব'লে দেবীর কুমারী মূর্ত্তির বড় একখানা ছবিরদিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। মনে পড়ে উপস্থিত অনেকেরই শরীর ভয়ে কন্টকিত হয়ে উঠেছিল।

আজ সেই "কুমারী সঙ্ঘে" অভিরামবাবুর বক্তৃতা হবে। অভিরাম তরফদার সুবিখ্যাত 'ভারত-গগনে'র সহকারী সম্পাদক। মিসেস বিশ্বাসের দৃষ্টি সুদূর-প্রসারিণী। এটা তিনি বেশ বুঝেছেন যে, মেয়েদেরও জার্ণালিজ্‌ম্ শেখা উচিত—অন্ততঃ সবাই জানুক ব্যাপারটা কি। দেশের এই সদা-পরি-বর্ত্তনশীল অবস্থায় মেয়েদের কবে কোন্ কাজ করতে হতে পারে—তার ঠিক কি ?

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় সভা আরম্ভ হ'ল। কুমারী সঙ্ঘের বিরাট 'হল'—একেবারে ভর্ত্তি। প্ল্যাটফরমের প্রথম চার সার চেয়ারে সঙ্ঘের মেয়েদের মা' এবং বয়স্কা আত্মীয়ারা বসেছেন। বাকীগুলিতে দশ থেকে কুড়ি অবধি নানা বয়সের মেয়েরা।

জনকতক মেয়ে হারমোনিয়ামের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্—' (কংগ্রেস এডিশন) গাইবার পর মিসেস বিশ্বাস উঠে কুমারী-জীবনে জার্ণালিজ্‌মের কতটা প্রয়োজন এবং দেশ মেয়েদের কাছে কি আশা করে—এ বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে ব'ললেন—এইবার 'ভারত-গগন' কাগজের শ্রীযুত অভিরাম তরফদার আমাদের দেশে খবর কাগজ চালানর পদ্ধতি সম্বন্ধে তোমাদের কিছু ব'লবেন।

অভিরাম বাবু সমাগত মহিলাবৃন্দকে স্মিত নমস্কার ক'রে প্ল্যাটফরমে উঠে দাঁড়ালেন। পরণে আগাগোড়া খদ্দরের পোষাক, চোখে শেলের চশমা, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা। চেহারাটা একহারা হ'লেও সামান্য একটু ভুঁড়ির আভাস পাওয়া যায়। মাথায় গান্ধী-টুপীটি বোধ হয় শেষ মুহূর্ত্তের অনুপ্রেরণা, তাই অন্তত দু'সাইজ ছোট এবং আশপাশ দিয়ে মসৃণ টাকের বড় একটা অংশ চোখে পড়ছিল।

অভিরাম বাবু মুখ খোলবার আগেই মিসেস বিশ্বাস আবার ব'ললেন, আপনি দয়া করে এটা ঠিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা করছেন ব'লে মনে করবেন না। অনেকটা ঘরোয়া কথাবার্ত্তার ভাবে বিষয়টা সবাইকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবেন। মেয়েরা মাঝে মাঝে হয়ত আপনাকে দু'টো একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে, তাতে নিশ্চয়ই আপনার কোন আপত্তি নাই?

অভিরাম বাবু মাথা হেলিয়ে 'আপত্তি নেই' জানালেও মনে মনে খুসি হতে পারলেন না। 'ভারত-গগনে'র মত অত বড় নামজাদা কাগজের সহকারী সম্পাদক বলে তাঁর বাইরে যথেষ্ট খাতির আছে—অন্ততঃ তাঁর নিজের তাই ধারণা। তা'ছাড়া জানাশুনা সবাইকে মাসখানেক ধরে বলে এসেছেন: আধুনিক বাংলার তরুণীদের সভায় বিশ্বের বাণী প্রচার করতে হবে, ওঁরা বড্ড ধরেছেন। সামনের সপ্তাহে বক্তৃতার পুরো রিপোর্ট বেরুবে, সব তৈরী। এখন কি না—মেয়েদের রকমই ওই—সব কথাই ঘরোয়া ভাবে না বললে ভাল লাগে না। যাকগে—

অভিরাম বাবু সমাগত মহিলাবৃন্দকে স্মিত নমস্কার করে প্ল্যাটফরমে উঠে দাঁড়ালেন। পরণে আগাগোড়া খদ্দরের পোষাক, চোখে শেলের চশমা, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা। চেহারটা একহারা হলেও সামান্য একটু ভুঁড়ির আভাস পাওয়া যায়। মাথার গান্ধী টুপিটি বোধ হয় শেষ মুহূর্ত্তের অনুপ্রেরণা

সুরুটা বেশ চমৎকার হ'ল। অভিরাম বাবু ভারত-বন্ধু রিপণ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ও বিপুল ক্ষমতার আলোচনা করে বললেন, সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়েই একটা জাতির হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায়। যদি কোন কাগজের পেছনে একদল জোরালো লেখক থাকেন, তা হলে পৃথিবীর যে কোন দেশের এক রেজিমেণ্ট সৈন্যের চেয়ে—সে কাগজের শক্তি অনেক বেশি।

হাসির আওয়াজটা তাঁর ভালো লাগল না। মেয়েদের কি নিয়ে হাসা উচিত তা তিনি মেয়েদের অনেক বার বুঝিয়েছেন। অথচ সভাস্থলে হাসি—বড়ই অশোভন।

তারপর একটু টেক্‌নিক্যাল ব্যাপারে এসে পড়ে লাইনো, রোটারী এই সব কি করে চলে বুঝিয়ে দিয়ে, সংবাদপত্রে হেড্‌লাইনের উদ্দেশ্য কি বলতে আরম্ভ করলেন :

…ভেবে দেখুন, বিষয়টা ভাববার মত—ঠিক মত হেড্‌লাইন লেখার ওপরেই একটা খবরের news value নির্ভর করে। ভাল করে হেড্‌লাইন না দিতে পারলে অতি গুরুতর খবরও লোকের চোখ এড়িয়ে যায়। অথচ অতি সামান্য একটা কথাও ভাল হেড্‌লাইনের জোরে সমস্ত দেশের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠতে পারে। মনে করুন, কাল রাত্রে খুব ঝড় হয়ে গেল, তার সঙ্গে বৃষ্টি। বাড়ীর দরজা-জানালা দুম্‌দাম করে বন্ধ হয়ে গেল—ছোট ছেলেরা ভয়ে কেঁদে উঠল। রাস্তায় কারও হাতের ছাতি বাতাসের জোরে উল্টে যাওয়ায় সে বেচারি কাপড়-চোপড় ছাতি সামলাতে মহা বিব্রত হয়ে উঠল। সব থেমে গেলে আপনারা হলে কি বলতেন ? উঃ কি ঝড়টাই হয়ে গেল—ভাগ্যিস কাল বেরুই নি। কিন্তু খবরের কাগজে কি লেখা উচিত ?

কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা

প্রথম ডিভিসন লীগ খেলা বন্ধ

ঝড়ের গতি ঘণ্টায় আশী মাইল

পূর্ব্ববঙ্গের বহু পরিবার গৃহহীন

বরিশালে সরকারী অফিসের কেরাণীর ঝড়ের বেগে নদীগর্ভে পতন।

অভিরাম বাবু থামলেন। সভা একেবারে নিস্তব্ধ। শ্রোত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিরাম বাবু খুসিই হলেন, হুঁ, বেশ effect হয়েছে, এখন বাকীটুকু গুছিয়ে বলতে পারলেই হয়। কিন্তু একদিক থেকে চাপা গলার হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। মিসেস্ বিশ্বাস এতক্ষণে বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী চুপচাপ বসে ছিলেন। হাসির আওয়াজটা তাঁর ভাল লাগল না। মেয়েদের কি নিয়ে হাসা উচিত তা তিনি মেয়েদের অনেক বার বুঝিয়েছেন। অথচ সভাস্থলে হাসি বড়ই অশোভন।

তাই মনে মনে হাসির কারণটা ঠিক করে নীচু সুরে অভিরাম বাবুকে বললেন, "দেখুন, আমার মনে হয় কোন মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে বিশেষতঃ মেয়েদের সামনে এ রকম ঠাট্টাচ্ছলে কথা বলা উচিত নয়।"

অভিরাম বাবু হেসে উত্তর দিলেন,—"না না ঠাট্টা করব কেন ? আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন নি যে, আমি কোন

সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছি। বিকেলে বা সন্ধ্যার পরে ঝড় হলে পরদিনকার কাগজে সাধারণত এই ধরণের হেড্‌লাইন দেখা যায়। বেশির ভাগ সময়ে দেখা যায় যে, সত্যিকারের ঘটনাটা হয়ত এত ভয়াবহ নয়। আমি যা বললাম এর সঙ্গে বাস্তবের কোনই সম্পর্ক নেই। আমি একটা উদাহরণ দেখালাম মাত্র।"

মিসেস্ বিশ্বাস গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওঃ তা হবে, কিন্তু এক বেচারা জলে ডুবে মারা গেল, তার পরিবার ছেলে-মেয়ের হল হয়ত অনাহার আর তাই নিয়ে সভাস্থলে তামাসা করাটা আমি ঠিক উচিত মনে করতে পারছিনে।"

"সে ত নিশ্চয়ই। আমি আপনার সঙ্গে একেবারে একমত। কিন্তু আমি যার কথা বলছি, থাক্‌গে, সে ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন এমন কিছু ত আমি বলিনি। আমি বলেছি নদীগর্ভে পতন।"

মিসেস্ বিশ্বাসের বন্ধু মিসেস্ বোস্ বলে উঠলেন, "সে কি কথা? একজন ভদ্রলোক জলে পড়ে গেলেন, তাঁর কি হল না হল, সে কথাও আমরা জানতে পারব না। দেশে কি মানুষ নেই?"

অভিরামবাবু একটু বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "আপনারা উদ্ধার করে। ভদ্রলোকটির দু'এক ঢোঁক জল পেটে গিয়েছিল আর কাপড়-জামা ভিজেছিল, এ ছাড়া তাঁর আর কিছুই হয় নি। বাড়ী গিয়ে এক কাপ গরম চা খাবার পর তিনি বেশ সুস্থই আছেন।

জজ-গিন্নী সামনেই বসে ছিলেন। একটু কানে কম শোনেন ব'লে এতক্ষণ আলোচনায় যোগ দিতে পারেন নি। করিম মাঝির কথা কানে যেতেই একেবারে জলদগম্ভীর নাদে বলে উঠলেন, "করিম—করিম মাঝি। রমা তোর মনে আছে, এই করিম সেবার চাটগাঁয় কর্ত্তার সঙ্গে কি রকম মুখোমুখি তর্ক করেছিল?"

রমা বাধা দিয়া বল্‌ল, "তোমার কিছু মনে থাকে না, মা। তার নাম তো গদাধর, না—না—গফুর। বাবা যখন পিরোজপুরে, তখন সেই লোকটা—"

"হাঁ গফুর না আরো কিছু। আমার পষ্ট মনে আছে চাটগাঁয় এই করিমই ব'লেছিল। দাঁড়া আমি বীণাকে জিজ্ঞেস ক'রছি—বীণা—"

সমস্ত হল্‌টা আওয়াজে গমগম করে উঠল। বীণা শেষের দিকে বসে ছিল। এসে সব শুনে বল্‌ল, "সে লোকটার নাম তো বিত্তাধর, হাঁ আমার বেশ মনে আছে। সেই তো

সঙ্গে সঙ্গে জজ-গিন্নী একেবারে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—ও মা আমার কি হবে···

শান্ত হন। ভদ্রলোকটি মারা যান নি। আমাদের কাল্পনিক ভদ্রলোকটির এ ঘটনায় কোনই ক্ষতি হয় নি।"

ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করবার জন্তে হেসে উচ্চকণ্ঠে পরে বললেন, "ওখানকারই একজন বীর যুবক, তার নাম করিম-মাঝি, অসমসাহসী, সে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভদ্রলোককে সেবার রাজসাহীতে বোটে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল। লোকটা বুঝি ছিপ ফেলে মাছ ধ'রছিল—সেবার সেই—"

আলোচনাটা ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে উঠল। অভিরামবাবু দেখলেন শ্রোত্রীমণ্ডলীর মধ্যে এ রকম গোলমাল আর কিছুক্ষণ চললে তাঁর বক্তৃতার বেশির ভাগই না-বলা থেকে যাবে।

তিনি ঘরোয়া ভাবের কথাবার্ত্তার ধরণ ছেড়ে বাঙ্গালা কংগ্রেসের জেনারেল মিটিং-এর বক্তার মত একেবারে গলা-ছেড়ে আরম্ভ করলেন, "আমি যে কথাটা আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম, সেটা হল এই যে, প্রত্যেক খবরের কাগজেই—"

মিসেস বিশ্বাস উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাশের গোলমাল থামানর মত সুরে বেশ জোর দিয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না অভিরাম বাবু, মানুষের আকস্মিক বিপদের কথা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা আমরা পছন্দ করি না। হতে পারে সবটাই কল্পনা, কিন্তু হিন্দু নারীর আদর্শ আপনি জানেন তো। মনে করুন, সত্যিই যদি কোন লোকের এই দুর্ঘটনায় ফলে মৃত্যু হ'ত! তা হ'লে—না, না, অভিরামবাবু এ আমরা সমর্থন করতে পারি নে।"

অভিরাম বাবু যথাসম্ভব শান্ত সুরে বললেন, "কথাটা ঠিক। আমার হয়তো গোড়াতেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, সে দিনের সেই ঝড়ে বরিশালের বা অন্য কোথাকার কোন লোক যদি নদীতে পড়ে থাকে, সেটা আমার সত্যিই জানা ছিল না, বা সে সম্বন্ধে আমার কিছুই বলবার উদ্দেশ্যও ছিল না, কিংবা সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি বা বাঙ্গালার মন্ত্রি-মণ্ডলী বেশি ঝড় হ'লে কোন লোক যাতে হঠাৎ নদীতে না পড়ে যায়, সেই রকম কোন বন্দোবস্ত করেন নি কেন বা করা উচিত ছিল কি না, তাও আমার বলবার কথা নয়। করিম মাঝি সেই ভদ্রলোকটিকে উদ্ধার না করে আর কোন লোক, সে মাঝি না হ'য়ে গোয়ালা বা টেররিষ্ট হ'লেও, আমার বক্তব্যের পক্ষে তা সমানই হ'য়ে দাঁড়াত। আপনাদের আপত্তির কারণটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।"

অভিরামবাবু দম নিতে থামলেন। সঙ্গে সঙ্গে জজ-গিন্নী একেবারে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—"ও মা অ মার কি হবে—টেররিষ্ট—কর্ত্তা তখনি আমাকে পই-পই করে বারণ করেছিলেন। ও—রে বীণা শীগ্‌গির বাইরে গিয়ে ড্রাই-ভারকে বল তাঁকে খবর দিতে—"

ভারত-গগনের সহকারী সম্পাদক আপত্তির ভঙ্গীতে হাত তুললেন, কিন্তু মিসেস্ বিশ্বাসের চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর আর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। কাগজপত্তরগুলো ব্যাগে ভরে নিয়ে সভা ত্যাগ করাই তিনি সঙ্গত মনে করলেন।

মিসেস্ বিশ্বাস উঠে বললেন—এবার সবাই চুপ কর। লোকটাকে দেখা অবধি আমার কেমন ভাল লাগছিল না। হাঁ—আজ তোমরা জার্ণালিজ্‌ম কিছু শিখলে। সামনের রবিবারে 'আধুনিক যন্ত্র-যুদ্ধ ও বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধ' সম্পর্কে ভারতীয় সৈন্যবিভাগের হাবিলদার শ্রীযুত গজানন পাঁড়ে তোমাদের কিছু বলবেন...

পুরুষ ও নারী

...মানুষের বিবিধ (অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত) বল অথবা সামর্থ্য বলিতে কি বুঝায় তদ্বিষয়ক দর্শনে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মূলতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ লইয়াই মানুষের অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর প্রাকৃতিক বল অথবা সামর্থ্য। পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই ঐ পাঁচটী-বিষয়ক বল অথবা সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু উহার কোন একটি বিষয়ে সমান ভাবে সাধনা করিলেও পুরুষ ও নারী এই উভয়েই ঠিক ঠিক সমান পরিমাণের সামর্থ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

শব্দ ও স্পর্শ-বিষয়ে সাধনানিরত হইলে পুরুষ ও নারী উভয়েই কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই দুইটি বিষয়ে পুরুষের পক্ষে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়, নারী কখনও ততদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় না।

সেইরূপ আবার রূপ, রস ও গন্ধ-বিষয়ে সাধনানিরত হইলে পুরুষ ও নারী উভয়েই অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু এই তিনটি বিষয়ে নারীর পক্ষে যতদূর উন্নতি লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়, পুরুষের পক্ষে ততদূর উন্নতি লাভ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

শব্দ ও স্পর্শ-বিষয়ক সাধনার ফলে অব্যক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করা সম্ভব হয়, আর রূপ, রস ও গন্ধ-বিষয়ক সাধনার ফলে ব্যক্ত বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিতে পারা যায়...

রাষ্ট্র-সংঘর্ষের পটভূমিকা

—শ্রীবিনয় দত্ত

বর্ত্তমান সভ্যতা রক্ষার জন্ত সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এ-সভ্যতার মূলে রহিয়াছে আধিপত্য বিস্তার, যুদ্ধ ইহার অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্য। যন্ত্র-সভ্যতার ইহাই পরিণতি।

১৯১৪ সালে আর একবার এমনি যুদ্ধ হয়। সে-যুদ্ধ জয়ের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সকলে ভাবিয়াছিল, যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখিয়া তাহার প্রতি পৃথিবীবাসীর বিতৃষ্ণা জন্মিবে; রাজত্ব-বিস্তারের যুদ্ধ বুঝি বা পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে। লীগ অব নেশনস্ আর ইউরোপীয় সাহিত্য কোমর বাঁধিয়া এই বিশ্বাসই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, যুদ্ধ শ্রেয়ও নয় প্রেয়ও নয়। নরমান এঞ্জেল দেখাইলেন যুদ্ধ করিয়া লাভ হয় না, লোক্শানই হয়।

সেই এঞ্জেল সাহেব আজ যুদ্ধের পক্ষে। সকল চিন্তাশীল লোক মাত্রেই যুদ্ধের পক্ষে। কেন?

যুদ্ধ না করিলে সভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। নাৎসি-বাদের মধ্য দিয়া যে সভ্যতার রূপ প্রকট, তাহা প্রিয় নয়, প্রেয় বা শ্রেয়ও নয়। তাহার উগ্র প্রকাশভঙ্গিকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্ত অনেকে সাবধান করিয়াছিল, যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ হয়ত তখন তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় নাই।

আজ যুদ্ধ না করিলে উপায় নাই। এ প্রকার স্বেচ্ছা-চারিতা সহ্য করা পাপ।

এ পর্য্যন্ত সকলই বুঝা যায়। যুদ্ধ এ অবস্থায় শ্রেয় এ কথা স্বীকারে লজ্জা নাই। নিজেকে রক্ষার চেয়েও নিজে যাহা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রিয় বলিয়া মনে করি, তাহার প্রতিষ্ঠায় জীবন দান মহৎ। সভ্যতা কেবল সাজ-পোষাকের কথা নয়, মনের কথা, আত্মার কথা, আমাদের সব কিছু আন্তর ঐশ্বর্য্যের কথা।

এই সভ্যতা রক্ষার জন্ত মানুষ সব সময় প্রাণ দিবে, যতক্ষণ মন্দিরে দেবতা আছেন। জাতির পতন হয় আন্তর ঐশ্বর্য্য হারাইলে, তখন জাতি অপর সভ্যতার আলোয় দেখিতে শিখে।

আমরা পরাধীন। আমরা দেখিতে শিখিয়াছি বিদেশী আলোতে। যে-আলো আমাদের চোখ ফুটাইয়াছে, তাহা নিবিয়া যাইবে ইহা কল্পনা করা যায়, কিন্তু হৃদয় তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। ডিমোক্রেসীর মৃত্যু আমাদেরও মৃত্যুর সূচনা এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য আমরা সারা ভারতবর্ষ নই, সারা বাংলাও নই। বাংলায় ইংরাজি শিক্ষার বেশী প্রচার না হইলেও মধ্যবিত্ত সমাজ এ-শিক্ষার মানুষ এবং এই মধ্যবিত্ত সমাজই এখন বাংলায় প্রাধান্য করিতেছে। আমরা মরিলে এ প্রাধান্য অন্য হাতে পড়িবে। ইংরাজি শিক্ষার ফলে শরীরে ও মনে ডিমোক্রেসীর বীজ যে-পরিমাণ শিকড় গাড়িয়াছে, সে-পরিমাণে এ যুদ্ধ আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা।

সমস্যার উত্তর আমাদের হাতে নাই। যন্ত্রসজ্জিত সেনাদল দু'পক্ষে ধ্বংসের কি তাণ্ডব সুরু করিবে তাহা অনুমান করিয়া ব্যথিত হইবার কারণ দেখি না। বহু প্রলয় পার হইয়া আসিয়াছি, আজও নিশ্চিহ্ন হয় নাই। ব্যষ্টির জন্ম-মৃত্যু সমষ্টির পথের ধুলা।

প্রশ্ন উদয় হয় এই যুদ্ধে জয়লাভের পরে পৃথিবী কি সত্যই ডিমোক্রেসীর অনুকূল হইবে, না, আবার নূতন কোন 'ইজম্', নূতন প্রলয়ের ইঙ্গিত দিবে।

উত্তর দিবার মত মালমশলা কাহারও নাই, কাজেই সকল উত্তরেই অনেক খানি অজানা ফাঁক থাকিবে। এ-দিক্ দিয়া আলোচনার সার্থকতা দেখি না।

মনে হয় সভ্যতার মূলে যে দোষ রহিয়াছে, তাহাই এই যুদ্ধের একটা বড় কারণ। তাহারই আলোচনায় ভাবী সভ্যতা-সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

যন্ত্র-সভ্যতার প্রকাশে যন্ত্রের উপকরণ চাই। বড় বড় কারখানা চলিতে পারে কারখানার খোরাক, কাঁচা-মালের আমদানী থাকিলে। এমন দেশ আছে যেখানে লোহা নাই—

এমন দেশ আছে যেখানে কয়লা নাই—এমন দেশ আছে যেখানে তেল নাই, পেট্রোল নাই, রবার নাই—সব দেশে সব কিছু থাকে না, থাকা সম্ভবও নহে। এক দেশের মাটিতে ভাল তুলা হয়, অন্য দেশের মাটিতে পাট জন্মায়। চা, কফি, যব সব দেশেই পাওয়া যায় না, অথচ এ সব না হইলে বর্ত্তমান সভ্যতা অচল হয়।

যে-সকল জিনিষ স্বদেশে পাওয়া যায় না, তাহা বিদেশ হইতে আসে। এই সনাতন রীতি—ব্যবসায়। সাধারণতঃ বিদেশী জিনিসের দাম হয় বেশী, আনিবার খরচ পড়ে বেশী। প্রাচীন কালেও ব্যবসায় ছিল। ভারতের পণ্য সুদূর রোমে রোমকদের বিলাসিতার উপকরণ জোগাইত। প্লিনি রাগ করিতেন, অপ্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্যের বিনিময়ে বিদেশে এত টাকা পাঠান কি রোমানদের যোগ্য? এমনি কত প্লিনি রাগ করিয়াছেন, তবুও বিলাস-দ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ হয় নাই। কারণ অবশ্য লাভের লোভ। অর্থের মোহ, মানুষের প্রকৃতি বলা চলে। কিন্তু সে-দিন বিদেশী পণ্য চলিত রাজা-রাজপুরুষদের মধ্যে, —অর্থবান্ ছাড়া কেহই বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিত না। দু একটি বড় শহর ছাড়া সমস্ত দেশের লোক ছিল গ্রামে। সেখানে চাষ-বাস করিয়া জীবন যাপন করা, রাজার প্রাপ্য ও দেবতার প্রাপ্য চুকাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বিদেশী পণ্যের প্রয়োজন ছিল না। তখনকার একটি গ্রাম এখনকার ন্যাশনাল ষ্টেট; সব কিছু স্বদেশে পাওয়া যাইবে, দরকারী জিনিসের জন্য বিদেশীর কাছে ব্যবসায়-সূত্রে হাত পাতাও নিষিদ্ধ। শহরের টাকাওয়ালা লোক বিদেশ হইতে জিনিস-পত্র আনিয়া নিজেদের বিলাসিতা চরিতার্থ করিবে তাহাতে গ্রামের কি ক্ষতি? কিছুই না। গ্রামের জীবন যেমন মন্দাক্রান্তা তালে চলিত, তেমনই চলিবে।

কিন্তু কারখানার পত্তনের পর হইতে ব্যাপারটা ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে। ধরা যাক কলিকাতার মত শহর। তাহার আশে-পাশেই কারখানা। কারখানায় কুলী-মজুর চাই। যে দেশে চাষবাসে আয় কম, সে দেশের লোক চাষবাসের দিকে বেশী নজর দিতে পারে না। সংসারের বড় ভাই হয় ত চাষবাস দেখিতে রহিল, অন্যরা কারখানায় কাজ নেয়। রোজগার না থাকিলে পেট চলিবে না। বাড়ি-ঘর বিদেশে, এদেশে আস্তানা গাড়িবার মত অর্থ উপার্জ্জন নাই। উপার্জ্জনের টাকা বাড়িতে পাঠাইতে হয়, কারণ দুর্দ্দিন লাগিয়া আছে, মহাজন গাঁয়ে পাকা বাসিন্দা। কারখানার কুলীর পক্ষে তাই বস্তিই একমাত্র গতি। গাঁ আর সহরের বস্তি স্বর্গ আর মর্ত্ত্য। তবুও থাকিতে হয়, কারণ জীবনধারণ করিবার অন্য কোন পথ নেই। এই কারখানা—যেমন ধরা যাক পাটকল—চলে গ্রাম হইতে পাট আনিয়া। ধানের চেয়েও পাটে বেশী লাভ হয়, চাষারা যেখানে পায়, যত পারে পাট করে। জুটমিল প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা পাট কিনিতে পারে না। লোক যায় গাঁয়ে গাঁয়ে, তাহারা চাষীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। চাষী সস্তায় পাট বিক্রয় করে; তাহার টাকা নাই, পাটও বেশী নাই যে, শহরে চালান দেয়। মহাজন পাট নানা চাষীর কাছ হইতে কিনিয়া এক চালানে শহরে আনে। কলিকাতায় সেই মাল পাঠান হয়। কিছু কলিকাতায় থাকে এ দেশের মিলের জন্যে, বাকী যায় বিদেশে। এক একটা মিল যেন এক একটি রাজত্ব, এত বড় ব্যাপার। এত কুলী সেখানে খাটে যে, ক্রমশঃ নানান গাঁয়ের, নানান নামের লোকগুলো ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়, কেবল থাকে কুলীর দল—সর্দ্দার কুলী। ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, থাকে সমষ্টির অস্তিত্ব।

ব্যক্তিত্বের বিলোপেই যন্ত্রসভ্যতার বৈশিষ্ট্য। গাঁয়ে লোকেরা কখনও নিজেদের গাঁয়ে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত হয় না—ভাগচাষী, বরগাদার, জনমজুর, ঠিকাচাষী নম্বরি কুলীর অবস্থায় পড়ে না। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত প্রীতি-শ্রদ্ধা-সহানুভূতির সৃষ্টি করে, সমষ্টির প্রতি এই সম্বন্ধ এখন আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়। যন্ত্রসভ্যতায় শ্রমিক-সমষ্টির কল্পনা তাই শ্রমিকের পক্ষে এত নিদারুণ। সমষ্টির উন্নতিপথে ব্যষ্টির স্বার্থ চূর্ণ হয়। সে জন্য কাহারও মনে কোন কাল দাগ পড়ে না। প্রতিদিন মানুষ যমের বাড়ি যায়, একদিন দু একটি বেশী কমে কি ক্ষতি বৃদ্ধি! ভবিষ্যৎ মানবজাতির উন্নতিকল্পে শ্রমিকশ্রেণীর সমগঠিত অভিযান আমাদের দেশেও পরিচিত।

এই ভবিষ্যৎটা কি? এখন যে ভাবে যন্ত্রশিল্প বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে থাকিবে কয়েকটি বড় বড় শহর আর অসংখ্য চাষের ক্ষেত। ট্র্যাক্টর সাহায্যে মাইলের পর মাইল চাষ হইবে, উৎপন্ন দ্রব্য লরি করিয়া রেল-ষ্টেশনে

বা সোজা শহরে আসিবে। সেখানে কারখানার অসংখ্য মজুর দ্বারা কাঁচামালকে বাজারের প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিণত করা হইবে। ব্যবসায়ী ক্যাপিটালিষ্ট এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী। লাভ প্রায় ষোল আনা তাহাদের। রাষ্ট্র যন্ত্র-সভ্যতার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলে এই লাভের ভাগাভাগি হইবে, রাষ্ট্র এবং শ্রমিক অংশীদার হইবেন। তফাৎ আপাতদৃষ্টিতে অনেকখানি মনে হইলেও মূলতঃ সামান্য, মাত্র অংশ-ভাগের ব্যবস্থায়। রাষ্ট্র এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবে না। পরিবর্ত্তন হইবে চাষীদের এবং ব্যবসাদারদের। চাষীরা আরও অর্থ উপার্জ্জন করিবে, ব্যবসাদাররা ইচ্ছামত লাভ করিবার সুযোগ হারাইবে। রাষ্ট্রের ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতাপ্রয়োগ বড় একটা হয় না। আজকাল জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের হার-নির্দ্দেশ সম্পর্কিত আইন এই ক্ষমতার প্রকাশ। সাধারণ মানুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যতক্ষণ না অন্যের কোন ক্ষতি হয়, এবং ঐ ক্ষতি স্বীকার করিতে অপর পক্ষ অঙ্গীকার করিলে রাষ্ট্রের বলিবার

[পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জনসাধারণের সমৃদ্ধি দেশজাত একটিমাত্র প্রধান রপ্তানীপণ্যের উপর নির্ভর করে। কোন্ দেশে শতকরা কতজন একটিমাত্র পণ্যের রপ্তানীর উপর নির্ভর করে এই মানচিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে. সাঙ্কেতিক চিহ্নের সঙ্কেত এইরূপ :—১। শতকরা ২০ জনের কম ; ২। শতকরা ২০ হইতে ৩০ জন ; ৪। শতকরা ৩০ হইতে ৪০ জন ; ৪। শতকরা ৪০ হইতে ৬০ জন ; ৫। শতকরা ৬০ হইতে ৭০ জন ; ৬। শতকরা ৭০ জন ও তদূর্দ্ধ। বিন্দুময় রেখাচিহ্নিত স্থানের মধ্যবর্ত্তী দেশগুলি তথাকথিত শিল্পপ্রধান দেশ। বিভিন্ন পণ্যরপ্তানীকারী দেশসমূহের প্রধান রপ্তানীপণ্য এই প্রকার :—ক্যানাডা, শস্য ; মেক্সিকো, তৈল ; কিউবা, চিনি ; গোয়াটেমালা, কফি ; সালভাডোর, কফি ; হণ্ডুরাস, কলা ; কষ্টারিকা, কফি ; পানামা, কলা ; ইকুয়াডোর, কোকো ; পেরু, তেল ; বলিভিয়া, টিন ; চিলি, নাইট্রেট ; ব্রেজিল, কফি, পারাগুয়ে, মাংস ; উরুগুয়ে পশম ; আর্জ্জেন্টাইন, শস্য, বেলজিয়ান কংগো, তামা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোনা ; মিশর, তুলা ; আয়রলণ্ড, মাংস ; নরওয়ে, মাছ ; সুইডেন, কাঠ ; ডেনমার্ক, ডেয়রী ; ফিনল্যাণ্ড, কাঠ ; লাটভিয়া, কাঠ ; এস্তোনিয়া, ডেয়ারী ; সোভিয়েট রুশ, গম, কাঠ ও তৈল ; রুমানিয়া, শস্য ; বুলগেরিয়া, তামাক ; গ্রীস, তামাক তুরস্ক, তামাক ; যুগোস্লোভিয়া, কাঠ ; ইরান, তৈল ; ভারতবর্ষ, তুলা, সিংহল, চা ; মালয়, রবার ; শ্যাম, চাউল ; ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, চিনি. অষ্ট্রেলিয়া, পশম ; নিউ জিল্যাণ্ড, ডেয়রী ; ফিলিপাইন, চিনি ; ফরাসী ইন্দো-চীন, চাউল ; ফরমোজা, চিনি ; চীন, রেশম ; জাপান, রেশম]

কিছু নাই—এরূপ ধারণা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আর বড় কেউ পোষণ করে না। রাষ্ট্রের ব্যক্তি-স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে। এ অবস্থায় লাভটা যদি ব্যবসাদারের হাত হইতে রাষ্ট্রের হাতে আসে, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। 'উপেনে'র এক বিঘা জমির প্রতি লোভ 'বাবু' মাত্রেরই আছে। এই লোভ অতি স্বাভাবিক, স্বামিত্বের প্রকাশ মাত্র।

বড় বড় শহরের কথা বলিলাম। ধরা যাক, এই প্রত্যেক বড় বড় শহর এক একটি রাষ্ট্রের রাজধানী। রাজধানীতে সমস্ত দেশের উৎপন্ন দ্রব্য আসিতেছে। কাঁচামাল কারখানায় চালানী জিনিসে রূপান্তরিত হইয়া বাহির হইতেছে। এখন প্রশ্ন, এক একটি রাজধানী এক একটি জাতির, এক জাতি অন্য জাতির সহিত কতদিন নির্ব্বিবাদে বাস করিবে? বাড়িতে বাপে-ছেলের ঝগড়া হয়, মায়ে-ছেলের বনাবনি হয় না, ভাই ভাইয়ের মুখদর্শন করে না, এ ত' অধুনা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গৃহে রক্তের সম্বন্ধ, একত্রবাসের নিবিড়তা কিছুই কাজে আসে না। গৃহ-বিবাদ মানুষের স্বভাব দাঁড়াইয়াছে।

জাতির মিল বড় দুর্ব্বোধ্য। কেবল রক্তের মিল নয়, আর্য্যরা এক নেশন এ কথা বলা যায় না। নেশনের সৃষ্টিতে বিভিন্ন রক্তের মিলন বিচিত্র নয়। আমেরিকা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নানা রেস-এর (race) লোক মিলিয়া এক এক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এ মিলন দৃঢ় নহে এ কথা বলিবার কারণ নাই। এক স্থানে থাকিলেই যে মিলন হইবে, একই ঐতিহ্যের অধিকারী হইলে মিলনের পথ সুগম হইবে, এ সব অনুমান মাত্র। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই জাতি বা নেশনের সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন হইলেও অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

অস্তিত্ব থাকিলেই তাহার ক্ষয়বৃদ্ধি আছে। আজকাল এই ক্ষয়বৃদ্ধিসম্পন্ন নেশনকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ আমাদের সকলের মত তাহারও স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে। পাশের বাড়ির মোটর বা ব্যাঙ্কের টাকা, অন্যের সামান্য সাফল্য আমাদের মনকে ক্লিষ্ট, বিচলিত করে। মনের মালিন্য, ক্লিষ্টতা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এক জাতি আমাদেরই মত অন্য জাতির সৌভাগ্যে জ্বলিয়া মরে, অন্যের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিবার ব্যগ্রতা তাহার স্বভাব। না থাকিলে লোভ, থাকিলেও লোভ। জার্ম্মানী ভার্সাই-সন্ধির পর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সবল হইবার চেষ্টায় যখন অন্য জাতিকে গ্রাস করিতে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা দেখি না, তখন এই সবল হইবার প্রবৃত্তির মূলে যে নির্লজ্জ লোভ তাহা পরিস্ফুট হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ায় গৃহশত্রুর ডাক পড়ে। তেমনি নেশনে নেশনে ঝগড়ায়ও গৃহশত্রুর নিকট সাহায্যভিক্ষা মনস্বিতার লক্ষণ। জারমান-রুষ চুক্তি, জাপান এবং রুশিয়ার মিতালীর কথা এই লোভেরই পরিণতি। খেসারত দিবার সময় বুঝা যাইবে আত্মঘাতী লোভের ফল।

জাতির স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ পায় রাষ্ট্রের মুখে। এক রাষ্ট্র তাই অন্য রাষ্ট্রের বিস্তারে বা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়। বন্ধু কখন শত্রু হয় কে বলিতে পারে? নিজের আত্মরক্ষার ক্ষমতাবৃদ্ধিই জীবনধারণের একমাত্র সম্বল। ব্যক্তির ঝগড়ায় রাষ্ট্র মধ্যস্থ হইতে পারে। আইন এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য। রাষ্ট্রের ঝগড়া কে থামাইবে? আমরা রাষ্ট্রের আইন না মানিয়া চলিলে, তাহার কথা না শুনিলে রাষ্ট্র শাস্তি দেয়। তাহার পুলিস আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। বাধা দিলে আমাদের শাস্তি দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে মশা মারার মতই সামান্য কার্য্য। আমরা দল করিয়া রাষ্ট্রের শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, রাষ্ট্র তখন সৈন্য দিয়া আমাদের বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য করিবে। মোট কথা রাষ্ট্রের সকল সময়ই ক্ষমতা আছে আমার তোমার শাসন করার।

কিন্তু রাষ্ট্রকে কে শাসন করিবে? কোন পুলিস নাই—পুলিস ডাকিবার লোকও নাই। রাষ্ট্রকে শাসন করার কোন উপায় নাই। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অত্যাচারে কাহাকে ডাকিবে? অন্য রাষ্ট্র গ্রাস করিলে কে তাহাকে রক্ষিত করিবে? কোন মহারাজা নাই রাষ্ট্রদের শাসন করে—অরাজকতাই রীতি।

যে রাষ্ট্র যত ক্ষমতাশালী তার স্বেচ্ছাচারিতা তত দুর্নিবার। বলবান্ রাষ্ট্রের পাশে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সর্ব্বদাই শঙ্কিত, কখন তাহার সামান্য জীবন শেষ হয়। চোখের পলক না পড়িতে মানচিত্রে ছোট ছোট রাষ্ট্রের জীবন-মৃত্যুর ইতিহাস লেখা হয়। অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া—এই আছে এই নাই। পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দুর মতই তাহাদের জীবন। স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব, জাতিগত ঐক্য যত

কথাই বলা হোক, সামান্য রাষ্ট্রের ইহাই পরিণতি, স্থির সম্ভাবনা।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহার মৃত্যুর কথাও উঠে। অমর রাষ্ট্রের ইতিহাস দেখি না। পুনর্জ্জন্ম দেখা যায়, কিন্তু মৃত্যু নিত্য। সামান্য রাষ্ট্র যেন টি. বি. রোগী, যক্ষ্মা —বহুদিন ধরিয়া জীবন ধারণ করিলেও প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা—শমন শিয়রে দাঁড়াইয়া।

শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথা স্বতন্ত্র। তাহার বিস্তার বট-বৃক্ষের মত। প্রতিদিন তাহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রতি দিন তাহার শিকড় মাটিতে আরও গভীর ভাবে প্রবেশ করে। মূল প্রতিদিন আরও শক্ত হয়, পরিধি বাড়ে। একদিন বহু বর্ষ পরে মৃত্যু ঘনাইয়া আসে, কাণ্ডটি হয়ত নষ্ট হয়, কিন্তু আবার নবজীবনের সূত্রপাত হয় মৃত্যুরই মধ্যে। বিরাট সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের ইতিহাস এমনই।

সামান্য রাষ্ট্র মৃত্যুর স্পর্শে সর্ব্বদাই শীতলাঙ্গ। চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ হইলেও তাহার কোন প্রখরতা নাই, সূর্য্যের অভাবে তাহার ঘনান্ধকার দূর করিবার কি উপায়? আশ্রিত হইয়াই তাহার জীবন।

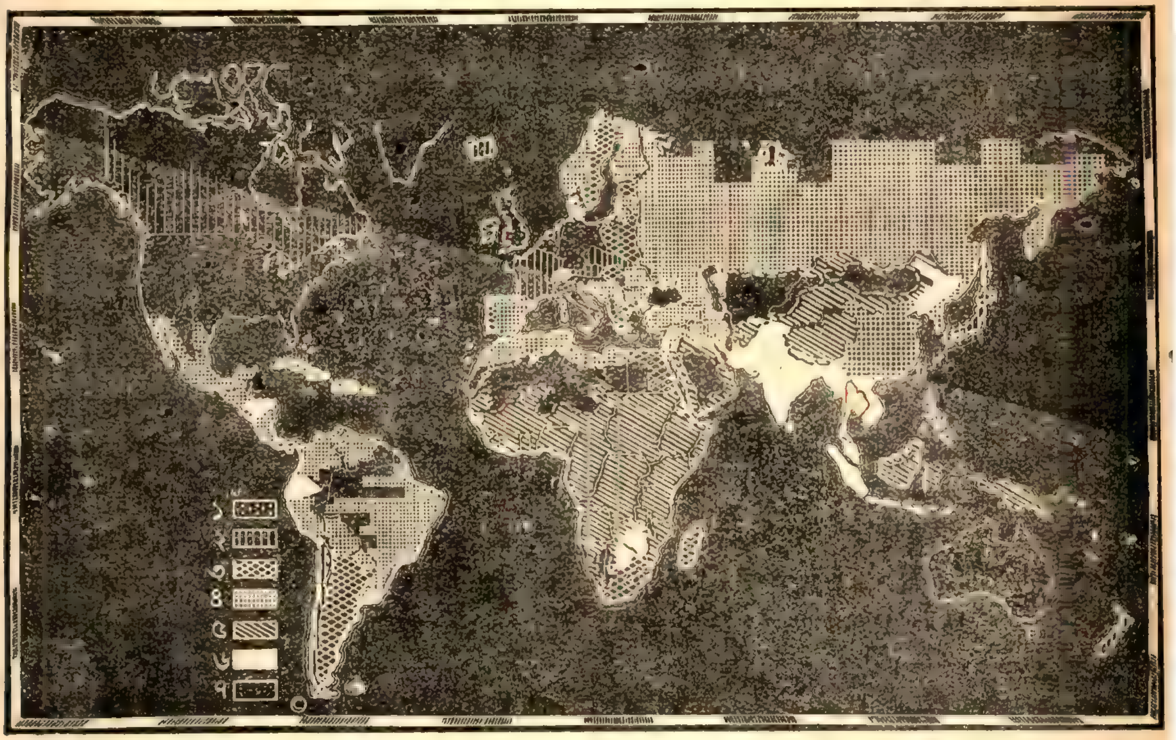

[জগতের অধিকাংশ অধিবাসী এখনও মূলতঃ গ্রামবাসী—শহরে যন্ত্র-সভ্যতাকে কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া ইহাদিকে বাঁচিতে হয়। এই মানচিত্রে বিভিন্নদেশে মোট জনসংখ্যার তুলনায় তথায় গ্রামাশ্রয়ী ব্যক্তির অনুপাত দেখান হইয়াছে।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের সঙ্কেত :—১। শতকরা ২০ হইতে ৪০ জন; ২। শতকরা ৪০ হইতে ৫৫ জন; ৩। শতকরা ৫৫ হইতে ৭০ জন; ৪। শতকরা ৭০ হইতে ৮৫ জন; ৫। তথাকথিত অসভ্য জাতিসমূহ; ৬। শতকরা ৮৫ জন ও তদূর্দ্ধ; ৭। যে সকল স্থানের অনুপাত পাওয়া যায় নাই বা মরুভূমি।]

মানুষ যেমন লোভী ও কপট, রাষ্ট্রও তেমন লোভী ও কপট। রক্ষক কবে ভক্ষক হইবে জানা কঠিন। না হইলেও হইবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রের লোভমুক্তি, নিঃস্বার্থতা লিগ অব নেশন্‌স্ অনেক শুনাইয়াছিল। সে সব

শুভেচ্ছা। বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে আজ সে সকল কল্পনাই ছিন্ন-ভিন্ন। লোভী রাষ্ট্র কপট রাষ্ট্রশক্তির ভারকেন্দ্র সরাইয়া দিয়াছে। অশান্তি আজ পৃথিবীব্যাপী।

রাষ্ট্রগঠনমূলে এই লোভ, এই কপটতার দৃঢ় ভিত্তি। ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্র লোভী হইবে, আত্মরক্ষার্থে কপট হইবে, আত্মবিস্তারের জন্য সকল ছলের আশ্রয় লইবে। ভাবিয়া দেখিলে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আত্মকেন্দ্রী জীবন স্বার্থের আঘাতে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে, লোভ তাহার নিত্য সহচর। যেমন মানুষ তেমনি রাষ্ট্র।

ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, রাষ্ট্র মানুষের দোষের স্পর্শে কলঙ্কিত হয় না। তাহার পৃথক্ সত্তায় মানুষের দৈন্য-দুর্ব্বলতার স্থান নাই। সমষ্টির ব্যক্তিত্বে ব্যক্তির স্থান কোথায় বা কতখানি—এসব কঠিন প্রশ্ন। উত্তর আজ পর্য্যন্তও ঠিক মত দেওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তির দোষ পরিহার করিয়া সমষ্টির কল্পনা দুষ্ট। রাষ্ট্রের সত্তার কল্পনায় মানুষের স্বভাবজ অপরিপূর্ণতা থাকিবে না ইহা আকাশ-কুসুম মাত্র।

বর্ত্তমান ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্র কখন লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিয়া শান্ত হয় নাই। চীন গ্রাস করিলে শান্ত থাকিবে একথা কেবল অনুমান মাত্র। তাহার দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি এশিয়ার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন। অনুমান সত্য হইতে পারে—লোভের সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

আজ যদি চীন জাপানকে তাড়াইতে পারে, কাল শক্তিশালী হইলে তাহার দৃষ্টি কোথায় পড়িবে কে বলিতে পারে? মাঞ্চুরিয়া ফিরিয়া চাহিবে না, মঙ্গোলীয়ায় তাহার প্রয়োজন নাই, কোরীয়ায় জাপানের অধিকার থাকিবে। এসব শক্তিশালী চীনের কথা নয়।

সবল রাষ্ট্র দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে, সুবিধা পাইলেই তাহাকে গ্রাস করিবে। দুর্ব্বল রাষ্ট্র সবল হইলে পররাষ্ট্রের প্রতি লোভ-দৃষ্টি দিবে। শান্তি বা সমতা নাই। ক্ষণকালের জন্য আংশিক বিরতি শান্তির আভাস দিলেও ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্রের কল্পনায় শান্তির স্থান নাই। তাহার ক্ষয় ও বৃদ্ধি যুদ্ধেরই ইঙ্গিত। পররাষ্ট্র সাক্ষাৎভাবে বা অসাক্ষাতে গ্রাস করাই তাহার ধর্ম্ম। সাক্ষাৎ গ্রাসের উপায় যুদ্ধ। অসাক্ষাৎ গ্রাসের রীতি তাহার কাঁচা-মাল কম দরে গ্রহণ করিয়া ঐ কাঁচা-মাল হইতে তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার। ইহা ইকনমিক বা অর্থনৈতিক যুদ্ধ।

ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরভুক্। পরিণতি অনিবার্য্য পতন বা শ্রেষ্ঠত্ব। বহু রাজাকে বিনাশ করিয়া এক ধর্ম্মাশোকের প্রতিষ্ঠা। বহু রাষ্ট্রকে গ্রাস করিয়াই এক প্রবল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। যতদিন এক রাষ্ট্র এইরূপে অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা শতগুণে বলবান্ না হয় ততদিন প্রতিক্ষণ যুদ্ধের ও ধ্বংসের আশঙ্কা প্রবল। বলবান্ হইতে হইলে অযথা যে শক্তি ব্যয় করিতে হয় তাহাতে রাষ্ট্রের জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, জাতির জীবনীশক্তির ক্ষয় হয়, আন্তর ঐশ্বর্য্য মলিন হয়। সভ্যতার এই মালিন্য বর্ত্তমান যুগের অভিশাপ। ইচ্ছা না থাকিলেও কোটী কোটী টাকা যুদ্ধের উপকরণ ও প্রচার-কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। জাতির মঙ্গলকামনা স্থগিত রাখিয়া রাষ্ট্র কেবলই শত্রুর আক্রমণ-আশঙ্কায় নিজেকে সুরক্ষিত করিতে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিবে। না করিয়া উপায় কি! শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা নাই, এ কথা কোন এক বিশেষ সময়ের পক্ষে সত্য হইলেও শত্রুতার সম্ভাবনা অত্যন্ত সত্য এবং চির-মিত্রতা স্বপ্ন। এ অবস্থায় নিজের আত্মরক্ষা-ক্ষমতা না বাড়াইলে হঠাৎ আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ এতই বেশী হইতে পারে যে, আত্মরক্ষার হয়ত কোন সামর্থ্যই থাকিবে না। এ জন্য সশস্ত্র থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু জাতি কতকাল এই আগুনের সহিত খেলা করিবে? মন লোভের স্পর্শে জ্বলিয়া যায়, ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়, ভয়ে গতিবেগ হারায়। জাতি ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়।

রাষ্ট্রের মৃত্যু, নয় জাতির মৃত্যু,—সভ্যতার মৃত্যু। আসন্ন সমরাগ্নি চিত্তে যে অস্থিরতা আনে তাহা ক্রমশঃ মনকে পঙ্গু করে। শরীরের বিশেষ একটি অঙ্গেই বারবার সামান্য আঘাত কিছুকাল পরে অসহ্য হয়। ক্রমাগত যুদ্ধের চিন্তা ক্রমশঃ মানুষের অন্য চিন্তাকে গ্রাস করে, যুদ্ধ ক্রমশঃ অপ্রিয় বলিয়া মনে হয় না, বরং শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া ধারণা হয়। ক্রমাগত এক চিন্তা মানুষকে ক্রমাগত এক কাজের মত নির্জ্জীব করিয়া তুলে; ইহাই মৃত্যু।

ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিক্ষণ এই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়।

যে দিক্ দিয়াই দেখি—এই ধ্বংস, এই মৃত্যু এড়াইবার

'সমুদ্রে ভাসমান মাণিক' আখ্যাত
সুপ্রসিদ্ধ কাপ্রি দ্বীপের
পুষ্পশোভিত নিসর্গদৃশ্য

—

ব্লু-গ্রোটো এবং প্রাচীন রোমক
সাম্রাজ্যের পুরাতন নিদর্শন স্বরূপ
প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ
এই দ্বীপে প্রচুর।

'চির-বসন্তের রাজ্য' বলিয়া কথিত
তায়োরমিনা (ইতালী) হইতে
তুষারাবৃত প্রভাতকিরণ-সমুজ্জ্বল
মাউণ্ট এত্না
(সিসিলি)।

উপায় নাই। ইহা সময়সাপেক্ষ মাত্র। ফল একই—প্রকাশে সময়ের পার্থক্য হইতে পারে। রাষ্ট্রের জীবনে শান্তি নাই, শান্তি আসিলে তাহা ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মত কখন মিলাইবে কে বলিবে?

বর্ত্তমান সভ্যতা এই কারণেই অন্তঃসারশূন্য। তাহার গুণগুলির সম্যক্ পরিণতি এ অবস্থায় সম্ভব নয়। পররাষ্ট্রের বিঘ্ন হইতে আত্মরক্ষা তাহাকে করিতেই হইবে। নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায় তাহার আত্মিক ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি কল্পনা মাত্র।

ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার বিফলতার কারণ। ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্রে এই কারণ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

মুক্তি আসিতে পারে একরাটত্বে। অন্য সকল রাষ্ট্রকে গ্রাস করিয়া এক সুবৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায়। তাহাতেও বিঘ্ন আছে সেই বিরাট রাষ্ট্রে গৃহ-বিবাদ কে রোধ করিবে? সমস্যা সমাধানের কোন সহজ উপায় দেখা যায় না।

অন্যদিকে পল্লী-সভ্যতার এখনও ধ্বংস হয় নাই। যন্ত্র-শিল্পের প্রচারে পল্লীর আত্মনির্ভরতা ঘুচিয়াছে, কিন্তু কাঁচা-মালের প্রয়োজন আছে, সে জন্য পল্লীও রহিয়াছে। এখনকার পল্লীতে ফসল হয় জীবনধারণের জন্য নহে, যন্ত্রীর এবং যন্ত্রের খোরাক যোগাইতে—যেমন বাংলার পাট, মিশরের তুলা, সিংহল এবং বাঙ্গালার চা, ক্যানাডার গম ইত্যাদি। যে দিন বিদেশে পাট কেনা বন্ধ হইবে সে দিন বাঙ্গলার চাষীর দুরবস্থা। ধান বিক্রয় না হইলেও তাহা খাদ্য বলিয়া নষ্ট করিতে হয় না। অপচয়ের সম্ভাবনা কম। অর্থ কম পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিরন্ন হইবার সমস্যা ওঠে না। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে অনেক দেশ কেবল এক শস্য উৎপাদন করে। হয়ত এই ব্যবস্থা চলিতে পারিত, কিন্তু ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্র এই প্রকার আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন-বিরোধী। লাভের অংশ লইয়াই বিরোধ; এক রাষ্ট্র যাহাতে অন্য রাষ্ট্রের সহিত লেন-দেনে সবল না হয়, তাহার প্রতি সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টি। যুদ্ধের সম্ভাবনায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি স্বদেশে উৎপন্ন করিবার বিপুল চেষ্টা। মোট কথা এই শস্য-উৎপন্নকারী দেশগুলির জীবন ঘনাইয়া আসিয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইহারা সামান্য বা আশ্রিত রাষ্ট্র। মুরুব্বী রাষ্ট্রের অপ্রতিহত অধিকার আশ্রিত রাষ্ট্রের উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় কি ভাবে কি দামে বিক্রয় হইবে এবং যুদ্ধের সময় তাহা শত্রুর হস্তে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করায়। ফলে ইহাদের সমৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী। আশ্রয়দাতার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইহাদেরও ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। সুফলা বলিয়া এক আশ্রয়দাতার বিয়োগে অন্য এক আশ্রয়-দাতা আসে, এই যা তফাৎ।

আশ্চর্য্য এই, যন্ত্র-সভ্যতা এখনও পৃথিবীর সামান্য অংশ জুড়িয়া মাত্র দেখা দিয়াছে; ইহাতেই এত অনাসৃষ্টি। আমেরিকার কিছু এবং ইউরোপের পশ্চিমভাগ, এখানেই প্রকৃত যন্ত্র-সভ্যতার ঘাঁটি। বাকী পৃথিবী এখনও চষী। যন্ত্র-সভ্যতার খোরাক যোগাইতে এখন ইহারা ব্যস্ত।

যুদ্ধ যখন যন্ত্র-সভ্যতার নিত্য-সহচর, তখন যুদ্ধ এড়াইতে হইলে পল্লী-সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের জীবন ক্রমাগত যন্ত্র-সভ্যতার চাপে পিষ্ট হইতেছে। পরমুখী জীবন প্রভুর অস্থির সৌভাগ্যে সর্ব্বদাই বিচলিত। এ অবস্থা বেশীদিন চলিলে আমাদের পুরাতন ঐতিহ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

এই পুরাতন ঐতিহ্য পল্লী-সভ্যতার। এখনও রাষ্ট্র যন্ত্র-সভ্যতার খোরাক হিসাবে কৃষিপ্রধান দেশগুলিকে ব্যবহার না করিলে পল্লী-সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব এ কথা বলা যায় না। পৃথিবীতে এখনও পল্লীবাসী জনবলে ও স্থানবলে প্রবল। রাষ্ট্র যন্ত্র-সভ্যতার পরিপোষক বলিয়াই পল্লীর এই পরমুখাপেক্ষিতা।

সভ্যতার জন্য যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহার ফলাফল এখন অনুমানসাপেক্ষ। ফলে পল্লী-সভ্যতা যেন লোপ না পায়, ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। স্বাবলম্বী জীবন পল্লী-সভ্যতায় সম্ভব। সভ্যতার প্রাণ তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদে, জনবলে নহে, সৈন্যসম্পদে নহে, অর্থের প্রাচুর্য্যেও নহে। যন্ত্র-সভ্যতা এই আন্তর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির প্রতিকূল। ন্যাশনালিষ্ট রাষ্ট্র আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার লইয়াই থাকিবে, সময় কোথায় তাহার আত্মানুসন্ধানে। প্রাচীন ভারত বেদ ও উপনিষদ রচনা করিয়াছিল। প্রাচীন চীন কন-ফুসিয়াসের জন্মদাতা। প্যালেষ্টাইনে হেরডের অত্যাচারেও যীশুর ধর্ম্ম-প্রচার সম্ভব।

অর্থ তখন কাম্য হইলেও একান্ত প্রয়োজনীয় হয় নাই। জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল সরল সহজ। অসহনীয় দুঃখ

অমানুষিক অত্যাচার সকলই ছিল। কিন্তু জীবন-ধারণের সমস্যা এত ঘোরাল হয় নাই। হয়ত নিত্য মৃত্যুস্রোতে ভাসমান মানব-জীবনের ক্ষণিক চাঞ্চল্য আজিকার মত সেদিন মনস্বীদের মায়ামুগ্ধ করে নাই। এই অনিত্যতার বার্ত্তা সে-দিন জীবনকে যে লাবণ্যমণ্ডিত করিয়াছিল, আজিকার ইতিহাসে তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। জাতি সেদিন মরিতে জানিত, মৃত্যু মানবধর্ম্মী মাত্রেরই অবশ্য-সম্ভবনীয় পরিণতি। মৃত্যুর কলঙ্কস্পর্শের বাহিরে মনের জীবন—দেহের নহে। মনের সমৃদ্ধিই জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে, অস্ত্রশস্ত্র, অট্টালিকা সকলই কালের গর্ভে বিলীন হয়, হয় না মানুষের মনের রাজ্য। মানুষের এই অবিনাশী সম্পদ্ কত না জাতির সাধনার স্মৃতি বহন করিতেছে। সভ্যতা এই মানস-সম্পদের ইতিহাস। এখনও পল্লী-সভ্যতার দান ইহার সকল কক্ষ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। যন্ত্র-সভ্যতা প্রথম হইতে বহির্ম্মুখী। ব্যবহারিক সত্যই তাহার সম্বল। তাই আন্তর জগতের সত্যগুলি তাহার চিত্ত স্পর্শ করে নাই। অনির্ব্বাণ কামনার অগ্নি তাহার জীবনে মালিন্য আনিয়াছে, দুর্নিবার লোভ মনের সকল সম্পদ্‌কে অর্থগ্রস্ত করিবার জন্য কি বিরাট্ পরিশ্রম করিতেছে। মৃত্যু স্থির জানিয়াও সামান্য দংশনে কাতর হইয়া বিলাপ তাহার প্রথা। জরার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চিরযৌবন-লাভের প্রয়াসে তাহার সাধনা অতুলনীয়। কিন্তু মন পঙ্গু।

অথচ অনিত্য সংসারে এই মনের গতিই নিত্য। যন্ত্র-সভ্যতায় এই মনের গতি ক্রমশঃ পঙ্গু হইতেছে। মন কেবল ব্যবহারিক জগৎ লইয়াই এখন ব্যতিব্যস্ত। তাহার দৃষ্টি ক্ষীণ ও দীপ্তি নিষ্প্রভ। পল্লী-সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় মনের এই বন্ধন মুক্ত হইবে। মানুষ তাহার একমাত্র গৌরব বিচার-শক্তির অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া দেহজ সুখ-দুঃখের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। এক মহাযুদ্ধ তাহাকে চৈতন্য দিতে পারে নাই। কে জানে অন্য এক মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে, এদিকে দৃষ্টি পড়িবে কি না। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন যে-দিন বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করিবে, সে-দিন যেন আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা, সভ্যতার সঙ্কটের কথা নেতাদের চিত্তে উদয় হয়। যন্ত্র-সভ্যতার দুঃখের হাত হইতে ভারত পরিত্রাণ পাইতে পারে। পল্লী-সভ্যতার উপযোগিতার কথা বিচার করা এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভাবী সভ্যতা যেন না চক্ষু বুজিয়া গ্রহণ করি। আত্ম-বিশ্লেষণের সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাহার প্রতিষ্ঠাই বাঞ্ছনীয়।

স্বাধীনতা

...আজকাল, কোন দেশ যখন একমাত্র নিজ দেশের মানুষের দ্বারা শাসিত হয়, তখন ঐ দেশকে স্বাধীন বলা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ চাকুরীজীবী, পরমুখাপেক্ষী অথবা পরাধীন হইলেও স্বাধীনতার আধুনিক সংজ্ঞানুসারে ঐ উপরোক্ত দেশকে স্বাধীন বলিয়া আখ্যাত করিতে আজকাল রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ কোন সঙ্কোচ অথবা কুণ্ঠা বোধ করেন না। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা এখন আর স্বাধীনতা কথাটির ব্যবহার হইতে উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

দুই হাজার বৎসরের আগেকার গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এখন যে অর্থে স্বাধীনতা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তখন ঐ অর্থে উহা ব্যবহৃত হইত না, এবং যে দিন হইতে মানুষ স্বাধীনতা শব্দটি বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মানুষের পশুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ স্বাধীনতার আধুনিক অর্থানুসারে মানুষ নরশোণিতলোলুপ হইলেও বীরপদবাচ্য হইয়া সুখ্যাতির যোগ্য হইতে পারে। নরশোণিতলোলুপতা কি পশুত্ব নহে?...

ভামতী

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১

রমণী হইয়া জননী না হ'লে
তাহার জনম মিছে।
বন্ধ্যার পাপ সকলেই কয়
আমি সকলের নীচে॥

বহু সাধনায় শিবের সমান
পেয়েছি এমন পতি।
বিঘ্ন না হ'য়ে দূরে থাকি তাঁর
সেবা করি যথা মতি॥

গেছে যৌবন জীবনের আর
আছে কতটুকু বাকি।
কতদিন আর মিছে আশা দিয়ে
মনেরে বুঝায়ে রাখি॥

না ডাকিলে তিনি এতদিন পরে
কেমনে যাইব আজ।
কাজে বাধা দিতে ভয় হয় আর
মনে বড় বাসি লাজ॥

যে হয় ঘটিবে করিব সাহস
আজি ডাকিবার তরে।
সারা রজনীর প্রদীপে তাঁহার
দিব তেল কম করে॥

হবে না কি আশা সফল আমার?
এত ভাবি মনে মনে।
দুয়ারের পাশে রহিলা বসিয়া
ভামতী সাঙ্গোপনে॥

২

স্তব্ধ নিশীথ জ্বলিতেছে দীপ
নির্জ্জন গৃহ অতি।
লিখিছেন টীকা বসি একমনে।
মিশ্র বাচস্পতি॥

ঝিল্লীর রব না পশে সেথায়
না আসে চাঁদের হাসি।
সমুখে দু'পাশে রয়েছে কেবল
পুস্তক রাশি রাশি॥

ভূতলে পাতিত শয়ন প্রান্তে
পড়ে আছে উপাধান।
কি যেন কঠিন ভাষ্য পদের
করিতে সু-সমাধান—

ভাবিছেন তিনি বসি যোগাসনে
অর্দ্ধ মীলিত আঁখি।
গভীর রজনী জানা'ল সহসা
কাননে ডাকিয়া পাখী॥

গভীর আঁধার তত্ত্বের পথে
উজ্জ্বল আলোক পেয়ে,
বিকসিত মুখে লেখনী আনিতে
সহসা দেখেন চেয়ে—

দীপ নেব' নেব' বিস্ময় ভরে
ভাবিতে লাগিল এ কি !
দীপের এ দশা হয়নি ত কভু
এমন ত কত দেখি ॥

'দীপ নিবে যায় কে আছ' বলিয়া
বসিয়া রহিল তথা ।
ললাট-রেখায় ফুটিয়া উঠিল
বহু ভাবনার কথা ।

৩

সহসা প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল
স্নেহের পরশ পেয়ে ।
শান্ত নয়নে তুলিয়া বদন
মিশ্র দেখেন চেয়ে—

দাঁড়ায়ে রমণী আছে একাকিনী
সহজ সরল বেশ ।
দীপের আলোক তবু রূপে তার
যেন ম্লান সবিশেষ ॥

বিকারবিহীন মিশ্র তখন
চাহি' মুখপানে তার ।
শুধালেন ধীরে 'কে তুমি, তোমারে
দেখি নি ত কভু আর ॥'

'সহধর্ম্মিণী বাচস্পতির
এই শুধু লোকে কয়'
কহিলা রমণী অতি ধীরে ধীরে
'আর নাহি পরিচয়' ॥

'লোকে কয় শুধু । তুমি কি জান না
আমি যে তোমার পতি ।'
মুখপানে পুন চাহিয়া বিস্ময়ে
কহিলা বাচস্পতি ॥

'কেমনে জানিব কি আছে আমার'
ভামতী বলিলা ধীরে ।
বিষয়বিমুখ মিশ্র তখন
পুছিলা তাহারে ফিরে ॥

'কুলবধূগণ আছে ঘরে ঘরে
সবে চেনে নিজ পতি ।
পরিচয় হেতু কি আছে অধিক
তাহা ত জানি না সতি' ॥

'আছে তাহাদের দম্পতি ভাব
বুঝিতে জানা'তে পরে
তনয় তনয়া' বলিতে বহিল
নিঃশ্বাস বেগভরে ॥

লজ্জাজড়িত নীরব কণ্ঠে
দাঁড়ায়ে রহিলা সতি ।
সহসা কি যেন ভাবি মনে মনে
উঠিলা বাচস্পতি ॥

বাম বাহু পাশে বাঁধিয়া তাহারে
কহিলা চিবুক ধরি –
'শুধু এই সাধ হইয়াছে শেষে
এতকাল সেবা করি ? ॥'

যে পুঁথি এখন রচিতেছি আমি
ধরিয়া তোমার নাম ।
পরিচয় তব করিবে অমর
পূরিবে মনস্কাম ॥

গণৎকার

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাড়ীর ছেলে অ, আ, ক, খ, লিখিতে শিখিয়াছে। দেয়ালে ক খ, মেঝের ক খ, বালিসে ক খ, ভাতের থালায় ক খ;—কয়লার আঁচড়ে, খড়ির দাগে, শ্লেট পেন্সিলে, উড পেন্সিলে, নখের টানে—যেখানে যেটি মানায়। গৃহস্থ বিপন্ন, সামাল সামাল রব পড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু বিপন্ন কি শুধু গৃহস্থই? ছেলেটির দিক্‌ দিয়াও ত ভাবিয়া দেখা উচিত একবার। নবার্জ্জিত বিদ্যার ভারে সে বেচারারও যে ভারসাম্য বিচলিত হইতে বসিয়াছে, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? দুগ্ধপোষ্য শিশু মাঝে মাঝে এ দুর্ব্বহ বোঝা নামাইয়া একটু দম না লইলে তাহার চলে কেমন করিয়া? আর শুধু শিশু বেচারাই কি এত দোষ করিয়াছে? বিদ্যার এক অবস্থায় এই-মোক্ষম চাপের অভিজ্ঞতা কি আমাদের নিজেদেরই নাই? চুণোপুঁটিদের ছাড়িয়া লাহিড়ী মহাশয়ের কথাই ধরা যাক।

আমাদের জ্ঞান লাহিড়ী। বিদ্যার জাহাজ, তিনটা বিষয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ, তাহার উপর ডি-এস-সি। প্রফেসর হিসাবে সারা দেশটার কয়টা লোকই বা তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে পারে? বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সম্বন্ধে কবে একটা প্রবন্ধ দিবেন, দেশ-বিদেশের পত্রিকার সম্পাদকেরা হাঁ করিয়া আছে। প্রবীণ মনীষী ব্যক্তি কলেজের লেকচার-রুমেই প্রবেশ করুন, বা কোন বিদ্বৎ-সভায়ই যান, প্রজ্ঞার একটি অলক্ষ্য জ্যোতি যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। সমস্ত জায়গাটিতে ছাইয়া পড়ে একটা থমথমে গাম্ভীর্য্যের ভাব।

কিন্তু এ জ্ঞানের চাপের কথা বলিতেছি না। কেন না এর গুরুত্ব বাহিরে যতটা অনুমিত হয় স্বয়ং লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে তার শতাংশের একাংশও হয় না। নিঃশ্বাসবায়ুর মতই এটা তাঁহার জীবনে সহজ হইয়া গিয়াছে।

শিশুর কথা অবতারণা করিয়াছি লাহিড়ী মহাশয়ের নবার্জ্জিত বিদ্যার প্রসঙ্গে। তিনি কিছুদিন হইতে সামুদ্রিক বিদ্যা শিখিতেছেন—অর্থাৎ হাত দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা। অবিকল শিশুর মতই ব্যাপার।

লাহিড়ী মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর বারান্দায় সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই ডানদিকের গোল থামটিতে লক্ষ্য করিলে এবং লক্ষ্য না করিলেও দেখিবেন পেন্সিল দিয়া একখানি মানুষের করতল আঁকা, মধ্যে সোজা, তির্য্যক্‌ অনেকগুলি সুস্পষ্ট রেখা। প্রথমে মনে হইবে কোন শিশুর কীর্ত্তি, গৃহের প্রবেশ-পথেই কি ভাবিয়া প্রহারের প্রহরী বসাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিবেন করতলটির পাশে ছোট বড় নানা আকারের নানা রকম অঙ্ক—যোগ,-বিয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া রেখাগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি নানারকম দুরূহ কাণ্ড।

জিনিসটা লাহিড়ী মহাশয়ের হাতের ক-খ। হয় ত কোন দিন কলেজে যাইবার সময় অন্যমনস্ক হইয়া বিদ্যার ভার থামের গায়ে নামাইয়া গেছেন—গুরুভার না নামাইয়া আর পাদমপি চলিতে পারেন নাই।

আপনি বোধ হয় উঠিয়া গিয়া বারান্দার গোল টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ তুলিয়া লইলেন। প্রথমেই নবীনতম সংবাদটির জন্য "ষ্টপ প্রেস"এর স্তম্ভটির উপর নজর ফেলিলেন। দেখেন সেই থামের হাত, পাশে যোগচিহ্নের মত ঢেরা-কাটা নক্‌সা, তাহার উর্দ্ধে নীচে দুই পাশে রাশিচক্রের বিচিত্র নাম সব—কর্কট, মিথুন, তুলা, তাহার নীচে সেই রকম দুর্ব্বোধ্য হিসাব।

অন্তঃপুরে আপনার প্রবেশ নাই, নতুবা দেখিতেন সামুদ্রিক বিদ্যার জোয়ার ঘরের আসবাবপত্র, এমন কি মাথার বালিস পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এক দিন গভীর রাত্রে লাহিড়ী মহাশয় গৃহিণীর ঘুমন্ত পিঠে পর্য্যন্ত করকোষ্ঠীর ছক আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া যে বাড়ীতে একটা আধ-চাপা প্রবাদ আছে তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলিতে পারি না।

অন্য বিদ্যা সম্বন্ধে ঝঞ্ঝাট বিস্তর, প্রথম বই কিনুন বা অন্য উপায়ে জোগাড় করুন, আহৃত বই রাখিবার হাঙ্গাম

আছে, আলমারি, র‍্যাক, বুককেস, টেবিলে যা হয় একটা; যথাস্থান হইতে লওয়া, পড়িয়া আবার যথাস্থানে রাখা, আবার সেই যথাস্থান হইতে কার্য্যগতিকে যদি দূরে রহিলেন ত' বিদ্যাও তৎকালের জন্য ধামা-চাপা রহিল।

এ বিদ্যায় ও-ধরণের বখেরা খুবই অল্প, কেন না প্রত্যেকটি মানুষ—ছেলে হোক, বুড়া হোক, যুবা বা প্রৌঢ় হোক, স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক—এ শাস্ত্রের দুইখানি পুস্তক সর্ব্বদাই দুই পাশে লটকাইয়া ঘুরাফিরা করিতেছে। শুধু একবার সঙ্কোচ কাটাইয়া চাহিয়া লওয়া; দোকানে হোক, ট্রামে হোক, বাসে হোক, খেলার মাঠে হোক, ষ্টীমার-ঘাটে হোক। এই রকম ধরণের একটা বার্ত্তালাপ—

"ইস্! আপনার যশোরেখাটা!...খুব বিশিষ্ট কি না, নজর পড়তেই চোখ আটকে গেল।"

"জানেন না কি সামুদ্রিক বিদ্যা আপনি?"

"জানি তা বলতে পারি না, কেন না সমুদ্রের মতই অতল তবে কৌতূহল আছে।...দেখতে পারি কি হাতটা?—খুব রিমার্কেবল কয়েকটা বিষয়ে...আপত্তি যদি না থাকে ত..."

"নাঃ, আপত্তি আর কি, কিই বা আমার যাবে আসবে তবে, মাফ করবেন, খুব বিশ্বাস নেই জিনিসটায়..."

বিশ্বাস নাই বলিয়া যে আপনি হাতটা পাইবেন না এমন নয়, কেন না বিধাতা হস্ত বা ললাট যেখানেই হোক এমন একটা রেখা বসাইয়া দিয়াছেন যে, বিশ্বাস না করিলেও অদৃষ্ট সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যাহা কিছু হোক শুনিবার জন্য মানুষ সর্ব্বদা উন্মুখ।...এই অদ্ভুত উন্মুখতার লজ্জা ঢাকা দিবার জন্য সে হাতটা বাড়াইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে "দেখুন, তবে বিশ্বাস করতে মন যায় না।"

ওদিকে আঁকর কাটা আর এদিকে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্রই ইতরভদ্র সকলের হস্ত পরীক্ষা করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নূতনলব্ধ বিদ্যায় আর মরিচা পড়িতেছে না। আর সর্ব্বদাই শান-পড়া অস্ত্রের মত উৎকট ভাবে পরীক্ষোন্মুখ।

বাড়ির সব হাত মুখস্থ, পাড়ারও প্রায় সব হাতেরই পাঠোদ্ধার হইয়া গিয়াছে। যশের ফাঁশ নানা রংবেরঙের দূরের হাত সমস্ত আকৃষ্ট করিয়া হাজির করিতেছে। এত সব ব্যাপারের মাঝে কিন্তু একটা মস্ত বড় ফাঁক থাকিয়া গেছে। অতি যশস্বী ভিক্ষুকের মত লাহিড়ী মহাশয় নিজের দিকে চাহিবার অবসর পান নাই—নিজের হাতটা একবার দেখিয়া রাখিবেন এ সুবসরটা আজ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। দেখিয়া রাখিলে কিন্তু হইত ভাল।

২

ঢাকায় সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান সম্মেলন, কিম্বা দুই এক সঙ্গে। ঠিক মনে পড়িতেছে না, কেন না এক খরচে একাধিক মেয়ের বিবাহের মত বাঙ্গালী আজকাল অনেক সময় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন সব গুলাকেই এক বেদীতেই উৎসর্গ করিয়া লইতেছে। অনুষ্ঠানের গোলমাল হোক না হোক স্মৃতির গোলমাল না হইয়াই পারে না।

ঢাকা মেল দাঁড়াইয়া আছে। সব পিছনে সম্মেলন-যাত্রীদের জন্য একখানি রিজার্ভ গাড়ী। অনেকে আসিয়া গিয়াছেন, বিছানা-পত্র পাতিয়া গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়াছেন। নানা রকম গল্প আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কে-কে এখনও অনাগত...অতুল-দা ত এখন আসবেন না, সেকেণ্ড বেল পেয়ে গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করবে ঠিক সেই সময় থল্‌থলে শরীর নিয়ে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়, কোমরের কাপড় আলগা হয়ে গেছে কুলি ওদিকে মাল তুলে দিয়েছে মালের মালিক নিয়ে ব্যস্ত...ঢাকাই অভ্যর্থনায় এবারেও সেইরকমই অষ্টগণ্ডার ব্যবস্থা থাকবে না কি মশাই?—তাহলে শর্ম্মা ফেরৎ গাড়ীতেই...বাঁচলে তবে তো সম্মেলন?... উস্ সে কি ঝাল মশাই!—এখনও জিভের ডগা ঝিঝিয়ে আছে!...এ র‍্যাগ কোথাকার?...মেসোপোটেমিয়ায় নিয়েছিলেন? সেই গ্রেটওয়রের সময়কার?—এখনও এ রকম রয়েছে!...তা হবে না কেন বলুন—ওদের দেশের উটের পিঠের লোম; কি রকম রোঁদটা টেনেছে!...

কোণের দিকে বেশ প্রশস্ত একটি বিছানা পাতিয়া একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। একেবারে কোণটিতে একটি বড় গোছের সুটকেশ, তাহার উপর জড়সড় করিয়া রাখা একখানা ওভারকোট। ভদ্রলোকের গায়ের কোটের বোতাম খোলা, তাহার নীচে কোট-সোয়েটারের বোতাম খোলা, তাহার নীচে পশমী কামিজেরও বোতাম খোলা, দেখিলে মনে হয় শীতকে ভয়ানক ভয় করেন অথচ গরমকে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারেন না।

ভদ্রলোক খুব নিবিষ্টমনে একজনের হাত দেখিতেছেন। পাশে এবং সামনের বেঞ্চিতে গাড়ীর অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা ভিড় একটু বেশী, এবং একটু একটু করিয়া আরও বাড়িতেছে। কয়েকজন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে, একজন স্থির নয়নে নিজের হাতের পানে চাহিয়া আছে, দুই একজন হাতে হাত ঘসিয়া রেখাগুলা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

নায়ক যে স্বয়ং আমাদের লাহিড়ী মহাশয় তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে হাতটা দেখিতেছিলেন সেটা সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রসারিত অন্য একটা হাত টানিয়া লইয়া আবার তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"ডান হাত; বাঁ হাত মেয়েদের।"

গাড়ীর দুয়ারের নিকট হইতে একজন চেঁচাইয়া বলিলেন "জান্‌দা, এখানে আমি আছি। ওদিকে ত অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল—এখন এই নতুন কেতুর প্রবেশ-হ'য়েচে, রেখাগুলোতে কিছু…"

পাশের ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"হাত দেখতে জানেন না কি উনি?"

কেতু-কবলিত ভদ্রলোক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হাত দেখতে জানেন!—বাংলার চীরো (Cheiro) ব'লছে আজকাল ওঁকে।"

"রিয়েলী!…আমার ও জিনিষটায় তত ফেথ্ নেই, কিন্তু একবার দেখালে হয়, লাগে ইণ্টারেষ্টিং…মন্দ নয়।"

দ্বিতীয় ঘণ্টি পড়িল, গার্ড হুইসিল দিল। অতুল বাবুর জন্য একটা উদ্বিগ্নতা পড়িয়া গেছে। যে ভদ্রলোকটি চিনিতেন সুধু তিনিই তখনও নিশ্চিন্ত ভাবে প্ল্যাটফর্মের গেটের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় সত্যই দেখা গেল আধভেজান গেট ঠেলিয়া, পাশের চেকারদের স্থানভ্রষ্ট করিয়া একজন গৌরকান্তি স্থূলকায় ভদ্রলোক হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। ডান হাতে কোমরের কাপড় আর কোঁচার উপরের ভাগটা মুঠা করিয়া ধরা, বাম হাতে একটা ওভারকোট, একটা ছাতা, একটা মোটা লাঠি, একটা পাট করা র‍্যাগ, আর একটা দীর্ঘ টর্চ। তিন-চার গজ আগে বিছানা, সুটকেস, টিফিনকেরিয়ার, জলের কুঁজা প্রভৃতি লইয়া একটা কুলি। গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, রিজার্ভ কামরার মধ্যে থেকে কয়েকজন হাতমুখ নাড়িয়া নাড়িয়া চীৎকার করিতেছে—"শীগ্‌গির আসুন দাদা…গার্ড-সাহেব, থামাও একটু…কাপড় ফেলে দিন দাদা, সব সামলান চলবে না …আর একটু জোর"…শুধু সেই অভিজ্ঞ লোকটি নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া সবাইকে আশ্বাস দিতেছে—"উনি ঠিক উঠবেন —আপনারা ব্যস্ত হচ্চেন কেন?"

কুলি জিনিষপত্র ভিতরে দিয়া ভদ্রলোককে যথারীতি গাড়ীসাৎ করিলে, ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন—"লাহিড়ী এসেচে?"

"ঐ যে উনি—যথারীতি জমিয়ে ব'সেচেন।"

"একবার হাতটা দেখাতে হবে, কেন এরকম বার বার হ'চ্ছে যে!"…

গাড়িতে তখন বেশ মোশন দিয়াছে, এমন সময় মাঝবয়সী গোছের একজন ভদ্রলোক ষ্টেশনেরই কোন ঘর হইতে যেন বাহির হইয়া ছুটিতে ছুটীতে আসিয়া ইঁহাদের গাড়ীর পাদানিতে টুপ করিয়া লঘু চরণে উঠিয়া পড়িল। হাতে একটি মাঝারি সাইজের সুটকেস্, আর কিছু নয়।

সমস্বরে কয়েকজন আপত্তি করিয়া উঠিলেন—"এটা রিজার্ভ মশাই।"

ভদ্রলোক দরজা ঠেলিয়া উঠিতে উঠিতে মিনতির স্বরে বলিলেন—"পরের ষ্টেশেনেই নেমে যাব, এইটুকু।"

ওদিকটায় অনেকেই নিজের আসন ছাড়িয়া লাহিড়ী মহাশয়কে ঘিরিয়া জড় হইয়াছে; আগন্তুক অল্প একটু জায়গা লইয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বসিলেন।

লাহিড়ী মশায়ের আরও দুই তিন খানি হাত দেখা হইয়া গেছে। এখন সেই দরজার কাছের ভদ্রলোকটির হাত পরীক্ষা হইতেছে। লাহিড়ী মহাশয় বলিতেছেন, "ফলাফল আপনাকে যা ব'লে দিয়েছিলাম তাই—আরে রোজ ত আর মত বদলাচ্ছে না বিধাতাপুরুষের, তবে আপনি একটা পলা ব্যবহার ক'রবেন…আপনার এই রেখাটার ওপর একটু দৃষ্টি আছে, এই ক্রস্ মার্কাটা দেখছেন ত? ঐ পলায় এটাকে আর স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে দেবে না।"

মদন-মঞ্জরীর বিজ্ঞাপন যেমন দেখা যায়—সেই রকম প্রসারিত হস্তের গাঁদি লাগিয়া গিয়াছে। লাহিড়ী মহাশয় প্রসন্ন হাস্যের সহিত এক একটি লইয়া রায় দিয়া যাইতেছেন—"অষ্টমাধিপতির স্থানে সপ্তমাধিপতির আগমনের যোগ, একটা

পোখরাজ প'রবেন···আপনার এখন বৃহস্পতির দশা—অর্থ বিদ্যায় যোগ—শিক্ষকতায় একটা উন্নতির যোগ আসছে···"

উত্তর হইল—"আছে যোগ সত্যিই?···শুনছি ত প্রিন্সিপ্যাল একটা ফেভারেব্‌ল্ কন্‌ফিডেন্‌শ্যাল রিপোর্ট দিয়েছে।" "তা হ'লে কথাটা ঠিক?—হাতের মার্কেও ধরা প'ড়বে?" "প'ড়তে বাধ্য। আগে রেখা তার পর ঘটনা, বাদ যাবার জো আছে?"

৩

সব চেয়ে শেষে যে ভদ্রলোকটি উঠিয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এত ভিড় কিসের?"

"জ্ঞান লাহিড়ী হাত দেখছেন।"

"খুব বিচক্ষণ না কি?"

"বাংলায় জোড়া নেই এখন। দেখাবেন না কি?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "না; কাজ নেই, দেখালেই ত শুন'ব মৃত্যুযোগ—দেখলেন না, গাড়ী ধরতেই একটা কি রকম ফাঁড়া গেল?"

একটু থামিয়া বলিলেন; "তবে সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রুদ্রাক্ষপুরা পাঞ্জাবী বেটা কি কতগুলো বা তা আউড়ে গেল, বিশ্বাস যত করি আর না করি মনে খানিকটা ধোঁকা লেগে আছে বটে; দেখলে হ'ত এঁর সঙ্গে মেলে কি না। কিন্তু ওই ব্যূহের মধ্যে ঢোকাই মুস্কিল। আর যদি দেখাতেই হয় তো কাছে ব'সে দেখানই ভাল, এখান থেকে হাত টেনে নিয়ে দেখবেন, নড়া ছিঁড়ে যাবে মশায়, ওতে রাজী নই···"

যে হাতটা দেখা হইতেছিল সেটা শেষ হইলে যাহার সঙ্গে কথা হইতেছিল সেই ভদ্রলোক বলিলেন—"জ্ঞানদা এই ভদ্রলোকের হাতটা একবার দেখুন তো··· ইনি আবার এক পাঞ্জাবী গেরুয়াধারীর পাল্লায় প'ড়েছিলেন, কি সব বলে দিয়েছে ভদ্রলোককে,···উনি আবার পরের ষ্টেশনে ব্যারাকপুরেই নেমে যাবেন।"

"সত্যি না কি, আসুন ত' দেখি।" লাহিড়ী মহাশয় একটা হাত দেখিবার জন্য সবে হাতে করিয়াছিলেন, ছাড়িয়া দিয়া উৎসুকভাবে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্‌টারেষ্টিং কেস বলিয়া সকলে জায়গা ছাড়িয়া দিল, ভদ্রলোক গিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের পাশটিতে বসিলেন।

গাদাগাদিতে বেশ গরম পড়িয়াছে, অন্তত লাহিড়ী মহাশয়ের পক্ষে ত' বটেই, তিনি কোটটি খুলিয়া পাশে রাখিলেন। ভদ্রলোকটির গায়ের র‍্যাপারটা খানিকটা নিজের কোলের উপর রাখিয়া আর খানিকটা পাশে কোটটার উপর জড় করিয়া রাখিলেন, তাহার পর ডান হাতটা বাহির করিয়া আগাইয়া দিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় হাতের চারটা আঙ্গুল একটু উল্টাদিকে টিপিয়া হাতটা ভাল করিয়া চিতাইয়া লইলেন, তাহার পর ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল, "কি বলেছে সে ব্যাটা পাঞ্জাবী মশাই?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—"কেন বলুন ত?"

"ওয়াণ্ডারফুল হাত মশাই। এই এতগুলো হাতের মধ্যে একটাও এরকম রিচ (rich) নয়। একটা কথা বলুন তো, আপনি কি কোন একটা বড় রকম স্পেকুলেশুন নিয়ে যাত্রা করেছেন? মানে, কোন একটা বড় রকম লাভ-লোকসানের ব্যাপার নিয়ে?"

ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"সেটা পর্য্যন্ত ধরা পড়েছে রেখায়, আশ্চর্য্য তো!"

লাহিড়ী মহাশয় ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধার জন্য ওভারকোটটা সুটকেসের উপর হইতে সরাইয়া ভদ্রলোকের র‍্যাপারের উপর রাখিলেন এবং সুটকেসটা খাড়া করিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া সরিয়া বসিলেন, তাহার পর হাতটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিজের মাথাটাও নানা ভাবে নাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিলে "ঠিক তো? সেই স্পেকুলেশুনে ষোল আনা লাভ আপনার আর এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। বৃহস্পতির এরকম যোগ দেখা যায় না সচরাচর—স্পেকুলেশুনে লোকের নিজেরও গাঁট থেকে কিছু বের করতে হয়, আপনার যেন সেটুকুও লোকশান নেই···দেখি, এইদিকটা ওল্টান তো···লাইন্ অব ল্যাক্—ওয়াণ্ডারফুল!" রাতারাতি বড়লোক হইয়া অন্ততঃ মানুষ হইয়া যাইবে—হঠাৎ এমন এক সৌভাগ্যশালীর আবির্ভাবে সকলে অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে বলিলেন—"কিছু ভুল হচ্ছে না ত' আমার কপালে সন্ত লাভ একথা ত এ' পর্য্যন্ত কোন গণৎকার বললে না। পাঞ্জাবী ব্যাটা বরং বললে—মস্তবড় একটা লোকসানের যোগ যাচ্ছে—তা সে ত সন্ত সন্ত তার হাত দিয়েই আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্ত লাভের কথা···"

লিগুরিয়েন রিভিয়েরা ঃ পেরাগ্গি (ইতালী)।

"যদি না হয় তো আমার সমস্ত বইগুলো নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দোব।…আপনার এড্রেসটা বলুন তো? কলকাতায় থাকেন তো?"

ভদ্রলোক ঠিকানা দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আর কি বলে?"

লাহিড়ী মহাশয় হাতটা আবার নানা ভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকক্ষণ নিবিড়ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—"এদিকে তো চমৎকার চলেছে—শুধুই লাভের যোগ—ওদিকে অনেক পরে শনির একটা যোগ আছে—তাতে সমুদ্রযাত্রা সূচিত করে…কোন বিপদ আছে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু ভালরকম ক্যালকুলেশন করে না দেখলে ধ'রতে পারছি না…"

এমন সময় গাড়ির বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল।

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমায় এইখানেই নামতে হবে…"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আবার কি সমুদ্রযাত্রার বিপদের কথা বলে দিলেন মশাই?"

একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "আপাতত মোটা দাঁও মারুন ত'। আর বিপদের কথা কি বলছেন মশাই? ও ত' স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, লাভের পর লাভে মোটা ব্যাংক ব্যাল্যান্স, তার পরে লম্বা ইউরোপীয়ান টুর…সঙ্গে নেবেন মশাই…"

গাড়ী প্লাটফরমে প্রবেশ করিয়াছে। কয়েকজন ভাগ্যবানকে খানিকটা আগাইয়া দিল। একজন দুয়ারটা খুলিয়া হাসিয়া বলিল, "ইউরোপীয়ান টুর তো দূরের কথা, আপাতত নগদ লাভের একটা ফীষ্ট পাওনা রইল মশাই, ঢাকা থেকে এসেই হাজির হব সদলবলে, ঠিকানা জানাই রইল।"

৪

ভদ্রলোক নামিয়া গেলে, গাড়ী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রু উঠিল।

ওদিকে হাত দেখা আবার সুরু হইল। সকলের কৌতূহল যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। একজন বলিল, "অথচ বেটা পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে কি সব দুর্ভাবনার কথাই বলে দিয়েছিল! বোগাস্!"

অপর একজন লাহিড়ী মহাশয়কে প্রশ্ন করিল, "ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফলবে বলছেন আপনি? আশ্চর্য্য উন্নতি করেছে তো পামিষ্ট্রি!"

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "ফলে কি না ফলে ঢাকা থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন, এই তিন-চারটে দিনের অপেক্ষা। ভদ্রলোক ঠিকানা তো দিয়েই গেলেন।"

অত অপেক্ষাও করিতে হইল না। ক্রু ওদিকে চেক করিতে করিতে এই কোণে আসিল; হাতটা সকলের সামনেই প্রসারিত করিয়া বলিল, "টিকেট প্লীজ্।"

একে একে টিকিট দেখাইতে লাগিল সকলে। লাহিড়ী মহাশয় ওভারকোটটা সরাইয়া কোটটা তুলিয়া লইলেন। ভিতর পকেটে হাত দিতেই মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। বুক পকেটে হাত দিলেন, পাশের দুই পকেটে। তাহার পর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাগটাই পাচ্ছি না যে! তাতে টাকা পঞ্চাশেকের নোটও ছিল!"

সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একজন বলিল, "ওভারকোটের পকেটে রাখেন নি তো?"

রাখা হয় নাই তবুও দেখা হইল, সুটকেশ খুলিয়াও দেখা হইল, আশে পাশে, বিছানা তুলিয়া—কোথাও ব্যাগ নাই।

লাহিড়ী মহাশয় যেন আর এক ঝোঁক বিচলিত হইয়া কোটটা তুলিয়া লইলেন, বুক-পকেটে হাত দিয়া শূন্য হাতটা বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন, "ঘড়িটাও নেই, সোনার চেন সুদ্ধ!…"

এক গতির আওয়াজ ভিন্ন গাড়িটাতে অন্য কোন শব্দ নাই। কিছু পরে একজন শুধু ভাগ্যবানের সদ্য লাভের বহরটা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া প্রশ্ন করিল, "কত দাম ছিল ঘড়িটার? এ দিকে ত' নগদ পঞ্চাশ টাকা গেছে বলছেন।…কেমন কৌশল করে আপনার কোটটার উপর গায়ের র‍্যাপার খানিকটা বিছিয়ে দিলে! তখন অত খেয়াল করি নি।"

অপর একজন বলিল, "তার ওপর উনিও আবার নিজের ওভারকোটটা চাপিয়ে দিলেন; ওর হয়ে গেল পোয়াবারো।"

তৃতীয় একজন বলিল, "চাপিয়ে না দিয়ে উপায় আছে? ওর যে মস্ত বড় একটা লাভের যোগ যাচ্ছে। সবাইকে হাতের কাছে জুগিয়ে দিতে হবে না?"

'অতুলদা' নিতান্ত সাদাসিধা প্রকৃতির লোক, বলিলেন, "গেল বটে, থোক টাকা একটা, কিন্তু সার্থক শিক্ষা তোমার লাহিড়ী; চব্বিশ ঘণ্টাই বা কোথায় গো? এ দিকে মুখ থেকে কথা বেরুস আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে লাভ, একটি পয়সা খরচ নেই একটু হাঁকুপাঁকু নেই, একরত্তি দৌড়ঝাঁপ নেই!…ধন্যি শাস্ত্র বাবা!…আর ও সমুদ্রযাত্রাও তোমার মিথ্যে বলা নয়, শেষ পর্য্যন্ত বেটার কপালে কালাপানি আছেই আছে।"

আকবর কি নিরক্ষর ছিলেন ?

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আকবর ভারতের সর্ব্বপ্রধান মুসলমান সম্রাট্ ছিলেন। তাহার পিতা সম্রাট্ হুমায়ুন ছিলেন একজন সুপণ্ডিত। আকবর পিতৃ-সিংহাসনে অরোহণ করিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ভারত-সাম্রাজ্য পুনরায় জয় করিয়া এই বিশাল রাজ্য পরিচালনার সুব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। সেজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, তিনি যে একজন বিশিষ্ট নৃপতি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যেভাবে রাজ্য পালন করিয়া ছিলেন, বহু সুশিক্ষিত নৃপতিই সে ভাবে রাজ্য পালন করিতে সমর্থ হন নাই। দূরদর্শিতায় এবং মানব-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানে তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক নৃপতিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই আকবর বাদশাহ নিরক্ষর ছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণও সুপ্রচুর। প্রায় সমস্ত ইংরাজ ইতিহাস লেখকই এই মতের সমর্থক। আকবরের প্রধান-মন্ত্রী প্রতিভাশালী আবুল ফজল এই মতের প্রবর্ত্তক। অনেকের ধারণা তিনিই আকবরকে 'উম্মি' (ummi) বা 'বর্ণজ্ঞানবিহীন' বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার যে ঐরূপ করিবার কোন কারণ ছিল না, তাহাও নহে। সে কথা পরে বলিব। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, আকবরের অক্ষর-পরিচয় ছিল না। ব্লকম্যান বলেন আকবর লিখিতে এবং পড়িতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তিনি শুনিয়া প্রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া ছিলেন। আকবর 'উম্মি' বা অশিক্ষিত ছিলেন বিভারিজও এই কথাই বলিয়াছেন। এমন কি আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর "তুজুক্ই জাহাঙ্গিরী" নামক আত্মজীবনীতে তাঁহার পিতা আকবরকে 'উম্মি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ এত প্রবল যে ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিবার চেষ্টাকে ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাস-লেখকের পক্ষে কোন প্রচলিত মতের প্রতিকূল তথ্য পাইলে সে সম্বন্ধে নীরব থাকা সঙ্গত নহে।

পক্ষান্তরে আকবর যে একেবারে নিরক্ষর ছিলেন না, তাহার পোষক প্রমাণ আজকাল কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত মৌলভী শিবলী প্রথম প্রচার করেন যে, আকবর বাদশাহ নিরক্ষর ছিলেন না। মৌলভী শিবলী "শের উল আজাম" নামক গ্রন্থে ফার্সি কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা পুস্তকে বলিয়াছেন যে, আকবর হদিস শিক্ষার জন্য তাঁহার শিক্ষকের গৃহে গমন করিতেন। এই কথা তিনি মআসির উল্ উম্‌রা (Ma'asir ul Umra)র প্রামাণিক উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণও ক্রমশঃ পাওয়া যাইতেছে, যাহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আকবরের অক্ষর-জ্ঞান ছিল, এবং তিনি লিখিতে এবং পড়িতে পারিতেন। এখন নিরপেক্ষভাবে সকল দিক্ বিচার করিয়া কোন্ দিকে পাল্লা ভারি হয়, তাহা বিচার করাই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের অবশ্যকর্ত্তব্য।

দুই দিকেই যখন প্রবল প্রমাণ বিদ্যমান, তখন অবস্থাগত ব্যাপারেরও বিচার করিয়া দেখা বিধেয়। প্রথমে দেখা যাউক,-বাল্যকালে আকবরের লেখাপড়া শিখিবার কি সুযোগ হইয়াছিল। আকবরের জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই তাঁহার শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা হুমায়ুন একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে যখন আকবরের বয়স চারি বৎসর চারি মাস চারি দিন, সেই দিনই আকবরের শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল।— মৌলানা আজাম উদ্দীন ছিলেন তাঁহার প্রথম শিক্ষক। সুতরাং সাধারণ বালকের ন্যায়ই আকবর পঞ্চম বৎসরেই লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার পর আট বৎসরকাল কাল আকবর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হইয়াছিল। একাল পর্য্যন্ত হুমায়ুন পুত্রের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অনেকগুলি শিক্ষকের নিয়োগই তাহার প্রমাণ। যথা মিয়া আবদুল লতিফ, পীর মহম্মদ খাঁ,

মৌলানা বয়াজিদ এবং হাজি মহম্মদ খাঁ। বালক পাঠে অনাবিষ্ট হউক না কেন, আট বৎসরেও যে তাহার বর্ণজ্ঞান হয় না, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। তবে একেবারে বুদ্ধিহীন হইলে তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আকবর একেবারে বুদ্ধিহীন ছিলেন এমন কথা তাঁহার অতিবড় শত্রুও বলিতে পারেন না। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরম খাঁ যখন আকবরের অভিভাবক হইয়াছিলেন, তখনও পাঁচ বৎসরকাল বৈরমের কঠোর তত্ত্বাবধানে আকবরকে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল। তের বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিয়াও আকবরের ন্যায় একজন প্রতিভাশালী এবং স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছাত্রের যে বর্ণজ্ঞানও হয় নাই, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসা যে ছিল না, তাহা বলা যায় না। এই তথ্য তাঁহার নিরক্ষরতার বিরোধী।

আর একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজল তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী'তে লিখিয়াছেন যে, এক এক জন যোগ্য পাঠক আকবরকে প্রত্যহ এক একখানি পুস্তক প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার কথা এই—পাঠক যে পুস্তকের যে পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া শুনাইতেন, আকবর প্রত্যহ তাহা তাঁহার মণিখচিত লেখনীর দ্বারা স্বহস্তে যত পাতা পড়া হইত, তাহা অঙ্কে লিখিয়া রাখিতেন এবং পাঠককে তদনুসারে পারিশ্রমিক দিতেন।* ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে আকবর অঙ্ক লিখিতে পারিতেন। তাঁহার মণি-খচিত লেখনী ছিল। তিনি যদি না লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহার নিজের জন্য মণি-খচিত লেখনী রাখিবার প্রয়োজন হইত না। ডক্টর নরেন্দ্র নাথ লাহা তাঁহার Promotion of Learning in India during Mohamadan Rule নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ব্লকম্যান এই স্থানের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট হয় নাই। তিনি হিন্দিশা (hindisah অর্থাৎ অঙ্ক) এই শব্দটী ধরেন নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ডক্টর লাহা আকবর যে নিরক্ষর ছিলেন তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু ইহার পর আবার একটা তথ্য মিলিয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর টমাস আর্ণল্ড জাফার-নামা নামক পুস্তকে বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী বাহজাদ অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি আকবর, জাহাঙ্গীর এবং সাজাহানের পুস্তকাগারে ছিল। সঙ্কলন-কর্ত্তা জাফার-নামার প্রথম পৃষ্ঠা হুবহু প্রকাশিত করিয়াছেন। উহাতে আকবর, জাহাঙ্গীর এবং সাজাহানের স্বহস্তে লিখিত কয়েকছত্র আছে। উদাহরণ স্বরূপ উহার একস্থানে ফরওয়ার্দ্দিন্ (Forwardin) এই কথাটি বেশ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। উহা আকবর কর্ত্তৃক স্বহস্তে লিখিত। উহার নিম্নে জাহাঙ্গীরের স্বহস্তে লিখিত এই কথা আছে;—"এই শব্দটি হজরৎ অস্তনের (অর্থাৎ স্বর্গীয় বাদশাহ আকবরের) স্বহস্তে লিখিত। মির জালালুদ্দীন হুসেন আগ্রা রাজধানীতে আকবরের হস্তে এই পুস্তকখানি দিয়াছিলেন।"* ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আকবর একজন লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন। জাহাঙ্গীরের নিজ উক্তিতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত হিরানন্দ শাস্ত্রী ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল্ কোয়াটারলি পত্রে লিখিয়াছেন যে, আকবর বাদশাহ সূর্য্য-সহস্র-নাম-স্তোত্র পাঠ করিতেন। ভানুচন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্য-সহস্র-নাম-স্তোত্র শিখাইয়াছিলেন। একখানা বৃত্তাকার চিত্রে সূর্য্যের সহস্র নাম চিত্রিত ছিল। আকবর সেখানিকে পূজা করিতেন এবং সূর্য্যের সহস্র নাম পাঠ করিতেন। বাঙ্গালোরে জৈন মুনি বিচক্ষণ বিজয় মহাশয় শাস্ত্রীজীকে সূর্য্য সহস্র নাম লিখিত কয়েকখানি পুঁথির পাতা এবং উক্ত চিত্রখানি দেখাইয়াছিলেন। ঐ চিত্রের প্রতিলিপি ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল্ কোয়াটারলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে চিত্রের অক্ষরগুলি রক্তবর্ণ বলিয়া চিত্রের ফটোগ্রাফ ভাল উঠে নাই। যদি ইহা সত্য হয় যে, আকবর উহা হইতে সূর্য্য-সহস্র নাম পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে বর্ণজ্ঞান-বর্জ্জিত ছিলেন না, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

---

* Whatever place (of the book, the reader) daily reached, he [Akbar] wrote with his jewelled pen numerical figures according to the number of leaves [read]. He paid the reader cash in gold or silver according to the number of leaves [read].
Bibl Indica Ed. Bk 1 Ain 34 p. 115 lines 11 & 12

* Mr. Hamead Hassan in the *Indian Review*.

পক্ষান্তরে আকবরের সমকালের ঐতিহাসিক মোল্লা আব্দুল কাদির বদাউনী তাঁহার প্রণীত 'তারিখ-ই-বদাউনী'তে লিখিয়াছেন যে, আকবর ৯৬৩ হিজরায় মীর আব্দুল লতিফের নিকট দেওয়ানই-হাফিজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হাফিজের ফার্সী কবিতার গূঢ় মর্ম্ম এখনও অনেক বিখ্যাত ফার্সী পণ্ডিতের বুদ্ধির অগম্য। বদাউনী লিখিয়াছেন যে, আকবর হাফিজের কবিতায় গূঢ় মর্ম্ম বেশ বুঝিতেন। একজন বর্ণজ্ঞানবিহীনের পক্ষে তাহা কি সম্ভব? এখানে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, যিনি হাফিজের কবিতা পড়িবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ এবং অত্যন্ত যত্ন এবং মনোযোগ সহকারে উহা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার যদি বাল্য-জীবনে অক্ষর-পরিচয় না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি তিনি পরে বিশেষ মনোযোগসহকারে অক্ষর-পরিচয় করিয়া লইতে পারেন নাই? এই কারণেও আমাদের স্বতঃই মনে হয় আকবর অক্ষরজ্ঞানবিহীন ছিলেন না।

তবে আকবর বাদশাহের প্রধান-মন্ত্রী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু আবুল ফজল তাহাকে বর্ণজ্ঞানবিহীন বলিয়াছেন কেন? কেহ কেহ বলেন, আবুলফজলের ঐ কথা বলিবার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। আবুল ফজলই আকবর-কর্ত্তৃক ইলাহি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি ঐ ধর্ম্মকে 'স্বর্গীয় ধর্ম্ম' বলিতেন। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের দৃষ্টান্ত অনুসারে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, আকবর বর্ণবোধবিহীন হইয়া যে ঐ সূক্ষ্ম ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, ইহা একটা অলৌকিক কাণ্ড। বদাউনী আকবরের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। আকবর কর্ত্তৃক ইলাহি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি আকবরের উপর অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, আকবর হাফিজের গূঢ় জ্ঞানগর্ভ কবিতা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, জাহাঙ্গীর কি কারণে তাঁহার পিতাকে উম্মি বা বর্ণজ্ঞানবিহীন বলিয়াছিলেন? জাহাঙ্গীর বাদশাহের 'তুজাকী জাহাঙ্গিরী' নামক একখানি আত্মজীবনচরিত আছে। তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমার পিতা সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত, বিশেষতঃ পণ্ডিত এবং ভারতের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা করিতেন। যদিও তিনি উম্মি অর্থাৎ বর্ণজ্ঞানবিহীন ছিলেন, তথাপি সুশিক্ষিত এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তাঁহার ভাষা এতদূর মার্জ্জিত হইয়াছিল যে, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তিনি যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তিনি কবিতার এবং গদ্যের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য এতদূর উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, এই কার্য্যে তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না।"* ইহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতাকে বর্ণজ্ঞানবর্জ্জিত বলিয়াই জানিতেন। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঐ জাহাঙ্গীরই "ওয়াকিয়াটি জাহাঙ্গীরী" নামক আর একখানি আত্মচরিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলিয়াছেন, তিনি তাহাতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা শিক্ষার দ্বারা বিশেষ সুবিধা না পাইলেও তিনি রচনার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ্য সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত মনে করিত।† তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই :

"ঐ সকল পণ্ডিতের সহিত আমার পিতা সকল বিষয়ই আন্তরিকতার সহিত সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। তিনি

---

* My father used to hold discourse with learned men of all persuations, particularly with the Pandits and intelligent persons of Hindusthan. Though he was illiterate but from constantly conversing with learned and clever persons, his language was so polished that no one could discover from the conversation that he was utterly un-educated. He understood even the elegance of poetry and prose so it well, that was impossible to conceive of any one more proficient.

(*Tuzaki Jahangiri, by Rogers and Beveridge* p. 33

† With these Pandits my father (Akbar) was in constant habit of familiar conversation on every subject. He associated, indeed, with the learned among the Hindus of every description, and although he might not have derived any particular advantage from this attainment, he had acquired such a knowledge of the elegance of composition both in prose and verse that a person not acqainted with the circumstances of his elevated character and station might have set him down as profoundly learned in every branch of science.

Waquiati Jahangiri Price's translation pp 44-45.

সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত হিন্দুর সহিত বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইতেন, তিনি তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যা হইতে হয় ত বিশেষ সুবিধা পান নাই। তাহা হইলেও তিনি কবিতা এবং গদ্য রচনার ঔৎকর্ষ্য এরূপ ভাবে বুঝিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উচ্চ চরিত্রের এবং অবস্থার সহিত যিনি পরিচিত নহেন, তিনিই তাঁহাকে সর্ব্ববিদ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া মনে করিতেন।"

পাঠক এক্ষণে উভয় উক্তির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। এখানে জাহাঙ্গীর বলিতেছেন যে, তাঁহার পিতা আকবর তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যা হইতে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। তাহা হইলেও তিনি তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যা হইতে কিছু সুবিধা পাইয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। 'তুজাকি জাহাঙ্গীরের' উক্তি জাহাঙ্গীরের প্রথম জীবনের। সুতরাং পরে তিনি সে কথাটি সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কেবল তাহাই নহে। তারিখ সালিমসাহী, ইকবল-নামা, জাহাঙ্গীরনামা প্রভৃতি গ্রন্থও জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত বলিয়া পরিচিত। এই গ্রন্থগুলির মধ্যেও এই বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্বতঃই সন্দেহ জন্মে যে, আকবর বাদশাহের কতকগুলি অভিজ্ঞ লোক তাঁহাকে মতলব করিয়া নিরক্ষর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ তাঁহারা আকবর অবতার বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, আকবর ধর্ম্মের যে গূঢ় তত্ত্ব সমস্ত বলিতেন, তাহা তিনি তাঁহার অধীত বিদ্যা হইতে বলিতেন না, কারণ, তাঁহার শিক্ষালব্ধ বিদ্যা কিছুই ছিল না। তিনি ঐ সকল তত্ত্বকথা বলিতেন ঐশী শক্তিবলে। নতুবা জাফরনামায় যাঁহার হস্তাক্ষরে 'ফরওয়ার্দ্দিন' লিখিত আছে, তাঁহাকে তাঁহারা নিরক্ষর বলেন কোন্ সাহসে ? জাহাঙ্গীর ত উহার তলায় লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, উহা তাঁহার পিতার হস্তাক্ষর। সেই জন্য অনুমান হয় যে, জাহাঙ্গীর যেন দোটানায় পড়িয়াছিলেন। তিনি কোথাও বলিয়াছেন যে, আকবর উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন, আবার কোথাও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় পণ্ডিত এবং মুসলমান সুশিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত তিনি যেরূপ উচ্চ অঙ্গের কথার আলাপ করিতেন, তাঁহার অধীত বিদ্যা সেরূপ ছিল না।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁহার লিখিত Promotion of Learning during Mohamadan Rule নামক গ্রন্থে এই বিবাদের একটা সুমীমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে উম্মি শব্দের অর্থ ঐ খানে "লিখিতে এবং পড়িতে অজ্ঞ" এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐ শব্দের আর একটা অর্থ আছে, তাহার অর্থ স্বল্পভাষী (taciturn), "মুহিবুল মুহিতে" তাহার অর্থ আল্‌কোয়ালিলুল কলাম (al qualilul kalam) বা স্বল্পভাষী। এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঐ স্থানে অর্থেরও বিশেষ সঙ্গতি হয়। উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, "আমার পিতা যদিও স্বল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত এবং বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে তিনি যে স্বল্পভাষী তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না।"* আমরা ফার্সি ভাষা জানি না, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে ডক্টর লাহা যে অর্থ করিয়াছেন, সেই অর্থ যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে এই সমস্যার সহজে মীমাংসা হইয়া যায় একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, আকবরের ইতিহাস ভাল পড়া ছিল এবং তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।† তিনি হাফিজের অনেক কবিতা আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন।‡

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, একেবারেই জ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারা যায় কি ? ব্লকম্যান বলিয়াছেন যে, আকবর পড়া পণ্ডিত ছিলেন না, শোনা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মতে আকবরের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। একথা আরও অদ্ভুত। যে বালকের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, সে কি তের বৎসর কাল বিভিন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তির শিক্ষাধীনে থাকিয়া বর্ণমালা পর্য্যন্ত অধিগত করিতে পারিল না ? ইহা কি সম্ভব বলিয়া মনে হয় ? যাহার বর্ণজ্ঞান মাত্র ছিল না সেই ব্যক্তি কি সুফি, সুন্নি, শিয়া, ব্রাহ্মণ,

* *Promotion of Learning in India* Addendum p. 211.

† Ferishta vol II p 280

‡ Eliot iv p 294.

জৈন, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক, খৃষ্টান, ইহুদী, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং আইন-সম্পর্কিত সমস্যার গূঢ় তর্ক বুঝিতে পারেন? পৃথিবীতে এত বড় শ্রুতিধর আজও পর্য্যন্ত জন্মে নাই যে, অক্ষরের বিনা সাহায্যে এই সকল জটিল তত্ত্ব ঠিক মনে রাখিতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে কেবল গোষ্ঠে গোচারণ করিয়া ভগবৎগীতার ন্যায় দার্শনিক উপদেশ দিয়াছেন কি করিয়া? এসকল ঐশী 'প্রস্তাব।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে গোষ্ঠে গোচারণই করুন, আর যাহাই করুন, পরে তিনি সন্দীপ মুনির নিকট কিছুদিন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ কেহ ঐশী শক্তিবলে উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন শুনা যায় সত্য, কিন্তু আকবর বাদশাহ্‌ত কেবল ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন না। তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের রাজনীতিক ছিলেন। শেরশাহ্‌ একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিলেন, তিনি বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি যৌবনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। মিষ্টার বিভারিজ বলিয়াছেন যে, ডক্টর লাহার আকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ প্রাচ্যখণ্ডে বহু অশিক্ষিত রাজ্যপালের নাম পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি হজরৎ মহম্মদের, আলাউদ্দীন খিলজীর এবং হাইদার আলির নাম করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমি হজরৎ মহম্মদ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না। তিনি একজন ঐশী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহাকে আলোচনার বাহিরে রাখা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে আলাউদ্দীন খিলজী গোড়ায় বর্ণজ্ঞানবিহীন মূর্খ ছিলেন সত্য, কিন্তু উত্তর কালে তিনি গোপনে ফার্সি ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ফার্সি ভাষায় লিখিত ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়াছিলেন।‡ তথাপি শাসক হিসাবে তাঁহার সুনাম নাই। হাইদার আলি খাঁ বাহাদুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্যই জানিতে পারা যায় নাই। সুতরাং তাঁহার কথা নজীর স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে না। শুনা যায় যে, মেরিঙ্কপটাম দেবী নামক জনৈক মহিলার সহিত তিনি গোপনীয় ভাবে পত্র ব্যবহার করিতেন। ইহাতে তিনি যে একেবারে নিরক্ষর ছিলেন, তাহা মনে হয় না। আসল কথা, সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ব্যক্তি কখনই সর্ব্বদিকে উদার প্রকৃতির রাজনীতিক হইতে পারে না। মিষ্টার বিভারিজও আকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি তাঁহার প্রণীত আকবরনামার অনুবাদে স্পষ্টই লিখিয়াছেন, It seems probable too, that Akbar never knew how to read and write, অর্থাৎ ইহা সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় যে, আকবর কখনই লিখিতে এবং পড়িতে শিক্ষা করেন নাই। তিনি যাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। তিনিও এ বিষয়ে নিশ্চিত নহেন, তাহা তাঁহার probable কথাতেই সুপ্রকাশ।

আকবরের আমলে অনেক রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে, আকবর লিখিতে এবং পড়িতে জানিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। তাঁহাদিগকে দরবারে অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। বাদশাহের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা করিবার সম্ভাবনাও ছিল না। তাঁহারা অন্যের মুখে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ সে কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশও করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আকবরের দরবারে আকবরকে ঐশী শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিবার জন্য আবুল ফজল প্রভৃতি কতকগুলি লোক তাঁহার নিরক্ষরতা সম্বন্ধে একটা গুজব রটাইয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা ঐ কথা শুনিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। উপরে যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে আকবর যে বর্ণজ্ঞান-শূন্য ছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয় না। আমি উভয় পক্ষের কথা বলিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। এখন পাঠক নিরপেক্ষ ভাবে কথাগুলির বিচার করিয়া দেখিবেন। আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

‡ Ferishta vol I p 348

নিরুদ্দেশ

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সুসজ্জিত দোকানগুলির সামনে অকস্মাৎ রব উঠিল, ছেলে হারাইয়াছে। মোটরের সামনে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতেছে। উদ্বেগে এবং আশঙ্কায় তাঁহার এমন হইয়াছে যে, লাঠিটির উপর ভর দিয়াও তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ছেলেটি তাঁহারই বাড়ীর।

কাশফুলের মতো সাদা তাঁহার মাথার চুল। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী, গলায় কোঁচানো উত্তরীয়, পরিধানে থান ধুতি। হাতে একটি রূপা-বাঁধানো লাঠি। 'ভদ্রলোক এই পাঁচ মিনিটেই মধ্যেই কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

অপরাহ্ন বেলা। পূজার বাজারের ক্রয়ার্থী তো আছেই, তাহার উপর আফিস-ফেরৎ কেরাণীর ভিড় আছে, অগণিত ফেরীওয়ালাও আছে। সকলে মিলিয়া ভদ্রলোককে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে।

জানা গেল, ছেলেটি ভদ্রলোকের দৌহিত্র। ভদ্রলোক এলাহাবাদে থাকেন। কয়দিনের জন্য জামাতৃগৃহে আসিয়াছেন। নাতিটিকে পোষাক কিনিয়া দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। দোকান পর্য্যন্ত সে তাঁহার সঙ্গেই ছিল। জামার মাপ লইতে গিয়া দেখা গেল, নাই। ভাবিলেন, বোধ হয় মোটরে গিয়া বসিয়া আছে। আসিয়া দেখেন, সেখানেও নাই। শোফার সমস্ত শুনিয়া তাহাকে খুঁজিতে ছুটিয়াছে।

কত, বয়স কত?

ছোট ছেলে? কত ছোট? ছ' সাত বছরের?

ফর্সা?

গায়ে কি-রঙের জামা আছে?

পরণে কাপড়-জামা। না কোট-প্যাণ্ট?

পায়ে স্যাণ্ডাল, না শু?

গায়ে গহনা-টহনা নেই তো মশায়?

কিছু নেই? হার? আংটি? বোতাম?

এই দেখুন। বলছিলেন, কিছু নেই। বোতাম কি আর গহনা নয়?

ছেলের নাম কি?

শুভ্রাংশু? ওই ব'লেই ডাকে?

কানু ব'লে ডাকে? কানু···কানু···

চার পাঁচজন অবিলম্বে-কানু, কানু, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যে যাহাকে দেখে, জিজ্ঞাসা করে, কানু বলিয়া একটি ছেলে হারাইয়াছে, দেখেন নাই?

জিজ্ঞাসিত হইয়া ভদ্রলোক থমকিয়া দাঁড়ায়।

ছেলে?

আজ্ঞে হাঁ। বছর ছয়েক বয়েস। ফর্সা, গায়ে শর্ট আর শার্ট। ডাক নাম কানু।

একটি ছেলে যেন···

কোথায়?

রেসে দৌড়িবার আগে প্রতিযোগিগণ সঙ্কেত-ধ্বনির জন্য যেমন উদ্গ্রীব হইয়া থাকে, সঙ্কেত শোনা মাত্র দৌড়িবে, তেমনি করিয়া চার পাঁচটি ছোকরা তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, একটি ছেলে দেখছিলাম যেন, মোড়ের মাথায়, চানাচুরওয়ালার সামনে। কিন্তু সে তো ফর্সা নয়। গায়েও তার পাঞ্জাবী।

সে নয়।

লোকগুলা হতাশ হইয়া বলিল।

আবার একটা জনতরঙ্গ প্রৌঢ় দাদামহাশয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল:

যে দোকানে ঢুকেছিলেন, তার ভিতরটা খুঁজেছেন?

অসহায় ভাবে দাদা মহাশয় বলিলেন, সেখানেই তো পেলাম না।

কিন্তু তাঁহার অসহায় ভাব দেখিয়াও জনতার মনে বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হইল না। তাহারা শত-মুখ

খিঁচাইয়া বলিল, পেলেন না তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি নিজে খুঁজেছিলেন?

মানে···

লোকেরা আবার ধমক দিল: আরে মশাই, খুঁজেছিলেন কি না? ওপরে? নীচে? সব?

ওপরটা বোধ হয়···

তাই বলুন। এ দিকে রাস্তা তোলপাড় তো ক'রে তুলেছেন!

অনেকগুলা লোক হুড়মুড় করিয়া সামনের দোকানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং কোন দিকে না চাহিয়া দুম দাম শব্দে কাঠের সিঁড়ি যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

কি হ'ল? কি হ'ল? অত লোক ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়? আস্তে যান, সিঁড়ি ভেঙে যাবে যে।

রাখুন মশায় সিঁড়ি। এ দিকে···

এ দিকে···কি? শুনুন, শুনুন।

সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!

কি সর্ব্বনাশ?

ছেলে হারিয়েছে।

কার ছেলে?

একজন ভদ্রলোকের। এইখানে আপনাদেরই দোকানেই জিনিস কিনতে এসেছিলেন।

ঠিক সেই সময়েই একটি ছোট ছেলে শর্ট ও শার্ট পরিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছিল।

লোকগুলা তাহাকে দেখিবা মাত্র সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল: এই যে!

সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক টপ্ করিয়া আকাশে তুলিয়া বাহিরের দিকে দৌড় দিল।

ভয় পাইয়া ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিল। পিছনে ছেলেটির মা অন্যমনস্ক ভাবে আসিতেছিল। ছেলের চীৎকারে সচকিত হইয়াই তাহারা দেখিল, রোরুদ্যমান ছেলেটিকে একজন লোক তুলিয়া লইয়া পালাইতেছে। ভয়ে তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ও কি! ও কি!

আর ও কি। লোকগুলা বিজয়গর্ব্বে ছেলেটিকে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সামনে রাখিয়া বলিল, এই নিন আপনার খোকা।

সাগ্রহে পিছন ফিরিয়া চাহিতে গিয়াই ভদ্রলোকের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল: এ তো নয়!

যাঁহার ছেলে তিনি বলিতেছেন, এ নয়, লোকগুলো তথাপি তাহা মানিতে চাহিল না।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলিল, বলেন কি মশাই! শর্ট আছে, শার্ট আছে, রং ফরসা, বয়েস ও···তবু বলছেন, এ নয়?

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এ নয়।

এমন সময় একটি যুবক এবং যুবতী পাগলের মতো ভিড় ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরিলেন। বাপ-মাকে দেখিয়া ছেলেটি আর একবার ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

যুবকটি জনতার দিকে রক্তচক্ষুতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কি তামাসা?

জনতা অম্লান বদনে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওঁকে জিগ্যেস করুন।

যুবকটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বিব্রত মুখের দিকে চাহিল। লজ্জিত ভাবে ভদ্রলোকটি বলিলেন, কিছু মনে করবেন না। আমার একটি খোকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁরা এই খোকাকেই-সেই খোকা ভেবে নিয়ে এসেছেন বোধ হয়।

ভদ্রলোকের এই বিনীত বাক্যে জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটি লোক বড় বড় দাঁত দুইটি হিংস্র-ভঙ্গিতে বিকশিত করিয়া বলিল:

চমৎকার বললেন তো মশাই! আপনি নিজেই বললেন না, ছেলেটির গায়ে শার্ট আর শর্ট আছে?

—তা বলেছি।

—তবে?

বলিয়া লোকটি বিজয়গর্ব্বে সমবেত সকলের মুখের দিকে চাহিয়া লহরে লহরে হাসিতে লাগিল।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। খোকারটির ফিরিবার নাম নাই। ভদ্রলোকটি অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

ফেরিওয়ালারা নিজের কাজে মন দিয়াছে। যে সব বেকারের দল অকারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের ভিড়ও অনেকটা পাৎলা হইয়াছে। কয়েকজন

আল্পস্ (কুরমেইয়ুরের সন্নিকট)।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যাঁহারা এই সময়টা কলেজ স্কোয়ারে বেড়াইতে আসেন, তাঁহারাই এখন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সহায়, সম্বল ও ভরসার স্থল।

—দিন-কাল যা পড়েছে, এখন ছেলে-পুলে নিয়ে রাস্তায় না বেরুনোই সঙ্গত।

—বেরুই না তো। ভুতোটা প্রত্যহ সকালে-বিকেলে আমার সঙ্গে আসবার জন্যে কাঁদে। বৌমাকে বলি, কাঁদুক ও। পূজোর ভিড়টা না কাটলে আর ছেলেপুলে নিয়ে বেরুচ্ছি না।

শুধু কি পূজোর ভিড়! তার চেয়েও বিপদ আছে। বলিয়া ভদ্রলোক এমন ভাবে চোখ টিপিলেন যে, সকলেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন।

আর কি আছে?

চারিদিক চাহিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, সে আর এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব'লে কাজ নেই।

কি বলুন না, শুনি।

ভদ্রলোক আর একবার চারি দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, জার্ম্মানরা এসেছে।

কোথায়? শ্রোতৃবৃন্দ যেন লাফাইয়া উঠিল।

কোথায় তা কি ঠিকানা জানাবে? এই ক'লকাতাতেই আছে কোথাও।

বলেন কি?

হাঁ। কতক ধরাও পড়েছে। তাইতেই তো জানাজানি হ'ল। তাদের কাছ থেকে বহু টাকাও নাকি পাওয়া গেছে?

তার পরে?

তার পরে আর কি? শুনছি সুন্দরবনের একটা খালে সাবমেরিন বেঁধে তারা সহরে ঢুকছে।

কি করবে তারা?

সে তারাই জানে। শুনছি, ছেলেপুলে ধ'রে তাতেই ক'রে চালান দিচ্ছে।

কিন্তু অত ছোট ছেলে নিয়ে কি করবে তারা?

তা কি আমি জানি?

ছোট ছেলেরা তো আর যুদ্ধ করতে পারবে না। বলুন?

ছোট ছেলেরা কি আর বড় হবে না, চিরদিনই ছোট থাকবে?

সে তো অনেক দেরী।

তবে ছোট ছেলে নিয়ে এস্তার বার হবেন। আমার বলবার কিছু নেই।

ভদ্রলোক বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহাকে চটাইতে কাহারও সাহস হইল না।

এই সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে শুনিতে একেবারে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। ভয়ে তিনি ঘামিয়া উঠিলেন। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখন যে কানু কত দূরে পৌঁছিয়াছে কে বলিবে? পুলিসকে অবিলম্বে একটা খবর দেওয়া দরকার। সাবমেরিন জলের ভিতর দিয়া যায়। অন্ধকারে জলের ভিতর দিয়া যাইতে দুধের বালক খুবই হয় তো কাঁদিবে। কিন্তু এই অল্প ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের পক্ষে সুন্দরবনে যেখানে সাবমেরিন বাঁধা আছে সেখানে উপস্থিত হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হয় নাই।

উপস্থিত ভদ্রলোকগণ পরামর্শ দিলেন, ও ছেলে এখানে পাবেন না মশাই। পুলিসে খবর দিন, যদি ছেলে পেতে চান।

সেই কথাই ঠিক। কিন্তু শোফারটা এখনও ফেরে না কেন? সময় বুঝিয়া সে লোকটাও কি উধাও হইল?

শোফারটা নতুন নয় তো?

না বোধ হয়। বছর দুই আগে এসেও যেন ওইটেকেই দেখে গেছি।

তা হ'লে ভালো। এখুনি থানায় চলে যান। গিয়ে ওই গাড়ীতেই পুলিশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

যদি ভালো চান।

ভদ্রলোকগণ নিজেদের মধ্যেই কি যেন হাসাহাসি করিতে করিতে বোধ হয় কলেজ স্কোয়ারের দিকেই ঠুক ঠুক করিয়া চলিতে লাগিলেন।

যুদ্ধের খবর বাবু! যুদ্ধের খবর! ইংরেজের জাহাজ ডুবে গেছে! এক পয়সা! টাট্কা খবর, নেবেন বাবু!

সর্ব্বনাশ! এই জার্ম্মান ব্যাটাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। যাহারা ইংরেজের বাড়ীর কাছে ইংরেজদের জাহাজ ডুবাইয়া দিতে পারে, তাহারা কলিকাতায় আসিয়া আমাদের ছেলে চুরি করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি থাকিতে পারে?

ভদ্রলোক এক পয়সার এক খানা স্পেশাল কিনিয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন।

দরদী জনতার ভিড় তখন একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। কেবল একজন ফেরীওয়ালা তখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। থাকিয়া থাকিয়া একবার সে আসিতেছে, আর জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছে, ছেলেটিকে পাওয়া গেল কি না। এই একটি উপদ্রব ছাড়া আর কোনো উপদ্রব নাই।

কিন্তু শোফারটা ফেরে না কেন? কত দূর গেল সে?

ভদ্রলোক মোটর হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, প্রাণের প্রাচুর্য্যে কলিকাতা যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। সজীব প্রাণীর মতো ট্রাম-বাস সুশৃঙ্খলে চলিতেছে, ইহার মধ্যে তাঁহার খোকার হারানো সংবাদ সরোবরে লোষ্ট্র-নিক্ষেপের মতো একবার তরঙ্গ তুলিয়াই কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

দাদা মশাই!

ভদ্রলোক চমকিয়া উঠিলেন।

হতভাগা ছেলে! কোথায় গিয়েছিলি?

হতভাগ্য বালকের মুখে কিন্তু দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নাই। গাড়ীতে উঠিয়া দাদা মহাশয়ের পাশে বসিয়া সহাস্যে বলিল, ইঞ্জিন দেখছিলাম। কি ধোঁয়া দাদামশাই! উঃ!

ইঞ্জিন!

সোফার মোটরে ষ্টার্ট দিয়া বলিল, রাস্তা মেরামত করার রোলার ইঞ্জিন। ওর ওপরে কানুর অনেক দিনের লোভ আছে। গিয়ে দেখি, সেইখানে কুলীগুলোর মধ্যে ব'সে দিব্যি গল্প জুড়েছে!

হ্যাঁ রে?

কানু গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে।

তুই ওদের চিনিস?

চেনে, না, কখনও দেখে নাই। কিন্তু কানুর কেমন মনে হইল, চেনে। বলিল, চিনি।

স্বদেশ আমার ঘুমে অচেতন

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ দেখিনু কাগজের পাতে লেখার বিজ্ঞাপন—
পূজার আসরে লিখিবার ডাক—খুসী হ'ল না মন।

* * *

বালক বেলায় খুশীর খেলায় খেলেছি আমের বনে—
মিতাদের সাথে কত মাতামাতি কারণে ও অকারণে।
হাওয়ার দোলনে পাশে দেখিতাম কতই দোলার ভীড়—
মনে পড়ে আর জলে ভরে মোর আঁখি ভাগীরথী তীর।
কোথা মোর সেই গ্রাম-জননীর মহিমার ইতিকথা—
কত হাস্যের গত কলরোল্—মধুর চঞ্চলতা।
বালক জীবন হারায়েছি কোন্ অতীত অতল তলে—
তবু মনে হয় সেই মধুময় জীবনে নয়নজলে।
শ্যামলিমা ঘোর মোরে ভুলাইল নয়নে কাজল আঁকি—
সেই ভুলানীর সোনার-সায়রে স্মরণের মধু মাখি।
আজো মনে ভাসে ডহরের জমি—পাশেই 'বাবুর বাঁধ'—
দেখিতাম সেথা জলের মায়ায় খেলায় মাতিত চাঁদ।

ডাক্ ধিন্না ধিন্না হাতে হাত দিয়া করিত হরির নাম—
গাঁয়ের সকল ভাব-বিহ্বল—এই ছিল মোর গ্রাম।

* * *

আজো গ্রাম আছে—ভরা বেদনায় মহিমার সুর নাই—
গরীব চাষার হাহাকারে সেথা বুক ভ'রে উঠে ভাই।

* * *

মোর লিখিবার কিছু নাই আজ—সবই যেন একঘেয়ে—
লিখিতে গেলেই আঁখি আগে দেখি গাঁয়ের মলিনা মেয়ে।
ওদের বিবাহে বাঁধা দিতে হয় বাপ পিতামোর ভিটে—
সব-সহা ও যে পল্লী-বালিকা সকলই উহার মিঠে।

* * *

স্বদেশ আমার ঘুমে অচেতন জীবনের অপমানে—
নূতন জীবনে জাগিবে সে কবে ভাগ্য-বিধাতা জানে।
ভুলিতে পারি না গাঁয়ের বেদনা হারানো মলিন ছবি—
গ্রাম-জননীর মাধুরীর মাঝে আমি বিষাদের কবি।

উনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্য

—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয়, সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল হইয়া উঠে, নানা দিক্ দিয়া পরাধীনতা জাতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, সুতরাং স্পেনীয়জাতির তদানীন্তন সাহিত্যেও এই সমস্যাগুলি তখন প্রাধান্য লাভ করে। জাতির মুক্তি—ইহাই ছিল সাহিত্য সাধনায় এই কালের সাহিত্যিকদের বীজমন্ত্র, তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনের অধিকাংশ সাহিত্যিকই ছিলেন জাতীয়তাবাদী।

স্পেনের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে ইহাঁদের সাহিত্য-সাধনা সমগ্র জাতিকে সেই মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেশ-ব্যাপী এক সংহত এবং সতেজ জাগরণ আনয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই স্পেনের জাতীয় কবি মান্যুয়েল হোসে কিন্তানার (Mannuel Jose Quintana) কথা মনে পড়ে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। স্পেনের জাতীয় কবি হইলেও একমাত্র দেশাত্মবোধ ছাড়া আর সকল বিষয়েই ইনি ছিলেন ফরাসীভাবাপন্ন। তাঁহার জীবনে ফরাসী প্রভাব ছিল খুব বেশী। ইনি ছিলেন সালামান্কা (Salamanca) সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের সাহিত্যাদর্শকেই স্বীয় সাধনায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি কিন্তানা ছিলেন একাধারে হোভেলিয়ানোস (Jove-Llanos) এবং মালিনদেথ ভালদেসের (Malindex Valdes) বন্ধু এবং সমসাময়িক রেনাল (Raynal), টারগট (Targot) এবং কন্দরসেতের (Condorcet) শিষ্য। যদিও ইহাঁর রচনায় ফরাসীভঙ্গিমা, নূতন শব্দ এবং বাক্যাদি প্রয়োগের মোহ প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁহার অক্ষম লেখনীর পরিচয় দেয়, তথাপি ভাবের দারিদ্র্যই ইহাঁর লেখার প্রধানতম অক্ষমতা। যে ভাব-প্রাচুর্য্য ও ভাব-বৈচিত্র্য রচনাকে চির নবীন ও সরস করিয়া পাঠকসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করে, কিনতানার রচনায় তাহা দৃষ্ট হয় না, বরং চল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রমে তিনি যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতেন, তবেই হয়ত তিনি অধিকতর খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, কারণ ইহাঁর শেষ জীবনের লেখাগুলি প্রথম জীবনেরই একটা প্রতিধ্বনি মাত্র। যৌবনে তিনি যে সুরের অবতারণা করিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে তিনি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। গদ্য, পদ্য, নাটক প্রভৃতি নানাপ্রকার রচনায় স্পেনীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিতে প্রয়াস পাই।ছিলেন সত্য, কিন্তু সকল রচনা সমভাবে তাঁহার মর্য্যাদা রাখিতে সমর্থ হয় নাই; তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র দ্যুক দে ভিস্কো'Duque de Visco' উল্লেখযোগ্য। এই বিয়োগান্ত নাটকটি M. G. Lewis-এর 'Castle Spectre' অবলম্বনে রচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লেখার মধ্যে 'Ode to Juan de Padilla' 'Call' to Arms Against the French' প্রভৃতি কবিতা এবং থিদ (Gid), পিথারো (Pizarro) প্রভৃতি প্রাচীন স্পেনীয় ব্যক্তিদের গল্পে লিখিত জীবনীগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'Duque de Visco' বা 'Ode to Juan de Padilla' প্রভৃতি রচনাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়। পরবর্ত্তী রচনাগুলির জন্যই কিন্তানা স্পেনীয় সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এ কথা নিশংসন্দেহে বলা যায়। ইহাঁর কাব্য-রচনা-রীতি সর্ব্বথা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। কাব্যের বিচারে ইহাঁর কাব্য খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া বিবেচিত হইবে না। দেশাত্মবোধ, রাজনীতি এবং মানবসমাজের প্রতি অকৃত্রিম এবং অগাধ ভালবাসা তাঁহার কাব্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে। এইগুলিই তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এবং এইগুলিই প্রকাশ পাইয়াছে ইহাঁর 'Ode to Guzman the Good,' 'Ode on the Invention of Printing' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তানা যুদ্ধ-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। এইজন্য ইহাঁর কবিতাগুলি অধিকাংশই বীরত্বব্যঞ্জক। ইহাঁর রচনা একদিন নিদ্রিত স্পেনীয়জাতির

মধ্যে জাগরণ আনিয়াছিল; দেশাত্মবোধ এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া সমগ্র জাতির জীবনে সংহতি আনিতে সহায়তা করিয়াছিল। এইজন্য তাঁহাকে স্পেনের জাতীয় কবি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

তৎপর অন্যতম জাতীয়তাবাদী কবি হুয়ান নিকাসিও গালেগোর (Juan Nicasio Gallego) নাম করা যাইতে পারে। ইনি কিন্তানার সমসাময়িক। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি একজন ধর্ম্মযাজক কিন্তু আজীবন সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে গালেগো ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। এজন্য ইনি কোনদিনই "Notre Dame de Paris'-র প্রশংসা করিতে পারেন নাই—বরং তীব্রভাবে তার নিন্দা করিয়াছেন। ইঁহার রচনা-সংখ্যা খুব বেশী নহে। কিন্তু নিষ্ঠা এবং সততার সহিত লেখনী চালনা করায় অল্প লিখিয়াই ইনি খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। Elegy বা শোকগাথা রচনায় ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইঁহার On the Death of the Duquesa de Frias নামক শোকগাথাটি গভীর আবেগপূর্ণ। ইহা পাঠক মাত্রেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 'El Dos de Mayo'-এর লেখক হিসাবেই ইনি অধিক সুপরিচিত। 'El Dos de Mayo' ইঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। স্পেনীয় গোলন্দাজ হাথিন্তো (Jacinto), রুইস (Ruis), লুইস দাওইথ (Luis Daoiz) এবং পেদ্রো ভেলার্ত্তে (Pedro Velarte) ফরাসী সৈন্যের হস্তে তাহাদের কামান ও গোলাগুলি অর্পণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলে সমগ্র স্পেনে এক ভীষণ সাড়া পড়িয়া যায়। ২রা মের এই ইতিহাস-বিখ্যাত ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই 'El Dos de Mayo' রচিত। ইহাতে স্পেনের জাতীয় জাগরণের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ইংরেজদের বিরুদ্ধে রচিত ইঁহার 'Ode A la Defense do Bueuos Aires' কবিতাটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচনামাত্রই বীররসাত্মক। এই বীররসের জন্যই গলেগোর লেখা স্পেনীয় সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিয়া আছে।

গলেগোর পরে, উনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্যে ফ্রান্সিস্কো মার্তিনের দে লা রোজা-র (Fransisco Marti-ner de la Rosa—১৭৮৮-১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) নাম উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে ইনি স্পেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে ইউরোপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। স্পেনের রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইঁহার দান সামান্য নহে। সাহিত্যিক হিসাবে ইঁহার যে খুব একটি বিশিষ্ট প্রতিভা ছিল তাহা নহে। ইঁহার গীতি-কবিতাগুলি প্রাচীন স্পেনীয় গীতিকাব্যেরই একটি রূপান্তর মাত্র। ইঁহার রচিত 'Anseneia de la Patria' কবিতাটি ছন্দের কসরৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইঁহার উপন্যাস-গুলির মধ্যে 'Dona Isabel de Solis'-এর কিছুটা নাম আছে। কিন্তু উহাও ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যর ওয়াল্টার স্কটের একটা ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। ইঁহার বিয়োগান্ত নাটক 'La Vinda de Padilla' 'Moraima' এবং অন্যতম নাটক 'Los Celos Infundados' প্রভৃতিও তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। ইঁহার 'Conjuracion de Venecia' এবং 'Aben Humeya' নাটক দুইখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত। শেষোক্ত এই দুইখানি নাটকের জন্যই স্পেনীয় সাহিত্যে ইঁহার নাম চিরস্মরণীয়। প্যারিসে ইঁহাকে কিছু-কাল নির্ব্বাসনে কাটাইতে হয়। এই সময়েই উক্ত নাটক দুইখানি রচিত হয়। 'Aben Humeya' প্রথমে ফরাসী ভাষায় লিখিত হয় এবং ১৮৩০ খ্রীঃ Porte Saint-Martin-এ সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। দ্বিতীয় নাটকটি রচিত হয় ১৮৩৪ খ্রীঃ। এই দুইটি নাটকের মারফতেই ফরাসী 'রোমান্টিসিজ্‌ম্' সর্ব্বপ্রথম স্পেনে প্রবেশ লাভ করে। এই জন্য স্পেনীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুইটি নাটকের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। স্পেনীয় সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম রোমান্টিক যুগের সূচনা করেন বলিয়া 'রোজা'কে স্পেনীয় সাহিত্যের অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক বলা হইয়া থাকে।

ভাগ্যক্রমে যদিও 'রোজা' স্পেনীয় সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তথাপি এ' কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্পেনীয় সাহিত্যে সত্যকারের রোমান্টিসিজ্‌মের প্রবর্ত্তন করেন, তৎপরবর্ত্তী সাহিত্যিক Angel de Saavedra, Duque de Rivas, (১৭৯১-১৮৬৫ খ্রীঃ)। স্পেন ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে বহুকাল ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে বাস করিতে হয়, ফলে মেলেন্দেজ্ ও কিনতানা প্রবর্ত্তিত স্পেনীয় সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত হইয়া

অতি সহজেই ইনি শাতোব্রিয়াঁ এবং বাইরনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। স্পেনীয় সাহিত্যের চিরন্তন ধারা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নব আদর্শে ও সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে 'Al Faro de Malta' এবং 'El Moro Exposito' প্রভৃতি গীতি-কবিতাগুলিই ইঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা। কাব্য-দ্যোতনা-পূর্ণ চমৎকার কাব্যাংশ, জাতীয় পৌরাণিক কাহিনী লইয়া খণ্ড মহাকাব্য রচনা প্রভৃতিই ইঁহার স্পেনীয় সাহিত্যে নবতম অবদান। ইঁহার সুবিখ্যাত নাটক 'Don Alvaro' আধুনিক স্পেনীয় নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগের সূচনা করে। ইঁহার 'Alvaro', 'Leonor' এবং 'Alfanso Vargas' প্রভৃতি নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির মুখ দিয়া যে সব কথা বলান হইয়াছে, তাহা যদিও মানুষের মুখে সচরাচর বড় শোনা যায় না, তথাপি ইহারা অতিমানব বা মানবেতর বলিয়া মনে হয় না। গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ, গাম্ভীর্য্য, হাস্যরস, দর্শন প্রভৃতির সমাবেশে রচিত উক্ত নাটকটি এক যুগকাল স্পেনীয় নাট্যামোদীদের চিত্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

গ্লাডষ্টোনের রচনা যাঁরা পড়িয়াছেন তাঁহাদের নিকট স্পেনের উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সাহিত্যিক হোসে মেরিয়া ব্লাংকো-র (Jose Maria Blanco) নাম ব্লাংকো হোয়াইট, (Blanco White) নামে সুপরিচিত। ইনি ছিলেন সেভিলের গীর্জ্জার একজন পাদ্রী (Canon of Seville)। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়, এবং ১৮৪১ খৃঃ মারা যান। ইঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল বড়ই দুঃখের এবং ইঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কাহিনীটিও বড় করুণ। জীবনে করুণ-রসের প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই হয়ত ইঁহার অধিকাংশ কবিতাই করুণরসাত্মক। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহার রচনায় কবিত্ব-শক্তির অসদ্ভাব ঘটে নাই।

ভাষার গাম্ভীর্য্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং কল্পনার প্রসারতা, ইংরাজীতে যাহাকে বলে flight of imagination ইঁহার রচনায় সুস্পষ্ট। উঁহার একটি কবিতা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতাটিতে ইঁহার কবিত্ব সুস্পষ্ট।

Mysterious light! When our first parent knew
Thee, from report divine and heard thy name,
Did he not tremble for this lovely frame
This glorious canopy of light blue?
Yet' neath a curtain of translucent dew
Bathed in the rays of the great setting flame
Hesperus, with the host of heaven, came,
And lo! creation widened in man's view.
Who could have thought such darkness lay concealed
Within thy beams, O Sun? Or who could find,
Whilst fly, and leaf and insect stood revealed,
That to such countless orbs thou madest us blind?
Why do we then shun death with anxious strife?
If light can thus deceive, wherefore not life?

কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়:—

হে রহস্যময় আলো! প্রথম মানব তোমা জানিল যখন
স্বর্গের বারতা লভি, সেই দিন 'তব' নাম শুনিল শ্রবণে,
চমকি উঠেনি কি হে! সুন্দর মূরতি তব হেরিয়া নয়নে?
ঊর্দ্ধে হেরি নীল নভে—মহিমায় সমুজ্জ্বল সুনীল গগন
স্বচ্ছ স্ফটিকসম শিশিরাবরণ, তারই অন্তরাল হ'তে,
অস্তমিত রবি-কর মরীচি-মালার মাঝে করিয়া গাহন,
সন্ধ্যাতারা এলো নামে, স্বর্গদূত সাথে তব সঙ্গের বাহন
মানবে চকিত করি—ত্রিভুবন লুপ্ত হ'ল তার দৃষ্টিপথে।
কে জানিত এমন তমসাঘন অন্ধকার আছে লুকায়িত
তব রশ্মি আলোকচ্ছটার ওহে দিবাকর! জানে কোন্ জন,
যে আলোকে ক্ষুদ্রতম পত্র কীট পতঙ্গও হয় প্রকাশিত,
অগণিত সে আলোক-রশ্মি তব অন্ধ করে মোদের এমন?
মৃত্যু সাথে ব্যগ্র কেন কলহেতে মোরা কেন তারে তিরস্কার
আলো যদি করে হেন ছল, জীবনের প্রতারণা বিচিত্র কি আর?

অনুবাদে মূল কবিতাটির ছন্দই সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত ব্লাংকোর 'Ode d Carlos III' এবং Resigned Desire প্রভৃতি কবিতাগুলিও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি যে বছরে মারা যান, সেই বছরেই এই কবিতাগুলি লিখিত হয়। ব্লাংকো-কে জানিতে হইলে উক্ত কবিতাগুলি পড়া নিতান্ত আবশ্যক।

ইঁহার বন্ধু আলবার্তো-লিস্তা (Alberto Lista)-ও এক জন সুপরিচিত সাহিত্যিক। একই বছরে অর্থাৎ ১৭৭৫ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। এবং ইনিও ছিলেন সেভিলের প্রধান

গীর্জ্জাবাসী একজন পাদ্‌রী। ইনি নিজে খুব ভাল গান করিতে পারিতেন। কবি হিসাবে ইঁহার খুব খ্যাতি নাই। যদিও কবিতা লিখিয়াছেন অনেক, তথাপি ইঁহার একমাত্র 'A la Muerte de Jesus' কবিতা ছাড়া অন্য কোন কবিতার আর নাম করা যায় না। উক্ত কবিতাটি ছন্দো-প্রধান। সুমিষ্ট শব্দ-সমষ্টি এবং কবিতাটি পড়িতে গেলে শব্দ-নিহিত যে সঙ্গীতের সুরটুকু বাজিয়া উঠে, ইহাই কবিতা-টির একমাত্র সম্পদ্। অধ্যাপক এবং essayist বা প্রাবন্ধিক বলিয়াই লিস্তা অধিক পরিচিত। ইংরেজ সাহিত্যিক ল্যাম (Lamb) কর্ত্তৃক লিখিত 'Specimens of English Dramatic Poets' ইংলণ্ডে যেরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, লিস্তার 'Lecciones de Litaratura Espanola'-ও স্পেনে তেমনই কার্য্যকরী হইয়াছিল। এই জন্য লিস্তাকে প্রাবন্ধিক হিসাবে অনেক সময় 'ল্যামে'র সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে।

এইবার আমরা স্পেনীয় সাহিত্যাকাশের অন্যতম উজ্জ্বল-জ্যোতিষ্ক হোসে দে এস্‌প্রনথেদা (Jose de Espronceda) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইংরেজ কবি শেলী কীট্‌সের মত ইনি ছিলেন স্বল্পায়ু। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে ইঁহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হয়। তাহা হইলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় সাধনার দ্বারা ইনি স্পেনীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

এস্‌প্রনথেদা ছিলেন 'লিস্তা'র ছাত্র। সাহিত্যেও লিস্তার নিকটই ইঁহার প্রথম হাতে-খড়ি। এস্‌প্রনথেদা যখন মাদ্রিদের Colegio de San Mateo-তে পড়েন তখন লিস্তা ছিলেন সেই কলেজের অধ্যাপক। গুরু-শিষ্যরূপে এইখানেই ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার জীবন একটু অদ্ভুত ধরণের, বহু বিচিত্র ঘটনা ইঁহার জীবনে ঘটিয়াছে। এগুলি যেমন অদ্ভুত তেমনই করুণ। এস্থলে দুই একটি ঘটনা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে এস্‌প্রনথেদা 'Los Numantinos' নামক একটি গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন; স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতির জন্য সংগ্রাম করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করার ফলে গুয়াদেলহারাতে ইহাঁর নির্ব্বাসন হয়, এই নির্ব্বাসনে থাকা কালীন লিস্তার উপদেশানুসারে এস্‌প্রন্‌থেদা তাঁহার 'El Pelayo' নামক মহাকাব্য রচনা আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ অল্প বয়সে যাঁহারা মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন, সেই মহাকাব্য বড় সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায় না।

এস্‌প্রন্‌থেদার মহাকাব্যও শেষ পর্য্যন্ত অসমাপ্ত রহিয়া গেল। মাদ্রিদে ফিরিয়া আসিয়া ইনি অধিকতর উৎসাহের সহিত গুপ্ত সমিতি এবং তৎসংক্রান্ত ষড়যন্ত্র কার্য্যে লিপ্ত হইলেন এবং জিব্রালটারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্থান হইতে ইনি লিস্‌বনে আসিলেন, এস্‌প্রন্‌থেদা যখন লিসবনে আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাত্র দুই 'পেসেতা' অর্থাৎ একটাকা ছয় পয়সার মত সম্বল। এসপ্রনথেদা নিজেই এক জায়গায় বলিয়াছেন, আমি যখন লিসবনে পৌছিলাম, তখন আমার সঙ্গে মাত্র এক টাকা ছয় পয়সা সম্বল। তাহাও পকেট হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। কারণ লিসবনের মত এত বড় সহরে এই সামান্য সম্বল লইয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না।

ইংরেজ কবি বাইরনের জীবনেও একবার এমনি ঘটনা ঘটিয়াছিল, লিসবনে তেরেসা (Teresa) নামক একটি মেয়ের সঙ্গে এসপ্রনথেদার পরিচয় হয়। এই 'তেরেসা' তাঁহার জীবনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিসবনে আসিয়াও এসপ্রনথেদা নিস্তার পাইলেন না। সরকারী চর এখানেও তাঁহার অনু-সন্ধান করে। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি লণ্ডনে পলাইয়া যান, লণ্ডনে আসিয়া বাইরনের কবিতার প্রভাবে তাঁহার যেন নবজন্ম হয়। ইংলণ্ডে আসিয়া তেরেসার সঙ্গে তাঁহার আবার দেখা হয়। এসপ্রনথেদা এইবার তেরেসাকে বিবাহ করেন এবং তাহাকে লইয়া প্যারিসে পলাইয়া যান। এখানে আসিয়া তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের যুদ্ধে যোগদান করেন। এদিকে দশম চার্লসের পতনে স্পেনীয় বিদ্রোহীদের মনে যুগপৎ আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। বিখ্যাত নেতা Chapolangarra-র নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধনকল্পে সমগ্র স্পেন ব্যাপিয়া তাহারা এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। Navarre নামক স্থানে Chapolangarra নিহত হইলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকারীভাবে সমস্ত বিপ্লবী রাজবন্দীদের মুক্তি ঘোষিত হইলে এসপ্রনথেদা স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময়ে স্পেনে বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের কোন একটি ভোজ-সভায় স্বরচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া এসপ্রনথেদা বিশেষ সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হন। রাজকীয় সৈন্য-বিভাগে ইনি একটি বিশেষ পদ লাভ করেন। এইরূপে তাঁহার সুদিন দেখা দিতে লাগিল।

এসপ্রনথেদা আবার সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু করিলেন। বক্তৃতা করিয়া এবং প্রবন্ধ লিখিয়া জনসংঘকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বিপ্লবীরা রাজকীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব জয়যুক্ত হইল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এসপ্রনথেদা Hague-স্থিত রাষ্ট্রপ্রতিনিধির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন এবং কিছুদিন পর Almeria-র ডেপুটি পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে মে তারিখে মাত্র চারিদিনের অসুস্থতায় তেত্রিশ বৎসর বয়সে পরিপূর্ণ যৌবনে ইনি পৃথিবী হইতে চিরতরে বিদায় লইলেন। এইরূপে পূর্ণ যৌবনেই এসপ্রনথেদার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের অবসান হইল।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি যে কাব্যচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই স্পেনীয় সাহিত্যে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই, শেলী, বাইরণ, কীটস যেমন অল্প বয়সেই ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অধিক বয়স বাঁচিয়া না থাকিয়া, তাঁহারা হয়ত ভালই করিয়াছেন। তেমনি এস্প্রন্থেদাও অল্প বয়সেই স্পেনীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। এর বেশী বাঁচিয়া থাকিবার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে এবং সাহিত্য-সাধনায় বাইরণের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, একবার স্পেনের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক এবং সাহিত্যিক Conde de Torenoকে এস্প্রনথেদার লেখা পড়িয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'না খুব বেশী পড়ি নাই, তবে বাইরণের লেখা আমি প্রায় সবই পড়িয়াছি।'

এই কথার তাৎপর্য্য হইল এই যে, বাইরণের লেখা পড়িলে আর এস্প্রন্থেদার লেখা স্বতন্ত্রভাবে না পড়িলেও চলে। এস্প্রন্থেদার লেখায় বাইরণের যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল এই কথায় ইহাই সূচিত হইয়াছে।

টরেণোর এই কথা শুনিয়া এস্প্রন্থেদা খুব উত্তেজিত হইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে এস্প্রন্থেদ তাঁহার 'El Diablo Mundo'-র প্রথম পর্ব্বে লিখিয়াছেন—

All necio andaz de corazon de cieno,
A vuien Maman el Conde de Toreno.'

অর্থাৎ কন্দে দে তরেনো একটা আকাট মূর্খ, কেবল অপরের নিন্দা করে এবং ইহার অন্তঃকরণে গলদ ছাড়া আর কিছুই নাই।"

অবশ্য তরেনো যা বলিয়াছেন তাহা একেবারে মিথ্যা নয়। যে অর্থে হাইনে (Heine), ম্যুসে (Musset), লিওপার্ডি (Leopardi) এবং পুশ্‌কিন্ (Pushkin) প্রভৃতি লেখকগণ বাইরণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা হয়, সেই অর্থে এস্প্রনথেদা কর্ত্তৃকও বাইরণ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন বলিলে অন্যায় বা অত্যুক্তি হইবে না। এসপ্রনথেদার 'El Estudiante de Salamanca' বাইরনের 'Don Juan Terorio'-রই প্রতিধ্বনি মাত্র। তারপর ইঁহার "To Jarifa-"তেও সেই একই জীবন-দৃষ্টি, দুরধিগম্যের জন্য সেই দুরপনেয় আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিই চোখে পড়ে। ইঁহার অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'Diablo Mundo'-তেও বাইরণীয় দুঃখবাদই পরিস্ফুট, প্রায় সকল লেখায়ই এসপ্রনথেদা নিজেকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোন লেখকই স্বীয় ব্যক্তিত্বকে একেবারে বাদ দিতে পারেন না। এসপ্রনথেদা সে চেষ্টাও করেন নাই, এ জন্য ইঁহার Dona Blanca de Borbon' একটা ব্যর্থ সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 'Diablo Mundo' এবং 'Estudiante de Salamanca' বাইরণ এবং জার্ম্মান কবি গ্যেটের আদর্শে লিখিত। এই সব লেখায় তাঁর নিজের কথা, স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং নিজের ব্যক্তিগত চরিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে, ব্যক্তিগত চরিত্রে বা সাহিত্য সাধনার দিক্ দিয়া যদিও এসপ্রনথেদাকে খাঁটি স্পেনীয় বলা যায় না, তথাপি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সে যুগে গীতিকাতে এসপ্রনথেদা-ই ছিলেন স্পেনের শ্রেষ্ঠ কবি।

বাসে

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

এস্প্লানেড টু খিদিরপুর ; হু হু শব্দে বাস ছুটিয়াছে। অন্ধকার বাদলা রাত্রি, তিন দিন অনবরত ফিন্‌ফিনে বৃষ্টি লাগিয়া থাকায় কলিকাতার পথ-ঘাটের যা অবস্থা হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। রাস্তার গ্যাস-লাইটগুলির পুরু কাঁচ বৃষ্টির ছাটে কেমন ঘোলাটে হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর খড়খড়ি তুলিয়া দিয়া বিদ্যুতালোকিত বদ্ধ কাঠের ঘরে কুড়ি বাইশটি প্রাণী 'আরামে' গল্প করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই বাদলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় পাঁচজন একত্রিত হইলেই ভদ্রভাবে দেহ-মন গরম করিয়া লইবার জন্ত যে ছুটি জিনিষের একান্ত আবশ্যক, বলাই বাহুল্য সে ছুটি—গরম চা ও পলিটিক্স।

স্থান ও কাল বিবেচনায় প্রথমটির চর্চ্চা সম্ভব নহে বলিয়া দ্বিতীয়টির চর্চ্চা সবেগেই চলিতেছিল।

সামনেকার একজন সহযাত্রী তাঁহার বিরাট গুম্ফ আন্দোলন করিয়া ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গী সহকারে বলিলেন, "দেখেছেন মশাই। সমস্ত ইণ্ডিয়াটা আজ বাংলার বিরুদ্ধে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র করছে। কিছুতেই মাথা তুলতে দেবে না আর কি—নইলে কি আর এমন কাণ্ডটা হয়—"

পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় জন বাধা দিয়া কহিলেন, "সে ত বটেই, দেখছেন না গাঁধীর কাণ্ডটা একবার। বাংলার এতগুলো রাজবন্দী যে উপোস করে মরতে বসেছিল, সেজন্তে কি একটু ভাবনা দেখেছেন কারও? আর এই যে দু' দু'বছরের রাষ্ট্রপতি, তাকে কি না শেষে—"

"হোপলেস—"

"স্রেফ জেলাসি (হিংসা), বাংলার ব্রেণকে (মস্তিষ্ক) ওরা যেমন করেই হোক দাবিয়ে রাখতে চায়। নইলে সুভাষ বোসকে কি না—"

কোণ হইতে কে একজন বলিল, "সব বেটাকেই বোঝা গেল কিন্তু এই ব্যাপারে। এখানে এতবড় একটা ব্যাপার চলছে কংগ্রেসে আর জহরলাল চললেন চীনে—যত সব—"

"ওঃ আজ দেশবন্ধু থাকলে—"

"তা হলে কি আর কথা ছিল, তবে সুভাষও ছাড়বার ছেলে নয়। দেখুন না তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক কি কাণ্ডটা করে...।"

ক্রমেই আমরা উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছিলাম। গাড়ী সশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, আলোচনাও প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে ছুটিয়া চলিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমরা প্রমাণ করিয়া ফেলিলাম, মহাত্মা গান্ধী একটি ঘুঘু বেনে, জওহরলাল হিপক্রিট (ধাপ্পাবাজ), বাদ-বাকী সবাই বোগাস, (বাজে) স্বার্থান্বেষী ও মিনিষ্টার-পদপ্রার্থী। ঘরে বাইরে এই ভাবে বাংলাকে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, তাই রক্ষা, নহিলে আমরা একবার দেখিয়া লইতে পারিতাম, ইত্যাদি—

আমার পাশেই একজন কোটপ্যান্ট-পরিহিত বিপুল-দেহ ভদ্রলোক নির্লিপ্তভাবে একটা মোটা চুরুট মুখে দিয়া চিমনির মত ধূম উদ্গীরণ করিতেছিলেন, এতক্ষণ একটা কথাও কহেন নাই।

একটু ঠেলা দিয়া কহিলাম, "বুঝলেন মশাই, বাঙ্গালীর যদি আজ ইউনিটি (একতা), থাকত তবে দেখতেন ভারতবর্ষের চেহারাটাই অ্যাদ্দিনে বদলে যেত"—ভদ্রলোক তেমনি নির্লিপ্তভাবে একটু হাসিয়া পুনরায় একমুখ ধূম উদ্গীরণ করিলেন। রাগে সর্ব্বশরীর জলিয়া গেল—ভাবিলাম, এই জাতীয় লোকগুলোর জন্তই বাংলার আজ এই দুর্দ্দশা।

বাসে যাহাদের সঙ্গে চলিয়াছি, আগেও তাহাদের দেখি নাই, পরেও হয়ত দেখিব না। বাস-চলতি কয়েক-মিনিটেরই বা পরিচয়, তবু দেশের দুরবস্থা আলোচনায় সমমতাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদের সহিত যেন হৃদয়ের ঐক্য অনুভব করিলাম। কেবল পাশের ঐ বিজাতীয় পোষাক-পরিহিত ভদ্রলোকটির প্রতি মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল—

টুং।

জেনোয়া।

ছুটন্ত বাসখানা মুহূর্ত্তের জন্য একবার থামিয়াই ছুটিল। এ উহার গায়ে টাল খাইয়া আবার সোজা হইয়া বসিলাম। উঠিলেন একটি তরুণী। ছোট্ট লেডিস ছাতাটি বহিয়া টুপ টুপ করিয়া জল ঝরিতেছে। গাড়ীর কিয়দংশও সম্ভবত ভিজিয়া গিয়া থাকিবে। গাড়ীতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে চার পাঁচজন লাফাইয়া উঠিয়া এতখানি জায়গা করিয়া দিলাম যে, তিন চারিজন মহিলা স্বচ্ছন্দে ও আরামেই বসিতে পারিতেন। আর যাহাই হউক বাঙ্গালীকে ভদ্রতা শিখাইতে হইবে না। মহিলাটিও বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পূর্ণ স্থানটি অম্লান বদনে দখল করিয়া সিক্ত ছাতা ও ব্যাগ ছড়াইয়া আরামে বসিলেন এবং আমরা চার পাঁচজন স্বল্প-পরিসর স্থানে পিতলের ডাণ্ডা ধরিয়া বেহার ভূকম্পনের প্রচণ্ডতম বেগ আস্বাদন করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলাম।

তরুণীর বয়স বিশ বা একুশ হইবে। গৌরবর্ণা না হইলেও সুন্দরী বলা চলে। বেশ-ভূষায় অতি-আধুনিকতার ছাপ পুরা মাত্রায়। লক্ষ্য করিলাম, বাস সমেত সকলেই একবার যেন অলক্ষিতে মহিলাটির সর্ব্বাঙ্গে সমবেদনার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। এই দুর্য্যোগের রাত্রি একলা পথে বাহির হইয়াছেন, হয়ত, ইঁহারা পুরুষের সমাধিকার দাবী করিয়া জীবন-সংগ্রামে নামিয়াছেন, কিন্তু fair sex-এর সুবিধাটুকু আঠার আনা আদায় করিয়া লইতে ছাড়েন না দেখিতেছি।

আলোচনার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। সামনেকার বিরাট-গুম্ফ মহাশয় নূতন করিয়া আলোচনার সূত্র ধরাইলেন—"যাই বলুন মশাই, বেঙ্গল ফর বেঙ্গলীস (বাঙ্গালা বাঙ্গালীর জন্য) না করলে আর এ জাতের রক্ষে নেই। আমি ওসব বিশ্বপ্রেম-ট্রেম বুঝিনে। উড়ে মেড়োয় দেশ ছেয়ে গেল, আর আমরা হলাম বেকার। সাপোর্ট বেঙ্গলী ফার্ষ্ট, দেখবেন সুড় সুড় করে সব বেটা সরে পড়তে পথ পাবে না—"

নীচেকার মাধ্যাকর্ষণের টান, সামনেকার বিশ মাইল স্পীড এবং দুই পার্শ্বের বিপুল চাপের সমন্বয় সাধন করিয়া ভারকেন্দ্রের সমতা-রক্ষা করিতে গিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেছি। দুলিতে দুলিতে বলিলাম, "জানেন, এই কোলকাতা থেকে প্রতি সপ্তাহে ঠাকুর, চাকর, দরওয়ান, মুটে-মজুররা কত টাকা বাংলার বাইরে চালান দেয়?"

আমার পৃষ্ঠসংলগ্ন দোদুল্যমান দ্বিতীয় ব্যক্তি কানের কাছে হতাশাব্যঞ্জক হুঙ্কার ছাড়িলেন, "যা বলেছেন স্যর, এ দেশের কী আর 'ভাক্তি' আছে।"

গুম্ফ মহাশয় বসিয়াই ছিলেন। খড়-খড়ির ফাঁকে স্থানটা একবার দেখিয়া লইয়াই উঠিয়া ঘণ্টা বাজাইলেন—নামিবেন।

বাসটা মুহূর্ত্তের জন্য একবার গতি হ্রাস করিয়াই আবার ছুটিয়া চলিল। এক হাতে ছাতা ও কাপড় সামলাইয়া এই রাত্রে চলন্ত বাস হইতে পিচ্ছিল পথে অবতরণ সহজ নহে। গুম্ফ মহাশয় সম্ভবতঃ পড়িয়া গিয়া থাকিবেন। তাঁহার পরিত্যক্ত স্থান সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকায় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, কেবল দূর হইতে তাঁহার অস্ফুট কণ্ঠের গালাগালি চলিতে কাণে আসিতেই স্থানটা পার হইয়া গেলাম।

আরাম করিয়া বসা গেল গন্তব্য স্থান আর বেশী দূরে নাই, গল্প তেমন জমিতেছে না। বাংলার অবশ্যম্ভাবী দুর্দ্দশায় আমরা সকলেই যেন ম্রিয়মাণ। তরুণীটি যথোচিত আলোকপ্রাপ্তা ও পুরুষের সমাধিকার-প্রার্থিনী হইয়াও বাসে আমাদের আলোচনায় একটুও যোগ দিতে পারেন নাই। আলোচনাপ্রসঙ্গে দু-এক বার তাঁহার মুখের দিকে নীরব সমর্থন লাভ করিবার জন্য চাহিয়া ছিলাম, নির্লিপ্ত দৃষ্টি দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। যতই আধুনিক হউন, এই তফাৎটা কোনও দিন ঘুচিবে কি? বাসে বসিয়া সমস্বরে পলিটিক্স চর্চ্চা?

তরুণীটি এবার ভ্যানিটি ব্যাগ ও ছাতাটি বাগাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চার পাঁচজন আমরা যুগপৎ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"বাঁধকে, বাঁধকে, একদম বাঁধকে, জেনানা হ্যায়—"

বাস একদমকেই বাঁধিল, তবে মুহূর্ত্তের জন্য। যেন বুড়ি ছুঁইয়াই ছুট।

গ্যাসের আলোয় দেখিলাম তরুণীটি নামিলেন এবং তাড়াতাড়ি গ্যাসপোষ্ট ধরিয়া ফেলিলেন, পিচ্ছিল পথ, দুর্ঘটনা একটা ঘটিয়া যাইতে পারিত। বিলাতি খুদ্রওয়ালা

জুতা বাঙ্গালী অন্তঃপুরিকাদের অলক্তক-শোভিত শ্রীচরণে এখনও তেমন ধাতস্থ হয় নাই। সময় বুঝিয়া পিচ্ছিল পথে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

বাসওয়ালার বেয়াদপিতে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। "রাস্কেল, ইরেসপন্সিবল, খোট্টা ভূত কোথাকার—"

এতগুলো সহযাত্রীর সহানুভূতি পাইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে হিন্দি ও বাংলার অদ্ভুত সংমিশ্রণে যে ভাষায় বাসওয়ালার প্রতি মনের ঝাল ঝাড়িলাম, একলা থাকিলে তাহাতেই একটা অনর্থ ঘটিয়া যাইত। বাঙ্গালীর ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা হইতে অন্যায় করিয়া বঞ্চিত করিয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব হইতে ইহাদের উপর মনটা নিরতিশয় তিক্ত হইয়াছিল। দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে সজোরে ঘোষণা করিলাম, বাংলার বুকে বসিয়া বাংলার অর্থ শোষণ করিয়া ইহাদের ক্রমশই নবাবোচিত মেজাজ হইয়া পড়িতেছে। সামান্য ভদ্রতা জ্ঞান ত নহেই, এমন কি দায়িত্ব জ্ঞানটুকুও ইহাদের কাছে আর আশা করা যাইতেছে না। বাঙ্গালী হইলে কখনও এমন হইতে পারিত না। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও সম্মান-রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে একমাত্র বাঙ্গালী-চালিত বাস ছাড়া অন্য কাহারও বাস না চড়িবার দুর্জ্জয় পণ করা ছাড়া উপায় নাই। ইত্যাদি—

রাগের মাথায় এই জাতীয় অনেক কিছুই বলিয়া গেলাম। হিন্দুস্থানী ছোকরা কণ্ডাক্টারটা একবার কি যেন বলিতে আসিয়া এতগুলি ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ভয় পাইয়া পিছাইয়া গিয়াছে।

ওয়াটারলু-বিজেতা ওয়েলিংটনের মত মুখভঙ্গী করিয়া সগর্ব্বে স্বস্থানে বসিতে যাইব, এমন সময় ড্রাইভারটি পরিষ্কার বাংলায় বলিয়া উঠিল, "যা বলেছেন স্যর, গাড়ীটা বড্ড লেট যাচ্ছে কি না, এটুকু মেরে নিতে না পারলে দেবে শালারা ফাইন করে। বাস সিণ্ডিকেটে হয়েছে যত শালা মেড়োর রাজত্বি।..."

মুহূর্ত্তমধ্যে কে যেন আমার মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসাইয়া দিল, পিঠে পড়িল সপাং করিয়া যেন চাবুকের এক ঘা।

চাহিয়া দেখি পার্শ্ববর্ত্তী বিজাতীয় পোষাক পরিহিত চুরুটধারী ভদ্রলোক হাস্য গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সীতা দেবীর ধরণীর মত দারুময় বাসখানি আমার আজ্ঞাবহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহার গর্ভে আমাকে স্থান দিতে বলিতাম। কিন্তু বাস-খানিও সীতা দেবীর বসুমতী নহে, কালটিও ত্রেতা নহে, তাই অগত্যা বাসের ঘন্টিটা একবার বাজাইয়া দিয়াই অন্ধকারের মধ্যে চলন্ত বাস হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলাম।

বৃষ্টি বেশ জোরেই আরম্ভ হইয়াছে; বাড়ী এখনও অনেক দূরে।

গণদেবতার পূজা

......শব্দের স্বাভাবিক অর্থ কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বেদাঙ্গ ও বেদের সাহায্যে সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে "পূজা" শব্দে "আমরা যাহা কিছু বুঝি ও শ্রবণ করি তাহা তাদৃশ ভাবে বুঝি ও শ্রবণ করি কেন ইহা প্রত্যক্ষ করিবার কার্য্য"কে বুঝিতে হয়। আর "গণদেবতা" বলিতে বুঝায় "মস্তিকমধ্যস্থ-রস-বিকাশক এমন কিছু বস্তু যাহার কার্য্যের ফলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এবং চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।" "গণদেবতার পূজা" বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত অনুভূতিমূলক কার্য্য, যে-সমস্ত কার্য্যের দ্বারা মানবাস্বরে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এবং চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় কেন, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়।......

বাঙ্গালা সাহিত্য

[বাঙ্গালা সাহিত্য—বর্ত্তমান ও প্রাগ্‌বর্ত্তমান, উভয়ের সম্বন্ধেই বিভিন্ন ও বিবিধ মতবাদ প্রচলিত। মূলতঃ এ বিষয়ে দুইটি মতবাদের প্রাধান্ত দেখা যায়। একটি হইতেছে যাঁহারা নিজেরা সাহিত্যিক, তাঁহাদের। তাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট না হইলেও, তুচ্ছ নহে, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের রুচিবোধ নাই বলিয়াই তাহার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়টি হইতেছে, পাঠকশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের। ইহাঁদের মধ্যে পুনরায় দুইটি বিভাগ দেখা যাইবে,—(১) যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার মারফৎ বিভিন্ন সাহিত্যের বাজারের সহিত পরিচিত, (২) যাঁহারা তাহা নহেন। পাঠকশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার মারফৎ সাহিত্যের বাজারের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের একটি বৃহদংশ মত পোষণ করেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে আজিও পর্য্যন্ত তেমন বিশিষ্ট কোন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অপরাংশ বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে শিশু-সুলভ ঔদাসীন্য, প্রীতি, বিরক্তি কিংবা বিস্ময়ভাবাবিষ্ট। কিন্তু ইহাঁদিগকে বাদ দিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের অপর একটি বিপুল বিশাল নামগোত্র-কুলহীন সম্ভাব্য পাঠক-সাধারণ দেখা যায়। তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য আজিও পরিচিত নহে, অতিমাত্রায় অপরিচিত। তাঁহারা যে সুখ-দুঃখের কারবার করেন, আজিও বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও নাগাল পায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আগামী যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাদেরই লইয়াই রচিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

এই স্থানে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যে কয়টি আলোচনা উপস্থিত করিতেছি, তাহার কোনটির সহিতই আমাদের সম্পূর্ণ মতসাম্য নাই, বরং কয়েক স্থলে ইহাঁদের সহিত আমাদের মত-বিরোধিতা বর্ত্তমান। তথাপি কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার সামান্য পরিচয় দানের উদ্দেশ্যেই ইহারা সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হইতেছে। —বঃ সঃ]

কা'র কোথা স্থান

একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, আমাদের দেশে সাহিত্যিকের কোন সম্মান আমরা দিই না। যদি কোন সামাজিক আসরে এমন দুই ব্যক্তিকে পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়, যাঁহাদের একজন লেখক ও অন্যজন কোন ইংরেজ আপিসের পাঁচশো টাকা বেতনের 'সায়েব', তবে নিশ্চয়ই সেই 'সায়েব' কেরাণীকে আপ্যায়ন করিতে পাঁচজন লোক হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিবে; অপর পক্ষে লেখক বেচারাকে কেহ হয়ত লক্ষ্যই করিবে না। অথচ বাংলাদেশে সাহিত্যই বোধ হয় একমাত্র সম্পদ্ যাহা লইয়া আমরা আজও গর্ব্ব করিতে পারি।

আমাদের জীবিত সাহিত্যিকদের এই অবহেলার পাশাপাশি লক্ষ্য করিবার মত আরও একটা মজার ব্যাপার আছে। মৃত সাহিত্যিক মাত্রই আমাদের দেশে মহা-সাহিত্যিক, কবি মাত্রই মহাকবি। বৈষ্ণব-কবি অসংখ্য আছেন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস; আবার এক একটি নামের পিছনে অনেক সময় তিন চারজন কবি আত্মগোপন করিয়া থাকেন। এই সব স্মরণীয় কবিদের রচনা বাংলা সাহিত্যের একটি অংশকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা প্রায় প্রত্যেক বাঙালীই জানে। কিন্তু সেই আলোকের উৎসের মধ্যে কোন্‌টি চাঁদ আর কোন্‌টি জোনাকি, সে ধারণা বাংলাদেশে অতি-উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও যে-কয়জনের আছে, তা'র সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেও বোধ হয় বাড়াইয়াই বলা হইবে। বাঙালী যাঁহাদের কবি বলিয়া স্বীকার করে—তাঁহারা সকলেই ব্র্যাকেটে ফার্ষ্ট—মহাকবি। বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে সাহিত্যের নানা বিভাগে যে-কজন সম্রাটের উল্লেখ দেখা যায়, ততগুলি সম্রাট্ কোনও দিন পৃথিবীতে ছিল কি না সন্দেহ।

মৃত সাহিত্যিকদের নির্ব্বিচার প্রশংসা ও জীবিত সাহিত্যিকদের প্রতি অবহেলা—উভয়েরই কিন্তু মূল কারণ এক। আমাদের সাহিত্য নানা বিভাগে সমৃদ্ধ হইয়াও সমালোচনা অংশে নিতান্ত দরিদ্র। সমালোচনা বলিতে আজও আমরা নিছক গালাগালি নতুবা 'আহা' এবং 'ওহো'-পূর্ণ উচ্ছ্বাস বুঝি। প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগের সাহিত্যের এখনও কোনো প্রকৃত সমালোচনা হয় নাই। এমন কি প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে পর্য্যন্ত কেবল উচ্ছ্বাসের আবেগ ভিন্ন কবিগণের আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণের কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। অবশ্য তুলনার নিষ্ফলতা আমি জানি; তথাপি একথা অনস্বীকার্য্য যে মহৎ কবিকে তাঁহার প্রাপ্য আসনে বসাইতে হইলে অপরের স্থান আপনা হইতেই খানিকটা নামিয়া আসে। সেহেতু সাহিত্য-রসিককে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে ক্ষীর গ্রহণ করিয়া নীর ত্যাগ করিতেই হইবে; সাদা জিনিষ দেখিলেই 'অহো' বলিয়া মূর্চ্ছা গেলে চলিবে না। যদি বিদগ্ধ-জন সে-কর্ত্তব্য পালন না করেন, তবে কেবল সাহিত্যের প্রতি নয়, সমাজের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্বও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কেন না শুধু সেরূপ অবস্থাতেই উৎকৃষ্ট লোকের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট লেখক কেবল মাত্র তাহাদের রচনার প্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিতে পারে। বাংলাদেশে আজ তাহাই হইতেছে।

আজ আমাদের দেশে এমন কেহই নাই, যে জোর করিয়া বলিতে পারে যে, গোবিন্দদাস আধ্যাত্মিক কবি হিসাবে নমস্ত হইলেও চণ্ডীদাসের তুলনায় তাঁহার স্থান অনেক নীচে, চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁহার নাম উচ্চারিত হওয়াই উচিত নয়। এমন বিশ্লেষকের আজ প্রয়োজন, যিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, মাইকেলের কবি-প্রতিভার নিকট হেমচন্দ্রের ও নবীন সেনের প্রতিভা পর্ব্বতের পাশে বল্মীকের তুল্য। মুড়ি-মুড়কির একদর সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসহ্য। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা যদি কোনোরূপে শিক্ষাপদবাচ্য হইত, তবে উচ্চশিক্ষিতেরা নিজেরাই এ তারতম্য বুঝিতে পারিত। স্পষ্টই বোঝা যায়, আমরা সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও সাহিত্যের কিছুই বুঝি না।

বড় কবি এবং ভাল কবির প্রভেদ বাঙালী আজও বুঝিল না, ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। অথচ মজা এই যে, আমাদের দেশের অসংখ্য ডিগ্রীধারীদের অধিকাংশকেই সাহিত্য পড়িতে হয়। তাহারা ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের বাছা-বাছা জিনিষ পড়ে, সে সম্বন্ধে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনে, নোট মুখস্থ করে, এমন কি 'এসে' লিখিতে বসিয়া দু' একটি ভালো ভালো লাইন উদ্ধৃত করিতেও কসুর করে না। অথচ কি আশ্চর্য্য, আপনি সাহিত্যিক ভিন্ন প্রায় যে-কোন উচ্চশিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখুন—এত পড়িয়াও কোনো বিশেষ লেখকের রচনার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হইবে না। অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত এবং অনুচ্চশিক্ষিত বৈদেশিকেরই কোন না কোন প্রিয় লেখক আছে—যাহার বই পড়িয়া সে অবসর বিনোদন করে, যাহার বই পড়িতে সে ভালবাসে। বাঙালী কিন্তু কোনও লেখাকেই পছন্দ বা অপছন্দ করে না। কোনও কিছু হাতের কাছে আসিলে পড়িয়া বলে 'বেশ', কিংবা 'বাজে'। বিশেষ কোন লেখাই সহজে তাহার মনে দাগ কাটে না এবং কোনো গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করাও তাহার মজ্জাগত নয়।

আসল কথা বিচার ও বিশ্লেষণ-শক্তি বাঙালীর প্রায় নাই। ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর হইতে পারে না, কারণ ভারতবর্ষে জন্মিয়া আমরা যে ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছি, তাহা বিশ্লেষণ-শক্তির চূড়ান্ত নিদর্শনে সমুজ্জ্বল। পাণিনি যে যে দেশে সম্ভব হইয়াছিল, অতুলনীয় দর্শনশাস্ত্র যে-দেশে জন্ম লাভ করিয়াছে, সে-দেশের এ দারিদ্র্য দুর্দ্দৈব ছাড়া আর কি?

যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, বাংলায় আজ পর্য্যন্ত একখানাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয় নাই। যুগ-প্রবর্ত্তক সাহিত্যিক বলিয়া যাঁহারা স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদের কাহারও সমগ্র রচনার যথোপযুক্ত আলোচনা করিয়া একখানি বইও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের উপর এ-পর্য্যন্ত একখানাও ভাল বই কেহ লেখেন নাই; অন্ততঃ আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এই, এবং এ-বিষয়ে আরও অনেক সাহিত্য-রসিক আমার সঙ্গে একমত। রবীন্দ্রনাথ না হয় অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, কিংবা তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি ও

বিশ্লেষণ না হয় বহু আয়াসসাধ্য, কিন্তু আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্যেরই বা কতটুকু আলোচনা হইয়াছে? যে-সব ছাত্রকে বাংলা ভাষায় উপাধি পরীক্ষা পাশ করিতে হয়, তাহারাই জানে কত কম বইয়ের উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হয়। যাঁহারা ছাত্র নহেন, তাঁহারা যদি কখনো দু' একখানা বই পড়িয়া বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চান, তবে তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতেই হইবে।

বাংলা সাহিত্যের শৈশব আর এখন নাই। 'আহা' 'অহো' আর উচ্ছ্বাসের দিন আজ শেষ হইয়াছে। হবুচন্দ্রের রাজ্যের মত আমাদের মুড়ি-মুড়কির সমান দর রাখিলে আর চলিবে না। আসল আর নকল হীরা, সোনা আর তামা একই গুদামে পুরিয়া আমি খুব ধনী বলিয়া চীৎকার করা চলে না। আমরা যে সাহিত্যের এত গর্ব্ব করি, যদি কোনো বৈদেশিক সে গর্ব্বের কারণ জানিতে চায়, তবে তার কি জবাব আমরা দিতে পারি? কতকগুলি নাম আওড়ানোতেই নিশ্চয় আমাদের উত্তর শেষ হইবে।

অতএব আমাদের দেশে আজ কয়েকজন দুঃসাহসী সমালোচক প্রয়োজন, যাঁহারা সাহিত্যের বিচার করিয়া আমাদের লেখকদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য আসন দান করিবেন। নির্ভীক আলোচনার অভাবে একদিকে যেমন বহু লেখক মাত্র মাঝারি জিনিষ লিখিয়াও প্রথম শ্রেণীর লেখকের সম্মান লাভ করিতেছেন, অপরপক্ষে তেমনি বহু লেখক উৎকৃষ্ট জিনিষ রচনা করিয়াও অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হইয়া আছেন। সকলেই জানেন শেক্‌স্‌পীয়রকে একসময়ে বেন্ জনসন্ প্রভৃতির সমকক্ষ নাট্যকার বলিয়াই মনে করা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাবান্ সমালোচকেরা তাঁহাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলে তবে তিনি তাঁহার ন্যায্য আসনে অধিষ্ঠিত হন। ঠিক অতবড় না হইলেও আমাদের দেশেও অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা আজও তাঁহাদের ন্যায্য স্থান লাভ করেন নাই। যদি কোনদিন বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়, তবেই 'স্বর্ণলতা'র লেখক তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা লাভ করিবেন। 'কঙ্কাবতী'র সাহিত্যিক মূল্য অবজ্ঞা করিবার মত নয়। কাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনেকাংশে পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রতিভার সঙ্গে বাঙালীর কোনও পরিচয় ঘটে নাই। অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন এখন নাম মাত্রে পর্য্যবসিত এবং কাব্যপুস্তকের ভিতর দিয়া ভিন্ন এই দুই কবির রচনার সঙ্গে পরিচিত হইবার অন্য উপায় আমাদের প্রায়ই নাই। সে-কারণ ইঁহারা যে কত উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন এবং ইঁহাদের রচনায় বৈশিষ্ট্য যে কত বেশী, তাহা অতি উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরও জানিবার উপায় অতি অল্পই আছে। আর একজন অসামান্য প্রতিভাশালী কবি ভাওয়ালের গোবিন্দ চন্দ্র দাসের অপূর্ব্ব রচনাগুলি যে আরও কিছুকাল অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার বইগুলি এখন আর কিনিতে পাওয়া যায় না। জীবিত কবিদের মধ্যেও যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, কালিদাস রায় এবং সুরেশ চক্রবর্ত্তীর নাম আমরা একসঙ্গে উচ্চারণ করিতেই শিখিয়াছি। কেহ বলিতে পারেন ইঁহাদের লেখার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের সময় এখনো আসে নাই। কিন্তু যদি তাহাই হয়, কুড়ি পঁচিশ বৎসর একাগ্র সাহিত্য-সাধনার পরেও যদি জনসাধারণের চোখে নিকৃষ্ট কবিদের সমকক্ষ হইয়াই থাকিতে হয়, তবে কবির মনে অভিমান আসাও কিছু বিচিত্র নয়। কিংবা হয়ত তিনি নিজেই একদিন বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিতে পারেন যে, তিনি একজন সামান্য কবির চেয়ে বেশি কিছু নহেন। যে-কোনো সাহিত্যসেবীর পক্ষে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের চেয়ে মারাত্মক আর কিছুই নাই। এজন্য সম্পূর্ণ না হোক প্রাপ্য সম্মান সকলকেই অন্ততঃ কিছুটা দেওয়া ভালো। কিংবা যদি নিন্দাই প্রাপ্য হয়, তবে বিচার করিয়া সে কথা বলিয়া দিবার যেন কেহ থাকে। এই জন্য প্রত্যেক সত্যকার সাহিত্যিকই তাঁহার রচনার যথেষ্ট আলোচনা হোক ইহাই পছন্দ করেন। নিষ্প্রাণ অবজ্ঞার চেয়ে সাহিত্য-সাধকের পক্ষে অভিনন্দন ও আঘাত দুই-ই বরণীয়।

—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

সাহিত্যের বন্ধন-মুক্তি

ডি কুইন্সি বলেছেন,—"Every literature, unless it be crossed by some other of different growth and that particularly at a critical time of its career naturally tends to superannuation." বিভিন্ন ভাবপ্রবাহের সংঘাত ও সম্মেলনের মধ্য দিয়েই সাহিত্য তার গতি ও বিস্তৃতির অবকাশ পায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতিপথে একদা অবরোধের আশঙ্কা জেগে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় ভাষা আড়ষ্ট, গতি প্রবাহহীন, প্রাণশক্তির পরিচয় অবলুপ্ত-প্রায়। গদ্য-সাহিত্য তখনও সূতিকাগার পার হয় নি—পদ্য-সাহিত্যে জরার চিহ্ন পড়ে গেছে, সাহিত্যের সে তামসী যুগে বঙ্কিম, হেম, মধু, নবীন, এঁরা সাহিত্যকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের সংযোগে সমৃদ্ধ করবার ভার নিলেন। তাঁরা স্কট, মিল্‌টন, হোমর, বাইরন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের ভাবসম্পদ, গঠন-প্রণালী, বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে নিয়ে এলেন—বাংলা-সাহিত্য ও ভাষাকে এক অপূর্ব্ব মহিমায় রূপায়িত করে তুললেন। তার পর আমাদের ভাষা ও সাহিত্য প্রবলতর ভাবপ্রবাহ নিয়ে ক্রমে বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে আপন আসন সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ করে নিয়েছে, সে ইতিহাস আজ বাংলা সাহিত্যিকদের কাছে অপরিজ্ঞাত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র হ'তে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিশিষ্ট সাধক যাঁরা, তাঁদের অনন্যসাধারণ অবদানে আজ বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ, পরিপুষ্ট ও শক্তিমান্। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব মনীষা, বিশ্বসাহিত্যের অসাধারণ জ্ঞান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যে পরিণতি দান করেছে, তাতে আজ একথা জোর করে বলতে পারি, বাংলাভাষা আজ পূর্ণ-যৌবনা। যে-কোন ভাবই হোক না কেন, ভাষায় তাকে প্রকাশ করার শক্তি আজ তার হ'য়েছে। সে আজ ক্লিষ্ট নয়, পঙ্গু নয়, অপরিস্ফুটতার বেদনা তার মধ্যে নেই। বাংলা-ভাষার আজ গৌরবের দিন। ভারতীয় ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আজ শুধু বাংলা ভাষাই করতে পারে। উর্দ্দু নয়, হিন্দি নয়, অথবা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা নয়। সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হবার একমাত্র দাবী বাংলা ভাষারই হয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ণধারগণ আজ হিন্দিভাষী বলে বাংলাভাষাকে সর্ব্বভারতীয় ভাষার উপযুক্ত বাহনের অযোগ্য মনে করতে পারেন, প্রাদেশিক ভাষা বলে উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু বাংলা-ভাষা যে সর্ব্ববিষয়ে হিন্দি ও উর্দ্দু হতে শ্রেষ্ঠ, বাংলা-সাহিত্যই যে আজ বিশ্বের দরবারে গৌরবশ্রীমণ্ডিত, এ-কথা অস্বীকার করতে পারেন না।

আমাদের ভাষার পুষ্টি হয়েছে, শক্তি হয়েছে সত্য, তার পরিচয়পত্র আজ গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, কবিতায় প্রচুর চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, তবু যেন মনে হয় ওরা আপন আপন সীমায় আজও এসে পৌছল না—নিজকে ব্যক্ত করা—পরিচিত করা, উদ্‌ঘাটিত করা, বিশ্লেষণ করার কাজে সে আত্মনিয়োগ করলে না। আমাদের যাঁরা সাহিত্য-রচয়িতা, সাহিত্যসাধনার পথকে যাঁরা জীবনের আনন্দ লোকের বিচরণ-ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যে উপন্যাস রচনা করেছেন, সে উপন্যাসের উপাদান নিয়েছেন বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর হ'তে, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার কথাবার্ত্তা, ঘটনার সমাবেশ, আবেষ্টনীর পরিবেশ সবই বাংলা হলেও যেন বাঙালী নয়। তাদের চলন-বলন, তাদের ঘরকন্না, তাদের আচার-ব্যবহার বাংলাকে চেনায় না। মনে হয়, পৃথিবীর যে কোন প্রগতিপন্থী সমাজ ও দেশের পক্ষে তা প্রযোজ্য হ'তে পারে। বাংলার বৈশিষ্ট্য, বাঙালী জীবন ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য যেন কোথাও ধরা পড়ছে না। যাঁরা কবিতাকে আশ্রয় করেছেন, তাঁদের রচনা নব নব পথ সন্ধানে রত বটে, কিন্তু তাও পশ্চিমের সংস্পর্শ ছাড়িয়ে যেন আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই নদীমাতৃক, শ্যামশোভাময়ী বনানী, পর্ব্বতবেষ্টিতা বঙ্গভূমি—তার শোভা, তার সম্পদ, তার বৈশিষ্ট্য কোন কবির কাব্যকথায় সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেনি। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী কবির তুলিকায় হিমালয়ের যে বর্ণনা ধরা দিল, ভাবের সু-উচ্চলোকে সে দার্শনিক অভিব্যক্তিকে প্রাণবন্ত করলে বটে, কিন্তু হিমালয়কে সে রূপায়িত করলে না: "হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দ্দম অগ্নিতাপ বেগে, আপনারে উৎসারিয়া মারিতে চাহিয়াছিল মেঘে"—এ কথা পৃথিবীর যে কোন উচ্চ

পর্ব্বত সম্বন্ধেই বলা যায়। এই কবিতার 'হিমালয়' নামকরণের কোন সার্থকতাই দেখা যায় না। হিমালয়ের বিরাট বিপুল অপূর্ব্ব রূপকে সে উদ্‌ঘাটিত করেনি। পদ্মার বর্ণনাতে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাকে চেনাতে ব্যগ্র নন। নদীর অন্তর্বর্ত্তী ভাবধারাকে ছন্দোবদ্ধ করে প্রকাশ করতেই যেন তাঁর কবি-প্রতিভা উন্মুখ। আধুনিক কবি যাঁরা এলেন, তাঁদের দৃষ্টিও বাংলার প্রতি নিবদ্ধ হল না। তাঁরা কেউ রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নলেখা রচনায় তৎপর, কেউ বা অতি-আধুনিক রস-সাহিত্যের পথ ধরে মোমবাতি, গোরুর গাড়ী, রাস্তা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে গদ্য-ছন্দের অনুশীলনায় রত। বাংলার জন্যে কারও দৃষ্টিও জাগল না—ভাবও ফুটল না। সকলেই বাংলার ছেলে হয়েও বাংলায় প্রবাসী হয়ে রইল।

এদের যে মূল্য নেই বা প্রয়োজন নেই, সে কথা বলছি না, প্রয়োজনও আছে, মূল্যও আছে। ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য নূতনতর ভাবপ্রবাহ দরকার। বঙ্কিম-যুগ থেকে রবীন্দ্র-যুগ পর্য্যন্ত সকলেই ওই প্রয়োজনের তাগিদ বহন করেছেন, তাঁরা নানা ভাবে নানাদিকে বাংলা সাহিত্যকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের জারকে সিক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু যে প্রয়োজনের তাগিদে ওদের আনতে হয়েছিল, তার কাজ ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তার জের যেন মিটছে না।

সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে যদি আনন্দ পরিবেশের প্রয়োজন বলে ধরা যায়, সমাজ-মন-সংগঠনে যদি তার দায়িত্বকে স্বীকার করতে হয়, সাহিত্যকে যদি মনের নিবিষ্ট অনুভূতির প্রকাশ বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তা হলে বাংলা সাহিত্য যে আজও বাংলার মনকে উদ্‌ঘাটিত করছে না, আজও যে সে ইংরেজী সাহিত্য ও ভাবের প্রভাবকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। এই দিক্ থেকে দেখলে বলতে হয়, বাংলা সাহিত্যের আজও সুদিন আসে নি, তার পরানুগ্রহ প্রবৃত্তি-পর দাসত্বের বন্ধন ঘোচে নি।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য থেকেই ওর সুস্পষ্ট রূপ ধরা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভ্রমর' বাংলার গ্রামের জমিদার-বাড়ীর বৌ। উনবিংশ শতাব্দীর কল্পলোকে সে জন্ম নিয়েছে। সে সময় আমাদের গ্রামের অন্তঃস্থলে আজকের দিনের মত বিদেশী ভাবের ছায়াসম্পাতও হয় নি। কলিকাতার নব্য বাংলার যে পরিবর্ত্তিত রূপ, যার সংবাদ গ্রামবাসীরা তখনও পায় নি, তথাপি ভ্রমর পতিভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে যে গদ্য রচনা করছে, তাতে উনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম্য-বধূর হৃদয়-বাণী উদ্‌ঘাটিত হল না। পতির চরিত্রের নির্ম্মলতা বা সমলতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে সেই নারী, যে নারী যুক্তির দ্বারা সব জিনিসকে গ্রহণ করতে চায়। যুক্তিবাদী মনের এ পরিচয় বাংলার গ্রামবধূর নয়, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করা প্রয়োজন বোধ করেন নি, কেন না তিনি চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভাব-প্রচারের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। তাই ভ্রমর পশ্চিমী মেয়ের ঢঙে যুক্তি দিয়ে পতি পরমগুরুর আধুনিক ব্যাখ্যা করতে বসে গেছে। যে বাংলার মেয়ে পতিত-স্বামীর প্রতি চিন্তায়ও কটূক্তি প্রয়োগকে অপরাধ মনে করত, সমাজ-মনের সে অবরুদ্ধ অর্গল ভেঙে তাতে চিন্তা, যুক্তি ও সত্যের আলোকপ্রবেশের পথ রচনার সার্থকতা থাকতে পারে—মনের জড়ত্বকে দূর করার যথেষ্ট মূল্য আছে সত্য, কিন্তু বাংলার বধূর অচলা ভক্তির মাধুর্য্যের পরিচয় তাতে পাওয়া যায় না, তাকে পাশ্চাত্য ভাবানুগ্রাহী বাঙ্গালী মন ব'লে চিহ্নিত করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কৃষ্টির পূর্ণ স্বরূপ দেখেছেন, হয়তঃ বা তার সঙ্গে একাত্মতাও অনুভব করেন, তাই তাঁর রচিত কথা-সাহিত্যের মধ্যে যে নরনারী রূপ পরিগ্রহ করেছে, তারা বাঙ্গালী হয় নি, ইঙ্গ-বঙ্গের অভিজাত সমাজের লোকরূপে পরিচিত হয়েছে, তাদের চিনতে কারও ভুল হয় না যে, তারা বাংলার অতিথি। 'গোরা'র চরিত্রগুলি, ঘরে 'বাহিরে'র বিমলা, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী প্রভৃতি নারীচরিত্র যে কোন্ মানসিক গঠনসৌষ্ঠবে সম্ভ্রান্ত সে বিষয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা নাই। তারা বাংলার মেয়ে নয়, যে মেয়েরা শহরের আবহাওয়া, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা আচ্ছন্নদৃষ্টি, সে মেয়েদের থেকে দূরে পল্লী অঞ্চলের নিভৃতছায়ায় যারা বাস করছে তাদের চিত্ররেখা অঙ্কিত হয় নি। ওদের আত্মীয়া বাংলার শহর খুঁজলে হয় ত বা দু'একটা মিলতে পারে, কিন্তু পশ্চিমের সমাজ ও সাহিত্যে ওদের বান্ধবী পাওয়া যায় প্রচুর।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পগুলিতে বাংলার মেয়ের স্বরূপ দেখি, 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'চরিত্রহীনের' সুরবালা প্রভৃতি চরিত্রে। কিন্তু 'পল্লীসমাজে'র জ্যেঠাইমাকে দেখলে মনে হয়, এই জ্যেঠাইমা ইংরেজী মন নিয়ে বাংলার ঘরে

জন্মেছিল। রমেশকে উপদেশ দিতে গিয়ে জ্যেঠাইমা গ্রামের যে সমস্ত কুরূপ দেখলেন, তাকেই বড় করে ঘোষণা করলেন, কিন্তু গ্রামের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য, সমাজবদ্ধভাবে যে গ্রামবাসীরা বছর বছর ধরে আপনাদের সুখ-দুঃখ-স্বাস্থ্য-সম্পদ নিয়ে বাস করে আসছে; তাদের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রয়েছে বা থাকতে পারে, তার ছবি তিনি দেখলেন না। গ্রামের সব খারাপ, ওদের মন নোংরা, সভ্যতার প্রতিবাদ—এই কথাই যেন 'পল্লীসমাজে' উদ্‌ঘাটিত হল। এ অনুভূতি বাংলার ক্রটী-বিচ্যুতির সমষ্টিকে নিয়ে তার প্রতি ভালবাসা থেকে উদ্ভূত নয়, এই সৃষ্টি পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুপ্রাণিত সমালোচক-দৃষ্টির সৃষ্টি, শরৎচন্দ্রের আঁকা কিরণময়ী, অচলা, সাবিত্রী, কমলা ওরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নায়িকার সহধর্ম্মী, ওদের চিনতে ভুল হয় না।

এ পর্য্যন্ত দেখা যায় বাংলার মন একটা পথ ধরেই বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সে মন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রতিচ্ছায়া।

তারপর এল নন্‌-কো-অপারেশনের বন্যা, বাধা-বাঁধন গেল ভেঙ্গে; যে-রোহিণী, বিনোদিনী, কিরণময়ী,কমলা গৃহের আবেষ্টনীর মধ্যেই তাদের মতবাদ ও কর্ম্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, তারা একেবারে বাইরে এসে দাঁড়াল। শরৎ-যুগ পর্য্যন্তও যে অর্গল ছিল, যে সীমা ছিল, বাঁধনের যে আড়ষ্টতা ছিল, রাষ্ট্রীয় আহ্বানের সুযোগে তাও ঘুচে গেল। তারপর সাহিত্য যে পথ নিলে, সে পথের রেখা-সংযোগ দেখা গেল ফ্রয়েড, এলিসের পথে, যৌনতত্ত্বকে রসান্বিত ও রূপান্বিত করাই হল এদের প্রচেষ্টা। নরেশ, অচিন্ত্য, বুদ্ধ, প্রবোধ নবাগতের দল এই লীলা-ক্ষেত্রকে মুখর করে তুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সুর ধ্বনিত হল বিভূতি, তারা-শঙ্কর প্রভৃতির কণ্ঠে। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্র সহরের আধুনিক আধুনিকার নব-বৃন্দাবনের নর্ম্ম-সহচরী নয়। তাঁরা গ্রামের পথের পাঁচালী রচনা করিতে আরম্ভ করলেন। দৃষ্টিকে বাংলার পল্লী-অভিমুখী করলেন বটে, কিন্তু মনের গঠনকে দরদী বাঙ্গালীর রূপে পরিশুদ্ধ করে নিলেন না। মনের দৃষ্টিভঙ্গী সেই পূর্ব্বতন পথচারীদের মতই সমালোচকের পর্য্যায় ছাড়িয়ে যায় নি, এখানেও দেখি রচয়িতার মন ভালবেসে গ্রামকে তার রচনাক্ষেত্র করে নেন নি—বিচারকের আসনে বসে গ্রামকে লক্ষ্য করেছেন। গ্রাম্য-জীবনে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রচ্ছদপটে অনেক আবর্জ্জনা, অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি, অনেক অন্ধতা, পঙ্গুতা, আড়ষ্টতা জমা হয়ে উঠেছে সত্য, তা থেকে তাকে মুক্ত করে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সাহিত্যিকের আছে বটে, কিন্তু আঘাত দিয়ে তাকে জাগাতে হবে, ভালবেসে নয়, এই ভঙ্গীটুকুকেই বলছি প্রাশ্চাত্ত্য। জাগাতে হবে—মুক্ত করতে হবে সত্য,কিন্তু যে পথ দিয়ে সে মুক্তির স্বরূপ আসবে, সে পথ যেন বাংলার নিজস্ব পথ হয়, সে পথ যেন পশ্চিমের পথানুসরণ না করে, ভালবাসার ভিত্তিতে যেন তার জাগরণ হয়, এই কথাই আমাদের বলবার।

পশ্চিমের কাছ থেকে আমরা অনেক নিয়েছি প্রয়োজনের তাগিদে, সমৃদ্ধির আয়োজনে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে দৈন্য ছিল, পঙ্গুতা ছিল, ভীরুতা ছিল—সে আজ নেই। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবসংস্পর্শে তা সঞ্জীবিত ও পরিপূর্ণ হয়েছে। ওদের ভাব-বিলাসের মোহ-মত্ততার অন্ধ অনুসরণ করার দিন প্রয়োজনের খাতিরেও আজ আছে বলে স্বীকার করার সময় নেই। এখন যদি আমরা আমাদের পশ্চিম-মুখী দৃষ্টিকে পূর্ব্বদিকের পানে না ফিরাই, তবে আবার বাংলা সাহিত্যের ভাবপ্রবাহের পথে পশ্চিমের ভাবপ্রবাহের দ্বারা যে উপলখণ্ড স্তূপীভূত হয়ে পড়বে, তাতে আমাদের এ পরিবর্দ্ধিত ও সুপরিপুষ্ট সাহিত্যের গতি যাবে থেমে, আবার অবরোধের মালিন্যে সে আপন বৈশিষ্ট্য হারাবে—শক্তি হারাবে। সে দুর্দ্দিন পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমাদের সজাগ হওয়া দরকার। বাহিরমুখী মনকে ঘরমুখী করার সময় আজ এসেছে। সাহিত্য-সাধকের দৃষ্টি ও চিত্ত এই সমস্যার প্রতি সচেতন হবে, তার নূতন গতিপথ রচনা হবে, এই ভরসাই আমরা করছি।

শ্রীঅমূল্য সেন

হ্যামলেট (স্বগতোক্তি)—“আঘাত-বেদনা হানে যে ক্রূর নিয়তি, সহ্য তাই ভাল ?
কিংবা, রাশি রাশি দুঃখ-শোকে করি প্রতিরোধ…”

বাংলা কাব্যে জাতীয়তাবোধ

উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে বাংলা কাব্যে জাতীয়তা-বোধের সুর প্রথম ধ্বনিত হয়। এ-সময়ে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-ধারার গভীর অনুশীলনের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি বিরাট ভাব-বিপ্লব দেখা দেয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক নিবন্ধে এই বিপ্লবের একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কথায়—"এই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চলিতেছে, কিন্তু বাংলায় সে পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব যতদুর অগ্রসর হইয়াছে, এতদুর আর কোথাও হয় নাই। এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরাজী শিক্ষা; ইহার ফল—সাহিত্যের উৎপত্তি।" উল্লিখিত এই ভাব-বিপ্লবকে কেন্দ্র করেই বাংলা কাব্যে জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষ। এর পূর্ব্বে আমাদের কাব্যে দেশাত্মবোধের তেমন সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারত-কলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের এই নিন্দনীয় অভাবের উল্লেখ দেখা যায়। প্রবন্ধটির একস্থানে আছে—"যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজী চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু তাহা জানিত না।" হিন্দুর এই না-জানার মধ্যে কি কারণ নিহিত আছে, তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাঙালী হিন্দু চিরদিনই—স্বপ্ন-বিলাসী। কোন-দিনই সে বাস্তবের নিষ্ঠাবান্ উপাসক হতে পারে নি। তার সবটুকু শ্রেষ্ঠ কল্পনা মুখ্যতঃ কল্পিত মোক্ষলাভ এবং তৎসহজাত ঈশ্বরপ্রীতিকে আশ্রয় করেই কাব্যে ও কথায় মুকুলিত হয়ে উঠেছে। দেশাত্মবোধের মধ্যে যে সুতীক্ষ্ণ বাস্তবমুখী দৃষ্টির প্রয়োজন তা তার এই ঈশ্বরপ্রীতি এবং সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে তাই পড়ি—"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা প্রীতি-বৃত্তির সমাঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্ব-লৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।" তাই বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পাশ্চাত্ত্য চিন্তাভাণ্ডার থেকে আহরণ করে আনলেন জাতিপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। তৃণ থেকে তারাস্তোম পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করে তাঁর অমর কণ্ঠ গেয়ে উঠল—"বন্দে-মাতরম্"। বাঙালার ধমনীছন্দে, হৃৎপিণ্ডের উঠা-পড়ার সমতালে আজও সেই মহাসঙ্গীতের ঝঙ্কার চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা দেশাত্মবোধের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কবি বলে পূজা করি। তবে তাঁর পূর্ব্বগামী কবি ঈশ্বর গুপ্তের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যে স্বাজাত্যপ্রীতির প্রথম ক্ষীণ উন্মেষ দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন 'খাঁটি বাঙালী কবি'। প্রথম প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ফলে শিক্ষাভিমানী বাঙালী যুবক দেশীয় আচার-বিচার, পাল-পার্ব্বণ প্রভৃতির উপর উদ্ধত অশ্রদ্ধা ও চরম অনাস্থা প্রকাশ করতে থাকে। তাদের মত্ততা দূর করে প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্যেই গুপ্ত কবির ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ কশাঘাত অজস্রভাবে তাদের উপর বর্ষিত হয়। বারে বারে তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিদেশী ঠাকুরের অপেক্ষা দেশের কুকুরও অধিক প্রিয়। তাঁর এই সতর্কবাণী সেদিনকার দিগ্‌ভ্রান্ত আত্ম-বিস্মৃত জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করে। তিনি তাদের পশ্চিমমুখী দৃষ্টি আবার ঘরের দিকে ফিরিয়ে আনেন।

ঈশ্বর গুপ্তের এই স্বাজাত্যপ্রীতিকে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য রঙ্গলালের কাব্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার রূপ গ্রহণ করে আরও এক ধাপ অগ্রসর হতে দেখা যায়। তখন টড্ সাহেবের 'রাজস্থান' সেই মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজ-স্থানে'র রোমাঞ্চকর বীরত্ব-কাহিনী, রাজপুতদের অটল স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যপ্রীতি তাঁর কল্পনাকে মুগ্ধ করে। তিনি এই রাজস্থানের আখ্যানবস্তুর অংশবিশেষকে আশ্রয় করেই আপনার সুগভীর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দেন। তাঁর 'পদ্মিনীর উপাখ্যানে' "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" প্রভৃতি পংক্তিগুলি এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

রঙ্গলালের পর মধুসূদনের আবির্ভাব—যেন স্বর্গ থেকে ভাগীরথীর অবতরণ। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে যে স্বাতন্ত্র্যবাদ ও জাতীয় ভাবের উদ্ভব হয়, মধুসূদনের কাব্যে তা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পুরুষার্থপ্রবণ রাবণের চরিত্রাঙ্কনে ও বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের অগ্নি-গর্ভ ভৎর্সনাময় উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধুসূদনের এই পুরুষকারকে হেম-নবীনের কাব্যে দেশহিতৈষণায় পরিবর্ত্তিত হতে দেখা যায়। হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় স্বদেশ-ভক্তিমূলক গানের অভাব লক্ষিত হয়। তিনিই প্রথম আংশিকভাবে আমাদের এই অভাব দূর করেন। এ-ছাড়া তাঁর 'বৃত্রসংহার'ও জাতি-বৈরের কাব্য হিসাবে অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর এই খাঁটি স্বাদেশিকতা পরবর্ত্তী কবি নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থে অতি মধুরভাবে বর্ণিত এবং বিন্যস্ত হয়েছে।

নবীনচন্দ্রের পর স্বাদেশিকতার কবি হিসাবে গোবিন্দদাস ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ দাসের অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি তাঁর কবিতা ও গানগুলিকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। জাতির মুক্তির জন্য যে একতা অত্যাবশ্যক "কুটীর নিবাসী……দরিদ্র ভিখারী" কবি গোবিন্দদাস প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এক অখ্যাত পল্লীপ্রান্তে বসে তা উপলব্ধি করেছিলেন—

এস ভাই ভিন্নভাব করি পরিহার
… … …
শুধু এই ভ্রাতৃভেদে ত্নঃখিনী জননী খেদে
জীবনে পড়িয়া আছে মৃতের আকার।

তৎকালীন 'নব্য ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'তাড়কার বন', 'জন্মাষ্টমী', 'স্বাধীনতা', 'স্বদেশ' প্রভৃতি দেশাত্ম-বোধক গান ও কবিতাগুলি বাঙালী পাঠক-সমাজে চিরদিন সমাদর লাভ করবে। শেষোক্তটিতে পরাধীনতার যে মর্ম্মন্তুদ বেদনা পরিস্ফুট হয়েছে পাঠকমাত্রেই তা অনুভব করবেন—

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোদের নয়
সোনার বাংলা সোনার ভূমি হীরার ভারত বলে তুমি
ভারত তোমার আসবে কোলে এই কি মনে লয়।

গোবিন্দ দাসের পর আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে আসি। আকাশের বিস্তৃতি এবং সাগরের অতলতা যেন এ-কাব্যে বর্ত্তমান। মুখ্যতঃ, কোন ভৌগোলিক সীমার দ্বারা খণ্ডিত বিশেষ একটি দেশ বা বিশেষ একটি জাতির জন্য এ-কাব্য নয়। এ বিশ্বের জন্য, বিশ্ব-মানবের জন্য। তাই তাঁর কাব্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশপ্রীতি অপেক্ষা বিশ্বপ্রীতিই সমধিক পরিস্ফুট। সংকীর্ণতাকে তিনি ঘৃণা করেন, কারণ তিনি পূর্ণতার উপাসক। তাঁর কাব্যের মূল সুর তাই অনন্তের সঙ্গে সান্তের মিলন, অসীমের মধ্যে সীমার বিলয়। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কোথাও তাঁর কল্পনা অবরুদ্ধ হয়ে নেই, ক্ষণে ক্ষণে সে ভূমার প্রতি ধাবিত হয়েছে। তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক কবিতাটির সাহায্যে আমাদের বক্তব্যকে অধিকতর পরিস্ফুট করা যায়। কবিতাটিতে দেখি "গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে" প্রপীড়িত, ভগ্নস্বাস্থ্য, অন্নহীন, ভাষাহীন, ম্লানমুখ লক্ষ লক্ষ নরনারীর জন্য কবির দরদের অন্ত নেই। তিনি বলেছেন—

"……এই সব মূঢ়, ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে—
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

কিন্তু অবিলম্বেই দেখি তাঁর কবিচিত্ত ধীরে ধীরে "ছাড়ায়ে সংসার সীমা","এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা" তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে কোন্ অজানা অচেনা বিশ্ব-প্রিয়ার সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর কাব্য-ভাণ্ডারে বিশুদ্ধ জাতীয়তা-বোধক কবিতার সংখ্যা অল্প। দেশের দুঃখ-দুর্দশা, ভীরুতা এবং পরাধীনতায় তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়। তিনি আমাদের "মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত" শুনিয়েছেন, মরণভয়কে জয় করার অভয় মন্ত্র দিয়েছেন, কারণ ভীরুতা থেকেই আসে পরাধীনতা আর পরাধীনতাই পূর্ণতা-লাভের বিষম অন্তরায়। তাই, বোধ হয়, আরও দেখি তাঁর কল্পনা বর্ত্তমান ভারতের অপেক্ষা প্রাচীন ভারতের দিকে অধিকতর প্রসার লাভ করেছে। কালিদাসের যুগের এবং তা অপেক্ষাও প্রাচীনতর ভারতের শান্ত, অনাড়ম্বর, সহজ জীবনের জন্য তিনি বহুবার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে এবং 'মেঘদূত', 'জন্মান্তর' শীর্ষক কবিতাগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকা যেমন আপনার গৌরব-মহিমায় আপনি পরিপূর্ণা, রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-ভাগ্যবিধাতা' ঠিক তেমনি আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ নয়। তিনি হলেন বিশ্বদেব—"দেশ দেশ নন্দিত করি" যার ভেরী মন্দ্রিত হয়, সমগ্র বিশ্বকে আশ্রয় করে যার অবিরাম লীলা চলে।

রবীন্দ্রনাথের পর স্বাদেশিকতার কবি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, বিজয়লাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রোত্তর এই সকল কবির সম্বন্ধে পরের প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

অহিংস সৈন্য

—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

খড়ের আগুনের উপমাটা তত কার্য্যকরী নয়—দাহিকা শক্তির অল্পক্ষণ-স্থায়িত্ব উহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাওয়া অবিবেচনার, অসংস্কৃতির স্থূল দৃষ্টান্ত। তবে হাঁ্যা, তুষের আগুনের উপমাটা সব দিক্ দিয়া সম্মানের—আবরণটা এমনি নিস্পৃহ আধুনিক যে, উপর হইতে বুঝিবার-ই উপায় থাকে না, ভিতরে একটি শক্তি নিঃসাড়ে কাজ করিতেছে—কোনরূপ আবেগ উচ্ছ্বাসের বালাই নাই। সংস্কৃতির দিক দিয়া উপমাটি মনে হয়, সুষ্ঠু।

...প্রকাণ্ড রাজপথে পুরাণ বিলাতী বস্ত্রখণ্ড জ্বালাইয়া দিয়া স্বদেশ-প্রীতির হোমানল প্রজ্বলিত করা হইল! করতালি আর উচ্চনাদে গগন বিদীর্ণ করিয়া শৃঙ্খলিতা, নিপীড়িতা দেশমাতার বন্দনা গাওয়া হইল। চোখের সম্মুখে যখন দগ্ধ কাপড়গুলি শত শত লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া শূন্যে গাল পাড়িতে লাগিল, তখন মাতৃ-পূজারীদের ছাব্বিশ ইঞ্চি বুকগুলি ফুলিয়া কোন্ না ছ'চল্লিশ-ইঞ্চি হইল! আর সেবকদিগের নিরস্ত্র আশাটা যে বিদেশী শাসকদিগকে সাগরপারে তাড়া না করিয়া আসিল, কে বলিতে পারে?...কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, সব-ই খড়! আপশোষ কাটাইতে আবার বিলাতী বস্ত্রের দ্বিগুণ প্রচলন করিতে হইল। জ্বালাময়ী বক্তৃতার জ্বালাটা সহসা জল হইয়া সরকারী দপ্তরখানায় গড়াইয়া গেল। নিপীড়িতা দেশ-মাতার পাণ্ডুর মুখে নিগূঢ় হাসি ফুটিল কি না, কে বলিতে পারে!

*

১৯৩০ সাল। অবশেষে মুরারী'দা নিজেই অহিংস সৈন্য সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িলেন। রুক্ষ চুল, মলিন মোটা খদ্দরে আচ্ছাদিত নিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ডের মত শরীর, হাতে একগাছি কঞ্চির ছড়ি, পায়ে খড়্‌পা—উপযুক্ত মায়ের সন্তান! এখন জেলা অফিসের তিনিই একমাত্র কর্ণধার। আইন-অমান্য আন্দোলন পুরাদমে চলিতেছে: এ দিকে লবণ, আর একদিকে আফিং, গাঁজা ও মদ।

বলির সমস্ত বলিষ্ঠ পশুই প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এবার ছাগ-শিশুতে নবমী পূজা শেষ না করিলে আর চলে না। শেষে কি তাঁহাদেরই যূপ-কাষ্ঠে মাথা গলাইতে হইবে? মুরারীদার ভাবিবার অবকাশ নাই। তাঁহার মত একটি মাথা যদি এখনই শেষ হইয়া যায়, পূজা চলিবে কিরূপে! আর ওদিকে পুলিস যে পরিমাণে পাইকারী দরে চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বিশেষ ভরসাও নাই।...

জেলা আফিস হইতে রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়া মুরারীদা' বার মাইল দক্ষিণে হাঁটিয়া আসিলেন। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে গাড়ুহাতে বিহারী বাবু মাঠের দিকে চলিয়াছিলেন। দূর হইতে বটতলার কাছাকাছি ছায়া মূর্ত্তিটিকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া, বিহারী বাবু থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন—গাড়ুটিকে নামাইয়া রাখিয়া চোখদুটিকে রগড়াইয়া লইলেন। কিন্তু কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না। ভূত ভাবিয়া সশব্দে রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তবুও মূর্ত্তিটি যখন ক্রমেই সামনে আসিতে লাগিল, বিহারী বাবু চোখে অন্ধকার দেখিয়া গাড়ু সমেত গোঁ-গোঁ করিতে করিতে একেবারে আলের নীচে পড়িয়া গেলেন। মুরারীদা' সামনে আসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফুৎকার দিয়া কহিলেন, "coward!" পরে গাড়ুর জলে বিহারীবাবুর জ্ঞান-সঞ্চার করিতে তিনি চোখ তুলিয়া কহিলেন, "তুমি? তুমি-মি-মি এখা-নে? আবার কার মাথা খেতে এসেচ শুনি?" মুরারীদা' কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিলেন, "পরিমল বাবু আছেন? তাঁকে একটু দরকার!"

পরিমল বিহারী বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। বয়স কুড়ি বাইশ, গৌরবর্ণ ছিপছিপে চেহারা। পরিমলের নামে বিহারী বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন—"কেন? নিজেরা বকেছো, তাকেও

বকাতে চাও ? যত সব বাপে-খ্যাদান, মায়ে-তাড়ান ছোঁড়া মিলে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিলে ! সে নেই, ভাল চাও তো সরে পড় বলচি !”

মুরারীদা’ নাসা কুঞ্চিত করিয়া সামনে চলিলেন। বিহারী বাবু পিছন হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন : “যাবে না ? ফের গ্রামে ঢুকবে ? ভাল হ’বে না বলচি, থানায় খবর দেব ! কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, যত সব হুজুক ! ফের-র, ভাল হ’বে না বলচি !”

মুরারীদা’র ভ্রূক্ষেপই নাই—ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জোরে পা চালাইলেন। বিহারীবাবু গাড়ু হাতে পিছন পিছন আসিয়া মুরারীদা’র খদ্দরের চাদর টানিয়া ধরিলেন।

মুরারিদা’ কঞ্চির ছড়িটাকে ঘুরাইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, “ওঃ তাই না কি ?”

মুরারীদা’ ঘুরিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন : “লজ্জা করে না দেশের কাজে বাধা দিতে ? নিজেরা কিছু করবেন না, অপরকেও কিছু করতে দেবেন না—coward !”

বিহারীবাবু মিনতি করিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ বাবু, তাই, তুমি এখন দয়া করে পেছন ফের দিকি ! এ গ্রামে আর নজর দিও না—দোহাই তোমার !”

মুরারীদা’ হাসিয়া কহিলেন, “কেন, আমরা কি ভূত, না ব্রহ্মদত্যি ?”

—“তারও বাড়া। ভূত তো তবু ঝাড়ফুঁকে নাবে, তোমাদের নাবাতে গেলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। জলজ্যান্ত ছেলেগুলোর আস্ত মাথা চিবিয়ে খেতে তোমাদের বাধে না। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, দোহাই তোমার। গরীবের ছেলেগুলো কেন আর পুলিসের নজরে পড়ে খামকা কুকুরের মত এর-তার বাড়ীতে পাত চেটে বেড়ায় !”

চাদরটিকে মাথায় জড়াইয়া মুরারীদা’ কঞ্চির ছড়িটাকে শূন্যে ঘুরাইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—“ওঃ, তাই না কি ?”

বিহারীবাবু সজল কণ্ঠে কহিলেন, “আধ পয়সার নুনের জন্যে এতগুলো ছেলেকে রাজ-রোষে ফেলে তোমাদের লাভ কি শুনি ?”

মুরারীদা ছড়িটাকে পাশের জিওলঝোপে আঘাত করিয়া কহিলেন, “স্বাধীনতা !”

প্রভাতের প্রথম রৌদ্রের সঙ্গে মুরারীদা’ গ্রামে ঢুকিলেন। গ্রামটার নাম ফুলেশ্বর, আয়তনে এক বর্গ-মাইলের অধিক হইবে না। দক্ষিণ হইতে গ্রামে ঢুকিলে প্রথমেই পড়ে মুসলমান-পাড়া, তারপর একটি সাঁকোর ব্যবধানে হালদারপাড়া—তারপরই বাবুদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলবাড়ী। নামেই স্কুলবাড়ী, ইহার ছাত্রদিগের গতিবিধি দেখিয়া মনে হয় ছাত্র-আন্দোলনের উপদ্রবে অধুনা ইহার এই অবস্থা। অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন যে ছাত্র-আন্দোলনকেও হাত ধরিয়া টানে, তাহা এই স্কুলটির অবস্থা দেখিয়া বেশ মালুম হয়। স্কুলটি দিবা-রাত্রই খোলা থাকে, শিক্ষাদান ছাড়াও এখানে আরও অনেক কিছুর আদান-প্রদান চলে। দুপুরে তাস, রাতে পাশা এবং রাজনীতি। অধুনা ইহা পরিমলের অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়াছে। সত্যাগ্রহী সংগ্রহের খাতাটি সারাক্ষণ চিত হইয়া পড়িয়া আছে—দয়া করিয়া কখন যে কেহ তাহার বুকের উপর উঠিবে বলা যায় না। পরিমলের অ্যাসিষ্ট্যান্ট মুকুন্দ সর্ব্বদাই মতোয়ান আছে। মুকুন্দ ইতি-পূর্ব্বে সত্যাগ্রহের পাঠ লইয়াছে। হাঁটু পর্য্যন্ত মলিন খদ্দর, দুই স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বুকের উপর অর্দ্ধসিক্ত গামছা ; রুক্ষ অসংযত কটাচুল হস্তাঙ্গুলী সাহায্যে পিছন-ফিরান—বলিষ্ঠ তামাটে চেহারা।

দূর হইতে মুরারীদা’ ছড়ি ঘুরাইয়া সঙ্কেত করিলেন,

মুকুন্দ আত্মিক হাস্যে ঘাড় বেঁকাইয়া অভিবাদন করিল। মুরারীদা' কহিলেন, "খবর কী? সত্যাগ্রহী চালান করছ না কেন?" মুকুন্দ গম্ভীর মুখে খাতাটা আগাইয়া দিল। "আমদানী নাই তো চালান দেই কোত্থেকে?" মুরারীদা' খাতা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "ওদিকে ব্যবসায় যে চাবি-তালা পড়লো! মহা মুস্কিল, কোন সেণ্টার থেকেই স্বেচ্ছাসেবক আসছে না—কাজ চলে কেমন করে?" মুকুন্দ 'থিওরী'র ধার ধারে না। তাহার গ্রামে আর কে-কে যাইতে পারে ভাবিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পরিমল আসিল। মুরারীদা' মুখ হাঁড়ি করিয়া কহিলেন, "খবর তো দেখছি সুবিধে নয়। আপনার গ্রামটা একেবারেই backward।" পরিমল একটু সঙ্কুচিত হইল। কঞ্চির ছড়িটি টেবিলে রাখিয়া মুরারীদা' কহিলেন, "আমি ভাবছি এক কাজ করলে হয়—" পরিমল ও মুকুন্দ উন্মুখ হইয়া চাহিল। মুরারীদা' বলিলেন, "একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করে এদের চোখ ফোটাতে হবে। গ্রামে আপনার জ্যেঠা মহাশয়ের মত লোক যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ এ ভাবে কাজের সুবিধে হবে না।" জ্যেঠা মহাশয়ের নামে পরিমল লজ্জিত হইয়া পড়িল। মুরারীদা' কহিলেন, "এই দেশের শত্রুদের আজ আমাদের স্পষ্ট করে জানাতে হবে তারা আমাদের কত ক্ষতি করছে,—দেশটা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। মাতৃ-পূজায় বলির প্রয়োজনে বাধা দেয়, নিমকহারাম—দেশদ্রোহী! আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।"

মুকুন্দ আত্মিক হাস্যে ঘাড় ভাঙ্গিল। পরিমল পিতৃ-পুরুষের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত মিটিং-এর ব্যবস্থা করিল। যেন বদ্ধ জলাশয়ে সজোরে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল—আয়োজন চলিতে লাগিল।

স্কুল-গৃহের প্রাঙ্গনে মিটিং-এর ব্যবস্থা করা হইল। লোক-সমাগমের আশায় নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অধিক বিলম্ব করা হইল, কিন্তু সভামণ্ডপে তেমন লোক-সমাগম হইল না। আশে-পাশে বয়স্ক ব্যক্তিগণ ঘুরাফেরা করিতে লাগিলেন, ইচ্ছাটা—দেখা যাক্ না ছোঁড়ারা কি করে! কৌতুহলটাকে স্পর্শ বাঁচাইয়া রাখাই ভাল।

সভামণ্ডপের মাঝখানটিতে মুরারীদা' কোমরে চাদর জড়াইয়া 'গান্ধী'র অনুকরণে কোলকুঁজা হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, ছড়িটি পাশেই শায়িত ছিল। একটি জলচৌকির উপর এক টুকরা খদ্দরের চাদর-ছেঁড়া পাতিয়া 'ডেইস্' করা হইল, তাহার দক্ষিণে একটি কার্পেটের আসন পাতিয়া সভাপতির আসন রচনা হইল। সভাপতি মুরারী দা' আসনে দাঁড়াইয়া বার বার ভ্রূকুঞ্চিত করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ সকলকে ডাকিয়া, এক প্রকার কোলে করিয়া আনিয়া সভামণ্ডপের মধ্যে বসাইয়া দিতে লাগিল। পরিমল কোন দিকে না চাহিয়া চৌকির উপর সাদা কাগজে বক্তব্য বিষয়-গুলি একে একে লিখিতে লাগিল। দু' তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরও আশানুরূপ লোক-সমাগম হইল না দেখিয়া

"আজ আমাদের বক্তৃতা করবার সময় নয়, ঘোর দুর্দ্দিনের সম্মুখীন আমরা..."

মুরারীদা' বাধ্য হইয়া গোধূলি-লগ্নে সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হাঁটু গাড়িয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া মুরারীদা' সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন: অধিকাংশই ছেলে-ছোকরা,—দুই একজন প্রৌঢ় কোণ লইয়াছেন। ছেলেগুলি কৌতুহলা-বিষ্ট, নিশ্চল, বিকৃতবদন; প্রৌঢ়গণ বালকসুলভ চপল।

মুরারীদা' কোমর হইতে চাদরটি খুলিয়া চৌকির উপর রাখিলেন। তারপর গলা ঝাড়িয়া ঘাড়টা শক্ত করিয়া, চিবুকটাকে কণ্ঠনালী হইতে বিষমকোণীর মাপে রাখিয়া আরম্ভ করিলেন:—"সমবেত ভাইগণ, বন্ধুগণ, আজ আমাদের বক্তৃতা করবার সময় নয়, ঘোর দুর্দ্দিনের সম্মুখীন আমরা—ঘরে-বাইরে আমাদের শত্রু! ঘরের শত্রু বিভীষণরাই আমাদের আজ সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করছে..."

সভাস্থলে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল, কেহ কেহ আবার 'হিয়ার হিয়ার' বলিয়া উঠিল।

"...শৃঙ্খলিতা, নিপীড়িতা ভারতমাতার দুঃখ এরা আমাদের বুঝতে দেবে না—পদে পদে বাধা দেবে, পাপিষ্ঠের দল! মায়ের অপমান আমরা সহ্য করব না। আমরা মানুষ, আমরা মেষ নই। কে এমন মায়ের সন্তান আছে, যার চিত্ত মায়ের দুঃখে উদ্বেলিত না হয়? বল, বল তোমরা, আপনারা, মাকে উদ্ধার করতে কে না চায়!"

সমস্বরে ধ্বনি উঠিল: "কেউ না, কেউ না।"

"বন্ধুগণ, আজ আমাদের কর্ত্তব্য অপার। শুধু মুখের

"যে যেমন কাজ করবে সে তেমন ফল পাবে। সে বাপই হোক্, আর যেই হোক্..."

কথা নয়, বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের লজ্জা ঘোচাতে হবে। বিভীষণদের কথায় আমরা কর্ণপাত করব না। এর জন্যে যদি আমাদের বাপ-মাকে অগ্রাহ্য করতে হয়, আমরা পিছ-পাও হব না, মহাত্মা গান্ধী আজ আমদের চোখ খুলে দিয়েছেন—তাঁর মত শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ কে আছে? কেউ না। তিনি বলছেন, আমরা জেগেছি, সুতরাং আমরা জেগেছি। ভাই সব! তোমরা সব চলে এস, ঐ মহাপুরুষ আমাদের ডাকছেন..."

সভাস্থল নিস্তব্ধ, যুবকগণ উত্তেজনায় বিস্ফারিত-বদন।

"...এই সব সশস্ত্র শত্রুদের সঙ্গে আমরা অস্ত্র নিয়ে লড়তে চাই না। অস্ত্র বর্ব্বরের সম্বল। ভারতের আদর্শ তা' নয়। প্রেম দিয়ে আমাদের হিংসাকে জয় করতে হবে। আমরা অহিংস সত্যাগ্রহী।...যে আইন আমাদের সামান্য নুন-ভাত থেকে বঞ্চিত করেছে, তাকে আমরা কিছুতেই মানব না।...এ যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমাদের এই মুক্তি-সংগ্রামে ডাক দিয়েছেন। ভেবে দেখুন আপনারা, কত বড় এই অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি! এ নীতি এমনই যে, এখানে বিচার চলে না, মন আপনা থেকেই মেনে নেয়।"

মুরারীদা' থামিয়া গেলেন। সভাস্থলে অখণ্ড নীরবতা ঘনাইয়া আসিল।

তারপর গলা ঝাড়িয়া মুরারীদা' বলিলেন, "আমি আর বেশী কথা ব'লতে চাই না—বেশী কথা বলবার আর সময়ও নেই। মনে মনে আপনারা এ নীতির শক্তি অনুভব করবেন। আমরা সবাই অহিংস সৈনিক, সেনাপতি আমাদের ডাক দিয়েছেন। আসুন, এখনি কাজে নেমে পড়ি। কারা-প্রাচীরের ভয় করলে চলবে না, ও প্রাচীর একদিন ধূলিসাৎ হবেই হবে, সাধ্য কি আমাদের এ অহিংস সত্যাগ্রহকে বর্ব্বররা অগ্রাহ্য করে। মা ভৈঃ!"

সভার যুবকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কিন্তু আশে পাশে অবিবেচক গুরুজনদের ভয়ে তাহারা মুরারীদা'র ডাকে সাড়া দিতে পারিল না। মুরারীদা' বুঝিলেন, কাজ হইয়াছে। আনুষঙ্গিক আরও দুই একটি কথা অনুনাসিক সুরে বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

পরিমল ছোট তরফের একমাত্র মালিক। ছোট বেলা হইতে বাপ-মা হারাইয়াছে এবং সংসারে শাসন করিবার মত লোক না থাকায় বে-পরওয়া হইয়া চলাফেরা করে। সংসারে এক মামীমা তাহার তত্ত্বাবধান করেন। কবে হইতে যে এই মামীমাটি পরিমলদের সংসারে কর্ত্তৃত্বের ভার লইয়াছেন, তাহার হিসাব কেহ বড় একটা করে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধির গুণেই বোধ করি, তিনি এই সংসারে হঠাৎ একদিন প্রবেশ করিয়া একেবারে আপনার হইয়া গেছেন। কোন দিক্ হইতে কোন প্রশ্নের অবকাশ রাখেন নাই। বয়স তাঁহার এখন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, গৌরবর্ণ আঁট-সাঁট চেহারা, মুখখানি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই দীপ্ত। দেখিলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সকলের সহিত মেলামেশায় তিনি

এমন একটি বৈশিষ্ট্য রাখিয়া চলেন,যাহাকে 'গেদা' বা 'অহঙ্কার' বলিতে শত্রু পর্য্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করে। অমায়িক ভাবটি তাঁহার সব সময়ের ভূষণ স্বরূপ। আত্মীয়-স্বজনের উপর তাঁহার অগাধ কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু এই মা-বাপ-মরা ছেলেটার উপর তিনি কর্ত্তৃত্ব করিতে যান না, হয়তো বা মনে করেন, আপনা হইতেই পরিমল শুধরাইয়া যাইবে।

আজকাল তাঁহার উদ্বেগ একটু বাড়িয়াছে। পরিমলের কার্য্য-কলাপ তাঁহার পছন্দ হইতেছে না। তাই প্রায়ই নানা অছিলায় তিনি তর্ক করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, পরোক্ষে আঘাত দিয়া তাহার ছেলেমানুষী বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

রাত্রে পরিমল খাইতে আসিলে মামী-মা বলিলেন, "কি রকম, কাটা সৈনিকদের ডাক পড়লো তা হ'লে। ওবাড়ীর ঠাকুর-জামাই বলছিলেন, লোকটি রোগা হ'লে কি হয়, গলার স্বরটি কিন্তু আছোলা—যাত্রাদলে জুড়ি গাইতো বোধ হয়।"

পরিমল লাফাইয়া উঠিল, "যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কও কেন? দেশদ্রোহীরা চিরকালই অমন কথা বলে আসে। ওতে কান দিলে চলে না।"

মামীমা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কান না দিলেও তো দেখি আবার চলে না। তাদের বিরুদ্ধে শানান কথাগুলি উচ্চ করে না বললে তো আবার তোমাদের সভা জমে না।"

—"যে যেমন কাজ করবে, সে তেমন ফল পাবে। সে বাপই হোক আর যেই হোক। খাতির নেই।"

মামীমা মুখ টিপিয়া কহিলেন, "কিন্তু গান্ধী মহারাজ যে হিংসে ভুলতে বলেন। মারলেও মার খেতে হবে। হিংসেটা কি তা হ'লে হাতে প্রকাশ না পেয়ে, মুখেই প্রকাশ পাবে? কিন্তু সেটা যে কাপুরুষতা, অবলার অস্ত্র।"

পরিমল হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। তাহার যেন কোথাও গণ্ডগোল বাধিয়াছে। মুখ অন্ধকার করিয়া খাওয়ায় মন দিল। মামীমা সুযোগ বুঝিয়া নরম সুরে কহিলেন, "এত বুঝিস্ আর এটা বুঝিস্ না কেন বাবা, যে, স্বাধীনতার নামে দেশব্যাপী একটা হুজুগ চলছে। দেখবি, আমি বলচি, আজ বাদে কাল এ থেমে যাবে। ব্যক্তিগত নাম-প্রচার আর স্বাধীনতার মন্ত্র কি এক রে?"

পরিমল সহসা তপ্ত হইয়া উঠিল, "তা বলবে বই কি। নিজের ধরণে সবাইকে দেখাই তো তোমাদের কাজ। অতবড় একটা লোকের নামে এতবড় অপবাদ দিতে তোমার বাধলো না?"

মামীমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "কেন বাধবে শুনি। আমি সত্যি জানি তাই বলচি। আমি জোর ক'রে বলবো হুজুগে পড়ে দেশকে চেনা যায় না—তার স্বাধীনতাও আসে

মুকুন্দ একটি সধূম হারিকেন আলো লইয়া সামনে আগাইয়া গেল, তারপর গুটি পাঁচ ছয় ছায়ামূর্ত্তি।

না। দেশের মুক্তি মানে আইন-অমান্য আন্দোলন নয়, জোর ক'রে আফিং-গাঁজা ছাড়ান নয়।"

—"তবে দেশের মানে কি শুনি?"

মামীমা বলিলেন, "দেশের মুক্তি মানে আশে-পাশের এই সব না-খেতে-পাওয়া লোকেদের খাওয়ার ব্যবস্থা। এদের মঙ্গল করবার ভার নে, তা'হলে সত্যিকারের দেশ-সেবা হ'বে। হুজুকে কখনো দেশ-সেবা হয় না, হ'তে পারে না।"

—"তা এদের ভালর জন্তেই তো মহাত্মা গান্ধী চেষ্টা করছেন।"

—"ওটা যে গা-জোয়ারী চেষ্টা ; ওর মধ্যে সহানুভূতির একটুও আগ্রহ নেই। জোর ক'রে রাম-নাম বলতে শেখালে, বুলিটাই যে সার হয়, এটা বুঝছিস্ না। বুলির অবসাদ একদিন আস্‌বেই।"

পরিমল গম্ভীরভাবে কহিল, "তোমাদের দৃষ্টি থাকলে বুঝতে যেটাকে বার বার হুজুক বলছো সেটা মোটেই হুজুক নয়।"

মামীমা কহিলেন, "কিন্তু এটা যে ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক গবেষণার ফল, তা তো তোরা বুঝছিস্ না!—দেশের লোকের সঙ্গে ওঁর কোন যোগই নেই, যত হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বেড়ান না কেন। এলো গা আর হাঁটুর ওপর কাপড় পরার সত্যিকারের অভিজ্ঞতা যদি থাকতো তা' হ'লে অত সস্তায় নাম কেনবার লোভটা সামলাতে পারতেন। ভেক্ নিয়ে ভিখ্ নেবার ফন্দিটা তো তোরা বুঝিস্ না।"

পরিমল ভাবিয়া পায় না, যাহাকে দেশের লোক দেবতার সম্মান দিতেছে, তাঁহার প্রতি তাহার এই মামীমাটী খড়্গহস্ত কেন।

মামীমা বলিলেন, "আর ঐ তোমাদের চরকা! সখ ক'রে চরকা কাটলে ভেবেছো, বস্ত্রহীনের লজ্জা কাটবে? বিলেতের কাপড়ের কলে চাবিতালা পড়বে? এটা ছেলে-মানুষী ছাড়া আর কি! মাঝখান থেকে চরকা-তকলী কাটবার জন্যে জাপানী তুলো আমদনী হ'চ্চে।...আজ চরকা নিয়ে নাচ্‌ছো, কাল ওগুলোকে ছাদের ওপর তুলে রাখ্‌বে—রোদ-আর জল খেয়ে খেয়ে ফেটেফুটে কোন দিন শেষ হবে—নয়তো চায়ের জল গরম করতে কাজে লাগবে। দেখিস্, আমি তোকে বলে দিচ্ছি।"

পরিমল কহিল, "লাগলেও তাতে ক্ষতি কি? তবু তো কাজ করে তার দিন ফুরবে।"

মামীমা হাসিয়া কহিলেন, "ক্ষতি কি! তা যখন তোদের বোঝবার ক্ষমতা নেই, তখন কেন এ নিয়ে মিথ্যে লাফাচ্ছিস্? অপ্রয়োজনে তোদের এতখানি অপব্যয় দেশ সইবে কেন? যাদের সত্যিকারের চরকার দরকার তাদের জন্যে তো কোন ব্যবস্থা করিস্‌নি কোন দিন। তোদের সখ ক'রে মুড়ি খাওয়ায় লাভ কি শুনি?" খাওয়া শেষ করিয়া পরিমল কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যে বক্‌তে চাই না। যে বুঝবে না, তাকে বুঝান যায় না।"

মামীমা কহিলেন, "বোঝ্‌বার শক্তি কি তোদের আছে? তোরা যে গড্ডলিকা! সামনের খানাটাকে চোখ চেয়ে দেখ্‌বি না, এমনি অন্ধ তোরা!"

মামীমার কথা যুক্তিহীন সাব্যস্ত করিয়া পরিমল আর উচ্চবাচ্য না করিয়া স্কুলবাড়ীতে মুরারীদা'র খাবার লইয়া প্রস্থান করিল। মামীমা মনে মনে হাসিলেন।

সেই দিন রাত প্রায় বারটা-একটার সময় স্কুল-বাড়ীতে অনেকগুলি উত্তেজিত চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মুরারীদা' তখন চেয়ারে বসিয়া নিমীলিত নেত্রে বিড়ি ফুঁকিতেছিলেন, মুকুন্দ দরকারী খাতাপত্র গামছায় জড়াইয়া ঘরের এককোণে মাটি খুঁড়িয়া চাপা দিতেছিল—পরিমল ঘরের দরজায় গুটি পাঁচেক সদ্য-সংগৃহীত সত্যাগ্রহীদের আশুকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিল। বহু কথার মধ্যে কেবল তপ্ত খোলা হইতে স্থানভ্রষ্ট খইয়ের মত দু'একটি কথা ফট্-ফট্ শব্দে বাহিরে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল : দেশ···ভারতমাতা··· অহিংস...মহাত্মা···সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস!

রাত দুইটার সময় সৈন্যচালনা আরম্ভ হইল। সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে মূর্ত্তিগুলি নড়িয়া উঠিল। মুরারীদা' চাপা কণ্ঠে কহিলেন, "চুপ! মুকুন্দ ঘরে তালা লাগাও। কই, পরিমল বাবু এগিয়ে আসুন। আলোটা সঙ্গে নিয়ে এস হে মুকুন্দ!"

মুকুন্দ একটি সধূম হারিকেন আলো লইয়া সামনে আগাইয়া গেল। তারপর গুটি পাঁচ ছয় ছায়ামূর্ত্তি—সকলের পশ্চাতে কোমরে চাদর বাঁধিয়া ছড়ি উঠাইয়া মুরারীদা' চলিলেন। পরিমল পাশে-পাশে চলিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার যেন কেমন-কেমন বোধ হইতে লাগিল। মামীমার 'গড্ডলিকা' কথাটা তাহাকে পীড়া দিল না কি!

মাঝপথে আসিয়া মুরারীদা' নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "থাক্ মেরে দিয়েচি—ভাই সব, এমনি করে বাধা ঠেলে আমাদের কাজ ক'রতে হ'বে—মূর্খ দেশের লোকের চেতনা সঞ্চার করতে হ'বে···মহাত্মা আমাদের মনে বল দিন।" মুরারীদা' উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সকলে শূন্যে হাত তুলিল। আবার সব চুপচাপ। পরিমল কেমন

যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মামীমার প্রত্যেক কথাটিরই প্রতিক্রিয়া তাহার মনে সুরু হইয়াছে কি না, কে বলিতে পারে!...

পরের দিন জেলা অফিসে সকলকে কর্ত্তব্যের ভার দিয়া মুরারীদা' যে কোথায় সরিয়া পড়িলেন, আর তাঁহার খোঁজ মিলিল না। আফিম্-গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য পরিমলকে কম্যাণ্ডারের পদে বৃত করা হইয়াছিল। গাইড় আর ফুলেশ্বর গ্রামের যুবকরা সেদিনকার সৈনিক পদে অভিষিক্ত হইল।...

বেলা বারটার সময় পরিমল সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সরকারী পাকা রাস্তার উপর টিনের চাল-ওয়ালা, ছেঁচা-বাঁশের ছোট আফিমের দোকানটি। আশে-পাশে পান-বিড়ি আর 'পবিত্র' চায়ের দোকান। পরিমল সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিতে চারিদিকে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। অদূরে গায়ে তেলচিটে গামছা দিয়ে দু'একটি গঞ্জিকা-সেবী অপেক্ষা করিতেছিল, অহিংস-সৈন্যসমাবেশ দেখিয়া আশেপাশে লুকাইয়া পড়িল। পরিমল ব্যূহ রচনা করিতে লাগিল।"

দোকানের কোল ঘেঁসিয়া দক্ষিণে এবং বামে দুজনকে দাঁড় করাইয়া, সম্মুখের রাস্তায় দুজনকে শোয়াইয়া দিল। মুকুন্দ এবং আর একটি ছেলে সামনের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিমল নিজে অদূরে স্থির পদক্ষেপে 'প্যাট্রোল' করিতে লাগিল।

আশে পাশের অবুঝ জনতা বুঝি ইহাদের দেখিয়া হাসিতেছিল, কেহ কেহ চুপি চুপি কহিল, "কাজ নেই, কম্ম নেই, উপদেশ দিতে এসেছেন সব! আমরা যদি নেশা করি ওনাদের কি, ওনাদের পয়সায় আমরা খাই?" মুকুন্দ উস্‌খুস করিতে পরিমল চোখের ইসারায় তাহাকে নিবৃত্ত করিল।

ইত্যবসরে একটু অন্যমনস্ক হইতে একটি নেশাখোর স্বেচ্ছাসেবকদের ডিঙাইয়া গিয়া আফিং কিনিয়া ফেলিল। কিন্তু ফিরিবার পথে ধরা পড়িয়া গেল। পরিমল হুকুম দিতেই দক্ষিণ এবং বাম হইতে সত্যাগ্রহী দুইটি আসিয়া লোকটির দুইটি হাত চাপিয়া ধরিল; সম্মুখ হইতে মুকুন্দ এবং তাহার সহযোগীটি আসিয়া তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। তারপর সুরু হইল ধ্বস্তাধ্বস্তি। লোকটি মাঝে মাঝে হাঁফ লইবার জন্য মাথাটিকে সত্যাগ্রহীচক্রের উপরে ঠেলিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মুকুন্দের হাতের চাপে তলাইয়া যাইতে লাগিল। লোকটি যত কাকুতি মিনতি করিতে যায়, অহিংস সত্যাগ্রহী ততই তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া দেয়। তাহার ছিন্নরুদ্ধ কাকুতিতে বোঝা গেল যে, সে তাহার পেটরোগা কন্যার নিমিত্ত মাত্র এক পয়সার আফিম্ খরিদ করিয়াছে, ভগবানের দিব্য লইয়া সে বলিতেছে, সে আদপেই

তৎক্ষণাৎ মুকুন্দ সজোরে তাহার গাল টিপিয়া ধরিল, আর তাহার সহযোগী ডান হাতের তর্জ্জনীটি বেঁকাইয়া আফিমের মোড়ক...

নেশা করে না। মুকুন্দ হুঙ্কার দিয়া উঠিল; "ফের-র্ বেটা মিছে কথা! ফেল্ বলছি আফিম্। পেটের অসুখ সারাতে আফিং দরকার হয় বেটাচ্ছেলে?" লোকটি হঠাৎ এক সময় মাথাটি ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া আফিমের মোড়কটি একেবারে গালে পুরিয়া দিল।

ব্যস্ এই আর যায় কোথায়! তৎক্ষণাৎ মুকুন্দ সজোরে তাহার গাল টিপিয়া ধরিল, আর তাহার সহযোগী ডান হাতের তর্জ্জনী বাঁকাইয়া আফিমের মোড়কটি বাহির করিয়া পদতলে দলিত করিল। জয়োল্লাসে মুকুন্দ 'বন্দেমাতরম্'

সহযোগে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল। লোকটি মুক্তকচ্ছ ঠিক করিতে করিতে সত্যাগ্রহীদের বাপান্ত করিয়া থানার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

পরিমল এতক্ষণ নীরবে সমস্ত ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিল। এত বড় একটা দেশের কাজে সে কিছুতেই মনের মধ্যে সাড়া পাইল না। লোকটির কাঁদকাঁদ' মুখটি তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিল। এরূপভাবে দেশের লোককে সাত্ত্বিক করায় সুবিধা কি আছে? লোকটি যে সুবিধা পাইলে আর নেশা করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? কৈ, আশেপাশের লোকগুলিও তো তাহাদের কার্য্য সমর্থন

"ভাঙ্গা স্বাস্থ্য, ভাঙ্গা মন, হয়তো গিয়ে দেখবো ভাঙ্গা ঘর, এখন বাঁচবো কী নিয়ে? শুধু আমি নয়, আপনি নয়, এরকম হাজার হাজার…"

করিল না। বরং তাহারা এক জোটে নেশা করিবার জন্য বরং প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু কেন? পরিমলরা কি তাহা হইলে শুধু হুজুকের উত্তেজনায় এ কাজ করিতেছে?…

বৈকালের দিকে পুলিস আসিয়া সবকটি সৈনিককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। সারাদিন মনের সংশয়-দ্বন্দ্বে পরিমলের মুখ দিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনিও বাহির হইল না। মুকুন্দ কেবল বার কয়েক মহাত্মার জয় দিয়া থামিয়া গেল।…

বিচারে পরিমলের দুই বৎসর এবং মুকুন্দর ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল—আর আর সকলে ছাড়া পাইল পরিমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেকগুলি: বিশেষ করিয়া ঐ যুবকদিগের উদ্যোক্তা হিসাবে এবং এইসকল সুকুমারমতি যুবকদের মনে রাজদ্রোহের বিষ প্রবেশ করাইয়া পিকেটিং করা, সর্ব্বোপরি নিরুপদ্রব পথিকের উপর গুণ্ডামী।…

কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া মুকুন্দ অনেক আস্ফালন করিল, হাতের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটিকে পাইলে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, এ ভাবও দেখাইল। আপনাকে 'নট্ গিল্টি' বলিবার সময় সে একটি নাতিদীর্ঘ, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল। পরিমল কেবল নির্জীবের মত কাঠগড়ার একটি পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত কথা কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত আসিয়া হঠাৎ যেন আদালত গৃহের জনতার কৌতূহলে আটকাইয়া গেছে। মনে হইল, ইহারা যেন তাহাদের উপহাস করিতে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। তাহার উপর বার বার মামীমার কথা মনে হইতে লাগিল: অহিংস আস্ফালনে বীরত্ব অপেক্ষা কাপুরুষতার লজ্জাই বেশী। পরিমল স্থির ভাবে শাস্তি গ্রহণ করিল।

…জেলখানার দরজার সম্মুখে অনেকে তাহাদিগকে ফুলের মালা পরাইল এবং শঙ্খধ্বনিতে তাহাদের অভিনন্দিত করিল বটে, কিন্তু পরিমলের পূর্ব্বের সে উৎসাহ ফিরিয়া আসিল না। বার বার মামীমার সেই রাত্রের ব্যথাকাতর মুখটি মনে পড়িতে লাগিল।…

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে আসিয়া পরিমল একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিয়া পাইল না অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত-সত্যাগ্রহীরা কি করিয়া এতদূর কুরুচিসম্পন্ন হইতে পারে। দেশবাসীর নেশা কাটাইবার জন্য যাহারা কারাবরণ করিয়াছে, তাহারাই আবার একটি বিড়ির জন্য কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দেয়—কারাগৃহের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করে! হুটাপাটিতে আবার কাহারও কাহারও গালে ছ্যাঁকা লাগিয়া যায়।…মাঝে মাঝে আবার ইহারা অহিংস আবেগে জেলখানার থালা-বাটী প্রাচীরের বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়,—ছাদের উপর উঠিয়া শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের স্ত্রী-কন্যাকে দেখিয়া মুখ বিকৃতি করে। শেষে ইহাদের অহিংস উপদ্রব এতদিন এতদূর বাড়িয়া গেল যে, সকলকে তালাচাবি বন্ধ করিয়া পুলিস

লাঠি চালাইল। ফলে পরিমলের মত অনেক নিরপরাধ যুবক মার খাইয়া হাঁসপাতালে গেল।

পরিমল বড় দুঃখে স্বীকার করিল মামীমার কথাই ঠিক: ইহারা সকলে হুজুকে মাতিয়াছে, দেশ-সেবার কোন আদর্শই ইহাদের নাই। ছি, ছি একটা বিড়ির জন্য এইরূপ ইতরামী করে ইহারা! কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া দেশবাসীর গাল টিপিয়া এক পয়সার আফিম্ বাহির করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না? গুণ্ডামী ছাড়া তাহারা মহৎ কি করিয়াছে? লজ্জায়, ঘৃণায় গ্লানিতে পরিমলের গা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে থাকে। আগাগোড়া ব্যাপারটি হুজুক ছাড়া কি?

কিছুদিনের মধ্যে আবার দেখা গেল, অনেকেই মুচ্‌লেকা দিয়ে বাড়ী ফিরিতেছে। মুকুন্দকে প্রায়ই বলিতে শোনা গেল, "দূর্‌-র্‌, এমন জানলে কে এখানে আসতো? সারাদিন একটা বিড়ি পর্য্যন্ত খেতে দেয় না। মুখারীদা'ই দেখ্‌চি খুব চালাক, বেশ কেটে পড়েচে যা হ'ক!" পরিমল চুপ করিয়া থাকে, শুধু মুকুন্দ নয়, এই ধরণের কথা আজকাল অনেকেই বলিতে সুরু করিয়াছে। মুকুন্দ আপন মনে বলিয়া যায়, "তবে যে ওরা বলতো, রাজবন্দীদের অন্য ব্যবস্থা। এখন দেখছি আমরাও যা, আর ঐ চোর ছেঁচড়গুলোও তাই! এরকম জানলে কোন শালা আসতো!"

পরিমল অবাক্ হইয়া ইহাদের কথা শোনে। ভাবে, কতবড় নীতি এই অহিংস অসহযোগ! চমৎকার যোগ রহিয়াছে ইহাতে দেশবাসীর...দেশের যুবকদের!...

কয়েকদিন ধরিয়া হাওয়া অন্যপথে বহিতে সুরু করিল, মুকুন্দ এবং আরো অনেকে সানন্দে ঘরে ফিরিল। জেলখানা প্রায় খালি হইয়া আসিল।...

এ-জেল, সে-জেল করিয়া প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। পরিমল সংবাদ পাইল "মহাত্মা"র সহিত আইন-প্রস্তুতকারীদের আপোষ চলিতেছে। একটি রফাও না কি হইয়া গেছে। মামীমার কথাগুলি পরিমলের কানে বাজিতে লাগিল। এতদিনে যাহা হউক নিজের নামটিতো যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার হইয়া গেল! এত বড় একটা আন্দোলন যে এত সহজে নিঃশেষ হইয়া যাইবে তাহারা কি ভাবিতে পারিয়াছিল? যথার্থ সৈনিক হিসাবে ভাবিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। কিন্তু এ কি? ব্যক্তি-প্রচারে তাহারা শুধু গড্ডলিকার মত মাথা গুঁজিয়া সামনে আসিয়াছিল না কি! অদূরের কসাইখানাটিকে লক্ষ্য করে নাই?

*

দুই বৎসর পরে ভগ্নস্বাস্থ্য আর ভগ্ন মন লইয়া পরিমল ছাড়া পাইল। কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, কোথাও এতটুকু উত্তাপের লেশ নাই, নিরুৎসাহের ভস্মস্তূপ চারিদিকে পুঞ্জীভূত। সঙ্গের একটি ছেলে ম্লান হাসিয়া কহিল, "ভারি অবাক্ হ'লেন না? এ'র চেয়ে বেশী কি আর আশা করতে পারেন? ভাবচেন, 'ব্রিট্রেয়াল'! হো-

"একটা বিড়ি দিতে পারেন—বড্ড ভুলে এসেচি!...এবারে আর নুন খেয়ে নিমকহারামী নয়—একেবারে খাঁটি 'কমুনিজ্‌ম'......"

হো, তা যাই বলুন মহাত্মাটির আত্মপ্রত্যয় অনেকখানি কিন্তু!"

পরিমল কহিল, "আমি ভাবছি এঁরা দেশের মঙ্গল চান না, দেশ বলতে কেবল কতকগুলো থিওরি বোঝেন। জনগণের দুঃখু এঁদের কতটুকুই বা বাজে? নিজেদের মতবাদের মোহে এরা দেশের আসল রূপটী ভুলে যান।"

ছেলেটি বলিল, "দুঃখু করচেন? তা করুন—but i'ts too late! কিন্তু আমি কি ভাবচি জানেন, আমাদের মত যুবকদের আর কোন আশা নেই! ভাঙা স্বাস্থ্য, ভাঙা মন, হয়তো গিয়ে দেখবো ভাঙা রয়েছে ঘর! এখন বাঁচবো কি নিয়ে? শুধু আমি নয়, আপনি নয়, এরকম হাজার

হাজার। সব আশা-ভরসা আমাদের শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে বুকের মধ্যে।…নেতারা পরস্পর তো দেশটিকে ভাগাভাগি করে' নিলেন। কোথায় রইল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, স্বাধীনতা, শান্তি।"

হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার কহিল, "তার চেয়ে জেলে মারা পড়লে ছিল ভাল, তবু জানতুম্ কাজ করে' মরেচি। মরার পরে তো জ্ঞান থাকতো না, যে, নিজের মৃত্যু নিজে দেখতে পেতুম। এখন সব চেয়ে আমার বাজছে কি জানেন, এক মুঠো ভাতের জন্যে এর তার উমেদারী করতে হ'বে। দেশের লোক আমাদের চিনবে না, তাদের আমরা যে সমস্ত ফাঁকি দিয়ে এসেছি, সাবধানে সমস্ত যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছি।"

প্রবল উত্তেজনায় ছেলেটি আর কথা কহিতে পারিল না। পরিমলও তাহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। আর সে বলিবেই বা কি? দেশকে এতদিন পাশ্চাত্ত্য ছাঁচে ঢালিয়া কাল্পনিক রূপ দিতে যাওয়ার এই তো হাতে হাতে ফল। পরিমল আজ মনে মনে মামীমার কথাগুলি অবনত মস্তকে স্বীকার করিল: দেশের আনাচে-কানাচে যে-দুঃখ, যে দারিদ্র্য আছে, তাকে দূর করাই তো দেশ-সেবা। ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মতবাদের পরীক্ষায় তেত্রিশকোটী লোক উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

ছেলেটি বলিল, "বলতে পারেন, আর কোন লজ্জায় দেশে ফিরব?"

পরিমল চুপ করিয়া রহিল। দিগন্ত-বিস্তৃত শূন্য মাঠে হয়তো ঐ প্রশ্নের উত্তর আছে।

দুপুরের দিকে পরিমল দেশের ষ্টেশনে আসিয়া নামিল। সব ঠিকই আছে, কিন্তু কাহার সহিত যেন তাহার পরিচয় নাই। পুরান ষ্টেশন-মাষ্টারটি তাহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল বটে, কিন্তু এই সুযোগে মহাত্মা যে একটি বাজে হুজুক দেশের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছে, তাহা জানাইতে কসুর করিল না। কহিল, লাখপতির জাত মশায় ওরা, আমাদের দুঃখু বুঝবে কেন? একদিন সুখ করে অনশন করলে মাথার কাছে পঞ্চাশটা ডাক্তার মতায়েন থাকবে, আর আমরা যদি শতদিন, শত বৎসর দাঁতে-দাঁত দিয়ে পড়ে থাকি, কেউ দেখবে না মশায়। তফাৎটি বুঝুন। ওদের কথা আমরা শুনব কেন বলুন? কেউ যদি বলে, তোমার ভারত-জোড়া নাম হবে, তা হলে আমি হাঁটুর ওপর কেন, কাপড় না পরেও চিরকাল কাটিয়ে দিতে পারি—ইচ্ছে করলে রিক্সা টানতে পারি, মশায়।" বলিয়া বিজ্ঞ ভাবে হাসিল। পরিমল দেখিল সর্ব্বত্রই ঐ এক কথার সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে।…

গ্রামের কাছাকাছি একটি মুদীখানা হইতে হঠাৎ মুরারীদা'কে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া পরিমল দাঁড়াইয়া পড়িল। মুরারীদা'র পরনে এখন আর খদ্দর নাই, তাহার পরিবর্ত্তে একটি ময়লা ফিন্‌ফিনে ধুতি, গায়ে কাঁধ-ছেঁড়া একটি আধ ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী, রুক্ষ চুলগুলি কিন্তু তেমন-ই পিছন ফেরান, অন্যথায় একটু বেশী তাম্রবর্ণ।

মুরারীদা' কাছে আসিয়া একটু কুঁজো হইয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "যা হোক! আচ্ছা ভোল ফিরিয়ে ফেলেচেন কিন্তু, একেবারে চেনবার জো নেই! মাইরি, কোন শালা চিনতে পারে!"

মুরারীদা'কে দেখিয়া পরিমল একেবারে জ্বলিয়া উঠিল,—ইচ্ছা হইল মুখের উপর টানিয়া এক চড় মারে। পরিমলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মুরারীদা' কহিলেন, 'একটা বিড়ি দিতে পারেন বড্ড ভুলে এসেচি!" যাত্রার ভঙ্গিতে ডান হাতটি সামনে বাড়াইয়া দিয়া, বাঁ হাতটি কোমরে রাখিয়া কহিল, "উঁহু এবারে আর নুন খেয়ে নিমকহারামী নয়, একেবারে খাঁটি 'কম্যুনিজম্'! চালাকিটি আর চলবে না, সব সমান! বুঝলেন কি না? এবার 'ডাইলেক্‌টিকের' জোর দেখবেন—এক চালে সব মাৎ! আঃ দিন্ না একটা বিড়ি।"

পরিমল দারুণ বিরক্তিতে পাশ কাটাইয়া সামনে আগাইয়া গেল, ঘৃণায় মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। মুরারীদা' পিছন হইতে বলিলেন, "দিলেন না ত? বুঝবেন ঠেলা, সব সমান! মার্কস্ বলেন, শ্রেণী-সঙ্ঘাত আসতে বাধ্য!"…

রাস্তা চলিতে চলিতে পরিমলের অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল। ম্লান অপরাহ্ণে আকাশের নীচে শস্যহীন মূর্চ্ছাতুর শূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন সে দেশের প্রকৃত রূপটি দেখিতে পাইল। সেখানে কোন থিওরী নাই, আছে শুধু ভেকশূন্য সেবা। তাহার মূক বেদনার ভারে হুজুক আস্ফালনের কোন ইঙ্গিতই নাই। ব্যক্তিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া, মতবাদের পাণ্ডিত্যকে বর্জ্জন না করিলে, তাহার সহিত কোন যোগসূত্রই স্থাপিত হইতে পারে না।…

সন্ধ্যা হয়-হয়, পরিমল চোরের মত আসিয়া আপন ঘরটিতে প্রবেশ করিল। সমস্ত ঘর-দোর খাঁ-খাঁ করিতেছে, কোথাও কেহ নাই। নিতান্ত অসহায়ের মত পরিমল ঘরের

দুয়ারের উপর মাথা রাখিয়া দাঁড়াইল। অবসাদের ভারে তাহার সমস্ত দেহ অবসন্ন।

হঠাৎ একটি চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া 'গান্ধী'র ছবিটি হুক হইতে খুলিয়া ছাড়িয়া দিল। দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া ছবিটি মেঝের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। পরিমল স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ঠোঁটের কোণে যেন একটু ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

খিড়কীর দুয়ারে মামীমার কণ্ঠস্বরে শোনা গেল: "ঘরে কে রে? কে-ও?"

পরিমল একেবারে সাড়া দিল না, আবছা অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মামীমা প্রদীপ আনিয়া তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "ওঃ তুই! আমি মনে করি—কখন এলি? ভাল আছিস্ তো বাবা?" পরিমলের মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া চুমা খাইলেন। পরিমল রুদ্ধ আক্রোশে ফোঁপাইয়া উঠিল। মামীমা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "বোকা ছেলে, এতে কখনো কাঁদতে আছে! কাজ তো তোদের এখনো ফুরিয়ে যায় নি!"

পরিমল মামীমাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "তোমার কথা আজ থেকে শুনবো মা! তুমি ঠিকই বল, সমাজ সেবা না করলে, সত্যকারের সহানুভূতি না থাকলে দেশ সেবা চলে না। হুজুকে শুধু দেশকে ফাঁকি দেওয়াই যায়, তাকে সেবা করা যায় না!"

ছবির ভাঙা কাঁচগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে মামীমা হাসিয়া কহিলেন, "ছবিটি কিন্তু না ভাঙ্‌লেই পারতিস।—অহিংস সেনাপতি!"

পরিমল ঘাড় নাড়িয়া রুদ্ধ আবেগে কহিল, "আমি চাই না কাটা সৈনিক হ'তে।"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "সুমতি হোক। নে কাপড়-চোপড় ছাড়।"

মধু উৎসবে

—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

বাঙলার বুক ছেয়ে
এল আজ এল ও রে শারদীয়া উৎসব
রক্তিম ঊষা-ভালে
সানায়ের সুরে সুরে উল্লাস কলরব।
লাজে বাঙা শেফালীরা
দিল দেখা গাছে গাছে গন্ধের শিহরণ
তপনের সোনাকর
শষ্প ও শিশিরেতে খেলা করে অনুখণ।
নীলিমার কোলে কোলে
ছেড়ে দেয় রূপা-রথ শুভ্র-সে মেঘদল
পাপিয়ার কাকলীতে
জ্যোছনার ছেয়ে গেছে শরতের ধরাতল।
আগমনী রচে চলে
পল্লীর কবি যত উদাসীন উন্মনা
ছেলে মেয়ে নরনারী
ভোর হতে করে সুরু হর্ষেতে আনাগোনা।
মোর বুকে উৎসব
ক্ষণিকের তরে আজ আসে নাই আসে নাই
উল্লাসধ্বনিরাজি
ঢাক ঢোল কাঁসরেতে ভাসে নাই ভাসে নাই।

শুনিতে কি পাও না'ক
ঘরে ঘরে বুক ফাটা বেদনার কলরোল
দেখিতে কি পাও না'ক
ব্যথিতের হাহাকারে নভতল উতরোল।
ক্ষুধিতের বেদনায়
ছুটিতেছে পথে পথে ক্রন্দন-কল্লোল
দৈন্যের জ্বালা ক্ষোভে
'বিষুবাস' খোলে মুখ পরাণেতে দেয় দোল।
দলাদলি কলহেতে
নিভে গেছে আজি রাতে উৎসব দীপরাজি
হিংসা ও রাগে দ্বেষে
সুরহীন কলরব থলে জলে ওঠে বাজি।
প্রতারণা বিদ্রূপ
আজিকেও দেখি হায় হীনবল দীনজনে
সহোদর সহোদরে
কোল দিতে চাহে না'ক বিজয়ার শুভখণে।
তরুণের পরাণেতে
উৎসাহ মরে গেছে বিকৃত রূপরাজি.
মিথ্যার অভিনয়
তবুও বলিব হায় উৎসব এলো আজি!

প্রাক্‌সামরিক ও যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ড

—শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য

যতদূর জানা যায়, দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভিস্তুলা, ওয়ার্ত্তা ও ওর্ডার বেসিনাঞ্চল-অধ্যুষিত কতগুলি শ্লাভ-জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই প্রথম এই রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তারপর পোলিশ চারণদের মুখ থেকে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা পড়ে জানা যায় যে, প্রথম মিয়েজ্‌কোর (৯৬২—৯৯২) ঠাকুরদাদা প্রিন্স জিয়েমোভিট্‌ কার্পেথিয়ান হতে বুগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক্রোবাকাইজা প্রদেশ পতনোন্মুখ বিশাল মোরাভিয়ান সাম্রাজ্য থেকে না কি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

গোঁড়া গ্রীক্‌ মিশনারীরা ভিস্তুলা অঞ্চলে তখন সবেমাত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সুরু করেছে। প্রথম মিয়েজ্‌কো নিজে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন। পরে তাঁর সমগ্র রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়ল। শ্লাভদের রাজ্য তখন বাল্‌টিক সাগরের সমগ্র ভূভাগ জুড়ে এল্‌বে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু পশ্চিম দিক্‌ থেকে জার্ম্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্লাভরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। প্রথম মিয়েজ্‌কোর পুত্র প্রথম বোলেস্‌লাউস (৯৯২—১০২৫) ছিলেন সত্যিকারের একজন তেজস্বী নরপতি এবং তিনি প্রথম রাজকীয় সম্মানের অধিকারী হলেন। চেক ও রুশদের যুদ্ধে পরাস্ত করে বিতাড়িত শ্লাভদের নিয়ে তিনি এক বিশাল রাজ্য গড়ে তোলেন। বাল্‌টিক থেকে কার্পেথিয়ান আর এল্‌বে থেকে বুগ পর্য্যন্ত ছিল তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি। পশ্চিমের কোনরূপ কর্তৃত্ব তিনি স্বীকার করলেন না। কিন্তু তাঁর বংশধরগণ এই রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করতে সক্ষম হল না। সামন্ত রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য দেখা দিল; রাজ্যের বন্ধন হয়ে পড়ল শিথিল আর রাজ্যও অনেক খোয়া গেল। রাজা প্রথম বোলেস্‌লাউসের রাজ্য প্রতিবেশী শত্রুদের হাতে বিধ্বস্ত হল। তারপর দ্বিতীয় বোলেস্‌লাউস্‌ (১০৫৮—৭৯) ও তৃতীয় বোলেস্‌লাউস্‌ (১১০২—৩৯) কতকগুলি বিজিত প্রদেশ পুনরুদ্ধার করলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাইলেসিয়া ও পোমেরানিয়া। পোল্যাণ্ডের শক্তি যৎসামান্য বৃদ্ধি পেল।

তারপর ১১৩৮—১৩০৫ সালে পোল্যাণ্ডের ভাগ-বাঁটোয়ারার পালা প্রথম আরম্ভ হল। তৃতীয় বোলেস্‌লাউস্‌ মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বেঁটে দিয়ে গেলেন। ফলে পোল্যাণ্ড কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ল। রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পোল্যাণ্ড হয়ে পড়ল দুর্ব্বল। প্রতিবেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার মত সামর্থ্যও তার আর থাকল না। ক্ষুদ্র পোল্যাণ্ডের ডিউক 'ডিউক অব পোল্যাণ্ড' নাম ধারণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। ক্রাকাও-এ রাজধানী স্থাপিত হল। বিশেষ করে সিরাদিয়ার মধ্যস্থিত রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবার পর থেকেই ক্রাকাও-এর মর্য্যাদা অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু উত্তরে মোসাভিয়া ও উত্তর-পশ্চিমে বৃহৎ-পোল্যাণ্ড ক্ষুদ্র-পোল্যাণ্ডের নীতি স্বীকার করতে অস্বীকার করল। এদিকে সাইলেসিয়ায় জার্ম্মান আধিপত্য বিস্তার লাভ করল। আর পোমেরানিয়া পোল্যাণ্ডের সার্ব্বভৌমত্ব অগ্রাহ্য করে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রিন্স বাটুর অধিনায়কত্বে তাতাররা করল পোল্যাণ্ড আক্রমণ। সানডোমিরৎস্‌ ও ক্রাকাও সহর তাতাররা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে লাগল। দেশে লোকসংখ্যা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হল। লীগনিজে সাইলেসিয়ার রাজা তাতারদের হাতে পরাস্ত হলেন। তারপর তাতাররা হাঙ্গারীর রাজা চতুর্থ বেলাকে সাজো নদীর তীরে পরাস্ত করল। তাতারদের এই আক্রমণ পোল্যাণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাল। রাজ্যের জনসংখ্যা পূরণ করবার জন্য অনেক সুবিধা দিয়ে সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রজা আমদানী সুরু হল। এই সঙ্গে অনেক

ইহুদীও পোল্যাণ্ডে প্রবেশাধিকার পেল। এতে পোলিশ সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে একটা নূতন জার্ম্মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল। পরে এই জার্ম্মানরা পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করে। ক্রমে পোল্যাণ্ডে জার্ম্মান বণিকদের প্রতিপত্তি এতদূর বেড়ে গেল যে, তারা পোলিশ অভিজাত-সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য এই জার্ম্মান বণিকদের জন্যই পোল্যাণ্ডের বৈভব অনেক বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে এই জার্ম্মানরা পোলিশ অধিবাসিগণের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

বর্ত্তমানে ডানৎসিক ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে পূর্ব্ব-প্রুশিয়া নামে জার্ম্মানির যে রাজ্য দেখতে পাওয়া যায়, ১২০৮ সালে শক্তিশালী টিউটনরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর সামরিক মঠাধ্যক্ষগণ প্রতিবেশী পৌত্তলিকগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে লিভনিয়ায় 'নাইটস্ অব দি সোর্ড' নামে একটি ধর্ম্ম-যুদ্ধ বাহিনী গঠন করা হয় এবং ১২০৮ সালে মোসাভিয়ার ডিউক কনরাড লিথুয়ানিয়ানদের স্বগোত্রীয় বর্ব্বর প্রুশীয় জাতির আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করবার জন্য কুলম্-এর (বর্ত্তমান পূর্ব্ব-প্রুশিয়া) অন্তর্গত জেলাসমূহে বসবাস স্থাপনার্থ শক্তিশালী টিউটনদের অভ্যর্থনা করে আনলেন। অবশ্য পোল্যাণ্ডের মধ্যে এই বৈদেশিকগণকে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য কনরাডকে পরে অনেক দোষ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ না করে তাঁর আর কোন উপায়ই ছিল না। দুরন্ত প্রুশিয়ানদের আক্রমণ প্রতিহত করবার মত তাঁর কোন সামর্থ্যই ছিল না। ১২৩০ সালে ক্রুস্কবীৎসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে টিউটনরা পোমেরানিয়া ও কুরল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের এবং দক্ষিণ দিকে অরন্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র-সংলগ্ন জেলাসমূহের অধিকার লাভ করে।

১২৫৯ সালে তাতাররা দ্বিতীয়বার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। তিন মাসব্যাপী তাতাররা ক্ষুদ্র পোল্যাণ্ড ও সানডোমিরৎস্-এর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলিকে বিধ্বস্ত করে। এই সঙ্কটকালে পূর্ব্বদিকে পোল্যাণ্ডের আর একটি শত্রু এসে জুটল। এরা হচ্ছে লিথুয়ানিয়ান্। ভয় হল পোল্যাণ্ড বুঝিবা সাইলেসিয়ার মত জার্ম্মানীর হস্তগত হয়। কিন্তু বৃহৎ-পোল্যাণ্ডের ডিউক প্রথম ব্লাডিস্লাউসের (১৩০৬-৩৩) অনন্যসাধারণ সাহসিকতার জন্য পোল্যাণ্ড সেবার জার্ম্মানীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পোল্যাণ্ডকে সংযুক্ত করে ১৩৩২ সালে তিনি প্লোভ্‌সে নামক স্থানে টিউটনদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পোল্যাণ্ডের নষ্ট গৌরব আবার ফিরে এল। প্রথম ব্লাডিস্লাউসের পর তৃতীয় কাসিমির (১৩৩৩-৭০) পোল্যাণ্ডের রাজা হলেন। কাসিমির ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্। বৈবাহিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে তিনি ইউরোপের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের যোগসূত্র স্থাপন করেন। সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অর্থনৈতিক ও শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করে তিনি পোল্যাণ্ডের অনেক উন্নতি সাধন করেন, রেড্ রাশিয়া অথবা গ্যালিসিয়ার বৃহত্তম অংশ তিনি নিজ করায়ত্তে আনেন। এতে পোল্যাণ্ডের উত্তর ও পূর্ব্ব বাণিজ্যে ফেঁপে উঠল।

ট্যানেনবার্গের যুদ্ধ

এদিকে টিউটনরা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল যে, তাদের ভয়ে লিথুয়ানিয়ানরা একটি রাষ্ট্র গঠন করে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হল। তৃতীয় কাসিমিরের মৃত্যুর পর পোল্যাণ্ডের দুর্দ্দিন আবার ঘনিয়ে উঠল। অন্তর্বুদ্ধের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই পোল্যাণ্ড টিউটনদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে লিথুয়ানিয়া পোল্যাণ্ডের একদিন শত্রু ছিল আজ সেই হয়ে উঠল তার মিত্র। উভয়ের প্রাচীন অস্তিত্বই টিউটনদের হাতে বিপন্ন হয়ে উঠল। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন কারুর আর অন্য উপায় থাকল না। তৃতীয় ক্যাসিমিরের মৃত্যুর ষোল বৎসর পর লিথুয়ানিয়ার গ্রাণ্ড ডিউক ইয়াগিলো ক্রাকাও-এ পোল্যাণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। ১৪১০ সালে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মিলিত শক্তির নিকট জার্ম্মান নাইটগণ পরাস্ত হন। দ্বিতীয় ভ্লাডিস্লাউস্ নাম ধারণ করে ইয়াগিলো উনপঞ্চাশ বৎসর পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। তাঁর সুশাসনের ফলে পোল্যাণ্ড একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে খ্যাতি লাভ

করে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র চতুর্থ কাসিমির (১৪৪৭-৯২) রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর রাজত্বকালে ডানৎসিক সমেত পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সহরগুলি টিউটনদের অত্যাচারের ফলে বিদ্রোহ-ঘোষণা করে এবং পোল্যাণ্ডের আনুগত্য স্বীকার করে। চতুর্থ কাসিমিরের মৃত্যুর পর পোল্যাণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজ্যের সমস্ত রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অধিকার করে বসে। চতুর্থ কাসিমিরের পুত্র প্রথম সিগিসমুণ্ড (১৫০৬-১৫৫৮) এবং তার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সিগিসমুণ্ড (১৫৪৮-৭২) সুদক্ষ ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে তাতারদিগকে দমন করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অর্দ্ধভাগে মাস্কোভির রুশীয়েরা পোল্যাণ্ডের পক্ষে এক ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সুশিক্ষিত পোলিশ বাহিনী তাদের পরাস্ত করে। দ্বিতীয় সিগিসমুণ্ড লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডকে এক সুবৃহৎ রাজ্যে পরিগ্রত করেন। তৃতীয় সিগিসমুণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভাসা-অধ্যায় আরম্ভ হয়। তাঁর রাজত্বকালে পোল্যাণ্ড একটি বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৬৪৮-৬৭ সালে রুশীরা ও সুইডেন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। পোল্যাণ্ডের দুর্দ্দিন আবার ঘনিয়ে উঠল। ১৬৯৭ সালে অগাষ্টাস যুগ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় অগাষ্টাস ডেনমার্ক ও রুশিয়ার সহযোগিতায় সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তারপর সুইডিশ, স্যাক্সন ও রুশীয়েরা উপর্য্যুপরি পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ করে। তৃতীয় অগাষ্টাস ১৭৩৩-৬৩ সাল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় ষ্টানিস্‌লাউস্ ১৭৬৪-৯৫ সাল পর্য্যন্ত পোলাণ্ডের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। এই সময় পোল্যাণ্ড তিনবার ভাগাভাগি হয়।

পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারা

ওয়ারসস্থিত রুশীয় মন্ত্রী ষ্টানিসলাউসকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য চক্রান্ত করতে লাগলেন। পোল্যাণ্ডে যে সমস্ত বিধর্ম্মীরা বাস করত, ওয়ারসস্থিত রুশীয় মন্ত্রী তাদের উত্তেজিত করে তুললেন। রাজনৈতিক অধিকারবিহীন বিধর্ম্মীরা পোল্যাণ্ডে এক তীব্র আন্দোলন সুরু করে। অভিযোগকারীরা পিটার্সবুর্গে জারিনা ক্যাথেরিনের নিকট এক প্রতিনিধি দল মারফৎ এই বলে এক আবেদন-পত্র পেশ করল যে, পোল্যাণ্ডের গঠন-তন্ত্র পুনর্ব্বিবেচনা সম্পর্কে ওয়ারসস্থিত রুশীয় মন্ত্রীকে ক্ষমতা দেওয়া হোক। কিন্তু প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়া, রাশিয়ার এই মধ্যস্থতা সুনজরে দেখল না। পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য তারা সবাই মিলে শেষে পোল্যাণ্ডকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। তখন অসহায় পোল্যাণ্ডের এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যে, ত্রি-শক্তির এই হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করে। ১৭৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেণ্টপিটার্সবুর্গে পোল্যাণ্ড-বাঁটোয়ারার প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় বার বাঁটোয়ারার সময় অষ্ট্রিয়াকে ভাগীদার হিসাবে দলে নেওয়া হল। ফলে পোল্যাণ্ডের এক-চতুর্থাংশ পরহস্তান্তরিত হয়।

প্রথম বাঁটোয়ারার পর পোলরা আবার সংহতিশক্তি গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। রুশীয়া, প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়া, নিজেদের মর্জ্জিমত একটা গঠন-তন্ত্র তৈরী করে পোল্যাণ্ডকে দেয়। পোল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও পরে কিছুটা উন্নত হয়। স্বদেশভক্ত পোলরা কসিউস্কোর নেতৃত্বে বিশেষ সাহসিকতার সহিত ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু বৃহত্তর শক্তির বিরুদ্ধে তারা কিছুই করে উঠতে পারে না। ১৭৯১ সালের ৩রা মে পোল্যাণ্ড প্রুশিয়ার সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং এই সময় অন্তর্ব্বিপ্লবের ফলে পোল্যাণ্ডে বংশপরম্পরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতে পোল্যাণ্ড আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, এই আশঙ্কায় জারিনা ক্যাথেরিন অস্ত্র-বলে পোল্যাণ্ডকে পূর্ব্বের গঠন-তন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য করেন। ১৭৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারায় দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

হৃতসর্ব্বস্ব পোলরা কসিউস্কোর অধিনায়কত্বে আর একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করে। অমিতবিক্রমে পোলরা রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে, কিন্তু উন্নত রুশশক্তির বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড পেরে উঠল না। ১৭৯৬ সালে পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত

আধুনিকতম রণসজ্জায় সজ্জিত পোল-সৈনিক।

পোলাণ্ডের—— ——নেতৃবৃন্দ

প্রেসিডেন্ট ইগ্নাসি মাসিস্কি (পোলাণ্ড)

[১৯৩৩ সালের ৮ই মে তারিখে দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। জন্ম, ১৮৬৭ সনের ১লা ডিসেম্বর, মিরজাগউ-এ। প্রথমবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার সময় ইনি লাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রো-কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন।]

কর্ণেল জোসেফ বেক।

[১৯৩২ সন হইতে বৈদেশিক সচিব ছিলেন। জন্ম, ...য়স, ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৪। বয়ঃক্রম ৪৪।]

জেনারেল ষ্টাচিভিস্জ্।

[১৯৩৫ সন হইতে চিফ অব দি জেনারেল ষ্টাফ ছিলেন। জন্ম ১৮৯৬, নভেম্বর মাস।]

মার্শাল এডওয়ার্ড স্মিগ্লি-রিজ্

[১৯৩৫ সনের ১২ই মে তারিখ হইতে পোল সৈন্যের ইনস্পেক্টার্ জেনারেল ছিলেন। বয়ঃক্রম ৫৩।]

হল। পশ্চিম গ্যালিসিয়া ও দক্ষিণ মোসাভিয়া অষ্ট্রিয়ার ভাগে পড়ে। প্রুশিয়ার ভাগে পড়ে পোদলাচিয়া, ওয়ারস ও মোসাভিয়ার অবশিষ্টাংশ আর বাকীটুকু রুশীয়া নিয়ে নেয়। তারপর ১৮৩০ ও ১৮৬৩ সালে পোলরা দু'বার বিদ্রোহ করে ব্যর্থ হয়। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাণ্ডের জাতীয় ইতিহাস রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৭৯৬ সালের পর থেকেই ইউরোপের মানচিত্রে পোল্যাণ্ডকে আর দেখা যায় না। কিন্তু পোলরা তাদের স্বদেশপ্রীতি ক্ষীণ দীপশিখার মত অন্তরে অন্তরে জাগিয়ে রেখেছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড আবার শতাব্দীর এই অজগর-নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে।

বিগত মহাযুদ্ধ ও পোল্যাণ্ড

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মান ও অষ্ট্রীয়ানরা রুশীয় পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ১৯১৫ সালের শেষ ভাগে অষ্ট্রোজার্ম্মান সৈন্য সমগ্র রুশীয় পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। জোসেফ্ পিলসুডস্কি স্বাধীনতার সর্ত্তে জার্ম্মানির পক্ষ অবলম্বন করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়া পরাজয় স্বীকার করে এবং জার্ম্মানী ওয়ারস অধিকার করে। পিলসুডস্কি সর্ত্তানুযায়ী জার্ম্মানীর কাছ থেকে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা দাবী করেন, কিন্তু জার্ম্মানী বিশ্বাসঘাতকতা করে পিলসুডস্কিকে ম্যাগডিবার্গের কারাকক্ষে আটক করে রাখে।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্ম্মানীতে বিপ্লব দেখা দিল। এতে সাম্রাজ্যবাদী জার্ম্মানীর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় পিলসুডস্কি মুক্তিলাভ করেন এবং ওয়ারসতে ফিরে যান। তারপর ভার্সাই চুক্তির ফলে পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করে। পশ্চিম দিকে সমুদ্র থেকে উত্তর সাইলেসিয়া পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের অধিকার সাব্যস্ত হয়। স্বাধীন সহর হিসাবে ডানৎসিককে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। ডানৎসিকের জলপথ, পোতাশ্রয় ও বন্দরগুলিতে পোল্যাণ্ডের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। পশ্চিম প্রুশিয়া ও পোজনানিয়ার কতকাংশ পোল্যাণ্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পিলসুডস্কি এতে সন্তুষ্ট হলেন না। রাশিয়ায় 'রেডস্' ও 'হোয়াইটস'দের মধ্যে এই সময় যে অন্তর্যুদ্ধ চলছিল, পিলসুডস্কি তার সুযোগ নিতে ভুললেন না। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করলেন এবং ফ্রান্সের সাহায্যে ইউক্রেনের বৃহৎ অংশ ও ভিল্‌না অধিকার করেন।

১৯২১ সালে পোল্যাণ্ডের সহিত রাশিয়ার 'রিগা'-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব-সীমান্ত সম্পর্কে মোটামুটি একটা মীমাংসা হয়ে যায়। ১৯২১ সালে পোল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের আর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। কারণ আগের মত ফ্রান্স তখনও সাম্যবাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যই ছিল যে, রাশিয়া সহজে পোল্যাণ্ড অতিক্রম করে ফ্রান্সে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। ১৯২৪ সালে ফ্রান্স পোল্যাণ্ডকে ত্রিশ কোটী স্বর্ণ-ফ্রাঙ্ক ধার দেয়। পরে ফ্রান্সের কাছ থেকে পোল্যাণ্ড আরও সাড়ে তিন কোটী স্বর্ণ-ফ্রাঙ্ক ধার নেয়।

১৯২৪ সালে পিলসুডস্কি পোল্যাণ্ডের সংস্কার আরম্ভ করেন। পরে পোল্যাণ্ডের অন্যান্য রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে পিলসুডস্কির মতভেদ হয় এবং ১৯৩০ সালে তিনি প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর পদ ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে এত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, ১৯৩৬ সালে তিনি আবার পোল্যাণ্ডের শাসন-ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। পার্লামেন্ট পিলসুডস্কিকে আবার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর সমর্থক মসিস্কিকে (কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট) প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত করেন এবং নিজে হন পোল্যাণ্ডের সমর-সচিব। ১৯৩৫ সালে পিলসুডস্কির মৃত্যুর পর স্মীগলী-রীজ (বর্ত্তমানে রুমানিয়ায় অন্তরীণ) সমর-সচিবের ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৩২ সালে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সাইলেসিয়া, করিডর ও ডানৎসিক নিয়ে পোল্যাণ্ডের সহিত জার্ম্মানীর বরাবরই একটা রেশারেশি ছিল। ১৯৩৪ সালে হিটলার দশ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ডের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সাব্যস্ত হয় যে, পোল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর

মধ্যে যদি কোন গোলযোগের সূত্রপাত হয়, তা হলে উভয়ে মিলে শান্তিপূর্ণ উপায়েই তার সমাধান করা হবে। সাধু প্রস্তাব। কিন্তু পোলদের পাগলামী ইদানীং না কি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, হিটলারের পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয়ে উঠল না। তাই গত ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবতারণা করেছেন।

পোল্যাণ্ডের দুর্দ্দিন আবার ঘনিয়ে উঠল। কুড়ি বৎসর যেতে না যেতেই পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আবার বিপন্ন হয়ে উঠেছে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক পোল হল দৃঢ়সংকল্প। মার্শাল স্মীগলী-রীজ পোলিশ সৈন্যবাহিনীর নিকট এক তেজোদৃপ্ত ঘোষণায় বললেন "পোলিশ এলাকায় প্রবেশকারী শত্রু-পক্ষকে প্রতি পদক্ষেপ রক্ত-রেখায় রঞ্জিত করে অগ্রসর হতে হবে।"

বর্ত্তমান অবস্থা

রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য নেই। ঘটনা-চক্রের কুটিল আবর্ত্তে প্রতিনিয়তই নূতন নূতন সমস্যা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। ফলে ইতিপূর্ব্বের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটছে। পরাক্রমশালী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পোল্যাণ্ডের আয়ুষ্কালের স্বল্পতা সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যেই পোল্যাণ্ডের মন্দভাগ্য যে আসন্ন হয়ে উঠবে, তা ভাবা যায় নি। যুদ্ধ চলছিল জার্ম্মানীর সঙ্গে পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বৃটেনের। এর মধ্যে শোনা গেল লাল ফৌজ পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম করে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছে। রুশ-জার্ম্মান চুক্তির মত নিদারুণ এই সংবাদ সমগ্র জগৎকে আর একবার হতবাক্ করে ফেলল। সোভিয়েট রুশিয়ার এই অপ্রত্যাশিত আচরণ আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ফ্রান্স ও বৃটেনের প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করে পোল্যাণ্ড যদি জার্ম্মানীকে প্রতিরোধ করতে পারত, তা হলে সোভিয়েট হয় ত সীমান্ত অতিক্রম করবার প্রয়োজন বোধ করত না। কিন্তু শত শত মাইল দূর থেকে পোল্যাণ্ডকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আর ফ্রান্স ও বৃটেনের এই প্রত্যক্ষ সাহায্য জার্ম্মানীর বিদ্যুৎ-গতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কতখানি কার্য্যকরী হত তাও বিচার্য্য। দীর্ঘকালস্থায়ী কোন যুদ্ধে জার্ম্মানীকে লিপ্ত করে অর্থনৈতিক চাপ দ্বারা জার্ম্মানীকে হীনবল করে ফেলাই বৃটেনের উদ্দেশ্য। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন তিন বা ততোধিক বৎসর যুদ্ধ চালাতে প্রস্তুত—বৃটেনের এই ঘোষণা থেকেই তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যক্ষ সাহায্যের পক্ষপাতী না হয়ে বৃটেন দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছে। দুর্দ্দমনীয় জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডকে তাই একা সংগ্রাম করতে হয়েছে। ফলে নাৎসী জার্ম্মানীর হিংস্র আক্রমণ পোল্যাণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে লাগল। পোল্যাণ্ডের এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রেসিডেণ্ট মসিস্কি ও প্রধান সেনাপতি স্মিগ্‌লি-রিজ দলবলসহ রুমানিয়ায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

পোল্যাণ্ডে রাশিয়া যে ভূভাগ করায়ত্ত করেছে, ১৯১৪ সালে এ অংশ রাশিয়ারই ছিল। সোভিয়েট রাশিয়া ইউক্রেনিয়ান ও হোয়াইট রুশীয়গণের স্বার্থ ও নিজ নিরাপত্তা রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব অবহেলা করে চোখের উপর নরমেধ-যজ্ঞের মধ্যে পোল্যাণ্ডের বিলুপ্তি মূঢ়ের মত শুধু তাকিয়ে দেখা, সমর্থনযোগ্য মনে করল না।

রাশিয়ার এই সাম্প্রতিক আচরণের বিরুদ্ধে অনেকে 'নীতি লঙ্ঘন করা হইল' বলে তারস্বরে চীৎকার করিতে সুরু করেছেন এবং পোল্যাণ্ডের এই করুণ পরিণতির জন্য অনেকেই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করে রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির বিকৃত ব্যাখ্যা করছেন। গণতন্ত্রী ফ্রান্স ও বৃটেন তাঁদের এই অবাঞ্ছিত স্বেচ্ছা-সহানুভূতির মুখাপেক্ষী নহে। রাশিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণের পরও ফ্রান্স ও বৃটেনের দৃঢ় মনোভাবের একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইউরোপে হিটলারবাদ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটেন বহু বর্ষব্যাপী যুদ্ধ চালাতে প্রস্তুত। মিঃ চার্চ্চিল ২রা অক্টোবরে মত প্রকাশ করেছেন যে, সোভিয়েটের আচরণ রহস্যাবৃত হলেও বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে প্রতিকূল বলা যায় না। ৪ঠা অক্টোবর প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেণ্ট সভায় ঘোষণা করেন যে, নূতন সোভিয়েট জার্ম্মান চুক্তিতে

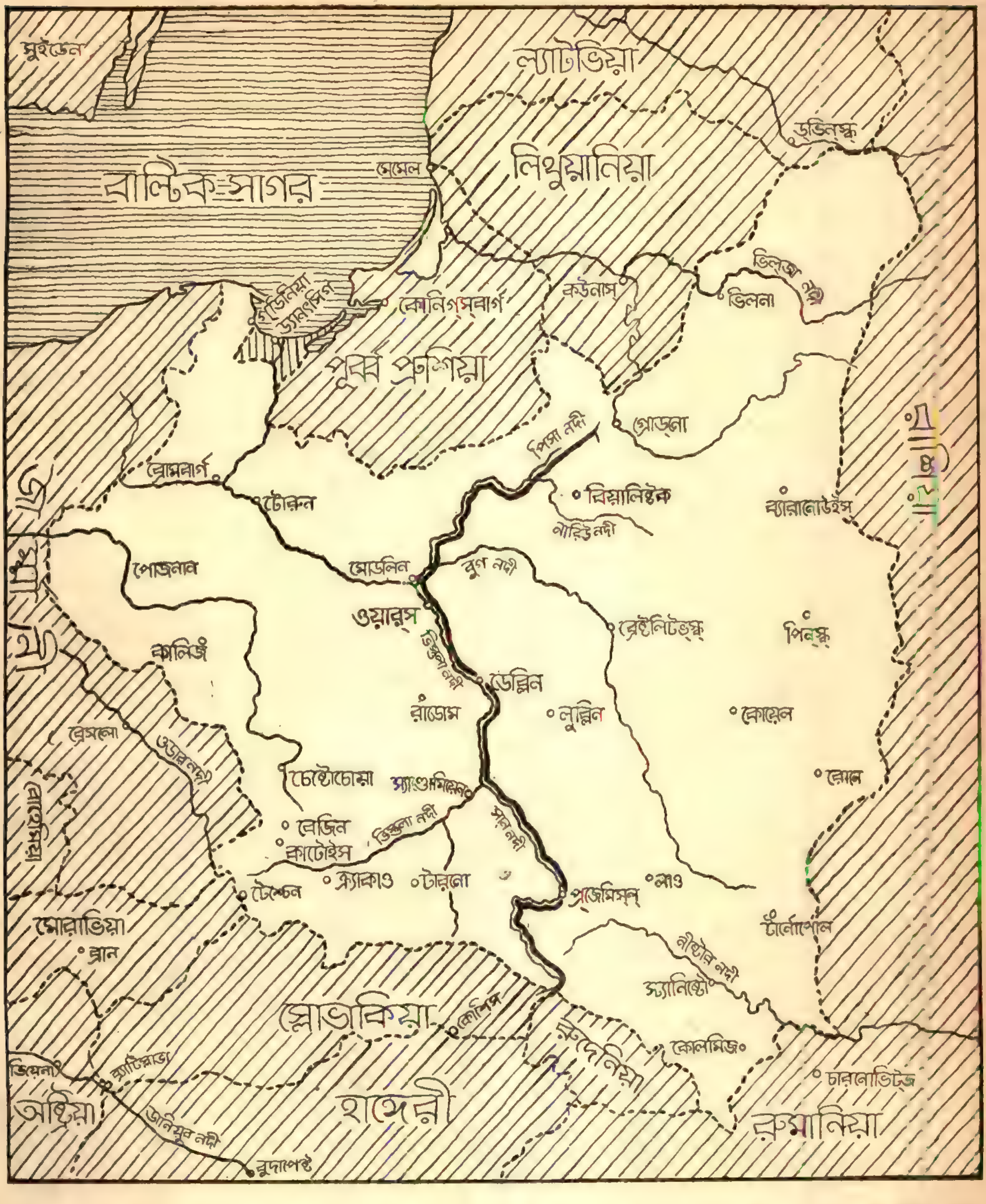

মানচিত্রে প্রদর্শিত রুশ-জার্ম্মান সীমানা পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব প্রুশিয়া এবং লিথুয়ানিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের যে অংশ আছে জার্ম্মানী উহা পাইবে। বর্ত্তমান সীমারেখা লিথুয়ানিয়ার দক্ষিণতম প্রান্ত হইতে পশ্চিম অভিমুখে যাইয়া পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সীমান্তে অগাষ্টাউ-এর উত্তর পর্য্যন্ত, তৎপরে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সীমান্ত হইতে পীসা নদী পর্যান্ত গিয়া দক্ষিণাভিমুখে মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমারেখা অনুসরণ করিয়া অষ্ট্রোলেকা পর্য্যন্ত, ইহার পরে দক্ষিণ পূর্ব্বে বুগ নদী পর্য্যন্ত গিয়া ঐ নদীর গতিপথ অনুসরণ করিয়া লুবলিন প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্তে, তৎপর পশ্চিম দক্ষিণ অভিমুখে সান নদী পর্য্যন্ত গিয়া ঐ নদীর গতি অনুসরণ করিয়া কার্পাথিয়ান পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে।

বৃটেনের সঙ্কল্পের কোন পরিবর্ত্তন ঘটবে না। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতাও একদিন পোল্যাণ্ডেরই মত বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সোভিয়েট সেদিন নিঃশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকে নি। চেক গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য রাশিয়া সেদিন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সহিত সহযোগিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে কোন সাধারণ সীমান্ত না থাকায় রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত সহযোগিতা করতে পারে নাই। চেকোশ্লোভাকিয়ার সেই দুর্দ্দিনে পোল্যাণ্ডই সে দিন বাদ সেধেছিল। তারপর সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর চলাচলের জন্য রুমানিয়া যদিই বা একটা পথ করে দিতে চেয়েছিল, মিঃ চেম্বারলেনের শান্তি-নীতির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোধে রাশিয়ার সাহায্য সে দিন অপ্রয়োজনীয় বোধে উপেক্ষা করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী সমরানল যাতে আর একবার জ্বলে উঠে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করতে না পারে তজ্জন্য মিঃ চেম্বারলেন শেষ পর্য্যন্ত শান্তির পথ উন্মুক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু হিটলারের কসাই-স্বভাব মনোবৃত্তি এতে প্রশ্রয়ই পেয়েছে। সাফল্যস্ফীত গর্ব্বিত হিটলারের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় মিঃ চেম্বারলেনের শান্তি-নীতি ইন্ধন যুগিয়েছে মাত্র। তাই পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফ্রান্স ও বৃটেনের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ডানৎসিগ বক্তৃতায় হের হিটলার সদম্ভ উক্তি করে বলেছেন, মাত্র আঠার দিনের মধ্যেই আমরা পোলদিগকে পরাজিত করেছি। কিন্তু হিটলার যেন ভুলে না যান যে, অন্য কোন বৃহত্তর রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ফ্রান্স ও বৃটেনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জার্ম্মানীর ভাগ্যে পোল্যাণ্ডের মন্দ ভাগ্যও আসন্ন হয়ে উঠতে পারে। কারণ যুদ্ধ-বিশারদগণ মনে করেন যে, আসন্ন মহাযুদ্ধেও বিমান-যুদ্ধ অপেক্ষা স্থল-যুদ্ধ ও জল-যুদ্ধই অধিক কার্য্যকরী হবে। তারপর অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা হেতু জার্ম্মানীর পক্ষে ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালস্থায়ী কোন যুদ্ধ পরিচালনা করাও সম্ভব হবে না। সর্ব্বোপরি অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনাও জার্ম্মানীতে রয়েছে। রুশ-জার্ম্মান অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর জার্ম্মানী নিজকে যতটা লাভবান্ বলে মনে করেছিল, রাশিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণের পর জার্ম্মানীর সেই ধারণা শিথিল হয়ে গেছে, যদিও জার্ম্মানী সরকারী ভাবে ঘোষণা করে যে পোল্যাণ্ড-বাঁটোয়ারা আগেই স্থির হয়ে গেছল। ক্রেমলিন প্রাসাদে রিবেনট্রপ-সম্বর্দ্ধনাই রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি নয়। তাই প্রীতি-ভোজের পটভূমিকায় নাৎসীবাদের মর্ম্মর-সমাধি চকিতে ভেসে ওঠে।

পোল্যাণ্ডের সহযোগিতায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে শস্য-শ্যামল ইউক্রেন প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করাই ছিল হিটলারের সুখস্বপ্ন! বস্তুত ১৯৩৩ সালের পর থেকে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে একটা সামরিক সম্বন্ধ স্থাপন করবার উদ্দেশ্যেই জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। নিয়তির কি পরিহাস যে হের ফন্ রিবেনট্রপকে আজ মঃ লাজার কাগানোভিচ ও মঃ এব্রাহাম লজোভস্কি—ইহুদী নিমন্ত্রণকর্ত্তাদের সঙ্গে একত্র ভোজে পরিতৃপ্ত হতে হচ্ছে। রুশ-জার্ম্মান নয়া চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র লুব্লিন প্রদেশ ও ভিস্তুলা নদীর উপর জার্ম্মানীকে পূর্ণ আধিপত্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে জার্ম্মানী সোভিয়েটের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে। পোলিশ-রুমানিয়ান সীমান্তে সোভিয়েটের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকায় রুমানিয়ার তৈল-সম্পদ্ লাভ করার জন্য জার্ম্মানীর রুমানিয়া অভিযানের পরিকল্পনা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ত্যাগ করতে হল। রুমানিয়ার তৈল-সম্পদ্ এখন দূর থেকে জার্ম্মানীকে প্রলুব্ধ করবে মাত্র; পোল্যাণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগ তেলের ঘানি রাশিয়ার ভাগেই পড়েছে। তথাপি জরুরী অবস্থার জন্য সোভিয়েট রুমানিয়ার বেসারাবিয়া (বেসারাবিয়া এককালে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।) সীমান্তে শত শত বাহিনী লাল পল্টন খাড়া পাহারা রেখেছে।

জার্ম্মানী বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের উপরও সোভিয়েটের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সোভিয়েট ও এস্তোনিয়ার মধ্যে দশ বৎসরের জন্য একটি পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'য়ে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া এখন অনায়াসে ওজেল ও দাগোতে নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপন ক'রতে পারবে।

লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার পররাষ্ট্র-সচিবদেরও মস্কোয়ে আহ্বান করা হয়েছে। এ দুটো দেশেও সোভিয়েটের প্রভাব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সোভিয়েট-জার্ম্মান নয়া চুক্তি ছাড়া পোল্যাণ্ড-বিভাগের চূড়ান্ত সীমারেখা টানা হ'য়ে গেল। নয়া ব্যবস্থার ফলে যে নূতন সোভিয়েট-জার্ম্মান সীমান্ত-রেখা স্থির হ'য়েছে তা পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সীমারেখার অনেকটা পূর্ব্ব দিকে গিয়েছে। ফলে ত্রিশ লক্ষ পোল জার্ম্মান শাসনের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। সমগ্র লুব্লিন প্রদেশ এখন জার্ম্মানীর আধিপত্যে এল। পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর আধিপত্য খানিকটা প্রসার লাভ ক'রেছে সত্য, কিন্তু জার্ম্মানী এই সম্পদ্ বেশী দিন ভোগ-দখল ক'রতে পারবে ব'লে মনে হয় না। সাম্রাজ্য-লিপ্সু হিটলার হয় ত ভাবছেন যে, পোল্যাণ্ডের উপর তাঁর আধিপত্য বুঝি বা কায়েম হ'য়ে গেল। জার্ম্মানীর প্রতি যতই সোভিয়েট আন্তরিকতা দেখাক না কেন, নাৎসী-প্রীতি তার এতটা প্রবল হ'য়ে ওঠে নি যে, উভয়ের মধ্যে কোন সাধারণ সীমান্ত সোভিয়েট স্বীকার ক'রে নেবে। পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট স্বেচ্ছায় যে নিজ আধিপত্য সঙ্কুচিত করেছে, এর মধ্যে তার হয় ত কোন কূটনৈতিক চাল আছে। যুদ্ধ অবসানে স্বাধীন পোল-রাষ্ট্র জার্ম্মান-অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর থেকেই গ'ড়ে উঠবে। এতে জার্ম্মানীকে নিশ্চয়ই বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করে নিজকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ক'রতে হবে। জার্ম্মানীকে তখন হয় ত ডানৎসিক, করিডর আর সামান্য কিছু নিয়েই সুখী হ'তে হ'বে। কারণ সোভিয়েট, হোয়াইট রাশিয়া, ও পোলিশ ইউক্রেণের এতটুকু অংশ পোল-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হ'তে দেবে না। শোনা যাচ্ছে জার্ম্মানীর তাঁবে একটি নামে স্বাধীন পোল-রাষ্ট্র জার্ম্মানী ও সোভিয়েট-অধিকৃত ভূখণ্ডের মধ্যে স্থাপিত হবে। হের হিটলার এখন মঃ ষ্ট্যালিনের ক্রীড়ণক মাত্র। আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট যে জার্ম্মানীর প্রতি এতটা সৌহার্দ্দ্য দেখাচ্ছে, তা কেবল নিজ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য। জার্ম্মানী এখন রাশিয়ার কূটনৈতিক জালে এমন ভাবে জড়িয়ে প'ড়েছে যে, স্বেচ্ছায় এমন কি অপর কোন শক্তি দ্বারা প্ররোচিত হ'য়েও জার্ম্মানী সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে সাহস ক'রবে না। সোভিয়েটের উপর জার্ম্মানীর বাধ্যবাধকতা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেবার জন্যই রাশিয়া এই নয়া চুক্তির অবতারণা ক'রছে। নিজ স্বার্থ ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার দিক্ থেকে এই অভিনয় করা ছাড়া সোভিয়েটের আর গত্যন্তর ছিল না। তবে রুশ-জার্ম্মান নয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে অপ্রত্যাশিত কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় নি। মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা ক'রেছেন যে, ইউরোপ হতে জার্ম্মান আক্রমণের চিরন্তন ভীতি দূর করাই হ'বে বৃটেন ও ফ্রান্সের এক মাত্র লক্ষ্য। শুধু এই দিক্ দিয়ে সোভিয়েটের নীতি ফ্রান্স ও বৃটেনকে সহায়তা ক'রবে বলে মনে হয়। হিটলার ভবিষ্যৎ-বাণী ক'রে বলেছিলেন যে, রুশ-জার্ম্মান মৈত্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা ক'রবে। আর সেই যুদ্ধেই জার্ম্মানীর বিলুপ্তি ঘটিবে। রুশ-জার্ম্মান নয়া চুক্তি কি তারই ইঙ্গিত?

আগামী যুদ্ধ

...শারীরিক বল ও আগ্নেয় অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা যে প্রকৃতপক্ষে লাভবান্ হওয়া যায় না, তাহা সত্য হইলেও সমগ্র মানব-সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারই জন্য এখনও ঐ পন্থাকেই মানুষ বীরত্বের প্রধান পন্থা বলিয়া সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকে। এই পন্থা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং সর্ব্বতোভাবে অনিষ্টপ্রদ, তাহা মানুষ সম্যকভাবে বুঝিতে না পারিলেও প্রকৃতিবশে এক শ্রেণীর মানুষ 'বাস্তব যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা অথবা লাভ করার প্রতি পরোক্ষভাবে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে, ইহারই ফলে শান্তি-বৈঠক প্রকৃতির অভিনয় চলিতেছে...

রাজযোটক

—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

জীবনের রহস্য মানুষের চির-অজ্ঞাত, তথাপি ভবিষ্যৎ জানিবার চেষ্টা তাহার কম নয়। গোলদীঘির পারে পাঁচটা পয়সা লইয়া যে-গণৎকার নিরঞ্জনকে বলিয়া দিল, সে শীঘ্রই চাকরী পাইবে, খুব ভাল চাকরী, যে-চাকরীতে অনেক লোক খাটাইয়া নিরঞ্জন খাইতে পারিবে রাজার হালে, সে অন্ততঃ সেদিনটা পাঁচ পয়সার ইলিশমাছ বা ঐরূপ কিছু কিনিয়াছিল, শূন্য-পকেট নিরঞ্জন কলের জল পান করিয়াই ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিল।

এইরূপ বহু ঘটনায়, জীবনের রহস্য অজ্ঞেয়, ইহাই তাহার ধারণা হইয়া গেছে এখন। গণৎকার দেখিলেই সে ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে—বলে, ঈশ্বর যে-বস্তু জানাতে চান না, তুমি মানুষ, কি করে জানবে সে বস্তু? স্পর্দ্ধা!

বিবাহিত নিরঞ্জন বধূ লইয়া বাস করিতেছে। বেলে-ঘাটার একটা সস্তা ভাড়ার কুঠরী, অবশ্য পাকাই, তবে বহু পুরাণো। বাড়ীওয়ালার মেয়ে দীপ্তি শিখার মতই দীপ্তিময়ী—আসে, নিরঞ্জন ও তস্য বধূর সহিত গল্প করে এবং কোন্ ক্রীম ভাল, কোন্ সাবান মাখিলে গায়ে অধিকক্ষণ গন্ধ থাকে, তাহারই আলোচনা করিয়া চলিয়া যায়—অর্থাৎ ক্রীম বা সাবান তাহার বড় বেশি জোটে না, যাহা জোটে তাহারই অহঙ্কার ছড়াইয়া যায় নিরঞ্জনের স্ত্রীর কাছে।

শ্যামলা নিতান্ত নিরীহ পল্লী মেয়ে। ক্রীম-সাবান সে দেখিয়া থাকিলেও খুব বেশী ব্যবহার করে নাই, অর্থাভাব, এবং ব্যবহার করিবার ইচ্ছা মনে জাগিলেও আমল দেয় না সে-ইচ্ছাকে। নিরঞ্জনের একটা খবরের কাগজের অফিসে সামান্য মাহিনার চাকরী জুটিয়াছে আজ মাত্র কয়েক দিন। এখনি ক্রীম বা সাবানের আব্দার চলিবে কেন? সক্ষম হইলে নিরঞ্জনই ত' তাহা আনিয়া দিবে। শ্যামলা একটু বেশি-রকম স্বামীপরায়ণা—আধুনিকার অভিধানে, নির্ব্বোধ আর কি!

সেদিন রাত্র নয়টায় অফিস হইতে ফিরিবার মুখে নিরঞ্জন একছড়া বেলফুলের মালা লইয়া আসিল—গণ্ডা দুই পয়সা মূল্যের মালা, কিন্তু তাহারই গন্ধে এই জীর্ণ বাড়ীটায় যেন বিবাহের সমারোহ জাগিয়াছে। গন্ধের টানে দীপ্তি আসিয়া দাঁড়াইল চৌকাঠের বাহিরে—"কিসের গন্ধ বৌদি?" কিন্তু উত্তর দিতে হইল না, দীপ্তি চাহিয়া দেখিল, শ্যামলার দূর্ব্বাশ্যাম কণ্ঠে মালাখানি সগর্ব্বে দুলিতেছে। ক্লান্ত নিরঞ্জন ও-পাশের খাটে প্রসারিত-দেহ। শ্যামলা মৃদু হাসিয়া সখীকে অভ্যর্থনা করিল—"আয়!"

ঘরে ঢুকিয়া দীপ্তি একটা ভাঙা মোড়ায় বসিল। নিরঞ্জন চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে, তাহার সহিত কথা কহা চলে না, দীপ্তি শ্যামলাকেই বলিল—"ওরে বাবা, আজ যে ফুলশয্যা হবে দেখছি।"

শ্যামলা আর একবার মৃদু হাসিল, কথা সে নিতান্তই কম বলে, ইহা তাহার স্বভাব। কিন্তু এতটুকু একটা মালা নিরঞ্জনদা যদি আনিলেনই, ফুলও কিছু বেশি আনিলেন না কেন? ক্লান্ত নিরঞ্জন চুপ করিয়াই রহিল। শ্যামলা বলিল, "তোর ফুলশয্যায় বেশি ফুল দেব।"

দীপ্তি একটু আনন্দিত, একটু লজ্জিত এবং একটু গর্ব্বিত হইল। তাহার বিবাহের কথা চলিতেছে। বর বেশ ভাল অবস্থার লোক—সেখানে ফুল দিবার জন্য দুই দুঃস্থ দম্পতির প্রয়োজন হইবে না—তথাপি বলিল, "দেখব কত দিতে পার।"

নানা গণৎকারের কাছে হাত এবং কোষ্ঠি দেখাইয়া এবং পঞ্জিকার জ্যোতিষ-বচনার্থ পাঠ করিয়া নিরঞ্জন খানিকটা জ্যোতিষ শিখিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বাস সে করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে উহা লইয়া আলোচনা করে। একদিন ছুটির দিনে দীপ্তির বাবা আসিয়া দীপ্তি ও তাহার ভাবী বরের দুইখানা কোষ্ঠি নিরঞ্জনকে দিল।

"যোটকটা একটু দেখে দেবেন নিরঞ্জন বাবু—আপনি তো জানেন দেখতে?"

"রাখুন, যা জানি, দেখবো—তবে আমার উপর বিশ্বাস করবেন না!"

"ওতেই হবে—ঘর-বর ভাল পাচ্ছি মশাই, তবে দেখাতে হয়, দেখাচ্ছি একবার।"

দীপ্তির বাবা চলিয়া গেলে নিরঞ্জন কোষ্ঠি পরীক্ষা করিতে বসিল। দীপ্তি ইহার মধ্যে আসিয়া শ্যামলার কাছে বসিয়াছে—সেও শুনিতে চায়, তাহার ভবিষ্যৎ। নিরঞ্জন বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া দেখিল মিল হয় না। অরি দ্বি-দ্বাদশ হইতেছে, তাহার উপর গণ-মিলন নাই এবং নাড়ীবেধ-দোষ হয়। দীপ্তির বাবাকে কি বলিবে ইহাই সে ভাবিতেছিল, দীপ্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছেন নিরুদা, মিল হচ্ছে না?"

"চলবে একরকম করে, তবে জ্যোতিষে বলছে ঝগড়াঝাঁটি হবে। কিন্তু এতে কে বিশ্বাস করছে!"

"আপনি করেন না বিশ্বাস? তবে শিখেছেন কেন?"

"শিখবো বলে শিখি নি—অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, দায়ে পড়ে শেখা গেছে।"

দীপ্তি হাসিয়া উঠিল। দায়ে পড়িয়া কি জ্যোতিষ শেখা হয়। যতসব বাজে কথা নিরঞ্জনের। নিজে কিছুই জানেন না, খালি খালি ফক্কুড়ি।

দীপ্তির পিতা আসিয়া বলিল, "কেমন দেখলেন, বিয়ে চলবে তো!"

"আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না, অন্য কাউকে দেখান"—বলিয়া নিরঞ্জন কোষ্ঠি ফেরত দিল—"আমি যা দেখলাম, তাতে বিয়ে না দেওয়াই উচিত।"

দীপ্তির বাবা অপ্রসন্ন মুখে চলিয়া গেলেন। নিরঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিরঞ্জন মিথ্যা কথা বলিবে, ইহা তিনি কেমন করিয়া প্রত্যাশা করেন।

"ও-সব বাজে নিরুদা, আপনাদের কি কোষ্ঠি দেখে বিয়ে হয়েছিল!"

"হাঁ, আমাদের রাজযোটক মিল হয়েছে। তবে না দেখলেই যে খারাপ কিছু হবে তা আমি বলছি না।"

"ভারি তো ভাল হয়েছে আপনাদের, বউকে একটা সোনার দানা দিতে পারেন না।"

শ্যামলা অত্যন্ত আহত হইয়া চমকিয়া উঠিল। নিরঞ্জনের দৃষ্টি কাতর হইয়া পড়িল। উচ্ছ্বসিত আবেগে দীপ্তি তখন বলিয়া চলিয়াছে—"যত সব বাজে উদ্ভট, জ্যোতিষ না কচু—তা হলে আর ত্রিশটাকা মাইনের কেরাণীর বউ হতে হোত না।"

কি কথায় কি কথা উঠিয়া পড়িতেছে। শ্যামলা আর সহিতে পারিল না, বলিল, "আমাদের ত্রিশ টাকাই ভাল দীপ্তি, তুই রাজরাণী হোস, আশীর্ব্বাদ করছি—কিন্তু চুপ কর।"

"ও মা! তুমি এত রেগে গেলে কেন বৌদি! আমি তো তোমার পক্ষেই কথা বলছি ভাই—নিরুদা তোমাকে দু'খান ভাল কাপড়ও দিতে পারেন না কেন?"

"থাম্ তুই দীপ্তি—কাপড় আর সোনাই মানুষের সর্ব্বস্ব নয়।"

দীপ্তি বারংবার ভাবিতে চেষ্টা করিল, কোথায় সে অন্যায় করিয়াছে। চাহিয়া দেখিল নিরঞ্জন ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। শ্যামলা ডাকিয়া বলিল, "এক পয়সার ধূপ কিনে এনো তো, আর এক পয়সার কয়লা, পয়সা নিয়ে যাও।" আঁচলের খুঁট হইতে একটা আনি খুলিয়া শ্যামলা নিরঞ্জনের হাতে দিল, বলিল, "বাকি দুপয়সার ফুল নিয়ে এস।"

ইহাই তাহাদের সম্বল। সামান্য চারিটা পয়সা, তাহাই গুছাইয়া প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু ইহাদিগকে কিনিতে হয়। ফুল আবার কেনা কেন? ঐ দুই পয়সার তো এক বেলার নুন-তেল হইয়া যাইবে। কিন্তু শ্যামলার ফুল কেনা চাই, নিরঞ্জন অত্যন্ত ফুল ভালবাসে। নিরঞ্জন বাহিরে চলিয়া গেল। শ্যামলা রান্নার কাজ লইয়া বসিল। দীপ্তি আর কোন কথাতেই ভাব জমাইতে পারিল না শ্যামলার সঙ্গে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দীপ্তি আর একবার আসিল শ্যামলার কক্ষে। নিরঞ্জন আহারান্তে ঘুমাইতেছে, বর্ষার ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিবার ভয়ে তাহার সারা গায়ে একটা চাদর চাপানো। শ্যামলা স্বামীর উচ্ছিষ্টপাত্রে খাইতে বসিয়াছে। ভাত ডাল, একটা তরকারী, একখানি মাছের টুকরা, রবিবারে ইহাই ইহাদের উন্নত আহার্য্য। দীপ্তির হাসি পাইতেছে, উহাদের না কি রাজযোটক হইয়াছিল!

"হ্যাঁ—সকালবেলা ফুল কেন আনালে বৌদি, পূজা ছিল না কি তোমার!"

"না ভাই, উনি ঘরে থাকলে ফুল রাখি আমি বিছানার পাশে।

দীপ্তি দেখিল, একটা কাচের প্লেটে কতকগুলি চাঁপা এবং মালতী ফুল নিরঞ্জনের বালিশের পাশে রহিয়াছে। ফুলদানী ইহাদের নাই, ফুল কিনিবার সামর্থ্যও নাই, তথাপি ফুলের বিলাসিতা দীপ্তির বড়ই দৃষ্টিকটু বোধ হইতেছে। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে অন্য কথা পাড়িল—"তোমাদের বিয়ে কত দিন হয়েছে ভাই বৌদি ?"

"চার বছর, আমার তের বছর আর ওঁর একুশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে।"

"তের বছর? ও মা! তখন তো আমি ফ্রক পরতাম! তুমি বরকে চিনেছিলে ভাই সেই বয়সেই, বুঝতে পারতে উনি তোমার কে?"

"হাঁ, না পারবার কি হেতু আছে? তের বছরের মেয়ের যথেষ্ট বুদ্ধি হয়, অন্ততঃ বরকে চেনে!"

"কি জানি ভাই, আমার তো উনিশ বছর হোল, এখনো বিয়ের নামে ভয় করে আমার!"

"আমি তো ভেবেছিলাম, তুই আমার থেকে ছোট, তুই বড় তা হলে আমার চেয়ে!"

দীপ্তি নিজের বোকামিতে নিজের উপরই চটিয়া উঠিল। সঠিক বয়স সে কাহাকেও বলে না, কথার কথায় বলিয়া ফেলিয়াছে শ্যামলার কাছে। কিন্তু নিরঞ্জনদা যখন কোষ্ঠি দেখিলেন, তখন তো নিশ্চয়ই বয়সের হিসাব করিয়াছেন। আর সে কথা কি বৌদিকে না বলিয়াছেন এতক্ষণ! মিথ্যা না বলিয়া ভালই করিয়াছে দীপ্তি। নিরঞ্জনদা নিশ্চয়ই রাত্রে দীপ্তির বয়স লইয়া স্ত্রীর সহিত আলোচনা করিবেন।

শ্যামলা বলিল, "কি অত ভাবছিস দীপ্তি, বরকে কিছু ভয় করতে হয় না। অত আপনার আর কেউ নাই পৃথিবীতে, পৃথিবীর ওপারেও কেউ নাই বোধ হয়।"

"কি জানি ভাই, তুমি ঘুমুবে না কি এখন!"

"হাঁ, অন্ততঃ শোব খানিক, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে আজ!"

এই ঠাণ্ডা বাতাসে মলিন শয্যায় শুইয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করাই উহাদের চরম বিলাসিতা। দীপ্তি উঠিয়া আসিল, তাহার কয়েকটা সেমিজ পেটিকোট তৈরী করিবার আছে।

এক শ্রাবণ-রজনীতে সেই ধনী সন্তানের সহিত দীপ্তির বিবাহ হইয়া গেল। শ্যামলা স্বামীর দ্বারা কতকগুলি বাছা বাছা দেশী ফুল আনাইয়া দীপ্তিকে উপহার দিল, বলিল, "এই ফুলকে ভ্রমর যেমন ভালবাসে তেমনি তোকে যেন উনি ভালবাসেন ভাই—"

আজ শ্যামলার এই আশীর্ব্বাদ দীপ্তির অত্যন্ত ভাল লাগিল। মনে হইল, ইহার চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ তাহাকে কেহই করে নাই। দীপ্তি ফুলগুলি বুকে ছোঁয়াইয়া অশ্রুসজল চক্ষে স্বামীগৃহে চলিয়া গেল।

•

ইহার পর একটানা একটা বিরতি, সুদীর্ঘ এক বৎসর। দীপ্তির সংসার স্বামীর আধিপত্যে সঙ্কীর্ণ। স্বামী সকল সময় ব্যস্ত থাকেন, যেটুকু সময় বা দীপ্তির নিকট অবস্থান করেন তাহা কাজের কথায় ভরা থাকে। কোন্ চাকরটা কাজ ভাল করে না, কাহারও নিকট পাওনা টাকা মারা যাইতেছে, কোন্ বাড়ীটায় ভাড়াটিয়া চলিয়া যাইবে। এই সব সংবাদ দীপ্তির স্বামীর নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রীর সহিত ভাব-বিলাসিতা করিবার তাঁহার একান্ত সময়াভাব। স্ত্রী আছে, সংসারে আরো পাঁচটা জিনিষ যেমন সযত্নে আছে তেমনই, বই পড়িয়া, জামা-সেমিজ সেলাই করিয়া এবং গল্পগুজব করিয়া সে নিশ্চয় ভালই থাকিবে। মাসের প্রথমেই তিনি দীপ্তিকে গোটাকতক টাকা তাহার হাতখরচের জন্ত দেন, দীপ্তির খরচ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, জমা হইতেছে। নূতন ডিজাইনের গহনা বাজারে বাহির হইলেই স্বামী কিনিয়া আনেন, নূতন পাড়ের শাড়ী, নূতন স্নো-ক্রীম সবই আনিয়া দেন। মাঝে মাঝে দীপ্তিকে লইয়া মোটরে ঘুরাইয়া আনেন; সিনেমায় যান, বাজার করিতেও লইয়া যান। অভাব কি দীপ্তির। ভালই তো আছে দীপ্তি তাহার স্বামীর সংসারে! তথাপি দীপ্তির মাঝে মাঝে মন উদাস হইয়া যায়। একলা ঘরে মেঘমেদুর আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, নীচে বৃষ্টিসিক্ত বাগানখানা হাতছানি দিয়া বলে, "এসো—আজ আমাদের ফুলের উৎসবে তুমিও যোগদান কর"—তখন দীপ্তির বড়ই একা বোধ হয়। মনে হয়, ঘরে এখন স্বামী থাকিলে তাহার মন আরও ভাল থাকিত।

বিবাহের পর বৎসরের সেই শ্রাবণের দিনটা আবার ঘুরিয়া

সোরেণ্টো সমুদ্রতীর হইতে দৃষ্ট বিষুবিয়স ।

আসিয়াছে। ঘনঘোর বর্ষা নামিয়াছে। বৃষ্টিভেজা বেলফুলগুলি অপরাহ্ণের শীতলস্পর্শে দল মেলিতেছে। দীপ্তি বাগানে নামিয়া স্বহস্তে আঁচলভর্ত্তি ফুল তুলিল। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মস্ত একটা গোড়ে মালা রচনা করিল—লুকাইয়া রাখিল মালাটি, স্বামী আসিলে তাঁহার গলায় সে ইহা পরাইয়া দিবে। আজ যেন স্বামীর সহিত একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা করিবার তাহার ইচ্ছা জাগিতেছে মনের গোপনপুরে।

দীপ্তি শয্যাটাকে আর একবার ঝাড়িয়া পাতিল। চন্দনসার ছড়াইয়া ঘরটা আর একটু সুরভিত করিয়া তুলিল। মুখের প্রসাধনটা আর একটু উজ্জ্বল করিয়া লইল এবং নীরবে বসিয়া রহিল প্রতীক্ষমানা অবস্থায়।

দামী বর্ষাতিটা গায়ে জড়াইয়া স্বামী আসিয়া ঢুকিলেন কক্ষে। দীপ্তি সলজ্জ মৃদু হাসিয়া বর্ষাতিটা খুলিয়া লইতে গেল, কিন্তু স্বামী ততক্ষণ তাহা খুলিয়া সযত্নে র‍্যাকের উপর টাঙ্গাইতেছেন। মূল্যবান বস্তু উহা। দীপ্তি বলিল, "ভিজে এলে কোত্থেকে—এই বাদলায় না বেরুলেই চলতো না?"

"কৈ আর চলে বলো—নভেল পড়ে কাটালে তো আমার চলবে না।"

স্বামী কাপড় ছাড়িয়া ফেলিলেন, পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া নোটগুলি লৌহসিন্দুকে রাখিলেন, তৎপরে ধীরে-সুস্থে একটা গদিআঁটা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "খুব যে গন্ধ ছড়াচ্ছ দেখছি ঘরে!"

"হ্যাঁ", বলিয়া দীপ্তি হাসিমুখে মালাটি আনিতে গেল। এইবার সে স্বামীর গলায় মাল্যদান করিবে এবং তাহার বিনিময়ে—দীপ্তির অন্তর একটু শিহরিয়া উঠিল। মালাখানি আনিয়া সযত্নে সে পিছন দিক হইতে স্বামীর গলায় পরাইয়া দিল। স্বামী বিস্মিত হইয়া চাহিলেন দীপ্তির মুখের দিকে, তারপর মালাটা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন,—"বাঃ বেশ মোটা মালা তো—বাজারে এর দাম নিশ্চয়ই বার আনার কম নয়।"

দীপ্তির মুখ মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। বাজারে ঐ মালাটার কত দাম হইবে সেই চিন্তাই স্বামীর মস্তিষ্কে প্রথম আলোড়ন তুলিয়াছে, আর বাজারের তৈরী মালা এবং দীপ্তির হাতের তৈরী মালায় কোনই পার্থক্য নাই যেন! স্বামীকে দীপ্তি চেনে, অপমানটা গায়ে না মাখিয়া সামনে ঝুঁকিয়া সে বলিল, "দাম না হয়, নাই কষলে; আজ একটু—"

দীপ্তি মুখ তুলিল কিসের প্রত্যাশায়? তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া একটি স্নিগ্ধ সৌরভ ঘুরিয়া ফিরিতেছে, একটি মাধুর্য্য-রশ্মি তাহাকে অতি-পরিচয়েও অপরিচয়ের সুষমা দান করিয়াছে; বলিল, "আজ একটু হিসাবের কথা ভুলে যাও গো! এক বৎসর আগে এই দিনে—"

দীপ্তির স্বামীর এই দিনটার কথা পর্য্যন্ত মনে ছিল না। দীপ্তির নিকট হইতে আভাস পাইয়া তাঁহার মনে পড়ায় তিনি হাসিয়া উঠিলেন। তার পর ভাবিলেন, ছেলেমানুষ দীপ্তি! হিসাবের কথা ভুলিলে কি মানুষের চলে না কি? আগে অর্থ তারপর অন্য কিছু। পেটে ক্ষুধা থাকিলে যতই কেন কাব্য কর না, কিছুই জমিবে না। স্বামী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তারপর? খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে যেতে হবে না কি? আন কবিতার বই; পাগল!" স্বামী আদর করিয়া কথাগুলি বলিলেন কি না, বোঝা গেল না, কিন্তু দীপ্তির মন ইহাতেই নিমজ্জিত হইয়া গেল। অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "পড়ব কবিতা একটা শুনবে!"

"থাক, ও তুমি দুপুর বেলায় যত খুসি পড়, আমাকে এখন কিছু খেতে দাও দেখি!" ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে হইবে, তাহার জন্য চাকর-ঠাকুর আছে এবং দীপ্তিও আছে। দীপ্তি স্বামীর খাবার ব্যবস্থা করিতে গেল। মনের মধ্যে কোথায় যেন তাহার কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া দীপ্তি দেখিল, স্বামী তাহার গলার মালাখানি ঘরে টাঙান একটা ছবির উপর ঝুলাইয়া দিয়াছেন। উহা যে দীপ্তির গলায় ফিরাইয়া দেওয়া উচিত, তাহা কি স্বামী একবারও ভাবিলেন না! এতটুকু প্রীতিও কি নাই তাঁহার? তথাপি দীপ্তি খুসি হইতে চেষ্টা করিল। আহারান্তে শয়নের পূর্ব্বে স্বামী নিশ্চয়ই মালাটি দিবেন দীপ্তিকে। দেখা যাক!

স্বামীকে খাদ্য পরিবেশন করাইয়া দীপ্তি আহার করাইল। পরিতুষ্ট স্বামী বাদল-রজনীর প্রগাঢ় নিদ্রার কথা ভাবিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি শয়ন করিলেন। দীপ্তি আহারান্তে ফিরিয়া দেখিল, নিথর নিদ্রায় স্বামী অচৈতন্য।

ভাল লাগিতেছে না। এই দাস-দাসী, হীরা-সোনা, গাড়ী-বাড়ী সবই যেন পুরান হইয়া গিয়াছে দীপ্তির চোখে। কিছুই আর মোহ জন্মাইতে পারে না তাহার মনে। সে যেন

একটা চলমান পুত্তলিকা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া যায়, কেহ তাহার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে না, তাহারও প্রয়োজন নাই কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার। দীপ্তির মনটা দিন কতকের জন্য অন্য পরিবর্ত্তন খুঁজিতেছে। সন্ধ্যায় স্বামীকে বলিল, "বাবা-মাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে—দেবে পাঠিয়ে ?"

"বেশ তো, যাও না, কালই, ছত্তর সিং রেখে দিয়ে আসবে।" যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও এত সহজে অনুমতি-লাভ দীপ্তির পছন্দ হইল না। দীপ্তির যাওয়া বা আসায় উঁহার যেন কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। একবার বলিলেন না যে, তাঁহার কোন কষ্ট হইবে, অথচ দীপ্তির কষ্ট হইতেছে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে। কিন্তু দীপ্তি অত্যন্ত সহনীলা হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, "তুমি যাবে না রাখতে ?"

"আমি ? আমাকে যে কাল চুঁচড়ো যেতে হবে, কাজ আছে।"

"বেশ, আনতে যাবে তো ? দিন সাতেক পরেই তুমি নিজে নিয়ে এস !"

"সে দেখা যাবে তখন। কি কি চাই তোমার, একটা লিষ্ট দিও, কাল আনিয়ে দেব।"

পরদিন বৈকালে দীপ্তি বাপের বাড়ী চলিয়া আসিল। মোটর আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বাপের পুরানো বাড়ীর দরজায়। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। দীপ্তি সাবধানে তাহার হিলতোলা জুতা চালাইয়া বারান্দায় উঠিল। আসিবার সময়ে গাড়ীতেই তাহার নিরঞ্জন ও শ্যামলার কথা মনে হইয়াছিল। ঠিক করিয়াছিল, নিরঞ্জনকে সে বলিবে, যোটক বিচার করিয়া সে বলিয়াছিল, দীপ্তির বরের সহিত ঝগড়া হইবে, ঝগড়া দীপ্তিদের একদিনও হয় নাই। ঝগড়ার বদলে যাহা হইয়াছে দীপ্তি তাহাকে বর্ণনা করিতে পারে না। দীপ্তি জামা-কাপড় ছাড়িয়া প্রথমেই শ্যামলা ও নিরঞ্জনের সহিত দেখা করিতে চলিল।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বারান্দাটা ঢাকা, দীপ্তি দেখিল, অন্য দরজা দিয়া সিক্ত বস্ত্রে নিরঞ্জন ঘরে ঢুকিতেছে একটা চার পয়সার বেলফুলের মালা তাহার হাতে। দীপ্তি থামিয়া গেল একটা থামের আড়ালে।

নিরঞ্জনের হাতে মালা দেখিয়া তাহার সেদিনকার কাহিনী মনে পড়িয়া গেল। কোথায় যেন একটি কাঁটা খচ্ করিয়া তাহাকে বিঁধিল।

দীপ্তি পলায়ন করিয়া বাঁচিল। সে জানে নিরঞ্জনের গণনা মিথ্যা।

শিল্প

…"শিল্প", এই পদটীর মুখ্যাংশ "শিল্" ও প্রত্যাংশ "পক্"

ঋষিগণ-প্রণীত পদের অর্থোদ্ধার করিবার পদ্ধতি অনুসারে "শিল্প" বলিতে বুঝিতে হইবে সেই প্রকরণ (কোন গুণ অথবা দ্রব্য নহে), যে প্রকরণের সাহায্যে কি প্রকারে মৌলিক সত্ত্বাবস্থা হইতে বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং ঐ বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়।

শিল্প এই পদটীর শব্দানুগ স্বাভাবিক অর্থ কি, তাহা সোজা বাংলায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে, কি প্রকারে মৌলিক সত্ত্বাবস্থা হইতে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা যে যে প্রকরণের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং যে যে প্রকরণের দ্বারা ঐ বিভিন্ন বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, সেই সেই প্রকরণের নাম "শিল্প"।

কিষণগড়

—শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

জয়পুর হইতে ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল দূরে কিষণগড় রাজ্য। ১৯৩৩ সনে শীতের এক সকালে জয়পুর হইতে সাইকেলে সোৎসাহে কিষণগড় পাড়ি দিলাম—সঙ্গে দুইটি বন্ধু। বাগড়ু ও দুদু হইয়া বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত এক রজনীতে কিষণগড় পৌঁছিলাম।

কিষণগড়—একমাত্র চিতোরগড়ের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। চিতোর বিশাল, দীর্ঘ—প্রশস্ত প্রস্তরের চূড়ায় অবস্থিত। চূর্ণ-বিচূর্ণ দৃশ্যে। কিষণগড় তার চেয়ে অল্প নিম্নে। কিন্তু ধ্বংসের পরিমাণ একই।

সে-রাত্রির চাঁদ দীপ্ত নয়, হর্ষিত নয়, মুদিত নয়, মৃত। চাহিয়া মনে হইল, অস্কার ওয়াইল্ডের 'সালোমে'র সেই অপূর্ব্ব উপমাটি, "it looks like a dead thing; something terrible will happen!" চাঁদকে মরার মত দেখাইতেছে, ভীষণ অশুভ কিছু একটা ঘটিবে। অশুভ যাহা ঘটিবার, তাহা প্রায় সবই ঘটিয়া গিয়াছে, নূতন অশুভ কিছু ঘটিবে বলিয়া অনুমান কিংবা কল্পনা করাও কঠিন। দুদু হইতে আসিবার পথে সাইকেলে অতিরিক্ত গ্রীষ্মবোধ এবং পরক্ষণেই শীতার্ত্ততার শিহরিত কম্পন; অতঃপর কিষণগড় হইতে সাত-আট মাইল দূরে পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইবার ঘটনাটা মনে পড়িল, মনে পড়িল—তৃষ্ণা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পাগলের মত পার্শ্বের জঙ্গলের লতা-পাতা চিবাইয়া পিপাসা নিবারণের চেষ্টা···

আর কি অশুভ ঘটিবে?

তথাপি আশঙ্কা কুসংস্কারের মধ্য দিয়া মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল, 'it looks like a dead thing, something terrible will happen!' চাঁদের মুখ মরার মত দেখাইতেছে, ভীষণ অশুভ কিছু ঘটিতে পারে।

যে-পাহাড়ের পাদদেশে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, তাহারই পার্শ্বে বেদেরা তাঁবু ফেলিয়াছিল। আমাদের দেখিয়া আচম্বিতে তাহাদের শ্মশানরক্ষীসম কুকুরের দল এমন চীৎকার করিয়াছিল যে, তদপেক্ষা অশুভ আর কিছু ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই···

প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম। কনকনে শীতের রাত্রে পশ্চাতের কুকুরযুথের ঘেউ-ঘেউ রব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া

কিষণগড় দুর্গ।

আসিল। এমন অবস্থায় ওষ্ঠাগত প্রাণ লইয়া বাইকারূঢ় হইয়া কিষণগড় মিলের নিকট আসিয়া পৌঁছাই। তাহার গায়েই জলের কল দেখিয়া মরুভূমিতে ওয়েসিস্ আবিষ্কারের ন্যায় স্বর্গ হাতে পাইলাম যেন।

কল খুলিয়া ইচ্ছামত জল খাইলাম, ধড়ে প্রাণ আসিল সত্য, কিন্তু তথাপি বিশ্বাস হইতেছিল না যে, জল সত্যই পাইয়াছি···তৃষ্ণা মিটিয়াছে···

চিন্তা করিলাম ওই রাত্রে যদি কুকুরের দল না পিছনে পড়িত সে যাত্রা হয়ত রক্ষা পাইতাম না ; একে ত' জলের জন্ত ওই অবস্থা হইয়াছিল, তার উপর কুকুরের তাড়না ; অর্থাৎ জলাভাবের জন্তই বোধ হয় ঈশ্বর তাড়া দিয়াছিলেন কুকুরের দ্বারা।

রাত ছিল জ্যোৎস্নায় পূর্ণ। কন্কনে শীতের ফরসা

রাজপুত।

রাত। দেখিবার মত দেখার অবকাশ হইল তৃষ্ণা দূর করার পর।

চাঁদের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি। চোখে ছানি পড়ার মত তাহার অবস্থা। পাতলা পাতলা ঝির-ঝিরে খণ্ড-খণ্ড মেঘে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কিষণগড় শহরকে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। শুভ্র প্রস্তরের 'ফুল-মহল' প্রাসাদটির মধ্যে আলোর ছড়াছড়ি। শ্বেতপদ্মের হ্রদ এবং ফুল-মহল প্রাসাদটি যৌবন-রূপের পূর্ণতায় নিস্তব্ধ রাতে সাঁতার কাটিতেছিল। চারিদিকে ঘেরা নানা বয়সের পাহাড়—যাহাদের উপর ইতিহাস ইসারায় কথা কহিতেছে, জ্যোৎস্নায় তাহারা খণ্ড খণ্ড রূপে আকাশের কোল বাহিয়া উঠিয়াছে। এই ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলি ক্ষোদিত ও নির্ব্বাক্, কিন্তু উদ্যম উৎসাহের দিক্ হইতে মূক বা বক্তবাহীন নয়।— কিন্তু তাদের দরদ, তাদের মর্য্যাদা, তাদের দস্তুরমত সম্মান ডুবিতে বসিয়াছে। তাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তার পরিবর্ত্তে জমিতেছে লণ্ডন, প্যারিস, টোকিয়ো, বার্লিন, মস্কো···

সে রাত কাটাইলাম আরও মাইল খানেক অগ্রসর হইয়া এক ধর্ম্মশালায়। ধর্ম্মশালাটীর দেয়ালের রূপ ও রং স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। স্থানে স্থানে চটাওঠা, ইট্-পাথর-বেরুনো ; বাকি স্থানগুলি বহুকালের দস্তখতের ঠেলায় বহু পুরাতন পাণ্ডুলিপির ন্যায় দেখাইতেছে। সাইকেল তিনখানা একখানে করিয়া চেন গলাইয়া তালা মারিয়া হেলাইয়া দিলাম এক নিম-গাছের গুঁড়িতে। সতরঞ্জি কম্বল যখন ছাড়িলাম, তখন বেলা এত হইয়াছে যে, ছায়া ছোট হইয়া আসিয়াছে।

নিদ্রা ভাঙ্গিতেই চেনা-দরজার ফাঁক দিয়া রৌদ্র প্রবেশ না করায় ধর্ম্মশালার রৌদ্রে, গন্ধে, রূপে, ছন্দে, চট্ করিয়া ঘুমের আমেজ কর্পূরের মত উবিয়া গেল। গা ঝাড়া দিয়া উঠিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্টোভ লইয়া পড়িলাম। চা, চিনি, পাত্র সবই ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই দুধের অভাবে গয়লা আসিয়া দাঁড়াইল।

দুধ আমাদের সঙ্গে ছিল টিনের। কিন্তু জঙ্গলে সাইকেল সারিবার সময় থলি হইতে অন্যান্য জিনিষ বাহির করিতে কৌটা সেখানেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম। যাক, গয়লা রোজ না কি একবার একবার খোঁজ লইয়া যায় এই ধর্ম্মশালায় দুধের কারুর প্রয়োজন আছে কি না।

চা পান খুব তোড়জোড় করিয়াই হইয়াছিল। তারপর খাতা-পেন্সিল লইয়া উঁচু-নীচু পথ পার হইয়া নজরে পড়িল ফুল-মহল প্রাসাদ। তার খুবই কাছাকাছি উঁচু-নীচু ঢিবি···আর নামিলাম না।

সেই একই স্থান হইতে তিন জোড়া চোখে তিন রকম দৃশ্য দেখিলাম। তার প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি—আর এক ঢালু পার হইয়া যে-খানটা উঁচু হইয়াছে, তাহার উপর বেশ একখানি সাদা ধপ্-ধপে

বাড়ী। পিছনে তাহার বিশাল পাহাড়; তারই গা ঘেঁসিয়া তুলা-পেঁজা খণ্ড খণ্ড মেঘের হুড়াহুড়ি।

কৈশোরে জ্যামিতি পড়িতে হইয়াছিল। আর কিছু

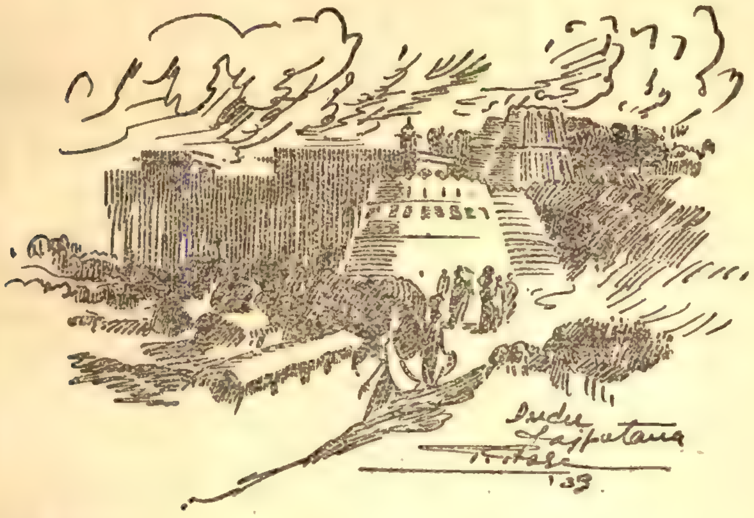

দুদু (রাজপুতানা)।

মনে না থাক, তাহার বিন্দু, রেখা, সরল ও বক্র, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ এবং বৃত্তগুলি মনে আছে এবং মনে থাকিবেও। মনে থাকিবে বলিতে ভরসা পাইতেছি এই জন্য যে, পৃথিবীর চারিপার্শ্বে চাহিয়া দেখি কেবল জ্যামিতির এই অঙ্কন—বিন্দুর পর বিন্দু, রেখার পর রেখা, সরল ও বক্র উভয়ই, ত্রিকোণের পর ত্রিকোণ, চতুষ্কোণের পর চতুষ্কোণ, বৃত্তের পর বৃত্ত। থরে থরে কে এমন করিয়া ইহাদের সাজাইয়া রাখিয়াছে?

দূরে অই বৃক্ষপুঞ্জ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছি। সমস্ত দৃশ্যটাই জ্যামিতির অঙ্কনে ভরিয়া গিয়াছে—পাতা আর পাতা কেবল নয়, ফাঁকে ফাঁকে সমস্তই জ্যামিতির অঙ্কন। এমন নিরবিচ্ছিন্ন জ্যামিতিপ্রিয়তা নিসর্গ ব্যতীত আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিঞ্চিন্মাত্রও শৈথিল্য নাই, অবসাদ নাই, কোথাও ত্রুটি কিংবা বিচ্যুতি নাই।

কিউব-পন্থী শিল্পীরা নিসর্গের এই দিক্‌টার একটি অংশ দেখিয়া তাহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। রেখা-শিল্পী মাত্রই জ্যামিতির প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট। কেহ সজ্ঞানে, কেহ অজ্ঞানে। সজ্ঞান যাঁহারা, তাঁহারা নিসর্গকে কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতেছেন, আর অজ্ঞান যাঁহারা তাঁহারা দেখিতে গিয়া, নিসর্গকে কাটিয়া ছাঁটিতেছেন। সজ্ঞান না অজ্ঞান, শিল্পী-চিত্তের কোন্ অবস্থা ভাল এবং কোন্ অবস্থা মন্দ তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

জ্যামিতিক রেখার সমাবেশে পথের ও কিষণগড়ের যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহারই কয়েকটি নমুনা এখানে উপস্থিত করিতেছি। আগেই বলিয়াছি যে, একই দৃশ্যের যে-ভাব আমি দেখিয়া তাহাকে অঙ্কিত করিলাম, সেই দৃশ্যের মধ্যেই অপর একজন আরও কোন স্বতন্ত্র

ফুলমহল প্যালেস ও কিষণগড় দুর্গ।

ভাব দেখিতে পায়। এরূপ কেন হয়? ইহার বিচার সুধিজন করিবেন।

কেবল চিত্র-শিল্পে নহে, সাহিত্য, তক্ষণ, ইত্যাদি সকল

শিল্পেই শিল্পী নিজের দৃষ্টির গণ্ডী কদাচিৎ অতিক্রম করিতে পারেন। সাহিত্যের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা এই গণ্ডী অতিক্রমের দাবী করিতে পারে, নিতান্ত নিরপেক্ষ ভাবেই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র তিনি অঙ্কন করিয়া থাকেন—চিত্র-

রাজপুতানা।

শিল্পে নাট্যপ্রতিভার এই বিকাশ কোথাও সম্পূর্ণ হইয়াছে কি?

কিষণগড়ের ফুল-মহল প্রাসাদের ও কিষণগড় দুর্গের যে রেখাচিত্র এইখানে উপস্থিত করিতেছি, তাহার সহিত সতীর্থ-দৃষ্ট এই একই দৃশ্যের বিভিন্ন আলেখ্য উপস্থিত করিতে পারিলে আলোচ্য বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হইত। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না।

সীমাহীন প্রান্তর।

একদিকে পদ্মে ভরা হ্রদটি 'মাক্কাল-বিলাস' কিষণগড় দুর্গ এবং ফুল-মহল প্রাসাদটিকে সাপের মত জড়াইয়া রাখিয়াছে। অন্যদিকে টিবির উপর ফরসা বাড়ীটিই ষ্টেট গেষ্ট-হাউস। মহারাজা সুরজ সিং কিষণগড়ের মহারাজার প্রধান-মন্ত্রী। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এ-সব।

এক চাপ-দাড়ী-আঁচড়ানো এলোমেলো-ভাবে পাগড়ী-পরা রাজপুত আসিয়া দাঁড়াইলেন পিছনে। তাঁহাকেও এখানে উপস্থিত করিলাম—যতক্ষণ কাজ করিতেছিলাম, তিনি ত্যক্ত করেন নাই, বিরক্তও করেন নাই, সেই কৃতজ্ঞতায়। কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই।

চোখে চোখ পড়িতেই বলিলেন—"নাক্সা বাণাউছো কাঁই?" ঝাড়সাই ভাষা বুঝিতাম অল্প স্বল্প, বলিলাম, "হা ম্বা (অর্থাৎ) হাঁ। ছবি আঁকছি।"

মহারাজা ভ্রমণকারীদের বড় ভালবাসেন। বসাইলেন। চাকরদের উপর হুকুমও হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই রূপার এক সেট চায়ের সরঞ্জাম আসিতে দেরী হইল না। চায়ের টেবিলে উদয়পুর, যোধপুর এবং জয়পুর ষ্টেটের রাজবংশীয় আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া—তিনি আমাদের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় উঠিয়াছি। আপনাদের কাছে ম্যাপ আছে তো? বলিলাম, উঠিয়াছি ধর্ম্মশালায়। ম্যাপ একখানা আছে Road-map of Rajputana। তাঁর নিজের নাম দস্তখত-করা Road-map of India নামক একখানা ম্যাপ দিয়া সোজা গ্যারেজে গিয়া মোটরে বসাইয়া ষ্টেট গেষ্ট-হাউসে লইয়া গেলেন। প্রধান-মন্ত্রী বলিয়া এক

জন না ভাবিলেও—তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে এই প্রকার সত্য মনুষ্যত্ব অতি বিরল।

এই সেই সাদা ফরসা তকৃতকে বাড়ী। পিছনে যাহার বিশাল পাহাড়, যাহার ক্রোড়ে সন্তান-স্নেহে স্নিগ্ধ রাজার অতিথিশালা, চূড়ায় যাহার ইতিহাসের অধিবেশন। গেষ্ট-হাউস-এর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইতেই কল টেপার মত আমাদের নিকট হইতে নম্রভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আর বলিলেন, "I am coming in the evening, সন্ধ্যা বেলায় আসিব।" সন্ধ্যা বেলায় তিনি আসিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দিনের মৃতপ্রায় চন্দ্রের কথা ভাবিতে-ছিলাম, অশুভ কিছু ঘটে নাই। তাঁহাকে বলিলাম যে, এরূপ একটা কিছু ঘটনা না ঘটিলে অস্কার ওয়াইল্ডের

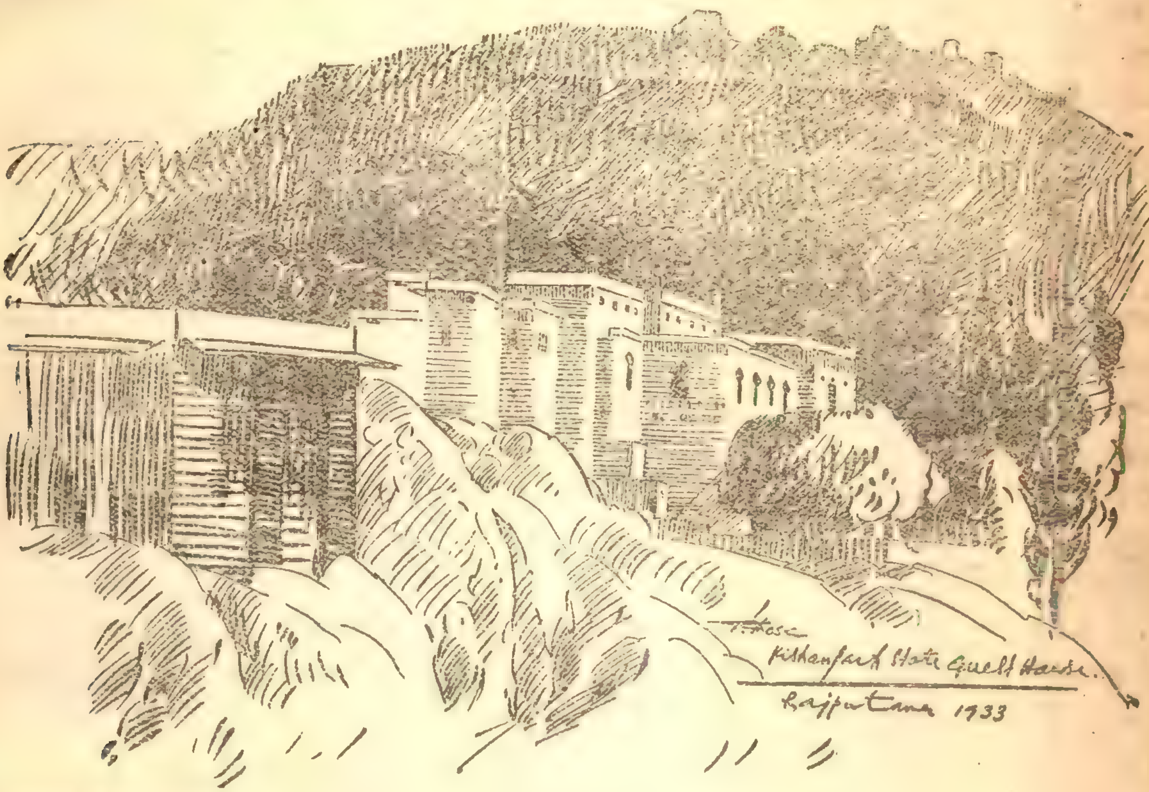

কিষণগড় ষ্টেট গেষ্ট-হাউস।

সারি সারি দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল। উপরে গেলাম। আমাদের বসিতে বলিয়া তিনি আরও ভিতরে গেলেন।

বসিলাম। কিছুদিন আগেই লর্ড উইলিংডন সেই খানে দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য আসবাবপত্র সবই ঝকঝক্ করিতেছিল। আমাদের কোন প্রকার অসুবিধা হইলে তাঁকে যেন ফোন করি আর চাকর-বাকরদের উপর শান্ত অথচ শাসিত হুকুম করিয়া উপমাটা মিথ্যা হইয়া যায়। শুনিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন, অস্কার ওয়াইল্ড নিশ্চয়ই জ্যোতিষ পড়িয়া থাকিবেন, আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে এইরূপ বলে, যাহাদের ভাগ্যে চন্দ্র নষ্টবলী তাহাদের জীবন অশুভে ভরা…

রসচর্চ্চার সেই স্মৃতিটা আজিও মনের মধ্যে অম্লান রহিয়াছে।

জল-বুদ্বুদ

—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

আফিসঘরের ঘড়িটায় এই মাত্র ঠং করিয়া বাজিল সাড়ে দশটা। মাষ্টারদের কেহ কেহ আসিয়াছে, দুই এক জন করিয়া আসিতেছে এবং আসে নাই এখনও অনেকেই। লম্বা টেবিলটার দুইধারে হেলান-দেওয়া বেঞ্চি দুইখানা চেয়ারের ব্যয়বাহুল্য সংক্ষেপ করিতেছে। নিতাই সরকার সদ্যপ্রাপ্ত খবরের কাগজখানার উপর অত্যন্ত নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যুদ্ধের খবরটা পড়িতেছিল; পাশ হইতে ত্রিলোচন রায় কাগজখানাকে টেবিলের সহিত তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধরিয়া পরপৃষ্ঠায় হিট্‌লার, মুসোলিনী, ষ্টালিন্ ও চেম্বারলেনের চেহারা কয়টা লক্ষ্য করিতেছিল, কাহার মুখে কত আউন্স প্রতিভার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নৈঋত কোণে একখানা হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া সুবল হাজরা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। অগ্রগামী অসাবধান পথিককে সতর্ক করিয়া দিয়া মেয়েস্কুলের একখানা ভর্ত্তি বাস ইস্কুলের পাশ দিয়া সশব্দে চলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে সুবল মাষ্টারের নাসিকাপ্রান্তটা যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

হয়গ্রীব পণ্ডিত একমুখ পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একটু মাথা হেলাইয়া সকলকে অভিবাদন জানাইল; ত্রিলোচনের পাশে দাঁড়াইয়া হাজিরা-খাতায় নাম সই করিতে করিতে বলিল, "তা হলে লাগলো দেখছি, অ্যাঁ, কি বলেন নিতাইবাবু?"

নিতাই মাষ্টার মাথা তুলিল না। এক কোণে অচিন্ত্য মজুমদার বসিয়া ছিল, ধনঞ্জয় চাটুয্যের নস্যের কৌটা হইতে প্রকাণ্ড একটি টিপ লইয়া নাকের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিল, "তা আর লাগবে না দাদা, ওরা ত আর একুশ টাকা ন' পাঁচ আনার মাষ্টার নয়; এমন করে অপমান লাঞ্ছনা হজম করতে ত দ্বিতীয়টী আর নেই।"

কাগজের উপর হইতে তিন পূর্ণ সওয়া সাত দশমিক ইঞ্চি আরও ঊর্দ্ধে মুখখানা তুলিয়া নিতাই মাষ্টার 'অ্যারিথ্‌মেটিক্যাল প্রোগ্রেশনে' কণ্ঠস্বরটাকে চড়াইয়া পড়িতে লাগিল—"সিক্স জার্ম্মান প্লেন্‌স্ ব্রট্ ডাউন, পোল্যাণ্ড গিভ্‌স এ ষ্টাবর্ণ ফাইট (Six German planes brought down, Poland gives a stubborn fight.)"—ছয়খানা জার্ম্মান এরোপ্লেন ভূপাতিত, পোল্যাণ্ড দৃঢ়ভাবে লড়িতেছে।

কোন একটা গুরুতর কারণে সুবল হাজরা নৈঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণে সরিয়া গিয়া রাখাল মাষ্টারের পাশে একখানা বিকলহস্তপদ চেয়ারে বসিয়াছিল। নিতাই মাষ্টারের কথা কয়টা কাণে ঢুকিতেই তার তাম্বুলরাগরঞ্জিত মেঘকৃষ্ণ ওষ্ঠাধরে প্রসন্ন হাসির একটা 'ট্যাঞ্জেণ্ট গ্রাফ' (tangent graph) খেলিয়া গেল, বলিয়া উঠিল, "মশায় এ কি ভেতো বাঙ্গালী, পোলাণ্ড, বাবা, ছাড়বার পাত্র নেহি হায়, to the last drop of blood, few few shall part, where many meet."

হয়গ্রীব পণ্ডিতের কেশবিরহিত শিরঃকেন্দ্রটা তখনও চক্‌চক্ করিতেছিল ঘামে। দক্ষিণ গাল হইতে বাম গালে অর্দ্ধচর্ব্বিত পানটাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "মেরিট, প্রতিভা যদি বলতে হয় ত আমাদের সুবলদার—"

শুষ্কতনু সুবল মাষ্টার বুকটাকে সাড়ে পাঁচ সুতা ফুলাইয়া চশমার ভিতর দিয়া চাহিয়া বলিল, "বলো কি পণ্ডিত, এই আটান্নো বছর দু'-মাস সাড়ে তেরোদিন বয়সেও এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'অ্যাট্ এ ষ্ট্রেচ' (এক নাগাড়ে) পেয়ারী সরকারের ফাষ্টো বুক্ অফ রিডিং-এর I go, We cry থেকে সুরু করে Finis পর্য্যন্ত মুখস্ত বলতে পারি—"

ত্রিলোচন মাষ্টার সায় দিয়া ইহার সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ দিল। অতি নিরীহ এবং অত্যধিক স্থূলকায় ধনঞ্জয় চাটুয্যে এতক্ষণ বৈদ্যুতিক পাখার তলায় বসিয়া আধ-ময়লা পাঞ্জাবীর বোতাম কয়টা খুলিয়া তাহার ভিতর সাড়ে পনেরো লিটর্ শীতলবায়ু (স্বাভাবিক তাপ ও চাপের পরিমাণ) ভরিয়া লইতেছিল; ঈষৎ অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাহলে কি আমাদেরও ডাক পড়বে না কি মশায়?"

ইস্কিয়া দ্বীপ (ইতালী)।

ত্রিলোচন রায় হিটলারের মুখ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "তোমাকে ত' বলেছিই ধনুদা, ওই যে কপালে রেখাটা তোমার, either (হয়) রাজা বা মন্ত্রী বা সেনাপতি—the oppor-tunity! চাই কি ত' the Commander-in chief of the Great War of 1939..... (জঙ্গীলাট)"

নিতাই মাষ্টারের ঠোঁটের উপর ঈষৎ ব্যঙ্গের বিকৃত রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেদিন হয়গ্রীব পণ্ডিতের দেহযষ্টির সূক্ষ্মতা লইয়া ধনঞ্জয়প্রমুখ কয়েকজন মাষ্টার যে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিবার জোগাড় করিয়াছিল, তাহারই প্রতিশোধ লইবার লোভটা সংবরণ করিতে না পারিয়া সে বলিল, "তোমাকে দাদা আর কিচ্ছুটি করতে হবে না, একটিবার শুধু কাত্ মারবার সময় কৌরব পক্ষের দিক হয়ে কাত মেরো, তা হলেই ব্যস্, দু'দশ হাজার সাফ্, চাই কি ওদের বিমান-গুলোও এসে আটকে যেতে পারে—"

ধনঞ্জয় চাটুয্যের সামনেই বসিয়া ছিল, দিগিশ দত্ত, একটু গম্ভীর গোছের লোক, বলিল, "যুদ্ধু টুদ্ধু বুঝি না, আমার ঊনত্রিশ টাকা তের আনা বজায় থাকলেই হলো, মাস কাবারে উটি আমার চাই-ই বাবা। তা' পোল্যাণ্ডের রণাঙ্গণে গিয়ে মাষ্টারীই করতে বলো, আর গোলাকার হয়ে কামানের খোলের মধ্যেই ঢুকতে বলো—"

কথাগুলা কিন্তু ধনঞ্জয় মাষ্টারের মোটেই ভাল লাগিল না। সত্যই কি যুদ্ধে যাইতে হইবে? এই পৃথিবী, এই আকাশ—নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র এক মুহূর্ত্তে চোখের সামনে ম্লান হইয়া যাইবে? মাষ্টারী জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য অর্দ্ধাশন, রোগ—কোনটাই আজ যেন এর তুলনায় অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হইল না। পাশে বসিয়া ছিল বলরাম হাইত্। লোকটা মোটের উপর ভাল মানুষ হইলেও একটাও কথা কি চাপিয়া রাখিতে পারে? তুচ্ছ একটা জিনিষকে ফেনাইয়া ফেনাইয়া এতবড় করিয়া তুলিতে সারা ভূ-ভারতে ওর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ধনঞ্জয় মাষ্টার কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া এক কোণে চিন্তাহরণ ভটচায্ বসিয়া ছিল, তাহারই পাশে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অত্যন্ত আস্তে আস্তে বলিল, "হ্যাঁ মশায়, সত্যি কি আমাদের এই যুদ্ধুতে যেতে হবে?"

ধনঞ্জয় মাষ্টার যে যুদ্ধের নামে ভয় পাইয়াছিল, এ কথাটা বুঝিতে চিন্তাহরণের বাকি ছিল না। কোন রকমে দন্তহীন ঠোঁটের ভিতরে হাসি চাপিয়া তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, "দরকার হলে ত সকলকেই যেতে হবে, এ ত' শুধু লাইনের কথা নয় কর্ত্তব্যও, তবে সে এখনও ঢের দেরী আছে যদি হয়; আমরাও ত থাকব হে সঙ্গে—"

দরকার হইলে তবে তাহাদিগেরও ডাক পড়িতে পারে; ধনঞ্জয় মাষ্টারের মনের মেঘ কাটিল না।

লোকটার কথা শুনিয়া বেশ ভাল বোধ হইতেছিল না। হয়ত তাহার এই সামান্য দুর্ব্বলতার কথাটা লইয়াই আজ হুলুস্থূল করিয়া তুলিবে মাষ্টার-মহলে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টায় তেমনি আস্তে গলায় আবার বলিল, "এই আমি তোমাকে অমনি অমনি জিজ্ঞেস করছিলুম চিন্তাদা, দরকার হলে ত যেতেই হবে, দেশের বিপদ, রাজার আহ্বান যেতে হবে না? ওটা তবে অন্য কিছু মনে ক'র না যেন।"

প্রকাণ্ড আর এক টিপ্ নস্যি লইয়া ধনঞ্জয় মাষ্টার মনটাকে চাঙ্গা করিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

সুবল হাজরা বাঁটুল সংস্করণের অত্যন্ত জীর্ণ, উপদ্রুত একটা নোট-খাতার উপর সওয়া দেড় ইঞ্চি পেন্সিলের খর্ব্বাগ্রটা দিয়া আগামী মাসের জন-খরচের হিসাব-নিকাশ করিতেছিল, একবার দুইবার করিয়া রবার্ট ব্রুসের অনুকরণে সাতশত বার চেষ্টা করিয়াও যখন ১৯৮/১০ আনা বাটতিটাকে ১৯৮/৫ আনায় কোন রূপেই নামাইতে পারিল না, তখন বিরক্তিসূচক একটা 'ধ্যেৎতেরি'—শব্দ করিয়া পকেটের প্রকাণ্ড লেখা ও অলেখা কাগজের স্তূপের মধ্যে সেটাকে গুঁজিয়া দিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে দিগিশ দত্তের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা যা আপনি বলেচেন দত্ত মশাই, উটি চাই-ই মাসান্তে যু—দ্ধ কেন মশায়, স্বয়ং যমরাজ এসে যদি বলেন, নরকের উঠোন ঝাঁট দিতে হবে, তাতেও গররাজি নেহি হ্যায়।" বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া উঠিল।

সুবল মাষ্টারের কথাগুলা শুনিয়া নিতাই মাষ্টার এবং ত্রিলোচন রায় যে পরস্পরের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, এ জিনিষটা আর যাহারই দৃষ্টি এড়াক না কেন, সুবল মাষ্টার কিন্তু ঠিক লক্ষ্য করিয়াছিল। চেয়ারের উপর খানিকটা স্প্রিং-এর মত নড়িতে নড়িতে অবশেষে স্থির হইয়া সে বলিল,

অধীনের কথা শুনে ত’-হাস্‌বেনই মশায়, কিন্তু কথাগুলো true, very true and nothing but true—(একদম খাঁটি সত্যি); এই হাউস-এর সামনে আমি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, যদি হক্‌-কথা বলবার লোক কেউ এখানে থাকেন ত’ ওই এক দিগিশ দত্ত—”

এ ত’ সামান্য কথা, শিবুপণ্ডিত যখন বলিল, কাল রাত্রিতে তিনটে সাতচল্লিশ মিনিট সাড়ে পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ডের সময় যখন ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, তখন ছাদের উপর বোঁ ভঁভঁভঁ···ক্যাঁচ করিয়া একটা শব্দ হওয়ায় শিবুপণ্ডিতের হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল; তাড়াতাড়ি গৃহিণীকে জাগাইয়া তুলিয়া নির্ব্বাণপ্রায় হারিকেনটাকে উস্কাইয়া দিয়া এবং তাঁহাকে অর্থাৎ গৃহিণীকে দুয়ার খুলিতে বলিয়া আলোটা ডান হাতে এবং লাঠিটা বাঁ হাতে, না লাঠিটা ডান হাতে এবং আলোটা বাঁ হাতে লইবে ভাবিতেছিল, এমন সময় দেখিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া হিটলার, সমরসজ্জায় সজ্জিত, বাঁ হাতে একটা জার্ম্মান রাইফল এবং ডান হাতে একটা পাথর-বাটি, তাহাতে কিঞ্চিৎ জল, পোলাণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে শিবু পণ্ডিতের পাদোদক লইবার জন্য এইরাত্রেই এরোপ্লেনে করিয়া আসিয়াছে।

ইহাতেও সুবল মাষ্টারের সন্দেহ হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

স্কুল বসিয়া গিয়াছে। মাষ্টারেরা একে একে আপনাপন গন্তব্য শ্রেণীতে চলিয়া গিয়াছে। অফিসঘর ফাঁকা, বেঞ্চির একদিকে বসিয়া শিবু পণ্ডিত। তার বিরামঘণ্টা এইটা, তাহারই বিপরীত দিকে বসিয়া সুবল মাষ্টার সমস্ত চক্ষুকর্ণনাসিকা একত্র করিয়া শিবু পণ্ডিতের রয়টারীয় চালে বর্ত্তমান ইউরোপের রাজনীতিক পরিস্থিতি ও জগতের উপর তাহার প্রভাবের ব্যাখ্যা শুনিতেছিল।

সুবলের একান্ত আস্থা তার উপর। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের চোখে তার অহেতুক অনুপস্থিতি, ছেলেদের খাতাগুলা ভাল করিয়া না দেখার অভিযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কারণে তার চারিদিকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র শিবু পণ্ডিতই তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে; এখানে তার একমাত্র বন্ধু যদি কেহ থাকে ত’ ওই শিবরাম গোঁসাই।

একটা কিউলেক্স মশা রাগতানসহকারে সুবলমাষ্টারের দক্ষিণ কর্ণ পরিবেষ্টন করিয়া নাসিকা ও তৎপরে বামকর্ণের শিখরদেশে আসিয়া বারবার অধিষ্ঠান করিতেছিল, একান্ত মনোযোগে অন্যায় ব্যাঘাত সত্যই শেষে সুবলমাষ্টারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল, ব্যাটাহত ক্রকেট্‌ বলের মত মশকটাকে মুষ্টিগত করিতে গিয়া হঠাৎ তার নজর পড়িল পাশেই দাঁড়াইয়া হেড্‌মাষ্টার।

“ওই ক্লাসটা আপনার সুবলবাবু? ফাঁক যাচ্ছে যে···”

পোল্যাণ্ডের মর্ম্মন্তুদ যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যটা ওখন তার চোখের সম্মুখে ধোঁয়াইয়া আসিয়াছিল, মনে হইল জার্ম্মানীর কামানগুলা পোল্যাণ্ডের দিক হইতে এবং পোল্যাণ্ডের কামানগুলা জার্ম্মানীর দিক্‌ হইতে ফিরাইয়া এক মুহূর্ত্তে ও এক সঙ্গে সুবল মাষ্টারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বসাইয়াছে।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। স্কুলের ‘বিশিষ্ট দানবীয় সমিতি’র অধিবেশন ছিল আজ। বছর দুই হইল এই সমিতি শিবু পণ্ডিতপ্রমুখ কয়েকজন নব্য ছোকরার উৎসাহে স্থাপিত হইয়াছে; অনেকেই ইহার সভ্য; হেডমাষ্টার ইহার এক্স-অফিসিও সদস্য। সভাপতি, সহ-সভাপতি, আইন-কানুন, সমস্তই আছে। সভাপতি সকলেরই নিকট দেবতুল্য পূজ্য, আর অন্যান্য সকলেই অপ-দেবতা। ইহার আইন-কানুনের সহিত পিনাল কোডের কোনই সম্পর্ক নাই—উপরন্তু বিপরীত। এই সমিতির নব সদস্যপদে বৃত হইতে হইলে প্রথমেই জরিমানা দিতে হয় একটা ভোজ, এবং কোন কোন জরিমানা কারণে এবং অধিকাংশই অকারণে দিতে হয়।

বাসুদেব মাষ্টারের পত্নীর নবতমা দশমীকন্যার জন্ম-উপলক্ষ্যে তাহার দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করিয়া আজিকার এই অধিবেশন হইতেছিল।

আফিস-ঘর খালি হইয়া গিয়াছে প্রায়।

হেডমাষ্টার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়া যে সন্দেশ আনা হইয়াছিল, তিনি আসিয়া আসনে বসিবার পূর্ব্বেই কখন এবং কিরূপে যে দানবীয় প্রথায় সন্দেশ-চতুষ্টয় আপনাদের অতীত অস্তিত্বের নমুনাস্বরূপ দুই একটি করিয়া পেস্তাকুচি ডিসের উপর রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তাহা দানবপ্রধান চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্‌ও জানিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে হয়গ্রীব পণ্ডিতের লুপ্তকেশ শিরোদেশ মিষ্টান্ন-বিশেষের রসে সিক্ত হইয়া চক্‌চকে ও চট্‌চটে হইয়া উঠিল। ত্রিলোচনের সাদা কামিজের পিছনটা তরকারী বিশেষের রঙ্গে সম্পূর্ণরূপ অন্য রং হইয়া উঠিল। পরিবেশক শিবুপণ্ডিত অনুধাবনশীল দানবদলের হাত হইতে পরিত্রাণলাভ মানসে অফিস-ঘরের চারিদিকে মুক্তকচ্ছ হইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন নিরাপত্তার জন্য প্রধান দানবের শরণাপন্ন হইল, তখন তাহার রসগোল্লার হাঁড়িতে নিজের ভাগের ছয়টা রসগোল্লার মধ্যে মাত্র পৌণে একটা পড়িয়া আছে।

অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। শিবু পণ্ডিত একধারে বসিয়া পান চিবাইতেছিল। নিতাই মাষ্টার পাশে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে দূরে কেরাণীবাবুর টেবিলের দিকে চাহিয়া ছিল। সুবল মাষ্টার অত্যন্ত রকমের ময়লা একখানা রুমালস্থলীয় ন্যাকড়ায় শালপাতার সাহায্যে ভাগের রসগোল্লা ছয়টা বাঁধিয়া লইতেছিল; এই সব দানবীয় কাণ্ডকারখানা দেখিয়া এতক্ষণ বোধ হয় কোনখানে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল সে।

নিতাই মাষ্টার ঠোঁটের মধ্যে ঈষৎ হাসি চাপিয়া বলিল, "ওগুলো বাঁধছেন কার জন্যে সুবলদা?"

সুবল মাষ্টারের ভ্রূ ও নাসিকাপ্রান্ত সমতলবর্ত্তী হইয়া উঠিল, গ্রন্থিবন্ধনরত আঙুল কয়টাকে দ্রুততর করিয়া বলিল, "তোমরা সব যত ছেলে-ছোকরা ভায়া, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত' মানো না—আহ্নিক না করলে আমার চলবে না এ সব—"

শিবুপণ্ডিত নিতাই-এর পিঠের উপর আঙুলের একটু চাপ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "চুপ, ওই কটাই হয়ত আজ ওর ঘরের সান্ধ্য আবহাওয়াটাকে অন্যরকম করে দেবে; বেচারীর দশ-বারটি ছেলেপিলে কি না—

"লোকটাকে কিন্তু ভাল লাগে না আমার একেবারেই, stamina নাই একটুকুও", নিতাইমাষ্টার তেমনি আস্তে গলায় বলিল।

"দেখ ওসব মানি না আমি; উপায় মাত্র বাইশ টাকা সাড়ে পনের আনা মাইনে, আর টিউশনি করে পায় সাড়ে সাত টাকা, আর এই বিরাট সংসার; give him a decent living, দেখবে সুবল হাজরার stamina কত ডিগ্রি বেড়ে যায়।"

"কিন্তু এতগুলো ছেলের শিক্ষাভার নিয়ে যারা আসে, যাদের আদর্শে গড়ে উঠবে দেশের ভবিষ্যৎ জীবন, তাদের আদর্শ যে সামান্য সাংসারিকতা থেকে অনেক উঁচুতে হওয়া উচিত, এ কথা ত' অস্বীকার করতে পারবো না, পণ্ডিত—"

শিবু পণ্ডিতের কপালের উপর শিরা দুইটা এবার সত্য-সত্যই ফুলিয়া উঠিয়াছিল; বেদনাব্যাকুল রক্তধারা যেন চিন্‌চিন্ করিয়া উঠিল উহাদের মধ্যে—কণ্ঠস্বরটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল ওর।

"সব বুঝি নিতাই, আমিও ওই জীবনের রসাস্বাদ করেছি, প্রবেশিকা পাশ করে আমাকেও বেরুতে হয়েছিল অন্নের সন্ধানে, আজ না হয় বি-এ পাশ করে তোমাদের এখানে হেড্ পণ্ডিত হয়েছি। নৈতিকতার বুলি তাদেরই শোভা পায়, যাদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান আছে, বুভুক্ষুর আবার আইন-কানুন কি?"

নিতাই একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল সুবল মাষ্টারের দিকে।

শিবু পণ্ডিত তেমনি আস্তে গলায় বলিয়া চলিল, "তোমা-দের সব চেয়ে বড় অভিযোগ তার ওপর, ও তার ছাত্রদের নম্বর দেয় বেশী করে, কোশ্চেন বলে দেয়—সব সত্যি, কিন্তু না দিলেই বা উপায় কি, টিউশনি থাকবে না; তার পরের অবস্থাটা বুঝতেই পারছো, starvation অনাহার।"

নিতাইয়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; সুবল মাষ্টার ততক্ষণে অফিস-ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছিল, ছেঁড়া জুতা, সেলাই-করা কামিজ, একবোঝা কাগজপত্রে দুই পকেট ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সগর্ব্বে খাবারের পুঁটলিটা ডান হাতে ঝুলাইয়া লইয়া রাস্তার বাঁ ফুটপাত ধরিয়া চলিয়াছে।

শিবু পণ্ডিতের চোখদুইটা জানালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া সুবল মাষ্টারের হাতল-ভাঙ্গা ছাতাটার উপর গিয়া পড়িয়াছিল, মুখ দিয়া ওর বাহির হইল শুধু—there's the school-master.

যে-যুদ্ধে প্রতিদিন ইহাদের লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে, তাহার নিকট ইউরোপের মহাযুদ্ধ ম্লান হইয়া যায়, যে বোমা-বর্ষী বিমানপোতের আশঙ্কায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত ইহাদের কাটিতেছে, তাহার কাছে, "লন্," "হ্যামডেন", "ব্লেনহায়েম্" বমার তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। সে যুদ্ধের সন্ধি নাই, বিরাম নাই, শান্তি নাই,…ইউরোপের যুদ্ধ তো সে যুদ্ধের তুলনায় জল-বুদ্বুদ।

সঙ্কলন

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

আমেরিকার ভবিষ্যৎ

Life পত্রিকায় Walter Lippmann আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

আমেরিকার মূলধন যথেষ্ট আছে, জমি উর্ব্বর, শিল্পের উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে, তথাপি একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব আমেরিকার অধিবাসীরা অনুক্ষণই বোধ করিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাদের উদ্বেগ অত্যন্ত পরিস্ফুট। সব বিষয়েই আমেরিকার বাড়াবাড়ি দেখা যায় এবং ইহার ফলে আমেরিকানরা তাহাদের সাহস হারাইয়া চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে এবং চতুর্দ্দিকেই হতাশার ছায়া দেখিতেছে। গত কয়েক বৎসর অত্যন্ত বাড়াবাড়ির ফলে লোকের মনে অবসাদের সৃষ্টি হইয়াছে ও অনেকে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছে। নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। অধিকন্তু এইরূপ নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব কখনও অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে যে হতাশার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকানরা তিনজন অধিনায়কের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে দিয়া নিরাশ হইয়াছে। তাহাদিগের ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক উপায় স্থির করিতে কেহই পারেন নাই। তাহারা প্রেসিডেণ্ট উইলসন সম্বন্ধে মনে করিয়াছিল যে, তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। কুলিজ এবং হুভারের অধিনায়কত্ব-কালে তাহারা মনে করিয়াছিল যে, দেশ নিশ্চিন্ত উন্নতির পথে পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহারা নিরাশ হইয়াছে এবং ইহার ফলে তাহারা এখন বিশ্বাস হারাইয়াছে। এই অকৃতকার্য্যতার কারণ এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবমনের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাই লইয়া বিংশ শতাব্দীর সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। তাহার ফলে বর্ত্তমানে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে; অধিকন্তু যে সময়ে দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখনও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বিধ্বস্ত আর্থিক অবস্থা সংস্কারে মনোনিবেশ করিতে আমেরিকানরা স্বীকৃত হয় নাই এবং তাহার ফলে আজ নিজের দেশের আর্থিক সংস্কার অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এখন অনেকে মনে করিতেছে যে, সমাজ-সংস্কারেও হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন জাতি যখন বৃহৎ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে চাহে না, তখন ছোট ছোট কার্য্য করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান আমেরিকার প্রভাব য়ুরোপের উপরেও বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃতি লাভ করিবে, সুতরাং তদনুযায়ী প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। আমেরিকানদের দুর্ব্বলচিত্ততা অপনোদনের একমাত্র উপায় নিজেদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা এবং তাহা হইলেই সেরূপ ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ও সাহস তাহাদের মধ্যে স্বতঃই উদ্ভূত হইবে।

পূর্ণস্বাস্থ্য

The Reader's Digest পত্রিকায় Dr. Alexis Carrel পূর্ণস্বাস্থ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

মানুষের পক্ষে কেবল বাঁচিয়া থাকাই যথেষ্ট নহে। বাঁচিয়া থাকিবার যে আনন্দ, তাহা উপভোগ করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রকৃত স্বাস্থ্য-লাভের উপায় সম্বন্ধে অনেকেরই কোন ধারণা নাই। অনেকেই মনে করে, রোগ না থাকিলেই পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ হইল। অদম্য কর্ম্মোৎসাহ, আত্মবিশ্বাস, জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার ক্ষমতা, স্নেহপ্রবণতা এবং সৃষ্টি করিবার শক্তি প্রভৃতি না থাকিলে কাহাকেও পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যাইতে পারে না।

শরীর ও মন উভয়েই সুস্থ থাকিলে তবেই পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ হয়। নীরোগ হইলে বা পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা লাভ

করিলেই স্বাস্থ্যবান বলা যাইতে পারে না; তৎসহ নৈতিক শক্তি এবং মানসিক স্থৈর্য্য থাকাও আবশ্যক।

যাহাদের কেবল দৈহিক স্বাস্থ্য আছে এরূপ লোকের সংখ্যাও বেশী নহে। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে যে সকল আমেরিকান সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন মাত্র নীরোগ দেখা গিয়াছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ শিশুর মধ্যে ন্যূনতম হিসাবে ১ কোটি শিশুই রুগ্ন দেখা গিয়াছে। এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, সভ্যজগতের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির অর্দ্ধেকই রোগগ্রস্ত।

বর্ত্তমানে জগতে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, জীবন-যাত্রার পথ যেরূপ ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্য লাভ করা অত্যাবশ্যক। দেহ যে ছিন্ন ভিন্ন অবয়বের সমষ্টি এবং আত্মা হইতে বিযুক্ত এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মনুষ্য-দেহ একটি ক্ষুদ্র কোষ হইতে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে; ক্রমে একটি কোষ হইতে ভাগ হইয়া দুইটি এবং এইরূপ বহুধা বিভক্ত হইয়া সমস্ত অবয়ব সৃষ্ট হয়। সুতরাং এক হইতেই বহুর উদ্ভব হইতেছে এবং পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট মানুষের দেহে বিভিন্ন অবয়বগুলির কোনটিই সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, সবগুলিই পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট এবং ঐগুলি আবার চেতনার সহিত জড়িত। পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে এই সম্পূর্ণতা রক্ষা করাই একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ রোগ বলিতে যাহা বুঝা যায়—তদ্দ্বারা যেরূপ স্বাস্থ্যের হানি হয়, ভয়, রাগ, দ্বেষ, উৎকণ্ঠা প্রভৃতিও স্বাস্থ্যের সেইরূপই হানি করিয়া থাকে।

মানুষের সকল ক্রিয়াই দৈহিক এবং মানসিক। শরীর এবং আত্মা পরস্পর সম্পূর্ণভাবে জড়িত।

স্বাস্থ্যলাভ করা ব্যক্তিবিশেষের উপরই নির্ভর করে। চিকিৎসক বা ঔষধ কখনও স্বাস্থ্য দান করিতে পারে না। নিজের চেষ্টাতেই স্বাস্থ্য লাভ করিতে হয়। চিকিৎসকগণ মাত্র কয়েকটি নিয়ম বলিয়া দিতে পারেন।

সর্ব্বপ্রকার বিষই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। বিষ যে কেবল বাহির হইতেই প্রবেশ করে তাহা নহে, শরীরের ভিতরেও উহার সৃষ্টি হয়। পরিপাক-যন্ত্রগুলি সুস্থ থাকিলে আভ্যন্তরিক বিষ উৎপন্ন হয় না। মদ্যপান, ধূমপান প্রভৃতির দ্বারা শরীরের বিষ প্রবেশ করান হয়, সুতরাং ঐ অভ্যাসগুলি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে শরীরের মধ্যে আত্ম-রক্ষার উপযোগী নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এইরূপ সামঞ্জস্য-বিধানের ক্ষমতা থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে। এই ক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতির সহিত সংযোগ রাখা প্রয়োজন। কৃত্রিম জীবনযাপনের ফলে মানুষের সুস্থ থাকি-বার ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে।

সামাজিক এবং মানসিক বিকৃতিও বর্ত্তমান যুগে স্বাস্থ্য-হানির প্রধান কারণ। শহরের গোলযোগ, ছায়াচিত্র, বেতার প্রভৃতির জন্য যে মানসিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তাহা স্বাস্থ্যের হানি করে। সুস্থ থাকিতে হইলে সততা এবং আত্মত্যাগ শিক্ষা করা আবশ্যক। ইহাতেই মানসিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, যাহাতে ঔষধ বা চিকিৎসকের কোন প্রয়োজনই হইবে না। দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে, ইহা চরম উদ্দেশ্যলাভের অপরিহার্য্য সোপান মাত্র।

কথার দ্বারা যুদ্ধ-পরিচালনা

Current History পত্রিকায় Edwin Muller প্রচার-কার্য্য যুদ্ধকালে কিরূপ ভয়াবহ অস্ত্রস্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

বর্ত্তমানে য়ুরোপের বেতার-ষ্টেশনগুলি বোমা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে, কারণ সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিস্ফোরক দ্রব্য অপেক্ষাও প্রচারকার্য্য অধিকতর ভয়াবহ।

মধ্যযুগেও প্রচারকার্য্যের উপকারিতা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন সৈন্যবাহিনী যখন মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, তখন হঠাৎ জার্ম্মান সৈন্যরা বর্দ্ধিত বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। অল্পকাল পরে বন্দী-সৈন্যদের নিকট হইতে ইহার কারণ জানা যায়। জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রচার করিয়াছিলেন যে, আমেরিকানরা বন্দী জার্ম্মান সৈন্যদের হত্যা করে।

মিত্রশক্তিগণ প্রথমে বিমান হইতে পুস্তিকা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে জার্ম্মানরা পুস্তিকাসহ বিমান ধরিতে পারিলেই চালককে ফাঁসী দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে মিত্রশক্তিগণ পুস্তিকাসহ বেলুন উড়াইয়া তথা হইতে যন্ত্রসাহায্যে পুস্তিকা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। অপর পক্ষও তাঁহাদের অনুসরণে ঐ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। অল্পসংখ্যক জার্ম্মান-সৈন্তের মধ্যে যখন এই-সকল পুস্তিকা পড়িত তখনই ফল ভাল হইত, কারণ বেশী সৈন্তের মধ্যে পড়িলে ঐগুলি সৈন্তাধ্যক্ষদের দেওয়া হইত এবং তাঁহাদের প্ররোচনায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত না। এই পুস্তিকাগুলিতে লেখা থাকিত যে, জার্ম্মান জনগণের প্রতি মিত্রশক্তির কোন বিদ্বেষ নাই। "যদি তোমরা তোমাদের স্বার্থপর নেতাদিগকে অনুসরণ কর তাহা হইলে যুদ্ধ বহুকাল স্থায়ী হইবে। বাড়ীতে তোমাদের পরিবারবর্গ অনশনক্লিষ্ট। তাহাদের বাঁচাইতে হইলে তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর।" বন্দী জার্ম্মান সৈন্তদের পত্র লিখিবার পোষ্টকার্ড দেওয়া হইত ও তাহাতে তাহারা লিখিত যে তাহারা নিরাপদে আছে এবং ভাল আছে।

গুপ্তচর দ্বারা ব্রিটেন প্রায় দেড়শত নিমজ্জিত ডুবো-জাহাজের নাবিকদের নাম সংগ্রহ করিয়াছিল ও তাহা জার্ম্মানীর বন্দরগুলিতে প্রচার করিয়াছিল। ইহার ফলে অন্যান্য নাবিকগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল।

জার্ম্মানরাও প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছিল কিন্তু তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, জার্ম্মানীর দেশ বা অর্থ অধিকার করিবার কোন বাসনা তাহার নাই। আমেরিকা কেবল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই প্রচারকার্য্য খুব কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল।

সম্প্রতি স্পেনের বিপ্লবে প্রচার-কার্য্যের জন্য বেতারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন শহর জয় করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া বিজয়ীদের প্রধান কার্য্যই হয় বেতার-ষ্টেশন দখল করা এবং তথা হইতে প্রচার-কার্য্য চালান।

চীনেও জাপানীরা এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। জাপানের সহিত সহযোগিতা করিবার উপকারিতা টোকিও হইতে বেতার-বক্তৃতা দিয়া চীনাদের বুঝান হইতেছে। মার্শাল চিয়াং কাই-শেকও বেতারে বক্তৃতার দ্বারা চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প হইয়া দাঁড়াইবার জন্য আবেদন জানাইতেছেন।

হিট্লারও প্রথমে বেতারে প্রচারকার্য্য দ্বারা অষ্ট্রিয়া, জুডেটেনল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া এবং মেমেল দখল করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া পরে ঐ দেশগুলি অধিকার করিয়াছেন।

আধুনিক কালের যুদ্ধে প্রচার-কার্য্যের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমেরিকার স্ত্রীলোক

Harper's Magazine পত্রিকায় Pearl S. Buck আমেরিকার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

আমেরিকার স্ত্রীলোকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং জ্ঞান-চর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করে; দ্বিতীয়, যাহারা প্রকৃত গৃহিণী এবং স্বামী, পুত্র, কন্যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া গৃহ-কার্য্যেই সময় অতিবাহিত করে। এই দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক-দের মনে কোন প্রকার অতৃপ্তি নাই। ইহারা সুচারু-রূপে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই সুখী। যে সকল স্ত্রীলোক গৃহকার্য্য করিয়া প্রচুর অবসর পায় এবং সেই অবসর কাটাইবার কোন কাজ খুঁজিয়া পায় না, তাহারাই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। ইহারা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য করিবার অভ্যাস না থাকায় চিত্তসংযমে অভ্যস্ত নহে। আমেরিকার স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনই ইহার মূল। স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিবার ফলে তাহাদের নিকটে কাহারও কোন দাবী-দাওয়া নাই। তাহারা আপন ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারে, সুতরাং জীবন-সংগ্রামের সহিত অনেকেরই পরিচয় ঘটে না; কাজেই চিত্তসংযম শিক্ষা হয় না। অস্থিরচিত্ততাই ইহার শেষ ফল। আমেরিকার স্ত্রীলোকরা ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারে, কিন্তু এই অবাধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও তাহারা কোন দিকেই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই গৃহকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সেই কার্য্য তাহারা যখন ইচ্ছা তখনই করিতে পারে, সুতরাং নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা হয় না। ইহার ফলে কোনরূপ সংগঠন-কার্য্যেও তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

গৃহ-সৌষ্ঠববিধান এবং উপযুক্তরূপে সন্তান-পালন-শিক্ষাও ইহাদের হয় না ; এই সকল কার্য্য সুন্দর ভাবে করিবার ইচ্ছাও ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। কোন প্রকার কঠিন কার্য্য করিতে হয় না বা সমাজ তাহাদের করিতে বাধ্য করে না বলিয়াই ইহাদের মনে এত এত অতৃপ্তি এবং অবাধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও ইহাদের এত অবনতি। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইহাদের মনে অতৃপ্তি আছে এবং ইহাতেই মনে হয় যে ইহারা এখনও মরে নাই।

কূটনীতিতে প্রতিপক্ষের আবশ্যকতা

Atlantic Monthly পত্রিকায় Walter Lippmann কূটনীতিতে প্রতিপক্ষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

স্বাধীনতা যে রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে মহৎ তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন, যদিও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার মূল্য খুব বেশী নহে। সাধারণতঃ অনেকেই দেখাইবার চেষ্টা করে যে, প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারী এবং এই জন্যই উহা দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু অপরকে যে স্বাধীনতা মানুষ দেয় তাহা যেন নিতান্তই অসীম সহনশীলতার জন্যই দিয়া থাকে। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুসময়ে অবশ্যই কার্য্যের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে না, তবে অসময়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, কারণ তখন সহনশীলতার অভাব ঘটিতে পাবে, সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকিবে না।

প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি বেশ সুদৃঢ়। প্রতিপক্ষের মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে কখনও ভাল ভাবে রাজ্য-শাসন চলিতে পারে না। প্রতিপক্ষের মতামত শুনিলে এবং তাহাদের সহিত আলোচনা করিলে নিজেদের মতামত পরিমার্জ্জিত হয়। রোগী যদি চিকিৎসকের মত পছন্দ না করিয়া তাহাকে মত প্রকাশের জন্যই বন্দী করেন, তবে রোগের উপশম হইবে না। ডিক্টেটর-শাসিত দেশের অবস্থা এইরূপই। ডিক্টেটরগণ প্রতিপক্ষকে নির্ম্মূল করিতে চাহেন।

গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিপক্ষের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে সত্যের অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়।

ডিক্টেটর-শাসিত দেশে হয় নায়ক নিজে বা তাঁহারই নিযুক্ত লোকেই বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সকলকেই উহা শুনিতে হয়, কিন্তু শ্রোতাদের বক্তব্য কেহ শুনিতে চাহে না। সুতরাং শাসকগণ লোকের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন না। তবে এই ডিক্টেটরগণও গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং তাহারাই লোকের মত সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারে তাহা শাসকদের জানায়। হয় ত এই উপায়ে জনমত জানিয়া তাহার কিছু মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ যদিও অনেক সময়ে কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছু ভুল তাঁহাদের থাকিয়াই যায় এবং ইহাই তাঁহাদের পতনের কারণ হয়, কারণ তাঁহারা কখনও সত্যের সম্মুখীন হইতে সাহস করেন না।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বা আমেরিকার কংগ্রেস-এ সকল সদস্যেরই নিজ মত ব্যক্ত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। শাসনতন্ত্রের চালকগণ প্রতিপক্ষের যুক্তি এবং মতামত শুনিয়া তর্ক-বিতর্কের দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। এইরূপ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য বুঝা যায়। তাহা না হইলে এক দলের লোক একস্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা করিলে তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। প্রতিপক্ষকেও আহ্বান করিয়া তাহাদের মতামত শুনা উচিত। সভ্য জগতে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। কাহারও মত প্রতিপক্ষের যুক্তির দ্বারা অকাট্য প্রমাণিত না হইলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর ইহাই মূল ভিত্তি।

অল্পব্যয়ে চিকিৎসা

The American Mercury পত্রিকায় Frank J. Taylor আমেরিকার কোন কোন স্থানে অল্পব্যয়ে সুচিকিৎসার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

এগার বৎসর পূর্ব্বে লস এঞ্জেলস্-এর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডক্টর এচ. ক্লিফোর্ড লুজ (Dr. H. Clifford Loos

চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। বর্ত্তমানে তিনি প্রায় ৬০,০০০ লোকের স্বাস্থ্য বিধান করিয়া থাকেন।

ডক্টর ক্লিফোর্ড-এর একজন প্রতিবেশী তাঁহাকে অল্প-ব্যয়ে যাহাতে চিকিৎসা হওয়া সম্ভব হয়, সে বিষয়ে অবহিত হইতে বলেন।

ডক্টর ক্লিফোর্ড লুজ তখন ডক্টর ডোনাল্ড ই. রস-কে তাঁহার অংশীদার করিয়া একজন সেবিকা নিযুক্ত করিয়া একটি চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে, যাহারা চিকিৎসা করাইতে চাহে, তাহাদের প্রত্যেককে মাসে দেড় ডলার করিয়া চাঁদা দিতে হয়। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং চিকিৎসক ও সেবিকার সংখ্যাও বাড়াইতে হইল। কিছুদিন পরিচালনের পরে দেখা গেল যে, চাঁদার হার অত্যন্ত কম নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং উহাতে খরচ সঙ্কুলান হয় না, সুতরাং চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া মাসিক আড়াই ডলার করা হইল। ইহাতে প্রতিষ্ঠানটি বেশ উত্তমরূপেই চলিতেছে এবং বহু দরিদ্র ব্যক্তিও প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের সাহায্য পাইতেছে।

গত বৎসর রোগীর সংখ্যা ৬,৭৭,৩১৩ হইয়াছিল এবং ২,৬০০টি অস্ত্র-চিকিৎসা হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকগণ সভ্যদের বাড়ীতে গিয়াও তাহাদের চিকিৎসা করেন এবং তজ্জন্য কোন পৃথক্ পারিশ্রমিক দিতে হয় না।

এই প্রতিষ্ঠানে বর্ত্তমানে ৬৫ জন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। ২,৫০০ শিক্ষক, পুলিসের অধিকাংশ কর্ম্মচারী, টেলিফোন কোম্পানীর ১,৭০০ কর্ম্মচারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আরও অনেক কর্ম্মচারী এখন এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য। সভ্যদের স্ত্রী-পুত্ররাও এই সকল চিকিৎসকের সাহায্য পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক লইবার ব্যবস্থা আছে। হাসপাতালে আসিয়া চিকিৎসা করাইলে প্রত্যেকবার পরীক্ষার জন্য ৫০ সেণ্ট দিতে হয় এবং বাড়ীতে পরীক্ষা করাইতে হইলে প্রত্যেক বার ১ ডলার পারিশ্রমিক দিতে হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক চিকিৎসকই বেতন পাইয়া থাকেন। নিম্নতম বেতন মাসিক ৩০০ ডলার এবং উচ্চতম বেতন মাসিক ১০০০ ডলার।

এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সুবিধা এই যে, রোগী অল্প ব্যয়ে এবং ঠিক সময়ে চিকিৎসা করাইতে পারে এবং চিকিৎসকেরও উপার্জ্জনের জন্য অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে হয় না। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য পাইলে অনেক সময় ব্যাধি গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে না।

শবদাহ বনাম সমাধি

Forum পত্রিকায় Percy Waxman শবদাহ ও শব সমাধির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

শবদাহের প্রথা প্রায় সভ্যতার উন্মেষ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে গ্রীসে মৃত-সৎকারের ইহাই একমাত্র সম্মানার্হ ব্যবস্থা ছিল। শিশুদের এবং যাহাদের অপমৃত্যু হইয়াছে তাহাদেরই সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা ছিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দেড়শত স্থানে শবদাহের ব্যবস্থা আছে এবং ক্রমেই ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বৎসরে প্রায় ১০,০০০ শব দাহ করা হইত। বর্ত্তমানে প্রায় ৪০,০০০ শব দাহ করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেকের মনে ধারণা আছে যে, সমাধিস্থ করা অপেক্ষা দাহ করা অধিকতর অসম্মানজনক।

চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, সমাধির আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি অনেকেই আত্মপ্রচারের অংশ বলিয়া মনে করেন। মৃত দেহ লইয়া আড়ম্বর করিবার কোনই অর্থ হয় না।

শব-সমাধি প্রথার উদ্ভবের কারণ এই যে, প্রাচীনকালে ধারণা ছিল যে, জীবিত অবস্থায় যে যেরূপ জীবনযাপন করিয়াছে মৃত্যু হইলেও সেইরূপ অবস্থাতেই সে থাকিবে। এই জন্যই মৃতদেহে সুগন্ধ দ্রব্য লেপন করা হইত এবং শবের সহিত খাদ্য, পরিচ্ছদ, রত্নাদি সমাহিত করা হইত।

বর্ত্তমানকালেও শব-সমাধির ব্যবস্থার জন্য যে-সকল দ্রব্যাদি আবশ্যক, সেই সকল দ্রব্যের বিক্রেতাগণ মৃতের আত্মীয়স্বজনের নিকট উচ্চ মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য এরূপ করিয়া থাকে যে, শোকসন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিলেও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাহাদের মানসিক অবস্থার কথা ইহারা আদৌ বিবেচনা করে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শব-সমাধির জন্য বৎসরে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ কোটি ডলার ব্যয় হয়। এই জন্য বৎসরে প্রায় ছয় কোটি ডলার মূল্যের ফুল বিক্রয় হয়। মৃতের জন্য এত ব্যয়ের কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

সুইডেনে এ বিষয়ে অতি চমৎকার ব্যবস্থা দেখা যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে তথায় একটি তহবিল (Flower Fund) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মৃতের বন্ধুবান্ধব মৃতের উদ্দেশ্যে ফুল না পাঠাইয়া তাহার মূল্যস্বরূপ টাকা পাঠাইয়া দেয়। এই তহবিলের কর্ম্মসচিব ঐ টাকা তহবিলে জমা করিয়া মৃতব্যক্তির বাড়ীতে সমানুভূতি-সংবাদ পাঠাইয়া দেন। এই তহবিলে যে অর্থ জমা হয় তাহার দ্বারা কার্য্য করিতে অসমর্থ দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়। ষ্টকহল্‌ম্‌-এ এই অর্থ দ্বারা যে দরিদ্র-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তথায় এক হাজার লোক আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আমেরিকায় ফুল ক্রয় করিবার জন্য প্রতি বৎসর যে ছয় কোটি ডলার ব্যয় হয় তাহা এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করিলে কত উপকার হয়!

বর্ত্তমান কালে আমেরিকায় সমাধি-স্থানের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সমাধি প্রথার প্রচলন কমিয়া শবদাহের প্রথাই প্রসার লাভ করিতেছে।

আছে মোর ছায়া

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তৃণে তৃণে পত্রে পুষ্পে ধান্যক্ষেত্রে গহনকাননে
নদীর কিনারে
বিষাদের ছায়া পড়ে,—পল্লীমাতা মলিন আননে
চেয়ে থাকে প্রতিদিন মৌন অশ্রু ভারে।
সঙ্গশূন্য উদাসীন বৈরাগীর বাজে একতারা,
শূন্য গৃহমাঝে
শীর্ণবৎস বক্ষে লয়ে' তন্দ্রাহীন কাঁদে সর্ব্বহারা
নিশি-দিন চিন্তাতুর সংসারের কাজে।
ধূসর দিগন্ততলে বহিতেছে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস,
বেণু শাখা-অন্তরালে পথহারা চিত্তে লাগে ত্রাস।

শৈবাল কণ্টকদামে স্রোতোধারা বদ্ধ দিবাযামী,
বন-বিহঙ্গম
ভগ্ন ঘাটে বসে আছে, চিত্ত তার দূরপথগামী,
ঝঞ্ঝাহত মৃত্যুমুখী স্থাবরজঙ্গম।
স্মৃতিভরা শীর্ণ নদী,—পণ্য তরী বক্ষে নাহি তার,
শ্যামল পুলিনে
শুষ্ক পণ্য কলরব, শ্মশানের ওঠে হাহাকার,
শেফালী ঝরিয়া পড়ে বেদনার দিনে।
হাটের পথিকবৃন্দ হাট ভাঙি' দূরে গেল চলে,
পারের কাণ্ডারী কোথা! জীর্ণ তরী বাঁধা বটতলে।
আমি নাহি, আছে মোর ছায়া

কৃষাণ চলেছে মাঠে, নাহি তার হরষ অন্তরে,
কণ্ঠে কোন গান
প্রভাত সমীরে তার ওঠে নাই,—জীবন-অম্বরে
গভীর আঁধারে তারা হারায়েছে প্রাণ।
পথ্য বিত অন্ন লাগি' লোভাতুর পল্লীশিশুদল,
জঠরজ্বালায়,
—তাও ভাগ্যে কোটেনাক, নিরাশায় বহে বক্ষতল,
প্রাণের পরাগ লুপ্ত বিশুষ্ক মালায়!
শূন্যকরে ভাগ্যলক্ষ্মী দাঁড়ায়েছে যুগের দুর্য্যোগে,
দীর্ঘনগ্ন বেলা তার কেটে যায় দুঃখের দুর্ভোগে।

খেলার প্রাঙ্গনে নাহি খেলিবার শিশুসাথীগণ,
আছে যাবা সব
বারোমাস জীর্ণজ্বরে পড়ে আছে, ক্লান্ত তনু মন,
বনশ্রীর শ্যামশোভা নিস্পন্দ নীরব।
কুসুমের মধু বিনা মধুকর বক্ষে ব্যথা লয়ে
যায় অসন্তোষে,
দূরের অতিথি এবে বুভুক্ষিত উপেক্ষিত হয়ে'
গ্রাম্যপথে চলে একা বিষণ্ণ প্রদোষে।
একমুষ্টি অন্ন আর মোটামুটি সামান্য বসন
পল্লীভাগ্যে জুটিল না, দুর্ভিক্ষেতে করে অনশন।
আমি নাহি, আছে মোর ছায়া

পাতার কুটীর'পরে নির্ব্বাপিত আশার আলোক,
আঁখির সম্মুখে
কঙ্কালের মূর্ত্তিগুলি কহে কথা, কত রোগ শোক
জড়ায়ে রয়েছে শত অভাগার বুকে।
বাজে না মৃদঙ্গ আর, ভক্ত নাহি বসে ধ্যান জপে,
নাহি উদ্গাতা
শান্তসৌম্য দেবালয়ে, শিবাদল অট্টহাস্যরবে
আনিয়াছে অমঙ্গল, কহিতেছে মাতা
'হে মোর প্রবাসী ছেলে! ভুলিবে কি সহরের মায়া,
চাহিবে কি মোর পানে? আমি নাহি, আছে মোর ছায়া।'

একটি ভৌতিক কাহিনী

—শ্রীশচীবিলাস সামন্ত

রাত্রি আড়াইটার সময় ডাক্তারি ব্যবসা ছাড়িলাম এবং শপথ করিলাম পাটের ব্যবসা ধরিব। এখন মনে হইতেছে, ভালই করিয়াছি। ইউরোপের যুদ্ধ উপলক্ষে পাটের চাহিদা বাড়িতেছে, পক্ষান্তরে ঔষধের দাম চড়িয়া যাওয়াতে কেহ ডাক্তার ডাকিতেছে না। তাহা ছাড়া পাটের ব্যবসাতে আমার কিছু টাকা পূর্ব্ব হইতেই খাটিতেছিল।

ডাক্তারি ব্যবসা কেন ছাড়িলাম? সেই কথাটাই আজ বলিব। ডাক্তারদের উপর এখন আমি নিজেই খড়্গ-হস্ত, কাজেই বলিতে কোন বাধা নাই।

কালটা ছিল বর্ষা। অবিরাম বর্ষণে শহর পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, কাহারও মনে আনন্দ নাই, কেমন যেন একটা কর্ম্মবিমুখতা শহরবাসী নর-নারীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তদুপরি আমাদের উত্তর-কলিকাতায় টাইফয়েড দেখা দিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার হইয়াও এই যোগাযোগটাকে মহা আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।—বর্ষাকালটাই বোধ হয় আনন্দ উপভোগের প্রতিকূল, মনে হয় যেন সব শূন্য; শূন্য নয়, অথচ শূন্য-বোধ বড় ভয়ানক। ইহাতে সমস্ত উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়, কাজে মনোযোগ আসে না—কেমন যেন একটা উদাসীনতা মনকে অলস করিয়া তোলে।

মাঝে মাঝে 'কল্' পাইতেছি, দু'চার টাকা পকেটেও আসিতেছে; অন্য সময় হইলে দিনগুলি রৌপ্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে রৌপ্য থাকিলেও তাহা উজ্জ্বল হইতে পারিতেছে না। আরও একটি কারণে এক দিন মনটা বিশেষ খারাপ হইয়া উঠিল। যে পরিবারকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতিপত্তি, হাতীবাগানের সেই রায়-পরিবারের একটি বধূ আমারই চিকিৎসাধীনে মারা গেল। টাইফয়েডের চিকিৎসা করিতেছিলাম কিন্তু দিন-দশেকের মধ্যে তাহার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হইল। কেসটিকে লইয়া বেশ চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার পকেটে মাত্র গোটা পঞ্চাশেক টাকা আসিবার পরই উক্ত রায়-গৃহে যাওয়ার পথ আর আমার রহিল না।

রাত্রে মনটা বড় খারাপ ছিল। এই কেসটার কথা চিন্তা করিতে করিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—দুপুর রাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম। ঘরে বাহিরে অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার—যেন হাতে স্পর্শ করা যায়। পাথরের মত জমাট কালো অন্ধকার যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া বসিল। বাহিরে মাঝে মাঝে মাঝে ক্ষীণ বিদ্যুৎ অন্ধকারের বীভৎসতাকে বাড়াইয়া দিতেছে। আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে। দোতলার ঘরে আমি একা, নীচের তলায় ভৃত্য ঘুমাইতেছে। হঠাৎ ডাকিলে সাড়া পাওয়া যাইবে না। অজানা ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিয়া সুইচ টিপিব এরূপ উৎসাহ উদ্যম এবং সাহস আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র খুঁজিয়া পাইলাম না।

শব্দ স্পষ্ট শুনিয়াছি, তবে কি চোর ঘরে ঢুকিয়াছে? প্রশ্ন মনে জাগিতেই হঠাৎ দেখি ঘরের এক কোণ যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম—দেখি আলোর কোন উৎস নাই, শুধুই আলো। ভূত বিশ্বাস করিতাম—সুতরাং আমার মনের অবস্থা কি হইল তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর বিশ্বাস না করিলেও সেই ভৌতিক আলো সেদিন আমাকে অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিতে দিত না।

অন্ধকার দেখিয়া আমরা ভয় করি, কিন্তু আলো দেখি-লেও যে ভয় হইতে পারে তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু আলোই হউক বা অন্ধকারই হউক, যাহার আকস্মিক আবি-র্ভাবের কারণ আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না তাহাই আমা-দিগকে বিস্মিত করে। গভীর রাত্রে এই বিস্ময়ই ভয়ে রূপা-ন্তরিত হয়। পরিচিত জগতের আবহাওয়ায় আমাদের যে সাহস, অপরিচিত জগতের আবহাওয়ায় তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। শুধু সাহস নহে অনেক সময় চেতনাও লুপ্ত হইতে

পারে। আমারও সেইরূপ অবস্থা হইল। চীৎকার করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া যখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছি সেই বিষম অবস্থায় দেখিলাম, সেই আলো একটি স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধরিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মুখখানা তাহার কাপড়ে ঢাকা—স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম আমি চেতনা হারাইতেছি।

এমন সময় সেই মূর্ত্তিটি সাধারণ মানুষের মত কথা কহিয়া উঠিল। বলিল, ভয় পেয়ো না আমি তোমার পরিচিত।—কণ্ঠে তাহার মধুর বিদ্রূপ।

সেই মানবকণ্ঠ যেন এক ধাক্কা দিয়া আমার অনেকখানি ভয় ভাঙাইয়া দিল। আমি পড়িতে পড়িতেও সোজা হইয়া বসিলাম। কে এই নারী—বা নারীর প্রেতাত্মা? যেই হউক, সেই গভীর নিশীথে একা ঘরে আর্দ্ধচেতন অবস্থায় তাহাকেই যেন পরম আশ্রয় বলিয়া মনে করিলাম। ভূতের ভয়ে ভূতই আমার ভবিষ্যৎ অপঘাত হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু ভূত হউক বা দেবতা হউক সে আমারই ভাষায় কথা কহিতেছে ইহাতেই যেন আমি বাঁচিয়া গেলাম। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, কে তুমি?' তোমার মুখের আবরণ খোল।

মূর্ত্তি বলিল, আজই তুমি আমাকে হত্যা করেছ, মুখের আবরণ খুললে ভয় পাবে—আবরণ এখন খুলব না।

হত্যা করেছি!

হাঁ হত্যা করেছ।

এইবার বিপদ্ গণিলাম। মনে হইল, ভূত আমার অনিষ্ট করিতে চায় তাই ছল খুঁজিতেছে। তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় বলিলাম, তুমি ভুল করেছ; যে তোমাকে হত্যা করেছে তার কাছে যাও, আমাকে ছাড়।

কিন্তু সে কথায় কোন ফল হইল না। ভূত বলিল, তুমিই আমাকে হত্যা করেছ।

প্রমাণ?—বেশ কঠিনভাবেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলাম।

প্রমাণ আমার কথা।

বিচার করবে কে?

আমি। আমার কথা তোমাকে মানতে হবে।

তুমি এ সব কি বলছ? আমি হত্যা করেছি অথচ আমি জানি না?

বলিলাম বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম ভূত আমাকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিতেছে। আর একটু পরেই হয়ত তাহার কথা মানিতে হইবে—সে তাহার অমোঘ প্রভাব ধীরে ধীরে আমার উপর বিস্তার করিতেছে।

ভূত আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, আমিও মৃত্যুর পূর্ব্বে জানতাম না, পরে জানতে পেরেছি। কিছুই মনে পড়িল না, তবু তাহার কথাটা উড়াইয়া দিতেও সাহস হইতেছিল না। আমি নিজে তাহার প্রভাবে সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়িতেছি স্পষ্ট বুঝতে পারিলাম, কিন্তু আমার মধ্যে তখনও কিছু অহমিকা অবশিষ্ট ছিল, ভূতের সঙ্গে ঝগড়া করিবার ভার সে একা গ্রহণ করিল। আমি ভয়ে কাতর হইয়াছি—আমার অহমিকা উদ্ধত শিরে ভূতের সম্মুখে বসিয়া রহিল—যেন তাহারই কথা আমি বলিতে লাগিলাম। বলিলাম, কে তুমি, পরিচয় দাও, নইলে চীৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করব।

আমি রায়-বাড়ির বধূ, তুমি চিকিৎসার নামে আমাকে হত্যা করেছ।

কথাটা শুনিয়া আমি পুনরায় চমকিত হইলাম। আমার মুখে কিছুক্ষণ কথা যোগাইল না। তবু এক রকম জোর করিয়াই বলিলাম, আপনি, আপনি রায়-বাড়ির বধূ—

ভূত আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, আর 'আপনি' বলে ভণ্ডামি করতে হবে না, ওতে আমি ভুলব না।

বেশ 'তুমি'ই বলছি, কিন্তু আমি তোমার হত্যা করেছি এ ধারণা তোমার কেমন করে হল?

ধারণা হয়েছে আমি সব দেখতে পাচ্ছি বলে।

দেখ, তুমি শিক্ষিতা ভদ্রঘরের বধূ, শুনেছি বি-এ পাস করেছিলে—তোমার পক্ষে এ রকম মিথ্যা অভিযোগ করা অন্যায়।

শিক্ষিতাই বটে! যেমন তুমি শিক্ষিত, শিক্ষিত হয়ে নরহত্যা করতে লজ্জা করে না?

তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, তুমি কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করবে না। এখন কি করতে চাও বল।

আমি জানতে চাই কেন তুমি চিকিৎসার নামে মানুষের সর্ব্বনাশ করছ।

চীৎকারে ঘর যেন কাঁপিয়া উঠিল। আমি ভীত কণ্ঠে জবাব দিলাম, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

বুঝতে চাও? তা হলে স্থির হয়ে বস। এই কথা বলিয়া ভূত নিজেও সম্মুখস্থ একখানা চেয়ারে বসিল। বাহিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ-গর্জ্জনেরও বিরাম নাই—তাহার উপর বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে টিপি টিপি, ক্রমে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল—বৃষ্টির সঙ্গে এলো-মেলো হাওয়া বহিতেছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম দেড়টা বাজিয়াছে। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির দুর্য্যোগময় অন্ধকারে আমি একা ভূতের সঙ্গে মুখামুখী বসিয়া। মনে হইল যেন আমিও প্রেতলোকে উপস্থিত হইয়াছি। যেন অপরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে আমার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভূতের মুখ আমার দিকে—দৃষ্টিও আমারই মুখে নিবদ্ধ—কিন্তু আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি না। সূক্ষ্ম আবরণের অদৃশ্য অন্তরাল ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ ধ্বনিময় শুধু একটি প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল, তোমার কি অধিকার আছে ব্যাধি-চিকিৎসার?

আমি বলিলাম, আমি চিকিৎসা বিদ্যা শিখেছি, এবং সেজন্যে ডিপ্লোমা পেয়েছি।

ভূত এক অভূতপূর্ব্ব অভিজাত সুরে বলিল, পরের উপদেশ মুখস্থ করে মনে করছ বিদ্যা শিখেছ?

আমার আত্মাভিমান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বলিলাম, ক্ষতি কি?

সেই উপদেশ যে অভ্রান্ত সেটা মেনে নেওয়াটাই ক্ষতি।

নিজেও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

আমার কথা কহিবার সঙ্কোচ আর নাই। কথাটি সহজ ভাবেই বলিলাম। তারপর আমাদের প্রশ্নোত্তর এই ভাবে চলিল—

ভূত বলিল, অভিজ্ঞতা লাভ করে নিশ্চয় বুঝেছ যে, যে-রোগী তুমি চিকিৎসা করবে তাকে নিশ্চয় সারিয়ে তুলবে?

আমি বলিলাম, না। কেউ কেউ সারে, অনেকে সারে না।

যখন রোগীর বাড়ী থেকে ডাক পড়ে তখন কি তাকে জানতে দাও যে তোমার চিকিৎসায় সে ভাল না হতেও পারে? বল, আমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

সেটা তারা ধরে নেয়। তারা জানে যে স্বয়ং ডাক্তারও একদিন মারা যায়। মৃত্যুর উপরে মানুষের হাত নেই।

যেখানে তোমাদের নিজেদেরই সন্দেহ, সেখানে চিকিৎসা করে টাকা নাও কেন?

নইলে বাঁচব কি খেয়ে?

এর পরেও কি মনে হয়, তোমাদের বাঁচাটাই খুব জরুরী?

মনে হয় বৈ কি। বাঁচতে সবাই চায়। তুমিও চেয়েছিলে।

চিকিৎসায় তা হলে তোমার স্বার্থ টাই আগে?

অম্লান বদনে সে কথা স্বীকার করিলাম। ভূত চঞ্চল হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর কয়েক সেকেণ্ড ঘরের মধ্যে ছটফট করিতে করিতে ঘুরিয়া আবার আমার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আমি ভীত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ভূত উত্তেজিত ভাবে বলিল, তা হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর তোমর কোন প্রীতি নেই?

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, আছে।

ভূত যেন সগর্জ্জনে বলিল, মিথ্যা কথা। তোমাদের বিজ্ঞানকে কি তুমি অভ্রান্ত মনে কর—যে-বিজ্ঞান তুমি নিজে সৃষ্টি কর নি—পরের লেখা বইতে পড়েছ?

না অভ্রান্ত মনে করি না, তবে যত দিন যাচ্ছে ততই ভ্রান্তি সংশোধন হচ্ছে।

কার চেষ্টায়?

বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায়।

অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করছে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি করতে?

সেই কথাই বলেছি।

আর তোমরা তাদের পরীক্ষার ফল মুখস্থ করে বলে বেড়াচ্ছ তোমরা চিকিৎসক ?

আমরাও পরীক্ষা করছি। তাঁদের পরীক্ষার ফল প্রয়োগ করে দেখছি সেটা কতখানি সফল হল।

তা হলে বলতে চাও তোমাদের আসল উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা এবং তার জন্যে কতকগুলো রোগীকে সংগ্রহ করে সেই পরীক্ষার পথ সুগম করা ?

তাই যদি হয় ক্ষতি কি ?

ভূত পুনরায় উত্তেজিত ভাবে বলিল, ক্ষতি এই যে, রোগীকে তা জানতে দিচ্ছ না। ক্ষতি এই যে, তোমার অনুমানমূলক ওষুধের কার্য্যফল পরীক্ষার জন্যে কতকগুলো রোগীকে লাভ করে ধন্য হচ্ছ অথচ তাদের কাছে তোমাদের কোন কৃতজ্ঞতা নেই, বরঞ্চ তাদের ভুল বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছ।

আমি বলিলাম, এইটেই সামাজিক রীতি—অন্ততঃ চিকিৎসার নামে আমরা রোগীর সেবা করছি, তার মনে আশা জাগিয়ে তুলছি, তার দুঃখে সান্ত্বনা দিচ্ছি।

ভূত বিদ্রূপ করিয়া বলিল—সেটা নির্ভর করছে রোগীর টাকার পরিমাণের উপর। যার টাকা নেই তার সম্বন্ধে তোমাদের কি ব্যবস্থা ?

এই জাতীয় প্রশ্নে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু আমি উপায়হীন। তবু মনের বিরক্তি গোপন করিয়া কহিলাম, তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে—দেশে হাসপাতালের অভাব নেই।

ভূতের স্বর আরও কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল, মূর্খ, তুমি জান, অনেকে চিকিৎসা না করিয়েও ভাল হয়ে ওঠে ?

জানি, কিন্তু সেজন্যে আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই। আর—তুমি ত আগেই বলেছ, আমার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার।

এমন কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয় না ?

মোটেই না। এই যে আজ রাত্রে এক প্রেতাত্মার সঙ্গে বসে তর্ক করছি এটা লিখেও কিছু উপার্জ্জন করব। —বলিতে বলিতে নিজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম—এবং উত্তেজনার মুখেই বলিলাম, আমার যা খুশী করব—তার জন্যে কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে চাই না। তুমি এখন যেতে পার, আমাকে ঘুমুতে হবে।

ভূত হাসিয়া বলিল, অত সহজ নয়। আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নি। আমার সব কথার উত্তর দিতে হবে—এবং তারই উপর তোমার জীবন নির্ভর করছে।

আমি ভীত ভাবে তাহার দিকে চাহিলাম।

সে জিজ্ঞাসা করিল, চিকিৎসায় ভুল হলে স্বীকার করবার সাহস আছে ?

আমি নিরুপায় ভাবে পুনরায় তাহার প্রশ্নে উত্তর দিয়া চলিলাম। বলিলাম, স্বীকার না করাই রীতি

অর্থাৎ প্রতারণায় আপত্তি নেই ? আচ্ছা তুমি জোর করে বলতে পার তোমার ওষুধ না খেলেও আমার মৃত্যু হত ?

তা কেমন করে বলি ?

এমনও ত হতে পারে যে, তোমার ওষুধ না খেলেই আমি সেরে উঠতাম।

সে কথা বলা শক্ত।

অর্থাৎ তোমার সন্দেহ আছে। আমার কিন্তু সন্দেহ নেই। আমি জানি তোমার ওষুধ না খেলে আমি মরতাম না—এবং সেইটেই আমার অভিযোগ।

আমার কৌতূহল জাগিল। বলিলাম, অভিযোগ প্রমাণ কর।

ভূত জিজ্ঞাসা করিল, টাইফয়েড রোগের কোন নিশ্চিত ওষুধ আছে ?

না।

তবে তুমি ওষুধ দিয়েছিলে কেন ?

আরোগ্য হতে কিছু সাহায্য হবে বলেই ওষুধ দিয়েছিলাম।

কোন্‌টায় আমার উপকার হবে তা নিশ্চয় জানতে ?

নিশ্চয় জানলে একটা ওষুধই বরাবর দিতাম। তুমি জান আমি ওষুধ বদলে বদলে দিয়েছি।

অর্থাৎ আমাকে মেরেছ। এর জন্য তোমাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

আমাকে শাস্তি না দিয়ে যিনি এই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁকেই শাস্তি দেওয়া উচিত। প্রথম আলো জেলেছেন একজন, আমরা সেই আলো বহন করে চলেছি মাত্র।

তার চেয়ে বল প্রথম আগুন জেলেছে একজন, আর তোমরা সেই আগুন বহন করে সবার ঘর জালিয়ে বেড়াচ্ছ।

তোমার যা ইচ্ছে বলতে পার।

তুমি জান যে আমার মোটেই টাইফয়েড হয়নি?

বাজে কথা বলছ, আমি তোমার রক্ত নিয়ে 'ভিডাল টেষ্ট' করেছি।

তুমি নিজে করেছ?

না, একটা ল্যাবরেটরি থেকে করিয়েছি।

তুমি সেদিন দুজনের রক্ত নিয়েছিলে। তার পর পাঠাবার সময় আমাদের নাম ওলটপালট করে দিয়েছ—কারণ এ সম্বন্ধে যতখানি সতর্ক হওয়া উচিত, তা তুমি হও নি—কারণ তখন তোমার মন অন্য জিনিসে ব্যস্ত ছিল। যার রক্তে আমার নাম দিয়েছ তার হয়েছিল টাইফয়েড, আর আমার হয়েছিল পাইমিয়া। কিন্তু আমার ভিডাল টেষ্ট নেগেটিভ হওয়ায়—তার অসুখ তুমি ধরতে পার নি। তার টাইফয়েডে তুমি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করেছ, আর আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ক্লোরিন মিকৃশ্চার খাইয়ে মেরেছ।

এইবার আমি সত্যই স্তম্ভিত হইলাম। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম আমি ভুল করিয়াছি, প্রতিবাদ করিবার মুখ নাই। তাই নরম হইয়া বলিলাম, মানুষ মাত্রেরই ভুল হতে পারে।

আমার বিচারক বলিল, তা জানি, কিন্তু মানুষের জীবন-মরণ সমস্যায় ভুল হবে কেন? কেন সাবধান হও নি? কেন যা জান না, তা করতে যাও?

আমি ভুল করতে পারি কিন্তু জানি না এ কথা মানব না।

যেটা জান সেটাও ত ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস কর না।

বিশ্বাস করি বৈ কি।

তা হলে তুমি কেবল হত্যাকারী নও, তুমি মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক।

না এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ।

ভূত এইবার নিজে কাঁপিতে লাগিল। সে এক লাফে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু তুমি এর আগে স্বীকার করেছ যে তোমাদের অমোঘ ওষুধ কিছু নেই। যদি থাকে তবে প্রত্যেক রোগী সেরে ওঠে না কেন? যারা সেরে ওঠে তারা তোমার ওষুধের গুণে নয়, নিজের জীবনী-শক্তিতে। তারা তোমার ওষুধ না খেলেও সেরে উঠত, অনেক সময় না খেলেই সেরে ওঠে। তোমরা ওষুধের ক্যানভাসার, তোমরা মূর্খ, তোমরা প্রতারক। লোককে ঠকিয়ে টাকা নাও।

আমি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলাম, তুমি উত্তেজিত হয়ো না; ইচ্ছা করে আমরা লোক ঠকাই না, জ্ঞানের অভাবেই হয়ত ঠকাই।

কিন্তু এ কথায় তাহার উত্তেজনা আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, মিথ্যা কথা। যদি দেখতাম তোমরা নিঃস্বার্থ ভাবে লোকের উপকার করছ, তোমাদের শাস্ত্র অভ্রান্ত কি না, পরীক্ষা করবার জন্য রোগীদের কাছে বিনীত ভাবে বলছ, হে রোগী, আমরা কতকগুলো থিওরি মুখস্থ করে ব্যাধি-মুক্তির উপায় কিছু কিছু জানতে পেরেছি বলে মনে করছি, কিন্তু আমরা জোর করে বলতে পারি না এতে ব্যাধি-মুক্তি হবে কি না, অতএব আমরা এটা তোমাদের উপর পরীক্ষা করে দেখতে চাই, তোমরা এতে সেরেও উঠতে পার—মরেও যেতে পার; কিন্তু একথা জেনেও যদি আমাদের পরীক্ষার সহায় হও, যদি আমাদের বিদ্যা তোমাদের উপর পরীক্ষা করতে দাও, তা হলে আমরা কৃতজ্ঞ হব, এবং যদি আমাদের দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হয়, তা হলে সে ক্ষতি আমরা অর্থ দ্বারা পূরণ করতে চেষ্টা করব। আমরা বৈজ্ঞানিক, আমরা সত্য আবিষ্কারের জন্য চেষ্টিত, এ পথে যদি সত্যের দেখা না পাই তবে আমাদের পথ বর্জ্জন করে অন্য পথের সন্ধান করব। এই ভাবে যদি রোগীদের বলতে পারতে, তা হলে বুঝতাম তোমরা প্রতারক নও। তা ছাড়া তোমরা পরের বিদ্যাও সবটা মুখস্থ কর নি, সেখানেও ফাঁকি দিয়েছ।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, ফাঁকি দিয়েছি ?

হ্যাঁ, পরীক্ষায় যতগুলো প্রশ্ন ছিল সবগুলোর উত্তর দিতে পারনি। মুখস্থ করবার সময় ফাঁকি দিয়েছ, কোন রকমে পাস করাটাই ছিল লক্ষ্য। সত্য হোক মিথ্যা হোক বিদ্যাটা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতেও পার নি। শিক্ষার্থীর মনোভাব তোমার ছিল না।

কি করে জানলে ?

আমি সবই জানি, এবং আশা করি সেটা এতক্ষণ বুঝতে পেরেছ। ছাত্র-জীবনটা সিনেমা-থিয়েটারে বেশি কেটেছে, পিতাকে ঋণগ্রস্ত করে।

সিনেমা-থিয়েটার বাদ দিলেই আদর্শ মানুষ হওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগে টিকতে হলে বর্ত্তমান যুগের দাবী কিছু কিছু মেটাতে হবে—এতে জীবনের বৈচিত্র্য বাড়ে।

ডাক্তারি পড়বার সময়, ডাক্তারি বিদ্যাটাই কেন, প্রধান লক্ষ্য হয় নি ? সিনেমা-থিয়েটারে না গিয়ে সে সময়টা বিজ্ঞানের সাধনা কেন করনি ? জীবনের বৈচিত্র্য বাড়াবার পক্ষে সেটাও কম হত না। নানা দিকে মনটাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলে ছাত্র-জীবনে, সে জন্যে ডাক্তার হয়েও তার ফল ভোগ করছ। এখন তুমি শুধু ডাক্তার নও, তুমি পাটের ব্যবসা করছ।

যাতে টাকা হয় তাই আমার করবার অধিকার আছে।

না, ডাক্তারের সে অধিকার নেই। পরের বিদ্যা মুখস্থ করে যে এত বড় দায়িত্ব নিয়েছে, তার দায়িত্ব সম্বন্ধে বোধ থাকা উচিত।

থাক সে উপদেশ আর আমি শুনতে চাই না।

তুমি শুনতে না চাইলেও আমি শোনাব। আমি আমার হত্যার প্রতিশোধ চাই। আমি তোমাকে হত্যা করব।

ভূত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে হাত বাড়াইল—আমার গলার দিকে।

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—সে চীৎকার বাহিরের ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মিশিয়া গেল—মনে হইল যেন আমার মুখ দিয়া কোন আওয়াজই বাহির হইল না।

ভূত পৈশাচিক হাসিতে ঘর মুখরিত করিল। স্ত্রী-কণ্ঠের ধারাল ধ্বনি আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ করিবার উপক্রম করিল।

অট্টহাস্য হাসিতে হাসিতে ভূত বলিল, কাপুরুষ, তোমার মরতেও ভয় !

আমি কাতর ভাবে বলিলাম, আমি সমস্ত অপরাধ স্বীকার করছি—আমাকে বাঁচতে দাও, আমি ডাক্তারি ছেড়ে দেব—আর কখনও মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করব না।

ভূত বলিল, তোমার মত কাপুরুষকে মারতেও আমার দুঃখ হবে—এ কথা আমি অনেকক্ষণ আগেই টের পেয়েছি।

বলিতে বলিতে ভূত সমস্ত ঘর উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। সেই প্রখর আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়া গেল—আমার চোখে অন্ধকার আরও নিরেট হইয়া আমার বুকে চাপিয়া বসিল—আমি চেতনা হারাইলাম।

যখন জাগিলাম তখন বেলা প্রায় আটটা। রাত্রের সমস্ত ঘটনা আমাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে—কিছুই ভাল করিয়া স্মরণ করিতে পারিলাম না, সবটাই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। আজিও মনে হইতেছে যেন স্বপ্নই দেখিয়াছি। আজ বর্ষারাতে পাটের হিসাব মিলাইতে মিলাইতে অকস্মাৎ সেই বীভৎস রাত্রিটির কথা মনে জাগিয়া উঠিল—তাই আজই কাহিনীটি লিখিয়া ফেলিলাম।

বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ গত সংখ্যা, (আশ্বিন, ১৩৪৬) "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত ১৩৪৫ সালে যে-সকল প্রবন্ধ প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গশ্রী, পরিচয়, বসুমতী এবং বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এখানে তাহাদের তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পত্রিকাসমূহের সাঙ্কেতিক চিহ্ন এইরূপ :—প্র—প্রবাসী ; ভা—ভারতবর্ষ ; বং—বঙ্গশ্রী ; প—পরিচয় ; ব—বসুমতী ; বি—বিচিত্রা। সংখ্যাগুলি বর্ষ, খণ্ড এবং প্রকাশ-সংখ্যাবাচক ; যথা, বং ৬-২-১ = বঙ্গশ্রী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।]

সমাজতত্ত্ব

৩২(রাষ্ট্রনীতি)

অষ্ট্রিয়া ও মধ্য-ইয়ুরোপ—শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক,
ভা ২৫।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২০৭-১০)

আগামী যুদ্ধ ও জার্ম্মানী—শ্রীসুধীর চন্দ্র রাহা
বং ৬।১।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ৫ (৬৬৩-৬৭)

আন্তর্জাতিক আবহাওয়া—শ্রীঅতুল দত্ত
ব ১৭-২-৩, পৌষ ১৩৪৫, পৃঃ ৪ (৩৬৩-৬৬) ১৭-২-৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৫৮৯-৯৪, ছবি-১০
ব ১৭-২-৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৮৫৩-৬১) ছবি-১৫
ব ১৭-২ ৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৩ (১০৬২-৭৪) ছবি-২৫ মানচিত্র-১

আবসিনিয়ার স্বাধীনতা-বিলোপে রাষ্ট্রবর্গের সিদ্ধান্ত
—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
প্র ৩৮-১-৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪৫৭-৬১)

ইউরোপ ও অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা—শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য
প ৭-২-৪ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১০ (১০৪১-৫০)

ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি—অতুল দত্ত
ভা ২৬-১-১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৯৮-১০৪)

ইতালী ও জার্ম্মানী—শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক
প্র ৩৮-১-২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৬৩৭-৪৩)। ছবি—১৫

ইয়ুরোপের মহাসমর
গান্ধীজীর নিঃস্বার্থপরতা, সত্যানুরাগ এবং অহিংসা প্রবৃত্তি
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬-২ ৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮+৩ (২৯৪-৩০১, ৩১১৮-৩১২৪)

১৯৩৫ সালের নূতন আইনের সাফল্য এবং ইংরাজের জয়
গান্ধীজির ষ্টেট্সম্যানশিপ ও তাঁহার প্রতি দেশবাসীর কর্ত্তব্য
শিল্প ও বাণিজ্যের অসাফল্য এবং : সম্প্রদায়গত ও প্রদেশগত
অমিলন দূর করিবার পন্থা সম্বন্ধে কংগ্রেসের গবেষণা
পরিবর্ত্তিত প্রজাস্বত্ব আইন এবং তাহার ভবিষ্যৎ
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬-১-৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬+৪+৬+৪, (৪৫৪-৪৭০)

এশিয়া মাইনর ও হেজাজ রেলপথ—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্র ৩৮-২-৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; ৭ [৯১৭-২৩]

ঐক্যের আলেয়া—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
ব ১৭-১-২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৩৪০-৪৪]

১। কংগ্রেসের প্রতারণার একটি উদাহরণ
২। লর্ড লিনলিথগো ও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
৩। গান্ধীজীর অনাবশ্যক পুনরুক্তি এবং প্রতারণামূলক রাষ্ট্রনীতি
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৭-১-১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ [১৬-৩৫]

১। গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ কি দেশপ্রেমিক
না আত্মবিক্রীত দেশদ্রোহী ?
২। মিঃ গান্ধীর অনশন ও তাহার তাৎপর্য্য
৩। জগতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও তাহার বিতরণ
৪। গণতন্ত্রের ত্রুটি ও তাহার সংশোধন পন্থা
৫। ইহাই কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ?
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৭-১-৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৯ [২৬১-৭৯]

গান্ধীজীর অহিংসা ও দেশপ্রেম
সুভাষচন্দ্রের একতাসাধন
গান্ধী-জিন্না-সাক্ষাৎকার
স্বাধীনতার উদ্দীপনা
মিঃ জেনের অস্থায়ীভাবে উড়িষ্যার লাটগিরি
এবং মন্ত্রীসভার পদত্যাগের হুমকি
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬-১-৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬+৩+২+৪+১ (৫৯৩-৬০০,
৬০৭-০৯,১৪

চীন জাপানে যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ—পি. সি সরকার
বি ১২-১-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৫০৩-০৮) ছবি-৭
চীনে নবজীবনের উন্মেষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
বং ৬-১-৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৬৮৩-৯০) ; ছবি-৪ ; মানচিত্র-১
চেকোস্লোভেকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ—শ্রীঅতুল দত্ত
ভা ২৬-১-৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৯৪৬-৫৩) ; মানচিত্র-১
চেকোস্লোভেকিয়ার সঙ্কট—অতুল দত্ত
ভা-২৬-১-৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৩৯৪-৯৯)
জার্ম্মানীর অষ্ট্রিয়া গ্রাস—অতুল দত্ত
ভা-২৫-২-৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮৬৭-৭১)
জার্ম্মানীর পুনর্জ্জন্ম—ইতিহাসের প্রতিশোধ—ডক্টর মণি মৌলিক
ভা-২৬-১-১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫১-৫৭) ; ছবি-১০
ডেমোক্রেসী ও কংগ্রেস—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বং ৬-২-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬৫৯-৬৩)
ত্রিপুরী কংগ্রেসের পথ নির্ব্বাচন—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
প্র ৩৮-২-৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮১৩-১৬) ; ছবি-৫
দেশ-বিদেশ—শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য
প ৮-১-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪৬৭-৭১) ;
প ৮-২-১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৭২-৭৪)
দেশ-বিদেশ—শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক
প ৮-২-২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১৬২-৬৬)
দেশ-বিদেশ—শ্রীবিজন রায়
প ৮-১-৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (২৪০-৬৭)
প ৮-১-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ ; (৩৪৯-৫৮) ।
দেশ-বিদেশ—শ্রীমোহিত বসু
প ৮-২-৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২৬৫-৬৮)
দেশ-বিদেশ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প ৮-১-২ ; পৃঃ ৮ (১৬২-৬৯)
দেশবিদেশের কথা, শ্রীগোপাল হালদার
প্র ৩৮-২-৩ ; পৌষ ১৩৩৫ ; পৃঃ ৫ (৪৯৫-৯৯) ছবি-৪
প্র ৩৮-২-৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৬২৯-৩৭) ছবি-৬
প্র ৩৮-২-৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৭০৯-১৬) ছবি-৫
প্র ৩৮-২-৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৯২৪-২৯) ছবি-১

৩৩(অর্থনীতি)

নেতৃত্বের নমুনা
নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণ কি কি ?
যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায় ?
বর্ত্তমান যুবকগণের দোষ কি কি ?
বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রের অসুবিধা কি কি ,
অপরিহার্য্য একতা যে ভারতবর্ষে আছে তাহা
উপলব্ধি করিবার উপায় কি কি ?
ভারতীয় জন-সাধারণের তীব্র দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি কি ?
৮ । কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভ্রমের দৃষ্টান্ত
(মহীশূর ছাত্র-সম্মেলনে মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর
সভাপতি রূপে অভিভাষণের সম্যক আলোচনা)
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬-২-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩৬ (৫৮৭-৬২২)
পশ্চিম ইউরোপে কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রীঅতুল দত্ত
ভা ২৬-২-৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৬৩৪-৩৫)
প্রাচী ও প্রতীচী, অতুল দত্ত
ভা ২৬-১-৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬৮৫-৮৯)
ফ্যাসিজম্, শ্রীঅমিতাভ সেন
বং ৬-২-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৭৮-৮০)
ফ্যাশিজম্ ও সমর, শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক
প ৮-১ ২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (১৪৪-৫২)
ফ্রান্সের সঙ্কট, শ্রীঅতুল দত্ত
ভা ২৬-২-৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪০২-০৬)
বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা এবং তাহা রক্ষা ও লাভ করিবার উপায়,
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬-২-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৪৫১-৬০)
বহির্জ্জগৎ, শ্রীগোপাল হালদার
প্র ৩৮-১-১ , বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১৩৮-৪২)
প্র ৩৮-১-২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (২৮৯-৯৫)
প্র ৩৮-১-৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৪১৫-২১) ; ছবি ১২
প্র ৩৮-১-৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৫৭৪-৭৮) ; ছবি ১৭
প্র ৩৮-১-৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৭২২-২৭) ; ছবি-৮
প্র ৩৮-১-৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৮৬৬-৭৬) ; ছবি—১৫
প্র ৩৮-২-১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (১৩৪-৪৪) ; ছবি-১৩
প্র ৩৮-২-২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৩১৩-১৮)
বৈদেশিক, শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র
বি ১২-১-২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৭০-৭৪)
বি ১২-১-৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৪১২-১৭)
বি ১২-১-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৪৯-৫১)
বি ১২-১-৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬৭৭-৮২)
বোম্বাই-এর মন্ত্রী সম্মেলন
বঙ্গশ্রী ও ভারতীয় কংগ্রেস
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের সংস্কার সম্বন্ধে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি
ও সঙ্ঘসমূহের কর্ত্তব্য,
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৬-১-৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ২+২+৭ (৭৩৭-৪৭)

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

ব ১৭-১-১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃঃ ৫ (১৬২-৬৬) ; ছবি ১

ব ১৭-১-২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৩৩২-৩৯) ; ছবি ২

ব ১৭-১ ৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ , পৃঃ ৮ (৪৬৬-৭১) ; ছবি ৭

ব ১৭-১-৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬৯৫-৭০০) ; ছবি ৬

ব ১৭-১-৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (৮৪২-৫২) ; ছবি ১৪

ব ১৭-১-৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১০৩৩-৩৭)

ব ১৭-২-১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (১৩৩-৪২) ; ছবি ৮

ব ১৭-২-২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (২৭৫-৮৩) ; ছবি ৯

ব ১৭-২-৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৪৮৪-৯৩) ; ছবি ৫

ব ১৭-২-৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৬৮২-৮৮) ; ছবি ৬

ব ১৭-২-৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮৬২-৯৮) ; ছবি ৬

ব ১৭-২-৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ;

ভারতীয় ঐক্যের রূপ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (অনুবাদক-মণি বাগচি)

ভা ২৬-১-১ , আষাঢ় ১৩৪৫ , পৃঃ ৩ (২৫-২৭)

মধ্য ইউরোপ, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বং ৬-২-১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৪১-৪৮) ; ছবি ৩

মধ্য ইউরোপের সঙ্কট, শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বং ৬-১-৫ , জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৭১২-১৬)

মিউনিক বৈঠকের পর, শ্রীঅতুল দত্ত

ভা ২৬-২-১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১৩৬-৩৯)

মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর অসার চিন্তার নমুনা

আমাদের, প্রধান-মন্ত্রীর কার্য্যসূচী

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব

ভারত-রক্ষা

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গত সভাপতি নির্ব্বাচনের শিক্ষা

মিঃ গান্ধীর হিংসা-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে কয়েকটি প্রবর্ত্তন বাক্য

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৭-১-২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ , পৃঃ ১৮ (১৪১-৫৮) ও ১৮ (১৬১-৭৮চ)

সুদেতেন জার্মানী ও চেকোস্লোভাকিয়া, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বং ৬-২-৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪১৩-১৭)

সুন্‌ইয়াৎ সেন ও মহাত্মা গান্ধী, শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

প ৮-২-৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (২৭১-৮০)

আর্থিক পরিকল্পনা—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪-৬)

আমরা কোন্ দিকে ?

আমাদের রক্ষার উপায় কি ?

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৬।২ ১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮+৬ (১-১৩)

আহার্য্য সংরক্ষণ—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৯৮৭-৯৪) ; ছবি-৩

উত্তর য়ুরোপের সাধারণতন্ত্র—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

ব ১৭।২।২ , অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ (২৯৩-৩০৯) ; ছবি-৩০

কাজু বা হিজলি বাদাম—শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভা-২৬।১।৩ , অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৯১৭-১৮)

কৃষকের দুঃখ ও কৃষির উন্নতি—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৬-১-৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৪৪৯-৫৪)

দ্রব্যমূল্য-গবেষণার সমস্যা—শ্রীসুশীল রায়

বং ৬-১-৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৭৯৯-৮০৩)

নূতন আয়কর বিধান—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

ব ১৭-২-২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৩৩১-৩৬)

ব ২৭-২-৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫৬১-৬৪)

পাশ্চাত্ত্য সোসিয়ালিজম্—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

ব ১৭-২-৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৩৬৭-৭৩)

১৭-২-৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫৮৯-৯৫)

বলশেভিক ও হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব ১৭-২-৩ , পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪৫৬-৫৮)

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পরিণাম—শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব ১৭-১-৫ , ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (৭৩২)

বড়দিনের আনন্দ, গান্ধীজীর সংগঠন জ্ঞানের নমুনা,
শিল্প-বাণিজ্য ও দেশের উন্নতি—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৭-১-১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (১-১২)
বালুকা বস্তার কয়মাস ও আর্থিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা
—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৭-১-২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ , পৃঃ ২ (১৭২ চ-৭২ ছ)
বাংলার কৃষকের পণ্য-বিক্রয় সমস্যা—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী
ভা ২৬-২-১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১১-১৪)
ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র
—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬-২-৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৩১১-৩১২ চ)
সাম্যবাদী সমাজ—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ
ব ১৭-২-৫ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ , পৃঃ ৫ (৮৩৭-৪১)
সোভিয়েট রুশিয়ার ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি—শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী
ভা ২৬-১-৩ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৮৯৫-৯৬)

৩৪ (আইন)

পথ চলার বিপদ—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
বং ৬-২-৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫৮১-৮৪)

৩৬ (প্রতিষ্ঠান ও সংস্থিতি [৩৬·৪ অপরাধতত্ত্ব])

ইনিই কি তিনি—৺ রমেশচন্দ্র রায়
ভা ২৬-১-১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৩-২৭)

শরীরের সহিত অপরাধের সম্বন্ধ—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
ভা ২৩-১-৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ৪ (৩৫৭-৬৭)

৩৭(শিক্ষাবিজ্ঞান)

আদিম কলিকাতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্র ৩৮-১-৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৪৭৬-৮৪)

ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় ছাত্র—শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়
প্র ৩৮-২-৪ ; মাঘ ১৩৪৫ - পৃঃ ৮ [৪৯৫-৫০২]

উচ্চ শিক্ষার আদর্শ—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বং ৬-২-২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ [১৯০-৯৬]

উমেদারকাব্য সঙ্কলন—শ্রীরণজিৎচন্দ্র সান্ন্যাল
ভা ২৩-১-৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৬১৬-৬৮]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ও কৃষ্টিগত উন্নতি
—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (২৭৯-৮১)

গৃহশিক্ষা—শ্রীইন্দিরা দেবী
বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬৬-৬৯)

জার্ম্মানীতে শিক্ষা ব্যবস্থা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
ভা ২৫।২।৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (৯৭৬)

ডেভিড্ হেয়ার ও রামমোহন রায়ের স্কুল ; বালিকাবিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্র ৩০।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৯-১৬)

নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজন—শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ
বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৭৫ ; পৃঃ ৩ (৬৪-৬৬)।

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে কোম্পানীর প্রবেশ—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্র ৩৮।১।৫ , ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৬৫৯-৬৬)

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী—নারী-শিক্ষাব্রতী
বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬০-৬৪)

বর্ত্তমান শিক্ষার বাঙ্গালী কোন্ পথে ?—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু
ভা ২৬।১।৩ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৯৫৯-৬২)

বয়স্কদের বর্ণপরিচয়—শ্রীঅনাথনাথ বসু
প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮০৫-০৯)

বিশ্বভারতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্র ৩৮।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫৯৬-৯৯)

বিশ্বভারতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্র ৩৮।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫৯৬-৯৯) , ছবি-৩।

ভারতের শিক্ষা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ; ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (১২৫-২৭)

মুসলমান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—মৌলবী একরামুদ্দীন
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; ২ (৫০১-০২)

মেয়েদের লেখাপড়া—শ্রীকমলাকান্ত বসু
ব ১৭।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (৭৫১-৫০)

লিখন-পঠনক্ষম বাঙ্গালীর সংখ্যা—শ্রীসুশীল রায়
বং ৬।১।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৬১৩-১৬)

লোকশিক্ষা—শ্রীঅনাথনাথ বসু
ভা ২৬।১ ৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪৫০-৫২)

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের গোড়ার কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
প্র ৩৮।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ ২৩০-৩৩) ; [illegible]—১

শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি ভাবিবার কথা
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা
শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং তাহার ক্রম
উপসংহার
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৭ (১ ৯-১৩৫)

শিশুর গঠন ও পাঠনপ্রণালী—শ্রীনগেন্দ্রকুমার চৌধুরী
ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৩৫ ; পৃঃ ৩ (৬৫০-৪)

সেকালের পাঠশালা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়
বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১২ (৩০৫-১৬)।

৩৮(বাণিজ্য)

ডাকঘর—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়
ভা ২৬।১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ [৮৬৮-৭২ ; ছবি ৬
ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ [৮৫।৯৪] ; ছবি ১

ডাক টিকিট—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়
ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩১৫ ; পৃঃ ১১ [৭৬৭।৭৯] ছবি অনেক আছে
ভা ২৫।২।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ [৯৩৩।৯৯] ; ছবি অনেক আছে

ফলের ব্যবসা ও তাহার উপায়—শ্রীমতী প্রতিভা দাশ
ভা ২৬।৩।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৯২১।২৩]

৩৮(বাণিজ্য, গমনাগমন)

বাঙ্গালার পথঘাট ও অন্যান্য যোগসূত্র—সুশীল রায়
বং ৬।২।৪ , পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৯০।৯৪] ; রেখাচিত্র সম্বলিত

৩৮(ব্যবসায়)

ব্যবসায়ে জাতীয় কল্যাণ—শ্রীমন্মথনাথ সরকার
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [২২০।২৩]

সুয়েজ খাল—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বং ৬।২।৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ [৬৪৩।৪৮] , ছবি ৩ ;
মানচিত্র ১

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

২১

"হালো (Hallo)!"

উচ্চকণ্ঠে এই ধ্বনিসহ ছড়ী হাতে চুরুট মুখে শার্ট-শর্ট-পরা একটি যুবা মোকার্জ্জি সাহেবের বাড়ীর হল-ঘরে গিয়া উঠিল।

"কে ভিক্টর! এস—এস! ভাল আছ ত?" হাসি-মুখে পার্শ্বস্থ একটি গৃহ হইতে মিসেস সরকার বাহির হইয়া আসিলেন।

"Oh! dearest mother mine! How do you do?" চুরুট হাতে লইয়া পুত্র ভিক্টর মাতা মিসেস সরকারকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল। মাতাও প্রত্যালিঙ্গনে ও চুম্বনে পুত্রকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

"এস—এস। আছি একরকম ভালই। তা তোমার শরীর ভাল ত? এস।"

বলিতে বলিতে মিসেস্ সরকার হাত ধরিয়া পুত্রকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

"তা—কাল ষ্টেশনে কেন যাও নি? ভেবে আমরা বাঁচিনে। চিঠি লেখা হয়েছিল—এদ্দিন পরে আমরা আস্‌ছি—"

"Oh excuse me mother dear! কি জান, আমাদের নূতন ফিল্মটার সুটীং সুরু হয়েছে কি না—পার্টিটা নিয়ে বেরুতে হয়েছিল—বন্দোবস্ত সব আগেই হয়ে গিয়েছিল, put off করা সম্ভব হল না। তা—হাঃ হাঃ হাঃ—আসল কথা, মনেই আমার ছিল না কিছু। —সেই ক'দিন আগে চিঠি পেয়েছিলাম, এটা ওটা একশ' রকম কাজ দেখতে হয়, ভুলেই গিয়েছিলাম একদম। কাল রাতে যখন গিয়ে শুলাম, হঠাৎ মনে হল। তা সকালেই অমনি বেরিয়ে পড়েছি—ওরা সব রয়েছে—চালিয়ে নেবে এক রকম করে। এই যে রেজ্জী। আয়—আয়! ভাল আছিস্ ত?"

ত্রস্ত উঠিয়া ভিক্টর ভগ্নী রেজিনাকে চুম্বন-আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিল।

"Oh you are a darling Regin! I congratulate you with whole heart and soul. সব শুনেছি—it has been a very nice match and a nicer catch to boot! হাঃ হাঃ হাঃ—"

রেজিনার ললাটে যেন একটু ভ্রূকুটি উঠিল। Match-এর সঙ্গে স্পষ্ট এই catch কথাটা সে বোধ হয় পছন্দ তেমন করিল না—কেহই করে না, যদিও মনে মনে ইহারা সকলেই জানে এ সব match-এ এই catch-টাই অনেক বড় কথা, আর মনের অন্তরে নিজেদের যে congratulate নিজেরা করে, তাহা এই catch-টারই কদরে বেশী।

যাহা হউক, বিরক্তির ভাবটা চাপিয়া মুখে যথা-সাধ্য কিছু মিঠা হাসি তুলিয়া রেজিনা ভ্রাতাকে সময়োচিত শিষ্ট-সম্ভাষণাদি করিয়া কহিল, "তা এসেছ এদ্দূর থেকে—এক কাপ চা আর কিছু খাবার টাবার—"

"হাঁ, হাঁ—that's just like the lady of the house. Thank you! হাঁ, a cup of hot steaming tea আর কয়েক টুকরা টোষ্ট-কোষ্ট কিছু will be very welcome. Really I am very tired, and hungry as a famished beast after the long drive in a jerking car."

রেজিনা ঘণ্টাটা টিপিল। পরিচারক আসিয়া সেলাম করিল ও আদেশ লইয়া বাহির হইয়া গেল। ভিক্টরও তাহার মাতার সঙ্গে উঠিয়া বাড়ীটার এদিক্ ওদিক্ একটু দেখিয়া লইতে বাহির হইল।

"বাঃ! খাসা বাড়ী ত! Stylish যেমন হতে হয়! Really it has been a very lucky catch for Regina. How could you manage it I

wonder ! Rooms enough and to spare. বোধ হয় একটু যায়গা আমাকেও দিতে পারবে রেজিনা। কি বল? আমার ঐ ফ্লাটটুকু—why it is no better than prison cell compared with this."

মাতা কহিলেন, "তা থাকবে বই কি ভিক্টর, থাকবে বই কি। আমরা যদ্দিন আছি, ধীরেশ যদ্দিন না ফেরে, থাকতেও হবে—তুমিও থাকবে বই কি? এসেই এখন এত বড় বাড়ী দিয়ে রেজিনা একা কি করবে?"

"My God !"

হঠাৎ উপরের বারান্দায় মীনাকে একবার দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়ে ভিক্টর চাহিয়া রহিল।

"My God !—I am—I am—why deuce take me if it is not our Sakuntala, the sweetest darling, the talk of the whole town. ! Why how comes she here ?"

"শকুন্তলা! সে কি?—ও যে মীনা—রেজিনার ননদ—ধীরেশের বোন!"

"Oh I see! How very lucky !"

"ওকে তুমি চিনলে কি করে? শকুন্তলা কি?"

"শকুন্তলা ফিল্ম তোমরা দেখ নি? কি করে দেখবে? এই ত সবে—মাস দুই হ'ল সুরু হয়েছে —the most attractive and sensational film of the day! ও যে তার leading star!"

"ষ্টার! ওমা, সে কি! ও কি ফিল্মে প্লে করে না কি?"

"না না, ঠিক professional star নয়। একটা amateur play ওরা করেছিল। খাসা উতরে ছিল, —তাই একটা ফিল্ম-কোম্পানী ছবিতে তুলে নেয়। সুটিং যখন হয়, আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখেছি। But now mum! I have got an idea in my head." "হাঁ, ভাল কথা! Where's that dear old fellow dad! তাকে দেখছি না যে, কোথাও বেরিয়েছে বুঝি?"

মাতা কহিলেন, "হাঁ, এই ত ধীরেশদের আফিসে গেছেন। হিসেব-পত্র সব দেখবেন, কাজকর্ম্ম কি ভাবে চলবে, কি ভাবে এখন চলছে সব বুঝে নেবেন। ধীরেশ ত আসতে পারে নি, তাঁকেই এখন সব দেখতে হবে কি না—"

"O I see! That's welcome news! তা হলে মোকার্জ্জির ফার্ম্ম (firm) আর আর সব income বাবার control এই এখন ত?"

"ধীরেশ যদ্দিন না ফেরে—"

"কবে ফিরবে সে?"

"এই ত ক'মাস পরে পরীক্ষেটা দেবে,—পাশ হলেই আসবে। এসে তাকেই ত এখন বাপের যায়গায় বসতে হবে।"

"পাশ হয়েই তবে আসতে হবে, নইলে আসতে পারে না। Well, I wish he will not pass very soon and come back to deprive father of his lucky job and it's lucky for us all."

"ও সব কথা ব'লো না ভিক্টর। রেজিনা শুনলে কি ভাববে!"

"She is not going to hear. I am not a fool and know when and where to keep a discreet tongue in my head."

"ভিক্টর!"

রেজিনার কণ্ঠস্বর উঠিল। মাতা ও পুত্র উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন।

"My God! ও—চা হয়েছে বুঝি? চল, যাওয়া যাক্। হাঁ, ঐ শকুন্তলার কথার কোনও hint এখুনি দিও না যেন ওকে। I am thinking of some thing—well, all in good time. There's no hurry about it now."

"ভিক্টর!"

"যাচ্ছি, রেজী ডিয়ার!"

উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চা ইত্যাদি সব প্রস্তুত ছিল। ভিক্টর অতি আনন্দে ও আগ্রহে আহার-পানে বসিল।

২২

সরকার সাহেব তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন। আসিয়াই কেমন হতাশ ও অবসন্ন ভাবে একখানি চেয়ারে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

"Well, daddy dear! How do you do?" উঠিয়া ভিক্টর করমর্দ্দনে পিতাকে সম্বর্দ্ধনা করিল।

"এই যে ভিক্টর! কখন এলে তুমি?"

"এই ত খানিকটা আগে। কাল ষ্টেশনে যেতে পারি নি—the fact is I was out and—and—"

"হুঁ!" এই মাত্র উত্তর করিয়া সরকার সাহেব রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম পুঁছিলেন।

সরকার বিবি ও রেজিনা কেমন একটু বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন। বিবি একটা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে? দেখে শুনে সব এলে?"

"এলাম। কিন্তু hopeless—সব একদম hopeless!"

"Hopeless!—Hopeless—তার মানে?"

"মানে—যা ভেবেছিলাম—তা কিছুই নয়। We have deen deceived—most damnably deceived! ধীরেশ একদম আমাদের ঠকিয়েছে! বুঝতে পারি নি তখন—all that glitters is not gold!"

রুদ্ধস্বরে রেজিনা বলিয়া উঠিল, "খুলেই বল না সব? কেন, কি হয়েছে? ও ফার্ম্ম কি ধীরেশের নয়?"

"ফার্ম্ম ধীরেশেরই বটে। বাপের ছিল—নামও ছিল মোকার্জ্জি এণ্ড সন্। বাপ নেই, পার্টনার (অংশী) আর ওয়ারেস হিসেবে ছেলে ধীরেশই এখন মালিক। তা এ ত আর জমিদারী নয়, ব্যবসা। আয় যা হয়, কাজকর্ম্মে। সেই কাজকর্ম্ম চালাত মোকার্জ্জি—যোগ্যতাও ছিল। আয়ও বেশ হত। তা ছাড়া আবার expert advice আর guidance অনেকে চাইত; তাতেও নিজের উপরি একটা আয় বেশ একটা ছিল। এই যেমন বোম্বে গিয়েছিল, কোন্ একটা ব্যাঙ্কের হিসেব-পত্র না কি ঠিক করে দিতে। টাকাও বেশ পেত। তা এ সব আয় ত তার সঙ্গে সঙ্গেই গেল।"

বলিয়া সরকার আবার কপালের ঘাম মুছিয়া একটু কাসিলেন।

রেজিনা কহিল, "সে যা যাবার গেছে—যাবেই। কিন্তু ফার্ম্মটা ত আছে, তা থেকে ত বেশ একটা আয় তাঁর হত।"

"হত। কাজকর্ম্ম নিজে দেখত—হত। হিসেব দেখলাম তা থেকে মাসে সাত শ' করে টাকা সে নিত। অন্য খরচপত্র সব চালিয়ে তার বেশী নিতে পারত না।…তা এখন—"

"এখন—কি? ওটাও আমরা পাব না?"

"ওরা ত বলে তা দিতে পারে না। কাজকর্ম্ম বাঁধা যে সব আছে, চালিয়ে ওরা নিতে পারলেও উপরে qualified লোক একজন চাই, দায়িত্বটা যার মাথায় থাকবে, সই-টই যে দেবে। ওরা ব'লছে, মাসে তিনশ' টাকার কমে এ রকম লোক একজন পাওয়া যাবে না। মোকার্জ্জির অভাবে আয়ও হয় ত কিছু কমবে। তবু ব'লছে, মাসে চারশ' টাকা ক'রে familyকে আপাততঃ দেবে—"

"আর ধীরেশের খরচ?"

"তাও ও থেকেই দিতে হবে—extra এটা কোত্থেকে ওরা দেবে?"

"কি সর্ব্বনাশ! আড়াইশ টাকা ক'রে তাকে পাঠাতে হবে বলেছে; আড়াইশ না হ'ক অন্ততঃ দু'শ টাকার কমে ত তার চলবেই না। বাকী থাকবে a paltry sum of—"

"Only one hundred and fifty or at the most two hundred!"

রেজিনার বিবর্ণ মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

"দেড়শ' কি দু'শ' টাকা কুল্লে! কি ক'রে আমি চালাব। এই বাড়ীটার এই establishment—"

"বাড়ীও তার নিজের নয়। ভাড়া করে ছিল।"

"বাড়ীও ভাড়া বাড়ী? Hopeless! সত্যই একে-

বারে horribly hopeless. We have been—we have been really deceived—most abominably diceived !"

রেজিনা প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার মত মত হইল। অবসন্নভাবে চেয়ারের পিঠে গা ছাড়িয়া দিল।

"স্মেলিং সল্ট, স্মেলিং সল্ট !"

সরকার সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে সরকার-বিবি ত্রস্তে গৃহান্তরে আসিয়া স্মেলিং সল্টের একটা শিশি লইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে রেজিনার নাকের কাছে ধরিলেন।

"ব্রাণ্ডী ! ব্রাণ্ডী ! a drop of brandy to save her—কোই হ্যায় ?"

ভিক্টর লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য ছুটিয়া আসিল, আদেশ পাইয়া ব্রাণ্ডীর বোতল, গ্লাস ও জল আনিয়া রাখিল। ভিক্টর ড্রাম দুই ব্রাণ্ডী একটুখানি জলে মিশাইয়া ভগ্নীর মুখে ঢালিয়া দিল। তার পরে পুরা একপাত্র নিজে পান করিল।

"I am sure you too want a sustaining peg, daddy dear"—বলিয়া আর এক পাত্র পিতার হাতে দিল। বেপথুমানা মাতার দিকে চাহিয়া মনে হইল তাঁহারও স্নায়বিক বলাধান কিছু প্রয়োজন। দুই তিন ড্রাম একটু জলে মিশাইয়া তাঁহার হাতেও দিল। পিতার হাতে একটা চুরুট বাহির করিয়া দিয়া নিজেও একটা ধরাইল। এই শক্ (shock)টা সকলেই তখন কিছু সামলাইয়া উঠিলেন।

মিসেস সরকার কহিলেন, "তা এত রোজগার করেছে এত দিন। টাকা অবিশ্যি বেশ কিছু জমিয়েছে। তার হিসেব-টিসেব কিছু দেখলে ?"

"কিছু নেই।—বাড়ীতে ত কাগজ পাওয়া গেল না কিছু। আফিসেও কিছু নেই, বরং দেনাই ঢের বেরিয়েছে।"

সোজা হইয়া রেজিনা উঠিয়া বসিল। আরক্ত চক্ষু তুলিয়া কহিল, "দেনা ! আবার দেনাও আছে ? কত টাকা দেনা হবে ?"

"তা—হাজার কুড়ির কম হবে না।"

"হাজার—কুড়ি !—কে এই দেনা এখন শুধবে ?"

"ইন্সিওরেন্স আছে ত্রিশ হাজার টাকার। দেনাটা তা থেকেই শোধ যাবে।"

"গিয়ে থাকবে ত ব্যালান্স কুল্লে দশ হাজার ?"

"হাঁ, সেটা ত কিছুই নয়। ভেঙ্গে খেলে-বা কদিন। আর ব্যাঙ্কে রাখলে সুদই বা কি হবে ? এক চিমটি নস্যি মাত্র।"

"মীনার জন্যে provision কিছু আছে ?"

"না। দেখতে ত পাওয়া যাচ্ছে না কিছু।"

"Who will keep her then ? আমি পারব না। ধীরেশ এটা প্রত্যাশাই করতে পারে না, এই আয় থেকে আবার তার মেয়েকে আমি পুষব। তার পথ নিজেকে তাকে দেখতে হবে।"

"সেটা—"

সরকার সাহেব মাথা চুলকাইলেন।

"সেটা—কি ? কি বলতে চাও তুমি ? এত বড় মেয়ে—কেন কোনও provision তার জন্যে করে রাখেন নি ? A reckless spendthrift and senseless fool ! দু'হাতে টাকা লুটেছে—আর ভাবে নি যে একটা মেয়ে তার ঘরে আছে,—তার keeping আছে, education আছে, marriage আছে, দুঃখের কথায় কিছু হয় না। সে যা করবার করে যায় নি, এখন ওর দায়ভার নিতে হবে আমাকে ? না, সে আমি পারব না, পারতেই পারি না ! সে responsibility-ও আমার নয়। তবে হাঁ—তেমন একটা আয় থাকত, family consideration একটা আছে—তা থেকে moral responsibilityও যে একটা আসে, সেটা shirk করতে আমি চাইতাম না। এই establishment ভেঙ্গে দিয়ে কোথায় কোন্ ফ্লাটের খোপরে গিয়ে মাথা গুঁজতে হবে—একখানা car পর্য্যন্ত রাখতে পারব না—society-তে বেরোতে হ'লে হয় পায়ে হেঁটে কি ভাড়াটে ট্যাক্সীতে—O what a shame—what disgrace ! And this is my married lot so highly talked of ! I wish I could get a divorce."

"Divorce! বলিস্ কি রেজিনা তাও কি হয়?" মাতা বিস্মিতভাবে চাহিলেন।

রেজিনা কহিল, "Why not? He married me under false pretences. That ought to be sufficient ground for divorce!"

হো হো করিয়া ভিক্টর হাসিয়া উঠিল—"You are a fool to talk of divorce Regin, I don't know if you can get a divorce on this ground. Even if you can, what after the divorce? Dhiresh at least has a future and can expect a better match? Do you know what you are? Never was a great beauty and now past the freshness of youth—almost a worn-out faded jade!"

"Take care what you say, Victor! How dare you—how dare you insult me with words which no woman born could ever forgive! Insult me, the mistress of the house and you are but a guest! Just clear out I say, bag and baggage! You can no longer be tolerated in my house."

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া রেজিনা উঠিয়া দাঁড়াইল; বজ্রদৃষ্টিতে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে এই উক্তি করিল।

"Your house! Pshaw! your house! And whose will it be to-morrow pray?

বিদ্রূপের বক্রহাসি ভিক্টরের মুখে ফুটিয়া উঠিল।

আরও উত্তেজিত হইয়া রেজিনা কহিল, "Yes mine! Today it is mine, and I order you just to clear out!"

বলিয়াই রেজিনা বাহির হইয়া গেল। মা থরথর কাঁপিতেছিলেন; পিতা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভিক্টর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মিসেস্ সরকার একটু সামলাইয়া লইয়া শেষে কহিলেন, "এখন কি হবে?"

গম্ভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সরকার সাহেব কহিলেন, "সব ভেস্তে গেল। কি ভাবলাম, কি হল? উপায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চারশ' টাকা ওরা দেবে, দু'শ' আড়াই'শ' করে আবার ধীরেশকে পাঠাতে হবে। রইল কুল্লে দেড়শ' দু'শ! অবিশ্যি রেজিনা ছোট একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট নিয়ে নিজেরটা কোনও মতে চালিয়ে নিতে পারবে—ধীরেশ যদ্দিন না ফেরে। তবে আমাদের আলগা হয়েই পড়তে হবে। আপাততঃ কলকাতায় —তবে—হাঁ, রেজিনা যদি আমাদের সঙ্গে এসে থাকে, তার এই incomeটা—"

"আমাদের সঙ্গেই থাকবে বই কি। একটা establishment হলে তারও সুবিধা হবে, আমাদেরও সুবিধা হবে। বুঝিয়ে তাই বলা যাবে, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হক।"

"তারপর ঐ মেয়েটা—তাকেই বা কি করে বলা যায় তোমার পথ এখন তুমি দেখ? ধীরেশই বা শুনে কি বলবে?"

"রেজিনাই বা কি করতে পারে? এই আয়ে আবার ওর ভার সে নিতে পারে? ধীরেশই বা কি বলতে পারে তাকে? রেজিনাও ত' সত্যি জল তুলে, ঘুটনো কুটে, মশলা পিষে নিজের হাতে রেঁধে খেয়ে, বাসন-কোসন মেজে একটা খোলার ঘরে গিয়ে থাকতে পারে না। অন্ততঃ চলনসই একটা respectable styleএ respectable একজন লেডীর মত থাকতে তাকে হবেই। বেশ ত' ধীরেশ পারে নিজে একটা ব্যবস্থা বোনের করে দিক না?"

"কোত্থেকে দেবে? সে যা পড়ছে, তার খরচ বড় বেশী। এই টাকাতেই কি করে কুলোবে ভাবছি। হয়ত লিখবে ঐ টাকাতেই দুজনে এক সঙ্গে যে ভাবে পায় থাক।"

"বললেই অমনি হল? রেজিনাকেও তা হলে শক্ত হয়ে বলতে হবে, সে তা পারবে না। হাঁ! সত্যিই ত আর সেকেলে সেই সব কনেবউগুলোর মত একটা দাসী সে তার বাপের ঘরে আসে নি! Respectable lady—বিয়ে করেছে—এখন সেই ভাবেই তাকে তার রাখতে হবে।"

"তা বটে, তা বটে, তবে কি না—"

সরকার-বিবি কহিলেন, "তোমার ও নিয়ে এত মাথা

ঘামাতে এখুনি হবে না। ওদের দায়, ওরা স্বামী-স্ত্রীতে বুঝে যা হয় করুক গে।"

"লেখা-লিখি করে বুঝে নিতে দু'তিনটে মাস যাবে। এ বাড়ী ত' ছেড়ে দিতে হচ্ছে। দিয়ে দেড়শ' দু'শ' টাকার একটা establishment-এর ভেতর গুটিয়ে আনতে হবে সব হদ্দ হপ্তা খানেকের ভেতর। ওকে যা হয় একটা কিছু এখুনি ত বলতে হবে।"

"সে রেজিনা এখন তার নিজের mistress, তার আর বুঝে ব্যয় বুঝে যা করতে হয় করুক, বলতে যা হয় বলুক। আমরা এমন advice দিতে পারি না যে, ওর ভার তোমাকে নিতেই হবে। আর আমাদের সঙ্গে যদি সে গিয়ে থাকে, আমার সে সংসারে ওকে আমি নিয়ে রাখতে পারব না। হাঁ, সোজা এই কথা আমি বলে দিচ্ছি!"

বলিয়াই মিসেস্ সরকার উঠিলেন। বাহিরে যাইতে যাইতে ফিরিয়া ভিক্টরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি তা'হলে এখন কি করবে ভিক্টর?"

চক্ষু বুজিয়া চেয়ারে হেলিয়া ভিক্টর চুরুট টানিতেছিল। চুরুটটা হাতে লইয়া উত্তর করিল, "Needn't bother! Let Regie go to hell—I don't care!—With regard to that poor girl—you needn't be fussing so much about her. I am going to take charge of her."

"Take charge of her? What do you mean, Victor."

বিস্মিত দৃষ্টিতে পিতা চাহিলেন।

ভিক্টর কহিল, "Well, I mean to propose and marry her—after due formalities of love-making and courtship—of course hurrying through these as far as possible."

"But how do you propose to keep her, I pray? You can't expect me to—to—"

"No, I don't expect it, nor thinking of it either. I know you can't."

"What then? Have you discovered a gold mine?"

"Yes, in a sense. And that gold mine is the girl herself."

"কি আবোল-তাবোল বকছ ভিক্টর? হাঁ, মেয়েটা দেখ্তে ভাল। A nice girl I admit. But gold mine! হাঁ, ওসব রোমান্টিক্ ভণিতে কচি-কাঁচা সব ছোকরা আর কবিদের মুখে মানায়।—But you are neither such a raw youth nor a poet."

"I know I am not. But I know she can earn a mint of money and I can make her do it."

"তার মানে?"

"মানে—Well, I gave some hint to my mother—when I came and had a glimpse of her just outside on the verandah."

"কি, ও ব'লছে কি এ সব?" বলিয়া সরকার সাহেব স্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

মিসেস সরকার কহিলেন, "বলছিল, ও না কি কোন্ ফিল্মে প্লে করেছিল, শকুন্তলা হ'য়েছিল—খুব নাম হ'য়েছে তার। ব'লছিল আমাদের নিয়ে দেখিয়ে আনবে।"

"বটে! ও কি তবে ফিল্ম-ষ্টার একজন—মোখার্জ্জির মেয়ে—a respectable Bengali girl!"

ভিক্টর বলিল, "অনেক respectable Bengali girls এখন ফিল্ম-ষ্টার হচ্ছে। তবে ও professionএ এখনও ঢোকেনি, এমেচার ভাবে ঐ ফিল্মটায় ছবি দিয়েছিল। And it was a tremendous success!"

"তাহ'লে তুমি বিয়ে ক'রে ওকে ফিল্ম-ষ্টার ক'রে নিতে চাও তোমার কোম্পানীতে?"

"হাঁ, তাই-ই চাই বটে। And that's the gold mine—I have discovered in her!"

"But would that be very respectable Victor? Husband of a film star and—making one's own wife a film star?

"Well, filmstarring and making one's wife a filmstar are quite respectable in Europe. There are instances in India too. And why shan't I follow suit if an opportunity comes?"

"দেখ!—তবে আমি খুব like করছি নি এটা।"

"I care a fig for your likes and dislikes! It's my business and don't bother."

বলিয়া ভিক্টর উঠিল। কহিল, "খাওয়া-দাওয়াটা তাহ'লে হোটেলে গিয়েই করব? রেজী ত হুকুম দিয়ে গেল, বেরোও আমার বাড়ী থেকে এখুনি।"

মাতা বলিয়া উঠিলেন, "না না, তাও কি হয় ভিক্টর? কতদিন পরে দেখা হ'ল, এলে আমাদের কাছে, আর থেতে যাবে হোটেলে! ও—রেজীর কথা ছেড়ে দাও—রাগ হলে ওর জ্ঞানকাণ্ড কিছু থাকে না। ওসব মনে রেখ না কিছু। সত্যি কি সে তোমাকে খাবার টেবিল থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে?"

"চাইলেও পারবে না। If she tries, we shall have a regular fight! আচ্ছা, তা'হলে আসি একটু ঘুরে। That's a dear ma—there!" বলিয়া মাতার মুখে একটু চুম্বন অঙ্কিত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

২৩

সন্ধ্যার পর ডিনারে সেদিন রেজিনা আসিল না; শয়নগৃহেই তার ডিনার প্রেরিত হইল। মন ভাল ছিল না, তা ছাড়া ভিক্টরের সঙ্গে মুখামুখি তাহার আর একটা বাক্-দ্বন্দ্ব ঘটে, ইহাও সে পছন্দ করিতেছিল না। সে জানিত ভিক্টর সহজে অমন এক কথায়ই যাইবে না, যাইতে চাহিলেও মাতা তাহাকে যাইতে দিবেন না। এক টেবিলে আহারে গিয়া বসিলে ছুঁতানাতায় ভিক্টর ঘা দিয়া তাহাকে রূঢ় কথা বলিবেই; সেও তাহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না। মীনার সম্মুখে এরূপ অশোভন কোনও দৃশ্য আদৌ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। ডিনারটা বেশ শান্ত ভাবেই কাটিয়া গেল। যেরূপ কায়দায় বা বে-কায়দায় পিতামাতার সঙ্গে সাধারণ ব্যবহারে সে চলিত, সেরূপ কিছুই তাহার আচরণে তখন প্রকাশ পাইল না। বেশ ধীর সংযত পরিমার্জ্জিত শিষ্টভাবেই সে কথাবার্ত্তা বলিল, সুমিষ্ট আলাপেই মীনাকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিল। ইঙ্গ-বঙ্গাদর্শানুযায়ী শিষ্ট বাঙ্গালী সমাজে কি কায়দায় চলিতে হয়, কি ভাবে কথা বলিতে হয়, সে তাহা বেশ জানিত এবং প্রথম এই সাক্ষাতে পরিমার্জ্জিত-রুচি, সুবুদ্ধি ও 'সু-শীল' একজন ভদ্রলোক বলিয়া তাহার সম্বন্ধে মীনার একটা ধারণা যাহাতে জন্মে, এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মীনার চিত্তেও সেইরূপ একটা ধারণা জন্মিল, যদিও তার দৃষ্টিভঙ্গী সে বড় পছন্দ করিতেছিল না।

পরদিন সকালে তার শয়নগৃহে মীনাকে রেজিনা ডাকিয়া পাঠাইল। একখানি কৌচে রেজিনা অর্দ্ধশায়িতা ছিল; সম্মুখে একখানি চেয়ারে মীনাকে বসিতে বলিল।

"হাঁ, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, কয়েকটা কথা বলতে হবে।"

"বলুন।"

রেজিনা কহিল, "কথাগুলো বিশেষ প্রীতিকর আমার পক্ষে নয়, তোমার পক্ষেও বোধ হয় হবে না। তবে situation যা দাঁড়িয়েছে, তাতে চাপাচুপি দিয়ে কিছু রাখা সম্ভব নয়, লাভও কিছু নেই তাতে। খোলাখুলি ভাবেই কথাবার্ত্তা সব বলে একটা মীমাংসা করে আমাদের নিতে হবে।"

"বেশ, তা' হলে বলুন যা বলতে চান।"

ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া রেজিনা কহিল, "তোমার পিতা তাঁর affairs সব কি ভাবে ফেলে গেছেন, জান কিছু?"

"না। বিশেষ কিছুই জানি না।"

"এ বাড়ী তাঁর নিজের নয়।"

"জানি।"

"কিন্তু এই establishmentটা বড় বেশী expensive। ধীরেশ এখুনি এসে তাঁর ফার্ম্মের চার্জ্জ নিতে পারছে না, কদ্দিনে পারবে তাও জানি না। তিনিও এমন কিছু রেখে যান নি, ব্যবস্থাও এমন কিছু করে যান নি, যাতে এই establishmentটা আমি এখন রাখতে পারি।"

"সম্ভব।"

রেজিনা কহিল, "আয় তাঁর না কি যথেষ্ট ছিল, হিসেব করে একটু সংযত হয়ে চললে রেখেও যেতে পারতেন বেশ কিছু। কিন্তু তা চলেন নি। দু হাতে খরচ করেছেন, বলতে বাধা হচ্ছি মীনা, rather beyond his means. রেখে গেছেন এক রাশি দেনা—বিশ হাজার টাকার!"

মীনা বলিয়া উঠিল, "এ সব আমাকে এখন বলবার এমন দরকার কিছু আছে ?"

"আছে, তাই বলছি। শুন্‌তে হবে তোমাকে, অবস্থা-টাও বুঝে নিতে হবে। বিশ হাজার টাকা দেনা ; তার against এ asset কিছুই নাই। তবু ভাগ্যিস ভাল insurance গোটা দুই না কি আছে। সে টাকাটায় দেনা শোধ গিয়ে হাজার দশেক টাকা না কি থাকতে পারে। সেটা—বুঝতেই পারবে—যদি হিসেব একটু থাকে—এ সংসারের পক্ষে কিছুই নয়। আর অতি দুঃখের কথা, অপ্রিয় হ'লেও বলতে হচ্ছে আমাকে—তোমার জন্যেও provision(ব্যবস্থা) কিছু করে যান নি, যেটা—যেটা—না কি—"

"থাক, আর বলতে হবে না কিছু। Provision করে যান নি কিছু, শুনলাম, এই যথেষ্ট।"

রেজিনা একটু ভ্রূকুটি করিল।

"বেশী কথা আমিও বলতে চাই না কিছু। এটা আমার concern কিছু নয়, যা কিছু তোমার। তবে establishment এর (সাংসারিক ব্যবস্থার) কথা হচ্ছিল, সেটা ব'লে আমার কথা আমি শেষ করতে চাই। হাঁ, ফার্ম্ম থেকে ওরা জানিয়েছে, উনি যেটা draw করতেন, সেটা ওরা এখন আর দিতে পারে না। Expert লোক একজন মাইনে করে রাখতে হবে, ধীরেশ না যদ্দিন এসে চার্জ নিতে পারে। দিতে পারে সবে চারশ টাকা মাত্র মাসে। তা থেকে ধীরেশের খরচ পাঠিয়ে দেড়শ' দু'শ টাকার বেশী বাঁচে না। সুতরাং এই establishment চলতেই পারে না। যেখানেই হক, অতি মডারেট ষ্টাই-লের একটা establishment নিয়ে কোনও মতে আমাকে থাকতে হবে। তার ভেতর কোনও ডিপেণ্ডেণ্টকে আমি রাখতে পারি না।"

"ডিপেণ্ডেণ্ট !"

"বললাম ত' কোনও 'প্রোভিশন' তোমার পিতা তোমার জন্য ক'রে যান নি।"

"ও! তা হ'লে আমিই আজ এ সংসারে একজন ডিপেণ্ডেণ্ট !"

চোখমুখ মীনার অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল।

"আমি—এই ঘরের মেয়ে—বাবার অভাবে দাদা বর্ত্তমান র'য়েছেন বাবার সম্পত্তির আয় থেকেই সংসার এখনও চলছে, আর সেই সংসারে আমি একজন ডিপে-ডেণ্ট !"

"Very sorry মীনা! তবে positionটা আজ তাই-ই বটে! যে আয় থেকে সংসারটা এখন এই ভাবে চালাতে হচ্ছে, তার উপরে, যতদূর জানি, legal claim বোধ হয় তোমার কিছুই নাই। তবে, হাঁ, একটা moral obligation—তা সামর্থ্যে যদি না কুলোয়, কে কি করতে পারে ? বলেছি সামর্থ্যে আমার কুলোবে না।"

"দাদা—"

বুক ভাঙ্গিয়া চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল। এই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়াই মীনা থামিয়া গেল। রেজিনা কহিল, "বেশ, ইচ্ছা হয়, তোমার দাদাকে লিখতে পার। যদি পারে সে, আলাদা একটা ব্যবস্থা তোমার করে দেবে।"

"তা'হলে বলতে চাও রেজিনা—বাবার মেয়ে আমি তাঁর এই সংসার থেকে বেরিয়ে আজ পথে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে. দুদিন আগে যার বড় এ সংসারে কেউ ছিল না !"

রেজিনা উত্তর করিল, "দু'দিন আগের conditions (অবস্থা) আজ আর নেই মীনা! আজ এ সংসার তোমার বাবার নয়, আমার।"

"তোমার না দাদার ?"

"But I am the mistress. কি ভাবে সংসারটা চালাব না চালাব, কাকে রাখব না রাখব, সেটা অবস্থা বুঝে আমাকেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ধীরেশের কোনও interference এর ভেতর চলতেই পারে না। আমিও সেটা tolerate করতে প্রস্তুত নই। Now I have had my say. এখন তুমি কি করবে নিজে বুঝে দেখ। এ নিয়ে আর কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন। সেটা তোমার আর আমার দু'জনের পক্ষেই সমান অপ্রিয় হবে!"

বলিয়া ঘণ্টাটা টিপিল। মীনা আর কথাটি না বলিয়া বাহির হইয়া আসিল। [ক্রমশঃ

পূজার বাজার

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

পূজার বাজার। কলিকাতার নানা স্থানের বিপণিশ্রেণীর সমারোহ-সজ্জার অবধি নাই। বিবিধ বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারে বিপণি স্তরে স্তরে শোভিত। দ্রব্যাদি ক্রয়কালীন ক্রেতার সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভাব না ঘটে, তাহা মনে রাখিয়া তাহার যথাযথ ব্যবস্থা বিক্রেতা করিয়াছে। মহিলা খরিদ্দারের সুবিধার জন্য বিপণি-কক্ষের অংশবিশেষ নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। বিপণির সম্মুখে অসংখ্য জনতা। ভিতরের জনতাও বড় অল্প নহে। বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান উৎসব এই দুর্গোৎসব—জনতা না হইয়া যায়!

ক্রেতৃমণ্ডলীর মধ্যে কচিৎ এক আধ জন ব্যতীত কাহারও মুখে কিন্তু উৎসবানন্দের চিহ্নমাত্র নাই। ক্রয়-কার্য্যে ভাবনা ও বিরক্তি-ভাবের আভাস উৎসবানুরক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই নহে। মণ্ডলীর প্রায় সকলের মুখেই সেই চিহ্ন বর্ত্তমান। অভাব, অনটন সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া। কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকাও ঘোর সমস্যার বিষয়। এ অবস্থায় উৎসবে মাতিয়া আনন্দ করা অস্বাভাবিক। বিশ্বজননীর শুভাগমন-সঙ্কেত দিকে দিকে প্রচারিত। যুগ-যুগান্তরের দৃঢ়ীভূত সংস্কারবশতঃ প্রাণে তাহা চাঞ্চল্য আনিলেও, দারুণ অভাবের অবসাদে ক্ষীণভাবে জাগিয়াই তাহা মিলাইয়া যায়, চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পরিণত হইয়া। উহাদেরই মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান্ তাহারাই বিপণিশ্রেণীর 'ভাগ্যবিধাতা'। বিধাতাই যদি অক্ষম বা অল্পক্ষম হয়, ফল শুভ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

এই 'বিধাতা'র সামর্থ্য উত্তরোত্তর ক্ষীণ হওয়াতে ব্যবসায়ীর অবস্থা ভীষণ; কিন্তু তবুও ব্যবসায় বন্ধ করা যায় না। খরিদ্দারের ক্রয়শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সস্তাগণ্ডার চটকদার মালের আমানতই অধিকাংশ ভাবে দোকান-দারকে করিতে হয়। অভাবগ্রস্ত হইলেও খরিদ্দার মোটা-সোটা টেক্‌সই দ্রব্যের পক্ষপাতী নহে - চাকচিক্যের প্রতিই তাহার ঝোঁক বেশী, তাহাতে টাকা উশুল হইবে না জানিয়াও। চাকচিক্যপ্রিয় খরিদ্দারের মনোরঞ্জন করিতে বিক্রেতার যত্ন—কেবল মালপত্রে নহে, দোকান সাজাইতেও অসীম। সন্ধ্যা-সমাগমে বৈদ্যুতিক আলোক-মালার সাহায্যে বিপণিশ্রেণী যেন ইন্দ্রালয়ে পরিণত। সুবৃহৎ কাচাবরণ সংযুক্ত বিপণির গবাক্ষে সজ্জিত ইন্দ্রালয়-ঐশ্বর্য্যে জনমন মুগ্ধ। 'বিধাতা'র উপর ব্যবসায়ীর ইহা কলম চালান—'খোদার উপর খোদকারি'। কালমাহাত্ম্যে ইহা ফলপ্রদ। বিপণিসজ্জা, চলচ্চিত্র-সমারোহ, চিত্র-বিচিত্র 'পূজাসংখ্যা' ও 'সার্ব্বজনীন পূজা'র ডামাডোল এখনকার পূজার বাজারের বিশেষত্ব। এ বাজার দেখিয়া বাহিরের কেহ বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর দুঃখ-দৈন্যের কথা কল্পনাও করিতে পারিবে না। ইহার উপর বাঙ্গালী মোটা মাহিনার চাকুরে ও আইনজীবী এবং চিকিৎসকের ফিস্-এর বহর দেখিলে বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থার কথা যদি কেহ তাহা-দিগকে জানায়, সে কথায় তাহারা সম্ভবতঃ আস্থা স্থাপন করিবে না।

পূজার বাজারের অন্য দিক্—বাবুসাহেবদিগের বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাত্রা। পূজায় তাঁহাদিগের একমাত্র করণীয় ইহাই। আত্মীয়স্বজনকে পূজা বলিয়া একখানা মিলের মোটা কোরা-কাপড় দিবারও বালাই নাই। অজুহাত এ বাজারে টাকা ছড়াইয়া দিবার অবস্থা কাহার আছে! কোম্পানীর পেট ভরাইতে, এ অমুক রং অমুক হোটেলের চাপরাশিকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহাদিগের জন্য বোধ হয় নূতন মিণ্ট গজাইয়া উঠে। মজার কথা, ইঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ জাতীয়তাবাদের পাণ্ডা। নিকট-আত্মীয়কে সর্ব্বপ্রধান উৎসবে একখানা কাপড় দিতে যাঁহারা কাতর, তাঁহারা সমগ্র জাতিকে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে উদ্যত!

পূজায় বাঙ্গালীর এই অবস্থা ও মনোভাব দর্শনে অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বের অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। বাঙ্গালীর অর্থোপার্জ্জন-শক্তি তখন এখনকার তুলনায় অনেক কম।

তবে বাঙ্গালী তখন দেশ ভুঁই খোয়ায় নাই। সব খোয়াইয়া বাঙ্গালী তখন কেরাণীর জাতিতে পরিণত হয় নাই। মাথা গুঁজিবার এবং দুই বেলা দুই মুঠা পেটে দিবার সংস্থান প্রায় সকলেরই ছিল। তাহা যাহাদের ছিল না, তাহাদেরও প্রাণে একটা অগাধ বিশ্বাস ছিল অনাহারে রাখিয়া ভগবান তাহাদিগকে মারিবেন না। ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়াইয়া বিশ্বাসীর বিশ্বাস ভঙ্গ হইতে দেয় নাই। আপনার জাতির সকলেই এক গোষ্ঠীর—ইহাই ছিল তাহাদের বদ্ধমূল ধারণা। গোষ্ঠীর কেহ অভুক্ত থাকিবে ইহা তাহাদের কল্পনাতীত ছিল। জাতীয়তাবাদের বুলি কিন্তু কাহারও মুখে ছিল না। মানুষের সহজ বুদ্ধিই তাহাদিগকে মানুষের ধর্ম্ম পালন করাইয়াছে।

মহাপূজার প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজার বাজারের তোড়জোড় আরম্ভ হইত। নিকট বা দূর আত্মীয় ব্যতীত গ্রাম-সুবাদে আত্মীয়তা যাহাদের সঙ্গে আছে, কিংবা কলিকাতায় নিকট প্রতিবেশী যাহারা, তাহাদের সকলকে পূজা উপলক্ষে তত্ত্ব করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় থাকিতে আয়োজন না করিলে চলিবে কেন? লোহার সিন্দুকের পরিসরানুযায়ী আত্মীয়-বন্ধু বাছিয়া লওয়ার মনোবৃত্তি তখন ছিল না। সুতরাং তত্ত্বের ইতর-বিশেষ হওয়া তখন ছিল কল্পনাতীত। সাধ্যে যতদূর কুলায় সকলকেই সমান ভাবে তত্ত্ব করিতেই হইবে, নতুবা হৈ হৈ, রৈ রৈ, কাণ্ড বাধিয়া যাইবে।

কাপড়ের বাজারে রেলি, গ্রেহামের প্রচলন তখন আরম্ভ হইয়াছে, ভদ্রগৃহে পূজার সময়ে বিলাতী মিলের কাপড়ের ব্যবহার কিন্তু কখনও দেখি নাই। সিমলা, ফরাশডাঙ্গা ও অন্যান্য মোকামের তাঁতের কাপড়ই ভদ্র গৃহস্থের ফ্যাশন। বাঙ্গালী পাদুকা-নির্ম্মাতার সংখ্যা তখন যথেষ্ট। কাজও তাহাদের যথেষ্ট। ঠনঠনিয়া ও তালতলার প্রতি জুতার দোকানে খরিদ্দারের গাঁদি লাগিয়া যাইত। দিনের আলো নিভিয়া যাইলে কেরোসিনের ডিবা বা হারিকেন জ্বালাইয়া দোকানের কেনা-বেচা চলিয়াছে। পশ্চিমা মুচীর সংখ্যাও কলিকাতায় তখন অল্প নহে। পাঞ্জাবী মুচীও কোথাও কোথাও দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। বেন্টিক্ ষ্ট্রীটে চীনা মুচির সংখ্যাও বেশ। পূজায় চীনা মুচির জুতাও বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি খুব। দরে শস্তা, সুদৃশ্য, টেকসই, সুতরাং মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকেই চীনা জুতার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে খুবই। বিলাতী জুতার চলন আবদ্ধ থাকিত শিক্ষিত গৃহস্থের মধ্যে। পোষাক-পরিচ্ছদের পীঠস্থান তখন জোড়াসাঁকো। কেবল কলিকাতা নহে, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সর্ব্বত্র বাবু-মহলে জোড়াসাঁকোর সুখ্যাতির অবধি ছিল না। ক্রমে জোড়াসাঁকোর অন্ন মারে বহুবাজার, পরে বহুবাজারের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয় কলেজ ষ্ট্রীট্। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পোষাক-পরিচ্ছদে চাঁদনীর নামও অল্প-বিস্তর ছিল। এখন ইহারই সান্নিধ্যে ধর্ম্মতলার কয়েকটি দোকানের নাম হইয়াছে বেশ।

জোড়াসাঁকোর পোষাক-পরিচ্ছদে তসর, গরদ, এণ্ডি, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর ও ভাগলপুরের সিল্ক ব্যবহৃত হইত প্রচুর। নবীন নবীনা ও বালক বালিকার পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য বোম্বাই সাটিন, বিদেশী সাটিন, ভেলভেট্ প্লাশ্ ও বিদেশী সিল্ক ব্যবহারের প্রয়োজন অল্প হইত না। ভেলভেট্ ও সিল্ক বা সাটিনের উপর ঠাসা সাঁচ্চা শলমার কাজ তখনকার উচ্চশ্রেণীর পোষাকে থাকিতই। মেয়েদের একটা শলমার ভেল্‌ভেটের জ্যাকেট ৩০।৩৫ টাকার কম জন্মাইত না। পূজা বা বিবাহের তত্ত্বে ভেল্‌ভেটের জামা দেওয়ার রেওয়াজই ছিল। ইহার পূর্ব্বের বধূ বা ঝিউড়িদের মধ্যে সেমিজ, সায়া, বডি, জ্যাকেট পরার রীতি ছিল না। হিন্দুর ঘরে মেয়েদের জামা-জোড়া আরম্ভ করানর 'পাইওনিয়র' কে বলা কঠিন। জামা-জোড়ার বালাই না থাকিলেও পোষাকী সজ্জায় বেনারসী শাড়ী ব্যবহার মধ্যবিত্ত ঘরেও ছিল। তখন একশত টাকার কমে একখানা বেনারসী জন্মাইত না। বেনারসী শাড়ীর পরে সাঁচ্চা শলমার পাড়-বসান সিল্ক শাড়ীর কদর। তাহার এক একখানির মূল্য ৫০।৬০ টাকার কম নহে। দর বেশী হইলেও কন্যা বা বধূকে অন্ততঃ একখানা বেনারসী দিতে কেহ কাতর হইত না। খাঁটি মাল একখানাতেই তাহাদের জীবন কাটিয়াছে। অন্যান্য

বাহারী শাড়ীর মধ্যে ঢাকাই শাড়ী, নীলাম্বরী, ময়ূরকণ্ঠী প্রভৃতি রংবেরং-এর শাড়ী। সওদা করিবার সময়ে ভাল, টেকসই জিনিষের দিকেই লোকের ঝোঁক। দামী জিনিষ তো একবার দেওয়া। তাহার পরে সিমলা, ফরাশডাঙ্গা, শান্তিপুরেই চলিবে। টাকার আমদানি এখনকার তুলনায় তখন অনেক কম হইলেও নকল বা শস্তার দিকেও লোকে যাইত না। দরিদ্রেরও ঝোঁক ছিল মোটা-সোটা খাঁটি জিনিষের উপর উপর, যা 'আয়' দেয়। বালক-বালিকার সাজ পোষাক তখন সিল্ক বা সাটিন-কোট। অল্প খরচে সিল্ক বা সাটিনের পাঞ্জাবী, শার্টও চলিয়াছে প্রচুর। পূজার আয়োজনে যোড়াসাঁকোর দোকানগুলির সজ্জা অল্প হইত না। তবে তাহার সবটাই ভিতরে। বাহিরে বিশেষ বাহার হইত না। ম্যাণ্টেলযুক্ত গ্যাসের আলোর রশ্মিতে সজ্জিত সাঁচ্চা মালের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিত ত্রিগুণ ভাবে।

পূজার বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য ব্যাপার—ক্রেতার হাসিমুখে সওদা করিয়া বেড়ান। স্ত্রী-পুত্রের জন্য মনের মত জিনিষ সংগ্রহ করিতে তাহার কি উৎসাহ! আত্মীয়স্বজন, এমন কি, দাস-দাসীর জন্যও সে সচেতন—ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিতে। তাহাদের সকলের মুখে হাসি ফুটাইতে পারিলে সে ধন্য হইবে। পূজার আনন্দ, পূজার সর্ব্বজনীনতা বৃদ্ধি পায় ইহাতেই। সকলেই তাহা করিতে সমান যত্নবান্। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য ইহাতে অটুট থাকায় সভা করিয়া কথার বাঁধনে ভ্রাতৃত্ব রক্ষার চেষ্টার সুতরাং কোনও প্রয়োজন হয় নাই।

পূজার বাজারের অন্যতম আকর্ষণের তখনকার বটতলার ছড়ার বই :—

"এবার পূজায় বিপদ ভারী
বউ চেয়েছে ঢাকাই শাড়ী"

এই প্রকারের কত কি! ছড়ার মাধুর্য্য বা রচনার কৃতিত্ব যাহাই হউক ফেরিওয়ালার মাল উজাড় হইয়াছে এক দণ্ডে। পূজায় 'বঙ্গবাসী'র 'পঞ্চানন্দে'র জন্য উৎকণ্ঠাসহ সাধারণের অপেক্ষা করার কথাও উল্লেখযোগ্য। পূজার বাজারের "হিতবাদী" ও ক্রমে আসর জমকাইয়া দেয়। 'বসুমতী' আবির্ভূত হইলে তিনখানি সংবাদপত্রের মধ্যে উপহার-প্রতিযোগিতার ধুম পড়িয়া যায়। পূজার বাজারে তাহাও অল্প উপভোগ্য ছিল না। চলচ্চিত্র উপভোগে আনন্দ যতই হউক, ভিখারী বৈষ্ণবের মুখে আগমনী শ্রবণে প্রাণে যে সুর বাজিত তাহা অবর্ণনীয়।

দেব-দেবীর পূজা

...দেব ও দেবীর পূজা কি বস্তু তাহা জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতির বিকাশ ও বৃদ্ধি যে সমস্ত প্রকরণের সহায়তায় হইতেছে, সেই সমস্ত প্রকরণের এক একটির নাম এক একটি "দেব" এবং ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক প্রকরণ হইতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত শক্তির এক একটির নাম এক একটি "দেবী।" দেব ও দেবীর পূজা বলিতে বুঝায় প্রাকৃতিক প্রত্যেক প্রকরণ ও প্রত্যেক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা অথবা এক কথায় প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিবার নাম "দেব-দেবীর পূজা।"

শহরে শারদীয়া

—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

সব দিকে পূজা-স্পেশ্যাল
কুমারটুলিতে ব্যস্ত হইল জি-পাল।
ব্যস্ত হল রেল-অফিস—ব্যস্ত হ'ল যতেক দোকানী
কন্‌শেসন্ মহারবে জুয়াচুরী হইল আমদানী,
অকস্মাৎ পাড়ায় পাড়ায়
বাল-বৃদ্ধ নর-নারী জুতা-হস্তে উঠিয়া দাঁড়ায়
"সার্ব্বজনীন পূজা," তাই নিয়ে বেজায় বিদ্বেষ
খোদা জানে কবে এর শেষ!
ওরিয়েন্টালী ঢঙ্গে খোলা হল ছায়া-চিত্র ঘর
বেতারের মারফতে বিজ্ঞাপিত হল বহুতর—
নিজ নিজ পাব্‌লিসিটি;
পত্রিকা অফিসে এল সংখ্যাতীত লেখা আর চিঠি
লেখিকা লিখিয়া দেছে—এই গল্প যদি নাহি ছাপে
সম্পাদক পড়িবেন স্ত্রী-হত্যার পাপে।
বাড়ী বাড়ী সুরু হল কেলেঙ্কারী, তত্ত্ব নাহি পেয়ে
বায়নাক্কা ধরিল কত আয়ুবৃদ্ধ মেয়ে
দেশে থেকে চিঠি এল—ভোগে সব ম্যালেরিয়া জ্বরে
বানে ভেসে গেছে ধান এক মুঠো অন্ন নেই ঘরে।

কিন্তু চমৎকার
প্লাট্‌ফর্ম্ম লোকারণ্য হল শেয়ালদার্
এসেছে অগণ্য লোক সহরে "এন্‌জয়" করিবারে
"টকী" ছবি দেখে যাবে, কিনে লবে জবর বাহারে
প্রাণপ্রিয় "ভাগ্যলক্ষ্মী" শাড়ী
"সায়গল" "পাহাড়ী"
কয় জোড়া জুতা পরে—ফিজি-সিল্কে রাশিয়ান সার্ট
করে কি না শিখে নেবে, এই সব "আর্ট"।
মোড়ে মোড়ে বারোয়ারী, মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ভার
আসে পাশে চলিতেছে "রাবীন্দ্রিক" ভাবা বাজার;
কোনো মতে তার মধ্যে ঢুকে
দেখা যায় প্যাণ্ডেলের আষ্টে পৃষ্ঠে বুকে
কালী 'বার্লি' 'সেন্ট' সোপ্‌,' বিজ্ঞাপন মেরে—
হয়েছে সজ্জিত
মধ্যখানে মুখখানি করিয়া লজ্জিত
দুর্গা যেন বলিছেন "লজ্জা-বস্ত্র দে বাবা একখানা
তোদের মজায় আমি করিব না মানা
গণেশের ভুঁড়ি গেছে, কার্ত্তিকের গোঁফ কামায়েছ,
লক্ষ্মী-সরস্বতী দুটি বালীগঞ্জী মেয়ে ক'রে দেছ
কর্ তোরা যাহা খুসী
তাহে নাহি দুষি,
শুধু মোর নটী-বেশ ছাড়া, দুর্গারে দুর্গতি থেকে বাবা
মোটা-খাপি কাপড় দে বাবা।"

বাদলরামের

কস্তুরী ও জাফরাণ-সংযুক্ত

কেশর-বিলাস ও কেশরিয়া-কিমাম

এবং কাশী-সূর্ত্তী, জর্দ্দা বাজারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মেইন—১৪৪এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী—বেনারস সিটি।

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই ও রেঙ্গুণ।

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য-কৃত দুইখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

১। ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা।

২। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃত বিজ্ঞানের সংজ্ঞা।

প্রত্যেক খানি গ্রন্থ—দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্, লিঃ

হেড অফিস—৪-বি, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাহ্মণ-পরিচয়

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির আলোচনায় প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ অভিনব গ্রন্থ। কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আনয়নের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ।

শ্রীমাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ,

সাংখ্যার্ণব প্রণীত।

মূল্য—আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডি. এম্. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজায় এই বইগুলি নিয়েছেন ত?

কথা-শিল্পে তিনখানি শ্রেষ্ঠ অবদান।

জীবনের চলস্রোত—দুই টাকা।

মনীষা—এক টাকা।

শিশুমনের চলচ্চিত্র—এক টাকা।

অনবদ্য ভাষা, বিচিত্র ঘটনা-সংস্থান এবং সর্ব্বোপরি সুগভীর চিন্তাশীলতা।

BANKIM CHANDRA : HIS LIFE AND ART—Rs. 2/8.

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী।

অমৃতবাজার বলেন—It is a national service.

ক্যালকাটা রিভিউ বলেন—Lovers of Bankim will enjoy its perusal.

P. E. N. Bulletin—The book bears evidence of ample research.

শিব-সাহিত্য কুটীর

২৬১৮এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সুযোগ্য ডিরেক্টারগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত

বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল

লাইফ ইন্‌সিওরেন্স

কোং লিঃ

১৩৩৮ সনের বীমা আইন অনুযায়ী রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

১২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট

কলিকাতা।

স্মৃতি। [শিল্পী—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

গোভিলগৃহ্যসূত্র

সামবেদে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা
ও এম্-এ পরীক্ষার পাঠ্য।

ভট্টনারায়ণকৃত অপ্রকাশিতপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ ভাষ্য,
বিস্তৃত টিপ্পনী, ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি সহ।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনব সংস্করণ।

মূল্য—১৪৲ চৌদ্দ টাকা।

সপ্তপদার্থী

ন্যায়-বৈশেষিক প্রকরণগ্রন্থ

প্রাচীন ন্যায়ে সংস্কৃত প্রথম পরীক্ষা
ও এম্-এ পরীক্ষার পাঠ্য।

মিতভাষিণী, পদার্থচন্দ্রিকা, বলভদ্রসন্দর্ভ,
জিনবর্দ্ধনটীকা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভূমিকা,
টিপ্পনী প্রভৃতি সহ।

অভিনব সংস্করণ।

মূল্য—৪৲ চারি টাকা।

"সাধনা বসুর" গাত্র-বর্ণ তাঁহার অভিনয় ও নৃত্য কলার মতই নিখুঁত এবং ইহা তাঁহার নিয়মিত ওটীন ক্রীম ব্যবহারের ফল বলিয়া যে তিনি নির্ণয় করিয়াছেন সেজন্য আমরা গর্ব্ব অনুভব করি।
OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time. and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.
Sadhona Bose
Oatine
CREAM for nightly massage
SNOW for daily protection

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY
Sec. No. ......
Book No. ......

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

অগ্রহায়ণ—১৩৪৬
৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গীতা-বিচার

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ১৩৪৪ সালের চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'তে 'গীতা-বিচার' নামক একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে 'গীতা'-বিষয়ক অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। গীতা-প্রণেতা 'ব্যাসদেব' তাঁহার প্রণীত গীতায় লোকসমাজকে যে যে কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদিগের মতে তাহার একটী কথাও তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় নাই। পরন্তু, তর্করত্ন মহাশয়ের উপরোক্ত প্রবন্ধ আগাগোড়া কতকগুলি কাল্পনিক কথায় পরিপূর্ণ। যাঁহারা গীতার মূল-রহস্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহারা তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিলে বিপথগামী হইতে পারেন এবং অধিকন্তু যাঁহার শিষ্য হইবার উপযোগিতা লাভ করা মানুষের উপাসনার বিষয়, সেই ব্যাসদেবকে কতকগুলি কাল্পনিক কথার উৎস বলিয়া মনে হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদিগের হৃদয়ে তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ সমালোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে।

তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ 'মাসিক বসুমতী'র আঠারটী সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উহা অতীব সুদীর্ঘ। কাজেই উহার সমালোচনাও—বিস্তৃতভাবে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে—অতীব সুদীর্ঘ হইয়া উঠিবে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগকে আমরা ধৈর্য্যসহকারে এই সমালোচনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যাঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমানযুক্ত তাঁহাদিগকে আমরা পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি।

আজকালকার মানুষ সাধারণতঃ ঋষিপ্রণীত মন্ত্র, সূত্র ও কারিকাগ্রন্থের বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা এবং তৎ তৎ অনুবাদ পাঠ করিয়া কোন একটী সংস্কৃত অথবা ইংরাজী উপাধি লাভ করিতে পারিলেই ঋষিপ্রণীত বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং তদ্বিষয়ে পাণ্ডিত্যাভিমান পোষণ করে। কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে ঋষিপ্রণীত মূলমন্ত্র অথবা মূলসূত্র অথবা মূলকারিকা পাঠ করিবার সঙ্কেত অবগত হইতে না পারিলে, কেবলমাত্র বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা এবং তৎ তৎ অনুবাদের সাহায্যে ঋষির মূল বক্তব্য নির্ভুলক্রমে অনুধাবন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহার কারণ, বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা এবং তৎতৎ অনুবাদ নির্ভুলও হইতে পারে অথবা ভ্রম-প্রমাদযুক্তও হইতে পারে। কাজেই, ঋষির মূল বক্তব্য বৃত্তি প্রভৃতির সাহায্যে নির্ভুলক্রমে অনুধাবন করিতে হইলে, ঐ বৃত্তি প্রভৃতি নির্ভুল অথবা ভ্রমপ্রমাদযুক্ত, তাহা পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন এবং ঐ পরীক্ষা ঋষিপ্রণীত মূলমন্ত্র, মূলসূত্র ও মূল-কারিকা বুঝিবার সঙ্কেত অবগত হইতে না পারিলে কোনক্রমেই সাধ্যায়ত্ত হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ঋষি-প্রণীত মূলমন্ত্র, মূলসূত্র ও মূল-কারিকা অনুধাবন করিবার সঙ্কেত অবগত হইতে পারিলে ঋষির মূল বক্তব্য বুঝিবার জন্য কোন বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা ও তাহার কোন অনুবাদ পাঠ করিবার প্রয়োজন হয় না।

ঋষি-প্রণীত মন্ত্র, সূত্র ও কারিকা যথাযথভাবে অনুধাবন করিবার প্রাথমিক সঙ্কেত, শব্দস্ফোট, পদস্ফোট ও বাক্যস্ফোট পরিজ্ঞাত হওয়া। ইহা ছাড়া ঋষি-প্রণীত কোন মন্ত্র অথবা কোন সূত্র অথবা কোন কারিকা যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহা 'আবৃত্তি' করিতে হয়, তাহার পর উহা 'পাঠ' করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে উহা অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু, বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া আধুনিক সমাজে অগ্রগণ্য হইবার খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত, স্ফোট পরিজ্ঞাত হওয়া এবং 'আবৃত্তি', 'পাঠ' ও 'অধ্যয়ন' করা তো দূরের কথা, সংস্কৃত ভাষায় 'স্ফোট', 'আবৃত্তি', 'পাঠ' ও 'অধ্যয়ন' এই চারিটী কথার অর্থ যে কি, তাহা পর্য্যন্ত যথাযথভাবে বিদিত নহেন। এই চারিটী কথার অর্থ যে কি, যথাযথভাবে তাহা ধারণা করিয়া লইয়া এবং তৎসম্মত কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া যে কোন আধুনিক পণ্ডিতের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। তখন দেখা যাইবে যে, আধুনিককালে যাঁহারা পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিযুক্ত তাঁহাদিগের কেহই, ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষা জানা তো দূরের কথা, তাহা জানিবার প্রণালী পর্য্যন্ত অবগত নহেন।

পাঠকগণের কেহই আমাদিগের উপরোক্ত কথায় আমাদিগকে যেন পাণ্ডিত্যাভিমানযুক্ত মনে না করেন। আমাদিগের দৃঢ় ধারণা—ঋষিগণ যে সমস্ত কথা তাঁহাদিগের বিবিধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই কথাগুলি এতই হিতকারী ও সমীচীন যে, তাহার কোন কথা সমাজমধ্যে যথাযথভাবে প্রচলিত থাকিলে, আজ সমগ্র মনুষ্যসমাজকে অর্থাভাবে, স্বাস্থ্যাভাবে, অশান্তিতে, অকালবার্দ্ধক্যে এবং অকালমৃত্যুতে বিধ্বস্ত হইতে হইত না। পরন্তু, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশভাগ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারিত। তাই যাঁহারা ঋষির কথার নামে তদ্বিরুদ্ধ কথা প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কথায় আমরা অত্যন্ত বেদনানুভব করি এবং বেদনাযুক্ত হইয়াই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ সমালোচনা করি। ব্যক্তিগত-ভাবে কাহাকেও নিন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগের কোন প্রবন্ধ রচিত হয় না। প্রাণের জ্বালায় নিন্দার ভাষা নির্গত হইয়া যায়।

যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিসম্পন্ন তাঁহারা সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের এই সমালোচনা ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিলে সর্ব্বসাধারণের উপকার সাধিত হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস, কারণ, তখন তাঁহারা ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা প্রচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন।

তর্করত্ন মহাশয়ের 'গীতা-বিচার'-নামক প্রবন্ধের মূল বিচার্য্য নিম্নলিখিত চারিটী প্রশ্ন :—

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্ব ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্বরূপ কি ?

(২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রচার কোন্ সময়ে ?

(৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেষ্টা যে ভগবান্, তিনি কে ?

(৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত কি ?

উপরোক্ত চতুর্থ প্রশ্নের বিচারকালে তিনি নিম্নলিখিত নয়টি অনু-প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন :—

(১) নর-হত্যায় পাপ আছে কি না ?

(২) বেদ শ্রদ্ধেয় কি না ?

(৩) জাতিভেদ গুণকর্ম্মানুসারে বা বংশানুসারে ?

(৪) শাস্ত্র ও বেদে ভেদ আছে কি না ?

(৫) ব্রহ্মতত্ত্ব কি ?

(৬) কর্ম্মে ও ধর্ম্মে ভেদ আছে কি না ?

(৭) স্বর্গ ও মোক্ষ বিষয়ে ভেদ কিরূপ ?

(৮) মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কি ?

(৯) ভেদাভেদবাদ কি ?

গীতার বিচার করিতে বসিয়া তর্করত্ন মহাশয় যে যে প্রশ্ন ও অনু-প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন তাহার কোন্‌টী আগে এবং কোন্‌টী পরে অথবা কোন্ ক্রমভেদে বিচার করা সঙ্গত, তাহা আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিব।

ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ গ্রন্থের যে নাম দেওয়া হইয়াছে সেই নামের অর্থ কি, তাহা ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ, ঋষি-প্রদত্ত কোন নাম কখনও অর্থহীন হয় না। যাঁহারা "নামকরণ"-সংস্কারসম্বন্ধীয় ঋষিগণের কথাগুলি যথাযথভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মানুষকে যেরূপ অর্থহীন নাম দেওয়া ঋষিগণের পরামর্শবিরুদ্ধ সেইরূপ কোন গ্রন্থকেও কোন অর্থহীন নাম প্রদান করা তাঁহাদিগের উপদেশসঙ্গত নহে। কাণা ছেলেকে "পদ্ম-লোচন" বলিয়া আখ্যাত করিলে যেরূপ "নামটী" অর্থহীন হইয়া যায় এবং এতাদৃশ নাম যেমন পরোক্ষভাবে মিথ্যাভাষণের সহায়তা করিয়া থাকে, সেইরূপ গ্রন্থের বক্তব্যবিষয়ানুরূপ উহার নাম প্রদত্ত না হইলে গ্রন্থের নামও অর্থহীন হইয়া মিথ্যাভাষণের সহায়তা করে। এতদনুসারে, ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থের নামের দ্বারাই ঐ গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের মূল-কথা সংক্ষেপতঃ জানা সম্ভব হয়। গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের মূলকথা সংক্ষেপতঃ জানিতে পারিলে, উহা কোন্ ক্রম-ভেদে বিচার করা সঙ্গত, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছি যে, ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ গ্রন্থের যে নাম দেওয়া হইয়াছে, সেই নামের অর্থ কি, তাহা ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

পদ-স্ফোটের নিয়মানুসারে "গীত" বলিতে সাধারণতঃ বোঝায়—"এমন কোন অনুভূতিমূলক

কার্য্য, যে কার্য্যের দ্বারা জীবের চক্ষুর ও অনুভব-শক্তির মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিয়া পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।"

গীতা-শব্দের পদ-স্ফোট-বিধিসঙ্গত উপরোক্ত অর্থটী ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা কোন বস্তুটীকে "কাল" বলিতেছি, কোন বস্তুকে "সাদা" বলিতেছি, আবার কোন বস্তুকে সুখের বলিয়া বলিয়া মনে করিতেছি, কোন বস্তুকে দুঃখের বলিয়া মনে করিতেছি। ইহা ছাড়া সময় সময় যে বস্তুকে সুখের বলিয়া মনে করিয়া থাকি সেই বস্তুকেই আবার দুঃখের বলিয়া মনে করি। ইহারই নাম "পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা।" পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে দেখা "চক্ষু"র কার্য্য, আর ঐ বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা "অনুভবশক্তি"র কার্য্য। কাযেই, কেন আমরা পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে চক্ষু ও অনুভব-শক্তির মধ্যে যে কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। "গীতা" বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় সেই অনুভূতিমূলক কার্য্যকে, যে অনুভূতিমূলক কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে চক্ষু ও অনুভব-শক্তির মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

পদ-স্ফোটের বিধি অনুসারে "গীতা" শব্দটাকে সাধারণতঃ উপরোক্তভাবে ব্যাখ্যা করিতে হয় বটে, কিন্তু কোন গ্রন্থকে যখন "গীতা" বলা হয়, তখন ব্যাকরণোক্ত "সামান্য" ও "বিশেষ" সমাসবিভাগের নিয়মানুসারে "গীতা" বলিতে বুঝায় সেই গ্রন্থকে, যে গ্রন্থে চক্ষু ও অনুভব-শক্তির মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিবার কার্য্য এবং পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হয় কেন তাহার কারণ লিপিবদ্ধ থাকে।

মহাভারতান্তর্গত "গীতা"র তাৎপর্য্য স্ফোট-বিধি অনুসারে যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে আছেও হুবহু উপরোক্ত উপলব্ধি করিবার কার্য্যের এবং পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হয় কেন তাহার কারণের বর্ণনা।

আমাদের গলদ হইয়াছে অনেক। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, "গীতা" মহাভারতান্তর্গত। মহাভারতের বক্তব্য কি, তাহা না বুঝিতে পারিলে "গীতা"র তাৎপর্য্য যে কি, তাহা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কখনও সম্ভব হয় না। মহাভারতের মূল বক্তব্য যে কি তাহা বুঝিতে পারিলে "গীতা"র তাৎপর্য্য যথাযথভাবে উদ্ধার করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কাজেই, "গীতা"র তাৎপর্য্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "মহাভারত" শব্দটার অর্থ বুঝিতে হয়। আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার নিজেই মহাভারতের প্রয়োজনীয়তা এবং উহার অর্থ বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, —"একতঃ চতুরো বেদা ভারতঞ্চ এতৎ একতঃ"। সংস্কৃত ভাষার অর্থ-গ্রহণের প্রচলিত নিয়মানুসারে ইহার অর্থে বলা হইবে—"'এক' হইতে চারিটী বেদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই 'ভারত'ও ঐ 'এক' হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে"। কিন্তু, এই অর্থ সঠিক নহে। স্ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে উপরোক্ত বাক্যের অর্থ—

"অ, ই এই দুইটী ধ্বনির মূল কারণ কি এবং তাহা উপলব্ধি করিতে হয় কি করিয়া তদ্বিষয়ক কথা লইয়া চারিটী বেদ রচিত হইয়াছে এবং অ, ই এই দুইটী ধ্বনির পরিণতি কি এবং তাহা উপলব্ধি করিতে হয় কি করিয়া তদ্বিষয়ক কথা লইয়া 'ভারত' রচিত হইয়াছে।"

এই বাক্য হইতে বুঝিতে হয় যে, বেদ-রচনার উদ্দেশ্য—সমস্ত সৃষ্টির মূলে যে 'অব্যক্ত' ও 'জ্ঞ'-ভাগ রহিয়াছে সেই 'অব্যক্ত' ও 'জ্ঞ'-ভাগকে উপলব্ধি করিবার পন্থা দেখান। আর, মহাভারত-রচনার উদ্দেশ্য—'অব্যক্ত' ও 'জ্ঞ'-ভাগ হইতে কি করিয়া 'ব্যক্তে'র উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঐ 'ব্যক্তে'র স্বভাব ও পরিণতি কি কি, তাহা দেখান। কাযেই বলিতে হইবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইলে 'মহাভারত' লইয়া উহার আরম্ভ করিতে হয় এবং বেদাধ্যয়নে উহার সমাপ্তি হইয়া থাকে, কারণ 'ব্যক্তে'র স্বভাব ও পরিণতি না বুঝিতে পারিলে তাহার মূলে যে 'অব্যক্ত' ও 'জ্ঞ'-ভাগ রহিয়াছে সেই 'অব্যক্ত' ও 'জ্ঞ'-ভাগকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

ইহার পর গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতং।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হি অধিকং যদা॥"

প্রচলিত পণ্ডিতগণের অর্থ—

"পূর্ব্বকালে সমুদায় দেবগণ মিলিত হইয়া একদিকে চারি বেদ এবং একদিকে এই ভারত রাখিয়া তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া পরিমাণ করেন, তাহাতে সরহস্য চতুর্ব্বেদ হইতে ইহাই গুরুতর হইল।"

এই অর্থও ঠিক নহে।

স্ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে ইহার মর্ম্মার্থ হইবে—

"যাঁহারা সত্ত্বার উপলব্ধিগ্রহণেচ্ছু হইয়া সাধনানিরত হইয়া থাকেন তাঁহারা বিধিসঙ্গত উপায়ে প্রত্যেক কার্য্যের কারণ কি, তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে বসিলে দেখিতে পাইবেন যে, সংসারে চলিতে হইলে সত্ত্বার রহস্যোদ্ঘাটন-সহায়ক চারিটি বেদ-জ্ঞানের তুলনায় 'ব্যক্তি'সম্বন্ধীয় জ্ঞান অধিকতর প্রয়োজনীয়।"

উপরোক্ত শ্লোকের পরের শ্লোকে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

'ত'-দা প্রভৃতি-লোকেঽস্মিন্ মহাভার-তং উচ্যতে।
মহত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং য-তোঽধিকং॥

এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ—

"তদবধি লোকে ইহাকে 'মহাভারত' বলিয়া থাকে। ইহা মহত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক, সুতরাং মহত্ব ও গুরুত্ব হেতু ইহা মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"

স্ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে ইহার মর্ম্মার্থ হইবে—

এই সংসারে, অহঙ্কৃতির কারণ কি—তৎসম্বন্ধীয় উপলব্ধি-প্রযত্ন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যের দ্বারা আরব্ধ হইলে 'মহা-ভার'-উপলব্ধির চেষ্টা অথবা "মহাভার-ত" আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া বিষয়ে এবং অভিজ্ঞান বিষয়ে মন চঞ্চল হইলে, শরীরস্থ বায়ুর কি অবস্থা হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলে ব্রহ্মরূপের সহিত প্রকাশাত্মক প্রকৃতির কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।"

এই সম্বন্ধীয় সর্ব্বশেষ শ্লোক—

মহত্বাৎ ভারবত্বাৎ চ মহাভার-ত উচ্যতে।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ইহার প্রচলিত অর্থ—

"ইহা মহত্ত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক, সুতরাং মহত্ত্ব ও গুরুত্ব-হেতু ইহা মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের যথার্থ অর্থ অবগত হয়, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।"

স্ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে ঐ শ্লোকের মর্ম্মার্থ—

"মন যখন বিভিন্ন ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্ররোচনায় অথবা অভিমানের প্ররোচনায় চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন তাহাকে কোন্ কোন্ উপায়ে প্রশমিত করা সম্ভব হয় তাহার কথা এই গ্রন্থে লিখিত আছে বলি য়াইহাকে 'মহাভারত' বলা হইয়া থাকে। মহাভারত শব্দটার অর্থ যে কি করিয়া "ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার এবং অভিমানের প্রশমন করিবার প্রযত্ন" হইয়া থাকে তাহা যিনি শরীরস্থ রসের সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, তিনি সর্ব্বরকমের অভিমানের কারণ প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহা সংযত করিতে সিদ্ধ হইয়া থাকেন।"

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর প্রচলিত অর্থ এবং স্ফোট-সঙ্গত অর্থ তুলনা করিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রচলিত অর্থানুসারে ঐ শ্লোক কয়েকটী গ্রহণ করিলে উহাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তুর কথা পাওয়া যায় না। অন্য পক্ষে, স্ফোট-সঙ্গত অর্থে মহাভারত যে কেন এত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে মুখ্য কথা বুঝিতে পারা যায়।

আজকালকার মানুষ সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকে যে, বেদ চারিখানি কতকগুলি প্রার্থনার কথায় পরিপূর্ণ, আর মহাভারত কয়েকটী যুদ্ধের ইতিহাস মাত্র। কিন্তু, "একতঃ চতুরো বেদা ভারতঞ্চ এতৎ একতঃ" এই বাক্যটী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোক যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে অব্যক্ত ভাগ রহিয়াছে, উহা কোথা হইতে এবং কি উপায়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা লইয়া 'বেদ', আর জীব-শরীরস্থ ঐ অব্যক্ত-ভাগের পরিণতি কি কি হইতেছে ও কোন্ কোন্ উপায়ে হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পন্থা লইয়া 'মহাভারত' রচিত হইয়াছে। এক কথায়, ইন্দ্রিয় ও মনো-গ্রাহ্য বস্তুর সহিত আমাদিগের প্রকৃত সম্বন্ধ কি এবং ঐ সম্বন্ধ কেনই বা দ্বন্দ্ব-কলহ-যুক্ত হইয়া থাকে, এবং কি করিয়া ঐ সম্বন্ধকে দ্বন্দ্ব-কলহ-বিমুক্ত করিতে হয় তাহা বুঝাইবার জন্য 'মহাভারত' আর বুদ্ধি ও আত্ম-গ্রাহ্য বস্তুর সহিত আমাদিগের প্রকৃত সম্বন্ধ কি এবং ঐ সম্বন্ধ কেনই বা আমরা বিস্মৃত হই এবং ঐ সম্বন্ধকে কি করিয়া সর্বদা নিজ শরীরমধ্যে জাগ্রত রাখা যায়, তাহা বুঝাইবার জন্য 'বেদ' রচিত হইয়াছে।

এই কথা কয়েকটী বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বেদ ও মহাভারতের কথায় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মূলতঃ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং যেখানে মহাভারতের সমাপ্তি, সেই খানে 'বেদে'র আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে, ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মীমাংসায় ও বেদাঙ্গে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে ঋষিগণের ভাষা বুঝিতে পারা যায় না এবং ঋষিগণের ভাষা বুঝিতে না পারিলে 'মহাভারতে'র অর্থ বুঝা সম্ভব হয় না এবং 'মহাভারত' না বুঝিতে পারিলে 'বেদ' বুঝা সম্ভব হয় না এবং 'মহাভারত' ও 'বেদ' যথাযথভাবে না বুঝিতে পারিলে দর্শন ও সংহিতা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি কিছুই বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। মহাভারত সম্যক্ ভাবে বুঝিবার জন্য

'রামায়ণ' ও 'ভাগবত' গ্রন্থ বুঝিবারও প্রয়োজন হয় এবং 'বেদ' বুঝিবার জন্য মহাপুরাণ ও উপ-পুরাণগুলি বুঝিতে হয়। আজকাল প্রায়শঃ মীমাংসা ও বেদাঙ্গ যথাবিধি না পড়িয়া ঋষির ভাষায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ইহারই ফলে তথাকথিত পণ্ডিতগণ ঋষি-প্রণীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিম্ভুতকিমাকার অর্থ সৃষ্টি করিতেছেন। 'মহাভারত' ও 'বেদ' যথাবিধি না পড়িয়া দর্শন, সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া হইয়া থাকে বলিয়া উহার তাৎপর্য্যও যথাযথভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

"একতঃ চতুরো বেদা ভারতঞ্চ এতৎ একতঃ"

এই বাক্যটী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোক যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আরও দেখা যাইবে যে, 'মহাভারত' গ্রন্থ রচনা করিবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—মানুষের 'ইচ্ছা', 'জ্ঞান', 'ক্রিয়া' ও 'অভিমানে'র বীজ কেন ও কি করিয়া উৎপন্ন হয়, এবং ঐ বীজ হইতে উহাদিগের আতিশয্যের কেন উদ্ভব হয় এবং কি করিয়া ঐ আতিশয্য নিবারণ করা সম্ভব হয়, তাহা বুঝান।

'মহাভারত' গ্রন্থের উপরোক্ত উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে তন্মধ্যে 'গী-তা'র (অর্থাৎ চক্ষু ও অনুভব-শক্তির কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিবার) যে কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইবে। কোন্ কোন্ যোগাযোগে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা চলাফেরা করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা অনায়াসেই দেখিতে পাইবেন যে, চক্ষুর সহিত অনুভব শক্তির যে কি সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে মানুষের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও অভিমানের বীজ যে কেন ও কি করিয়া উৎপন্ন হয় এবং পরবর্ত্তী কালে উহাদিগের আতিশয্যের যে কেন উদ্ভব হয় তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না।

উপরোক্তভাবে 'মহাভারত' গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, 'মহা-ভার-ত' ও 'গী-তা'র সম্বন্ধ এবং মহা-ভার-ত গ্রন্থরচনায় গী-তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলে গী-তা-বিচার কোন্ ক্রমভেদে হওয়া সঙ্গত তাহা স্থির করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। আমূলভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গ্রন্থকার যে যে ক্রম-ভেদে গীতার অধ্যায়গুলি সাজাইয়াছেন তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ক্রম-বিভাগ আর কিছুই হইতে পারে না। কেন উহা হইতে আর কোন উৎকৃষ্টতর ক্রম-বিভাগ হইতে পারে না, তাহা বলিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে সম্পূর্ণ মহাভার-তের কথাগুলি পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

মোটের উপর, মহাভারত-প্রণেতা ব্যাসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেও তাঁহার ক্রম-বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করা—তর্করত্ন মহাশয়ের মত পণ্ডিতের কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। তর্করত্ন মহাশয় যদি ঐ ক্রমবিভাগানুসারে গীতার বিচার করিতেন তাহা হইলে আমাদিগের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিতেন এবং তাঁহার কথার সমালোচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইত। কিন্তু, তাহা তিনি করেন নাই। কাযেই, কোন্ ক্রমে তর্করত্ন মহাশয়ের কথাগুলি সমালোচনা করিলে একদিকে যেরূপ সমালোচনা সার্থক হইতে পারে, অন্যদিকে আবার গীতার মূল তাৎপর্য্য উদ্ভাসিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে এত চিন্তা করিতে হইতেছে।

আগেই বলিয়াছি যে, 'গী-তা'র অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য—'চক্ষু' ও 'অনুভব-শক্তি'র কি সম্বন্ধ তাহা দেখান এবং উহা প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্যযুক্ত করিয়া তোলা। মহাভারতের গীতা পর্ব্বটী সম্যক্ ভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ব্যাসদেবের কথানুসারে গী-তা (অর্থাৎ 'চক্ষু' ও অনুভব-শক্তি'র সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্য) লাভ করিবার একমাত্র উপায় পাপকে অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ মানুষ যখন অভিমানাত্মক কার্য্যে অথবা বাক্যে অথবা চিন্তায় লিপ্ত হয় তখন) মোক্ষ-যোগ অভ্যাস করা এবং এই মোক্ষ-যোগ অভ্যাস করিবার উপায়, বিষাদ-যোগ, সাংখ্য-যোগ প্রভৃতি আর সতেরটী যোগ যথাক্রমে অভ্যাস করা। এই কারণেই ব্যাসদেব মোক্ষ-যোগাধ্যায়ে গী-তা-পর্ব্বের সমাপ্তি করিয়াছেন এবং তাহার পূর্ব্বে আর সতেরটি যোগাধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, বিষাদ, সাংখ্য প্রভৃতি সতেরটী যোগে অভ্যস্ত না হইতে পারিলে মোক্ষ-যোগে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হয় না এবং মোক্ষ-যোগের তাৎপর্য্য কি তাহা অনুমান না করিতে পারিলে, বিষাদ-যোগ প্রভৃতির অভ্যাসে যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হয় না। এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা "যোগের অভ্যাস" ও "যোগের তাৎপর্য্য-অনুমান"-নামক দুইটী পৃথক্ কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে যোগের অভ্যাস ও তাহার তাৎপর্য্য-অনুমান দুইটী পৃথক পৃথক্ কার্য্য। কোন যোগে প্রবিষ্ট হইতে হইলে আগে তাহার তাৎপর্য্য অনুমান করিতে হয়, তাহার পর তাহার অভ্যাসে লিপ্ত হইতে হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষ-যোগাধ্যায়ে গী-তা পর্ব্বের সমাপ্তি এবং ঐ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কি তৎসম্বন্ধে তর্করত্ন মহাশয়ও একটী অনু-প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন তখন মোক্ষ-যোগাধ্যায়ের বিচারেই আমরা সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করিব। এই বিচারে কি কি কথা উত্থাপিত হয়, তাহা দেখিয়া পরবর্ত্তী ক্রম-বিভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব।

"মোক্ষ-যোগ-বিচার"

মোক্ষ-যোগ-বিচারকালে আমরা মুখ্যতঃ ব্যাসদেব গীতার মোক্ষাধ্যায়ে কি কি বুঝাইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার "গীতা-বিচারে" "মোক্ষ' সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা ভ্রম-প্রমাদযুক্ত অথবা ভ্রম-প্রমাদশূন্য তাহার বিচার করিব। এই বিচারে দেখা যাইবে যে, তর্করত্ন মহাশয় "গীতা'র তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা তো দূরের কথা, ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষায় পর্য্যন্ত সম্যক্ ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই।

আমাদিগের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আমাদিগের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে ভারতীয় ঋষি-প্রণীত গ্রন্থগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতায় সুশোভিত এবং তদনুসারে উহা অমূল্য ধনের আস্পদ। ঐ ঋষি-প্রণীত গ্রন্থগুলির বক্তব্য প্রত্যেক কথা একদিন জগতের সর্ব্বত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইয়াছিল এবং সারাজগৎ একদিন ঐ গ্রন্থগুলিকেই সর্ব্ববিষয়ক সত্যের একমাত্র আধার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু, তর্করত্ন মহাশয়-শ্রেণীর পণ্ডিতগণ দুই সহস্র বৎসরেরও আগে হইতে ঐ অমূল্য শাস্ত্রগুলিকে কু-ব্যাখ্যায় প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে কয়েক সহস্র বৎসর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, মানুষ আর ঐ ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থে কোন-বিষয়ক সত্যের সন্ধান পায় না এবং ঐ ঋষি-প্রণীত গ্রন্থগুলি প্রায়শ: ছাড়িয়া দিয়া নানা রকমভাবে নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা সত্যের আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহারই ফলে ধর্ম্ম লইয়া,

সামাজিক আচার-ব্যবহার লইয়া, আর্থিক সংগঠন লইয়া নানারূপ দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইয়াছে এবং এমন কি, মনুষ্য-সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের এতাদৃশ বিচার-বুদ্ধি যুক্তি-সঙ্গত হইলে, মনুষ্য-সমাজের দুর্গতির মূল কারণ যে তর্করত্নমহাশয়-শ্রেণীর পণ্ডিতগণের কু-ব্যাখ্যা, তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং এতাদৃশ কু ব্যাখ্যা যাহাতে কাহারও মনে শ্রদ্ধা লাভ না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র-গ্রন্থ যে সর্ব্ববিষয়ক সত্যের আলয় এবং তর্করত্নশ্রেণীর পণ্ডিতগণ যে উহার কু-ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন তাহা দেখান আমাদিগের এই প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

'মোক্ষ' সম্বন্ধে কথা বলিতে বসিয়া তর্করত্ন মহাশয় দুইটী অনু-প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। একটীর নাম—" 'স্বর্গ' ও 'মোক্ষ বিষয়ে ভেদ কিরূপ ?" এই প্রশ্নটী আলোচিত হইয়াছে মাসিক বসুমতীর ১৩৪৬ সালের আষাঢ়-সংখ্যায়। অপরটীর নাম—" 'মোক্ষ'-প্রাপ্তির উপায় কি।" উহা আলোচিত হইয়াছে মাসিক বসুমতীর ১৩৪৬ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায়।

" 'স্বর্গ' ও 'মোক্ষ' বিষয়ে ভেদ কিরূপ ?"—এই অনু-প্রশ্নের আলোচনায় তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, "স্বর্গ অক্ষয় সুখ। মোক্ষও অক্ষয় সুখ।" (১৩৪৬ সালের আষাঢ়-সংখ্যার বসুমতীর ৩৫৮পৃঃ)

ঐ অনু-প্রশ্নের আলোচনায় আর এক স্থানে তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—

"গীতাতে মোক্ষ ও স্বর্গের ভেদ স্পষ্টাক্ষরেই কথিত,—স্বর্গ ঐহিক সুখের ন্যায়ই নশ্বর,—তাহা অক্ষয় নহে। মোক্ষ-সুখ অক্ষয়। স্বর্গ—ভোগ-সুখ, অতএব নশ্বর।" (মাসিক বসুমতী—১৩৪৬ সাল, আষাঢ় সংখ্যা, ৩৫৯ পৃঃ)

"স্বর্গ"কে একবার "অক্ষয়-সুখ" বলিয়া আবার তাহাকে "নশ্বর-সুখ" বলায় দুইটী বিরুদ্ধবাদের সামঞ্জস্য করিবার জন্য তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—

"মতান্তরে অক্ষয় স্বর্গ স্বীকৃত হইলেও গীতা-সিদ্ধান্তে অক্ষয় স্বর্গ নাই, মোক্ষ-সুখই অক্ষয়।" (মাসিক বসুমতী—১৩৪৬ সালের আষাঢ়-সংখ্যা, ৩৬৩ পৃঃ)

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, অক্ষয়ই হউক আর নশ্বরই হউক তর্করত্ন মহাশয়ের মতে "স্বর্গ" শব্দের অর্থ এক প্রকার "সুখ" আর "মোক্ষ" শব্দের অর্থও এক রকমের "সুখ"।

শব্দের অর্থগ্রহণে তর্করত্ন মহাশয়ের এই পাণ্ডিত্য আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদিগের মতে এতাদৃশ অর্থগ্রহণ সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপাণ্ডিত্যের পরিচয়।

নিরুক্তাধিকরণে নৈঘণ্টুকাণ্ড যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে, 'সুখ' ও 'সর্গ' এই দুইটী শব্দ—শব্দের একই জাতীয় পর্য্যায়ান্তর্গত বটে, কিন্তু সম্যক্‌ভাবে একই অর্থযুক্ত নহে। "সুখ" ও "সর্গ" এই দুইটী শব্দ শব্দের একই জাতীয় পর্য্যায়ান্তর্গত বটে, কিন্তু 'সুখ' ও 'স্বর্গ' অথবা 'সুখ' ও 'মোক্ষ' শব্দের একই জাতীয় পর্য্যায়ান্তর্গত পর্য্যন্ত হইতে পারে না। বেদাঙ্গান্তর্গত শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া শব্দবৃত্তের স্বভাব কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যুক্তাক্ষরযুক্ত স্বরান্ত পদ এবং অযুক্তাক্ষরযুক্ত স্বরান্ত পদ কখনও শব্দের একই জাতীয় পর্য্যায়ান্তর্গত হইতে পারে না এবং কোনও দুইটী পদ শব্দের একই জাতীয় পর্য্যায়ান্তর্গত না হইলে কখনও সর্ব্বতোভাবে একই অর্থযুক্ত হইতে পারে না।

বেদাঙ্গান্তর্গত অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ (অর্থাৎ পাণিনি)-নামক ব্যাকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 'স্বর্গ', 'মোক্ষ', ও 'সুখ' এই তিনটি শব্দই নাম-বাচক বটে, কিন্তু 'স্বর্গ' ও 'মোক্ষ' এই দুইটী শব্দ দুইটী বিভিন্ন 'কর্ম্মে'র দুইটী বিভিন্ন অবস্থার নাম-বাচক, আর 'সুখ' এই শব্দটী একটী গুণের নাম-বাচক। কোন কর্ম্মের কোন অবস্থার নাম-বাচক শব্দ, আর কোন গুণের নাম-বাচক শব্দ কখনও একার্থক হইতে পারে না।

নিরুক্ত ও পাণিনি অনুসারে 'স্বর্গ', 'মোক্ষ' ও 'সুখ' যেরূপ সর্ব্বতোভাবে একার্থ-বাচক হইতে পারে না, সেইরূপ সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা দেখিলেও দেখা যাইতে পারে যে, গীতা-প্রণেতা ব্যাসদেব 'স্বর্গ', 'মোক্ষ' ও 'সুখ' কখনও একার্থে ব্যবহার করেন নাই।

'গীতা'র তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাসদেবের মতে 'স্বর্গ' ও 'মোক্ষ' সর্ব্বদাই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত, কিন্তু 'সুখ' কখনও মানুষের কাম্য হওয়া উচিত নহে।

'স্বর্গ' যে ব্যাসদেবের মতে মানুষের কাম্য হওয়া উচিত তাহার প্রমাণ—গীতার নবম অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব-ভোগান্॥"

এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ—

"ত্রিবেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ, সোমপায়িগণ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া, পাপমুক্ত হইয়া দেবেন্দ্র-লোকপ্রাপ্তির বাসনা করেন; তাঁহারা পবিত্র দেবেন্দ্র-লোক লাভ করিয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন।"

ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ—

"শরীরস্থ তেজের সাহায্যে 'অহংকৃতি' কি ব্যাপার তাহা অনুভব করিতে পারিলে 'স্পর্শে'র পরিণতিসমূহকে প্রতিরুদ্ধ করা সম্ভব হয় ও তখন জীবের সত্ত্বানুভূতি কেন নষ্ট হইয়া যায় এবং কেনই বা জীব অভিমানগ্রস্ত হয় তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তখন শরীরস্থ বায়ুর সাহায্যে 'স্বর্গানুভূতি' অর্থাৎ 'সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির সহিত জীব-স্বভাবে'র কি সম্বন্ধ তাহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় অর্থাৎ তেজের সাহায্যে 'অহংকৃতি' কি ব্যাপার তাহা অনুভব করিতে পারিলে এবং স্বর্গানুভূতি লাভ করিলে যে 'রস' 'রসনা'র পরিচালক সেই রসকে অনুভব করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া মস্তিষ্ক-মধ্যে মস্তিষ্কের যে ক্রিয়াবশতঃ ঐ রসের উৎপত্তি হয়, মস্তিষ্কের সেই ক্রিয়াও অনুভব করা সম্ভব হইয়া থাকে।"

গীতার মধ্যে যে কয়েকটী দুরূহ শ্লোক আছে এই শ্লোকটী তাহার অন্যতম। ইহা বেদোক্ত যোগের একটী কথা। বিভিন্ন উপনিষদে বেদোক্ত যোগের কথার ছড়াছড়ি রহিয়াছে। এখন আর মানুষ তাহা বুঝে না। বেদোক্ত যোগে অভ্যস্ত হইতে পারিলে মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং তখন

মানুষের পক্ষে সপ্তলোকের পূর্ণমূর্ত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। বেদোক্ত যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তখন পৃথিবীর সম্পূর্ণরূপ, মহাসাগরের সম্পূর্ণরূপ, নভো-মণ্ডল ও পৃথিবী-মণ্ডলের মধ্যস্থ বায়ু-মণ্ডলের সম্পূর্ণ রূপ, নভো-মণ্ডলের সম্পূর্ণ রূপ স্ব-চক্ষে দেখিয়া উঠা সম্ভব হইয়া থাকে। ইহা আমাদিগের কাল্পনিক কথা নহে। বেদোক্ত যোগের পথে যথাযথভাবে কিঞ্চিন্মাত্রপরিমাণেও অগ্রসর হইতে পারিলে আমাদিগের কথার সত্যতা অনুমান করা সম্ভব। 'যোগে'র নামে সন্ন্যাসী নামধারী মানুষ এখন যাহা করিয়া থাকে তাহা বেদোক্ত হঠযোগ নহে। যোগের নামে যাহা চলিতেছে, তাহার কথার সহিত বেদোক্ত-যোগের কথা তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের কথার সত্যতার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ঋষি-প্রণীত 'হঠ-যোগ' আছে বটে, কিন্তু সেই হঠ-যোগও মানুষ অধুনা বিস্মৃত হইয়াছে। ঋষি-প্রণীত 'হঠ-যোগ' বেদোক্ত যোগের সামর্থ্যলাভ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা নিরাপদ নহে। উহা হইতে ঐন্দ্রজালিকতার স্পৃহা জাগ্রত হইবার আশঙ্কা থাকে বলিয়া ঋষিগণ উহা অবলম্বন না করিয়া তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতার উপরোক্ত শ্লোকটী বেদোক্ত যোগে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে সম্যক্ ভাবে বোঝা সম্ভব নহে। কাযেই, উহা লইয়া আমরা পাঠকদিগকে মাথা ঘামাইতে নিষেধ করি। 'স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে' এই কথাটী বুঝিতে পারিলেই দেখা যাইবে যে, ব্যাসদেবের মতে 'স্বর্গ' মানুষের আরাধ্য হওয়া উচিত।

উপরোক্ত শ্লোকের পরের শ্লোকেই ব্যাসদেব বলিতেছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ—

"তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এইরূপে বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া ভোগ-কামনাপরবশ হইয়া গতাগতি লাভ করেন।"

স্ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে ঐ শ্লোকের মর্ম্মার্থ হইবে—

"এই অবস্থায় অর্থাৎ শরীরস্থ তেজের সাহায্যে 'অহংকৃতি' কি ব্যাপার তাহা অনুভব করিতে পারিলে একদিকে যেরূপ ক্রমে ক্রমে স্বর্গানুভূতি অর্থাৎ সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির সহিত জীব-স্বভাবের কি সম্বন্ধ, তাহা পর্য্যন্ত সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং পরিশেষে যে 'রস' 'রসনা'র পরিচালক সেই রসকে অনুভব করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া মস্তিষ্ক-মধ্যে মস্তিষ্কের যে ক্রিয়াবশতঃ ঐ রসের উৎপত্তি হয়, সেই ক্রিয়াও অনুভব করা সম্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার অন্যদিকে স্বর্গানুভূতির ক্ষমতা জন্মিলে রসনার তৃপ্তি-সামর্থ্যও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে যে 'রস' 'রসনা'র পরিচালক সেই রসকে অনুভব করিবার সামর্থ্য ক্ষীণ হইয়া যায় এবং তখন রসনার ভোগ-স্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। এইরূপে 'অহংকৃতি' কি ব্যাপার, তাহা অনুভব করিবার সামর্থ্য বৈপরীত্য লাভ করিলে যাহা কিছু দেখা যায় এবং যাহা কিছু কল্পনা করা যায়, তাহা লাভ করিবার জন্য কামগ্রস্ত হইতে হয়।"

উপরোক্ত দুইটী শ্লোক একত্র করিয়া তাহাদিগের মর্ম্মার্থ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাসদেবের মতে 'স্বর্গ'-নামক উপলব্ধি মানুষের কাম্য এবং তৃপ্তি অথবা সুখ-স্পৃহা মানুষের সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, কারণ 'স্বর্গ'-নামক উপলব্ধির সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াও যদি মানুষ কোন তৃপ্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পতনের আশঙ্কা আবার উপস্থিত হয়।

তৃপ্তি অথবা সুখ-স্পৃহা যে ব্যাসদেবের মতে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তাহার সাক্ষ্য গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতেও পাওয়া যায়—

'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥
(২য় অঃ ৩৮ শ্লোক)

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
(২য় অঃ ৫৬ শ্লোক)

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
(১২শ অঃ, ১৭ শ্লোক)

যে যে প্রধান প্রধান উপদেশ গীতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার অন্যতম কথা, গুণাতীত হইতে চেষ্টা করা। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!"—এই বাক্যটী হইতে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

গুণাতীত হইতে হইলে কি কি করিতে হয় তাহার অনেক কথা গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েই ব্যাসদেব বিবৃত করিয়াছেন। ১৪শ অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫শ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন—

সমদুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
... ...
... ... গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

এতাবৎ দেখা গেল যে, ব্যাসদেবের মতে 'সুখ' অকাম্য আর 'স্বর্গ' কাম্য। কাযেই, 'স্বর্গ' ও 'সুখ' তিনি কখনও একার্থে ব্যবহার করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এইরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, 'মোক্ষ'ও ব্যাসদেবের মতে কাম্য।

"যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনি মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥"

এই শ্লোকটীর "মোক্ষপরায়ণঃ" কথাটী তাহার নিদর্শন।

কাযেই, ব্যাসদেব যে 'মোক্ষ' আর 'সুখ' একার্থে ব্যবহার করেন নাই, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অতএব বলিতে হইবে যে, তর্করত্ন মহাশয় সুবুদ্ধিহীন মানুষের দ্বারা 'পণ্ডিত' বলিয়া বিবেচিত হইলেও এবং সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানহীন গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের দ্বারা 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে বিভূষিত হইয়া থাকিলেও 'মোক্ষ', 'স্বর্গ' ও 'সুখ' এই তিনটি কথার অর্থ-ই বুঝিতে পারেন না এবং তাঁহার পক্ষে এতদ্বিষয়ক কোন যুক্তিসঙ্গত বিচার অসাধ্য।

শুধু যে তিনি এই তিনটী কথার অর্থ বুঝিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহার রচিত 'গীতা-বিচার' নামক প্রবন্ধে তিনি সে সমস্ত প্রাচীন শ্লোক ও 'শ্রুতি' উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার দিকে নজর করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষাতেই সম্যক্ ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই।

১৩৭৬ সালের আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত মাসিক বসুমতীর গীতা বিচারে তিনি বলিতেছেন—

"মীমাংসকের উপদেশ—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বপদাস্পদম্॥

ইহার অনুবাদে তিনি বলিতেছেন—

"যে সুখ দুঃখমিশ্রিত নহে, উত্তরকালেও যাহা দুঃখগ্রস্ত হয় না এবং যে সুখ ইচ্ছামাত্রেই উপনীত হয়, তাহা স্বর্গ।"

উপরোক্ত মূল ও অনুবাদ মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, তর্করত্নমহাশয় "ন" শব্দের অনুবাদে "না" গ্রহণ করিয়াছেন, "গ্রস্ত" শব্দের অনুবাদে "দুঃখ-গ্রস্ত" এবং "স্বপদাস্পদং" শব্দের অনুবাদে "স্বর্গ" গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা তর্করত্নমহাশয়কে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি :—

(১) সত্ত্বা এবং আত্মা-সম্বন্ধীয় বাক্যে যখন "ন" শব্দটী ব্যবহৃত হয় তখন ঐ "ন" শব্দটীর অর্থ যে "না" হইতে পারে তাহা তিনি কোন ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণ অথবা নিরুক্তের কোন সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারেন কি? "ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে" পাণিনির এই সূত্রটী যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, চরজীবের কোন কার্য্য-সম্বন্ধীয় বাক্যে যখন "ন" ব্যবহৃত হয়, তখন "ন"-শব্দে "লোপ" অথবা "না" বুঝায় বটে, কিন্তু যখন সত্ত্বা, আত্মা অথবা শরীরের কার্য্যসম্বন্ধীয় বাক্যে "ন" ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থে "ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া" অথবা উন্মেষ ও বিকাশ গ্রহণ করিতে হয়।

(২) "গ্রস্ত" শব্দের অর্থ যে "দুঃখগ্রস্ত" হইতে পারে তাহাও কি তিনি কোন ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণ অথবা নিরুক্তের কোন সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারেন?

(৩) "স্বপদাস্পদং" শব্দের অর্থ যে 'স্বর্গ' হইতে পারে তাহা কি তিনি ঐ পদটিকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন।

ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তর্করত্ন মহাশয়ের উপরোক্ত অনুবাদ সর্ব্বতোভাবে অলীক।

ঐ শ্লোকটীতে বাস্তবিক পক্ষে "সুখে"র সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে "স্বর্গে"র কোন কথা নাই। কোথা হইতে ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা আমাদিগের জানা নাই। কাযেই,

উহার কার্য্য-কারণসঙ্গত স্থানীয় অথবা বিশেষ বক্তব্য আমরা উদ্ধার করিতে সক্ষম নহি। ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে উহার মৌলিক মর্ম্মার্থ ঃ—

"শরীরস্থ বায়ুসম্বন্ধীয় অনুভূতির যে উন্মেষ ও বিকাশ দুঃখের দ্বারা কখনও কখনও বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়, যে উন্মেষ ও বিকাশ ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি লোলুপতা আনয়ন করে, এবং যাহা অভিলাষের সার্থকতায় অনুভব করা যায় তাহার নাম সুখ। ইহা যাঁহারা স্বত্বাকে বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অন্ধ তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয়।

অগামী বারে তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত আরও কয়েকটী প্রাচীন বাক্য ও তাহার অনুবাদ অবলম্বন করিয়া তর্করত্ন মহাশয় যে সম্যক্ ভাবে সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই তাহা আমরা দেখাইব। তাহার পর মোক্ষ-যোগাধ্যায়ে ব্যাসদেব কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের সম্ভাব্য পরিণাম

গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভ হইতে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেই, ভারতের বড়লাট দেশের বিভিন্ন নেতাদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন এবং পরে জানা যায় যে, ভারতকে বর্ত্তমান অবস্থায় 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসে' উন্নীত করা যায় কি না, মোটামুটি ভাবে ইহাই সে আলোচনার বিষয় ছিল।

অদূরভবিষ্যতে ভারতের 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্' লাভের সম্ভাবনা আছে কি না, এবং বর্ত্তমানে উহা লাভ করিলে তাহার আশু ফল কি দাঁড়াইতে পারে, বর্ত্তমান সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য তাহার আলোচনা করা।

অনতিবিলম্বে ভারতের 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্' লাভের সম্ভাবনা আছে কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—এ বিষয়ে বর্ত্তমানে আলোচনা কি নিমিত্ত উত্থাপিত হইয়াছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কর্ত্তৃক এই সন্ধিক্ষণে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্' প্রসঙ্গের প্রথম অবতারণা হয় নাই, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কংগ্রেস্ ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক ভারতের শাসনতন্ত্র-রচনার বিষয়ে ভারতবাসীর দায়িত্ব বিষয়ে ব্রিটিশ জাতির মত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় এবং ঐ প্রস্তাবে ভারত পূর্ণ গণতন্ত্র লাভ না করিলে গণতন্ত্রের নামে যে-যুদ্ধ তাহার সহায়তা করা যে ভারতের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে, ইহার উল্লেখ থাকাতেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় অনুমান করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, আমাদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের নৈপুণ্য এবং রাজনীতিজ্ঞতা প্রমাণ করিতে যত বক্তৃতাই দান করুন না কেন এবং যত প্রস্তাবই রচনা করুন না কেন, যদি অনতিবিলম্বে সন্ধি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তবে কোন ক্রমেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনেরই অনুমতি লাভ করা যাইবে না। অন্যপক্ষে, যদি ব্রিটিশ কূটনীতি-পরিচালনায় অনতিবিলম্বে সম্মানজনক কোন সন্ধি-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়, তবে যুদ্ধে জয়লাভার্থ ব্রিটিশ জাতির সহিত ভারতবাসী যাহাতে যোগদানে-বাধ্য হয়, তজ্জন্য ভারতের শাসনতন্ত্র-পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধরগণের এই কার্য্যক্রমের জন্য আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে তাঁহাদিগকে কোনরূপে দায়ী করিতেছি না কিংবা করিতে পারিতেছি না, কেননা বর্ত্তমানের সকল রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধরই এমতাবস্থায় অনুরূপ কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতেন। কিন্তু, দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত ভারতীয় যে-নেতৃবৃন্দ অপরের দুর্দ্দিনের সুযোগ-গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছেন না, তাঁহাদিগকে আমরা ধিক্কার জানাইতেছি। তাঁহাদের এই ব্যবহার কাপুরুষোচিত এবং পাপজনক

হইয়াছে এবং ইহাতে কোনপক্ষের জনসাধারণেরই কোন হিত সাধিত হইতে পারে না। আমরা বলিতে চাহি যে, ব্রিটিশ জাতি এ দেশে যে-শিক্ষা-ব্যবস্থার আমদানী করিয়াছেন, তাহার ফল যখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখন সর্ব্বপ্রকারে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনের পরিবর্ত্তে বরং ভারতবাসীদের নির্ব্বোধ থাকাও শ্রেয়ঃ, যাহাতে তাহারা অপরের দুর্দ্দশায় আন্তরিক সহানুভূতি পোষণ করিতে পারে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ অনতিবিলম্বে কোন সম্মানজনক সন্ধিপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হন, তবে ভবিষ্যতে আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি দাবী করিতে পারিব না, কেন না মনুষ্যের রক্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া (ভারতীয় নেতৃবৃন্দের) এই শ্রেণীর পশুচিত ব্যবহার সহ্য করা যায় না। ইহার ফল দাঁড়াইবে এই যে, মনুষ্যজাতির জরুরী সমস্যাসমূহের সমাধান-কল্পে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ জাতির যে আন্তরিক সহযোগিতার বর্ত্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন তাহার সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে এবং ভারতকে তাহার জনসাধারণের ক্ষুধাতৃষ্ণার হেতু নৈরাশ্যজনক অবস্থাজনিত বিশৃংখল অবস্থায় নিপতিত হইতে হইবে।

বর্ত্তমান সন্ধিক্ষণে যদি ভারতকে 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্'-এর স্তরে উন্নীত করা যায়, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে আমরা এক্ষণে তাহা আলোচনা করিব। ইহা অবশ্য স্মরণীয় যে, ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যান্‌গণ কোন সম্মানজনক সন্ধিপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতিলাভের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনাও নাই, কেবল ব্রিটিশ জাতিকে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইলেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক কথায়, যুদ্ধে জয়লাভার্থ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা মনে করা হইলেই ভারতের 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্'লাভ সম্ভব। অর্থাৎ, এই 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্'-এর বিনিময়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যুদ্ধচালনার্থ লোকজন এবং অর্থ সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

যুদ্ধের শেষ কি দাঁড়াইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এবং সে সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নহে। যে ভাবে বর্ত্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে বলা চলে যে, উভয় পক্ষকেই ইহাতে বহু প্রাণনাশ এবং আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ, ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে উপায়ে 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্'লাভের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা সার্থক করিতে হইলে বহুসংখ্যক ভারতবাসীর প্রাণবিষয়ে এবং ভারতের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের—ইতিমধ্যে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও—বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে দেশের মধ্যে অরাজকতা ঘটিবার সম্ভাবনা, কেন না, ভারতের জনসাধারণের পক্ষে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের অধিকতর অনটন সংঘটিত হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাহাদের ক্ষিপ্তপ্রায় হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয় অবস্থাতেই ভারতে বিশৃংখলা ঘটার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ দাঁড়াইবে মিঃ জওহরলাল নেহেরু এবং অপরাপর নেতৃবৃন্দ-আনীত প্রস্তাব।

সম্ভবতঃ অনেকে পণ্ডিত জওহরলাল আনীত প্রস্তাব বিষয়ে গদ গদ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আর কিছুকাল অতিবাহিত হইলেই তাঁহারা দেখিবেন যে, অচিরাৎ প্রতীকারব্যবস্থা গৃহীত না হইলে দেশের মধ্যে এরূপ বিশৃংখলা ঘটিবে, যে বিশৃংখলা মনুষ্যজাতির লিখিত ইতিহাস-কালের মধ্যে ঘটে নাই।

যাঁহারা নেতৃবৃন্দকে ভোট দান করিয়া তাঁহাদের নেতৃত্বলাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের হস্তে, ইহার একমাত্র প্রতীকার। বর্ত্তমান নেতৃত্বের অবসান বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া,—যে-নেতৃবৃন্দ কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় দাবীর কথা উত্থাপন না করিয়া ব্রিটিশ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌গণের নিকট কেবল ভারতীয় ও ব্রিটিশ জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধানের দাবী উত্থাপিত করিবেন,—তাঁহাদের হইয়া কংগ্রেস্ অধিকারকল্পে, ইহাঁদিগকে সমবেত হইতে হইবে। যদি এই সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌গণের নিকট ভারতবাসী তথা ব্রিটিশ জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান দাবী করা যায়, তবে তাঁহারা ইহার সদুত্তর না দিয়া পারিবেন না, এবং যদি কোন ক্রমে ভারতবাসী ও ব্রিটিশ জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান-উপায় যথাবিহিত এবং আন্তরিক ভাবে গৃহীত হয়, তবে তাহার ফলে প্রত্যেক দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা আসিতে বাধ্য, কেন না, এই অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এমন উপায় গ্রহণ করিতে হইবে, যদ্দারা প্রত্যেকটী দেশ

স্বসম্পূর্ণ হইতে পাবে এবং সকল দেশের প্রত্যেকটী ব্যক্তি বেতনভোগী নফরগিরীর অধীন না হইয়া তাহার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনে সমর্থ হয়।

ভারতবাসী, তথা ব্রিটিশ জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্তার সমাধানকল্পে ভারতের উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা যথাযোগ্য ভাবে গৃহীত হইলে তৎসহায়ে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এরূপ দাঁড়াইবে যে, তাহাতে পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীর প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করা চলিবে। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, ভারত, এমন কি বর্ত্তমান শত্রুপক্ষ জার্ম্মান জাতিকেও তাহাদের আহার্য্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে। জার্ম্মান জন-সাধারণ তাহাদেব প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামাল সরবরাহবিষয়ে নিশ্চিত ভরসা দান করিলে, বিনা রক্তপাতে এবং বিন্দুমাত্র বস্তুগত ক্ষতি সাধন না করিয়াই তাহাদিগের দ্বারাই "হিটলার-তন্ত্রে"র অবসান সম্ভব হইবে।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, ভারতের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দকে যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্'-এর জন্ম বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহাদেব বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত হইবে না এবং সর্ব্বপ্রকারে এই আন্দোলন স্থগিত রাখা প্রয়োজন। তাঁহারা যদি এখনও ইহা বুঝিয়া না উঠিতে পারেন, তবে ভবিষ্যতে অনেক অনিষ্ট সহ্য করিয়া বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে ইহা বুঝিতে হইবে—তখন হয় তো আর প্রতীকারের উপায় থাকিবে না।*

ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি

ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহের প্রতি অবহিত হইতে হইবে :—

প্রথমতঃ, যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণার্থ কংগ্রেস্ ওয়ার্কিং কমিটি গৃহীত প্রস্তাব;

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাট বাহাদুরের সাক্ষাৎকার;

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্'-দানই ব্রিটিশজাতির উদ্দেশ্য, কিন্তু দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারত তাহা সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারে না, বড়লাট বাহাদুরের এতদ্বিষয়ক ঘোষণা;

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারতে ব্রিটিশ জাতির যে-উদ্দেশ্য বলিয়া বড়লাট বাহাদুর প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমর্থনার্থ লর্ড জেটল্যাণ্ডের ঘোষণা;

পঞ্চমতঃ, ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম যে অকল্যাণ হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থ স্যর স্যামুয়েল্ হোরের ঘোষণা এবং তৎকর্ত্তৃক সকলের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা-স্থাপনার্থ বড়লাট বাহাদুর এবং ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ;

সপ্তমতঃ, ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে হাউস্ অব কমান্সের বিতর্ক;

অষ্টমতঃ, ভারতে বিভিন্ন কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ।

উপরিনির্দ্দিষ্ট উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যথাবিহিত বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এক পক্ষে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ—ভারতকে ব্রিটিশ সরকার, অচিরাৎ না হইলেও, যুদ্ধ সাঙ্গ হইবার অব্যবহিত পরেই, স্বকীয় শাসন-ব্যবস্থা-প্রণয়নের অধিকার দান করিবেন,—এই বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্ম যেরূপ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, অন্যপক্ষে ব্রিটিশ সরকার বিনাসর্ত্তে এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতিদানে নিতান্ত নারাজ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, ভারতবাসীরা সম্পূর্ণরূপে ঐক্য-বদ্ধ হইতে পারিলেই তাঁহারা ভারতকে স্বকীয় শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার দান করিতে পারেন। ইহার সরলার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, ১৯৩৫ সনের যে-শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইতেছে "ভেদনীতি", তদধীন অবস্থাতেও কি ভাবে তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইবেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ইহার সন্ধানগতে

* ১২ই অক্টোবর তারিখের 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী রচনা হইতে।

অসামর্থ্য প্রকাশ পাইতেছে বলিয়াই ভারত স্বকীয় শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণের অধিকার-লাভ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

আমরা অবশ্য স্বীকার করি না যে, ব্রিটিশ জাতির এই "ভেদনীতি" সত্ত্বেও দেশবাসীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্যসাধন অসম্ভব। কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতবাসী কর্তৃক ভারতের শাসন-বিধিরচনার অধিকার-দানের উপর যে সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন, সমগ্র ভাবে ভারতবাসীর সেই ঐক্যসাধনের পন্থা আবিষ্কারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অদ্যাবধি যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আমাদিগকে ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। সে যাহাই হউক, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতবাসীদের স্বকীয় শাসনতন্ত্র-রচনার জন্য কংগ্রেসের দাবীর প্রতি যে-ভাব দেখাইতেছেন, তাহা বর্ত্তমান ব্রিটিশ জাতির কূটনীতি-বিদ্যারই অন্যতম দৃষ্টান্ত; অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ জাতির মধ্যে চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন পাওয়া যাইত, ইহা তাহার বিপরীত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিতে পারিয়াছেন, এমন কোন প্রকৃত ব্রিটিশ' এই নীতিকে সরল বলিয়া আখ্যাত করিতে পারিবেন না। ব্রিটিশজাতির চরিত্রের যাহা প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এবং যাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ড যে-আসন লাভ করিয়াছিল, তাহা অটুট থাকিলে, আমরা কংগ্রেসের এই দাবীর উত্তরস্বরূপ, সবলভাবে হয় "হাঁ।" নয় "না" শ্রবণ করিতাম এবং "ভেদনীতি"র সম্পূর্ণ উচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হইত।

ভারতবাসী তথা ব্রিটিশ জন-সাধারণের অবস্থা ইহার ফলে অদূরভবিষ্যতে কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা নিম্নের দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, কংগ্রেসের চাপে যদি ব্রিটিশ জাতি সম্পূর্ণ ভাবে—শাসন-দায়িত্ব—হয় কংগ্রেস্ নয় মুশলিম লীগ, কিংবা কংগ্রেস ও মুশলিম লীগ, এই উভয় দলের উপর সমবেত ভাবে—অর্পণ করেন, তবে কি অবস্থার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা; দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ জাতি যদি শাসন-দায়িত্ব ত্যাগ না করেন এবং বর্ত্তমানে যে ভাবে চলিতেছেন, সেই ভাবে চলিতে থাকেন ও কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদসাধনে আন্দোলন চালাইতে থাকেন, তবে কি অবস্থার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা।

ব্রিটিশ, তথা ভারতবাসী জন-সাধারণের মধ্যে ইহাতে কি অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারের শাসনতন্ত্র অথবা শাসকমণ্ডলী যাহা অথবা যাঁহারাই হউন না কেন, জন-সাধারণ নিজেদের জীবনযাপনার্থ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান লইয়া যেরূপ মাথা ঘামায়, উহা লইয়া তত মাথা ঘামায় না। দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি এই জন-সাধারণ এবং ইহাদের যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থিত হয়, তবে সরকার বৈদেশিক হইলেও তাহাদের কিছু যায় আসে না এবং নিজেদের সরকারও যদি তাহাদের জীবনযাত্রার উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবস্থিত না করিতে পারে, তবে তাহাকেও তাহারা মানিয়া লইতে চাহে না।

সুতরাং, উপরিলিখিত দুই বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভবে জন-সাধারণের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা, তাহার বিচার করিবার জন্য আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, উপরিলিখিত দুই প্রকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কোনটি ত জন-সাধারণের জীবনযাত্রার পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হইবে কি না।

এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, কি ভাবে দেশবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তির ন্যূনতম দ্রব্যের সংস্থান ব্যবস্থিত হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশদ ভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং বর্ত্তমান সন্দর্ভে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব না। কেবল ইহা বলিয়াই অধুনা ক্ষান্ত হইব যে; দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যের সংস্থান ব্যবস্থিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—নদীসমূহের স্রোতঃপথের সকল বাধার উচ্ছেদ করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি। আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, রেল-রাস্তা, মোটর চলাচলের রাস্তা, ব্রিজসমূহ এবং নদীতীরে শহর-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হইলে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে, ব্রিটিশজাতি কংগ্রেসের চাপে শাসন-দায়িত্ব যদি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন, অথবা উহা, কংগ্রেস, নয় মুশলিম লীগ কিংবা মিলিত ভাবে কংগ্রেস ও মুশলিম লীগের হস্তে অর্পণ করেন, তবে জন-সাধারণের মধ্যে যে অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেখ-

রাস্তা, মোটর চলাচলের রাস্তা, ব্রিজসমূহ এবং নদীতীরে শহর-নির্ম্মাণ ত্যাগ করার পক্ষে ঐ অবস্থা অনুকূল হইবে কি না, তাহা জানিবার দরকার।

একই ভাবে, যদি ব্রিটিশ জাতি শাসনদায়িত্ব পরিহার না করিয়া যে-ভাবে বর্ত্তমানে চলিতেছেন, তেমনই চলিতে থাকেন, এবং কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদকল্পে আন্দোলন চালাইতে থাকে, তবে জন-সাধারণের মধ্যে কি অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও, ঐ অবস্থা রেলরাস্তা, মোটর চলাচলের রাস্তা, ব্রিজসমূহ এবং নদীতীরে শহরপ্রতিষ্ঠা ত্যাগ করার পক্ষে অনুকূল কি না, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার দরকার।

অতঃপর আমরা বিচার করিব যে, কংগ্রেসের চাপে ব্রিটিশ জাতি শাসনদায়িত্ব পরিহার করিয়া হয় কংগ্রেস, নয় মুসলিম লীগ, কিংবা মিলিত ভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, উভয়ের উপর যদি অর্পণ করেন, তবে কি অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনা।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, ব্রিটিশজাতি স্বেচ্ছায় ভারতের প্রদেশসমূহের অথবা কেন্দ্রীয় শাসনদায়িত্ব পরিহার করিতে পারেন না, কেন না, স্বকীয় জীবিকার জন্য তাঁহাদিগকে বহুলাংশে ভারতীয় বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ইহা যদি তাঁহারা করেন, তবে কেবল তেমন কোন চাপ উপস্থিত হইলেই করিতে পারেন। মনোবিজ্ঞানের তথ্য হইতেছে যে, স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে কোন ব্যক্তি বাধ্য হইলে, সে-ব্যক্তি, যে-শক্তির অধীনে তাঁহাকে এইরূপে স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইতেছে, সে-শক্তির শুভানুধ্যায়ী হইতে পারে না কিংবা তাহার সহযোগিতা করিতে পারে না।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ অথবা উভয়ের মিলিত চাপে ব্রিটিশজাতি ভারতের শাসন-দায়িত্ব পরিহারে বাধ্য হইলেও, তাঁহারা, কংগ্রেসই হউন, অথবা মুসলিম লীগই হউন, কাহারও পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার সহিত আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করিতে পারেন না। সুতরাং, ইহার ফলে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবেই হউক, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে সর্ব্বদা ব্রিটিশ জাতির তীব্র বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় সরকারসমূহ একক ভাবে কংগ্রেস, অথবা মুসলিম লীগ, কিংবা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, মিলিত ভাবে উভয়ের উপর যদি অর্পিত হয়, তাঁহাদিগকেও—জন-সাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যের সংস্থান-ব্যবস্থার জন্য যে-গবেষণার আবশ্যক, তদপেক্ষা দেশের বিভিন্ন দল এবং শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিবার জন্যই অধিকতর ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

দেশের প্রকৃত অবস্থা যেমন কম-বেশী এইরূপ দাঁড়াইবে, অর্থাৎ বৃটিশ-জাতির তীব্র বিরুদ্ধাচরণের সহিত হিন্দু, মুসলমান এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই দেখা যায় যে, রেলরাস্তা, মোটর চলাচলের রাস্তা, ব্রিজসমূহ এবং নদীতীরে শহরনির্ম্মাণের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ-সাধন, এই সকল কার্য্যে ব্রিটিশ জাতির সহযোগিতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না।

সুতরাং ইহা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশরা শাসনদায়িত্ব-পরিহারে বাধ্য হউন, অথবা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একক ভাবে অথবা উভয়ে মিলিত ভাবে শাসনদায়িত্ব লাভ করুন, তেমন অবস্থায় কোন ক্ষেত্রেই দেশের জন-সাধারণ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জনে সমর্থ হইতে পারে না।

ব্রিটিশজাতি শাসনদায়িত্ব পরিহার না করিয়া বর্ত্তমানে যেরূপ ভাবে শাসন পরিচালনা করিতেছেন, সেইরূপ ভাবে শাসন-পরিচালনা চালাইতে থাকিলে এবং কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদকল্পে আন্দোলন চালাইতে থাকিলেও অবস্থা একই প্রকার দাঁড়াইবে। কেন না, সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশজাতির উচ্ছেদ-চেষ্টা তথা ভারতীয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী। দেশের মধ্যে যে-ভাব রেল রাস্তা, মোটর চলাচলের রাস্তা, ব্রিজসমূহ এবং নদীতীরস্থ শহর নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের অনুকূল, বিরোধিতার ভাব তদ্‌বিরুদ্ধ।

সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত মাত্রায় মেঘাচ্ছন্ন এবং যদি দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের চিরাচরিত পন্থাসমূহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক না হন, তবে ইহাতে দেশের মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইতে বাধ্য।*

---

* ২রা নভেম্বর তারিখের "দি উইকলি বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

দেশের আসন্ন বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে

বৃটিশ, তথা ভারতীয় রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ তাঁহাদের গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া প্রকৃত পথে চলিবার জন্য মন প্রস্তুত করিতে পারিলেই দেশের এই আসন্ন অরাজক অবস্থা হইতে অব্যাহতি সম্ভব।

ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণের উন্মত্তপ্রায় আচরণ সত্ত্বেও বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কি উপায়ে এই আসন্ন অরাজক অবস্থা হইতে দেশকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অতঃপর আমরা প্রথমেই তাহার আলোচনা করিব।

জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান না হইলে তাহারা যেরূপ বিপন্ন হইবে, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি, অর্থাৎ দেশকে অরাজকতা হইতে নিষ্কৃতি দানের কি পন্থা, ইতিপূর্ব্বে তদালোচনায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন হইতেছে, নদীস্রোতসমূহের বাধা অপসরণপূর্ব্বক জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংস্কার-সাধন। ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, রেল-রাস্তা, মোটর চলাচলের রাস্তা, ব্রিজসমূহ এবং নদীতীরস্থ শহর-নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত না হইলে, এই ব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই কার্য্য সফল হইতে পারে না। পরবর্ত্তী আলোচ্য হইতে আমাদের এই বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

রেল-রাস্তা প্রভৃতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে, প্রাথমিক কার্য্য হিসাবে দুইটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য। রেলরাস্তাসমূহের উচ্ছেদ সাধিত হইলে, যাঁহারা রেল কোম্পানীতে মূলধন খাটাইতেছেন, যাঁহারা রেল কোম্পানীর চাকুরী করিতেছেন এবং রেল কোম্পানীর সাহায্যে ব্যবসায়ের দ্বারা যাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। কেবল তাঁহাদেরই নহে, জনসাধারণকেও চলাচল-ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইবে। মহাজন, উপরিতন ও অধস্তন রেল-কর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ীদের এই ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। জনসাধারণের চলাচল-ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করিবার জন্য রেলের পরিবর্ত্তে জলপথে চলাচল ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। জলপথের এই ব্যবস্থার জন্যও এক দিকে যেমন প্রচুর অর্থ আবশ্যক, তেমনই ষ্টীমলঞ্চ এবং ষ্টীমার প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে কারুবিদ্যার যথেষ্ট নৈপুণ্য আবশ্যক। সুতরাং রেলরাস্তাসমূহের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে যেমন প্রচুর অর্থ, তেমনই কারুবিদ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্য আবশ্যক। প্রচুর পরিমাণের অর্থ এবং কারুবিদ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ব্যতিরেকে দেশের আসন্ন অরাজক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর কোন উপায় নাই। জনসাধারণের অনাহার-সমস্যার সমাধান-পন্থার বিষয় রেলরাস্তাসমূহের উচ্ছেদ দ্বারা সাধিত করিবার চিন্তায় যদি কেহ মহাজন, রেলের কর্ম্মচারিসমূহের ক্ষতিপূরণের বিষয় কিংবা জলপথ-ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিয়া চলিতে চাহেন, তবে দেশকে এক অরাজক অবস্থা হইতে মাত্র অপর অরাজক অবস্থায় নিক্ষেপ করা হইবে।

মোটর চলাচলের রাস্তা, ব্রিজসমূহ এবং নদীতীরে শহর-নির্ম্মাণের উচ্ছেদ ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলেও, তেমনই প্রচুর অর্থ এবং কারুবিদ্যার যথেষ্ট নৈপুণ্য আবশ্যক। এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ এবং কারুবিদ্যার যথেষ্ট নৈপুণ্য কি ভাবে ব্যবস্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় দেখা যায় যে, জনসাধারণের অনাহার ও বেকার-সমস্যা পূরণের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ জাতির সহযোগিতা-লাভে বঞ্চিত হইয়া কেবল মাত্র ভারতবাসীর দ্বারা ঐ কার্য্য সম্ভব নহে। এমন কি, ভারতবাসিগণের এই দুই অত্যন্ত জরুরী সমস্যা সমাধানের পথে জার্ম্মান কিংবা রুশ জাতিও অচিরাৎ কোন সাহায্য দান করিতে পারেন না।

যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ, ভারতবাসীর এই বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ক শিক্ষায় সচেষ্ট হন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণের তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ সাধনের প্রয়াস সত্ত্বেও, তাঁহারা ঐ কার্য্য সাধন করিতে পারেন।

অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে যাহা শিক্ষণীয়, তাহা শিক্ষা করিয়া যদি ব্রিটিশ জাতি ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণ ব্রিটিশ জাতির রাষ্ট্রনৈতিক সহযোগিতা না লইয়াও এই দুই জরুরী সমস্যার সমাধান করিবার উপযোগী কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে পারিলে, তাঁহারা (ব্রিটিশ জাতি) এদেশের বিভিন্ন শাসনযন্ত্র ভারতীয়গণকে অর্পণে আপত্তি করিবেন না, তবে তাঁহারা (ব্রিটিশারগণ) দেখিতে পাইবেন যে, সমগ্র জগদ্বাসীর সমক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণের অপদার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাঁহারা (ব্রিটিশ জাতি) ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের, অর্থাৎ শতকরা সাতানব্বই জনের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। এই ঘোষণান্তে ব্রিটিশ জাতি যদি কার্য্যতঃ অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধানোপযোগী ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাঁহারা আগামী শত শত বৎসরের জন্য যে কেবল ভারতবাসী জনসাধারণের হৃদয়ের আধিপত্যলাভে সমর্থ হইবেন তাহা নহে, ব্রিটিশ জনসাধারণ, তথা সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের হৃদয়ের উপর আধিপত্য-প্রতিষ্ঠাতেও সমর্থ হইবেন। ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি বিহিত হইলে ভারতে এমন প্রচুর পরিমাণ আহার্য্য ও কাঁচামালের উৎপাদন সাধিত হওয়া সম্ভব হইবে যে, ভারত সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবী সাধারণের উপযোগী যথেষ্ট আহার্য্য ও কাঁচামাল বিনামূল্যে সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে জানিয়াই আমরা এই কথা বলিতেছি। হিটলার, ষ্টালিন ও মুসোলিনী তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের শ্রমজীবী সাধারণের হৃদয়-জয়ে সমর্থ হইয়াছেন বলিলে অন্যায় কথা বলা হইবে না এবং তাঁহারা যে ইহাতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা উঁহাদের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন এবং ঐ উদ্দেশ্যকেই যে, তাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার বাস্তব প্রমাণ দানেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যদ্যপি স্ব স্ব দেশের জনসাধারণের বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধানকে এই তিন জন ডিক্টেটর তাঁহাদের জীবনের ব্রত করিয়া শ্রমজীবী সাধারণের হৃদয়জয়ে সমর্থ হইয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কার্য্যতঃ ইহা সমাধান করিতে পারেন নাই এবং বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, শেষ পর্য্যন্ত উঁহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, কেন না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, মনুষ্যজাতির অনাহার সমস্যার সমাধান এশিয়া, বিশেষতঃ ভারতের মধ্যস্থতায় যত শীঘ্র সম্ভব, ইয়োরোপ কিংবা আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইহার সমাধান তত শীঘ্র হইতে পারে না। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া ভারতের সাহায্যে যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ যথাবিহিতভাবে মানবজাতির এই সমস্যাসমূহের সমাধানে অগ্রসর হন, তবে, হিটলার অথবা ষ্টালিন, অথবা মুসোলিনী নহেন, তাঁহারাই সমগ্র মানবজাতির আধিপত্যলাভে সমর্থ হইবেন।

এই চিন্তাপ্রণোদিত হইয়াই আমরা বলিতেছি যে, ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণের ব্রিটিশ উচ্ছেদ-আন্দোলন সত্ত্বেও, যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ তাঁহাদের গোঁড়ামী পরিহার করিয়া ঠিক পথে চলিতে পারেন, তবে তাঁহারা ভারতকে—কেবল ভারত কেন, সমগ্র পৃথিবীকে—আসন্ন অরাজক অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। যদ্যপি আমরা জ্ঞাত আছি যে, তাঁহারা ইহা করিতে সমর্থ, তথাপি তাঁহারা ইহা কার্য্যতঃ করিবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে, কেন না, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আমাদের নিকট দাম্ভিকতা এবং নিজেদের জ্ঞান ও চাতুর্য্য সম্বন্ধে অনুচিত মূল্যবোধক বলিয়া মনে হয়। এখনও যাহাতে তাঁহারা সতর্কতা অবলম্বন করেন, আমরা তাহাই চাহি। ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণ কর্ত্তৃক ব্রিটিশ জাতির উচ্ছেদ-আন্দোলন সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ জনসাধারণকে যেরূপ আসন্ন অরাজক অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারেন, ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণও —যদি তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন কেবল তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন এবং সংস্কার-মুক্ত হইয়া প্রকৃত পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হন,—তাঁহাদের পরাধীনতা সত্ত্বেও এই কার্য্য সফল করিতে পারেন।

অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণকে প্রকৃত পথে চলিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাদের সাম্রাজ্যবাদমূলক এবং প্রভুত্বলোভী মনোভাব সত্ত্বেও তাঁহাদের কার্য্যে ইঁহাদিগকে আন্তরিক ভাবে সহযোগী হইতে হইবে। ইহার অর্থ আরও দাঁড়ায় এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া উঠিতে না পারেন যে, গত কিছু কালের জন্য যে অনাহার ও বেকার সমস্যা মনুষ্য

জাতিকে পীড়িত করিতেছে, তৎসমাধানবিষয়ক তথ্যসমূহের জ্ঞানের দিক্ দিয়া ভারতীয়দিগের অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থা অধিকতর উন্নত নহে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণ কার্য্যতঃ কোন ক্রমেই শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। ইহার অর্থ আবার আরও দাঁড়াইবে যে, জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান কিরূপে করিতে হইবে, বস্তুতঃ তাহা জানিয়াও যাঁহারা "অহিংসা," "অসহযোগ," "নিরস্ত্র প্রতিরোধ," "অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন" প্রভৃতি বিভ্রান্তকারী উক্তিসমূহ যথা-তথা ব্যবহার করেন, ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণকে তাঁহাদের নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে হইবে।

অতঃপর আমরা বিচার করিব, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের সাম্রাজ্যবাদমূলক মনোভাব সত্ত্বেও ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণ কোন্ পথে চলিলে, তাহাকে যথোচিত বলা যাইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী বর্ত্তমানে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী কার্য্যবিধি লইয়াই আমরা আলোচনা করিব, অর্থাৎ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের পদত্যাগের পর হইতে কি ভাবে চলিতে হইবে, আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

আমরা সকলেই জানি যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব অনুযায়ী মন্ত্রিসভাসমূহের পদত্যাগ ঘোষিত হইবার পর বড়লাট মেসার্স গান্ধী, জিন্না এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন। পরবর্ত্তী সংবাদে এই সাক্ষাৎও এক প্রকার নিষ্ফল হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এক্ষণে, প্রথমতঃ, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উচিত মুসলিম লীগ ও তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের যতগুলি সম্ভব সভ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসমূহ-গঠনার্থ বড়লাটকে অনুরোধ এবং তাঁহাকে নিশ্চিত ভরসা-দান যে, যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল মন্ত্রিসভা ভারতবাসী জনসাধারণের সমস্যা-সমূহের অচিরাৎ সামাধানকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন কংগ্রেস সংগঠনের ইঁহারা আন্তরিক সমর্থন লাভ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে দেশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির অনাহার ও বেকার-সমস্যার বাস্তব সমাধান-পন্থা বিষয়ে অনুসন্ধানী হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে, সরকারসমূহ যে-সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং করিবার প্রস্তাব- উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল কার্য্যের কুফল ও নিষ্ফলতা-প্রমাণার্থ তৎসম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে তথ্য-সন্ধানী হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে—উপরের দ্বিতীয় দফা অনুযায়ী তাঁহারা যে-তথ্যসন্ধানে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা যাহাতে এসেম্বলি ও কাউন্সিলসমূহের সদস্যবৃন্দ, তথা শিক্ষিত সম্প্রদায় জ্ঞাত হইতে পারেন,—তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, সরকার হইতে মধ্যে মধ্যে এই-বিষয়ক যে-সব কার্য্য-প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তাহার কুফল ও নিষ্ফলতা ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত এসেম্বলি ও কাউন্সিলসমূহের কংগ্রেসী সদস্যদিগকে ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণের নির্দ্দেশ দান করিতে হইবে এবং তাঁহারা যেন সরকারী প্রস্তাবসমূহের বিপক্ষে কিংবা স্বপক্ষে ভোট না প্রদান করেন, ইহাও জানাইতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, এসেম্বলি ও কাউন্সিলসমূহের কংগ্রেসী সদস্যগণ যাহাতে কেবল জনসাধারণের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধান-বিষয়ক প্রস্তাব-পন্থার সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে সেই নির্দ্দেশ দান করিতে হইবে।

প্রথম দফায় যাহা বলা হইয়াছে, সেই কার্য্যে অগ্রসর হইলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেখিতে পাইবেন যে, ১৯৩৫ সনের শাসন-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত "ভেদনীতি" ব্যর্থ হইয়াছে। কেন না, তাঁহাদের এই কার্য্য দ্বারা মুসলমান, তথা তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের নিকট ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কার্য্যতঃ প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, তাঁহারা মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের কার্য্যনিয়ন্ত্রণাধিকার-লাভের বিরোধী নহেন। এই উপায় দ্বারা তাঁহারা যে কেবল মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হইবেন তাহা নহে, তাঁহারা এতদ্দ্বারা জনসাধারণের শুভেচ্ছা-লাভেও কৃতকার্য্য হইবেন; কেন না, তাহারা (জনসাধারণ) দেখিবে যে, তাহাদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের হইয়া নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করা অপেক্ষা তাহাদেরই জীবন-মরণসমস্যার সমাধানের জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত। এইরূপে সমগ্র দেশবাসী মিলিত হইয়া প্রকৃত কংগ্রেস—ধাতুগত ভাবে যে কংগ্রেসের অর্থ দাঁড়ায়, সমগ্র দেশবাসীর মিলন—গঠিত হইবে এবং যখন সমগ্র দেশ নৈতিক ভিত্তিতে

মিলিত হইবে, তখন পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারলাভে বাধা দিতে পারিবে না।

ইহাও অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত নেতারা জনসাধারণের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধান কি ভাবে হইতে পারে, তাহার সঠিক পন্থা না জানিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদের সৈন্যবাহিনীকে, অর্থাৎ এসেম্বলি ও কাউন্সিলসমূহের সদস্যগণকে তদ্বিষয়ে শিক্ষিত না করিতে পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত প্রথমতঃ যে কার্য্যবিধির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পালন সম্ভব নহে। এই জন্যই পরবর্ত্তী কার্য্যবিধিসমূহেরও প্রয়োজন।

আমরা ভরসা রাখি যে, যে-কোন সত্যসন্ধ ব্যক্তি আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্যপন্থার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নেতৃবৃন্দ কি এখনও আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না ?*

যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা

যুদ্ধের অবস্থা বিষয়ে আলোচনায় আমাদিগকে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধ-বিষয়ক সকল সংবাদই 'সেন্সর' মার্ফৎ প্রচারিত হয়। 'সেন্সরশিপ' বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে কি বুঝা যায়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা কষ্টকর হইবে না যে, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাত হইবার যথার্থ পন্থা কেবল মাত্র প্রকাশিত সংবাদসমূহের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ নহে। প্রকাশিত সংবাদসমূহ কেবল যুদ্ধ-নায়কবৃন্দের মনোভাব বুঝিবার সহায়ক হইতে পারে। যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় প্রকৃত সংবাদ জানিতে হইলে, যুদ্ধ-বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদ ব্যতীতও বিভিন্ন দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে। বিভিন্ন দেশসমূহের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যথার্থ পরিপ্রেক্ষণ ব্যতীত যুদ্ধ-বিষয়ক সংবাদ হইতেই আমরা যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তবে আমাদের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

যুদ্ধের অবস্থা জ্ঞাত হইবার পথে যে-"সেন্সরশিপ" এই প্রকার জটিলতা উপস্থিত করিয়াছেন, অনেকে তাহার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, "সেন্সরশিপ" অনাবশ্যক সংস্থাপন নহে। যুদ্ধ মাত্রেই ভীতি-উৎপাদক হইতে বাধ্য এবং জনসাধারণের পক্ষে ভীত হওয়া স্বাভাবিক। জন-সাধারণের নিকট যুদ্ধ-সম্পর্কিত সংবাদ নগ্নভাবে প্রচারিত হইলে তাহাদের পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে এবং তাহার ফলে দেশাভ্যন্তরস্থ শৃংখলা ও শান্তিরক্ষা অধিকতর কষ্টসাধ্য হইতে পারে। তদুপরি, যথাযথভাবে যুদ্ধ-চালনা করিতে হইলে—যাহাতে শত্রুপক্ষ অতর্কিত থাকে, সেই জন্য গোপনীয় ভাবেও অনেক কার্য্য সাধন অত্যাবশ্যক। এই নিমিত্তই যুদ্ধ চলিবার কালে "সেন্সরশিপ" অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

কিন্তু, এই "সেন্সরশিপ" সত্ত্বেও জন-সাধারণ যাহাতে অজ্ঞাতসারে বিপন্ন না হয় অথবা অযথা ঝুঁকিদার বাণিজ্যে লিপ্ত না হয়, সেইজন্য যুদ্ধ-সম্পর্কিত অবস্থার যথাযথ অনুধাবনের সামর্থ্যরক্ষাও আবশ্যক।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা যুদ্ধের যে সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, যদ্যপি মিত্রপক্ষ (অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্স) নিজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহারাই অধুনা যুদ্ধ চালনার পক্ষপাতী, কেন না, তাঁহারা হিটলার-তন্ত্র অর্থাৎ পশুশক্তি-প্রমত্ত সংঘর্ষমুখীনতার উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। একদিকে মিত্রপক্ষের যখন এই মত, অন্যদিকে শত্রুপক্ষ (অর্থাৎ জার্ম্মানগণ) যদ্যপি যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার এক্ষণে শান্তির নিমিত্ত সমুদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। যুদ্ধ-সম্পর্কিত সংবাদ হইতে ইহাও প্রকাশ পায় যে, মিত্রপক্ষ যে সর্ত্ত উপস্থিত করিবেন, তাহাতে যদি শত্রুপক্ষ সম্মত হন, তবে মিত্রপক্ষও শান্তি-স্থাপনে অনিচ্ছুক নহেন। সুতরাং যুদ্ধের সংবাদ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উভয়পক্ষেই সমরলিপ্সা এবং শান্তি-স্থাপনেচ্ছা বর্ত্তমান। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েক স্থানে নিশ্চিত ভাবে পরাজিত হন অথবা দেশাভ্যন্তরে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিড়ম্বনা দ্বারা অসামান্য ভাবে বিপর্য্যস্ত না হন, ততক্ষণ যুদ্ধের অবসান হইবে না।

* ২রা নভেম্বর তারিখের 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভের অনুবাদ।

যুদ্ধের সংবাদের সহিত বিভিন্ন দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি যথাযথ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, যদ্যপি মিত্রপক্ষের আর্থিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা শত্রুপক্ষ অপেক্ষা অনেক অনধিক, তথাপি ইহাও বলা চলে না যে, মিত্রপক্ষের কোনক্রমেই আর্থিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা বিদ্যমান নাই, কেন না, গত দ্বাদশ বৎসরের সংবাদ হইতে প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরাই অনাহার ও বেকার সমস্যার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে এমন কথাও বলা চলিতে পারে যে, যে কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন পক্ষের আর্থিক বিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং তাহার ফলে দেশাভ্যন্তরে বিশৃংখলা দেখা দিয়া যে-কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধ থামিয়া যাইতে পারে।

সুতরাং জন-সাধারণকে বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধ হইতে পৃথক্ এবং সেইজন্য তাহাদিগের ঝুঁকিদার বাণিজ্য বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

ভারতবাসীদের স্বদেশ আক্রমণ সম্বন্ধেও একেবারে অপ্রস্তুত থাকা উচিত নহে। তাঁহারা যেন লক্ষ্য করিতে ভুলিয়া না যান যে, রুশীয়গণের সহিত এইবারে জার্ম্মানগণের দিব্য মিতালী ঘটিয়াছে এবং মিত্রপক্ষ অচিরাৎ শত্রুপক্ষের যুদ্ধাভিযানে বাধা উপস্থিত না করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা গত যুদ্ধে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা অধিক।

সুতরাং জন-সাধারণকে আমরা সময় থাকিতে সাবধান হইবার জন্য বলিতেছি।*

বড়লাট ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য

গত ৫ই নভেম্বর তারিখে ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যে বাণী বেতারযোগে প্রচারিত হয় এবং পরদিন যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়, উভয়ের সম্বন্ধেই একান্ত অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, বড়লাট বাহাদুর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ, উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত, কিন্তু উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের আচরণে প্রকাশ যে, তাঁহাদের কেহই যথাবিহিত মনোযোগের সহিত বড়লাট বাহাদুরের নির্দ্দেশ অনুসরণ করেন নাই। এতৎসত্ত্বেও বড়লাট বাহাদুর আশা রাখেন যে, "উপরিনির্দ্দিষ্ট অনৈক্য এবং বাধাসমূহ কেবলমাত্র পরস্পর-মিলনেচ্ছা, বিশ্বাস ও কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত দৃঢ় বাসনার দ্বারা পরিচালিত আলোচনার সাহায্যে দূর হইতে পারে।"

বড়লাট বাহাদুরের এই প্রত্যাশা,—অর্থাৎ "কেবলমাত্র পরস্পর-মিলনেচ্ছা, বিশ্বাস ও কৃতকার্য্য হইবার দৃঢ় বাসনার দ্বারা পরিচালিত আলোচনার সাহায্যে" রাষ্ট্রনেতাদের অনৈক্য দূর হইয়া তাঁহাদের মধ্যে "প্রকৃত ঐক্য" প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব,—যথার্থ কি না, তাহার বিশ্লেষণ করাই আমাদের এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

আমাদের মত এই যে, বড়লাট বাহাদুরের এই প্রত্যাশা যথার্থ নহে এবং কোন দেশ ও জাতির সকল রাষ্ট্রনেতার মধ্যে এবং কোনও দেশ ও জাতির জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ "প্রকৃত ঐক্য" কেবলমাত্র পরস্পর-মিলনেচ্ছা, বিশ্বাস এবং কৃতকার্য্য হইবার দৃঢ় বাসনার দ্বারা পরিচালিত আলোচনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমরা মনে করি যে, কোন দেশের রাষ্ট্রনেতা, তথা জনসাধারণের মধ্যে "প্রকৃত ঐক্য" কেবলমাত্র নিম্নলিখিত দুইটি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব—:

প্রথমতঃ, যখন দেশের প্রত্যেকের জীবনযাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান-সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, দেশের নেতৃবৃন্দ, তথা জনসাধারণ যখন সর্ব্বপ্রকার রিপুর সংযম-শিক্ষা লাভ করেন। আমাদের সুচিন্তিত মত এই যে, কোন দেশে যতকাল পর্য্যন্ত না উপরের দুই প্রকার অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ততকাল পর্য্যন্ত সে দেশের জনসাধারণ অথবা নেতৃবৃন্দের পরস্পরের মধ্যে "প্রকৃত ঐক্য" প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে।

আমরা "প্রকৃত ঐক্যে"র কথা বলিতেছি এবং পাঠক-

* ২রা নভেম্বর তারিখের 'দি উইক্লি বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

গণকে আমরা স্মরণ রাখিতে বলি যে, সাধারণতঃ জনসাধারণের মধ্যে দুই প্রকার ঐক্য সম্ভব—:

(১) প্রকৃত ঐক্য; (২) বাহ্যিক ঐক্য। জনসাধারণকে যখন মনে ও বাহিরে, উভয়ত্রই ঐক্যবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই ঐক্য আন্তরিক এবং প্রকৃত। কিন্তু যখন জনসাধারণকে কেবল বাহ্যতঃ ঐক্যবদ্ধ দেখা যায়, অথচ মনে মনে তাহারা অনৈক্য পোষণ করে, তখন সেই ঐক্য আন্তরিক নহে, কেবলমাত্র বাহ্যিক। ঘটনা-দৃষ্টে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এই যে, বর্ত্তমান পৃথিবীর কোন দেশ কিংবা কোন জাতির নেতৃবৃন্দ, তথা জনসাধারণের মধ্যেই "প্রকৃত ঐক্যে"র সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ঐক্য বলিতে বর্ত্তমান জগতে যাহা দেখা যায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে আন্তরিক নহে, মাত্র বাহ্যিক। ইহা যদি যথার্থ না হইত, তবে প্রত্যেক দেশ এবং জাতির মধ্যে বর্ত্তমানে দলাদলি কিংবা মতবৈষম্য দেখা যাইত না।

"প্রকৃত ঐক্য" যে "বাহ্যিক ঐক্য" অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যপ্রদ, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকিবার কথা নহে। কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, যখন "প্রকৃত ঐক্য" সম্ভব হয় না, তখন "বাহ্যিক ঐক্য" কার্য্যকরী হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ হইলেও, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, "বাহ্যিক ঐক্য" জাতির পক্ষে হিত অপেক্ষা অধিক অহিত-সাধক হইয়াছে বলিয়াই দেখা যায়। আধুনিক জগতে জাতিতে জাতিতে যে-কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই, ইহা স্পষ্ট হইবে। প্রায় সকল জাতিই পরস্পরের প্রতি বাহ্যতঃ ঐক্যভাব প্রদর্শন করিলেও, সামান্যতম বিষয়ে পর্য্যন্ত ইহাদের কোন একটি জাতির মধ্যে মত-বৈষম্য অনুপস্থিত বলিয়া দেখা যায় না। সুতরাং আধুনিক জগতে জাতিসমূহের ঐক্যকে "প্রকৃত" অপেক্ষা অধিক 'বাহ্যিক' বলিতে হইবে।

ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? বাহ্যতঃ তাহাদের প্রত্যেকেরই শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিয়া চলিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে—কোথাও, ইহাদের কেহই এই দুইয়ের একটিরও সামান্য মাত্র অধিকারী নহে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে-কোন দলের নেতৃবৃন্দের কদাচিৎ কাহাকেও দেখা যাইবে, যিনি বিরুদ্ধ পক্ষের নেতৃবৃন্দের পতনের বাসনা দ্বারা মনে মনে দগ্ধ হইতেছেন না, কিংবা তাঁহাদের পতনে পুলক বোধ করিতেছেন না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারেও প্রত্যেক জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্যবিস্তার-প্রয়াসে—আর্থিক হউক, রাষ্ট্রীয় হউক অথবা সামরিক হউক,—অপর জাতির বিপক্ষে কোন না কোন প্রকার যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন। এই সকল জাতি তাঁহাদের মনুষ্যোচিত বিচারবোধ এরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, সাধারণ অবস্থায় একটি মাত্র ব্যক্তির প্রাণসংহারকে অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিলেও যুদ্ধে অগণিত প্রাণ-সংহারে তাঁহারা গৌরবান্বিত বোধ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন না।

"বাহ্যিক ঐক্যে"র কুফলসমূহের কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্যও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, "বাহ্যিক ঐক্য" জনসাধারণকে আন্তরিকতা-বিহীন এবং কপট করে, কেন না, ইহাতে জনসাধারণ মনে এক ভাব পোষণ করিলেও বাহ্যতঃ বিপরীত ভাব দেখাইতে বাধ্য হয়। ফলতঃ, যে সত্যপরায়ণতা মনুষ্য-চরিত্রের সারভূত বৈশিষ্ট্য, তাহাই জনসাধারণ হারাইয়া ফেলে এবং তাহারা মনুষ্যাবয়বে পশু-প্রকৃতি হইয়া পড়ে।

সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যাইবে যে, মনুষ্য-জাতির পক্ষে যে ঐক্য প্রয়োজনীয়, তাহা "প্রকৃত", "বাহ্যিক" নহে। ইহাও পরিস্ফুট হইবে যে, ইউরোপ কিংবা আমেরিকা, কোন দেশেই মনুষ্যজাতির মুক্তির পক্ষে অধুনা যাহা অতি-মাত্রায় প্রয়োজন, সেই "প্রকৃত ঐক্য" বিদ্যমান নাই।

যখন ইহা অত্যন্ত পরিস্ফুট যে, এমন কি, ইংলণ্ডেও "প্রকৃত ঐক্য" নাই, তখন ইহা নিরাপদেই বলা যায় যে, ইংলণ্ডের কোন রাজনীতিবিদের পক্ষে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অথবা জনসাধারণের মধ্যে কি ভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সাধারণ অবস্থায় তাহার নির্দ্দেশদান সম্ভব নহে,—যদি অবশ্য তাঁহার স্বদেশ যে-ধারায় অভ্যস্ত, তদপেক্ষা কোন বিভিন্ন ধারায় তিনি চিন্তা করিতেছেন, ইহা না জানা যায়। এই যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া আমরা মতপ্রকাশে বাধ্য হইতেছি যে, লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো কিংবা তাঁহার সতীর্থগণের কেহই প্রকৃত ঐক্য-প্রতিষ্ঠার উপায় নিজেরা যেরূপ জ্ঞাত নহেন, তেমনই কি ভাবে ভারতকে এতদ্বিষয়ক শিক্ষা দান করা যায়, তাহাও পরিজ্ঞাত নহেন, কেন না, তাঁহাদের কাহাকেও—যে-ভাবে

তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক লেখকবৃন্দ তাঁহাদিগকে শিক্ষিত করিয়াছেন—তদপেক্ষা বিভিন্ন ভাবের চিন্তা করিতে দেখা যায় না। সুতরাং বলিতে ইচ্ছা যায়, "চাচা আপন বাঁচা।"

এই ভাবে যদি বর্ত্তমান কালের ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ নিজেরা যাহা জ্ঞাত নহেন, অপর জাতিকে তদ্বিষয়ক শিক্ষা দান করিবার জন্য উদগ্রীব না হইতেন, তবে তাঁহাদিগকে হিটলার-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের সরল উদ্দেশ্য সাধনার্থে অগণিত মনুষ্যের প্রাণ-সংহারের বিপদে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন হইত না। আমাদের মতে, নিজেরই যাহার জ্ঞান নাই, তদ্বিষয়ে অপরকে শিক্ষাদানের প্রবৃত্তি "ফাঁকিবাজী"র সমর্থক, এবং বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাষ্ট্র-নেতাগণের চরিত্রের ইহাই হইতেছে অন্যতম বৃহৎ ত্রুটি। ব্রিটিশ জাতির জনসাধারণ সরল-প্রকৃতি এবং তাঁহারা সর্ব্বদা দেশপ্রেমের প্রেরণা-প্রবুদ্ধ বলিয়াই ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাদের এই প্রকার প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহারা এতদিন চালাইয়া আসিয়াছেন। ব্রিটিশ জনসাধারণের এই দেশাত্মবোধ এবং সত্যপরায়ণতা সত্ত্বেও যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এত সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাইতে হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণই হইতেছে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের এই দাম্ভিকতা। ব্রিটিশ জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা নিজেদের যোগ্যতার সহায়ে যে-সাম্রাজ্য গঠন করিয়া গিয়াছেন, সেই সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে, ব্রিটিশ রাজনীতি-বিদ্যার সম্পূর্ণ সংস্কার অত্যাবশ্যক।

কেবল মাত্র পরস্পর-মিলনেচ্ছা, বিশ্বাস ও কৃতকার্য্য হইবার দৃঢ় বাসনার দ্বারা পরিচালিত আলোচনার সাহায্যে রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে অনৈক্যের অবসান করিয়া প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠান সম্ভব কি না, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে প্রথম দেখিতে হইবে যে, কেন মনুষ্যে মনুষ্যে অনৈক্য এবং তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে কলহ ও দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তির কেন উদ্ভব হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, যেখানে যেখানে এই দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব পরিস্ফুট, সর্ব্বত্রই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, অথবা কোন না কোন রিপুর সংযম-সামর্থ্যের অভাব বিদ্যমান। ইহাও পরিলক্ষিত হইবে যে, কোন সমাজে যতক্ষণ হয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, অথবা রিপু-সংযমনের অসামর্থ্য না ঘটে, তথায় দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের অনৈক্যের কারণসমূহের মূল নিবারণে প্রয়াসী হইলেও দেখা যাইবে যে, এখানেও ঐ একই কারণ বর্ত্তমান।

কোন ট্রেণে যদি এক হাজার যাত্রীর আসনের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু দেড় হাজার টিকিট বিক্রয় হয়, তবে সেই ট্রেণের যাত্রীদের যে অবস্থা হয়, ভারতবাসীর অবস্থা বর্ত্তমানে প্রায় সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। যদি ধারণা থাকে যে, কোন ট্রেণে যাত্রীর আসন-ব্যবস্থা যেরূপ, তদনুযায়ীই টিকিটও বিক্রয় হইয়াছে, তাহা হইলে ট্রেণে উঠিবার নিমিত্ত তেমন কোন উদ্বেগ ও ত্বরা থাকিতে পারে না, কেন না, কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার ভয় থাকে না। কিন্তু যদি ধারণা হয় যে, ট্রেণে যাত্রীর আসন-ব্যবস্থা যেরূপ তদপেক্ষা অধিক টিকিট বিক্রয় হইয়াছে, তবে পূর্ব্বাহ্ণে আসন-সংগ্রহার্থ ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব ঘটিতে বাধ্য; কেন না, কতিপয় ব্যক্তি সে ক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য। এমতাবস্থায় সকল যাত্রীকে সুখী করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, ট্রেণের আসন-সংখ্যার বৃদ্ধি; অপর কোন উপায়ই বিদ্যমান নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, টিকিট বিক্রয়ের সংখ্যা হ্রাস করিলেও যাত্রীদের সুখী করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভ্রমণেচ্ছুদিগকে টিকিট না দিয়া আর কোন উপায়েই যে সুখী করা যায় না, তাহাও বুঝা দরকার।

ভারতের অধিবাসীদিগের আর্থিক অবস্থার সহিত উপরের উপমার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের উৎপন্ন আহার্য্যের পরিমাণ যে-সংখ্যক লোকের পক্ষে যথেষ্ট, তদপেক্ষা ভারতের জনসংখ্যা অধিক। ফলে দেশের কিয়দংশ লোকের হয় সম্পূর্ণ অনশনের ফলে অকালমৃত্যু, নয় অর্দ্ধাশনের ফলে অসুস্থ হওয়া অপরিহার্য্য। এ ক্ষেত্রে জন-সাধারণের মধ্যে এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে জীবিকা-ব্যাপারে সংঘর্ষ না হইয়াই পারে না। এই অবস্থার একমাত্র প্রতীকার হইতেছে—ভারতের প্রত্যেকটী অধিবাসী যাহাতে অন্ততঃ জীবন-যাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করিতে পারে, তদনুরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতার সৃষ্টি। এই প্রতীকার-পন্থা উপস্থিত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জন-সাধারণের মধ্যেই হউক অথবা নেতৃবৃন্দের মধ্যেই হউক, সংঘর্ষের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ

সম্ভাবনা অদৃশ্য হইয়াছে এবং তাঁহারা আন্তরিক ভাবে মিলিত হইয়া ভারতে ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্ব-কামনায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন।

ভারতবাসিগণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য একবার পূর্বপ্রচলিত হইলে অনৈক্যের যে সম্ভাবনা থাকিবে; তাহা কেবল রিপু-সংযমের সামর্থ্যের অভাব বশতঃ।

ভারতের যুবকবৃন্দ যাহাতে বিভিন্ন রিপুসংযমের শিক্ষা লাভ করে, তদ্রূপ কোন শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলে দেখা যাইবে যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনৈক্যের অবশিষ্ট কারণসমূহ তিরোহিত হইয়াছে।

এইরূপে ভারতের অবস্থা যথাযথভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অপর কোন পন্থায় ভারতে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিরর্থক এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক।

যাঁহারা বলেন যে, "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" ভারতে অনৈক্যের হেতু এবং সেই জন্য তাহার উচ্ছেদের নিমিত্ত যাঁহারা চেষ্টিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা তথাকথিত "সংস্কৃতিগত মৈত্রী" প্রভৃতির সাহায্যে ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত। ব্যাধির কারণসমূহের প্রতীকার না হইলে কোন ব্যাধিরই সম্পূর্ণ নিবারণ সম্ভব নহে। "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, ইহা বলিলেও বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত ভাবে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা"কেই ভারতের সর্বপ্রকার অনৈক্য অথবা এমন কি সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের মূল কারণ বলিয়া কখনও নির্দ্ধারিত করা যায় না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাই যদি ভারতের সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যের, অথবা এমন কি সাম্প্রদায়িক অনৈক্যেরও মূল কারণ হইত, তবে বাঁটোয়ারার উদ্ভবের পূর্ব্বে ভারতবাসিগণের মধ্যে অনৈক্যের ইতিহাস পাওয়া যাইত না।

উপসংহারে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যে প্রত্যাশা,—"কেবল পরস্পর-মিলনেচ্ছা, বিশ্বাস ও কৃতকার্য্য হইবার দৃঢ় বাসনা-পরিচালিত আলোচনার সাহায্যেই" ভারতীয় নেতাদের পরস্পর অনৈক্য অবসান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,—ইহা যথার্থ নহে। তাঁহার লক্ষ্য যদি ভারতীয় নেতাদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য-প্রতিষ্ঠা হয়, তবে তাঁহার সরকারকে প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য যাহাতে ন্যূনকল্পে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান হইতে পারে তৎকল্পে অনেক কিছু করিতে হইবে এবং এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যদ্দ্বারা ভারতীয় যুবকগণ তাহাদের বিভিন্ন রিপু-সংযমে অভ্যস্ত হয়। আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই সকল ব্যবস্থাপনে তাঁহার অকৃতকার্য্যতার জন্য ভারতে অনৈক্যসমূহের অধিকাংশ ভাগ দায়িত্ব ভারতের রাষ্ট্রনেতা তথা জনসাধারণের স্কন্ধ হইতে তাঁহার সরকারের উপরই ন্যস্ত হয়।

হইতে পারে যে, বড়লাটকে প্রকৃত পথের ইঙ্গিতদানের অসামর্থ্যের দায়িত্ব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের, কিন্তু বাস্তব কার্য্যের দায়ে তাঁহাদিগকে দায়ী করা যায় না, কেন না, ভারতীয়গণের অনৈক্যের মূল কারণ দূর করিবার পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, কার্য্যতঃ তাহা একমাত্র ভারত-সরকারই পালন করিতে পারেন।

ভারতের রাজপ্রতিনিধির পদের পুণ্য আসন প্রকৃত ভারতবাসী মাত্রেরই পক্ষে শ্রদ্ধার্হ, সুতরাং রাজপ্রতিনিধি হিসাবে লর্ড লিন্‌লিথগো যে-বাণী উচ্চারণ করেন, তৎসম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে অধিকতর জ্ঞানগর্ভ এবং চিন্তাশীল হইবার নিমিত্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।*

বেলজীয়-ওলন্দাজ শান্তি-প্রস্তাব

বেলজিয়ামের নৃপতি ও হল্যাণ্ডের রাজ্ঞী মিলিতভাবে সমর-রত জাতিসমূহের নিকট শান্তির জন্য যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন, ইহা সুসংবাদ। উক্ত নৃপতি এবং রাজ্ঞীর মিলিত বিবেচনায় শান্তির মূসর্ত্তসহ প্রকৃতপক্ষে কি রূপ দাঁড়াইবে, তাহা জানা যায় নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যদি ব্রিটিশ জনসাধারণ তাঁহাদের মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত পন্থায় পরিচালিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নরহত্যার নৃশংসতা হইতে

* ৯ই নবেম্বর তারিখের 'দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন, তবে শান্তির সর্ত্ত যাহাই হউক, তাঁহাদেরই শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জয়লাভ সুনিশ্চিত।

আমরা মনে করি যে, পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্রই নাই, যে-রাষ্ট্র তাহার জনসাধারণের খাদ্য-সংস্থানের প্রাচুর্য্য ব্যতীত স্বকীয় সামর্থ্য অধিক কালের জন্য অটুট রাখিতে পারে, এবং যে-রাষ্ট্র জনসাধারণের খাদ্য-সংস্থানের প্রাচুর্য্য ব্যবস্থিত করিতে পারে, কোন ক্ষেত্রেই তাহাকে অধিক কালের জন্য অধীন রাখা সম্ভব হয় না এবং ঐ জন্যই আমরা উপরের বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছি।

গত দুই সহস্র বৎসরের জগতের ইতিহাস হইতেই আমাদের এই মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিক্ হইতে গত সহস্র বৎসর কালের জগতের অবস্থা যথার্থ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ এই সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) রাজার প্রাধান্যকাল, (২) রাজা এবং প্রজার বিবাদ-কাল, (৩) কোন না কোন প্রকারের গণতন্ত্রে প্রজার প্রাধান্যকাল। প্রত্যেক দেশেই দেখা যাইবে যে, প্রথমতঃ, অর্থাৎ রাজার প্রাধান্যকালে শান্তি, সন্তুষ্টি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, রাজার এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে একটি বিবাদকালের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ যে-কাল দেখা যাইবে, তখন রাজার পতন ঘটিয়াছে এবং রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে কোন না কোন প্রকারের গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে।

এই তিন বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থাধীন কালে প্রজা-সাধারণের আর্থিক অবস্থা পরীক্ষায় দেখা যাইবে যে, রাজার প্রাধান্যের কালে, যখন সাধারণের মধ্যে সন্তুষ্টি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান, তখন জনসাধারণের মধ্যে প্রায়শঃ দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দেখা দেয় নাই। পরবর্ত্তী কালে যখন সন্তুষ্টি, শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থানে রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব-কলহ দেখা দিয়াছে, তখনকার অবস্থা যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিবর্ত্তে জীবিকার্জ্জনে কষ্ট দেখা দিয়াছে। সর্ব্বশেষে যখন রাজতন্ত্রের স্থানে কোন না কোন ভাবের গণতন্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন দেখা যাইবে যে, জনসাধারণের বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শেষোক্ত কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, শাসনতন্ত্রের রূপান্তরের নিমিত্ত জনসাধারণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল।

প্রত্যেক দেশের এই রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের অবস্থার সহিত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা মিলাইয়া এই পরিবর্ত্তনের কারণ ব্যাখ্যার প্রয়াস করিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন জনসাধারণের পক্ষে জীবিকার্জ্জন কষ্টসাধ্য হয় নাই, ততদিন শাসনতন্ত্র বিষয়েও বিরক্তি দেখা যায় নাই। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে জীবিকার্জ্জনে কষ্ট দেখা দিয়াছে, তখন আর জনসাধারণ সন্তুষ্ট থাকে নাই, তাহার ফলে শেষতঃ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে।

এই জন্যই আমরা মনে করি যে, যতদিন রাষ্ট্র তাহার প্রজার প্রচুর খাদ্যসংস্থান ব্যবস্থা করিতে পারে, ততদিন পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে উৎপাটিত করিতে পারে না এবং অপর পক্ষে কোন রাষ্ট্রশক্তি যদি তাহার প্রজা-সাধারণের খাদ্য-সংস্থান ব্যবস্থার প্রাচুর্য্য রক্ষা না করিতে পারে, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই সেই রাষ্ট্রশক্তি অটুট রাখিতে পারে না।

সুতরাং প্রশ্ন করা যায় যে, যদ্যপি হের হিটলার তাঁহার জাতির তথাকথিত বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের সহায়ে ব্রিটিশ জাতির বিপক্ষে সমরে জয়লাভ করিয়া আপাতদৃষ্টে মিত্রপক্ষের স্বার্থবিরোধী কোন সন্ধি স্থাপনে কৃতকার্য্যও হন, তথাপি জার্ম্মানীর পক্ষে অধিক কালের জন্য তাহার রাষ্ট্রশক্তিকে অটুট রাখা সম্ভব হইবে কি না।

ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার কিয়দংশের কথা দূরে থাক্, জার্ম্মানীর যখন স্বকীয় জন-সাধারণের প্রচুর খাদ্য-সংস্থান-ব্যবস্থারও উপায় নাই, তখন জার্ম্মানী সমগ্র পৃথিবীতে কোন উল্লেখযোগ্যরূপ রাষ্ট্র-প্রাধান্য অধিককালের জন্য অটুট রাখিতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর সম্পূর্ণ জনসংখ্যার খাদ্যসংস্থান ব্যবস্থিত করিতে পারে একমাত্র ইংলণ্ড, কেন না, ভারত তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত। ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংস্কার সাধিত হইলে এই দেশ সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ আহার্য্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিতে সমর্থ।

সকলেই জানেন যে, শান্তির সর্ত্ত হিসাবে জার্ম্মানী জাতিগত, সমুদ্রপথে যান-চলাচলগত এবং বাণিজ্যগত

স্বাধীনতার অত্যন্ত স্বপক্ষে। ইংলণ্ড এই তিনটি সর্ত্তে রাজী হইলে প্রথমে মনে হইতে পারে যে, ইংলণ্ড অতি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, কেন না, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিশ্বব্যাপী এবং সমুদ্রপথের যান-চলাচল ও বাণিজ্য-ব্যাপারে ইংলণ্ডের আসন সর্ব্বশীর্ষে। কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংস্কারে মনোযোগী হইলে—জার্ম্মানীর এই তিন শ্রেণীর স্বাধীনতার সর্ত্ত যদি স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, তাহাতে হের হিটলার প্রথম প্রথম মনে করিয়া সুখ বোধ করিতে পারেন যে, ইংলণ্ডের প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, ইংলণ্ডের কোন প্রাধান্যই তিনি নষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। ইংলণ্ডের কোন প্রাধান্য নষ্ট করা দূরে থাক, এই অবস্থার সৃষ্টি হইলে হের হিটলার দেখিয়া নিরাশ হইবেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, তথা ব্রিটিশ প্রাধান্য সমুদ্রপথে যান-চলাচল ও বিশ্ববাণিজ্য বিষয়ে উত্তরত্রই অধিকতর রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ বর্ত্তমান পৃথিবীর রক্তপাত লিপ্সা সংযত করিয়া ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংস্কারে মনোযোগী হইলে, ভারতে অদূরভবিষ্যতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এমন প্রচুর হইবে যে, তাঁহারা (ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ) প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের আহার্য্য ও কাঁচামালের স্বল্পতা-পূরণে সমর্থ হইবেন জানিয়াই আমরা এই কথা বলিতেছি। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা (ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ) সমগ্র মানবজাতির হৃদয়-জয়ে সমর্থ হইবেন এবং ফলে সমগ্র জগতে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। একবার এই ভাবের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, পৃথিবীর কোন শক্তি ব্রিটিশ জাতির সমুদ্রপথের চলাচল এবং বাণিজ্য-বিষয়ক প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে পারিবে না।

এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, সন্ধির সর্ত্ত যাহাই হউক, পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রিটিশ জনসাধারণ তাঁহাদের মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে পারিলে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণসংহার কাণ্ড রোধ করিতে পারিলে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

এখন প্রশ্ন এই যে, চার্চ্চিল, ইডেন, অ্যাণ্ডারসন-প্রমুখ দাম্ভিক ব্যক্তিবৃন্দের মন্ত্রিসভাকে ব্রিটিশ জনসাধারণ প্রকৃত পথে পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবেন কি না।

ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, কে জানে!*

স্বকীয় প্রশংসায় মিঃ গান্ধী

নিজের বিরুদ্ধে যৌন-বিষয়ক ব্যভিচারের অভিযোগ খণ্ডনার্থ মিঃ গান্ধী নিজেরই সম্বন্ধে বিরাট এক সন্দর্ভ লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই সন্দর্ভে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯০৬ সাল হইতে তিনি 'ব্রহ্মচর্য্যে' ব্রতী আছেন, তখন হইতে তিনি স্বীয় পত্নীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিতে নিজেই ব্রহ্মচর্য্যের রীতি রচনা করিয়াছেন। আমরা নিশ্চিত জানি যে, মিঃ গান্ধীর অন্ধ অনুচরবৃন্দ তাঁহার এই শ্রেণীর প্রবন্ধ-পাঠেও উল্লাস বোধ করিবেন, কিন্তু আমাদের নিকট এই সন্দর্ভের বিষয়ভাগ পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে হইয়াছে, মিঃ গান্ধীর উত্তরে "ঠাকুর ঘরে কে?" "না আমি তো কলা খাই নাই", এই প্রবাদ-বাক্যের ভাব পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট।

আমাদের জ্ঞান হইতে আমরা বলিতে পারি যে, মিঃ গান্ধী যদি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করিতেন, তবে নিজে হইতে তাহার রীতি রচনায় সাহসী হইতেন না; কেন না, তবে তিনি বুঝিতেন যে, যে-ব্যক্তি স্বকীয় দেহমধ্যে 'ব্রহ্ম'-এর আবির্ভাব এবং আচরণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যে'র প্রকৃত রীতিনীতি রচিত হইতে পারে না। মিঃ গান্ধীর এই উপলব্ধি হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবশ্য জানি না, কিন্তু আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান এই যে, যে-ব্যক্তির 'ব্রহ্ম'-বিষয়ক উপলব্ধি যথার্থ হয়,

* "দি উইকলি বঙ্গশ্রী"র ৯ই নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

তিনি কখনও ব্যাধি বা প্রতিহিংসার ভাব দ্বারা পীড়িত হইতে পারেন না। এই শ্রেণীর আত্ম-প্রতারক ব্যক্তিবৃন্দের নেতৃত্ব মানিয়া চলিবার ন্যায় ব্যক্তির অভাব ঘটে না, ইহাই আশ্চর্য্য।*

বাঙ্গালার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি দুইটি সভায় "বাঙ্গালার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ" সম্পর্কে কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—প্রথম, মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর অষ্টাদশ মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার এক সভায়, দ্বিতীয় কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলিকাতার এক সভায়। উভয় সভাতেই, বাঙ্গালার অর্থ-সচিব মিঃ নলিনী-রঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করেন। এই সভা দুইটিতে যাঁহারা বক্তৃতা দান করেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ টি. কে. ঘোষ, মিঃ টি. সি. গোস্বামী, মিঃ এস. এন. সেন, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এবং বঙ্গীয় মিল-সমূহের স্বত্বাধিকারী সমিতির সেক্রেটারী মিঃ সুবিনয় ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। মিঃ সুবিনয় ভট্টাচার্য্য ব্যতীত সভাপতি এবং সকল বক্তাই সাধারণ ভাবে শিল্পবিস্তার ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মিঃ সুবিনয় ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতার বিষয় ছিল, "বাঙ্গালার কাপড়ের কলের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ"।

মেসার্স টি. কে. ঘোষ, টি. সি. গোস্বামী, মিঃ এস. এন. সেন এবং মিঃ পি. সি. গুহ রায়ের বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য বলিতে দেখা যায়, যন্ত্র চালিত শিল্পের ফলাফল তথা স্বাস্থ্যপ্রদ শিল্প-গঠন ও বিস্তার-বিষয়ক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব; সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের মনোযোগ তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন না। জনসভায় এই শ্রেণীর বক্তাদিগকে শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দান করিতে দিলে, তাঁহারা কেবল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে এবং চিন্তাশীল শ্রোতার সময় নষ্ট করিতে পারেন। আমাদের মতে, যে-সব বিষয়ে যাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে সব বিষয়ে তাঁহারা জন-সভায় যাহাতে বক্তৃতা দান না করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে অবহিত হওয়া জনহিতকামী সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার বক্তৃতায় যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে উল্লেখযোগ্য বলিতে হইবে। তাঁহার কুষ্টিয়ার বক্তৃতায় মিঃ সরকার উত্থাপিত প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, "দেশ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হইলে শিল্প-বিস্তার সম্ভব নহে, এই মতবাদ যথার্থ কি না।" দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, "রাষ্ট্রশক্তি শিল্প-বিষয়ক কার্য্যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে শিল্প-বিস্তার অগ্রসর হইতে পারে না, এই মতবাদ যথার্থ কি না।"

উপরের এই দুইটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ সরকার যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হইলে শিল্প-বিস্তার সম্ভব নহে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রশক্তি শিল্প-বিষয়ক কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে শিল্প-বিস্তার যথাযথ ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না—এই উভয় চিন্তাধারাই যথার্থ নহে। তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শিল্প-বিষয়ক কার্য্যে রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ দায়িত্বের অভাব কিংবা দেশে পূর্ণ স্বাধীনতার অভাব থাকিলে, উভয় অবস্থাতেই শিল্প-বিস্তার কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব। মিঃ সরকারের এই মত-বাদের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। দেশ স্বাধীন না হইলে কিংবা রাষ্ট্রশক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ না করিলেও শিল্প-বিস্তার কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কি উপায়ে ইহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারে। এই বিষয়ে মিঃ সরকার সম্পূর্ণ নীরব রহিয়া গিয়াছেন। শিল্প-বিষয়ক তত্ত্বে সামান্য মাত্র প্রবেশ হইলেও অবিলম্বে দেখা যাইবে যে, স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রশক্তি কর্ত্তৃক শিল্পকার্য্য-বিষয়ক দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রচালিত শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে সুফলপ্রদ করা যায় না। শিল্পকার্য্যে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের একমাত্র পন্থা হইতেছে বর্ত্তমান যুগের প্রাকৃতিক শক্তি ও মহাযন্ত্র-পরিচালিত শিল্পানুসরণ পরিহার এবং অতীত যুগের মনুষ্য-শ্রম-চালিত কুটীর-শিল্পের ব্যবস্থা গ্রহণ। কিন্তু কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্যকে স্বাধীন পেশা

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ৯ই নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

হিসাবে লাভবান্ করিতে না পারিলে এবং বৎসরের পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া কৃষকেরা যাহাতে সমগ্র বৎসরের খাদ্য সংস্থান করিতে পারে, কৃষি এইরূপ ভাবে ব্যবস্থিত না হইলে ইহা সম্ভব নহে।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অবস্থা হইতেই সম্পূর্ণ রূপে স্পষ্ট হইতেছে যে, মহাযন্ত্র-চালিত শিল্প, স্বাধীন অবস্থাতেও অথবা রাষ্ট্রশক্তি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে উহার দায়িত্ব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সুফলপ্রদ হইতে পারে না। ইউরোপ ও আমেরিকার এই সকল দেশ শিল্প-বিস্তার বিষয়ে যথাযথ ভাবে সফল হইলে ঐ সকল দেশে বেকার ও অনাহার-সমস্যা দেখা যাইত না, অথবা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ বাজার বিস্তারার্থ ছল-চাতুর্য্য এবং রক্তপাতের প্রয়োজন হইত না। সুতরাং ইউরোপের যুদ্ধ, তথা তাহার সর্ব্বনাশের যাহা মূল হেতু, সেই শিল্প-বিস্তারের স্বপক্ষে মত-প্রকাশ কি, অদূরদর্শিতা ও মস্তিষ্কহীনতার পরিচায়ক নহে? যে-সব ব্যক্তি উপায়ান্তর লাভ না করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য শিল্প-ব্যবসায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে শিল্প-বিস্তারের স্বপক্ষে মত-প্রকাশ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু মন্ত্রিসভার কোন সদস্যের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে সমগ্র ভাবে সমাজের হিতসাধন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহা অশোভন। তৎসত্ত্বেও কোন মন্ত্রিসভার সদস্যকে যদি দেখা যায় যে তিনি কোন শিল্প-বিস্তারের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তবে স্বতঃই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব-পালনের অনুপযুক্ত। সুতরাং দুঃখের সহিত আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মন্ত্রী হিসাবে মিঃ সরকারের সম্বন্ধে আমরা উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারিতেছি না।

বাঙ্গালার কাপড়ের কলের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহা আরও উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া মিঃ সুবিনয় ভট্টাচার্য্য মনে করেন, তাঁহার বক্তৃতা হইতে ইহাই মনে হয়। তাঁহার এই বিশ্বাসের সত্যতা প্রতিষ্ঠার্থ তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৯০৩ সনে যেখানে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ১৯ এবং উহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার এবং স্পিণ্ডল (spindle)-সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ, ১৯৩৮ সনে উহা বাড়িয়া কাপড়ের কলের সংখ্যা হয় ২৮, আদায়ীকৃত মূলধন দাঁড়ায় ২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, তাঁতের সংখ্যা ৯ হাজার এবং স্পিণ্ডল-সংখ্যা ৪ কোটি ১৫ লক্ষ। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, উৎপন্নের পরিমাণ ৭৭ কোটি ৭ লক্ষ গজ হইতে বাড়িয়া ২০৬ কোটি দাঁড়ায়।

এই সকল অঙ্ক হইতে অবশ্য প্রমাণিত হয়, বাঙ্গালার কাপড়ের কল-শিল্প বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার কাপড়ের কলের শিল্প যে সফল হইয়াছে, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হয় না। যদি আমরা পরিচয় পাইতাম যে, বাঙ্গালার অধিকাংশ কাপড়ের কল, প্রতিষ্ঠার পর কিছু কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই বিনা ঋণ-গ্রহণে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিতেছেন, নূতন করিয়া মূলধন না তুলিয়া কার্য্যপ্রসার সাধন করিতে পারিতেছেন এবং তাঁহাদের শ্রমিকদিগের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সহায়তা করিতে পারিতেছেন, তবে আমরা মিঃ ভট্টাচার্য্যের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিতে পারিতাম যে, বাঙ্গালার কাপড়ের কলের শিল্প সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালার কাপড়ের কলের অবস্থা পর্য্যালোচনায় দেখা যাইবে যে, ইহাদের অবস্থা ঠিক বিপরীত। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে-সব কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিকে প্রায় আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত বলিয়া দেখা যাইবে; দেখা যাইবে, কার্য্যপ্রসার ও পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তন নিমিত্ত তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির হয় নূতন মূলধনের নয় ডিবেঞ্চারের প্রয়োজন হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত সবগুলিই দারিদ্র্যপীড়িত এবং অসুস্থ শ্রমজীবীর রাজ্য বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং, যদ্যপি বাঙ্গালার কাপড়ের কলসমূহের প্রচুর প্রসার পরিলক্ষিত হয়, তথাপি যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা চলে না, ঐ শিল্প যথাবিহিত ভাবে সুফলপ্রদ হইয়াছে। বরং এই অসাফল্য সত্ত্বেও যে ইহার বিস্তার দেখা যায়, তাহাতে মাত্র প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালার জনসাধারণ কাপড়ের কলের (অসাফল্য সত্ত্বেও) শেয়ার ক্রয় করিয়া নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ই দান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মিঃ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন, "ভরসার সহিত বলা যায় যে, কর্ত্তৃ-

পক্ষের উপযোগী সততা, কার্য্যসামর্থ্য এবং বিচক্ষণতা, তথা শ্রমজীবিগণের উপযুক্ত বিশ্বস্ততা, কার্য্যনৈপুণ্য এবং শ্রমনিষ্ঠা থাকিলে বাঙ্গালার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত শুভ, যদি অবশ্যপ্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া যায় এবং এই শিল্প ক্রেতাসাধারণের অকুণ্ঠ সহানুভূতি, সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়।" অনেকগুলি 'যদি'-কণ্টকাকীর্ণ মিঃ ভট্টাচার্য্যের এই বক্তব্যের নিমিত্ত তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে পারিতেছি না। ইহার পরিবর্ত্তে, কর্ত্তৃপক্ষ অসৎ, শিথিলনিষ্ঠ এবং নিরুদ্যম না হইয়া পারেন, তথা শ্রমজীবীরা কৃতঘ্ন, নৈপুণ্যহীন এবং অলস না হয় ও এই শিল্প ক্রেতা-সাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে,—কল-পরিচালনার এরূপ কোন পরিকল্পনা তিনি উপস্থিত করিতে পারিলে আমরা তাহা সানন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম।

মিঃ ভট্টাচার্য্যের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা নাই, কিন্তু এমন কথা আমরা বলিবার সাহস রাখি যে, আধুনিক জগতের কল-পরিচালনার প্রচলিত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের যদি তাঁহার প্রকৃত সামর্থ্য থাকিত, তবে তিনি অচিরাৎ বুঝিতে পারিতেন যে, যে-উপায়ে কলের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত শুভ হইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন, বর্ত্তমান কালের বাস্তব অবস্থায় সেই উপায় কার্য্যতঃ পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সংস্কার উদ্দেশ্যে কোন কর্ম্মবীরের উত্থান না হইলে বাঙ্গালার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ নিরতিশয় তমসাচ্ছন্ন। পরিতাপের বিষয় এই যে, যথোচিত ভাবে বিষয়-বস্তুর বিচার করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন না করিয়াও অনেকে তদ্বিষয়ে বাগাড়ম্বর প্রদর্শনে ইতস্ততঃ পর্য্যন্ত বোধ করেন না।*

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা

মিঃ গান্ধী তাঁহার 'হরিজন' পত্রিকায় তৎপ্রকাশিত বহু রচনার মধ্যে সম্প্রতি "নানা মুনির নানা মত Opinions Differ" শীর্ষে একটি সন্দর্ভে "ধর্ম্ম ও জাতীয়তা" বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও জাতীয়তা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণার অভাব এই সন্দর্ভে অতিমাত্রায় পরিস্ফুট বলিয়া মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। তাঁহার "জনৈক মুসলমান বন্ধু" ভারতের মুসলমানগণের জন্ম স্বতন্ত্র জাতীয়তা দাবী করিয়াছেন দেখিয়া মিঃ গান্ধী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সন্দর্ভ হইতে মনে হয়, তিনি এই মুসলমান বন্ধুর ধারণাকে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ কি, তদ্বিষয়ে তিনি কোনও মূলনীতির উল্লেখ করেন নাই।

ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, অথবা বৌদ্ধগণের কাহাকেও বিভিন্ন "জাতি" বলিয়া কেন পরিগণিত করা যায় না, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগের 'ধর্ম্ম' ও 'জাতীয়তা'র অর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতা ও বর্ত্তমান ভাষা-তত্ত্বের সৃষ্টির বহু পূর্ব্বেই মানবের ভাষায় 'ধর্ম্ম' এবং 'জাতীয়তা' এই দুইটি কথার সন্ধান পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই দুইটি কথার সম্যক্ ধারণা গঠনার্থ আমরা যে-শব্দবিজ্ঞান, প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রু ভাষার জননী, তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিব।

এই শব্দ-বিজ্ঞানানুযায়ী "ধর্ম্ম" কথাটির অর্থ হইবে, কোন জীবের শরীরাভ্যন্তরস্থ যে-প্রক্রিয়াসমূহ, ঐ জীব অথবা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলের সহিত তাহার যে-সমতা বিদ্যমান, সেই সমতার বিজ্ঞাপক হয় সেই প্রক্রিয়াসমূহ।

ইহার অর্থকে অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য আমরা মনুষ্যের 'ধর্ম্ম'কে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতেছি। মনুষ্যের "ধর্ম্ম" কি, তাহার সন্ধানার্থ, আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, মনুষ্যরূপী বিভিন্ন ব্যক্তির শরীরগত আকৃতিতে এবং চালচলনে 'সমতা' ও 'বৈশিষ্ট্য' উভয়ই বিদ্যমান। মনুষ্যরূপী ব্যক্তিবৃন্দের যে 'সমতা', তাহারই নিমিত্ত চতুষ্পদ জীব এবং অপরাপর জীবের সহিত মনুষ্যের পার্থক্য। বস্তুতঃ এই বিভিন্ন 'সমতা'রাশিই জীবসমূহকে প্রধানতঃ একই শ্রেণীভুক্ত করে। এইরূপ বিভিন্ন 'সমতা'সমূহ যেমন জীবসমূহকে কোন এক শ্রেণীবিশেষের অথবা সাধারণ গোষ্ঠীর অন্তর্গত করিবার মূল কারণ, তেমনই আবার 'পার্থক্য'সমূহ তাহাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের মূল।

* "দি উইক্‌লি বঙ্গশ্রী"র ১৬ই নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

রাম ও শ্যাম নামধারী বিভিন্ন দুই ব্যক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের শরীরগত, আকৃতিগত ও চালচলনে যেমন অনেক 'সমতা' বিদ্যমান, তেমনই আবার অনেক "পার্থক্য" বিদ্যমান। রাম ও শ্যামের এই 'সমতা'সমূহই প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যত্বের গুণ-নির্দ্দেশক এবং তাহাদের পার্থক্যসমূহ হইতেছে রাম ও শ্যাম আখ্যাত ব্যক্তিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক।

ব্যক্তিসমূহের এই সকল সমতা-বিষয়ক আলোচনায় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই দেহাভ্যন্তরে বিশেষ বিশেষ অব্যক্ত ক্রিয়াসমূহের ফলে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের এই সমতা বিকাশ লাভ করে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে এমন বিশেষ প্রকার অব্যক্ত কয়েকটি ক্রিয়া কার্য্যকরী, যাহা সকল মানুষের পক্ষেই সাধারণ। কোন ব্যক্তি যদি স্বকীয় দেহাভ্যন্তরে এই সকল অব্যক্ত ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারিবেন যে, কি কারণবশতঃ তিনি অপর সকল মনুষ্যের সহিত প্রায়শঃ একই প্রকার আকৃতি ও আচরণলাভে সমর্থ। তিনি স্বতঃই আবার ইহাও উপলব্ধি করিতে পারেন যে, কি কারণবশতঃ তাঁহার এবং অপরাপর সকলের মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সেই ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি না করিয়া অপর সকলের সহিত কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভের সামর্থ্য অর্জ্জন করেন।

শব্দ-বিজ্ঞানানুযায়ী মনুষ্যের এই সকল অব্যক্ত ক্রিয়াই "ধর্ম্ম" আখ্যাত হইয়া থাকে। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে, মনুষ্যসমূহের "ধর্ম্ম" কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না, উহা সকল মানুষের পক্ষেই এক। এই জন্যই প্রাচীন জগতে "মানবক ধর্ম্ম" ব্যতীত আর কোনও ধর্ম্মের বিষয় শুনা যায় না। কিন্তু, যদ্যপি প্রত্যেক মনুষ্যের এই আভ্যন্তরীণ অব্যক্ত ক্রিয়া-কলাপই মনুষ্যজাতির "ধর্ম্ম" গঠন করিতেছে এবং প্রতিক্ষেত্রেই উহার রূপ এক, তথাপি বিভিন্ন মনুষ্যের সামর্থ্য বিভিন্ন বলিয়া ইহা উপলব্ধি করিবার পন্থা একই প্রকার হইতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন মনুষ্যের সামর্থ্য-বিভিন্নতা বশতঃ ধর্ম্ম উপলব্ধির চর্য্যাগত পন্থা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। বেদ, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে "ধর্ম্ম" উপলব্ধির এই বিভিন্ন চর্য্যাগত পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি কথায় বিভিন্ন ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে না। যথাযথভাবে শব্দ-বিজ্ঞানের অনুসরণে ব্যাপৃত হইলে দেখা যাইবে যে, উহাদের দ্বারা "মানবক ধর্ম্মে"র, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির ধর্ম্মের উপলব্ধির বিভিন্ন চর্য্যাগত পন্থা বুঝান হইয়াছে। এই তিনটি বিভিন্ন চর্য্যার সম্যক্ উপলব্ধির দ্বারা বুঝা যাইবে যে, তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইলেও, তিনেরই উদ্দেশ্য এক।

স্বকীয় দেহাভ্যন্তরে মনুষ্যসমূহের সমতা-বিকাশক এই সকল অব্যক্ত ক্রিয়ার দ্বারা কি ভাবে 'ধর্ম্ম' গঠিত হইতেছে, তাহার উপলব্ধিতে সমর্থ হইয়া কেহ যদি মনুষ্যজাতির পার্থক্য-সমূহের কারণ জানিবার প্রয়াসী হন, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আবাস-ভূমির বিভিন্নতাই এই পার্থক্যসমূহের কিয়দংশের হেতু।

আবাস-ভূমির বিভিন্নতাজনিত যে সকল পার্থক্য তাহাই মনুষ্যের 'জাতীয়তা' নির্দ্দেশক। কোন ব্যক্তি "ধর্ম্মো"পলব্ধিতে সমর্থ হইলে এই সকল পার্থক্যজনিত দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান যে নিশ্চিতরূপে ঘটিতে বাধ্য, তাহার ইঙ্গিত আমরা ইতি-পূর্ব্বেই দিয়াছি।

সুতরাং "ধর্ম্মো"পলব্ধির বিভিন্ন পন্থা লইয়া কলহ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।

তথাপি, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের এই কলহ কেন ঘটে, তাহার সন্ধান প্রয়াসী হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত হিন্দুত্ব, প্রকৃত মুসলমানত্ব ও প্রকৃত খ্রীষ্টানত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই ইহার একমাত্র কারণ।

সংস্কারচালিত হইয়া জনসাধারণ বিভিন্ন ব্যবস্থা কামনা করিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মনুষ্যের "ধর্ম্ম"-উপলব্ধির বিষয় লইয়া যেমন অনৈক্য থাকিতে পারে না, তেমনই "ধর্ম্ম"-উপলব্ধির পন্থার ভিত্তিতে কোন 'জাতীয়তা'ও গঠিত হইতে পারে না।

ধর্ম্মকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ কতিপয় ব্যক্তির আবির্ভাব মনুষ্যসমাজে না হইলে এই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-কলহের সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটিতে পারে না।

মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ অপর যে, পন্থাতেই চেষ্টিত হউন না কেন, তাঁহারা অচিরাৎ বুঝিবেন যে কেবলই তাঁহারা পাষাণ-প্রাচীরে মাথা খুঁড়িতেছেন।*

* "দি উইক্লি বঙ্গশ্রী"র ১৬ই নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

বন্যা

—শ্রীমতী পার্ল বাক্

বন্যার জল খানিকটা সরে গেছে। মাঝে মাঝে ডাঙ্গা দেখা যায়। সেই ডাঙ্গার কিনারে কিনারে ছোট ছোট স্তূপ। যতদূর চোখ যায়—এক চক্রবাল থেকে আর এক চক্রবাল পর্য্যন্ত সবই একরূপ। স্তূপগুলি প্রথম মনে হয় বন্যার ধ্বংসস্তূপ। কাছে এগিয়ে গেলে দেখা যায়, তার প্রত্যেকটার মাঝে রয়েছে কয়েকখানা করে কাঠের বেঞ্চ, কাজ চালাবার মত একখানা টেবিল, ছোট একটা তাক, আর ধোঁয়ায় কালো মেটে-হাঁড়ীর উপর একটা করে লোহার ছোট কড়া। এ সব কড়ার নীচে আগুন জলে নি বহুদিন: বন্যায় আগুন জালাবার সরঞ্জাম সব নিয়ে গেছে।

ঘর-বাড়ী গৃহস্থালীর—এ ছাড়া আর কিছু নেই; বন্যায় আর সবই নিয়ে গেছে। চাষারা সারা বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে যে ফসল উৎপন্ন করেছে—বন্যায় তারও কিছু রেখে যায় নি। এই সব ছোট ছোট স্তূপের প্রত্যেকটীর আশেপাশে কয়েকটি করে লোক ঘোরাফেরা করে—ওরাই হচ্ছে দেশের এক এক বাড়ীর লোকজন: প্রায়ই একটি করে পুরুষ, তার স্ত্রী, তার ছেলেপিলে, তাদের সঙ্গে কোথাও বা বুড়ো মা-বাপ আছে, কোথাও বা নেই। বন্যায় বুড়ো-বুড়ীদের বড় বেশি রেখে যায় নি। ছেলে-পিলেদের অবস্থা অতি শোচনীয়। আর তাদের বাপ-মাদের ভেতরে ঝগড়া ত লেগেই আছে,—কখনও বা সেটা বাইরে প্রকাশ পায়, কখনও বা প্রকাশ পায় না; দু'জনাই মনের কথা মনে চেপে রাখে।—কিন্তু কিসের এই মনান্তর।

এই ত এদিকে একটি কৃষক তার স্ত্রীর দিকে কেবলই কটমট্ করে চাইছে। এরা পাঁচটী সন্তানের মা-বাপ—তবুও বয়স এদের অতি অল্পই। কম বয়সেই এদের বিয়ে হয়েছে। পুরুষটির বয়স ছাব্বিশ-সাতা'শের বেশি নয়, আর স্ত্রীর বয়স আরও কম। লোকটার একদিন বেশ শক্তি-সামর্থ্য ছিল বলে মনে হয়, তবে এখন সে বড়ই রোগা হয়ে গেছে। পাড়াগাঁয়ের সর্ব্বত্রই এই ধরণের লোক: তারা জমী চাষ করে, ভাল আবাদ করা ক্ষেত্র আর তার সোনার ফসল নিয়ে গর্ব্ব করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা এ-ফসল উৎপন্ন করেছে, কত হিসেব করে তারা বছরের পর বছর বীজ রেখে যাচ্ছে।

যে কৃষকটিকে নিয়ে এখানে কথা চলেছে—তার মুখ দেখে মনে হয় লোকটি গম্ভীর, কষ্টসহিষ্ণু ও সাদাসিধে ভাল লোক; তবে সম্প্রতি তার মেজাজটা ভাল নেই—চোখে তার সততার চিহ্ন থাকলেও তাতে নৈরাশ্য ঘনিয়ে এসেছে।

বউটি তার দিকে মাঝে মাঝে তাকায় বটে, তবে তার অজ্ঞাতে একবার তাকিয়ে তখনই আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। বউটি দেখতে একরকম ভালই: পাড়াগাঁয়ে মেয়ে—মুখখানি দিব্বি গোলগাল, খালি পা। এখন কাহিল হয়ে গেছে তাই, নইলে দেহের গঠনও বেশ সুঠাম ও মজবুত বলে মনে হয়। চোখ দুটি বসে গেছে, চুলগুলি রুক্ষ আর এলোমেলো,—কতদিন যে মাথায় চিরুণী পড়ে নি, কে জানে! ঠোঁট দু'টি শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে চেটে সে ওটা ভিজিয়ে নেয়।

একটুও অবসর নেই বউটির। সারাদিন সে তার ছেলেমেয়েদের পাহারা দেয়। দুজন ত তার একরকম কাছ-ছাড়াই হয় না। বুকে তার দুধের নাম-গন্ধও নাই—তবু তাতেই ছিনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে একটি। বউটি তবুও তাকে সেইখানেই দিনরাত চেপে রাখে। দুধ পাবার মিছে আশায় ছেলেটি একটুখানি থামে, তারপর আবার চিঁ চিঁ করে কাতরাতে থাকে। ভাল করে কাঁদবার শক্তিও তার নেই। অপরটি হচ্ছে মেয়ে—ছেলেটির চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে; হাড়ের উপর চামড়ার আবরণ সার। সে একটু শব্দ করে না, মায়ের কোলে একটুও নড়াচড়া করে না। আর তিনটি ছেলেমেয়েও তেমন নড়াচড়া করে না। তারা একটুখানি যেই সরে যায় কিংবা জলের কিনারে যেতে চায় অমনি তাদের মা চীৎকার করতে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত না তাদের হাতের নাগালের মাঝে পায় সে পর্য্যন্ত আর তার চীৎকার থামে না।

বিশেষ করে রাত্রিতে এদের মা একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। সারারাত সে ঘুমোয় না। সব ছেলেমেয়েগুলি নিজের নাগালের মাঝে দু'ধারে রাখে, আর বারে বারে হাত বুলিয়ে দেখে—সব ঠিক আছে কি না! তন্দ্রার মাঝে সে বার বার জেগে ওঠে, তারপর সবার উপর একবার দ্রুত হাত বুলিয়ে নেয়,—ঠিক আছে ত!—তার পাঁচটী ছেলেমেয়ে, সবাই ঠিক আছে ত!—অ্যাঁ—তার সেই মেয়েটি!—না, এই যে রয়েছে,—সবাই রয়েছে। স্বামী একটু নড়লেই—স্ত্রী অমনি তেড়ে ওঠে—"হচ্ছে কি, ও-রকম করছ কেন?"

স্বামী তখন বউকে গালিগালাজ করতে থাকে, অভিসম্পাত দেয়। বউ জানে—স্বামী কেমন অমন করে। সে এর পর চুপ করেই থাকে। শুধু একবার ছেলেমেয়েগুলিকে ভাল করে কাছে টেনে নেয়, তারপর তাদের হাতড়ে হাতড়ে গুণে দেখে সবাই ঠিক আছে কি না।

রাত্রি ভোর হ'লে বউটি বড় বেশি ব্যস্ততা দেখায়, যেন হাতে কত কাজ,—কত খাবার যেন তার তৈরী করতে হবে। একটা লাউয়ের খোলের পাত্রের মাঝে জল ঢেলে—অল্প যে ময়দা অবশিষ্ট আছে, তা থেকে একটুখানি নিয়ে গুলতে গুলতে—সে খুসীর ভাণ করে বলতে থাকে: "ভাখো ত, এখনও আমাদের কতখানি ময়দা রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম—দু' একদিনের বেশি আর যাবে না, কিন্তু এখন দেখছি বেশ দু'-চার দিন যাবে।"

তারপর খাবার ভাগ করার পালা। বউটি স্বামীকেই দেয় সবচেয়ে বড় ভাগ। বড় দুটি ছেলে তা' নিয়ে হৈ চৈ আরম্ভ করলে—বউ তাদের কসে এক তাড়া লাগিয়ে দেয়। স্বামী আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে,—একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। বউয়ের নিজের ভাগ সবচেয়ে কম, কিন্তু তবুও খাবার সময় তার কত জাঁক: শপাশপ—শপাশপ করে সে শব্দ করতে থাকে। অনেক দিন খিদে নেই বলে সে ভাণ করে। সে একেবারেই কিছু খায় না—অথবা বলে—তার পেট ব্যথা করছে। কোন দিন খাবার সময় এমনও হয়, স্বামী যেই পিছন ফিরেছে অমনি সে নিজের ভাগটা সবার চেয়ে ছোট শিশুটিকে খাইয়ে দেয়।

কিন্তু স্বামীকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। সে টের পেয়ে চীৎকার করে উঠে: "ও সব চালাকি চলবে না—তা' বলে দিচ্ছি; নিজে উপোষ করে থেকে ওদের একটিকেও আমি বাঁচাতে দেব না আমি।"

যে পর্য্যন্ত বউ খাবারের বাটী নিজের মুখে তুলে না ধরে সে পর্য্যন্ত স্বামী আর শান্ত হয় না। বউ বাটী থেকে বেশ শব্দ করে খায়—আর ঢোক গেলে—যেন কত খেয়েছে।

বউ যতই চালাকী করুক না কেন—স্বামীর জানতে বাকী নেই—তাদের সঞ্চিত খাবার কত কম। ছেলেমেয়েরা 'খাব' 'খাব' বলে যে সোর-গোলটা তোলে সেটাও যে সে শুনতে পায় না—তা' নয়। সবই বোঝে সে। মায়ের ধমকানিতেও ওরা সব সময়ে চুপ করে থাকতে পারে না। ছেলে দুটি ত বেশ উঁচু গলাতেই কান্না সুরু করে দেয়। একদিন ওরা কেমন সুস্থ সবল ছিল, যা চাইত তাই খেতে পেত। ওরা এখন বুঝতেই পারে না—কি করে সারাদেশ এমনি করে জলে ভেসে গেল। ওরা কেবলই ভাবে—এ থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায় বাবা কেন বার করে না।

ওদের বাপ জলের কিনারে গিয়ে বসে বসে কেবল ভাবে। ছেলেমেয়েরা যখন ক্ষুধার তাড়নায় এক সঙ্গে কাঁদতে থাকে,—বাপ তখন দুই হাতে দুই কান বন্ধ করে। ঠিক এই সময় মা বড় ভয় পেয়ে যায়। ছেলেদের কানের কাছে মুখ নিয়ে সে চুপে চুপে বলে, "ওরে—তোরা চুপ কর, চুপ কর, লোকটাকে পাগল করে দিস্ না, আমার কথা শোন—আর কাঁদিস্ না।"

মায়ের রকম-সকম দেখে তারা চুপ করে। তারা বেশ বোঝে একটা কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু কি যে সে বিপদ, তা ঠিক ধরতে পারে না। তারা শুধু ভয় পায়।

ছেলেরা চুপ করে বটে, কিন্তু তাদের মা-বাপের মাঝে মনান্তর বাড়তে থাকে, কিন্তু কেউ তা বাইরে প্রকাশ করে না। যে সামান্য মর্য্যাদা অবশিষ্ট ছিল, তা'ও ক্রমে কমতে থাকে,—বন্যা একটুকুও কম দেখা যায় না। প্রতি রাত্রে—অন্ধকারে মা তার ছেলে-মেয়েগুলি বেশ ভাল করে গণে।

কিন্তু রক্তমাংসের শরীর ত। না ঘুমিয়ে লোকে ক'দিন থাকতে পারে? মায়ের অনশন-ক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহ একদিন

রাত্রে ঘুমে ঢ'লে পড়ে। কোন সময় যে ঘুম আসে মা তা জানতেও পারে না। ঘুমের মাঝেও তার বাহুদু'টি ছেলে-মেয়েদের আগলে রাখে। এই ফাঁকে বাপ উঠে ছোট ছোট দু'টির মেয়ের কাণে কাণে চুপে চুপে কি বলে। মেয়ে দু'টী বাপের কথায় বিশ্বাস করে তার সাথে সাথে কিছুদূর এগিয়ে যায়। খানিক পরে বাপ টলতে টলতে এগিয়ে আসে আসে—একা।

একবার দুবার জোরে জোরে তার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে, তারপর তাও সে চাপতে থাকে—নিঃশ্বাসগুলি তার চাপা কাতরানির মত শোনায়।

ভোরের আলো চোখে না যেতেই মা ধড়ফড় করে উঠে পড়ে—সে ভয় পেয়ে গেছে। জাগবার আগেই সে যেন টের পেয়ে যায় যে, সে ঘুমিয়ে ছিল। চোখ না মেলেই সে ছেলেমেয়েগুলিকে একবার হাতড়ে দেখে নেয়—ঠিক আছে ত—তার সবগুলি আছে ত?···অ্যাঁ···আর দুটি! কোথায় গেল তারা? মুহূর্ত্তে তার ঘুমের আড়ষ্ট ভাব কেটে যায়। সে কেঁদে—তড়াক্ করে উঠে স্বামীর কাছে ছুটে যায়—তার শীর্ণ দুর্ব্বল পা দুটী সহসা যেন কত সবল হয়ে উঠেছে। স্বামীর কাছে দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে ঝাঁকুনী দিয়ে সে চীৎকার করে উঠে:

"আমার মেয়ে দু'টি কই?"

স্বামী দুই হাঁটু উঁচু করে—তার মাঝে মুখ দিয়ে বসে আছে। স্ত্রীর কথায় তার মুখ আরও মাটীর দিকে নুয়ে পড়ে, সে উত্তর দেয় না।

বউ এবার ক্ষেপে যায়। স্বামীর কাঁধ ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকুনী দিতে দিতে সে পাগলের মত কাঁদতে থাকে: "আমি যে তাদের মা, তুমি কি বুঝবে, ওগো আমি যে তাদের মা!"

বউটির কান্না শুনে আশে-পাশের সবাই জেগে যায়, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে একটি কথাও কেউ বলে না। ব্যাপারটা কি—তা' সবাই বোঝে। সর্ব্বত্রই এই। বউ পাগলের মত কাঁদতে থাকে,—কান্নায় বুক তার ফেটে যায়। অমনি করে কাঁদতে কাঁদতেই সে বলে: "কোন মায়ে কি এমন কাজ করতে পারত?—যারা বাপ—তারাই শুধু এ কাজ করতে পারে,—সন্তানের উপর একটুখানি তা'দের টান নেই। সন্তানদের একটুখানি খাবার দিতে গেলে—তা'রা হিংসেয় জ্বলে যায়।"

এইবার স্বামী কথা কয়। দু'টো জানুর মাঝ থেকে নুয়ে পড়া মুখখানা তুলে বউয়ের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বলে: "তুমি বুঝি ভাব—আমি ওদের ভালবাসি নে?"

বলে' সে মুখ ফিরায়। আবার একটু পরে বলে, "পেটের জ্বালা থেকে ওরা মুক্তি পেয়েছে।"

বলতে গিয়ে স্বামী হঠাৎ কেঁদে ওঠে,—কিন্তু কাঁদার শব্দ থামাতে গিয়ে মুখখানা তার বিকৃত হয়ে ওঠে। এইবার বউও তার কান্না থামাতে চেষ্টা করে।

অনুবাদক—শ্রীতারাপদ রাহা।

পুনরাবৃত্তি

—শ্রীমোহিনী চৌধুরী

এবারও হ'য়েছে পূজা মহা সমারোহে
ধনীর প্রাসাদে আর বারোয়ারী মাঠে;
উপস্থিত ছিল সবে পরম আগ্রহে
ছাগশিশু প'ড়েছিল যবে যূপকাঠে।
এবারও বেজেছে বাদ্য, হয়েছে আরতি,
ধনীদের ভোজে কিছু ঘটে নাই ত্রুটী;
গঞ্জনা-বর্ষণ হোলো গরীবের প্রতি,
বুভুক্ষু এবারও বহু খেয়েছে ভ্রূকুটি।
বারোয়ারী উপলক্ষে উঠিল যে চাঁদা
সিনেমার আয়োজন হোলো তাই দিয়ে;
পরধন আত্মসাতে ছিল নাকো বাধা,
এবারও হেসেছি মোরা বহুকে কাঁদিয়ে।
এবারও স্বার্থের খাদ্য করিতে অর্জ্জন
মনুষ্যত্বটুকু মোরা দিনু বিসর্জ্জন।

আরেক দিবসে জানি হ'য়েছিল পূজা—
দাশরথী দশাননে শাস্তি দিতে যবে
সিন্ধুপারে লিপ্ত ছিল ভীষণ আহবে,
বর দিয়েছিল তারে মাতা দশভুজা।
তারপরও কতবার বঙ্গের অঙ্গনে
মৃত্তিকায় গড়া হোলো দুর্গার প্রতিমা;
প্রতি গৃহে আনন্দের নাহি ছিল সীমা,
বিজয়া মধুর হোত প্রীতি-আলিঙ্গনে।
আজও নাকি পূজা হয় পল্লীর মণ্ডপে,
সেই উপলক্ষে পাই দীর্ঘকাল ছুটী;
'পূজার ছুটীতে' আজো করি' ছুটাছুটি
বায়ুবদলের আশা পূর্ণ করি সবে।
সিন্ধু-পারে আজো হয় যুদ্ধ ঘোর অতি,
রাবণাস্ত্রে মৃতপ্রায় মাতা ভগবতী॥

বঙ্গভাষার আধুনিক বিকৃতি

—শ্রীহরিপদ দত্ত

সকল সভ্যজাতিরই লিখিত বা সাধু ভাষা ও কথোপকথনের বা কথ্য ভাষায় রূপহিসাবে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সভাসমিতিতে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহাদিগকেও কথ্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কবিতার ভাষা সাধু ও কথ্য ভাষার সংমিশ্রণ; ভাষা সম্বন্ধে কবির স্বাধীনতা ও সুবিধা গ্রহণের অধিকার আছে, কারণ কবিতা সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ এবং কবিতাকে ছন্দের বন্ধনীর মধ্যে থাকিতে হয়। ছন্দোভঙ্গ না করিয়া ভাবকে পরিস্ফুট করিতে হইলে ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না। ভাবহীন ও (ব) ছন্দোহীন কবিতা কবিতা-পদবাচ্যই নহে। "ওস্তাদী কবি" ও তর্জ্জার ছড়ার মধ্যেও ভাবের সমাবেশ থাকে, অথচ তাহাতে প্রায়ই ছন্দোবিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। নাটকে কথোপকথনই থাকে, সুতরাং নাটকের ভাষাকেও কথ্য ভাষা বলা যাইতে পারে। উপন্যাসে ঘটনার বিবরণ ও কথোপকথন সাধারণতঃ উভয়েরই সমাবেশ থাকে এবং প্রয়োজন হয়; এই হিসাবে উপন্যাসকারেরও ভাষার রূপের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু গদ্যে যে সকল প্রবন্ধ বা গল্প রচিত হয় এবং যে সকল রচনা গদ্যসাহিত্য রূপে সাধারণ্যে পরিচিত তাহার ভাষা সম্বন্ধে লেখকের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই; ভাষার রূপ ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা এই শ্রেণীর লেখকের অবশ্যকর্ত্তব্য। পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা যেমন মানুষের কর্ত্তব্য, সাহিত্য-জগতে রচনা দ্বারা যাঁহারা খ্যাতি ও মর্য্যাদা-অর্জ্জনে অভিলাষী তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা। ভাষার মর্য্যাদাই সাহিত্যের মর্য্যাদা।

ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতাকালে ও চিঠিপত্রে, তর্কে বা debate-এ যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা ইংরাজীর লিখিত বা সাধু ভাষার অনুরূপ। ভদ্রসমাজে কথোপকথনেও সাধারণতঃ ইংরাজীর সাধু ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা সকল সময়েই গ্রাম্যদোষ-বর্জ্জিত এরূপ বলা যায় না। কিন্তু কথোপকথনে ভাষার গ্রাম্য দোষ মার্জ্জনীয়। বাঙ্গালা চিঠিপত্রাদিতে আমার মত সেকালের লোক অদ্যাপি সাধু ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকে স্থানে স্থানে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সখিভাবাপন্না পাত্রীগণের বা নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের কথোপকথনে। এই কথোপকনের ভাষা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্ভুক্ত না হইয়া "প্রাকৃত"-আখ্যাতেই পরিচিত রহিয়াছে। প্রাকৃত ভাষাই আর্য্যাবর্ত্তের আদিম ভাষা; এবং দেবনাগর প্রাকৃত ভাষার বিশুদ্ধ সংস্করণ ইহাই সাধারণের জ্ঞান; তথাপি প্রাকৃত ভাষার স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাঙ্গালা ভাষা শৈশব, অন্ততঃ কৈশোর অতিক্রম করে নাই। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই অনেক আধুনিক লেখক ইহার আকার বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি আধুনিক রচনা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

১। "সব রস শুকিয়ে নীরস হয়ে গেছে জীবন। বেকার জীবনের ব্যর্থতার ওপর নেমে এসেছে কাল পর্দ্দা—জঞ্জালের মত প্রতি পদে শ্লথ ব্যর্থতা। সামনে সামনে চলা ঘুচে গেছে, এঁকে বেঁকে চলতে হয়। হয়তো খানিকটা অসত্যের পথে, পঙ্কিল প্রবাহে ডুব সাঁতার কাটতে কাটতে।"

২। "অনুকূল বাবু রূপোর চামচে মুখে নিয়ে সংসারে আসেন নি।"

৩। "শীতের কুয়াশা ফুরিয়ে গেছে কোন্ সকালে। আকাশ চিরে সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার ইটকাঠময় জনবহুলতার ওপর।"

৪। "নিশীথ রাত্রিতে ঘরের ঘড়িতে টিং টিং শব্দের মত আমাদের কথা টং টং করে বাজছে যেন।"

৫। "তাঁর ব্যবস্থার উপর মানুষের কারসাজী এ?"

৬। "অথর্ব্ব বিচারবুদ্ধির ফোগলা দাঁতে যথাসাধ্য চর্ব্বণ করতে চেষ্টা করি এই আধুনিক সাড়ে বত্রিশ ভাজা।"

৭। "সত্যের বীজকে প্রতিদিনের "অভ্যাসযোগে"র দ্বারা উদ্ভিন্ন করতে হয় জীবনে।"

৮। "ফরাসী বিপ্লবের সময় রাস্তার এপারে ওপারে নোটের দামে ঘটেছিল মুল্যবিভ্রাট, নিরিখ বেঁধে দেবার কর্ত্তৃপক্ষের অভাবে।"

৯। "বাহিরের শূন্যতা ভরে তুলেছি পশ্চিমের বিলাসবাহুল্যের পুঞ্জভারে।"

১০। "কোন দ্যুতিমান গ্যাস বা বাষ্পের কিরণচ্ছত্র এ'হতে ভিন্ন প্রকার।"

১১। "পথে তার মনে হল এবং দুঃখও হল, মহিলা-টীকে মিলনী-সঙ্ঘের কার্ড না দেওয়াতে।"

১২। "এ সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, লোকাচারের পেছনে রয়েছে একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারা।"

১৩। "প্রথম যখন ক্যাপিটালিষ্ট নীতির গোড়াপত্তন হয়েছিল, তখন পুঁজিপতিরা...ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে না কি তারা স্বার্থের প্রলো-ভনে শ্রমিককৃষকদের পক্ষ ছেড়ে তাঁদের পক্ষেই যোগদান করে।"

১৪। "ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে বাঙলা সাহিত্যে আসিয়াছিল একটা নবযুগ···ইহা একটি স্পষ্টরূপ গ্রহণ করিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের হইতে·· সুদুর প্রাচ্যের শ্যামল ক্ষেত্রে পড়িয়াছিল পশ্চিমের একটি সোনালী আলো।"

১৫। "সেই সুরের রেশ তাঁহাদের সঙ্গীতের ভিতরে তুলিয়াছিল বিচিত্র ঝঙ্কার।"

বাঙ্গালাভাষার এইরূপ বিকৃতিই কি ইহার নবযুগের বৈশিষ্ট্য? এ সকল কি গদ্য-কবিতার ভাষা, না ভাষার খিচুড়ী? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এইরূপে বঙ্গভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ হইতেছে। এই শ্রাদ্ধের মন্ত্রের স্রষ্টাই বা কে, প্রবর্ত্তকই বা কে? অনুকরণস্পৃহাশীল বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বাণীর অর্চ্চনাকল্পে এই মন্ত্রকে ইষ্টমন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। ফলতঃ, এখন "ঠক বাছতে গাঁ উজাড়" প্রায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

এই শ্রেণীর আধুনিক লেখকসম্প্রদায় বঙ্গসাহিত্যজগতে যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি?

লিখিত বিষয় সাধারণের বোধগম্য হইবে ইহা যদি উদ্দেশ্য হয়, কতিপয় উদ্ধৃতাংশের বিচার করিলে সে উদ্দেশ্য নিষ্ফল প্রতীয়মান হইবে। "সামনে সামনে চলা ঘুচে গেছে, একে বেঁকে চলতে হয়। হয়তো খানিকটা অসত্যের পথে; পঙ্কিল প্রবাহে ডুব সাঁতার কাটতে কাটতে"—এ ভাষা কি সাধারণের সহজবোধ্য? উপযুক্ত ছেদচিহ্নসন্নিবেশ (punctuation) দ্বারা ইহকে বোধগম্য করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ইহার এই রূপ দাঁড়ায়—"সামনে সামনে চলা ঘুচে গেছে, এঁকে বেঁকে চলতে হয়—হয়ত খানিকটা অসত্যের পথে—পঙ্কিল প্রবাহে ডুব সাঁতার কাটতে কাটতে"। (২)-সংখ্যক উদ্ধৃতাংশ একটি ইংরাজী বাক্যের নিছক অনুকরণ: "Anukul Babu was not born with a silver spoon in his mouth."। ইংরাজীভাষার অনভিজ্ঞ কোন্ পাঠকের ইহা বোধগম্য? (৩)-সখ্যক উদ্ধৃতাংশের "ইট-কাঠময় জনবহুলতার" অর্থ কি, তাহা প্রবন্ধরচয়িতা হয়ত স্বয়ং বুঝাইয়া দিতে পারেন। "ইটকাঠময়" "কলকাতার" বিশেষণ হইতে পারে, "জনবহুলতার" বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলে সমস্ত বাক্যটির কি অর্থ হয় বুঝিতে পারিলাম না। (৪)-সংখ্যক উদ্ধৃতাংশে "যেন" শব্দ এবং (৫)-সংখ্যক উদ্ধৃতাংশে "এ" বাক্যের (sentence) শেষে ব্যবহৃত হওয়ার তাৎপর্য্য কি বুঝিলাম না। (৬)-সংখ্যক উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত কথাগুলি যদি অলঙ্কার-বর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিত, কিন্তু সেগুলি অলঙ্কারবর্জ্জিত নয়। অধিকন্তু, এতাদৃশ রচনা "সাড়ে বত্রিশ ভাজা"র অন্যতম ভাজা বলিয়াই প্রতীতি হয়। (১১)-সংখ্যক উদ্ধৃতাংশের ভাষা একেবারেই অশুদ্ধ। ইহার গঠন এইরূপ হওয়া উচিত ছিল—"পথে তার মনে হল, মহিলাটীকে মিলনী-সঙ্ঘের কার্ড দেওয়া হয় নাই, এবং সে জন্য দুঃখ হল।" বোধ

হয় এইরূপ গঠনই লেখকের অভিপ্রেত ছিল, কোন কারণে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

ভাষার সংস্কার যদি এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য হয় তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। সমস্ত উদ্ধৃতাংশগুলিরই গঠন বিকৃত। গঠনের বা রূপের বিকৃতি সাধন করিয়া কোন বস্তুর বা বিষয়ের সংস্কার সম্ভবপর হয় না। এবংবিধ উপায়ে যাঁহারা সংস্কার সাধন করিতে চাহেন, তাঁহারা "শিব গড়িতে বাঁদর গড়িবেন" ইহা ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? "হয়েছে," "করেছে," "গেছে," "বলে," "করে" এইরূপ শব্দের পরিবর্ত্তে "হইয়াছে," "করিয়াছে," "গিয়াছে," "বলিয়া", "করিয়া" শব্দ ব্যবহার করিতে লেখনীর কি প্রতিবন্ধক সংঘটিত হয় বুঝিতে পারি না। পরন্তু যখন "বলিয়া"র পরিবর্ত্তে "বলে" বা "করিয়া"র পরিবর্ত্তে "করে" শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, তখন তাহাতে উপরিলিখিত (') চিহ্ন সংলগ্ন না করিলে "বলে" বা "করে"র (সে বলে, সে করে)—র সহিত পার্থক্য থাকে না।

ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপদের, কর্ম্মপদের ও অধিকরণাদির প্রয়োগ ব্যাকরণ অনুযায়ী ত বটেই, অধিকন্তু স্বাভাবিক ও সাধারণ পদ্ধতি; স্থানবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম আবশ্যক ও মার্জ্জনীয়। কিন্তু অধিকাংশ উদ্ধৃতাংশের মধ্যে এই পদ্ধতির যেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় তাহাতে উহা যে লেখকের স্বেচ্ছাচারিতা ও (সাহিত্যিক) উচ্ছৃংখলতার ফল সে বিষয়ে সন্দেহ করে না। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতা সংস্কার-স্পৃহার পরিচায়ক হইতে পারে না।

যদি ভাষাকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করা বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে উদ্ধৃতাংশ সম্পর্কীয় সন্দর্ভগুলিতে অন্ততঃ নূতন নূতন শব্দের প্রয়োগ ও বিন্যাস পরিদৃষ্ট হইত, নূতন নূতন ভাব ত পরের কথা। অধিকাংশ সন্দর্ভে ভূরি ভূরি বিকৃত শব্দেরই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এরূপ নূতন শব্দ কোথায়? বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াও লেখক "ইহা হইতে"র পরিবর্ত্তে "এ-হতে" লিখিয়া ফেলিয়াছেন। Fascism সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিতে বসিয়া "ভিত্তিস্থাপন" বা তদনুরূপ শব্দের পরিবর্ত্তে লেখক "গোড়াপত্তন" লিখিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুইটি মাত্র ত্রুটীরই উল্লেখ করা হইল। স্থূলতঃ উপরোক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-গ্রাম্য-দোষ বিশেষভাবে পরিবর্জ্জনীয়, তাহাই প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্থানলাভ করিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থকারগণ যখন সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বঙ্গভাষাকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত ও নূতনরূপে গঠিত এবং উহার পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সাধন করিতেছিলেন, তখন পূর্ব্বপ্রচলিত খাঁটি বাঙ্গালার অস্তিত্ব-রক্ষার উদ্দেশ্যে "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম পেঁচার নক্সা" প্রভৃতি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। যদি কথিত বিপ্লবের মূলে সেরূপ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে গ্রাম্যদোষের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দেরও বহুলতা লক্ষিত হয়। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ কয়টি ইহার প্রমাণ—

(ক) "হয়ত তাম্রকূটপরাগের সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের ডগায় তাদের তারুণ্যবেপথুর কিঞ্চিৎ স্পন্দন আমার মগজে গিয়া ভোঁ ভোঁ করে।"

(খ) "ভাব, চিন্তা ও আদর্শের সমতা যে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ঐক্যলাভ করে সে আনুকূল্য পঞ্চাশ বছর আগে আমরা পাই নি।"

(গ) "পরিদৃশ্যমান আলোক...একটি সপ্তকের মধ্যে পর্য্যবসিত।"

পূর্ব্বে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারও কতকগুলিতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (গ) সংখ্যক অংশ একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল; ইহার সম্বন্ধে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নির্দ্দেশ ব্যতীত অন্য কিছু বলিবার নাই। (ক) ও (খ)-চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশ-দ্বয়ের অর্থ বা ভাবার্থ পাঠক নিজেই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন, এবং উহাদের শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে নিজের মত স্থির করিবেন।

বর্ণযোগ (বানান) বিষয়েও বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অঙ্কাবরণের মধ্যে নূতন বর্ণযোগ-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্চাশদধিক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" হইতে

বাণান শিক্ষা ও অভ্যাস করতঃ এ যাবৎ তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে এখন সে সকল ভুলিতে হইবে। ইংরাজীতে যেমন Americanism প্রবেশ করিতেছে, বঙ্গভাষায় এই নূতন বর্ণযোগ-পদ্ধতির প্রবেশও তদনুরূপ। অনুকরণ ব্যতীত বাঙ্গালীর জীবনের ও ভাষার গঠন কি অসম্ভব? অনুকরণ করিতে যাইয়া গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক গ্রহণ করা হয়। সংস্কৃত শব্দের বা তাহার বর্ণযোগ-পদ্ধতির বাঙ্গালাভাষা হইতে নিরাকরণ যদি উদ্দেশ্য হয়, সেরূপ উদ্দেশ্য কখনই ফলপ্রসূ হইবে না। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার ভিত্তি ও মজ্জা সংস্কৃত। ভিত্তি নষ্ট হইলে তাহার উপর স্থাপিত সমস্ত গঠন নষ্ট হইয়া যায়। মজ্জাহীন দেহের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। যদি উদ্দেশ্য এরূপ হয় যে, সংস্কৃত শব্দগুলিকে এমন রূপান্তরিত করিতে হইবে যে, সহসা কেহ তাহাদিগকে সংস্কৃত বলিয়া চিনিতে পারিবে না, তাহা হইলে বাহাদুরী দেওয়া ভিন্ন আর কিছু না বলাই ভাল।

বাঙ্গালা ভাষাকে মৌলিক বা বিশুদ্ধ খাঁটী ভাষা বলা যায় না। ইহার মধ্যে সংস্কৃতের ত কথাই নাই, ফরাসী, উর্দ্দু ও হিন্দী শব্দ প্রচুর পরিমাণে, এবং ইংরাজী কিয়ৎপরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে। এই সকল শব্দ নিস্ক্রান্ত হইলে বাঙ্গালা ভাষার ভাণ্ডার, অধিক না হউক, প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণে শূন্য হইয়া যায়। ইংরাজী ভাষারও ভিত্তি লাটিন বটে, কিন্তু ইহাতেও অন্যান্য অনেক ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রচলিত প্রায় সকল ভাষারই অবস্থা এইরূপ। পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্ব এবং অধুনা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রভাব ভারতবাসী অন্যান্য জাতির মত বাঙ্গালীর জীবনে ও ভাষায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাষার গঠন ও রূপ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার গঠন ও রূপের বিকৃতি সংসাধিত হইলে বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, ইহা স্বভাবতঃই বিবেচিত হইতে পারে।

যে সকল আধুনিক লেখক বাঙ্গালা ভাষাকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, এবং কিঞ্চিৎ সংযম অভ্যাস করিলে ইহাকে সুরূপ প্রদান, অন্ততঃ, বর্ত্তমান অবিকৃত রূপ রক্ষা করিতে সক্ষম, প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে। তাহা হইলেই স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতার অভিযোগ স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও ভাষায় প্রকাশিত ভাব, সকল দেশে, সকল কালে, জাতির প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে। জাতীয় ইতিহাস এই ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মধ্যেও সেইজন্য ভারতবর্ষ অদ্যাপি সমগ্র জগতে সম্মানিত ও পূজিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কোন লেখকবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ রচিত হয় নাই। হাতের কাছে যাহা পাইয়াছি এবং চোখের সম্মুখে যাহা পড়িয়াছে তাহাই অবলম্বন করতঃ স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। কে কোন্ প্রবন্ধের রচয়িতা তাহাও স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করি নাই। কেবল এইটুকু স্মরণ আছে যে কথিত রচয়িতাগণের কাহারও সহিত আমার কস্মিন্‌কালে পরিচয় ছিল না ও নাই।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে, তরুণ লেখকগণ বিকৃতির পন্থা বর্জ্জন করিয়া ভাষার পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি সাধনের দিকে চালিত হইতে পারেন।

বিশৃঙ্খলার কারণ

…কালের প্রভাবে মানব সমাজে সর্ব্বদাই শ্রমজীবীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। সময় সময় বুদ্ধিজীবী মানুষ, এমন কি, বিকৃত হইয়া কার্য্যতঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন শ্রমজীবিগণ বুদ্ধিজীবিগণের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু, স্বভাবতঃ তাঁহারা ঐ কার্য্যে অপটু বলিয়া সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে……

মজুর

—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

পৃথিবীর প্রেতপুরে জন্ম লভে নিত্য অনুখন,
অসংখ্য জীবন।
বুকের শোণিতপাতে
দিনে রাতে
প্রাণপণ হতভাগ্য নিঃস্বদের দল
ধনীর ভাণ্ডার ভরি' অনাহারে একান্ত দুর্ব্বল,
যন্ত্রের যন্ত্রণা সাথে খেটে মরে বিশ্রামবিহীন,
কদর্য্য কুৎসিত প্রাণ উপবাসী, বিশীর্ণ, মলিন।

নিষ্ঠুর দাম্ভিক স্ফীতি বিসর্পিত অতল গভীরে
ধীরে ধীরে—
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করে অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ :
মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনায় সর্ব্বপ্রাণমন,
বিলাসের পিরামিড, সম্পদের প্রদীপ্ত প্রমোহ,
ভেঙে দিতে করে না বিদ্রোহ।

সচল যন্ত্রের মত শ্রমিকেরা বাঁধা ধরা হয়েছে রুটিন্,
খেটে মরে অবিরাম বিশ্রামবিহীন নিশিদিন :
অন্যায়ের মত্ত পদতলে—
পৈশাচিক বাসনার লোভাতুর উন্মত্ত নর্ত্তন যেথা চলে।

আমৃত্যু সহিষ্ণু এরা, ঘৃণা আর তীব্র অনাদর,—
সুবিধাবাদীর মুক্ত সুতীক্ষ্ণ নখর
আকণ্ঠ আরামে যদি পান করে বুকের শোণিত,—
সব কিছু সয়ে যাবে ধরণীর ধৈর্য্যের সহিত।
ধরণীর বিলাসের ভোগে—
অক্লান্ত কায়িক শ্রমে, শোকে, দুঃখে, রোগে,
বঞ্চনার গ্লানি আর ক্ষুধার কাকুতি নিত্য সহে,
খিন্ন ক্ষীণ নাভিশ্বাস বহে,—
যাহারা দিয়াছে প্রাণ, নিত্যদিন করিছে সংগ্রাম,
হতভাগ্য হেয় সেই মজুরের কোন দিন কেহ জানে নাম ?

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

বিশ্বকর্ম্মার যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী—

এমন সময় খবর পাওয়া গেল, বনচড়ায় একটি পাত্রী আছে।

পিতার ইচ্ছা বিশ্বকর্ম্মা মেয়েটিকে দেখিয়া আসেন। দিদিকে বলিলেন—"তোরাও যা না।"

"আগে ওরা দেখে আসুন না—কেমন, তখন যাব।"

বিশ্বকর্ম্মা ও প্রফুল্ল কন্যা দেখিয়া আসিলেন। দুই জনেরই খুব পছন্দ হইয়াছে। কন্যাটি বগুড়ায় মাসীর বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। মেয়ের ফোটো দেখিয়া সুরুচিরাও ভারী খুসী।

পিতার ইচ্ছা তেজেনের পরীক্ষার পরে বিবাহ হয়, অগত্যা সকলেই নিজ নিজ মনের ইচ্ছা তখনকার মত চাপা দিল। সকলেই বলিল, তখন কিন্তু আসতে হবে—হবে, হবে।

পিতার ইচ্ছা ছিল জামাই আর কিছু দিনের ছুটী লন; তখনকার মত আর সেটা সম্ভব হইল না। নীহারকে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা রওনা হইলেন। সুরুচি ও মেজ-বৌকে দিদি কিছুতেই আসিতে দিলেন না।

বিশ্বকর্ম্মার পাল্লায় পড়িলে দিনগুলি পাল মেলিয়া যেন উড়িয়া যায়। সুতরাং কোথাও যাওয়া হয় নাই। সুরুচি অনেক দিন পরে আসিয়াছেন, একটু এ-পাড়া ও-পাড়া বেড়ান দরকার। অনেকে অনুযোগ করে, অভিমান করে, অতএব একদিন সকালে ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে গেলেন। একবার ট্রেনে একটি সমবয়সীর সঙ্গে সুরুচির আলাপ হইয়াছিল—তাঁহাদের পিসীর বাড়ী এখানে। দিদির সঙ্গে কথায় কথায় জানিতে পারিলেন তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া এই খানেই বাড়ী করিয়াছেন। সুরুচি বলিলেন, "চল তবে সেই বাড়ী আগে যাই, কি সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছিলাম তাঁর—"

দেখা হইলে দুই জনই দুই জনকে চিনিতে পারিলেন এতদিন পরে। আদর সমাদর করিয়া বসাইলেন, এবং ঘরে গিয়া ঘুমন্ত মেয়েকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিলেন পান সাজিয়া আনিতে।

বিরক্ত হইয়া মেয়েটি উঠিয়া আসিল ঘুম-জড়ান চোখে আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া, চুলগুলি বাঁধিয়া কুয়ার পাড়ে গেল, বালু খুঁড়িয়া এক গোছা পান বাহির করিল এবং ধুইয়া লইয়া ঘরে আসিল।

এক নিমেষে সকলে সজাগ হইয়া উঠিলেন। পান সাজিয়া আনিয়া মেয়েটি সামনে রাখিল, মা ধমক দিয়া বলিলেন, "প্রণাম কর।"

দিদি, মেজ-বৌ, সুরুচি, তাপসী বাক্য-হারা—পা বাহির করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, বারান্দা ঘেঁসিয়া মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে নীচু মুখে, বছর এগার বয়স, একখানা আধ-ময়লা ডুরে কাপড় পড়া, এলোমেলো চুলের খোঁপাটা, ঠিক যেন শৈবাল-জড়িতা পদ্মকলি—

গাড়ীতে উঠিবার সময় সকলে আশা করিলেন যে, মেয়েটিকে আর একবার দেখিতে পাইবেন, কিন্তু পা ছুঁইয়া কোন মতে প্রণাম সারিয়া সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে কোথাও দেখা গেল না।

ফিরতি-পথে তাপসী বলিলেন—"কি সুন্দর—কি সুন্দর—এমন মুখের চেহারা?—এমন সুন্দর চুল—"

সুরুচি বলিলেন—"আমরা এ-পাড়ায় কম আসি, বছর তিনেক পরে এলাম বোধ হয়। মেয়ে নয় যেন ছবিখানি—"

তাপসী বলিলেন—"বন-কুসুম—ঘোর জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে—" তাপসী সুরুচি

মেজ-বৌ বলিলেন—"ওটিকে আমায় দাও—"

দিদি বলিলেন—"সুধীরের জন্যে?—বেশ হবে দিদি, খুব মানাবে—যেন রাধাকৃষ্ণ।"

বাড়ী পৌছিতে না পৌছিতে বিবাহ ঠিক।

তাপসী বলিলেন—"জামাই বাবু কি বলেন দেখ আগে—"

সুরুচি বলিলেন—"মেজদির যদি পছন্দ হয়—তাঁর হবেই।"

মেয়ের বাপের সঙ্গে প্রফুল্লর খুব ভালবাসা—তাঁহারা শুনিয়া রাজী—এবং অত্যন্ত খুসী। কিন্তু সমস্ত সঙ্কিত

অর্থ ব্যাঙ্কে আটক পড়িয়া আছে—কিছুই দিতে পারিবেন না। জমি-জমা যথেষ্ট—তবে মেয়ের বেলা মা বাপ সহজে স্বার্থ-ত্যাগ করেন না,—যতটা করেন স্বেচ্ছায় ছেলের বেলা।

বিশ্বকর্ম্মাকে কে না চেনে?—অতএব বিবাহ প্রায় হইয়াই গিয়াছে, এমনি ভাবটা দুই দিকেই প্রকাশ পাইল।

একমাস পরে সুরুচিরা মেদিনীপুর গিয়াছিলেন—বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া বলিলেন—"না।"

"না কেন? মেজদির বড্ড পছন্দ—তাঁর এক ছেলে, বৌ আনতে অনেক হাঙ্গামা—"

"হাঙ্গামা আবার কি?"

"প্রথম মেয়ের সঙ্গে এক ছেলের বিয়ে দিতে নেই, শেষটির সঙ্গেও না,—আবার ছোট্ট মেয়েটি চাই—সুন্দর চাই, বাপের মতন চেহারাটি চাই,—বংশ ভাল চাই—"

"বটে?—এত?—তবে এ মেয়ে?"

"হ্যাঁ—সব—ঠিক ঠিক পাওয়া গেছে—"

"কিন্তু, আমার মত নেই—"

"কেন?"

"সব বিয়ে বিদেশে হলে দেশের লোকে বলবে কি?—তারপরে বলছ এক পয়সা দেবেন না—সুধীরের এরকম বিয়ের দরকার কি—"

"কেন, ফণীর শ্বশুর অত বড় লোক, এক পয়সা দিলেন না, একখানা গহনাও না, তখন কিছু বলনি? সরোজের শ্বশুরও কম মাহিনা পান না, এক চুড়ি আর হার দিয়ে মেয়ে দিলেন, কি পেয়েছিলে?"

"সে যা হয়েছে হয়েছে, বার বার আর নয়।"

কয়েক দিন পরে প্রফুল্লের চিঠি আসিল, মেয়ের বাপ-মা ব্যস্ত হইয়াছেন। ওপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন, দিদি, তাপসী, প্রফুল্লরা।

বিশ্বকর্ম্মা কিছুতেই মত দিলেন না।

ফণী বলিল, "মেয়েদের এই স্বাধীনতা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, বিয়ে ব্যাপারে মেয়েরা কেন? সুধীরের বিয়ের এখন কি দরকার, থাক না কিছুদিন, অরক্ষণীয় হ'য়েছে না কি?"

"এমন সব দিক্ দিয়ে পছন্দের মেয়ে সব সময় পাওয়া যায় না।"

"না, সব মেয়ে ফুরিয়ে যাবে, আর মিলবে না! কাকার মত নেই, ছেড়ে দিন।"

কয়েক দিন দ্বিধার মধ্যে কাটিল, সুরুচি চিঠি লিখিলেন প্রফুল্লকে, বিশ্বকর্ম্মা অরাজী।

চিঠির উত্তর আসিল একেবারে চমৎকার, মেয়ের বাপ বরপক্ষের যাতায়াতের খরচটা শুধু দিবেন, এবং সেটা তিনি প্রফুল্লকে দিয়াও দিয়াছেন, মেয়ের বিবাহের সমস্ত ভারই প্রফুল্লের হাতে অর্পণ করিয়াছেন, বিবাহও প্রফুল্লদের বাড়ীতেই হইবে, যেহেতু বিবাহাদির ব্যাপারে তাঁহারা কিছুই জানেন না। যদি বিশ্বকর্ম্মা মেয়েটি মেদিনীপুর আনিয়া বিবাহ দিতে চান তাতেও রাজী, এককথায় মেয়েটিকে একেবারে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ বিশ্বকর্ম্মা বা সুরুচি মেজ-বৌয়ের সঙ্গে তাঁহাদের মৌখিক বা চিঠিপত্রে এপর্য্যন্ত একটি কথাও হয় নাই। তাঁহাদের এই অখণ্ড অসংশয় বিশ্বাস সুরুচিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তথা প্রফুল্লদের, প্রফুল্লের চিঠির সুরেই তাহা বোঝা যায়। তাহারাও অসংশয়ে ভার গ্রহণ করিয়াছে।

মেজ-বৌ নিশ্চিন্ত, নিজের কাজ লইয়া থাকেন, কিন্তু সুরুচির দারুণ সঙ্কট! চিঠিখানা বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া বলিলেন, "এখন ফেরা যায় কি করে?"

"এগোলে কেন? আমি আগেই অমত করেছি তখনই কেন জানিয়ে দিলে না?"

"দিদির যে বড্ড পছন্দ।"

"তবে যা খুসী কর।"

"তুমি রাজী হবে না?"

"না।"

"তা হবে কেন? আমি চিনিনে তোমায়? দু'দুটো বিয়ে দিলে নিজেদের ঘরের রাশ রাশ টাকা খরচ করে, আর এটা আমরা পছন্দ করেছি বলে—নয়?"

"না, সুধীর এমন দীনভাবে বিয়ে করবে আমার ইচ্ছা নয়।"

"মা যদি কিছু না চায় তার, তোমার কি দরকার? তুমি মত দাও।"

"না, না।"

"দেবে না?"

"যা খুসী করগে।"

"এখন যদি বিয়ে ভেঙ্গে দিই, কি অপমান হবে আমার! লোকে বলবে কি?"

"সে তোমরা ভাই-বোনেরা বোঝ গে।"

"আচ্ছা, বেশ, মাথায় নিয়েছি যখন সমাধা করবই," বলিয়া সুরুচি উঠিয়া গেলেন। জেদ তাঁরও কিছু কম নয়, বীরাঙ্গনা তো বটে!

বিবাহের যোগাড় হইতে লাগিল, তমলুক হইতে সরোজ ও সরোজিনী আসিল।

মেদিনীপুরের বিখ্যাত জুয়েলার সূর্য্য সাহার কাছে গেল গহনার অর্ডার, মেজবৌয়ের মনে কষ্ট না হয় সুধীরের মিলন-পত্র সেই ভাবে তৈয়ারী ও কেনা হইল। বরযাত্রীর রেল-ভাড়া এবং মেয়ের হাত-পায়ের মাপও প্রফুল্লের কাছ হইতে আসিয়া পৌঁছিল।

মনে ভয়, মুখে সাহস, সুরুচি নূতন গহনা বিশ্বকর্ম্মাকে দেখাইলেন, বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "দাম সব মিটিয়ে দিয়েছ?"

"এক বারে পারা যাবে না, মাসে মাসে দেব বলেছি"।

"রাজী হয়েছেন?"

"হাঁা, আগেরও অনেক পাওনা আছে।"

"আগের আবার কিসের পাওনা,—আমি কিছু জানিনে ত!"

"জান না? সরোজের বিয়ের সময় আমার চুড়ি-করাও নি?"

"ও", তারপরে গহনাগুলি দেখিয়া বলিলেন, "বালা কই?"

"বালা গড়তে দিই নি খরচ বেশী পড়বে ভয়ে।"

"থাক—থাক আর মায়া দেখিয়ে কাজ নেই টাকার ওপর, চুড়ির সঙ্গে বালা নইলে নতুন বৌকে মানায়?"

"মানাক না মানাক তোমার কি? তোমার তো মতই নেই।"

"মতের কথা হচ্ছে না, আরম্ভ করেছ যখন, যা-তা করে করা কেন!"

"পরশু ওরা যাবে, বালা গড়বার সময় কই?"

"অর্ডার দাও না কালকের মধ্যে করে দেবে। তারপরে বিয়ে তো দিচ্ছ, সুধীরের মত নিয়েছ?"

"ওর আবার মত কি!"

"বটে! বিয়ে করবে ও তোমার মতে?"

"তাই করতে হবে।"

"ছেলেখেলা নয়, ওকে বলে মত নাও, ও এমন দীনভাবে বিয়ে করতে চাইবে বলে আমার মনে হয় না।"

সুধীরকে কয়েক দিন আগে চিঠি লিখিয়া আনান হইয়াছে। সে দিব্য মনের আনন্দে আছে। সুরুচি বলিলেন, "দিদির জন্যে—শুধু দিদির জন্যে, তুইও কি শ্বশুরের দেওয়া জিনিষের আশা করবি? যদি তোর ইচ্ছে না থাকে, স্পষ্ট করে বল, লুকোসনে, আমি বিয়ে ভেঙ্গে দেব—"

"আমি কি জানি? আপনি যা খুসী করুন না।" সুধীর সরোজিনীর সঙ্গে খেলিতে বসিয়া গেল।

মেজ-বৌ বলিলেন, "অবাক্ হয়েছি, এক কথায় রাজী হয়ে গেল? একটু লজ্জাও নেই, লোকে মুখেও তো একবার একটু অনিচ্ছা দেখায়? কলিকালের ছেলে দেখ একবার!"

সুরুচি ফণীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন সূর্য্য সাহার দোকানে।

সূর্য্য সাহা দোকানেই ছিলেন। শো-কেসে সাজান গহনার সামনে পড়িলে কোন বাঙ্গালিনী খালি হাতে ফিরিতে পারেন? প্লেটের উপর জোড়া-হাঁসের রূপার একটা সিন্দুর-দানী এবং আরও কয়েকটা জিনিস কিনিবার পরে বালার কথা মনে পড়িল, তখন সুরুচি বলিলেন, "এক জোড়া বালা গড়ে দিতে হবে, পরশু সকালে চাই।"

সূর্য্য সাহা বলিলেন, "খাঁটি গিনি সোনার বালা তৈরি আছে, দেখুন—যদি পছন্দ না হয় তৈরি করে দেব।"

নানা মাপের নানা ডিজাইনের দশ পনের জোড়া বালার মধ্যে এক জোড়া অমৃতি-পাক বালা সুরুচি বাছিয়া লইলেন।

বাড়ীতে আসিলে দেখিয়া মেজবৌ বলিলেন, "এত সব আবার আনলি কেন? সব যে ঘর থেকে দিতে হবে—"

"তা হোক আমার বড্ড পছন্দ হলো।"

বিশ্বকর্ম্মা অফিস হইতে ফিরিলে ভয়ে ভয়ে সুরুচি তাঁহাকে দেখাইলেন, বালার কথাই ছিল, ঝোঁকের মাথায় আরো যে অনেক কিছু কিনিয়া ফেলিয়াছেন!

কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "বেশ, বেশ, সুন্দর হয়েছে।"

* * *

এক সময় মেজবৌ বলিলেন, "ওরা কি গোত্র?"

"তা আমি জানিনে।"

"যদি সগোত্র হয়?"

গোত্র সম্বন্ধে সুরুচির বিশেষ জ্ঞান নাই, তবে শুনিয়াছেন সগোত্রে বিবাহ খুব অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, এইখানে তাঁহার ভয়। পিতার মনের ভাব মেয়েরাও লাভ করিয়াছে।

"কি হবে মেজদি? সর্ব্বনাশ যে!"

ফণী বলিল, "বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। মেয়েরা দেবে বিয়ে? তবে আর ভাবনা কি? সে দিন রিক্স দিয়ে ঘরে আনলুম, তার গিন্নীপনা দেখ। আমাদের গ্রাহ্যই নেই, অমন যে কাকা তাঁকেও না, নিজেই সর্দ্দার, বেশ হয়েছে এবার।"

নীহার প্রথম হইতেই বিপক্ষ, "বার বার বারণ করলুম, বাবুর ইচ্ছে নয়, থাকুগে, মা কি কম না কি, সগোত্তরে বিয়ে দিয়ে সব শুদ্ধু নরকে যাও।"

সুরুচি বলিলেন, "আমি কি একা যাব? তোমরাও।"

"ইস, বাবুও না, আমিও না।"

ফণী বলিল, "আমিও না।"

সুরুচি সগোত্রের ভাবনায় ব্যাকুল, সময় নাই চিঠি লিখিয়া জানিয়া লইবার। টেলিগ্রাম করিলে হয়, কিন্তু টেলিগ্রাম বড় বেয়াড়া জিনিস, যখন তখন আসে, যদি বিশ্বকর্ম্মার হাতে পড়ে, বলেন যে "গোত্র না জেনেই কোমর বেঁধেছ!" বিশ্বকর্ম্মার টিপ্পনী বড় অসহ্য!

দেশের একটি ছেলে বাসায় থাকে, সে বলিল, "মিত্রেরা বিশ্বামিত্র গোত্র হয়।"

"ঠিক জান তুমি, ঠিক জান?"

"হ্যাঁ, আমার শ্বশুর মিত্র।"

"যদি সত্যি হয়, তোমার খাওয়া পাওনা রইল এই সুখবরের জন্যে।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সকাল বেলা ফণী খবরের কাগজটা হাতে আসিয়া বলিল, "বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, এবার বুঝুন মজা।"

সুরুচি অবিরত শাসনে ও বিদ্রূপে রাগিয়া গিয়াছেন, বলিলেন, "হয়েছে কি?"

"অত ছোট মেয়ের যে বিয়ে দিচ্ছেন, সর্দ্দা আইনে পড়তে হবে না? যান এবার জেলে যান।"

সর্দ্দা আইনের কথা তো মনে পড়ে নাই, মেয়ে যে মোটে এগারো বছরের, এখন? বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলে আর কি রক্ষা আছে? গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত যে শেষ। বিশ্বকর্ম্মা মেয়েও দেখেন নাই, বয়সও জানেন না, ছোট মেয়ে এইটুকু শুনিয়াছেন মাত্র। এ কি দুঃসংবাদ! কাল বর রওনা হইবে যে—

"এই দেখুন, তিন জোড়া মা-বাপের জেল হয়ে গেছে, পুরুত শুদ্ধ।"

"আমরা এ বিয়েতে নেই। সাক্ষী দেব, আমরা কিছু জানি নে, ইনি বাপের বাড়ী গিয়ে বিয়ে ঠিক করেছেন, সব চিঠি পত্র আপনারই নামে, ও দিকেও দাদামশাই কিছুর মধ্যে নেই, মামা আর দুই মাসীমা কর্ত্তা, যান চার ভাই-বোন মজা করে জেলে গিয়ে থাকুন গে।"

"দেখা যাবে এবার আচার! আচারের চোটে বাড়ী শুদ্ধ অস্থির। এ কাকার সঙ্গে ঝগড়া করা নয়। ওঁর কল কেউ ছুঁতে পারবে না, আমরা যেন ডোম বাগদী! কে দেবে জেলে অত জল? দিনে দশবার চান করা বেরুবে! মেজ-খুড়িমার জেল সবার আগে হয়ে বসে আছে, এক রত্তি ছেলের বিয়ের জন্যে কি নাচ!"

মেজবৌ ভয়ে কম্পমান হইয়া বলিলেন, "ছেড়ে দে ভাই বিয়ে, কারোই মত নেই, পদে পদে বাধা! মেয়ে থাকগে দু'তিন বছর বাপের কাছে।"

সুরুচি বলিলেন, "গায়ে হলুদের আগে কেন বললে না?"

"আজ কাগজ পড়ে না মনে হলো? নিজে এত পণ্ডিত, স্বামীর কথা গ্রাহ্য নেই, একথা মনে হয় নি কেন? আমরা না হয় মূর্খ।"

"বেশ, বেশ, তোমার আর লেকচার দিতে হবে না, যা হয় উনি দেখবেন।"

"কক্ষনো না, কাকার কি দায়? তাঁর কথা রেখেছেন?"

"তবে এক কাজ কোরো, ওখানকার থানায় একটু বলে রেখো।"

"হ্যাঁ যেমন বুদ্ধি! আগে ভাগে বলতে গেলে সন্দেহ করবে না? শেষে আমি জড়িয়ে মরি আর কি।"

নীহার বলিল, "ভদ্দর লোকের বউ জেলে যাবে—অমন বিয়ে দিয়ে কাজ নেই মা।"

ফণী বলিল, "ওখানে কিছু না ও যদি বলে কেউ খাতিরে, নতুন বৌ এত দূরে আনতে গেলে লোকে দেখবে না? শেয়ালদা পুলিশের হাতেই আগে ধরা পড়তে হবে।"

সহসা নিজের তীব্র জেদ ফিরিয়া পাইয়া সুরুচি বলিলেন, "না—যা খুসী হোক্‌গে—বিয়ে দোবোই—জেলে যাই যাব।"

বরযাত্রীরা রওনা হইয়া গেল।

বাণবিদ্ধ হরিণীর মত সুরুচির সুখ নাই, শান্তি নাই, জোর নাই, মুখে জেদ—অন্তরে হাত-পা ভাঙ্গিয়া আসে। বিশ্বকর্ম্মার তীব্র আপত্তি, অসম্ভব গম্ভীর মুখে থাকেন—কথা বলেন না, সকলের অমত, ফণীর বিদ্রূপ, সর্ব্বোপরি সর্দ্দা আইনের ভয়, অবশেষে কি কপালে জেল আছে? হইতেও পারে, হিন্দু শাস্ত্রে স্বামীর বিরুদ্ধ কাজ করিলে মহাপাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে বৈ কি।

রাত্রে বিশ্বকর্ম্মার নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখিয়া সুরুচির হিংসা হয়, নিজে সারা রাত জাগিয়া ভাবেন,—সত্যই তো, ওদিকে দুই বোনই কর্ত্তা—প্রফুল্লের একখানা চিঠি আসে তো তাপসীর তিনখানা, দিদি নিজে হাতে লেখেন না, তাপসী তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। বাবা তো সব শুনিয়াই খুসী, কোনও ব্যাপারের মধ্যে নাই। তবে উপায়?

আবার ভাবেন চার জনে জেলে গেলে তত কষ্ট হইবে না—দেখা হইলে গল্পে গল্পে দিন রাত কাটে, তেমনি কাটিবে। কিন্তু কত দিনের জেল হয়? ছ'মাস না বছর ঠিক তো জানা নাই।

তাঁর পরের প্রধান ভাবনা বৌকে বিশ্বকর্ম্মা কি চোখে দেখিবেন? তিনি যে বৌ সম্বন্ধে একটা কথাও মুখাক্ষরে বলেন না। যদি সে তাঁর বিরাগ-বিরক্তির পাত্রী হয়—তবে যে দুঃখের সীমা থাকিবে না কাহারও।

এমন বিপদে পড়িয়াছে কেউ? সুরুচি বিছানা ছাড়িয়া ওঠেন না, শুধু বিশ্বকর্ম্মা যে-সময়টা বাড়ীতে থাকেন, ততক্ষণই কলের পুতুলের মত যা নড়া-চড়া করেন, অন্তরে দুশ্চিন্তার আশঙ্কা আর বিশ্বকর্ম্মার উপরে তীব্র অভিমান।

টেলিগ্রাম আসিল বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা পড়িয়া চুপ করিয়া রহিলেন, সুরুচি দেখিলেন ঐ একটা কথাই লেখা—আর কিছুই না—পুলিশ হাঙ্গামা হইল কি না কে জানে? কিংবা টেলিগ্রামের পর হয়তো পুলিশ আসিয়াছে, শত্রুর অভাব নেই—প্রফুল্লের বিয়ের সময় যে কাণ্ডটা হইয়াছিল।—কে জানে কি ঘটিতেছে।

সুরুচির দশা দেখিয়া সকলে দুঃখিত—মেজবৌ বলিলেন, "না এ বিয়ে না হলেই ভাল হ'ত—"

সুরুচি জোর করিয়া বলিলেন—"বেশ হয়েছে।"

পরের দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে ফণীর আসিবে—বিশ্বকর্ম্মা যথারীতি অফিস চলিয়া গেলেন, সে সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া গেলেন না।

সুরুচি দেশের সেই ছেলেটিকে বলিলেন—"ওঁর গাড়ী নিয়ে আমার দরকার নেই—তুমি ভাল একটা ট্যাক্সি নিয়ে ষ্টেশনে যাও।"

মেজ বৌ বলিলেন—"এত খরচ-পত্তর হলো—বৌ দেখে যদি ঠাকুরপো পছন্দ না করে—মুখ দেখাতে পারব না—"

সুরুচিরা সেই যে নিমিষের দেখা দেখিয়াছিলেন মেয়েটিকে, আর একবার দেখিয়া আসিবার জন্য দিদি বার বার বলিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু হইয়া ওঠে নাই। যদি বিবাহ না হয় কি হইবে বার বার দেখিয়া? চেহারা ভাল মনেই নাই নিজেদের। হঠাৎ দেখিয়াছিলেন বলিয়াই কি অত ভাল লাগিয়াছিল, যদি সে রকম না হয়?

আর উঠিতে বসিতে জেলের ভয়—এই লম্বা পথ—কে মা বৌকে দেখিবে? কারও না সর্দ্দা আইনের কথা মনে পড়িবে? পুলিশ কোথায় নাই বিশ্বকর্ম্মা কি বলিবেন না যে, এত ছোট মেয়ে বিয়ে দিলে কোন্ বুদ্ধিতে?

বাড়ীর সামনের বারান্দায় সুরুচি ষ্টেশনের পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—অল্প অল্প আঁধার হইয়াছে—বিশ্বকর্ম্মা তখনও ফেরেন নাই। এমন সময় হেড্‌লাইট, সাইডলাইট জ্বালাইয়া ঘন ঘন সুতীব্র হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে বিশ্বকর্ম্মার গাড়ী বায়ুবেগে ষ্টেশনের দিক হইতে ছুটিয়া আসিল এবং বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। এ কি ওঁর গাড়ী ওদিক থেকে কেন? রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুরুচি নীচের দিকে চাহিলেন,—সরোজিনী দুড় দুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল,—ঝিয়েরা বাহিরে ছুটিল, বৌ আসিয়াছে ভাবিয়া এবং তৎক্ষণাৎ ভিতরে পালাইয়া আসিল,—মেজবৌ ঘরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন—বৌ পরিচয়ের আগে তাঁহাকে দেখিতে নাই।

সুরুচি ব্যাপারটা বুঝিতে না বুঝিতে সশব্দে দুই-তিন সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া লাফে লাফে উপরে উঠিতে উঠিতে বিশ্বকর্ম্মার উচ্চ কণ্ঠ "কই তুমি—কই—কোথা?"

বৌকে প্রায় কোলে তুলিয়া লইয়া বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন।

সুরুচি বলিলেন, "সুধীর কই?"

"এসেছে, নীচে আছে, গাধাটা! ষ্টেশনে গাড়ী ইন্ করেছে, হাত ধরে নামাবে, না নিজের সুটকেস নিয়েই ব্যস্ত—"

"নামালে কে?"

"আমি", সশব্দে চেয়ার টানিয়া বিশ্বকর্ম্মা বৌকে কোলে বসাইলেন, "সুন্দর বৌ! করেছ কি? অ্যাঁ করেছ কি? এইটুকু মেয়ে থাকতে পারবে মা-বাপ ছেড়ে। নাম কি? নাম একটা কি রেখেছে যেন, বল না।"

বিবাহ ঠিক হইবার পরে সুরুচি বাপের দেওয়া নাম লতিকা বদলাইয়া সুধীরা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাপসীকে সে চিঠি বিশ্বকর্ম্মা দেখাইয়াছিলেন।

"বেশ নাম, আচ্ছা সুধীরা, তোমায় যদি না যেতে দিই, থাকতে পারবে না?"

সুধীরার মাথায় কাপড় নাই। দিতেও জানে না, মুখ একটু নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

"লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মা, দাও দাও একে খেতে দাও, ছেলে মানুষ খিদে পেয়েছে, ঐ লক্ষ্মীছাড়ারা কি ওকে কিছু খেতে দিয়েছে পথে? আসুক আগে। দাও আমাকেও দাও, চুপচাপ কেন? বাড়ীর কর্ত্রী—বিয়ে বাড়ীর। বৌ বরণ কর, আলপনা দাও হুলুস্থুল কর। তুমি বরকর্ত্তা—ধাঃ ব্যাকরণ ভুল! বরকর্ত্রী—আমরা কে? দুটো খেতে পেলেই খুসী। কৈ মেজবৌ, ডাক? বৌ দেখবেন না? চুপি চুপি ছেলের বিয়ে ঠিক করে এখন পালিয়ে কেন?"

সুরুচি বলিলেন, "দিদি রাত্রে দেখবেন।"

"কেন তোমার মুখ ভার কেন? হাস—আনন্দ কর, নৃত্য-গীত কর, রণ জয় করেছ, জেদ বজায় রাখলে, আর কেন? প্রসীদ! প্রসীদ!"

বিশ্বকর্ম্মার কথার সুরে প্রচুর উল্লাস ও উৎসাহ, বিগত এক মাসের গাম্ভীর্য্য লোপ এবং নিজ স্বভাবের প্রত্যাবর্ত্তন।

সুরুচি বলিলেন, "তুমি ষ্টেশনে গেছলে?"

"হ্যাঁ বৌ আসবে কিসে? তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল, চারটে অবধি গাড়ী চেয়ে পাঠালে না, শেষে বুঝলাম—রাগ, কি করি নিজেই গেলাম।"

সুরুচি বলিলেন, "যাব কি—মনে সুখ থাকলে ত?"

"অসুখ? তোমার মনের অসুখ? বল কি? অবাক্ করলে যে? সর্ব্বেসর্ব্বা প্রবলপ্রতাপান্বিতা শ্রীলা শ্রীযুক্তা অশেষগুণনিলয়া।"

"সত্যি করে বল, বৌ তোমার পছন্দ হয়েছে?"

"খুব, খুব বেশী" বিশ্বকর্ম্মা সুধীরার মুখ ধরিয়া তুলিলেন—"দেখ কেমন কচি পাতার রং, কেমন মুখের চেহারা—লক্ষ্মীশ্রী যাকে বলে, লাগুলি! সব চেয়ে ভাল লাগছে আমার এত ছোট্ট বলে, এইটুকু আবার বৌ হয়? খুঁজে বার করলে কি করে? অবাক্ করে দিলে যে?"

"কিছু দিলে না বলে তোমার যে কষ্ট ছিল।"

"যেতে দাও, যেতে দাও—কিসের দেনা-পাওনা—আসল হচ্ছে বৌ—এ বৌ দেখে দেশের লোকে ধন্য ধন্য করবে দেখো, এই রকম ছোট্টটি থাকতে থাকতে দেশে দেখিয়ে আনতে হবে।"

নীহার,ফণী, সরোজ জিনিসপত্র লইয়া ট্যাক্সিতে আসিয়াছে। ভিড় করিয়া সকলে বৌ-পরিচয় দেখিতে আসিল, সরোজিনী সমস্ত দিন ধরিয়া যথাশক্তি আলপনা দিয়াছে—সে তো আলপনা নয়—পিটুলি গোলার লেপন! সরোজিনীর আনন্দ ধরে না, ছোট্ট যা'টি পাইয়া। বিশ্বকর্ম্মা ক্লাবে না গিয়া দিব্য সাজ-পোষাক করিয়া বৌ-পরিচয় দেখিতে আসিয়া জমকাইয়া বসিলেন। সরোজিনী সুধীরার মাথায় কাপড় তুলিয়া দিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "না, ওকে খোলা মাথায় মানায় বেশী—তোমার শাশুড়ীদের মাথায় কাপড় তুলে দাও না—ওঁরা যে বৌ—তা ভুলেই গেছেন।"

ঠাট্টায় কৌতুকে হাসিতে বিশ্বকর্ম্মা ঘর মাথায় করিয়া তুলিলেন। আশীর্ব্বাদটি সারা হইবামাত্র সুধীরা উঠিয়া নীচে পলাইয়া গিয়া বাঁচিল।

পরদিন তাপসীর চিঠি আসিল। চিঠি পাইবামাত্র শত জরুরি কাজ ফেলিয়া পড়া বিশ্বকর্ম্মার অভ্যাস—যার চিঠিই

হোক না কেন—খাম ছিঁড়িতে এক সেকেণ্ড লাগে না। শিরোনামা দেখা অভ্যাস নাই তাঁর।

তাপসীর চিঠি—

দিদি! সুধীর ও সুধীরা চলে যাওয়াতে বাড়ীটা বড্ড ফাঁকা হয়ে গেছে। মেজদিকে বোলো, বেয়ান জামাই দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এখানে এমন বিয়ে আর একটিও হয়নি। সব শুদ্ধ অবাক্ হয়ে গেছে, মেয়েরা বিয়ে ঠিক করলে, বিয়ে দিলে, একটি কথা অমিল হল না, যেন খেলা-ঘরের বিয়ের মতন আমোদের মধ্যে বিয়েটি হয়ে গেল! বোনেরা সত্যি একটা কাজ করলে বটে! সব তুমি এসে শুনো। মেয়ের মা তোমার কাছে একেবারে কেনা! তারা তো তোমার উপরেই সব নির্ভর করেছিলেন; জামাইবাবুর সঙ্গে একটি কথা না, একটা চিঠি না। জামাইবাবুর সাড়া শব্দ নেই কেন? বৌ দেখে কি বললেন? সেইটি জানাবে। তোমরা এলে না, সব যেন খালি খালি। ফণী সর্দ্দা আইনের ভয় দেখিয়ে গেছে, তা দিদি তুমি যদি যাও, তবে জেলে আমার কষ্ট নেই।

ইতি—তোমার ছোট খুকী।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"বোনেরা উকীল হলে মানাতো। ভাইয়েরা বোন হয়ে বোনেরা ভাই হলেই ছিল ভাল। কি তর্ক-শক্তি, বর্ণনা-শক্তি, নিজেদের গুণপণা আবার চিঠিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে! একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর!"

নীহার বলে—"ভাল এক নাচুনী বৌ নিয়ে এলো মা, বাবুর সমস্ত জিনিস-পত্তর ওলোট-পালট করছে সারা দিন, একটু সুস্থির নেই।"

সরোজিনী সুধীরার সঙ্গে পারিয়া ওঠে না, একছুটে সে ছাদে যায়, বাহিরে যায়, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়, আরদালীদের তাঁবু পর্য্যন্ত। ফণী সরোজকে দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ নাই। এরা সবাই তো তার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। শ্বশুর-বাড়ী হইল আবার কার? মেজবৌ সরোজিনীকে বলেন—সরোজিনী শোনায়, কিন্তু সুধীরা শোনে না।

আট দিন পরে দুই জনের ফিরিবার কথা। সুধীর কি সব বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে বৌকে, বৌ যখন শুনিল, এবার সুধীরের সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইবে, আর কেহ যাইবে না। সে বলিল, "ওর সঙ্গে আমি যাব না।"

সুরুচি বলিলেন—"সেই ভাল, এখানেই থাক।"

"না—মা কাঁদবে।" বলিয়া এক দৌড়ে গেল ফণীর কাছে—"আপনি আমায় নিয়ে চলুন।"

ফণী খুব ভালবাসে সুধীরাকে। বলিল, "আমি এখন যেতে পারব না যে।"

"কেন পারবেন না? আসতে পেরেছিলেন ত? ও লক্ষীছাড়ার সঙ্গে আমি যাব না।" বলিয়া মুখ ফুলাইয়া হাজির হইল সরোজের কাছে।

সরোজ বলিল—"আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে। আমি আজই তমলুক যাচ্ছি।"

"তবে আমি যাবই না।" বলিয়া সুধীরা বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন—"ডাক সে পাজিকে, লাগাচ্ছি কটা, ইয়ারকি করতে গেছেন এক শিশুর সঙ্গে, কি কি বলেছে শুনি?"

বিশ্বকর্ম্মা অফিস হইতে আসিয়াই সুধীরাকে ডাকেন। আজ না খাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সরোজিনী বলিয়াছে, "ঠাকুরপো ওকে টুনটুনি, আহ্লাদী পুতুল, অসভ্য বলেছে, তাই রাগ করেছে।"

"ইস অসভ্য, নিজে খুব সভ্য! বাঁদরটা। ডাক নীহার, কোথা সে?"

সুরুচি বলিলেন, "বৌকে দুটো কথা বলেছে বলে তুমি বেত লাগাবে?"

মেজবৌ বলিলেন, "মন্দ কি? বৌয়ের সঙ্গে কি রকম করে কথা কইতে হবে, সেটা কাকার কাছে আগে জেনে নেয় নি কেন?"

সরোজিনী প্রমুখাৎ খবর পাইয়া সুধীর অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছে, বৌয়ের ছায়াও মাড়ায় না।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমি ছুটী নিয়ে গিয়ে সুধীরাকে রেখে আসি, অনেক দিন যাইনি, কর্ত্তা বার বার লিখছেন।"

"অনেক দিন মানে? চৈত্র মাসের শেষে এসেছ, এটা আষাঢ় মাস, তু'মাস হয়েছে সবে। যেমন বাপ তেমনি তুমি। এখন তোমার যাবার দরকার নাই, বেয়ানেরা মেয়ে জামাই জোড়ে চান, এরাই যাক।"

"না ও পাজির সঙ্গে দিয়ে আমার বিশ্বাস হয় না, ওটা একটা বাউণ্ডুলে, না দেবে খেতে, না হাত ধরে নামাবে ওঠাবে, আর কেউ সঙ্গে যাক।"

পরের দিন চিঠি আসিল দ্বিজেনের, সে চিঠি লিখিয়া কলিকাতা রওনা হইয়াছে, কালীঘাটে নূতন বাসা করিবার জন্য। দিন ঠিক করিয়া সুধীরদের রওনা করিয়া দিতে লিখিয়াছে, হাওড়া ষ্টেশনে সে নামাইয়া লইবে এবং শিয়ালদহে তুলিয়া দিবে। তাহাকে যেন আগে জানান হয়।

বিশ্বকর্ম্মা এবার নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বিজেনের কাছে চিঠি গেল।

আফিসে যাইবার সময় সুধীরাকে কোলে বসাইয়া অনেক আদর করিয়া বাঁদরটা পথে কি রকম ব্যবহার করে, তাহা লিখিয়া জানাইতে বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিদায় হইলেন, সুরুচিকে বার বার সতর্ক করিয়া গেলেন, সঙ্গে যেন ভাল ভাল খাবার তৈরি করিয়া দেওয়া হয়, ছেলে মানুষ কষ্ট না পায়।

শুনিয়া সুধীর সরোজিনীর কাছে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইস্—আমাদের ওপর কোন দিন কিছু নজর নেই, একটা বুনো টুনটুনির জন্যে এত ?"

ছুটার গাড়ীতে তাহারা রওনা হইল।

সুরুচি বলিলেন, "খুব সাবধান, যত্ন করে নিয়ে যাও, মা-বাপ বিশ্বাস করে রয়েছে, হারিয়ে না যায়।"

"অত যদি ভয়, পরের কাছে মেয়ে দেওয়া কেন ? নিজেদের কাছে রাখলেই পারতো মা-বাপ, কে চেয়েছিল ?"

"যা বলি শোন্, হাওড়ায় বড্ড ভিড়, দ্বিজেন যদি চিঠি না পেয়েই থাকে, সব সময় হাত ধরে থাকবি—বুঝলি ?"

"বুঝেছি, হারিয়ে যদি যায়ই, আর কি এমুখো হবো ?"

মেজবৌ বলিলেন, "ঠাট্টা নয়, ঠাকুরপো আস্ত রাখবে না তা হলে।"

"তোমার ঠাকুরপো আমার পাত্তা পেলে ত ?"

সুধীরা ঠোঁট ফুলাইয়া দিব্য খোলা মাথায় গাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং সুধীরের দিকে একেবারে পিছন ফিরিয়া বসিল।

হাওড়া ষ্টেশনে দ্বিজেনকে দেখিবামাত্র সুধীরা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত ধরিল এবং সুধীরকে একেবারে বর্জ্জন করিল।

শিয়ালদহে ট্রেনে দুইজনকে তুলিয়া দিয়া দ্বিজেন বলিল, "এবার নির্ভাবনা, ভোর বেলা নাম্‌বি, কেঁদেছিলি ?"

"না, আপনি চলুন আমার সঙ্গে।"

"আমি সবে তিন দিন হলো এসেছি, তোর কিছু ভয় নেই সুধীরা, ষ্টেশনে তোর কাকা থাকবে গাড়ী নিয়ে, রাত্তিরটা তো ঘুমিয়েই কাটাবি।"

সুধীর বলিল—"হুঁ আবদার! মামার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ওঁকে পৌছাতে যাবেন! আমি যে এসেছি তাই কত ভাগ্যি! আবার মামা!"

দ্বিজেন হাসিয়া বলিল "সুধীর চুপ চুপ! ও তোর ওপর খুসী নয়, বোধ হচ্ছে।"

"বয়ে গেল।"

ট্রেণ ছাড়িতে দেরী আছে। সুধীর বলিল, "মামা, খেয়ে যান, আপনার জন্যে মা বেশী করে দিয়ে দিয়েছেন।"

মেজবৌয়ের ভাই নাই, সুরুচির ভাইদের প্রাণের মত ভালবাসেন।

ডিস মাত্র একখানা, টিফিন-ক্যারিয়ারটা খুলিয়া সামনে রাখিয়া ভাগ্নে বৌ ভাগ্নে ও মামাশ্বশুর একত্র একপাত্রে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সুধীরাকে দ্বিজেনরা ছেলেবেলা হইতে জানে, গাড়ীর মধ্যে যা কিছু কথা তাহার দ্বিজেনের সঙ্গে, সুধীরের সঙ্গে কথা নাই রাগের জন্য, লজ্জায় নয়, লজ্জা করিতে শেখে নাই।

আগে সুধীরের খাওয়া হইল, একটু পরে দ্বিজেনও হাত তুলিল, তারপরে সুধীরার খাওয়াও হইয়া গেল, তাহার পরিত্যক্ত একটা লুচি ডিসে রহিয়া গেল দেখিয়া দ্বিজেন বলিল, "ওটা খাও ?"

সুধীর বলিল, "না আর খাব না।"

দ্বিজেন বলিল, "সুধীর একটা লুচি কি নষ্ট করা উচিত ? এটা তো ভাল কথা নয়, মেজদির হাতের খাস্তা লুচি!"

সুধীর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না কখখনো নয়, কোন চিন্তা নাই," বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুধীরার উচ্ছিষ্টাবশেষ লুচিটা খাইয়া ফেলিল।

বলা বাহুল্য দ্বিজেনের মারফৎ এই ঘটনাটা পল্লবিত হইয়া অচিরাৎ সকলের গোচর হইয়া গেল।

ধবলগিরি [ফোটোগ্রাফ

শিবসঙ্কীর্ত্তন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল

—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যখন বৈষ্ণব যুগ চলিতেছিল, সেই সময়ে শাক্তগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই সময়ে শিব, শক্তি ও মনসার মাহাত্ম্যপ্রচারকল্পে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। দ্বিজ জনার্দ্দন, বলরাম, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন; কাণা হরি দত্ত-প্রমুখ শতাধিক কবি মনসার ভাসান বা মনসামঙ্গল রচনা করিলেন; এবং শিবপ্রসঙ্গ লইয়া বহু কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত শূন্যপুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু কবি শিবলীলাসংক্রান্ত বহু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নের প্রথমাংশের কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে মুকুন্দরামের চণ্ডী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য-রচিত শিবায়ন ও পরবর্ত্তী যুগের কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের হরগৌরীর আত্মলীলার আখ্যান-ভাগের একটী তুলনা করিব।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডিকামঙ্গল রচনা করেন। এই চণ্ডিকামঙ্গল বা কবিকঙ্কণের চণ্ডী শতবৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার ঘরে ঘরে গীত হইত। চণ্ডিকামঙ্গলের অনুকরণে পরবর্ত্তী যুগে ঐ ধরণের বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে মেদিনীপুরনিবাসী রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য রচিত শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্ত্তন একটী সুরচিত বৃহৎ কাব্য। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই শিবায়ন বঙ্গদেশের কতকাংশের পল্লীগ্রামে চণ্ডীর মতই আদৃত হইত। অনেকে হয়ত সেই শিবসঙ্কীর্ত্তনের নামও পর্য্যন্ত অবগত নহেন।

এই শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যটী বঙ্গীয় ১২৬০ সালে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে রাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১২৯৩ সালে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গবাসীর জন্য বহু পুঁথি হইতে পাঠ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক ইহার একটী সংস্করণ করেন, তাহা বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। বসুমতীও শিবায়নের একটী সংস্করণ করেন।

উল্লিখিত তিনটী কাব্যের তুলনা করিবার কারণ, এই তিনটী কাব্যেই শিবপ্রসঙ্গের পূর্ব্বাংশ প্রায় একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং আমাদের মনে হয় শিবায়নের রচয়িতা চণ্ডীকাব্য হইতে এবং ভারতচন্দ্র চণ্ডী ও শিবায়ন হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন *।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বঙ্গবিশ্রুত সুতরাং তাহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। আমরা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্ত্তনের কিছু পরিচয় দিব।

মেদিনীপুর রাজবংশের ইতিহাস ** হইতে আমরা জানিতে পারি যে ১১০০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৩-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রঘুনাথ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা রামসিংহ মেদিনীপুরের শাসনভার গ্রহণ করেন।† তিনি মেদিনীপুরে কর্ণগড় ও আবাসগড় নামক দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কর্ণগড় মেদিনীপুর শহরের ছয় মাইল উত্তরে, আবাসগড় মেদিনীপুরের উত্তর সীমাতেই অবস্থিত।‡ তাঁহার মৃত্যুর

---

* "প্রথম ভাগের অনেক স্থলেই ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের চণ্ডী এবং বোধ হয় কোন কোন স্থলে রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন হইতেও অস্থি সঙ্কলন করিয়া তদুপরি মাংস যোজনা করিয়াছেন।" বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য—রামগতি ন্যায়রত্ন।

** *History of Midnapur Raj* by Narendralal Khan.

† উক্ত ইতিহাসে লিখিত আছে" He distinguished himself by good services to the existing Government. His name appears in Marshman's History of Bengal Chapter XIII p. 163" কিন্তু দুঃখের বিষয় মার্শম্যানের ইতিহাসে উল্লিখিত মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রামসিং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের শত্রুতা করেন, কিন্তু যশোবন্ত সিংহের পিতা ১৭১১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

‡ *Midnapur District Gazetteer*.

পর ১১১৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যশোবন্ত বা যশোমন্ত সিংহ মেদিনীপুরের রাজা হন। অনেকে মনে করেন, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ যখন ঢাকার নায়েব নবাব নিযুক্ত হন, তখন ইনি তাঁহার দেওয়ান হন এবং তাঁহার সুশাসনে ঢাকা তৎকালে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। §

রাজা যশোবন্ত সিংহ একজন ভক্তিমান্ শাক্ত ছিলেন, তাঁহার কুলদেবতা দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার তিনি নিত্য সেবা করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, শিব-দুর্গা তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং তাঁহার মাথায় পঞ্চাঙ্গুলীর দাগ অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাও কথিত হয়, বিষ্ণুপুরের রাজা বহু সৈন্য লইয়া কুলদেবতা মদনমোহনের সহিত যশোবন্ত সিংহকে আক্রমণ করেন। যশোবন্ত সিংহ তৎকালে মহামায়ার আরাধনায় রত ছিলেন, সুতরাং কিছুই জানিতে পারেন নাই, পরে সৈন্যকোলাহলে ধ্যান-ভঙ্গ হইলে তিনি মহামায়ার সাহায্যে প্রার্থনা করেন। মহামায়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত শত্রুসৈন্য মথিত করিয়া মদনমোহনকে পরাস্ত করিয়া যশোবন্ত সিংহকে রক্ষা করেন। এই সকল কাহিনীর মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নাই। ১১৫৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহ দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র অজিত সিংহ রাজা হন।

রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ্ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই আলোচ্য কাব্যখানি রচনা করেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমে মেদিনীপুর জিলার বরদা পরগণার যদুপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন, পরে যদুপুর ত্যাগ করিয়া তিনি মেদিনীপুর-রাজের সভাসদ্ হন এবং মেদিনীপুর পরগণার অযোধ্যাবার নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। কর্ণগড়দুর্গমধ্যস্থ মহামায়ার মন্দিরে তিনি পাঁচটী নর-কপালের উপর যোগ-সাধনের নিমিত্ত আসন নির্ম্মাণ করেন। সেই আসনটী অদ্যাপি "পঞ্চমুণ্ডী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কথিত আছে মহামায়া তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা উপহার দেন। মহামায়ার আদেশেই তিনি শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি রামেশ্বর রাজা রামসিংহ কর্ত্তৃক সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন :

"মধুকর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রামেশ্বর রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত।"
(শিবসংকীর্ত্তন পৃঃ ২০)

"রচে রাম রামসিংহ রাজ প্রতিষ্ঠিত'
(শি. স, পৃ ১৩০)

গ্রন্থকার কাব্যমধ্যে এইরূপে নিজের বংশপরিচয় দিয়াছেন।

"ভট্টনারায়ণ মুনি, সন্তান কেশরকুনি
জ্যোতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন
তস্যসুত বিদিত-লক্ষণ
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা সে সুন্দরী
এ অযোধ্যা নগর নিকেতন।
যদুপুরে পূর্ব্ববাস, হেমৎ সিংহ পরকাশ
রাজা রামসিংহ কৈলস্থিত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বরিয়া পুরাণ পটে
রচাইল মধুর সংগীত।।"
পৃ ২০৭-২০৮

"শম্ভুরাম ভায়ার মঙ্গলকর প্রভু।
পদচ্ছায়া দিহ দয়া না ছাড়িহ কভু।

---

§ মেদিনীপুরের রাজবংশের ইতিহাসে লিখিত আছে "During the life time of his father he gained great renown in the service of Nawab Moorshid Kuli Khan. In 1734 he was appointed under Serferaz Khan the nominal governor, Dewan of the province of Dacca, which he raised to a most flourishing condition by his wise and able administration, as appears, from Chapter VIII of Marshman's History of Bengal."

মার্শম্যান-এর ইতিহাসে যে ব্যক্তি ঢাকার দেওয়ান হইয়াছিলেন তাঁহার নাম যশোবন্ত রায় এবং তাঁহার সহিত মেদিনীপুরের কোন সম্পর্ক ছিল কি না, জানা যায় না। গ্রন্থকার মহাশয় ভ্রান্ত ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ভগিনী পার্ব্বতী গৌরী সরস্বতী ত্রয়।
দুর্গাচরণাদি করে ভাগিনেয় ছয় ॥
ভাগিনেয়ী পুত্র রামকৃষ্ণ বন্দ্যোঘটি।
এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি ॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।
পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিয় ॥

গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থ-রচনাকাল যে ভাবে দেওয়া আছে তাহা হইতে সরলভাবে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকে বন্ধনীর মধ্যে ১৬৩৪ লিখিত আছে। তাহা হইতে অতি কষ্টকল্পনার সাহায্যে এইরূপ সমাধান করা যায় :—

শাকে হলে চন্দ্রকলা রামকরতলে।
বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে।
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল সারা।
অবনীতে আসি যেন অমৃতের ধারা ॥

চন্দ্রকলা=১৬। রাম-বলিতে তিন বুঝায়, কারণ ভৃগুরাম, দাশরথি রাম এবং বলরাম। যদি ভৃগুরামের চারি হাত ধরিয়া লওয়া যায়, যথা পরশু, পাশ, কার্ম্মুক ও শর এই চারি হস্তের অস্ত্র শস্ত্র, তাহা হইলে তিন রামের ৪+২+৪=১০ খানি হাত এবং প্রত্যেক হস্তে দশটি অঙ্গুলী, সুতরাং "রাম করতলে চন্দ্র কলা" এই অর্থে ১৬×১০×১০=১৬০০ বুঝায় এবং "বাম হইল বিধিকান্ত পড়িল অনলে" এই চরণে বিধিকান্ত অর্থ ব্রহ্মার মুখ=৪ এবং অনল=৩। সুতরাং বাম অর্থাৎ উল্টাইয়া বসিলে হইবে ৩৪ এইরূপে ১৬৩৪ মাপক পাওয়া যায়।

আর যদি পরশুরামের চারি হস্ত না মানা যায় তাহ হইলে চন্দ্রকলা অর্থ চন্দ্র=১ ধরিয়া রামকরতল অর্থে ৩×২=৬ ধরিয়া লইতে হয়। যাহা হউক যদি ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল ধরিয়া লইতে হইবে। সম্ভবতঃ রাজা রামসিংহের ঐ বন্দশাতেই এই কাব্য রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং কবি কাব্য সাঙ্গ হইবার পর ইহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছেন।

আমরা এক্ষণে এই তিনটী কাব্যের প্রথমাংশের বস্তুর একটি তালিকা দিব। এই তিনটি কাব্যেই প্রথমাংশে দেববন্দনাদি আছে, তাহার পর সৃষ্টিপ্রকরণ ও গ্রন্থসূচনা এবং পরিশেষে হরগৌরীর কাহিনী। আমরা তিনটি কাব্যের সূচীপত্র পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিবার চেষ্টা করিব।

কবিকঙ্কণচণ্ডী, শিবসঙ্কীর্ত্তন ও অন্নদামঙ্গলের যুগপৎ নির্ঘণ্ট

[১] দেববন্দনাদি—

চণ্ডী	শিবায়ন	অন্নদামঙ্গল
গণেশবন্দনা	গণেশবন্দনা	গণেশবন্দনা
১ (মহাদেববন্দনা)	শিববন্দনা	শিববন্দনা
—	—	সূর্য্যবন্দনা
—	—	বিষ্ণুবন্দনা
—	—	কৌশিকীবন্দনা
সরস্বতীবন্দনা	নারায়ণীবন্দনা	লক্ষ্মীবন্দনা
শ্রীচৈতন্যবন্দনা২	চৈতন্যবন্দনা	সরস্বতীবন্দনা
লক্ষ্মীবন্দনা		
চণ্ডীবন্দনা	——	অন্নপূর্ণাবন্দনা
(শুকদেববন্দনা)		
দিগ্‌বন্দনা	সর্ব্বদেববন্দনা	——

১ বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অনেক পুঁথিতে নাই।

২ অনেক পুঁথিতে ইহার পরিবর্ত্তে শ্রীরামবন্দনা আছে।

চণ্ডী	শিবায়ন	অন্নদামঙ্গল
[২] সৃষ্টিপ্রকরণ ও গ্রন্থসূচনা—		
গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ	গ্রন্থের সূচনা	গ্রন্থ সূচনা
		কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন
মঙ্গলবারের পালা আরম্ভ	কলিকালে মুক্তির উপায়	গীতারম্ভ
প্রার্থনা	৩ (সূতপ্রতি প্রশ্ন, সূতের কথারম্ভ)	
আদিদেব	ব্রহ্মাদির জন্ম (সৃষ্টির দেবতা) ৩	
সৃষ্টিপ্রকরণ	বিধিকর্তৃক সৃষ্টির উৎপত্তি	
মনুর প্রজাসৃষ্টি	৩ (সৃষ্টিপ্রকরণ, পৃথিব্যাদির উৎপত্তি)	
[৩]		
ভৃগুমুনির যজ্ঞ ও	দক্ষযজ্ঞ ৪	———
দক্ষের শিবনিন্দা		———
দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ	———	———
———	শিবের নিকট নারদের গমন	———
শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা	(দক্ষযজ্ঞে সতীর গমনোদ্যোগ)	সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ
গৌরীর দক্ষালয়ে গমন	সতীর দক্ষালয়ে গমন	সতীর দক্ষালয়ে গমন
দক্ষের প্রতি গৌরীর নিবেদন		
দক্ষের শিবনিন্দা		
শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ	শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ	শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ
দক্ষযজ্ঞনাশে শিবদূতের গমন	নন্দীর সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম	
	(বীরভদ্রের সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম, দক্ষসেনা নাশ)	শিবের দক্ষালয় যাত্রা
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ	দক্ষযজ্ঞ নাশ	দক্ষযজ্ঞ নাশ
দক্ষের ছাগমুণ্ড ও	দক্ষের ছাগমুণ্ড	প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন
সতীস্কন্ধে শিবের ভ্রমণ		পীঠমালা
বীরভদ্রের কৈলাস গমন		
ব্রহ্মাকর্তৃক শিবের স্তব		
দক্ষের জীবন লাভ		
[৩] (ক)		
হেমন্তগৃহে গৌরীর জন্ম	হিমালয়ে গৌরীর জন্ম	শিববিবাহের মন্ত্রণা
গৌরীর রূপ ও নারদাগমন	গৌরীর বাল্যলীলা,	শিববিবাহের সম্বন্ধ
হিমালয় প্রতি নারদোপদেশ ও	গৌরীর বিবাহবিবরণ	
শিবের হিমালয়ে গমন	হিমালয়-আলয়ে মহেশের গমন	———
হরকোপানলে মদনভস্ম	মহাদেবের তপস্যাভঙ্গ ও কামদেব ভস্ম	শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম
রতির খেদ	রতির রোদন	রতিবিলাপ
রতির প্রতি দৈববাণী	(রতির প্রতি সরস্বতীর আশ্বাস)	রতির প্রতি দৈববাণী

৩ বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকের নির্ঘণ্ট। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ নির্ঘণ্ট আছে তাহা বন্ধনীর বাহিরে দেওয়া হইল।

৪ শিবায়নের "দক্ষযজ্ঞ" পালায় ভৃগুমুনির যজ্ঞের কথা ও দক্ষযজ্ঞের সূচনার কথা আছে।

চণ্ডী	শিবায়ন	অন্নদামঙ্গল
গৌরীর তপস্যা	ভগবতীর তপস্যা	———
শঙ্করের ছলনা ও	ভগবতীর প্রতি হিতোপদেশ	———
হরগৌরীর কথোপকথন	মহাদেবের মহিমা ব্যক্ত	
হরগৌরীর বিবাহোদ্যোগ	(শিবের বরসজ্জা)	
	দেবগণের বরসহিত বিবাহযাত্রা	শিববিবাহযাত্রা
নাগরীদিগের বরদর্শনে গমন	———	———
	অধিবাসাদি নান্দীমুখের বিবরণ	শিববিবাহ
	আয়িওগণের নামের নির্ণয়	
	স্ত্রীআচারের পরিহাস	
মেনকার খেদ	মেনকার বিলাপ	কন্দল ও শিবনিন্দা
শিবের মদনমোহন বেশধারণ	মহাদেবের মদনমোহন মূর্ত্তি	শিবের মোহনবেশ
	গৌরী কর্ত্তৃক শিবের প্রশংসা	
নারীগণের পতিনিন্দা	শাশুড়ী জামাই নিন্দা	———
মহেশের গলে গৌরীর মাল্যদান	সম্প্রদান বিধি	———

এই নির্ঘণ্ট হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তিনটী কাব্যের আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে এক। প্রথমাংশ, অর্থাৎ দেববন্দনাদি এবং দ্বিতীয়াংশ, অর্থাৎ সৃষ্টি-প্রকরণ ও গ্রন্থসূচনা সম্বন্ধে কোন তুলনামূলক আলোচনা করিব না, তবে কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। অন্নদামঙ্গলে সূর্য্য, বিষ্ণু এবং কৌষিকীবন্দনা আছে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যদ্বয়ে নাই। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু রামেশ্বর নারায়ণীর বন্দনা করিয়াছেন; এই নারায়ণী বিষ্ণুর শক্তি—

নমো নমো নারায়ণী, সদানন্দ সনাতনী
পদ্মযোনি সহায়িনী শিবা
*
তুমি শালগ্রামশিলা, ভারতে করিলে লীলা
প্রকৃতি পুরুষ নানা ছলে।
মন্থনে মোহিনীবেশে, গোকুলে পুরুষ শেষে
মুরলী বাজালে তরুতলে

কবি এই স্থানে অদ্বৈতবাদের পরিচয় দিয়াছেন।

চণ্ডী ও শিবায়নে চৈতন্যবন্দনা আছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চৈতন্যের লীলাভূমি নদীয়ার রাজকবি হইয়াও ভারতচন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যের বন্দনা গাহেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন, ভারতচন্দ্রও শাক্ত; সম্ভবতঃ মনে মনে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন এবং অন্নদামঙ্গলে চৈতন্য-বন্দনার অভাব সেই বৈষ্ণব বিদ্বেষের ফল বলিয়াই মনে হয়। চণ্ডীতে চণ্ডীবন্দনা এবং অন্নদামঙ্গলে অন্নপূর্ণাবন্দনা আছে; কিন্তু শিবায়নে পৃথক্ করিয়া শিববন্দনা নাই। গ্রন্থসূচনাপ্রসঙ্গে কবি হরগৌরীর বন্দনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের দিগ্‌বন্দনার অনুকরণে শিবায়নে কবি সর্ব্বদেববন্দনা গাহিয়াছেন। কবিকঙ্কণ দিগ্‌বন্দনায় ভারতের বিভিন্ন তীর্থের প্রতিষ্ঠিত দেবাদির বন্দনা গাহিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বদেব-বন্দনায় কেবল শেষকালে কয়েকটী তীর্থদেবতার বন্দনা আছে মাত্র।

আমরা অতঃপর কাব্যের মুখ্য অংশের বিষয় আলোচনা করিব। চণ্ডীতে গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণপ্রসঙ্গে মুকুন্দরাম নিজের 'চণ্ডী' রচনা করিবার প্রকৃত বিবরণ দিয়াছেন। শিবায়নের কবি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুরাণাদির ন্যায় নৈমিষকাননে মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সূতের মুখ দিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে কবির কাব্য যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। ভারতচন্দ্র অবশ্য মুকুন্দরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি অন্নদার আদেশক্রমে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তাঁহার সভাকবি হিসাবে অতি নিপুণ হস্তে গ্রন্থ সূচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ, কুল ও রাজ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কবিকঙ্কণ তাঁহার রাজা রঘু-

নাথের এইরূপ কোন বিশদ পরিচয় দেন নাই, যাহা দিয়াছেন তাহা অতি সামান্য। শিবায়নের কবি গ্রন্থের নানা স্থানে তাঁহার পালন-কর্ত্তা যশোমন্তের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সূচনায় রাজবংশের কোন পরিচয় বা উল্লেখ নাই। অন্নদা-মঙ্গলের গ্রন্থারম্ভে ভারতচন্দ্র আলিবর্দ্দীর সিংহাসনারোহণের পর হইতে বর্গীর হাঙ্গামা পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি তাহার পর তাঁহার পালক কৃষ্ণচন্দ্রের ও সেই সঙ্গে তাঁহার সভাসদ্‌বর্গের পরিচয় দিয়াছেন। কবি নবদ্বীপরাজের রাজ্যসীমাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্নদামঙ্গল হইতে এইরূপ বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রন্থসূচনার পর যথারীতি প্রার্থনা করিয়া কবিকঙ্কণ সৃষ্টি-তত্ত্ব কহিয়াছেন। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে শিবায়নের রচয়িতা সূতের মুখ দিয়া প্রশ্নোত্তরছলে সৃষ্টিতত্ত্ব গাহিয়াছেন। ভারতচন্দ্র এই অংশটি যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শিবচরিত্রের মোটামুটি আখ্যান-বস্তুটি সংক্ষেপে এইরূপ:—

একদা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু একটি যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞে দেবগণ, দেবর্ষি ও প্রজাপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতি নিজ কন্যা সতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ দিয়াছিলেন। দক্ষ সেই যজ্ঞে দেবসভায় উপস্থিত হইলে বিধিবিষ্ণু ও শিব বিনা* সকল দেবগণ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শিব জামাতা হইয়াও শ্বশুরের সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে গালাগালি দিলেন।** শিব ও দক্ষ উভয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে দক্ষপ্রজাপতি এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। শিবায়নে লিখিত আছে নারদের পরামর্শে শিবকে অপমান করিবার জন্য দক্ষ এই আয়োজন করিয়াছিলেন কিন্তু চণ্ডীতে আছে—

"ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষের হইল বড় দম্ভ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ॥"

তাহাতে শিবের নিমন্ত্রণ হইল না।

[ক্রমশঃ

---

* শিবায়নে লিখিত আছে "শিব বিনা সম্ভ্রমে সকলে করে স্তুতি।

** এইখানে রামেশ্বর কবিকঙ্কণকে অনুসরণ করেন নাই। চণ্ডীতে দক্ষের শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী তাহাকে শাপ দিল "মহাদেবে দক্ষ যেন বল কুবচন। অচিরাতে হবে তোর ছাগল বদন॥" শিবায়নে নন্দীর অভিশাপের কথা নাই। ভারতচন্দ্র ভৃগুমুনির যজ্ঞের কথা একেবারে লিখেন নাই।

রস ও উৎসব

...কোনরূপ গভীর গবেষণার কার্য্য কিরূপ ভাবে সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কোনরূপ তীব্র রসের বস্তু আস্বাদন করিলে, অথবা কোনরূপ তীব্র রসের কবিতা পাঠ করিলে, অথবা কোনরূপ তীব্র রসোৎপাদক ভাবে কোন গান গাহিলে, ঐ তীব্র রসবশতঃ হৃদয় এতাদৃশ ভাবে আন্দোলিত হয় যে, ঐ রসেই উহা আপ্লুত হইয়া পড়ে এবং অন্য কোন কার্য্যের, অথবা চিন্তার সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ইহারই জন্য সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ প্রাচীন কালে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মালোচনায় তীব্র রসোৎপাদক সঙ্গীত ও বাদ্য নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণের মধ্যে এখনও ঐ প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুর ধর্ম্ম অথবা মানবধর্ম্মাবলম্বিগণের পূজা ও উৎসব কি বস্তু, তাহা যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মুসলমানগণের উপাসনাকালে সঙ্গীত ও বাদ্য যেরূপ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, মানব-ধর্ম্ম অথবা মানবধর্ম্মাবলম্বিগণের উৎসব-কালে ঢক্কা, কাঁসর ও ঘণ্টানিনাদে উৎসবের কথা জনসাধারণকে জানাইয়া দিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে বটে, কিন্তু কি উৎসবকালে, অথবা কি পূজাকালে, সর্ব্বত্রই কোনরূপ রসের তীব্রতা উৎপাদক কোনরূপ সঙ্গীত, অথবা বাদ্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।...

মৃত

—শ্রীনিখিল সেন

জ্যৈষ্ঠ মাসও বুঝি আসিয়া পড়িল, তবুও এক ফোঁটা বৃষ্টির নাম নাই। বৃষ্টিহীন আকাশ তাম্রাভ হইয়া গিয়াছে। দুপুরের ক্ষুদ্র সূর্য্য চিক্-চিক্ করিতেছে আপন তীক্ষ্ণতায় ধারাল একখানি তরবারির মত।

এক ভুঁই লঙ্কা ক্ষেত করিয়াছিল চন্দ্র খামারু। ফল ও গাছ কয়টি মাঠেই তামাটে হইয়া জ্বলিয়া গেল। রেল-লাইনের পাশে পশ্চিমের বড় সেই বিলটাই গাঁয়ের সব চাষীদের একমাত্র সম্বল। তাহার বুকেও এখন গভীর ফাটল পড়িয়াছে। আউশের সনটা বুঝি এবার অমনি অমনি বহিয়া গেল। মা বসুমতীর বুকে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। খাল, বিল সব শুকাইয়া গিয়াছে। এ বুঝি সব পাপের ফল! নইলে, এ সব কবে হইয়াছে? চন্দ্র খামারু মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। বুক ফাটিয়া তাহার আজ কান্না আসিল।

গাঁয়ে সহসা বহু উলুধ্বনি উঠিল। পাড়ার কুমারী মেয়েরা বরুণ দেবের নিকট জল ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। প্রত্যেকের মাথায় এক একখানা করিয়া কুলা আর তাহার উপর দূর্ব্বা আর আমের পল্লব। কুমারী মেয়েরা প্রতি গৃহস্থের ছাঁচের নীচে গিয়া জলের জন্য দাঁড়াইতেছে আর সকলে গাহিতেছে এক সুরে:

> 'মেঘ-কুমারী রে—মেঘ-কুমারী,
> মেঘ দু'ই দু'ই ঢ্যাল পানি।'

গৃহস্থ-বধূরাও তখন তাহাদের মাথার কুলার উপর কলসী হইতে জল ঢালিয়া দিতেছে। পূর্ব্বেও এমন বহুবার হইয়াছে। গাঁয়ের কুমারী মেয়েরা জল-ভিক্ষায় তখন পাড়ায় বাহির হইয়াছে। বরুণ দেব চাষীদের প্রতি কৃপাও করিয়াছেন।

*

সে যাহা হউক, কাল হয় ত প্রচুর বৃষ্টি হইয়া যাইবে। চাষীদের মুখে হয় ত আবার হাসি ফুটিবে। বলদ আর জোয়াল লইয়া তাহারা আবার মাঠে যাইবে। কিন্তু এক ফোঁটা জল—শুধু এক ফোঁটা জলও নিবারণের মার মুখে পড়িল না মরিবার সময়। এক বুক তৃষ্ণা লইয়া তাহাকে শেষে মরিতে হইল একান্ত অসহায় হইয়া। অবশ্য সে এক দিন না একদিন মরিত-ই। সংসারে কেহ আর অমর নয়। আর তাহার বয়সও নেহাৎ কম হয় নাই—বয়সের সে হিসাব রাখে না যদিও। এই ত্—সেবার উন্যাটমুখীর যে মহা তুফান হইয়াছিল, সে বছরেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তখন আর তাহার কতই বা বয়স হইবে? বড় জোর এগার কি বার বছর মাত্র। তুফানের পরেও প্রায় এক যুগ কাটিয়া গেল। বৃদ্ধা সে হইয়াছিল বই কি! তাহার উপর আবার বাত আর পুরোন সেই 'কামড়ি' রোগটা শেষ বয়সে তাহাকে বড় কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল।

নবার মা নিবারণের সাক্ষাৎ মাসী মা। সেদিন ও পাড়ায় আসিয়াছিল কানাই পোদ্দারের নিকট রূপার গোট ছড়াটি তাহার বন্ধক রাখিতে। নিবারণের বাড়ীর সামনে দিয়াই তাহাকে ফিরিতে হইবে। উঠানের লিচু গাছটা হইতে অমনি চারিটা ভুমুর পাড়িয়া লইলে বেশ মন্দ হয় না। নবার মা তাই নিবারণদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। কিন্তু দরজায় বাঁখারির ঝাঁপখানা আটকান দেখিয়া সে ফিরিয়া যাইতেছিল। নিবারণের মা হয় ত কোথায় গিয়াছে। হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিবারণের মার রুদ্ধ ঘর হইতে কেমন এক পচা গন্ধ আসিতেছে থাকিয়া থাকিয়া। তাহার কেমন সন্দেহ হইল। কয়েকবার সে নিবারণের মাকে ডাকিল কোন সাড়া আসিল না। কৌতূহল তাহার বাড়িয়া গেল। ঝাঁপখানা দু'হাতে টানিয়া সে খুলিয়া ফেলিল। ঘরের বোটকা সেই পচা দুর্গন্ধ তাহার ঘাড়টাকে বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে মুচড়াইয়া ফিরাইয়া দিল। নাকে কাপড় দিয়া নবার-মা পিছনে হটিয়া আসিল।

বিবস্ত্র-প্রায় নিবারণের মার বীভৎস শব ছেঁড় মাদুরটার কিছু দূরে মাটীর উপর পড়িয়া আছে। ফুলিয়া উঠিয়া শব এখন পচিতে সুরু করিয়াছে। চোখের তারা দুটিকে বুঝি আরসোলায় খাইয়া ফেলিয়াছে। শিথিল দু'হাতে ধরিয়া আছে নিবারণের মা তাহার পিতলের লোটাটিকে। আর

লোটাটির পাশে কাত হইয়া পড়িয়া আছে মাটির কলসটি। জ্বরের ঘোরে সে হয় ত জল খাইতে আসিয়াছিল। জল বুঝি আর মুখে উঠিল না। তাহার বয়স-জীর্ণ দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডটি অকস্মাৎ তারপর বিকল হইয়া গিয়াছে।

নবার মা দাওয়া হইতে আর্ত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ধ্যা তখন নামিয়া আসিয়াছে পল্লীর অঙ্গনে। পশ্চিমের দিগ্বধূটির কপালে কে বুঝি পরাইয়া দিয়াছে এক তাল টকটকে সিঁদুর।

লখনা গরু লইয়া মনিববাড়ি ফিরিতেছিল। এক হাতে তাহার পাচন আর কোমরে এক কোঁচড় পেয়ারা। নবার মার আকুল চীৎকার শুনিয়া প্রাণপণে সে দৌড়াইয়া আসিল। কোঁচড়ের পেয়ারাগুলি পথেই সব ছড়াইয়া পড়িল।

"কি জেঠিমা, কি ?"

"য়্যাঁ, হয়েছে কি লখনা, অমন ছুটতেছিস ক্যান্ ?"

জগাই বরামীও সে পথ দিয়া আসিতেছিল। লখনাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল :

"নবার মা অমন কাঁদতেছে ক্যান্ রে ? ব্যাপারটা কি ?"

লখনার বুঝি অত সময় ছিল না। সে কোন সাড়া দিল না। এক লাফে একেবারে নিবারণদের দাওয়ায় উঠিয়া আসিল। সমানে বিনাইয়া বিনাইয়া তখন নবার মা কান্না সুরু করিয়াছে। আকস্মিক শোকের গুরুভারে তাহার পূর্ব্বের ব্যথাও বুঝি আবার তখন উথলিয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে নিবারণের উঠান পাড়া-পড়শীতে ভরিয়া উঠিল।

ধরা-ধরি করিয়া তখন সকলে তুলসী-বেদীর নিকট লইয়া আসিয়াছে নিবারণের মাকে।

ভিড় ঠেলিয়া শরৎ মুন্সি সামনে আগাইয়া আসিল। মুন্সেফি আদালত হইতে বাড়ীতে সবেমাত্র সে পা দিয়াছে, নবার মা তখনই কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বগলের নথি-পত্র রাখিয়া শরৎ তারপর ছুটিয়া আসিয়াছে। গায়ের বোতামহীন কামিজটাও পর্য্যন্ত ছাড়িবার সময় পায় নাই। খোঁচ-পড়া তাহার লম্বা মুখে ব্যস্ততার ভাব।

"তোমরাও যেমন, মড়া আগলে বসে থাকলে এখন চলবে নি। তার সৎগতির সব যোগাড়-পত্তর করতে হবে না ?"

পুঁটির বউ নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছিল। শরৎ তাহাকে থামাইয়া দিল। কহিল, "হয়েছে, আর কাঁদতে হবে না, যাও দিকি। বুড়ো মানুষ মরেছে ত অত কাঁদাবার কি আছে, য়্যাঁ ?"

বাহিরের দাওয়ায় ত্রিভুজের মত দু হাঁটু সোজা গুটাইয়া কানাই পোদ্দার বসিয়াছিল পিছনে একটু হেলান দিয়া। কহিল :

"নিবারণের মার দুঃখু দেখে গাছের পাতা ঝরেছে রে শরৎ, গাছের পাতা ঝরেছে। তা এখন মরেছে ত আপদ গিয়েছে—নিষ্কিতি পেয়েছে।"

"আমিও তা কই কানাই-কা, কান্নাকাটি করে তাকে কি আর পাবে ? নিবারণকে গিয়ে এখন কেউ খপর দাও, তার মার ক্রিয়া-কম্ম এসে সব চুকিয়ে যাক।"

যাত্রামণি গাঁয়ের প্রাচীনতম বৃদ্ধ। মোটা ভুরু জোড়াটি পর্য্যন্তও তাহার পাকিয়া গিয়াছে কাশ ফুলের মত শাদা হইয়া, কহিল, "হু, মা বেঁচে থাকতে ব্যাটা কোনদিন একছিটে জল দিল না, সারাটা কাল মা বেচারি পরের বাড়িতে ধান ভেনে জীবন কাটাল—এখন তোমার নিবারণ এসে মায়ের বৃষোৎসগ্‌গ কম্ম করবে গে, দশ গাঁ নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে—পরাবে, স্তাখ !"

"তা তোমরা খপরটা জানাও না যাত্রামণি দা !"

"তা দাও, ব্যাটা কি বলে স্তাখ। ওরা শহুরে মানুষ, শরৎ। তার উপর আবার বড় মানষের জামাই—শেষে তোমাদের তাগিয়ে না দিলে হয়।"

"কিন্তু আমি কই শরৎ", দাওয়া হইতে কানাই পোদ্দার আবার বলিয়া উঠিল, "নিবারণের জন্যে আর বসে থেকে কাজ কি ? একে তো বাপু বাসি মড়া, তার উপর আবার পচতে সুরু করেছে—শেষে দুর্গতির একশেষ হবে স্তাখ।"

"তা মুখাগ্নি করবে কে ?"

"কেন, তোমার নবাও ত করতে পারে, নিবারণের মা তার সাক্ষাৎ মাসী হয়।"

"শুধু মুখাগ্নি করলে ত আর হয় না, পুরুৎঠাকুরকেও ত বিদায় করতে হবে ? নিবারণের মার সারা বাড়িটা খুঁড়লেও ত আর কাণা কড়িটি বেরুবে না।"

"তা ত বুঝলাম, কিন্তু সহর ত তোমার এক চোখের পথ নয় যে, উড়ে গিয়ে অমনি কেউ চলে আসবে? তোমার যাবে কে?"

"জগাই যাক না?"

"তাই পাঠিয়ে দাও শরৎ, হাজার হ'ক ব্যাটা ত! না হয় দুপাতা লিখা-পড়া শিখে অমন বিগড়ে গেছে—তাই বলে' মায়ের চিতায় একটা কাঠি দেবে না, এমন কি কথা? দশ মাস দশ দিন বাপু তাকে পেটে ধরেছে ত!"

যাত্রামণির পুরাণ হাঁপানি রোগ। বলিয়াই সে প্রবল কাসিতে লাগিল।

শহরের শেষ গাড়িটা বুঝি এখনও ধরা যাবে ছুটিয়া গেলে। রাত্রি তেমন হয় নাই। আকাশের দিকে একবার চাহিয়া জগাই ঘরামীর তাহাই মনে হইল। কিনারা-ভাঙা মস্ত ওই চাঁদটি সবেমাত্র আকাশে উঠিয়াছে পুকুর পাড়ের খেজুর গাছটির মাথায়। তাহাদের সারা গাঁয়ের উপর দুধের বড় ভাঁড়টি কে বুঝি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

রাত্রিতে আর কোন গাড়ি ছিল না। সকালের প্রথম গাড়িতেই নিবারণ গাঁয়ে আসিয়া পৌছিল। এক রাত্রিতেই তাহার আগাগোড়া কে একেবারে বদলাইয়া দিয়া গিয়াছে। চোখদুটি তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে; চোখের জল বুঝি শুকাইয়া গিয়াছে। রুক্ষ বেশ; খালি পা আর গলায় উত্তরীয়।

নিবারণদের বাহির দাওয়ায় পাড়া-পড়শীরা মিলিয়া তখন জটলা করিতেছিল। প্রতিবেশীর বিপদের সময় কাল যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছিল, অনেকেই তাহাদের আজ আসিতে পারে নাই। আপন আপন ক্ষেত-খামারের কাজে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধদের ভিতরও যাত্রামণি বাদ পড়িয়াছে। শ্মশান-ঘাটে যাওয়ায় অত রাত্রিতে হাঁপানির টান তাহার বেজাই বাড়িয়া গিয়াছে।

নিবারণের দেখিয়া শরৎ মুন্সি আগাইয়া আসিল।

"বুঝলে নিবারণ, তুমি না আসতে তোমার মাকে চিতায় তুলতে আমাদের মোটে ইচ্ছে ছিল না, তবে কি জান, ঠাকুর-মশাই শেষকালে বেঁকে বসলেন কি না—তিন দিনের বাসি মড়া তিনি না কি ছোঁবেন না—তাই অগত্যা...তা তুমি হেব না বাবা, তোমার মার মুখাগ্নি বিধিব্যবস্থা মতই হয়েছে।"

নিবারণের মাথাটা আপনা হইতে আজ মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। মুখে তাহার কথা ফুটিল না। টলিতে টলিতে কোন রকমে সে দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিল। বুকের হৃদ্-যন্ত্রটা বুঝি তাহার থামিয়া যাইবে। ধপ্ করিয়া মাটিতে সে বসিয়া পড়িল।

নবার মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিবারণের মাথাটা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার সে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"জানিস বাবা, মরবার সময় দিদি এক বুক তেষ্টা নিয়ে মরল। মুখে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে দেবার কেউ ছিল না।"

পরলোকগতা ভগ্নীর বিস্মৃতপ্রায় ছোট-বড় এক একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া নবার-মা তারপর কাঁদিতে লাগিল বিনাইয়া বিনাইয়া। মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া পুঁটির বউ তাহাকে এক সময় থামাইয়া দিল।

একটু পরে নবার-মা টিনের একটি পেটী নিবারণের নিকট লইয়া আসিল। বহুদিনকার পেটীটি মাঝে মাঝে রঙ উঠিয়া গিয়া বিশ্রী ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, লোহার কব্জীতে মরিচা ধরিয়াছে। এক পাশের একটা কোণ গুরুতর আঘাত খাইয়া বোধ হয় দুমড়িয়া গিয়াছে। বহু টানা-হেঁচড়া করিয়া পেটীটা সে খুলিয়া ফেলিল নিবারণের সামনে। ভিতরে তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। রঙীন ফুলতোলা খান কয়েক মাত্র কাঁথা—নিবারণের মা-ই বুঝি বহু বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের উপরে সুতার কাজ করিয়াছে। কাঁথার নীচে উপরের মলাট-ছেঁড়া খান কয়েক বই আর কিনারা-ভাঙা একখানা শ্লেট সে বাহির করিল—শৈশবের বহু দৌরাত্ম্যের ছাপ নিবারণের লাগিয়া আছে বই আর শ্লেটখানার উপরে।

তোরঙ্গটীর এক কোণে হাত লাগাইয়া নবার মা নকড়ার একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিল। কাল সুতায় বাঁধা সোনার একখানি ছোট পদক পুঁটুলিটার মধ্যে রহিয়াছে, পদকখানার উপর বাল-গোপালের একটি মূর্ত্তি—হাসিয়া হামাগুড়ি দিতেছে। শৈশবে এই পদকখানি নিবারণের গলায় ছিল। অনেকদিন হয়ত সে ইহা মুখে পুরিয়া দিয়াছে—

তাহার কচি দাঁতের দাগগুলি এখনও লাগিয়া আছে। আর রহিয়াছে তাহার মধ্যে ভারী এক জোড়া সেকেলে রূপার বালা।

পুঁটুলিটি নিবারণের হাতে দিয়া নবার মা কহিল, "এসব বাবা, তোমার মার। কত আঁটাআঁটির দিনেও দিদি এসব বুকে করে রেখেছে; হাতছাড়া করবার একবার নামটিও করে নি। কতদিন বলেছে,—'তা হোক, এসব আমার নিবারণের জিনিষ; তার ছেলে-পিলেরা পরবে অখন। আমার আবার দুঃখু কি, তারা আমার বেঁচে থাক'।"

নবার মার চোখে জল আসিয়া পড়িল। যাহার উদ্দেশে সে দুহাত কপালে ঠেকাইল। আবার কহিল, "এ যে বালা জোড়াটি দেখছো, ওটা তোমার মার বিয়ের। রাধিকে দিদি তা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে এসেছিল, তা তোমার বিয়ে ত এখানে আর হল না। বালা জোড়াটি ফিরিয়ে নিতে তোমার মা কিন্তু প্রথমে চায় নি। রাধির বাপকে বলছিল, 'একবার আশীর্ব্বাদ করে ও আবার ফিরিয়ে নি কি করে? রাধিকে বালা জোড়াটি তার খুড়িমা আদর করে দিয়েছে। ও আমি আর নেব না।' তা বাবা, বৌমাকে বালা জোড়াটি পরতে দিও, সগ্গ থেকে তোমার মা খুসী হবে।"

"না, থাক মাসীমা, মার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব ফুরিয়ে গেছে।"

নিবারণের চোখদুটিও সজল হইয়া উঠিল। সামনের এক চালাটির উপরের শণ প্রায় উড়িয়া গিয়াছে। কয়েক জোড়া পায়রা তাহার উপর বসিয়াছে। শূন্য অপলক দৃষ্টিতে নিবারণ তাকাইয়া রহিল সেদিকে।

বিস্মৃতির রুদ্ধ দুয়ার ঠেলিয়া তাহার আজ একদিনের কথা জমিয়া উঠিল চোখের উপর। ভাল করিয়া তখনও ফরসা হয় নাই। মাঘ মাসের ঘন কুয়াশায় ঢাকিয়া গিয়াছে চারিদিক্। ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে বার-তেরো বছরের একটি ছেলে দুপা গুটাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া আছে অকাতরে। গায়ের কাঁথাখানি ছেলেটির কখন সরিয়া গিয়াছে। ছেলেটির মা তাই কাঁথাখানা আবার টানিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল। ছেলেটির ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপর সে উঠিয়া বসিল, দুহাতে চোখদুটি কচলাইয়া লইয়া কহিল, "বাঃ, চারদিকে বেশ ফরসা হয়ে গেছে যে! তোকে কাল বলিনি মা, দীঘির পাড়ে সেই তালগাছটির আগায় শকুনিটা যখন ডেকে ওঠে, আমাকে তখন জাগিয়ে দিতে! অতো পড়া এখন কি করে মুখস্থ করি বল্‌ত?"

"তুই বাইরে এসে দেখ না, এখনো রোদ ওঠে নি।"

"তুই কিচ্ছু না মা," ছেলেটি তাহার মায়ের কথা কানেই তুলে নাই। বলিয়া গিয়াছে, "জানিস, হেডমাষ্টার মশাই সেদিন কি বলেছে—পরীক্ষাতে এবার যদি আমি প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারি তবে ইস্কুলে ত ফ্রি পাবই, তার ওপর আবার একেবারে ডবল প্রোমোশন্।"

মা বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। ছেলে তাহা লক্ষ্য করিয়া আবার কহিয়াছে: "ধ্যাৎ, তুই কিচ্ছু জানিস না মা! ডবল প্রমোশন মানে—এই ইয়ে—একটা ক্লাশে আমাকে আর পড়তে হবে না, একেবারে সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে যাব—কি মজা!"

মায়ের বুক গর্ব্বে তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে। চৌকাটে পা দিয়া কহিয়াছে, "হাঁড়িতে তোর পানতা ভাত রইল, যাবার সময় খেয়ে যাস মনে করে, বুঝলি? আমি এখন পাড়ায় যাচ্ছি।"

"বাঃ, তুই বুঝি আজকেও কিছু খাবি না মা? বেশ, দেখিস, আমিও না খেয়ে ঠিক চলে যাব ইস্কুলে।"

"না বাবা, আমার মাথা খাস্, অমন পাগলামো করিস না।" মা তারপর হাসিয়া ফেলিয়াছে, "আচ্ছা, আগে তুই বড় হ', চাকরী কর—দেখিস তখন তোর মা খেয়ে খেয়ে একদিন পেটে ফেটে মরে যাবে।"

"সত্যি তুই দেখিস মা, আমি ঠিক বড় হয়ে আমাদের অই হেড্‌মাষ্টার মশাইয়ের মত হব—চোখে এই ইয়া বড়া চশমা থাকবে কাল মত। তখন তোকে মা আর ধান ভানতে হবে না পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে...।"

প্রবেশিকাতে নিবারণ বৃত্তি পাইয়াছিল পনেরো টাকা। নিবারণ তারপর কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে কলেজে পড়িতে। মা কিন্তু তাহার আপত্তি তুলিয়াছিল, "শহরে গিয়ে বাবা আর কি হবে? তোর বাপ-ঠাকুরদা তো এই গাঁয়েই মানুষ হয়ে শেষে মরল। শহরে গিয়ে আমাদের কাজ নেই।"

"তুমি কিছু ভেবো না মা, কলকাতায় গিয়ে আমি তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না ?" নিবারণ মাকে তাহার আশ্বাস দিয়াছে, "কলেজে ত ফ্রি পাবো তার উপর একটা টিউশনি জুটাতে পারলে, বৃত্তির টাকাটা হাতেই তোলা থাকবে। কিছু কিছু তোমাকে পাঠাতেও পারবো।"

"না বাবা, আমাকে আর পাঠাতে হবে না। তুই নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই আমার সুখ।"…

প্রিয়বাবু নাম-করা উকিল। তাঁহার ছেলেকে পড়াইবার জন্ম তিনি নিবারণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আপনা হইতে। নিবারণও শেষে নিজের গুণে তাঁহাদের আপনার করিয়া লইয়াছে। কুন্তলার সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছিল প্রিয়বাবুদের বাড়ীতে। কুন্তলা কখন তাহার চোখে প্রেমের মায়াকাঠি ছোঁয়াইয়া গিয়াছে, নিবারণ তাহা টেরও পায় নাই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে নিবারণ গাঁয়ে ফিরিয়াছিল বহুদিন পরে। মাটীর সুস্থ সবল ছেলেটির তখন একটু একটু ভাঙন ধরিয়াছে; ক্রমশঃ সে তখন ছিটকাইয়া পড়িতেছে গাঁয়ের সবুজ কোল হইতে। মা বিবাহের কথাটি একদিন পাড়িয়াছিল। হাসিতে নিবারণ তখন ফাটিয়া পড়িয়াছে।

"তুমিও যেমন মা, পাঁচুর বোন, ওই রাধিকে কেউ আবার বিয়ে করবে না কি? আমাদের কলকাতায় বাপু, ওসব ঝঞ্ঝাট কিছু নেই। আলাপ নেই, পরিচয় নেই কোথাকার পুঁচকে একটা মেয়েকে গলায় অমনি ঝুলিয়ে দিলেই আর বে হল না। দস্তুর মত আইন করে এসব বাল্য-বিবাহ এবার থামিয়ে দেওয়া উচিত।"

সূর্য্য যদি আজ পশ্চিম দিকেই উঠিত, নিবারণের মা বুঝি ততখানি বিস্মিত হইত না। পুত্রের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত সে শুধু তাকাইয়া রহিল। শেষে ছোট একটা নিঃশ্বাস চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ওখান হইতে উঠিয়া গেল।

ইহারই মাস কয়েক পরে কুন্তলার সঙ্গে নিবারণের বিবাহ হইয়া গেল। মাকে প্রণাম করিতে তাহারা তখন গাঁয়ে ফিরিয়াছিল। পুরা একদিন আর এক রাত্রিও বুঝি তাহাদের গাঁয়ে টেকা হয় নাই; কুন্তলা হাঁপাইয়া উঠিয়াছে ইহার মধ্যে। গরুর গাড়িতে করিয়া ইষ্টিশানে ফিরিতে ফিরিতে নিবারণকে বলিয়াছে এক সময়, "আমি তো ভাবতেও পারি না,—অমন পচা গাঁয়ে তুমি ছিলে কি করে য্যাদ্দিন। ভাগ্যিস প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি বাপু; আমি আর এ মুখো হচ্চি না কোনদিন।"

বিবাহের পর নিবারণ ওকালতিতে বসিয়াছে। প্রথম মাসের আপন উপার্জ্জিত টাকা হইতে মাকে সে ২৫ টাকা পাঠাইয়াছিল। মণিঅর্ডারখানা কিন্তু নিবারণের নিকট আবার ফেরৎই আসিয়াছে। শরৎ মুন্সিকে দিয়া মা তাহার লিখিয়া পাঠাইয়াছে…আমার এখন টাকার দরকার নেই বাবা; দরকার হলে চেয়ে নেব তখন।…

এই নিবারণকে লইয়াই না একদিন সে কল্পনার জাল বুনিয়াছিল, নিবারণের বৌকে সে কোলে করিয়া বরণ করিয়া লইবে। তাহার ছেলে-পিলেদের লইয়া শেষ বয়স তাহার গড়াইয়া যাইবে পরম শান্তিতে। তাহা বুঝি এখন শুকাইয়া গিয়াছে—মরিয়া গিয়াছে নিঃশেষে।

মার চিঠির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা নিবারণকেও কম বিঁধে নাই। সেও আর পরের মাসে টাকা পাঠায় নাই মায়ের নিকট।…

গাঁ ভাঙ্গিয়া বুঝি সকলে তীর্থে যাইতেছিল। যাত্রামণি আসিয়া নিবারণের মাকে কহিল, "বুনলে খুড়ি, অমন সুযোগ হারালে তা আর এ জন্মে পাবে না। চল বড় গাঁও গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসি। নাতির মুখখানাও অমনি দেখে আসবে, বুঝলে ?"

নিবারণের মার বুকে সেদিন যেন শঙ্কা আসিয়াছিল। কহিয়াছিল:

"না, থাকগে মতির বাপ, আমার সে নিবারণ আর নেই—কি জানি কি হয়ত বলে বসবে"

"হে হে-হে", যাত্রামণি দিল্-খোলা হাসিয়া উঠিয়াছে—"তুমিও যেমন, হাজার হক ছেলে ত, একদিন ত পেটে ধরেছিলে—অমন কি আর বলতে পারে ?"

বৈঠকখানায় অনেক মক্কেল। নিবারণও খুব ব্যস্ত ছিল। ছ্যাকড়াগাড়ির ভাড়াটা চুকাইয়া যাত্রামণি আর নিবারণের মা বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল গাঁয়ের এই দুইজন স্ত্রীলোককে সহসা তাঁহাদের মধ্যে দেখিয়া উপবিষ্ট ভদ্রলোকেরা কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া

উঠিলেন। বিস্ময় আরও তাঁহাদের বাড়িয়া গেল, নিবারণ যখন চেয়ার ছাড়িয়া তাঁহাদের পদধুলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ প্রথম দিকে কম বিস্মিত হয় নাই; যাত্রামণি-দা আর মাকে অমন দেখিতে পাইবে, সেও আশা করে নাই। কিন্তু বিস্ময়ের ভাব তাহার পর মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়া বিরক্তিতে মুখ তাহার ভরিয়া উঠিল। মাকে আর যাত্রামণি-দাকে সে ভিতরে লইয়া গেল।

সিঁড়ির নিকট আসিয়াই নিবারণ সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"এখানে আসতে হলে আগে বুঝি একটা খবর দিতে নেই?" নিবারণের মুখ কঠিন হইয়া গিয়াছে—"খামাকা অমন বৈঠকখানায় ঢুকে পড়লে যে আমাদের বেশ অপ্রস্তুত হতে হয়, এটা অন্তত তোমাদের জানা উচিত।"

নিবারণের গলার ঝাঁঝে তাহার মা আর যাত্রামণি দুজনেই সহসা মুখ তুলিয়া চাহিল। বহুদিন পরে দেখা; সেই যে একবার বিবাহের পরে দেশে গিয়াছিল নিবারণ, তারপর আর যায় নাই। তবুও আপনাকে যতদূর সংযত করিয়া নিবারণের মা জবাব দিয়াছে।

"না বাবা, কলকেতায় আসবার আমাদের আগে থেকে ঠিক ছিল না। তোর যাত্রামণি দা গঙ্গাস্নানে আসতে অত করে বলায়, তাই এসেছি। কাল না হয় পরশু আমরা আবার চলে যাব।"

"কাল-পরশু আবার চলে যেতে আমি তোমাদের সাধছি কি না? যদ্দিন খুসী থাকো না, মানা করচে কে? আমি বলছিলাম, আগে খবর পেলে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিতাম। ব্যাটা দারোয়ানটাও যেমন।"

খোকাকে কোলে লইয়া নেপালী আয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, নিবারণ তাহাকে অকারণ ধমকাইয়া উঠিল।

"এও নাম্‌কি, মায়জিকো পাশ লেও যাও উন্‌কা।"

রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া নিবারণ তারপর ঢুকিয়া পড়িয়াছে বৈঠকখানায়।

অতীতের মুছিয়া-যাওয়া সেই স্মৃতিগুলি তাহাকে আজ বড় ব্যথিত করিয়া তুলিল। এখন তাহা বুঝি আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই; নিঃশেষে কখন মরিয়া গিয়াছে। তাহার বুক ফাটিয়া আজ কান্না আসিল। হাত বাড়াইয়া নবার-মার নিকট হইতে ন্যাকড়ার পুঁটুলিটা আবার লইয়া কহিল, "এটা দাও মাসীমা, তোমাদের বৌমা যে মায়ের সেকেলি ওই বালাজোড়াটি পরবে বলে তো মনে হচ্ছে না, তবে পদকখানা আমার কাছে থাক—ছেলেবেলায় আমি তা গলায় পরতাম!"

বিজয়া উৎসব

...জনসাধারণ যাহাতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইতে পারে, ধনের প্রাচুর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া উৎসবের নামে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের হানিকর কোন কার্য্যে জনসাধারণ প্রবৃত্ত না হয়, তাহার সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই যে ঋষিগণের মনে স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে দুর্গোৎসব ও বিজয়ার উৎসবের পরিকল্পনা স্থান পাইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য এখনও অথর্ব্ববেদ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ এবং কালিকাপুরাণে উজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু, যে ভাষায় ঐ বেদ ও পুরাণ লিখিত রহিয়াছে, সেই ভাষা আধুনিক পণ্ডিতগণ যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই দুর্গাপূজা, দুর্গোৎসব এবং বিজয়ার উৎসবের প্রকৃত মর্ম্ম ও পদ্ধতি তাঁহারা উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন না এবং তাঁহারা ঐ মর্ম্ম ও পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন না বলিয়াই মানুষ দুর্গোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াও শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকে এবং দুর্গোৎসব সত্ত্বেও মানুষের শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য, পুত্র-কন্যার বিয়োগ-জনিত শোক তাপ, দারিদ্র্য উপস্থিত হয় বলিয়াই ক্রমে ক্রমে মানুষ দুর্গোৎসবের গূঢ় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐ উৎসব বড়-মানুষের ও বড়-মানুষীর একটা ফ্যাশনের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...

যুদ্ধ কি অপরিহার্য্য ?

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মানব-সমাজের পক্ষে যুদ্ধ কি অপরিহার্য্য ? যুদ্ধ না করিয়া কি মানুষ থাকিতে পারে না ? এক দল লোক বলিয়া থাকেন যে, মানুষ আদিম কাল হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে ; সুতরাং যুদ্ধ এবং শিকার মানুষের স্বভাবের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে। কেহ ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রগত স্বার্থের হানি ঘটাইয়াছে, এরূপ একটা ধারণা জন্মিলেই মানুষের ক্রোধ জন্মে, আর তাহার বলেই মানুষ যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজনা পায়। ইহা স্বভাবের নিয়ম। তদ্ভিন্ন লোভ, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি সহজাত রিপুসকল মানুষকে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্দীপ্ত করে। মানব-জাতির ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ত্তমান যুগে ত যুদ্ধ লাগিয়াই আছে। দক্ষিণ আমেরিকার পারাগুয়ে এবং বলিভিয়ার মধ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, এশিয়ার পূর্ব্বাংশে কয়েক বৎসর সংগ্রাম চলিতেছে, আবিসিনিয়া স্বাধীনতা হারাইল, আবার য়ুরোপেও যুদ্ধ বাধিল। সুতরাং যুদ্ধের বিরাম কোথায় ?

কিন্তু এ কথা সত্য যে, মানুষ শান্তি চাহে। কেহ ইচ্ছা করিয়া অশান্তিকে বরণ করিয়া লইতে সম্মত নহে। মনুষ্য সমাজেরও অশান্তি স্পৃহনীয় নহে। তথাপি যুদ্ধ হয় এবং হইতেছে। ইহা মানব-নিয়তির একটা অতি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা। সবাই বলে চাহি শান্তি, কিন্তু করে যুদ্ধ। যুদ্ধকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও মানুষ যেন আপনার অলক্ষ্যে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। সকল যুগে সকল দেশেই মানুষ এই অদৃষ্টের অধীন হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ত্রেতা-যুগে রাবণের অহঙ্কার এবং লোভের ফলেই রাম-রাবণের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। রাবণ যুদ্ধ করিতে চাহে নাই। সে ছদ্মবেশে অতর্কিতভাবেই জানকীকে হরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে মনেও কল্পনা করে নাই যে, সুদূর দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত অযোধ্যার দুইটি বনচর সহায়হীন রাজকুমার সাগর পার হইয়া লঙ্কায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে। কিন্তু তাহার ফলে হইয়াছিল যুদ্ধ এবং রক্ষকুল নির্ম্মূল। দ্বাপরে ভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ তখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কৌরবপক্ষের ভীষ্মাদিও যুদ্ধের প্রতিকূলে ছিলেন। দুর্য্যোধনের দুর্ব্বার হিংসা এবং কর্ণ-শকুনির কুপরামর্শে একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন মনেও করেন নাই যে, তাঁহার সহিত যুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়ী হইবে। সেই যুদ্ধে যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে পাঁচখানি গ্রাম দিতেও সম্মত হন নাই, তিনিই সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় দেহত্যাগ করেন এবং কুরুকুল উচ্ছেদ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি লুপ্তপ্রায় হওয়াতে, ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাসে তাহার প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছিল।

স্মরণাতীত কাল হইতে যুদ্ধ এবং তাহার সজ্জার জন্য বিশেষ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যাবিলোনিয়া এবং আসিরিয়া (Assyria) দেশে প্রাপ্ত মৃণ্ময় ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজা ইয়েয়াতুমের রাজত্বকালে যোদ্ধারা নারিকেল-রক্ষক বর্ম্মের সহিত আঁটা শিরস্ত্রাণ পরিত। তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল দীর্ঘফলকযুক্ত বর্শা, আর চিবুক হইতে চরণ-অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঢাল। সুসা (Susa) নগরীর ধ্বংসস্তূপ-মধ্যে প্রাপ্ত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, খৃষ্ট জন্মিবার ৩ হাজার ৭ শত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সমর-পরিচ্ছদ ও সজ্জার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইহা হইতেই মনে হয় যে, মানবসভ্যতার আদিকাল হইতেই যুদ্ধ-বিগ্রহ মানব-সমাজকে উত্তেজিত করিয়া আসিতেছে। অনেক সময় যুদ্ধের ফলে মানব-সভ্যতার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় যুগের ইতিহাস ঐরূপ পরিবর্ত্তনের কথা স্বীকার করে। যুদ্ধ এবং শান্তির ভিতর দিয়াই মানব-সভ্যতা বিকশিত হইয়া আসিতেছে। কখন কখনও যুদ্ধের ফলে সেই সভ্যতার গতিও বিপরীতমুখী হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইতিহাসের একই বার্ত্তা

এই যে, মানুষ শান্তিকামী হইলেও যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে জীবদেহের গতির এবং স্থিতির ভিন্নতার এবং সমতার একটা সামঞ্জস্য ঘটিয়া যায়। তাহার ফলে জীবদেহ দেশ-কালভেদে ভিন্ন ভাবে বিকাশ পায়। সমাজ-শরীরও, বোধ হয় প্রকৃতির বিস্তারের ও ব্যবস্থাপনের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠে। যখন কোন সাম্রাজ্যের বিস্তার তাহার ব্যবস্থাপন-শক্তিকে অতিক্রান্ত করিয়া যায়, তখন সেই সাম্রাজ্যের অন্য দেশকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা ক্ষয় পায়। সে সাম্রাজ্য অজীর্ণ-রোগে ভুগিয়া মরে। সেই জন্য নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্য মাত্রেরই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আবার যে রাষ্ট্র একেবারেই বিস্তার লাভ করে না, যাহারা পরকে আপন করিয়া লইতে পারে না, তাহাকে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে হয়। ফলে তাহার জীবনীশক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের এবং স্ফূর্ত্তি অভাবে ক্ষয় পায়। তবে কি সংগ্রামকে "নিষ্ক্রয়" স্বরূপ দিয়া মানব-সমাজকে শান্তি কিনিতে হয়? প্রায়ই দেখা যায় শান্তি স্থায়ী হয় না। উহা মানুষের দৌর্ব্বল্য ঘটায়। সেই জন্যই কি মানুষ সভ্যতার আদি কাল হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে?

শক্তিশালী জাতিরা বলিয়া থাকেন যে, মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ করে। প্রকৃতি মানুষকে যে স্বভাব দিয়াছেন, মানুষ তাহা পরিহার করিতে সমর্থ নহে। বিরোধ এবং বিপ্লব স্বভাবজনিত। সেই হেতু মানুষ আবহমান কাল যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই যুদ্ধ করিতে থাকিবে। যুদ্ধ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা উদ্দাম কল্পনার একটা খেয়াল মাত্র। ইহাঁদের মতে মানুষ একটা কল্পনাকুশল পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই।

কিন্তু সকল লোকই এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় নাই। অন্য এক দল চিন্তাশীল লোক বলেন, মানুষকে একটা উচ্চ অঙ্গের পশু মাত্র মনে করা ভুল। মানুষে পশুত্ব আছে ইহা সত্য, কিন্তু তাহাতে দেবত্বেরও কিছু উন্মেষ দেখা যায়। মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতে দেবত্বেরও যে কুঁড়ি পাইয়াছে, তাহা হইতে তাহার বিচার-বুদ্ধির এবং স্বাধীন ইচ্ছায় স্ফূর্ত্তি ঘটে। মানুষ যদি তাহার সেই বিচার-বুদ্ধির অনুশীলন এবং যথাযথ ভাবে বিনিয়োগ করে, তাহা হইলে সে যুদ্ধ পরিহার করিয়া চির-শান্তির অধিকারী হইতে পারে। তাহার ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা অসীম। উহা সর্ব্ববিধ বাধা বিলুপ্ত করিয়া স্বীয় বাঞ্ছিত কার্য্যসাধনে সমর্থ। যুদ্ধ যখন সামাজিক মানুষের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার, তখন মানুষ ইচ্ছা করিলে পশুত্বের স্থানে মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিলে—সে মনুষ্য-জাতির কার্য্যক্ষেত্র হইতে সংগ্রামকে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং এই বিষয়ে মানুষের সিদ্ধান্ত দুই প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দল বলিতেছেন যে, যদি শক্তি অর্জ্জন করিতে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে জয়ী হইতে হয়, জীবনীশক্তির সম্প্রসারণ করিতে হয়,—যদি সমষ্টির, সমাজের ও গোষ্ঠীর বৃদ্ধির জন্য জয়যাত্রা করিতে হয়, রাজ্যাধিকারপূর্ব্বক ধরাতলে প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের কার্য্যক্ষেত্র হইতে যুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিলে চলিবে না। যুদ্ধ থাকিবেই। ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া মনুষ্য-সমাজ প্রগতির দিকে যাইতেছে। যুদ্ধ ভাঙ্গে, শান্তি গড়ে। বিপ্লব নাবে, শান্তি রাখে। সুতরাং উভয়েরই প্রয়োজন বিদ্যমান। আর এক দল বলিতেছেন, যুদ্ধ যত অমঙ্গলের জনক। মানুষের ভিতর লোভনামক একটা রাক্ষস লুকাইয়া আছে, যুদ্ধ হইতেছে তাহার খোরাক। যুদ্ধ যত ধনপ্রাণ নাশ করে, তত গড়িতে পারে না। উহা নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়া প্রগতিকে পিছাইয়া দেয় এবং মানব-সমাজে শোকের শ্বাস বহাইয়া ধরণীকে প্রতপ্ত করিয়া তুলে। অতএব উহার পরিণাম বিষাদ এবং ক্ষয়। যুদ্ধকে বন্ধ করিয়া দিয়া চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই মানব-জাতির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মানুষ ইচ্ছা করিলে তাহা পারে। ইচ্ছাশক্তির শক্তি অসাধারণ। বিশেষতঃ সম্মিলিত মানব-সমাজের ইচ্ছা অতিবল।

এখন এই পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের মীমাংসা বা সামঞ্জস্য-সাধন দুরূহ। প্রত্যেক পক্ষের যুক্তিতে কতকটা সত্য এবং কতক মিথ্যা আছে। তবে এ কথা সত্য যে, মানুষ যদি বিনা তর্কে এ কথা স্বীকার করিয়া লয় যে, সামাজিক ঘটনাচক্র মানুষের ইচ্ছায় আবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধও মানুষের ইচ্ছায় ঘটে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সাধারণের মনে যে ইচ্ছা বা বাসনা প্রবল হইয়া উঠে, সকলের মুখপাত্রস্বরূপ রাজা, শাসনকর্ত্তা, সেনাপতি, জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং

পরিষদ্ তাহাই ব্যক্ত করেন। আমি অবশ্য স্বাধীন দেশের কথা বলিতেছি। কারণ পরাধীন দেশের লোকের ইচ্ছা কার্য্যক্ষেত্রে তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না। এক দলের মত এই যে, মানব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবার বা ধর্ম্ম এবং আইন মনুষ্যের ইচ্ছার ফল। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত মানব-সমাজ যদি এক বাক্যে ও এক মতে সমাজের বৈধ কার্য্যের গণ্ডী হইতে যুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন, তাহা হইলে মানব-সমাজ হইতে যুদ্ধ বহিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে বা হইতে পারে কি ?

সমস্যাটি অবশ্য কঠিন। সম্মিলিত জনমত যখন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে যে, তখন আর লোক হিংসাকে মনে স্থান দিবে না, সমাজকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিবে যে, সমাজের বার আনা লোক হিংসাকে ঘৃণা করিবে, বর্ব্বরতার লক্ষণ বলিয়া বুঝিবে, তখন হয়ত ইহা সম্ভব হইতে পারে। তখন হয়ত জনমতের চাপে লোক বুঝিবে, হিংসা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তখন হয়ত লোক বুঝিবে যে, রাষ্ট্রকে আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে না, রাষ্ট্রকে সামরিক ব্যবস্থা করিতে হইবে না। এখন হয়ত কোন কোন সমাজের বার আনা লোকই যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু তাহা হইলেও ত যুদ্ধ হইতেছে। কারণ এখনও যুদ্ধ করাটাই যে বর্ব্বরতা তাহা লোক ঠিক বুঝিতেছে না। বহুলোক যুদ্ধের বিরোধী হইলেও অবস্থাবিশেষে যুদ্ধের প্রয়োজন যে ঘটে, ইহা বহুন রাষ্ট্রপরিচালকগণই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই জন্য আন্তর্জ্জাতিক আইনেও প্রত্যেক রাষ্ট্রের যুদ্ধ করিবার অধিকার স্বীকৃত। সেই জন্য আন্তর্জ্জাতিক আইনে সকল জাতিকে যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র সেনা এবং সমর-সরঞ্জাম রাখিবার অধিকার দিয়াছে। সকলেই স্বীকার করিবেন, যদি অন্য রাজ্যের সহিত মনোবাদ উপস্থিত হয়, এবং অন্য কোন উপায়ে তাহার কোন মীমাংসা করা সম্ভব না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়াই সেই বিবাদের মীমাংসা করিতে হইবে। উহা যে আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ-মীমাংসার শেষ উপায়, তাহা অস্বীকার কেহই করিতেছেন না। তাই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্রের পক্ষে সমর-বিভাগ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃত রহিয়াছে। শান্তি রক্ষার জন্য, অহিংসভাবে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য, যে জাতিসংঘ পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই জাতিসংঘের নিয়মাবলীতেও রাষ্ট্রের পক্ষে সামরিক ব্যবস্থাপন বর্জ্জিত হয় নাই।

দার্শনিকরা এবং ব্যবহার-শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞগণ এখনও সামরিকতার সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহারা তিনটি কারণে যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছেন। প্রথম নৈতিক নিয়তি, দ্বিতীয় রাষ্ট্রের হিতসাধন এবং তৃতীয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন। অর্থাৎ এই তিন দফা কারণেই যুদ্ধের, তথা হিংসার, যৌক্তিকতা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই তিনটি কারণের কোন কারণই বিচারসহ নহে। ইহার প্রথম দুইটি কারণ গ্রহণের অযোগ্য ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ন্যায় অনুসারে যুদ্ধের যৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। বিচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যায়ের নীতি ঠিক ভাবে ধরিয়া দোষাদোষ নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ন্যায়ের বিচারে উভয় পক্ষের এমন গলদ প্রায়ই পাওয়া যায় যে, কোন পক্ষকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা সম্ভব নহে। সকলেই আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য ন্যায়ের বা ধর্ম্ম-নীতির দোহাই দেয়। কচিৎ ইহার ব্যতিচারও দৃষ্ট হয়। আর যুদ্ধে যে ন্যায়ানুগামী পক্ষই জয়লাভ করে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং নৈতিক কারণে যুদ্ধ করিবার সার্থকতাও নাই। দ্বিতীয় কারণের কথা ভাবিয়া দেখিলেও বুঝা যায়, রাষ্ট্রের হিতসাধনকল্পে যুদ্ধ করিবার অজুহাতটিও সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং গ্রহণের অযোগ্য। রাষ্ট্রের হিতার্থ যুদ্ধ না করিয়া মধ্যস্থ দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিলে তাহাতে সুফল অধিক ফলে। যুদ্ধ করিলে কোন স্থানে দুই জাতির মধ্যে কোনও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার ফলে বৈরিতা ঘটে এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়। সুতরাং উহা যুদ্ধের একটা নূতন কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

তৃতীয় কারণটিকে বৈজ্ঞানিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কতকগুলি নীতিহীন-সমাজতন্ত্রবাদী এবং ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন রাজনীতিক ইহাকে প্রাণিবিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধ (biological war) বলিয়া একটা খুব চটকদার নাম দিয়াছেন। ইহা হইতেছে জাতির পরিসরবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ। ঐ সকল অতি-পণ্ডিতেরা বলেন, উহা জাতীয় জীবন-সংগ্রাম। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন জীবন সংগ্রাম করিতে হয়, জাতীয় জীবনে সেইরূপ সংগ্রাম করিতে

হইয়া থাকে। এ সংগ্রাম হইতেছে রাজ্যবৃদ্ধির জন্য, দস্যুতা করিয়া পররাজ্য অপহরণের জন্য সংগ্রাম। কোন নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা এই সংগ্রামের সমর্থন করেন নাই। উহা কথনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

যুদ্ধের এই তিন দফা কারণের মধ্যে কোন দফাই নৈতিক বিচারে টিকিতে পারে না। তবে ইতিহাসের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বলা হয় যে, সকল যুদ্ধেই এই ত্রিবিধ কারণ মিশ্রিত থাকে। ইহা অনেকটা প্রবলের গায়ের-জোরের যুক্তি। ইহা প্রবলের পক্ষে দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য-বিস্তারের একটা ছলনা মাত্র।

এখন কথা হইতেছে, বর্ত্তমান সময়ে সমাজ যেরূপভাবে গঠিত হইতেছে বা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তবে কি সমাজের বর্ত্তমান গঠনের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে? ইহা সহজ কথা নহে। তবে এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সালিসীর দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পৃথিবীতে অল্প দিন হইতে হইতেছে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা সফল হইল না। হইবার কোন আশাও দেখা যাইতেছে না। কারণ যুদ্ধ-প্রবৃত্তি মানুষের হীন স্বার্থবুদ্ধির সহিত জড়িত, যাহার শিকড় মানুষের স্বার্থ-বুদ্ধির ভিতর পর্য্যন্ত নিহিত সহজে তাহার উচ্ছেদ করা সম্ভবে না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যীশু খৃষ্ট পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। য়ুরোপে কিছু কম পৌনে দুই হাজার বৎসর এই প্রেমধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই খ্রীষ্টধর্ম্ম ধর্ম্মের এবং নীতির দিক্ দিয়া মানুষ মানুষের সমান বা সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? সত্য বটে, যীশুখৃষ্ট ক্রীতদাস প্রথার এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে কোন কথাই বলেন নাই। তবে তিনি যে নীতি, ধর্ম্ম এবং সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে পরোক্ষভাবে ক্রীতদাস প্রথার এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সাক্ষাৎ ভাবে ক্রীতদাস প্রথা তিরোহিত করিতে বহু কাল অতীত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উহা এখনও রহিত হয় নাই। উহা প্রচ্ছন্নভাবে এখনও সভ্য সমাজের বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রত্যক্ষভাবে কোন কোন অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য জাতির মধ্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে। যুদ্ধ রহিত করিয়া সালিসীর বা মধ্যস্থতার দ্বারা সকল রাষ্ট্রীয় বিবাদ মীমাংসা করিয়া লইবার চেষ্টাও নিতান্ত অল্প দিন হইতেছে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে, নেপোলিয়নের সংগ্রামে মথিত য়ুরোপ যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তিতে সালিসীর দ্বারা সকল আন্তর্জ্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবার যুক্তি করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। কোয়েকার উইলিয়ম এলেনের প্রতিষ্ঠিত শান্তি-সমিতি (Peace Society) এই কার্য্যে অল্প চেষ্টা করে নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে যে শান্তি সম্মেলন (Peace Congress) বসিয়াছিল, তাহাতে বহু শান্তি-সমিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক্ ইজ অব বৃষ্টল বিলাতের লর্ড সভায় আন্তর্জ্জাতিক মীমাংসা আদালত গঠিত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তদানীন্তন লর্ড সালসবারি বলিয়াছিলেন যে, সকল ব্যক্তিই লর্ড বৃষ্টলের প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও য়ুরোপের অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ হইতেছে, তাহাতে রাজ্যগুলির মধ্যে বিগ্রহের ভাব যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এ সময় ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার অনুকূল নহে।*

---

* "I confess and I think it is the general feeling—that deeply as everybody sympathises with the object my noble friend has in view and earnestly as we must desire to see the day when the horrors of war may be prevented by the establishment of some species of international arbitration, it is very far from us now and farther apparently than it was some years ago. No one, I think, can watch the progress of the affairs of the continent of Europe, and the tendency of various States, without seeing that the pacific spirit has not increased and that the chances of avoiding war are not more favourable than they were. My Lords, the reason why any proposal of this kind has not yet been dealt with as a practical proposition is, that it presupposes in States a condition of mind which would in itself accomplish all the objects my noble friend has in view. If nations were once to get to that state of mind that they would submit all their disputes to any tribunal, and would obey that tribunal, the warlike spirit would so far disappear that the very necessity for taking precautions would cease to exist. At present we can say that we see no prospect of the formation of any such tribunal,..."

এই অবস্থা ঘটিতে পারে কখন? যখন সমস্ত মানুষ সত্যাশ্রয়ী ও সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হয়। বিচারপতি আর কাহারও অনুরোধে পড়িয়া ভুল রায় না দেন—লোক মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়, তখন।

সেই হইতে এ পর্য্যন্ত য়ুরোপের গগনে কত সহস্রবার রবিশশী উদিত এবং অস্তমিত হইয়াছে, কিন্তু অবস্থা তাহা অপেক্ষা আর ভাল হয় নাই বরং মন্দ হইয়াছে। লর্ড সালস্‌বারি সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বিধি (International Law) বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। কোন ধর্ম্মাধিকরণই পক্ষগণকে ঐ আইন মানাইতে পারেন না, সুতরাং উহাকে আইন বলা যাইতে পারে না। লর্ড সালস্‌বারির ঐ উক্তির পর অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু য়ুরোপের বা পৃথিবীর অবস্থা তাহা অপেক্ষা একটু ভাল হয় নাই। শান্তির আবহাওয়া এখনও পৃথিবীর কুত্রাপি প্রবাহিত হয় নাই। যুদ্ধ পরিহার করিবার জন্য সেই হইতে এ পর্য্যন্ত চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। ১৮৮৯ খ্রীঃ জুন মাসে ফ্রান্সের প্যারি শহরে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, হাঙ্গেরী, গ্রীস এবং মার্কিনের প্রতিনিধি-সভা হইতে ৯৯ জন প্রতিনিধি সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সালিসির দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সভাও হইয়াছিল; কিন্তু উহা দুই তিন বৎসরের অধিক কাল টিকে নাই। এইরূপ বহু সভাই হইয়াছে, বহুবার চেষ্টাও হইয়াছে, কিন্তু উহার কোন ফলই ফলে নাই। ইহার পর ১৮৯৮ খ্রীঃ হেগের শান্তি-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সমিতির সভাপতি রুষিয়ার জার যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ বর্জ্জন করিয়া শান্তি দ্বারা বিবাদ মিটাইবার অনুকূলে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার উপর আর কোন কথাই বলা যাইতে পারে না। ঐ সভা কিছু কার্য্যও করিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই। তাহার পর জেনিভার জাতিসঙ্ঘ খুব আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। এখন জাতিসঙ্ঘও রহিয়াছে, যুদ্ধও চলিতেছে। বরং জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে যুদ্ধ যেন লাগিয়াই রহিয়াছে।

কেন এই চেষ্টা বার বার বিফল হইতেছে? তবে কি মানুষ চেষ্টা করিয়া সংগ্রাম নিবারিত করিতে পারে না? পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে দুই মত আছে। এক দল বলিতেছেন, যুদ্ধ মানুষের প্রকৃতিগত, সুতরাং অপরিহার্য্য। আর এক দল বলিতেছেন, যুদ্ধকে পরিহার করা, যায় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সমাজের এবং রাষ্ট্রের গঠন যেরূপ তাহাতে যুদ্ধ পরিহার করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যদি সমাজ এবং রাষ্ট্র-গঠন পরিবর্ত্তন করা যায়, যদি মানুষের সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহা সম্ভব হয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং জাতি একটা স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন সত্তা লইয়া বিরাজ করিতেছে মনে করে; সমগ্র মনুষ্য-জাতির সহিত তাহাদের যে একটা সমান স্বার্থ (general interest) আছে তাহা অনুভব করে না। সেই জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মানব জাতির বিভিন্নতার মধ্যে যে একটা স্বার্থগত সমতা আছে, ভেদের মধ্যে যে একটা একতা আছে, তাহা আধুনিক জাতিরা বা মানব-সম্প্রদায় বুঝে না এবং উপলব্ধিও করে না। তাহার কারণ তাহাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য এই উদার স্বার্থের কথা লোককে বুঝাইয়া দিতেছে সত্য, কিন্তু সীমাবদ্ধ জাতীয়তা-বোধ সেই সঙ্কীর্ণতাকে অধিকতর সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যেমন জাতীয় স্বার্থের উপর আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ আছে, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তেমনই রাষ্ট্রগত স্বার্থ ছাড়া একটা সার্ব্বজনীন স্বার্থ আছে। সেই স্বার্থ যত দিন মানুষ মর্ম্মে মর্ম্মে না বুঝিবে এবং বুঝিয়া তদনুসারে রাষ্ট্রীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিবে, ততদিন মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে না, এবং ততদিন সংসার হইতে যুদ্ধও নির্ব্বাসিত হইবে না। যুদ্ধ পশুত্বেরই প্রকাশ। মানুষের ভিতর যে পশুত্ব লুকাইয়া আছে, যুদ্ধে তাহাই প্রকট হয়, অর্থাৎ তাহাই প্রকট হইয়া যুদ্ধ ঘটায়। মনুষ্যত্ব যদি মানুষের ভিতর পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা হইলেই পশুবলের স্থানে ন্যায় বিচারের আসন পাতা হইবে, সংসার হইতে যুদ্ধ বিদায় লইবে। নতুবা কিছুতেই উহাকে নির্ব্বাসিত করা সম্ভব হইবে না।

স্বপ্ন-সৌধ

—শ্রীবেণুকর বসু

নৈরাশ্য আর ব্যর্থতার চিরপুরাতন হাহাকার, তথাপি-ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের মিথ্যা আশায় নিয়মিত চাকরীর উমেদারি করা ছাড়া বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেকার যুবক নিখিলেশের আর করবার কি থাকতে পারে? হিন্দুসভা, বেকার-সঙ্ঘ, কংগ্রেস, পল্লী-উন্নয়ন, নারী-রক্ষা সমিতি গঠন, শব-সৎকার, ইণ্ডোস্পেন, ইণ্ডো-পোল' য়্যাসোসিয়েশান প্রভৃতি যদিও বা বেকার-জীবনের অবৈতনিক চাকরী, কিন্তু তাতে করে' পেটের ভাত আর পরণের কাপড় সংস্থান হওয়া একেবারেই অসম্ভব, সুতরাং ও দুটোর একান্ত প্রয়োজন মেটাতে নিখিলেশের আজ যেমন-তেমন একটা চাকরী চাই-ই চাই।

নিখিলেশ আজ যথা নিয়মে (অর্থাৎ যেমন সে রোজ যেয়ে থাকে) চলেছে সোজা ট্রাম রাস্তার দিকে, তবে আজ আর তার চোখে মুখে কোন অনিশ্চয়তার উদ্বেগ বা ব্যাকুলতা নেই, পরিবর্ত্তে আছে শুধু ভবিষ্যৎ সাফল্যের উজ্জ্বল দীপ্তি। যদিও সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিশ্চয়তা নেই। নৈরাশ্যের সান্ত্বনাই বুঝি কাল্পনিক সাফল্য।

...উঃ! কি অসহ্য গরম, কিন্তু যে কোন উপায়েই হোক না কেন, তাকে একটার মধ্যেই পৌঁছুতেই হবে এসপ্ল্যানেডে পপিয়া কেমিক্যালের সিটি অফিসে।

প্রদেশের সম্পদ-কেন্দ্র এই এসপ্ল্যানেড—কাজেই দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত জন-কোলাহল মুখরিত। ...নিখিলেশের প্রত্যহ একবার করে এখানে আসা চাই, কেন না, সে এখন ছাত্র আন্দোলনের নেতা; পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের নিখিলেশ বোস নয়, সমাজ সেবী, সাহিত্য-সেবী যুবক নিখিলেশ নয়। আদর্শবাদে তার পেট আজ কাল আর ভরে না,-তার চাই পয়সা—নিজের স্ত্রীর, মা, ভাই-বোনের ক্ষুধিত, ক্লিষ্ট দুটি চোখে একটু খানি আনন্দের, একটুখানি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি ফুটিয়ে তুলতে। কাজেই তার এখানে একবার আসা চাই।

হাঁ, নিখিলেশ একবার করে আসে—যদি কিছু একটা জুটে যায়, দু' দশ জনের মত তারও মন্থর গতির কিছু পরিবর্ত্তন হয়। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে মুখচেনা, পরিচিত, অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যে দেখা না হয়, তা নয়।—সবাইএর মত তাকেও অকারণেই কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলতে হয় অভিনয়ের ভঙ্গীতে—"আচ্ছা ভাই আজ তবে যাওয়া যাক, বিশেষ ব্যস্ত আছি"।

নিখিলেশ আজ যাচ্ছিল আর ভাবছিল: টালিগঞ্জ থেকে এসপ্ল্যানেড অনেকখানি রাস্তা—ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ ট্রামওয়ে কোম্পানীকে—'ফুল সেকশন' মাত্র দু' পয়সা আর তিন পয়সা ভাড়া! যদি এইটুকু সুবিধা না থাকত তবে কী দুরবস্থাই না হত, এমন চমৎকার চাকরিটা পথে পড়েই মারা যেত!

"একটার মধ্যে স্বয়ং এসে সাক্ষাৎ করুন।"

কিন্তু আহা বেচারি ছেলেমানুষ অমিতা, এগারটার মধ্যে চারটা ভাত কী করে' দেয় অনটনের সংসারে—দিন আনা, দিন খাওয়া, বারটার সময় রওনা হয়ে হেঁটে একটার মধ্যে 'পাপিয়া কেমিক্যালে'র অফিসে পৌছন একেবারেই অসম্ভব। তবে অগতির গতি ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোম্পানী—আর তার সদাশয়তা—'চীপ মিড-ডে ফেয়ার'।

"বাবু, একটা পয়সা, আজ দু'দিন কিছু খাইনি।'

নিখিলেশ চমকে উঠল। একটা পয়সা, অতি সামান্য তার প্রার্থনা, কিন্তু পকেটে আছে মাত্র ছ'টি পয়সা—যাতায়াত খরচ চার পয়সা, আর অমিতা তার মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে—"যে করে' হক সময়মত দুটো পয়সা খরচ করে দাড়িটা কামিয়ে নিয়ো।" নিখিলেশ ভাবল: দেব, দেব, আর কটা দিন পরে যদি তুমি চাও আমার পকেটে যা কিছু থাকবে সব তোমাকেই দেব। কিন্তু আজ—আজ শুধু নিখিলেশ একবার অক্ষমতাজ্ঞাপক ইঙ্গিত জানাল।

নিখিলেশের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হল, সে ভাবতে লাগল: চমৎকার, কী চমৎকার কাজ, অথচ কাজ কিছুই নয়—একটা ডিস্‌ট্রিক্ট এজেন্সী নিয়ে থাকা, আর মাস গেলে

আশীটা টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরা—আর তা ছাড়া নিশ্চয়ই সাব-এজেন্সীর ওভাররাইডিং কমিশনও আছে। সেল্ গ্যারান্টি নিশ্চয়ই নেই, যদি থাকত তবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখও অবশ্যই থাকত। অতি সাবধানে নিখিলেশ একবার তার বুক-পকেট থেকে বের করল বিজ্ঞাপনের ছোট্ট কর্ত্তিত অংশটুকু।

'আঃ',—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিখিলেশ ভাবলে: বাঁচা গেল 'সেল্ গ্যারান্টি' নেই। 'কেমিক্যাল প্রডাক্টস্' নিশ্চয়ই খুব বড় কনসর্ন্—নইলে যে-সে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নয়—একেবারে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে!

নিখিলেশ একবার মনে মনে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালে সঞ্জয় ঘোষের উদ্দেশ্যে। সামান্য কটা দিনের পরিচয়—কিন্তু কী উদার সহানুভূতি, বন্ধুপ্রীতি তার। সবাই বলে চালিয়াৎ সঞ্জয়—তাতে আর ক্ষতি কি? অল্প-বিস্তর চালের উপরই নির্ভর করে বর্ত্তমান সভ্যতার সকলখানি কৃতিত্ব। আজ যদি সঞ্জয় ঘোষ না থাকত তবে—উঃ! ভাবতেও নিখিলেশের সকল অন্তর শিউরে উঠল, তাকে স্ত্রীর হাত ধরে' পথে দাঁড়াতে হ'ত!

নিখিলেশের যত ভাবনা অমিতার জন্য, আর তার বুড়ো মায়ের জন্য। নিখিলেশের চিন্তা আজ এলোমেলো, খেই-হারানো। সে ভাবে, আর দশটা দিন পরে কোথায়, কোন গাছতলায়, আশ্রয়হীন, সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় এসে দাঁড়াতে হত, তা নয় আজ সে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। নিতান্তই দৈবানুগ্রহ, আশীটা টাকা তার পক্ষে যথেষ্ট। দু'জনার, তার নিজের আর অমিতার খাওয়া আর বাড়ীভাড়া বাবদ মাসে ত্রিশ টাকাই যথেষ্ট। নিখিলেশ মনে মনে হিসেব করে যায়। কুড়ি টাকা দেশে মাকে পাঠাতে হবে, আহা, কী ঐকান্তিক প্রার্থনা তাঁর দেবালয়ে—'হে ঠাকুর, আমার নিখিলের একটা চাকুরি করে দাও ঠাকুর, বুকের রক্ত দিয়ে আমি দেবতার পুজো দোব।' বুঝি এত দিন পরে মঙ্গলময় ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন!

"ক্ষেমঙ্করী দেবীর মণি অর্ডার আছে।" মা ছুটে আসবেন। দুঃসংবাদ নয় অথচ ব্যাকুল উদ্বেগের রেখা ফুটে উঠবে তাঁর সমস্ত চোখে, "কে পাঠিয়েছে?"

নিখিলেশ বে-স? বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিশ্বাস না করে আর উপায় কি? কেন না, টাকা যে এসেছে এটা বাস্তব সত্য।...কোন মতে টাকা কয়েকটা নিয়ে হয়ত মা বেরিয়ে পড়বেন। ভাসুর ঠাকুর, নন্দ ঠাকুরপো থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে যদু, মধু, রামা, হরি, যাকেই সামনে পাবেন তাকেই তিনি বলবেন, "সন্ধের সময় ঠাকুরতলায় আজ পুজো দোব, তোমরা কিন্তু পেসাদ নিতে এসো। নিখিলের আমার চাক্‌রী হয়েছে—কেন না হবে আমার অমন লেখা পড়া জানা ছেলে—দেখ ও শীগ্‌গিরই ডেপুটীও হয়ে যেতে পারে।"

নিখিলেশ হিসাব খতিয়ে দেখে, তিরিশ টাকা, সংসার খরচ আর দশ টাকা বাজে খরচ, আর দেশে মা পেলেন কুড়ি, মাসে মোট খরচ ষাট টাকা, তাহ'লে উদ্বৃত্ত থাকবে প্রতি মাসে কমসে কম কুড়ি টাকা। অমিতার কয়েক গাছা চুড়ি চাই, আর এক ছড়া মেট্রে হার, কানের জড়োয়া সেটিং-দুল দু'টি, মানে কানবালা। অমিতা ছেলে মানুষ, তার হয়ত সময় সময় ইচ্ছা করে একটা রিস্ট্ ওয়াচ অন্ততঃ একটু সময়ের জন্যও সে হাতে দেয়, নিখিলেশ ভাবে অবসর মুহূর্ত্তে সে প্রাণভরে পৃথিবীতে শুধু ঈশ্বরের মহিমাই প্রচার করে বেড়াবে, আর কিছু নয়।

নিখিলেশ আজ ইচ্ছা করেই ট্রাম ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠে বসলো, ভাবলে একটা পয়সা বইত নয়। আর দু'দিন পরে ত তাকে একটি মানুষের মতই চলফেরা করতে হবে।

"এই যে মিঃ বোস কতদূর?"

"কে?" একটু চমকে উঠে নিখিলেশ বললে, "আরে সুধীর বাবু যে, অনেক দিন পরে দেখা—তার পর?"

সুধীর ঘোষ পুরাতন বন্ধু, অনেক দিন এক সঙ্গে ছিল কোন এক 'ডিটেন্‌সন্ ক্যাম্পে'। অতীতের সে সব কথা এখন নিছক স্বপ্ন বলেই মনে হয়। 'সক্রেটিস' 'প্লেটো' 'য়্যারিসটোটল' 'টলষ্টয়' 'রমাঁ রলাঁ' 'মার্কস্' 'কার্লাইল' 'লেনিন' 'ইণ্টার ন্যাশনাল', সে সবই বোধ করি তলিয়ে গেছে কোন্ এক বিস্মৃতির অতল তলে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবত্ব, সভ্যতার গালভরা কপচানি সে সবই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে কোন্ রূঢ় বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে—মর্ম্মন্তুদ কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের কল হাস্যধ্বনির অন্তরালে আজ

শুধু চাই, কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান, মানুষের মত বেঁচে থাকবার অতি সামান্যতম ন্যায্য অধিকার বা দাবী।

"তার পর; এ রকম চেহারা?"

"আর এক রকম ভাবে দিন কাটলেই হোল। মহা নির্ব্বাণের পথে পা বাড়িয়েছি। 'নির্ব্বাণং পরমং সুখং'।" একটু মুরুব্বিয়ানা চালে নিখিলেশ বললে।

"কি করা হচ্ছে আজ কাল?"

"বিজিনেস্।" একটু গম্ভীর স্বরে নিখিলেশ বললে। ইচ্ছা করেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। 'মূল্যহীন বেকার জীবন' জয়ঢাক পিটিয়ে এটা আর প্রচার করেই বা লাভ কি? দুর্ব্বলতা! তা হোক, স্থানবিশেষে মহাসত্যের অপেক্ষা মিথ্যা, দুর্ব্বলতাই অধিক পরিমাণে শক্তিশালী। সত্য শুধু লাঞ্ছনার ভদ্রবেশী কঙ্কাল।

"আচ্ছা ভাই আসি।" হ্যাঁ, এইখানেই আপাততঃ অফিস, হ্যাঁ, 'পপিয়া কেমিক্যাল'।" নিখিলেশ বাঁ হাত দিয়ে পপিয়া কেমিক্যালের বাড়ীটাই দেখিয়ে দিলে।

*

নিখিলেশ আর একবার পকেট থেকে ছোট্ট কাগজখানি দেখে নিলে। এই বাড়ীই বটে। 'এ্যালুমিনিয়ম' প্লেটে লেখা আছে, 'পপিয়া কেমিক্যাল'। কি প্রকাণ্ড অট্টালিকা। নিখিলেশ ভাবলে, কেনই বা না হবে, এত বড় কোম্পানী! লোক গিস গিস করছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নিখিলেশের পা জড়িয়ে আসছে। তকমা-আঁটা দরোয়ান আর্দ্দালীদের দিকে নিখিলেশ করুণামিশ্রিত চোখে চেয়ে দেখলে, আহা, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য কি কঠোর পরিশ্রম!

"কি চাই আপনার!"

"আজ্ঞে", নিখিলেশ গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বললে, "আজকের 'ষ্টেট্সম্যানে' দেখছিলুম আপনাদের এখানে একটা চাকরী খালি আছে—"

"ও, আপনি ঐ ঘরে ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে কথা বলুন।"

"যে আজ্ঞে" বলে নিখিলেশ পা চালিয়ে দিলে ম্যানেজারের অফিসের দিকে।

"শ্লীপ দি জিয়ে বাবুজী!"

শ্লীপ? একটু ভ্রূ কুঁচকে নিখিলেশ ভাবলে, কি স্পর্দ্ধা এদের! আর দশজনার মতই তার অধিকার! অথচ দু'দিন পরে সমস্ত অফিসের দরজাই তার কাছে হয়ে যাবে উন্মুক্ত, অবারিত। কিন্তু এদের আর সত্যিই অপরাধ কি? এত বড় একটা ব্যাপার, 'ডিসিপ্লিন' একটু থাকা কিছু প্রয়োজন বই কি?

"আইয়ে বাবুজী!"

নিখিলেশ পুরো নামটাই লিখেছিল। নিখিলেশ বোস, এম্-এস্ সি.। তাই বোধ করি বিনীত সম্ভাষণ।

নিখিলেশ ঘরে ঢুকে প্রণামই করল। কি উদার, শান্ত, সৌম্য মুখশ্রী, আর আশীটা টাকা, সুতরাং সে অবলীলাক্রমে সনাতন প্রথারই অনুসরণ করলে।

পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে সে ইংরাজিতেই আরম্ভ করলে, বললে, "আই হ্যাভ—"

বাধা দিয়ে ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি হে ছোকরা?"

"নিখিলেশ বোস।"

"তা কোন্ পর্য্যন্ত লেখাপড়া করা হয়েছে? এম-এ? তাই বুঝি ইংরেজী বিদ্যেটা জাহির করবার আর জায়গাই খুঁজে পেলে না।"

"অন্যায় হয়ে গেছে," অপরাধীর মত মাথা নীচু করে নিখিলেশ বললে।

"তা হলে বলি, শোন হে ছোকরা। আমার বিদ্যে বি-এল-এ রে পর্য্যন্ত। কিন্তু এই যে কারবার, কার দৌলতে জান? এই শর্ম্মার—"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।"

"বুঝবে কী করে হে? তা হলে কি আর চাকরি চাকরি করে ঘুরে বেড়াও না কি? যাক, তোমার দেশ কোন্ জেলায় বললে? যশোর? বেশ আমাদের নিয়মানুসারে তোমাকে যশোরের এজেন্সীই দেওয়া হবে— পার্ব্বতী, ওদের বিলটা আজ পাঠিয়ো বাবা, আর আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা রেখে যেতে আজ যেন আর ইচ্ছে করে ভুলে যেও না।"

তারপর নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে, "তা হলে বলি শোন, আমাদের কোম্পানীর নানা রকম পেটেণ্ট ওষুধ আছে, প্রসাধনের জিনিষপত্তর। আমাদের দেশের পয়সা

দেশেই থাকবে, এইটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কি বল, চমৎকার পরিকল্পনা নয়?"

"নিশ্চয়ই।" উৎসাহিত কণ্ঠে নিখিলেশ বললে।

একটু মাথা নেড়ে ম্যানেজার বাবু বলে যেতে লাগলেন, "যশোর খুব বড় জেলা, সেখানে তোমাকে একটা এজেন্সী দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, আর তোমাকে দেখে কাজের ছোক্‌রা বলেই মনে হয়। কি বল হে পারবে ত গুছিয়ে নিতে? তোমার শুধু বসে থাকাই কাজ। 'শো-রুম' 'ফার্ণিচার' 'ষ্টক্‌' সবই আমাদের। সব চেয়ে যে বড় জিনিস পাব্‌লিসিটি—সেটাও আমাদের। সব চেয়ে যেটা ব্যবসায়ের বড় মূলধন সেই পাবলিসিটি, তার জন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বুঝলে?"

নিখিলেশ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" সমস্ত চোখে মুখে তার ফুটে উঠল সাফল্যের উজ্জ্বল দীপ্তি।

"তবে মুস্কিল, অতগুলি টাকার জিনিস তোমায় ছেড়ে দেই ত্রাদার কোন্‌ সাহসে? অত বড় জেলা—"

কথার ভঙ্গীতে নিখিলেশ ভয় পেয়ে যায়। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "তবে পপুলেশ্যন বেশি হলেও কমার্শিয়াল ডিস্‌ট্রিক্ট নয়—"

তার কথা সমাপ্ত না হতে বিরক্তপূর্ণ কণ্ঠে ম্যানেজার বাবু বললেন, "তোমাদের ওসব কেতাবি চাল তুলে রেখে দাও। ওসব বিদ্যে আমার নখের আগায়। আমাদের বয়স ছিল হে, ছিল। তা যাক, অত বড় জেলায় যে অতগুলি টাকার মাল ছেড়ে দেব কি ভরসায় বল? বিশ্বাস কি, এটা যে কলি কাল।"

"আমি শিক্ষিত ভদ্র সন্তান—"

অসমাপ্ত কথা কেড়ে নিয়ে ম্যানেজার বাবু তিক্ততাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "কি হিমালয় থেকে নেমে আসা সাধুর বাচ্চা রে বাবা! শোন হে ছোক্‌রা, ওসব বক্তৃতা শুনতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু ওতে আর কাজ হয় না আজ কাল।"

এত ক্ষণ পরে নিখিলেশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল! একটা দম্‌কা হাওয়ায় তার সমস্ত স্বপ্নালু আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে চলল। ইচ্ছা হোল সামনের 'পেপার ওয়েট্‌টা' তুলে ছুঁড়ে মারে ঐ হতভাগা বুড়ো ম্যানেজারের কপালে। কিন্তু এখনও আশা আছে, উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হ'লেও মানুষ ত? ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে নিখিলেশ ব'ললে, "দোহাই আপনার, বিশ্বাস করুন, আমি অসহায় দরিদ্র—"

চীৎকার করে ম্যানেজার বাবু ব'ললেন, "এটা থিয়েটারের ঢঙ্‌ দেখাবার জায়গা নয়—তোমাদের ইয়ং-ম্যান দলের আমার জানা আছে, যত সব জোচ্চরের ঝিকুচি ক'রে ছ। যাও বেরিয়ে যাও—দরোয়ান!"

নিখিলেশ আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে নিষ্ফল আক্রোশে একবার হাত দুটো মুঠো ক'রে হন্‌ হন্‌ ক'রে নেমে এসে দাঁড়াল উন্মুক্ত, প্রশস্ত রাজপথের উপর।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অমিতা বললে, "হ্যাঁ গা, আজ কি হোল ব'ললে না ত?"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে নিখিলেশ বললে, "দোহাই তোমার অমিতা, আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দাও। আগুন শুধু জলছে চারিদিকে, আগুন! পড়ব তারই মধ্যে ঝাঁপিয়ে অমিতা!"

"তোমার সঙ্গে আমি সব জায়গাতেই যেতে পারি নির্ভয়ে, দ্বিধাশূন্য মনে। কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি অমন করে বলো না, আমার ভয় করে।"

"ভয়!" একটু চিন্তা ক'রে নিখিলেশ বললে, "থাক একটু ঘুমোও অমিতা।"

খানিক সময় চুপ-চাপ।

নিখিলেশ আবার বললে, "জান ত' অমিতা, কপাল খুলতে দেরী হয় না। বনেদী জমিদার বংশ সবাই বলে, পূর্ব্বপুরুষের কিছু টাকা, মানে বেশ কিছু টাকা না কি বাড়ীতে পোতা আছে, আর তা না কি আমিই পাব।"

"হ্যাঁ গো সত্যি?"

"সত্যি, সত্যি, আর তোমার যে কোন্‌ এক গণক ঠাকুর শুনে বলেছিল লটারিতে তুমি টাকা পাবে?"

ভগ্নকণ্ঠে অমিতা বললে, "সেত আরও পাঁচ বছর দেরী আছে গো।"

"ইম্‌পারফেক্ট সায়েন্স, কাজেই পাঁচ বছরের জায়গায় পাঁচ মাস হওয়াও কিছু বিচিত্র নয় অমিতা।"

"ওগো তোমার পায় পড়ি তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।"

নিখিলেশ চোখ বন্ধ ক'রলো।

গভীর সাড়াশব্দহীন রজনীতে নিখিলেশের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুরম্য অট্টালিকা, মোটরের ঘর ঘর শব্দ, ব্যাঙ্কের টেলিফোনের ঝঙ্কার, শিশুর কোলাহলময় শৈল-বিহার।—আর কত কি!

অমিতা ডেকে ডেকে কোন সাড়া পায় না।

যশোহর-পরিচিতি

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভূমিকা*

অধুনাখ্যাত বাংলার অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ জেলার যখন উদ্ভব পর্য্যন্ত হয় নাই, শৌর্য্য, স্বদেশপ্রীতি, শিক্ষা, সভ্যতা এবং শিল্পে যশোহর তখন দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রাচীন যে যশোহরের নাম করিতে আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের মূর্ত্তি—স্বাধীনতালাভের জন্য বাঙ্গালী বীরের দুঃসাহসিক প্রয়াস ও বাংলার গৃহে গৃহে শক্তির সাধনার ছবি; দুর্দ্ধর্ষ মোগলবাহিনীর সহিত বাঙ্গালী সেনার গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাস এবং একদা নদীমাতৃক যশোহরের নদী বাহিয়া বাঙ্গালীর নির্ম্মিত 'ছিপে' বাঙ্গালী সৈনিকের যুদ্ধযাত্রার চিত্র—সে দিনের যশোহর স্বাস্থ্য, সম্পদ, প্রাচুর্য্য ও আনন্দে পূর্ণ ছিল। আজ যে-সকল নদী মরিয়া গিয়া রোগ, অস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু, দারিদ্র্য এবং ভূমির অনুর্ব্বরতার কারণ হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব নদীই সেদিন স্বাস্থ্য, শক্তি ও প্রাচুর্য্য বহন করিয়া আনিত এবং পলি বহন করিয়া আনিয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিত। স্বীয় গৌরবে গৌড়ের যশকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল বলিয়া এই ভূখণ্ডের নাম যশোহর অর্থাৎ যশোহরণকারী হইয়াছিল। বর্ত্তমান যশোহর জেলা এই যশোহর রাজ্যের উত্তর-সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল। উত্তরে বর্ত্তমান যশোহর হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বে মধুমতী ও পশ্চিমে গঙ্গা ইহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল। যশোহর ব্যতীত এই প্রাচীন রাজ্যের অবশিষ্টাংশ বর্ত্তমানে খুলনা ও চব্বিশপরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু, আধুনিক যশোহরের দুর্গতির অবস্থা ইহার গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির মধ্যে যশোহর আজ অগ্রণী। যশোহরের ম্যালেরিয়া সারা বাংলাদেশে প্রবাদ-বাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের জনবহুল, কর্ম্মব্যস্ত শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি নীরব ও জনবিরল হইয়া উঠিয়াছে, পল্লীগুলি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে এবং বহু পল্লী সম্পূর্ণভাবে জনমানবহীন হইয়া গিয়াছে। নদীর তীরে তীরে পূর্ব্বে যে-সব সমৃদ্ধ পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল, নদী মজিয়া যাওয়ায় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রভাবে আজ তাহা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগ, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা যশোহরবাসীদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যশোহর সহরও বাংলাদেশের দরিদ্রতম সহরগুলির অন্যতম। ভূমির উর্ব্বরাশক্তি আশ্চর্য্য রকম কমিয়া গিয়াছে; উৎপন্নের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ব্বের এক-চতুর্থাংশের নীচে নামিয়াছে এবং এইরূপে বহু জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যশোহরের দারিদ্র্য ও রোগবহুলতার সহিত ইহার ভূমির ক্রম-বর্দ্ধমান বন্ধ্যাত্বের সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ।

তবুও, এই চরম দুর্গতির মধ্যেও আধুনিক যশোহর বহু কৃতী সন্তানের জননী হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোহরের কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' বাংলার নাট্য-সাহিত্য ও গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। তিনি চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের এবং তাঁহার উপযুক্ত সহোদর স্বর্গত মতিলাল ঘোষের নাম বাঙ্গালী জানে; অমৃতবাজার পত্রিকার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা মাত্রেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্ম্মদক্ষতার সাক্ষ্য দিতেছে। যশোহরের মাগুরা তাঁহার জন্মস্থান। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

---

*যশোহরের পরিচয়ের জন্য কয়েকটি প্রবন্ধের প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাহার প্রথম কিস্তি। প্রবন্ধের অনেক তথ্য সরকারী বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

'স্বর্ণলতা'র পরিচয় আধুনিক কালের অনেকেই হয়ত জানেন না, কিন্তু, একদিন এই পুস্তকখানির সমাদর ও জনপ্রিয়তা শিক্ষিত সমাজে সার্ব্বজনীন ছিল। তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাগ্‌আঁচড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। যশোহরের তদানীন্তন জননেতা রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও মনীষার খ্যাতি সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও যশোহরে কৃতী ও যশস্বী লোকের অভাব নাই।

ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিচয়

প্রেসিডেন্সী বিভাগের পাঁচটি জেলার মধ্যে যশোহর অন্যতম। ইহার অবস্থান ২২°৪০´ হইতে ২৩°৪৭´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৮°৪০´ হইতে ৮৯°৫৯´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে। যশোহর জেলার প্রধান সহর এবং জেলার শাসন-কেন্দ্র যশোহর সহর মৃত ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। যশোহর সহরের অবস্থান ২৩°১০´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৩´ পূঃ দ্রাঘিমা। ইহার বিস্তৃতি ২,৯২৫ বর্গমাইল।

যশোহরের পূর্ব্বদিকে ফরিদপুর জেলা, উত্তর এবং পশ্চিমে নদীয়া এবং দক্ষিণে ২৪-পরগণা ও যমুনা। পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্বদিকে অনেক দূর ধরিয়া গড়াই ও মধুমতী প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

যশোহর হুগলী ও পদ্মা নদীর ব-দ্বীপের অংশ এবং ইহার গঠনে ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পলিমাটীগঠিত বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্য দিয়া অনেকগুলি নদী চলিয়া গিয়াছে। এই সকল নদী আবার অসংখ্য খাল দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। সকল নদী পূর্ব্বে গঙ্গা বা তাহার শাখা বা খাল হইতে জলের যোগান পাইত এবং মধ্যে মধ্যে এই সকল নদীর কূল ছাপাইয়া দেশ প্লাবিত হইয়া যাইত। এই ভাবে প্লাবনবাহিত মাটী জমিয়া ক্রমে জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূমি উঁচু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সকল নদী ভরাট হইয়া যাওয়ার ফলে অধিকাংশ স্থলে মূল স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই ইহারা অধিকতর অগভীর হইয়া যাইতেছে এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই স্রোতোহীন বদ্ধ জলা অবস্থায় থাকিয়া অধিবাসীদের স্বাস্থ্যনাশ করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বেও বর্ষার সময় ইহার অনেকগুলি নদীতে স্রোত বহিত, কিন্তু কচুরিপানা বিপুলভাবে এই স্বল্পকালীন স্রোতের পথও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণে ভূমি যেখানে ক্রমনিম্ন হইয়া বিল ও জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে সেখানে নদীগুলিতে জোয়ারের জল উঠে এবং জলের যোগানের জন্য ইহাদের আর উপরের জলের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এই জন্য নদীগুলির দক্ষিণপ্রান্ত এখনও প্রবহমান আছে। যদিও কচুরিপানার অত্যাচার এখানেও পৌঁছিয়াছে।

জলপথগুলি ভরাট হইয়া যাওয়ায়, ভূগঠনের দিক দিয়া যশোহর জেলাকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্বের স্বল্পপরিমিত স্থানে পলিমাটির দ্বারা ভূগঠন কার্য্য এখনও পর্য্যন্ত কিছু চলিতেছে। উত্তরে কুমার নদ মাথাভাঙ্গার জল (মূলতঃ গঙ্গার) এবং উত্তর-পূর্ব্বে গড়াই গঙ্গার বন্যা বহন করিয়া আনে এবং পলিমাটী জমা করিয়া ভূ উন্নয়ন কার্য্যে সহায়তা করে। নবেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত গঙ্গায় জল কম থাকে এবং মূল স্রোত হইতে পূর্ব্বোক্ত পথে বিশেষ প্রবাহিত হয় না, তবুও ভূগঠন যে এ অঞ্চলে এখনও চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলার অবশিষ্টাংশে ভূগঠন সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে অথবা আপাতত বন্ধ রহিয়াছে। নিম্ন ভৈরব, চিত্রা, কপোতাক্ষ প্রভৃতি; এখানকার জলপথগুলি গঙ্গা হইতে বন্যার জল প্রাপ্ত হয় না। মূল স্রোত হইতে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথচ ইহারা এত প্রশস্ত যে, স্থানীয় বৃষ্টির জলমাত্র সমুদ্রে বহন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না। দেশের ক্রমনিম্নতা এত কম যে, ইহাকে সম্পূর্ণ সমতল বলা যাইতে পারে, ফলে বহুস্থানে এই সকল নদী বদ্ধ জলায় পরিণত হইয়াছে এবং বহুবিধ জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়াছে। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে কচুরিপানাই অবশ্য প্রধান। ৩৮ ও ৩৯ সালের অতিবৃষ্টির জন্য যশোহরের এই সব অঞ্চল, বিশেষতঃ বনগ্রাম ও মাগুরা মহকুমা সম্পূর্ণভাবে বন্যা-প্লাবিত হয় এবং যশোহর সহরের নিম্নের মৃত ভৈরব এবং অন্য অনেক স্থান দিয়া বিপুল জলরাশি প্রবাহিত হইয়া লোকের মনে আশা জাগ্রত করে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতি তাহার বহুদিনের অকৃত কার্য্যে পুনরায় মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহার এই চেষ্টায় সহায়তা করিতে পারিলে হয়ত মৃত নদীর অনেকগুলি পুনর্জ্জীবিত হইতে পারিত।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়াও যশোহরকে স্বভাবতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর এবং পশ্চিমের ভূমি উন্নত ও শুষ্ক, কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের ভূমি নিম্ন ও বড় বড় বিল ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। যদি কেশবপুরের হরিহর নদ হইতে মহম্মদপুরে মধুমতী পর্য্যন্ত একটি রেখা টানা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, এই রেখার উত্তর ও পশ্চিমে অবস্থিত স্থানসমূহ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং মাটি ঈষৎ বালুকাযুক্ত এবং প্লাবনমুক্ত। এখানকার নদীগুলিতে জোয়ারের জল পৌঁছায় না এবং প্রবল বর্ষার সময় ব্যতীত জল উচ্চতীরভূমির অনেক নীচে থাকে। দেশ উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে এবং নদী ও খালগুলিও এই পথ অনুসরণ করিয়াছে। দেশের এই উত্তর-পশ্চিমাংশ গঙ্গার বন্যা-জল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং মৃতপ্রায় হইয়া জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহারা জলনিকাশের কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের জলবহন ক্ষমতার তুলনায় এই জলের পরিমাণ অতিশয় সামান্য।

এই কাল্পনিক রেখার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে বহু খাল নানাদিকে গিয়াছে এবং ঘনসন্নিবিষ্ট বড় বড় বিল রহিয়াছে। এক গ্রীষ্মকাল ব্যতীত এসব অঞ্চলের জল শুকায় না বলিয়া পদব্রজে ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব। ডিঙ্গি নৌকা এবং ডোঙ্গা* লোকের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। বিলের মধ্যবর্ত্তী গ্রামগুলিতে বর্ষা ও শীতের প্রথমাংশে লোকে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলেও এই ডোঙ্গার সাহায্যে যাতায়াত করিয়া থাকে। নদীর জল জোয়ার-ভাঁটা অনুসারে উপরের দিকে উঠে অথবা নীচের দিকে নামে এবং কয়েক মাস ধরিয়া প্রায় সমগ্র দেশই কার্য্যতঃ জলের নীচে থাকে। জল-নিকাশের কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই এবং জল যখন সরিয়া যায় তখন সকল স্থলে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী পথ অবলম্বন করে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যেও এই কাল্পনিক রেখার উভয় পার্শ্বে অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে। উত্তর এবং পশ্চিমে দেশ সাধারণভাবে পরিষ্কার এবং বৃক্ষাদির সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু, এ অঞ্চলে গুড় ও চিনির জন্য লোকে প্রচুর পরিমাণে খেজুর গাছের চাষ করে এবং বড় বড় খেজুরবাগান দৃশ্যের কতকটা বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। তবুও খেজুর গাছের শাখা-প্রশাখা অল্প বলিয়া এবং গাছের বৃদ্ধিও অধিক নহে বলিয়া ইহা কখনই জঙ্গলের আকার গ্রহণ করে না। মাঝে মাঝে আমন ধান হইবার মত নিম্নভূমি আছে বটে, তবে তাহার পরিমাণ খুবই অল্প। জমি উঁচু বলিয়া বর্ষার ধান আউসই এ অঞ্চলের প্রধান ফসল। শীতকালে মটর, মসুর, মুগ, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মুগকলাইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতির 'সোণামুগ' এই অঞ্চলের প্রায় একচেটিয়া ফসল। সহর ও গ্রামগুলি বড় বড় এবং অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে বলিয়াই মনে হয়,—অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্বে ইহারা সুখেই ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে জনবসতি খুব বিরল, বৃক্ষাদির সংখ্যাও অল্প এবং ভূমিও অনুর্ব্বর। অত্যধিক ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অনেক গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বসমৃদ্ধির চিহ্ন-স্বরূপ বড় বড় ভাঙ্গাবাড়ী পড়িয়া আছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বের নদীগুলিতে এখনও জলপ্রবাহ আছে এবং ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা প্রভৃতির তীরে বড় বড় গ্রামে সমৃদ্ধির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এই অঞ্চলের বৃক্ষাদির সংখ্যা প্রচুর। বড় বড় বিলে ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং যেসব বিলে বার মাস জল থাকে, সেখানে ফসল না জন্মিলেও প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। এই সকল পতিত বিলের অধিকাংশ ভরাট হইয়া উঠিয়াছে এবং এখন ফসল জন্মিতেছে। জেলার এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

যশোহরে বহুবিস্তৃত বদ্ধ জলাভূমি থাকায় এখানে জলজ উদ্ভিদের বিশেষ প্রাধান্য আছে এবং মৃত নদীর ধার

* তালগাছের গোড়ার দিক্ চিরিয়া দুই ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগকে নৌকারূপে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ইহাকে লগীর সাহায্যে অল্পজলে চালান হয়। সাধারণতঃ ডোঙ্গা ১০।১২ হাত লম্বা হয় এবং এক সারিতে মাত্র একজন বসিতে পারে। ইহাতে একবারে ৩।৪ জন লোক বসিয়া যাইতে পারে, অথবা ৬।৭ মণ বোঝা লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য ইহার দেড়গুণ ক্ষমতাবিশিষ্ট ডোঙ্গাও দেখা যায়।

ও জনশূন্য গ্রামগুলি বহুবিধ ছোট ও গুল্মজাতীয় গাছের গভীর জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাই বলিয়া যশোহরে সুবৃহৎ বৃক্ষের অভাব নাই। অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল প্রভৃতি গাছ বিস্তারে ও উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। যশোহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নারিকেল ও সুপারি প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট না হইলেও, ইহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত উঁচু হয় এবং বারমাস এ অঞ্চলের পল্লীগুলিকে শ্যামশ্রী-মণ্ডিত করিয়া রাখে।

জেলার পশ্চিমাংশে বনগ্রাম ও ঝিনাইদহে, বিশেষ করিয়া ঝিনাইদহে অসংখ্য খেজুর গাছ আছে। এক এক স্থানে ১০।১৫ বিঘার বড় বড় খেজুরবাগান আছে। খেজুরগাছজাত দ্রব্যই এ অঞ্চলের লোকের অন্যতর প্রধান উপজীবিকা ছিল। প্রথমে বৈদেশিক চিনির প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া এই শিল্প বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বর্ত্তমানে কারখানাজাত দেশী চিনির প্রতিযোগিতায়ও ইহার আত্মরক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। খেজুর গাছের সংখ্যা এজন্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে। কাষ্ঠোপযোগী গাছের মধ্যে বাবলা গাছ জেলার সর্ব্বত্র জন্মে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেশ বড় হইয়া উঠে। দেবদারু, শিমুল এবং অন্যান্য বড় ও মাঝারি গাছের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ভাল কাঠ বলিয়া কাঁঠাল কাঠের খুব সুনাম আছে—দরজা জানালা হইতে আরম্ভ করিয়া মূল্যবান্ আসবাব-পত্রাদি ইহাতে নির্ম্মিত হয়। কাঁঠালের পরই জাম কাঠের স্থান—যদিও উৎকৃষ্টতার দিক্ হইতে ইহা কাঁঠালের কাছাকাছি পৌঁছিতে পারে না।

আধুনিক যশোহর অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ না হইলেও পূর্ব্বে সুন্দরবন যখন অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ছিল এবং নদীগুলি গঙ্গার সহিত সংযুক্ত ছিল, তখন যে এদেশ অরণ্য-বহুল ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে নীলকুঠীর সাহেবেরা ঝিনাইদহ মহকুমায় অশ্বপৃষ্ঠে বন্য-মহিষ শিকার করিতেন—এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। কেশবপুর ও মণিরামপুর থানায় একশত বৎসর পূর্ব্বেও যে বন্যমহিষের উৎপাত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে বন্যমহিষ যশোহরের কোথাও দৃষ্ট হয় না এবং থাকিবার মত নিবিড় অরণ্যও নাই। পূর্ব্বে জেলার সর্ব্বত্র ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল এবং নেকড়ে ও চিতা জাতীয় ব্যাঘ্র প্রায় সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু এখন ব্যাপক বা স্থায়ীভাবে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের কথা শোনা যায় না—যদিও মাঝে মাঝে নানাস্থানে চিতাবাঘ দুই একটি আসিয়া পড়ে। বনগ্রাম ও ঝিনাইদহ মহকুমার জঙ্গলেও ইহাদিগকে দেখা যায়। বন্য জানোয়ারের মধ্যে বন্যবরাহ যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায় এবং ইহারা শস্যের, বিশেষ করিয়া, ইক্ষু, ধান্য, আলু ও কচু প্রভৃতির বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। কোন কোন জাতির লোক দড়ির ফাঁসে ইহাদিগকে ফেলিয়া জীবন্ত অবস্থায় বাড়ীতে লইয়া যায় ও ইহার মাংস ভক্ষণ করে। কাঁটাযুক্ত দেহ-বিশিষ্ট সজারুও কোন কোন শস্যের ক্ষতি করে। শীতকালে অনেকে খরগোস ও সজারু শিকার করিয়া থাকে। বহু-সংখ্যক শৃগাল এখানকার বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং লোকের গৃহপালিত, ছাগ, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি অপহরণ করে। তবে ইহারা পচা ও দূষিত পদার্থ ভক্ষণ করে বলিয়া পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশেষ সহায়তা করে। বন্যবিড়াল ও আরও দুই একটি ক্ষুদ্র বন্যজীব দেখা যায়। এই সকল লুপ্ত ও অর্দ্ধলুপ্ত বন্যজীব একদা অরণ্য-সান্নিধ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বল্‌টিকে রাষ্ট্রিক ঘূর্ণাবর্ত্ত

—শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য

রুশ-জার্ম্মান অনাক্রমণ-চুক্তির বলে বলীয়ান্ জার্ম্মানী ফ্রান্স ও বৃটেনের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া যে-দিন পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান করিল; সেদিন যুদ্ধ আর কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইয়া উঠিল না। তথাকথিত শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ বাধিলই।

সোভিয়েট-জার্ম্মান অনাক্রমণ-চুক্তি এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্ব দৃশ্যপটে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার সময় হইতেই বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির গুরুত্ব সমগ্র বিশ্বের নিকট প্রতিভাত হয়। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী ফ্রান্স ও বৃটেনের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সোভিয়েট গণতন্ত্রী রাষ্ট্রদ্বয়ের নিকট বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দাবী করে; অর্থাৎ জার্ম্মানী যদি বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই জার্ম্মানীকে প্রতিরোধ করিবে; কারণ জার্ম্মানী বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিতে অধিকার লাভ করিলে অনায়াসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করিতে পারে। সুতরাং ফ্রান্স ও বৃটেন যদি বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে পোল্যাণ্ড অথবা রুমানিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েটও ফ্রান্স ও বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। কিন্তু বৃটেন সোভিয়েটের দাবী অসঙ্গত বোধে অস্বীকার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির আলোচনা বাতিল হইয়া ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব্ব এক পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। কম্যুনিষ্ট-বিরোধী-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্ম্মানী সোভিয়েটের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি করে। পোল্যাণ্ড-বিজয় সমাপ্ত করিয়া জার্ম্মান সৈন্য বল্‌টিকের সীমান্তে উপনীত হইলে নিজ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাশিয়া বল্‌টিক রাষ্ট্রসমূহে হস্তক্ষেপ করে।

এই স্বাধীন বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলি একদিন রাশিয়ার জার-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিসট্যাড্ চুক্তির ফলে সুইডেন এস্তোনিয়া ও লাটভিয়াকে পিটার-দি-গ্রেটের হস্তে সমর্পণ করে এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আর একটি প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে সুইডেন ফিন্‌ল্যাণ্ড ও অল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে রাশিয়ার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। তারপর ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ড জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ ব্রেষ্ট-লিটভস্ক্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে পোল্যাণ্ড, ইউক্রেন, অল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জসহ ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার উপর রাশিয়ার কর্ত্তৃত্বের অবসান হয়। এই সুযোগে জার্ম্মানী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে স্বাধীন তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে গঠন করিবার চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মানী ফিনল্যাণ্ডের সিংহাসন কাইজারের শ্যালক প্রিন্স চার্লস অব্ হেসকে দান করে। দ্বিতীয় উইলহেলম্ এস্তোনিয়ায় এবং য়ুরাকের প্রিন্স উইলিয়ম লিথুয়ানিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিবেন সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে জার্ম্মানী এই সময় পশ্চিমে ভীষণভাবে পর্য্যুদস্ত হয় এবং ‘প্যারি শান্তি সম্মেলন’ অনুযায়ী পোল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির কিন্তু স্বস্তি ছিল না। কম্যুনিষ্ট আতঙ্কে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। ১৯১৮ সালে ‘ফিনিস্ রেডস্’ ও ‘ফিনিস হোয়াইট’দের মধ্যে ভীষণ অন্তর্যুদ্ধ বাধে। জার্ম্মানীর সহযোগিতায় ‘ফিনিস্ হোয়াইট’রা যুদ্ধে জয়-লাভ করে। ফলে বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিতে জার্ম্মানীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালে রাশিয়া বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে।

শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্বয়—জার্ম্মানী ও রাশিয়ার—মধ্যে

পড়িয়া এই বাল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিকে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে কালাতিপাত করিতে হইয়াছে। বিশেষ হের হিটলারের অভ্যুদয়ের পর হইতে জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রনীতি যে ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে নিরাপত্তা রক্ষার দিক্ দিয়া বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির উদ্বেগ আরও বাড়িয়া যায়। হিটলার "মাইন্ কাম্ফ্"-এ সুস্পষ্ট ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইউরোপে যখন আমরা নূতন কোন দেশ অধিকারের কথা বলি, তখন তাহা প্রধানতঃ রাশিয়া ও রাশিয়ার নিকটবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলিকেই বুঝায়।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির আতঙ্কের কারণ অসঙ্গত নহে এবং এই হেতুই এস্তোনিয়া, লাট্‌ভিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ড নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য বরাবর নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। একের সন্তোষ বিধান করিতে গেলেই যখন অন্যের বিরাগভাজন হইতে হয়, তখন বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলি নিরপেক্ষ থাকাই প্রশস্ত মনে করিয়াছে। জার্ম্মানীর 'জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ' অর্থাৎ নাৎসিবাদ অথবা রাশিয়ার 'সাম্যবাদ' অর্থাৎ কমুনিষ্টবাদ কোনটির উপরই বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির শ্রদ্ধা ছিল না। তবে বাল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির সাম্প্রতিক আচরণে একটু নাৎসি-প্রীতি দেখা যায়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুন এস্তোনিয়া ও লাট্‌ভিয়ার সহিত জার্ম্মানীর অনাক্রমণচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির জার্ম্মান প্রীতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ সুরক্ষিত করিবার জন্য ফিন্‌ল্যাণ্ড 'অল্যাণ্ড কন্‌ভেশ্‌ন'-এর স্বাক্ষরকারীদের নিকট দাবী উপস্থিত করে। বৃটেন ও ফ্রান্স ফিন্‌ল্যাণ্ডের দাবী মঞ্জুর করে, কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে সোভিয়েট সরকার ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সুইডেনের দাবীর প্রতিবাদ করে। সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী এই অল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ সামরিক দিক্ দিয়া রাশিয়ার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বল্‌টিক সাগরে রুশ নৌ-শক্তি লুপ্ত করিয়া জার্ম্মানীর সহিত অপ্রতিহতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সুইডেনও অল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েটের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা করিয়া রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে মলোটভ অল্যাণ্ড সম্পর্কে ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সুইডেনের দাবীর বিরোধিতা করেন। ইহা ছাড়া জার্ম্মানী যে কোন মুহূর্ত্তে অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, মেমেল, ডানৎসিক ও করিডরের মত এই ক্ষুদে বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিকে আত্মসাৎ করিতে পারে। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েট ফিন্‌ল্যাণ্ড ও অল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

এই বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯৫,০০,০০০ হইবে। এস্তোনিয়ায় ১২,০০,০০০, লাট্‌ভিয়ায় ২০,০০,০০০, লিথুয়ানিয়ায় ২৪,০০,০০০ এবং

হের হিটলার।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ৪০,০০,০০০ অপেক্ষা কিছু কম হইবে। এস্তোনিয়া, লাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্থায়ী সৈন্য-সংখ্যা যথাক্রমে ১২,০০০, ২৫,০০০, ২৩,০০০ ও ৩০,০০০; মোট ৯০,০০০ মাত্র। নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধিবাসীকেই সামরিক শিক্ষা লইতে হয়। অভিজ্ঞ সেনানায়কগণের অধীনে সৈন্যগণকে শিক্ষা

দান করা হইয়া থাকে। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সহিত জার্ম্মান অথবা রাশিয়ার সামরিক শক্তির তুলনা করিলে হাস্যাস্পদ মনে হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের সংহত শক্তি কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ রাশিয়া অথবা জার্ম্মানীর শক্তিকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে-হিটলার কম্যুনিষ্ট-বিরোধী চুক্তি নিমেষে ধূলিসাৎ করিতে পারে, প্রয়োজন-বোধে সে রুশ-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি যে কোন মুহূর্ত্তে ভঙ্গ করিয়া বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বস্তুতঃ এই আশঙ্কা করিয়াই রাশিয়া অবশেষে বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং দুর্ব্বল বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিকে নিরুপায় হইয়া অগত্যা রাশিয়ার শরণাপন্ন হইতে হইল।

এস্তোনিয়া সোভিয়েটের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ওজেল ও দাগোতে সোভিয়েট নৌ-ও বিমান-ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার দিয়াছে। রাশিয়া এখন রিগা উপসাগরে প্রভুত্ব লাভ করিল। রিগা বন্দর হইতে মস্কোর রেলপথের যোগসূত্র আছে, ফলে লেনিনগ্রাড হইতে রাশিয়ার বল্‌টিক্ সমুদ্র পর্য্যন্ত যাতায়াত সুগম হইল। নয়া চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট এস্তোনিয়ায় চার ডিভিশন সৈন্য অর্থাৎ প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। এস্তোনিয়ার মোট জার্ম্মান অধিবাসীর সংখ্যা বিশ হাজার। তন্মধ্যে আঠার হাজার জার্ম্মান অধিবাসীকে জার্ম্মানীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট তোড়জোড় করিতেছেন। ইতোমধ্যে এক হাজার জার্ম্মান অধিবাসীকে জার্ম্মানীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। জর্ম্মানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য হাজার হাজার জার্ম্মান টাল্লিনে প্রতীক্ষা করিতেছে। ওজেল দ্বীপে পের্‌না কিউরেসার্ বন্দরে বহু জার্ম্মান জাহাজ এস্তোনিয়া-প্রবাসী জার্ম্মানদিগকে স্বদেশে স্থানান্তরিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

লাটভিয়া-সোভিয়েট পারস্পরিক সাহায্য ও বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। লাটভিয়া সোভিয়েটকে লিবাউ ও উইনডাউতে কয়েকটি নৌ-ও বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিবার অধিকার দিতে সম্মত হইয়াছে। লাটভিয়ায় মোট জার্ম্মান অধিবাসীর সংখ্যা সত্তর হাজার, তন্মধ্যে ষাট হাজার জার্ম্মান অধিবাসীকে জার্ম্মানীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য রিগা, লিবাউ ও লাটভিয়ান বন্দরে ইতোমধ্যে ১৪খানা জাহাজ আসিয়া ভিড়িয়াছে।

সোভিয়েটের সহিত লিথুয়ানিয়ার সামরিক ও পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী সোভিয়েট ভিলনা সহ লিথুয়ানিয়াকে একশতখানি গ্রাম, ২০-মাইল-ব্যাপী রেলপথ এবং ৪২৫ বর্গ মাইল বনভূমি প্রত্যর্পণ করিয়াছে। লিথুয়ানিয়ায় মোট জার্ম্মান অধিবাসীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকেও জার্ম্মানীতে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। জার্ম্মানীর সহিত লিথুয়ানিয়ার সাধারণ সীমান্ত থাকায় সোভিয়েটের নিকট এই স্থানটির বিশেষ সামরিক গুরুত্ব আছে। সোভিয়েট লিথুয়ানিয়া-জার্ম্মান সীমান্তে ছত্রিশ দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিয়াছে।

এস্তোনিয়া, লাট্‌ভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় অধিকার লাভ করা সোভিয়েটের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের বেলায় সোভিয়েটকে একটু বেগ পাইতে হইতেছে। রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড উপসাগরবর্ত্তী কোরল্পটাউ খাঁড়ির মুখে অবস্থিত লাভানসায়ার ও সেস্‌কায়ার দ্বীপ ফিন্‌ল্যাণ্ডের নিকট দাবী করিয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডকে পূর্ব্ব কারেলিয়ার একটি অংশ প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। রাশিয়ার নিকট এই স্থানটির বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। রুশ ফিনিশ সীমান্তে কারেলিয়ার এই অংশটি বনপ্রধান স্থান। তবে দুই লক্ষ ফিনিশ অধিবাসীর এখানে বাস এবং এই দিক্ দিয়া ফিনল্যাণ্ডের নিকট এই স্থানটির প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। সোভিয়েট দাবী করিয়াছে যে, ফিন্‌ল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সহিত একটি সামরিক চুক্তি করিতে হইবে, অল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং এই দ্বীপগুলির তত্ত্বাবধানের ভার রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ফিন্‌ল্যাণ্ড অন্যান্য বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির মত দুর্ব্বল নহে। ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষ ফিনিশ সামরিক বিভাগে যোগদান করিয়াছে। সর্ব্বত্র সামরিক তোড়জোড় চলিতেছে। তবে একা ফিন্‌ল্যাণ্ডের পক্ষে রাশিয়ার দাবী এড়াইয়া চলা সম্ভবপর হইত না। স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ান ব্লক—অর্থাৎ ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের চাপে পড়িয়াই ফিন্‌ল্যাণ্ড একটু বাঁকিয়া বসিয়াছে। অস্‌লো চুক্তির ফলে এই ত্রিশক্তি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত যোগ-সূত্র স্থাপন করে। রাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও অল্যাণ্ডে অধিকার লাভ করিলে তাহাদের এই নিরপেক্ষ নীতি এবং জার্ম্মানীর সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ব্যাহত হইতে পারে। নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রতি উক্ত ত্রিশক্তির দরদ এতটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েটের প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের খবরদারী দেখিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড আরও একটু বল পাইয়াছে। কিন্তু মঁসিয়ে মলোটভ গত ৩১শে অক্টোবর তারিখের বক্তৃতায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আঁতে ঘা দিয়াছেন। মঃ পাসিভিকির নেতৃত্বে ফিনিশ প্রতিনিধি-দল সোভিয়েটের প্রশ্নোত্তর লইয়া হরদম মস্কো হাঁটাহাটি করিতেছেন। আলোচনার এখনও অবসান হয় নাই বটে, তবে ফিনিশ প্রতিনিধি-দলের পাণ্টা প্রস্তাবের মধ্যে একটা নরম স্বীকারোক্তির রেশ শোনা যাইতেছে। ফিন্‌ল্যাণ্ড-সোভিয়েট চুক্তির মীমাংসা সম্পর্কে বিলম্ব হইলেও ফিনিশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ এর্কো অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে শীঘ্রই একটা আপোষ হইয়া যাইবে। হইলেই ভাল; অন্যথা মঁসিয়ে মলোটভের কথার অনুসরণে বলিতে হয় "শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে।"

লাটভিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডক্টর কার্লিস উলমানিস্ এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন, "সোভিয়েটের সহিত বল্‌টিক রাষ্ট্রসমূহের চুক্তি হওয়ার ফলে জনসাধারণ যুদ্ধাতঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।" জোর করিয়া নহে—সুযুক্তি ও সদ্ভাবের দ্বারাই রাশিয়া বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির সহিত পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। একটা কামান না দাগিয়া এমন কি একবিন্দু রক্তপাত না করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে আয়ত্তাধীনে আনিবার রাশিয়ার এ এক অভিনব কৌশল এবং জার্ম্মানীর সহিত রাশিয়ার পার্থক্য বোধ হয় এইখানেই। জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল—সমস্ত পোল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া রক্তগঙ্গা বহিয়া গেল। কিন্তু রাশিয়ার পোল্যাণ্ড অভিযানের সময় ইউক্রেনিয়ান ও হোয়াইট রাশিয়ানরা লাল পতাকা উড়াইয়া লাল ফৌজকে অভিবাদন জানাইল। নৃশংস ধ্বংসলীলার হাত হইতে অর্দ্ধেক পোল্যাণ্ডও রক্ষা পাইল। বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলি সেদিন নিশ্চয়ই চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল না। পোল্যাণ্ডের বুকের উপর তাহারা

মঃ মলোটভ।

জার্ম্মানী ও রাশিয়ার চরিত্র পাশাপাশি নিরীক্ষণ করিয়াছে। জার্ম্মানীর কবল হইতে অসহায় বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলি আজ যে রক্ষা পাইল, এজন্য বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ মনে মনে হয়ত রাশিয়াকে ধন্যবাদ দিতেছে। সংবাদপত্র মারফৎ আমরা শুধু লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহাদের নেতৃবৃন্দের উক্তি। নেতৃবৃন্দের কথার জনসাধারণের মনোভাব ব্যক্ত নাও হইতে পারে।

এদিকে হিটলারের পূর্ব্বাভিযান পরিকল্পনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বল্‌টিক সাগরে রাশিয়া এখন পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ লাভ করিবে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব

—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত কয়েক বৎসরের চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত আলোচনায় এটুকু স্থির হইয়াছে যে, ঐ নামে একাধিক কবি বাংলা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যিনি বড়ু চণ্ডীদাস নামে খ্যাত তিনি তাঁহার তথাকথিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-নামক কাব্যখানি প্রাক্‌চৈতন্য যুগে রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জনসাধারণ এই বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্বরসের সহিত আজও তেমন পরিচিত হয় নাই। পরচৈতন্য যুগে আবির্ভূত যে চণ্ডীদাস, তাঁহারই পদলালিত্য ও পদমাধুর্য্য বাঙ্গালীমাত্রকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বর্ণনার চমৎকারিত্বে, ভাবের গভীরতায় ও আবেগে, ভাষার সৌষ্ঠবে, ছন্দের ঝঙ্কারে এবং উপমা-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের পদগুলিও সরসসুন্দর। পরচৈতন্য যুগে যে-চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিম্নলিখিত পদগুলির সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদাবলীর ভাব ও ভাষার পার্থক্য সহজেই লক্ষিত হয়। পরচৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসের—

সজনি, ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি,
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি' তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
...
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি' নিঙ্গাড়ি'
পরাণ সহিতে মোর॥
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি আদেশে
শুনহে নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥

অথবা

সই, পীরিতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানি রাতি কি দিন॥

এবং

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

এই পদগুলি বিশেষ বিখ্যাত। প্রথমোক্ত পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অনেক স্থলেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধিকা সেখানে বৃষভানু রাজার নন্দিনী নহেন। তিনি 'সাগর গোআলের' কন্যা এবং সাধারণ গোপকন্যাদের সহিত তিনি হাটে দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেছেন। দ্বিতীয় পদটি আক্ষেপানুরাগ বা বিরহের পদ। বিরহ-বিষয়ক পদে পরচৈতন্য যুগের চণ্ডীদাস অনেক স্থলেই 'পীরিতি'—এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া তাঁহার কাব্যের সৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভিতরে বড়ু চণ্ডীদাস মাত্র একবার 'পীরিতি' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।—

মোর বোল সুন অবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী॥

—শ্রীকৃকী. পৃ. ৩২৮

ইহা ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রেম বা প্রীতি অর্থে 'নেহা' 'নেহ' ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয় পদটিতে রাধিকার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। পরচৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসের যে সকল পদে রাধিকার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল পদে বিহ্বলা রাধিকার মনোহর মূর্ত্তিটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার পূর্ব্বরাগ নাই—তিনি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই পুনঃ পুনঃ রাধিকার প্রতি তাঁহার প্রণয় নিবেদন করিতেছেন। পরচৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসের পদাবলীর নায়িকা রাধিকার কর্ণে শ্যামনাম যেন মধুবর্ষণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ির শত চেষ্টা সত্ত্বেও রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন এবং

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণকে 'শ্যাম' বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। সর্ব্বত্রই তিনি 'কাহ্ন,' 'কাহ্নু,' 'কাহ্নাঞি' ইত্যাদি। রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব ও ভাষার বৈষম্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আগন্ত কবিত্বের রসধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বত্র মৌলিক কবিত্বরস উৎসারিত হয় নাই, কারণ বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেব কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া মধ্যে মধ্যে জয়দেবের অনুকরণে পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল অনূদিত অংশেও জয়দেবের শব্দযোজনার সৌন্দর্য্য এবং বর্ণনা চাতুর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। রচনা কোথাও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। অনুবাদ মূল অনুযায়ী হইয়াছে অথচ ভাষার গতিবেগ স্বচ্ছন্দ ভাবেই প্রবাহিত হইয়াছে। নিম্নে জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ এবং বড়ু চণ্ডীদাসের পদ পর পর প্রদত্ত হইল। বড়ু চণ্ডীদাসের অনূদিত অংশে জয়দেবের বর্ণনার চমৎকারিত্ব লক্ষিত হইবে। জয়দেবের নিম্নোদ্ধৃত পদটি সুপ্রসিদ্ধ।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী॥ ১
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে তনুতে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুং॥২
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং॥ ৩
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং॥৪
উরসি মুরারেরুপহিত হারে ঘনইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥ ৫
বিগলিত বসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানং।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানং॥ ৬
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামং।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামং॥ ৭

এই গীতটির সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলনীয়—

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেতবেণু বাজাএ বতনে॥
কালিন্দীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাত চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে॥
তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকে করএ কাহ্ন অতি বহুমানে॥
পাখি বসিতেঁ তরু পাত চলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচএ শয়নে॥
চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কতখনে আইসে রাধা এহি করি মনে॥
তেজহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীত।
শোভে মেঘ মালে যেহেন-তড়িত॥
গলিত বসন হীন রসন জঘনে
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লব শয়নে॥
মানী বড় কৈল কাহ্নাঞি শেষ রজনী।
তার পূর মনোরথ মোর বোল শুনী॥

—শ্রীকৃকী, বৃন্দাবনখণ্ড পৃঃ ২০২।

এখানে অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই। জয়দেবের পদের মনোহারিত্ব এখানেও বর্ত্তমান। বিরহী শ্রীকৃষ্ণের রূপটি জয়দেবের কাব্যে যেমন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এখানেও শ্রীকৃষ্ণের সেই উৎকণ্ঠা সুপ্রকাশিত।

জয়দেবের—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী।
হরতিদর তিমিরমতি ঘোরং।

—গীতগোবিন্দ ১ ম সর্গঃ।

এই গীতটিও আগাগোড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অনূদিত হইয়াছে। মানিনী রাধার অভিমান দূর করিবার জন্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন রুচি তোহ্মার।
হরে দুরন্তর তম আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আমারে॥

ইত্যাদি, শ্রীকৃকী পৃঃ ২১৭।

বড়ু চণ্ডীদাস রাধিকার ভ্রূযুগল কে কামধনু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার কুটিল কটাক্ষকে সেই কামধনুর বাণস্বরূপ বলিয়াছেন—

ভ্রুহি কাম ধনু নয়ন বাণে।

ইহা জয়দেবের—"ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গ-তরঙ্গিতানি বাণা"—এই বর্ণনার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

বিরহ বর্ণনায় বড়ু চণ্ডীদাসের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তথাপি বিরহিণী রাধিকার চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া স্থানে স্থানে তিনি গীতগোবিন্দ অনুসরণ করিয়াছেন। সেই সকল অংশে রূপকার যেন রূপ দেখিয়া মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন।

জয়দেবের—

নিন্দতিচন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং॥ ১
সা বিরহে তব দীনা
মাধবমনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥ ইত্যাদি

এই গীতটির সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলনীয়—

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে॥
করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে।
ত্রত করে পাস্থিতেঁ তোর আলিঙ্গনে॥
আল কাহাঞি ল
রাধা বিরহ দহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার কারণে॥ ইত্যাদি

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, বিরহখণ্ড পৃঃ ৩৭৯

এখানেও চণ্ডীদাস একেবারে কথায় কথায় হুবহু জয়দেবের অনুবাদ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি-বর্ণিত বিরহকাতরা রাধিকার অবস্থাও জয়দেব ও চণ্ডীদাস-বর্ণিত রাধিকার মত। বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ত পদে যে কেবল জয়দেবের রাধিকার রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। উক্ত পদে আমরা বিদ্যাপতির রাধার মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুলতার আভাসও পাই। বিদ্যাপতির পদাবলীর বিরহিণী রাধিকাও চন্দ্র ও চন্দনের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

মৃগমদ চানন পরিমল কুঙ্কুম,
কে বোল সীতল চন্দা।
পিয়া বিসলেখে অনল জঞো বরিসএ
বিপতি চিহ্নিয় ভল মন্দা॥

বিদ্যাপতির অন্যান্য বহু পদেই আছে যে, চন্দন এবং চন্দ্রের শীতল কিরণ বিরহিণী রাধার দেহ দহন করে—

মনমথ মন মথ তনি বিনু সজনি
দেহ দহয় নিশিচন্দ॥

চানন চান তন অধিক উতাপয়
উপবন অলি উতরোল রে।
সময় বসন্ত কন্ত রহু দূরদেশ
জানল বিহি প্রতিকূল রে॥

নিন্দয় চন্দন পরিহর ভূষণ
চাঁদ মানএ জানি আগি।

এইরূপ জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয় কবির বর্ণনার চমৎকারিত্ব মিলিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের বিরহ-বর্ণনাকে সরস-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। উভয় কবির কাব্য-কুসুমের মনোহারিত্ব যেন এক বৃন্তে ধৃত হইয়া চণ্ডীদাসের কাব্যের শ্রী ও ভাব-সমৃদ্ধ সাধন করিয়াছে।

জয়দেব বিরহী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়॥
সখী সীদতি তব বিরহে বনমালী॥

—গীতগোবিন্দ, ৪র্থ সর্গ ১০ম গীতি

জয়দেবের অনুকরণে চণ্ডীদাসও বিরহী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতেছেন—

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ। ল।
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহি হৃদয়ে॥ ল॥ ১॥
তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞি ল।
তোর বিরহ দহনে॥ ধ্রু॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৃন্দাবনখণ্ড পৃঃ ১৯৯

নিম্নে জয়দেব-বর্ণিত বিরহিণী রাধার আরও একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে—ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাবিরহ খণ্ডের একটি পদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। চণ্ডীদাসের "তনের উপর হারে মানএ যেহেন ভারে"—এই পদটি জয়দেবের—"স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং" এই গীতটির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারং॥ ১॥
রাধিকা বিরহে তব কেশব॥ ধ্রুবম্॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং,
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥ ২॥

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহং।
মদনদহনমিব বহতি সদাহং॥ ৩ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালং
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালং॥ ৪ ॥
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পং।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পং॥ ৫ ॥
ত্যজতি ন পানিতলেন কপোলং।
বালশশিনমিব সায়মলোলং॥ ৬ ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামং॥ ৭ ॥

গীতগোবিন্দ, ৪র্থ সর্গ, ৯ম গীতি

চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন—রাধিকা বিরহ-পীড়নে এমনই কৃশতনু হইয়া গিয়াছেন যে স্তনবিনিহিত হার তাঁহার পক্ষে বহন করা ক্লেশকর। চন্দন-পঙ্ক সরস বটে, কিন্তু বিরহিণী রাধিকা আতঙ্কে উহাকে বিষের মত মনে করিতেছেন এবং রাত্রিকালের স্নিগ্ধশীতল চন্দ্র-কিরণকে তিনি অগ্নির মত জ্ঞান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সন্তপ্তা রাধিকা কেবল তাঁহার মিলনের আশায় বাঁচিয়া আছেন। কুসুম-শরের ভয়ে রাধা তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিতেছেন। তিনি তাঁহার অশ্রুভারানত নয়নযুগল চারিদিকে ফিরাইতেছেন দেখিয়া মনে হইতেছে যেন জলকণাকীর্ণ নয়ন-নলিনী নাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মনোরম কিশলয় শয্যাটি দেখিয়া তিনি উহাকে অগ্নি কল্পনা করিয়া শঙ্কিতা হইতেছেন। করতলে তাঁহার কপোল লগ্ন করিয়া তিনি নিশ্চল মনে আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আছেন।—

স্তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি দুবলে বিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে শশাঙ্কে॥ ১॥
আল
তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে॥
কুসুম শর হুতাসে।
তপত দীর্ঘ নিশ্বাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে॥ ২॥
দেখি পল্লব শয়নে
আঙ্গার রাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে॥
বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে॥ ৩॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহখণ্ড পৃ-৩৭৭

এইভাবে জয়দেবের অনুকরণ করিয়া চণ্ডীদাস যেখানেই পদরচনা করিয়াছেন, সেখানেই তিনি সর্ব্বতোভাবে আদর্শের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া রীতিসিদ্ধ ভাষায় কথায় কথায় অনুবাদ করিয়াছেন। সেই সকল অংশ মৌলিক নহে—কিন্তু সরস-সুন্দর ও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে-সকল স্থানে মৌলিক কবিত্বরস উৎসারিত হইয়াছে, সেই সকল অংশেও যেমন কবিত্ব তেমনি ভাবোচ্ছ্বাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধিকার রূপবর্ণনা, শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা, বিরহবর্ণনা প্রভৃতিতে কবির অপূর্ব্ব কারুকুশলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই কাব্যে আর এক শ্রেণীর পদাবলী আছে, সেগুলি অধ্যাত্ম রাজ্যের—সেগুলি অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক। ক্রমাগত সীমার বন্ধন অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুল প্রার্থনায় পরিপূর্ণ সেই পদগুলি।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনা অনেক কবিই করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস-বর্ণিত শ্রীরাধার রূপ-মাধুরীও চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যের রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকার অনেক বৈষম্য লক্ষিত হইবে। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনমাত্র শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হন নাই এবং রাধিকা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোরও থাকেন না। পরচৈতন্যযুগের পদকর্ত্তাগণ তাঁহাদের পদাবলীতে যে-রাধামূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই রাধা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর। তাঁহার—

জলদ নেহারি' নয়নে ঝরু লোর

এবং তিনি বিজনে তরুণ তমাল-তরুকে আলিঙ্গন দান করেন। কারণ মেঘের বর্ণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তমাল তরুর ঘন নীল-নিবিড়তা দেখিয়াও তাঁহার স্মৃতিপটে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী জাগিয়া উঠে। ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের নীলিমা দেখিয়াও রাধিকার মনে পড়িয়াছে শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যাম মূর্ত্তিটি। সেই রাধিকা যমুনায় জল আনিতে গিয়া জলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের নীলিমা দেখেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের পটে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি ঝলমল করিতে থাকে।—

যমুনার জল গাগরী ভরিতে
দেখিলু কালিয়া চাঁদ।
চণ্ডীদাস কহে রহিতে নারিবা
অন্তরে কালার ফাঁদ॥

—পরচৈতন্যযুগের চণ্ডীদাস

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকার এইরূপ বিহ্বলতা কোথাও নাই। তথাপি রাধিকা যেন তুলিতে আঁকা ছবির মত স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছেন। যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিতে না পাইলেও রাধিকা সখিগণ-পরিবৃতা হইয়া যমুনায় জল আনিতে যান—

যাই যমুনার পানিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কৃষ্ণ হরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগতি ছান্দে।
আলকে শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে॥

এখানে যমুনায় জল আনিতে যাওয়ার প্রসঙ্গে কবি রাধিকার রূপটি চমৎকার ভাবে আঁকিয়াছেন। রাধিকার গতি গজের মত ধীর এবং তাঁহার উজ্জল মুখচন্দ্রের উপর অলকদাম যেন চন্দ্রের উপর কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নানাবিধ পুষ্পের কোমলতার সহিত কোমলাঙ্গী শ্রীরাধার তুলনা করা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির বিশেষত্ব। সুন্দরী কিশোরীর প্রতি অঙ্গের লাবণ্য ও কোমলতা শব্দতুলিকায় অঙ্কিত হইয়া সুচিত্রিত আলেখ্যের মত প্রতিভাত হইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধিকা নলিনীদলের মত কোমলাঙ্গী—

এগার বৎসরের বালী।
যেহ্ন নলিনী দল কোঅলী॥

শিরীষ ফুলের কোমলতা তাঁহার প্রতি অঙ্গে বিরাজমান—

শিরীষ কুসুম কোঅলী।
অদভুত কনক পুতলী॥

বিদ্যাপতিও রাধিকার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে রাধিকা—

শিরিষ কুসুম তনি অতি সুকুমার ধনি

রাধার চক্ষুযুগল হরিণীর চঞ্চল দৃষ্টিকেও হার মানাইত—বান্ধুলী ফুলের মত তাঁহার অধরের কান্তি ছিল এবং গণ্ডস্থল ছিল মহুয়া ফুলের মত। তাঁহার দশনপংক্তি ছিল মাণিক অপেক্ষাও উজ্জলতর এবং দেহের কান্তি ছিল সুবর্ণের মত—

কুরঙ্গ নয়ন জিণী তোহ্মার নয়নে।
অধর বান্ধুলী গণ্ড মাধুক সমানে॥
মাণিক জিনিআঁ তোর দশনের পাঁতী।
কনআ নিকষ তোর দেহের কাঁতী॥

রাধিকার চরণযুগলে স্থলকমলের সৌন্দর্য্য ছিল—তাঁহার গতি ছিল রাজহংসের গতি অপেক্ষাও মন্থর—

থল কমল জিণী তোহ্মার চরণে।
রাজহংস জিণী তোহ্মার গমনে॥

রাধিকার চরণযুগলের সৌন্দর্য্য রক্ত-কমলের আরক্তিম আভাকেও হার মানাইত।—

তোর পাঅ দেখি রাতা উতপল
লাজে লুকাইল জলে।
তোহ্মার গমন দেখি রাজহংস
গতি করিল সলিলে।

অন্যত্র—

রাতা উতপল তোর দুই চরণে।
রাজহংস জিণী তোর গমনে॥

এই কাব্যের বৃন্দাবনখণ্ডে বিভিন্ন পুষ্পের সহিত তুলনা করিয়া কবি তাঁহার কাব্যের নায়িকার সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে রাধিকার কুসুম-সুকুমার রূপটি স্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে—ফুলের সুষমা যেন রাধিকার অঙ্গে অঙ্গে বিরাজ করিতেছে—

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপুট নাসা তিল ফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
অধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কর্ণযুগ তোর এ বগ ফুলে॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খণ্ডয়ী কুসুম তোর বসনে॥
ভুজযুগ হেম যূথিকা মালে।
অশোক তবক কর যুগলে॥
মুকুলিত থল কমল তনে।
রোমরাজী তাত আর্তরীগণে॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘ যুগলে॥
চরণ-কমল থল কমলে।
আঙ্গুলী চম্পক কলিকা জালে॥
নখর নিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে॥
কনক চম্পক কুসুম পান্তী।
তোহ্মার সকল শরীর কান্তী॥
সেআলী সেআলী মাহলী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে।
দেখোঁ সে তোর ফুল শরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে॥

নিম্নে রাধিকার রূপবর্ণনার আর একটি স্থান উদ্ধৃত হইল। এখানেও কবির বর্ণনার অভিনবত্ব এবং তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুরে।
সজল জলদে যেন উইল নব সূরে॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥
মুনি মন মোহিনীর মণী অনুপামা।
পদ্মিনী আমার নাতিনী রাধা নামা॥
ললিত অলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বন মাঝে॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পশি' তপ করে নীল উতপল॥
কণ্ঠদেশ দেখিয়া শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জল মাঝে॥

কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
আভিনাব পাকা পাকা দাড়িম্ব বিদরে॥
মাঝা খিণী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংসে জিনী চলএ বিলম্বে॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥

উপমার সাহায্যে রূপবর্ণনা করা কবিত্বের পরিচায়ক। পদাবলী সাহিত্যে উপমা-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার উপমা-গুলিতে কল্পনার, গভীরতা ও প্রসারতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই উপমার সাহায্যে অতি অল্প আয়াসেই বড়ু চণ্ডীদাস রূপবর্ণনা করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধিকার নয়নযুগলের সৌন্দর্য্য ও চটুলতা নৃত্যশীল খঞ্জনের মত, তাঁহার বদন-কমল শরতের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল। তাঁহার অধরে বান্ধুলী ফুলের আভা।—

শরত উদিত চান্দ বদন কমল
খঞ্জন জিনিয়া তোর নয়ন যুগল॥
অধরে বান্ধুলী রাগ শোভএ সুন্দরী।

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—

মুখ কমলে আতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুই॥

নীল মেঘস্তরের মত রাধার কুন্তল—

নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।
বদন সংপুন শশধরে॥

নীল পদ্মের মত রাধিকার চক্ষুযুগল আর তাঁহার দশন-পংক্তির দীপ্তি মাণিকের দীপ্তিকেও হার মানায়—

নয়ন তোর নীল উতপলে।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশনের দুতী।
সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী॥

রাধিকার নীল কুন্তলরাশির উপর চম্পকের মালা যেন মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত শোভা পায়। তাঁহার সিঁথীর সিন্দুর দেখিয়া মনে হয় যেন নীল আকাশের বুকে সূর্য্যোদয় হইয়াছে—

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দূর
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥

নানারূপ আভরণ পরিহিতা রাধিকার বর্ণনার সময়েও কবি উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছাড়েন নাই। রাধিকার কর্ণ-বিলম্বিত মণি-কুণ্ডল যেন পূর্ণচন্দ্রের দুই পার্শ্বে সূর্য্যের মত শোভা পায়—

কপোল যুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণি কুণ্ডলে।
সংপূর্ণ চান্দের দুই পাশে যেহ্ন
উইল সুরুজ মণ্ডলে॥

অন্যত্র কবি রাধিকার অঙ্গের উপর তাঁহার গজমুক্তার হারের শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—

কনক কুম্ভ আকারে দুই তোর পয়োভারে
তাহাতে উপর গজ মুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধার

ইহার সহিত বিদ্যাপতির—

পীন পয়োধর অপরূব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

এই বর্ণনা তুলনীয়। উপমা প্রয়োগে বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস এই উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গী একরূপ।

কোথাও কোথাও আবার বড়ু চণ্ডীদাসের রাধিকা পুষ্পাভরণ-ভূষিতা। রাধিকার সেই রূপ বর্ণনা করিতেও কবি উপমা দ্বারা তাঁহার অঙ্কিত চিত্রটিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। রাধিকার খোঁপার উপরে চম্পকের মালা শোভা পাইতে দেখিলে মনে হয় যেন শিবের শিরদেশে স্বর্গ-মেখলা শোভা পাইতেছে—

ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হর শিরে শোভে যেহ্ন কনক মেখলা।

বড়ু চণ্ডীদাস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাও আমাদিগকে মুগ্ধ করে এবং সেই বর্ণনা করিতে গিয়া কবি কোথাও উপমার আশ্রয় লইয়াছেন আবার কোথাও বা বিনা উপমায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যামশোভা—

সজল জলদ রুচি জিনী দেহ কান্তী।

সেই নয়নানন্দকর রূপের উপর শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ আভরণে ভূষিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে—

ময়ুর পুছেঁ বান্ধিআঁ চূড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চাঁদ ষোল কলা॥
কাজলেঁ উজল নয়ন যুগল
খঞ্জনকে উপহাসে।
ঈষত হসিত ভুবন মোহন
যেহ্ন কমল বিকসে॥

অন্যত্র—

নীল কুটিল ঘন সুছ দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ॥
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে॥

এই সকল বর্ণনা পরচৈতন্যযুগের বহু পদকর্ত্তার পদ-মাধুর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পরচৈতন্য যুগের পদ-কর্ত্তাদের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণও ময়ূরের পুচ্ছ দিয়া চূড়া বন্ধন করেন, আর তাঁহার অঙ্গেও চন্দনের ফোঁটা ঝলমল করিতে থাকে—

কালার অঙ্গে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি

এবং

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ
কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনোলোভা॥ —জ্ঞানদাস

শ্রীকৃষ্ণ কেবল ময়ূরপুচ্ছে চূড়া বন্ধন করেন না। সুবর্ণের কান্তিবিশিষ্ট পুষ্পের দ্বারা তিনি তাঁহার জটাবন্ধন করেন। তাঁহার নীল দেহের উপরে চন্দনের বিন্দু যেন গগনে পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তি পাইতে থাকে।—

ময়ুর পুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেড়া
কনয়া কুসুমে বান্ধি জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোঁটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা॥

এইরূপে কবি যেখানেই রাধা-কৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিয়াছেন সেই স্থানগুলি বড় মনোহর—ঐ বর্ণনা যেন এক একটি সুচিত্রিত চিত্রপট। উপমা ও শব্দ-বিন্যাসকৌশলে নায়ক-নায়িকার রূপ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের উপমা যেমন সুন্দর ও মনোরম তেমনি উজ্জ্বল ও সার্থক। সৌন্দর্য্যের এক একটি চিত্র কবির নিপুণ-তুলিকাস্পর্শে সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কেবল যে রাধাকৃষ্ণের বহিঃসৌন্দর্য্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের মনোরাজ্যের ভাবরাশির বিশ্লেষণও করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস বিরহের কবি। রাধাবিরহ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার কবিত্ব উৎসারিত হইয়াছে। এই রাধাবিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি রাধিকার কুসুম সুকুমার অন্তর্জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই চণ্ডীদাসের বিরহ-বিষয়ক একটি পদ আস্বাদন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত নিম্নলিখিত গানটি গাহিয়াছিলেন।—

হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কি না হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে তনু মন জারে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যথা গেলে কানু পাও তথা উড়ি যাও॥

—চৈ-চ-মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ

চণ্ডীদাসের এই পদটি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোন্মুখ শ্রীরাধিকার ব্যাকুলতা শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরেও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত—

এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে॥

—চৈ-চ-মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ

বংশীখণ্ডে এবং রাধাবিরহখণ্ডে কবি রাধিকার বিরহের আকৃতি বিশেষ নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিরহ বর্ণনাতেও উপমা-প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং ভাবের ঐশ্বর্য্য মিলিত হইয়া কবির বর্ণনা সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

বংশীখণ্ডের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ এড়াইয়া চলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ দান-ছলে হাটে রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন—রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কিন্তু বংশীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরাগ জন্মিয়াছে—তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনলোলুপ। যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি হইলে রাধিকা বিরহে কাতরা হইয়া উঠেন—সেই বংশীধ্বনি যখন নীরব হইয়া যায় তখন রাধিকা বড়ই ব্যাকুলা হইয়া উঠেন।—

সুসর বাঁশীর নাদ শুণী আইলোঁ
মো যমুনা তীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পারিলোঁ যমুনা নীরে॥
বড়ায়ি ল।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবে
কাহ্ন গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল তৈল এবে
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে॥
বড়ায়ি ল।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে।
কাল কাহাঞি চাচর কেশে
কুসুম শোভিত মাথে॥

যে রাধিকা পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছিলেন যে "কাল কাহাঞি তোক বড় ডরাও" সেই রাধিকা বংশীখণ্ডে কৃষ্ণানুরক্তা এবং কৃষ্ণ-বিরহে কাতরা হইয়া বলিতেছেন—

যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন মনে।
কাহ্নাঞি ছাড়া না জানো মো আনে।

এবং

চারি দিকে তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম ডালে বসি কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষ বাণ ঘাএ॥
চাপ সুরঙ্গের তভ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্নি বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কলি যুগ জাএ॥
বাঁশীর শবদে প্রাণ হরিআঁ
কাহ্নি গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥

অন্যত্র—

মুকুলিল আম সাহারে।
মধু লোভে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
ডালে বসি কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।

ইহার সহিত বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদটি তুলনায়—

সাহর মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব॥

বিরহব্যাকুলা রাধিকা কদমতলে শয়ন করেন কিন্তু উহাতে তাঁহার অন্তরে অধিকতর জ্বালা বোধ হয়—

সুতিলোঁ কদম তলে।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে॥

সখির পরামর্শে তিনি সজল নলিনীদলের উপর শয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে উহা অপেক্ষা অনলও যেন শীতল—

সুতিলোঁ। সখির বোলে।
সজল নলিনী দলে।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে॥

বিরহের আগুনে পুড়িয়া ক্ষীণ-কলেবরা হইয়া গিয়া রাধিকা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

এ মোর বাহুর বলএ।
সব খন খসিআঁ পড়এ॥

বিরহ-বিশীর্ণা বিদ্যাপতির রাধিকারও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল—

কঙ্কণ-বলয়া গলিত দুহুঁ হাত।

মেঘদূতেও নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহিণী প্রিয়ার 'কনক-বলয়-ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ' হইয়াছিল।

বিরহিণী রাধিকা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণ দান।
আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন॥ ধ্রু॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর॥
যাব কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে॥

ইহা বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদটি স্মরণ করাইয়া দেয়—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীথার সিন্দুর পোছি কর দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন না হইলে রাধিকা যে যোগিনী হইবেন এ কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও এক স্থানে রাধিকা বলিয়াছেন—

কাহ্ন বিণি মোঁ। যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে॥

বসন্ত ঋতুর আগমনে রাধিকার বিরহ বর্দ্ধিত হয়—

সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
আধিক বিরহ শিখে হৃদএ জলএ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধি করিলে রহে আহ্মার জীবন॥
কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাআত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান॥

দিনের সূর্য্য এবং রাতের চন্দ্র এ দুইয়ের মধ্যে বিরহিণী রাধিকা কোনও পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না—

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মোরে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিবোঁ পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাও
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদিনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥

যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হয়—যখন কোকিলের কুহু রবে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠে, তখন দক্ষিণ পবন রাধিকার অঙ্গে যেন অনল-স্পর্শের মত মনে হয়—

বাঁশী বাজায়িল যবে কাহ্নে।
কোকিল কৈল পালি গানে।
আগুনি আলিল দেহে তখন দক্ষিণ পবনে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় রাধিকার বহুদিন গত হইল—তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আসেন না দেখিয়া রাধিকা আক্ষেপ করিতেছেন—

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয় হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল॥

মুছিঅাঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
বজরে পড়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ।
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥

বড়ু চণ্ডীদাস বর্ষার কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পাঠ করিলে এই উক্তি প্রমাণিত হইবে। 'ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআইল ডাল', 'আষাঢ় মাসেতে নব মেঘ গরজএ' প্রভৃতি কবিতা বর্ষার মতই ভাবে নিবিড় এবং কবিত্বে উচ্ছল। বর্ষার সুর বিরহের সুর। সেই জন্য বর্ষাগমে বিরহিণী রাধিকার অন্তরে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-ব্যথা বেশী করিয়া জাগিয়া তাঁহাকে বড় বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুম শর জালা।
হেন কালে বাড়িবে কাহ্ন সমে কর মেলা ॥
ভাদর মাসে অহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফাটি জাইবে বুক ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলে ফুটিবেক কাশী ॥
তবে কাহ্ন বিণি হৈব নিফল জীবন।

বর্ষাগমে বিদ্যাপতি বর্ণিত বিরহিণী রাধিকার অন্তরও বিরহতাপে দগ্ধ হইয়াছে—

ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহকয় দাদুল মোর ॥
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

অন্যত্র –

সজনি ছোড়লুঁ জীবন আশা।
দারুণ বরিখা ঝিউ ভেল অন্তর
নাহ রহল দূর দেশা ॥ ধ্রু ॥

বাদর দরদর নাহি দিন অবসর
গরগর গরজই রাতি
অনিল অধীর থির নহে অন্তর
দমকত দামিনি-পাঁতি ॥
ঘন ঘন ডাহুকি ডহ ডহ ডাকই
চাতক পিউ পিউ বোল।
নাচত মত্ত শিখণ্ডক মণ্ডল
নিশি-দিশি দাদুরি রোল ॥
কোন কলাবতি কঠিন হৃদয় অতি
পিয়া বিনে রাখব প্রাণ।

—বিদ্যাপতি

বিরহ-বর্ণনা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে আধ্যাত্মিক কবিতার ভিতর দিয়া। এই শ্রেণীর পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বংশীধ্বনি বাজিয়াছে—সেই মর্ম্মভেদী বাঁশীর সুর শুনিলে রাধার আর ঘরে থাকাই দায় হয়। উহা যেন শ্রীরাধিকার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাঁহার মন-প্রাণকে আকুল করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিখ্যাত পদে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥

এই বাঁশীর সুরের কথাই আছে। সমগ্র 'বংশীখণ্ডে' বারংবার রাধিকার কর্ণে এই মনোমুগ্ধকর বংশীধ্বনি পৌছিয়াছে। সেই আহ্বানে রাধিকার অন্তর আত্মা সীমার বাঁধ ভাঙিয়া অসীম অনন্ত প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

এই শ্রেণীর পদগুলির ভিতর দিয়া রূপকভাবে ভগবানের সহিত ভক্তের মিলনের আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি জাগতিক নর-নারীর প্রেমগীতি গাহেন নাই। এখানে ঐহিক প্রেমের উন্মত্ত কাকলি থামিয়া গিয়াছে, কবি ভগবৎপ্রেমের লীলা বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।

সকল দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাস সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন—তিনি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রায় প্রত্যেক পদের মধ্য দিয়া কবিত্বরস উৎসারিত হইয়াছে, এবং তাহা ভাবে ও সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে।

মানব শরীরে জলের উপকারিতা

—শ্রীফণিভূষণ রায়

শরীরের মধ্যে জল কি কার্য্য করে, তাহা জানিবার জন্ত আমি অধ্যয়ন, পরীক্ষা ও চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অতি সামান্ত মাত্র পরীক্ষার ফলেই আমি আশ্চর্য্যরূপ ফল পাইয়াছি এবং ঐ পরীক্ষার ফল কতকটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় সাধারণের নিকটে উপস্থিত করিলাম। তাহার কারণ এই যে, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক লোকের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ পরীক্ষা করিবার অবস্থা এখনও হয় নাই।

জল সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় প্রথম প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা জল বর্জ্জন করা হইয়াছিল। আহার্য্যের সহিত মিশ্রিত যে জল ছিল, তদ্ব্যতীত অন্ত জল খাওয়া হয় নাই। হিন্দুর ঘরে উপবাসের পরীক্ষার অভাব নাই, অভাব না ঘটলেও বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদিগের নিজের উপর পরীক্ষা করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক ভাবিয়া আমি নিজের উপরেই পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এই পরীক্ষার ফলে প্রথমেই নৈতিক লাভ হইল; একটী চিরপরিচিত সত্য নূতন আলোকে মনের নিকট উপস্থিত হইল। সেটা এই যে, কোনও জিনিসকে দূর হইতে দেখা ও তাহার কাছে গিয়া দেখার মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। পিপাসার সময় জল না পাইলে কি ভয়ানক কষ্ট হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। খুব পিপাসার পরে যদি দুই তিন ঘণ্টা জল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাহির হইতে মনে হয়, কষ্টটা কত ভয়ঙ্করই না হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেরূপ কোন কষ্টই হয় না। প্রথম প্রথম পিপাসার বেগটা খুব বেশী কষ্টকর বোধ হয়। কিন্তু ক্রমশঃ সে কষ্টের ভাবটা চলিয়া যায়; তার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জল খাইবার ইচ্ছাটা কিছু কিছু বর্ত্তমান থাকে, থাকিলেও ঐ অনুভূতিটা বিশেষরূপ কষ্টকর নহে। প্রথমতঃ, পিপাসার কষ্ট ও পরবর্ত্তী সেই কষ্টের নিবৃত্তি আমার বিবেচনায় এইরূপে সংঘটিত হয়:—রক্তের ভাগ যখন কম পড়ে, সেই সময় বরাবর কণ্ঠ-কূপদেশে (pharynx) পিপাসার অনুভূতি হয়। সে সময়ে খুব তৃষ্ণা পায়; সেই সময় ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইলে পিপাসার তৃপ্তির জন্ত যেটুকু জল খাওয়া দরকার তাহার অতিরিক্ত অনেক বেশী জল খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একটু একটু করিয়া কণ্ঠকূপকে আর্দ্র করিয়া জল পান করিতে থাকিলে অল্প জলেই তৃষ্ণা নিবারণ হইবে। পাকস্থলী হইতে জল রক্তে গিয়া এবং রক্ত হইতে কণ্ঠকূপে আসিতে কিছুক্ষণ দেরী হয়। এই কারণ ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইলে পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না। অথচ প্রচুর জল পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করিবে। পিপাসার সময়ে জল পান না করিলে রক্ত তাহার স্বাভাবিক মহাজন পাকস্থলীর নিকট হইতে জল পায় না। তখন সে রসকে নিজের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নিজের আয়তন সমান রাখে; রসও শরীরের কোষগুলি হইতে জল টানিয়া বাহির করিতে থাকে। এই সময় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় এবং শরীরকে খুব শুষ্ক বোধ হয়। শরীরে এই সময়ে ঘর্ম্ম কম হইতে থাকে; মুখে লালা কম বাহির হয়; প্রস্রাবেরও মাত্রা কম হয়। রস রক্তে আসিবার পর অনেকক্ষণ তৃষ্ণার তীব্রতা থাকে না, শরীরের জলভাগের এই সময়ে খুব হিসাবের সহিত খরচ আরম্ভ হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন তৃষ্ণা আসিবে, সেই তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করা চলিবে না, কারণ তাহার পর হইতেই শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া আসিবে; হৃৎপিণ্ড সম্যকরূপে নিজের কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। কলেরা রোগে শরীর হইতে এত অধিক মাত্রায় জল বাহির হইয়া তৃষ্ণা এত অধিক হইয়া পড়ে, সমস্ত শরীরে এত টান ধরে এবং পাকযন্ত্রের তখন জল লইয়া রক্তে প্রবেশ করাইবার ক্ষমতা এত কম পড়িয়া যায় যে, চিকিৎসকগণ তখন রক্তবাহী নলের মধ্য দিয়া লবণাক্ত জল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে বাধ্য হন। অবশ্য অন্ত উপায়ও আছে। এবং ইচ্ছা করিয়া জল গ্রহণ হইতে বিরত থাকার কালে ঐরূপ কোন উৎপাতই হইবে না। এবং পান করিবার অল্প কাল পরেই শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জলোপবাসের আমি আরও কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া-

ছিলাম। এই সকল পরীক্ষা কয়েকদিন ধরিয়া পানীয় জলের মাত্রা কমাইয়া কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত করা হইয়াছিল। কোন কোন পরীক্ষায় জলের মাত্রা পূর্ব্বের এক-অষ্টমাংশে আনা হইয়াছিল। এবং পরীক্ষাকাল এক সপ্তাহ হইতে এক মাস পর্য্যন্ত ছিল। এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য আমার মনের সমক্ষে উপনীত হইল। জলোপবাস কালে বিষ্ঠা ও মূত্রের পরিমাণ কমিয়া যায়। লালা-নিঃসরণ ও ঘর্ম্মের পরিমাণও অল্প হয়। ঘর্ম্মের অল্পতানিবন্ধন চর্ম্ম শুষ্ক থাকে ও উহাতে চর্ম্মরোগ সহজে জন্মিতে পারে না; তখন তৈল না মাখিলেও চর্ম্ম বেশ মসৃণ থাকে। অতিরিক্ত ঘর্ম্মোদ্গমে চর্ম্মস্থ sebaceous gland-এর দ্বারা যে তৈলময় পদার্থ নির্ম্মিত হয়, তাহা শরীর হইতে ধুইয়া যায়, কিন্তু অল্প ঘর্ম্মোৎপত্তি হইলে উক্ত তৈলময় পদার্থ চর্ম্মের উপরে জমিয়া উহাকে মসৃণ রাখে।

ঐ সময়ে শরীরের শীতাতপ সহ্য করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমার পূর্ব্বে অতি সামান্য কারণে সর্দ্দি লাগিত, কিন্তু ঐ সময়ে আমি অধিক পরিমাণ হিম লাগাইয়াছিলাম—অথচ সর্দ্দি হয় নাই, কিংবা কোনরূপ পীড়ার উৎপত্তি হয় নাই। এই পরীক্ষা গত বিহার-ভূমিকম্পে দ্বারবঙ্গে রাজনগরে অনুষ্ঠিত হয়। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা শীতকালে হিম ভয়ে ভীত হইয়া গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শশব্যস্ত ভাবে বাস করেন, তাঁহারা যদি নিজের প্রতিদিনের পানীয় জলের মাত্রা কমাইয়া এক তৃতীয়াংশে বা অর্দ্ধাংশে আনিতে পারেন, তাহা হইলে আর বদ্ধ ঘরে বাস করিয়া শরীরকে রোগক্লিষ্ট করিতে হইবে না—বিশেষ উপকার পাইবেন। এই প্রক্রিয়াটীকে অনেক বহুমূল্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল দিতে দেখিয়াছি।

জলের উপবাসের দ্বারা শরীরের শীতাতপ সহ্য করিবার ক্ষমতা কি প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শরীরের রক্তে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া রক্তের আয়তন বর্দ্ধিত হইলে, উহা হইতে জলীয়াংশ দ্বিবিধ উপায়ে বাহিরে যাইতে পারে। প্রথমতঃ, উহা রক্ত হইতে কোষগুলির মধ্যগত স্থানে যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উহা ঘর্ম্ম, মূত্র ও নিঃশ্বাসবায়ুর সহিত বাহিরে যায়। কোষ-মধ্যস্থ স্থানগুলি রসপূর্ণ থাকিলে দ্বিতীয় উপায়ের দ্বারা উহা বাহির হইয়া যাইবে। কোন কোন লোকের মূত্র-যন্ত্রের দ্বারা, কোন কোন লোকের ঘর্ম্ম-যন্ত্রের দ্বারা এবং কোন কোন লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্রদ্বারা অধিকতর মাত্রায় জল বাহির হইয়া যায়। যাহাদিগের অধিক ঘর্ম্ম হয়, তাহাদের অনেকের প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়। ইহার কারণ বুঝা শক্ত নহে। যে জল মূত্রের আকারে বাহির হয়, তাহা শরীর হইতে যে পরিমিত তাপ হরণ করে, সেই পরিমিত জল যদি ঘর্ম্মের আকারে বাহির হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী তাপ হরণ করিবে। এই শেষোক্ত উপায়ে অপহৃত তাপের পরিমাণ বহির্গত ঘর্ম্মের পরিমাণও সেই স্থানের আবহাওয়ার অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেই স্থলের বাতাসে যদি অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা হইলে শরীর হইতে ঘর্ম্ম দ্বারা অধিক তাপ অপহৃত হইবে। বাতাসে যদি জলীয় বাষ্প কম থাকে অর্থাৎ উহা শুষ্ক থাকে, ঘর্ম্ম যেমনই বাহির হয় উহা তেমনিই বাষ্পীভূত হইয়া শুকাইয়া যায়। কিন্তু আর্দ্র বায়ুতে উহা সহজে শুকাইতে পারে না। গাত্রস্থ বস্ত্রাদি ভিজাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করে। উহার ফলে শরীরের চারিদিক অপেক্ষাকৃত অধিক আর্দ্র বায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। আর্দ্র বায়ু শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা অনেক বেশী তাপ পরিচালন করে বলিয়া, আর্দ্র বায়ুতে শরীর হইতে অনেক বেশী তাপ বাহির হইয়া যায়। এই কারণেই হেমন্তে যত অধিক সর্দ্দি লাগে, খুব প্রবল শীতের সময় তত সহজে সর্দ্দি লাগে না। তাহার কারণ এই যে, প্রবল শীতের বায়ু শুষ্ক বলিয়া উহা শরীর হইতে অধিক পরিমাণ তাপ হরণ করিতে পারে না। কিন্তু হেমন্তের সময় বায়ুতে যথেষ্ট মাত্রায় বাষ্প থাকে। আর্দ্র বায়ুতে ঘর্ম্ম হইলে শারীরিক তাপ সহজেই অত্যধিক মাত্রায় বাহির হইয়া যায়। গিরিডি প্রভৃতি অঞ্চলের বায়ু শুষ্ক বলিয়া স্বাস্থ্যকর এবং বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানের বায়ু সেঁতা বলিয়াই অস্বাস্থ্যকর। সেঁতা স্থানের বাড়ীও ঐ কারণে অস্বাস্থ্যকর এবং যে সমস্ত বাটীর উঠানে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে জল ঢালা হয় এবং যেথায় সূর্য্য ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেরূপ স্থলও সেঁতা বলিয়া অস্বাস্থ্যকর। এই সকল কারণে দ্বিতল গৃহ অধিকতর স্বাস্থ্যকর এবং আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণাদি কেন উচ্চ করা আবশ্যক, তাহার অন্যতম কারণ এক্ষণে পাওয়া গেল।

আমরা আমাদের পানীয় জলের মাত্রা কম বেশী করিয়া যে আমাদের শরীরের তাপকে অল্প বা অধিক মাত্রায় বাহির করিয়া দিতে পারি, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বোঝা যাইতেছে। এই কারণেই শীতকালে লোকে স্বভাবতঃই কম জল পান করে ও গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃই অধিক জল পান করে এবং শীতপ্রধান দেশের লোকে স্বভাবতঃই উত্তেজক পদার্থ মিশ্রিত জল পান করে, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক বিশুদ্ধ জল পান করিতে অভ্যাস করিয়াছে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, যে-সকল ব্যক্তির সহসা ঠাণ্ডা লাগে, তাহাদের পক্ষে পানীয় জলের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হিতকর। এবং অন্য সকল লোকে যদি সপ্তাহে দুই একদিন জলের উপবাস দেয়, তবে তাহাদের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অন্য সকল রোগ হইতেও অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা বাড়িবে। প্রথম প্রথম তৃষ্ণার সময় জল পান না করিলে যেরূপ কষ্ট হইবে, পরবর্ত্তী সংযমের সময় সেরূপ কষ্ট হইবে না। শরীর ক্রমশঃ এ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে, রস হইতে রক্তের দিকের স্রোত তখন স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

তবে সকল ব্যক্তিকেই জল কম খাইবার ব্যবস্থা দেওয়া যায় না। অতিরিক্ত ভোজনের পর শরীরের খানিকটা অপ্রয়োজনীয় তাপ বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তন্নিমিত্ত প্রচুর জল পান করা প্রয়োজন হইতে পারে। এবং যাহারা প্রচুর পরিমাণে মাংসাদি, ডিম্ব-শ্বেতাংশসদৃশ খাদ্য (proteid) ব্যবহার করেন, তাঁহাদের শরীর হইতে উক্ত বিষখাদ্য ভোজনজনিত দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রচুর জল পান করা আবশ্যক।

উপবাস

উপবাস সম্বন্ধেও আমি পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাঁহাতে সুফল পাইয়াছি। উপবাস করিবার সময় যেরূপ কষ্ট, পরে আর সেরূপ কষ্ট হয় না। তবে উপবাস সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন। ম্যালেরিয়ার দেশে যাহাদের বাস, তাহাদের অনেকের পূর্ণ উপবাসে পীড়া হয়। আমার মতে পূর্ণ উপবাস না করিয়া সপ্তাহে একদিন যদি লোক সচরাচর যে পরিমিত অন্নজল গ্রহণ করে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করে, তবে তাহাদের শুধু ম্যালেরিয়া নহে, আরও বহুরোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

এই প্রবন্ধে আমি স্থলে স্থলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মহাশয়গণের প্রতিষ্ঠিত মতের সার সংকলন করিয়া সাধারণের উপযোগী ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সাধারণ কর্ত্তৃক পরীক্ষা দ্বারাই ইহার শেষ মীমাংসা হইতে পারে। সাধারণে যাহাতে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, তদ্‌বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে তাঁহাদের আপত্তি থাকিবার কিছুই নাই মনে হয়। কারণ (১ম) মতগুলি বিজ্ঞানসম্মত। (২য়) উহাদের অনুসরণে অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে। (৩য়) উহাদের অনুসরণে কোনওরূপ অপব্যয় নাই। (৪র্থ) উহাদের অনুসরণে কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা পরীক্ষা করিবেন, তাঁহারা যদি নিজেদের পরীক্ষার ফল আমাকে জানান, বা অন্য উপায়ে তাহা সাধারণের নিকট জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে একান্ত অনুগৃহীত হইব।

শরীরতত্ত্ব

…শরীরতত্ত্ববিদ্যাতে ভারতীয় ঋষিগণ অনন্যসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। শরীর মন ও বুদ্ধি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক ঋষিদিগের জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে—সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে। জীবন্ত মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রাণবায়ুর চলাচল অনুভব করিবার উপায় কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া এবং প্রথমতঃ প্রাণবায়ুকে উপলব্ধি করিয়া মানুষের মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত কি বস্তু এবং তাহাদের স্থান কোথায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় ঋষির শরীরতত্ত্বের জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ও সঠিক তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে এখনও বুঝিতে পারা যায়। অল্পবুদ্ধি মানুষকে কি করিয়া বুদ্ধিমান্ করিতে হয়, তাহার জ্ঞান একমাত্র ভারতীয় ঋষি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।…

নূতন কথামালা

—শ্রীশচীবিলাস সামন্ত

বহু পুরুষ ধরিয়া গাধা জাতি জম্বুদ্বীপের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে চরিয়া বেড়ায়, স্বাধীন বিচরণ, স্বাধীন চলাফেরা, কোথায়ও কোন অভাব নাই, কাহারও সঙ্গে কোনরূপ দ্বন্দ্ব করিবারও প্রয়োজন হয় না, কারণ ক্ষেতে পা বাড়াইলেই প্রচুর খাদ্য —সবুজ কচি ঘাস—লতাপাতা—ফল পেট ভরিয়া খাইতে পায়। হাতে তাহার প্রচুর সময়, কারণ খাওয়া ভিন্ন তাহার আর কোন কাজ নাই, সমস্ত দিন ধরিয়া ত আর খাওয়া যায় না, তাই অবসর সময় কি করিয়া কাটাইবে সেইটিই হয় সমস্যা।

গাধাদের সভা বসে। সভায় নানা রকম বিষয়ের আলাপ হয়। নানা যুক্তি-তর্ক হয়, তার পর যে যাহার ঘরে গিয়া ঘুমায়। গাধাদের মধ্যে এক দলের মনে সন্দেহ জাগে, তাহাদের এই সুখের জীবনই কি আদর্শ জীবন? এই দলের সবাই অল্পবয়স্ক তরুণ, ইহারা নিজেদের ভালমন্দ বুঝিতে পারে না। ইহাদের কথা শুনিয়া প্রবীণ গাধারা বলে, সুখের এবং শান্তির জীবনই ত আদর্শ। এই সুখ শান্তির জন্যই ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চিন্তা করিয়া আমাদের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার, এই ব্যবস্থা ভাল কি না। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের খাদ্য নষ্ট করিয়া তোমাদের গৃহাশ্রয় ভাঙ্গিয়া পরস্পর মারামারি করিয়া এই সুখশান্তি ধ্বংস করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার, তাহাতে আরও বেশি আনন্দ হয় কি না। আমরা তোমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিব না।

ইহা শুনিয়া তরুণ গাধার দল বলিল,—আচ্ছা আমরা পরীক্ষা করিয়াই দেখিব। আমাদের এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জীবন ভাল লাগিতেছে না, উর্ব্বর ভূমির ফসল-প্রাচুর্য্য—অযাচিত নদীজলধারা—হিংসাহীন অহেতুক স্বজাতি-প্রেম—ইহা আমাদের কাছে অসহন বোধ হইতেছে।

প্রবীণ দল বলিল,—তোমাদের যদি সেইরূপ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের নূতন পথে একবার যাত্রা করিয়া দেখ, হয়ত এই পথে তোমাদের অভিজ্ঞতা লাভ হইবে।

এ কথা শুনিয়া তরুণ গাধার দল মহা উৎসাহিত হইয়া আত্মধ্বংসের কাজে নিযুক্ত হইল।

প্রথমতঃ তাহারা দল করিয়া তাহাদের ক্ষেত নষ্ট করিবার কাজে লাগিল। তাহারা বলিল যে, ক্ষেত নিজ হইতে উর্ব্বর হইয়া আছে, যে ক্ষেত না চাহিতেই আমাদের খাদ্য যোগায়, সে ক্ষেত মুখ্য ভাবে বা গৌণ ভাবে আমাদের অপমান করিতেছে। আমরা ইহা চাই না। এই ক্ষেতের উর্ব্বরাশক্তি নষ্ট করিয়া আমরা আমাদের বুদ্ধিবলে এই ক্ষেত হইতে ফসল ফলাইব। ইহাতে আমাদের আত্মনির্ভরতা বাড়িবে, কাজ বাড়িবে এবং জীবনে বৈচিত্র্য বাড়িবে।

দেখিতে দেখিতে জম্বুদ্বীপের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল, বনস্পতির পাতা ডালপালা পুড়িয়া গেল; গাধারা যে আশ্রয়ে বাস করিত তাহাও তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। গর্দ্দভ-শিশুরা ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল, ক্ষুধায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, বৃদ্ধ গাধারা শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল কিন্তু কে তাহাদের কান্না শোনে—তাহাদের সকল আর্ত্তনাদ হাওয়ায় হাওয়ায় শূন্যে মিলাইয়া গেল।

চুপ করিয়া রহিল কেবল তরুণ গাধার দল। তাহাদের জীবনে কাজ বাড়িয়াছে, বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে, কিন্তু খাদ্যাভাবে দেহ শীর্ণ হইয়া আসিল। একজন বলিল,—ধ্বংসের কাজটা ত বেশ অনায়াসে সম্পন্ন হইল, কিন্তু আমরা বিবেচকের মত হাতে কিছু খাদ্য রাখিয়া কাজে নামিলেই ভাল করিতাম। আর একজন বলিল,—ওসব কথা এখন বলিয়া লাভ নাই। আমরা যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি, তাহার মধ্যে অনুতাপের স্থান নাই। আর অনুতাপ করিয়া লাভ কি? আর একজন রসিকতা করিয়া বলিল,—

"আমাদের মধ্যে তাপ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে অনুতাপের অবকাশও নাই।

এইরূপ বহু গাধাকে অনাহারে মারিয়া নিজদের কঠিনতম অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তরুণ গাধারা কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিল। তাহারা ভাবিয়া দেখিল যে, যে-খাদ্য তাহারা এতদিন খাইতেছিল, তাহা আগুনের সাহায্যে পুড়াইবার পর যে ছাই অবশিষ্ট রহিয়াছে উহা সেই খাদ্যেরই সারাংশ। যাহা অদাহ্য এবং অক্ষয়, খাঁটি সোনার মত তাহাই পড়িয়া আছে।

সুতরাং তাহারা ছাই খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

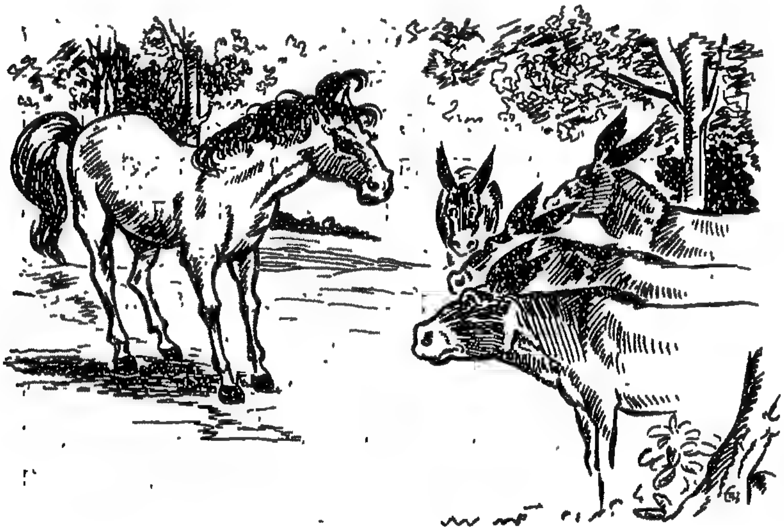

..একটি নূতন ধরণের প্রাণী গাধাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল...

এই ভাবে কিছুদিন কাটাইবার পর অনেকে মরিয়া গেল, যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, সমস্ত মাঠ সবুজে ছাইয়া গিয়াছে—দগ্ধ ক্ষেতের বুকে নব দূর্ব্বাদল অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহারা পরম উৎসাহে যে যত পারিল সেই ঘাস খাইয়া পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিল।

আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিল, প্রকৃতির কাছে তাহারা হার মানিয়াছে। তাহাদের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া তাহাদের বহু পরিশ্রমলব্ধ ভস্মরাশি ভেদ করিয়া আবার তৃণদল মাথা তুলিতেছে।

সকলে সমস্বরে কহিল,—প্রতিকার চাই!

সকলে মিলিয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু চিন্তা করা যত সহজ, উপায় বাহির করা তত সহজ নহে। প্রকৃতি বহুদিনের,বহু লক্ষ বৎসরের অভ্যস্ত কৌশলে গাধার বুদ্ধিকে হার মানাইয়াছে, গাধারা তাহা ভাবিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহাদের কেবলই মনে হইতে লাগিল, না, না, আমরা প্রকৃতির এই প্রভুত্ব কিছুতেই মানিব না।

তাহারা প্রতিদিন সভা করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই সবুজ ঘাস লুকাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। এক মাস যায়, দুই মাস যায়, তিন মাস যায়, ক্রমে বৎসর চলিয়া গেল, তবু তাহারা প্রকৃতিকে বশে আনিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে ছোট ঘাস বড় হইয়াছে—মাঠ ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একদিন সেই ঝোপের মধ্য হইতে একটি নূতন ধরণের প্রাণী গাধাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল। দেখিতে তাহাদেরই মত, অথচ কি বলিষ্ঠ, কি দ্রুতগতি এবং কি সুন্দর।

এক গাধা জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে? নূতন প্রাণী বলিল,—আমি ঘোড়া, আমি শ্বেতদ্বীপ হইতে এখানে আসিয়াছি।

আসিবার উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য, এখানকার ফসল নষ্ট করা।

আমরাও ত তাহাই চাই, কিন্তু কিছুতেই স্থায়ীভাবে নষ্ট করিতে পারিতেছি না। তোমার সাহায্য পাইলে হয় ত আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। উপায় কিছু আবিষ্কার করিয়াছ?

করিয়াছি বৈ কি। আমরা এমন উপায় আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা জমির ফলন-শক্তি নষ্ট করিতে অমোঘ—সেই অমোঘ শক্তির অধিকারী আমরা—সে এমন প্রবল শক্তি যে আমরা নিজেরাও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না।

এখানে কি সেই শক্তির তাড়নাতেই আসিয়াছ?

না, আরও উদ্দেশ্য আছে। প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, আমরা কিছু খাদ্য চাই—তোমাদের দেশ হইতে সেই খাদ্য আমরা স্বদেশে লইয়া যাইব।

তাহা হইলে ক্ষেতের ফসলকেও তোমরা মান্য কর ?

না মানিলে প্রাণ বাঁচে না। আমাদের দেশেও ফসল ফলিত, কিন্তু আমরা এমন এক শক্তি লাভ করিয়াছি, যাহা দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষেতের ফলন-শক্তি কমাইয়া ফেলিয়াছি, সেই শক্তির অংশ তোমাদিগকেও কিছু দিব। তোমরা সেই শক্তির অধিকারী হইলে নিজেরাই নিজেদের ক্ষেত নষ্ট করিতে পারিবে।

শুনিয়া ভয়ানক লোভ হইতেছে। আমরা সবাই মিলিয়া তোমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। দীক্ষা দাও গুরুদেব।

অধীর হইও না। আগে তোমাদের ক্ষেত হইতে কিছু খাদ্য দেশে চালান করি—সেখানে সবাই আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাহারা একটু শান্ত হইলে এইখানে আমাদের কাজ আরম্ভ করিব।

গাধারা তাহাতেই রাজি হইল। তাহারা সবাই মিলিয়া তাহাদের ক্ষেত হইতে ফসল ঘোড়ার দেশে পাঠাইয়া দিল। এবং তাহার মূল্যস্বরূপ ঘোড়ার নিকট হইতে সেই বিশেষ শক্তি লাভ করিতে লাগিল।

ঘোড়া বলিল,—এই শক্তির নাম আধুনিক বিজ্ঞান। জীবনের বৈচিত্র্য বাড়াইতে, কাজ বাড়াইতে, উত্তেজনা বাড়াইতে এবং আহার কমাইতে ইহার তুল্য জিনিস আর নাই। ইহার সাহায্যে বহুদিনের সত্য মিথ্যায় রূপান্তরিত হইবে—রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করিতে ইহার মত আর কিছুই নাই। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা ইহার গুণ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছি। যত দিন যাইতেছে, ততই দেখিতেছি, ইহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। তোমাদের দেশে যে খাদ্য-সন্ধানে আসিয়াছি, ইহার মূলে রহিয়াছে এই বিজ্ঞান। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে ফসল ফলিত তাহাতে আমরা মহা শান্তিতে ছিলাম। কিন্তু ঘোড়া হইয়া আমরা সেই শান্তি কেমন করিয়া সহ্য করি ? আমরা চিরদিন মাটির বুক খুঁড়িয়া খাদ্য সংগ্রহ করিব এবং মাত্র তাহাতেই তৃপ্ত থাকিব, ইহা হইতে পারে না। আমরা যে প্রকৃতি হইতে কত বড়, তাহা আমাদের নিজেদের কাছেই প্রমাণ করা দরকার। কাজেই বিজ্ঞান সাধনায় মন দিয়াছি। এই বিজ্ঞান আমাদিগকে দশ দিনের কাজ এক দিনে করিয়া দিতেছে—আমরা যেখানে এক মাসে যাইতাম বিজ্ঞান আমাদিগকে একদিনে সেখানে লইয়া যাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বে ব্যাধি ছিল না, এখন কথায় কথা। আমরা ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি অর্থাৎ প্রকৃতি এইভাবে আমাদের নিগ্রহ করিতেছে—কিন্তু আমরা কি তাহাতে নিরাশ হইয়াছি ? —মোটেই না। আগে ব্যাধি ছিল না, একটানা অসহ্য শান্তি ছিল, এখন ব্যাধির সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে হাজারে পৌঁছিয়াছে, আমরা তাহার প্রতিকার কল্পনা করিয়াছি দশ হাজার। আরও শুনিতে চাও ?

...গাধার অশান্তিকর শান্ত জীবনে বৈচিত্র্য আসে...

গাধা বলিল,—না, যেটুকু শুনিয়াছি ইহাতেই তোমাদের এই বিজ্ঞানের কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়াছে—এখন শিষ্যদিগকে তোমাদের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী কর—এবং যত শীঘ্র পার ততই আমাদের মঙ্গল।

ঘোড়া কহিল,—বৎস, অধীর হইও না। ধীরে ধীরে সব হইবে—শুধু আমাদের কাজের রীতিটি লক্ষ্য করিয়া যাও এবং যখন যাহা বলি তাহা শুনিয়া যাও।

গাধার দল তাহাতে রাজি হইল।

এই ভাবে ঘোড়াদের দেশে ফসল রপ্তানি এবং গাধাদের বিজ্ঞান শিক্ষা বিধিমত আরম্ভ হইয়া গেল।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়। গাধা বিজ্ঞানের নবলব্ধ শিক্ষায় উত্তেজিত ভাবে দিন কাটায়। বিজ্ঞানের প্রসার ক্ষেতের উপর প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। কলকারখানায় ক্ষেত ঢাকিয়া যায়। সবুজ তৃণদল শুকাইয়া তামাটে রং হইয়া যায়, তাহার উদ্ধত শির নত হইয়া মাটিতে মিশায়। গাধা শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করে আর আনন্দে জ্ঞানহারা হইয়া ভাবিতে থাকে তাহাদের উন্নতি হইতেছে। তাহারা যে প্রকৃতির উপর টেক্কা মারিবার সুযোগ পাইয়াছে!

বহু বৎসর এই ভাবে কাটিয়া যায়। ঘোড়াদের কারখানায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া গাধার অশান্তিকর শান্ত জীবনে বৈচিত্র্য আসে—সুখবিলাসে মন তার ভরিয়া ওঠে—মাটির গাধা আকাশের পথে উড়িয়া বেড়ায় আর ভাবে এই ত স্বর্গ!

আর ঘোড়া কি ভাবে? তাহা কেহ জানে না। ঘোড়া-গাধার মিলিত শক্তিতে সোনার জম্বুদ্বীপের বুকের যত সোনা, লোহা, তামা কলের শোষণে বাহির হইয়া আসে। আসে তেল, আসে ধাতু—আসে কয়লা। ফসলের খাদ্য মাটির বুক হইতে নিষ্কাশিত করিয়া ঘোড়া তাহার সাহায্যে আকাশে ওড়ে। পৃথিবীর বুকে যতগুলি পদার্থ থাকিলে পৃথিবীপৃষ্ঠে উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী পরিপুষ্ট প্রাণরসে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত—নিজের খেয়ালবশে তাহা বাহিরে টানিয়া আনিয়া মুঠা মুঠা ধূলার মত তাহা লইয়া খেলা করে। ঘোড়া ওঠে কলের গাড়িতে। সে নিজের জন্য তৈরী করে দশখানা কলের গাড়ি। তাহার শাবকের খেলার জন্য গাড়ি চাই। খেলার গাড়ি তৈরী হয় পঞ্চাশ খানা। পঞ্চাশখানা খেলার গাড়ি লইয়া অশ্বশাবক খেলা করে। কি সুন্দর তাহারা ছোটে! কি সুন্দর তাহারা ঘড় ঘড় করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়! খেলার গাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গা টিন আর ভাঙ্গা লোহা পৃথিবী উদ্বৃত্ত ভারের মত বহন করে।

কিন্তু এই ভাবে আর কত কাল কাটাইবে। ধীরে ধীরে জাতির প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসে—ঘোড়াজাতির এবং গাধাজাতির। মনে হয়, তাহারা বুঝি যথেষ্ট খাইতে পাইতেছে না। এতকাল মনে হইয়াছিল, খাদ্য স্থূল, খাদ্য ইতর, খাদ্য উন্নত জাতির অপকর্ষের পরিচয় বহন করে। তাই খাদ্য হইতে দূরে সরিয়া সে উৎকর্ষের পরিচয় দিতে চাহিয়াছিল—মনে হইয়াছিল ঘোড়াজীবন সার্থক করিতে হইলে আকাশে উড়িতে হইবে—সেই জন্য সে আকাশে উড়িবার কল আবিষ্কার করিল। যে মাটি তাহাকে খাদ্যের প্রলোভনে মাটিতে টানিয়া রাখে, সেই মাটির স্পর্শ হইতে দূরে গেলেই তাহার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহার সেই শূন্যচারী জীবনে সন্দেহের গুরুভার নামিয়া আসে—সে ব্যাকুল হইয়া মাটির দিকে তাকায়।

মাটির দিকে তাকাইয়া তাহার চিন্তাধারা ওলটপালট হইয়া যায়। সে মনে করে পৃথিবীতে ঘোড়া এবং গাধাজাতির বংশবৃদ্ধিই তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। তাহারা খাদ্য কমাইয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিল, বংশবৃদ্ধি না হইলে তাহাদের পরিকল্পনা সার্থক হইত। ঘোড়া এবং গাধা যত উন্নত হইবে, তাহাদের খাদ্য ততই কমিয়া যাইবে। অন্তকথায় খাদ্যবস্তু কমিয়া যাওয়াই তাহাদের উন্নতির একমাত্র লক্ষণ। সুতরাং ইহার একমাত্র প্রতিকার ঘোড়া এবং গাধার সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া।

এই মহাসত্য আবিষ্কারের পর হইতে নানা কৌশল করিয়া ঘোড়ায় ঘোড়ায়, ঘোড়ায় গাধায়, এবং গাধায় গাধায় দ্বন্দ্ব বাধাইবার কৌশল আবিষ্কার হইল। প্রায়ই যুদ্ধ বাধিতে লাগিল এবং প্রতিযুদ্ধে বহু প্রাণ সংহার ঘটিল। কিন্তু কিছুতেই সমস্যা সমাধান হয় না। এতকাল ধরিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে জাতীয় উন্নতির যে ধাপ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারই ধাক্কায় পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে—সেই সত্যটি কাহারও কাছে ধরা পড়িল না। সবাই ভুল পথে ভুল প্রতিকারের মিথ্যামোহে মত্ত হইল। গাধাজাতি একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে তাহারা ধীরে ধীরে ঘোড়াদের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যে শিষ্যত্ব চাহিয়াছিল তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা যে কোনদিন গুরুর আসনে বসিতে পারিবে এমন কল্পনা তাহারা প্রথমে করে নাই, কিন্তু আজ বহুকাল পরে

তাহারা মনে করিল ঘোড়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহারা ভাল করে নাই। কারণ তাহাদের নিজেদের দেশের সমস্ত ক্ষেত নষ্ট করিয়া তাহারা গাধাদের দেশের খাদ্য অংশ দেশে লইয়া যাইতেছে—না লইলে তাহারা বাঁচে না। যে খাদ্য স্বভাবতই গাধাদের দেশে ছিল, তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর গরু, ভেড়া এবং কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ান চলিত; কিন্তু উন্নতির উগ্র উৎসাহে গাধা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে। ঘোড়া তাহাকে তাহার এই কাজে সাহায্য করিয়াছে, কারণ উন্নতির মোহ তাহার এখনও যায় নাই। সে মনে করিয়াছিল, গাধারও উন্নতি সাধন করিতে পারিলে তাহারা ঘোড়ার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। আর গাধা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তাহার দ্বারা সকল দিকেই সাহায্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু গাধার দেশের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র যে এত সহজে নষ্ট হইতে পারে ঘোড়া এতখানি বুঁঝিতে পারে নাই। গাধাও প্রথম মনে করিয়াছিল ক্ষেতকে অবহেলা করিলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে, ঘোড়াও তাহাই মনে করিয়াছিল, সুতরাং দুই জনে সমান অপরাধী। গাধা কিন্তু নিজের অপরাধ ভুলিয়া যায়—সে মনে করে সমস্ত অপরাধ ঘোড়ার। তাহার মন হইতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এখনও দূর হয় নাই। শুধু সে মনে করে, সে এতকাল শিষ্য ছিল এখন গুরু হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। আর মনে করে, বিজ্ঞান শিক্ষা তাহার যথেষ্ট হইয়াছে এবং ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই সে এখন বিজ্ঞানের পথে যাত্রা করিতে পারিবে।

খাদ্যের দিকে তাহার দৃষ্টি এখনও ফেরে নাই। তাহার শুধু আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানকে সে একাই আয়ত্ত করিবে। কিন্তু গাধার দেশের এক বিরাট অংশ তরুণ গাধাদের এই চালচলন, রীতিনীতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে।

তাহারা জানে ইহারা যাহা করিতেছে তাহা তাহাদের ভালর জন্যই করিতেছে, কারণ তরুণ গাধারা তাহাদিগকে বরাবর এই কথাই বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাদের অন্ন ঠেকাইয়া রাখা যায় না। তাহারা বলে, আমরা খাদ্যাভাবে মারা যাইতেছি—আর কতকাল এই ভাবে দিন কাটাইব?

তরুণ গাধারা বলে, দেখিতেছ না, আমরা কি কাণ্ডই করিতেছি! আকাশে উড়িতেছি—মাটিতেও কলের ঘোড়ায় ছুটিতেছি—তোমাদের অনাহারজনিত বিবিধ ব্যাধির কত ঔষধ আবিষ্কার করিতেছি—আমাদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ভিটামিন। কিছু যদি না খাইতে পাও তাহা হইলে এই ভিটামিন তোমাদের বাঁচাইয়া রাখিবে। ভিটামিন এ-বি-সি-ডি-ই-এফ হইতে জেড পর্য্যন্ত যেদিন আবিষ্কার করিব, সেই দিন এ দেশে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে।

...প্রায়ই যুদ্ধ বাধিতে লাগিল এবং প্রতি যুদ্ধে বহু প্রাণী সংহার ঘটিল...

কিন্তু অজ্ঞ গাধা সম্প্রদায় এ সব কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারে না। বলে দোহাই তোমাদের, আমরা ভিটামিন চাই না—আমরা খাদ্যবস্তু চাই।

তরুণ গাধারা বলে, ইহাই ত শ্রেষ্ঠ খাদ্য। আমরা যেমন মাত্র কয়েক শত গাধা তোমাদের মত কোটি কোটি অজ্ঞ গাধা হইতে শ্রেষ্ঠ, তেমনি এই ভিটামিন সকল খাদ্যবস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ। আমাদিগকে দেখিয়াও কি তোমরা কিছু বুঝিতে পার না? আমরা যে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছি,

তাহাতে সেই বিদ্যার প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের অপেক্ষা কত উন্নত হইয়াছি। আমাদের উন্নতির সহায়ক সেই বিজ্ঞানের সাহায্যেই তোমাদের উন্নতি সাধন করিব।

আর কতদিনে করিবে—অজ্ঞ গাধারা হতাশ হইয়া বলে।

তরুণ গাধারা বলে, এখন একটি মাত্র বিষয়ে সব আটকাইয়া আছে। ঘোড়ারা আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া আছে, তাহাদিগকে এ দেশ হইতে বিদায় করিতে পারিলে আমরা আরও উন্নত হইব।

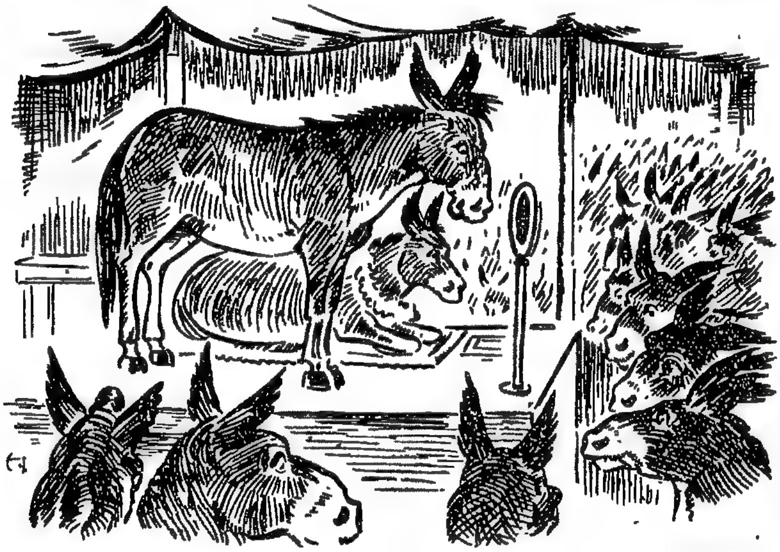

...তাহারা সভা করিয়া ঘোড়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ আনিল ...

অজ্ঞ গাধারা জিজ্ঞাসা করে, আমাদের কি হইবে?

তরুণ গাধারা বলে, তোমাদের জন্যই ত আমাদের এই দুঃসাধ্য-সাধন। ঘোড়াদের বিদায় করিতে পারিলে আমাদের আকাশ-যানের সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে, বিদ্যুতের আলোর জোর পঞ্চাশগুণ বাড়িবে, কলের ঘোড়ার সংখ্যা হইবে অগণিত।

অজ্ঞ ঘোড়ারা বলে, কিন্তু আমরা যে খাদ্য চাই, তাহার কথা ত কিছু বলিতেছ না।

তরুণ গাধারা বলে, কালে সব হইবে। আগে ঘোড়াদের বিদায় দিবার ব্যবস্থাটা করি।

অজ্ঞ গাধারা তাহা শুনিয়া অদৃষ্টে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া যায়।

ঘোড়াদের বিরুদ্ধে তরুণ গাধাদের অভিযান আরম্ভ হইতে দেরী হইল না। তাহারা সভা করিয়া ঘোড়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনিল। বলিল, আমরা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া দেশের শস্যভার লাঘব করিয়াছি এবং এই বিদ্যা আমাদের যথেষ্ট আয়ত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি, সুতরাং ঘোড়ার শিষ্যত্ব আমাদের আর চাই না। হে ঘোড়া, আমাদের হাতে আমাদের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দাও। শস্যভার লাঘব করিয়া যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটায় তোমরা আর ভাগ বসাইও না, উহা যৎসামান্য উহাতে আমাদেরই কুলায় না।

এই সভার মধ্যে একটি অজ্ঞ গাধা কি করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, শস্য কমিবার জন্য ত তোমরাই দায়ী। তোমরা—

কিন্তু ইহার কণ্ঠ হঠাৎ নীরব হইয়া গেল। দেখা গেল সভাস্থ গাধারা ইহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে।

সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে সভার কাজ চলিল। অজ্ঞ গাধার প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া এক তরুণ গাধা বক্তৃতা দিল। সে বলিল, খাদ্য আমাদের হাতে কমিয়াছে একথা সত্য, এবং ইহাও সত্য যে ইহাতে আমাদের অবস্থা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে খাদ্য হইতে বহু ঊর্দ্ধে অর্থাৎ স্থূলতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়াতেই আমাদের সার্থকতা। প্রচুর খাদ্য, প্রচুর শান্তি ইহা অসভ্য বর্ব্বরদের আদর্শ। ন্যূনতম খাদ্যে দেহটাকে কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে—আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি। দেহ জড় পদার্থ, দেহচর্চ্চায় জড়ের সাধনা, স্থূলের সাধনা, বস্তুর সাধনা। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের এই স্থূলত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে। আমরা মনের এবং আত্মার চর্চ্চা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কলের বাহনে, কলের শাসনে আমরা দেহকে আমাদের জীবন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছি। কোথায়ও

যাইতে হইলে দেহকে চালনা করিতে হয় না, আধুনিক যুগে ইহা অপেক্ষা বিস্ময় আর কি আছে। অজ্ঞ গাধারা আমাদের এই উন্নত অবস্থাটা ঠিক মত ধারণা করিতে পারিতেছে না—কিন্তু আমার বিশ্বাস উহাদের মধ্যে যদি বিজ্ঞান প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলে উহারাও ধীরে ধীরে আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।

এই সভার আবেদন নিবেদন এবং অভিযোগ শুনিয়া ঘোড়ারা বলিল, হে গাধা, তোমাদের অভিযোগের কোন হেতু নাই, কেন না, আমরা এবং তোমরা একই পথের পথিক, তোমরা যাহা চাও, আমরাও তাহা চাই। বিজ্ঞান চাহিয়াছিলাম; আমরা তাহা পাইয়াছি, তোমরা বিজ্ঞান চাহিয়াছিলে, তোমরা তাহা পাইয়াছ। এরূপ অবস্থায় আমরা চলিয়া গেলে তোমাদের কি সুবিধা হইবে? তোমরা আরও বিজ্ঞান প্রচার করিবে এবং তাহার ফলে তোমাদের শস্য আরও কমিয়া যাইবে। তোমরা কোটি কোটি অজ্ঞ গাধাকে যখন বিজ্ঞান-ধর্ম্মেই দীক্ষিত করিতে চাহ, তখন আমরা থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাহাই। বরঞ্চ আমরা থাকিলে বিজ্ঞানের প্রসার আরও দ্রুত হইবে। আমরা জানি ইহাতে আমাদেরও খাদ্য কমিয়া আসিবে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অবশ্যই কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারিব—ভিটামিন ত পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছি। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে তোমরা কোনও আন্দোলন করিও না, করিলে বিশেষ লাভ হইবে না। এ দেশে তোমরাও থাকিবে, আমরাও থাকিব, যদি মরি এক সঙ্গেই মরিব।

তাহা শুনিয়া গাধারা বলিল, সবই ত বুঝি, কিন্তু একটি জায়গায় আটকাইতেছে। অজ্ঞ গাধা-সমাজে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না, কারণ তোমাদিগকে গুরু বলিয়া মানিলে আমাদের সম্মানের হানি হয়।

ঘোড়ারা বলিল, আমরা যে তোমাদের গুরু ইহা ত সত্য ঘটনা, ইহা নূতন করিয়া মানিবার কি প্রয়োজন? সকলেই ইহা জানে, সুতরাং লজ্জা কোথায়?

গাধারা বলিল, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরা এবারে গুরু হইতে চাই। আমাদের জম্বুদ্বীপের গৌরব ফিরাইয়া আনিতে ইহা না হইলে চলিবে না। এই ভাবে তর্ক চলিতে লাগিল, কিন্তু ঘোড়াদের জম্বুদ্বীপ ছাড়িবার কোন আগ্রহই দেখা গেল না। তাহার কারণ, যে আত্মধ্বংসী বিদ্যা তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া পৃথিবীর সকল দেশের অবস্থা এক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। ইহা বিধাতার অভিশাপ। ঘোড়াজাতির উপর বিধাতা এই অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। যাহা কিছু জটিল এবং কূট তাহারই বুদ্ধিভ্রংশকারী আবর্ত্তে পড়িয়া এই জাতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্য সকল জাতি এক সঙ্গে বিধ্বস্ত হইবে। প্রাণীর জন্য যে সুখ এবং শান্তি বিধাতা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পৃথিবীতে দান করিয়াছেন, তাহার প্রতি ক্রম-অন্ধত্বই উন্নতি বলিয়া বর্ত্তমান প্রাণী মানিবে। যে প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া ধরণীর বুকে আহার্য্য সম্ভারনা সৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবা মাত্র হাত বাড়াইয়াই খাদ্য পাইয়াছে, সেই প্রাণী ধরণীর স্নেহপূর্ণ মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া বলিতেছে—উন্নতি করিতেছি।

কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়া এবং গাধার মধ্যে বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করিল। এবং তাহার বিষ সমগ্র জম্বুদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িল। অজ্ঞ গাধারা আবার দল ধরিয়া তরুণ গাধাদের কাছে আসিয়া বলিল, তোমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে দেখ। আমরা দিনে দিনে অনাহারে এবং ব্যাধিতে কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছি, এইবার সবংশে ধ্বংস হইয়া যাইব, আমাদের জন্য তোমরা কি করিতেছ? আমাদের জমি লইয়া তোমরা তাহার উপর তাণ্ডবনৃত্য করিতেছ, জমির চেহারা দেখিলে কান্না থামাইতে পারি না, তোমরা আমাদের এই ভাবে মারিবে? আর যে সহ্য করিতে পারি না।

তরুণ গাধারা বলিল, তোমাদের কান্না শুনিবার আমাদের সময় নাই। তোমরা কাঁদিতে আসিয়াছ, চিরকাল কাঁদ, ইতিমধ্যে আমরা যে মহৎ কাজে নিযুক্ত হইয়াছি তাহা সম্পন্ন করি।

অজ্ঞগণ বলিল, কি তোমাদের মহৎ কাজ?

তরুণরা বলিল, ঘোড়ার সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া দেশময় অশান্তি সৃষ্টি করা। এই অশান্তিই আমাদের মৃতদেহে

প্রাণ সঞ্চার করিবে, আমরা ঘোড়ার অধীন থাকিয়া প্রায় মৃত হইয়াই ত পড়িয়াছি। পার ত তোমরাও এই অশান্তি অভিযানে যোগ দাও, চাই খালি অশান্তি, খালি আগুন। এবং ধোঁয়া।

অজ্ঞেরা বলিল, এই কি তোমাদের মহৎ কাজ?

তরুণরা বলিল, হ্যাঁ, এই আমাদের মহৎ কাজ। তোমরা এই মহত্ত্বের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না তাহা জানি, তোমরা সবংশে ধ্বংস হইয়া যাইবে তাহাও জানি, তোমাদিগকে বাঁচাইব এমন সাধ্য আমাদের নাই। আর তোমাদিগকে বাঁচাইব এমন প্রবৃত্তি, অবসর এবং উৎসাহ আমাদের নাই। তোমাদের সংখ্যা বহু কোটি, আর আমরা মাত্র কয়েক হাজার। সুতরাং তোমরা মরিয়া গেলে আমরা হয়-ত আরাম পাইব। কিন্তু তবু বলি, তোমরা কোনরকমে বাঁচিয়া থাক, কারণ তোমাদিগকে বাঁচাইব এই কথাটি আমাদের কাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে আমাদের বিবেক বড় যন্ত্রণা দেয়। আমরা যাহা কিছু করিতেছি তাহা যে তোমাদেরই জন্য করিতেছি, এই কথাটা আমাদের সর্ব্বদা বলা দরকার। ঘোড়ার সঙ্গে বিরোধ করিতে এই কথাটি আমাদের বড়ই সাহায্য করিতেছে। তাহাদিগকে আমরা বলিতেছি, তোমরা এদেশ ছাড়িয়া যাও, নইলে কোটি কোটি অজ্ঞ অন্ধ গাধা অনাহারে মারা যাইবে। এখন বুঝিতে পারিলে, তোমাদের এই অসহায় অবস্থা আমাদের কত প্রেরণা, কত সুযোগ দান করিতেছে?

অজ্ঞ গাধাদের মুখে কথা নাই। তাহা দেখিয়া তরুণরা আবার বলিতে লাগিল, আশা করি আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছ? তোমরা যে না খাইয়াও বাঁচিয়া আছ, ইহাতে তোমাদের চরিত্রের একটি মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া একটা কর্ত্তব্যবোধও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা যে সাধনায় মত্ত হইয়াছি, আমাদেরই স্বজাতি হিসাবে তাহা তোমাদের সমর্থন করা কর্ত্তব্য। এবং আমাদের বিশ্বাস তোমরা শুধু আমাদের মহৎ কাজে সাহায্য করিবে বলিয়াই এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগে নিযুক্ত হইয়াছ। এই আত্মত্যাগ সত্যই মহৎ। ভগবান্ তোমাদের আত্মার সদ্গতি করুন।

এ কথায় অজ্ঞ গাধারা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহাদের সত্যই আর কিছু বলিবার নাই।

তরুণ গাধারা তাহা দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল এবং অবিলম্বে ঘোড়াদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এই বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব এই বিরোধের পটভূমিতে ফুটিয়া উঠিবে—তাহাদের মান-সম্মান, প্রতিপত্তি। ইত্যবসরে কোটি কোটি অজ্ঞ গাধা অনাহারে শুকাইয়া মরিবে। এমন শক্তি তাহাদের নাই যাহাদ্বারা আবার তাহারা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের খাদ্য সংস্থান করিতে পারে। তরুণ গাধারা তাহাদের ক্ষেত নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাদের মাতৃরূপা জন্মভূমি দানবীয় যন্ত্র-শক্তির বিষোদ্গারী নিঃশ্বাসে শক্তি-হীনা হইয়া পড়িয়াছে। কে তাহাদের এখন রক্ষা করিবে? এখনও হয়ত সময় আছে, কিন্তু উদ্ধত তরুণদের উগ্র অহঙ্কারের মুখে কোন্ শক্তিমান্ আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবে?

সুতরাং বর্ষ-বর্ষ ধরিয়া চলিবে যন্ত্রে-যন্ত্রে বিরোধ, তাহার শ্রবণ বধিরকারী শব্দ-বিভ্রান্তির মধ্যে অত্যাচারি-তের ক্রন্দনধ্বনি কেহ শুনিতে পাইবে না। তাহারা আজ মূক, তাহারা আজ হৃতশক্তি, হৃতগৌরব, নতশির। কে তাহাদের বাঁচাইবে, আর কে বাঁচাইবে এই আত্ম-ধ্বংসী উদ্ধত তরুণদের?

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

২৪

মাতা বুঝাইয়া বলিলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে এক বাড়ীতে এক সংসারভুক্ত হইয়া থাকাই রেজিনা সুবিধা মনে করিল। একশত করিয়া টাকা মাসে তাঁহাদের দিবে; ধীরেশের খরচ পাঠাইয়া বাকী যাহা রাখিতে পারে, তাহার দ্বারা নিজের অন্যান্য খরচ চালাইবে। মাতার এই প্রস্তাবও রেজিনা অসঙ্গত মনে করিল না। কিন্তু ভিক্টর কি করিবে? অমার্জ্জনীয় যে অপরাধ সে করিয়াছে, তার পর এক সংসারে তাহার সঙ্গে থাকিতে প্রাণান্তেও রেজিনা রাজি নয়। অপ্রিয় এরূপ ঘটনা একত্র থাকিলে আরও অনেক ঘটিবে। তা ভিক্টর বরং তার ফ্ল্যাটেই যেমন ছিল, তাই থাকিবে। বহু বৎসর যাবৎই ত সে তাঁহাদের ছাড়িয়া পৃথক্ ভাবে আছে, আজ তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন বলিয়া একসঙ্গে আসিয়া নাই থাকিল। হাজার হইলেও সে বয়স্ক পুত্র, তার খাতিরে কন্যা রেজিনাকে কিছু আর পৃথক্ ভাবে থাকিতে তাঁহারা দিতে পারেন না। তার পর সকলের বড় কথা, রেজিনার নিকট হইতে মাসিক একশত করিয়া টাকা তাঁহারা পাইতেছেন। সে ত তাঁহাদের গলাতেই ছিল, বিবাহ না হইলে তাই থাকিত, খরচটাও চালাইতে হইত। বিবাহ করিয়াছে বলিয়া খরচ আর কতই তার জন্য বাড়িবে? ভাল একটা 'বেডরুম্' আর পৃথক্ একটা 'ওয়ার্ড-রোব' (ward robe-পোষাকের ঘর) সে চাহিতে পারে। তেমন তার কাপড়চোপড় ইত্যাদির ব্যয় নিজেই সে চালাইবে; হাত খরচ বলিয়াও তুলিয়া কিছু দিতে হইবে না। ড্রয়িং-রুম্ একটাতেই দুজনের চলিবে; maid (খাস পরিচারিকা) একজনেই দুজনের কাজ বেশ করিতে পারিবে। কাজই এমন বা কি? না হয় রেজিনার maid বলিয়াই তাহাকে রাখিবেন। ধরিতে গেলে ঐ একশত টাকাই উপরি একটা আয় তাঁহাদের হইবে। ইয়োরোপ ঘুরিয়া আসিবার পর এরূপ একটা আয়ের দরকারও তাঁহাদের বড় হইয়া পড়িয়াছে। আর ভিক্টর আসিয়া থাকিলে একটি পয়সা সাহায্য সে করিত না। খরচই বরং অনেক বাড়িয়া যাইত। মাসে মাসে তার পেগ-সিগারেই কি কম টাকা উড়িয়া যাইত? তার ভাগী আবার বন্ধুবান্ধবও কত! যখন তখন হয় ত আসিয়া জুটিত। তাদের reception-এর (অভ্যর্থনার) জন্য আলাদা একটা ঘরই হয় ত সে চাহিত। না, কাজ নাই। তার অপেক্ষা রেজিনাকে লইয়া থাকাই তাঁহাদের অনেক ভাল। খরচ কম, উপরি আবার একটা আয়ও তাহার সঙ্গে আসিতেছে। তবে হাঁ, সে পুত্র ত বটে, মধ্যে মধ্যে আহারে তকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, দুই এক দিন কখনও "গেষ্ট" (guest অভ্যাগত) ভাবে আসিয়াও বাড়ীতে থাকিতে পারে। ইহতে রেজিনার আপত্তি বোধ হয় হইবে না। রেজিনাও জানাইল, বিশেষ আপত্তি তাহার নাই; কথাটা শোভনও তাহার পক্ষে হইবে না। তবে কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে ভিক্টর যেন সংযত হইয়া চলে। মাতাও যেন এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান তাহাকে করিয়া দেন।

সরকার সাহেব আসিয়া জানাইলেন, এ মাসের বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে; আফিস হইতেই মাসের প্রথম ভাগেই মাসের ভাড়াটা দেওয়া হয়। মাস কাবারের আর সাত দিন বাকী আছে, এই কয়দিনের মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া দিলে এক মাসের নোটিসের দাবী বাড়ীওয়ালা করিবে না। জানকীনাথ বাবু এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রেজিনা একটু কাগজে লিখিয়া মীনাকে জানাইল, ৩০শে তারিখে বাড়ী তাহাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইতি মধ্যে ব্যবস্থা যাহা হয় একটা করিয়া তাহাকে লইতে হইবে। এ বিষয়ে কোনও help (সাহায্য) সে তাহাকে করিতে অসমর্থ। তবে এ কয়দিন আহারাদি মীনা তাহাদের সঙ্গেই করিতে পারে। সেটা রেজিনা grudge (আপত্তি) করিবে না, বরং খুসী মনেই তাহাদের guest (অতিথি) হইয়া তাহাদের সঙ্গে একত্রে আহারে তাহাকে আহ্বান সে করিতেছে। মীনা উত্তরে জানাইল, তাহার ব্যবস্থা

যাহা হয় সে এই সপ্তাহ মধ্যেই করিয়া লইবে। রেজিনার কোনও সহায়তা তাহাতে প্রয়োজন হইবে না। রেজিনার সাহায্যও সে গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহার আহারাদির ব্যবস্থা তাহার পরিচারিকার সাহায্যে নিজেই সে করিয়া লইবে। আগামী ৩০শে তারিখ পর্য্যন্ত এ বাড়ী তাহার পিতারই বটে। সুতরাং এ কয়দিন এ গৃহে থাকিয়া তাহার আহারাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সে করিয়া লইতে পারে।

দিন দুই পরে সকালে একদিন অনুতোষ আসিয়া জানাইল, মিস্ মোকার্জ্জির সঙ্গে সে একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। বেয়ারা একটি ঘরে তাহাকে বসাইয়া সংবাদ দিল। মীনা নামিয়া আসিল।

"এই যে আসুন। নমস্কার। ভাল আছেন আপনারা অনু বাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি আছি ভালই। তবে জানকীনাথ বাবু পরশু থেকে বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নিজে আসতে পারলেন না, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। তা আপনার শরীর ভাল ত?"

"এই চলে যাচ্ছে এক রকম। তা বসুন। হাঁ, কি অসুখ হয়েছে তাঁর?"

"বেশী কিছু নয়। এই জ্বর আর সর্দ্দিকাশি কিছু আছে। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে। তাই আমাকে ডেকে বলে দিলেন—"

"কি বলুন।"

বলিয়া একখানি চেয়ারে মীনা বসিল। অনুতোষও আর একখানি চেয়ার একটু টানিয়া লইয়া সম্মুখের ছোট টেবিলটির পাশে আসিয়া বসিল।

"হাঁ, তা হলে বলুন তিনি কি বলে পাঠিয়েছেন।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আরও একটু কাছে সরিয়া কিছু মৃদুস্বরে অনুতোষ কহিল, "আমরা সব শুনেছি মিস্ মোকার্জ্জি।"

"শুনেছেন? ও!" মুখ খানি লজ্জায় কেমন আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু থমকিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "তা কি করে শুনলেন? আমি ত—"

"না, আপনি কিছু জানান নি। তবে মিষ্টার সরকার মোটামুটি জানকীনাথ বাবুকে জানিয়েছেন, কি বন্দোবস্ত মিসেস মোকার্জ্জি আপাততঃ তাঁর সম্বন্ধে করতে চান। কথা প্রসঙ্গে এটা বোঝা গেল আপনার ভার নিতে তিনি প্রস্তুত নন। তার পর আপনার চাকরাণী এলোকেশীও গিয়ে তাঁর বৌ-ঠাকরুণকে খুঁটিনাটি অনেক কথা বলেছে।"

"ও! হাঁ, একটু বসুন আপনি, আসছি।" বলিয়াই হঠাৎ উঠিয়া মীনা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বুক ভাঙ্গিয়া চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল, সামলাইতেই পারিতেছিল না। নিকটেই একটা বাথরুমে প্রবেশ করিয়া চোখ-মুখ ধুইয়া আঁচলে বেশ করিয়া মুছিয়া ফিরিয়া আসিল। অনুতোষ গভীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, চক্ষু ছুটি তাহারও আর্দ্র হইয়া উঠিল। রুমাল বাহির করিয়া মুছিয়া ফেলিল।

মুখে একটু হাসি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়া মীনা কহিল, "তা শুনেছেন ত সব। কি আর করব? ভারটা যদি ওঁরা না নিতে চান—"

"না নিয়ে পারেন না। পিতার গৃহে পিতৃ-সম্পত্তি থেকে প্রতিপালিত হবার একটা দাবী অবিবাহিতা কন্যার আছে।"

একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মীনা উত্তর করিল, "পিতার গৃহ ব'লেই যে-কোনও যায়গা আমার নাই।"

"তাঁর ওয়ারেসরা যেখানে থাকবেন সেইটেই এখন আপনার পিতৃগৃহ। আর সে গৃহের খরচ-পত্রও সব চলবে আপনার পিতৃ-সম্পত্তির আয় থেকে।"

"কিন্তু মালিক ত দাদা, আর ঘরের কর্ত্রীও না কি রেজিনা। তা সে যদি তার সে ঘরে আমাকে না রাখতে চায়—"

"একটা ব্যবস্থা অন্ততঃ আপনার জন্য করতে হবে, খরচ-পত্রও তার চালাতে হবে।"

"সে বলে, এ আয় থেকে সেটা সে চালাতে পাবে না।"

"আপনার দাদা অন্ততঃ সেটা বলতে পাবেন না। আর ব'লেও—"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "বাবা তাকে হয় ত আ[illegible] করতে পাবেন। কিন্তু কি-করে করবেন?"

অনুতোষ উত্তর করিল, "সহজে না রাজি হলে [illegible] তার আছে।"

চকিতে মীনা অনুতোষের মুখের দিকে চাহিল। চোখ মুখ ভরিয়া যেমন একটা রক্তজ্বালা তাহার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। লজ্জায় মীনা মুখখানি নত করিল, আঙুলে বসন প্রান্ত কুঁচকাইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আছে ত আদালতের আশ্রয়। তা, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা মামলা-মোকদ্দমা করতে যাওয়া, সেটা কি ভাল হবে? আছেনও তিনি দূর সেই বিলেতে।"

অনুতোষ কি একটু ভাবিয়া কহিল, "আপনার দাদাকে কোনও চিঠি লিখেছেন আপনি?"

"না লিখি নি কিছু। লিখতে চাইও না। রেজিনাই যা হয় লিখবে। দেখি তিনি কি বলেন।"

অনুতোষ কহিল, "জানকী বাবুও লিখবেন বলেছেন। তা এই সব চিঠি চাপাচাপিতে একটা মীমাংসা কিছু করে নিতে তিন-চারটে মাস অন্ততঃ কেটে যাবে। এদিকে এই বাড়ী ছেড়ে তিন চার দিনের ভেতরই একটা ব্যবস্থা যা হয় আপনাকে করে নিতে হবে। আর খরচও তার চালাতে হবে। জানকীনাথ বাবু তাই বলছেন—"

"কি?"

"কলেজ যদ্দিন না খোলে, মোকার্জ্জি সাহেবের কোনও বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে আপনি থাকুন। বন্দোবস্ত আমরাই করে দেব। কলেজ খুল্লে হোষ্টেলে গিয়ে থাকবেন। খরচটা আফিস থেকে তিনি চালিয়ে দেবেন। মাসে, ধরুন, পঞ্চাশ টাকা হলে বোধ হয় চলতে পারে।"

"তা পারে। কিন্তু কি করে তিনি এটা দেবেন? ওদের ঐ টাকা থেকে কেটে?"

"না। আলাদা একটা চার্জ্জ ধ'রে।"

"সেটা কি তিনি পারেন? দাদার মত না নিয়ে?"

"সে দায়িত্ব তিনি নিতে প্রস্তুত। চিঠিতে তাঁকে সব জানাচ্ছেন। অমত তাঁর হবার কোনও কারণ নেই। আর যদি হয়ই, সেটা উনি গ্রাহ্যই করবেন না বলেছেন।"

"কিন্তু রেজিনা হুলুস্থুল করবে। জানতেও তারা সব পারবে। মিষ্টার সরকার ত দাদার পক্ষে হিসেব-পত্র গিয়ে মাঝে মাঝে দেখবেন। টাকা বেশী কিছু দেওয়া সম্ভব হলে নিজে সেটা রেজিনা চাইবে। দাদাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। শুনছি, সর্ব্বদাই বলছে সামান্য এই টাকায় তার চলতেই পারে না। দাদাকে গাল মন্দও অনেক দিচ্ছে। এও না কি বলছে ঠকিয়ে তাকে বিয়ে করে সে তার সর্ব্বনাশ করেছে। এলোকেশী এসে যা শোনে সব বলে। আমারও কানে কিছু কিছু যায়।"

"হুঁ। এলোকেশী বোধ হয় লুকিয়েও ওদের কথা সব শোনে। জানকী বাবুর বাড়ীতে গিয়েও এমন অনেক বলেছে—"

বলিতে বলিতে অনুতোষ একটু হাসিল।

"তা সে যাক। এখন—সে উনি যাই বলুন—"

মীনা কহিল, "তাতেই দাদাকে বাধ্য হতে হবে। মন ইচ্ছা যাই থাক্ ওদের জিদ তিনি এড়াতে পারবেন না। মেয়ে মেয়ে চিঠি যাবে, যেমন মেয়ে তেমনি বাপ মা সবাই তাঁকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলবে। শেষে হয় ত তাঁর খরচ থেকেই টাকা কেটে রাখতে চাইবে। আপনাদেরও জ্বালাতন কম করবে না। দাদাও শেষে স্পষ্ট আপত্তিই হয় ত জানাবেন।"

"সেটা জানকী বাবুই তাঁর সঙ্গে বুঝে নেবেন। আপনি কেন অত ভাবছেন?"

মীনা উত্তর করিল, "আমাকে নিয়ে দাদার এত বড় অশান্তি হয়, এটা আমি চাইনে। পরীক্ষার সময় এসেছে, ক্ষতিও যথেষ্ট হবে। হয় ত পাশ করেই বেরোতে পারবেন না। আবার আপনাদের সঙ্গে বড় একটা বিরোধ হবে। এরাও জ্বালাতন কম করবে না। অবিরত অফিসে গিয়ে গোলমাল করবে। মিষ্টার সরকার কেবল নয়, রেজিনা নিজেও গিয়ে আপনাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবে। সে তা পারে। দেখেন নি তার রকম-সকম, আর তার সেই কথা-বার্ত্তার ভঙ্গী।"

একটু হাসিয়া অনুতোষ কহিল, "বাইরে থেকেই পরিচয় যা পাচ্ছি তাই যথেষ্ট। যা বলছেন, সেটা সম্ভব বটে।"

"তা হলে কি করতে পারবেন আপনারা? কোন্ ভরসায় এই ব্যবস্থাই বা করতে চাইছেন? গোলমালে কাজকর্ম্মের ক্ষতি হবে। ফার্ম্মটাই শেষে গোল্লায় যাবে।"

"সেটা হবে না। হতেও দেব না। আমরাও ত ও-থেকেই যা হ'ক দু পয়সা করে খাচ্ছি। আর ওদের এই opposition (বাধা)—তা সেটা বোধ হয় আমরা meet (অতিক্রম) করতে পারব।"

দৃঢ়ভাবে মীনা তখন কহিল, "না না, অতটা অশান্তি আমি সবার ঘটাতে চাই না। ও সব কল্পনা, আপনারা ছেড়ে দিন। প্রাণান্তেও একটি পয়সা আমি নেব না, যদ্দিন না দাদা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দভাবে আমাকে কিছু দিতে পারেন। সেটা সম্ভবও যদি হয়, তিনি ফিরে আসবার আগে হবে না।"

"কিন্তু তত দিন আপনার খরচটা—"

"কটা মাস আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।"

বিস্ময়ে অনুতোষ মুখ তুলিয়া চাহিল। কেমন একটা সঙ্কোচে ঈষৎ লালিম মুখখানি মীনা এক দিকে ফিরাইয়া লইল।

"পারবেন? ওঃ! তা হলে আপনার নিজের হাতে—"

"সম্বল যা আছে, কয়টা মাস বেশ চলবে। তারপর—সে তখন যা হয় ভাবা যাবে। আপাততঃ আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

অনুতোষ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

যতদূর সে জানিত, বাঁধা নিয়মে হাত-খরচ বলিয়া মাসে মাসে কন্যাকে মোকার্জ্জি সাহেব কিছু দিতেন না। তার প্রয়োজন যাহা সব নিজেই চালাইতেন, নগদ টাকা সামান্য যাহা কিছু যখন দরকার হইত, মীনা তখন চাহিয়া লইত। তাহা হইতে বাঁচাইয়া এমন কিছু তহবিল তার হাতে সে জমাইতে পারে না, যাহাতে দুই-চার-ছ'মাস সমস্ত খরচ তার চলিয়া যাইতে পারে। এরূপ ভাবে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমাইয়া নিজের একটা তহবিল করিবার মত হিসাবের বুদ্ধিও মীনার কখনও ছিল বলিয়া তাঁর মনে হইল না। সে ধাতুরই মেয়ে সে নয়। তবে গহনাপত্র কিছু আছে। তবে কি তাই বিক্রয় করিয়া মীনা এখন তার উদরান্নের সম্বল সংগ্রহ করিবে? কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গভীর একটি নিঃশ্বাস অনুতোষ ত্যাগ করিল। মীনাও এই দৃষ্টির সম্মুখে বড় সঙ্কুচিত বোধ করিতেছিল। নিঃশ্বাসের শব্দটিও তার কানে গেল। অনুতোষ কি ভাবিতেছে সেটা সে বুঝিল। কিন্তু কি সে বলিবে? অনুতোষের অনুমান যে সত্য। আর সত্য হউক মিথ্যা হউক, এই বিষয় লইয়া অনুতোষের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনাই সে কিছু করিতে পারে না।

অনুতোষ শেষে কহিল, "তাহ'লে হোষ্টেলে গিয়েই ত থাকবেন, এই কলেজটা খুলবার পর? এখুনি তবে একটা seat (স্থান)—"

"না, হোষ্টেলে থাকা সম্ভব হবে না অনুবাবু।"

"সম্ভব হবে না—অবিশ্যি hostel lifeটা (হোষ্টেলে থাকাটা) অভ্যেস আপনার নাই, তেমন comfortable (সুখকর) আপনার পক্ষে হবে না। তবে একা আলাদা একটা establishtment (বাসা) করে কেবল ঐ এলোকেশীকে নিয়ে থাকাটা—"

"সেটা খুব সুবিধে হবে না জানি। খরচও অনেক বেশী পড়বে। নিজের আরাম কিসে বেশী হবে সেটা ভাববারই সময় আজ আমার নয়। তবে—তবে—হোষ্টেলে থাকা যাবে না। আমি—আমি—"

"কেন, কি হয়েছে? থাকা যাবে না? কেন যাবে না? বাধা কি?"

একদিকে একটু ঘুরিয়া নত মুখে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে মীনা শেষে কহিল, "বোম্বে থেকে ফিরে এসেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। মনে—মনে হয়েছিল, দাদার নতুন এই সংসারের চাইতে হোষ্টেলে থাকাই আমার পক্ষে বোধ হয় ভাল হবে। তা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানিয়েছেন, হোষ্টেলে অন্য অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে থাকতে আমাকে তাঁরা দিতে পারেন না।"

"পারেন না? সে কি? কেন, কেন পারেন না?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ কোনও মতে একটু মুক্ত করিয়া মীনা কহিল, "কেবল—কেবল তাই নয়। জানিয়েছেন—জানিয়েছেন—কলেজেই আমাকে আর রাখা হবে কি না, সেটা—সেটা—ছুটীর পর কমিটী—"

আর পারিল না, দুই হাতে ঢাকিয়া মুখখানি মীনা চেয়ারের পিছনে চাপিয়া ধরিল।

ত্রস্তে অনুতোষ উঠিয়া দাঁড়াইল। নিকটে একটু অগ্রসর হইতে হইতেই থামিয়া টেবিলটির উপরে হাত খানি রাখিল; কোনও মতে একটু আত্মসম্বরণ করিয়া শেষে কহিল, "অত অধীর হবেন না মিস্ মোকার্জ্জি! স্থির হন, স্থির হন। আমি—আমি—আপনার দাদার মত, আপনার পিতার অনুগ্রহেই প্রতিপালিত। পড়িয়েছিও আপনাকে অনেক

দিন। ছোট বোনটির মত অনেক আবদারও তখন করেছেন। তারপর কাজকর্ম্ম উপলক্ষে বাড়ীতে যখন এসেছি, নিঃসঙ্কোচে অতি সরল ভাবেই আপন ভাইটির মত আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছেন, আদর আপ্যায়নও কত করেছেন। তেমনই আপনার আপন ভাই—অতি বড় একজন বান্ধবের—মতই আমাকে আজ দেখুন। খুলে সব বলুন, কি হয়েছে, কেন তাঁরা এমন রূঢ় একটা জবাব আপনাকে দিলেন। বুঝতে পারছেন না, মিস্ মোকার্জ্জি, আপনার এই অপমানে—আর—আর—চোখের সামনে আপনাকে এই রকম অধীর দেখে কত ব্যথিত আমি হচ্ছি।"

অনুতোষের কণ্ঠস্বরও কিছু কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। থামিয়া আর্দ্র চক্ষু দুটি রুমালে মুছিয়া সরিয়া গিয়া নিজের আসনে আবার বসিল।

কথাগুলি মীনারও বড় মিঠা লাগিল। বেশ একটু সান্ত্বনা—কিছু বল-ভরসাও মনে যেন সে পাইল। একটু শান্ত হইয়া চক্ষু দুটি মুছিয়া সোজা হইয়া তখন বসিল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "বলতে আপনাকে লজ্জা নেই কিছু, কাকেই বা আর বলব? সত্যি আজ আপনার—এই এই - আপনাদের মত আপন জন কেউ আমার নেই। বাবা নেই, দাদা বিদেশী, বউ বাড়ী থেকেই বের করে দিল।"

"থাক্ থাক্! ওসব কথা আর কেন তুলছেন? কেন মনটাকে এমনি করে ব্যথা দিচ্ছেন? যা হবার হয়েছে, উপায় ত নেই। জানকীনাথ বাবু রয়েছেন, আপনার পিতার সহযোগী, বন্ধু, বড় স্নেহও আপনাকে করেন। মনে করবেন উনিই এখন আপনার পিতা। আর ধীরেশ বাবু যদি আপনার দিকে ফিরে সত্যি নাই চান, জানবেন—দরদী আর একজন ভাই-ই আমি আপনার থাকব।"

"নমস্কার! ওঁকেও আমার নমস্কার জানাবেন। হাঁ, সত্যি আপনাদের কাছে লজ্জা আমার কিছু নেই। করেই বা লাভ কি? দু'দিন বাদে সবাই জানবে, সবাই বলাবলি করবে। এ দাগা আমার মুখে পড়বেই। তা আপনি ত সব জানেন, ঐ যে ফিল্মে ছবি দিয়েছিলাম, রোজই বহু সিনেমার ছবি উঠছে, নানা রকম সব পোষ্টার রাস্তায় বেরোয়, এখনও বেরোচ্ছে—"

"ও! বুঝতে পেরেছি। তাহ'লে কলেজে নাম রাখতেও কমিটী বোধ হয় আপত্তি করবেন?"

"সম্ভব। সম্ভব কেন—নিশ্চিতই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে তৈরী যদি করে নিতে পারি, প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেট ভাবে বি-এ পরীক্ষাটা দেবার চেষ্টা করব। হাঁ, সেটারও কি আপত্তির কোনও কথা উঠবে?"

একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অনুতোষ কহিল, "কারণ ত কিছু দেখতে পাচ্ছি নি। তা আপনি তৈরী হন, সেটা ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।"

মীনা কহিল, "এক একবার ভাবি পাশ করেই বা কি হবে? কাজকর্ম্ম করেই অবশ্যি আমাকে খেতে হবে। কিন্তু কোনও মেয়ে-ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজে আমাকে নেবে না। টুইসনও কিছু পাব না। চাইতে গেলে মাথা হেঁট করেই আসতে হবে। বি-এ পাশ করতেও যদি পারি, এমন কি লাভ আমার হবে?"

"তবু গ্রাজুয়েটের মূল্য একটা আছে। আর অতটাই বা কেন এখুনি ভাবছেন? সময়ে সবই লোকে ভুলে যায়। আর কাজকর্ম্ম করেই যে আপনাকে খেতে হবে, এমন ত নাও হতে পারে।"

"কি আর হবে? এক দাদা, তা পারলেও এসে কতকাল আর বোনকে পুষতে চাইবেন? আমিই বা সে দাবী কি করে করব? তাই ভাবছিলাম, এক শিক্ষয়িত্রীর কাজ আর মেয়ে ডাক্তারী ছাড়া respectable কোনও কাজই আর মেয়েদের এদেশে নেই। কিন্তু দুটোর একটাতেও আমার যাবার পথ কিছু নেই। এক মেয়েদের গান-বাজনা শেখাতে পারি, কেউ যদি দয়া করে নেয়।"

"পাগল! বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান শিখিয়ে ক'টা টাকা কে আর পায়? আজকাল আবার ওস্তাদ অনেকে চায়, মিউজিক স্কুলও এখানে ওখানে হচ্ছে। যাক, ওসব কথা এখন ছেড়ে দিন। পরীক্ষাটা দেবার চেষ্টা করুন। টিউটোরিয়াল হেল্প (tutorial help—গৃহশিক্ষার সাহায্য) যদি কখনও কিছু দরকার হয় নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবেন। হাঁ, তা'হলে থাকবার বন্দোবস্ত কোথায়, কি ভাবে করতে চান? ধরুন, এই পাড়ায় আপনার পিতার কোনও বন্ধুর বাড়ীতে—"

"না না, এ পাড়াতেই ওভাবে আর কোথাও থাকতে চাই না। তার খরচও বড় বেশী পড়বে। তারপর কাজকর্ম্ম যাই করতে চাই, সুবিধে এদিকে বড় কিছু হবে না। তবে কোথায় কি বন্দোবস্ত করে অল্প খরচে কি ভাবে গিয়ে যে থাকতে পারি, ভেবেই কূল পাচ্ছি নি। সেটা আপনাদেরই করে দিতে হবে।"

"তাই দেব।"

একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মীনা কহিল, "তাই ভাবছিলাম অনুবাবু, কি সব বড় বড় কথাই না বলেছি, আর শুনেছি। কতই না সাম্য-স্বাধীনতার গর্ব্ব করেছি, এদেশের গৃহস্থ মেয়েদের জীবনকে শত ধিক্কার দিয়েছি। মনে করেছি, তাদের চাইতে কতই উপরে আমরা উঠে গেছি। কিন্তু আজ! কই, কিছুই ত' জানি না, কিছুই ত' শিখিনি, কিছুই ত' পারি না! বাবাকে হারিয়ে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছি। একটু যায়গা করে যে থাকব, তাও আপনাদের সহায়তা ছাড়া পারি না। এর পর কাজ যদি কিছু করতে হয়, তাও কি নিজে কিছু দেখে নিতে পারব? অথচ শুনেছি, নিজেও কিছু কিছু দেখেছি, এ দেশেরই সেকেলে সেই গৃহস্থ ঘরের অনেক মেয়েমানুষ, অসহায় অনেক বিধবাও, নিজেরা সংসার চালায়, ছেলে মেয়েদেরও মানুষ করে তোলে। গ্রামে কেবল নয়, এই কলকাতাতেও অনেক এমন মেয়েমানুষ আছে, কারও ওপর নির্ভর না করে নিজেরাই সংসার চালিয়ে নিচ্ছে। শুনেছি, চোখেও অনেক দেখেছি, দূর দূর থেকে মেয়েরা সব গঙ্গা নাইতে যায়, দেবালয়ে গিয়ে পূজো-প্রণামী দেয়, পুঁথি-পাঠ শোনে, দোকানে গিয়ে জিনিষ-পত্র কত কেনে, সঙ্গে একটি পুরুষ মানুষ নেই। অথচ এদের বলি আমরা পরাধীন, হীন, আর আমরা স্বাধীন, উন্নত! বাইরে বেড়াই, সভা সমিতিতে যাই, পার্টিতে গিয়ে আমোদ করি পুরুষদেরই আওতায়! অলঙ্কারের মতই শোভাই বাড়াই, কাজ ত' কিছুই করি না। ওদের সাহায্য ছাড়া করতেও কিছু পারি না।"

একটু হাসিয়া অনুতোষ কহিল, "কথাটা যা বলেছেন ঠিক। আসল কথা, সহরের এই উন্নত সমাজ বলে যাঁরা গর্ব্ব করেন, দেশটাকে তাঁরা চেনেন নি, দেশের ভেতর গিয়ে কখনও ঢোকেন নি, তাই অবজ্ঞা করেন, হীন বলে মনে করেন। নইলে দেশটা সত্যিই, এঁরা যে হিসাবে দেখেন, সে হিসাবে হীন নয়। মেয়েরাও এদেশে অসাধারণ শক্তি ধরে, ঘরে ঘরে তারাই কর্ত্তৃত্ব করে, গোবেচারী পুরুষগুলো ধমকেই ত' প্রায় নত হয়ে থাকে।"

"দেখব! দেখতে শিখতে এখন চাই। দেশের মেয়ে হ'য়ে দেশের ভেতরই ঢুকতে বড় ইচ্ছে হয়। কিন্তু পারব কি?"

"চাইলে কেন পারবেন না? হাঁ, তাহ'লে উঠি এখন। হাঁ, আর একটা কথা—জানকীনাথ বাবু জানতে চেয়েছেন, তিনি আসতে পারবেন না—তাই আমাকে বল্লেন,—কিছু উদ্বিগ্নও তিনি আছেন—"

"কি, বলুন।"

"ব'লতে কিছু সঙ্কোচ আমার বোধ হ'চ্ছে—"

"সঙ্কোচের কিছু কারণ নেই অনুবাবু। এই যা সব কথাবার্ত্তা আমাদের হ'ল, এর পর সঙ্কোচের কোনও বাধা আর থাকতেই পাবে না কিছুতে।"

"হাঁ, ঐ রবীন রায়ের সঙ্গে আপনার না কি engagement (বিবাহের কথা) হ'য়েছিল—"

"ও! হাঁ, engagement একটা হ'য়েছিল। কিন্তু তা আর নেই—ভেঙ্গে গেছে।"

"ভেঙ্গে গেছে! কেন, তিনি—"

"তিনি—হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম, বিবাহিত।"

"ও! তাই! আচ্ছা, তাহ'লে আসি এখন। থাকবার একটা যায়গা ঠিক ক'রে আপনাকে খবর দেব। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

২৫

"এই যে এস অতীন্ তোমার অপেক্ষাই ক'রছি।"

"আমিও ঠিক তোমার দেওয়া সময় মত এসে হাজিরই হ'য়েছি। তা কবে এলে ক'লকাতায়?"

"সম্প্রতি। এই পাঁচ ছ'দিন হবে।"

"এসে এই হোটেলেই বুঝি গা-ঢাকা দিয়ে আছ? বাড়ীতে আর যাওয়া হয় নি?"

"না, তবে এখানেও ঠিক ফেরারী আসামীর মত গা-ঢাকা দিয়েও নেই। কোন কারণও তার নেই। বাড়ীতে

যদি আমি না যাই, ধ'রে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে কেউ আমায় নিয়ে যেতে পাবে না।"

"তা এসেই আগে আমাকে স্মরণ করেছ—?"

"করেছি, তার কারণ কিছু খবর-টবর আমার দরকার। নিজে পাবলাম না; মনে হ'ল তোমার কাছে পেতে পারি। কারণ, কেন বুঝতে পারি নি এখনও, আমার personal অনেক খবর তুমি রাখতে চাও। জানি না, interestও বিশেষ কিছুই নেই, এমন খবর আমাকে দিতেও বেশ একটা আগ্রহ তোমার দেখেছি। সম্প্রতি কেবল এই বোম্বেতেই।"

"হাঁ, সম্প্রতি, বোম্বেতেই বটে। আর খবর গুলোয় তোমার একটা interestও যে না ছিল তা বলতে পারি না।"

"অথচ এটা তুমিও জান, আমিও জানি, আমরা দুজনে দুজনের যে অতি প্রিয়বন্ধু—আর সত্যি ক'রে তুমি যে আমার বিশেষ হিত কিছু চাও, তাও নয়।"

"অহিতও কিছু চাই নি। আর খবর যা দিয়েছিলাম, তাতে তোমার হিত, অন্ততঃ হিত ব'লে তুমি যা মনে ক'রতে, তা ছাড়া অহিত কিছু চাওয়া হয় নি। অতি বড় প্রিয় বন্ধু না হই, তোমার শত্রু এমন কথাও ব'লতে পার না। হাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে পারি। মালাবার পাহাড়ে সেই যে একটা discomfiture বা disaster তোমার হ'ল, তার জন্য ঠিক আমি দায়ী নই। ষড়যন্ত্রও কিছু আমি করি নি। তোমার বাবাই ওঁদের নিয়ে বেড়াতে আমাকে পাঠান। ঘটেছিল যা, দৈবাৎ।"

"হ'তে পারে। তবে দৈবাৎ যে অমন একটা ঘটনা ওখানে ঘটতে পারে, এটা তোমার বোধ হয় অজানাও ছিল না?"

"ঘটতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতই যে ঘটবে, এতটা ঠিক ভাবি নি। অন্ততঃ এটা তুমি স্বীকার করবে, মীনা মোকার্জ্জির সঙ্গে তোমার মিলনটা ভেস্তে যাক্, এটা আমি ঠিক বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি নি। তা হলে আগেই যেচে তোমাকে অতগুলো খবর দিতাম না।"

"তা বলতে পার বটে। কিন্তু কি যে তোমার উদ্দেশ্য—সেইটি ঠিক ধরতে পারছি নি। সেই যে দিন দুই আগে সন্ধ্যার পর আমরা যখন ফিরি, তোমার সেই বিকট হাসি—মনে হল লুকিয়ে আমাদের সব কথা শুনছিলে যেন?"

"দৈবাৎ ওখানে ছিলাম, কাণে গেল—interestingও খুব মনে হল, লুকিয়েই তাই শুনছিলাম। কেন-টেন তার কিছু নেই। সবাই অমন শোনে। তারপর জাল যা ফেলেছিলে, মীনা সেটা যে ভাবে এড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল, একদম বেকুব তোমাকে বানিয়ে দিল, তাতে হাসিটা আর সামলাতে পারলাম না। তা সে যাক, এ সব তর্কে-বিতর্কে এখন লাভ কিছু নেই। শত্রু, মিত্র কি নিরপেক্ষ উদাসীন যাই হই, একটা গরজেই আমাকে ডেকেছ। ভালবাসার মোলাকাৎ করতেও নয়, কি একটা 'ডুয়েল ফাইট (duel fight)' করতেও নয়—যদিও সেটা একদম criminal আজকাল। তা এখন সেই গরজের কথাটাই বলে ফেল।"

রবীন একটু চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বলছি। হাঁ, চা'টা—কিছু খাবে।"

"আপত্তি নেই। এটা বিশ্বাস করি, খবরটা যা চাও, তা পা'বার আগেই চায়ের সঙ্গে বিষ খাইয়েও আমাকে মারবে না। তবে—বড্ড হয়রান। সঙ্গে একটু পেগের হুকুমও যদি কর, বিশেষ কৃতজ্ঞ হব। সেটায় তোমারও এমন অরুচি কিছু নেই জানি।"

"না, তা নেই। কবা যাচ্ছে।"

ঘণ্টাটা রবীন টিপিল। খানসামা আসিয়া আদেশ লইয়া গেল, চা টোষ্টের সঙ্গে ভাল দুখানা কাটলেট আর দুইটা পেগ। চুরুট ও দিয়াশলাই বাহির করিয়াও রবীন টেবিলের উপরে রাখিল। আহারপানের সঙ্গে কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

"হাঁ, ভাল কথা, তোমার বিলেত যাওয়াটা বন্ধই বোধ হয় তবে হল।"

"আপাততঃ বটে। ফুরসুৎ নেই। তা ছাড়া টাকা যা হাতে আছে, কুলোবে না। বাবার কাছ থেকেও সাহায্য কিছু expect করি না।"

"সম্ভাবনাও বড় কিছু নেই। বেশ একটু হুঁসিয়ারই তিনি এখন হয়েছেন।"

"হুঁ। বেশ একটা যোগাযোগও তাঁর সঙ্গে তোমার ঘটেছে। তা তাঁর attitude এখন কি?"

"Attitude—মানে ?"

"মানে—এই generally আমার সম্বন্ধে কি তিনি ভাবছেন ? কি expect করেন ?"

"কি ভাবছেন, তিনিই জানেন। তবে expect করেন ঘরে ফিরতে তুমি বাধ্য হবে। এদিকে ত সব ভেস্তে গেল। আবার টাকার টানও পড়বে।"

"ভেস্তে একদম নাও যেতে পারে। মোকার্জ্জির আকস্মিক এই মৃত্যুর পর—situationটা যে turn এখন নিল, তাতে দেখা যাক্ কি হয় ? টাকার টান ?—না সে টানে তাঁর দ্বারস্থ আমাকে হতে হবে না। টাকা চাইলে ঢের রোজগার করবার পথ আমার আছে, পথ খুলেও যাচ্ছে।"

"হাঁ, শুনেছি ফিল্ম কোম্পানীর লোক কেউ কেউ তোমার কাছে approach করেছে।"

"শুনেছ ! কি করে ? কোথায় ? কার কাছে ?"

"এত খবর রাখতে পারি আর এইটুকু পারব না ? খবর অনেক রাখি বলেই না আমাকে স্মরণ করেছ, এই খানাপিনার খাতিরটুকুও আজ করলে, নইলে কি করতে ? দৈবাৎ কাছে এসে কখনও পড়লেও নাথি মেরে বোধ হয় সরে যেতে।"

"অতটা চাষা আমি নই অতীন। আর তোমাকে নাথি একটা মারলে পাঁচটা নাথি উল্টে আমাকে খেতে হ'ত। তার পরিচয় বোম্বের সেই রাস্তাতেই একদিন পেয়েছি। তবে এ কথা ঠিক—I don't like you. I don't understand you either। তবু—"

"জানি রবীন সব জানি। এই যে উক্তি দু'টো করলে that's no news to me। জানি, তুমি পছন্দ ত' আমাকে করই না, বুঝতে অনেক চেষ্টা করেও আমাকে বুঝতে পারছ না। তবে কি না, এই কথায় বলে গরজে লোকে বেড়ালেরও পায়ে ধরে, তাই। যাক্, এখন সেই গরজের কথাগুলি একে একে তবে ব্যক্ত কর, যদি একাধিক কিছু থাকে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে কেবল বাবার attitudeএর খবরটার তরে আমার তলব পড়ত না, বিশেষ টাকার টানটাও যখন নেই।"

পাল্টা জবাব ইহার কিছু না দিয়া কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া রবীন শেষে বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, বিন্দুর সঙ্গে বোধ হয় বেশ জানাশোনা তোমার আছে, নয় ?"

"আছে বই কি। ছেলে বেলা থেকেই আছে। তার বাপের বাড়ীর কুটুম আমি, অতি ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুও আমি।"

"হাঁ। সে কি বলে এখন ? জান কিছু ?"

"না। সেটা জানবার সুযোগ কিছু হয় নি। বললে বৌদিকে—মানে তার দিদিকে—লুকিয়ে যদি কিছু বলে থাকে। আর কাউকে কিছু বলবে না। জানবেও না সেটা সহজে আর কেউ কিছু।"

"হুঁ। এই ঘটনাটার পরে সে কি ভাবছে, কি করছে, কি করতে চায়—"

"নতুন কিছু ভাবছেও না, করছেও না, করতে চাইছেও না। সেই আগের মতই পতিব্রতা সেকেলে সতীর মত মনে মনে পতিদেবতার ধ্যান করছে, পূজো করছে। এটা বেশ অনুমান করেও নিতে পার।"

"আছে কোথায় ?"

"তোমাদেরই বাড়ীতে, তোমার বাবা মার কাছে। আর অতি লক্ষ্মী বউটির মত তাঁদের চরণ সেবা করে কৃত কৃতার্থ হচ্ছে।"

"এগুলো অখ্যাতির কথা কিছু নয় অতীন।" কহিয়া একটি নিঃশ্বাস রবীন ছাড়িল।

"বটে। তাহ'লে আকৃষ্টও বেশ একটু হ'য়ে পড়েছ দেখছি। মালাবার পাহাড়ের ঘটনাটা তাহ'লে বৃথা যায় নি ?"

"আকৃষ্ট—না, আকৃষ্ট এমন কিছু হইনি—আকৃষ্ট বলতে যা বোঝায়। তবে হাঁ, বড় একটা শ্রদ্ধা তার প্রতি অনুভব ক'রছি।"

"শ্রদ্ধার টানও একটা আকর্ষণ বটে।"

"হাঁ, সে ভাবে তবে আকৃষ্ট হ'য়েছি বলতে পার।"

"শ্রদ্ধার আকর্ষণ প্রেমের আকর্ষণেও এ সব ক্ষেত্রে প্রায়শঃ পরিণত হয়ে থাকে।"

"হলে সেটা এমন দোষের কথা কিছু নয়, অতীন্। সে আমার বিবাহিতা স্ত্রীই বটে।"

"বা! তা হলে মন্ত্রশক্তিটার ক্রিয়া সুরু হয়েছে দেখছি।"

তীব্র দৃষ্টিতে অতীন্ চাহিল। রবীন কহিল, "মন্ত্র-শক্তি টক্তি ও সব ম্যাজিক কিছু মানি না। তবে এটা ঠিক, শ্রদ্ধা বেশ একটু অনুভব করছি। সবাই করবে। তুমি কি কর না?"

"একদম না। আমি—আমি মনে করি, অতি অবোধ একটা মেয়ে সে, একেবারে সেই আদিম যুগের অন্ধ তমিস্রায় নিমগ্ন! একটা, একটা lifeless stock! আর তার একটা wraith—অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্ত্তি—সে যেন আলোকের এই যুগে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে!"

চমকিয়া রবীন চাহিল। স্বরে অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনা, চোখে মুখেও অত্যধিক একটা রক্তজ্বালা ব্যক্ত হইল।

"বটে! যদি খোলাখুলি একটা বিদ্রোহ করত, আদালতে গিয়া ডিভোর্স চাইত, তা হলেই বোধ হয় এই আলোক যুগের যোগ্য তোমার শ্রদ্ধার পাত্রী বলে তাকে গণনা ক'রতে তুমি?"

"নিশ্চয়ই কর্‌তাম! And you deserve that!" বলিয়া টেবিলে প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত সে করিল। খাবার ইত্যাদি সমেত ট্রেখানি পড়িতে পড়িতে কোনও মতে রহিয়া গেল।

হাসিয়া রবীন কহিল, "I do admit I deserve that! কিন্তু সে তা করবে না। বরং—after all this আমি যদি গিয়ে চাই, তাকে পাব। She is a charming and sweet girl too, worth having! তবে এ কথাটাও সত্যি যে, আমার চাওয়াটা সে খুঁজে নেবে না।"

"খুঁজে তবে তুমিই নাও। মন্ত্রশক্তির ম্যাজিকটা মান আর না মান, সেটা বেশ এসে ধরেছে বটে!"

"ধরেই যদি থাকে, আর টেমে যদি অজ্ঞাতসারে নেয় ত নেবে। তবে consciously, deliberately খুঁজে আমি নেব না। যাক্ ও কথা এখন! তারপর—"

"হাঁ, মীনাব কথাটা—আসল যে মনের কথাটা, এই সব গৌরচন্দ্রিকার পর তাতেই এখন এসে পড়।"

"ওগুলোও ঠিক গৌরচন্দ্রিকা নয়, জানবার সত্যিকার একটা তাগিদও ছিল। তবে আমার অনুমানের উপরে নতুন খবর কিছু তুমি দিতে পার নি, কেবল তার সম্বন্ধে তোমার দারুণ এই অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা, আবার তার তরে বন্ধুজনোচিত অতি বড় একটা দরদ, যাতে এতটা উত্তেজিত করেই তোমাকে ফেললে যে, টেবিলটা ভেঙেই ফেলে দিয়েছিলে আর কি?"

"যে ব্যবহার তার সঙ্গে করেছ, আত্মীয় বন্ধুজনের বড় একটা indignation হওয়া, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

অপেক্ষাকৃত কিছু শান্ত সংযত ও গম্ভীর ভাবেই অতীন্ এই মন্তব্য করিল।

"যাক্! তা হ'লে মীনার খবর কি জান? আমি এসেছি এখানে, তার প্রধান কারণ—মনে হ'ল, মিষ্টার মোকার্জ্জির আকস্মিক এই শোচনীয় মৃত্যুর পর আমার ঠিক protection না হ'ক্, friendly help একটা তার পক্ষে দরকার হ'তে পারে। আত্মীয়-স্বজন কেউ আর নেই। ধীরেশও আসতে পারে নি। সে না কি বিবাহও ওখানে করেছে—"

"হাঁ, আর পাঠিয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীসহ তার ঠিক নবীনা না হ'ক, নব-বিবাহিতা স্ত্রী রেজিনাকে। আর তারা এসেই ঘাড়ে ধরে মীনাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছে।"

"ঘাড়ে ধরে বের করে দিয়েছে! সে কি?"

"Literally ঠিক না হ'ক, যা করেছে figuratively সেটাকে তাই বলা যেতে পারে বটে। তাকে বিদেয় করে দিয়েছে, বলে দিয়েছে, 'তোমার ভার আমরা বইতে পারব না, খরচপত্র কিছু চালাতে পারব না, নিজের পথ এখন নিজে দেখ'।"

"বটে! আর ধীরেশ?"

"ধীরেশ ত বিলেতে। চিঠি-ফিঠি তাকে লেখা হয়েছে, দু তরফ থেকে। তবে যদ্দুর বোঝা যাচ্ছে, ধীরেশকে একান্তভাবেই তার এই সহধর্ম্মিণীর অনুবর্ত্তী হয়ে চলতে হবে, স্বামীর কি সহধর্ম্মীর দাবী-দাওয়া কিছু চলবে না।"

বলিয়া অতীন রেজিনার অভ্যাগমের পর মোকার্জ্জি সাহেবের গৃহে যাহা কিছু ঘটিয়া ছিল, খবরও সে অফিস হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিল, সব বিবৃত করিল।

স্তম্ভিত হইয়া রবীন কতক্ষণ বসিয়া রহিল, গভীর একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় সে আছে?"

"জানতে পারি নি। আছে কোথাও গিয়ে, তার ঐ চাকরাণী এলোকেশীকে নিয়ে ছুই একটা ঘর-টর ভাড়া করে। সম্বল ত কিছু নেই। আফিস থেকে তার খরচপত্রের একটা বরাদ্দ করে দিতে চেয়েছিলেন জানকীনাথ বাবু তাঁর নিজের দায়িত্বে। তা সেটা সে নেয় নি। কি করে চালাবে জানি না।"

"হুঁ। তা পড়াশুনা—এই ত কোর্থ ইয়ার কেবল সুরু হচ্ছে।"

"সেটাও শুনলাম খতম্ হয়ে গেছে। কলেজ হোষ্টেলে থাকতে চেয়েছিল, দেয় নি। কলেজেও বোধ হয় পড়তে পাবে না, expel করবে।"

"সে কি। হোষ্টেলে দেয় নি, কলেজ থেকেও expel করবে, কেন, কি করেছে সে?"

"আর কিছু নয়, তবে তোমার সঙ্গে নানা রকম প্রেমের ভঙ্গীতে—চূড়োন্ত আদিরসের সব ভাব বিকাশে—প্রত্যহ তার ছবি বেরোচ্ছে সিনেমায় সিনেমায়—কত পোষ্টার ফুটে রয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। তা respectable গেরস্ত মেয়েদের হোষ্টেলে থাকবে, একসঙ্গে এক কলেজে পড়বে—"

ধড়াক্ করিয়া রবীন উঠিয়া দাঁড়াইল। গৃহতলে প্রচণ্ড এক পদাঘাত করিয়া আরক্ত উত্তেজনায় উন্মত্তের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ কতক্ষণ ঘুরিল। মনে হইল, ঘরখানিই যেন রোষস্ফীত তাহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অতীন কোনও মতে হাসি চাপিয়া মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া লইতে লাগিল। শেষে কহিল, "শোন, একটু ঠাণ্ডা হও। এই ঘরের ভেতর পাগলের মত লাফালাফি করে লাভ কিছু নেই। কি করবে তাই এখন ভাব।"

"ভাববার কিছু আর নেই। তাকে এখন আমার protectionএ নিতে হবে, either by a marriage or—or—"

"As a mere lover!"

"অগত্যা তাই করতে হবে। এ ভাবে ভাসিয়ে তাকে দেওয়া যেতে পারে না। She wants a loving protector and wanted it never so terribly as now!"

"ঠিক কথা! And you are the most competent person to take up the position."

"কোথায় সে আছে?"

"জেনে দিচ্ছি এই কাল পরশু তক্।"

"আজই পার না?"

"সম্ভব হলে জানাব।"

"And I shall ever be grateful to you for this service অতীন্."

"Thank you! তবে কি না, খবর আমি এনে দিচ্ছি যত শীগগির পারি, but you must hurry up and make hay while the sun shines."

"মানে?"

"মানে—atmosphereটা এখনও favourable তোমার পক্ষে আছে। বেশী দিন বোধ হয় থাকবে না। A rival may appear soon. আর তার সূচনাও দেখা দিয়েছে।

"A rival! কে—কে এই rival!—কোত্থেকে এল? কি ভাবে এল?"

"আসে নি ঠিক এখনও। তবে এল প্রায়। আসবেও, যদি না এর ভেতর তুমি গিয়ে সামনে পড়তে পার।"

"আঃ! খুলেই বল না কি হয়েছে?"

টেবিলে প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাত পড়িল।

হাসিয়া অতীন্ কহিল, "ওদের ঐ ফার্ম্মের প্রধান কর্ম্মচারী জানকীনাথ বাবুই এখন মীনার এক রকম অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি—"

"ও! এই rival! হাঃ হাঃ হাঃ!"

"হাস! যদি কিছু relief পাও, হেসেই একটু নেও। তবে আমি পাগল হই নি যে তাঁকে তোমার rival বলে ভয় দেখাব।"

"তবে কে আবার এল!"

"তিনি আছেন মাথায় দায়িত্বটা নিয়ে। তবে কিছু দিন যাবৎ অসুস্থ, বেরোতেও বড় পাবেন না,—ওকে দেখবার শুনবার, ওর বন্দোবস্ত সব করে দেবার ভার দিয়েছেন অমুতোষের ওপর।"

"অমুতোষ! Who is he! What is he! Is he a young man?"

"Yes, and a very nice and most attractive young man too!"

"কে সে ! কি করে সে ।"

"ঐ ওদের অফিসের একজন কেরাণী ।"

"ওঃ—কেরাণী !"

অতীন্ কহিল, "নেহাৎ ছোটখাট নগণ্য একজন কেরাণীও সে নয়। জানকীনাথ বাবুর ডান হাত বললেও তাকে হয়। মোকাজ্জিও খুব ভাল তাকে বাসতেন, খাতিরও খুব করতেন। মীনার টিউটর সে ছিল আগে। তখন তাকে দেখে, তার যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে, কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হয়ে আফিসের কাজে তাকে নেন। দেখতে দেখতে উঠেও গেছে অনেক উপরে। মোকাজ্জি যখন মারা গেলেন, আফিস থেকে তাকেই পাঠান হয়; সেই গিয়ে বোম্বে থেকে মীনাকে নিয়ে আসে।"

প্রত্যেকটি কথা বেশ জোর দিয়া দিয়াই অতীন্ বলিতেছিল; আর সেগুলি তীক্ষ্ণধার বিষমুখ এক একখানি ছুরিকার মত গিয়া রবীনের বুকে বিঁধিতে লাগিল। ছটফট করিয়া শেষে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বদা ওদের দেখা শুনো হয়!"

"হয় মাঝে মাঝে।—এখনও ভাবটা তেমন ঘনিয়ে বোধ হয় ওঠে নি।"

"ঘনিয়ে উঠতে আমি দেব না! Any how it must be prevented and further progress of intimacy stopped. মীনা is mine and must be mine."

"কিন্তু কি করে সে তোমার হবে? বিবাহ যদি সম্ভবই না হয়, সে কি কেবল lover বলে তোমাকে আত্মসমর্পণ করবে?"

"I must at least try! Any how this Anutosh's approaches must be stopped! আমি মীনাকে না পেতে পারি। কিন্তু সে যে আমার চোখের সামনে আর কারও হবে, এটা সহ্যই আমি করতে পারব না!"

"ঠিক কথা! প্রেমের পাত্রীকে না পাওয়াটা বরং লোকে বরদাস্ত করতে পারে; কিন্তু সে যে চোখের সামনে আর কারও হয়, আর কেউ তার প্রেম উপভোগ করে, এটা মানুষ কেউ প্রাণ থাকতে বরদাস্ত করতে পারে না।"

এমন একটা ধ্বনি অতীনের কণ্ঠস্বরে উঠিল, এমন একটা জ্বালা তার চোখে-মুখে ভাতিয়া উঠিল, তাহ দেখিয়া রবীন কেমন থমকিয়া গেল। একটু কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "মনে হচ্ছে অতীন তুমি অন্তরের সঙ্গে আম ? অন্তরে এই বেদনার সত্যটা অনুভব করেই কথাটা বললে Are you— are you actually in love?"

"I may be, and why not? I am a young man, a man—neither a fish nor a stock nor a stone—but a man with warm blood pulsating through my veins just as yours!"

"Are you—are you—in love with মীনা?"

"You are a fool রবিন্! তাহ'লে মীনার সঙ্গে তোমার মিলন ঘটাবার তরে উঠে পড়ে এ ভাবে লাগতাম না!"

বলিয়াই অতীন বাহির হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া রবীন দাঁড়াইয়া রহিল। না, মীনা নয়; মীনা নয়। সে বরং চায় মীনার সঙ্গে তার যে ভাবেরই হোক যোগ একটা ঘটে কেনই বা তা চায়? বিন্দু—তবে বিন্দু কি? বিন্দুর সঙ্গে তার বিচ্ছেদটা থাকিয়া যায়, সেইটাই বরং সে চায় তার কথাবার্ত্তার অনেক স্থলে আকস্মিক একটা উত্তেজনা, চক্ষু-মুখের দীপ্তজ্বালা, সব যেন খোলা পুস্তকখানির পাতাগুলির মত একটির পর একটি করিয়া চোখের সামনে পড়িতে লাগিল। যে রহস্যটা ধরিতে পারিতেছিল না, আজ যেন পারিল। কেমন একটা ঈর্ষ্যার জ্বালাও মন ভরিয়া জ্বলিয়া উঠিল। টেবিলের উপরে মাথাটি রাখিয়া একখানি চেয়ারে সে বসিয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ

কালীপূজা

—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

উপক্রম

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি হিন্দুসমাজভুক্ত ও হিন্দু নামে পরিচিত মাত্র। আমি শাস্ত্রজ্ঞও নহি, আচারীও নহি। হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া যে গ্রন্থগুলি পরিচিত, তাহাদিগের মধ্যে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি সে সমস্ত অনুশাসন কঠোর ভাবে প্রতিপালন করি না। যাঁহারা ঐ অনুশাসনগুলি কঠোর ভাবে প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও শ্রদ্ধা করি, কাহাকেও প্রশংসা করি মাত্র এবং কাহাকেও বা কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করি।

হিন্দুর জ্ঞানের শাস্ত্র, হিন্দুর ভক্তির শাস্ত্র ও হিন্দুর কর্ম্ম-শাস্ত্র তিনেরই বিশেষ অনুশাসন ছিল যে, জ্ঞান এবং ভাবকে জীবনের কর্ম্মে সমন্বয়ের মধ্য দিয়া লইয়া আচারে পরিণত করিবে। হিন্দুশাস্ত্রের বহু অনুশাসনের ন্যায় এটিকেও কর্ম্ম এবং সাধনাসাধ্য মনে করিয়া আমরা অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু তর্কের সময় অথবা সভায় ইহাকে স্মরণ করিয়া মহত্ত্বের গৌরব দিতে কুণ্ঠিত হই না। কারণ, সেটুকু করিতে কোন শ্রম বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এবং বাক্যে ও কর্ম্মের অনৈক্যে আমরা আদৌ লজ্জা বোধ করি না; কেন না, সেইটাই আমাদের অনেকের জীবনের ধারা হইয়া উঠিয়াছে। সেই ধারা-প্রবাহে অবগাহন করিয়া আমাদের লজ্জাবোধরূপ চক্ষুর ক্লেদকে আমরা সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া ফেলিয়াছি। তাই, আপনাদের মত সজ্জন-সমাজে আমারও কালীপূজা সম্বন্ধে কিছু বলিতে কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ হইতেছে না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এখানে আমি ক্ষমা শব্দটাই প্রয়োগ করিলাম। মার্জ্জনা শব্দ ইচ্ছা করিয়াই দিলাম না। দুটির মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করি। মনে আপনাদের ধৈর্য্য আছে, আসনে আপনাদের স্থৈর্য্য আছে; বিশেষতঃ হেমন্তের এই শীতস্পর্শে যখন কীট বা মশকের উৎপাত কমিয়া আসিয়াছে, এবং এক বাঙালীর স্পর্শ অপর বাঙালীর নিকট সুখস্পর্শ হইয়াছে, তখন আপনারা আমার বক্তৃতা নিশ্চয়ই বহুক্ষণ ধরিয়া সহ্য করিতে সক্ষম হইয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। মার্জ্জনা আপনারা করিতে পারিবেন না। মার্জ্জনা করিয়া ক্লেদ দূর করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদের কোথায়? ধর্ম্মের তত্ত্ব আমরা জানি, কিন্তু তাহার নিবিড় স্পর্শের সহিত আমাদের পরিচয় নাই; আমরা তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু অনাচারী। অগ্নিতে আর আমারা আহুতি দেই না, ভস্মেই আমাদের প্রীতি। "তেজো নো দেহি" বলিয়া যে হিন্দু একদিন প্রার্থনা করিতেন, সে আজ সাধুর নিকট তাঁহার তেজহীন নির্ব্বাপিত বহ্নি-ইন্ধনের শুষ্ক ভস্ম মাত্র প্রার্থনা করে। আর, সাধুরাও আজ হিন্দু সমাজে ভস্মমাত্র দান করিয়াই নিজেদের দগ্ধোদর পূরণ করিতেছেন। রুদ্র বৈশাখের দীপ্ত ও প্রখর তেজের স্পর্শের মধ্যেই আমরা প্রাণের প্রতীক নব-কিশলয়ের সজীব শ্যামলতার দর্শন পাই; আর শীতের তেজোহীন স্পর্শেই বৃক্ষের সেই শ্যামল পত্র জীর্ণ হইয়া তাহার শ্যামশোভা ছাড়িয়া হরিদ্রাভ ম্লান বর্ণে তাহার অবশ্যম্ভাবী পতনের সূচনায় অরণ্যকে রিক্ত ও শোভাহীন করিয়া ফেলে। সকল রকমে জীর্ণ ও রিক্ত আমরাও বুঝি তাই, শ্যামার শ্যামলতা এবং চির-কিশোরের নবীন মেঘের সজল কান্তির সেই সজীব রঙকে পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্রাভ ও ম্লান গৈরিক-কেই আদর করিতে শিখিয়াছি, আজ বাঙ্গালার ধর্ম্মে তাই প্রাণেরই অভাব দেখিতে পাই; প্রাণের স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছে প্রাণহীন, রসহীন ঘৃণ্য এবং বিবোধকঠোর ম্লান অনুষ্ঠানরাশি। ইহা ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মের শব। মিশরের "মমি"র মত জড় ভেষজের ও আবরণের প্রয়োগে রক্ষিত প্রাণহীন দেহপিণ্ড মাত্র। শব-সাধনার শক্তি-দেবতা কালী, তাই, আজ বাঙ্গালার শ্মশানে আমাদের আলোচনার বিষয় "কালীপূজা"।

আলোচনার ক্রম

আজ আমরা শবাসনা কালীর পূজা করিব না। কালী-পূজার তত্ত্বমতে আলোচনা করিব। সুতরাং আপনারা

ভীত হইবেন না। নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতাকে ছিন্ন করিয়া প্রাণহীন পশুচর্ম্মের নির্ম্মিত ঢাকের শ্রুতিকঠোর উদ্দাম শব্দও আপনাদিগকে ত্রস্ত করিবে না; আবার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী ছাগশিশুর মর্ম্মভেদ করুণ আবেদনও আপনাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবে না। আপনাদের ভাবসাগরে কোন তরঙ্গ জাগাইবার আমরা ভরসা রাখি না; তবে সেই নীরব, নিস্তব্ধ "সুপ্ত মীন ইব হ্রদঃ" ভাবসাগরে যাঁহার পাদস্পর্শে চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে, সেই চিরচঞ্চলা কালীর কথাই আপনাদিগকে শুনাইব।

আমরা মানুষ, আমাদের জ্ঞান সসীম, সেই সসীম জ্ঞানের পরিধি সকলের সমান নহে। সকল তত্ত্বকে সেই পরিধির মধ্যে আনিয়াই আমরা প্রকাশিত করি। সংজ্ঞাকে (sensation) যেমন আমাদের মানস জ্ঞানের আকারে আকারিত করিয়া গ্রহণ করি, ঠিক তেমনি সেই সংজ্ঞা-সঞ্জাত ভাবকেও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানপরিধির রূপে রূপায়িত করিয়াই অপরের নিকট ব্যক্ত করি। সুতরাং আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত আমার ভাবকেই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। তাহার সহিত আপনাদের ভাবের সামঞ্জস্য নাও থাকিতে পারে। আমার ভাবের স্পর্শ আপনাদিগের মনে কি ভাবের উদ্বোধ করিবে, তাহা আপনারাই বুঝিবেন।

কালীপূজার তত্ত্ব নানা ভাবে আলোচিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ ঐতিহাসিক ভাব। কেহ কেহ বলেন, কালী আদিতে অনার্য্যদিগের দেবতা ছিলেন। অনার্য্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা সেই দেবতাকেই আমাদের মায়ের আসন দিয়াছি। শ্যামামায়ের "উলঙ্গত্ব" এবং "কৃষ্ণরূপত্ব" এবং তৎসহ "ঘোরদংষ্ট্রাত্ব"ই না কি ইহার অনার্য্যত্বের চিহ্ন। কালো হইলেই অনার্য্য হয় কি না, সে বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভার আপনারা আমাদের ঐতিহাসিক ও নরতাত্ত্বিকদের উপর দিবেন। ইতিহাসে আমার অজ্ঞতা অসামান্য। অসামান্য অজ্ঞতা এবং সামান্য জ্ঞান, এই দুইয়ের বিরোধে আমার যুক্তিধারা যে ভিন্ন পথ ধরিবে, তাহা হয় তো সৃষ্টিছাড়া হইবে, কাহারওই মনঃপূত হইবে না। সুতরাং কালীর ইতিহাসকে আমি দূর হইতেই নমস্কার করিতেছি। কালীর তত্ত্ব অন্তরের কথা, মানস ব্যাপার; ইংরাজীতে যাহাকে বলে idea তাহাই। অতএব সেখানে সকলেরই প্রবেশের অধিকার আছে। কিন্তু ইতিহাস অন্তরের বস্তু নহে, উহা বাহিরের, উহা জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়; অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে material বা concrete। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের প্রচলিত প্রথামত শ্যামামায়ের কথা বা রূপ যেমনি material বা concrete হইয়া মন্দিরে আশ্রয় লইলেন, অমনি সে আশ্রয় অনেকের পক্ষে অনাশ্রয় হইয়া পড়িল। Spirit বা তত্ত্বের পূজায় ও স্পর্শে সকলেরই অধিকার, কিন্তু matter বা জড়মূর্ত্তির পূজার বা স্পর্শের অধিকার কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের বৃত ব্রাহ্মণেরই রহিল। এই যে জড়ের পূজা ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিষেধ, ইহা কি তাঁহাদের বংশের মর্য্যাদার লঙ্ঘন না হীনতার কলঙ্ক, ইহা হিন্দুর এই পুনরুত্থান বা Neo Hindu revival-এর দিনে একটু বিশেষ ভাবে অনুধাবনের বিষয় নহে কি? আপনারা এ বিষয় একটু চিন্তা করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিবেন কি?

তারপর আসিবে অর্থনৈতিক কথা। শাস্ত্রে আছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের কথাই মানুষের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের কথা। ইতিহাসের কথায় ধর্ম্মের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এইবার অর্থের কথা বলিব। সামাজিক ভাবের কথায় কামের কথা উঠিবে। মোক্ষের কথার কোনও ইঙ্গিতও হয়তো শেষ দিকেও দেওয়া হইবে না। কারণ, শেষের সেই কথার জ্ঞানও আমাদের কাহারও নাই, শুনিবার বা স্মরণ করিবার সাহসও হয়তো নাই।

অর্থের কথা বলিতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে পুরোহিতের দক্ষিণা। সেটা অর্থই বটে। তবে পুরোহিত সেটা উপার্জ্জন করেন উপবাস করিয়া। ব্যাপারটায় একটু বিরোধাভাস আছে। লোকে অর্থ উপার্জ্জন করে উপবাস বাঁচাইবার জন্য, আর পুরোহিত ঠাকুর অর্থ উপার্জ্জন করেন উপবাস করিয়া। অবশ্য পয়সা দিয়া উপবাস অনেকের ভাগেই ঘটে। মায়ের তহবিলে খাজানা দিয়া বা পূজা দিয়াও সকলে প্রসাদ পান না—কেন না, মায়ের হেঁসেল হোটেল নয়। প্রমাণ দেখিয়াছি কালীঘাটের কালীবাড়ীতে এবং নাটোরের জয়কালীর বাড়ীতে। অন্যত্র বোধ হয়

আমার পরিচয় থাকাতে মায়ের প্রসাদের পরিচয় পাইয়াছি। এখানেও আবার সেই বিরোধাভাস। আমরা জানি মাই ছেলেকে চেনেন, ছেলেই বরং অনেক সময়ই মাকে চেনে না। কিন্তু এই সব কালীমায়ের ব্যবস্থা অন্তরূপ, এখানে ছেলে চিনিলেই তবে মা চেনেন। "কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়"—এ প্রবাদ বুঝি পাষাণী মায়ের জন্য নয়। এসব মায়েদের সেবাইতরা কি মায়ের রক্ত শোষণ করিয়া মাকে প্রাণহীনা ছেলে-ভোলা "পাগলী মা" করিয়া রাখিয়াছে? এই সেবাইতের শোষণ বন্ধ করিতে পারিলে "পাগলী মা"কেও সুস্থ করিতে পারা যাইবে এবং মায়ের পূজা হইতে সমাজের অর্থলাভও হইতে পাবে। কালীর তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে এ কথাটা হিন্দুসমাজ যেন ভুলিয়া না থাকেন। ঘরের কড়ি পরকে দিয়া উপবাস করিতে আমরা নিত্যই অভ্যস্ত। জমিদারকে খাজানা দি, ফসল পাই না; পুলিশকে বেতন দি, চুরি বন্ধ হয় না; কোর্টকীর টাকা দি, ন্যায়বিচার পাই না; হুজুরকে সম্মান দেখাই, নিজেরা সম্মান পাই না; জিনিষের দাম দিই, খাঁটি দ্রব্য পাই না; ডাক্তারকে ভিজিট দিই, ছেলে বাঁচে না; মিউনিসিপ্যালিটীকে ট্যাক্স দিই, সেবা (service) পাই না; ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পথকর দিই, রাস্তার কাদা শুকায় না; কংগ্রেসের চাঁদা দিই, স্বরাজ পাই না। আর গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দি, মন্ত্রী ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ ছাড়া বাংলাদেশের আর সকলে আমরা উপবাস করি। মনে হয়, পুরোহিতের ধারা হইতেই এটা আমাদের জাতির ধারা হইয়া গিয়াছে। আমরা উপবাসী থাকিয়াই পরের পূজা করিতে অভ্যস্ত। এই উপবাসের ধারা না বদলাইলে আমাদের অর্থলাভের ব্যবস্থা হইবে কি না, হিন্দুসমাজ একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি?

এবার কালীপূজার সামাজিক দিক্। উৎসব মাত্রেরই একটা সামাজিক দিক আছে। সেটা এখানে আলোচ্য নহে। কারণ, উহা কেবল মাত্র কালীপূজারই বিশেষত্ব নহে।

মূর্ত্তিতে না হইলেও মন্ত্রে কালীপূজার অধিকার সকলেরই আছে। ইহাই বাঙলার তন্ত্রের একটি বিশেষ দান। শব্দময় বেদের মন্ত্রে চৈতন্য জাগাইবার সকলের অধিকার না থাকিলেও বাংলার তন্ত্রের মন্ত্রে শব-সাধনার মন্ত্রে অধিকার সকলেরই আছে। সমাজের সকলকেই শব-সাধনার জন্য এই যে আহ্বান, বাংলার তন্ত্রমার্গের কালীপূজার ইহা একটি বিশেষত্ব, কালীপূজার এই সামাজিক ধারাটি বাঙালীর জীবনে কি একটি নূতন প্রাণের উৎস খুলিয়া দিবে না?

কালীপূজার সামাজিক দিকের আলোচনায় কাম সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিতে হইবে; সমাজের স্থিতি ও গতিতে কামেরও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। কাম শব্দের অর্থ আমাদের বাঙলা দেশে বেশ স্পষ্ট নহে। কামের একটি অর্থ কামনা। সে কামনা বা ইচ্ছা নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। সামাজিক জীবের কামনা বহু হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিপূর্ত্তিতে সংযম এবং সীমা রাখিতে হইবে। ভক্ত, তাই মায়ের নিকট কামনা জানান, "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" রূপের অর্থ সৌন্দর্য্য। আর সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য্য। সমাজকে সুসমঞ্জসই হইতে হইবে। জয় এখানে অসংযত কামনার জয়। যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা যারা মায়ের নিকট এই প্রার্থনাই জানান হইতেছে যে, সমাজের অকল্যাণকর কোন নিন্দার কার্য্য যেন আমরা না করি। আর সমাজের শত্রু ত' বিরোধ। সেই বিরোধকে তুমি দূর করিয়া দাও, ইহাই সন্তানের প্রার্থনা।

কামনার এই যে বহুরূপ, তন্মধ্যে ক্ষুধাই সকলের অপেক্ষা প্রবল। ক্ষুধার দুই রূপ, এক উদরের, অপর যৌন ক্ষুধা। উদরের ক্ষুধার নিবৃত্তি করে অন্ন। সে অন্ন যদি সম্যক্ ভাবে পরিবেশিত না হয়, তবে তাহাতে ব্যক্তির ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু সমষ্টির ক্ষুধা থাকিয়াই যায়। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা"—তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পূজা করিতে হইলে সকল ভূতের ক্ষুধারই অঞ্জলির ব্যবস্থা করিতে হয়। সমাজে আজ সে ব্যবস্থার অভাব; কালীর ভক্তকে আজ মায়ের ক্ষুধারূপের তৃপ্তির উপকরণ সংগ্রহ ও সম্যক্ পরিবেশনের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হইতে হইবে। মানবের যৌন ক্ষুধা দেহের ও মনের। দেহের আবেগ ক্ষীণ হয় অতি ব্যয়ে বা ভোগে; আর মনের ক্ষোভ শান্ত হয় পরম লাভে। এই যৌন ক্ষুধারই সর্ব্বপ্রচলিত নাম কাম।

চণ্ডীতে মায়ের বর্ণনায় আছে—"সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী"—সংসার বাঁধিবার হেতুও সন্তান, সংসারের

স্থিতির কারণও সন্তান। সন্তানের উৎপত্তির কারণ স্ত্রী-পুরুষের কাম। সুতরাং পরম্পরাসূত্রে কামই সংসার স্থিতি ও বন্ধের মূল। এই তত্ত্বের কদর্থ করিয়া কেহ কেহ কাম-চর্চ্চাকেই কালী সাধনার প্রধান অঙ্গ মনে করিয়া সমাজে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। আচারেই সমাজের স্থিতি ও পুষ্টি; ব্যভিচারেই তাহার পতন ও ধ্বংস। আচারের মূলেই সংযম, আর অসংযমই ব্যভিচার। অতএব কামের দুটি রূপ—এক ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ বা সংযত; অপর ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বা অসংযত।

ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম সম্বন্ধেই গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ"। টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—"ধর্ম্মেন অবিরুদ্ধো স্বদারেষু পুত্রোৎপাদন মাত্রোপযোগী কামোঽস্মীতি॥" পুত্র শব্দে বৈধ সন্তান মাত্রকেই বুঝাইতেছে।

আর যেখানে সন্তানোৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণের সাহস নাই এবং সংসার বাঁধিবার সাহস বা ইচ্ছা নাই, সেখানেই কাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ। স্বদার ভিন্ন অন্য নারীর সহিত যে যৌন মিলন, যাহার ফল সংসারও নহে, সন্তানও নহে, তাহাই হীন কাম। তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, কালীপূজার সহিত এই কামের কোন সম্বন্ধ নাই। পুত্র-কন্যার সন্তান কামনাতেই মা সন্তানের বিবাহ দিয়া থাকেন। যে মা বিবাহ-বন্ধনের বাহিরে অন্য রমণীর সহিত স্বীয় পুত্রের যৌন মিলনের প্রশ্রয় দেন, সেই কালীই হয় তো অনার্য্য-দিগের দেবতা, তিনি আমাদের শিবাসীমন্তিনী দক্ষিণা কালী নহেন।

কালীসাধনার নামে এই যে হীন কামচর্চ্চা, ইহা সাধনা নহে, সাধনার ব্যভিচার,—ভ্রমসাধনা। বৈষ্ণবের পরকীয়া ব্যভিচারও এইরূপই গর্হিত।

বিষয়

কালী পূজার তত্ত্বালোচনা করিবার অধিকারী কে? তত্ত্বের একটা দিক্ ফুটিয়া উঠে জ্ঞানবানের কাছে। আর একটা দিক্ উদ্ভাসিত হয় ভাবুকের নিকটে। অপর আর একটা দিক্ বুঝিতে পারেন কর্ম্মী। কিন্তু এই তিন দিক্কেই যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই সাধক। সাধক এই তিনকেই বুঝেন, এবং জীবনে তাহার সমন্বয়সাধন করেন। সুতরাং সাধক ছাড়া এই দুরূহ তত্ত্ব আর কেহ সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে পারেন না।

তবে সে সাধক কোথায়? হয় তো বাঙ্‌লায় আজ সে সাধক নাই; থাকিলেও হয় তো তাঁহাকে আমরা চিনি না। রামপ্রসাদের মুখে মাতৃ-সাধকের উক্তি—"মা, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে"—এই গুপ্ত সাধকদিগের বিজ্ঞাপন নাই, সহরে বন্দরে ঘন ঘন যাতায়াত নাই, কাম বা কামনাসিদ্ধির লোভ দেখান নাই, তাবীজ কবচ দিয়া শিষ্যসংগ্রহ নাই, ইহাঁদিগকে আমরা চিনিব কি করিয়া?

সাধক চিনিতেও সাধনার প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষক এ শিক্ষা দিতে পারেন না। সাধকে ও শিক্ষকে পার্থক্য আছে। শিক্ষক শিক্ষক, তিনি শেখান প্রাণহীন শুষ্ক বুলি। আর সাধক হইলেন আচার্য্য—তিনি জীবনকেই সাধনার মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলেন। তাই শিষ্যের পতনে এই গুরুর পতন; তাহাতে বুঝা যায় আচার্য্যের শক্তি হইতে তিনি ভ্রষ্ট। তাই সাধনার ঐকান্তিকী ইচ্ছাশূন্য, নিষ্ঠাচ্যুত ব্যক্তির নিকট সাধক এ গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন না। সাধকের চিন্তার ও বিচরণের ক্ষেত্র পৃথক্।

তাহা হইলেও আমরা এ তত্ত্বের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। চণ্ডী বলেন "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য"; আমাদের জ্ঞানালোক সর্ব্বত্র সমান ভাবে প্রসারিত না হইতে পারে, তবুও সন্তানের সীমাবদ্ধ জ্ঞান-পরিধির মধ্যেও মাতৃতত্ত্ব কথঞ্চিৎ ধরা দিবেন; আমরা ততটুকুই আলোচনা করিব।

বহুঈশ্বরবাদী ও মূর্ত্তি-পূজক বলিয়া হিন্দুর একটা অপবাদ আছে। সেটা তাহার কলঙ্ক অথবা গৌরব তাহাও ভাবিবার বিষয়।

যে হিন্দু তারস্বরে বেদের মন্ত্রে ঘোষণা করিয়াছেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং পুনরপি বলিয়াছেন "নেদং যদিদমুপাসতে"—তিনি বহুঈশ্বরবাদী এ কথা ভাবিতেও দ্বিধা হয়। যিনি গীতায় বিশ্বরূপের কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার ঈশ্বর কেবলমাত্র মূর্ত্তিতে সীমাবদ্ধ, হিন্দু এইরূপ ভাবিতেছেন, ইহা ভাবিতেও কুণ্ঠা হয়। তবুও হিন্দুর সমাজে বহু দেব দেবীর পূজাপদ্ধতি এবং মূর্ত্তিতে ঐ সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। এই

উভয়বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য কোথায়? যে হিন্দুর উপনিষদে ব্রহ্মের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়াও কেবলমাত্র নঞর্থবাচক শব্দের দ্বারা বিশেষিত বা অবিশেষিত করা হইয়াছে, সেই হিন্দু সাকারবাদী ইহাই বা বলি কি করিয়া?

এ বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে "ভাব" বা "সত্তার" অর্থাৎ idea-র আলোচনাই সর্ব্বপ্রথমে করিতে হয়। বস্তুর বস্তুত্বই তাহার ভাব বা সত্তা অর্থাৎ idea। এই ভাবটী যেমন কোন বিশেষ বস্তুরও আছে, ঠিক তেমনি সেই জাতীয় সকল বস্তুর মধ্যে সাধারণ ভাবেও (common) আছে। এই সাধারণ ভাবের সত্তা এক জাতীয় সকল বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত আছে বলিয়াই উহাদিগের একজাতীয়ত্ব নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু এই ভাব সাধারণতঃ আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষ নহে। উহা মানসগ্রাহ্য অথবা অনুমানগম্য। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ গুণাদির দ্বারাই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষহেতু আমাদের বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান জন্মে। ইহাই প্রত্যক্ষ। সুতরাং বস্তুর বস্তুত্ব বা ভাব আমাদের প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রাহ্য নহে; উহার গুণ বা কর্ম্মের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে তাহা আমাদিগের প্রত্যক্ষগম্য হয়। যে যে বস্তুতে চেতনা আছে বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি হয়, তাহাদিগের মধ্যে দয়া মায়া প্রভৃতি নানা মানস-গুণের ভাব আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি, উহাও প্রত্যক্ষগম্য নহে, মানসগ্রাহ্য বা অনুমানগম্য। দ্রব্যের পরস্পরের সহিত অথবা একই দ্রব্যের বিভিন্ন অংশের যে সম্বন্ধ, যাহা হইতে সৌন্দর্য্য প্রভৃতির বোধ হয়, তাহাও প্রত্যক্ষগম্য নহে। মানসগ্রাহ্য অনুমানগম্য মাত্র। ইহাদিগের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি নাই।

মানুষের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতিই আকর্ষণের আবেগ বেশী। তাহার মধ্যে আবার রূপের আবেদনই আকৃষ্ট করে অধিক। তাই, মানুষের অন্তরে যখন কোন বস্তু বা গুণের ভাব বা সত্তা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে, মানুষ তখন শিল্পী হয়। শিল্পী তখন চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সঙ্গীতে এবং কবিতায় তাহার মানসী মূর্ত্তিকে রূপের বা ভাষার মধ্য দিয়া রূপায়িত করিয়া নিজেও সম্ভোগ করেন, অপরকেও সম্ভোগ করান। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আমরা যত ভালবাসি, যত আপনার ভাবি, এত বোধ হয় আর কিছুকে নহে। তাই, নিরাকারবাদী বা সাকার-বিদ্বেষী ধর্ম্মেরও যাঁহারা সেবক, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবের আবেগ দ্বারা প্রেরণা লাভ করিয়া চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এই বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য গুণাবলীকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাতৃস্নেহের আবেদন সন্তানের নিকট বড়ই মধুর, বড়ই ঘনিষ্ট, বড়ই তীব্র। তাই দেখিতে পাই, নিরাকারবাদী খৃষ্টানেরা মধ্যযুগে এবং এখনও এই মাতৃস্নেহকে দৈব স্নেহ (divine love) মনে করিয়া উহার ভাব বা সত্তাকে নারীরূপিণী মাতৃমূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই যে অরূপকে রূপ দিবার চেষ্টা, এই যে অনন্তকে সান্তের মধ্য দিয়া অ-ধরকে ধরিবার এবং ঘনিষ্ট ভাবে আপনার করিয়া প্রেম ও ভক্তি নিবেদনের আধার করিবার ইচ্ছা, ইহার সম্বন্ধেই হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন, "Religion springs from Art"—শিল্পীর মনই ধর্ম্মের উৎস। তাই কবি গাহিয়াছেন,—"সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর; আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

অরূপ বাতাস যখন অসীম জগতে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তখন হয় সে ঝঞ্ঝা, তাহার ধ্বনি তখন গর্জ্জন, সে প্রভঞ্জন তখন করে ভীতির উৎপাদন। আর, সেই অশান্ত (অসান্ত) সমীরণকে যখন ক্ষুদ্র বাঁশরীর ক্ষুদ্রতর ছিদ্রপথে বাহির হইতে হয়, তখনি তার অশান্ত গর্জ্জন হয় শান্ত ও মধুর সুর।

অরূপ অনন্ত ভগবান্ আপনাকে এই সান্ত বিশ্বে কত বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়া এই রূপহীন দেশ ও কালাত্মক বিশ্বকে কত অপরূপ রূপে সাজাইয়া তুলিতেছেন। সেই অরূপেরই তো এই অপরূপ রূপে রূপের মধ্যে প্রকাশ। অরূপে আর রূপে তাই প্রভেদ কোথায়? একই দৃষ্টির দুটী ভঙ্গী মাত্র।

ভগবানের এই যে রূপহীন অনন্ত রূপ ও গুণ, ইহা যতক্ষণ হিন্দু সান্তভাবে চিন্তা না করে, ততক্ষণ সে তাহাদিগকে নঞর্থবাচক বিশেষণ দেয়। আবার, যখন তাহাদিগকে কিছু সান্ত করিয়া অনরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে, তখন তাহাদিগকে অস্তিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করে। আর, যখন তাহাদিগকে আরও সান্ত করিয়া একেবারে আপনার করিতে চায়, তখনই তাহাদিগকে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও

শব্দের মধ্য দিয়া আকারিত করিয়া তোলে। তখনই চিত্রে ও ভাস্কর্যে, স্তবে ও স্তুতিতে তাঁহাকে ভক্তি নিবেদনের আধার করিয়া তুলে। ইহাই মূর্ত্তি-পূজার বা সাকারবাদের প্রথম স্তর।

হিন্দু যদি ভগবান্‌কে সান্ত ও সাকারই ভাবিত, তবে কি হিন্দুর দেবতা এত বিভিন্ন আকারের কল্পিত হইত? ভগবান্ অদ্বয় বস্তু, কিন্তু তাহার রূপ ও গুণ অনন্ত। মানবের জড় ইন্দ্রিয় ও মানসিক চিন্তার ক্ষেত্রের পরিধি সান্ত। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহার এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সেই রূপ ও গুণের অতীত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তবে, উচ্চাঙ্গের সাধকের না কি ক্ষণে ক্ষণে এই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তখন তিনি বলিয়া উঠেন—"বেদাহমেতৎ তমসঃ পরস্তাৎ"—এই "এতৎ" ও লিঙ্গহীন। তাই, তাঁহাদের প্রত্যক্ষকে আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে গেলে বলিয়া থাকেন, "নেতি নেতি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্"—কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন দিয়া প্রকাশ করেন না বা করিতে পারেন না। তিনি যে স্বরূপতঃ সর্ব্বলিঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। হিন্দু যদি রূপকেই বা আকারকেই ভগবানের স্বরূপ ভাবিত, তবে, তাহার ভগবানের একই মাত্র মূর্ত্তি হইত। সেটাই হইত জড়মূর্ত্তিপূজা,—হিন্দু জড়োপাসক নহে। সে জানে সাধারণ মানুষের নিকট বস্তুর প্রকাশ তাহার রূপ ও গুণ এবং কর্ম্মের দ্বারা, বস্তুর স্বরূপ তাহার সাধারণ জ্ঞানে নিরাকার।

হিন্দু ইহাই স্বীকার করে যে, ভগবান অনন্ত, অরূপ ও নিরাকার। নিরাকারের অর্থ "আকারশূন্য বা আকার-পরিগ্রহের শক্তিশূন্য নহে। অনন্ত আকার, অনন্ত রূপগ্রহণের ও সৃজনের অধিকারী। তাই, যাহার মনের যাহা প্রিয়, যাহার জ্ঞানে ও ভাবে তিনি যে ভাবে ভাসিয়া উঠেন, তিনি তাঁহাকে সেইরূপেই ধ্যান করিয়াছেন। তাই, বিশ্বের নানা কালের, নানা দেশের নানা সাধক তাঁহার নানা ভাবের পূজা করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে স্নেহময় পিতারূপে তাঁহার পিতৃরূপের ভাবে মুগ্ধ; কেহ তাঁহার ন্যায়পরায়ণ বিচারক রূপকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; কেহ তাঁহাকে মা ভাবিয়া তাঁহার মাতৃরূপকেই উপাসনা করিতেছেন,—কেহ দেখিয়াছেন তাঁহাকে সখারূপে, প্রিয়তমরূপে, আরও কত কি রূপে! সে রূপ মানস রূপও হইতে পারে, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপও হইতে পারে। হিন্দু তাই মূর্ত্তিপূজক নহে; সান্ত মূর্ত্তির মধ্য দিয়া অনন্ত মূর্ত্তির অনন্তভাবের রস আস্বাদন করেন। ইহাই মূর্ত্তিপূজার গূঢ় তত্ত্ব।*

এই যে ভাব সত্তা, কেহ কেহ বলেন উহা শব্দগম্য বা শব্দসমষ্টি মাত্র। এই নিরাকার ভাবের চিন্তার উহার ভাষাগত প্রতীক ঐ অর্থদ্যোতক একটী শব্দেরই ধারণা হয় মাত্র—ভাব নিরাকারই থাকিয়া যায়। উহা মানবের চিন্তার অতীত অচিন্ত্যভাব। এই মতবাদিগণকে ইংরাজীতে বলা হয় nominalist এবং তাঁহাদের মতবাদ nominalism,—আমাদের ভাষায় শব্দাত্মক। কেহ কেহ বলেন, ঐ ভাব চিন্তাগম্যমাত্র। ইঁহাদিগকে বলা হয় conceptualist, ইঁহাদের মতবাদ conceptualism। আমাদের ভাষায় এই ভাব ধ্যানমূর্ত্তি। আবার, যাঁহারা মনে করেন ব্যক্তির অতীতে ভাবের একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে তাঁহারা realist, তাঁহাদের মতবাদ realism—আমাদের ভাষায় নিত্যরূপ।

হিন্দুর দেবতার ধ্যানে তাঁহাকে শব্দাত্মিকা, ধ্যানমূর্ত্তি এবং নিত্যরূপা এই ত্রিবিধ ভাবেই বর্ণনা করিয়া এই তিনটী মতবাদেরই সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

ভগবান অনন্ত, কিন্তু তাঁহার যতটুকু আমাদের সাধারণ চিন্তার পরিধির মধ্যে ধরা দেয়, আমরা ততটুকু তত্ত্বেরই আলোচনা করিব।

মানবের সকল চিন্তার মূলে আছে দেশ ও কাল (space and time)। দেশ ও কাল বৈশেষিক দর্শন মতে দ্রব্য হইলেও নিত্য এবং অমূর্ত্ত ও অবিচ্ছিন্ন। ইহারা ভগবানেরই বিভূতি (aspects), তিনি স্বয়ং ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কালাতীত ও দেশাতীত স্বরূপে অবস্থান করেন। এই বিভূতিদ্বয়ের মধ্যে দেশ স্থির, কাল চঞ্চল। একটী static, অপরটী dynamic। একের গুণ স্থিতি, অপরের গুণ গতি। দেশে বস্তুর অবস্থিতি, এক বস্তু অপর বস্তুকে সান্ত (limiting) করিয়া একত্র অবস্থান করে (co existent)। কালে ঘটনার পারম্পর্য্য; একের

ধ্বংসে অপরের উদ্ভব (events in time)। এক ক্ষণের ধ্বংসে অপর ক্ষণের উদ্ভব ও স্থিতি, আবার তাহার ধ্বংসে নূতনের জন্ম। একটা কারণ-কার্য্যের শৃঙ্খলার অবিচ্ছিন্ন, অন্ত চঞ্চল প্রবাহ। তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটা মিতা সম্পর্ক বিদ্যমান। একে অপরকে ছাড়িয়া থাকে না। দেশে যেন শান্ত সদৈকরূপ (changeless)। সুতরাং স্থিতির নিত্য-দর্শনে ইহা আশ্চর্য্য (striking) নহে। আর কাল যেন নিত্য চঞ্চলা প্রসবিণী, ধ্বংসের মধ্য দিয়া নূতনের সৃজনকর্ত্রী। এই নূতনত্বের জন্যই কাল আশ্চর্য্য (striking)।

তাই এই অমূর্ত্ত নিত্য কালকে যদি রূপ দিতে হয়, তবে প্রথমেই দৃষ্টিতে পড়ে তাহার গতির আবেগ। তাহাতে পুরাতনের ধ্বংস এবং নূতনের আবির্ভাব। তন্মধ্যে আবার ধ্বংসরূপটিই আমাদিগকে বেশী আকৃষ্ট করে। কালের রূপ ও স্বরূপই ইহা। গীতায়ও আছে, ভগবান্ বলিতেছেন—"কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।"

কালের এই ভাবরূপকে গ্রহণ করিয়া আমরা কালীর কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দেশ ও কাল যেমন মানবের চিন্তার আধার, তেমনি ইহারা ভগবানের অন্যতম বিভূতিস্বরূপেই মানবের নিকট প্রতিভাত। তিনি দেশ ও কালের অতীত সত্য, কিন্তু মানব তাঁহাকে দেশ ও কালের মধ্যে দিয়াই আপনার করিয়া লইয়াছে। তাই; ঈশ্বরে বিশ্বাসী যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই হউক না কেন, মুখে তাঁহারা যদিও বলেন, "ঈশ্বর সকলের" সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা আবার বলিতে থাকেন, "আমরা তাঁহার নির্ব্বাচিত জাতি, তিনি আমাদেরই দেবতা, তিনি একমাত্র আমাদেরই সহায়।" এই সমস্ত limiting বাক্যের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাকে দেশেরই অধীন করিয়া ভাবেন। আবার যখন বলেন, "প্রাচীনকালে মানব ঈশ্বরের অধিকতর প্রিয় ছিল", "মানব তখন ভগবানের অধিক ভক্ত ছিল", "যত মহাপুরুষ তাঁহার কথা বলিবার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন কালেই জন্মিয়াছেন", তখন তাঁহারা এই সমস্ত limiting (সান্তকৃত) বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে কালের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়াই চিন্তা করেন। ভক্তির নিয়মই এই, সে অনন্তকে আপন গণ্ডীর মধ্যে আনিয়াই আপনার করিয়া লইতে চায়।

এই সম্পর্কে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ভগবানের বিভূতি বা গুণ (aspects বা attributes) তাহা হইতে পৃথক্ নহে। আমরা উহাকে চিন্তায় পৃথক্ করিয়া ভাবি মাত্র (as abstractions)। তাহাতে তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হয় না। যেমন কোন মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্বকে পৃথক্ করিয়া ভাবিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বের কোন হানি হয় না। কারণ, স্বরূপতঃ কোন বস্তু হইতে তাহার গুণকে পৃথক্ করা যায় না। গুণ বস্তুর একটি শক্তি, উহার দ্বারা সে বস্তুর অস্তিত্ব বোধক্ষম ব্যক্তির মনে তাহার অস্তিত্ববোধ জন্মাইয়া থাকে। ব্যক্তি যেমন তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে প্রসারিত করিয়া বস্তুর সহিত সংযোগ সাধন করে, বস্তুও তেমনি তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তির গ্রহণযোগ্য রূপরসাদি প্রকাশ করিয়া উভয় শক্তির মিলন ঘটাইয়া আপন অস্তিত্বকে ব্যক্তির মনের বোধশক্তির সহিত একাত্ম করিয়া দেয়। কাজেই বুঝা গেল যে, বস্তুর প্রকাশশক্তি না থাকিলে ব্যক্তির বোধ-শক্তি নিরর্থক হয়। এই প্রকাশশক্তি ও বোধশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই জগতের অস্তিত্বের মূলে অবিরত চলিতেছে। সুতরাং বস্তুর গুণ তাহা হইতে পৃথক্ না হইয়াও শক্তিরূপে পৃথক্ ভাবে প্রতিভাত হইতে পারে।

ভগবানের এই যে কাল-বিভূতি, ইহাতে ধ্বংসের ভাব বা দৃশ্যই প্রবল। অথচ ইনি নূতনকেও প্রসব করেন। এই ধ্বংসের মধ্যে বিদ্বেষ নাই, ইহা নূতনের জন্মের অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বরূপ। অথচ নূতন সৃষ্টিতে একটা আনন্দও আছে, সৃষ্টের প্রতি একটা স্নেহও আছে। সৃষ্টির অর্থই নিজের সঞ্চিত শক্তির ত্যাগ। প্রতিদানে আনন্দ না থাকিলে ত্যাগের ইচ্ছাই হয় না। তাই সৃষ্টিতে আনন্দ। আমাদের নিকট ধ্বংসের অর্থ অত্যন্তাভাব; তাই ধ্বংসে আমাদের বেদনা। কালের নিকট ধ্বংসের অর্থ পুরাতনকে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া নূতনকে আপনার মধ্য হইতে প্রকাশ করা। তাই সেখানে কোন বেদনাবোধের কারণ নাই। বাহিরকে আপন করার এবং অন্তরকে বাহির করার লীলার মধ্যেও আনন্দই আছে। তাই উপনিষদের "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই তত্ত্বের সহিত এই ধ্বংসতত্ত্বের কোন বিরোধ নাই।

একাধারে একজনকে কোলে টানিয়া লওয়া এবং অপরকে নূতন জন্ম দেওয়া, ইহার কল্পনা কেবল মায়ের রূপেই সম্ভব। মা নারীরূপিণী। পিতা আমা হইতে দূরে। জ্রণকালে মায়ের উদরে, বাল্যকালে মায়ের ক্রোড়ে, যৌবনে মায়ের হাতের অন্ন পরিবেশনে এবং প্রৌঢ়ে মায়ের পদতলে যে আনন্দ হয়, তাহাতে মায়ের সহিত সন্তানের সম্পর্কে যে নিবিড়তা স্থাপিত হয়, এত আর কাহারও হয় না। তাই, হিন্দু এই কাল-বিভূতিকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া কাল হইতে কালীর রূপ ধ্যান করিয়াছেন। তাই, কালী যেমন ধ্বংসরূপিণী, তেমনি আনন্দময়ী।

বহু ঘটনার সমষ্টি কালরূপিণী মায়ের এই ভাবসত্তা বা রূপের স্বরূপ কি? হিন্দু বলেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" এখানে যদি "ব্রহ্মণঃ" শব্দে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হইয়া থাকে, তবে বুঝিব মা ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া নিজেই এইরূপ ধরিয়াছেন। আর যদি সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয় তবে বলিব সন্তানই মাকে তাহার এই অভীষ্টরূপে সাজাইয়াছেন। ইহাতে মায়ের স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সন্তানের নিকট স্বরূপের এই দুই ভাবে মাতৃরূপ দর্শনই ঠিক। দুই রূপের মূলেই তাহার হিত। যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহাই হিত। "জীবের আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই প্রতিপ্রয়াণ।" উপনিষদের এই বাক্য জীবের আনন্দই বিধান করিয়াছেন। জীবের মাতৃরূপ ধ্যানেই আনন্দ, তাই কালী আনন্দময়ী।*

মায়ের বর্ণনা—

> শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধানম্
> উদ্গীতরম্যপদপাঠবতাং চ সাম্নাম্।
> দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভাবনায়
> বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥

অতএব মা শব্দাত্মিকা।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" অতএব মা ধ্যানমূর্ত্তি এবং ধ্যানগতা। ধ্যানের অর্থই রূপচিন্তা।

অতএব মা নিত্যরূপা।

মানুষ মানুষকে যত ভালবাসে, এত আর কাহাকেও নহে। মানবের ধ্বংসই তাই তাহার নিকট ধ্বংসের পরাকাষ্ঠা। সেই জন্যই কালীর মূর্ত্তি ধ্যান বা চিন্তা করিতে ছিন্নশির ও হস্তপদাদিই মায়ের বিভূষণ হইয়া উঠিয়াছে।

মায়ের ধ্যান—

> করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
> কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥ ১
> সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
> অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্॥ ২
> মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
> কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥ ৩
> কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
> ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥ ৪
> শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
> সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥ ৫
> ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
> বালার্কমণ্ডলাকারাং লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥ ৬
> দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
> শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥ ৭
> শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
> মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥ ৮
> সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্॥

এখন প্রশ্ন উঠিবে, এই ধ্বংস, এই পরিবর্ত্তনের (changes) জগদ্ব্যাপারে সার্থকতা কোথায়? কেন এই পরিবর্ত্তন? নিশ্চয়ই জগদ্ব্যাপারের বর্ত্তমান অবস্থায় কোথায়ও কিছু অপূর্ণতা আছে, কোথায়ও কিছু অসম্পন্ন আছে এবং বর্ত্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। পরিবর্ত্তনের অর্থই হইতেছে একটা উৎকৃষ্টতর অবস্থায় উপনীত হইবার চেষ্টা। এই চেষ্টারই নামান্তর বিরোধ ও ধ্বংস॥ কালে অচঞ্চল স্থিতির কোন স্থান নাই। গতির অর্থই বর্ত্তমানে অসন্তুষ্টি। তাহার অর্থ অধিকতর সন্তোষজনক অবস্থাপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা। সুতরাং এই ক্ষণে যাহা অসন্তোষজনক মনে হইতেছে; পরক্ষণেই গতির আবেগে তদপেক্ষা সুষ্ঠুতর অবস্থার কল্পনা আসিল। প্রাচীনে ও নবীনে তখন বিরোধ। পরক্ষণে তাহার সামঞ্জস্যে নূতন অবস্থার উদ্ভব। তৎপরক্ষণে তাহাই আবার অসন্তোষজনক বলিয়া বোধ; আবার নূতনের কল্পনা।

* কালী সম্বন্ধে প্রচলিত মতের ভ্রান্তি এবং ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত ধারণার বিশদ্ আলোচনার জন্য ১৩৪৫ সনের পৌষ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক হিন্দুয়ানী' দ্রষ্টব্য।—বঃ সঃ।

আবার বিরোধ, আবার সামঞ্জস্য,—আবার বিরোধ। এই ভাবেই ক্ষণিক স্থিতি, ধ্বংস ও উদ্ভবের মধ্য দিয়াই অনন্ত কালপ্রবাহ একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে অবিচ্ছিন্নভাবে ধাবিত হইতেছে। একটা অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থান্তরের দিকে ছুটিয়েছে। এ পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র কোন বস্তুবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের নহে, ইহা সমস্ত বিশ্বজগতের পরিবর্ত্তন। অতএব এই সদাপরিবর্ত্তনশীল কালের গতি বিশ্বের উন্নতিরই অভিমুখে।

বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক হেগেলের (Hegel) মতের ইহা সারসংক্ষেপ। বিশ্বকে উন্নত করিবার জন্যই মায়ের এই ধ্বংসলীলা, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি ও অনুধাবন করিতে পারিলেই এই ধ্যানের অর্থ আমরা বিশদভাবে বুঝিতে পারিব।

হেগেল (Hegel) বলেন, "Being is becoming"—সত্তাই বিকাশ। উপনিষদের "বহুস্যাং প্রজায়েয়" একই অর্থবোধক। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ। আপনাকে বিকাশ করাই আনন্দ। সত্তা ও বিকাশ একার্থবোধক। চেতনার অর্থই বিরোধজ্ঞান। 'আমি' এবং 'অপর' এই দুই বিরোধাত্মক (limiting) বস্তুর যুগপৎ জ্ঞান না থাকিলে চেতনা থাকে না। ব্রহ্মের নিকট অবশ্য আমি ও অপর বোধরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। কিন্তু জগতের বিরোধাত্মক ভাব ও পদার্থ দেখিলেই বুঝি যে, ইহাদের মূল ব্রহ্মের মধ্যে না থাকিলে ইহারা আসিল কোথা হইতে? সকল বিরোধের মিলন তাঁহাতে। সেই সমন্বয়ের অবস্থায় তিনি সৎ (static), তন্মুহূর্ত্তেই সৎ চিৎ, তখনই তাঁহার মধ্যে চেতনার মূলীভূত বিরোধে তাঁহার প্রকাশ (dynamic); এবং সেই বিকাশই আনন্দ। এই বিরোধের প্রকাশ হইতেই সৃষ্টি। চিৎ অবস্থার লক্ষণ "তদা ঐক্ষত"। তাহা হইতে সৃষ্টি এবং সৃষ্টির মূলেই আনন্দ।

সৃষ্টির মূলই তাই বিরোধাত্মক, গতিশীল কাল। সেই জন্যই কালীকে আদ্যাশক্তি বলা হয়। Being is becoming হইল সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। তাই অনাদিরূপিণী কালী সনাতনী।

ধ্বংসের মধ্যেই যে মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে, ইহা বুঝাইতেই "মুণ্ডমালা" শব্দের সহিত "বিভূষিতাম্" শব্দটা দেওয়া হইয়াছে। ধ্বংসের প্রতীকও যে শোভা, সেও যে সুন্দর, তাহাই বুঝান হইল। কেন না যাহাই সত্য, তাহাই শিব, তাহাই সুন্দর। মায়ের হাতে যেমন ধ্বংসের অস্ত্র, তেমনি আবার তিনি অভয় এবং বর হাতে লইয়াই আছেন। যেমন তিনি করালবদনা, তেমনি তিনি হসন্মুখী। যেমন তিনি ঘোরারাবা শিবাদিগের দ্বারা পরিবৃতা ভীষণা, তেমনি আবার "সুখপ্রসন্নবদনা" "স্মেরাননসরোরুহা"। সকল বিরোধের সমন্বয়ে মহিমময়ী।

এই ধ্যানের ভাবে ও শব্দের ঝঙ্কারে একটা গতির আবেগ ও ব্যঞ্জনা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। কালের concept-এর ইহা চরম কল্পনা।

এবার প্রশ্ন মায়ের পদতলে শিব কেন? বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে মায়ের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে বলিয়াছেন, "আপনার শিব আপনি পদতলে দলিতেছ মা।"

কিন্তু বিশ্বের বিকাশ সম্বন্ধে যে কল্যাণ ও আনন্দের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি, তাহাকে আমরা ভিত্তি করিয়া মা কেন "শবরূপ মহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতা", এ বিষয় আলোচনা করিব।

সমগ্র বিশ্বে একটা বিশিষ্ট ঐক্য (unity) আছে। সে ঐক্যের একটা অবিচ্ছিন্নতা (continuity) আছে। সেই ঐক্যের মধ্যে জটিলতারও (complexity) স্থান আছে। সুতরাং বিশ্বের কল্যাণের মধ্যেও ঐক্য, অবিচ্ছিন্নতা এবং জটিলতা আছে। বিশ্বকল্যাণের এই ভাবত্রয়ের যুগপৎ বোধ সাধনা-সাপেক্ষ।

কালের গতিই আনন্দময় কল্যাণের দিকে। কিন্তু পূর্ণ কল্যাণ কবে বিকশিত হইবে, অনন্ত কালের গতিতে তাহা নির্ণীত হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে শিব একদিন জাগরিত হইবেনই। সেই সুদিনের প্রতীক্ষায়ই মানুষ ধর্ম্মের জগতে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ব্যবস্থায়, সমাজনীতির তত্ত্বে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পরীক্ষা-গৃহে অবিশ্রান্ত কষ্টসাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া ধ্বংস এবং উদ্ভব লইয়া নানা ভাবে নিরীক্ষণ (observation) ও পরীক্ষা (experiment) চালাইতেছেন। এ পথে হয় তো ব্যষ্টির (individual) ক্ষণে ক্ষণে কিছু কল্যাণ হইতেছে, তাই মা আমার "সুখপ্রসন্নবদনা"। কিন্তু সমষ্টির (all) কল্যাণরূপ বিশ্বশিব আজও মৃতবৎ

সুপ্ত (latent and potential); তাই শিব এখনও কালীমায়ের পদতলে। যেদিন তিনি প্রাণের স্পন্দনে জাগরিত (patent and actual) হইবেন, সে দিন হয়তো মার মধ্যে আর ধ্বংসমূর্ত্তি নাই, স্থিরা কল্যাণী মূর্ত্তি, সে দিনের বিশ্বের জাগ্রত শিব জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর মস্তকেই স্থান করিয়া লইবেন।

জগৎ সেই দিনের কল্যাণ-শঙ্খনিনাদ শ্রবণের ব্যগ্রতায় উৎকর্ণ হইয়া আছে।

এবার মায়ের পূজার কথা।

কালীমূর্ত্তির প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। তাহা পুরোহিতের কাজ। আমরা তত্ত্বের পূজার কথা বলিব। মায়ের তত্ত্বই যখন গতি, তখন গতির আরাধনার পদ্ধতিতেও গতির নূতন বিকাশের পরিচয় দিতে হইবে।

চণ্ডীতে বর্ণিত আছে, মা আমার সকল দেবতার সকল শক্তির সংহতিমূর্ত্তি। ""অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।" মা আমার সকল তেজের তেজোময়ী, "অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।" "ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশি-সমুদ্ভবাম্।" সেই মায়ের উদ্বোধনে সকল দেবতার শক্তি-কেই জাগাইতে হইবে। সে কি ব্যক্তিবিশেষের সাধ্য? কোটি কোটি দেবতার সংহতশক্তির আহ্বানে কোটি কোটি মানুষের সংহতির প্রয়োজন; মায়ের পূজার তাই প্রধান উপকরণ সংহতি। হিন্দুর সেই উপকরণ আজও যে সংগৃহীত হয় নাই। তাই মায়ের বোধন-ঘণ্টাও এখনও বাজিয়া উঠে নাই।

মায়ের পূজার অর্ঘ্য কি? বিশ্বের চরম কল্যাণে, সকল বিরোধের সমন্বয়ে জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং তৎসাধনে আত্মোৎ-সর্গের অকৃত্রিম ইচ্ছার আবেগ।

যে মায়ের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিব, সে মায়ের সহিত আমার সম্পর্কের নিবিড়তা কিরূপ, ইহা বুঝিলেই এই কালীপূজার সাধনা ও সার্থকতা অবধারণ করিতে পারিব। তাহা হইলেই "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা" তিনি তাঁহার পূজার প্রসাদতুষ্টি আমাদিগের অন্তরে দান করিবেন। এবং "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা"—তাঁহার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা ইহজগতেই শান্তির অধিকারী হইতে পারিব।

নিখিল বিশ্বকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া মা আমার সমষ্টির প্রতীক; আর আমি ব্যষ্টি মাত্র। সমষ্টি অনন্ত, ব্যষ্টি সান্ত। অনন্ত আসিয়া যখন সান্তের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখনই ব্যক্তির প্রকাশ। হেগেল (Hegel) বলেন ব্যক্তি তাই সান্ত ও অনন্তের মিলনসেতু। সান্তের তত্ত্বই (essence) অনন্ত এবং অনন্তের প্রকাশই (manifestation) সান্ত। সুতরাং এক দিকে মা আর আমি এক, আবার অপর দিকে মাই আমার সর্ব্বস্ব এবং আমিই তাঁহার নিত্যলীলার আধার। হেগেলের উক্তি, ভাব-সমাধির মহামুহূর্ত্তে (inspired moments) মানব তাহার সত্তা লোপ করিয়া দিয়া আপনকে ভগবানের সহিত অভিন্ন ভাবিতে পারে, কিন্তু যখনই সে তাহার অন্তরসর্ব্বস্বকে (ideal) রূপের মধ্য দিয়া (material form) আপনার করিতে চায়, তখনই সে এই অনন্তের দুয়ারে নিজে কত কাঙাল তাহা বেশ বুঝিতে পারে। তাহার সান্ত কল্পনা অনন্তকে সম্যক্ রূপ দিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে সেই অনন্তেরই শরণ লইতে বাধ্য হয়। মানুষ তাই এই রূপের মধ্য দিয়াই অরূপের আভাস পায়। এমনি করিয়াই মূর্ত্তির অতীতের অমূর্ত্তের সহিত তাহার পরিচয় চলিতে থাকে। ইহাই মৃন্ময় ও চিন্ময়ের মিলন। মৃন্ময় রূপে তিনি দেন ধরা, আর চিন্ময় রূপে দেন তার আভাস। ধরা দিবার ফল পুলক, আভাসের ফল আলোক। পুলকে অন্তর হয় ভাবে পুলকিত, আভাসে হয় জ্ঞানে আলোকিত। এই আলোকিত জ্ঞান ও পুলকিত ভাবের মিলনেই শুদ্ধা ভক্তির জন্ম। মায়ের সহিত আমার সম্পর্কের নিবিড়তার মূলে থাকা চাই এই শুদ্ধা ভক্তি।

কেহ কেহ ভাবেন, চিন্ময়ের আভাসের আলোকসাগরে মৃন্ময় বুঝি ডুবিয়া যায়। মৃন্ময় ও চিন্ময়ে বুঝি বিরোধের সম্পর্ক। তাই হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন, বাইবেল প্রভৃতি কেবল নিরাকারবাদীদিগের শাস্ত্রগ্রন্থে মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করা হইয়াছে। মূর্ত্তিপূজার অর্থ তাঁহারা যাহাই করেন, তাহাতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, মানবের মন জড়প্রতীক ব্যতীত অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না। তাঁহারা বলেন, ভাবের ভাব ব্যতীত অন্য কোন যোগ্য আকার নাই, সুতরাং তাহার

জড় প্রতীক সৃষ্টি করা তাঁহারা নিষেধ করেন। যদিও তাঁহারা অরূপকে রূপ দিতে নিষেধ করেন, কিন্তু অন্তরে আমরা তাঁহাকে যে রূপেই ধ্যান করি না কেন, তাহাতে তাঁহারা বাধা দিতে পারেন না। বাহিরে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা নিষেধ, কিন্তু মানস কল্পনাকে নিষেধ করিবে কে? মন যে নানা ভাবে (ideas) ভরা, সে ভাবধারণা যে তাঁহারই যোগ্য ভাবধারণা, তাহা বলিবে কে? প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্ম* বাস্তবিকই প্রতীকোপাসনা, সে প্রতীক কাহারও নিকট মানস, কাহারও নিকট জড়। শিল্পী অনন্তকে সান্ত রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলেন। ধর্ম্ম অনন্তকে জগদতীত পুরুষ বলিয়াই ধরিয়া লয়। মানবের সাধারণ চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধ, সে সীমার মধ্যে মানবসম্বন্ধীয় ধারণাই বৃহত্তম। তাই, অনন্তকেও সে মানবেরই বৃহত্তম সংস্করণ বিরাট পুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। ইহাই ঈশ্বরকে মানবীকরণ (anthropomorphism)। একত্বের মধ্যেই তাহার পৃথক্ অংশে যে সুসামঞ্জস্য, তাহাই সৌন্দর্য্য। বিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না;—যেখানে সামঞ্জস্যের বোধ নাই, সেখানে সৌন্দর্য্যও নাই। তাই, ধর্ম্মে যেমন সত্যও আছে, শিবও আছে তেমনি সুন্দরেরও ধ্যান আছে। তাই, এই সৌন্দর্য্য-বোধই সান্ত ও অনন্ত, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে এক করিয়া, পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য দেখিতে পায়। আর ভাবহীন জ্ঞান তাহাদিগকে নিঃসম্পর্কিত বিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া চিন্তা করে। তাই কেবলমাত্র জ্ঞানীর ভগবান্ কোন্ সুদূরে ঊর্দ্ধ আকাশে বসতি করেন; আর মানুষ তাহা হইতে কত দূরে এই অধস্তন মর্ত্ত্যে পড়িয়া আছে। তাইতো অতবড় ভগবানের কোন খবর এই ক্ষুদ্র মানুষের নিকট পাঠাইতে হইলে তখনি ডাক পড়ে তৃতীয় ব্যক্তি—দেবদূতদিগের। ধর্ম্মে দ্বৈতবাদ আছে সত্য, কিন্তু সে দ্বৈতবোধ চিরন্তন নহে। এই দ্বৈতবোধ একবার স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে পৃথক করে, আবার তাহাদিগকে মিলাইয়া দেয়। ভগবান্‌কে ও মানুষকে ইহা পৃথক করে সত্য, আবার তাহাকে ভগবানের সহিত মিলাইয়াও দেয়।

কিন্তু যে শক্তি এই মিলনের প্রণালী, সে হইতেছে প্রেমের প্রবাহ। ভাবসাগরে জোয়ার আসিলে প্রেমের প্রবাহপ্রণালী ছাপাইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত, সান্ত-অনন্ত সব এক করিয়া দেয়। তখন যীশুর মুখে গান ফুটে—"I and my Father are one;" সুফী তখন প্রিয়তমের মিলনস্পর্শে আনন্দে ভরপুর, বৈষ্ণব তখন মধুর রসের ভরা গাঙে পাড়ি জমায়, আর তান্ত্রিক তখন্ মায়ের রূপসাগরে আত্মভোলা। মাতৃবোধে পার্থক্য বোধও আছে, মহত্ত্ববোধও আছে, আবার নাড়ীর টানের একত্ব-বোধে সর্ব্বতোভাবে ভাবের এবং প্রাণের মিলন ও নির্ভর আছে। এই যে মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক কল্পনা ইহাই ধর্ম্মবোধের পরাকাষ্ঠা।

এই যে মাতা ও সন্তানের দ্বৈত এবং অদ্বৈত সম্পর্কবোধ, ইহা হইতে প্রশ্ন উঠে, মার ইচ্ছা এবং আমার ইচ্ছা, ইহার মধ্যে সম্পর্ক কি? হেগেল (Hegel) মনে করেন—আমাদের প্রাচ্য ধর্ম্মে অনন্তই সব। তাহার প্রধান কথা, সবই ব্রহ্ম। এই সর্ব্বব্রহ্মবাদই প্রাচ্যের অতিধর্ম্ম (ultra-religious pantheism)। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছুই নহে। প্রাচ্য দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজার সহিত প্রজার যে সম্পর্ক, প্রাচ্যের ধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত মানুষেরও সেই সম্পর্ক কল্পিত হইয়াছে। তিনিই স্রষ্টা, মানুষ তাঁহার সৃষ্ট জীব। সুতরাং তিনি তাহাদের সম্পর্কে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। "তুমি মারিলে মারিতে পার, রাখিলে কে করে মানা"—এই ভাব। "বড় কর, ছোট কর, সবই তোমার ইচ্ছা"। কুম্ভকারের হাতে যেমন ঘটের মাটি, ভগবানের হাতে মানুষও ঠিক তেমনি। সুতরাং মানুষের স্বাধীনতা এবং স্বতঃসিদ্ধতার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। শুধু মানুষের কর্ম্মই নহে, তাহার ইচ্ছাও ভগবানের হাতে। ঈশ্বরই তাহার অন্তরকে পুণ্যে উদ্ভাসিত করেন বা পাপে কলুষিত করেন। কল্যাণ-অকল্যাণ, পাপ-পুণ্য সবই পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে। ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন মানুষের পক্ষে অক্ষমতা এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কি থাকিল? এই প্রকারের অনন্তের সন্নিকটে অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতেই পারিবে না।

তান্ত্রিক ভগবান্‌কে কেবলমাত্র প্রভু ভাবে না বা ভাবিতে পারে না। সে ভাবে ভগবান্ তাহার জননী। তাহার মধ্যে মায়ের রস-রক্ত সবই আছে, তবুও সে এবং মা এক নহেন। মা মা, সে সন্তান। মা হইতে সে পৃথক্ হইলেও মায়ের নাড়ীর টান তাহার প্রতি চিরদিনই আছে। তাহার আনন্দেই মার আনন্দ, তাহার দুঃখেই মার দুঃখ। ইহা যদি pantheism (পূর্ণাদ্বৈতবাদ) হয়,—তান্ত্রিক pantheist। আর, ইহা যদি মায়ের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে মা এই পার্থক্য অথচ ঐক্যবোধের dualism (দ্বৈতবাদ) হয় তবে তান্ত্রিক dualist।

রাজা আমার প্রভু, কিন্তু তিনি আমি নহেন। তাঁহার ভাবধারা এবং আমার ভাবধারায় কোন সহজ সামঞ্জস্য নাই। সে সম্পর্ক বাহিরের—সে মিলন ভয়ের। তাই, প্রভু-ভৃত্যের

* ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচলিত ধারণার খণ্ডন "বঙ্গশ্রী"-এর একাধিক সম্পাদকীয় সন্দর্ভে দেখা যাইবে। বঃ সঃ।

সম্পর্কের ভাবধারায় মানুষের স্বাধীনতা নাই। কিন্তু যেখানে মা ও সন্তানের সম্পর্ক, সেখানে স্বাধীনতা পরাধীনতার কোন প্রশ্নই নাই, কোন আঘাত-বোধ বা বেদনা-বোধ নাই। আমার ভাবধারা যে আমি মায়ের নিকট হইতেই পাইয়াছি। তাই তো তাঁহার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার মধ্যে পরাধীনতা কোথায়? তাই তান্ত্রিক আনন্দে গাহিলেন,—"সকলি তোমার ইচ্ছা মা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার ইচ্ছা তুমি কর্ম্ম মা লোকে বলে করি আমি।"

মায়ের ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা এক। এই তো মায়ের অঞ্জলি। বিশ্ব-কল্যাণ-সাধনে মায়ের ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশিয়া যাউক,—বিশ্বের সেবাই আমার মায়ের সেবা হউক, ইহাই কালীপূজায় ভক্তের আত্ম-বিসর্জ্জন,—ইহাই জপ সমর্পণ।

আমার সেই ইচ্ছাময়ী মা সন্তানের নিকট কেমন ভাবে আসিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়া অদ্যকার আলোচনা শেষ করিব।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি, বিশ্বম্॥

তিনি সুকৃৎদিগের শ্রী। তাই আজ মায়ের ভক্তকে সুকৃৎ—কল্যাণকৃৎ হইতে হইবে। পাপাত্মাদিগের কোন শোভা নাই—তাহারা শ্রীহীন। পাপ-চিন্তা ও পাপ-কার্য্য,—হিংসা ও বিদ্বেষ, এবং ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য হইতে দূরে থাকিতে হইবে। হিন্দু আজ সত্যরূপ প্রাণকে ছাড়িয়া অসত্যরূপ প্রাণহীন অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। প্রেমকে ছাড়িয়া ভ্রাতৃ-বিরোধে, হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণায় জর্জ্জরিত। এই পাপকে সমাজ হইতে দূর করিতে না পারিলে মা আবার শোভা, সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধি লইয়া শ্রী-রূপে আমাদের সমাজে ও গৃহে আসিবেন না। এই সমস্ত পাপে রত আমরা পাপাত্মা—তাই আমাদের গৃহে অলক্ষ্মীরই আবির্ভাব। আমরা যদি সৎ জ্ঞানের জন্য প্রযত্ন করি, তবেই তিনি আমাদের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে আবির্ভূতা হইবেন। আমরা সাধু হইলে তিনি শ্রদ্ধা হইয়া আমাদিগের নিকটে আসিবেন। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। আমরা যদি কুল-মর্য্যাদা বাড়াই তবেই অপকর্ম্মে আমাদের লজ্জারূপে তিনি আসিবেন। তিনি যে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জা-রূপেণ সংস্থিতা"॥ এমন যে দেবী, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি, তিনি বিশ্বকে পালন করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা হউক।

সংবেত নতি আমাদের প্রণামের ধারা হউক, বিশ্বের কল্যাণ-বাঞ্ছা আমাদের প্রার্থনা হউক।

আসুন, আমরা দেবীকে আবাহন করি,—মাগো, তুমি আমার একার মা নও; তুমি অখিল জনের জননী। তুমি সকলের আর্ত্তিহারিণী, তুমি জগৎকে পালন কর। তুমি চরাচরের ঈশ্বরী, তুমি প্রসন্ন হও।

সকল বিদ্যা তুমিই, তাই আমাদের মধ্যে সকল বিদ্যা-অর্জ্জনের সাধনা জাগুক; জাতি ও সমাজ ধন্য হউক। জগতের সকল নারীই তুমি, নারীর সম্মান করা ও রক্ষা আমার সাধনা হউক,—আর কোন স্তব নাই মা। ইহাই আমাদের পূজার সাধনা হউক।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

প্রতীচ্য দার্শনিক মতবাদের সহিত প্রাচ্য সাধক-দিগের ভাববাদের মিলনে আমাদের আলোচনা সার্থক হউক।

আসুন আজ আলোচনার অন্তে আমাদের কর্ম্মসিদ্ধিরূপ জপ ও ফল-কামনা মায়ের চরণে বিসর্জ্জন দিয়া সাধনাকেই মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া মাকে প্রণাম করিতে করিতে সমবেত কণ্ঠে বলি—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥*

* বগুড়া কালীতলার কালীপূজা উপলক্ষ্যে লিখিত এবং বগুড়া হিন্দু ধর্ম্মসভায় পঠিত।

বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

রাজপুত্র না রাজকন্যা?

সোনালী রং মাখা বাসন্তী প্রভাত। গো-সহস্রী গঙ্গা-স্নানের দিন। গঙ্গা অভাবে নদী স্নান করিয়া কৈকেয়ী চৌধুরাণী ফিরিতেছেন।

পথের মধ্যে ষষ্ঠীতলা—প্রকাণ্ড চাঁপা রংয়ের গাড়ীটি দাঁড়াইল। প্রায় এক মাইল জুড়িয়া নিবিড় বন, বনের মাঝখানে অশ্বত্থতলায় প্রস্তর-বেদী। এই খানে মায়ের পূজার্চ্চনা হয়। অতি জাগ্রত দেবী, বহু রকম জনপ্রবাদ আছে। কিন্তু কৈকেয়ী এখানে যাওয়া-আসা করিতেছেন খুব বেশী দিন নয়।

অনেক আগে নিত্য পূজার ব্যবস্থা ছিল না, শুধু তিথি-বিশেষে পূজার্চ্চনা হইত। কাছেই একজন গরীব ব্রাহ্মণের বাস, পুরুষানুক্রমে তাঁহারাই সেবক। অর্থাভাবে এদিক্-ওদিক্ ঘোরেন, মায়ের উপর তেমন লক্ষ্য ছিল না। কৈকেয়ী জানিতে পারিয়া সেই ব্রাহ্মণকেই দেবীর পুরোহিত করিয়া নিত্য-পূজার ব্যবস্থা করিলেন, এবং পূজা ও ব্রাহ্মণের নিজ ব্যয়ের জন্য কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিলেন। কিছু দূরেই ব্রাহ্মণের নূতন বাড়ী।

ষষ্ঠীতলা গ্রামের মেয়েরা নদী-স্নান করিয়া দেবীপ্রণাম করিতে আসিয়াছে। ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছামত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পথের ধারে একটি আমগাছতলায় কয়েকটি বালিকা কাঁচা আম কুড়াইতেছিল, গাড়ী দেখিয়া তাহারা চাহিয়া রহিল। একটু দূরে একটি ছেলে একটা করবী গাছের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া এক গাদা হলদে বন-ফুলের মালা গাঁথিতেছিল, সে একবার চোখ তুলিয়া দেখিয়া আবার হাতের কাজে মন দিল।

কৈকেয়ী গাড়ী হইতে নামিয়া পথ ছাড়িয়া বনে ঢুকিয়া ছেলেটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেটির বয়স বছর দশেক হইবে, সবুজ ছিটের ইজের পরা, গায়ে একটি ঘন লাল রংয়ের খদ্দরের পাঞ্জাবী, দু'হাতে দুটি সবুজ কাচের রুলি। খাটো কোঁকড়া চুলগুলি মুখের দু'পাশে ও পিঠে ছড়ান। কন্যাহীনা মা ছেলেকে মেয়ের বেশে সাজাইয়া রাখেন, মনের মত গহনা পরান, লম্বা চুল রাখিয়া বেণী বাঁধার সখ মিটান। যে কারণেই হোক ছেলেটি কৈকেয়ীকে আকর্ষণ করিয়াছে, নাকটি তার তিলফুল নয়—রংটিও বিদ্যুৎ নয়, তবু যে কৈকেয়ী কি দেখিতেছেন, সেটা অন্য মেয়েরা বুঝিতে পারিল না। দলের মধ্যে দু'তিনটি সুন্দরী আছে, তার মধ্যে একজন সব চেয়ে বেশী সুন্দর, অথচ তাদের দিকে একটি বার চোখ না দিয়া ঐ ছেলেটিকে অমন করিয়া দেখা, এ কি তাদের অপমান নয়? বয়স কম হইলেও এটুকু বুদ্ধি তাদের আছে ত!

কিন্তু কি সুন্দর ঐ মালা-গাঁথা ছেলেটির মুখ—বাঁকা ভ্রু দুটি যেন উড়ন্ত পাখী, দুটি উজ্জ্বল চোখ, কৃষ্ণ পক্ষের আঁধার আকাশের তারার মত সে চোখ দুটির দীপ্তি, গায়ের রংটি পূর্ণিমার চাঁদের মত স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল।

কৈকেয়ী বলিলেন, "তুমি ত বেশ মালা গাঁথতে পার!"

ছেলেটি মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল, কৈকেয়ী বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথা?"

"ষষ্ঠীতলা।"

গলার সুরটি বড় মিষ্টি, কৈকেয়ী বলিলেন, "তোমরা কে কে আছ?"

"দাদা, বৌদি, খুকু, সুবল—"

"মা বাবা?"

ছেলেটি মাথা নাড়িল।

কৈকেয়ী আবার বলিলেন, "তোমার দাদা কি করে?"

প্রশ্নটা বুঝিতে না পারিয়া সে চাহিয়া রহিল, দলের সুন্দরী মেয়েটি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "ও বুঝতে পারে নি, ও অমনি হাবা, চেয়ে আছে ত চেয়েই আছে। ওর দাদা ইস্কুলের মাষ্টার, ওরা বড্ড গরীব।"

সেটা কৈকেয়ী আগেই বুঝিয়াছেন। ছেলেটির পরিচ্ছদটি পুরান, কিছু রং-জ্বলা। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা সবাই নানা রংয়ের পোষাক পরিয়া প্রজাপতির মত বেড়াইতেছে, শুধু

এই ছেলেটিই জীর্ণবেশ। সামান্য সঙ্গতি থাকিলেও কেহ আজিকার মত একটা বিশেষ দিনে বাড়ীর ছেলেকে এমন বেশে রাখে না। গায়ে সোনার আঁচড়টি ত নাই-ই।

সঙ্গিনীর কথায় ছেলেটি মন দিল না, আপন মনে মালা গাঁথিতে লাগিল। মুখে সুন্দর অভিনিবেশের ভাব। যতই গরীব হোক, ছেলেটি যে খুব যত্নে মানুষ দেখিলেই বুঝা যায়, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত অমলিন, নির্ম্মল। পাড়াগাঁয়ের মায়েরা কিছু অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ছেলে মানুষ করে, শেষে বয়সের সঙ্গে সেটা তাদের মজ্জাগত হইয়া যায়। তারা ঘর-দুয়ার বাসন-কোষণ খুব চক্‌চকে রাখে, কিন্তু শুইবার বিছানা, পরণের কাপড় ও নিজের দেহ এই তিনটি সম্পর্কে উদাসীন। মাথায় ময়লা জমিয়া জট বাঁধে, খেয়াল নাই। একটা পূজা-পার্ব্বণ বা উৎসব-দিনের অপেক্ষায় থাকে—গা ছাড়িয়া দিয়া। তার পরে সেই দিনটা আসিলে মাথা ঘসা, কাপড়ে সাবান দেওয়া এবং ছেলে-মেয়েদেরও একটা গতি হয়। আবার কিছু কালের জন্য নিশ্চিন্ত।

তথ্যটা কৈকেয়ী জানেন বলিয়াই একটু আশ্চর্য্য হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

মুখ না তুলিয়াই সে বলিল, "লক্ষণ।"

কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "লক্ষণ ? তুমি লক্ষণ ? তোমার দাদার নাম কি রাম ?"

এবার জবাব দিল সুন্দরী মেয়েটি, "লক্ষণ বলে ডাকে ওকে, ওর ভাল নাম সুদেষ্ণা বোস।"

কৈকেয়ী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন, তার চেয়ে বেশী হইল আনন্দ, এক নিমিষ চুপ করিয়া সুদেষ্ণাকে দেখিলেন, শেষে বলিলেন, "কে নাম রেখেছে তোমার ?"

সুন্দরী মেয়েটি খুব সপ্রতিভ, সেই চট্ করিয়া জবাব দিল, "ওর বৌদি, ও ওর দাদার খুব বাধ্য কি না, তাই লক্ষণ বলে ডাকে; বলে 'আমার লক্ষণ দেওর'।"

কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই দেওর সাজিয়ে রাখে ? সুদেষ্ণা, কই তোমার বৌদি ?"

"পূজোর কাছে আছে।"

কৈকেয়ী আর কিছু না বলিয়া বনের মধ্যে ঢুকিলেন। নিবিড় বন—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ—কত জানা অজানা গাছ—পক্ষীরা চঞ্চুতে বহিয়া পক্ক ফল আনে, বীজ ঝরিয়া আপনি গাছ হয়।

কত ফলবান্ তরু, কত সুন্দর লতা, কত ফুলের গাছ, আপনি জন্মে, আপনি বাড়ে, আপনি শুকায়। এই বনের একটি পাতায়ও কেহ হাত দেয় না। শুধু ছেলে-মেয়েদের বেলা কোন নিষেধ নাই, তাহারাই মা ষষ্ঠীর সব চেয়ে প্রিয়। আর দলে দলে পশুরা চরিয়া বেড়ায়, তাহাদেরও নিষেধ নাই। নিষেধ শুধু হিংস্র, ভীরু, সংশয়ী বয়স্ক মানুষের বেলা।

পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, পুরোহিত চলিয়া গিয়াছে, শুধু দু'চার জন প্রসাদ নির্ম্মাল্য গুছাইয়া লইতেছে। হঠাৎ কৈকেয়ীকে দেখিয়া তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া রহিল। যারা চেনে না, চুপি চুপি অন্যের কাছে পরিচয় জানিয়া লইল।

কৈকেয়ী বেদীমূলে প্রণাম করিলেন। মেয়েরা পূজার কাছে ছিল না, তারাও প্রণাম করিল। সুদেষ্ণা ছোট্ট কপালটিতে মাটীর ছাপ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কৈকেয়ী বলিলেন, "কৈ তোমার বৌদি ?"

"এই যে", বলিয়া একটি এলোকেশীর আঁচল ধরিয়া সুদেষ্ণা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল।

এতটুকু মেয়ের হাসির এত শোভা ? যেন বিজলী খেলিয়া গেল। কৈকেয়ীর মনটা একটা মধুর আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সুদেষ্ণার বৌদির দিকে চাহিলেন—বয়সে তরুণী, সুন্দর চেহারা, একটু ক্ষীণাঙ্গী। হাত দুটিতে শাদা শাঁখা, একখানা পুরান কালপেড়ে গরদের শাড়ী পরা, শাড়ীর পাড়ের রং জলিয়া গিয়াছে। ইহারও মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সুদেষ্ণারই মত পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল।

কৈকেয়ী গৃহিণীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা পূজো দিলেন ?"

জবাব দিলেন একজন। "ঠিক পূজো নয়, নদীতে নাইতে এলাম, মাকে পেন্নাম করে যাবই, তাই কিছু কিছু এনেছিলাম। এদিকে এলে মার কাছে একবার না দাঁড়িয়ে ত যেতে পাবি নে"—বলিয়া বেদীর দিকে চাহিয়া মাথাটি একটু নীচু করিলেন।

কৈকেয়ী ফিরিলেন, কিছুদূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সুদেষ্ণা বৌদির গায়ে ভর দিয়া চাহিয়া আছে, চোখে একটা উদাস স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব, এ বয়সের মেয়ের চোখে এমন

চাহনি কৈকেয়ীর কাছে একটু নূতন বলিয়া বোধ হইল। আসল কথা, সুদেষ্ণাকে ভাল লাগিয়াছে, তাই তার সবই ভাল মনে হয়।

কৈকেয়ী চলিয়া গেলে সুদেষ্ণার বৌদি বলিল, "উনি প্রণাম করে গেলেন, কিছু প্রসাদ দিলে হয় না মেজদি ?"

"উনি কি নেবেন ?"—প্রশ্ন করিলেন বড় গিন্নী।

মেজদি অর্থাৎ ষষ্ঠীতলার মেজ-গিন্নী বলিলেন, "ওমা প্রসাদ না নেয় কেউ ? ভাল কথা মনে করেছিস করুণ, দে ঐ রেকাবীটা—"

একটি বড় রেকাবে প্রসাদ সাজাইয়া মেজ-গিন্নী সুদেষ্ণাকে গিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির দিয়ে আয় লক্ষ্মণ, চলেই গেলেন বুঝি—"

সেরা সুন্দরী মেয়েটি রেকাবীটি লইয়া বলিল, "আমি দিয়ে আসি—"

সুদেষ্ণা এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। মেজ-গিন্নী বলিলেন, "এই নাও, এতক্ষণে সাড় হলো মেয়ের। ও যে থাকে থাকে কি ভাবে—বুঝতে পারি নে। ওকে একা একা কোথাও যেতে-আসতে দিস নে করুণ, দেব্-দেব্‌তার দিষ্টি পড়লে অমন হয়, সন্ধ্যে কি দুপুর বেলা এলো চুলে থাকে না যেন।"

একটু ভয়ে ভয়ে করুণা সুদেষ্ণার দিকে চাহিয়া বলিল, "না দিদি, ও কোথাও যায় না একা। ওর ভাবই যে অমনি ধারা। পড়তে বসে এক দিকে চেয়ে থাকে, খেতে খেতে ভুলে যায়—যেন স্বপন দেখছে, জিজ্ঞেস করলে কিছু কয় না। ও নিজেই বোঝে না—"

কৈকেয়ী গাড়ীতে বসিয়াছেন, মলের ঝুনুঝুনু শব্দ শুনিয়া এ-দিকে চাহিলেন, সবার আগে সুন্দরী মেয়েটি রেকাবী হাতে পৌঁছিল বলিল, "প্রসাদ এনেছি আপনার জন্যে—"

"বেশ করেছ", রেকাবীটি লইয়া হাসিমুখে পাশে রাখিলেন। মেয়েটির কাঁধে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

"সুষমা।"

"বাঃ মেয়েরা সবাই সু, তোমাদের সুদেষ্ণা কই ?"

"এই যে"—সুষমা একটু সরিয়া দাঁড়াইল, পিছনে সুদেষ্ণা, গাঁথা মালাটা তাহার নিজের গলায় উঠিয়াছে, কালোচুল বেড়িয়া হলদে মালাটি লাল জামার উপর দুলিতেছে।

কৈকেয়ী তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমায় কিছু দিলে না ?"

সুষমা হাসিয়া বলিল, "ও কি দেবে ? ওর কিছু নেই, একটা পুতুল অবধি না। ওর বৌদি এক গাদা মাটির পুতুল বানিয়ে দিয়েছে, ও সেইগুলো রং ক'রে, কাপড় পরায়, ওর বৌদিও আবার ওর সঙ্গে পুতুল খেলে—"

কৈকেয়ী হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, "এস এখানে—"

সুদেষ্ণা কাছে আসিল। কৈকেয়ী বলিলেন, "তোমার কাছে যা আছে, যদি আমি চাই—দেবে ?"

সুদেষ্ণা মাথা হেলাইল।

সুষমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি দেবে ও ? দুটো কাঁচের রুলি—"

সে কথায় কাণ না দিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "তোমার ফুলের মালাটা দাও তবে—" বলিতে-না বলিতে সুদেষ্ণা মালা খুলিয়া কৈকেয়ীর হাতের উপর রাখিল।

কৈকেয়ী সুদেষ্ণার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "তোমায় যদি আমার বাড়ী নিয়ে যাই, যাবে ?"

সুষমা বলিল, "আমরা সব্বাই যাব, কেউ বারণ করবে না। ও বৌদিকে ছেড়ে কোথাও যায় না, সব কথায় ওর বৌদি—"

অন্য একটি মেয়ে বলিল, "আদেখলে বৌদি।"

সুষমা ছড়া কাটিল—

আদেখলের পাতে পড়লো ঘি—
আদেখলে চক্কে বলে এ আবার কি।

সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হাসিয়া উঠিল। সুদেষ্ণার ছোট্ট কপালে একটু ভ্রূকুটি ফুটিল মাত্র। দলের মধ্যে সেই ছোট ও দীন। দলের প্রধান সুষমা, রূপে, বয়সে ও বাক্‌পটুতায়।

কৈকেয়ী সস্নেহে সুদেষ্ণার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "তবে তোমার বৌ-দিকে জিজ্ঞেস ক'রো—"

ড্রাইভারকে বলিলেন, "চল।"

কিছু দূর গিয়া একটা বাঁক ঘুরিয়া গাড়ী বড় রাস্তায় পড়িল। তখন আবার দেখা গেল, মেয়েরা কেহ ঢিল ছুঁড়িয়া আম পাড়িতেছে, কেহ কুড়াইতেছে, কোন বুদ্ধিমতী

সদ্ব্যবহারে সব চেয়ে ব্যস্ত। কৈকেয়ী দেখিলেন, সেই গাছের নীচে সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া সকলের সঙ্গে আলাদা ভাবে থাকিয়া সুদেষ্ণা কৈকেয়ীর গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে, শেষ রাত্রের তারার মত অচঞ্চল ও উজ্জ্বল চোখ, চোখে সেই রকম স্নিগ্ধ কিরণ-ছড়ানো চাহনি।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম

নারায়ণগঞ্জের চৌধুরী বংশের এক বংশধর শ্রীনিবাস বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইদের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া একদিন নিঃশব্দে বিনা সম্বলে স্ত্রী ও শিশু পুত্রটি লইয়া শীতললক্ষ্যা নদী পাড়ি দিয়া শ্রীনগরে আসিয়া পৌছিয়াছিল। তখন শ্রীনগরের নাম ছিল ফুলতলি। এক চাষা ক্ষেত্তর মোড়ল সবে মাঠে লাঙ্গল দিতে সুরু করিয়াছে, তখনও ভোর হইতে কিছু দেরি আছে, এমনি সময়ে সেই নির্জ্জন মাঠের ধারে নদীতীরে এক তেজী পুরুষ বসিয়া ছিল, কাছে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও একটি শিশু। চাষাকে দেখিয়া শ্রীনিবাস উঠিয়া আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল। অনেক দিন নৌকায় বেড়াইয়াছে, শেষে এই নদীর ধারে ইহারা নামিতে চাহিলে নামাইয়া দিয়া মাঝি নিজের গন্তব্য স্থান উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বধূর গলার হারটি দিয়া মাঝির ভাড়া শোধ গিয়াছে।

নিস্তব্ধ নির্জ্জন আধ-আলো আধ-আঁধার মাঠে সাক্ষাৎ দেবে ও পুরুষকারে। চাষার পায়ের কাছে শিশুটিকে রাখিয়া পুরুষটি বলিল, "এই তোমার পৌত্র, আমাকে সন্তান মনে কর, এই তোমার পুত্রবধূ, আমাদের আশ্রয় দাও—জায়গা দাও—"

চাষা গরু লাঙ্গল ফেলিয়া শিশুকে তুলিয়া লইল; সাক্ষী রহিল, উজ্জ্বল সিন্দুরাভ পূর্ব্ব গগন, পশ্চিমের নিষ্প্রভ ম্লান চাঁদ ও নদীর কালো জল।

তার পরের সে দীর্ঘ ইতিহাস কেশবের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—'শ্রীনগরের ইতিহাস'। ক্ষুদ্র গ্রাম ফুলতলি ধীরে ধীরে জাঁকাইয়া উঠিয়া পঁচিশ বৎসর পরে শ্রীনগর নাম ধরিল।

চাষার হাতে স্ত্রী পুত্র সঁপিয়া দিয়া শ্রীনিবাস বাহির হইল, কখনও উত্তরে, কখনও দক্ষিণে, কখনও পশ্চিমে, শুধু পূর্ব্বাঞ্চলটা বাদ দিয়া অবিশ্রাম ঘুরিতে লাগিল, শেষে আর দূরে জাহাজ-পথে ভারতবর্ষ ছাড়িল, কখনও দু'বছর, কখন তিন-চার বছর পরে ফুলতলি আসিত, তখন চাষার ঘ আনন্দের বান ডাকিত। শ্রীনিবাসের স্ত্রী ইন্দ্রাণী চাষা চাষাণীকে শ্বশুর-শাশুড়ীর মত দেখে, তাহাদের ছোট্ট মে সোনা বাপ-মায়ের কাছে বেদখল হইয়া ইন্দ্রাণীর কো জুড়িয়া বসিল। রাজার ঘরের বৌ ইন্দ্রাণী মলিন কাপ পরিয়া মনে মনে প্রবাসী স্বামীর অপেক্ষায় থাকে, বাইে সংসার করে। তার ছেলেটি চাষার প্রাণ-দোসর।

বিদেশ হইতে শ্রীনিবাস আসে, চাষার আঙ্গিনায় চাঁদে হাট বসে। ইন্দ্রাণী একা দশটা হইয়া নূতন উদ্যমে কাজ করে লজ্জায় আনন্দে মুখ রাঙ্গা। অনেক দিন পর পর দেখ হয়, নববধূর মধুর ভাবটা রহিয়াই গেল। চাষা নদীতে জা ফেলে, দুধ দুহিয়া আনে, রান্নাঘরের দুয়ারে বসিয়া ইন্দ্রাণীে উপদেশ দেয়, "আর কি কি লাগবে বল্ মা এনে দি, সব রক করে আমার ছেলেকে খাওয়াবি, খাদ না দিস্ দাঁতে কুটো কাটবো না, দেখিস। যে অমৃত তোর সোয়াদ হাতে, ছেে যেন দুদিনে সেরে যায় বুঝলি?"

উদ্যোগী পুরুষ লক্ষ্মী লাভ করে। কুড়ি বছর পে চাষার কুটীর ঘেরিয়া প্রাসাদ উঠিতে লাগিল। চাষার মে চাঁপা নাম ধরিল চম্পাবতী চৌধুরাণী; সেই জমিদার শ্রীনিবা চৌধুরীর মা। চাষা ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী বিষয়বিরাগী, নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীনিবাসের ছেলেে লইয়াই উন্মত্ত রহিল। চম্পাবতী হীরা মুক্তা পরিয়া সা মিটাইতে লাগিল।

ইন্দ্রাণী আজীবন বধূ হইয়াই রহিলেন। শ্রীনিবা চম্পাবতীর প্রতিনিধি হইয়া জমিদারী চালাইতে লাগিলেন

কন্যা সোনা—সুবর্ণবতী নামে মেদিনীপুরের এক মহৎধনী ঘর আলো করিল, এখন তাহার বংশধর রাজা উপাধি লইয়াছে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের যে বাগান তাহার উত্তর দিকে চাষার ভিটা, চারিদিকে বাগান, মাঝখানে ভিটা। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে।

জ্ঞাতি-বিবাদ মিটিল, নারায়ণগঞ্জে শ্রীনিবাসের যাতায়াতও

আরম্ভ হইয়াছিল শেষের দিকে। কিন্তু সেখানকার কপর্দ্দকও শ্রীনিবাস আর ছুঁইলেন না।

শ্রীনিবাসের সেই শিশু প্রতাপ চৌধুরী।

বংশমালা

স্বর্গীয় প্রতাপ চৌধুরী ছিলেন ভয়ানক প্রতাপশালী জমিদার। তাঁর দাপটে না কি বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খাইত। যদিও সেই কাজটা কেহ নিজের চোখে দেখে নাই—তবু সাধারণের এত বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিবাদকারীকে রীতিমত লাঞ্ছনা সহিতে হইত।

প্রতাপ চৌধুরীর ছেলে ভবানী চৌধুরী যেমন শান্ত-স্বভাব—তেমনই দয়াশীল। প্রতাপ চৌধুরী ছেলেকে ঠাট্টা করিতেন 'বুদ্ধদেব' বলিয়া। শেষে ছেলের স্বভাব বদলাইবার নহে দেখিয়া মন দিলেন পুত্রবধূর খোঁজে।

মিত্রেরা শ্রীনগরের জমিদারদের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার। অর্থে কি ক্ষমতায় কেহ কম নন। মিত্রদের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে। নবীন জমিদার গিরিরাজ মিত্র তখনও সাবালক হন নাই,—বেশী দেরীও নাই। গিরিরাজের মা ছেলের বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছেন,—মিলিল আর এক জমিদার—ত্র্যহস্পর্শ লাগিল। শেষোক্ত জমিদারটি যৌবনে ছিলেন খাঁটী সাহেব—বার কয়েক য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারই মেয়ে কৈকেয়ী। তখনকার লোকে জানিত বাংলা দেশে একটি মাত্র সুন্দরী আছে—সে কৈকেয়ী।

বাপের মনোভাবটি যদি বরাবর এক রকম থাকিত—তবে কৈকেয়ী বোধ হয় কোন য়ুরোপীয়ানের হাতেই পড়িতেন। ভাগ্যক্রমে বাপ হিন্দু হইয়া উঠিলেন,—এবং বার বছরের মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছা হইল, গিরিরাজের সঙ্গে কৈকেয়ীর বিবাহ সম্বন্ধ হইল।

কৈকেয়ী স্পষ্ট বলিলেন—অমন গাছের গুঁড়ির মত বরকে আমি বিয়ে করব না বাবা—ও বাড়ীতে ঢোকে কি করে? ওর জন্যে হাতীশাল করে দেয় না কেন?

কথা গোপন থাকে না। মিত্ররাও জানিল, শ্রীনগরের প্রতাপ চৌধুরীর কাণেও গেল। অমনি নিজে যাচিয়া আসিয়া কৈকেয়ীকে পুত্রবধূ করিয়া লইয়া গেলেন।

গিরিরাজ অলস বিলাসে কাল কাটাইতেন—এই ব্যাপারে তাঁহার চৈতন্য হইল—অবিলম্বে ব্যায়াম-চর্চ্চায় মন দিয়া পুষ্ট নধর শরীরটিকে দৃঢ় ও সুগঠিত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন,—যিনি আধ মাইল পথ হাঁটিতে হাঁপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেন, বছর দুই পরে দেখা গেল তিনি একজন চমৎকার ঘোড়-সোয়ার। সূর্য্যোদয়ের আগে প্রকাণ্ড ঘোড়া ছুটাইয়া দশ-বিশ ক্রোশ প্রাতঃভ্রমণ সারিয়া আসেন।

এদিকে কৈকেয়ীর সগর্ব্ব স্বভাব, বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ ধী ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া প্রতাপ চৌধুরীর সমস্ত ক্ষোভ দূর হইয়াছে। কৈকেয়ী তাঁর ডান হাত—দেওয়ান ব্রজনাথ বাঁ হাত। আরও কিছু কাল পরে কৈকেয়ীই হইলেন জমিদার, প্রতাপের সঙ্গী হইল পৌত্র কেশব।

প্রতাপ কিছুই দেখেন না—কেহ কিছু বলিলে বলেন—"আমার মা যা করবে—আমি কি তাই পারি—তাই ত সরে দাঁড়িয়েছি। আমি যা চেয়েছিলাম—মা তার চেয়ে অনেক বেশী।"

কৈকেয়ী একদিকে কঠিন অন্যদিকে দয়াবতী। প্রজার দুঃখ বিপদে সাহায্য করেন দুহাতে, অন্যায় করিলে সিংহীর মত নিষ্ঠুর হন। প্রতাপ বলেন,—"এই আমি চাই, এই আমি চাই—যে-মা শুধু ভালই বাসে, সে মা নামের যোগ্য নয়। যে-মা শাসন করে সেই হচ্ছে মা।"

শ্বশুরের সঙ্গে কৈকেয়ী হাতীর পিঠে করিয়া শিকারে যান, ভবানী জানালায় দাঁড়াইয়া দেখেন। স্ত্রী তো নয় রাজেন্দ্রাণী! সম্রাজ্ঞী! লোকে কৈকেয়ীকে চেনে—ভবানীকে চেনে দীন দুঃখী। বর্ষাকালে বজরায়, গ্রীষ্মে হাতী কিংবা পাল্কীতে কৈকেয়ী মহল দেখিয়া বেড়ান, ভবানী বিরহ-নিশি যাপন করেন, মনের খবর আর কে রাখে!

জমিদার-বাড়ীটি ছিল সেকালের ধরণে তৈয়ারী, কৈকেয়ী নক্সা আঁকিয়া বাড়ীর চেহারা ফিরাইলেন। বছর কয়েকের মধ্যে বাড়ীটি চারি গুণ বড় হইল, চেহারা ও রং বদলাইয়া গেল। কৈকেয়ী বলিলেন, "বাবা, যে-বাগানের ফুলে দেব-পূজো হয়, সেই বাগানের ফুল কি মানুষের কাজে লাগা উচিত?"

"কিছুতেই না, তুমি কি ভাবছ বল দেখি?"

"সে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, ঠাকুর-বাড়ীর সঙ্গে বড় একখানা বাগান করা হোক—সেইটি থাক্‌বে ঠাকুরের।"

"তথাস্তু।"

বাগান আরম্ভ হইল শেষও হইল। কিন্তু লোকের দেখার শেষ আজও হয় নাই। কি প্রকাণ্ড বাগান, লোকে বলে এমন ফুল নাই—যা এ বাগানে নাই। কত প্রাচীন ফুলের নাম, যা এতদিন সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যেই বন্দী ছিল, সেই দুর্লভ ফুল চাক্ষুষ হইল। বাগানের চারিদিকে তিন হাত উঁচু তিন হাত চওড়া প্রাচীর—বাহির হইতে দেখিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু লোহার কাঁটা তারের বেড়া প্রাচীর ঘেঁসিয়া প্রায় গাছ সমান উঁচু। মিত্রেরা ঠাট্টা করিয়া নাম দিলেন 'চীনের প্রাচীর', বাগানের নাম দিলেন 'ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান'।

কেশবকে প্রতাপ চোখের আড়াল করিতে পারেন না—কিন্তু বলেন, "নাঃ—এও ভবানীর মতই হবে।"

কৈকেয়ী বলেন, "আপনি হতাশ হবেন না বাবা, এঁকে আমি ঠিক মানুষ করে তুলবো।"

প্রতাপ স্বর্গীয় হইলে ভবানী জমীদার হইলেন নামে, কাজে হইলেন কৈকেয়ী। ব্রজনাথের যোগ্য ছেলে দেবনাথ। ব্রজনাথ দেওয়ানগিরি ছাড়িয়া দিলেন। দেবনাথ হইলেন ম্যানেজার। জমীদারী তো কৈকেয়ীর নখ-দর্পণে।

ভবানী তো চিরদিনই স্ত্রীর অধীন, একটি কাজ কেবল স্বাধীন ভাবে করিয়া ফেলিলেন। দীন দুঃখীর দুঃখে তাঁহার মন কাঁদিত, তাই কৈকেয়ীর নামে এক দান-ভাণ্ডার খুলিলেন।

কৈকেয়ী মোটেই খুসী নন; ভবানী বলিলেন, "তুমি যাই বল, তোমার নামে একটা কিছু করবার আমার বড় সাধ ছিল, আর একটা কথা আমার রেখো—যদি কখনও অবস্থান্তর ঘটে, নিজেদের কষ্ট হয়, তবু এই ভাণ্ডারের খরচ সংক্ষেপ কোরো না। সাধ্যে কুলায় বেশী করবে—কিন্তু কমিয়ো না।"

ভবানীর কাজ আরম্ভ হইল—নূতন ত্রিতল বাটী, উপরে অফিস, নীচে দান-ব্যাপার। সেই বাড়ীর শীর্ষে বড় বড় রঙ্গীন অক্ষরে নিজের নামটি লেখা দেখিয়া কৈকেয়ীর বিমুখ মন কোমল হইল।

মুখে বলিলেন, "এতে কেবল লোককে অলস করে তোলা হয়—দরকার মত খরচ হাতে পেলে সহজে কি কেউ খেটে রোজগার করতে চাইবে?"

ভবানী বলিলেন, "সহজে কি কেউ ভিক্ষেই করতে পারে? নেহাৎ দায়ে না পড়লে কেউ লোকের কাছে হাত পাতে না।"

কৈকেয়ী উত্তর দিলেন, "লোক-চরিত্র তুমি কিছুই জান না, সুবিধে পেলে কেউ ছাড়ে না, একজন অনাথের সঙ্গে দশজন সনাথ আসবে।"

"আসুক, অত ভাবতে গেলে কিছুই করা যায় না। কাকা দেখবেন বলেছেন, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

সৌভাগ্যে, গর্ব্বে, আনন্দে, মহিমায় কৈকেয়ী যখন পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রভাময়ী, সেই সময় ভবানী অকস্মাৎ পিতার অনুসরণ করিলেন।

পাঁচদিন পরে কৈকেয়ীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, সকলে ভাবিয়াছিল দুই জনই বুঝি এক সঙ্গে যায়।

বিধাতা কৈকেয়ীকে ভাঙ্গিয়া গড়িলেন—জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ স্বামীর সঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়া অর্দ্ধাংশ লইয়া কৈকেয়ীকে সংসারের দিকে ফিরিয়া চাইতে হইল।

[ক্রমশঃ

ভারতের লবণ-শিল্প ও বঙ্গভূমি

—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু এবং বঙ্গপ্রদেশের সমুদ্রতীরস্থ লবণাক্ত ভূমি হইতে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই লবণ প্রস্তুতের ব্যাপক কুটীর-শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। হিন্দু রাজত্বে এই শিল্পের প্রতি এবং লবণ-বাণিজ্যের প্রতি রাজকর্ম্মচারীদের সুদৃষ্টি এবং যত্ন ছিল তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লবণ-অধ্যক্ষ নামে কোন কর্ম্মচারীর নাম আছে, তিনি রাজ্যের লবণ-বিভাগের কর্ত্তা হইয়া রাজার জন্য রাজকোষে সম্ভবতঃ শুল্ক প্রেরণ করিতেন। যাঁহারা লবণ প্রস্তুত করিতেন, ব্যবসা বা বাণিজ্যের জন্য বৃহদায়তনের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের দস্তুরমত এই উল্লিখিত লবণাধ্যক্ষের নিকট 'লাইসেন্স' বা অনুমতি লইতে হইত।

পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে সমুদ্র-উপকূলের এই শিল্প ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহু লবণের উৎস ছিল বা আছে। বর্ত্তমানে সেইগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণ লবণ পাওয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে সুবৃহৎ মেয়ো লবণ-খনি অতি প্রাচীন যুগ হইতে আর্য্যস্থানের অধিবাসীদের লবণ জোগাইতেছে। গ্রীক্ সম্রাট বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারত-অভিযানের সময়ে এই লবণ-খনিতে কাজ হইতে দেখিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে মেয়ো লবণের পাহাড় ১৫০০-২০০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া আছে—এ ভাণ্ডার অফুরন্ত। খেওড়া, ওয়ার্চা, কলাবাগ, জাট্টা, বাহাদুরখেল এই কয়টী জায়গায় মাত্র এই বিরাট লবণ-পাহাড়ে খনি নির্ম্মাণ করিয়া লবণ বহিষ্কৃত করা হইতেছে। মেয়ো লবণ-ভাণ্ডার জগতের শ্রেষ্ঠ উৎস-সহ এই স্থান হইতে সহস্র বৎসর সমগ্র পৃথিবীর চাহিদা মিটান যায়। সিন্ধুনদের দুই পাশে স্থিত এই খনিগুলি হইতে যে লবণ বাজারে আসে তাহা খনিজ বলিয়া সমুদ্রজ (সামুদ্র) লবণ অপেক্ষা লবণাক্ত; আমরা এই লবণ সৈন্ধব নুন বলিয়া জানি।

পর্ব্বত ও সমুদ্র ছাড়া মধ্য-ভারতের সম্বর ও কয়েকটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ হ্রদ হইতেও আমরা এই মহাদেশের অধিবাসী কিন্তু পরিমাণ লবণ পাইয়া থাকি। মধ্যযুগে রাজপুতানার স্বাধীন রাজ্যগুলির অধীনে সম্বর, পচভদ্র, দিদোয়ানা এবং খারাগোদার কতকগুলি লবণের কারখানা ছিল; বর্ত্তমানে সেইগুলিই সুসংস্কৃত হইয়া উন্নত প্রণালীতে কাজ করিতেছে। যুক্তপ্রদেশে ও বঙ্গপ্রদেশের মধ্যভাগে ও নিম্নভাগে নোনামাটী হইতে লবণাক্ত জল পরিস্রুত করিয়া সেই 'ব্রাইন' বা নোনা জল জাল দিয়া নুন প্রাপ্ত পাইবার রেওয়াজ বহুদিন হইতেই ছিল। উড়িষ্যা ও বঙ্গোপসাগর উপকূলস্থ নিম্নভূমিতে এই পদ্ধতিতেই হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে মলঙ্গীরা লবণ প্রস্তুত করিত। মাঝে বৃটিশ নীতির ফলে এই শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এখন পুনরায় এই শিল্পের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দিকে আইনের দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই উপায়ে লবণ পাইবার পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে পুনরায় গ্রাম্য লোকেরা নোনামাটি হইতে আহার্য্যোপযোগী লবণ এই উপায়ে প্রস্তুত করিবার অধিকার পাইয়াছে; ইহার জন্য কোন শুল্ক দিতে হয় না।

[খ]

পূর্ব্বোক্ত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে বিস্তৃত লবণের পাহাড়শ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি সুবিধাজনক স্থানে মাত্র খনির পত্তন হইয়া খনন-কার্য্য চলিতেছে। খেওড়ার মেয়ো মাইন (খনি) ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তনের লবণ-খনি। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। পৃথিবীর বৃহত্তম লবণ-খনি পোল্যাণ্ডের উইলিচ্কাতে (Wieliezka) ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া পোল্যাণ্ডের এই খনিগুলিতে কাজ হইতেছে। নিম্ন কার্পাথিয়ার অনেকখানি স্থান ঘিরিয়া মাটীর তলায় উইলিচ্কার লবণ-খনি এমন ভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, তাহাদের তুলনায় আমাদের ভারতবর্ষের লবণ-খনিগুলি কিছুই নহে। এই খনিগুলিতে মাটীর অতি নীচে বাসোপযোগী বাড়ী-ঘর

প্রভৃতি আছে—পূর্ব্বে সেখানে লোক বাস করিত। ইহা ভিন্ন খনিগুলিতে শ্রমিকদের জন্য রেল-ষ্টেশন, পাকা পথ, হোটেল, আমোদপ্রমোদের জায়গা অনেক কিছুই আছে।

করকচ লবণের ট্যাঙ্ক : বাংলার কারখানা।

খেওড়ার নিকটে ওয়ার্চা, কোহাট, বাহাদুরখেল, করাক। কলাবাগ, জাট্টা প্রভৃতি অনেকগুলি লবণ-খনির সৃষ্টি হইয়াছে; ইহার প্রায় সবগুলিই ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। খেওড়া খনি অতি প্রাচীন; বর্ত্তমানে অতি আধুনিক উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে এখানে লবণ সংগ্রহ করা হয়। মুসলমান আমলে মোগলরা ইহার কিছু উন্নতি করেন, তার পর ইহা শিখদের হস্তে চলিয়া আসে। কিংবদন্তী আছে যে, খেওড়াতে যে মুসলমান শ্রমিক সম্প্রদায় কাজ করিতেছে, ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষরাও এই খনিতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে কাজ করিয়া আসিতেছে।

১৮৪৯ সালে বৃটিশ-রাজ এই অঞ্চলে অধিকার পাইলে রীতিমত নিয়মানুগ পদ্ধতিতে খনির সংস্কার এবং ভাগ-বিভাগ হয়। বৃহত্তর খনি খেওড়াতে এখন চার-পাঁচটি সেকশন করিয়া পুরাদমে নোনা পাথর সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। প্রায় ১১।১২ মাইল রেল-লাইন পাতা খনির মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টবে করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে লবণ পদার্থ বাহির হইয়া আসে, ইহা ছাড়া বিদ্যুৎ-সাহায্যে শ্রমিকরা অক্লেশে পাথর কাটিতে সমর্থ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে খেওড়া, ওয়ার্চা, বাহাদুরখেল প্রভৃতি খনিগুলিতে গত ৪।৫ বৎসর বাড়তি শুল্ক আদায়ে যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে। খেওড়া খনি হইতে গড়পড়তায় প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ মণ লবণ পাওয়া যাইতেছে, যুদ্ধের সময় বিদেশী লবণের আমদানী কমিয়া যাওয়াতে ইহার পরিমাণ বাড়িয়া একবার (১৯১৮-১৯) ৪২ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছিল। আবার ১৯২৩ সালে—যে সময় লবণের শুল্ক লর্ড রেডিং-এর সময়ে ১।০ হইতে ২।।০ দাঁড়াইয়াছিল, সে সময় ইহা ১৩ লক্ষতে নামিয়া গিয়াছিল। খেওড়ার লবণের অর্দ্ধেকের বেশী পাঞ্জাবে ব্যবহার হয়। বিহার অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কিছু বেশী ক্রয় করে। বাংলাতে এই নুন গড়ে বিশ-পচিশ হাজার মণের বেশী আসে না, কারণ রেলপথে এতদূর আসিতে স্বভাবতই দর বাড়িয়া যায়।

পাঞ্জাব সল্ট রেঞ্জের ওয়ার্চা খনিটিও বর্দ্ধিষ্ণু। একেবারে খেওড়ার ছাঁচে বাড়িয়া উঠিয়াছে, যদিও আয়তনে ইহা অনেক ছোট। এখানে বৎসরে ৬।৭ লক্ষ মণ লবণ সংগ্রহ হইয়া

'সোলার বেড' : করাচি।

থাকে। ওয়ার্চার পরই কলাবাগের নাম করা যাইতে পারে। কলাবাগ খনি সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী কলাবাগ গ্রামের অতি নিকটে, এখানেও ৩।৪ লক্ষ মণ লবণ প্রতি বৎসর সংগ্রহ

হয়। খেওড়া, ওয়ার্চা এবং কলাবাগ সিন্ধুর এপারে এই তিনটি লবণ-খনি পর্য্যন্ত নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের লাইন আছে, মাল বহন রেলওয়ের সাহায্যেই হইয়া থাকে।

সিন্ধুর অপর পারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে

বাংলার একটি লবণের কারখানায় ইরাণী চাকার জল নিষ্কাশন।

কোহাটের গিরিমালার খাদে খাদে সরকারের তত্ত্বাবধানে তিনটি স্থানে নোনা পাথর সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। বাহাদুরখেল, জাট্টা এবং কারাক্, এই খনিগুলির লবণ আফগানিস্থান, ওয়াজিরিস্থান, চিত্রাল প্রভৃতি উপরিস্থিত দেশসমূহে চালান হইয়া থাকে। বাহাদুরখেল খনি কোহাটের বড় খনি, ডিনামাইট দিয়া ফাটাইয়া চাঁই চাঁই নোনা পাথর বাহির করিয়া কাবুল কান্দাহার পর্য্যন্ত চারিদিকে চালান যায়। এই তিনটি খনি হইতে বৎসরে পাঁচ সাড়ে-পাঁচ লক্ষ মণ লবণ বহিষ্কৃত হয়। কোহাটের লবণ অল্প লাল্‌চে গোছের। আমাদের এ দিকে বড় আসে না, আফগানিস্থান অঞ্চলেই প্রধানতঃ চালান যায়।

রাজপুতানার সম্বর হ্রদ হইতে পরিষ্কার অম্বুজ লবণ আমরা প্রাপ্ত হই। সম্বরের নুন মধ্য-ভারতীয় দেশীয় বা করদ রাজ্যগুলিতে এবং আগ্রা ও অযোধ্যা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়পুর, যোধপুর, ইন্দোর এবং গোয়ালিয়র রাজ্যগুলির উদ্যোগে হ্রদের চতুর্দ্দিকে কয়েকটি স্থানে বহুদিন হইতেই জল শুকাইয়া নুন পাওয়া যাইত এবং রীতিমত এই নুনের ব্যবসায় চলিত, কিন্তু কোন কারণে গোলযোগ হওয়াতে জয়পুর ও যোধপুর দরবার ১৮৭০ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সম্বর হ্রদের লবণ প্রস্তুতের জন্য লীজ্ দিবার স্বত্ব দিয়াছেন।

সম্বর লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডার আরাবল্লী পর্ব্বতমালার পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আয়তনে ২২ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রস্থ। এই হ্রদের জল নোনা কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌রা বলেন যে, সম্বরের তলায় কতকগুলি লবণের উৎস (spring) আছে। কেহ কেহ বলেন, নোনা পাহাড় ধুইয়া ইহাতে জল জমা হইয়া ক্রমশঃ তীব্র লবণাক্ত হইয়াছে। রাজপুতানায় মরুভূমির জন্য সাধারণ আবহাওয়া বড়ই নীরস, বায়ুর আর্দ্রতা বিশেষ অল্প বলিয়াই সম্বর হ্রদে অতি সহজে করকচ (solar) লবণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে বড় বড় কন্‌ডেন্সার নির্ম্মাণ করাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের খোদ তত্ত্বাবধানে বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে অতি আধুনিক উপায়ে (systematic) সম্বরে নুন প্রস্তুত হয়। মাড়োয়ারী বণিকদের চাহিদা মিটাইতে এখানে বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে সম্বরের চারিপার্শ্বস্থ সকল কারখানাগুলি হইতে ৭৬ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে, যে স্থলে যুদ্ধের পূর্ব্বে ১০।১২

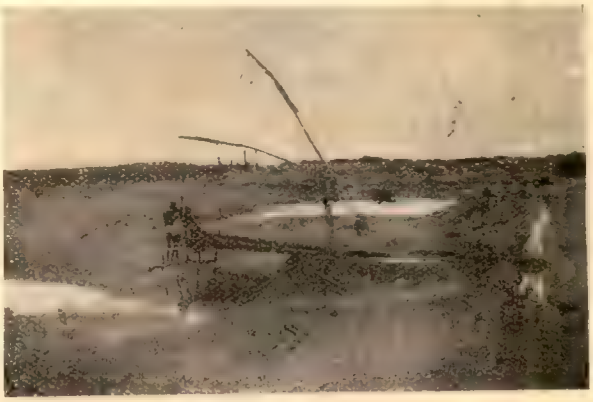

নৌপদায় নোনা জল গর্ত্ত করিয়া তোলা হইতেছে। [ফেটো-ললিত নাগ

লক্ষ মণের অধিক হইত না। এখন গড়ে বৎসরে ৬৫ লক্ষ মণ লবণ সম্বর হ্রদ হইতে পাওয়া যায়।

যোধপুরে পচ্‌বদ্র ও দিদোয়ানাতে কিছু নুন বহিষ্কৃত হয়। পচ্‌বদ্রে ৮।১০ লক্ষ মণ নুন তৈয়ারী হইলেও আমাদের এ

দিকে আসে না—রাজপুতানা ও যুক্তপ্রদেশের লোকেরাই ব্যবহার করে। দিদোয়ানা একটি পুরাতন লবণ-ক্ষেত্র, তবে ইহার নুন অন্যান্য রাসায়নিক লবণের মিশ্রণে গুণে নিকৃষ্ট। ভরতপুরে পূর্ব্বে নুন প্রস্তুত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের কোন কারখানায় লবণের ধুপগুলিকে দরমা ঢাকা দেওয়া হইতেছে।

[গ]

এডেন বাদ দিলে করাচি (সিন্ধুপ্রদেশ); ওর্খা করদরাজ্য এবং বোম্বাই প্রদেশ বঙ্গের বাজারে বহু পরিমাণে লবণ রপ্তানী করিয়া থাকে। সেইজন্য আমরা এই সমস্ত দেশে কিরূপে লবণ-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। সিন্ধুদেশে করাচির নিকট ও দূরে চারটি লবণের কারখানা; তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি মরিপুরে* (Maurypore) এটি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টই চালাইত, কিন্তু ১৯৩১ সালের পর নসেরবাঞ্জীকে লীজ্ দেওয়া হয়। করাচির শুষ্ক আবহাওয়ায় এডেন-পদ্ধতিতে অতি সুলভে সহজে করকচ লবণ প্রস্তুত হয়। তাহার মধ্যে ২৫ লক্ষ মণ কলিকাতার বন্দর দিয়া বঙ্গের বাজারে আমদানী হয়। ইহার কারণ ১৯৩১ সালে ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশে এবং ভারতবর্ষকে লবণ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে বা বাংলাতে ভারতীয় লবণ সরবরাহের কথা হওয়ায়, বিলাতী লবণের উপর বাড়তি শুল্ক বসাইতে করাচির লবণ-শিল্প দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

করাচির চারটি সিন্ধী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রাক্স (Grax Ltd.) এবং গুলবাই 'পিট্ ব্রাইন' (Pit brine) হইতে লবণ বাহির করে। সমুদ্রকূলের নিম্নভূমিতে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া নোনাজল পাম্প করিয়া তুলিয়া তাহাকে কন্‌ডেন্সার সাহায্যে ক্রমশঃ ঘনীভূত করিয়া করকচ লবণ বাহির করিয়া লওয়া হয়।

ওর্খা বন্দরের নিকটস্থ লবণের কারখানাগুলি হইতে আমাদের প্রদেশে প্রতি বৎসর ১২।১৩ লক্ষ মণ নুন আসে। এই অঞ্চলের কাথিয়াবাড়, বরোদা, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে অতি প্রাচীন যুগ হইতে লবণ প্রস্তুত হইত। এক্ষণে দ্বারকা ও ওর্খাবন্দরের মাঝামাঝি মিথাপুর কারখানায় বেশ বিস্তৃতভাবে লবণের চাষ চলিতেছে। বর্ষার ৩।৪ মাস বাদ দিয়া মিথাপুরে সমুদ্রতীরে পাঁচশত একার বাঁধঘেরা জমিতে জোয়ারের জল সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রসাহায্যে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওইদিকেই লবলক্ষি বন্দরের দক্ষিণে মোভি রাজ্যের লবণপুর নামক স্থানে এবং পোরবন্দরে উপরোক্ত পদ্ধতিতে করকচ লবণ প্রস্তুত হয় এবং বৎসরে ১০।১২ লক্ষ মণ বাংলায় চালান আসে।

মাদ্রাজে লবণের চাষ।   [ফোটো—ললিত নাগ

বোম্বাই প্রদেশে বহুদিন ধরিয়া লবণ প্রস্তুত হইতেছে। সমুদ্রের ধারে ধারে এবং কচ্ছ (Run of Cutch) উপদ্বীপের কূলে শত শত বৎসর ধরিয়া বিস্তৃত ভাবে লবণ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশ এবং মাদ্রাজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা বৃটিশ সরকার উনবিং[illegible] যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিল, সেই নীতি বোম্বাই প্রদেশে

* Maury সাহেবের নামে মোরিপুর দাঁড়াইয়াছে।

অনুসৃত হয় নাই। কোম্পানী একচেটিয়া ভাবে লবণ বাণিজ্য নিজেদের করায়ত্ত করিলে আজ বোম্বাই হইতে প্রতি বৎসর ২৫।৩০ লক্ষ মণ লবণ আমরা কিনিতে পারিতাম না এবং পূর্ব্ব-ভারত, বিশেষ করিয়া বাংলা হইতে গুজরাটী, কাচ্ছী বা সিন্ধী বণিকরা বৎসরে ৪০।৪২ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা বঙ্গজননীর ললাটে এইরূপ

টিউটিকর্ণ লবণ ক্ষেত্র। [ফোটো —ললিত নাগ

ভবিতব্যই লিখিয়া থাকিবেন। উত্তর বোম্বাই প্রদেশে কচ্ছ অঞ্চলে খারাগোদা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘাঁটি, প্রতি বৎসর ৩৫।৩৬ লক্ষ মণ লবণ এখানে প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ৮।৯ লক্ষ মণ কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া বঙ্গদেশে আমদানী হইয়া থাকে।

খারাগোদার লবণাক্ত জল (brine) কচ্ছ নিম্নভূমিতে অনেকগুলি কূয়া বা গর্ত্ত (pit) করিয়া পাওয়া যায়। সেই জল এত অধিক পরিমাণ নোনা থাকে (২২°B.)* যে, তাহা সহজেই সিরিজ অব কনডেন্সারে নির্বাষ্প হইয়া করকচ লবণ দান করে। খারাগোদায় বড় বড় ৬৫০টী প্যান আছে (condensing pan) তাহাতে আহার্য্য লবণ ছাড়া magnesium sulphate এবং magnesium chloride প্রভৃতি রাসায়নিক লবণও প্রস্তুত হয়। লবণকে পরিষ্কৃত, রিফাইন করিবার জন্য এখানে বড় বড় যন্ত্রপাতি বসানো আছে। গুজরাটে পূর্ব্বে ছোট বড় অনেকগুলি লবণের কারখানা ছিল, কিন্তু কিছুদিন হইল সেগুলি বন্ধ হইয়া খারাগোদাই শ্রেষ্ঠ কারখানায় পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রজ লবণ প্রস্তুত ব্যাপারে বোম্বাই সহরের দূরে নিকটে বা আশে-পাশে প্রায় ১৪।১৫টি প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। খারাগোদার ন্যায় এই ১৪।১৫টীর মধ্যে ধরাসনা, চার্বদা, বেসিন, দাদার প্রভৃতি ৪।৫টী প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের, বাকিগুলি বেসরকারী। বোম্বাইয়ের আর্দ্রতা, বর্ষা এবং সাধারণ আবহাওয়া আমাদের বাংলা দেশেরই মত, তবুও স্থানীয় ব্যবসাদাররা শুদ্ধ মাত্র রৌদ্রের এবং বাতাসের সাহায্যে (solar evaporation) জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল আটক করিয়া এবং পর পর অনেকগুলি ঘন করিবার ট্যাঙ্কে শুকাইয়া যেরূপ প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করে, তাহা বঙ্গবাসী শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে।

বোম্বাইএর লবণ তুলনায় নিকৃষ্ট হইলেও এই প্রদেশের সমুদ্রতীরে ১৭৭০০০ একার জমিতে লবণের চাষ হয় এবং ছোট বড় চারিশত কারখানা এই বিস্তৃত মাটী হইতে বৎসরে গড়ে ১০৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করে। এই সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানাগুলিতে লবণ প্রস্তুত করিতে মণ প্রতি দুই আনার বেশী ব্যয় হয় না। সেজন্য বোম্বাইতে ভাল নুন ডিউটি দিয়া ২.২/০ দরে বিক্রয় হয়।

প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় মাদ্রাজও লবণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, উপরন্তু অন্য দেশে আমদানী করিয়া কিছু অর্থ দেশে লইয়া আসে। মাদ্রাজের লবণ সাধারণতঃ নিকৃষ্ট – টিউটীকর্ণের নুনই পরিষ্কার এবং তাহাই বঙ্গে কয়েক হাজার মণের বাজার পাইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদ্রের কূলে কূলে আগাগোড়া নুনের চাষ হইয়া থাকে। এখানেও কোনরূপ ইন্ধন প্রয়োজন হয় না। রৌদ্র এবং গতিশীল বাষ্পের সাহায্যে লবণ প্রস্তুত হয়।

মাদ্রাজেও বহুদিন ধরিয়া লবণ প্রস্তুত হইতেছে—ঊনবিংশ শতাব্দীতে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে বঙ্গের লবণ-শিল্প যখন হ্রাস পাইতে বসিয়াছিল, সে সময় একচেটিয়া ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য মাসে মাসে মাদ্রাজ হইতে লবণ আমদানী করা হইত কলিকাতার বাজারে। মাদ্রাজের লবণ-শিল্প একেবারে ধ্বংস হইতে পারে নাই বলিয়া ক্রমশঃ বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে মাদ্রাজ পুনরায় প্রচুর পরিমাণে—অন্ততঃ দেশের চাহিদা মিটাইতে—নুন প্রস্তুত করিতেছে। সমগ্র মাদ্রাজের উৎপন্ন সরকারী রিপো

* Salt Industry—Agarwal.

অনুযায়ী গড়ে ১২৫ লক্ষ মণ, তাহাও কোন কোন সময়ে, যেমন ১৯২৭-২৮ সালে, ১৪৫ লক্ষ মণ এবং ১৯৩১-৩২ সালে ১৪৬ লক্ষ মণ—এমনও হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৫ লক্ষ মণ পর্য্যন্ত নুন মাদ্রাজ হইতে জাহাজে বঙ্গের বাজারে আমদানী হইত। গত কয়েক বৎসর কমই আসিতেছে।

পূর্ব্ব-ভারতের নেপাল, ভুটান, আসাম, বঙ্গদেশ এবং এবং উড়িষ্যায় ব্যাপকভাবে কোন লবণ-শিল্প নাই বলিলেই চলে। যাহা আছে তাহা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কুটীর-শিল্পে এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে নিবদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষে লবণের মোট চাহিদার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহে বর্ণিত স্থান হইতে প্রস্তুত হয়—বাকি এক-চতুর্থাংশ মিটায় এডেন এবং বিদেশী লবণওয়ালারা। এই বিদেশী লবণ কলিকাতা, চট্টগ্রাম এবং রেঙ্গুন বন্দর ছাড়া আর কোথাও আসে না। অবশ্য ট্যারিফ বোর্ড ও সল্ট সার্ভে কমিটীর সুপারিশে বঙ্গের বাজার অন্য প্রদেশস্থ লবণ আসাতে বিদেশী আমদানী কমিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, বঙ্গপ্রদেশে বর্ত্তমানে কোন বিশেষ পরিমাণ লবণ হয় না, যাহাতে অপরাপর পূর্ব্বোক্ত দেশগুলির ন্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

[খ]

বৃটিশ বণিকদের আসিবার পূর্ব্বে জলেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁথি (হিজলী), সুন্দরবন চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে বা নিকটে বিস্তৃতভাবে নুনের চাষ চলিত—যাহা দ্বারা বঙ্গ, বিহার, আসাম এমন কি উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত বহু পরিমাণ লবণ সরবরাহ করা হইত। কোন বিদেশ হইতে বা পশ্চিম ভারত হইতে এতটুকুও লবণ আনিবার প্রয়োজন হইত না। যাহারা নুন প্রস্তুত করিত তাহারা মলঙ্গী বলিয়া পরিচিত ছিল এবং তাহারা এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাজ করিত। প্রতি দলে সাতজন করিয়া মলঙ্গী থাকিত। অংশগুলিকে বলিত খালাড়ি। কথিত আছে ৮০ হাজার মলঙ্গী মোগল আমলে হিজলী, তমলুক, সুন্দরবন, চব্বিশ পরগণায় বিস্তৃত লবণ-শিল্পে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত ছিল। উহারা নোনাজলকে জ্বাল দিয়া নুন বাহির করিত। তজ্জন্য নিকটস্থ বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত। আজও কুটীর-শিল্পে এই মলঙ্গী প্রথাতেই লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অতীতের বর্ণিত ওই লবণ-শিল্প সম্পূর্ণ রাজ-সরকারের অধীনে ছিল। দেখা-শুনার জন্য স্থানীয় জমিদারদের নিযুক্ত করা হইত, ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া আসিলে জমিদার-গণ একে একে মালিক হইয়া বণিকসম্প্রদায়কে বিক্রয় করিতে লাগিল—তাহারা সেই লবণ চতুর্দ্দিকে চালান দিত। লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস, এই সমস্ত জমিদারদের হস্ত হইতে লবণ বিক্রয়ের ভার কাড়িয়া লইয়া এবং ক্রমশঃ সমস্ত নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাধারণ বিক্রয়ের দরের উপর লাভ করিতে যাইয়া দেশীয় বণিকদের নিকট পরে বিশেষ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইল না। ফলে ১৮১৮ সাল হইতে লবণের চাহিদা কমিয়া আসিল, কারণ ঐ বৎসর হইতে ভাল বিলাতী লবণ সস্তা দরে বাজারে আসিতে আরম্ভ করিল। পাকেচক্রে কোম্পানী বোধ করি ইহাই চাহিয়াছিল। অযথা হস্তারোপে এবং অন্যায় ভাবে লাভ করিতে গিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত বড় লবণ-শিল্পকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও বোধ করি হয় নাই—তাই বৎসরে ১৪০ লক্ষ মণ লবণ আমরা অন্য দেশ হইতে ক্রয় করিয়া দেশের দু'কোটী টাকা প্রতি বৎসর বাহির করিয়া দেই। ১৮৬৩ সালে বাংলার মলঙ্গী লবণ-শিল্প একেবারে লুপ্ত হয়। যাহাও বা কুটীর-শিল্পরূপে চালিত একটু আধটু ছিল তাহাও ১৮৯৭ সালে আইনে নিষিদ্ধ হয়।

তারপর যুদ্ধের প্রায় শেষে যখন বিদেশী আমদানী হ্রাসে লবণের দর অসম্ভব বাড়িয়া যায়, সেই সময় (১৯১৮) বাংলা-সরকার লবণ প্রস্তুতের লাইসেন্স দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে কুটীর-শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয়। লাইসেন্স দিবার ব্যবস্থা করিলেও বহুদিন কেহ বাংলার সেই লবণ-শিল্পকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সাহস করে নাই—গবর্ণমেণ্ট ত নয়ই। পরে বহু আন্দোলনে এবং স্বদেশপ্রাণ কয়েকজনের দৃষ্টি পড়াতে ১৯৩২ সালে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করে। ১৯৩৩ সালে আরও তিনটি লাইসেন্স গৃহীত হয়।

বর্ত্তমানে তিনটি স্থানে সামান্য লবণ প্রস্তুত হইতেছে। সে সমস্ত স্থানে পূর্ব্বে লবণ-শিল্পের অস্তিত্ব ছিল—কাঁথি, সুন্দরবন এবং চট্টগ্রাম—এই তিনটি স্থানে বর্ত্তমানে কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান কারখানা খুলিয়া কাজ করিতেছে।

প্রসন্ন বাবু*

—চারু বন্দোপাধ্যায়

বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু নিজেকে সরল ও সত্যবাদী করে তোলবার জন্য আবাল্য সাধনা করে এসেছেন; অতিরিক্ত সরলতার জন্য লোকে তাঁকে বলত বোকা, আর অতিমাত্রায় ধর্ম্ম বাঁচিয়ে চল্‌বার শুচিবাই দেখে লোকে তাঁকে বলত নেকা। তিনি সর্ব্বজীবে ভগবানের প্রকাশ দেখতেন, তাই সকল লোককেই তিনি বিশ্বাস করতেন, কাউকেই মন্দ ভাবতে পারতেন না। কেউ যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, এ সন্দেহও তাঁর মনে উদয় হতো না এবং কেউ রহস্য বিদ্রূপ করে কোন কথা ব'ললেও তিনি সেটা সত্য বলেই মেনে নিতেন। পরমার্থ চিন্তা করার দরুণ বোধ হয় তিনি অনেক সময়েই অন্যমনস্ক থাকতেন।

এই সরল বৃদ্ধ প্রসন্ন বাবুর জীবনের গুটি কয়েক কাহিনী তাঁর স্বভাবের পরিচয় দেবে।

১

সরু গলি। গলি জুড়ে আড়া-আড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক গরু। প্রসন্ন বাবু সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করবেন, পথরোধ করে গরু দাঁড়িয়ে। তিনি গরুর কাছে এসে অতি কোমল বিনয়-নম্র স্বরে অনুরোধ করলেন, "গরু, তুমি সর।"

গরু সে কথায় কর্ণপাত না করে চোখ বুজে রোমন্থন করতেই লাগল।

প্রসন্ন বাবু আবার মিনতি করে অনুরোধ করলেন, "গরু, তুমি সর।"

গরু এবার শুধু কান নেড়ে মাছি তাড়ালে। পথ ছাড়বার কোন লক্ষণই দেখালে না।

তখন গত্যন্তর না দেখে প্রসন্ন বাবু বললেন, "গরু, তুমি সর। না যদি সর তা হলে আমি তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য হব।"

২

কলকাতার নতুন ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হয়েছে। বিদ্যুন্ময় তার ছিঁড়ে পড়ে দু-চারজন লোক আর ঘোড়া গরু মারা যাওয়ার খবরও খবরের কাগজে দেখা গেছে।

একদিন প্রসন্ন বাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আছেন যুবা কুমুদ বাবু। পথের এক ধারে বাগানের বেড়া দেবার জন্য কিছু মোটা কাঁটা-দেওয়া তার কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা আছে। দূর থেকেই সেই তার দেখাবামাত্র প্রসন্ন বাবু কুমুদ বাবুর বাহু চেপে ধরে এক লাফ দিয়ে পিছনে হটে গেলেন এবং বিস্মিত কুমুদ বাবু প্রসন্ন বাবুর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ভয়ার্ত্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "অ কুমুদ, কুমুদ, ঐ কি সেই প্রাণ-নাশন তার?"

কুমুদবাবু হাসি চেপে বললেন—"না, ও প্রাণ-নাশন তার নয়, ও বাগানের বেড়া দেবার তার।"

প্রসন্নবাবু আরও দু পা পিছিয়ে গিয়ে কুমুদ বাবুকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা কুমুদ বাবু, তুমি একবার ছুঁয়ে দেখো তো!"

৩

প্রসন্নবাবু নিমন্ত্রণ খেতে বসেছেন। পাশে বসে আহার করছেন পরিহাস-পটু রসিক সুকুমার বাবু। প্রসন্নবাবুর ক্ষুধা কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্ত হলে তিনি যখন পাতের উপর থেকে চোখ তুলে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করলেন তখন দেখলেন যে, উঠানে একজন একটা ঝুড়িতে কিছু তুলছে।

বৃদ্ধ প্রসন্ন বাবুর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কিছু ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। তিনি ঠাহর করে দেখতে যখন কিছু স্থির করতে পারলেন না, তখন পার্শ্ববর্ত্তী সুকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সু কু-মা-র, ওগুলো কি?"

সুকুমার বাবুর প্রসন্ন বাবুর কানের কাছে মুখ অগ্রসর বললেন, "ওগুলো ঘুঁটে।"

---

* এই 'নক্‌সা'টি স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। ইহা অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি ইহা আমাদের হস্তগত হওয়ায় আমরা ইহা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতেছি। —সম্পাদক বঙ্গশ্রী।

প্রসন্ন বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "অঁ্যা ? ঘুঁটে !"

সুকুমার বাবু এবারে গলার স্বর একটু চড়িয়ে বললেন, "ওগুলো ঘুঁটে।"

প্রসন্ন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"ঘুঁটে ? ওগুলো দিয়ে কি হবে ?"

সুকুমার বাবু বললেন—"ওগুলো দিয়ে পায়েস রান্না হবে।"

বৃহৎ ভোজের ভূরি-ভোজন চলছে। চারিদিকে নানা-প্রকার হাসির গল্প হচ্ছে। ভোজ্য বস্তু বহু প্রকারের। ক্রমে ক্রমে সে সব দেওয়া হল। যখন মিষ্টান্ন ভোজন শেষ হয়ে গেল, তখন সকলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল এখনও কার খাওয়া অসমাপ্ত আছে, এখন উঠতে পারা যায় কি না।

সকলের খাওয়া শেষ হয়েছে, কেউ হাতে নুন আর নেবুর রস মেখে হাতের ঘি তোলবার চেষ্টা করছেন, কেউ বা গেলাসের মধ্যে হাত ডুবিয়েই হাত ধুচ্ছেন। কেবল প্রসন্ন বাবু পাতার উপর হাত রেখে বসে আছেন। পরিবেশকেরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনাকে আর কি দেব ? আপনার আর কি কিছু চাই ?"

৩

প্রসন্ন বাবু বল্লেন, "পায়েস তো দেওয়া হলো না।"

গৃহস্বামী অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, "পায়েস তো করতে পারি নি। ক্ষীর, দই, সন্দেশ আর কিছু এনে দেবো কি ?"

প্রসন্ন বাবু বল্লেন, "না এই যে সুকুমার বল্লেন যে কিসের পায়েস তৈরী হচ্ছে।"

সুকুমার বাবু তো লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসেছেন।

গৃহস্বামী একবার সুকুমার বাবুর দিকে তাকিয়েই বুঝলেন যে রসিক সুকুমারের কোনো রসিকতা একটা বিভ্রাট ঘটিয়েছে। তিনি স্মিত মুখে হাসি চেপে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের পায়েস।"

প্রসন্ন বাবু চেয়ে খাওয়ার লজ্জায় একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন, "ঐ যে ঘুঁটের পায়েস তৈরী হয়েছে, সেটা তো কৈ দেওয়া হয় নি।"

ভোজন-পংক্তির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা হাসির হিল্লোল বয়ে গেল।

৪

ছুটির দিন। অফিস বন্ধ। দুপুর বেলা এক ভদ্রলোক প্রসন্ন বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘরে ঢুকেই দেখলেন যে প্রসন্ন বাবু কোট প্যাণ্টালুন পরছেন। সেই ভদ্রলোকটি প্রসন্ন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ ছুটির দিনে কোট-প্যাণ্ট পরে কোথায় যাচ্ছেন ?"

প্রসন্ন বাবু মালকোঁচা মারা কাপড়ের উপরের প্যাণ্টালুন চড়াতে চড়াতে বল্লেন, "এক খানা চিঠি ডাকবাক্সে দিতে যাচ্ছি।"

প্রশ্নকারী ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "বাসার সাম্‌নেই তো ডাকবাক্স, তাতে চিঠি ফেলবেন, তার জন্যে কোট-প্যাণ্ট পরছেন কেন ?"

প্রসন্ন বাবু বল্লেন, "সাহেবকে চিঠি লিখেছি কি না !"

ভদ্রলোক তো একেবারে অবাক্।

প্রসন্ন বাবু তাঁকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, "সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তো কোট-প্যাণ্ট পরে যেতাম। কারো সঙ্গে দেখা করে কথা বলাও যা, আর চিঠিতে কথা বলাও তো তাই। এ সাহেবের চিঠি কি না !"

৫

শীতকাল। এক মুন্সেফ বাবুর বাড়ীতে প্রসন্ন বাবুর পরিবারের সকলের প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়েছে। সন্ধ্যার পরেই পাল্‌কী এলো প্রসন্ন বাবুর বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে যাবার জন্যে। বেহারা বাড়ীর দরজায় পাল্‌কী নামিয়ে হেঁকে বল্লে,—"বাবু, মুনসেফ বাবুর বাড়ীতে যাবার পাল্‌কী এসেছে।"

অল্পক্ষণ পরেই একজন আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে এসে পাল্‌কিতে উঠলো। বেহারারা আর কাউকেও আস্‌তে না দেখে পাল্‌কীর দরজা দিলে বন্ধ করে এবং পাল্‌কী কাঁধে নিয়ে মুন্সেফবাবুর খিড়কি দরজায় নিয়ে গিয়ে হাজির করলে।

পাল্‌কী নামতেই মুন্সেফবাবুর স্ত্রী কন্যা আর পুত্রবধূরা সকলেই অগ্রসর হয়ে আগন্তুক মহিলাদের অভ্যর্থনা করতে এলেন। কিন্তু তাঁরা পাল্‌কীর দরজা খুলেই দেখেন একমুখ দাড়ি নিয়ে ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন প্রসন্নবাবু।

দাড়ির অতর্কিত আবির্ভাবে তাঁরা লজ্জা পেয়ে ঘোমটা টেনে বাড়ীর মধ্যে পলায়ন করতে লাগলেন।

পাল্‌কী থেকে প্রসন্নবাবু চেঁচাতে লাগলেন—"দেখেন, দেখেন..."

আর 'দেখেন'! লজ্জিতা মহিলারা ততক্ষণে মৃদুমধুর গুঞ্জরণ কর্‌তে কর্‌তে অন্তঃপুরে পলায়ন করেছেন।

তখন প্রসন্নবাবু পাল্‌কী থেকে নেমে অন্দরের মধ্যেই প্রবেশ করেই চেঁচিয়ে বল্‌লেন—"দেখেন, শোনেন! আমার কোনও দোষ নেই। এই বেহারাগুলোর যত দোষ,—তারা আমাকে ডাক দিয়ে যে বল্‌লে - বাবু, মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে যাবার পাল্‌কী এসেছে।"

একটি বালক হাস্‌তে হাস্‌তে এসে প্রসন্নবাবুর হাত ধরে বল্‌লে—"আসুন, আপনি বার-বাড়ীতে চলুন।"

বুদ্ধ মূর্ত্তি

—শ্রীঅমর ভট্ট

অতীতের ভাস্কর্য্যের মৃত্যুহীন অপূর্ব বিকাশে
ভারতের কীর্ত্তিমান মানবের যত স্মৃতি ভাসে,
তাহারি বিলুপ্ত এক দীপ্তিমান অতীত গৌরব
কঠিন পাষাণ ভেদি শিল্পী হেথা করেছে উদ্ভব।
জগতের অভিশপ্ত শতাব্দীর মহাবক্ষ চিরি
যে মহাজীবনস্রোত একবার এসেছিল ফিরি
একেবারে লুপ্ত তাহা হয় নাই কালের সঙ্ঘাতে
আজিও ফিরিছে তাহা মানবের উন্মেষের সাথে!
হে মহমানব-শিশু! জগতের শুনিয়া আহ্বান
দিগন্তের বক্ষ ভেদি অনন্তের করিতে সন্ধান
নাহি জানি কবে সুরু করেছিলে মহা অভিযান
সাথে নিয়ে জ্ঞান-দীপ্ত বজ্রসম সুকঠোর প্রাণ!
যৌবনের প্রারম্ভের কাল্পনিক মোহমুগ্ধ আশা
তোমার অন্তরমাঝে জাগাইয়া লালসার ভাষা
ফিরাইতে পারে নাই জীবনের প্রমুক্ত গতিরে
তরঙ্গিত অন্ধকার অনিরুদ্ধ সমাজের তীরে।
বিদলিত বিচূর্ণিত স্বার্থমগ্ন পৃথিবীতে বসি
যেদিন প্রদীপ্ত আত্মা উঠেছিল প্রথম উচ্ছ্বসি
সেদিন সমগ্র বিশ্ব না হেরিয়া সে মহা সাধনা
হয়ত বসিয়া ছিল আপনাতে হয়ে আনমনা।

তারপর একদিন ধীরে ধীরে বোধি বৃক্ষতলে
চিরন্তন ক্ষুদ্রতারে লুপ্ত করি নয়নাশ্রু-জলে
তোমার প্রদীপ্ত জ্ঞান বিতরিয়া অজ্ঞান-তিমিরে
জ্বলেছিল প্রপীড়িত ভারতের চতুর্দ্দিক ঘিরে;
তোমার অপূর্ব্ব তীব্র বজ্রসম মহামন্ত্রবাণী
দূর করি পৃথিবীর অযাচিত সর্ব্ব কষ্ট গ্লানি
চেয়েছিল নিয়ে যেতে মৃত্যুহীন মহান আত্মারে
শঙ্কাহীন, শান্তিময় অভীপ্সিত কল্পনার পারে।
মৃত্যুর বেদীর তলে আপনারে দিয়া বিসর্জ্জন
করে গেছ মানবের সাধনার মহা উদ্বোধন;
যা কিছু রহিয়া গেছে লুপ্ত তাহা হবে নাক কভু
অস্থায়ী দেহের স্মৃতি বাঁচাইয়া রাখিবারে তবু
যাহাতে মিশেছ তুমি, সে কঠিন মৃত্তিকা প্রস্তরে
মানুষ গড়েছে তোমা, মহা যত্নে শত বর্ষ ধরে।
যদিও পাষাণ ভেদি জাগিবে না সুগম্ভীর ভাষা
মিটিবে না মানবের আলোকের গভীর পিপাসা,
তথাপি দাঁড়ায়ে আজ চিরমুগ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে
উদ্বেলিয়া উঠে চিত্ত ভরে যায় অজানিত সুখে।
আমার চোখের 'পরে যে তোমারে রেখেছে ধরিয়া
মৃত্যুহীন অতীতের সে মহান ভাস্করে স্মরিয়া

সসম্ভ্রমে নত শীরে তোমার এ পাদপীঠ-তলে
অভিষিক্ত করি তারে আপনার নয়নের জলে।

ধীবর [শিল্পী—শ্রীবাসুদেব রায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

বড়দিন ও নববর্ষের কন্‌সেশন

বড়দিন ও নববর্ষের ছুটি উপলক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবারেও যাত্রী-সাধারণের সুবিধার্থে সকল ষ্টেশন হইতেই ১০১ মাইল এবং ততোধিক দূরত্বের জন্য সস্তা ভাড়ায়—সকল শ্রেণীর সিঙ্গেল টিকিটের দামের ১⅓ ভাড়ায়—যাতায়াতের টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

টিকিট বিক্রয়ের তারিখ ঃ—১৪ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

ফিরিবার শেষ তারিখ ঃ—টিকিট যে-দিনেই ক্রীত হউক না কেন, ১৯৪০ সালের **১৫ই জানুয়ারী রাত্রি ১২টার মধ্যে** ফিরিতে হইবে।

যাত্রা-বিরতি ঃ—যাত্রিগণ যতদিন ইচ্ছা **মধ্যবর্ত্তী** এক বা একাধিক **ষ্টেশনে** যাত্রা-বিরতি করিতে পারিবেন। তবে **যাইবার কালে** বা **ফিরিবার কালে** কোনও দূরত্ব **একাধিক বার ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।** যে ষ্টেশন হইতে টিকিট ক্রীত হইবে তাহার **৩০ মাইল** বা **তন্নিম্ন দূরত্বের মধ্যে** যাত্রা-বিরতি করা চলিবে না এবং ফিরিবার শেষ তারিখ-(১৫ই জানুয়ারীর রাত্রি ১২টা)-এর মধ্যে যাত্রা সমাধা করিতে হইবে।

মোটর-কার কন্‌সেশন

কেবল মাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উপর ১০০ মাইলের অধিক দূরত্বের জন্য বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে সিঙ্গেল (এক পিঠের) ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট বিক্রয় করা হইবে।

যে-সকল ষ্টেশনে মোটরকার নামাইবার এবং উঠাইবার ব্যবস্থা বিদ্যমান

কেবল সেই সকল ষ্টেশনের জন্য মোটর-কার কনসেশন টিকিট পাওয়া যাইবে।
তবে যাইবার সময় যে মোটর-কার লইয়া যাওয়া হইবে, ফিরিবার সময় সেই মোটর-কারই আনিতে হইবে।
মোটর-কার কনসেশন পাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় প্যাসেঞ্জার টিকিটের অনুরূপ, কেবল ফিরিবার কালে ১৫ই জানুয়ারী রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মোটর-কার বুক করা চলিবে।

অন্যান্য বিবরণের জন্য ঃ—
চীফ্ কমার্সিয়াল ম্যানেজার,
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস, কলিকাতা।

"সাধনা বসুর" গাত্র-
বর্ণ তাঁহার অভিনয়
ও নৃত্য কলার মতই
নিখুঁত এবং ইহা
তাঁহার নিয়মিত
ওটীন ক্রীম
ব্যবহারের ফল বলিয়া
যে-তিনি নির্ণয় করিয়া-
ছেন সেজন্য আমরা
গর্ব্ব অনুভব করি।
OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.
Sadhona Bose
Oatine Cream
Oatine
CREAM for nightly massage
SNOW for daily protection

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

পৌষ—১৩৪৬

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গীতা-বিচার

"মোক্ষ-যোগ-বিচার"

'স্বর্গ' ও 'মোক্ষ' বিষয়ে ভেদ কিরূপ, তাহা বুঝাইতে বসিয়া তর্করত্ন মহাশয় লিখিতেছেন,—

"অনেকেই বলিবেন, ইহা তো জানা কথা, স্বর্গ দেবলোক ভোগ,—পৃথিবীতে যেমন মনুষ্য বাস করে, ঐ যে উপরের গ্রহগুলি নক্ষত্রাকারে প্রতি নির্ম্মল রাত্রিতেই আমরা প্রত্যক্ষ করি—পৃথিবীর ন্যায় ঐগুলিও জীবের বাসস্থান—ঐ স্থানের অধিবাসী জীবগণ দেবতা নামে খ্যাত—আর ঐ সব অবস্থা দেবলোক,—মনুষ্য-ভারতে কর্ম্ম করিয়া মরণান্তে ঐ সব স্থানে গমন করে, এবং পৃথিবীদুর্লভ সুখ তথায় ভোগ করে—ঐ সব স্থানের নাম স্বর্গ।" (১৩৪৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'বসুমতী'র ৩৫৭ পৃষ্ঠা, প্রথম কলম, তৃতীয় পংক্তি হইতে অষ্টম পংক্তি)।

তর্করত্ন মহাশয়ের উপরোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তিনি এতৎপ্রসঙ্গে "স্বর্গ"কে একটী "স্থানের নাম" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে (গত সংখ্যায়) দেখান হইয়াছে যে, তিনি "স্বর্গ", "মোক্ষ" ও "সুখ" এই তিনটী শব্দকে একার্থক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। "স্বর্গ" শব্দটীকে একবার কোন প্রকারের "সুখ" বলিয়া ধরিয়া লইয়া আবার তাহাকে কোন "স্থানের নাম" বলিয়া অভিহিত করিলে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় না কি ?

"স্বর্গ"-শব্দে কোন স্থানের নাম বুঝা যাইতে পারে কি না, আমরা এক্ষণে তাহার বিচার করিব।

"স্বর্গ"-শব্দে কোন স্থানের নাম বুঝা যাইতে পারে কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে, সংস্কৃত ভাষায় অথবা সংস্কৃত ভাষার বাক্যে যে-সমস্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের অর্থ কিরূপে উদ্ধার করিতে হয়, আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে তাহা জানিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষার বাক্যে যে-সমস্ত 'পদ' ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের অর্থ কিরূপে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা জানিতে হইলে মানুষের ভাষায় কয় শ্রেণীর বাক্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত

হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। মানুষের ভাষায় প্রধানতঃ কয় শ্রেণীর বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষ প্রধানতঃ কয় শ্রেণীর হইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। মানুষ প্রধানতঃ কয় শ্রেণীর হইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি মানুষ প্রায়শঃ নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী দুঃখ দূর করিয়া সুখ লাভ কবিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে এবং কখনও বা সুখ, কখনও বা দুঃখ লাভ করে। শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন্ কারণে যে মানুষের সুখ-দুঃখের উদ্ভব হয়, তদ্বিষয়ক কোন প্রশ্ন অথবা উপলব্ধির প্রযত্ন এই শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে কখনও জাগ্রত হয় না। ফলে এই শ্রেণীর মানুষ সর্ব্বদা হয় উত্তেজনায়, নতুবা হতাশায় তিল তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং অকালবার্দ্ধক্যে বিধ্বস্ত হইয়া জলবুদ্বুদের মত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আজকালকার দুনিয়ায় দেখা যাইবে যে, এই শ্রেণীর মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পৌণে ষোল আনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহাঁদিগের কেহ কেহ সময়-সময় অভিমানভরে দেশ ও দশের কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, দেশ ও দশের কোন প্রকৃত উপকার করা তো দূরের কথা, ইহারা নিজদিগের এবং নিজ নিজ পরিবারবর্গেরই তৃপ্তি সম্যক্ ভাবে সাধন করিতে পারেন না। যাঁহারা কবি-সম্রাট্, সাহিত্য-সম্রাট্, মাহাত্ম্য-সম্রাট্, টিকী অথবা আচার-সম্রাট্, রাষ্ট্রনীতি-সম্রাট্, অর্থনীতি-সম্রাট্, বিজ্ঞান-সম্রাট্, দর্শন-সম্রাট্, আইন সম্রাট্, বিচার-সম্রাট্, বাণিজ্য-সম্রাট্, শিক্ষা-সম্রাট্ প্রভৃতি নামে বিকাইতেছেন, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই শ্রেণীর লোক ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর লোকের মতই নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী দুঃখ দূর করিয়া সুখ লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং কখনও বা সুখ, কখনও বা দুঃখ লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ে সময়-সময়, শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন্ কারণে যে মানুষের সুখ-দুঃখের উদ্ভব হয়, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন ও উপলব্ধিপ্রযত্ন উপস্থিত হয়, অথচ ঐ উপলব্ধিতে সিদ্ধি লাভ করিয়া বিবিধ সুখ-দুঃখের কারণ নিজ শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আজকালকার দুনিয়ায় একরূপ বিরল হইয়া পড়িয়াছেন।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া, যাঁহারা উপরোক্ত উপলব্ধিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজ নিজ শরীরাভ্যন্তরেই স্বকীয় সমস্ত সুখ-দুঃখের কারণ অনুভব করিতে পারেন, এমন এক শ্রেণীর মানুষও থাকিতে পারেন। ইহাঁরাই মানুষের তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। 'এই শ্রেণীর মানুষও থাকিতে পারেন'—এবংবিধ বাক্য ব্যবহার করিবার কারণ—এই শ্রেণীর মানুষ এখন আর দেখা যায় না। অন্ততঃপক্ষে এমন শ্রেণীর মানুষের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎকার হয় নাই। অনুমান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, নিজ নিজ শরীরাভ্যন্তরে স্বকীয় বিবিধ সুখ-দুঃখের কারণ অনুভব করিতে পারিলে জীব ও জন্তুর অবয়ব ও কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু জীব ও জন্তুর মূল কারণ সম্বন্ধে কোন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না।

যাঁহারা জীব ও জন্তুর সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিনাশের কারণগুলিকে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা মানুষের চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর কোন মানুষও এখন আর দেখা যায় না।

মানুষ যেরূপ চারি শ্রেণীর, সেইরূপ তাহাদিগের বাক্যও চারিশ্রেণীর হইয়া থাকে।

বুদ্ধির সাহায্যে অনুমানসামর্থ্য বিকশিত হইলে দেখা যাইবে যে, সরল-প্রাণ কৃষকের বাক্য, আর জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞান মানুষের বাক্য, আর প্রকৃত জ্ঞানীর বাক্য কখনও সর্ব্বতোভাবে এক রকমের হয় না। কৃষকের বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদগুলি—যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞান মানুষগুলি সেই সেই পদগুলি অনেকাংশে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কাযেই কোন পদের অর্থ সঠিকভাবে উদ্ধার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ পদটী চারিশ্রেণীর মানুষের কোন্ শ্রেণীর বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

ঋগ্বেদের "প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম," যজুর্ব্বেদের "অহং ব্রহ্মাস্মীতি," সামবেদের "তত্ত্বমসীতি", অথর্ব্ব-বেদের "অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি"—এই চারিটী কথা উপলব্ধি করিতে পারিলে বাক্যবিষয়ক আমাদিগের কথা-গুলি সর্ব্বতোভাবে প্রতিভাত হইবে। ছোট ছোট এই চারিটী কথার মধ্যে যে, কত বিষয়ের ও কত সাধনার কথা নিহিত আছে, তাহা বর্ণস্ফোট পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে বুঝা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে বেদোক্ত কথাগুলির বিষয় ও সাধনা বর্ণস্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে নিজের পক্ষে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু অন্য কোন ভাষার অথবা বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অপর কাহাকেও বুঝান সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য ব্যাসদেব বেদের অভ্যাসেও নিযুক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু "বেদ-বাদরত" হওয়াকে নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ("বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ··· ··· ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে"—গীতা ২য় অঃ ৪২-৪৪ শ্লোক)। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই ব্যাসবাক্য অবহেলা করিবার ফলে একদিকে যেরূপ বেদের অনর্থ প্রচার করিয়া মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার নিজ নিজ পরিবারের নির্ব্বংশতা ও শ্রী-হীনত্ব সাধন করিয়াছেন।

যেমন বীজের ভিতরই প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিহিত থাকে এবং বীজটীকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তৎপ্রসূত বৃক্ষকে না দেখিয়াও তৎ-সম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, সেইরূপ চারিটী বেদ-বিষয়ক উপরোক্ত চারিটী কথায় বর্ণস্ফোটের সহায়তায় অভ্যস্ত হইতে পারিলে চারিশ্রেণীর বাক্য ও তন্নিহিত পদগুলির অর্থ কিরূপভাবে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। এক কথায়, চারিটী বেদ-বিষয়ক উপরোক্ত চারিটী কথায় অভ্যস্ত হইতে পারিলে, ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রের মূল সূত্র বুঝিতে পারা যায়। এইরূপভাবে ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রের মূল সূত্র বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে মুগ্ধবোধ, কলাপ, সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা, সারস্বত এবং অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ নামক ব্যাকরণগুলির প্রত্যেকখানিতে নির্ভুলভাবে ভাষা বুঝিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং উহার প্রত্যেকখানির সূত্রগুলি ঋষির জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ এখন আর কেহ ঐ সমস্ত ব্যাকরণ পড়িয়াও ঋষি-প্রণীত ভাষা বুঝিতে সক্ষম হন না এবং অনেকেই ঋষি-প্রণীত কথা আবোল-তাবোল অর্থে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন ও পাণ্ডিত্যের দাবী করিতেছেন। ইহার কারণ, এই আত্মপ্রতারক 'পণ্ডিত'গণ যদিও মনে করেন যে, তাঁহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা পড়েন ব্যাকরণের ভাষ্য, টীকা ও পঞ্জী। ব্যাকরণের সূত্র অধ্যয়ন করা তো দূরের কথা, বৃত্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম হন না। 'বৃত্তি' বুঝিবার জন্য যে সমস্ত ভাষ্য ও টীকা রহিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটী বিকৃতপথগামী ও মূর্খতাপ্রসূত। এই ভাষ্য

ও টীকা-প্রণেতাগণও আধুনিক ‘পণ্ডিত’গণের মতই আত্ম-প্রতারক এবং ব্যাকরণের সূত্রসমূহের বেদোক্ত মূল সূত্র সম্বন্ধে অজ্ঞানী। ‘সিদ্ধান্ত কৌমুদী’-প্রণেতা ভট্টোজী দীক্ষিত ও “ব্যাকরণ কৌমুদী”-প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেকের মনেই আজ উচ্চস্থান লাভ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু যদি আবার কখনও সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার নির্ভুল পন্থা মানবসমাজে প্রচার লাভ করে, তখন দেখা যাইবে যে, ঐ দুইটী মৃত মানুষ তাঁহাদিগের ব্যাকরণ প্রণয়নের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার ইষ্ট সাধন করা তো দূরের কথা, উহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। সংস্কৃত বাক্য ও সংস্কৃত পদের অর্থ যথাযথভাবে উদ্ধার করিতে হইলে যাঁহারা আধুনিক ব্যাকরণের জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহাদিগের প্রাণে সুখ-দুঃখের কারণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উদয় হয় না, অথবা যাঁহাদিগের প্রাণে ঐ প্রশ্নের উদয় হয় বটে, কিন্তু উহার কারণ নির্ণয় করিতে যাঁহারা অক্ষম, তাঁহাদিগের বাক্যে যে-সমস্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ উদ্ধার করিবার প্রধান পন্থা, ‘প্রকৃতি’ ও ‘প্রত্যয়ে’র বিভাগ করা এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া। স্ফোটে অভ্যস্ত না হইতে পারিলে কোন প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ সম্যক্‌ভাবে ধারণা করা সম্ভব হয় না এবং নিজ শরীরাভ্যন্তরে সুখ ও দুঃখের কারণ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে অর্থাৎ স্বকীয় ‘আত্মা’কে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে স্ফোটে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য সাধারণ মানুষের ব্যবহারার্থে ঋষিগণ মুগ্ধবোধ, কলাপ, সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা ও সারস্বত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, এই চারিখানি ব্যাকরণ ঋষি-প্রণীত নহে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা সত্য নহে। ঋষি শব্দের মৌলিক অর্থ “যে সাধনার দ্বারা মায়ার মূল কারণ ও তাহার আসুরিক অথবা তামসিক পরিণতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় সেই সাধনা।” ‘বিশেষ-সন্ন্যাসের’ নিয়ম অনুসারে যে মানুষ ঐ সাধনায় সিদ্ধ হন, সেই মানুষকেও ‘ঋষি’ বলা হইয়া থাকে। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে প্রবিষ্ট হইয়া মুগ্ধবোধ, কলাপ বা সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা ও সারস্বত ব্যাকরণের সূত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ‘ঋষি-সাধনা’য় সিদ্ধ না হইলে এতাদৃশ সূত্র রচনা করা সম্ভব হয় না। অধুনা যাঁহারা ঐ চারিখানি ব্যাকরণের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহাদিগের সূত্রের প্রণেতা নহেন, পরন্তু ‘বৃত্তি’র প্রণেতা। এই বৃত্তিকারগণ “ঋষি-সাধনা”য় সিদ্ধ না হইলেও ভাষ্যকারগণ ও টীকাকারগণের মত নিন্দনীয় অথবা উপেক্ষণীয় নহেন। সূত্রের সমস্ত কথা কোন বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু বৃত্তির সাহায্যে সূত্রে নির্ভুলভাবে প্রবেশ করা সম্ভব হইয়া থাকে। অন্যদিকে, ভাষ্য ও টীকায় কোন বৃত্তিতে পর্য্যন্ত নির্ভুলভাবে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না, পরন্তু বিপথগামী হইতে হয়।

‘পদ-প্রকৃতি’র অর্থ সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগম্য করিয়া মোটামুটী ভাবে উপলব্ধিযোগ্য করিবার জন্য পদ-প্রকৃতিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক শ্রেণীকে “আখ্যাত” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং আর এক শ্রেণীকে বলা হইয়াছে “নাম”। “নাম” ও “আখ্যাত” বলিতে কোন্ শ্রেণীর ‘প্রকৃতি’কে বুঝায়, তাহা জানিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অণুপরমাণুসম্বলিত খণ্ড-মণ্ডলের মূল কারণ সর্ব্বপরিব্যাপ্ত তেজ, রস ও বায়ুর বীজসম্বলিত একটী কর্ম্ম এবং ঐ সর্ব্বপরিব্যাপ্ত তেজ, রস ও বায়ুর বীজসম্বলিত কর্ম্মই চর-জীবের শব্দপ্রকাশিকা-শক্তিরও মূল কারণ।

এই সর্ব্বপরিব্যাপ্ত কর্ম্ম জীবেতর স্থানে এবং জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার প্রাকৃতিক অথবা প্রাথমিক অবস্থা 'গুণা'তীত ও 'দ্রব্যা'তীত। ঐ 'কর্ম্ম' ক্রমশঃ গুণের উন্মেষ সাধন করিয়া থাকে এবং গুণের উন্মেষ হইলেই যুগপৎ দ্রব্যের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। তেজ, রস ও বায়ুর বীজ-সম্বলিত সর্ব্বপরিব্যাপ্ত ঐ কর্ম্মই অহরহঃ জীবের অঙ্গের ও ভাবের উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করিতেছে এবং জীব অঙ্গাত্মক ও ভাবাত্মক হইয়া কখনও বা বিষয়মুখী এবং কখনও বা আত্মমুখী হইতেছে। জীব অঙ্গাত্মক ও ভাবাত্মক হইয়া বিকশিত হইবার পর ঐ সর্ব্বপরিব্যাপ্ত কর্ম্ম, স্বকীয় অঙ্গ ও স্বকীয় ভাবের মিশ্রণে জীবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে থাকে এবং জীবের এই কর্ম্মের ফলে কখনও বা জীবাতিরিক্ত অপর বস্তুর সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে, আর কখনও বা স্বকীয় অঙ্গ ও ভাবের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিনাশ সাধিত হয়। জীব যে সমস্ত কর্ম্ম করে তাহা সাধারণতঃ দুই ভাবে বিভক্ত। কতকগুলি জ্ঞান-জ আর অন্যকগুলি অজ্ঞান-জ। তাহার জ্ঞান-জ কর্ম্মও অসংখ্য এবং অজ্ঞান-জ কর্ম্মও অসংখ্য। জীবের এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মের প্রত্যেক শ্রেণীটী কখনও বা অঙ্গের এবং কখনও বা ভাবের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিনাশের সহায়ক হয়। জীবের কর্ম্মগুলি যেরূপ জ্ঞান-জ ও অজ্ঞান-জ হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার জীবের অঙ্গ ও গুণগুলিও প্রকৃতিজাত হইয়া প্রাকৃতিকতা লাভের সহায়ক হইতে পারে এবং বিকৃতি-জাত হইয়া বৈকৃতিকত লাভের সহায়ক হইতে পারে।

কর্ম্ম, গুণ ও দ্রব্যসম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলি বুঝিতে পারিলে "পদপ্রকৃতি" ও "পদ-প্রত্যয়" সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যগুলি মোটামুটী ভাবে বুঝা সম্ভবযোগ্য হয়। ইন্দ্রিয়াতীত তথ্যগুলি সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে আরও অনেক কথা জানিবার প্রয়োজন হয়। আমরা এখানে তাহার আলোচনা করিব না। তেজ, রস ও বায়ুর বীজসম্বলিত সর্ব্বপরিব্যাপ্ত যে 'কর্ম্ম' খণ্ড-মণ্ডলের এবং চর-জীবের শব্দপ্রকাশিকা-শক্তির মূল কারণ, সেই 'কর্ম্ম' হইতে যে-সমস্ত 'ক্রিয়া' ও 'কার্য্যে'র উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত 'ক্রিয়া' ও 'কার্য্য'কে ব্যাকরণে "আখ্যাত" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, জীব অঙ্গাত্মক ও ভাবাত্মক হইয়া বিকশিত হইবার পর উপরোক্ত সর্ব্বপরিব্যাপ্ত কর্ম্ম, স্বকীয় অঙ্গ ও স্বকীয় ভাবের মিশ্রণে, জীবৎকাল পর্য্যন্ত যে-সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই সমস্ত কর্ম্মও ব্যাকরণের "আখ্যাতে"র অন্তর্গত। জীবের এতাদৃশ কর্ম্মকে শব্দবিজ্ঞানানুসারে "ধাতু" বলিতে হয়

জীবের জ্ঞান-জ ও অজ্ঞান-জ কর্ম্মের ফলে সর্ব্বদা স্বকীয় ও পরকীয় বিভিন্ন 'অঙ্গে'র ও 'ভাবে'র পরিবর্ত্তন হইতেছে। জীবের জ্ঞান-জ ও অজ্ঞান-জ কর্ম্ম কখনও স্বকীয় অথবা পরকীয় বিভিন্ন অঙ্গের ও ভাবের পরিবর্ত্তন-সাধনহীন হইতে পারে না। এই পরিবর্ত্তন-সাধন-সক্ষমতা লইয়া 'ধাতু'র 'বিভক্তি' ও 'প্রত্যয়'। ইহারই জন্য 'ধাতু' কখনও 'বিভক্তি' অথবা 'প্রত্যয়'হীন হইয়া ব্যবহৃত হয় না এবং তাহা সর্ব্বদাই কোন না কোন 'কারক'-সংযুক্ত হইয়া থাকে।

সর্ব্বপরিব্যাপ্ত যে কর্ম্ম খণ্ড-মণ্ডলের এবং চর-জীবের শব্দ-প্রকাশিকা-শক্তির মূল কারণ, সেই কর্ম্ম হইতে যে সমস্ত ক্রিয়া ও কার্য্যের উৎপত্তি হয়, 'আখ্যাতা'ন্তর্গত সেই সমস্ত 'ক্রিয়া' ও 'কার্য্য' 'বিভক্তি' অথবা 'প্রত্যয়হীন' হইয়া থাকে এবং তাহা 'কারক'-সংযুক্ত না হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদে ও বেদসম্বন্ধীয় কথায় প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন 'আখ্যাতে'র ব্যবহার হইয়া থাকে এবং কখন কখন এতাদৃশ 'আখ্যাত নিজেই

'কারকে'র কার্য্য করে। এতাদৃশ বিভক্তি ও প্রত্যয়হীন 'আখ্যাতে'র ব্যবহার ও অর্থ গ্রহণ করিবার পদ্ধতি মুগ্ধবোধ, কলাপ, সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা ও সারস্বত ব্যাকরণে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার পদ্ধতি একমাত্র অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে সম্পূর্ণ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবের জ্ঞান-জ ও অজ্ঞান-জ কর্ম্ম মূলতঃ দশটী কারণে উদ্ভুত হইয়া থাকে। মৌলিক এই দশটী কারণ লইয়া ধাতুর 'ভূদাদি' প্রভৃতি দশটী 'গণ'। ধাতুর গণ দেখিয়া 'কোন্ কারণ বশতঃ কোন্ কার্য্যে'র কথা বলা হইতেছে, তাহা মোটামুটী ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হয় এবং কারণ,কার্য্য ও কার্য্যের গতি, এই তিনের সঙ্গতি স্থির করিতে হয়। আজকালকার মূর্খ-'পণ্ডিত'গণ তোতা-পাখীর মত 'গণ-দর্পণ' মুখস্থ করেন বটে, কিন্তু 'গণে'র অর্থোদ্ধার করিতে সক্ষম হন না।

জীবের জ্ঞান-জ ও অজ্ঞান-জ কর্ম্মের ফলে সর্ব্বদা স্বকীয় ও পরকীয় বিভিন্ন 'অঙ্গে'র ও 'ভাবে'র যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হয়, তন্মধ্যে অজ্ঞান-জ কর্ম্মের ফলে, স্বকীয় 'অঙ্গে'র ও 'ভাবে'র পরিবর্ত্তন প্রকাশ করিবার জন্য ধাতুর উত্তর আত্মনেপদীয় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, এবং পরকীয় অঙ্গের ও 'ভাবের' পরিবর্ত্তন প্রকাশ করিবার জন্য পরস্মৈপদীয় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে "অ-থ পরস্মৈপদানি" এবং "ন-ব- পরাণি আত্মনে", কলাপের এই দুইটী সূত্র যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য পওয়া যাইবে। বিভক্তি-যুক্ত কোন ধাতুর ব্যবহার দেখিলেই বুঝিতে হয়, জীবের অজ্ঞান-জ কোন্ কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে। উহা যখন পরস্মৈপদীয় বিভক্তি-যুক্ত হয়, তখনই বুঝিতে হয় যে, কার্য্যের ফল কর্ত্তা ব্যতিরিক্ত অপর কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট, আর উহা যখন আত্মনেপদীয় বিভক্তি-যুক্ত হয়, তখনই বুঝিতে হয় যে, কার্য্যের ফল কর্ত্তার নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট। আজকালকার 'পণ্ডিত'গণ যেরূপ ভাবে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদীয় ধাতুর অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইহাঁরা প্রায়শঃ ধাতুর পদ-বিভাগের সার্থকতা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না। শুধু যে ধাতুর পদ-বিভাগই ইহাঁরা বুঝিতে পারেন না তাহা নহে, পুরুষ-বিভাগ ও লটাদি বিভাগে পর্য্যন্ত ইহাঁরা দন্তস্ফুট করিতে পারেন না। ইহাঁদিগের দ্বারা যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইতেছে এবং হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিনব সংস্করণ এবং কলঙ্কস্বরূপ। ধাতুর পুরুষ-বিভাগ, লটাদি-বিভাগ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বলা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে। আমাদিগের ভাগ্যে আছে কি না তাহা জানি না, তবে কাল যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে আর বেশীদিন এই আত্ম-প্রতারণা ও মোহ-মুগ্ধতার রাজত্ব থাকিতে পারিবে না এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রকৃত অর্থে কাহারও অধিকরণে কালের দ্বারা প্রচারিত হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

ধাতুর উত্তর যে 'প্রত্যয়' ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'কৃৎ প্রত্যয়'। জীবের জ্ঞান-জ কর্ম্মের ফলে স্বকীয় ও পরকীয় 'অঙ্গে'র ও 'ভাবে'র যে-সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সেই সমস্ত বিভিন্ন পরিবর্ত্তন প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন কৃৎ প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। "সিৎ-ধি, ইজু-অৎ, ঞ-ন-অ-অনুবন্ধে", কলাপের এই সূত্রটী ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত কোন শব্দ দেখিলেই বুঝিতে হয়, কোন না কোন জীবের কোন না কোন জ্ঞান-জ কর্ম্মের কথা এবং তৎসম্ভূত স্বকীয় অথবা পরকীয় কোন না কোন অঙ্গের অথবা ভাবের পরিবর্ত্তনের

কথা বলা হইতেছে। কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দ্বারা কখনও কোন অজ্ঞান-জ কর্ম্মের কথা বলা হয় না। জ্ঞান-জ কর্ম্মের দ্বারা স্বকীয় অঙ্গের অথবা পরকীয় অঙ্গের এবং স্বকীয় ভাবের, অথবা পরকীয় ভাবের পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইতেছে, তাহা বুঝিতে হয় কৃৎ-প্রত্যয়ের স্বভাব বিচার করিয়া। কৃৎ-প্রত্যয়ের স্বভাব বিচার অতীব বিস্তৃত। তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে। কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখনও দ্রব্যার্থক অথবা গুণার্থক হইতে পারে না। উহা সর্ব্বদাই কর্ম্মার্থক হইয়া থাকে। "সার্ব্বধাতু-কবৎ শে", কলাপের এই সূত্রটী ফোট-বিধি ও নিরুক্তের নিয়মানুসারে যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিভক্তি-যুক্ত হইলেও উহার কর্ম্মার্থ ই থাকিয়া যায়। বিভক্তির দ্বারা কেবলমাত্র উহার মুখ্য কারক কে তাহা স্থির করিতে হয়।

'আখ্যাত' এবং 'ধাতু' বলিতে কি বুঝায়, তাহা 'হৃদয়ঙ্গম' করিতে পারিলে 'নাম' বলিতে কি বুঝায়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। আগেই বলিয়াছি যে, খণ্ড-মণ্ডলের উদ্ভব এবং চর-জীবের শব্দ-প্রকাশিকা শক্তির মূল কারণ তেজ, রস ও বায়ুবীজসম্বলিত সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত একটী কর্ম্ম এবং এই কর্ম্ম ক্রমশঃ গুণের উন্মেষ সাধন করিয়া থাকে এবং গুণের উন্মেষ হইলেই যুগপৎ দ্রব্যের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। ঐ 'গুণ' ও 'দ্রব্য' লইয়াই 'নাম'। জগতের মূল কারণ যে 'কর্ম্ম' তাহা হইতে যেরূপ 'গুণ' ও 'দ্রব্যে'র উদ্ভব হয়, সেইরূপ জীবের কর্ম্ম হইতেও গুণ এবং দ্রব্যের উদ্ভব হয়।

"কার্য্যত্বে নিত্যতায়াং বা
কেচিৎ একত্ব বাদিনঃ ॥
কার্য্যত্বে নিত্যতায়াং বা
কেচিৎ নানাত্ববাদিনঃ ॥" [বাক্যপদীয়—১ম অঃ ;৭০ শ্লোক]

'বাক্যপদীয়ে'র উপরোক্ত শ্লোকটী যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

জীবের কর্ম্ম হইতে যে-সমস্ত 'গুণ' এবং 'দ্রব্যে'র উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত 'গুণ' এবং 'দ্রব্য'ই ব্যাকরণে 'নাম' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

'নাম'-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে কোন 'নাম'ই কর্ম্ম ব্যতিরেকে উদ্ভূত হইতে পারে না। কোন 'নাম'ই যে কর্ম্ম ব্যতিরেকে উদ্ভূত হইতে পারে না, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক 'নাম'ই কোন না কোন কর্ম্মের অবস্থাবিশেষ মাত্র এবং প্রত্যেক 'নামে'র মধ্যেই কর্ম্মার্থক কোন না কোন বর্ণ অথবা পদ থাকিতে বাধ্য। 'কর্ম্ম' হইতে কি করিয়া 'নামে'র উৎপত্তি হয়, তাহা চিন্তা করিতে না জানিলে, ব্যাকরণের মূল সূত্রে প্রবেশ করা কখনও সম্ভব হয় না। ইহা সাধনাসাপেক্ষ। কথার দ্বারা ইহা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারিব না। মোটর উপর জানিয়া রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক 'নামে'র ভিতর কোন্ কোন্ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তাহা বুঝানই ব্যাকরণের 'কারক' ও 'সমাস' অধ্যায়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

'আখ্যাত' যেরূপ বিভক্তি ও প্রত্যয়হীন হইতে পারে, 'নাম' কখনও সেইরূপ বিভক্তি ও প্রত্যয়হীন হইতে পারে না।

'আখ্যাত' যেরূপ বিভক্তি-যুক্ত হইলে অজ্ঞান-জ কর্ম্মের কথা বুঝাইয়া থাকে এবং প্রত্যয়যুক্ত হইলে জ্ঞান-জ কর্ম্মের কথা বুঝায়, সেইরূপ 'নাম' যখন 'সুবাদি' বিভক্তি-যুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, 'নামা'ভিহিত 'গুণ' অথবা 'দ্রব্য' বিকৃতিজাত হইয়া বৈকৃতিকতা লাভের সহায়ক হইয়াছে এবং উহা যখন তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, নামাভিহিত 'গুণ' অথবা 'দ্রব্য' প্রাকৃতিকতা লাভের প্রয়াসী হইয়াছে। এই কথাগুলি স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে ব্যাকরণের আরও অনেক কথা জানিতে হইবে। তাহা জানাইয়া দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে। সংক্ষেপতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, যেমন তিঙাদি-বিভক্তিগুলির এবং কৃদন্ত-প্রত্যয়গুলির বিশেষ বিশেষ গূঢ় অর্থ আছে, সেইরূপ সুবাদি বিভক্তিসমূহের এবং তদ্ধিত প্রত্যয়সমূহেরও বিশেষ বিশেষ গূঢ় অর্থ বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত গূঢ় অর্থ না জানিয়া ঋষি-প্রণীত কোন পদ অথবা বাক্যের অর্থ প্রচার করিতে গেলে উহা কদর্থে প্রচারিত হয় এবং তাহার ফলে নির্ব্বংশ ও শ্রীহীন হইতে হয়। ভাষ্যকার, টীকাকার ও অনুবাদকারগণের এবং তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণের হইয়াছে এবং হইতেছেও তাহাই।

'স্বর্গ' শব্দের অর্থে কোন 'স্থানের নাম' বুঝা যাইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিতে বসিয়া ব্যাকরণের উপরোক্ত কথাগুলি বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ব্যাকরণ আধুনিক মূর্খ-'পণ্ডিত'গণের হাতে যে, অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে এবং ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ যে, এই আধুনিক 'পণ্ডিত'গণের পক্ষে আদৌ বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে, তাহা সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন পাঠকবর্গকে বুঝান। দ্বিতীয়তঃ, কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ যে কখনও দ্রব্য অথবা গুণার্থক হইতে পারে না এবং উহা যে সর্ব্বদাই কর্ম্মার্থক হইয়া থাকে, তাহা বুঝান।

এক্ষণে দেখা যাউক "স্বর্গ" শব্দটীর মধ্যে কি কি প্রকৃতি এবং প্রত্যয় আছে।

'স্বর্গ' শব্দটীর মধ্যে আছে প্রধানতঃ দুইটী পদ, প্রথমটী—'স্বর্' এবং শেষটী—'গ'। এই দুইটী পদ "নাম" অথবা "আখ্যাত" শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, দুইটী পদই কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত 'আখ্যাত' এবং সমাসযুক্ত সম্পূর্ণ পদটী কৃৎপ্রত্যয়ান্ত। "স্বর্" শব্দটী 'ধি'-প্রত্যয়ান্ত 'স্থ' ধাতু আর 'গ' শব্দটী ড-প্রত্যয়ান্ত 'গৈ' ধাতু। কাযেই 'স্বর্গ' শব্দটি যে কোন 'গুণ' অথবা 'দ্রব্য' বাচক হইতে পারে না, পরন্তু উহা যে কোন না কোন জ্ঞান-জ কর্ম্ম-বাচক হইবে, তাহা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহা 'দ্রব্য'-বাচক নহে, তাহা কখনও 'স্থান'-বাচক হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য, কারণ "স্থান" "দ্রব্যে"রই অন্তর্গত।

এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করুন; এই মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয়টীর এবং তাঁহার শ্রেণীর পণ্ডিত গণের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান কতখানি।

'স্বর্গ' শব্দটী যদি কর্ম্মার্থক হয়, তাহা হইলে উহার অর্থ কি হইবে, ইহা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'স্বর্গ' শব্দটীর অর্থ হইবে, সেই কর্ম্ম, যে, কর্ম্মে জীব-সত্ত্বার প্রত্যেক বিকাশ প্রত্যক্ষযোগ্য হইয়া থাকে।

পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোক্ষ-যোগাধ্যায়ে গীতার সমাপ্তি এবং 'স্বর্গারোহণ' পর্ব্বে মহাভারতের সমাপ্তি।

ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হইবে যে, "মহাভারত" রচনার উদ্দেশ্য—মানুষের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও অভিমানের বীজ কেন ও কি করিয়া উৎপন্ন হয়, এবং ঐ বীজ হইতে উহাদিগের আতিশয্যের বেগ উদ্ভব হয় এবং কি করিয়া ঐ আতিশয্য নিবারণ করা সম্ভব হয়, তাহা বুঝান। ইহাই যে মহাভারতের উদ্দেশ্য, তাহা আমরা মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ের তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাসদেবের নিজের কথার দ্বারাই দেখাইয়াছি। আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও অভিমান তাহার সত্ত্বার সহিত এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, জীব-সত্ত্বার প্রত্যেক উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ-যোগ্য না হইলে কখনও ঐ ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও অভিমানের বীজ উপলব্ধি করা, অথবা উহাদিগের আতিশয্য নিবারণ করা সম্ভব হয় না। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও দেখা যাইবে যে, 'মহাভারতে'র উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে যে কর্ম্মের দ্বারা জীবসত্ত্বার প্রত্যেক উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, সেই কর্ম্মে সাফল্য লাভ করা অথবা "স্বর্গা"রোহণ করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "স্বর্গ"-শব্দে যে অর্থ গ্রহণ করা হইতেছে, তাহা কার্য্য-কারণসঙ্গত এবং ব্যাসদেবের অনুমোদিত। তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রেণীর 'পণ্ডিত'গণ যে "স্বর্গ"-শব্দকে কখনও 'কোন সুখ', আবার কখনও "কোন স্থানের নাম" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার মূল কারণ ইঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত নহেন।

শুধু যে হিন্দু-'পণ্ডিত'গণেরই সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে এই অবস্থা হইয়াছে, তাহা নহে, মুসলমান ও খৃষ্টান 'পণ্ডিত'গণও একই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।

আরবী ও হিব্রু ভাষায় "স্বর্গ"-শব্দের যে দুইটী প্রতিশব্দ রহিয়াছে, শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে ঐ দুইটী প্রতিশব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দুইটী শব্দও "স্বর্গ"-শব্দের উপরোক্ত অর্থের সহিত সম্পূর্ণভাবে একার্থক।

সংস্কৃত ভাষায়, যাঁহারা শব্দ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি পালন না করিয়া যথেচ্ছভাবে শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়। এতদনুসারে আধুনিক মুসলমান ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণকে 'ম্লেচ্ছ' বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রাচীন সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণ এমন ছিলেন যে, তাঁহাদিগকেও সংস্কৃত ভাষানুসারে ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারিত না। সংস্কৃত ভাষা মানিয়া চলিলে, শুধু যে আধুনিক মুসলমান ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণকেই ম্লেচ্ছ বলিতে হয় তাহা নহে, তর্করত্ন মহাশয় শ্রেণীর আধুনিক হিন্দু-'পণ্ডিত'গণকেও 'ম্লেচ্ছ' বলিতে হয়, কারণ ইঁহারাও শব্দ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি পরিজ্ঞাত নহেন এবং শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে ও উহা পালন করিতে পারেন না এবং করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ ম্লেচ্ছগণ আজ বাংলার হিন্দুসমাজের ঋষি-ধর্ম্ম পালনের এবং সংস্কৃত শিক্ষার কর্ণধার হইতে চাহেন। মানুষ আর কত কাল মোহান্ধ হইয়া থাকিবে? মনুষ্য-সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত যে আজ টলটলায়মান।

তর্করত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যে কত বিকৃত, তাহার আরও সাক্ষ্য আগামী সংখ্যায় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব।

ছাত্রবৃন্দের নেতৃত্ব

গত ২০শে নবেম্বর তারিখে ধুবড়ীতে জিলা ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতিরূপে মিঃ শরৎচন্দ্র বসু একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতায় বক্তা যে-সকল মত প্রকাশ করেন, এই সন্দর্ভে আমরা তাহার আলোচনা করিব। ঐ বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার মূল্যবান্ সময়ের কিয়দংশ তাঁহার সহকর্ম্মিগণের তথা দেশের চিন্তায় অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার শ্রেণীর অপরাপর নেতৃবৃন্দ এই চিন্তায় যে-সময় ক্ষেপ করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তিনি বোধ হয় এই বিষয়ে অধিকতর সময় ক্ষেপই করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি দেশবাসী জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণের দিক্ হইতে যে মতবাদকে যথোচিত বলা যায়, তিনি সে মতবাদ অর্জ্জনে অদ্যাবধি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই বক্তৃতায় অনন্যমূলক চিন্তাধারার যে সামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই আমরা বলিতেছি যে, অপরাপর নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা মিঃ শরৎচন্দ্র বসু দেশ এবং জাতিকে কি ভাবে অগ্রগামী করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় অধিকতর সময় ক্ষেপ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি প্রকৃত পন্থার সন্ধান-লাভে কৃতকার্য্য হন নাই এবং তাঁহার মতবাদসমূহ ছাত্রসমাজকে বিপথগামী করিয়া নিশ্চিতরূপে তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, ইহাও আমরা বলিব। কেন না, তাঁহার এই সকল চিন্তা পাশ্চাত্ত্য দেশ এবং বিদেশীয় গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে লব্ধ এবং তিনি নিজে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের ক্রীতদাস মাত্র। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পাশ্চাত্ত্য দেশেও সজ্জনের অভাব নাই, কিন্তু ঐ দেশের অর্থনীতিবিদ্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং রাষ্ট্রনেতাগণকে প্রকৃতপক্ষে সৎ বলা যায় কি না, তাহা বিচারসাপেক্ষ। পাশ্চাত্ত্য দেশের এই সকল বিষয়ক ধুরন্ধরবৃন্দকে যে উচ্চ আসনেই এদেশবাসিগণ অধিষ্ঠিত করিয়া থাকুন না কেন, ইহা বাস্তব সত্য যে, তাঁহাদেরই কৃতকার্য্যের ফলে জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্ত্য ভূভাগস্থ উল্লেখযোগ্য দেশসমূহ মনুষ্যরক্তপাত বিষয়ে কুণ্ঠা পরিহার করিয়া পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন।

আমাদের মতে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকার, তথা পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রনেতাগণের যে-সকল কথা মস্তিষ্কে স্থান দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিবার শিক্ষা না পাইলে, কখনও স্বাধীন গবেষণা-কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন না এবং তাঁহারা স্বাধীন গবেষণা-কার্য্যে সাফল্যলাভ না করিলে, দেশ ও জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় যে-শ্রেণীর নেতৃত্বের অত্যন্ত প্রয়োজন, তাঁহাদের দ্বারা সেই প্রকার নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জ্জিত হইতে পারে না।

মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর বক্তৃতাকে প্রধানতঃ তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমাংশে, বর্ত্তমান-যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ হওয়া সম্ভব, তিনি তাহার আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশে, যুদ্ধকালীন ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য-বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। দেশের যুব-শক্তির দেশসেবার কার্য্যে যোগ্য হইবার নিমিত্ত কিরূপ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, তৃতীয়াংশে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

বক্তৃতানিহিত প্রধান বক্তব্যাংশ উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের তুলনায়, তাঁহার এই বক্তৃতায় প্রসঙ্গসমূহের পরম্পর যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু উত্তরাধিকারসূত্রে যে মস্তিষ্ক-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং স্বভাবতঃ সেই মস্তিষ্ক উচ্চস্তরের চিন্তায় প্রবেশাধিকারী, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত কুশিক্ষাবশতঃ তিনি তাঁহার স্বভাবগত সামর্থ্য-সমূহের যথোচিত ব্যবহারে অকৃতকার্য্য হইতেছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রকৃতি ও গতি-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক মহাযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিবে এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-বাদের জয়ে এক-নেতৃত্ববাদ পৃথিবী হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায় লাভ করিবে। তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হয় যে, এক-নেতৃত্ববাদের ধ্বংসসাধন, তথা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-রক্ষায় মিত্রপক্ষের সঙ্কল্পই যুদ্ধের প্রধান হেতু।

মিঃ বসুর বক্তৃতার প্রথমাংশের আলোচনা হইতে নিম্ন-লিখিত প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হইতেছে :

(১) মিঃ বসু কর্ত্তৃক যুদ্ধের কারণ নির্ণয় অভ্রান্ত হইয়াছে কি না?

(২) তিনি অভ্রান্ত না হইলে, যুদ্ধের কারণ বস্তুতঃ কি ?

(৩) বর্ত্তমান যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক মহাযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিয়া কয়েক স্থানে সম্মুখ-সমর বাধিবে, মিঃ বসুর এই অনুমান যথার্থ কি না ?

(৪) এই তৃতীয় দফার বক্তব্য বিষয়ে তাঁহার অযাথার্থ্য প্রমাণিত হইলে, যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি কি হইতে পারে ?

(৫) বর্ত্তমান যুদ্ধে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাবাদের জয়লাভ দ্বারা চিরতরে এক-নেতৃত্ববাদ ধ্বংসলাভ করিবে, মিঃ বসুর এই অনুমান অভ্রান্ত কি না ?

(৬) তিনি অভ্রান্ত না হইলে যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণাম কি ?

প্রথম দফায় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, যুদ্ধ-ঘোষণায় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার রক্ষা এবং এক-নেতৃত্ববাদের ধ্বংস-সাধনই মিত্রপক্ষের লক্ষ্য কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ স্থির করিতে হইবে "এক-নেতৃত্ববাদ (totalitarianism)" কথাটির প্রকৃত অর্থ কি,এবং দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা করিতে হইবে যে, মিত্রপক্ষের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপ এক-নেতৃত্ববাদ-পরিশূন্য কি না এবং মিত্রপক্ষের শাসনতন্ত্রে একমাত্র গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাবাদেরই প্রাধান্য বর্ত্তমান কি না। ফরাসী ও ব্রিটিশ উভয় শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে এক-নেতৃত্ববাদ-পরিশূন্য এবং তাঁহারা কেবল গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাবাদ দ্বারা পরিচালিত, ইহা দেখিতে পাইলে আমাদিগকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, মিত্রপক্ষ এক-নেতৃত্ববাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস-কামনাতেই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যপক্ষে ফরাসী ও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র, উভয়েই, এমন কি অংশতঃও এক-নেতৃত্ববাদ বিরাজমান, সুতরাং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাবাদ তাঁহাদের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিরাজমান নহে, ইহা দেখিতে পাইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যুদ্ধের মূলে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাবাদের প্রাধান্যরক্ষা ও এক-নেতৃত্ববাদের ধ্বংস-সাধনার কামনা বিদ্যমান, এরূপ অনুমান নিতান্তই কল্পনামূলক।

অতঃপর, অভিধানের পৃষ্ঠায় 'এক-নেতৃত্ববাদ' কথাটির প্রকৃত অর্থের সন্ধানে অগ্রসর হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ইহার অর্থ হইতেছে "এমন মনোভাব অথবা রাষ্ট্রবিধি, যাহা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা আনুগত্য স্বীকার করে না, (Some spirit of, or pertaining to a polity, which permits no rival loyalties or parties.)" 'এক-নেতৃত্ববাদে'র এই আভিধানিক অর্থকে ভিত্তি করিয়া এক-নেতৃত্ববাদ ভাল অথবা মন্দ, কিংবা কোন শাসনতন্ত্র পরিচালনা প্রতিদ্বন্দ্বী দল অথবা আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত কি উপায়ে সম্ভব, তাহার ধারণা গঠনের চেষ্টা করিলে আমরা দেখিব যে, জন-সাধারণের সহিত সরকারের সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দল অথবা আনুগত্যের অবিদ্যমানতা দুইটি মাত্র ক্ষেত্রে সম্ভব। যখন সত্য-বিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে এবং তাহার ফলে জন-সাধারণ একই আদর্শপ্রণোদিত হয় এবং সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনের নিশ্চয়তা, ও তুলনামূলক যোগ্যতার যথাযথ পরিমাপের অস্তিত্ববশতঃ জীবন-যাত্রার মান বিষয়ে সর্ববব্যাপক সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকে, তখন জন-সাধারণের চিত্ত ও কার্য্য একসূত্রে গ্রথিত থাকে এবং স্বতঃই শাসনতন্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও আনুগত্যের অবিদ্যমানতা ও এক-নেতৃত্ববাদের বিদ্যমানতা প্রাধান্য লাভ করে। সরকারের এই প্রকার অবস্থায় 'এক-নেতৃত্ববাদ' অবাঞ্ছনীয় কিংবা ক্ষতিকর নহে। বরং এই অবস্থা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে যখন সত্য-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ঘটে, এবং তাহারা জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিবিধ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় এবং যখন সমাজের প্রত্যেক স্তরে কোন না কোন প্রকার অসন্তুষ্টি বিরাজ করে এবং ঐ সমাজের বুদ্ধিজীবিগণ সমাজস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপার্জ্জনের নিরাপদ সংস্থানে অক্ষম হওয়ায় যখন অনাহার ও বেকার সমস্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী দল এবং আনুগত্যেরও নিশ্চিত প্রাদুর্ভাব ঘটে। এমতাবস্থায় সরকারের স্বতঃই 'এক-নেতৃত্ববাদ'-এর অবিদ্যমানতা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু জন-সাধারণের এই প্রকার অবস্থা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, 'এক-নেতৃত্ববাদে'র অবসান মাত্রই জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণজনক নহে

তৃতীয়তঃ, জনসাধারণ উপরিনির্দিষ্ট অবাঞ্ছনীয় ঘটনার দ্বারা প্রপীড়িত হইলে স্বভাবতঃই যখন প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও আনুগত্যের উদ্ভব ঘটে, তখন সরকারসমূহ আইন অথবা

অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে মৈত্রী-বন্ধন দ্বারাই হউক, কিংবা সবল হস্তে হউক, সকল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শাসন পরিচালনা করিতে পারেন। সরকারসমূহের এই অবস্থায়, আপাতদৃষ্টে 'এক-নেতৃত্ববাদ' অবিদ্যমান বলিয়া দেখা গেলেও বাস্তবতঃ দেখা যায় যে, মন্ত্রিসভা প্রভৃতি যে-কোন আখ্যায় একদল ব্যক্তির প্রাধান্যে তথায় এক-নেতৃত্ব সূচিত রহিয়াছে, কেন, না এই দল প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপে প্রতিদ্বন্দ্বী দল অথবা আনুগত্যের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না। ইহাকে দ্বিতীয় প্রকার 'এক-নেতৃত্ববাদ' বলা যায় এবং ইহা অকল্যাণকর। অতঃপর, ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার-সমূহে কোন প্রকার 'এক-নেতৃত্ববাদ' বিদ্যমান কি না, তাহা পরীক্ষার চেষ্টা করিলে আমরা দেখিব যে, ফরাসী অথবা ব্রিটিশ, কোন সরকারেই প্রথম শ্রেণীর 'এক নেতৃত্ববাদ' বর্ত্তমান নাই, কিন্তু উভয়ের মন্ত্রিসভাই যখন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অথবা আনুগত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে স্বীকার করেন না, তখন ফরাসী ও ব্রিটিশ উভয় সরকারেই দ্বিতীয় শ্রেণীর 'এক-নেতৃত্ববাদ' বর্ত্তমান। সুতরাং যে পর্য্যায়েরই হউক, উভয় সরকারেই যখন 'এক-নেতৃত্ববাদ' বর্ত্তমান, তখন ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ইহাঁদের কেহই গণতন্ত্র, তথা স্বাধীনতাবাদের নীতিসমূহের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে প্রণোদিত নহেন।

কোন-প্রকার 'এক-নেতৃত্ববাদ'-এর সংস্পর্শে না আসিয়া কেবল গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাবাদের নীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কোনরূপ শাসন পরিচালনা সম্ভব কি না, রাষ্ট্র-দর্শনের ইহা অন্যতম প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের আলোচনা আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধে করিব না।

যাহাই হউক, যতদিন ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার, উভয়েই কোন না কোন প্রকার 'এক-নেতৃত্ববাদে'র সংস্পর্শ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন যুক্তিসঙ্গত ভাবে ইহা বলা চলে না যে, মিত্র-পক্ষ ধরাতল হইতে 'এক-নেতৃত্ববাদ' সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিবার কামনা দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই যুদ্ধে লিপ্ত হইবার বিপদ্ স্বীকার করিয়াছেন। যদি আমরা মিত্রপক্ষকে ইহারই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনে অগ্রসর দেখিতাম, তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেও পারিতাম না, কেন না, কোন সরকারই কোন না কোন প্রকারের 'এক-নেতৃত্ববাদ' ব্যতীত চলিতে পারে না।

সুতরাং, আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, মিঃ বসু কর্ত্তৃক বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ নির্ণয় একেবারেই যথোচিত হয় নাই।

বস্তুতঃ গত চার-পাঁচ বৎসর কালের পৃথিবীর ঘটনাসমূহের গতি সম্যক্ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভা বরাবরই যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহার ফলে ব্রিটিশ জাতির শক্তি হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বহির্জ্জগৎ মনে করিয়াছে। এই নিমিত্ত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে যথেষ্ট উপহাসাস্পদও হইতে হইয়াছে এবং কতিপয় ব্রিটিশ "টোরি (Tory)" ইহাতে যথেষ্ট আঘাত বোধ করিয়াছেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যুদ্ধ এড়াইয়া চলায় বহির্জ্জগতের উপহাস যে-সকল ব্রিটিশ "টোরি"কে অত্যন্ত আহত করে, তাঁহারাই পার্লামেণ্টে অবশেষে সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া, ব্রিটিশ জাতির শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এই কলঙ্ক হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ-ঘোষণায় বাধ্য হইয়াছেন।

দর্শন-বিষয়ক অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয় মিঃ শরৎচন্দ্র বসু জানিয়া রাখিতে পারেন যে, যে যুদ্ধ অথবা সংঘর্ষ মনুষ্য-প্রাণসংহারক হয় কিংবা মনুষ্যকে চিরতরে পঙ্গু করিতে পারে, তাহা কখনও কল্যাণচিন্তা-প্রসূত নহে, সর্ব্বদাই দেখা যাইবে যে, হয় তাহা মনুষ্যের কুভাব কিংবা আত্মাভিমানপ্রসূত। কেহ যখন আন্তরিক ভাবে সমাজের হিতচিন্তায় রত হন, তখন তিনি যুক্তিদ্বারা অথবা বিপক্ষের কল্যাণসাধন-কার্য্য দ্বারা বিপক্ষকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার সামর্থ্যযুক্ত হন।

ব্রিটিশ জাতির শক্তি যে কোনক্রমেই খর্ব্বতা লাভ করে নাই, পৃথিবীসমক্ষে ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য রক্ষণশীল এই ব্রিটিশ 'টোরি'গণের মনোভাবই যুদ্ধ-ঘোষণার আশু কারণ বলিয়া বুঝা যাইবে। মিঃ বসুর আলোচনা হইতে যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, ইহাই তাহার দ্বিতীয় দফা।

তৃতীয় দফার বিচারে আমরা প্রথম দেখিতে পাই যে, এ পর্য্যন্ত জার্ম্মান ও মিত্রপক্ষের মধ্যেই যুদ্ধ বাধিয়াছে, এবং এখন পর্য্যন্ত, উভয় পক্ষেরই সেরূপ জটিলতা সৃষ্টির মনোভাব বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা আন্তর্জ্জাতিক মহাযুদ্ধের আকার লাভ করে নাই। অতঃপর ইহাও লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র—এমন কি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেও জনসাধারণের মধ্যে এমন একশ্রেণীর লোক পাওয়া যাইবে, যাঁহারা হয় যুদ্ধসম্বন্ধে

সম্পূর্ণ উদাসীন, নয় যুদ্ধ-লিপ্সার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। এই শ্রেণীর লোক বস্তুতঃ সংখ্যায় অধিক না হইলেও, কোনক্রমেই তাঁহাদিগকে নগণ্য বলা যাইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে, যাঁহারা এই যুদ্ধকে আন্তর্জ্জাতিক মহাযুদ্ধের আকার দিতে চাহেন, তাঁহারা সফলকাম হইবেন কি না, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগণ যদি এই যুদ্ধকে আন্তর্জ্জাতিক মহাযুদ্ধে পরিণত করিতে পারেন, তবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ অনতিবিলম্বে গৃহ-বিবাদের আগারে রূপান্তরিত হইবে। আন্তর্জ্জাতিক কোন মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমাদের আশঙ্কা যে, অধিকাংশ সভ্যজাতিই আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপাদন সম্বন্ধে অনবহিত হইতে বাধ্য হইবে এবং জনসাধারণ অনাহার ও বিবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইবে, এই জন্যই আমরা এই কথা বলিতেছি। এইরূপ কোন ঘটনা যাহাতে না ঘটে, তাহাই আমাদের কাম্য, কিন্তু পৃথিবীর সকল জাতিই যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি মারমুখী হইয়া উঠে, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা না ঘটিবার স্বপক্ষে আমরা কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

পঞ্চম দফার বিচারপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সকল দিক্ দিয়া "এক-নেতৃত্ববাদ" কি, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন শাসনই সম্পূর্ণরূপে 'এক-নেতৃত্ববাদ'-বিবর্জ্জিত ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না এবং সকল প্রকারে 'এক-নেতৃত্ববাদে'র অবসান ঘটিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ ঘটে এবং কোন সমাজেই সম্পূর্ণরূপ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ইহাও লক্ষণীয় যে, জনসাধারণ যখন জীবনযাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জনের বিষয়ে নিশ্চয়তা বোধ করে না এবং শাসন-পরিচালনা বিষয়ে তাহাদের অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে, কেবল তখনই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাবাদের কথা উত্থাপিত হইতে শুনা যায়। সুতরাং, আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম, কি ভাবে "এক-নেতৃত্ববাদ"-এর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া তৎস্থানে পূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের মতে, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ "এক-নেতৃত্ববাদ"ই বা কি, এবং "গণতন্ত্র" বা "স্বাধীনতাবাদ"ই বা কি, তাহা সম্যক্ ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না, এবং এই জন্যই তাঁহারা বাস্তবক্ষেত্রে যে-রূপ-সংগঠন কোনক্রমেই গঠিত হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন কিংবা যে সংগঠন উপেক্ষণীয়, তাহারই চিন্তায় বিভোর থাকেন।

যুদ্ধের আশু প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার যেরূপ কারণ রহিয়াছে, সেইরূপ শেষতঃ মনুষ্যজাতির তিক্ত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নূতন ও কল্যাণজনক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হওয়াও সুনিশ্চিত। আমাদের মতে, এই নূতন ও কল্যাণজনক সমাজ-ব্যবস্থার কিরূপ সংগঠন ও প্রকৃতি হইবে, তাহা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতের অপরিজ্ঞাত। বর্ত্তমান জগতে চিন্তাক্ষেত্রে যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারা যাহাতে বিশৃঙ্খল অবস্থা নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হন, আমরা সেই অনুরোধ জ্ঞাপন করি, কেন না, সেই অবস্থার তিক্ততা মনুষ্যের সহনশীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে বাধ্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন ভারতবাসিগণের কি কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ শরৎচন্দ্র বসু প্রথমেই ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র-প্রতিরোধ-প্রয়োগের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। এই নিরস্ত্র-প্রতিরোধের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "এক দল অতি-পরিশ্রমে কাতর ব্যক্তি, যাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই এবং আমাদের দেশের সমস্ত কার্য্যক্ষম অধিবাসীর অতি সামান্যাংশের মধ্যেই যাঁহারা সীমাবদ্ধ, তাঁহাদের লইয়া আমরা সংঘর্ষ চালাইতে পারি না। নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টির প্রয়োজন, নূতন সংস্থানের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন এবং যতদূর সম্ভব দেশের সাধারণ অধিবাসীকে, সাধারণতঃ যাঁহারা রাজনৈতিক কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা দরকার। জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি প্রসার করিয়া তাহাকে সংখ্যা অথবা অথবা সামর্থ্য, উভয় দিক্ হইতেই অধিকতর ও দৃঢ়তর রূপ স্থায়ী করিবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বথা চেষ্টিত হইতে হইবে।"

মিঃ বসুর এই প্রসঙ্গ উল্লেখ বাস্তবিকই মূল্যবান্ এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থকারসমূহ হইতে লব্ধ কুসংস্কার দ্বারা তিনি যদি প্রভাবিত না হইতেন, তবে তিনি অচিরাৎ বুঝিতে পারিতেন

যে, তাঁহার অভিলাষের যাহা প্রধানাংশ,কোন প্রকার "নিয়ন্ত্র-প্রতিরোধ" দ্বারাই তাহার ভিত্তি গঠিত হইতে পারে না। "নিরস্ত্র দাবী" উপস্থিত করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু যদ্যপি সমগ্রভাবে "নিরস্ত্র-প্রতিরোধ" সম্ভবও হয়, তথাপি নিরস্ত্র প্রতিরোধ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

যুব-শক্তির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে মিঃ বসু যে দর্শন উদ্গার করিয়াছেন, যাঁহারা "যৌবনের ধর্ম্ম"বিষয়ক চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ দর্শন অবোধ্য। ইতিপূর্ব্বে একাধিক সংখ্যায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে সে-আলোচনার পুনরাবৃত্তি করিব না।

মিঃ বসুর শ্রেণীর নায়কবৃন্দ অপরের দোষ ক্রটি সংশোধনে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে স্বকীয় দোষ-ক্রটি সংশোধনে অবহিত হন, ইহাই আমরা কামনা করি।*

বাঙ্গালা সরকারের পল্লী-সংস্কার পরিকল্পনা

বাঙ্গালার নবাগত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মহামান্য স্যর জন হার্বার্ট পল্লী-সংস্কার পরিকল্পনা বিষয়ে যথেষ্টরূপ অবহিত বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। গত ২রা ডিসেম্বর তারিখে "জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘ (National-Wolfare Unit)"-এর সদস্যদের সম্মুখে তিনি যে বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

জাতির উন্নয়ন-কার্য্য প্রসারার্থ বাঙ্গালা সরকার 'জাতীয় কল্যাণ কর্ম্মীসংঘে'র পরিকল্পনা সংগঠন করিয়াছেন। কর্ম্মী-সংঘ নিম্নলিখিত কার্য্যসমূহে ব্যাপৃত হইবেন :—

(১) ডাক্তারী চিকিৎসার সাহায্যদান;

(২) স্বাস্থ্য-বিষয়ে পরামর্শ দান;

(৩) জনসাধারণকে স্বাবলম্বন শিক্ষাদান;

(৪) অবস্থার উৎকর্ষ-সাধনের যুক্তিযুক্ত পন্থা বিষয়ে জনসাধারণকে নির্দ্দেশ দান;

(৫) কৃষিকার্য্যের উন্নত-প্রণালী বিষয়ে জন-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ;

(৬) সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির উন্নত পন্থায় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ।

বক্তৃতা, বায়োস্কোপ এবং প্রদর্শনীর সাহায্যে কর্ম্মীসংঘ এই সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে।

মহামান্য লাট বাহাদুর 'জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘে'র সম্মুখে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য অংশ নিম্নলিখিত দুই ভাগে বিভক্ত :—

(১) "একদিকে কার্য্যপ্রেরণা এবং অপরদিকে সহযোগিতার প্রকৃত ভাবের সহায়তায় অত্যল্প কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব";

(২) "অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং অনাহার, এই তিন প্রকার মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদিগকে সর্ব্বদা অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে এবং যতদিন না তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হয়, ততদিন মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের চেষ্টায় শৈথিল্য ঘটিতে দিলে চলিবে না।"

জাতীয় কল্যাণ কর্ম্মীসংঘের কার্য্যে ইতিমধ্যেই স্যর জন হার্বার্ট যে কার্য্যোদ্যম এবং সহযোগিতার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, এই প্রদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দ তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া পারিবেন না। অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা, জনসাধারণের এই তিনটি মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্য মহামান্য লাট বাহাদুরের এই সংকল্প প্রশংসার্হ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বাঙ্গালার পল্লী উন্নয়ন ব্যাপারে লাট বাহাদুরের এই সংকল্প এবং কার্য্যোদ্যম উৎসাহ ও প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু সকল প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, "জাতীয়-কল্যাণ-পরিকল্পনাকল্পে যে সকল কার্য্যে কর্ম্মীসংঘ হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছেন, তাহা লাট বাহাদুর-উল্লিখিত জনসাধারণের যে তিনটি মারাত্মক শত্রু অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা, ইহাদের উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য্য হইবে কি না।"

*"দি উইক্লি বঙ্গশ্রী"র ২৩শে নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা হইতে বলিতে আমরা বাধ্য যে, জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘ-পরিকল্পিত কার্য্যসমূহের ফলে জনসাধারণের এই তিনটি শত্রুর (অর্থাৎ অস্বাস্থ্য,দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার) সর্ব্বনাশকর প্রভাবের উচ্ছেদ-সাধন দূরে থাক, ফলতঃ উহারা বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিশেষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্য্যন্ত শিথিল করিবার কারণ উপস্থিত হইবে। আমরা মনে করি যে, গত কয় বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার, তথা ভারতের সমগ্র জনসাধারণ যে ভাবে এই তিনটি উৎপাতের, অর্থাৎ অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহাদের উচ্ছেদ-সাধন কার্য্যে অসাফল্য বর্ত্তমান সরকারকে নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ করিবে, কেন না, প্রজাবৃন্দের অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা নিবারণে অপারগ হইলে কোন উৎকৃষ্ট সরকারও টিকিয়া থাকিতে পারেন না।

আমাদের বক্তব্য এই যে, জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘ যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিমাণেও জনসাধারণের অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা নিবারণ সম্ভব হইবে না, বরং তাহাতে ইহাদের প্রত্যেকটির মূল কারণ বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের এই মতবাদ যথার্থ কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘ-প্রস্তাবিত কার্য্যাবলীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিস্তৃত বিশ্লেষণ-কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, আমরা স্যর জন হার্ব্বার্টকে, সমাজের অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে—লাট সাহেব হিসাবে নহে—লক্ষ্য করিতে অনুরোধ জানাইতেছি যে, এই সকল কার্য্য ইতিপূর্ব্বে ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় সকল প্রদেশেই আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই দেশবাসীর অধিক সমষ্টি যে তত্রত্য জনসাধারণ, তাহাদের অস্বাস্থ্য কিংবা দারিদ্র্যের কোন প্রতীকার দেখা যায় না। গত ত্রিশ বৎসরের সমাহার-বিবরণী (census report) হইতে দেখা যাইবে যে, চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত জনসংখ্যার মধ্যে জীবিত অপেক্ষা মৃতের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। হাসপাতালসমূহের বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, অসুস্থ ব্যক্তির, তথা ব্যাধির সংখ্যা ও তীব্রতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রত্যেক দেশের সরকারের বার্ষিক বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্র দারিদ্র্যের করাল ব্যাদান হইতে জনসাধারণকে রক্ষার্থ সরকারসমূহ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত রহিয়াছেন। প্রত্যেক দেশে ধাতু ও কাগজের মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রসার লাভ করিয়াছে, বাণিজ্যের বাজার বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের নিয়োগাভাব এবং আহার্য্য ও কাঁচা-মালের অভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই বুঝা যাইবে যে, জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘ যে-সকল কার্য্যে ব্রতী হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য বিতাড়নে তাহারা যদি প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী হইত, তাহা হইলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ঐ সকল কার্য্য নিশ্চয়ই সার্থক হইত, এবং তাহা হইলে কোন ক্রমেই ঐ সকল দেশ নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিতে উদ্বুদ্ধ হইত না। সুতরাং অগ্র হইতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘের প্রস্তাবিত কার্য্যকলাপের উপর জনসাধারণের অস্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যের প্রতীকার বিষয়ে নির্ভর করা চলে না।

এই সকল কার্য্যকে অধিকতর বিশ্লেষণাধীন করিলে দেখা যাইবে যে, ছয়টি প্রস্তাবিত কার্য্যের প্রথম দুইটির (অর্থাৎ ডাক্তারী চিকিৎসার সাহায্য দান এবং স্বাস্থ্য-বিষয়ে পরামর্শদান) লক্ষ্য হইতেছে, জনসাধারণের অস্বাস্থ্য নিবারণ এবং অপর চারিটির লক্ষ্য হইতেছে, তাহাদের দারিদ্র্যের প্রতীকার এবং সমগ্রভাবে ছয়টির লক্ষ্য হইতেছে, জনসাধারণের অজ্ঞতা নিবারণ। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, ইহাদের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় হইলেও, কার্য্য-পন্থার প্রত্যেকটিই নিন্দার যোগ্য।

যথাযথভাবে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ধারণা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইহা কেবল ব্যাধির লক্ষণসমূহ নিরাময় চেষ্টাতেই নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু ইহা না জানিতে সমর্থ হইয়াছে মনুষ্য-জীবনের কিংবা ব্যাধির মূল কারণ, না জানিতে সমর্থ হইয়াছে কোন প্রকার ব্যাধির সম্পূর্ণ প্রতীকার-পন্থা। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে এই যে,আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহায়তায় যে জাতীয় চিকিৎসার সাহায্য এবং পরামর্শ দান সম্ভব, তদ্দ্বারা কেবল ব্যাধিগ্রস্তের আশু যন্ত্রণার উপশম সম্ভব, তদ্দ্বারা সমূলে কোন ব্যাধির নিবারণ যেরূপ সম্ভব নহে, তেমনই কোন ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার

ব্যবস্থাও তদ্দ্বারা সম্ভব নহে। এই জন্তই প্রায়শঃ দেখা যায় যে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চিকিৎসা-পন্থা এবং ঔষধাদির প্রতি যাঁহারা বীতরাগবশতঃ ইহাদের কেবল এড়াইয়া চলেন, জনসাধারণের সেই অংশ, যাঁহারা আধুনিক ঔষধ, তথা আধুনিক চিকিৎসকের কবলে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা দীর্ঘ কালের জন্ত অধিকতর সুস্থভাবে জীবন যাপন করেন।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রত্যেক দেশের সরকারের কর্ত্তব্য হইতেছে, দোষযুক্ত ঔষধাবলী এবং ভ্রান্ত চিকিৎসা-পন্থার প্রসার-সাধন না করিয়া যাহাতে নির্দ্দোষ ঔষধাবলী এবং প্রকৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এবং নির্দ্দোষ ঔষধাবলীর সন্ধান না পাওয়া যাইবে, ততদিন চিকিৎসা-ব্যাপারে আধুনিক চিকিৎসা পন্থার প্রসার কিংবা নিবারণ, কোন কিছুর প্রচারে সাহায্য না করিয়া জন-সাধারণের অভিলাষ অনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া সরকার মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহা না করিয়া যদি কোন সরকার দোষযুক্ত ঔষধাবলী এবং ভ্রান্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রচারার্থ প্রচারকার্য্যে অবতীর্ণ হন, তবে কোনদিনই জনসাধারণ কোন ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে, যখন প্রজা-সাধারণ, তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য-ধ্বংসের কারণ হইবার নিমিত্ত সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বিদ্বিষ্ট হইবে। অনেকে হয়তো যুক্তি দেখাইবেন যে, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া এবং অপরাপর অনেক ব্যাধির ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালের আবিষ্কৃত ঔষধাবলী, তথা ইঞ্জেক্সন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে বেশ ভালভাবে উপকার হইতে দেখা যায়, কিন্তু এইরূপভাবে চিকিৎসিত লোকসমষ্টির আয়ুষ্কাল সযত্নে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা আধুনিক কালের ঔষধাবলীর এবং ইঞ্জেক্সন প্রক্রিয়ার অধীন না হইয়াছেন, তাঁহাদের তুলনায় ইহারা প্রায়শঃই অল্পজীবী। স্বাস্থ্য-বিষয়ে যদি সরকার প্রকৃতই জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণকামী হন, তবে সরকারকে এ-বিষয়ে কোন তথ্য গোপন না রাখিয়া প্রজা-বৃন্দকে জানাইতে হইবে যে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দুষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা হেতু এ বিষয়ে সরকার কিছুই করিতে পারেন না এবং অচিরাৎ যাহাতে নির্দ্দোষ এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্নিমিত্ত জনসাধারণ যাহাতে যথাসাধ্য গবেষণা-পর হন, তৎকল্পে তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। সরকার যদি এই ভাবে কার্য্য করেন, তবে জন-সাধারণের সমক্ষে তাঁহাদের সততা ও সারল্য প্রমাণিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাহার ফলে জন-সাধারণ ও সরকারের মধ্যে সাধু এবং কল্যাণজনক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাও নিকটবর্ত্তী হইবে। ইহা লক্ষণীয় যে, সরকার, তথা বৈজ্ঞানিকবৃন্দের স্তোকবাক্যের ফলে ইতিমধ্যেই সর্ব্বত্র জনসাধারণ এবং শাসকদলের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হইয়া প্রত্যেক দেশেই কম্যুনিজম প্রভৃতি সূচিত হইয়াছে।

দারিদ্র্য নিরসনকল্পে জাতীয়-কল্যাণ কর্ম্মীসংঘ প্রস্তাবিত কার্য্যকলাপের অবস্থাও একই প্রকার বলিয়া দেখা যাইবে।

এই কার্য্যকলাপের প্রথম দফাতেই জনসাধারণকে স্বাবলম্বনে দীক্ষাদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাকে হাস্যোদ্দীপক বলিতে হইবে। এমন কি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বালকদিগেরও আজ অবিদিত নাই যে, বর্ত্তমান জগৎ প্রকৃত প্রস্তাবে "স্ব" কি, তদ্বিষয়ে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে নাই, সুতরাং ইহাও বুঝা যাইবে যে জ্ঞান-জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় "স্ব"কে "অবলম্বন" করিবার প্রকৃত পন্থার সন্ধান সম্ভব নহে। চারি পার্শ্বে চাহিয়া ইহাও বেশ বুঝা যাইবে যে, যে-পৃথিবী একদিন স্বাধীন কৃষিজীবী, স্বাধীন ব্যবসায়জীবী, স্বাধীন শিল্পজীবী প্রভৃতির আবাসস্থল ছিল, যেখানে প্রত্যেক দেশের লোকসমষ্টির অধিকাংশ একদিন বেতনভোগী নফরগিরির অবলম্বন ব্যতীত স্বকীয় পন্থায় জীবিকার্জ্জন করিত, সেই পৃথিবী অধুনা কেবল হয় বেতনভোগী নফর, নয় বেতনভোগী নফরগিরীর জন্ত লালায়িত ব্যক্তির আবাসস্থলে রূপান্তরিত হইয়াছে। যদি চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যায় যে, কেন এরূপ হইল, তবে দেখা যাইবে যে, "স্ব"-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব হইতেই বর্ত্তমান জগৎ এই অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। "স্ব"-বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ না করিয়া "স্বাবলম্বন" বিষয়ে উল্লেখমাত্রকেই আমরা বস্তুতঃ অর্থহীন ধোঁকা প্রদান বলিয়া মনে করি।

"স্ব"য়ের সমগ্র সত্তা কি, একবার ইহার ধারণা করিতে

পারিলে বুঝা যাইবে যে, "ধ"কে বজায় রাখিতে হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উভয় প্রকার চেষ্টারই প্রয়োজন রহিয়াছে। সমাজ অথবা রাষ্ট্ররূপে সংঘগত সংগঠন ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে জন-সাধারণ সুখী ও শান্ত জীবন গঠন করিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইলে বিফলকাম হইতে বাধ্য। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইতেছে প্রচুর ধন-ভাণ্ডার এবং ন্যায্য বিতরণ-ব্যবস্থার আয়োজন; এই ভাণ্ডারের উপযুক্ত অংশলাভের উপায় শিক্ষা করিয়া স্বকীয় অংশলাভের জন্য কার্য্যে ব্রতী হওয়া প্রজাবৃন্দের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। ভাণ্ডার-শূন্য অবস্থায় বিতরণ সম্ভব হয় না। ভাণ্ডারের অপ্রাচুর্য্যের দারিদ্র্য জনসাধারণের নহে। অন্য পক্ষে ভাণ্ডারের প্রাচুর্য্য এবং ন্যায্য বিতরণ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব সত্ত্বেও জনসাধারণ যদি আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উপযুক্ত অংশলাভে কৃতকার্য্য না হয়, তবে তজ্জন্য জনসাধারণকেই দায়ী করিতে হইবে।

বিবিধ আহার্য্য ও বিভিন্ন কাঁচামালের বর্ত্তমান ভাণ্ডারের হিসাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশেই তাহার সমগ্র অধিবাসীর সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যে-পরিমাণ দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে ঘাটতি পড়িয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। হইতে পারে যে, সমগ্র অধিবাসীর আহার্য্য সঙ্কুলানের পক্ষে বাঙ্গালা দেশের উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণে আজিও ঘাটতি উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালায় তুলা উৎপন্ন হয় না এবং ইহার জমীতে এরূপ তুলা উৎপাদন সম্ভব নহে, যদ্দ্বারা টেকসই সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ এই ঘটনা অপ্রমাণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইতে পারেন, কিন্তু সূর্য্য ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের যথাযথ সম্পর্কের জ্ঞানের উপর গঠিত যে ভূতত্ত্ব, তাহার সামান্য আভাস পাইলেও প্রমাণ হইবে যে, উহা অখণ্ডনীয় সত্য। সুতরাং বাঙ্গালাকে তাহার সমগ্র অধিবাসীর প্রয়োজন-পূরণের পক্ষে বস্তুতঃ যে-পরিমাণ আবশ্যক, তদপেক্ষা অনেক অধিক ধান্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন করিতে হয়, যাহাতে ইহার তুলাজাত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আবশ্যক উদ্বৃত্ত মূল্যদান সম্ভব হয়। যতদিন বাঙ্গালায় এই পরিমাণ উদ্বৃত্ত হইত, ততদিন বাঙ্গালার কৃষকগণের মধ্যে দারিদ্র্য দেখা যায় নাই। প্রদেশের সমগ্র লোক-সমষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামালের ভাণ্ডারের প্রাচুর্য্যসাধনের ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইবার কথা বলিলে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দান করা হইতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

আপাততঃভাবে ইহা যত অনায়াসসাধ্য মনে হইতেছে, ঐ ব্যবস্থা করা বস্তুতঃ তত অনায়াসসাধ্য নহে। ইতিপূর্ব্বে আমরা একাধিক সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, আধুনিক জলসেচ-প্রথার সাধন দ্বারাও যেরূপ ইহা ব্যবস্থিত হইতে পারে না, তেমনই একক কোন প্রদেশও ইহা ব্যবস্থিত করিতে পারে না।

যে-দেশে একদিন সমগ্র পৃথিবীর অপরাপর দেশের ঘাটতিপূরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহার্য্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন হইত, সে দেশে স্বকীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনেও কেন ঘাটতি ঘটিতেছে, ইহা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসই ইহার মূলে এবং তাহারও মূলে রহিয়াছে বিবিধ আকারে ও প্রকারে নদী-স্রোতের বাধা-উৎপাদন। এতদ্দেশীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ বর্ত্তমানে হয় ত আমাদের সহিত একমত হইতে পারিবেন না, কিন্তু ক্রমশঃ বাস্তব ঘটনায় প্রমাণিত হইবে যে, সকল দেশ কিংবা প্রদেশেরই জমীর উর্ব্বরাশক্তি-বৃদ্ধি বর্ত্তমান অপেক্ষা যদি অন্ততঃ পক্ষে চারিগুণ অধিক না করা যায়, এবং ঐ বৃদ্ধি-সাধন কোন কৃত্রিম জলসেচ-ব্যবস্থা অথবা কৃত্রিম সার ব্যতিরেকে সম্ভব না করা যায়, তবে কোন দেশেরই দারিদ্র্য সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না। যদি উৎস হইতে মোহনা পর্য্যন্ত সকল স্থানে নদী-স্রোত অব্যাহত রাখা যায়, তবেই ইহা সম্ভব। রেলের সেতু, বাঁধ ইত্যাদি, রেলরাস্তা এবং মোটর চলাচলের রাস্তাই নদীস্রোতের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পৃথিবীতে রাস্তার বিস্তারার্থ এই মত্ততা দেখা দেয় নাই, ততদিন পৃথিবীতে কুত্রাপি দারিদ্র্যের এমন মূর্ত্তিও দেখা যায় নাই। জনসাধারণের দারিদ্র্য নির্ম্মূল করিতে হইলে সুতরাং জমীর উপর এই রাস্তা-বিস্তার নির্ম্মূল করিয়া তৎস্থানে জল-পথের প্রবর্ত্তনা করিতে হইবে। ভারতে এই ব্যবস্থা কেবল কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব।

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যতদিন কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক এই ব্যবস্থা না প্রবর্ত্তিত হইবে, ততদিন জনসাধারণকে "স্বাবলম্বী" হইতে বলিলে কোন কাজ হইবে না। তাহার জন্য চেষ্টিত না হইয়া, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে উপরিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত না করিয়া বাঙ্গালার সরকার আর কোন প্রচারকার্য্যে অবতীর্ণ হইলে এবং উহা চালাইতে থাকিলে, তাহা কিছু কালের জন্য এক শ্রেণীর ব্যক্তির উপর তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের সহায়ক হইতে পারে এবং এমন কি, ইহা সরকার পক্ষের সমর্থকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু সে-সমস্তই আপাতকালস্থায়ী হইবে, শেষতঃ জনসাধারণ বুঝিবে যে, রাষ্ট্র-পরিচালকগণ তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জন-সাধারণ অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট হইবে, কেন না, বাস্তব দারিদ্র্য প্রচারকার্য্য দ্বারা বিতাড়িত হইবে না।

যতদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক উপরিনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রকৃত পন্থায় কার্য্য আরম্ভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের উচিত—জনসাধারণের নিকট কোন তথ্য গোপন না করিয়া সকল বিষয়ে তাহাদিগকে জ্ঞাপন করা। তাঁহাদিগের উচিত হইতেছে, জন-সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া জ্ঞাপন করা যে, তাহাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস এবং ইহার প্রতীকার-ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে নহে, ইহার ব্যবস্থা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার করিতে পারেন। এই ভাবে চলিলে জন-সাধারণের নিকট সরকারের সততা ও সারল্য প্রতিভাত হইবে এবং ফলে দুই পক্ষের সম্পর্ক উৎকৃষ্টতর হইবে।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে স্যর জন হার্ব্বার্ট কি এতদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন?

কংগ্রেস কি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলিয়াছে?

"কংগ্রেস কি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলিয়াছে?"—এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথম দেখিতে হইবে যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য কি এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য কি, তাহা জানিতে হইলে কংগ্রেসের কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া অপরিহার্য্যভাবে আবশ্যক। কংগ্রেসের কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে দেশের আশু-সমাধেয় সমস্যাসমূহ-নির্দ্ধারণও অপরিহার্য্যভাবে আবশ্যক। আমাদের এই বক্তব্য হইতে বুঝিতে হইবে যে, কংগ্রেস দেশ ও জাতির আশু-সমাধেয় সমস্যাসমূহের সমাধানে অগ্রসর না হইলে কংগ্রেস অর্থহীন প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়ে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত যে কোন সংগঠনই হউক, তাহাদের সকল কার্য্যই এরূপ ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে, তদ্দ্বারা তদন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সময়োচিত ভাবেও হিত সাধিত হয়। যদি ব্যক্তিগত-ভাবে কেহ অত্যন্ত পরিশ্রম করেন এবং এমন কার্য্যও করেন, যাহাকে বিস্ময়কর বলা চলে, কিন্তু তিনি যদি সেই কার্য্যের দ্বারা নিজের কোন হিত সাধন না করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন ক্রমেই প্রাজ্ঞ অভিহিত করা যায় না। সকল সংঘগত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। কোন সংঘগত প্রতিষ্ঠান সুকঠিন কার্য্য-সমূহ সাধন করিয়া এমন কি জগৎকে বিস্ময়ান্বিত করিতেও যদি কৃতকার্য্য হয়, কিন্তু ঐ সংঘ যাহাদের লইয়া গঠিত, তাঁহাদের কোন প্রকৃত হিতসাধনে অকৃতকার্য্য হয়, তবে দক্ষতা প্রদর্শনে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ঐ সংঘের অন্তর্ভুক্ত আছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত, এমন কথা বলা যায় না।

এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলিতেছে কি না, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ দ্বারা দেশের জনসাধারণের আশু-সমাধেয় সমস্যাসমূহের প্রকৃত সমাধানের সম্ভাবনা বিদ্যমান কি না এবং ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেশের আশু-সমাধেয় সমস্যাসমূহ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। ইহা না বলিলেও চলে যে, জনসাধারণের অনাহার, অর্দ্ধাহার এবং শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বেকার-সমস্যাই বর্ত্তমানে সকল সমস্যার তীব্রতম সমস্যা।

"দি উইকলি বঙ্গশ্রী"র, ৭ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

যদি কেহ বলেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাঁহাকে আমরা বলিব যে, "হাঁ, স্বাধীনতার প্রয়োজন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা এই ভীষণ অনাহার ও বেকার-সমস্যার অচিরাৎ সমাধান যদি সম্ভব হয়, তবেই ইহার প্রয়োজন।" কিন্তু এই সুতীব্র সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান এতদ্দ্বারা সম্ভব হইবে কি না, তাহা না জানিয়া কেবল স্বাধীনতার নিমিত্তই যদি স্বাধীনতার সন্ধান করা হয়, তবে আমরা বলিব যে, ইহা রোমাঞ্চকর হইতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণোচিত নহে। আমরা নিশ্চিত ভরসা রাখি যে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকগণের অধিকাংশই আমাদের এই মতবাদের সহিত একমত হইবেন।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, কংগ্রেসের পরিচালনা যথাযথ হইতেছে কি না, তাহার সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে যে, ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমান কার্য্যকলাপে দেশের দরিদ্র সাধারণের অনাহার-সমস্যার এবং শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বেকার-সমস্যার দ্রুত সমাধানের সম্ভাবনা আছে কি না। ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমান কার্য্যকলাপে দেশের এই সুতীব্র সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধানের সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা জানিতে হইলে এই সমাধানকল্পে অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। যদি আমরা বলি যে, এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের "ঐক্য", তবে আমাদের এই কথায় আশা করি, মিঃ গান্ধী পর্য্যন্ত দ্বিমত হইতে পারিবেন না। ইহার অর্থ এই যে, দ্বন্দ্ব-কলহ-পরিপূর্ণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে যাহাতে নূতন করিয়া কলহের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ দেশের জন-সাধারণের তথা কংগ্রেসের স্বার্থবিরুদ্ধ। কারণ এই যে, দ্বন্দ্ব-কলহ মাত্রেই ঐক্যের পরিপন্থী এবং ঐক্য সংগঠনের পক্ষে বর্ত্তমান সকল কলহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন যেরূপ সর্ব্বদা আবশ্যক, তেমনই নূতন করিয়া কলহ যাহাতে সূচিত না হয়, তদ্বিষয়েও অবহিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুরা হয়তো তর্ক উত্থাপন করিবেন যে, ভারতের কোন সমস্যারই সমাধানে অগ্রসর হইতে হইলে শত্রুপক্ষ, অর্থাৎ ব্রিটিশগণের সহিত কলহ ব্যতীত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, "গত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া এই তথাকথিত শত্রুপক্ষের সহিত আমরা এই কলহ বহু করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জন-সাধারণের অনাহার ও বেকার-সমস্যার সমাধান ব্যাপারে দেশ এক তিলও অগ্রসর হয় নাই। অগ্রসর হওয়া দূরে থাকু, এই সকল সমস্যা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়াছে। আমাদের নেতৃবৃন্দের চক্ষু ইহাতে উন্মীলিত হওয়া উচিত, এবং যদ্যপি আপাতদৃষ্টে বৃটিশগণের সহিত কলহ ব্যতীত দেশের অগ্রগতি সম্ভব নহে বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু যে করিয়াই হউক, ইহা কি করিয়া সম্ভব, তাহাই আমাদিগকে ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে।"

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নিজেদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহই অনিষ্টকর, কিন্তু শত্রুপক্ষের সহিত কলহ অনিষ্টকর নহে। এই সকল ব্যক্তিকে আমরা বলি যে, নিজেদের মধ্যে পরস্পর কলহ অনিষ্টকর, ইহা স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার্য্য যে, শত্রুপক্ষের সহিত কলহও সমান অনিষ্টকর, কেন না, সকলের পক্ষেই সাধারণ কতিপয় স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া দেশের জন-সাধারণকে যতদিন একপ্রাণতার সূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভব না হইবে, ততদিন শত্রুপক্ষের সহিত কলহ দ্বারা সর্ব্বদা নিজেদের মধ্যে পরস্পর কলহ বাধিতেও বাধ্য। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যখন দেশবাসীকে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হইবে, তখনই কোন দেশ তাহার শত্রুপক্ষের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবার ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যতদিন নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সামান্যমাত্র বিবাদ-বিসংবাদও বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন শত্রুপক্ষের সহিত কলহ বিষয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত দেশবাসী করিতে পারে না।

ইহার অর্থ আরও দাঁড়াইতেছে এই যে, দেশের সুতীব্র সমস্যাসমূহের সমাধান-কামনায়, দেশের মধ্যে যে-সকল কার্য্যে, এমন কি শত্রুপক্ষের সহিতও দ্বন্দ্ব-কলহের সম্ভাবনা থাকে, তাহা স্থগিত রাখিয়া দেশের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ঐক্যের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে, ওয়ার্কিং কমিটির কোন কার্য্যকলাপে যদি ব্রিটিশগণের সহিত নূতন করিয়া কলহের সূত্রপাত হইতেছে বলিয়া দেখা যায়, তবে তাহাকে কেবল অনিষ্টকর নহে, অতীব অনিষ্টকর বলিয়া জানিতে হইবে।

ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, ওয়ার্কিং কমিটীর সম্প্রতিকার প্রস্তাবসমূহ কংগ্রেস ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং যদ্যপি বাহিরে উভয় পক্ষই তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিবাদে লিপ্ত নাও হয়, তথাপি ভিতরে ভিতরে উভয় পক্ষেই উষ্মা বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং ইহা অনস্বীকার্য্য যে, কংগ্রেস বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলিতেছে না।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন কংগ্রেসের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যানুযায়ী চলা তবে কাহাকে বলিতে হইবে, অতঃপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদের মতে, ওয়ার্কিং কমিটী যদি এইরূপ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যাহাতে ব্রিটিশ জাতির এই সংঘর্ষোন্মুখীনতা দমনের যুদ্ধে কংগ্রেস অকুণ্ঠভাবে তাঁহাদের সমর্থন করিবে, ইহা উল্লিখিত থাকে, কিন্তু ঐ প্রস্তাবে ব্রিটিশ জাতি কি ভাবে জার্ম্মানীর বিপক্ষে তাঁহাদের যুদ্ধ চলার সময়েই ভারতের বেকার ও অনাহার সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া জ্ঞাপন করিবার দাবীও উল্লিখিত হয়, তবেই কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলিতে পারে। আমরা এইরূপ বলিতেছি, কেন না ইহাতেই কংগ্রেসের লক্ষ্যানুযায়ী কার্য্য সাধিত হইবে, এবং ইহা ব্রিটিশজাতির ভারতবাসীদের মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদের ইন্ধন জোগাইবার কার্য্যের নৈতিক অধিকারও উচ্ছেদ সাধন করিবে এবং তদুপরি সকলে বুঝিবে যে, কংগ্রেস জনসাধারণের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধানকেই সকল সমস্যার সমাধানের উপরে স্থান দিয়াছেন। উপরন্তু যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কি ভাবে ব্রিটিশ সরকার জন-সাধারণের বেকার ও অনাহার-সমস্যার সমাধান কার্য্যকরী করিবেন, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিতে নাও পারেন এবং আমাদের মতে, ইহা তাঁহারা পারিবেনও না, তবে কংগ্রেস ইহাকেই ভিত্তি করিয়া দেশবাসী জন-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন এবং তাহার দ্বারা দেশের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন।

ইহার পর যদি কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, কেন তাহা হইলে কংগ্রেস ক্রমাগত ভুল করিয়া চলিয়াছেন, তবে তাহার উত্তরে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিব যে, ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে, দেশবাসী মিঃ গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীবাদের প্রাধান্য ঘটিতে দিয়াছে।

আমাদের মতে, দেশের বর্ত্তমান বিপদক্ষণে ভারতের পক্ষে এইরূপ নেতা ও দিশারীর প্রয়োজন, যিনি সকল দ্বন্দ্ব-কলহের উপরে বিরাজ করিতে পারেন এবং আত্ম-বিশ্লেষণের সামর্থ্য দ্বারা স্বকীয় দোষত্রুটির সন্ধান পাইতে পারেন, কিন্তু মিঃ গান্ধীর অস্থি-মজ্জার সহিত দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব ওতপ্রোতরূপে জড়িত এবং এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই আত্ম-প্রবঞ্চনাপর।

মিঃ গান্ধীর যে-কোনও রচনা বা উক্তি হইতে মিঃ গান্ধী সম্বন্ধে আমাদের এই মত সমর্থন লাভ করিবে।

সংপ্রতি "হরিজন" পত্রিকায় কংগ্রেসের যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তিনি যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহাতে মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন:

"যদি ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধপরিচালনা বিষয়ে কংগ্রেসের সাহায্যপ্রার্থী হন, তবে ব্রিটিশ জাতির মনোভাব বুঝিবার সম্পূর্ণ অধিকার কংগ্রেসের আছে।"

আমরা বলিব যে, জার্ম্মানীর বিপক্ষে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ব্রিটিশ জাতি কর্ত্তৃক ভারতের সংস্থানসমূহ কার্য্যে লাগাইবার ব্যাপার রোধ করিবার কর্ত্তৃত্ব যদি কংগ্রেসের থাকিত, তবে এই মন্তব্যে যে-মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যথাযথ হইয়াছে বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ইহা যখন বাস্তব সত্য যে, কংগ্রেসের সে কর্ত্তৃত্ব নাই এবং কংগ্রেসের বিপক্ষতা অগ্রাহ্য করিয়াই যখন ব্রিটিশজাতি তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী ভারতের সংস্থান ব্যবহার করিতে পারেন, তখন উপরের মনোভাব মিথ্যা দ্বন্দ্বসূচক মনোভাব জ্ঞাপক মাত্র।

মিঃ গান্ধী "অহিংসা" ও "নিরস্ত্র প্রতিরোধ" বিষয়ে যে-সকল কথা কহেন, তাহা হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে যে, তিনি আত্ম-প্রবঞ্চনা বিষয়ে সুনিপুণ। তথাকথিত 'অহিংসা' লইয়া তিনি বেশ বাজার সরগরম করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বকীয় মনোভাবের যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা হিংসা-বিষে জর্জ্জর।

"হরিজন"-এর ঐ একই প্রবন্ধে মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন:

"আমিও স্বীকার করি যে, ভারতের সশস্ত্র বিদ্রোহের

সামর্থ্য নাই। কিন্তু ইহা-ভারতের পক্ষেও যেরূপ, ব্রিটেনের পক্ষেই সেইরূপই অগৌরবের বিষয়। সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষে ভারত একেবারেই অযোগ্য। ব্রিটেনের সম্পর্ক ভারতকে দুর্ব্বলতর করিয়াছে। তাহার নিরস্ত্রীকরণ ব্রিটিশ ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কজনক অধ্যায়।"

মিঃ গান্ধী যদি অন্তরের সহিত অহিংসার স্বপক্ষে হইতেন, তবে তিনি যেমন ভারতের সশস্ত্র যুদ্ধের অসামর্থ্যের বিষয়কে কাহারও পক্ষেই অগৌরবজনক বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না, তেমনই ভারতের নিরস্ত্রীকরণকে "কলঙ্কজনক অধ্যায়" বলিয়াও গণ্য করিতেন না। ইহাতেই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পায়। 'মনে এক মুখে আর'-এর এই প্রকার-ভাব এবং অসত্য কখনও দেশের পক্ষে কল্যাণচিহ্নক হইতে পারে না।

ইহার একমাত্র প্রতীকারের পন্থা হইতেছে দেশের বিচক্ষণতম ব্যক্তিবৃন্দের কংগ্রেসের কার্য্যে অগ্রসর হইয়া এই সকল পেশাদার 'আন্দোলনবাজ'দিগকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে বিতাড়ন।*

মাননীয় মিঃ এন. আর. সরকারের "ভারতবাসীর দৃষ্টিতে যুদ্ধসংক্রান্ত অর্থনীতি"

সংপ্রতি কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়াম গৃহে বাঙ্গালার অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এন. আর. সরকার এই শীর্ষে একটি দীর্ঘ রচনা পাঠ করিয়াছেন। "তাঁহার বন্ধু স্যর উইলিয়াম" এই সভার সভাপতিত্ব করেন।

রচনাটি পুঁথিগত বিদ্যায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ এবং ইহাতে জনহিতকর বলা চলিতে পারে, এমন একটি কথার আভাস পর্য্যন্ত নাই; ফলে ইহা জনসাধারণ, তথা সরকারকে বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহাদের সমূহ সর্ব্বনাশের হেতু হইবে, এরূপ আশঙ্কা করা যায়। এই জন্যই জনসাধারণের নিকট এই বক্তৃতার স্বরূপ উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে সময় থাকিতে সাবধান করা আমাদিগের কর্ত্তব্যের অংশবাংশ বলিয়া আমরা মনে করি। মাননীয় মিঃ সরকার মাত্র যদি বীমা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা রূপে যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিতেন এবং আমাদের সরকারের অর্থ-সচিব না হইতেন, তবে এই রচনাকে আমরা আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করিতাম না।

রচনাটি তিনটি কিস্তিতে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূলতঃ ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে যুদ্ধকালীন বিপর্য্যয় হইতে রক্ষালাভার্থ বে-সরকারী ব্যক্তি, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানীসমূহের অর্থনীতি-বিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে সরকারী অর্থনীতি-বিভাগ-সংক্রান্ত মোটামুটি কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে এই দুঃসময়ে সরকারী ধন-ভাণ্ডার কিরূপ ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ মিঃ সরকারের রচনার প্রথমাংশে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে :—

(১) বর্ত্তমান যুদ্ধকালে ভারতের অবস্থা,
(২) যুদ্ধরত জাতিসমূহের অর্থনীতি,
(৩) অন্য দিক্,
(৪) ভারতীয় দিক্,
(৫) শিল্প-বিস্তার,
(৬) অর্থনৈতিক অসুবিধাসমূহ,
(৭) যুদ্ধের সুবিধা,
(৮) বৈদেশিক বাণিজ্যে কুঠারাঘাত,
(৯) সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ,
(১০) বাণিজ্যে বিশৃংখলা,

(১১) যুদ্ধহেতু যে-সকল বিশেষ শিল্প প্রাধান্য লাভ করিয়াছে :—(ক) রাসায়নিক শিল্প, (খ) বৈদ্যুতিকযন্ত্র প্রস্তুত শিল্পপাতি, (গ) কলকব্জা-নির্ম্মাণ-শিল্প (ঘ) জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্প।

(১২) নূতন-শিল্পসমূহ,
(১৩) কৃষিবিষয়ক অর্থনীতি।

দ্বিতীয়াংশে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে :

(১) দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের নীতি,

* "দি উইক্লি বঙ্গশ্রী"র ৭ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

(২) সরকারী অর্থবিভাগ-সংক্রান্ত যুদ্ধকালীন অর্থনীতির আর্থিক দিক্,

(৩) মুদ্রামাণ এবং বিনিময়।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন ভারতের অবস্থা বিচারে মিঃ সরকার যুদ্ধসম্পর্কে তিন প্রকার অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, (১) যুদ্ধরত জাতিসমূহের অবস্থা; (২) নিরপেক্ষ জাতিসমূহের অবস্থা; এবং (৩) স্বার্থবিশিষ্ট দর্শকস্থানীয় জাতির অবস্থা। মিঃ সরকারের মত হইতেছে, ভারতের অবস্থা এই "স্বার্থ-বিশিষ্ট দর্শকস্থানীয়ের অবস্থা।" এই আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ সরকার যাহা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহার সহিত আমাদের মতবৈষম্য নাই, কিন্তু ব্রিটিশজাতির কর্ত্তৃত্ব যে-যুদ্ধঘোষণার প্রধান কারণ, তাহাতে ভারতের মাত্র "স্বার্থবিশিষ্ট দর্শক-স্থানীয়ের অবস্থা", কিরূপে বলা চলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের মতে, যতদিন ইংলণ্ড যুদ্ধের প্রধান ভূমিকা অধিকার করিয়া থাকিবেন, তত দিন ভারতকেও বস্তুতঃ যুদ্ধ-রত অবস্থাতেই থাকিতে হইবে- এবং যদি এমন কি যুদ্ধ আর দুই বৎসর কাল কোনক্রমে চলিতে থাকে, তবে ভারতবর্ষ অন্যতম যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে দেখিলে আমরা বিস্মিত হইব না। আমরা কেন এই মত পোষণ করি, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইলে যে-স্থান প্রয়োজন, বর্ত্তমান সন্দর্ভে তাহার সঙ্কুলান সম্ভব নহে।

"যুদ্ধরত জাতিসমূহের অর্থনীতি," "অন্য দিক্" এবং "ভারতীয় দিক্" প্রসঙ্গের আলোচনায় মিঃ সরকার যুদ্ধকালে অর্থনীতি বিষয়ে ভারতের কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে মত প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জটিলতার উল্লেখ করিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে, সুতরাং এই বিষয়ে তিনি স্বীয় ব্যর্থতা স্বীকার করিয়াছেন।

"শিল্প-বিস্তার" এবং "অর্থনৈতিক অসুবিধাসমূহে"র আলোচনায় মিঃ সরকার প্রথমতঃ "যুদ্ধকালীন অর্থনীতি" বলিতে কি বুঝায়, তাহা ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "যুদ্ধকালীন অর্থনীতি", এই পদের দুইটি বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াইতে পারে—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যে অর্থনীতিগত ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে; অথবা যুদ্ধজনিত অসুবিধা হইতে আত্মরক্ষার্থ অর্থনীতিগত যে-ব্যবস্থার প্রয়োজন, তথা যুদ্ধজনিত অবস্থা-হেতু সুবিধার জন্য যে অর্থনীতিগত ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহাও বুঝা যাইতে পারে। ইহা যে মিঃ সরকারের 'অর্থনৈতিক প্রতিভা'র অন্যতম সাক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই প্রতিভার চূড়ান্ত বিস্ময়কর নিদর্শন হইতেছে এই যে, "অর্থ-নীতি" এই পদের দ্বারা মিঃ সরকার কি বুঝেন, তদ্বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া গিয়াছেন। ফ্র্যাঙ্কলিন, হকস্-ওয়ার্থ, সেনেকা, মুণ্ডার, হান্না মুর, বার্ণস্, ওয়েদারস্পুন, শেনষ্টন, জনসন, হল, রাস্কিন, বেকন, অ্যাডিসন, প্লুটার্ক, কিকিরো, ইঁহারা "অর্থনীতি" পদটির অর্থ বুঝাইতে কে কি বলিয়াছেন, তাহা যদি তিনি বুঝিতে পারেন, তবে অনায়াসেই দেখিতে পাইবেন যে, "যুদ্ধকালীন অর্থনীতি" পদটির কখনও দুইটি অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না, এবং যুদ্ধকালীন স্বকীয় ব্যয়কে স্বকীয় আয় অপেক্ষা অনধিক রাখিতে হইলে সরকার ও জনসাধারণের কি কর্ত্তব্য, এই একটি অর্থ ব্যতীত "যুদ্ধকালীন অর্থনীতি"র দুইটি অর্থ কখনও সঙ্গত হয় না। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহারা মিঃ সরকারের মতের সমর্থন এবং আমাদের মতের বিরোধিতা করিবেন, কিন্তু ইহা অবশ্যস্মরণীয় যে, বর্ত্তমান কালের ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্‌গণ ইংলণ্ডের, তথা ইংলণ্ডের অধীন দেশসমূহের জনসাধারণের অনাহার ও বেকার সমস্যার সমাধান ব্যতীত অপর সকল বিষয়েই নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উন্নতির রোমাঞ্চকর পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের এই অর্থনীতি-বিদ্‌গণের উদ্দেশ্যে আমরা ধিক্কার জানাইতেছি এবং তাঁহাদিগকে আত্মবিশ্লেষণনিষ্ঠ হইয়া সাধারণ্যে বক্তৃতা দান করিতে কুণ্ঠাবোধার্থ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

"যুদ্ধকালে ভারতে অর্থনৈতিক অসুবিধাসমূহে"র আলোচনায় মিঃ সরকার কেবল নিম্নলিখিত তিনটি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন:—

(১) শত্রুপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়া,

(২) অনিশ্চিত ভাবে নিরপেক্ষ অবস্থার দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের বিশৃংখলা,

(৩) যথেষ্ট মাল-বহনের ব্যবস্থার অভাব,

(৪) সমুদ্রপথ-বাহিত বাণিজ্যের সঙ্কটাবস্থা।

তিনি আর কোনও অসুবিধার উল্লেখ করেন নাই। মনে

হয়; তিনি বলিতে চাহেন যে, উপরিলিখিত কয় প্রকারের অভাব এবং বিশৃংখলা না ঘটিলে ভারতবাসী জনসাধারণকে কোন আর্থিক সংঘাতেরই অধীন হইতে হইত না। আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, যখন এই সকল অভাব এবং অব্যবস্থার উদ্ভব হয় নাই, তখন পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বে, ভারতবাসী জনসাধারণের, তথা পৃথিবীর অবশিষ্ট প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল—আমরা তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমরা পাঠকবর্গকে বিচার করিয়া দেখিতে বলি যে, আর্থিক অসুবিধাসমূহের সম্পূর্ণ তালিকা দান করিতে হইলে যুদ্ধকালীন, তথা শান্তির অবস্থাকালীন, উভয় অবস্থাতেই যে-সকল অসুবিধা বর্ত্তমান, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন কি না। মিঃ সরকারের "অর্থনৈতিক প্রতিভা"র ইহাও অন্যতম নিদর্শন।

"যুদ্ধজনিত সুবিধা"সমূহের আলোচনায় মিঃ সরকার নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"উৎপাদনকারীরা তাহাদের উৎপন্ন মালের বিক্রয়ে অধিক মূল্য লাভ করিলে তাহাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি উন্নত হইবে এবং ফলে জিনিসপত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে শিল্পজাত-দ্রব্যসমূহের উৎপাদন উৎকর্ষ ও বিস্তারলাভের প্রকৃষ্ট কারণ সৃষ্ট হইবে।"

মিঃ সরকারের এই আশা-সমুদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ-চিন্তার ব্যাঘাত করিয়া আমরা তাঁহাকে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করি :—

(১) ভারতবাসী জনসাধারণের কি পরিমাণ আজ বাস্তবিক উৎপাদনকারী হিসাবে (দ্রব্যবিক্রয় দ্বারা) হাতে-কলমে অধিকতর মূল্য লাভ করিবে?

(২) বর্ত্তমানে যেরূপ ভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ চলিতে থাকিলে, যাহারা হাতে-কলমে উৎপাদনকারী নহে, জনসাধারণের সেই অবশিষ্টাংশ, যাহাদিগকে সাময়িক বেতন দ্বারা জীবন যাপন করিতে হয় এবং জীবিকা পরিচালনার্থ সকল দ্রব্যই ক্রয় করিতে হয়, তাহাদের কি অবস্থা ঘটিবে?

(৩) এরূপ অবস্থা যদি ঘটে, যাহাতে খাদ্য ও অপরাপর নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহের ঘাটতি বশতঃ দ্রব্য-বিক্রয়-সঙ্কোচ (rationing) করিতে হয়, এবং সেই অবস্থায় যে-কোন মূল্যের বিনিময়েও যদি নিজেদের সন্তান-সন্ততির জন্য আবশ্যক পরিমাণ খাঁটি খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া না যায়, তখন যাহারা হাতে-কলমে উৎপাদনকারী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে দ্রব্যবিক্রয় দ্বারা অধিকতর মূল্য লাভে সমর্থ হইবে, তাহাদের অবস্থাই বা কি দাঁড়াইবে? নিজেদের পোষ্যবর্গের জন্য আবশ্যক পরিমাণ আহার্য্য সংগ্রহ করিতে অধিকতর বিক্রয়-মূল্য-লাভ-সঞ্চিত সমগ্র অর্থও যদি তাহাদিগকে প্রদান করিতে হয়, তাহাতে কি তাহারা গররাজী থাকিবে? শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং বিস্তারাভিযানে উদ্যোগী হইতে তখনও কি তাহারা সমর্থ থাকিবে?

আমরা অস্বীকার করি না যে, বর্ত্তমানে শাসন ব্যবস্থা যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে, সেই পরিচালনায় যদি বাধা উপস্থিত না হয়, তবে উৎপাদনকারীদের কিয়দংশ অধিকতর উপার্জ্জনে সমর্থ হইবেন এবং অনেকে মাল-বাঁধাইকারী ব্যক্তি সাময়িক ভাবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করিবেন। কিন্তু এই সাময়িক অবস্থা অতিক্রম করিয়া চাহিয়া দেখিবার মস্তিষ্ক-সামর্থ্য থাকিলে মিঃ সরকার অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকার সুবিধা-ভোগকারী লোক-সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পাঁচজনও হইতে পারে না, অন্য পক্ষে অবশিষ্ট শতকরা পঁচানব্বই জনের অবস্থায় যে-বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া শাসন-কার্য্যকে সকল দিক্ হইতে অচল পর্য্যন্ত করিয়া তুলিতে পারে। মিঃ সরকার এবং তাঁহার সগোত্র ব্যক্তিবৃন্দ আমাদের সহিত ইহাতে একমত না হইতে পারেন এবং হয় তো বর্ত্তমানে আমাদিগকে ব্যঙ্গও করিতে পারেন, কিন্তু যথাকালে দেখা যাইবে যে, আহার্য্য সঙ্কুলানের দিক্ হইতে ভারতেরই হউক, অথবা অবশিষ্ট পৃথিবীর অপর সকল দেশেরই হউক, কাহারও অবস্থাই—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ গত যুদ্ধের সময় ১৯১৪ সনে যেরূপ ছিল, সেরূপ নাই।

তৎকালে ভারতে উৎপন্ন আহার্য্যের ঘাটতির পরিমাণ বর্ত্তমানের তুলনায় সিকি ভাগও ছিল না। তৎকালে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে পারিত, ফলতঃ চলিয়াছিলও তাহাই, এবং যুদ্ধ-মত্ত জাতিসমূহকে আহার্য্যের ঘাটতিপূরণের চিন্তায় তেমন উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই। কিন্তু সে সময় আর নাই। ঘাটতির বর্ত্তমান অবস্থায় আর ছয় মাস কাল যুদ্ধ চলিলে, মনুষ্যশক্তির বাঁচিবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহার অভাব-জনিত বিপর্য্যয় হইতে কোন জাতিরই বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। খাদ্য-সঙ্কোচ-ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু উহাতে তেমন কোন সুবিধা হইবে না। মিঃ সরকার যদি তাঁহার পদমর্য্যাদা এবং কৃতিত্বের মোহে অন্ধ না হইতেন, তবে যাঁহাদিগকে সামান্য বেতনে অথবা মুনাফায় জীবিকার্জ্জন করিতে হয়, তাঁহাদিগকে যে ইতিমধ্যেই মূল্যাধিক্যের ফলে জীবন-যাপনে অধিকতর কষ্টের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে, তাহা বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়বত্তা তাঁহার থাকিত। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপার যথাযথ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপযোগী সামান্য মাত্র ব্যবসায়-সামর্থ্য তাঁহার যদি থাকিত, তবে তিনি অবিলম্বে উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, যখন মালবাঁধাইকারী ও ফাটকাবাজের দল মনের আনন্দে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়া দ্রব্যমূল্যে অভাবনীয় হ্রাস-বৃদ্ধি-সৃষ্টির সুযোগ লাভ করে, তখন প্রকৃত শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃত শিল্প-বাণিজ্য-পরিচালনা বর্ত্তমানে, অন্ততঃ এ দেশে, অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হইতে পারে যে, জনকয়েক শিল্প-মালিক কিংবা বণিক্ নিজেদের মজুদ মালের সাহায্যে অধিকতর অর্থাগমের সুবিধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রকার ব্যবসায়মূলক না হইয়া ঝুঁকিদারিতে পরিণত হইয়া পড়িবে। ফলে, সরকার এই ফাটকাবাজী ও মালবাঁধাই সম্পূর্ণরূপে স্থগিদ করিবার যুক্তি অবলম্বন না করিলে অদূরভবিষ্যতে অধিকাংশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান কারবার গুটাইতে বাধ্য হইবেন এবং অনাহার ও বেকার সমস্যার অধিকতর প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। যুদ্ধজনিত সুবিধা উল্লেখে মিঃ সরকারের কল্পনা বিহঙ্গ-পক্ষ সাহায্যে উড্ডীয়মান হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যোচিত মস্তিষ্ক-সামর্থ্য থাকিলে কি করিয়া যে, কেহ এই অবস্থায় দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর অর্থাৎ শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জনের ইষ্ট বিষয়ে আশান্বিত হইতে পারেন, তাহা আমাদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না।

"যুদ্ধজনিত সুবিধাসমূহে"র আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ সরকার আর্থিক অসুবিধাসমূহের অতিক্রমকল্পে নিম্নলিখিত পন্থার নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন :—

(১) যে-সকল দেশজাত সামগ্রীর বিদেশে চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে, সেই হ্রাসের পরিমাণ পূরণার্থ বাহিরে নূতন বাজারের সন্ধান করিতে হইবে, অথবা দেশের মধ্যেই তাহাদের অধিকতর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(২) দেশের ভিতরেই অথবা বিদেশ হইতে কয়েকটি আমদানী-মালের সরবরাহের নূতন উপায় সন্ধান করিতে হইবে ;

(৩) যুদ্ধজনিত অবস্থার ফলে যে কয়েকটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে ;

(৪) যুদ্ধজনিত সৃষ্ট এই অবস্থার সর্ব্বাধিক সুযোগ গ্রহণার্থ ক্রমশঃ দেশজাত মালের দ্বারা আমদানী মাল বিতাড়িত এবং নূতন পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়া আমাদের দেশের মাল বাহিরের বাজারে চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এক টুকরা কাগজে লিখিয়াই যদি এই সকল প্রস্তাব ও পরিকল্পনার সাধন সম্ভব হয়, তবে ইহা যে সাধ্যায়ত্ত, তাহা আমরা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমরা চাই যে, মিঃ সরকার নিজের টাকা খাটাইয়া এবং ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে নিজের স্কন্ধে লইয়া ইহার দৃষ্টান্ত স্থাপনে অগ্রসর হউন। ব্যবসায় বিষয়ে যে-ব্যক্তির সামান্য মাত্র কাণ্ডজ্ঞান বর্ত্তমান, তিনি অচিরাৎ দেখিতে পাইবেন যে, বাজারে ফাটকাবাজী ও মালবাঁধাইয়ের প্রাধান্যহেতু ও ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ বিষয়েই প্রকৃত বাণিজ্য অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং যদি সরকার অনতিবিলম্বে বাজারের এই ফাটকা না বন্ধ করেন, তবে অদূরভবিষ্যতে অধিকাংশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের কারবার গুটাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। এই ভাবে যখন বর্ত্তমান বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহেরই কারবার উঠাইবার লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তখন বাণিজ্য-বিস্তারের চিন্তা নিতান্তই নিরর্থক।

তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মিঃ সরকার-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় শিল্প-বিস্তার সম্ভব, তথাপি ইহা যুদ্ধজনিত আর্থিক অসুবিধা দূরীকরণের উপায় বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না, কেন না, আহার্য্য ও কাঁচামালের উৎপাদনের ফলে যে ঘাটতি উপস্থিত হইয়াছে, এই উপায়ে সেই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইবে না।

মিঃ সরকারের রচনার প্রথমাংশের অপর সকল প্রসঙ্গে (বৈদেশিক বাণিজ্যে কুঠারাঘাত, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ, বাণিজ্য-বিশৃংখলা, রাসায়নিক শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণশিল্প, যন্ত্রনির্ম্মাণ-শিল্প, জাহাজ-নির্ম্মাণ, নূতন শিল্প, কৃষি-বিষয়ক অর্থনীতি) তিনি তাঁহার প্রথমাংশে বর্ণিত বিষয়েরই বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর উহার আলোচনা করিব না।

"দ্রব্যমূল্যনিয়ন্ত্রণের নীতি"র বিষয় লইয়া তাঁহার রচনার দ্বিতীয়াংশ সূচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের আলোচনায় তিনি প্রকারান্তরের দ্রব্যমূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কোন দেশ, এমন কি আমেরিকার যুক্তরাজ্য পর্য্যন্ত ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, কার্য্যতঃ ইহা সম্ভব নহে। আমাদের মতে, উৎপাদনকারী তথা ক্রেতা, উভয়ের স্বার্থরক্ষার্থ দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ আর্থিক দিক্ হইতে সুস্থ সমাজ-পরিচালনায় প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়। উৎপাদনকারী ও ক্রেতা, উভয়ের স্বার্থের প্রতি অবহিত হইয়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত না হইলে দেশের সমূহ অনিষ্টাশঙ্কার সকল প্রকার সম্ভাবনা সর্ব্বদা থাকিয়া যায়, কেন না সে ক্ষেত্রে যেমন ক্রেতা হিসাবে জনসাধারণ, আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য হইতে রক্ষা পায় না, তেমনই শিল্প ও বাণিজ্যনিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দও ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিজেদের স্থায়িত্ব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। আমরা ভরসা রাখি যে, আমাদের পাঠকবৃন্দ এবিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন। মিঃ সরকারের শ্রেণীর অর্থনীতি-বিদ্‌গণ অর্থনীতির প্রয়োজনীয় বিষয়ের অ-আ-ক-খ পর্য্যন্ত জানেন না বলিয়া যখন স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কি করিয়া গর্ব্ববোধ করেন, তাহা আমরা সত্যই বুঝিতে পারি না।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের নিকট দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের বিষয় অত্যন্ত জটিল বলিয়া মনে হইতে পারে এবং এমন কি ইহা অসম্ভব বলিয়াও তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রাচীনকালে জগতের অবস্থা এইরূপ ছিল না। ভারতীয় ঋষিপ্রণীত বেদ ও সংহিতা প্রকৃত অর্থে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা এই বিষয়ক সকল প্রশ্নই মনুষ্যবুদ্ধির বোধগম্য রূপে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

উৎপাদনকারী এবং ক্রেতা, উভয়ের স্বার্থের প্রতি সমান রূপে অবহিতভাবে দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত প্রথম প্রয়োজন হইতেছে, সমাজের শ্রমজীবিগণের তথা বুদ্ধিজীবিগণের পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারণ। দৈনিক (অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত) পারিশ্রমিকের হার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের তারতম্যের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু শ্রমজীবিগণের এই হারের তারতম্য সাধন কখনও উচিত হয় না, কিন্তু সেই হার সাধারণতঃ শ্রমজীবিগণের যাহারা পোষ্য (যথা স্ত্রী-পুত্রাদি), তাহাদের জীবনযাপনের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয়কল্পে যথেষ্ট না হইলেও চলিবে না। শ্রমজীবিগণের দৈনিক পারিশ্রমিকের এইরূপে নির্দ্ধারিত হারকেই "মুদ্রামাণের একক" (unit of money) বলিয়া ধরিয়া এই হারের বিভিন্ন গুণিতককে বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের পারিশ্রমিকের হার ধার্য্য করিতে হইবে।

টাকাকে মুদ্রামাণের একক স্থির করিয়া দেশের প্রত্যেকটি শ্রমজীবীর দৈনিক পরিশ্রমের হার এক টাকা ধার্য্য করিলে, বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণের প্রাপ্য হয় ১া০ টাকা, নয় ২৲ ৩৲ অথবা ৪৲ টাকা, প্রভৃতি ধার্য্য করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অথবা শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের হার এই ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া লইলে অতি সহজেই হিসাব করা যাইবে—বৎসরের ৩৬৫ দিনের জন্য দেশবাসী সমগ্র জনসংখ্যার পারিশ্রমিক পক্ষে প্রয়োজনীয় মুদ্রার সংখ্যার পরিমাণ কি। দুই বৎসর কালের পক্ষে সমগ্র দেশবাসী জনসংখ্যার সম্পূর্ণ পারিশ্রমিকের জন্য যাহা প্রয়োজন, তদপেক্ষা মুদ্রাসংখ্যা অধিক প্রচলিত হইলে চলিবে না।

এইভাবে, মুদ্রামাণের একক, শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর পারিশ্রমিকের হার এবং প্রচলনার্থ মুদ্রাসংখ্যার সমগ্র পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া মূলধনের সুদের হার নির্দ্ধারণার্থ সচেষ্ট হইতে হইবে। যখন মূলধনের সুদের হার এবং

শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর পারিশ্রমিকের হার নিশ্চিতভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে, তখন কৃষিজাত ও শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণও সুসাধ্য হইবে, কেন না সকলদ্রব্যেরই খরচার মূলে রহিয়াছে দৈহিক শ্রম, উদ্ভাবধান এবং মূলধন; কিংবা ভাষান্তরে শ্রমজীবীর কার্য্য, বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্কসামর্থ্যের নিয়োগ এবং মহাজনের টাকার সাহায্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-বৃন্দের পক্ষে ইহা অনুসরণ কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সহায়তা বাঞ্ছা করিলে, আমরা ইহার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ ইহা কার্য্যকরী করিবার পন্থা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ইহা উপভোগ করিবার স্থায় বিষয় নহে কি? তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের অর্থনীতি-সম্বন্ধে গর্ব্ব বোধ করেন!

"সরকারী অর্থবিভাগসংক্রান্ত যুদ্ধকালীন আর্থিক দিক্‌" এবং "মুদ্রামান ও বিনিময়" প্রসঙ্গ-আলোচনায় আধুনিক "সরকারী-অর্থবিভাগ" বিষয়ক বিদ্যার সহিত সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মিঃ সরকার বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন বিষয়কেই অনুকরণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেজন্য আমরা মিঃ সরকারকে দোষী করিব না, কেন না ইহা এই যুগের স্বাভাবিক ত্রুটি এবং এই নিমিত্তই পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত রহিয়াছে—এই অবস্থা কখন প্রকৃত অর্থানুযায়ী অর্থনীতির অ-আ-ক-খর জ্ঞানানুগত নহে। অর্থনীতি সর্ব্বদাই ব্যয় অপেক্ষা আয়ের আধিক্য দাবী করে, অথবা অন্য কথায় আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অনাধিক্য দাবী করে, ফলতঃ ঋণ কোন-রূপেই প্রকৃত "অর্থনীতি"র অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

আমাদের মতে, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ যদি প্রকৃত অর্থনীতির সন্ধানলাভপূর্ব্বক আধুনিক অর্থনীতি ও অর্থনীতি-বিদ্‌গণের উচ্ছেদ সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প না হন, তবে যে শৃঙ্খলা প্রত্যেকের শান্তি আনয়নে সমর্থ, জগদ্বাসী তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে না।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "ষ্টেট্‌সম্যান"-এ যাঁহারা মিঃ সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অনুকম্পার পাত্র বলিয়া মনে করি। এই সকল পত্রিকায় তাঁহার প্রশংসার মূলে, মিঃ সরকারের রচনা ও বক্তব্যে যাহা পাওয়া যায়, তদ্ব্যতিরেকে আরও কিছু বিদ্যমান বলিয়া কি মনে করা যায় না? জনসাধারণ কি তথাপি অন্ধ হইয়া এই শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের মুখাপেক্ষী থাকিবেন?

এই ভাবের কার্য্য হইতে আমরা মিঃ সরকারকে বিরত থাকিতে বলি, কেন না, ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তাঁহার এই কার্য্যের যোগ্যতা নাই এবং ইহাতে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।*

* "দি উইকলি বঙ্গশ্রী"র ১২ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরাজী সন্দর্ভ হইতে।

বড়দিনের আনন্দ

...যাঁহারা আপনাদিগের মাতা, ভগ্নী, দুহিতা ও পত্নী, তাঁহারা যদি বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে আপনাদিগের মনে কি ভাবের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা একবার চিন্তা করুন এবং ঐ ভাব লইয়া চাহিয়া দেখুন যে, পল্লীগ্রামের কোটী কোটী নারী ও বালিকা কখনও বা সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, কখনও বা অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। পাঠক, আপনারা কি পাষাণ?

আমাদিগের ছত্রিশ কোটীর এই বিংশতি কোটী বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করে নাই, এই আনন্দ তাহারা জানে না, এই আনন্দ এখনও তাহারা চাহে না।...

বড়দিনের উপহার

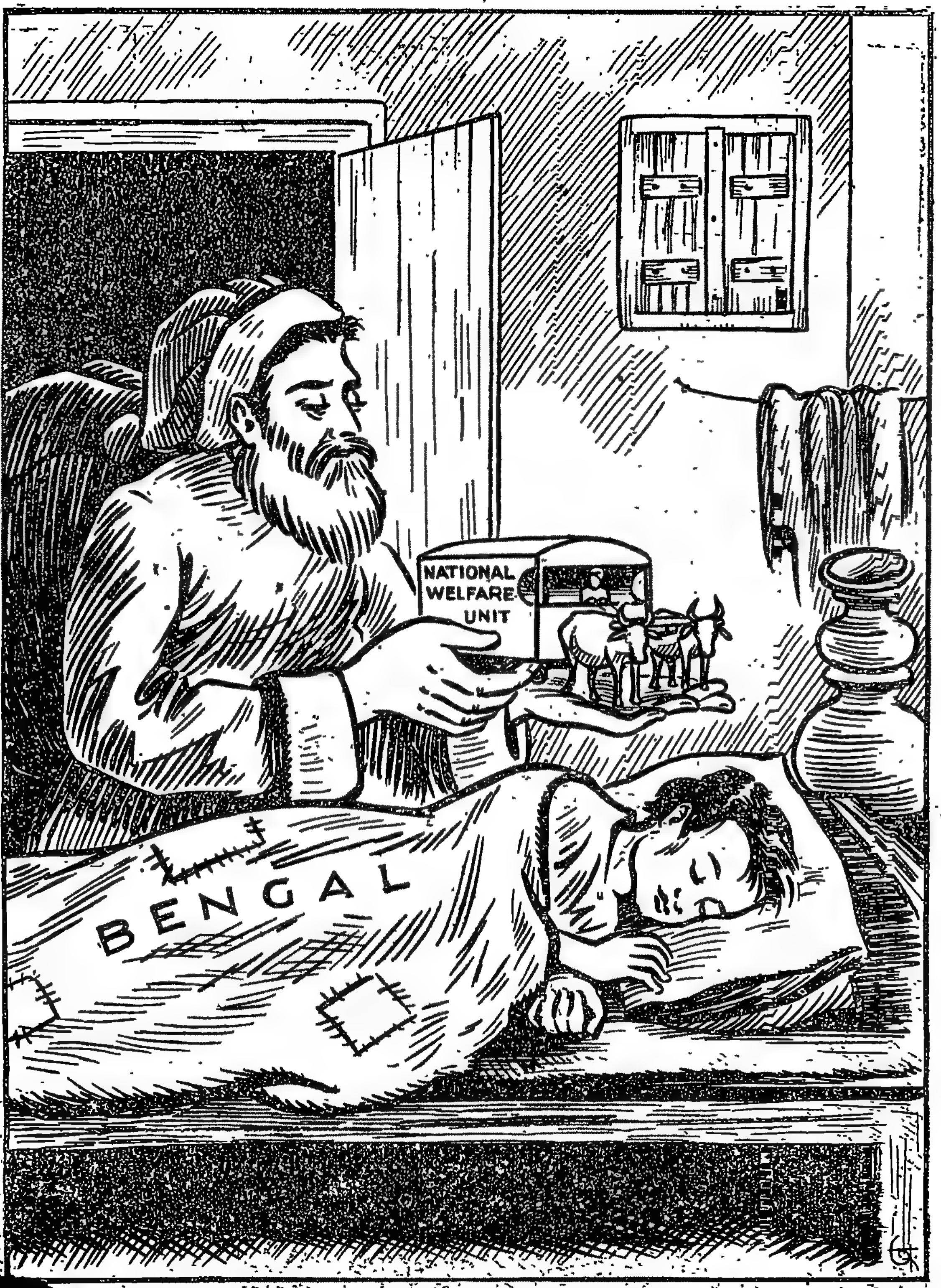

গত ২রা ডিসেম্বর তারিখে বাংলার লাট স্যর জন হার্বার্ট ও বাংলার প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল
[illegible] ওয়েলফেয়ার ইউনিট-এর কর্ম্মীবৃন্দের কলিকাতা হইতে যাত্রার পূর্ব্বে তাহাদের সাফল্য-

দ্বার-বিভ্রাট

[দি

সাহিত্যে বাস্তবতা

—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

জীবনের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিবার যে সহজাত কামনা, তাহার প্রেরণায় পশুও বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে আপন জীবনধারাকে প্রসারিত করিবার আয়োজন করে। মানুষও তাহাই করে, কিন্তু তাহাতেই সে তৃপ্ত হয় না। আপনার অতৃপ্তির আগুনে কখন আপনি পুড়িয়া মরে, কখন পরকে পুড়াইয়া মারে, কখন বা সেই হোমানলে আপনাকে আহুতি দিয়া সৃষ্টি করিতে চাহে নূতন জগৎ। অন্তরের এই অতৃপ্তি, এই বেদনা, না-পাওয়াকে পাইবার ব্যাকুলতা, অনুপভুক্তকে উপভোগ করিবার কামনা কখন মানুষকে পশু অপেক্ষা হীন করিয়া দেয়, কখন বা তাহাকে গড়িয়া তুলে দেবতা অপেক্ষা মহৎ করিয়া। কখন বা সে হয় ঘৃণ্যতম, কখন বা চির-নমস্য—পায় চির-অমরতা।

অনন্ত সুন্দর এই বিশ্ব। হয়ত এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেও এক পরম রমণীয় সৃষ্টি। তবুও এই সুন্দরকে উপভোগ করিবার যে-আকাঙ্ক্ষা, তাহার আর সীমা নাই। এই সৌন্দর্য্যের প্রতি যে-আসক্তি, তাহার আর শেষ নাই। তাই সে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে—

> "জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারনু
> নয়ন না তিরপিত ভেল।"

মানব-অন্তরের এই যে আক্ষেপের লীলা, বেদনার বিকাশ—ইহা এক পরম রমণীয় বিস্ময়। ইহাকেও আমরা একান্ত আগ্রহে উপভোগ করি। ইহাও যেন সেই সৌন্দর্য্য-লীলার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ—ফুলের যেমন সৌরভ, চাঁদের যেমন জ্যোৎস্না, তটিনীর যেমন কল্লোল। জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে সুন্দরকে দেখিয়া-দেখিয়া হৃদয় আজও তৃপ্ত হইল না, অন্তরের ব্যাকুলতার সেই অতৃপ্তির এই অভিব্যক্তি মানব-হৃদয়কে চিরদিনই বিভ্রান্ত করে।

ফুল দেখিয়া মানুষের আনন্দ হয়, কিন্তু সেই আনন্দেই তাহার পরিতৃপ্তি নাই। আপনার অজ্ঞাতসারে আপন হৃদয়-মধ্যে থাকিয়া যায় এক অতৃপ্তির বেদনা, যাহার ফলে ফুলের সৌন্দর্য্যটুকু সে পাইতে চায় এমন এক স্নেহ-নিবিড় সত্তায়, যাহাকে সে একান্ত আপন বলিয়া মনে করিতে পারে, যাহার মধ্যে সে আপনাকে একান্তভাবে মিলাইতে পারে। চাঁদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মানুষ পুলকিত হয়। কিন্তু সেই পুলকাবেগেই আপনাকে বিলাইতে চায় এমন এক নিবিড় নৈকট্যের মধ্যে যেখানে সে খুঁজিয়া পায় চাঁদের অমিয়টুকু। অথচ যাহা চাওয়া যায়, তাহা পাওয়া যায় না। এই না-পাওয়ার ব্যাকুলতায় মানুষ মনে মনে রচিয়া বসে নূতন জগৎ। ইহাই যখন রূপ পরিগ্রহ করিয়া লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হয়, তখন তাহাকে সে বলে আর্ট।

আধুনিক সাহিত্যে 'রস-সৃষ্টি' কথাটি সুপ্রচলিত। রস সৃষ্টি বলিলে যাহা বুঝা যায়, সংক্ষেপে আর্টও তাহাই। কিন্তু রস কি? ইহার কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন*। কারণ উহা উপলব্ধি করিতে হয়, উপভোগ করিতে হয়। অনুভূতির দ্বারা ইহা জানিতে হয়, চিনিতে হয়, বুঝিতে হয়। অনুভব-শক্তির দ্বারা ইহা অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিগম্য হয়। মিষ্ট রসের আস্বাদ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার দ্বারা বুঝান সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি রসের আস্বাদ জানে তার নাই, তাহাকে রসের স্বাদ বুঝাইব কেমন করিয়া? সুখে দুঃখে, স্নেহ-প্রেমে, রাগে-অভিমানে, মানব-হৃদয় যে আবেগে তরঙ্গায়িত, তাহারই তালে তালে নিত্য নব নব রসের লীলা। সেই আবেগেই মানুষ ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথে, নির্জ্জনে বসিয়া গান গাহে, মাটি লইয়া তাল পাকায়, পাথর লইয়া কুঁদিতে বসে, কথার পর কথা সাজাইয়া যায়, বিনাইয়া যায়। এমনি করিয়া একদিন আর্ট সৃষ্টি হয়। আর্টের উৎস রসে, রসের বীজ মনে।

---

* আমরা লেখকের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত নহি এবং মনে করি যে, 'রস' বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বুঝিতে হয়, তাহার অজ্ঞতাই আধুনিক কালের সাহিত্যের অবনতির মূল কারণ। গত ফাল্গুন-সংখ্যায় 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকীয় সন্দর্ভ 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন ও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা'য় 'রস' বলিতে কি বুঝায়, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।
—বঃ, সঃ

বিধাতা রচিয়াছেন প্রকৃতি, মানুষ রচনা করে আর্ট। ইহাও এক নূতন সৃষ্টি, মনোজগতে ইহার অস্তিত্ব। এই যে যাহা ছিল না তাহা গোচরীভূত হওয়া, 'না'স্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের উদ্ভব, অ-সৎ হইতে সতের আবির্ভাব—ইহার পিছনে আছে কামনা। শক্তির সহিত এই কামনা ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত, যেমন অগ্নির সহিত দাহিকাশক্তি ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। জৈব-জীবনের কুৎসিত লালসা হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাত্ম জীবনের ভগবৎ-প্রেমের মাধুর্য্য অবধি, সকল প্রকার মানসিক বিকৃতি ও বিকাশ এই কামনার বিভিন্ন রূপ। আধুনিক মনোবিদ্ ইহার নামকরণ করিলেন 'লিবিডো'। তপোবন হইতে ইহারই ইঙ্গিত করিয়া প্রাচীন ঋষি বলিলেন—

অ-সৎ হইতে কেমন করিয়া সতের আবির্ভাব ঘটিল, তাহা স্থির করিতে যাইয়া কবিরা হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া মনীষার বলে সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রথম মনের বীজ যে কামনা, তাহারই আবির্ভাব সর্ব্বাগ্রে।

মানুষ যদি নিষ্কাম হইত, যাহা পাইয়াছে তাহাতে তুষ্ট থাকিত, যাহা পায় নাই তাহা পাইতে চাহিত না, তাহা হইলে আর্টের সৃষ্টি হইত না, সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু মানুষের মন কামনা-শূন্য নয়। অসংখ্য কামনা মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া মনের দ্বারে উপনীত হয়। কিন্তু সভ্যজগতের স্বাধীনতা, সামাজিক বিধি-নিষেধ, রাষ্ট্রীয় শাসন, লৌকিক নীতি ও প্রথা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী, লোক-লজ্জা এবং অভ্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কামনার কণ্ঠরোধ করে, কিন্তু নিঃশেষিত করে না। সেই অতৃপ্ত মনোবৃত্তি, সেই অপূর্ণ-কামনা সাহিত্যে এবং শিল্পে নানারূপে এবং বিবিধ মূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া উঠে। ভাবের অপূর্ব্বতায় এবং প্রকাশের মাধুর্য্যে সেই রূপান্তরিত মনোবৃত্তি চিরদিন আনন্দ দান করে। মানব-মনের অতৃপ্তির ব্যাকুলতা হইতে রসের উৎস উৎসারিত হয়।

রসের পরিণতি মনের বিভিন্ন অবস্থায়—কখনও সুখ-বোধে, কখনও দুঃখবোধে, কখনও অনুরাগে, কখনও বিরাগে। ইহাকে মানুষ মূর্ত্তি দেয় চিত্রে অথবা ভাস্কর্য্যে; নৃত্যে অথবা সঙ্গীতে, শিল্পে অথবা সাহিত্যে। যে-রস একটি বিশেষ অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া একান্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল, শিল্পে বা সাহিত্যে তাহা ব্যক্ত হইয়া বিভিন্ন মনে ছড়াইয়া পড়িল। এই যে রস এবং তাহা পরিবেশিত হইবার অবলম্বন, এই যে ভাব এবং তাহা প্রকাশিত হইবার বাহন, এই যে অ-রূপ এবং তাহা অভিব্যক্ত হইবার রূপ—এই উভয়কে আশ্রয় করিয়াই আর্টের বিকাশ। ললিত কলায় এবং সাহিত্যে ইহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

আর্টের বিষয়-বস্তুর কোন সীমা-নির্দ্দেশ নাই। কারণ, সাধারণ লোকে যাহাকে কুৎসিত বলিয়া মনে করে, অসুন্দর বলিয়া ভাবে, অপবিত্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে, আর্টিষ্ট তাহার মধ্যেও সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান। তাঁহারা বলেন, সত্য নাই, মিথ্যা নাই, শুভ নাই, অশুভ নাই, সুন্দর নাই, অসুন্দর নাই, পবিত্র নাই, অপবিত্র নাই, মানুষ আপনার মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক। এই প্রকাশের মধ্যেই আর্টের চরিতার্থতা এবং উহার শোভনতা ও পূর্ণতার মধ্যেই আর্টের উৎকর্ষ।

সাহিত্যিক আর্টের ব্যবসায়ী। রূপ ও রস সৃষ্টি করে। অতীতের স্মৃতি-রঞ্জিত এবং বর্ত্তমানের কোলাহল-মুখরিত দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া হৃদয়াবেগে রঙীন এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য রচনা করে। সুবিন্যস্ত এবং সুসংবদ্ধ ভাবপুঞ্জ তখন প্রকাশ-ভঙ্গীর উৎকর্ষ-গুণে সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অর্থাৎ সাহিত্য শুধু রস নয়, শুধু রূপও নয়, রস-ঘন রূপকে প্রয়োগ করিবার কৌশলও নয়, পদ্ধতিও নয়। সাহিত্য ইহাদের সমন্বয়।

সাহিত্য কথাটা যখন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি, তখন ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনকেও সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া লই। অর্থাৎ সাহিত্যের সম্বন্ধ তখন শুধু মানব-হৃদয়ের সঙ্গে নয়—মানব-বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সঙ্গেও বটে। কথা-সাহিত্য ও কাব্য-সাহিত্যের কারবার জীবন লইয়া। জীবনের ব্যাখ্যা, জীবনের সম্ভাবনা গল্পে উপন্যাসে ও নাটকে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। আবেগের দ্বারা রচিত হয় কাব্য। জীবন ও আবেগ রস-সাহিত্যের উপাদান। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান মানবের বুদ্ধি মার্জ্জিত করে, জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। প্রকাশ-ভঙ্গী ও রচনা-পদ্ধতির গুণে ইতিহাসের কাহিনী, দর্শনের মতবাদ, বিজ্ঞানের থিওরী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ইহারা জ্ঞান-সাহিত্য।

কিন্তু আর্ট যে-রস পরিবেশন করে, জ্ঞান-সাহিত্য সে-রস পরিবেশনে বঞ্চিত। কারণ ইহাতে বুদ্ধির বিকাশ ও প্রকাশের নব নব পরিকল্পনা আছে, জ্ঞানের সমুদ্র-মন্থনের নব নব আয়োজন আছে, কিন্তু হৃদয়ের যোগ নাই। ইহাতে সাহিত্যের আকৃতি আছে, প্রকৃতি নাই—রূপ আছে, রস নাই। আর্টের দিক হইতে যখন সাহিত্যের বিচার করিতে বসি, সাহিত্যকে তখন সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি। তখন সাহিত্য বলিতে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্যকেই বুঝি। সাহিত্য তখন রস-সাহিত্য।

জীবনের সম্যক্ আলোচনা সাহিত্যালোচনার বিষয়-বস্তু। স্মৃতি-জড়িত এবং আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেলিত এই জীবন। ইহাতে আনন্দ ও বেদনা কখন সূক্ষ্ম, কখন তীব্র, কখন বিক্ষিপ্ত, কখন নিবিড়। ক্ষণিকের বেদনায় মুহ্যমান হইয়া মানুষ মরিতে বসে, আবার ক্ষণিকের আনন্দ-স্মৃতিটুকু বক্ষে ধারণ করিয়া দুঃসহ জীবন দীর্ঘকাল ধরিয়া বহন করিয়া চলে। এই যে জীবন যাহার অন্তরালে বসিয়া মানবাত্মা কখন মরমে গুমরিয়া মরে, কখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদে, কখন বা আনন্দের আবেগে বিহ্বল হইয়া পড়ে, ইহাকে যে রূপ দিতে পারে, সেই ত রূপ-দক্ষ—আর্টিষ্ট। মানবের আকাঙ্ক্ষাকে যে রূপায়িত করিতে পারে, সে-ই ত রূপকার।

মানুষের সঙ্কীর্ণ বাঞ্ছার আত্মার আকাঙ্ক্ষা কখন কখন দৈহিক-ক্ষুধার নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইহার যে আদৌ স্থান নাই, তাহা নহে। কিন্তু আর্টের বিকাশের জন্য, সাহিত্যসৃষ্টি ও পুষ্টির জন্য ইহাই যখন একান্ত ভাবে অবলম্বনীয় হইয়া পড়ে, তখন ঘনাইয়া আসে দুর্দ্দিন। কারণ দৈহিক আনন্দ ক্ষণিক, কিন্তু আত্মিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা জীবন হইতে জীবনান্তরে প্রবাহিত হইয়া শাশ্বত কালে বিরাজ করে। তাই জীবনের সহিত শরীর-ধর্ম্ম ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত থাকিলেও যে-গান, যে-কাব্য, যে-সাহিত্য অমর হইয়া আছে, তাহা শরীর-ধর্ম্মের জয়গান নহে।

জীবনের বিষয়গুলি সাহিত্যের উপাদান। সৃষ্টির আদিম-প্রভাত হইতে উহারা বারংবার মানব-জীবনে পুনরাবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু তবুও চির-পুরাতন জীবন-কাহিনী সাহিত্যে চির-নূতন হইয়া দেখা দেয়। সাহিত্যিক যদি ফটোগ্রাফার হইত, জীবন-কাহিনী সঠিক বিবরণ লিখিয়া যাইত, তাহা হইলে একঘেয়েমির দ্বারা মন উৎপীড়িত হইত, সাহিত্য আর আনন্দ দান করিত না, হৃদয়কে রসে আপ্লুত করিত না। রস শুকাইয়া সাহিত্য মরুভূমিতে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং হয়ও না। চির-পুরাতন কাহিনীগুলি সাহিত্যিকের মানস-সরোবরে অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া বিকশিত হয়। তাহাই যখন লোকচক্ষুর সম্মুখে উপনীত হয়, তখন তাহা দেখা দেয় নব সৃষ্টিরূপে। এই সৃষ্টির মধ্যে যখন আমরা ইতিহাস খুঁজিতে বসি, অথবা বস্তু-জগতের সহিত ইহা মিলাইয়া লইবার আয়োজনে মাতি, তখন ভুল করি।

কিন্তু তাই বলিয়া বস্তু-জগতের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক নাই, বাস্তবতার কোন সার্থকতা নাই, বাস্তব সাহিত্যে কোন আর্ট নাই, ইহা সত্য নহে। বাস্তব জগৎ হইতে আমরা সাহিত্যের বিষয়, আর্টের উপাদান সংগ্রহ করি। কল্পনার পরশে এবং হৃদয়-রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া উহা এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। বঙ্কিমচন্দ্র বহু উপাদান ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইতিহাস বাস্তব-জীবনের কাহিনী। তাহা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তববাদী নহেন—রোমাণ্টিক। বাস্তববাদের কোলাহলে সাহিত্যাকাশ আজ মুখর। বাস্তবতাকে সমর্থন করিবার জন্য আর্টের দোহাই প্রবল। কিন্তু তবুও সেই বাস্তব সাহিত্যই বাংলা দেশে বিরল।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সত্যের সাক্ষাৎ করি, তাহাই বাস্তব সত্য। তাই বলিয়া উহা কদর্য্যতার কাহিনীও নহে, কৌৎসিত্যের ইতিবৃত্তও নহে। ইহার মধ্যে শিব ও সুন্দর; শুভ ও কল্যাণের প্রকাশ আছে, হৃদয়-বৃত্তির লীলা আছে, ঐশী প্রেরণার অনুভূতি আছে। স্নেহে-প্রেমে, দয়ায়-দাক্ষিণ্যে, সহিষ্ণে-বাৎসল্যে জীবন লীলান্বিত। আধুনিক মনোবিদ্ বলিলেন, মানব-জীবনের এই যে বিচিত্র অভিব্যক্তি, কাম হইতে ইহার বিকাশ। ইহা শুনিয়া সাহিত্যিক যদি কামুকতা ফুটাইবার জন্য জীবনের ব্যাখ্যা সুরু করেন, তাহা হইলে তাহা হইয়া দাঁড়ায় সাহিত্যে বিড়ম্বনা। বিবর্ত্তনবাদী বলেন, বানরের ক্রমোন্নতির ফলে কালক্রমে নরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তদনুসারে সাহিত্যিক যদি দন্ত-বিকাশের সাধনা সুরু করিয়া দেন, তাহা হইলে উহা জীবনের সম্যক্-

আলোচনা বা জীবনের সমালোচনা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে না, এবং আর্টের খাতিরেও উহা আর্টের উৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। অর্থাৎ যাহা ব্যবহারিক সত্য, তাহা আর্টেরও সত্য নহে। জলের পিপাসা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দূর হয় না। 'লিবিডো'র ব্যাখ্যা শুনিয়া রস-পিপাসার নিবৃত্তি হইবে কেমন করিয়া?

তবুও এ কথা সত্য, বাস্তব জীবনে কদর্য্যতার স্থান আছে। জীবনের ব্যাখ্যায় ইহাকে একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রোমান্টিক সাহিত্যিকরাও ইহাকে একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারাও মাঝে মাঝে বাস্তববাদীদের মতই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন এবং বলেন—

"মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোলে
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বোলে।"

রোমান্টিক সাহিত্য জীবন হইতে জীবনাতীত সত্যে উপনীত হয়, বাস্তব জীবন হইতে সম্ভাব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। তাই রোমান্স কল্পনা-প্রসূত। জীবনের কাহিনী মানব-মনে যে অনুভূতির সঞ্চার করিয়া আবেগ-রঞ্জিত কাল্পনিক সম্ভাবনার সৃষ্টি করে, রোমান্স তাহারই চিত্র।

বাস্তবতার মধ্যে সম্ভাবনার স্থান নাই। কি হইতে পারিত এবং কি হইতে পারে, ইহা লইয়া বাস্তববাদীর কোন প্রয়োজন নাই; কি আছে এবং কি ঘটিতেছে ইহা লইয়াই তাহার কারবার। ইহা লইয়াই সে আর্টের শ্রী ফুটাইয়া তুলে। তাই বাস্তব সাহিত্য জীবনের প্রতিলিপি, কিন্তু তাই বলিয়া উহা সংবাদপত্রের মত ঘটনার বিবরণ নহে। সংবাদ পাঠ করিয়া ঘটনাটি জানিয়া মন মুক্তি পায়। সাহিত্য মনকে আন্দোলিত করে, আলোড়িত করে, রাখিয়া যায় অনুভূতির ছাপ—সম্ভাবনার মোহ। চক্ষের সম্মুখে যে ঘটনা ঘটে, অন্তরে তাহা জাগ্রত করে অনুভূতি। রচনা-কৌশলে উহা যখন সুপ্রকাশিত হইয়া সকল মানব মনে অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেক করে, তখন বাস্তব আর্ট সার্থক হইয়া যায়।

বাস্তবতায় কল্পনা সংযত। বাস্তব জীবনের অনুভূতিটুকু যাহাতে ব্যাহত না হয়, তাহার প্রতি বাস্তব শিল্পীর সতর্ক দৃষ্টি। সে কল্পনা ও আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না; তাহার সৃষ্টিকে রঞ্জিত করে না। ঘটনার সহিত অনুভূতির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই ক্ষান্ত হয়। এই কারণেই রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টি করা সহজ; বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টি কঠিনতর। রোমান্সের ক্ষেত্রে কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া সাত সমুদ্র তের নদীর-পারে পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোনার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত করিবার জন্য ছুটিয়া চলে। ইহার মধ্যে বাধা-বন্ধন-হীন মন মুক্তি পায়। কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে কল্পনার রশ্মি শ্লথ করিবার উপায় নাই। আর্টের দৃষ্টি দিয়া বাস্তব ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া যেটুকু গ্রহণ করিবার তাহা পরি-গ্রহের দ্বারা সাহিত্যিক বাস্তব জীবনের অনুরূপ অনুভূতিটুকুই সাহিত্যে প্রকাশিত করেন। স্বপ্ন-রাজ্যের মোহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করে না, তাহা নহে। তিনি আপনাকে মোহমুক্ত রাখেন। স্বপ্ন-বিভ্রমের মধ্যে বিচরণ সংযত করার দ্বারা বাস্তব সাহিত্যিক আপনাকে আর্টের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন। আধুনিক তথাকথিত বাস্তববাদের মধ্যে সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি কই? সে সংযম কই?

বাস্তব জীবনের অনেকখানি জুড়িয়াই যৌন জীবনের স্থিতি। সুতরাং যৌন-জীবনের কাহিনী অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে হয় তো পরিহার করা যাইবে না। সাহিত্যের সময়ে যৌন কাহিনী প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর্টের দিক দিয়া ইহা রীতিসঙ্গত। কারণ আর্ট প্রচলিত নীতি ও দুর্নীতি, শ্লীলতা ও অশ্লীলতার ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহে।

কিন্তু দুর্নীতিকে উপভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তির দ্বারা মানব ক্লিষ্ট। জীবনে যাহা আস্বাদ করিবার সুযোগ পায় না, সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহা উপভোগ করিয়া আনন্দ পায়। তাই সকল দেশেরই এক শ্রেণীর লেখক সেই অন্তর্নিহিত কৌৎসিত্য-প্রবণতার চরিতার্থতার জন্য লেখনী ধারণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই উদ্দেশ্যেই বাস্তবতার উপাসনার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, কে জানে। সত্য করিয়া বাস্তব সাহিত্য রচিত হউক তাহা আদৃত হইবে, সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে। কল্পনার সহিত যৌন কামনার রসায়ন মিলাইয়া সাহিত্যের বাজারে

বাস্তব আর্টের ব্যবসায় জমাইবার মধ্যে যে বঞ্চনা বর্ত্তমান, তাহা দ্বারা সাহিত্য যেন পীড়িত না হয়।

রোমান্টিক সাহিত্যই হউক, আর বাস্তব সাহিত্যই হউক, এমন একটা আবেদন লইয়া উহা মনের দ্বারে উপনীত হয়, যাহা হৃদয়কে স্পর্শ করে। এই আবেদনই আর্টের বড় কথা। কল্পনার সহায়তায় অথবা বাস্তব চিত্র অবলম্বনে সাহিত্যিক অন্তরের দ্বারে আবির্ভূত হয় সেই আবেদন লইয়া। এই আবির্ভাবের দ্বারাই আর্ট সার্থক হয় না—উহার সার্থকতা হৃদয়ের সুপ্ত সঙ্গীতের উদ্বোধনে, যাহার ফলে মানুষ শাশ্বত সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ লাভ করে, অমৃতের আস্বাদ পায়।

সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন আকৃষ্ট হয় পদ্মের দিকে পঙ্কের দিকে নয়। যে সৃষ্টি-নৈপুণ্যের দ্বারা পঙ্কজের জন্ম হয়, মানুষ তাহাকে প্রণতি জানায়, অথচ উহার সৃষ্টি-লীলায় পঙ্কের বিশিষ্ট স্থান আছে। পঙ্কের জীবন ইহাতে পুষ্পিত হইয়াছে, কিন্তু সে থাকিয়াছে লোক-চক্ষুর অগোচরে। যিনি রূপকার তিনি পঙ্কিলতাকে সার্থক করিয়াছেন অনায়াসে এবং অজ্ঞাতসারে। আর্টের চিরন্তন রহস্যটুকুই এইখানে। জীবনের ব্যবসায়ী যে সাহিত্যিক তিনি অনেক সময় কদর্য্যতাকে পরিহার করিতে পারেন না; কারণ জীবন-লীলায় উহার বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের ব্যাখ্যায় জীবনের আলোচনায় উহারই আসন সবার উপরে নয়। উহা রস যোগায়, সৃষ্টিকে আবিল করে না।

সাহিত্যিক স্রষ্টা। সে পদ্ম সৃষ্টি করিবে কি পঙ্ক সৃষ্টি করিবে, ইহা নির্ভর করে কতকটা তাহার শক্তির উপর, কতকটা তাহার রুচির উপর। পদ্মের সহিত পঙ্কের সম্বন্ধ যতই নিবিড় হউক, পাঁক প্রস্তুত করিতে পারিলেই পদ্ম ফুটে না এবং পদ্ম ফুটে বলিয়াই পঙ্কের আসন চন্দনের সমপর্য্যায়েও নয়। তবুও একথা সত্য, ফুল ফুটানো যেমন সৃষ্টি, পাঁক তৈরী করাও তেমনি সৃষ্টি। কিন্তু মানব-মনের কেমন একটা দুর্ব্বলতা, সে পঙ্কজের স্রষ্টাকেই প্রণতি নিবেদন করে—পঙ্কের স্রষ্টাকে নয়। মনের এই যে দুর্ব্বলতা, এই যে রহস্য ইহারই আকর্ষণে আর্টের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির সার্থকতা আবিলতায় নয়—সৌন্দর্য্য প্রকাশে।

আজিকার দিনের দুঃখের কথা এই যে, রসস্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা অপেক্ষা এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে বাস্তবতার উপাসক বলিয়া গর্ব্ববোধ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ইহা সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতার দ্বারা সাহিত্য আজ ভারাক্রান্ত। ইহারই কোলাহলে আকাশ আচ্ছন্ন। রস-সৃষ্টির দিক্ হইতে সাহিত্যের পরিচয় না যাচিয়া উহা যখন ভ্রষ্ট আদর্শগত অথবা বাস্তববাদের গর্ব্ব-বোধের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, তখন সাহিত্য নামিয়া যায় অবনতির পথে। যাহা আর্ট, যাহা সাহিত্য, তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই—তাহার মধ্যে আছে পরম ঔদার্য্য। ইহার রূপ ও রস দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানব-মনে আনন্দ দান করে।

রস-সৃষ্টি

...সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে "রসসৃষ্টি", ইহা অলীক। মনুষ্য-শরীর সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রস কোন মনুষ্য সৃষ্টি করিতে পারে না। রস, তেজ ও বায়ু এই তিনটী বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র প্রকৃতি। সর্ব্বজগৎ-পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির কার্য্যবশতঃ রস, তেজ ও বায়ু সর্ব্বদা মনুষ্য-শরীরে আপনা হইতেই বিদ্যমান থাকে এবং ঐ তিনটি বস্তুর কার্য্যবশতঃ মনের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় ও মেদ, অস্থি প্রভৃতি সম্বলিত শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার পর বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সংযোগের জন্য মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি-সাধন করিয়া থাকে।

কাজেই মানুষের 'ভাব' সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য আছে, ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ রস সৃষ্টি করিতে পারে অথবা তাহার কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি, ইহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না।...

খলিসাদহের বিল

—শ্রীগোপেশ্বর সাহা

আজি এ প্রভাতে উজল আলোতে মনে জাগে সেই ছবি,
ধানক্ষেত চিরে জলের রেখাটি, মাঝ দিয়ে ওঠে রবি।
নীরব নিথর রূপার রেখাটি দু-পাশে ধানের জমি
যেন সে স্নিগ্ধ দেবের আসন, দূর হতে তা'রে নমি।

বর্ষার দিনে নৌকা সাজা'য়ে আসিত বা কোন মেয়ে,
ছোট ছোট ছেলে নিমেষ ফেলিতে আসিত তেমনি ধেয়ে।
দিত হাত-তালি লম্ফ-ঝম্ফ হৈ হৈ কলরব,
জীবনের সেই মধুর ছবিটি মুছিয়া গিয়াছে সব।

রোজ সন্ধ্যায় কুমোরের মেয়ে কলসীটি নিয়ে কাঁখে,
ধানের জমির আলটি ঘুরিয়া আসিত এই-সে বাঁকে।
কলসী ভরিয়া নীরবে যাইত, তেমনি পথটি বেয়ে,
যে'ত ডা'ন হাতে ধানের মাথায় অভয় আশিস দিয়ে।

ধীরে ধীরে যে'ত সে ছবি মিলায়ে আঁধার আসিত ছেয়ে,
গ্রামের পথিক গ্রামে চলে যেত সোজা সে সড়ক বেয়ে।
পাড়ে পাড়ে তা'র জলিত আলোক যেন সে মোতির মালা;
আজি তা'র বুকে জলিতেছে শুধু হতাশার মরু জ্বালা।

সেবার এখানে বাবুদের ছেলে শাঁক্‌লা ফুলের তরে,
ডুবিতে ডুবিতে বাঁচাল রহিম নিমেষে আসিয়া ধরে'।
সোর-গোল কত পড়ে গেল হেথা বড় বাবু এল ছুটে,
সেদিন হইতে কপালে তাহার গেল লাখেরাজ জুটে।

বিজয়ার সাঁঝে মেলা বসে যেত কত না লোকের ভিড়,
ছেলেদের মুখে বাঁশীর আওয়াজে ভরে যেত দুই তীর।
কত কোলাহল হাসির ফোয়ারা কত-না সুখের মেলা,
আপনা আপনি জমিয়া উঠিত সকাল-সন্ধ্যা বেলা।

ঢ়ে ওই বুড়ো বটগাছ ওই বারোয়ারী-তলা,
হু দূরে তা'র শিব-মন্দির তা'র পাশে ছোট তলা।
জলার ওধারে পীরের দরগা চেতন পীরের ঠাঁই;
সিরনী দিয়াছে সবাই আসিয়া কোন ভেদাভেদ নাই।

ছোট এ বিলটি রূপালী রেখায় নীরবে যাইত বেয়ে,
এ-পারে ও-পারে দু'পারের লোক বাঁচিত নেয়ে ও খেয়ে।
মধু হালদার রোজ ভোরে আসি' জাল ফেলি' বাঁক ঘুরি
ফিরে যেত রোজ "সারিখলসেয়" আপন ডালিটি পূরি।

সেবার এখানে ছিপ হাতে বসি' কাজীদের ছেলে সদু,
অকাল বিধবা নীরজার পানে চেয়েছিল না কি শুধু।
এমন করিয়া বিশু মণ্ডল শাসন করিল তার,
তিন মাস সে যে ঘরের বাহির হয় নি কখন আর।

ও-পারের ওই জটা তাল গাছে বিষম ভূতের বাসা,
গভীর রাত্রে শুনা যেত না কি নাকি সুরে কাঁদা হাসা।
সন্ধ্যার পর করিত না কেহ ওই পথে চলা ফেরা,
কত না ভয়ের জাল টানা দিয়ে ওই গাছ ছিল ঘেরা।

ওই নিমতলা গাঁজনের ধুম "হাজরা" ধরার খেলা,
প্রতি বছরেই লেগে যেত সেথা হাসি-তামাসার মেলা।
কোন্‌বার সেই কোন্ একজন এনেছিল গোটা শব,
সেই কথা নিয়ে প্রতি বছরেই লেগে যেত কলরব।

ওই খানে নেয়ে রায়ের গিন্নী কলসে ভরেছে জল,
দুষ্ট ছেলেরা রোজ সেই খানে লাগায়েছে কোলাহল।
'জল দিলি' বলে দিত কত গাল বলিত মন্দ কত,
জলভরা সাথে গাল খাওয়া আজ অতীতের কোলে গত।

নিমাই ঠাকুর মন্ত্র পড়িয়া অঞ্জলি দিত ছাড়ি,
পিছনে দাঁড়ায়ে নবনে ভুবনা করিত রগড় ভারি।
নবনে তেমনি অঞ্জলি পূরি জল দিতে জলে ঢালি,
হাসির বহরে নিমাই ঠাকুর চেয়ে দেখে দিত গালি।

দুই পারে ওর সোনার লক্ষ্মী বাঁধা ছিল বার মাস,
ওর কূলে কূলে ফুটিয়া উঠিত মোহন মধুর হাস।
ওর জলে ছিল জীবন-প্রবাহ সদা আনন্দময়,
খলিসাদহের অতীত কাহিনী স্মৃতির মাঝেতে লয়

প্রেম ও কাম

—শ্রীবিজয়রত্ন সেনশর্ম্মা

সৃষ্টির আদি অথবা সূচনা হইতেই এই শোকতাপময় জগতে প্রেম ও কাম পাশাপাশি ভাবেই তাহাদের কার্য্য করিয়া আসিতেছে; তাহাদের আবর্ত্তে পড়িয়া কেহ বা অনাবিল সুখস্রোতে ভাসিতেছে, কেহ বা পঙ্কিলস্রোতে হাবুডুবু খাইয়া শোচনীয় অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। অথচ সৃষ্টিরহস্তের এমনই বৈচিত্র্য যে, মানবমাত্রেই অহরহ ইহাদের পশ্চাতে ছুটিতেছে। কারণ, না ছুটিয়াও উপায় নাই, যেহেতু মানব-মনের অন্তর্নিহিত রহস্যও নিহিত ঐ স্থানে। কিন্তু এই প্রেমই বা কি, আর এই কামই বা কি? কত দার্শনিক, কত কবি, কত প্রেমিকই না ইহাদের ব্যাখ্যায় মুখর হইলেন, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত কেহই ইহাদের তলদেশে প্রবেশ করিয়া এমন পর্য্যবেক্ষণী শক্তি লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না যে, ইহাদের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করিবার বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতে পারেন। তবে, এ ক্ষুদ্রবুদ্ধির এই ব্যর্থ প্রয়াস কেন? মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, এ জগতে কিছুই বৃথা যায় না; কোথায়, কখন, কোন্ অবস্থায়, কি ভাবে কোন্ বস্তুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যায়, কে বলিতে পারে? আজি পর্য্যন্ত যাহা হয় নাই, আগামী কল্য যে তাহা হইবে না, সে-কথা যখন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তখন চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? মহাকবি কালিদাসও যদি "গমিষ্যামি উপহাস্যতাম" বলিয়া মহাকাব্যের সূচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিই বা "আপরিতোষাৎ বিদুষাম্" বা "সন্তঃ পরীক্ষ্য অন্যতরং ভজন্তে" বলিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিবার সাহস পাইব না কেন?

'প্রেম' বলিতে কেহ 'আত্মত্যাগ' বা 'আত্মবিসর্জ্জন' বুঝেন; কেহ 'আত্মপ্রতারণা' বুঝেন; কেহ 'সংযম', ও 'ত্যাগ'কেই বুঝেন; 'পরাসুখার্থে দুঃখবরণ' বলেন; কেহ বা যদি "মেঘের ছায়া" বলিয়া কল্পনা করেন; আবার কেহ বা "মান, লজ্জা, ভয়—তিন থাকতে নয়" বলিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কেহ 'প্রেম'কে, 'আকাশকুসুম' বলিয়া মতপ্রকাশ করেন—বা যেন তেন প্রকারেণ প্রেমাস্পদকে লাভ করিয়া 'ইন্দ্রিয়-লালসার চরিতার্থতাকেই' 'প্রেম' বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা হইলে আমার সমগ্র শক্তি লইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিব। 'প্রেম' শব্দটি মন্দাকিনীস্রোতে মর্ত্তে ভাসিয়া আসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহা 'স্বর্গীয় পদার্থ'ও নহে বা অত্যন্ত দুর্লভও নহে। মর্ত্তেই উহার সন্ধান মিলে, তবে কচিৎ।

প্রেম করিবার বা ভালবাসিবার সে-ই অধিকারী, যে-ব্যক্তি একাধারে জিতেন্দ্রিয়, সংযত, মনস্বী, উদার ও স্বার্থত্যাগী। 'সাহিত্যদর্পণো'ক্ত 'ধীরোদাত্ত' নায়কই প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অধিকারী, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ঠিকভাবে বিচার করিলে সমুদায় সাহিত্য ঘাঁটিয়াও একটিমাত্র 'ধীরোদাত্ত' নায়কের সন্ধান মিলে না। যেখানে 'দিবার ইচ্ছা' নাই, থাকিলেও অল্প—শুধু 'পাইবারই ইচ্ছা', তথায় প্রেম নাই, থাকিতে পারে না। কিন্তু যেখানে একেবারেই 'পাইবার ইচ্ছা' নাই, শুধুই 'দিবার ইচ্ছা', সেখানেও প্রেম নাই। (বলা বাহুল্য, আমার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ভগবৎ-প্রেম নহে; এমন কি, সেক্ষেত্রেও ইহা বিচার্য্য বিষয়)। সেই হেতু "মেরেছে কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না"—ইহার মধ্যে আমি শুধু 'দয়াই' দেখিতে পাই। প্রেমের নামগন্ধও নাই। বড়জোর, 'জীবে-প্রেম' বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে মহত্ত্ব আছে, কিন্তু প্রেমের মাধুর্য্য নাই এবং সেই জন্যই আত্মমর্য্যাদাবোধ বা অভিমান—প্রেমের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। আবার যেখানে আত্মবোধ বা অভিমান আত্মঘাতী অথবা প্রেমাস্পদের ক্ষতিকারক, সেখানেও প্রেম নাই। সব স্থলেই যে প্রেম মিলনাত্মক হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই—বরং বিয়োগান্ত প্রেম যতই করুণ হউক না কেন, মিলনাত্মক অপেক্ষা অধিক মধুর। তাই, বিরহী দার্শনিক প্রেমিক-কবি বলিয়াছেন—"মিলনে সা তু একা, বিরহে তন্ময়ং জগৎ।" কিন্তু সে স্থলে প্রাণ খোঁজে—"অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয় প্রার্থনা কুরুতে।" অর্থাৎ, 'বাসনা' চরিতার্থ না হইলেও পরস্পরের মিলন-ইচ্ছা প্রাণে আনন্দের

সঞ্চার করে। তাই বলিতেছিলাম যেখানে একেবারেই 'পাইবার ইচ্ছা' নাই, সেখানেও প্রেম নাই। তথাপি, 'উভয়-প্রার্থনা'তেই যেখানে প্রেমিক সন্তুষ্ট সেখানেও, তাহার ত্যাগের মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সংযত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রেম করিবার প্রকৃত অধিকারী। আবার কোন কোন স্থলে উভয়প্রার্থনাতেও বিরত হইতে হয়। হয়ত কোন বিবাহিত ও সন্তানাদির জনক অথচ জিতেন্দ্রিয়, সংযত ও সর্ব্বপ্রকারে গুণবান্ ব্যক্তি কোন কুমারীকে ভালবাসিল, অথবা অন্য কোন কুমারই এমন কোন কুমারীকে ভালবাসিল, যাহাকে পাইবার পথে সামাজিক বাধা বর্ত্তমান, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহারা দেখে যে তাহাদের "ধর্ম্ম-সঙ্গত" মিলনের পথে যথেষ্ট অন্তরায় আছে, তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তব্য—অপর পক্ষ হইতে 'প্রার্থনা'-প্রাপ্তির জন্যও বিরত হইবার চেষ্টা করা; তদ্বিপরীত কার্য্যকেও প্রেম আখ্যা দেওয়া যায় না। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—তাদৃশ ব্যক্তি ভালবাসিবার অধিকারীই বা কিরূপে? তদুত্তরে বলিব—তাহারও ভালবাসিবার অধিকার আছে, এমন কি, ভালবাসা লইবারও অধিকার আছে, কিন্তু ধর্ম্মসঙ্গত মিলন ছাড়া পাইবার অধিকার ত' নাইই, এমন কি তাহাকে নিজের ভালবাসার কথা জানিতে দিবারও অধিকার নাই। তবে, সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভালবাসা এমনই একটী ধর্ম্ম—যাহা স্ব-প্রকাশিত। যেখানে নিপুণ চক্ষেও ভালবাসার প্রকাশ নাই, সেখানেও ভালবাসা নাই। তবে, আমি শুধু বলিতে চাহি—সংযম। পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—সে ভালই বা বাসিবে কেন? তদুত্তরে বলিব—ভালবাসা কাহারও হাতধরা নহে। "ন স্নেহঃ কারণং অপেক্ষতে" অর্থাৎ ভালবাসা কোন কারণের অপেক্ষা রাখে না—প্রয়োজনক্ষেত্রে যুক্তি হইলেও—অনেকস্থলে কামুকের হস্তে অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু মানুষের ব্যবহারে মানুষ মানুষকে ভাল না বাসিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব ও অনুচিত। উহা মানবধর্ম্ম; কিন্তু সেই ধর্ম্মও 'নিন্দিত' যে-স্থলে ভালবাসায় সংযম নাই বা ত্যাগ নাই। আর যে-স্থলে ক্ষতি করিবার ইচ্ছা অর্থাৎ 'ভোগেচ্ছা', সে-স্থলে শুধু নিন্দিত নহে, দণ্ডার্হও বটে। তবে যদি কেহ বলেন—উহা ত' আত্মপ্রতারণা। তদুত্তরে বলিব—ঐরূপ আত্মপ্রতারণা কয়জন করিতে পারে? পৃথিবীতে তাদৃশ সংযমের অধিকারী কয়জন? বলা বাহুল্য, ঐরূপ আত্ম-প্রতারণা সমাজের ও নিজেদের মঙ্গলার্থে অবশ্য কমনীয়। আর, যে ক্ষেত্রে প্রেমিক-যুগল নির্ভীকভাবে, প্রকাশ্যে সর্ব্ববাধা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মসঙ্গতভাবে মিলিত হইল—সেই ক্ষেত্রে তাহাদের প্রেম বিশ্বপূজিত।

এই যে আজি পথে-ঘাটে, ছাদে-বাতায়নে, গল্পে উপন্যাসে, সিনেমা-রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ছড়াছড়ি দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রেমের নামগন্ধও নাই। প্রেম এত 'সুলভ' নহে, প্রেম করিবার অধিকারী এত সহজে হওয়া যায় না। যে-শিক্ষা, যে-বিনয়, যে-ভদ্রতা, যে-বিশ্বাস, যে-উদারতা, যে-ত্যাগ—সর্ব্বোপরি যে-সংযম প্রেমের মন্ত্র জপিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সে-সাধনা প্রেমিকের কষ্টের নহে। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার সম্বন্ধে যদি আমার এ-বিশ্বাসই না রহিল যে, সে যেখানে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন; সে আমারই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেখানে ভালবাসা নাই। তাই প্রেমের বা ভালবাসার অপর নাম—বিশ্বাস। এবং সেই স্পর্দ্ধাতেই বলিব—বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল বা তুলসীদাস শ্রেষ্ঠ প্রেমিক স্বীকৃত হইলেও, যথাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ভোগেচ্ছা, চাঞ্চল্য, উন্মত্ততা ও মোহ আমার প্রাণে ব্যথার সঞ্চার করে। অথবা আমার মনে হয়, পরবর্ত্তী লেখকরা নিজেদের রুচি-অনুসারে তাঁহাদের বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রেমের মধ্যে ব্যাকুলতা বা তীব্রতা লোভনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে—এমন কি, প্রেমের অঙ্গ বা ভূষণ বলিনাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই, কিন্তু উহা চাঞ্চল্যরহিত হওয়া প্রয়োজন। তাই বলিতেছিলাম—লালসা, চাঞ্চল্য, উদ্ভ্রান্ততা বা মোহ—প্রেম নহে। পরন্তু, ভোগেচ্ছারহিত্য; ধীরতা; স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্যই প্রেমের কমনীয় ও রমণীয় ভূষণ। ধর্ম্মসঙ্গতভাবে মিলিত হইবার পর ভোগেচ্ছা আসুক, কিন্তু ধীরতা, স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য যেন অন্তর্হিত না হয়। আবার, ইহাও সত্য যেখানে চাঞ্চল্য বা ব্যাকুলতা নাই, সেখানেও প্রেম নাই। কিন্তু সে-ব্যাকুলতা শুধু নিজের কাছে, বড় জোর, সখা বা সখীর কাছে—অন্যের কাছে নহে। প্রেমাস্পদকে সে-ব্যাকুলতার কথা জানাইতে ইচ্ছা হইবেই,

সুতরাং তাহাকেও জানাও, আপত্তি নাই ; এমন কি, লাভ ছাড়া লোকসান নাই। কিন্তু সাবধান! যদি ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে মিলিত হইবার পথ উন্মুক্ত থাকে, তবেই, নতুবা নহে। এবং সেই হিসাবেই আমি বলিতে চাহি—"প্রতাপ" বা "আয়েষা"র ভালবাসিবার অধিকার আছে, কিন্তু 'শিবনাথ' বা 'কিরণময়ী'র নাই। অধিক কি; ঐ সব কারণেই হরপার্ব্বতীর প্রেমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 'মদনভস্মের' প্রয়োজন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য; 'কুমারসম্ভব'মহাকাব্যে মদনভস্ম রূপকমাত্র; এবং 'প্রেম'কে 'কাম'হীন কবিবার জন্যই কামনাশের প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার স্থান-কাল ও পাত্র হিসাবে নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতাও প্রেমের ব্যাপারে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে একাধারে প্রেমিক-প্রেমিকার, তাহাদের অভিভাবকদের ও সমাজের যথেষ্ট উদারতারও প্রয়োজন। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আদর্শা সতী সাবিত্রী। তাই আজিও সাবিত্রীর প্রেম ঘরে ঘরে পূজিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আধুনিক সমাজ নিজের অজ্ঞাতসারেই সাবিত্রীর প্রেমের পূজা দিতেছে। আজি যদি কোন কুমারী সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করে, তাহার নিন্দার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না, বা অভিভাবক ও সমাজও তাহার সমর্থন করিবে না। কিন্তু সত্য ও সুন্দরের এমনই প্রভাব যে, সে তাহার পূজা নিজ শক্তিতেই আদায় করিয়া লইতেছে। অনুরূপ কারণেই আজি 'মহুলা,' সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, চিন্তা, দময়ন্তী প্রভৃতি সকলকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

প্রিয় প্রিয়ার নিকট বা প্রিয়া প্রিয়ের নিকট যে কি বস্তু, তাহা বুঝাইবার ভাষা আজিও সৃষ্ট হয় নাই—জগতের সকলের নিকট সে গুণহীনা ও কুৎসিৎ হইতে পারে, কিন্তু প্রিয়ের নিকট তাহার অপেক্ষা সুন্দরী ও গুণবতী আর কেহই নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি যতই ব্যাখ্যা করা যাউক না কেন, তথাপি কিছুই বলা হয় না, বলিয়া মহাকবি বলিয়াছেন, "তৎ হি তস্য 'কিম'পি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়জনঃ"—অর্থাৎ যে যাহার প্রিয় সে তাহার নিকট এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। প্রিয়ের জন্য বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-বরণে সেই সুখ পায় যে যথার্থ প্রেমিক; কিন্তু, নীরবে হওয়া চাই—তাহার জন্য ঢাক পিটাইবার প্রয়োজন নাই, এমন কি দয়িতার নিকটও অপ্রকাশ্য রাখার সংযম আবশ্যক।

আবার প্রেমের পথও সরল নহে—বিশ্বের যাবতীয় বিঘ্ন আসিয়া স্বতঃই উপস্থিত হয়। সত্য বটে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, বাল্যপ্রণয়ে না কি অভিশাপ আছে; কিন্তু আমি বলিতে চাহি যেখানেই প্রকৃত প্রণয় সেইখানেই অভিশাপ। তাই প্রেমের বিঘ্নসঙ্কুল পথে বিচরণ করিতে হইলে যে, কতখানি সংযম ও ধীরতার প্রয়োজন, তাহা সহসা অনুমান করিয়া উঠা যায় না। আত্মত্যাগী ভিন্ন প্রেমের মহিমাও কেহ বুঝে না বা তাহার মূল্যও দিতে পারে না। আর, কে না জানে যে, প্রেম অমূল্য। প্রেমিকের নিকট জীবনও তুচ্ছ; তাই আজিও প্রেমের মূল্য নিরূপিত হয় নাই। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় প্রেমিকের একমাত্র সম্বল অশ্রু। সেই জন্যই বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিতে সম্মত আছি; কিন্তু যে কখনও নির্জ্জনে কাঁদে নাই, তাহার সহিত প্রণয় করিতে সম্মত নহি। নির্জ্জনের অশ্রু! বিশ্ববাসী বিশ্বের সকল সম্পদ্ ভোগ করুক, আমায় জন্য শুধু 'নির্জ্জনের অশ্রুই' থাকুক। সার্থক বটে তাহার জন্ম, ধন্য বটে তাহার জীবন যে এ জগতে ভালবাসিতে পারিয়াছে বা ভালবাসা পাইয়াছে।"

আর "কাম" অর্থে শুধু যে ইন্দ্রিয়-কামনা-চরিতার্থতাই বুঝায় তাহা নহে, "কামে"র শব্দগত অর্থ—কামনামাত্রই। সুতরাং কামহীন মানব বিরল। দুঃখে "অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ" ব্যক্তি কয়জন? সেই নির্ব্বিকার, কূটস্থ, আত্মভোলা যোগীকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া রক্তমাংসে গঠিত মানব আমি শুধু এইটুকুই দেখিতে ও পাইতে চাহি যাহা "নিন্দিত" নহে। কারণ, সেই কামহীন প্রেম—বোধহয়, যোগীরও সাধ্যায়ত্ত নহে—কারণ, তিনিও পরমাত্মাকে "পাইতে" চাহেন! এবং সেই কারণেই দেখিতে পাই—দেবাদিদেব মহাদেবও তপস্যা করিতেছেন—"কেনাপি কামেন"। যাহাই হউক, আমার প্রবন্ধে আমি সেই "কাম"কে বিষয়ীভূত করিতে চাহি নাই। আমি, প্রেমের পার্শ্বে যে কামের কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহা ইন্দ্রিয়বাসনাচরিতার্থতাকেই লক্ষ করিয়া। সুতরাং আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—কাম—কাম, প্রেম নহে। সুতরাং প্রেম সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার পরে কামসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

গুহাভিমুখে !

[দি উইক্‌লি বসুমতী হইতে

চক্ষুর নিমিষে

১৮ই নভেম্বর তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় মিঃ গান্ধী লিখিয়াছেন—"কংগ্রেসের যুগপৎ দুই প্রকার কারকতা আছে। শান্তিকালে উহা জনগণের প্রতিষ্ঠান; যুদ্ধকালে উহা অহিংস সেনাদলে পরিণত হয়।"

বিজয়ী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

অনিন্দিতা—অমরার ফুল

বছর দুই কৈকেয়ীর প্রায় তীর্থে ঘুরিয়াই কাটিল। একবার এক তীর্থে একটি মেয়ে পাইলেন—ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, নাম জানকী। অনাথা মেয়েটি এক দুর্দ্দান্ত আত্মীয়ের ঘরে দারুণ কষ্টে দিন কাটাইত। সেই আত্মীয়টির পাশের বাড়ীতেই কৈকেয়ী থাকেন। দিন-রাত বালিকার মলিন মুখখানা তাঁহার চোখে পড়ে, চাহিবামাত্র আত্মীয়টি জানকীকে দিয়া দিল। জানকীর পিতৃ-সম্পত্তি ছিল সেই আত্মীয়ের হাতে। সে সব কৈকেয়ী ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, জানকীকে পাইয়া তাঁহার মন জুড়াইল।

জানকী যেমন সুন্দরী তেমনই জেদী ও রাগী। কেশবের সঙ্গে সমান করিয়া কৈকেয়ীকে দখল করিল, বয়সে কেশবের ছোট, কিন্তু কেশবের নাম ধরিয়া ডাকে। কেশব বলে 'দিদি।' ভুলিয়া কখনও 'জানকী' বলিয়াছে তো বাধিল খণ্ডপ্রলয়। সে দুর্দ্দম রাগ ভাঙ্গায় কার সাধ্য!

কৈকেয়ী বলিলেন, "ও তোর দিদি হয় কেশব, দেখতে তোর চেয়ে লম্বা। কেমন সুন্দর দিদিটি, ছোট ভাই হওয়াই ভাল। দিদি কত ভালবাসে, আদর করে।"

কেশব জানকীর দাপটে অস্থির, বিবাদ মিটিলেই বাঁচে। তৎক্ষণাৎ মায়ের ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া জানকীকে খুশী করিল।

ক্রমে জানকী বড় হইল, রূপও বাড়িল—দেবীর মত উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় রূপ, চাহিলে চোখ ধাঁধিয়া যায়। লোকে বলে, মায় মেয়ে, যেমন মা তেমনি মেয়ে। মেয়েটা আবার মায়ের চোখের মণি। সুযোগ্য ক্ষত্রিয় ছেলে খুঁজিতে দেবনাথ পশ্চিমাঞ্চল চষিয়া ফেলিলেন। জুটিলও ঠিক মনের মত গণ্ডা কয়েক। সেইগুলি হইতে বর বাছাই হইতেছে, এহেন কালে দুর্দ্দান্ত মেয়েটা ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল: "বিয়ে করব না।"

কৈকেয়ী মেয়ে লইয়া মত্ত, মেয়ের চালচলনটা দেখেন নাই মন দিয়া। সে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, পূজা করে, রামায়ণ পড়ে। চুল বাঁধিতে চায় না। কৈকেয়ীর গুরুদেব আসিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করে। বাড়ীর লোকে জানকীকে ভীষণ ভয় করে, কৈকেয়ীর চেয়ে বেশী। মেয়েটা যেন কোন এক সুদূর লোকের নিবাসিনী, ভুলিয়া পৃথিবীতে নামিয়াছে।

কৈকেয়ী মেয়ে-জামাইয়ের দান-যৌতুকের ফর্দ্দ করিতেছেন, বিবাহ প্রায় ঠিক—জানকীর সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা: 'মানুষের বাঁদী হব না।' কিছুতেই তাহার পণ ভাঙ্গান গেল না। কৈকেয়ী সুখী ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "থাক্ তবে আমার কাছেই থাক্।"

আনন্দে জানকী কৈকেয়ীর কোলে চড়িয়া বসিল। হাসিয়া বলিল, "তাই তো রইলাম—তুমিই পর করে দিতে চাইছিলে। তুমি সৎমা—তা বলে আমি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি?"

তারপরে জানকী গেরুয়া রং করা সাড়ী পরা ধরিল। হাতের কঙ্কণ, গলার হার খুলিল না বটে, কিন্তু সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত সন্ন্যাসিনী হইয়া গেল। অনাথা হইয়া শিশুকালে মানুষের যে নির্ম্মম ব্যবহার সহিয়াছে—সেই অবস্থায় হয়ত বা মনের কোণে তীব্রবৈরাগ্যের ছায়া পড়িয়াছিল। কালে সেই বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিল। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়-বালার দৃঢ় চরিত্রে কৈকেয়ী মুগ্ধ—সে তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না, সেই যেন হইল কৈকেয়ীর মা। সকলে কৈকেয়ীকে ভয় করে। কৈকেয়ী ভয় করেন জানকীকে। তাঁহার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্ষোভ দূর করিয়া সে বাড়ীখানাকে উজ্জ্বল করিয়া ফুলের মত ফুটিয়া রহিল, অমর ফুল, যে ফুল ঝরিয়া পড়ে না—মলিন হয় না, চিরকাল ধরিয়া শোভা ও সুগন্ধ বিলায়। জানকীর মুখের রামায়ণ গান, হিন্দী দোঁহা কৈকেয়ীর মনে অমৃত ঢালিয়া দেয়। অমৃত ঢালে সকলের কানে। কিন্তু সে গান শোনা বড় দুর্ল্লভ ব্যাপার—যখন ইচ্ছা হইবে তখন জানকী গায়। অন্যথা মাথা কুটিয়া মরিলেও সে শুনিবে

না। নিতান্ত আত্মীয়েরা ভিন্ন সকলেই জানে জানকী কৈকেয়ীর মেয়ে।

ছায়ারূপিণী

এণ্ট্রান্স পাশ করিলে কেশবের বিবাহ হইল।

বধূ রুক্মিণী এগার বছরের মেয়ে। কেশব কলিকাতায় কলেজে পড়িতে গেলেন। অত ছোট মেয়ে মানুষ করিবার ধৈর্য্য তখন কৈকেয়ীর নাই—বৌকে তিনি প্রায়ই বাপের বাড়ী রাখেন। দেবনাথ সেটা পছন্দ করেন না—প্রায়ই তিনি নিজে গিয়া রুক্মিণীকে লইয়া আসেন।

বউটি যেমন কোমলস্বভাব তেমনই ভীরু—লজ্জাবতী লতার মত আপনাকে কেবলই লোকের চোখের আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে চায়। কৈকেয়ী তাহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন—সে কৈকেয়ীর সেবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়।

লোকে বলে, "এই শাশুড়ীর কি এই বউ? গেরস্ত ঘর হলে মানাত।"

কৈকেয়ীর আশার মূলে কুঠার পড়িল। বলিলেন, "এ কি বউ এনে দিলে ঠাকুর-পো? কোথাকার কোন্ জঙ্গলি ঘরের মেয়ে!"

"অমন কথাটি বলবেন না বৌ-ঠাকরুণ, নারাণগঞ্জের ভাস্কর রায়ের মেয়ে।"

"তা হোক—মেয়ে তেমন নয়। এই ঘরে কি এই বৌ সাজে?"

"শিখিয়ে নিন্। খাঁটি জিনিস এনে দিয়েছি—এখন গড়ে নেবার ভার আপনার।"

অবজ্ঞার সঙ্গে কৈকেয়ী বলিলেন, "আমি হার মেনেছি, এ কিছু শিখতে পারবে না।"

"অত হতাশ হবেন না। মা, রূপে গুণে লক্ষ্মী। শুনতে পাই—আপনাকে প্রাণ দিয়ে সেবা যত্ন করেন।"

বিরক্ত হইয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "আমি তা চাইনে। আমি যা চাই, এ তা দিতে পারবে না।"

বিয়ের তিন বছর পরে কৈকেয়ী পৌত্রের মুখ দেখিলেন। তাঁহার তিক্ত বিরক্ত মন অনেকটা প্রসন্ন হইল পৌত্রকে কোলে পাইয়া এবং বিবাহের তিন বছর পরে—এত দিনে রুক্মিণীর উপর কিছু স্নেহের সঞ্চারও হইল।

কলেজের পড়া শেষ করিয়া অনেকগুলি উপাধি লইয়া কেশব ঘরে ফিরিলেন। দেখা গেল, ছেলের স্বভাবের মধ্যে পিতার স্বভাব ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কি জমিদার? কেশব ভবানীরই মত, তেমনই বিলাসহীন, তেমনই উদার। একটি কঠিন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না—সেই চালাইবে জমিদারী? তাহারই আশায় কৈকেয়ী আছেন। নিজের কাজ বুঝিয়া লইয়া সে মাকে অবসর দিবে, না সে বসিল সাহিত্যচর্চ্চা করিতে!

আবার কৈকেয়ীর অতি সাধে বাদ ঘটিল। তখন স্বাভাবিক দর্প ও অভিমানের সঙ্গে বলিলেন, "কারও দরকার নেই...আমিই দেখব সব। বাবা জেনেছিলেন—বলেছিলেন। আমি বিশ্বাস করিনি।"

কেশব ও রুক্মিণীর উপর হইতে কৈকেয়ীর মন একেবারে ফিরিয়া গেল। পৌত্র আনন্দকে লইয়া তিনি আলাদা হইয়া গেলেন।

চৌধুরী বাড়ীতে আর একটি পরিজন আছে। কৈকেয়ীর এক মাসতুত ননদের মেয়ে।—সম্পর্কে ভাগ্নী, স্বামীর সঙ্গে শিলং-এ থাকিত, স্বামীটি বড় প্রচণ্ড স্বভাব—বড়লোক আত্মীয়ার সঙ্গে মোটেই কুটুম্বিতা করিতে চায় না।—আত্ম-মর্য্যাদার জন্য নহে—সে আশা করিয়াছিল জমীদার-ঘরের নিয়মানুসারে সে একটা মোটা মাসহারা পাইবার যোগ্য। কৈকেয়ী সেটা দরকার মনে করেন নাই। সুতরাং সে বিষম চটিয়া গিয়াছিল। কৈকেয়ীও আর কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। এতদিন পরে সেই ভাগ্নীটির মেয়ে প্রতিমা বিরোধটা মিটাইল। বাপ তো মাতৃহীন মেয়েটিকে বিবাহ দিয়াই শ্বশুর-বাড়ী বিদায় করিয়াছে, নিজে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে লইয়া শিলং থাকে—প্রতিমার খোঁজ আর নেয় না। প্রতিমার শ্বশুর-বাড়ী কৈকেয়ীর সীমানার মধ্যে। খবর পাইয়া রুক্মিণী দুঃখিনী মেয়েটিকে কোলে টানিয়া লইলেন। প্রতিমার শাশুড়ী আবার কৈকেয়ীর একজন বাল্য-সখী। প্রতিমার স্বামী সুরেশ ছেলেটি ভাল—তবে অবস্থা ভাল নয়।

চৌধুরী-বাড়ীর পরিজন এই। প্রাচীন জমিদার ঘরে

আশ্রিত আত্মীয় থাকে অসংখ্য। কৈকেয়ীর সংসারে সেটা একেবারেই নাই। যাহারা আশ্রয় না নেয় তাহারা মাসিক সাহায্য পায়, সেটাও কৈকেয়ীর নাই। দরকার হইলে তিনি বাড়ী তৈরী করিয়া দেন, বিপদে পড়িলে উদ্ধার করেন, অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ দান করেন। কিন্তু নিয়ম করিয়া মাসিক সাহায্য দেন না, আর দেন না স্থায়ী ভাবে চৌধুরী-বাড়ীতে আস্তানা গাড়িতে। তাঁহার মতে সেটা দুই পক্ষেরই ক্ষতিকর। কাজেই ক্রিয়া-কর্ম্ম ছাড়া চৌধুরী-বাড়ীতে বড় কেহ আসে না।

কৈকেয়ীর কাজের প্রতিবাদ করা কাহারও সাহসে কুলায় না, আড়ালে অনেকেই নিন্দা করে। মিত্রেরা তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু সে সমস্ত আলোচনা কৈকেয়ী তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করেন—ঘৃণা করেন।

সংসার-বন্ধন

আনন্দ কৈকেয়ীকে ষোল আনা দখল করিয়াছে, তাহাকে লইয়া কৈকেয়ী সুখীও, দুঃখীও। কেশবের দিক্ দিয়া একটা বিষয়ে কৈকেয়ী নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, কেশব সকলের সঙ্গে মিশিবার অবসর পাইতেন না, নিজের লেখা-পড়া লইয়াই মগ্ন। কিন্তু আনন্দ যাচিয়া সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সব জায়গায় অবাধে যাওয়া আসা করে, মান-মর্য্যাদার দিকে কোন লক্ষ্য নাই। কৈকেয়ীর হাতে মানুষ হইয়াও কেমন করিয়া যেন ভিন্ন স্বভাব ধরিয়া উঠিল। লেখা-পড়ায় ভাল, চৌধুরীদের হাই স্কুলের মাষ্টারেরা ভাল বাসেন, সে দিক্ দিয়াও বলিবার নাই। আনন্দ সাঁতার কাটে, কুস্তি লড়ে, ব্যায়াম করে। চিড়িয়াখানার ঝোঁক—পশু পক্ষী কিনিবে না, নিজেরা ধরিবে। এই উদ্ভট আব্দার রাখিতে কৈকেয়ীকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। এ জিনিষটা তিনি পছন্দও করিয়াছেন খুব। প্রতাপ চৌধুরীর পরে শিকারের কথা লোকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। দেবনাথের ভাই-পো আনন্দের বন্ধু এবং সাহসী। আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল। দিব্য এক চিড়িয়াখানা গড়িয়া উঠিল। পক্ষীরা আপনি আসিয়া বাসা বাঁধিল। ভাম, খট্টাস, সজারু হইতে হরিণ, বাঘ, কুমীর পর্য্যন্ত নানা জায়গা হইতে ধরিয়া ধরিয়া আনা হইল। আনন্দের জলহস্তী নাই, সিংহ নাই, সিন্ধু-ঘোটক নাই, সে জন্য তার দুঃখ নাই। সে সব তো এদেশের জন্তু নয়। কিনিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে তা চায় না।

থিয়েটার-যাত্রা দেখিতে অসাধারণ সখ, বার বছরের ছেলে অজ্ঞান হইয়া গীতাভিনয় শোনে। নাটকের চেয়ে গীতাভিনয় তার ভাল লাগে বেশী। ঐ যে অম্বরীষ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ কেমন অসমসাহসী, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভক্তি, নিয়তি, মায়া,—সেই সব অপূর্ব্ব চরিত্র নাটকে কই?

তখনও যাত্রার আদর ছিল, পূজার সময় ও বৈশাখী উৎসবে নাম-করা যাত্রার দল আসে। থিয়েটারের সখটা প্রতাপ চৌধুরীর তো ছিলই, ভবানীরও ছিল। কেশবও ছেলেবেলায় উৎসাহী ছিলেন। স্কুলের মাষ্টার ও পণ্ডিতেরা এবং কর্ম্মচারীরা মিলিয়া থিয়েটার করেন। থিয়েটারের সময় আনন্দ আহার-নিদ্রা ছাড়ে।

অল্প বয়সের উৎসাহ, তায় আনন্দ একটু বেশী প্রাণবন্ত ছেলে। তবু কৈকেয়ী কি চান? তিনি যা চান আনন্দের মধ্যেও বোধ হয় সেটা নাই। তিনি চান, দ্বিতীয় প্রতাপ চৌধুরী, উপাধিহীন রাজা, মুকুটহীন সম্রাট—দুপুর বেলার সূর্য্যের মত তেজীয়ান্ দর্পে, গর্ব্বে, ক্ষমতায় দাপরে ক্ষত্রিয় রাজ।

মনের ক্ষোভ চাপিতে না পারিয়া কৈকেয়ী স্পষ্টই বলেন, "আমার শ্বশুরের নাম তোরা আর রাখতে দিবিনে একটাও যদি মানুষের মত হলো।"

আনন্দ বলে, "দিদি, সবাই বলে আমি না কি তোমার শ্বশুর, আবার তোমার কাছে এসেছি?"

"ইস্! কে বলে? বাবা ছিলেন রাজর্ষি এই তুচ্ছ সম্পত্তির লোভে আবার আসবেন না কি?"

"তবে আমি কে? তোমার সাহেব বাবা?"

কৈকেয়ী হাসিয়া উত্তর দেন, "না। আমার বাবা শেষে মহর্ষি হয়ে গেছলেন, তিনি কেন পরের সংসারে আসতে যাবেন?"

কৈকেয়ীর জন্য আনন্দকে গলায় হার পরিতে হয়, ভাল ভাল পোষাক পরিতে হয়। সমস্ত সাধ তিনি আনন্দকে দিয়া মেটান। ভবানী, কেশব, জাহ্নবী, রুক্মিণী কেহই তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারেন নাই।

রুক্মিণী একদিন আনন্দকে রাহুল সাজাইয়া দিলেন, বালক-সন্ন্যাসী বেশে আনন্দ কৈকেয়ীর কাছে ভিক্ষা-পাত্র হাতে গিয়া দাঁড়াইল, কৈকেয়ী ভীষণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এ সাজ তোকে কে পরালে?"

"মা।"

"তা বুঝেছি, তোর মার যেমন বুদ্ধি, ছেলের হাতে ভিক্ষের ঝুলি দেবেন বৈ কি। যা খুলে ফ্যাল্।"

"তা বলবে বৈ কি, পিসীমা যে পরে, তা কৈ কিছু বল না? আমি পরেছি, কি না তাই!"

"খোল আনন্দ, আমার চোখে কাঁটা বিঁধছে।"

আদুরে আনন্দ ঠোঁট ফুলাইয়া পলাইল।

ষোল বছরে পা না দিতে দিতে কৈকেয়ী আনন্দের পাত্রী খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। খবরটা পাইয়া গিরিরাজ মিত্র নিজের দৌহিত্রীর সঙ্গে আনন্দের বিয়ের প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন।

শ্রীনগর হইতে সহর এক মাইল দূরে। সহরে ঢুকিবার পথের কিছু দূরে মিত্রদের প্রকাণ্ড, পুরানো ছাঁদের বাড়ী দুর্লঙ্ঘ্য প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। দুই বংশের সীমানা পাশাপাশি—সুতরাং বিবাদ-বিসংবাদেরও বিরাম নাই—আবার আসা-যাওয়া লৌকিকতা-ভদ্রতাও আছে। মন বিদ্বেষে ভরা—প্রকাশ্য সৌজন্যের ত্রুটি নাই।

গিরিরাজের দৌহিত্রীটিকে কৈকেয়ী ছেলেবেলায় একবার দেখিয়াছিলেন। বেশীর ভাগ কলিকাতাতেই তারা থাকে। বিবাহের জন্যই আসিয়াছে বোধ হয়। দেবনাথ দেখিতে গেলেন।

মেয়েটি বেশ সুন্দরী, তবে চোখ দুটি পিঙ্গল। মেয়ের মা-বাবা বড় আধুনিক, তাঁহাদের যত্নে মেয়েটির চুলগুলিও কটা হইয়া উঠিয়াছিল—সাজ-সজ্জা ও শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালার মেয়ে বলিয়া চিনিতে পারা কঠিন।

কৈকেয়ী বলিয়া পাঠাইলেন—আনন্দের জন্য একটি বাঙ্গালী মেয়েই দরকার—মেম সাহেব কি বাঙ্গালীর ঘর করিতে পারিবেন? সেটা কোন দিকেই সুবিধা হইবে না, অতএব—

এইটি দ্বিতীয় প্রত্যাখান। গিরিরাজের জ্বলন্ত ক্রোধ আকাশ ছুঁইবার জো করিল।

আসল কথা পিঙ্গল-নয়না কন্যা তাঁর পছন্দ নয়—দ্বিতীয়, মেয়েটির বয়স চৌদ্দ, অত বড় মেয়ে তিনি চান না।

গিরিরাজ নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া সুগন্ধি ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে কৈকেয়ীর সমালোচনা করেন: "যশোবন্তের রাণীর মত হুকুম—'সেনাপতি দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর'—অর্থাৎ কি না গরীব আত্মীদের বাড়ী ঢুকতে দিয়ো না। সেনাপতি তো ঐ দেবনাথ। তালপাতার সেপাই, এক সের দুধে দিন কেটে যায়। তবে সৈন্যগুলি যোগাড় করেছে ভাল—এক এক ব্যাটা যেন এক এক পাহাড়—দিনে দিনে দল বেড়েই চলছে, লুট-পাট করবার মতলব আছে না কি কিছু? ওদের যোগাড় করে কোত্থেকে হে?"

একজন মোসাহেব বলিল, "আজ্ঞে উনি তো প্রায়ই তীর্থে বেড়ান। পশ্চিম থেকেই আনেন।"

পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা

ষষ্ঠীতলা হইতে ফিরিয়া কৈকেয়ী বসিবার ঘরে গিয়া ঝিকে বলিলেন, "ঠাকুরপোকে ডেকে আন।"

ঘরটির দুয়ারে সাদা পর্দ্দা, চারি কোণে চারিটি বড় আলমারী, মাঝখানে চেয়ার টেবিল। দেয়ালে বড় বড় ছবি। কার্য্যতঃ এটা কৈকেয়ীর অফিস—এখানে কাজ কর্ম্ম করেন—কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন। ইহার পাশের ঘরটি খুব জমকাল রকমে সাজানো। সেটি বাহিরের লোক-জনের সঙ্গে দেখা করিবার ঘর। দুই ঘরের মাঝের দরজাটি বন্ধ আছে।

দেবনাথ ঘরে ঢুকিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন, "বসো।"

টেবিলের উল্টা দিকের চেয়ারে বসিয়া দেবনাথ বলিলেন, "বলুন।"

"বিরাট রাজরাণীকে দেখে এলাম।"

দেবনাথ চুপ করিয়া অপেক্ষায় রহিলেন।

"কি বলব বল দেখি?"

"বোধ হচ্ছে নতুন কোন কথা।"

"হ্যাঁ—ষষ্ঠীতলায় যা দেখে এসেছি ভুলতে পারছি নে।

দেখলাম তাকে রাজপুত্র লক্ষ্মণ—জানলাম সে রাজকন্যা, নামে সে বিরাটের রাণী।"

এবার দেবনাথের মুখে হাসি দেখা দিল, বলিলেন, "কিছু কিছু বুঝছি যেন।"

"শোন বড্ড ছোট্ট সে—এতটুকু মেয়ে—কি সে মুখ তার। আমার এত ভাল লেগেছে, কি বল্‌ব, হয়ত' তোমরা তাকে সুন্দর না বল্‌তেও পার—অনেকেই হয়ত বলেব না—কারণ—বৌমারটির মত রং, চেহারা নয়।"

দেবনাথ একটু গর্ব্ব ও আত্মপ্রসাদের সঙ্গেই বলিলেন, "যখন মা' লক্ষ্মীকে এনে দিয়েছিলাম, তখন তত পছন্দ করেন নি।"

"সে তার স্বভাবের কথা বলেছিলাম। নইলে বৌমার মত সুন্দরী আজও আমার চোখে পড়ে নি। এ মেয়েটি তেমন কিছুই নয়, তবু কেন এত ভাল লাগল বুঝতে পারছিনে। কি সুন্দর চেয়ে থাকে, দেখলে আর চোখ ফিরান যায় না।"

"কার মেয়ে?"

"তা জানি নে, জিজ্ঞাসাও করি নি। তুমি খোঁজ নাও। বাপ-মা নেই, তাব দাদা বষ্ঠীতলার স্কুলে মাষ্টারী করে। মেয়েটার নাম জানি। সুন্দর নাম, সুদেষ্ণা। সুদেষ্ণা বোস।"

"ও, তাই বিরাটরাণী বলছিলেন?"

"হ্যাঁ, তুমি ব'লো পণ্ডিত মশাই কাল তাকে দেখ্‌বেন, যদি ঠিকুজী মেলে, একে ঘরে আনবই।"

রাত্রি প্রায় দশটা। কৈকেয়ী কাগজপত্র দেখিতেছেন, দেবনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কাজ উদ্ধার করে এলাম।"

"সত্যি? মেয়েটিকে দেখেছ ত?"

"না, সে আপনিই তো দেখেছেন। কথাবার্ত্তাটা বললাম, বোধ হয় তাদের অমত হবে না।"

কৈকেয়ীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, "তাদের আবার অমত? এ কি বামনের চাঁদে হাত নয়?"

"বিনোদ বোসের বেশ আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে দেখলাম, নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে জানাতে সঙ্কোচ নেই। চোখ দুটি ভারি উজ্জ্বল, জেদী চেহারা। চোখে মুখে প্রতিভার আলো জ্বলছে।"

সুদেষ্ণার মুখ কৈকেয়ীর মনে পড়িল, এ যেন তারই বর্ণনা, অলক্ষ্যে ভাই-বোনে সাদৃশ্য আসে। বলিলেন, "মাষ্টারী করছে ত?"

"অদৃষ্টের লেখা। নইলে যেটুকু বুঝলাম, সত্যিকার একজন শিক্ষিত লোক।"

"বাসুদেবপুরের জন্য ঠিক এমনি একটি লোক পেলে মহালটা ঠিক হতো।..."

"অনায়াসেই একে পেতে পার। কি বললে সে?"

"বললে, আমার স্ত্রী বোনটিকে মানুষ করেছে—তার মত জেনে আপনাকে জানাব।"

একটু বিরক্ত ভাবে কৈকেয়ী বলিলেন, "নিজে আসবে ত?"

"না। বললে স্কুল আছে—চিঠি লিখে পাঠাবে।"

"বটে! নিজে এলে কি মানহানি হয়?" কৈকেয়ী বিরক্ত হইয়াছেন—খুসীও হইলেন। বোনটির ভায়ের মত স্বভাব হওয়াই সম্ভব।

"তবে পণ্ডিত মশাই দেখতে যাবেন সকালে কেমন—তাতে আপত্তি নেই ত'? পণ্ডিত মশায়ের কাছে না শুনে আমি ঠিক করতে পারিনে।"

"না—তা নেই। সে আমি বলেছি। বললে বেশ দেখুন তিনি তার পরে যা হয় ঠিক করবেন। বিয়ের আগে দেখা-শোনা অনেক হয়, সেটা ত নিয়মই।' তবে বিনোদ বোসকে আমার সত্যি ভাল লেগেছে, সে আপনি যা বলুন। বড়লোকের সঙ্গে মাখামাখি করবার ইচ্ছা মোটেই নেই—সুন্দর সহজ সবল স্বভাবটি।"

পরের দিন সন্ধ্যায় জপ ও আহ্নিক সারিয়া কৈকেয়ী পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখেন, বিন্দু দাসী দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল, "পণ্ডিতমশাই এসেছেন।"

বসিবার ঘরে পণ্ডিত মশাই বসিয়া আছেন, ইনি চৌধুরীদের হাইস্কুলের পণ্ডিত। মনখোলা, সদাচারী প্রফুল্ল স্বভাবের লোক, বেশীর ভাগ সময় কাটে জ্যোতিষ-চর্চ্চা করিয়া। থিয়েটারে পণ্ডিত মশাই মুনি ঋষি সাজেন। বয়স হইলেও সখ আছে অসামান্য।

কৈকেয়ী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের আসনে বসিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, "মা, আমি ওবেলা দশটার আগেই আপনার কাজ শেষ করে এসেছি। স্কুলে একটু কাজ ছিল বেশী, তাই এত দেরি হয়ে গেল।"

"তা হোক। সন্ধ্যাহ্নিক সেরে এসেছেন ত?"

"হ্যাঁ। ওই কাজটি বাকী রেখে আমি বেরুতে পারি নে মা।"

"কি রকম দেখলেন?" কৈকেয়ীর মনটা একটু কাঁপিল।

"আমার যা সামান্য বিদ্যা, এইটুকু আমি বলতে পারি যে, এই কন্যা ঘরে আনলে কোনদিন কষ্ট পেতে হবে না।"

কৈকেয়ীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "সব বলুন—"

"সূর্য্যোদয়ের পরই গিয়াছিলাম, বাইরের ঘরে বিনোদ বাবু কন্যাটিকে পড়াচ্ছিলেন। ম্যানেজারের কাছে আগেই জেনেছিলেম, পরিচয় হল, প্রণাম করলেন, ভগ্নীকে বললেন, প্রণাম করতে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে আমায় প্রণাম করে দাঁড়াল। আমি এমন পদ্মিনী জাতির মেয়ে খুব কম দেখিছি মা। আহা! কুমারী মাতা। মনে হল আমিই প্রণাম করি। কোলে নিলাম—কুমারী কন্যা সকলের প্রণম্য—তায় এমন সর্ব্বসুলক্ষণা কুমারী।"

"আমি এখন কাউকে জানাই নি—আচ্ছা মেয়েটির চেহারা কেমন লাগল আপনার?"

ঈষৎ হাসিয়া পণ্ডিত বলিলেন—

"পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা, বালসূর্য্যসমপ্রভা—
বিশালনেত্রা বিম্বোষ্ঠী সা কন্যা লভতে সুখম্।"

কৈকেয়ী চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "কি বললেন? আবার বলুন।"

পণ্ডিতমশাই বলিলেন, "কিংবা—

স্নিগ্ধকেশী বিশালাক্ষী সুস্থা ধীরা মৃদুস্বনা,
সুমুখী সুগুপ্তা কন্যা তাং কন্যাং বরয়েদ্ বুধঃ।

কৈকেয়ী বলিলেন, "ঠিক আপনি সত্যি বলছেন, পণ্ডিত মশায়—আমার মনে হচ্ছে তাকে দেখেই যেন ঐ শ্লোকগুলি লেখা হয়েছে, 'স্নিগ্ধকেশী'ই বটে! যেমন মেঘের মত রং চুলের, তেমনি কোঁকড়া—"

পণ্ডিতমশাই হাসি মুখে আবার বলিলেন,—

কেশা অলিকুলচ্ছায়াঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সুকোমলাঃ,
কিঞ্চিদা কুঞ্চিতাগ্রাশ্চ কুটিলাশ্চাতি শোভনাঃ।

কৈকেয়ীর মুখে একটু স্নেহের হাসি ফুটিল। বলিলেন, "সন্তান-যোগটা?"

"দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে এইটুকু দেখেছি। কন্যার জন্মের ক্ষণ, তারিখ এনেছি, একটা ঠিকুজী করে নিই, পরে সব বলব। বাবাজীর কোষ্ঠীখানাও চাই। মিল করে দেখতে হবে। তার পরে সে দুটো কোন ভাল জ্যোতিষীকে দিয়ে—"

"দরকার নেই। অনেক ভাল জ্যোতিষীর গণনা দেখেছি। আপনার মত অমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় না। তবে কোষ্ঠী দুটোতে যদি মিল না হয়?"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা। বাবাজীর কোষ্ঠী আমি তৈরি করেছি। কিছু কিছু মনে আছে। এ মেয়ের সঙ্গে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হবে না।"

"তবে বৈশাখের মধ্যেই বিয়ের দিনটি দেখবেন, আমি দেরি করতে চাইনে, আনন্দের কোষ্ঠী আমি বার করে রেখেছি, নিয়ে যান।"

টেবিলের নীচু দিকের একটা ড্রয়ার টানিয়া খুলিয়া এক খানা কুণ্ডলী-পাকানো কাগজ বাহির করিয়া কৈকেয়ী পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে সরাইয়া দিলেন।

সেটা তুলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণ বিদায় হইলে কৈকেয়ী নিজের বিশ্রাম-ঘরের দিকে চলিলেন।

সেই ঘরের সাদা মেঝের উপর কাল কম্বল পাতিয়া জানকী বসিয়া তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছে। তাহার রুক্ষ, ঝাঁকড়া চুল পিঙ্গলাভ জটার মত দেখিতে, গৈরিক বর্ণের সাড়ী পরা। চেহারায় উদাস নির্লিপ্ত ভাব। আর্য্যবালা। জানকী সুলেখিকা, তুলসীদাসী রামায়ণের বাংলা কবিতা এবং বাংলা রামায়ণের হিন্দী পদ্যানুবাদ করে। কেশবের সঙ্গে জানকীর প্রায়ই সাহিত্য-তর্ক বাধে। কেশব হটিয়া যান। জানকী হটে না। কেশবের ইচ্ছা জানকীর মধুর কবিতাগুলি ছাপাইয়া বই করিবে। জানকী রাজী নয়, বলে, "এ পাঁচজনের চোখের সামনে ধরবার দরকার নেই।"

জানকীর কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট ও গম্ভীর, ঝরণার মত উঁচু নীচু হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহার কাছে রুক্মিণী

চৌধুরাণী বসিয়া শাশুড়ীর জন্য একটি সাদা পশমের ফুল-হাতা জামা বুনিতে বুনিতে রামায়ণ শুনিতেছেন। রুক্মিণী চৌধুরাণীর চেহারা পুরাণের দময়ন্তী শকুন্তলার রূপ-বর্ণনার সঙ্গে অনেকটা মেলে। লাল পাথর দেওয়া বড় বড় তিনটি সোনার ফুল-কাঁটায় এলো খোঁপাটা আটকান। কাণে হীরার ফুল, হাতে তাবিজ ও চুড়, পাথর-বসান তাবিজের ঝুমকা দুটি হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। গলায় চিকণ ডায়মণ্ডকাটা বিছে হার—তিন চার নবর করিয়া পরা। মুখের ভাব খুব প্রফুল্ল, হাসি-হাসি। উজ্জ্বল চোখ দুটি এক একবার দরজার দিকে ফেরে। একান্ত মনে রামায়ণ শুনিতে শুনিতে লাল জরি-পাড় শান্তিপুরী সাড়ীর চাবি-বাঁধা আঁচলটা খসিয়া জানকীর কোলের উপর পড়িয়াছে, মাথার কাপড়টাও নামিয়া পিঠের সেমিজের বাঁকা রেখাটি ডান দিক্ দিয়া দেখা যাইতেছিল। একাসনে যোগিনী ও গৃহলক্ষ্মী।

কৈকেয়ীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া রুক্মিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জানকী বই পড়া বন্ধ করিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিল, যেমন তার ঘন কৃষ্ণ চোখ, তেমনি বিদ্যুতের মত দীপ্ত চাহনি, বলিল, "সারা দিন করছ কি শুনি?"

ঘরের একদিকে একটা বড় চৌকিতে পুরু নরম কম্বল বিছানো, এইটিই কৈকেয়ীর আসল বসিবার ঘর।

জানকীর কথায় উত্তর না দিয়া কৈকেয়ী একটু হাসিয়া বিছানায় বসিয়া বালিশ দুটি টানিয়া আধ-শোয়া ভাবে হেলান দিলেন, রুক্মিণী তাঁহার পায়ের দিকে বসিয়া আবার বুনিতে আরম্ভ করিলেন।

কৈকেয়ী বলিলেন, "বৌমা, মেয়েটিকে দেখবে একবার?"

রুক্মিণী বলিলেন, "তুমি দেখেছ মা, ওতেই হয়েছে।"

"জানকী, কি বলিস? দেখবি নে?"

জানকী আবার বইয়ের দিকে মন দিয়াছে—মুখ না তুলিয়াই বলিল, "বাড়ী এলেই দেখতে পাব—অত ব্যস্ত কি?"

রুক্মিণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "এবার প্রতি-কে আনতে পাঠাব?"

কৈকেয়ীর মনটা ভাল আছে, একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার শুধু রাত দিন প্রতি র ভাবনা। চৈত্র মাসেই আসবে না কি? বোশেখ পড়ুক?"

সুকুমারী—রাজার ঝিয়ারী

বারান্দায় মাদুর পাতিয়া সুদেষ্ণা লেখাপড়ায় ব্যস্ত। করুণা রান্নাঘরের কাজ সারিয়া গা ধুইতে গিয়াছে। সুদেষ্ণার ছোট্ট ভাই-পো সুবল পিসির বই খাতা ছড়াইয়া কালী ঢালিয়া একাকার করে, তবু পিসিকে ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকিতে পারে না। এ দিকে সুদেষ্ণার পড়ায় মন লাগে না যতক্ষণ দাদা না আসে। দাদাও সন্ধ্যা হইতে বাহিরের ঘরে কি যে গল্পে মন দিয়াছে! ঘরের ভিতরে বিছানায় যে ছোট্ট নূতন খুকীটি ঘুমাইতেছে, সুদেষ্ণার দুর্দম ইচ্ছা যে, তাহাকে তুলিয়া আনে। আবার লেখাপড়ার সময় খেলা করিতে নাই, এটাও সে জানে। তখন নূতন বুদ্ধি বাহির করিয়া বলিল, "আয় সুবল, তোকে ছবি এঁকে দি।"

"কিসের ছবি পিসি?"

"রাক্ষসী রাণীর, দুধ না খেলে যে ধরে নিয়ে যায়।" শ্লেট পেন্সিল লইয়া সুদেষ্ণা ছবি আঁকিতে বসিল।

বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ হইবার শব্দ হইল, লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বিনোদ ভিতরে আসিল। সুদেষ্ণা বলিল, "দাদা ইংরেজিটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, পড়িয়ে দাও আবার।"

"কাল সকালে দেবো। তোর বৌদি কই?"

কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে করুণা ছেলের দুধ গরম করিতে বসিয়াছে, সেখান হইতেই জবাব দিল, "কেন?"

"এ দিকে এস", বলিয়া বিনোদ ঘরে ঢুকিল

ঘরের এক দিকে তিনটা চৌকি জুড়িয়া পরিষ্কার বিছানা পাতা, অন্য দিকে লম্বা বেঞ্চের উপর ছিটের ঢাকনী দেওয়া কয়েকটি বাক্স ও ক্যাশ-বাক্স। এক দিকে একটা টেবিল, দুটি পুরাণ চেয়ার ও দুটি টুল। তার এক পাশে আল্না। ছোট বড় কাপড় পরিপাটী করিয়া গুছান। করোগেট টিনের ঘর, ছেঁচা বাঁশের বেড়া মাটী লেপা, তার উপর কলি ফিরাইয়া সাদা রং করা। বড় বড় জানালা, দুটী দরজা। দেওয়ালে একটি ব্র্যাকেটে বিনোদের দু' তিনটি জামা ঝুলান। চারি দেয়ালে চারি খানি দেব দেবীর ছবি। বেঞ্চের তলায় একটি বড় পিঁড়িতে কতকগুলি মাজা ধোয়া রেকাবী ও গ্লাস। আর একটা জল-চৌকিতে ষ্টোভ ও শিশি বোতল কৌটা। একটি জলভরা মাটীর কলসী—তলায় খড়ের বিড়া, মুখে কাঁসার বাটি ঢাকা।

দেবনাথ বলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের লেখা।

অদৃষ্টের লেখা না হইলে বিনোদের মত ছেলে, আই-এ পাশ প্রথম বিভাগে। বাপ মায়ের অসুখ, বাপ মা হারানো, কত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পরীক্ষাই দিতে পারিল না, পরের বছর বি-এ দিল, পাশ করিল দ্বিতীয় বিভাগে। না আছে সহায়, না আছে সম্পত্তি, বিঘা কতক চাষ-আবাদী জমি ছাড়া। তার আবার এমনি এক-রোখ যে, কাহার দুয়ারে দাঁড়াইবে না, হাত পাতিবে না, সাহায্য চাহিবে না। অগত্যা ষষ্ঠীতলার স্কুলের মাষ্টারী ভিন্ন আর কি হইতে পারে? চাকরীটা না লইলে কি এক বছরের অনাথা বোনটিকে দুধ যোগাইয়া বাঁচাইতে পারিত?

অনেকগুলি কর্জ্জও ছিল, ধীরে ধীরে শোধ করিয়াছে। এবার হইতে পরামর্শ হইয়াছে, বোনের বিবাহের জন্য সঞ্চয় করিবে।

ষষ্ঠীতলা গ্রামটা খুবই ছোট, গ্রাম না বলিয়া পাড়া বলিলেই ঠিক হয়। গ্রামের মধ্যে প্রধানা দুই জন। এক—নেপালের মা, মেজ-গিন্নী; দুই—সুষমার মা, বড়-গিন্নী। এঁদের অবস্থাই সব চেয়ে ভাল।

করুণা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া দুয়ারে শিকল দিয়া নামিয়া আসিল। দুধের বাটী সুদেষ্ণার কাছে রাখিয়া ঘরে ঢুকিল। সুবল পিসি ছাড়া আর কারও হাতে খায় না।

বিনোদ বিছানায় টান-টান হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। করুণা ঘুমন্ত শিশুটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বিছানার কিনারে বসিল বলিল, "কে এসেছিল? সেই থেকে কথাই হচ্ছে।"

"একটা গুরুতর বিষয়।"

"কি গুরুতর বল না?"

"আচ্ছা, আন্দাজ কর দেখি, কি বলব?"

"আমি ত অন্তর্য্যামী নই, আমার অত বুদ্ধি নেই।"

"তবে বলে কি হবে, সুপরামর্শ ত পাব না।"

"না বললে নেই, আমার সেই সেলাইটা পড়ে রয়েছে, নিয়ে বসি গে।"

বিনোদ করুণার আঁচল চাপিয়া ধরিল, "শোন-শোন; তোমার লক্ষ্মণের বিয়ের যোগাড় করছি।"

"ইস্, ঠাট্টা রাখ, আসল কথাটি বলে ফেল।"

"ঐটিই আসল কথা।"

"সত্যি? এইটুকু মেয়ের? বোশেখে সবে এগারতে পা দেবে যে? বলেছিলে যে, ভাল লেখাপড়া না শিখিয়ে বিয়ে দেবে না?"

"আমি খোঁজ করি নি, বর যদি এগিয়ে আসে, কি করব বল?"

"সে কি? লক্ষ্মণকে দেখেছে না কি?"

"দেখেছে, পছন্দ হয়েছে।"

"তোমার আজ হয়েছে কি? অমন চেপে চেপে কথা কইছ কেন? কে তাঁরা? ছেলেটি দেখতে বেশ সুন্দর ত? কোথায় তাঁদের বাড়ী?"

"সেইটি শুনলেই চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।"

বিনোদের মুখের ভাব গম্ভীর, করুণার কৌতূহলের সীমা নাই। আর একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, "কেন? তবে বুঝি সুবিধের নয়? নইলে কি যেচে আসে। মনের মত না হলে আমি বিয়ে দিচ্ছি নে, সে জেনে রেখো।"

"কি রকম হলে তোমার মনের মত হয় বল দেখি?"

"বললে কি হবে?"

"আচ্ছা বলই না দেখি, ঠিক ঠিক না হলেও কাছাকাছি ত হতে পারে? তবে যদি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণকে বর ঠিক করে থাক, সে আলাদা কথা।"

"আহা, আমি পাগল হয়েছি নয়? মানুষের মধ্যে আর পছন্দসই বর নেই, স্বর্গে খুঁজতে যেতে হবে? যাও আর ঠাট্টায় কাজ নেই।"

"বলই না শুনি, ঠাট্টা থাক্, সত্যি তোমার মনের মত ছেলে আমি খুঁজে দেখব।"

"কথা দিয়েছ মনে রেখো, তবে শোন", হাসি হাসি মুখে করুণা বালিশে ভর দিয়া হেলিয়া বলিল, "বরটি হবে খুব সুন্দর, যেন রাজপুত্তুর রাজার মত ধনী হবে, তবে রাজা নয়, রাজা হলে বয়স বেশী হবে, না? রাজপুত্তুরই ভাল, লক্ষ্মণের সঙ্গে মানান চাই ত?"

"আর?"

"আর সবই ঐ রকম—ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতন

সাতমহলা বাড়ী, দেউড়ীতে দরোয়ান, সেপাই, শান্ত্রী। মালী নিত্য মালা গেঁথে দেবে, শ্বেত-পাথরে বাঁধা ঘাট, দাসীরা চুল খুলে দেবে, চুল শুকিয়ে দেবে।"

বলিতে বলিতে করুণা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল, "নাও—সেই থেকে তো কেবলি বাজে কথা হচ্ছে। আসল কথা বললেই না। বিয়ের এখনও সময় হয় নি, তবু পছন্দমত পেলে কেন না দেবো? ছেলেটি লেখাপড়া শিখেছে, শ্বশুর-শাশুরী আছে, অবস্থাটি ভাল, এইরকম হইলেই আমার খুব হলো, ও যে বড্ড সুখী, কষ্ট না পায় এমনি ঘরে দিতেই হবে—তার জন্যে যদি তোমার বাড়ী-ঘর বেচতে হয়—তাও।"

বিনোদ হাতের উপর মাথা রাখিয়া একটু উঁচু হইয়া বলিল, "কল্পনা অনেক সময় সত্যি হয়, যা বললে ঠিক তেমনই পাবে বোধ হচ্ছে।"

"কোথায় গো? সত্যি ভাল? তবে আমি এক্ষুণি রাজী, কাল যদি গায়ে-হলুদ দিতে হয় তাই। কিন্তু খুব দূর নয় তো? যে আদুরী মেয়ে ও।"

"না কাছেই, এই শ্রীনগরে, বর হচ্ছে আনন্দ চৌধুরী। কৈকেয়ী চৌধুরাণী ষষ্ঠীতলায় লক্ষ্মণকে দেখে আদর করেছিলেন, বলছিলে না? তাঁর খুব পছন্দ হয়ে গেছে, তাই নাতির সঙ্গে বিয়ে দেবেন।"

করুণার মুখে কথা নাই, একবার দেব-দেবীর উপর তাহার চোখদুটি ঘুরিয়া আসিল, মনে মনে প্রণাম করিল। বিনোদের হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "কি করে জানলে?"

"ম্যানেজার এসেছিলেন। কথাটা গোপন রাখতে বলেছেন, তোমায় বলে বোধ হয় ভাল করলাম না—স্ত্রীলোক তো কথা গোপন রাখতে পারে না।"

"তা বই কি, সে তোমরা। কিন্তু গরীবের মেয়ে, অত বড় ঘরে কি রকম হবে? মানাবে কি? যেমন ভয় হচ্ছে, তেমনি আনন্দ হচ্ছে, ঠিক যেন বুঝতে পারছি নে, কি করি?"

"ভয় কি? আমি লক্ষ্মণকে তেমন শিক্ষা দিই নি। যেখানেই যাক্—ধনী হোক, গরীব হোক সব অবস্থা মানিয়ে নিতে পারবে। ও সব রকম ভাবে চলতে পারবে। আমার হাতে গড়া পুতুল আমি চিনি। তবে নিজেদের কিছু স্বার্থ ছাড়তে হবে, যখন-তখন দেখবার আশা থাকবে না আর। তা যাক্, ও সুখী হলেই হলো।"

"আচ্ছা কথা উঠেছে বইতো নয়—যদি ওঁরা পিছিয়ে যান?"

"সে ভয় নেই, কৈকেয়ী চৌধুরাণীর কথা বড় নড়চড় হয় না। সকালবেলা ওদের জ্যোতিষী আসবেন। ঠিকুজী দেখে মিল হলে বিয়ে একেবারে ঠিক জেনো।"

"ও—তবে এখুনি আশা করবার দরকার নেই। আচ্ছা যদিই হয়, খরচ-পত্র কি করতে হবে তোমার?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "একখানা চেলি, এক জোড়া শাঁখা।"

অবাক্ হইয়া করুণা বলিল, "আর কিছু দেবে না তুমি?

"নিলে ত? ওটা নেহাৎ প্রথা তাই।"

শিশুটি নড়িয়া উঠিল। করুণা তাহার কাছে সরিয়া গিয়া আবার ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল, "না। তুমি একখানা লাল সাড়ী খুব ভাল দেখে এনে দিয়ে—ও বড্ড লাল রং ভালবাসে—আমার চেলীখানা পরে বেড়ায়—পূজায় নীলাম্বরী কিনে দিলে পাঁচ টাকা দিয়ে, সেটা ছোঁয়ও না।"

"তা দেবো, তুমি কাউকে জানিয়ো না যেন। শুধু নিজের মনে তোমার ঠাকুরমার ঝুলির রাজপুত্রের সঙ্গে আমাদের আনন্দ চৌধুরীকে মিলিয়ে দেখ—কতখানি তফাৎ থাকলো।"

(ক্রমশঃ)

শিবসঙ্কীর্ত্তন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল

—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

শিব প্রণাম না করায়, অপমানিত বোধ করিয়া দক্ষ শিবের প্রতি যে সকল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, মুকুন্দরাম তাহা ব্যাজস্তুতি ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন—

নাহি জানি আদিমূল, কিবা জাতি কিবা কুল,
না জানি যে কেবা মাতা পিতা॥
ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদ খেলা,
হেন ছার আমার জামাতা॥
অঙ্গরাগ চিতাধূলি কাঁধেতে ভাঙ্গের ঝুলি,
বিষধর উত্তরী বসন।
শ্মশানে যাহার স্থান তারে কেবা করে মান
দেববুদ্ধি করে কোন জন॥—ইত্যাদি।

রামেশ্বর এস্থলে দক্ষকর্ত্তৃক শিবনিন্দার কোন বর্ণনা করেন নাই, কেবল লিখিয়াছেন—

দক্ষের দারুণ দুঃখ দাক্ষায়ণী-নাথে।
দিতে গালি দেবগণ নিবারিল তাতে॥

অন্নদামঙ্গলে ভৃগুমুনির যজ্ঞের প্রসঙ্গই নাই, কেবল দক্ষের শিববিদ্বেষের উল্লেখ এই ভাবে আছে—

শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি।
সদাশিব নিন্দা করে মহাক্রোধ হৈলা হরে
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।
দক্ষেরে বিধাতা বাম না লয় শিবের নাম
সদানিন্দা করে কটু ভাষে॥

এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক চণ্ডিকামঙ্গলে লিখিত আছে, ভৃগুমুনির যজ্ঞে দক্ষকর্ত্তৃক শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী দক্ষকে শাপ দিল—

দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল লৈল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তি পথে॥
মহাদেবে দক্ষ যেন বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল বদন॥

নন্দীকর্ত্তৃক অভিশাপের কথা শিবায়ন বা অন্নদামঙ্গলে নাই। আমরা সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করিতেছি।

কিছুকাল পরে দক্ষ একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, এই যজ্ঞে সমস্ত ত্রিলোকের নিমন্ত্রণ হইল, কেবল হইল না মহাদেবের। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন, "বিধি বিষ্ণু শিব বিনা আইলা দেবগণ।" সম্ভবতঃ শিব না আসায় বিধি বিষ্ণুও আসেন নাই। রামেশ্বর এইখানে নারদকে দক্ষের মন্ত্রণাদাতা সাজাইয়াছেন—

নারদ বলেন তার প্রতীকার কর।
মন্দধীর মত মিছা মনস্তাপে মর॥
যে যেমন করে তারে তেমনি উচিত।
তুমি যজ্ঞ কর তবে হইবে বিহিত॥
শিব না পূজিলে যদি অন্য পূজ্য নাই।
সকল নিষেধ বিধি বিধাতার ঠাঁই॥
আপনি বিধাতা তাহে বিধাতার সুত।
নিমন্ত্রণ করে আন নির্জ্জর প্রভৃত॥

দক্ষযজ্ঞের আয়োজন চলিতে লাগিল এদিকে—

আকাশে শুনিবা বিমানের কোলাহল।
যজ্ঞের দুহিতা চণ্ডী হইলা চঞ্চল॥ (চণ্ডী)

রামেশ্বর লিখিতেছেন, নারদ আসিয়া এই যজ্ঞের বিবরণ শিবকে দিয়া কোন্দলের সৃষ্টি করিলেন—

শ্বশুরের ঘরে যজ্ঞ যাও নাই মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বলে নাই আমা॥
কি বল কি বল বলে বর্ণে দিল হাত।
বৃথা যজ্ঞ করে দক্ষ হইবে উৎপাত॥
মূলে মারি কুঠার পল্লবে ঢালে জল।
শিবের কি ক্ষতি ক্ষতি দক্ষের কেবল॥
কিন্তু সব কন্যায় আসিবে বাপঘর।
দাক্ষায়ণী গেলে দেখা হত পরস্পর॥
সাধ করে সীমন্তিনী পরে পাঁচ খান।
উৎসবে উৎসব (উৎসাহ) হয়ে পিতৃগৃহে যান॥
দিন দুই দেখা শুনা মা বাপের সাথে।
কথনীয় নয় কত প্রীতি হয় তাতে॥

দারুণ দক্ষের দেহ নাহি দয়ালেশ।
এমন দুহিতাস্নেহ দূর করে শেষ॥
সতীকে শুনায়ে শিবে সব কথা বলে।
দেবঋষি দক্ষযজ্ঞ দরশনে চলে॥

সতী কিরূপে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ পাইলেন ভারতচন্দ্র তাহা লিখেন নাই।

সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞদর্শনে যাইতে ইচ্ছা করিয়া শঙ্করের অনুমতি চাহিলেন। শিব বিনা নিমন্ত্রণে সতীকে পাঠাইতে চাহিলেন না, সতী ব্যাকুল হইয়া শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—

চণ্ডীতে—

অনুমতি দেহ হর যাইতে বাপের ঘর
যজ্ঞমহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা কর কৃপানিধি
যাব পক্ষ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ যাইতে বাপের বাস
নিবেদন করি যোড় করে॥
একতিল কোথা যাই জুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধাতা করিল জন্মদুখী।
পর্ব্বতে কাননে বসি, নাহি পাশ পড়সী,
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী॥
শুমঙ্গল সূত্রকরে, আইলাম তোমার ঘরে,
পূর্ণ হৈল বৎসর পাঁচ সাত।
দূর কর বিবাদ পূরহ আমার সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান, করিবেন অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
বসন ভূষণ আদি পাব বস্ত্র নানাবিধি
ভেদবুদ্ধি নাহিক বাপার॥
সতীর বচন শুনি কহিছেন শূলপাণি
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপঘরে যদি চল, তবে নাহি হবে ভাল
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন॥

* * *

তারপর—

চলিবারে অনুমতি নাহি দিল পশুপতি,
দাক্ষায়ণী হৈলা কোপবতী।
সম্ভারে হইয়া বামা চলিলা ভ্রূকুটীভীমা
একাকিনী বাপের বসতি॥
হইয়া উন্মত্ত-বেশা যান চণ্ডী মুক্তকেশা
না শুনিয়া শিবের বচন।
শিবের ইঙ্গিত পাঞা পাছে নন্দী যায় ধ্যাঞা,
বৃষভের করিয়া সাজন॥

এই প্রসঙ্গটী রামেশ্বর অধিকতর সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চণ্ডীর সতী পিতা শিবনিন্দা করিলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধা, কিন্তু রামেশ্বরের সতী পিতার স্নেহে কাঙ্গালিনী, পিতার ও পতির মনোমালিন্য দূর করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিতা—

পড়িয়া প্রভুর পায় সতী গড়াগড়ি যায়
বিদায় মাগেন প্রাণনাথে।
যাইব জনকালয় কৃপা কর কৃপাময়
পদধূলীগুলি ল'য়ে মাথে॥
শুন পিতৃ-নৃপস্থানে যাতে পারে অনাহ্বানে
তাই যাই জনকের যাগে।
বাপাকে বিস্তর কবে পূজাব তোমাকে লবে
যজ্ঞভাগ দেয়াইব আগে॥
করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম স্থাপন করিব ধর্ম্ম
মর্ম্ম কথা কহিলাম সব।
সতীর শুনিয়া বাণী সমাকুল শূলপাণি
রহিলেন হইয়া নীরব॥
দেখিয়া সাধ্বীর নতি ভাবিলেন পশুপতি
কেবল কৈলাস অন্ধকার।
সভ্রমে সতীকে তুলি নিষেধ করেন শূলী,
বিনয় করিয়া বারম্বার॥
অনাদরে নাহি যাও একান্ততঃ নাহি যাও
মন দিয়া শুন বলি শিবে।
গেলে পাবে পরিতাপ সভায় তোমার বাপ
অপভাষা আমারে বলিবে॥
সহিতে নারিবে পরে বিপরীত দেখি পরে
শিবের করিবে সর্ব্বনাশ॥

... ...

পশুপতি অনুমতি সতী নাহি পায়ে
চলিলা পিতার প্রতি কোপবতী ধায়ে॥
যেন কেহ কার প্রাণ লয়্যা যায় কাড়ি।
চলিলেন চন্দ্রমুখী চন্দ্রচূড়ে ছাড়ি।

প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে।
বেগবতী যান সতী কেহ নাহি সাথে॥
ব্যগ্র হয়ে উগ্র নাহি ভাবি পান কিছু।
নকর নন্দিরে নাথ পাঠাইলা পিছু॥
ভগবতী হয়ে নতি নন্দির সহিত।
মনস্বিনী মায়ের মন্দিরে উপস্থিত॥*

ভারতচন্দ্র এই খানে ভগবতীর মহিমা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া শিবকে খেলো করিয়াছেন এবং সতীর চিত্রকেও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন—

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥

সতী দশমহাবিদ্যার রূপ দেখাইয়া শিবকে ভয় দেখাইলেন, শিব ভয়ে সম্মতি দিলেন। এটা যেন একটা ছেলেমানুষী হইয়াছে, দেবাদিদেব মহাদেব যিনি কোন অনুভূতির অতীত তাঁহাকে ভয় দেখাইবার প্রচেষ্টা কবির পক্ষে ধৃষ্টতা হইয়াছে। তারপর—

মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দিরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥

কবিকঙ্কণের সতী বৃষভে চড়িয়া রাজমহিষীর ন্যায় বহু সৈন্যসামন্তসহ পিতৃগৃহে গমন করিলেন। ভগিনীগণ আসিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন, মাতা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনজল দিলেন। অন্নদামঙ্গলের সতী শিবকে ভয় দেখাইতে কালীবর্ণ হইয়াছিলেন তাই দেখিয়া প্রসূতি স্বপ্নদৃষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন। মায়ের নিকট কিছু আহার করিয়া সতী যজ্ঞদর্শন করিতে গেলেন।

* প্রথম সংস্করণে কিছু ভুল পাঠ ছিল তাহা যথাসম্ভব সংশোধিত করা হইল।

রামেশ্বরের সতীর মাতৃসম্ভাষণ বড়ই মধুর। পতিগৃহবাসিনী বাঙ্গলার মেয়ের জননীর সহিত মিলনের একটী সুন্দর চিত্র ফুটিয়াছে—

প্রসূতি পুরট পীঠে বসি পাকশালে।
প্রণমিল আসি প্রাণতুল্য প্রিয় ছেলে॥*
অন্য কন্যা সকল বসেছে বেড়ে মায়।
সম্ভ্রমে সম্ভাষ সবে করিলেন তাঁয়॥
সতী নাহি দেখিয়া সবার ছিল দুখ।
সবে জীল সতির দেখিয়া শশিমুখ॥
আইস বলিয়া আশ্বাসে আশীষ বচনে।
জিজ্ঞাসিল মঙ্গল মধুর সম্ভাষণে॥
গলা ধরে কাঁদে চাঁদ মুখে চুম্ব খায়ে।
জীল যেন জননী জীবন দান পায়ে॥
অনিবার্য্য প্রেমধারা পরিপূর্ণা সতী।
জানিল জননী ভাল জনক দুর্ম্মতি॥
মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠী দেখিবা সবায়।
অভিমান ক'রে কন অভাগিনী মায়॥
সকল বান্ধব আসে জনকের যাগে।
সতী,সুতা কেন পিতা হয় পরিত্যাগে॥
যজ্ঞেশ্বর জামাতাকে যজ্ঞে নাহি আনি।
বৃথা যজ্ঞ করে পিতা শুনে কার বাণী॥
বলিব বাপার কাছে মনে আছে যত।
জননী বিদায় দেহ জনমের মত॥
সকল সংসার লয়ে সুখে কর ঘর।
মনে কর সতী কন্যা মরে অতঃপর॥
জননী এমন বাণী শুনে সতীমুখে।
শোকাকুলা হৈলা যেন শেল মারে বুকে॥
মামী মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠী যত মায়ে।
ধরে গলে করে কোলে কান্দে মুখ চায়ে॥
প্রণতি করিয়া সতী সবাকারে কন।
হাসিয়া বিদায় দেহ কান্দ কি কারণ॥
আশিষ করিয়া মনে রাখিও সবাই॥
প্রতি জন্মে পশুপতি পতি যেন পাই॥
ইহা বলে সবাকারে করিয়া বন্দন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥
সত্বরে সুন্দরী গিয়া নন্দির সহিত।
যজ্ঞস্থানে দক্ষের সাক্ষাতে উপস্থিত॥

* রাঢ় ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ছেলে অর্থে সন্তান বুঝায়।

সতী আসিয়া দক্ষকে প্রণাম করিলেন কিন্তু পিতা কন্যাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না—

দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি।
হেটমুণ্ডে আশীষ করিল প্রজাপতি॥
আয়োতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবী হউক স্বামী সুস্থির সুমতি॥

(কবিকঙ্কণ)

সুরসভা দেখি গৌরী সম্ভ্রমে সবায়।
পিতাকে বন্দনা করে বসিলা সভায়॥
ক্রোধভরে দক্ষ তারে আশীষ করয়।
ক্ষিপ্তপতি শুদ্ধমতি অচিরেতে হয়। (রামেশ্বর)

অন্নদামঙ্গলে সতীকর্তৃক প্রণাম ও দক্ষের আশীর্ব্বাদের কথা একেবারে নাই—

কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥

কবিকঙ্কণের দক্ষ এই স্থানে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কালে নিজ মনোভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়া হেটমুণ্ডে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাহিরে কোন কোপ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু রামেশ্বরের দক্ষ ক্রুদ্ধভাবেই শিবকে পাগল বলিলেন এবং ক্ষিপ্ত জামাতা শীঘ্রই স্থিরমতি হউক এই আশীর্ব্বাদ করিলেন আর অন্নদামঙ্গলের দক্ষ কন্যার কালীবর্ণ দেখিয়াই রাগে জ্বলিয়া গেলেন এবং শিবকে কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন।

তিনটী কাব্যেই দক্ষকর্ত্তৃক শিবনিন্দা কতকটা ব্যাজ-স্তুতি। মুকুন্দরাম এখানেও পুনরায় দক্ষের মুখ দিয়া শিব-নিন্দা করাইয়াছেন। সতী পিতাকে শিবকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য অনুযোগ করিলে দক্ষ বলিলেন—

কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
যেবা ছিল কপালে লিখন।
আমার কর্ম্মের গতি স্বামী হইল বাম-পথি
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ॥
আরোহণ বৃষ-বরে শিঙ্গা ডম্বুর করে,
ভক্ষণ ধুতুরার ফল।
ভাঙ্গে বড় অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস
ফণী হার ফণীর কুণ্ডল॥
পরিধানে বাঘ-ছাল গলাতে হাড়ের মাল
বিভূতি-ভূষণ দেই অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান তারে কে বা করে মান
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে॥
আরাধিয়া পশুপতি পাইলে পশুর পতি
অহি সঙ্গে একত্র শয়ন।
হর-শিরে শশিকলা অহি সঙ্গে যার খেলা
বঞ্চিত ভুবনে দুই জন॥

সাধক রামেশ্বর শিবনিন্দা বর্ণনা করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এইখানে তাঁহার অন্তর কাব্যের সঙ্গে সায় দেয় নাই তাই তাঁহার অপর কাব্য দুইটী হইতে নিকৃষ্ট হইয়াছে—

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

অমঙ্গল সকল লক্ষণ তার হেন।
মহাদেব নাম কিন্তু মহাপ্রেত যেন॥
প্রেত ভূত অসত পিশাচ সহ সঙ্গ।
শ্মশানে শবের প্রায় সদাই উলঙ্গ॥
ভুজঙ্গ ভূষণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায়।
দেব মাঝে সে কি সাজে দেখে লাজ পায়॥
অমূলের পুত্র সেটা নির্ম্মূলের নাতি।
তিনকুল মধ্যে বংশে দিতে নাহি বাতি॥
বিধির ঘটনে বিষ পানে মৃত্যুঞ্জয়।
সতীর কপালে পতি পাপ মতি হয়।
বেদপথ ছেড়ে তার মত স্বতন্তর।
এই মত আর কত কৈল কদুত্তর॥

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে॥

ভারতচন্দ্রের রচিত এই ব্যাজস্তুতি পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনা অপেক্ষা কাব্য হিসাবে অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে—

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে কুক্কুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥

সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয় চাসি কেন নয়
নাহি কেন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কে বা দ্বিজদের সেবা
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কে বা॥
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিত্তে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী-বিহারী নহে ব্রহ্মচারী
একি মহাপাপ হর॥

কাব্য হিসাবে ভারতচন্দ্রের বর্ণনা উৎকৃষ্টতর হইলেও তিনি কবিকঙ্কণ ও রামেশ্বরের নিকট ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামেশ্বরের কাব্য নিকৃষ্টতর হইলেও তাহাতে মৌলিকত্বের অভাব নাই।

তারপর শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন। কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র তিনজনেই সতীর মুখ দিয়া দক্ষকে এই শিবনিন্দার জন্য ভর্ৎসনা করাইয়াছেন। রামেশ্বরের সতী পিতাকে বিনয়বাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, পরে নন্দীকে শিবের মহিমা বর্ণনা করিতে বলিলেন। নন্দী শিবের, বিশেষতঃ লিঙ্গপূজার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শিবদ্বেষীর সর্ব্বনাশের কথা বলিলেন এবং বলিলেন—

শিবনিন্দা করে ওর এত বড় বুক।
পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মুখ॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিকঙ্কণ ভৃগুমুনির যজ্ঞেই নন্দী-কর্ত্তৃক এই শাপের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ ও রামেশ্বর উভয়েই যোগাসনে সতীর দেহ-ত্যাগের কথা বলিয়াছেন; ভারতচন্দ্র সে কথা উল্লেখ করেন নাই এবং ভারতচন্দ্রের সতী স্বয়ং দক্ষকে অভিশাপ দিয়াছেন—

"যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।"
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল॥

কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাপ প্রতিকারের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিলেন, রামেশ্বরের সতী পিতার কেন হেন দুর্ম্মতি হইল এই পরিতাপে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্রের সতী ক্রোধভরে নিজে দক্ষের কন্যা হইয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, সেই পাপ দূর করিবার জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিকঙ্কণের সতীর সহিত বহু পিশাচ সৈন্য গিয়াছিল, তাহারা সতীর দেহত্যাগে দক্ষযজ্ঞ নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভৃগু যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন, যজ্ঞ হইতে বহু সৈন্য উদ্ভূত হইল, তাহারা শিবের পিশাচ সৈন্যকে তাড়াইয়া দিল। শূন্যবৃষভ লইয়া

অশ্রুমুখে বার্ত্তা নন্দী দিল মহেশ্বরে।
কান্দিয়া পড়িল শিব মহীর উপরে॥

রামেশ্বরের কাব্যে সতীর দেহত্যাগের পর মহাকাল নন্দী একাকীই দক্ষযজ্ঞ নাশে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রজাপতি দক্ষ স্বয়ং

নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠে, অভিচার মন্ত্রপুটে
দক্ষকুণ্ডে আহুতি প্রদান॥

তাহাতে

উঠে সেনা লক্ষ লক্ষ দক্ষের হইয়া পক্ষ
নন্দির সহিত করে রণ।

নারদ আসিয়া নন্দীকে পরামর্শ দিলেন—

অভিচারে অভিচার শিব বিনা প্রতিকার
তোমা হ'তে হইবে না কিছু

অস্ত্রক্ষতদেহে নন্দী সতীর দেহ লইয়া মহাদেবকে সংবাদ দিল—

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন:

সতী দেহ ত্যাগে নন্দী মহারাগে
সত্বরে গেলা কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে শোকাকুল হয়ে
নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥
শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষ দমন॥

ভারতচন্দ্রের শিব স্বয়ং দক্ষযজ্ঞ নাশ করিতে গেলেন, কিন্তু কবিকঙ্কণ ও রামেশ্বরের শিব ক্রোধে জটা ছিঁড়িয়া বীরভদ্রের সৃষ্টি করিলেন। রামেশ্বরের শিব সতীর দেহত্যাগে কাঁদিলেন না, তিনি সংহারকর্ত্তা সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বীরভদ্রকে দক্ষযজ্ঞ নাশে পাঠাইলেন।

ভারতচন্দ্রের শিবের দক্ষালয় যাত্রা একটী অপূর্ব্ব রচনা। ভুজঙ্গ-প্রয়াতছন্দে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি লিখিয়াছেন—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল্ কলাকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥

কবিকঙ্কণ বিস্তারিত করিয়া বীরভদ্রকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ বর্ণনা করিয়াছেন, ততোধিক বিস্তারিত ভাবে মনের ঝাল মিটাইয়া রামেশ্বর দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে অপূর্ব্ব-তূণকছন্দে দক্ষযজ্ঞ নাশ বর্ণনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের বীরভদ্র দক্ষের মাথা কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু রামেশ্বরের বীরভদ্র—

সংসারে দেখাতে শিব নিন্দকের ফল।
কাটিয়া দক্ষের মাথা হাসে খল খল॥
ফেলাইয়া পাবকে প্রস্রাব করি তায়।
মূত্র ভরে যজ্ঞ কুণ্ড উথলিয়া যায়॥

কবিকঙ্কণ বীভৎস রসের বর্ণনা করেন নাই কিন্তু রামেশ্বর বীভৎস রসের বর্ণনা করিয়া রুদ্র অবতার বীরভদ্রের গুরুত্ব খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন।

এইরূপে তো দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইল। দক্ষ প্রজাপতি যে মরিবেন, তাহা কিরূপে হইবে দেবগণ শিবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইখানে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে বিভিন্ন পাঠ দেখা যায়, কোন কোন পুঁথিতে কেবলমাত্র দক্ষের ছাগমুণ্ড হওয়ার কথা অতি সংক্ষেপে আছে—

এখন দক্ষের সব শুনি বিনাশন।
তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন॥
ছাগলের মুণ্ড দক্ষে করিল যোড়ন।
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন॥

অনেক পুঁথিতে ইহা ব্যতীত আবার বিস্তারিত ভাবে দক্ষের জীবনলাভের কথা আছে। সতীর বিচ্ছেদে হর উদাস হইয়া হিমালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মা গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে মনের দুঃখ জানাইয়া আশুতোষ দক্ষকে জীবন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং স্বয়ং নন্দী ও মহাকালের সহিত বৃষভারোহণে দক্ষালয়ে গমন করিলেন—

পুরীখান দেখিল অঙ্গার-ভস্মময়।
অন্তরে হইলা হর পরম সদয়॥
হাতে জপমালা প্রভু বসিলা ধিয়ানে।
জীব-সঞ্চারিণী বিদ্যা মনে মনে গুণে॥

শিবের অনুগ্রহে কাটা ধড় যোড়া লাগিল, দক্ষের অনুচরগণ প্রাণ পাইল। দক্ষ প্রাণ পাইলেন, কিন্তু মুণ্ড কৈ। মুণ্ড তো যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, দক্ষের কবন্ধ মুণ্ডহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রহ্মার কথায় শিব বলিলেন, দক্ষের স্কন্ধে ছাগলের মুণ্ড জুড়িয়া দাও। দেবগণ বলিলেন, এ কেমন প্রজাপতি ছাগমুণ্ড হইবেন। শিব বলিলেন, নন্দীর অভিশাপ খণ্ডন হইবার নয়। কাযেই, যজ্ঞের ঘরে ছাগলের মুণ্ড ছিল তাহাই আনিয়া দক্ষের দেহে জুড়িয়া দেওয়া হইল, দক্ষ ছাগমুণ্ড হইলেন।

রামেশ্বর শিবকে আর দক্ষালয়ে লইয়া যান নাই—

আশুতোষ পরিতোষ হৈয়া দিল বর।
ছাগমুণ্ড যুড়ে দক্ষ রক্ষ অতঃপর॥

ভারতচন্দ্র স্বয়ং শিবকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ করাইয়াছেন সুতরাং সঙ্গসঙ্গই দক্ষের জীবনলাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায়॥
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা
দেখিয়া শিবের কোপ অস্থির হইলা।
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিবপাশে আইলা সত্বর।

এদিকে সদ্যবিধবা প্রসূতি জামাতার নিকট করজোড়ে উপস্থিত হইলেন, শাশুড়ীকে দেখিয়া শিবের রুদ্রভাব দূর হইল। প্রসূতির স্তবে শিব তুষ্ট হইলেন—

প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইয়া।
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা॥

দক্ষ প্রাণ পাইলেন, কিন্তু মুণ্ড হইল না। প্রসূতি বলিলেন, এ কি বিড়ম্বনা! বিধিবিষ্ণু মন্ত্রণা করিয়া শিবকে বলিলেন মুণ্ড দিতে—

আনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দি বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥

শিব সম্মতি দিলেন; নন্দী একটী ছাগল কাটিয়া তাহার মুণ্ড দক্ষের স্কন্ধে আঁটিয়া দিলেন।

এ তো গেল পরের কথা, কবিকঙ্কণ-দক্ষের জীবন-লাভের পূর্ব্বে সতীর শবদেহ-স্কন্ধে শিবের ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন—

বৈরাগে চলিলা ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা আদি পুরন্দরে রহা করে-যত্ন করে
নাহি শুনে কাহার বচন॥
সতীকে লইয়া শূলে তুলিয়া স্কন্ধের মূলে,
ত্রিভুবন করেন ভ্রমণে।
কাটিতে সতীর শব জগতের নাথদেব
অনুমতি দিল সুদর্শনে॥
চক্র কীটরূপ ধরি শরীরে প্রবেশ করি
গ্রন্থে গ্রন্থে কাটিতে লাগিল।

ইহার পর সতীদেহের বিভিন্ন অংশ পড়িয়া যে পীঠস্থান-গুলির উদ্ভব হইয়াছে মুকুন্দরাম তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

বামচরণ	ঘাটশিলায়	পীঠস্থান	রুক্মিণী
দক্ষিণচরণ	যাজপুরে	„	বিরজা
বামহস্ত	রাজবোলণ্টে	„	বিশাললোচনী মাহেশ্বরী
দক্ষিণহস্ত	বালিডাঙ্গায়	„	রাজেশ্বরী
পৃষ্ঠদেশ	ক্ষীরগ্রামে	„	যোগাদ্যা
মস্তক	নগরকোটে	„	জ্বালামুখী
নাভি	হিংলাজে	„	—
মধ্য অঙ্গ	কামিখ্যায়	„	কামরূপ-কামিখ্যা
বক্ষঃ	বারাণসীতে	„	বিশালাক্ষী

ইহার পর—

প্রভু শূল শূন্য দেখি স্নেহেতে সজল-আঁখি
অস্থিখণ্ড পাইল শূল আগে
কারুণ্য পদাম্ভ (?) বলি সেই অস্থি কণ্ঠে ধরি
ধ্যান করি বসিলেন যোগে

ইহার পর ব্রহ্মা আসিলেন দক্ষের জীবনলাভের জন্য। রামেশ্বরের পীঠ বর্ণনা করেন নাই তিনি. শুধু লিখিয়াছেন—

মৃত বপুস্কন্ধে বিভু ভ্রমিল ভারত।
অঙ্গ ভঙ্গ হবে হৈল পীঠ পঞ্চাশৎ॥
সড়ে মাংস পড়ে হাড় ছাড়ে নাই শূলী।
মালা গাঁথে গলায় পরিল হাড়গুলি।
চিতাভস্ম গায়ে মাথে করিল সন্ন্যাস।
সতীর স্মরণ করে শ্মশান নিবাস॥

ইহার পর দক্ষের জীবনদান প্রসঙ্গ।

ভারতচন্দ্র দক্ষের জীবনদানের পর সতীর দেহ লইয়া শিবের ভ্রমণ প্রসঙ্গ জানাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, সতীর দেহ চক্রপাণি স্বয়ং চক্রধারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে একান্ন পীঠের উদ্ভব হইল।

এক মত না হয় পুরাণ মত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত॥

সুতরাং ভারতচন্দ্র মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্র হইতে পীঠমালার তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মুকুন্দরামের তালিকা কোন্ তন্ত্র অনুসারে তাহা জানি না।

ইহার পর সতী গিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্ম লইলেন। নূতন উপাখ্যান আরম্ভ হইল।

[আগামী বারে সমাপ্য

দক্ষিণেশ্বর। [ফোটোগ্রাফ—পি. গোস্বামী

CAL... LIBRARY ...ITY

সন্ধানে

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রামের শেষে, পারঘাটের উপরেই ছিল বিষ্ণু মুচির ছিটে-বেড়ার ঘরখানি। সুমুখের বারান্দাটা সামনের দিকে একটু হুমড়ে পড়েছে।

বিষ্ণুর বেশ বয়স হয়েছিল। ডাঁটি-ভাঙ্গা, সুতা-বাঁধা, চশমা চোখে তাকে সব সময়েই কাজ করতে দেখতে পাওয়া যেত। হাতের কাজটি চমৎকার, জুতা ছিঁড়তে জানে না; আর, সব চেয়ে বড় সুপারিশ ছিল, দামটি অভাবনীয় শস্তা।

সে-দিন রাত হয়েছে, বিষ্ণু উঠি উঠি করছে। এমন সময় দূর থেকে কে ডাকলে। আঁধারে মানুষ চেনা যায় না। গলাটা পরিচিত বলেই ত মনে হয়; কিন্তু কানে একটু খাটো বলে বিষ্ণু যেন নিজেকে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। মনে মনে বলে: "শিরোমণি মশাই···না? এত রাতে?"

বেড়া পেরিয়ে ডাকতে ডাকতে শিরোমণি এগিয়ে এসে বললেন: "এই যে, আছিস দেখছি, আমার বাপু জুতো-জোড়াটায় একটু হাত লাগিয়ে দিয়ে, একটা কিনারা করে দাও আজই, বুঝলে?···কাল সকালেই দক্ষিণ গ্রাম যেতে হবে।"

"দক্ষিণ গ্রাম?" বলে জুতাটা মাথায় ঠেকিয়ে সে বললে, "সে যে পাক্কা চোদ্দ কোশের ধাক্কা, দা-ঠাকুর! সে যেমন তেমন নয়, সেকেলে ডাল-ভাঙ্গা কোশ, বড় কষ্ট হবে যে ঠাকুর, গাড়িতে যাও না—"

"না, বিষ্টু, সে উপায় নেই, ভারি জরুরী কাজটা।"

বসবার ছোট্ট জল-চৌকিটি মুছে এগিয়ে দিয়ে সে বললে, "বসতে আজ্ঞে হয়, দা-ঠাকুর···একটু যে দেরী লাগবে—"

"তা হোক গে···আজই চাই।"

খাটো মাটির পিলসুজটির উপর বড় একটা প্রদীপ বসান। তাতে ভেরাণ্ডার তেল টল্‌টল্ করছে। গোটা কয়েক শলতে লাগান, উস্‌কে দেবার জন্যে চেপটা চেঁচাড়ির কাঠি। চকমকি ঠুকে বিষ্ণু শোলায় আগুন করে গন্ধকের কাঠি দিয়ে প্রদীপ জ্বাল্‌লে।

সেই আলোতে তার গোল-গাল চেহারাখানি দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, অর্থের দুশ্চিন্তা তার নেই, যদিও সে দিন আনে, দিন খায়; নিজের কাজের উপরই সে সুপ্রতিষ্ঠিত; অন্যের মুখাপেক্ষা নেই। পরশ্রীকাতরতায় তার স্বভাব মোটেই হিংস্র কি উগ্র নয়। বিদ্বেষ নেই, তার অহঙ্কারের বালাই নেই, ধারও ধারে না। বিষ্ণু সত্যিই সুখী জীব।

এ সবই জানতেন কৃত্তিবাস শিরোমণি, তবুও হঠাৎ তাঁর মনটা যেন শ্রদ্ধায় অবনত হল। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে তার কাজ দেখতে লাগলেন। বুড়োর অপূর্ব অভিনিবেশ ধ্যান-ধারণার চেয়ে কণা-মাত্র কম নয়।

ডান হাতের কাছটিতে গোল একটা পাথরের মত কি ওটা? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিরোমণির সন্দেহ-আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার উপক্রম হয়।

পাকা অভিজ্ঞ চোখ বলে: দামোদর শিলা নয় ত? আশঙ্কা এমন ঘনীভূত হল যে, খুলে জিজ্ঞেস করতেও সাহসে কুলিয়ে উঠল না তাঁর।

মাথা তুলে বিষ্ণু বললে, "দা-ঠাকুর, অপরাধ নেবেন না, এই সময়টা, আমার গিয়ে (পেটে হাত বুলিয়ে) ওই একটা বদ অভ্যেস্, পেটটা কেমন কামড়ে আসে।"

সম্মতির হাসি হেসে শিরোমণি বললেন, "অপরাধ? কি যে বল বিষ্ণু? সকলের আগেই ত শরীর, বলছেন শাস্ত্রকারেরা: 'শরীরমাদ্যং'···"

ক্ষিপ্রপদে বিষ্ণু নদীর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিরোমণি তাড়াতাড়ি শিলাখণ্ড তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ করে একেবারে চমকে গেলেন।

"প্রভু! তুমি এখানে! এ কি কাজে লেগেছ দয়াময়?"

নিমিষে শিরোমণির কাছে সংসারটা বিশ্রী, বিবর্ণ, গারদ-

থানার মত প্রতিভাত হল। পলকে আকণ্ঠ তিক্ততায় পূর্ণ হয়ে উঠল। কৃত্তিবাস শিরোমণির পক্ষে সে জায়গা আঁস্তাকুড়ের মত নোংরা মনে হল। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে নদীর দিকে ছুটলেন।

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শিরোমণি ভাবতে লাগলেন; এখন কি কর্ত্তব্য আমার? এমনি করেই ত গোবিন্দের আদেশ আসে মানুষের মনে! গোবিন্দ কথা কন না সত্যি! কিন্তু মনের সিংহাসনের উপর বসে বিবেক যে বিশ্রব্ধ-আলাপ করেন, সেই ত তাঁর অমোঘ বাণী, অনাহত ধ্বনির অভ্রান্ত নির্দ্দেশ!

মুখ হাত ধুয়ে, বিষ্ণু এসে বললে, "কাল সকালে নিশ্চয় তৈরী পাবেন দা-ঠাকুর। এক মুঠো খেয়ে নিয়ে কাজটি সেরে তবে শোব; আপনি বাড়ী যান। কথার খেলাপ হবে না, দা-ঠাকুর।"

সন্ন্যাস-রুগীর মত টল্‌তে টল্‌তে কৃত্তিবাস বাড়ী ফিরে গেলেন।

… … …

খেয়ে-দেয়ে, এক ছিলিম তামাক্ টেনে বিষ্ণু বসে মৃদু মৃদু ভজন গাইতে গাইতে আবার কাজে মন দিলে। সাধারণ শ্রমিকের মত কথা দিয়ে ভুলে যাওয়া তার অভ্যাস নয়; তা' পালন না করলে নিদ্রাগম হবে না নিশ্চয়। বিষ্ণু কাজের মৌতাতে মশগুল হয়ে গেল।

ক্রমে পূবের আকাশে শুকতারা উঠল। শ্যামার শিশ্ সকালের ভিজে স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল। কাজটি শেষ করে বিষ্ণু সেইখানেই জিনিষ-পত্র হাতিয়ারগুলি সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল।

এ দিকে বাড়ী ফিরে কৃত্তিবাসের রুচল না মুখে আহার, না এল চক্ষে এক পলকের জন্যে ঘুম। উঠানে পায়চারি করতে করতে চলেছে মনের মধ্যে তর্কের ঘোর বিতণ্ডা। তার শেষ নেই, সমাধান নেই।

ভগবান্ কি না আজ মুচির ঘরে চামড়া পালিশের কাজে লেগেছেন! কোথায় গেল সনাতন ধর্ম্ম; কোথায় রইল ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য!

মানুষের অজ্ঞাতে হয়ত কত ব্যভিচার চলেছে, কিন্তু চোখের সামনে, প্রত্যক্ষ করে যদি এর প্রতিকার, প্রতিবিধান না করেন ত বৃথাই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম তাঁর, বৃথাই ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা, বৃথাই দেহ ধারণ করে বেঁচে থাকা! এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল।…

কিন্তু চাইলে দেবে কি বিষ্ণু শালগ্রাম শিলা? সে জাতে মুচি; নীচকুলে জন্ম তার, কি বোঝে সে শালগ্রাম শিলার প্রকৃত মাহাত্ম্য-মহিমা?…

রাত্রি যত অগ্রসর হয়—মাথা ততই গরম হয়ে উঠে। শিরোমণি ছটফট করতে করতে ঘর থেকে আঙিনায় এলেন, আঙিনা থেকে পথে। শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছলেন বিষ্ণুর বাড়ীর সামনে।

স্তব্ধ চতুর্দ্দিক্। আকাশের গায়ে রাতের নিকষ কালো কেটে গিয়ে উষার লালচে আভা লেগেছে, তার আবছা আলোয় দেখা গেল বিষ্ণু নিদ্রাভিভূত। মাথার শিয়রে তৈরি রয়েছে জুতো জোড়াটি। দামোদর বিষ্ণুর বদ্ধমুষ্টিকে আলগা করে গড়িয়ে এসেছেন ধূলা-খেলার লীলায়!

শিরোমণির মনে নিমেষে উদ্দাম-বিপ্লবের জয়-পতাকা উড়িয়ে এল একটা তুমুল ঝড়। নিঃশব্দে দামোদরকে তুলে নিয়ে কৃত্তিবাস উধাও হয়ে গেলেন। নদীপথে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পতিতোদ্ধারিণীর বুকে! "মা! মা! রক্ষে কর সনাতন ধর্ম্ম!"

গঙ্গা-মৃত্তিকার তালের মধ্যে গোপনে দামোদর প্রভু কৃত্তিবাস শিরোমণির পূত-পবিত্র গৃহে উত্তীর্ণ হলেন, সেই প্রভাতে।

সকালে বিষ্ণু উঠে দেখলে তার শরীর ভাল নেই। রাত্রি জাগরণের দরুণ এমনটি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সে ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্ষেমি, বিষ্ণুর বিধবা কন্যা; ঘরদোর নিকিয়ে পুঁছিয়ে এসে বিষ্ণুকে তখনও নিদ্রিত দেখে ভারি আশ্চর্য্য হল; জিজ্ঞেস করলে, "বাবা, জ্বর হয়েছে?"

"নাঃ, রাতে কাজ করেছি কি না…গা মাটি-মাটি করছে, তাই…"

"শিরোমণি মশাই-এর ছাত্তর দেবু…"

"হাঁ, ওঁর জুতোজোড়া…"

"এই টাকাটা…"

"একটা আধুলি···দিতে হবে ফিরিয়ে···"

বাইরে থেকে দেবু হেঁকে বললে : "না, ওটা নূতন জুতোর বায়না দিতে বলেছেন···"

দেবু চলে গেল।

ক্ষেমি বললে : "বাবা, শিলেটা কি তুলে রেখেছ ?"

"হবে, দেখ না মা, সিংগেসনে···"

"নেই তো, বাবা···"

বিষ্ণুর আর শোওয়া হল না। কাঁচা চামড়ার গন্ধে মাঝে মাঝে দামোদরের উপর কুকুরে দয়া করে থাকে এমন। খুঁজে-পেতে বার করতে হয়।

বিষ্ণু সেই সন্ধানে ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বার হয়ে গেল।

•

এদিকে হেঁটে যেতে পারলেন না শিরোমণি। মাথা ঘোরা সুরু হয়ে গেছে। ওটা ওঁদের বংশের অসুখ। অগত্যা ডুলি এল ; দুর্গা-শ্রীহরি স্মরণ করে তিনি রওনা হয়ে গেলেন।

ডুলির গা নাড়ায় শিরোমণি অচিরে তন্দ্রাভিভূত হলেন। কাহারদের গুঞ্জন-ধ্বনি ক্রমে যেন কার পরিষ্কার কথোপকথনে পর্য্যবসিত হল। যেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ!—স্বপ্ন-কল্পনায় তাঁর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল মানস-চক্ষে! মাথার চুল পাকা বটে, কিন্তু চূড়ার আকারে বাঁধা! ভুরু দুটি বিশাল ললাটের উপর রামধনুর মত বিস্তৃত। হাতে বাঁশী নয়—একটা তলতা বাঁশের লাঠি। চোখ দুটো ভাঁটার মত গোল, যেন হাপরের মত অগ্নি-উদ্গিরণ করছে। ভূমগুলের মত লম্বোদর দিগন্ত-বিস্তৃত! ত্রাসে শিরোমণির দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল।

কৃত্তিবাস পরিষ্কার শুনতে পেলেন : "দেখ, কাজটা কি ভাল করলি ?"

কথার উত্তর মনে এল না।

"শুনছিস ?"

"কে তুমি ? চিনিনে ত তোমায় ?"

ক্রোধে প্রজ্জলিত হয়ে সেই মূর্ত্তি বললেন : "চিনবি ; সে দুঃখু তোর থাক্‌বে না · "

দুশ্চিন্তায় শিরোমণি উঠে বসলেন। দেখেন বাম চক্ষু তাঁর ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে। ব্যাপার কি ?

উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন অম্বর মেদিনী ঘন-কৃষ্ণ মেঘে কবলিত। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে কাণে তালা ধরিয়ে বাজ পড়ল।

ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে—চোখের উপর হাত রেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃত্তিবাস বললেন : "পরীক্ষার আরম্ভ তো ভয়-ভীষণ হয়েই থাকে, এই জীবনটাই যে তোমার পরীক্ষা, প্রভু !"

দক্ষিণ গ্রাম থেকে সরাসরি দর্পণ-নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন শিরোমণি। গুরুর আদেশ এবং অনুমতি নিয়ে দামোদর শিলার অভিষেক করাই সমীচীন মনে করেছিলেন। কোথায় কি যেন একটা অশান্ত করে তুলেছিল তাঁর মনকে।

গুরুদেব আগা-গোড়া শুনে বললেন : "কৃত্তিবাস, শিলাটি অপহরণ করে যৎপরোনাস্তি অন্যায় করছে,—ব্রাহ্মণের অনুচিত, অতিশয় গর্হিত···"

"অ-প-হ-র-ণ! অনাচার-নিবারণ কি ব্রাহ্মণের অবশ্য-কর্ত্তব্য নয় ?"

"না, না, কৃত্তিবাস! নিবারণ মাত্রেই ক্ষত্রিয়োচিত রাজ-ধর্ম্ম ··তুমি বাড়ী ফিরে গিয়ে বিষ্ণুকে উচিত মূল্য দিয়ে শিলা ক্রয় করে তারপর প্রতিষ্ঠা করতে পার। যাও বৎস, অনুসন্ধান করগে, বিষ্ণুর ঐ শিলা-সেবার অধিকারের নিশ্চয়ই কোন বিচিত্র ইতিহাস আছে। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত থাকে, তার সন্ধান, অনুধাবন, উপলব্ধিই হচ্ছে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম। অন্যথায় সমূহ প্রত্যবায়—এই আমার একান্ত প্রতীতি। তিলমাত্র বিলম্ব না করে গৃহে প্রত্যাগত হয়ে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন কর।"

গৃহে প্রত্যাগত হলেন শিরোমণি। অধীর ব্যস্ততায় তাঁর মনটা সীতাকুণ্ডের জলের মতই ফুটছে টগ্‌বগ্ করে।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে অতি প্রত্যুষে গঙ্গা-স্নানে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু গঙ্গা-স্নান গৌণ। আসল কথাটি ছিল মনের মধ্যে বনের আড়ালে বাঘের মতই ওত পেতে।

একবার বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা হলে পরিষ্কার হয়ে যায় ব্যাপারখানা। তা সে যত দাম চায় দিতে হবে, না হয় বাড়ীখানা বন্ধক পড়বে। ধর্ম্মের কাছে অর্থ? বলেন নি কি শাস্ত্রকার : "অর্থমনর্থম্···?"

বিষ্ণুর বাড়ীখানা যেন কেমন দেখায়? বিরাট বিষাদ-ভরা উদাসীনতা গ্রাস করে আছে ঐ দিক্‌টা!

সাহসে বুকে বেঁধে ডাক দিলেন কৃত্তিবাস: "বিষ্টু, ও বিষ্টু,···বিষ্টু রে···"

গঙ্গার পাড়ে পাড়ে তার প্রতিধ্বনি ধ্বনিতে হয়ে উঠল এ—এ—এ—এ, সঙ্গে সঙ্গে উঠল কান্নার আওয়াজ বাড়ীর মধ্যে থেকে: "ওগো বাবা গো, কোথায় তুমি গেলে গো!" নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ শিরোমণি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন সেই বিনিয়ে বিনিয়ে ক্ষেমির কান্না: "ওগো বাবা গো, আমি কি করব'গো"···

অবশেষে ক্ষেমি বেরিয়ে এল, প্রণাম করে বললে: "ঠাকুর মশাই···বাবা আমার তার শিলে খুঁজতে চলে গেছে···সেই সন্ন্যেসীর দেওয়া শিলে গো-ও-ও···।"

উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল থেকে আধুলি খুলে মাটিতে রেখে দিয়ে সে বললে: "তা খেতে নাই পাই, সেও ভাল, এই বায়না ফেরত নিন ঠাকুর-মশাই···"

আবিষ্টের মত এক পা, এক পা করে ঘাটের পথে যেতে যেতে শিরোমণি বললেন: "ও আধুলি ফিরে দিতে হবে না—ও তোমাকেই···"

বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধানে শিলা ফেরতের প্রসঙ্গটি সহজেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল। কিন্তু গুরুদেবের নির্দ্দেশের মধ্যে একটি ইঙ্গিত মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে, ক্ষেমির সন্ন্যাসীর উল্লেখে! কেই বা সেই সন্ন্যাসী, আর কতটুকুই বা জানে ক্ষেমি তার সম্বন্ধে?

সে দিন সকালে, মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেমি জিজ্ঞেস করলে: "আমায় ডেকেছ কেন, ঠাকুর-মশাই?"

"আজ এখেনে তুই প্রসাদ পাবি আর, বুঝেছিস—ওই গিয়ে, তোর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল—জিজ্ঞেস করছিলুম তোর দিন চলবে কি করে?"

"তা তো জানিনে, ঠাকুর-মশাই—নারায়ণ যে পথ দেখিয়ে দেবেন, সেই পথেই—"

কথাগুলি সত্যই একান্ত সহজ। ভারতবর্ষে মুচি, মেথর, মুদ্দোফরাসের মুখে এই গভীর ভক্তি-রসাত্মক বিশ্বাসের পরিচয়-ব্যঞ্জক কথা শুনতে পাওয়া একটুও আশ্চর্য্য নয়। তাদের মধ্যে বিশেষ করে, স্ত্রীজাতির মধ্যে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণটি অতুলনীয়।

কিন্তু এই সহজ কথাই সে দিন শিরোমণির চিত্ত-সায়রকে উদ্বেলিত করে তুললে। তাঁর সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল।

সস্নেহে বললেন তিনি: "বোস্, বোস্।"

ক্ষেমি কিন্তু বসল না,—বললে: "গাই ঘরে আসেনি, বাছুরটা ক্ষিদেয় ছটফট্ করছে এতক্ষণে, ঠাকুর-মশাই,—এখন যাই—আজকে আবার হাট-বার।"

"হাটে যাবি কেন?"

"ঘুঁটেগুলো না বেচলে···আজকে অপরাধ নিও না···পেসাদ কাল্‌কে এসে পেয়ে যাব···"

ক্ষেমি চলে গেল।

গঙ্গায় সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ ক'রে কৃত্তিবাস শিরোমণি বিষ্ণুর বাইরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লেন:

"ক্ষেমি, ফিরেছিস···ক্ষেমি···ও ক্ষেমি···"

ক্ষেমি বেরিয়ে এসে ছোট জল-চৌকিটি এগিয়ে দিয়ে দূরে গিয়ে বসল।

অন্ধকারে রাত্রির ধ্যান-নিমগ্নতা তখনই যেন সুরু হ'য়ে গেছে। তার আড়ালে শিরোমণিও প্রশ্ন করার অবাধ সাহস পেলেন—আর, ক্ষেমিও নিজেকে অনেকখানি স্বচ্ছন্দ বোধ ক'রলে।

"ক্ষেমি, শিলা খোঁজার কথা, কি বলছিলি, সেদিন?"

"ঠাকুর-মশাই, ওটি আমাদের একটি ভারি লুকোনো কথা! সেদিন মাথার ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলেছি; কিছু মনে ক'রো না: বাবার মানা আছে, ও কথা বলতে···যে!"

"বটে! বলবিনে তা হলে? আমি ব্রাহ্মণ, কোন কথাই আমায় ব'লতে দোষ নেই...বুঝেচিস।"

নিঃশব্দে খানিকটা কেটে গেল।

নিরুপায় হয়েই ক্ষেমি বলতে লাগল: "ছোট ভাইটি আমার যখন ছিল মার পেটে, তখন তিনি একরাতে স্বপ্ন দেখলেন যে গোপাল বলছেন: 'তোর কাছে যাব'।"

"সে-কথা শুনে বাবা বললে : 'তা'হলে এবার তোর ছেলে হবে।' আর হোলও গিয়ে তাই, ঠাকুর-মশাই! কিন্তু মা দেখতে পেলে না তাকে! আর, ছ'-মাস পরে—গোপাল আমার কোল খালি ক'রে চ'লে গেল। সেই থেকেই তো গোরু পোষা।"

ক্ষেমির কণ্ঠস্বর আর্দ্র আর ভারী হয়ে গেল। সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে: "আবার বাবাও কেমন পাগলের মতই হয়ে গেল। তারপর বৃন্দাবনে গেলে সেখেনে এক সন্ন্যেসী ঐ শিলে দিয়ে বললে: 'এই তোর গোপাল, একে সকালে-বিকেলে তুলসী পাতা দিয়ে সেবা করবি—আর নিজের কাজে লাগাবি—রাতে কাছছাড়া করবিনে'...আহা! বাবার ছিল শিলে-অন্ত প্রাণ! সন্ধ্যের পর বাবা ভজন শোনাতো...সেই শিলে হারিয়ে গেল..."

ক্ষেমি আর কথা বলতে পারলে না—অশ্রুধারে তার বুক ভেসে গেল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে কৃত্তিবাসের মনে একই কথা ঘূর্ণিপাক খেতে লাগল: ভগবান বিচিত্র তোমার লীলা! তুমি বেদের আদিভূত কারণ; পুরাণের অতীত। তোমার চরিত্র শুধু অপরিজ্ঞাত নয়—মনুষ্য-বুদ্ধিতে তুমি অপরিজ্ঞেয়! তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত! সেই তুমি তুলসী-পাতা খেয়ে মুচির বাড়ীতেও থাক!

কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ; আমি বেদের আজ্ঞাকারী; উপনিষদের গুণগ্রাহী উপাসক; পুরাণের বোদ্ধা এবং বেত্তা। নিয়মনিগড়ে আমার হাত-পা বাঁধা।

আজ আমার উপর দয়া ক'রেছ। তার আরম্ভ ভয়াল ভয়ঙ্কর। কিন্তু জানি সে শুধু তোমার পরীক্ষা মাত্র। বিবেক-বুদ্ধি-প্রণোদিত কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হ'লে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, তাও জানি—তাই তোমার সেবা-ব্রত গ্রহণ করার সংকল্পে মননের দৃঢ়তা প্রার্থনা করি তোমার কাছে জোড় হাতে।

তুমি কি স্বেচ্ছায় আস নি আমার কাছে? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একতিলও মানুষ অগ্রসর হতে পারে না। আমি জানি, কোন লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে এ-কাজ করি নি আমি। অপহরণের অপবাদ, গুরুদেবের বিচার-বিভ্রান্তি। গুরুদেব,—আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। আমি নির্লোভ, আমি পরস্বাপহারী তস্কর নই। আপনার কাছে সহস্রবার ক্ষমা ভিক্ষা করি। এমন দিন আসবে যেদিন আমার এই কর্ম্ম—সাধুতার গৌরবে মণ্ডিত হবে নিশ্চয়।

কৃত্তিবাসের বামদিকে শিবা চীৎকার করে উঠল, দক্ষিণে সর্প-কবলিত ভেকের করুণ কাকুতি শোনা গেল। মণিবন্ধ বারম্বার স্ফুরিত হয়ে উঠল।

দুই হাত জোড় করে শিরোমণি বললেন—"হে দেবাদিদেব—এ সবই তোমার প্রসন্নতার পূর্ণ পরিচয়! তোমার অভিষেক-প্রতিষ্ঠার এই সব কি অনুমোদন নয়?"

শুভদিনে দামোদরের প্রতিষ্ঠা-অভিষেক সমারোহে সম্পন্ন হল। দেবতার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার জন্য ক্ষেমি নিযুক্ত হল।

শিরোমণির মনের সকল দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

দীর্ঘ সাত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

এই সাত বছরে কৃত্তিবাসের ঘরে আপনার বলতে আর বড় কেউ জীবিত নেই। একে একে তিনটি জোয়ান ছেলে গত। দুই মেয়ে বিধবা হয়েছে। বসত-বাড়ীও ঋণের দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন শিরোমণি করজোড়ে নিবেদন করেছেন বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে: "প্রভু, এ সবই তোমার পরীক্ষা, কঠিন পরীক্ষা।"

সেদিন জমিদারের পাইক-পেয়াদা এসে দাঁড়াল। কৃত্তিবাস কণ্ঠে বিগ্রহ বেঁধে বেরিয়ে গেলেন গ্রামের বাইরে বটতলায়। বসে ভাবছেন—এবার কি করি, দয়াময়?

দূরে গঙ্গা বয়ে চলেছে। শিলাটি তাতে ফেলে দিলেই ত সকল লেঠা চুকে যায়।

"না, না, না," শিরোমণি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমি তোমায় ত্যাগ করব না ভগবান্! এই তো তোমার সঙ্গে আমার চুক্তি, আজীবনের চুক্তি।"

গাছের উপর থেকে কৃত্তিবাসের মাথায় কাক পুরীষ ত্যাগ করলে। গঙ্গা-স্নান করে শিলাকে তুলসীপাতার সেবা নিবেদন করে, সেই মুহূর্ত্তে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

উদ্দেশ্য, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর উপদেশ ও আদেশ গ্রহণ।

যমুনার তীরে প্রকাণ্ড কদম গাছের তলায় নিবিড় ঘন তুলসীকুঞ্জে ঐ বুড়ো মানুষটিকে ওদেশের কেউ চিনত না। কিন্তু একটু ভাল করে নিরীক্ষণ করলে আমরা চিনতে পারব নিশ্চয়।

সে-গৌরবর্ণ এখন তাম্বার রঙে পরিণত হয়েছে। কালো চুল পেকে জটায় নিবিড় হয়ে গেছে। গোঁফ-দাড়ি মুখের উপর বটের ঝুরির মতই ঝুলছে। পরণে ধুতি নেই, কোপনি। সেই কোপনির দিকে চেয়ে চেয়ে একগাল হেসে বলেন—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

নয়তো কি? ভগবান্ যাঁর নিত্য অতিথি সে ভাগ্যবান্ ছাড়া আর কি?

কৃত্তিবাস কোন দিন ভিক্ষায় বার হন নি। নিজেরও তুলসীপাতার সেবা চলে। ভক্তেরা এসে ভাঁড় ভরিয়ে দিয়ে বলে—"আজ দয়া করে ভগবান্কে অন্ন-ভোগ নিবেদন করুন।"

"তবে তাঁর তাই ইচ্ছে—" বলে হাসেন শিরোমণি। জলে ঝড়ে কদমতলায় বাস; শুধু একটু তালপাতার ছাউনি কে করে দিয়েছে বিগ্রহের জন্যে।

কিন্তু দিন যে ফুরিয়ে আসে। সন্ন্যাসী, কোথায় সন্ন্যাসী! কবে তিনি আসবেন? না এসে কি থাকতে পারেন? বিষ্ণুর কাছে এসেছিলেন। আসবেন, আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি।

কৃত্তিবাসের চোখে ঘুম নেই। যমুনার তীরে শেষ রাতে লাল রঙের চাঁদখানা যেন অভিমানে মুখ ভার করে আছে। ওদিকে উদয়াচলে আলোর সমারোহ লেগে গেছে।

দূরে—দূরে। উঁচু-নীচু পথ অতিক্রম করে ঐ না—সন্ন্যাসী? অশীতিপর বৃদ্ধ, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়।

ছুটে গিয়ে কৃত্তিবাস বললেন—"জয় হোক। এস বাবা, আমার প্রভুর তুলসীকুঞ্জে···তোমারই প্রতীক্ষায়—"

সন্ন্যাসীর চোখ দুটি ঘোলা হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস শ্বাসে পরিণত হয়েছে। বললেন—"জল, জল···জল···আমার মাথায় তুলসীর ডাল দিয়ে শুইয়ে দাও···"

সন্ন্যাসীর জ্ঞান লোপ হয়ে গেল।

মুখে জল দিয়ে, মাথায় বাতাস করে সন্ন্যাসীর জ্ঞান হল।

শিরোমণি জোড়হাত করে বললেন—"বাবা আদেশ···"

"কি আদেশ? কিসের আদেশ?"

শিরোমণি দামোদর শিলা বার করে এনে বললেন, "এই শিলার সেবা করার আদেশ···"

দুই বাহু তুলে সন্ন্যাসী বললেন—"এই যে আমার হারিয়ে যাওয়া গোপাল। আমার বুকে দাও ওঁকে।"

"আমার গোপাল।"

বুকের উপর গোপালকে রাখতেই সন্ন্যাসী হাঁ করে বললেন—"জল, জল···"

জল পান করে শান্ত হয়ে বললেন—"শিরোমণি ঠাকুর—আপনি? আঃ নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারব আজ। আপনার হাতে রইল গোপালের সেবার ভার···"

"কে তুমি, বাবা?"

"আমি? আমি তোমাদের শ্রীচরণের দাসানুদাস··· চিনতে পারছেন না? আমি বিষ্টুদাস মুচি।"

বিষ্ণুর দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার আত্মা তখন বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করেছে।

বাঙ্গালার মৎস্য

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

মৌরলা জাতি (Minnow) :

মৌরলা জাতি পোনা-শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র মৎস্য। এই জাতির মধ্যে অনেক গুলি অধিজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় এমন পুষ্করিণী নাই! যাহাতে মৌরলা মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র মৎস্যকুলের মধ্যে ইহাদের বংশবৃদ্ধি অত্যধিক হইতে দেখা যায়। এই জাতির মৎস্য যেমন সুস্বাদু, তেমনই রোগীর পক্ষে সুপথ্য ও মহোপকারী বলিয়া বিখ্যাত। ইহা অল্প-পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য বলিয়া শিশুর ক্ষেত্রেও ইহার ঝোল নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। ইহারা দন্তহীন মৎস্যশ্রেণীর অন্তর্গত— শৈবাল, কীট, পতঙ্গ ইহাদের খাদ্য। মৌরলা মৎস্য নানা অধিজাতিতে বিভক্ত, যথা :—(১) বড় সাদা মৌরলা; (২) হরিদ্রাভ মৌরলা (৩) ক্ষুদ্র লাল মৌরলা, ও (৪) বড় চাঁদা মৌরলা। মৌরলাগণের মধ্যে চাঁদা মৌরলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা মিষ্ট জলের অধিবাসী।

(১) বড় সাদা মৌরলা—Amblypharyngodon mola—ইহাদের মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দেহের মধ্যভাগ বিস্তৃত, কানকো হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটী উজ্জ্বল চওড়া শ্বেতবর্ণের দাগ অঙ্কিত দেখা যায়। ছোট নদী, ঝরণা ও পুষ্করিণী ইহাদের বাসস্থান। বর্ষা ও বসন্তকালে বৎসরে দুইবার ডিম ছাড়িয়া থাকে। পুকুরে ইহারা এত দ্রুত বর্দ্ধিত হয় যে অনেক সময় স্নানার্থীদিগের স্নান করিবার অসুবিধা হয়। সাধারণ বড় সাদা মৌরলা গড়ে ২॥০—৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়।

(২) হরিদ্রাভ মৌরলা—Danco Acquipinnatus—ইহারা আকৃতি-প্রকৃতিতে প্রায় বড় সাদা মৌরলার অনুরূপ, তবে ইহারা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণের ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। ইহারা অধিকাংশ মিষ্ট জলের নদী ও বিলে বাস করিয়া থাকে।

(৩) ক্ষুদ্র লাল মৌরলা—ইহারা আকারে১—১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদেরও বর্ণ হরিদ্রাভ, কিন্তু ইহার দুইপার্শ্বে 'সেলাইয়ের দাগে'র নিকট লোহিত বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয় এবং ইহার চক্ষু ও কানকোর নিকট লোহিত বর্ণের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি ও অন্যান্য গুণাদিতে ইহারা অন্যান্য মৌরলা মৎস্যের অনুরূপ।

(৪) চাঁদা মৌরলা—Rohtea Alfrediana—আকৃতি প্রায় বড় সাদা মৌরলার অনুরূপ, তবে ইহারা আকারে খুব বৃহৎ ও বিস্তৃত। দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ৫—৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতেও দেখা যায়। ইহারা বড় নদী ও হ্রদে বাস করিয়া থাকে। আমাদের দেশের নদীতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের বড় বড় নদীতে অনেক সময় ইহাদের দেখা যায়। ইহারা বৎসরে মাত্র বর্ষাকালে একবার ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

ডানকোনা জাতি (Dace) :

মৌরলার পরেই ডানকোনা জাতি খুব উল্লেখযোগ্য মৎস্য। ইহারা পোনা জাতির অন্তর্গত না হইলেও, প্রকৃতি ও সাদৃশ্যে ইহারা মৌরলার জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইহারাও মৌরলার ন্যায় দন্তহীন এবং শৈবাল ও কীটভুক্ মৎস্য। ডানকোনার মধ্যে অনেক অধিজাতি দৃষ্ট হয়। মৌরলার ন্যায় ইহারা বৎসরে দুইবার ডিম্ব প্রসব করে ও জলাশয়ের অগভীর স্থানে বিচরণ করে। মৌরলা যেমন মিষ্ট জল ভিন্ন বাস করিতে পারে না, ডানকোনা জাতি কিন্তু তেমন ভাবে জীবন ধারণ করে না; ইহাদের মধ্যে দুই চারিটী জাতি লোনা জলেও বাস করিতে পারে। ডানকোনা জাতির এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, ইহাদের পৃষ্ঠরেখা উপর দিকে ঈষৎ বক্রাকার, দেহ গোলাকার ও সরু এবং কানকো হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত সোনালী বা কৃষ্ণবর্ণের বিস্তৃত রেখার দ্বারা অঙ্কিত। ইহাদের মস্তকের অগ্রভাগ ঈষৎ চেপ্টা ও চক্ষু বৃহৎ।

বাঙ্গালাদেশের ডানকোনা জাতির মধ্যে নিম্নলিখিত অধিজাতিগুলি দেখা যায়, যথা :—(১) সোনা খড়কে ; (২) দাঁড়কে ; (৩) বড় ডানকোনা ; (৪) চাঁদা ডানকোনা ; (৫) ডানকোনা বাটা ; (৬) ধানি ; (৭) জেব্রাধানি ; (৮) তেচোকা ; (৯) ঝানাচুনা।

(১) সোনা খড়কে (Esomus Dauricus)—ইহারা দেখিতে অনেকটা মৌরলার মত হইলেও ডানকোনার সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। ইহাদের দুই-পার্শ্বে 'সেলাইয়ের দাগে'র নিকট উজ্জ্বল সোনালী বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়, এই কারণে উহারা সোনা-খড়কে নামে বিখ্যাত। ইহারা দৈর্ঘ্যে ২।৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দেহের গঠনাদি অনেকাংশে ডানকোনার মত। ইহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ শ্বেত। ছোট নদীই ইহাদের আদি বাসস্থান।

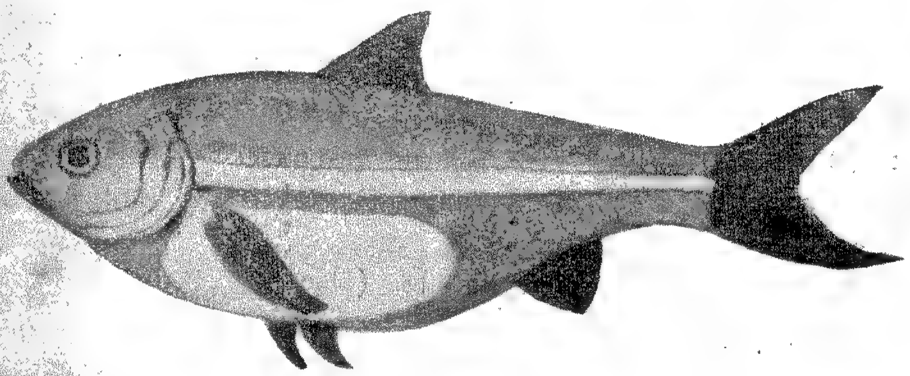

চাঁদা মৌরলা।

ইহার মাংস গুণে মৌরলার মত উপকারী বলিয়া মৌরলার ন্যায় ইহার আদর যথেষ্ট। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে এই মৎস্য যথেষ্ট দেখা যায়। তবে দুঃখের বিষয়, ক্ষুদ্র জাতির মৎস্য বলিয়া ইহাদের সংরক্ষণ ও পালনে লোকের তাদৃশ আগ্রহ নাই এবং ফলে বাঙ্গালায় ইহাদের বংশ খুব দ্রুত লোপ পাইতেছে।

(২) দাঁড়কে (Flying Barb)—ইহারা ক্ষুদ্র জাতীয় ডানকোনা বিশেষ। ইহাদের দেহ সরু, গোলাকার, চক্ষু বৃহৎ ও বর্ণ হরিদ্রাভ শ্বেত। মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, নিম্ন বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশাদিতে ইহাদের যথেষ্ট পরিমাণ দেখা যায়। ইহারা পতঙ্গভুক্ মৎস্য—মশক, শুককীট ইহাদের প্রিয় খাদ্য। ইহারা খুব অল্পজলে লতা গুল্মের অন্তরালে বাস করে। ইহারা বৎসরে দুইবার ডিম্ব প্রসব করে। ইহাদের মাংসগুণ তিক্ত, লঘু, পিত্তকর ও কফবাতনাশক।

(৩) বড় ডানকোনা (Danco Riro)—ইহারা ডানকোনা জাতির মধ্যে আকারে বেশ বড়। ইহাদের পার্শ্বের দাগদুটি খুব বিস্তৃত ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা সাধারণতঃ মিষ্ট জলের অধিবাসী, লোনা জলে প্রায়ই ইহারা বাঁচে না। শৈবাল ও কীট ইহাদের খাদ্য। বর্ষায় বৎসরে একবার মাত্র ইহারা অল্প জলে গুল্মযুক্ত স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। দৈর্ঘ্যে ইহারা ২॥০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মাংসগুণ দাঁড়কের মত।

(৪) চাঁদা ডানকোনা (Giant Danco)—আকৃতিতে ইহারা অনেকটা বড় কাঠচাঁদা মৎস্যের মত দেখিতে। দেহ পাতলা ও উদর হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত খুব বিস্তৃত, দেহে আঁশ বর্ত্তমান ও দেহস্থ কাঁটা সাধারণ ডানকোনা অপেক্ষা বৃহৎ ও কঠিন। দেহের বর্ণ খুব উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের না হইলেও ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্বেত। 'সেলাইয়ের দাগে'র নিকট রেখাদ্বয় ডানকোনার ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণের না হইয়া রূপালী শ্বেত বর্ণের, প্রায় মৌরলার ন্যায়। কিন্তু ইহার মস্তক ও গ্রীবার গঠন ডানকোনার ন্যায়। ডানকোনার ন্যায় চক্ষু দুইটিও খুব বৃহৎ। ইহার আস্বাদ উত্তম ও ইহার মাংসগুণ কিঞ্চিৎ পিত্তকর। দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রবল বর্ষায় বৎসরে মাত্র একবার ডিম্ব প্রসব করে। মিষ্ট ও লোনা উভয়বিধ জলেই ইহারা বাস করিতে পারে। দক্ষিণ বঙ্গের নদী প্রভৃতিতে ইহাদের যথেষ্ট দেখা যায়। শৈবাল ও পতঙ্গ ইহাদের খাদ্য।

(৫) ডানকোনা বাটা (Rasbora Daniconius)-পার্ব্বত্য নদীতে ইহারা সাধারণতঃ বাস করে। ভারতের নানাস্থানে ইহাদের দেখা যায়। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায়

৫।৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা শৈবালভুক্। লোনা জলে ইহা বাস করিতে পারে না। ইহাদের আঁশ বৃহৎ, বর্ণ ধূসর ও হরিদ্রা, কানকো হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত পার্শ্বরেখাদ্বয় খুব বিস্তৃত ও কৃষ্ণবর্ণের। প্রথম বর্ষায় ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের মাংস-গুণ বাটা মাছের ন্যায় উপকারী।

(৬) ধানি (Brachy Danco Reris)—ইহারা দৈর্ঘ্যে ১-১½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারাও ক্ষুদ্র ডানকোনা বিশেষ। ইহারা লোনা জলে বাস করিতে পারে। সমস্ত ডানকোনা জাতির মধ্যে ইহাদের চক্ষু বৃহদাকার। বর্ষা ও বসন্তে ইহারা বৎসরে দুইবার ডিম্ব প্রসব করে। ইহাদের মাংসগুণ তিক্ত ও পিত্তকর।

খাদ্য। অন্যান্য ডানকোনা জাতির ন্যায় ইহারাও শত্রু ভয়ে তীরস্থ অগভীর ও স্বল্প জলে বিচরণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ এই মৎস্য কেহ খায় না। ইহার মাংসগুণ ডানকোনার মত। সমগ্র বাঙ্গালার পুষ্করিণী ও চুণ্টাদিতে ইহাদের বিচরণ করিতে দেখা যায়। দৈর্ঘ্যে ইহারা ১½।২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বৎসরে মাত্র বর্ষায় ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

(৯) ঝানাচুনা (Micro Rasbora Rubescens)—ইহারা ডানকোনা জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ইহারা লোনা ও মিষ্ট জলের অধিবাসী। দৈর্ঘ্যে ½—¾ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহার মাংস-গুণ কটু, উষ্ণ, লঘু ও মলসংগ্রাহক। ইহারা বর্ষায়

ডানকোনা চাঁদা।

(৭) জেব্রা ধানি (Danco Zebrina)—ধানি অধি-জাতিগণের মধ্যে ইহারা বিশিষ্ট মৎস্যবিশেষ। ইহাদের বৃহৎ চক্ষু ও কানকো হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত লম্বালম্বি বহু কৃষ্ণবর্ণের ডোরা দাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা খুব সুদৃশ্য মৎস্য, বর্ণ-শফরাদির মত পালিত হইবার যোগ্য। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদের বহু সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৮) তেচোকা—(Panchax Panchax [Draws])—ইহারাও ডানকোনা জাতির অন্তর্গত মৎস্যবিশেষ। ইহাদের চেপ্টা মস্তক ও তদুপরি একটি তৃতীয় নেত্রের ন্যায় রূপালী বিন্দু-শোভিত চিহ্ন, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুদৃশ্য পুচ্ছ ও গোল দেহ, সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কীট, পতঙ্গ, শৈবাল, মশক শুককীট ও ডিম্ব ইহাদের

ডিম্ব প্রসব করে ও প্রতি মৎস্য গড়ে দেড় সহস্র ডিম্ব পাড়িয়া থাকে। লোকে ইহার ঝাল ও অম্বল খাইয়া থাকে।

ইলিশ জাতি (Cuplex Ilisha) :

মৎস্যকুলের মধ্যে ইলিশ জাতি একটী বিখ্যাত মৎস্য। ভারতের, তথা বাঙ্গালার মিষ্ট জলের নদীতে ইহারা যথেষ্ট সংখ্যায় বিচরণ করিলেও, মূলতঃ ইহারা সমুদ্রের অধিবাসী। উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রজল ও নদীমোহানায় ঘোলা লবণাক্ত জল ইহাদের আদি বাসস্থান। গভীর সমুদ্রজলে ইলিশ মৎস্য দেখা যায় না। ইলিশ জাতি বিখ্যাত হেরিং জাতির অন্তর্গত অধিশ্রেণীর মৎস্য। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র হেরিং জাতি ও তদন্তর্গত অধিজাতিগণের সন্ধান পাওয়া যায়। হেরিং জাতির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মৎস্যগুলি বিশেষ বিখ্যাত যথা :—(১) শ্যাড্; (২) হেরিং ভোয়ার্ক; (৩)

আমলেট ; (৪) পিলচার্ড ; (৫) এ্যানকোভী। ইলিশ মৎস্য উপরে উক্ত শ্যাড্ অধিজাতির অন্তর্গত মৎস্য। ভারতীয় শ্যাড্ বলিতে আমাদের ইলিশকেই বুঝায়। এই শ্যাড বা ইলিশ মৎস্য ইউরোপেও দেখিতে পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক প্রভৃতি উত্তর-ইউরোপীয় দেশে এই ইলিশ মৎস্য ওল্লিসা (Ollisa) নামে বিখ্যাত। যাহা হউক, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বা ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইলিশ

ইলিশ।

মৎস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও, বাঙ্গালার ইলিশের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও স্বাদু মৎস্য জগতে বিরল। বিখ্যাত পৃথিবী-ভ্রমণকারী পরলোকগত মিঃ হেনরী মার্টিনি সাহেব যখন পর্য্যটন-ব্যপদেশে বাঙ্গালায় আগমন করেন, তখন কলিকাতাবাসীরা তাঁহার সম্মানার্থ যে ভোজ দেন, তাহাতে তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী ভ্রমণ-ব্যপদেশে তিনি যত দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, সে সকল স্থানের ভোজে তিনি যে সকল খাদ্য খাইয়াছেন, তাহার মধ্যে বাংলার ইলিশ মৎস্য ও আনারসের ন্যায় উৎকৃষ্ট আস্বাদন-যুক্ত মৎস্য ও ফল তিনি জীবনে কখনও আহার করেন নাই। বাংলার ইলিশের পক্ষে ইহা যে গৌরবজনক আখ্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমলেট।

স্যামন্ মৎস্যের ন্যায় ইলিশ মৎস্যও অভিযানকারী মৎস্য। নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে যেমন সামুদ্রিক স্যামন মৎস্য সমুদ্র ছাড়িয়া মিষ্ট জলের নদীতে প্রবেশ করিয়া সুদূর অন্তর্দ্দেশে গমন করিয়া ডিম্বাদি প্রসব করিয়া থাকে, ইলিশ মৎস্যও তদ্রূপ বসন্তকালের প্রারম্ভে সমুদ্র ছাড়িয়া মিষ্টজলের নদীতে প্রবেশ করিয়া জোয়ারের টানে সুদূর অন্তর্দ্দেশে গমন করিয়া থাকে। উহারা বসন্তকালে নদীতে প্রবেশ করিয়া প্রায় ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ডিম্বাদি প্রসব করে এবং পরে অপেক্ষাকৃত বড় শাবকগণকে লইয়া সঙ্গে পুনরায় তাহারা সমুদ্রে ফিরিয়া যায়। সমুদ্রের জল ছাড়িয়া, উহারা যতকাল পর্য্যন্ত নদীতে বাস করে, স্যামন মৎস্যের ন্যায় সম্ভবতঃ উহারা কিছু খায় না। এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, বাস্তবিক উক্ত সময়ে ইলিশ মৎস্যের উদরে কোন খাদ্য ভুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃহৎ মৎস্যগণ সমুদ্রে ফিরিয়া যাইবার সময়, কেবল ডিম্ব-নিঃসৃত শিশু-শাবকগণ নদীতে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সমুদ্রে যেমন অন্য জাতির মৎস্যেরা শাবকগণকে সহজে সংহার করিয়া থাকে, নদীর অন্তর্দ্দেশে থাকিলে ইলিশ শাবকগণের সেই আশঙ্কা থাকে না। বোধ হয় এই জন্যই ইলিশ মৎস্য নদীতেই ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন মৎস্যগণ নদীতে আসে, তখন তাহাদের দেহ-সৌন্দর্য্য ও আস্বাদন অতি উত্তম থাকে, কিন্তু ডিম্ব প্রসবাদির পর স্ত্রী বা পুং উভয় জাতির মৎস্যের দেহ-সৌন্দর্য্য ও আস্বাদন সেই প্রকার থাকে না। অনেকে মনে করেন যে, এই ডিম্ব-প্রসবাদির সময়ে মৎস্যেরা কিছু আহার না করিলেও উহাদের দেহস্থ তৈল ও বসা উহাদের প্রাণ রক্ষার কারণ হইয়া থাকে।

শিশু ইলিশ নদীমধ্যস্থ খয়রা বা চাপলে মৎস্যের শাবকের সহিত একত্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শৈশব অবস্থায় খয়রা ও ইলিশ মৎস্য প্রায় একই প্রকার দেখিতে থাকে।

উভয়ের মধ্যে যে সামান্য আকৃতিগত বৈষম্য রহিয়াছে, খুব লক্ষ্য না করিলে তাহা দেখা যায় না। ইলিশ মৎস্য যত বড় হয় খয়রা মৎস্যের সহিত তাহার পার্থক্য ততই প্রকট হইয়া পড়ে। এক বৎসরে ইলিশ শিশু প্রায় ৬।৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নদীতে প্রায় এক বৎসর বর্দ্ধিত হইবার পর শাবকগণ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে এবং দুই তিন বৎসর সমুদ্রে যাপন করিবার পর আবার পঞ্চম বর্ষে নদীতে সদলে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইলিশ মৎস্য প্রায় তিন বৎসর অতীত হইলে পর ডিম্বধারণক্ষম হইয়া থাকে বা যৌবন প্রাপ্ত হয়। একটী ইলিশ গড়ে প্রায় ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

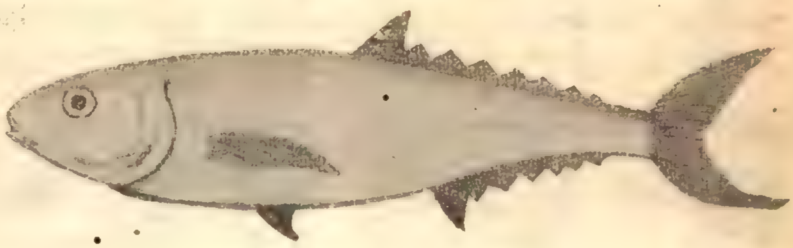

হেরিং।

স্যামন ও কড মৎস্যের ন্যায়, প্রতি পাঁচ বৎসরান্তর ইলিস মৎস্য সদলে নদীতে বর্দ্ধিত সংখ্যায় প্রবেশ করিয়া থাকে। সেই জন্য দেখা যায় যে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ইলিশ মৎস্য খুব অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। ১৯৩৪ অব্দে যেরূপ বহুল পরিমাণে ইলিশের আমদানি বাঙ্গালায় হইয়াছিল, বর্ত্তমান ১৯৩৯ অব্দেও ঠিক সেই প্রকার অগণিত সংখ্যায় ইলিশ মৎস্যের আমদানি হইয়াছিল, এই কথা বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন।

বাংলার হিন্দু সমাজে এরূপ নিয়ম আছে যে, শারদীয় বিজয়া দশমীর পর দিন হইতে বাসন্তী পঞ্চমী পর্য্যন্ত কেহ কেহ ইলিশ মৎস্য আহার করেন না, ঐরূপ আহার করাকে তাঁহারা ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মনে করেন না। শ্রীপঞ্চমীর পর একটী শুভ দিনে ইলিশ-শাবক বা খোকা ইলিশ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তৈল, সিন্দূর ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা উহাকে বরণ করিয়া প্রথম ইলিশ মৎস্যের আবির্ভাবকে অনেকে অভিনন্দিত করেন। পূর্ব্বে উক্ত বিজয়া দশমী হইতে মাঘ পর্য্যন্ত বাজারে ইলিশ মাছের তাদৃশ চাহিদা না থাকায়, ধীবরগণ উহা আমদানী করিত না। এই নীতি বাস্তবিক যথার্থ ধর্ম্মানুমোদিত হউক আর না হউক, উহার মধ্যে একটী সুন্দর সংরক্ষণ-নীতি বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গালী অবনত শিরে এই সামাজিক প্রথা ও নীতিটিকে পূর্ব্বে মান্য করিত। এই নিষিদ্ধকাল মধ্যে ইলিশ খাওয়ার নিষেধ থাকায় শিশু ইলিশ অযথা নিহত না হইয়া অব্যাহত ভাবে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন এই সুন্দর সংরক্ষণ-নীতি, বাঙ্গালী আর মানিতে চাহে না। আমরা যতই তথাকথিত আধুনিক হইতেছি, ততই আমরা আমাদের দেশগত ও পিতৃপুরুষাদি-অনুমোদিত নীতিগুলিকে প্রাচীন কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমাদের আধুনিক জিহ্বার উচ্ছৃঙ্খল পরিতৃপ্তির জন্য জেলেরাও আমাদের চাহিদা অনুযায়ী শিশু ইলিশ দলে দলে নিহত করিয়া, আমাদের ভবিষ্যতের খাদ্যভাণ্ডারের অপচয় ও অভাব ঘটাইতেছে। যে ইলিশ বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য, তাহার সংরক্ষণ না হইলে, কালে শীঘ্রই যে উহা প্রায় লোপ পাইবে তাহাতে সন্দেহ

খয়রা (চাপলে)

নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী জানিত যে ইলিশ মৎস্য যৌবন-প্রাপ্ত না হইলে, উহার দেহপুষ্টি ঘটে না এবং খাইতে সুস্বাদু হয় না। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা মৎস্য-ভোজী মাত্রেই জানেন। যে জাতি এতাদৃশ বহু সুপ্রাচীন নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অগ্রসর না হইয়া, অযথা খেয়ালবশে ইহা ভঙ্গ করিতে সাহসী হয়, তাহার পরিণাম কখনও শুভ হয় না।

ইলিশ জাতির মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত অধিজাতি দেখিতে পাই, যথা :—(১) ইলিশ ; (২) খয়রা ; (৩) আমলেট।

(১) ইলিশ (Cuplex Ilisha)—ভারতের সিন্ধু, পদ্মা, গঙ্গা ও কৃষ্ণা নদী প্রভৃতিতে যথেষ্ট ইলিশ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মা ও গঙ্গার মোহানার মৎস্য তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব্ববঙ্গে চন্দনা নামে ইলিশের একটি বিশেষ শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। উহা প্রকৃত পক্ষে ইলিশ হইলেও, সাধারণ ইলিশের সহিত ইহার আকৃতিগত পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ ইলিশ অপেক্ষা ইহা একটু অধিক দীর্ঘ ও সরু হইয়া থাকে, ইহার মস্তক একটু বড় ও দেহ অধিক লোহিতাভ। একটি ইলিশ গড়ে ১॥০-২॥০ লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

(২) খয়রা (Cuplex Khaira)—আমরা যে সাধারণ খয়রা বা চাপলে মৎস্য দেখিতে পাই, তাহা ডোয়ার্ফ হেরিং জাতির অন্তর্গত। ইলিশ অপেক্ষা ইহারা ক্ষুদ্র, পাতলা ও ছোট আঁশযুক্ত হইয়া থাকে। আস্বাদনে খয়রা মৎস্য প্রায় ইলিশের তুল্য। একটি খয়রা মৎস্য গড়ে ৩০।৪০ সহস্র ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহারা মিষ্ট ও লোনা উভয়বিধ জলেই বাস করিতে পারে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বর্ষাকালে এই মাছ পুষ্করিণীতে প্রবেশ করে এবং সেখানেও ইহাদের মৌরলা মৎস্যের ন্যায় ডিম্ব হইতে ছানা জন্মায়। বর্ষাকালে বারিপাতের সময় ইহারা আনন্দে জলের উপর পাশ কাটিয়া সন্তরণ করে। সে সময়ে সমস্ত পুষ্করিণী অতি মনোহর রৌপ্যোজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। লোনা জল ও সমুদ্রের নিকটে নদীর মোহনাদিতে যে বৃহদাকার খয়রা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে গাং-চাপলে বা গাং-খয়রা বলে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪—১৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গাং-খয়রাও হেরিং মৎস্য বংশসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত।

(৩) আমলেট জাতি—ইহারাও ইলিশ জাতির অন্তর্গত মৎস্য। ইহারা দেখিতে অনেকটা ইলিশের মত হইলেও, ইহাদের দেহ পাতলা ও বিস্তৃত এবং দেহস্থ আঁশ ও চক্ষু বৃহৎ হইয়া থাকে। ইলিশ জাতির ন্যায় ইহাদের দেহে সরু কাঁটার আধিক্য খুব বেশী হইতে দেখা যায়। ইহারাও মিষ্ট জলে ও মোহানার ঘোলা লবণাক্ত জলে বাস করিতে পারে। আমলেট মৎস্য গড়ে ১-১।০ লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। আস্বাদনে আমলেট মৎস্য ইলিশ ও খয়রা মৎস্যের ন্যায় উত্তম হয় না। ইলিশের ন্যায় বাজারে ইহার চাহিদা অধিক নাই। সামুদ্রিক আমলেট দৈর্ঘ্যে প্রায় ২॥০ ফিট পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। শ্রাবণ ও ভাদ্রের প্রবল বর্ষায় ইহারাও ইলিশের ন্যায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহারাও বর্ষা-কালে সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশের পুষ্করিণী আদিতে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেখানে ইহাদের ছানা জন্মায় না।

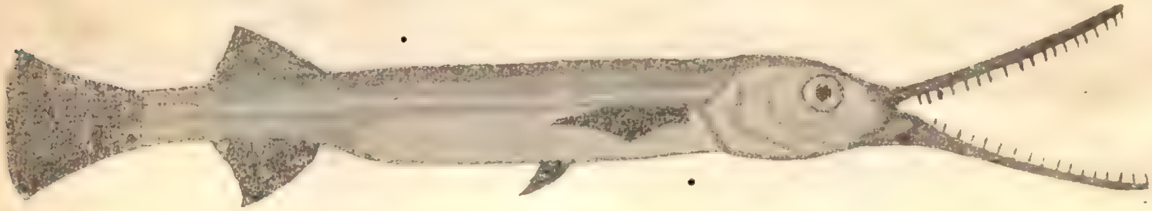

গাংদাড়া।

খড়কে ঠুঁটী।

(৫) হেরিং মৎস্য (Herring)—প্রকৃত হেরিং মৎস্য সমুদ্রের অধিবাসী। ইলিশ, খয়রা, আমলেট, চেলা,

ফেঁসা প্রভৃতি মৎস্য এই গাষ্ঠীর অন্তর্গত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হেরিং গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল মৎস্যের মধ্যে পরস্পর দৈহিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে। খয়রাকে খর্ব্ব হেরিং বা Dwarf Herring বলিলেও, সামুদ্রিক হেরিং-এর সহিত ইহার একটু আকৃতিগত পার্থক্য আছে। সামুদ্রিক হেরিং দৈর্ঘ্যে ইলিশ অপেক্ষা বৃহৎ হয় না। ইহাদের চক্ষু মধ্যমাকার, ত্বক স্থূল ও আঁশশূন্য; দেহস্থ কণ্টকাদি খুব অল্প ও খুব দৃঢ় হয়। ইলিশ বা আমলেট ও খয়রার মত ইহাদের মাংস নরম ও সরু কাঁটাযুক্ত নহে। কিন্তু আস্বাদনে ইহা ইলিশ বা খয়রার মত সুন্দর নহে। সমুদ্রের উজান স্রোতে হেরিং মৎস্য দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, ইহারাও ডিম্ব ও ক্ষুদ্র মৎস্যাদি আহার করিয়া থাকে। সমুদ্রে এক একটি হেরিং-এর দলে প্রায় ১৫ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ পর্য্যন্ত মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে শীতকালে হেরিং মৎস্য ধরিবার ঋতু নহে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম কাল এই মৎস্য ধরিবার উপযুক্ত ঋতু। ইউরোপের হেরিং মৎস্যের চাহিদা খুব অধিক। ইহা গুরু, বৃষ্য ও পিত্তবৃদ্ধিকর বলিয়া কথিত।

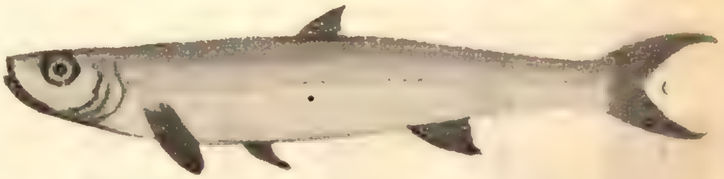

শীর্ষে।

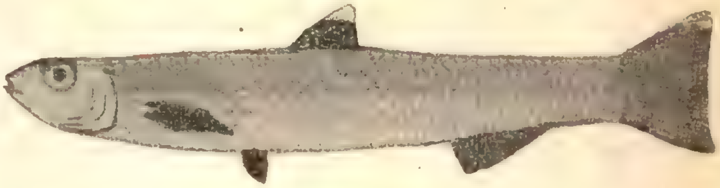

ভাঙ্গন।

চেলা (Chela Bacaila) :

ইহারা সাধারণতঃ মিষ্ট জলের অধিবাসী। আমাদের দেশের প্রায় সকল পুষ্করিণীতে চেলা মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চেলা সাধারণতঃ ৪ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না। উহার বৃহৎ চক্ষু ও উপর দিকে বঙ্কিম পৃষ্ঠরেখা (concave dorsal line) সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার দেহে খয়রা প্রভৃতির ন্যায় সরু কাঁটা নাই বলিয়া সকলে ইহা পছন্দ করে। চেলা খুব সুস্বাদু মৎস্য। ইহারা তিনটী অবিজাতিতে বিভক্ত যথা:—(১) চেলা ; (২) শীর্ষে ; ও (৩) গাংচেলা। শীর্ষে মৎস্য একজাতির ক্ষুদ্র চেলা মৎস্য, ইহার পৃষ্ঠরেখা চেলার মত উপর দিকে বক্রাকার না হইয়া সাধারণ মৎস্যের ন্যায় নিম্নদিকে বঙ্কিম ভাবযুক্ত। চেলা ও শীর্ষে মৎস্য কীট-পতঙ্গভুক্, মশক শুককীটাদি খাইতে ভালবাসে। গাংচেলা সাধারণতঃ লোনা জল ও সামুদ্রিক মোহানাতে বাস করে। আকারেও সাধারণ চেলা অপেক্ষা বৃহৎ ও বলবান হইয়া থাকে। সামুদ্রিক চেলা সমুদ্রের ছোট মৎস্যশিশু ও ডিম্বাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই গাংচেলা মৎস্য পিলচার্ড নামে বিখ্যাত। আমাদের দেশে বিলাতী বা ক্যানাডীয় সার্ডিন্ নামে টিনে করিয়া রক্ষিত যে মৎস্য আমদানি হইয়া থাকে, তাহা এই পিলচার্ড শ্রেণীর মৎস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সার্ডিন বলিয়া কোন বিশিষ্ট মৎস্যশ্রেণী নাই। চেলা লঘু, স্বাদু, বায়ু ও কফ-নাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রদ।

ফেঁসা (Anchovy Chirocentrus Dorab) :

ইহা বাঙ্গালার একটী সর্ব্বজনবিদিত মৎস্য। আকারে প্রায় চেলা মৎস্যের তুল্য হইলেও, চেলার সহিত ইহার আকৃতিগত যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ইহার চক্ষু বৃহৎ, মুখের দিক চেলার মত ঈষৎ কোণযুক্ত নহে, দেহ পাতলা, চেলা অপেক্ষা বিস্তৃত ও ত্বক আঁশশূন্য। দেহমাংস চেলার মত কাঁটাশূন্য নহে, পরন্তু বহু সরু ও তীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত বলিয়া অনেকে ইহা খাইতে পছন্দ করেন না। বড় পুষ্করিণী ও নদী ইহার জন্মস্থান, কীট-পতঙ্গ ও মৎস্যডিম্বাদি ইহার খাদ্য। বিলাতে ইহাকে অ্যাংকোভী (anchovy) মৎস্য বলে ও তথাকার লোকেরা ফেঁসা মৎস্য তৈলের সহিত চটকাইয়া বোতলে আচারের মত রক্ষা করিয়া আহার করিতে ভাল-

বাসে। ৮।১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ কেঁসা মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে ও বসন্তকালে ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহার মাংসগুণ লঘু, অল্পপুষ্টিকর ও বায়ুপিত্তকর।

পারশে জাতি (Grey mullet) :

পারশে মৎস্য বাঙ্গালায় একটী বিশিষ্ট স্বাদু মৎস্য। ইহারা লোনা ও মিষ্ট উভয়বিধ জলেই বাস করিয়া থাকে। সাধারণ পারশের আকার খুব দীর্ঘ হয় না, নদীতে সচরাচর

পারশে।

৬।৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ পারশে মৎস্য দৃষ্ট হয়। চেপটা মস্তক ঈষৎ গোলাকার দেহ, ঈষৎ উচ্চ বৃহৎ চক্ষু ইহাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য। কীট, শৈবালাদি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যাদি ইহাদের খাদ্য। ইহাদের দেহমাংস নরম, স্বাদু ও কাঁটাশূন্য বলিয়া ইহাদের চাহিদা খুব অধিক। পারশে শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি অধিশ্রেণী দেখা যায়—(১) সাধারণ পারশে; (২) গাং-পারশে; (৩) ভাঙ্গন, ও (৪) খরসুলা বা তারুই মৎস্য।

বড় ডানকোনা।

সাধারণ পারশে (Mugil Parsia)—বসন্তকালে খুব আমদানি হইয়া থাকে এবং উক্ত সময়ে ও গ্রীষ্মের শেষে উহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। পারশে মৎস্যের ডিম্ব খুব সুস্বাদু বলিয়া বিখ্যাত। ইহা লঘু, মিষ্ট, স্বাদু ও কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রদ।

গাং-পারশে (White mullet)—ইহারা আকারে খুব বৃহদাকার হইয়া থাকে। দেড় সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত গাং-পারশে খুব দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে ইহাকে সাদা ভাঙ্গনও বলিয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে ইহাদের ৩৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ভেড়ীর লোনা জল, নদী-মোহানা ও সমুদ্র খাড়ী ইহাদের আবাসস্থান। ইহাদের মাংস পারশের ন্যায় স্বাদু ও গুণসম্পন্ন।

(৩) ভাঙ্গন (Red mullet Mugil ; Bhangan)—ইহা পারশে জাতির অন্তর্গত একটী খুব পরিচিত মৎস্য। চেপ্‌টা মস্তক, গোলাকার দেহ, রক্ত হরিদ্রাভ মিশ্রিত বর্ণ ইহার বৈশিষ্ট্য। পারশে জাতির ন্যায় ইহার পুচ্ছাগ্র অবিভক্ত ও সমান। আকারে ও ওজনে এক একটী ভাঙ্গন মৎস্যকে খুব বড় ও গুরু হইতে দেখা যায়। লবণাক্ত মোহানার ভাঙ্গন সময় সময় ৩০।৩২ ইঞ্চি লম্বা ও ৪।৫ সের ওজনের হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার মাংস স্বাদু ও কাঁটাবিহীন বলিয়া বাজারে ইহার চাহিদা খুব অধিক। বড় নদী, ভেড়ী ও মোহানা ইহার আদি বাসস্থান। ইহার মাংসগুণ কিঞ্চিৎ গুরু ও পিত্তকর। প্রথম বর্ষায়

দাঁড়কে।

ইহারা ডিম ছাড়িয়া থাকে। শৈবাল, চিংড়ী ও ছোট কীটাদি ইহার খাদ্য।

(৪) খরসুলা বা তারুই (Mugil Corsula)—বাংলার প্রায় অনেক পুষ্করিণীতে খরসুলা দেখা যায়। ধুসরবর্ণ দেহ, গোলাকার চক্ষু, খুব উন্নত ও অবিভক্ত পুচ্ছ ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহারা যখন জলে সাঁতার দেয়, ইহাদের চক্ষু দুইটী তখন জলের উপর জাগিয়া থাকে। চক্ষুর গঠনে ইহাদের সহিত কানাবেলের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহারা লোনা জলে বাস করিতে পারে না। প্রকৃতিতে ইহারা পারশের ন্যায়। ইহার মাংসগুণ স্বাদু, মিষ্ট, লঘু ও বায়ুপিত্ত-নাশক। ছোট নদী ও পুষ্করিণী ইহাদের বাসস্থান।

গাংদাড়া জাতি (Forceps fish) ;

(১) গাংদাড়া বা বকঠুঁটী—(Fistularia Serrata)—ইহারা লোনা ও মিষ্ট উভয় প্রকার জলেই বাস করিয়া

থাকে। গোলাকার নলের মত দেহ, বকের ন্যায় দীর্ঘ চঞ্চু ও বৃহৎ চক্ষু ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ইহাদের পৃষ্ঠবর্ণ সবুজাভ বর্ণের, 'সেলাইয়ের দাগ'টী খুব উজ্জ্বল রূপালী ও বিস্তৃত ধরণের এবং উহাদের পুচ্ছ ছোট ও অবিভক্ত, ভাঙ্গন মৎস্যের মত। ইহার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য একমাত্র সামুদ্রিক তরোয়াল মৎস্যের মধ্যে দেখা যায়। তরোয়াল মৎস্য যেমন নিজ তীক্ষ্ণ-চঞ্চু দ্বারা শিকারকে বেগে আঘাত করে, ইহারাও অনেকটা সেই প্রকার করে। ইহারা সাধারণতঃ তীরস্থ শৈবালাদির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মৎস্যাদি তাহাদের সম্মুখীন হইলে, ইহারা পিছু হটিয়া অকস্মাৎ বেগে শিকারের উপর

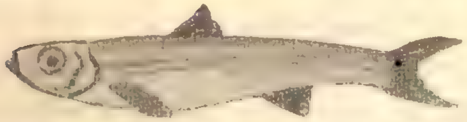

সোনা খড়কে।

পড়িয়া নিজ তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট চঞ্চু দ্বারা ধৃত করে; চঞ্চুদ্বয়ের মধ্যে শিকার একবার ধৃত হইলে আর পলায়ন করিতে পারে না। ইহারা প্রথম বর্ষায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের মাংসগুণ সুস্বাদু, লঘু, রোচক ও কিঞ্চিৎ বায়ুকর। গাংদাড়া জাতির মধ্যে আর একটি অনুরূপ মৎস্য দৃষ্ট হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Poker fish বলে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে উহারা গাংদাড়ার সদৃশ, বাঙ্গালায় উহাকে খড়কে ঠুঁটি বলে।

(২) খড়কে ঠুঁটী (Poker Fish)—ইহারা প্রায় সর্ব্বাংশে গাংদাড়ার ন্যায় আকারে দৃষ্ট হইলেও, ইহাদের চঞ্চুর গঠন গাংদাড়ার চঞ্চু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। গাংদাড়ার ন্যায় ইহাদের তীক্ষ্ণদন্তশোভিত দুইটি চঞ্চু নাই। ইহাদের ওষ্ঠ ক্ষুদ্র ও গোলাকার ও সামান্য উন্নত, এবং অধরাগ্র ভাগ দীর্ঘ হইয়া গাংদাড়ার ন্যায় চঞ্চুতে পরিণত হইয়াছে। গাংদাড়ার ন্যায় উহাদের চঞ্চুতে দন্ত নাই, ইহারা দন্তহীন মৎস্য। উহাদের মুখে অধরভাগে মাত্র একটি চঞ্চু হইবার কারণ নির্ণয় করা

জেব্রাধানি।

কঠিন; তবে ইহা বোধ হয় যে, উহারা গাংদাড়ার ন্যায় মৎস্যাশী নহে, পরন্তু কীট, পতঙ্গ, শুক ও কর্দ্দমমধ্যস্থ বা শৈবালসংলগ্ন খাদ্যাদি খুঁটিয়া খায়। উহাদের চঞ্চুটির গঠন দেখিয়া ইহা অনুমান করা যায় মাত্র। গাংদাড়ার ন্যায় ইহারা খুব দীর্ঘও হইয়া থাকে, তবে গাংদাড়া মৎস্য যেমন স্থূল ও বলশালী হয়, ইহারা তদ্রূপ হয় না। বড় গাংদাড়া প্রায় এক হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং ইহাদেরও প্রায় ১৫।১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহার মাংসগুণ ও ডিম্বপ্রসবাদি কাল গাংদাড়ার মত, কিন্তু ইহারা গাংদাড়ার ন্যায় আদৌ লোনা জলে বাস করিতে পারে না। গুণে ইহারা প্রায় গাংদাড়ার অনুরূপ।*

* এই প্রসঙ্গে ১৩৩৫ সালের মাঘ সংখ্যার 'বাঙ্গালার মৎস্য' এবং চৈত্র সংখ্যার 'ভারতের মৎস্য'—শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাক্য-বিন্যাস

...শব্দ ও বাক্যের উপরোক্ত বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যমূলক চরিত্রের তারতম্যানুসারে লিখনভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালীর পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালীর পার্থক্য মূলতঃ দ্বিবিধ। যথা প্রকৃতিমূলক ও বিকৃতিমূলক। প্রকৃতিমূলক লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী সর্ব্বদাই একরকমের হইয়া থাকে। লিখনভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে সর্ব্বদাই ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণ, ছন্দ ও কল্পের নিয়মগুলি অটুটভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতিমূলক লিখন-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে কখনও যথেচ্ছাচার প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কারণ তাহাতে সর্ব্বদাই অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলন-প্রণালী সন্নিবিষ্ট থাকিয়া যায় এবং ঐ মিলন-প্রণালী কখনও একাবস্থায় একাধিক নহে। অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলন-প্রণালী সন্নিবেশ থাকা নিবন্ধন বাক্যের অথবা শব্দের কোন্ অবস্থায় হ্রস্বের আশ্রয় লইতে হইবে, কোন্ অবস্থায় দীর্ঘের আশ্রয় লইতে হইবে, কোন্ অবস্থায় কোন্ মাত্রার আশ্রয় লইতে হইবে, কোন্ বাক্যে অথবা কোন্ শব্দে কয়টী বর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে, কোথায় কোন অঙ্গের স্পর্শমূলক বর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে সর্ব্বদাই একবিধ নিয়মাবদ্ধ থাকিতে হয়। এবংবিধ নিয়মাবদ্ধতার ফলে, প্রকৃতিমূলক লিখন-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে যে সমস্ত পদ ও বাক্য রচিত হয় তাহা কখনও একাধিক অর্থযুক্ত হয় না এবং তদনুসারে উহা কখনও জটিলতার নিদান হইতে পারে না। যাহা আপাত ভাবে অব্যক্ত তাহাও এবংবিধ লিখন-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-বিন্যাসে শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়। এবংবিধ নিয়মাবদ্ধ লিখন-ভঙ্গী ও বর্ণ-বিন্যাসের অন্যতম সুফল এই যে, উহা পাঠ করিলে কখনও কাম-ক্রোধাদির উদ্ভব হইতে পারে না, কারণ উহাতে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত রস, তেজ ও বায়ুর প্রাকৃতিক মিলন-প্রণালী সংরক্ষিত হইয়া থাকে...

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

সরোজ সকালবেলা চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা সরোজিনী শাশুড়ীদের কাছে বসিয়া আছে, কেবলই ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছে।

সুরুচি বলিলেন, "তুমি খেয়ে শোওগে যাও।"

সচেতন হইয়া সরোজিনী লজ্জিতভাবে বলিল, "সবার আগে—"

"তা হোক, তোমার শরীর ভাল নয়, যাও ওতে দোষ নেই।"

সরোজিনী উঠিয়া গেল। দুই যায়ে কিছুক্ষণ হাসাহাসি করিলেন। গত রাত্রে উহারা জাগিয়া কাটাইয়াছে।

খানিকক্ষণ পরে ফণী আসিয়া বলিল, "বৌকে দেখছি নে যে, বাপের বাড়ী গেছে না কি?"

"না, ঘুমিয়েছে।"

"কি—ঘুমিয়েছে? আটটা না বাজতে? নাঃ আপনিই বৌকে নষ্ট করবেন—"

"শরীর খারাপ হলেও বৌ শুতে পারবে না? তুমি আচ্ছা ভাসুর, আমি সারাদিন শুয়ে থাকলেও আমার ভাসুররা কিচ্ছু বলেন না, কাজ করতে দেখলেই রাগ করেন—"

"বেশ বেশ, বৌ-পুজো করুন ফুল দিয়ে, আমার কি? দেখলি রে নীহার? ওঁর মত শাশুড়ীর কাছে থাকলে বৌটি যা হবে বুঝতে পারছিস?"

নীহার বিজ্ঞভাবে বলিল, "হুঁ পারছি।"

সরোজিনী ভাল তাস খেলিতে জানে—বলে, "খেলবেন কাকীমা?"

"সর্ব্বনাশ! বাবা তাস খেলা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, আমরা কেউ তাস হাতে করি নে, আমার দিদিরা হরতন চিড়িতনও চেনেন না।"

"আমরা ত খেলি, মা বাবা আমরা—"

"তোমার বাবা ভালবাসেন তোমরা খেল, আমার বাবা যা ভালবাসেন না, আমরা তা করি নে। লীলা পদ্মা জানে, তারাও আর তাস ছোঁয় না, বাবা গান-বাজনা ভালবাসেন, পদ্মা সেতার বাজিয়ে গান গেয়ে বাবাকে শোনায়।"

ফণী বলিল, "এই বৌটি আপনাদের আনন্দ-কুটীরে পড়লে ঠিক হত।"

কয়েক দিন জ্বরের পর ফণী সবে পথ্য করিয়াছে, খুব দুর্ব্বল, সরোজিনী বলিল, "বট্‌ঠাকুরকে গুগ্‌লীর ঝোল দিন না, দু দিনে সেরে উঠবেন।"

মেজ-বৌ বলিলেন, "কিসের ঝোল?"

"গুগ্‌লী জানেন না? পুকুরে হয়, ছোট ছোট?"

"পুকুরে ত অনেক কিছু হয়, বুঝলাম না।"

নীহার সর্ব্বত্র বায়ুর ন্যায় সঞ্চারী, দরজায় উঁকি দিয়া বলিল, "কি বড়মা?"

"বৌমা বলছে, ফণীকে হুগলী না কিসের ঝোল খাওয়াতে—"

"কি বৌদি?"

"গুগ্‌লীর কথা বল্‌ছি—মেজ-কাকীমা বুঝতে পাচ্ছেন না।"

"রামো,—রামো,—রামো, রাধাগোবিন্দ রাধাকিষ্ণ!—বৌ'দিটা এক্কেবারে পেত্নী।"

সরোজিনী হাসিয়া ফেলিল। মেজ-বৌ বলিলেন, "কি রে?"

"ছোট্ট ছোট্ট শামুক বড়মা, কলকাতায় খায় ব্যামো হলে, আমি দেখেছি।"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! বৌমা, যা বললে আমার কাছে বললে, তোমার ছোট শাশুড়ীর কাছে বোল না,—বমি করে ফেলবে শুন্‌লে—ওর যা ঘেন্না, কই-মাগুর-শোল খায় না—"

"কেন কাকীমা, গুগ্‌লী খুব ভাল জিনিষ—আমাদের অসুখ হলে মা ঝোল করে দেন।"

"থাক্ মা থাক্—বাপের বাড়ী গিয়ে বেশী করে খেয়ো তোমাদের হুগলী।"

"হ্যাঁ কাকীমা, ডাক্তাররা খেতে বলে।"

"বলুক গে আমাদের দেশের ডাক্তারদের হুগলী পথ্যি দিতে কখনো শুনি নি—"

নীহার বলিল, "বৌদি, সরোজ বাবু যদি শোনে—তোমার হাতেই খাবে না দেখো।"

ডাকের চিঠি-পত্র আসিয়াছে।

একখানা খামে-আঁটা চিঠি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বিশ্বকর্ম্মা ভ্রু কুঞ্চিত করিতেছেন—দেখিয়া সুরুচি বলিলেন, "কার চিঠি ?"

"কি জানি—কে আমায় লিখলে 'প্রাণেশ্বরী'— ঠাট্টা করেছে না কি কেউ ?"

টেবিলে পতিত খামটা তুলিয়া লইয়া সুরুচি বলিলেন, "এ যে সরোজিনীর নাম—তার চিঠি তুমি খুললে কি বলে ?"

"অ্যাঁ, বলনি কেন ?"—বিশ্বকর্ম্মা চমকাইয়া উঠিয়া চিঠি ফেলিয়া দিলেন; সমস্তটায় চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন নিজের চিঠি ভাবিয়া,—এক বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই।

"বলব কি—চিঠি পেলেই একবারে ছিঁড়ে পড়া !"

"সেই জন্যে বুঝতে পারছি নে, ভারি অন্যায় করেছি, এখন করি কি ?"

"তা আমি কি জানি—"

"তুমি বাঁচাবে না তোমার স্বামীকে বিপদের সময় ? এই বুঝি সতী ?" তার পরে ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—

"প্রাণেশ্বরী লিখলে কেন ? ওটা ভাল কথা নয়,—বড্ড সেকেলে মান্ধাতা যুগের—আর কিছু খুঁজে পেলে না ?"—ওদের ভাষা-জ্ঞান মোটেই হয় নি—এই প্রাণেশ্বরী, হৃদয়নাথ বড় বিশ্রী ভাষা।"

সুরুচি হাসিতে হাসিতে সোফা হইতে গড়াইয়া পড়েন আর কি। বিশ্বকর্ম্মা রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কি অন্যায়টা বলেছি ?"

"তুমি ওদের চিঠি-পত্র লেখাটা শিখিয়ে দিয়ো—নিজের চিঠির কথা মনে নেই ? আনব ? কত সম্বোধন—পৃথিবীর কাব্য—"

"আমি অমন লঘু ভাষা লিখি নে—আমার মার্জ্জিত ভাষা—গুরুগম্ভীর ভাষা—কালীপ্রাসন্নিক ভাষা"—বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন, বেলা হইয়াছে স্নান যাইবেন, আবার বলিলেন, "যা হয় কোরো—যেটা ভাল হয়—বুঝলে ?"

সুরুচি চিঠিখানা লইয়া সরোজিনীর ঘরে গেলেন, "এই নাও তোমার চিঠি—তোমার কাকা ভুলে ফেলেছেন, বুঝতে পারেন নি—"তার পরে হাসিয়া বলিলেন, "আমিও একটু পড়ে ফেলেছি, সবটা নয়—যদিও মোটে এক পাতা চিঠি।"

সরোজিনী তো পান-সাজা ফেলিয়া কপাটের আড়ালে পিছন ফিরিয়া বসিল—চিঠিটা তাহার কাছে রাখিয়া সুরুচি চলিয়া আসিলেন।

রবিবার—বিশ্বকর্ম্মা নভেল পড়িতেছেন, সাধারণতঃ দু'-এক পাতার বেশী পড়েন না, বইটা ভাল লাগিলে বাকী গল্পটা সুরুচির কাছে শুনিয়া লন;—ভাল না লাগিলে—"ছাই লিখেছে, এর চেয়ে আমি ঢের ভাল লিখতে পারি—কলম ধরি নে তাই—" বলিয়া বই ফেলিয়া দেন।

সুরুচি বলিলেন, "অত মন দিয়ে কি পড়া হচ্ছে ?"

"ওঃ কি বলব—চমৎকার !"

"বল না কি এমন—"

"এই মেয়েটি অর্থাৎ নায়িকাটী স্বামীর আবার বিয়ে দিচ্ছে,—বেশ আনন্দ করে—আগ্রহের সঙ্গে, তোমার মত নয়—"

"তোমার মত কপটাচারী স্বামী নেই দুনিয়ায় আর একটি—"

"কটা স্বামী চাও তুমি ? দ্রৌপদীর মত ?"

"একটিও না—তোমাকেও না।"

"অপরাধ ?—"

"অপরাধ নয় ? তুমি চাও আমি ঐ রকম উৎসাহ করে তোমার আবার বিয়ে দি।"

বিশ্বকর্ম্মা খুসী হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঔশীনরী ধারিণীর মত,—নাঃ সে তোমার দ্বারা হবে না—তেমন মহত্ত্ব তোমার নেই,—আঃ কি সুন্দর লেখা, পড়ি—আবার পড়ি কি পতিব্রতা স্ত্রী, এরাই শক্তিরূপিণী আদর্শ নারী, ধন্য লেখক, এমন চরিত্র এঁকেছে,—কি না স্বামীর ভালবাসার পাত্রী খুঁজতে যাচ্ছে !"

"তোমার ভালবাসার পাত্রীটি কে বল।—আমিও তাকে খুঁজতে বেরুব।"

"খুঁজে কি হবে? তুমি কি প্রাণ ধরে তাকে এনে আমায় দিতে পারবে?"

"বিয়ে দেবার জন্যে খুঁজব না কি?"

"তবে কি জন্যে?"

"তোমাদের দু'জনকে জেলে পুরতে—বল নাম বল?"

"আর কি বলি"—বিশ্বকর্ম্মা উপন্যাসে মন দিলেন।

মিনিট পনের পরেই সশব্দে বইটা ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নাঃ যাচ্ছেতাই—বিশ্রী—এই সব বই আবার চলে—না আছে প্লট না আছে আর্ট।"

"যা হোক! এত সুখ্যাতি—সব গেল?"

"মরুক গে"—বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন।

"উঠছ যে?"

"আর পারা যায় না বিছানায় থাকতে—"

বিশ্বকর্ম্মার মত অস্থির চঞ্চল মানুষ নিষ্কর্ম্মা সময় কাটাইতে পারেন না। সবে একটা বাজিয়াছে, একবার ঘড়ি দেখেন, একবার গান ধরেন, একবার বলেন, "চল কোথাও ঘুরে আসি।"

"দুপুর রোদে আমি ঘুরতে পারব না।"

"তা পারবে কেন? স্বামীর কথা শোনা যে মহাপাপ।"

অবশেষে বিশ্বকর্ম্মা বৈকালের স্নানটা দু'টার সময়ই সারিয়া ফেলিলেন এবং পোষাক-কামরায় ঢুকিলেন।

নামে পোষাক-কামরা, কিন্তু পোষাক পরা হয় শয়ন-ঘরে, ছাড়াও হয় শয়ন-ঘরে, দুপুর বেলা নীহারের ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাঁহাকে ডাকেন না—সমস্ত জামা-কাপড় নিজেই বহিয়া আনিয়া খাট, টেবিল, ইজিচেয়ার, চৌকিতে মনের সাধে বিছাইয়া ফেলিয়া খুশীমত পরিতে আরম্ভ করেন। রবিবার দুপুরবেলা এই রকমেই কাটে। সুরুচি এই সময় কিছুমাত্র সাহায্য করেন না। তবে এর চেয়ে নীহারকে ডাকা শতগুণে ভাল—যেহেতু বৈকালে দুই ঘণ্টা ধরিয়া সে গুছায় পোষাক-কামরা, এবং সুরুচি শয়ন-ঘর।

বিশ্বকর্ম্মা খুব নূতনের ভক্ত—পুরানো ড্রেসিং-টেবিলটা বাড়ী চালান করিয়া দিয়া একটা নূতন টেবিল কিনিয়া আনিলেন, সব শুদ্ধ সাতটা ড্রয়ার, উপর দিকে খাঁজ-কাটা ফ্রেম-হীন লম্বা আয়না বসানো।

অজানা দোকানে অর্ডার দিয়াছিলেন বাক্‌চাতুরীতে ভুলিয়া, দাম বড় বেশী। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "এক স্ত্রী ভিন্ন কিছুই পুরানো ভাল নয়"—অতএব মহা আদরে টেবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন, "নাও—কি একটা পচা আয়না ছিল তোমার—"বলিতে বলিতে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চমকিয়া সরিয়া আসিলেন, "এ কি! এ কি! চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে নিজের চেহারা দেখে!"

সত্যই চেহারা দেখায় ভূতের মত অসম্ভব লম্বা ও সরু। সুরুচি রাগ করিয়া বলিলেন, "যেমন টেবিলের চেহারা, তেমনি গুণ—"

"কেন—কেন, দেখতে বেশ সুন্দর, আয়নাটা খারাপ দিয়েছে—ব্যাটারা ঠকিয়েছে, বদলে নিচ্ছি দাঁড়াও—"

"সব বদলে ফেল—ও বিশ্রী টেবিল আমি চাই নে—ড্রেসিং টেবিল দু'টো কি তিনটে ড্রয়ার থাকবে—না ঠিক দেরাজ; আমি কোন দিন ও পছন্দ করি নে—ফ্রেম নেই, কন্ধকাটা কবন্ধের মতন আয়না—লক্ষ্মীছাড়া চেহারা—"

বিশ্বকর্ম্মা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "একেবারে নয়া ফ্যাশন তোমার জন্যে আনলাম, পছন্দ করলে না?"

"না, পছন্দ নিজের—লোকে বললে হয় না।"

"তবে ক্যাটালগ দেখে বলে দাও, তৈরী করে দেবে সেই রকম—এটাও থাক।"

"না দু'টো ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই বিদেশে, তোমার কি—ছড়ি হাতে ট্রেনে ওঠা আর নামা—বদলীর কষ্টটা জান না তো—"

সেই টেবিলটা এখনো ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই,—পোষাকের ঘরে থাকিলে কখন আচম্‌কা বিশ্বকর্ম্মা ডরাইয়া উঠিবেন নিজের চেহারা দেখিয়া, এই জন্য শয়ন-ঘরের একদিকে রহিয়াছে।

আজ স্নানের পরে সেই আয়নার সামনে মনের ভুলে এক পা দিয়া তখনই সরিয়া আসিলেন।

সুরুচি তখনই বলিলেন, "দিলে না ফিরিয়ে?"

"দেব, বলেছি তাদের।"

"তবে নেয় না কেন?"

"গরজ নেই, টাকা দেওয়া হয়েছে—আর কি।"

"তবে কাল আমিই পাঠিয়ে দেব দেখো।"

"আচ্ছা"—বলিয়া দেওয়ালের আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া টাই বাঁধিতে লাগিলেন।

একটু পরে সেটা খুলিয়া ফেলিয়া একটা বো পরিতে পরিতে বলিলেন, "তুমি এটাকে কি বল যেন?"

"কিচ্ছু বলি নে।"

"বল না, অত সঙ্কোচ কি? ডগ্ কলার বল না তুমি?"

"বলিই তো।"

"আর কি বল?"

"বলি যে মানুষের চেয়ে কুকুরের গলায় বেশী মানায়।"

"আর মানুষে পরলে?"

"জানি নে।"

"কুকুরের মত দেখায় এই তো? নিজের স্বামীকে কুকুর বললে?"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "কই বললাম, তুমিই জোর করে বলাচ্ছ—"

পোষাক পরা না হইতেই মেঘ ডাকিল। ঘন মেঘ ও আসন্ন বৃষ্টি দেখিয়া সুরুচি বলিলেন, "যাচ্ছ কোথা?"

"সেই লাইব্রেরীর মিটিংটা—"

মেঘে অন্ধকার হইয়া জোর বাতাস উঠিল, সুরুচি বলিলেন, "এই দুর্য্যোগে কে বেরোয় ঘর থেকে।"

"দুর্য্যোগ কিসের—বর্ষাকালে ও রকম হয়।"

"আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, অত দুঃসাহসী হয়ো না।"

"দুঃসাহসে দুঃখ হয়—
দুঃশীলেরা নিঃসংশয়।"

"তুমি দুঃশীল—নিজেই স্বীকার করলে?"

"তুমিও দুঃশীলা।"

"নিশ্চয়ই—নইলে মানাবে কেন?"

সুরুচি মেঘ দেখিতে বারান্দায় গেলেন, ইতিমধ্যে নীহার আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বকর্ম্মা ডাকিলেন, "ওগো—কই?"

"যাও! ও কি ডাক?—আমার নাম নেই না কি? সব সময় ভাল লাগে না।"

"স্ত্রীর নাম ধরতে নেই যে।"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "স্ত্রী গুরুজন না কি?"

"তার চেয়ে বেশী, স্ত্রী যেমন স্বামীর নাম করে না—তেমনি ঠিক।"

"ইস্, কি পুরাতনপন্থী—তোমায় চেনা মুশ্কিল।"

"তোমায়ও, আজও স্বরূপ বুঝতে পারলাম না—দিবা-নিশি সন্দিহান থাকি।"

বিশ্বকর্ম্মা আধুনিক নারী-প্রগতির তীব্র সমালোচক। কোন বন্ধুর স্ত্রীর চিঠি দেখিয়াছেন—স্বামীকে লিখিয়াছে "প্রিয় পঙ্কজ"; যখন তখন বন্ধুকে ঠাট্টা করিয়া ভূতছাড়া করেন—বিদ্রূপের চোটে বান্ধবীটি আর বিশ্বকর্ম্মার সম্মুখীন হন না।

মেঘে ঘরের ভিতরে অন্ধকার, বাতি জ্বালিতে হইল, বিশ্বকর্ম্মাও তৈয়ারী—বারান্দায় বাহির হইয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কেবল তোমার চালাকি।"

বলিয়া স্বচ্ছন্দমনে নিষ্ক্রান্ত—গাড়ী সবে বাড়ীর সীমা ছাড়াইয়াছে—মুষল ধারায় নামিল বৃষ্টি।

এবার তেজেনের পালা।

এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির—২৮শে আষাঢ় বা ১১ই শ্রাবণ তেজেনের বিবাহ।

বিশ্বকর্ম্মা ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন, সুরুচিকে বলিলেন, "কোথায় বিয়ে কিছু জানা যাচ্ছে না।"

"তুমি যেটা দেখে এসেছিলে বগুড়ায়, সেইটে নয় ত?"

"না—তা হলে তখনই হত।"

তখন হাতে অনেকগুলি দরকারী কাজ, ওদিকে ছোট ছেলের বিয়ে, নিত্য চিঠি; বাবা লেখেন আলাদা, তা ছাড়া দিদিরা ভাইয়েরা। তেজেন কলিকাতায় আছে, ইঁহাদের সঙ্গেই যাইবে।

দশ দিনের ছুটিতে বিশ্বকর্ম্মা চলিলেন। বান্ধবেরা বলিলেন, "আপনি বড় ভাগ্যবান্, চৈত্র মাসটা কাটিয়ে এলেন, আবার এখনি চললেন, আমরা দু'এক বছর পরে দু'এক দিনের জন্যে যাই।"

"এক মাস কি ভাই? চার মাস থেকেছি। দশ দিনের জন্যে যাচ্ছি কেউ জানেন না; তাঁরা লিখেছেন, এক মাসের জন্যে যেতে।"

পৌঁছিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "পরমহংসীরা আছেন কেমন ?"

তাপসী বলিলেন, "অতি উত্তম। মহাশয়ের কুশল ?"

"যে আজ্ঞে। প্রফুল্ল, এই বর্ষায় আয়োজন করে ফেললে ?"

"আপনিই ত পথ দেখিয়েছেন।" শ্রাবণ মাসে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

উত্তর দেশ, চেরাপুঞ্জীর ছোট ভাই। ওদিকে পুণ্যাহের আয়োজন হইতেছে, ১১ই তারিখ হইতে ছয় দিন অহোরাত্র-ব্যাপী যাত্রা-থিয়েটার চলিবে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গান শোনা বা দেখা, ভোরে পুকুরে ঝাঁপাইয়া স্নান করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কম্পন আরম্ভ হওয়া, দেখিয়া দেখিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে পুণ্যাহের পাট তুলিয়া দিতে হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা না পৌঁছান পর্য্যন্ত উৎসব যেন অরুণের মত অপূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল, এবারে গরুড়ের মত পাখা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। দিদি বলিলেন, "বাবা শুধু পথের দিকে চেয়ে থাকেন, একটা করে দিন যায়—বাবা বলেন, 'বোধ হয় ছুটী পায় নি'।"

এতক্ষণ আসল কথাই হয় নাই—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "পাত্রীটি ?"

"আপনিই তো দেখে পছন্দ করে গেছলেন, আমরা আর দেখিনি।"

"তেজেনের এগজামিনের পরে বিয়ে হবে বলেছিলেন যে ?"

"সেই কথাই ছিল, প্রফুল্লকে তো জানেন ? ধরে পড়লে ও এড়াতে পারে না, মেয়ের দাদা এমনি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল যে, আর পারা গেল না।"

পাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা হাওড়ার বাঙাল বাবুদের মেয়ে ও ভবানীপুরের জমিদারের দৌহিত্রী। বিবাহ ভবানীপুরে দিদিমার কাছে হইবে। ভবানীপুর আত্রেয়ী নদীর তীরে।

নিকট আত্মীয় সকলেই আসিয়াছে—সুধীরা আসিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে, দিন পনের কুড়ি আগে সে মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছে। সুরুচির বাবা ভোরবেলায় বেড়াইতে যান, প্রায়ই সুধীরাকে সঙ্গে লইয়া থাকেন। দিদি বলেন, "বাবা নতুন বৌকে হাঁটিয়ে এতদূর আনলেন ?"

বাবা হাসিয়া বলেন, "ও আবার নতুন বৌ হলো কবে ?"

দ্বিজেন ঘরের মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া বলে, "সুধীরা দেখতো আমার পিঠে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।"

সুধীরা তাহার পিঠে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া পিঁপড়ে খুঁজিতে আরম্ভ করে।

দিদি বলেন, "বেশ মামা-শ্বশুর ভাগনে-বউ—বেশ!"

দ্বিজেন বলে, "একটু বড় হলে তখন মানবি—না রে সুধীরা ?"

তাপসী বলেন, "পদ্মপুরাণে আছে—'ভাগিনা-বধূ গীত গায়—মামা-শ্বশুর নাচে'।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "একটু ভুল হয়েছে—এ যুগে শাশুড়ীরা নাচে।"

দ্বিজেনকে আর কষ্ট করিয়া জবাব দিতে হইল না—সে হাসিয়া কুটপাট।

তাপসী বলিলেন, "না এটা শ্বশুরদের নাচের যুগ—দিদি বলে, আপনি খুব ভাল নাচতে পারেন।"

"তোমার দিদি মিথ্যাবাদিনী।"

কথাটা মিথ্যা নয়—কলেজের এক সহপাঠীর কাছে বিশ্বকর্ম্মা কিছু নৃত্য শিখিয়াছিলেন, খালি ঘর পাইলেই মহলা দেওয়ার অভ্যাস আছে।

বিবাহের দিন বেলা নয়টার সময় বরযাত্রীরা রওনা হইল, পুণ্যাহের গানের জন্য বরযাত্রীর সংখ্যা অনেক কম, অতি নিকট আত্মীয়েরাই শুধু গেল।

বোনেদেরও বরযাত্রিণী হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ এবং নিমন্ত্রণ ছিল, বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "চল পঞ্চরথী-বেষ্টিত হয়ে সসৈন্যে যাত্রা করি—জগতে একটা নতুন রেকর্ড রাখা যাক।"

সুরুচি বলিলেন, "রথী নয়—রথীনী।"

"হ'ক ব্যাকরণ ভুল—শুনতে ভাল হওয়া চাই—শুধু রথী—মহা মহা রথী।"

তাপসী বলিলেন, "যেতাম, কিন্তু আপনার ঠাট্টার ভয়েই যাব না।"

"ভয় ? তোমাদের ভয় ? তোমার দিদি কবিতা লিখেছে—"

"ভাঙ্গি কারাগার
ভয় নাই, ভয় নাই আর।"

সুরুচি বলিলেন, "দিদির কুষ্ঠী না কেটে শুয়ে পড়লে ভাল হয়—শেষ রাত্রে উঠতে হবে যে।"

তাপসীদের যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুরুচি মোটে দশ দিন থাকিবেন। গোলেমালে তিন-দিন যদি কাটে তবে কথা কহিবার সময় কই?

সুরুচির বাবা গেলেন না—শরীর ভাল নয়।

ওদিকে বর-যাত্রীরা ট্রেণ হইতে নামিয়া আত্রেয়ী নদী পার হইতে না হইতে বোটের ভিতরেই চার-পাঁচ জন জ্বরে পড়িল, কন্যার বাড়ী পৌঁছিয়া প্রফুল্লের জ্বর—সেই রাত্রে নীহারেরও জ্বর।

পরের দিন বাসি-বিয়ে না হইতেই দ্বিজেনের জ্বর—জ্বর আসিবামাত্র দ্বিজেন লেপ মুড়ি না দিয়া ঝাড়া দৌড় দিল বোটে চড়িয়া এবং আত্রেয়ী-পার হইয়া ট্রেণ ধরিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

পিতা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "ফিরে চলে এলি যে তুই? খবর কি?"

"খবর ভাল—ষ্টেশনে আলো বাজনা পাঠাতে হবে, তাই এলাম।"

"সে সব তো প্রফুল্ল ঠিক করেই গেছে, তোর আসবার দরকার কি ছিল? তুই আচ্ছা ছটফটে।"

নিরুত্তরে দ্বিজেন বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

বাড়ীর ভিতরকার অবস্থা এত চমৎকার যে 'কহনে না যায়'—সুরুচিরা পাঁচ বোন সারি সারি শুইয়া—খুড়িমায়েদের জ্বর, বোনঝিদের জ্বর, গুরুদেব আসিয়াছেন তাঁর জ্বর। বিগ্রহের পূজারী ঠাকুর মাঝঘরের বারান্দায় কম্বলচাপা। দুই ঘরে দুই বৌ—লীলাবতী ও পদ্মাবতী লেপ মুড়ি দিয়াছে। এক কথায় দু'একজন ছাড়া বাড়ীশুদ্ধ যেন আড়ি করিয়া পাল্লা দিয়াছে যে, কার কত ডিগ্রী তাপ ওঠে।

দ্বিজেন বলিল, "ধ্যেৎ, আগে জানলে কি আসি? এখন জ্বর নিয়ে এই সব রোগীর নার্সিং করব কি আমি?"

সুরুচির দিদি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "তোর কাছে আমরা কিছু চাইব না—তুই শুয়ে পড়।"

"সবাই মিলে কোঁ কোঁ করছ জলের জন্যে—না দিয়ে পারা যায়? যাত্রা দেখতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি সবশুদ্ধ?"

"আমরা কেউ যাই নি—মেয়েরা গেছলো শুধু।"

দ্বিজেনের বিশ্বাস হইল না—লম্ফ ঝম্প করিয়া দুই বৌয়ের কাছে গেল—দুই জনই বলিল, তাহারা যায় নাই।

বাড়ীর রকম দেখিয়া বিরক্ত হইয়া দ্বিজেন পুকুর-ঘাটে গিয়া বসিয়া রহিল—পুকুরে জেলেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

তেজেনের বিবাহের ভার পিতা প্রফুল্লের হস্তে দিয়াছেন। সে আয়োজনও করিয়াছে তেমনই। মন্ত্রী দ্বিজেন। বাহিরে প্রকাণ্ড টিনের চালা উঠিয়াছে। সারি সারি [illegible] উনান পাতা, কাজে-কর্ম্মে লোক লাগিয়া গিয়াছে, অথচ বাড়ীর এই দশা!

পরের দিন রাত্রে বর-বধূ আসিবে, উৎসবে অনেককে কিছু চাঙ্গা করিয়া বিছানা হইতে উঠাইল, যাদের জ্বর বেশী তাহারা শুইয়াই অপেক্ষায় রহিল।

রাত্রি আটটায় বাজনা শোনা গেল, আধ ঘণ্টা পরে গাড়ী পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল, শুধু আলোর বন্যা, কলরব নাই, কলরব করিবে কে? সমস্ত গাড়ী প্রায় খালি, বেশীর ভাগ বরযাত্রীই পথে নিজ নিজ বাড়ীতে নামিয়া গিয়াছেন—শয্যা লইতে—সব জ্বর।

বধূ বরণ করিয়া লইল লীলা ও পদ্মা গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া। দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা ভারি দমিয়া গেলেন।

ফুল-শয্যার দিন প্রায় সকলেই অন্ন-পথ্য করিয়া ফেলিল। যাহারা ডাক্তারের মত পাইয়াছে তাহারা, যাহারা না পাইয়াছে তাহারাও।

সন্ধ্যার পরে হলে উৎসব-সভা বসিল। আনুষ্ঠানিক গান ও নাচ, আশীর্ব্বাদ, উপহার, আনন্দ-কৌতুক অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। সুরুচির বাবা খাটের উপর বসিয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মার উপহারখানি আর একবার পড়া হইল। সকলেই সেইটি খুব পছন্দ করিয়াছে, গর্ব্বে আটখানা হইয়া বিশ্বকর্ম্মা বসিয়া আছেন—নিজের মহিমায়। বিশ্বকর্ম্মা এত কষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, আপনারা পড়িবেন না? না পড়িলে চলিবে কেন?

খুঁজে দেশ দেশ
এনেছি তো বেশ,
মনের মতন
বউটি তোর—
তোর বিয়ে দিয়ে
নিঃশ্বাস নিয়ে
ঘাম দিয়ে জ্বর
ছাড়িল মোর।
রোদে তেতে পুড়ে,
পথে পথে ঘুরে,
দফাটি নিকাশ
হবার বো,
তবু গঞ্জনা
সয়েছি রে নানা,
আমি না কি কিছু
করিনে খোঁজ!
কনে' দেখে দেখে
দেশে দেশে হেঁকে,
গরু খোঁজা তাই
করেছি দেশ,—
তাই হেন কালে
মোদের কপালে
বউটি আসিয়া
জুটিল বেশ!
দিন দেখে শুনে
জীবনের সনে
সাত পাক দিবে
বাঁধিলি যারে,
তার এজলাসে
শাসনের পাশে—
সাত পাকে বাঁধা
পড়িবি রে!—
ধাঁধার মতন;
আলেয়া যেমন,
খেলিয়া অমনি
পলায় ছুটি—
বিয়েটিও তাই
দু'দিন যেতেই,
বুঝিবি রে ভাই
স্বরূপটি কি!

এখন তোমার
কোন কথা আর
লাগিছে না বুঝি
শুনিতে ভালো?
উপবাস ক'রে,
সারা দিন ধরে,
রাঙ্গা মুখ দুটি
হয়েছে কালো।
বেশি কিছু আর
নাই বলিবার—
বাঁধো দুই জনে
সুখের ঘর।
চরণ কমল
দিলাম বাড়ায়ে
মাথা নীচু করে
প্রণাম কর!

তাপসী বলিলেন, "জামাই বাবুর উপাধি দেওয়া গেল কবিতাকাশ।"

দিদি বলিলেন, "সুধীরার বিয়ের সময় আপনারা এলে বড় ভাল হতো।"

"আচ্ছা জামাই বাবু, আপনার মত ছিল না, না? ফণী, সরোজ, নীহার বলেছিল।"

"না, ঠিক অমত নয়, তবে—"

"এখন?"

"এখন আর জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বল? তোমার দিদির অক্ষয় কীর্ত্তি।"

"ফণী যে ভয় দেখিয়েছিল আমাদের সর্দ্দা আইনের।"

"ঠিক"—সুধীরার দিকে চাহিয়া—"অন্ততঃ বছর তিনেক সে ভয় আছে।"

"আপনি বাঁচাবেন না আমাদের?"

"না, তা কেন বাঁচাব? বে-আইনী কাজ আমি করতে পারি, না উচিত? তবে তোমাদের যা যা প্রয়োজন, যথা পঞ্চাশটা বালতি, ঘটি এসব আমি সাপ্লাই করব নিশ্চয়, জেলে তোমাদের অসুবিধে হবে না।"

সুরুচির পিতা বলিলেন, "আমার মেয়েরা বাপু, বুঝলে, সব এক রকম, এক একটা কাজ ক'রে ফেলবে, অগ্রপশ্চাৎ

না ভেবে। শেষে তাই নিয়ে একটা দুর্ভাবনা। যথার্থই খুব অন্যায় কাজ করা হয়েছে, তাতে ভুল নেই।"

তাপসী বলিলেন, "আজকাল জেলে তেমন ভয় নেই। মেয়েরা স্বদেশীর পর থেকে যখন তখন জেলে যাচ্ছে।"

পিতা বলিলেন, "তা বেশ, ভয় নেই যখন তোরাও যা। তারা স্বদেশী করে গেছে, তোরা যাবি বে-আইনী কাজ করে।"

পিতা যখন মেয়েদের তিরস্কার বা অনুযোগ করেন, তখন তাঁর জামাতাদের মত সুখী আর কেহই বোধ হয় হয় না।

অনেক রাত্রে সভা ভঙ্গ হইল। পর দিন সকাল বেলা দেখা গেল, বাড়ীর বেশীর ভাগ লোকই বিছানা হইতে ওঠে নাই, শেষরাত্রির জ্বরে। এদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে মুষলধারে।

টিনের চালার রাঁধুনী বামুনেরা শেষ রাত্রে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিবে কথা ছিল, ভোর বেলা দেখা গেল, ঘরে মানুষের চিহ্ন নাই, অবিলম্বে রাঁধুনীদের নিকট হইতে খবর আসিল তাহাদের দশ জনের মধ্যে আট জনের জ্বর, আসিতে পারিবে না।

এদিকে বাড়ীর লোক-জনের জন্য অতিরিক্ত যে পাচক দুটি রাখা হইয়াছিল, তাহাদেরও দেখা গেল না রাত্রে জ্বর হইয়াছে—ভোরে পলায়ন করিয়াছে।

তখন পরামর্শ সভা বসিল, সিদ্ধান্ত হইল প্রীতি-ভোজ এখনকার মত বন্ধ থাক, অগ্রহায়ণ মাসে হইবে।

তুমি

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সুখের দিনে রয় না তোমায় মনে—
কোথায় যেন হারাই অকারণে—
সবাই যখন হাসে,
আমি তাদের পাশে
সুর মিলিয়ে বেড়াই তাদের সনে
তুমি রহ
একলা নিরজনে॥

নিখিল জনের মুখর কলরোলে—
হৃদয় কেবল ভোলে তোমায় ভোলে—
বাহির যখন ডাকে—
হাতছানিতে তাকে—
খুসী যখন বুকের মাঝে দোলে,
সকল হিয়া উতল ক'রে তোলে,

তুমি রহ তোমার মাঝে ঢাকা,
আপন পটে আপন ছবি আঁকা
সকল জনের ছায়া—
ঢাকিয়া রাখে মায়া
লুকায়ে রাখে বিছায়ে কালো পাখা
তোমার রঙে
যায় না গো রং মাখা।

ছাড়িয়া আসি তোমার মায়াখানি—
মনের মাঝে মমতা নাহি মানি;—
হয় ত তোমার মনে
কারণ অকারণে—
কতই ব্যথা বাজে নাহি জানি—
আমার কাছে কও না তাহা আনি।

নিজের মাঝে বহিয়া চল নিজে,—
আঁখির পাতা কখনো ওঠে ভিজে
কখন বুঝি মনে
সবার নিরজনে—
আপন মনে করিতে চাহ কী যে ?
নিজেরে শুধু শাসন কর নিজে।

কিন্তু যখন দুখের দিনে একা
নয়নজলে ঝরে করুণ রেখা
কেউ রহে না কাছে
কেবল আঁধার মাঝে
শিহরি উঠি, চমকি উঠি একা
নিকষ কালো,—যায় না কিছু দেখা।

হৃদয় ভরি কেবল জাগে ভয়—
দুঃসহ সে ব্যথার নাহি লয়—
সকল কিছু ফেলে
দু হাত দিয়ে ঠেলে—
তোমার বুকেই ফিরতে আমায় হয়—
দুখের দিনে তুমি যে অক্ষয়।

আমার ব্যথার মলিন মায়ালোকে—
তোমায় হেরি কী সে অরূপ চোখে—
শান্ত তোমার বুকে—
ঘুমাতে চাই সুখে—
ভুলিতে চাহি সকল দুঃখ শোকে—
মেটে না আশা—চাহিয়া থাকি চোখে।

কী যে নিবিড় সান্ত্বনা ঐ চাওয়ায়—
অলক দোলে শান্ত মধুর হাওয়ায়—
শ্যামল স্নেহে গড়া
ভালবাসায় ভরা—
পরাণখানি আকুল করে পাওয়ায়—
রৌদ্র-দাহ শীতল করে ছাওয়ায়।

মধুর দুটি কোমল বাহুলতা—
মুখখানি মোর বক্ষে অবনতা
ডাগর দুটি আঁখি
লাজের কাজল মাখি'
ঘুমায়ে যেন পড়িতে চাহে তথা—
অধর কাঁপে—কহিতে নারে কথা।

বুকের মাঝে রাখিয়া মাথা, গণি—
ভীরু বুকের মৃদু কাঁপন ধ্বনি—
আগলি রাখি সুখে
আপনি রহ বুকে—
গাঁথিয়া রাখ মণির মাঝে মণি
বুঝি গো মোর দেখার দরশনি।

দুঃখের মাঝেই চাই গো, তোমায় চাই
সংসারে আর কেউ যে তখন নাই
সুখ দিয়ে যা ভুলি
দুখ দিয়ে তা তুলি
হর্ষে যাহা চাহিয়া দেখি নাই
বেদন ক্ষণে তাহাই ফিরে চাই।

বড়ই ভাল বেদন ব্যথা ক্ষণে
তোমার কোলে গভীর নিরজনে
অলস ভীরু হিয়া
একলা এলাইয়া
মন খানিরে রাখি তোমার মনে
সকল জ্বালা ভোলা নিরজনে॥

শ্রীরাধার প্রাচীনত্ব

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রধানতঃ ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। এই ভক্তিবাদ বৈষ্ণবগণের মূল আদর্শরূপে গৃহীত হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের মধ্য দিয়া আস্বাদন করেন। এই পাঁচটি রসের মধ্যে আবার মধুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীদিগের সহিত যে লীলা অভিনিষ্পন্ন করেন, সেই অভিনব মাধুর্য্যলীলাই মুখ্যতঃ বৈষ্ণবগণের আস্বাদ্য বস্তু।

বিষ্ণুর উপাসনা অতীব প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ স্বয়ং বিষ্ণুর উপাসনা করেন না; তাঁহারা বিষ্ণুর অবতারবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। এই শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবরূপী বিষ্ণুর উপাসনাও এতদ্দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রবর্ত্তিত। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ভক্ত, তাঁহারা গোপাল-কৃষ্ণের উপাসক—গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা-অনুষ্ঠান—এই লীলারস বা ব্রজের নিগূঢ় রসাস্বাদনে তাঁহারা বিভোর।

বিস্ময়ের বিষয় এই, বাসুদেব কৃষ্ণের উপাসনা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও গোপীজনমনোহর শ্রীকৃষ্ণোপাসনা তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বেদ, উপনিষদ, জাতক মহাভারত প্রভৃতিতে গোপীদিগের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। তাঁহাদের প্রথম উল্লেখ পাই, হরিবংশ এবং ভাগবতে। সাধারণভাবে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত হইলেও বিশেষভাবে কোন গোপীর বা শ্রীরাধার উল্লেখ তাহাতে নাই। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অভিনব প্রেম-লীলা যাহা আধুনিক বৈষ্ণবগণ ভাবে বিভোর হইয়া আস্বাদন করেন, যে লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেন, যে লীলারস তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগ্রস্ত করিয়া ফেলিত, প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রায় সর্ব্বত্রই এ সুমধুর প্রসঙ্গটীর কোন উল্লেখ নাই। গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা কোন কোন গ্রন্থে মুখ্য বা গৌণভাবে আলোচিত হইলেও প্রসঙ্গতঃও সে সব গ্রন্থে শ্রীরাধার উল্লেখ করা হয় নাই। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ বায়ুপুরাণ, এবং শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোপীদিগের সহিত তাঁহার মধুর সম্বন্ধ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইলেও উক্ত কোন গ্রন্থেই শ্রীরাধার উল্লেখ পর্যান্ত নাই। এই সকল পুরাণাদিতে শ্রীরাধিকাকে অবহেলা করিয়া শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা প্রভৃতি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি-রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। ভাগবতে গোষ্ঠ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইলেও তথায় বিশেষভাবে কোন গোপীরই নামোল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে-গোপীর প্রতি সমধিক প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার নামটি কি হইতে পারে ব্যাসদেব তাহা ভাবিয়াও দেখেন নাই। উপর্য্যুক্ত প্রকৃতিগণের নামোল্লেখ ব্যতীত কোন কোন গ্রন্থে আবার সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রীগণেরও নামোল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যম পাদে 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজ আচার্য্য (বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীর মতে ১০১৪ খৃঃ) শঙ্করাচার্য্যের (সপ্তম শতাব্দী) মায়োপমাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করতঃ দাক্ষিণাত্যে দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। উক্ত শতাব্দীতেই মধ্বাচার্য্য রামানুজ-প্রচারিত দ্বৈতবাদে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাহারই ভিত্তির উপরে পূর্ণ দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদের পরিবর্দ্ধনামণ্ডিত মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা মধ্বাচার্য্য ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের এক নবযুগের উদ্বোধন করিলেন। তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রামানুজ কেহই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধার স্থান দেন নাই। বৈষ্ণবগণের চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সনক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্কই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনামূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন। ক্রমে দাক্ষিণাত্যে বল্লভস্বামী (বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীর মতে ১৪৭৯ খৃঃ) রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনামূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন।

রুদ্রসম্প্রদায়ের বিশেষত্ব আচার ও নিষ্ঠার উপর বৈষ্ণববাদের প্রতিষ্ঠা; আর মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রধানতঃ ভক্তি ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাপ্রভু মাধ্বীসম্প্রদায়ভুক্ত এবং গুরুপরম্পরায় মধ্বাচার্য্য হইতে অষ্টাদশ স্থানীয় হইলেও তিনি মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম মূলতঃ গ্রহণ করিলেন না, তিনি মধ্বাচার্য্যের দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধর্ম্মের আচরণীয় রীতিগত এই পার্থক্যের জন্য বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ ভারতবর্ষের অপরাপর বৈষ্ণবগণ হইতে বিভিন্ন।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলা উপাখ্যান বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। ভাগবতাদিপুরাণরচকগণ কেন যে এই মধুর, রসাঢ্য উপাখ্যানটির বর্জ্জন করিলেন তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নহে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় বোধ হয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়া থাকা সম্ভব যে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অনুষ্ঠিত লীলোপাখ্যানের প্রচলনের ফলে জনসাধারণের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবসমাজ হেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে—এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে যে-আখ্যানটি সর্ব্বাধিক চিত্তাকর্ষক—বৈষ্ণবসমাজের মূল রসদ যে আখ্যানটি জোগাইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলার প্রাচীনত্বের নিদর্শনের অভাব নাই। ভাগবতাদি পুরাণে শ্রীরাধার উল্লেখ না থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীরাধার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তথায় শ্রীরাধার জন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, নিজ রস-আস্বাদন-সৌকর্য্যার্থে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম অঙ্গ হইতে শ্রীরাধার জন্মদান পূর্ব্বক স্বীয় একান্ত নীরস নিঃসঙ্গতা দূর করিয়াছিলেন :

পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলকে রাসমণ্ডলে।
শতশৃঙ্গৈকদেশে চ মল্লিকামাধবীবনে॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ॥
*
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গা চ রাধিকা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধিকার অপর নাম চন্দ্রাবলী—

নখচন্দ্রাবলী বক্ত্রচন্দ্রোঽস্তি যত্র সন্ততম্।
তেন চন্দ্রাবলী সা চ কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা পুরা॥

পদ্মপুরাণে আছে :—

চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ও শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীরাধিকার প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'গাথা সপ্তশতী' বা 'শুকসপ্তশতী' রচিত হয়। এই গ্রন্থে শুক কর্ত্তৃক সাতশত উপাখ্যান পদ্যাকারে কথিত হইয়াছে। উক্ত উপাখ্যানসমূহের একটি আখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি—একদা শ্রীরাধার নয়নে ধূলিকণা পতিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সযত্নে শ্রীরাধার নয়ন হইতে উক্ত ধূলিকণা অপসারিত করিয়া দেন। প্রণয়িনীর পরিচর্য্যারত প্রণয়ীর ঈদৃশ প্রেম-বিহ্বল ভাব দর্শনে অপরাপর গোপীদের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয়। সপ্তশতীর এই আখ্যান এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিভিন্ন আখ্যান হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলোপাখ্যান প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভট্টনারায়ণ কর্ত্তৃক 'বেণীসংহার' নাটক রচিত হয়। উক্ত নাটকের নান্দীশ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ আছে। শ্লোকটি এইরূপ :—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসেরসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে-
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥

"কালিন্দীপুলিনে কেলিনিরতা শ্রীরাধিকা (কোন বিশেষ কারণবশতঃ ক্ষুণ্ণা হইয়া) রাসোৎসব পরিত্যাগ করতঃ কোপবশে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রস্থান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছেন। অনুসরণকালে শ্রীরাধিকার চরণ-চিহ্নের উপর স্বীয় চরণ স্থাপিত হইবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের দেহে রোমাঞ্চের সৃষ্টি হইতেছে। কংসারির এই অক্ষুণ্ণ অনুনয়ে প্রীতা শ্রীরাধা পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিদৃষ্টি নিক্ষেপে তাঁহাকে প্রসাদীকৃত করিলেন। শ্রীরাধার প্রীত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল প্রচেষ্টা তোমাদিগকে সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করুক।"

এইরূপ নান্দীশ্লোকের দ্বারা বেণীসংহার নাটকের উদ্বোধন হইয়াছে। তৎকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার আখ্যান অবশ্যই

এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, নতুবা ভট্টনারায়ণ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবেন কেন ?

কেন্দুবিল্বের চারণ কবি জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি অমর কাব্য গীতগোবিন্দের স্রষ্টা। ইহার বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা। জয়দেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এইরূপ একটি নান্দীর উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের বিষয় বস্তুতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন :—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ —
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্ব কুঞ্জদ্রুমং,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥

"হে রাধিকে ! নভোমণ্ডল নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হইয়া উঠিল, বনভূভাগও শ্যামল তমালতরুনিকরে অন্ধকারময়, শ্রীকৃষ্ণ অতীব ভয়শীল, নিশাভাগে একাকী গমনে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তুমি তাহাকে আপনার সমাভিব্যাহারে লইয়া গমন কর। নন্দ কর্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাতা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধাসতী শ্রীহরিসমভিব্যাহারে পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং কালিন্দীকূলে সমুপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকা শ্রীহরিসহ কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই গুপ্ত কেলি ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাগণের হৃদয়-মন্দিরে প্রস্ফুরিত হইয়া জয়লাভ করুক।"

পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীগীতগোবিন্দের আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে :—

বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা,
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥

"যাঁহার চিত্তমন্দির শ্রীহরির চরিত-চিত্রে সমঙ্কিত, যিনি শ্রীরাধিকার পাদপদ্মসেচনে নিরত, সেই মহাকবি নর্ত্তকপ্রবর জয়দেব শ্রীহরির রতিকেলি-কথা-সম্বন্ধীয় এই গীতগোবিন্দ প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন।"

গীতগোবিন্দের বর্ণনীয় বিষয় :—

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ,
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণকে গোপবধূগণের সহিত সমভাবে কেলি করিতে দেখিয়া শ্রীমতী রাধার অন্তরে অভিমানের উদয় হইল। স্বীয় প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল বিবেচনায় তিনি, যাহার শিখর-প্রদেশকে ভ্রমরকুল গুঞ্জনরবে মুখরিত করিতেছিল, সেই লতাকুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় উপবেশন পূর্ব্বক দীনভাবে প্রিয় সহচরীসকাশে আত্মমনোরথ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।"

পরবর্ত্তী সর্গে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীরাধিকার অপ্রাপ্তিতে রসিকশেখরের খেদ, ক্রমে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিমুখতা, শ্রীরাধিকার অভিমান, "মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্"—শ্রীরাধিকার প্রতি জনৈকা সহচরীর সান্ত্বনাবাক্য তৎপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ের সাক্ষাৎ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো,
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥

প্রভৃতি অনুনয়-উক্তি, পরিশেষে শ্রীরাধার মানভঙ্গ এবং উভয়ের মিলন।

জয়দেবের সময় শ্রীরাধা-কৃষ্ণলীলা-আখ্যান প্রচলিত না থাকিলে জয়দেব তাঁহার গ্রন্থের উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন ? এই সকল প্রমাণাদি হইতে আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এতদ্দেশে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলা-আখ্যায়িকার বহুল প্রচার ছিল, যাহার ফলে বিভিন্ন যুগের কবিগণ উক্ত লীলা-আখ্যায়িকা অবলম্বনে নাটক, কাব্যগ্রন্থ বা আখ্যায়িকা সৃষ্টির সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-রচকের আবির্ভাব হয়—এক জন নান্নুরের চণ্ডীদাস, অপরজন মিথিলা-বিস্ফীর বিদ্যাপতি। উভয়েই প্রেমিক, উভয়েই সুগায়ক, উভয়েরই সুমধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচক। উভয়েই মূল আদর্শ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা বর্ণন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনায় প্রেমের অফুরন্ত খেলা দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভক্তি ও

প্রেমের সম্মিলনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-বর্ণন উভয়ের কল্পনাতেই ছিল না—তাঁহারা প্রধানতঃ প্রেমবাদের উপরই এই লীলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তৎপর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১৪৭৩-৮০ খৃঃ) মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ বসু রামানন্দের পিতামহ কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দবিজয়' নামক গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মালাধর বসু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে সমপর্য্যায়ে স্থাপন করতঃ তাঁহাদের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন—ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধকে তিনি অবহেলা করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব প্রেমের বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত করেন। চৈতন্যাবতারের মূল উদ্দেশ্য নিজ রসাস্বাদন; শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন :

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

বহুকাল পর্য্যন্ত অবিতরিত সুধা উজ্জ্বল রস দ্বারা পরিপুষ্ট, নিজভক্তিসম্পত্তি প্রদানার্থ শ্রীচৈতন্য কৃপাবশে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য আস্বাদন করেন সেই অদ্ভুত মাধুর্য্যই বা কিরূপ; শ্রীকৃষ্ণের অনুভবজনিত সুখধারা শ্রীরাধার অন্তরে কি ভাবে আস্বাদিত হয়, তাহা জানিবার লোভে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধা-ভাবসম্পন্ন হইয়া (রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং কৃষ্ণস্বরূপম্) শচী-গর্ভরূপ সমুদ্রে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে চৈতন্যাবতারের মূল উদ্দেশ্য নিজ রসাস্বাদন বা স্বকীয় অমূল্য জীবনীর দৃষ্টান্ত সাহায্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা প্রচার। মহাপ্রভুর সময় হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে সারা ভারতবর্ষ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। পরবর্ত্তী সময়ে ভাই জীবনে বা সাহিত্যে একমাত্র আচরণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইল শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-আস্বাদন এবং অপরকে তাহার আস্বাদ দান। মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা অবলম্বনে 'ললিতমাধব' নামক অমর গ্রন্থের জন্মদান করেন।

রায় রামানন্দ উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং উত্তরকালে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য হইয়া পড়েন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'জগন্নাথবল্লভ'এর রচয়িতা। 'জগন্নাথবল্লভ' বা 'রামানন্দগীতি' নাটকের বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা।

অতএব দেখা যাইতেছে, খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষোড়শ শতাব্দী—এই সুদীর্ঘ ষোল শত বৎসর ধরিয়া সুবিস্তৃতভাবে শ্রীরাধার জন্মবৃত্তান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রেম-লীলা অবলম্বনে নানাবিধ কাব্য, নাটক ও আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীরাধা-কাহিনী যে প্রাচীন এবং বঙ্গদেশে এককালে যে তাহারা বহুল প্রচার ছিল তাহাই সূচিত হইতেছে। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে এই লীলা-কাহিনীর প্রচার থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনী বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিল মহাপ্রভুর জন্মের পর হইতে। মহাপ্রভুর দেহরক্ষার পরে বহুল প্রসারের ফলে কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, কি নাটক, কি গল্প বা পদাবলী সর্ব্বত্রই এই কাহিনী উপকরণ জোগাইয়াছে। তাহার পর যুগপরিবর্ত্তন এবং সাহিত্য-জগতের বিরোধ বিপ্লবের মধ্য দিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা তেমনি ভাবেই বাঙ্গালীর হৃদয় চির সরস করিয়া তুলিতেছে। এই অপূর্ব্ব লীলা-কাহিনী বাঙ্গালা ভাষার কত গ্রন্থের যে মালমশলা জোগাইতেছে তাহার শেষ নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় বৈষ্ণব সাহিত্য অবলম্বনেও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাদির সৃষ্টি হইয়াছে। অপূর্ব্ব সাহিত্যখনির পূজারী বৈষ্ণব-মহাজনগণের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারা যায় না—সেই মহাজনপদে অসংখ্য প্রণতি। সর্ব্ব শেষে সর্ব্বরূপাধার ও তদীয় আধেয়ের চরণে প্রণতি নিবেদনান্তে বিদায় লইতেছি—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ॥

গুরুদেব

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

ভারতবর্ষ গুরুবাদের দেশ। প্রাতঃকালীন শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শয্যারোহণ পর্য্যন্ত দৈনন্দিন সমুদয় কর্ম্মেই গুরুমুখী নির্দ্দেশের অপেক্ষা করা আমাদের কেমন স্বভাব হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে শিক্ষাগুরু, দীক্ষা-গুরু, ধর্ম্মগুরু, কর্ম্মগুরু প্রভৃতি অসংখ্য গুরুর গুরুভার বহন করিতে আমাদের সনাতন মনের কাঁধ দুইটাতে রীতি-মত কড়া পড়িয়াছে বলিলেই হয়। রামায়ণ-মহাভারতের দেশে গুরুভক্তির ট্রেনিং (শিক্ষা) আর আমাদের নূতন করিয়া লইতে হইবে না। একলব্য, আরুণি প্রভৃতির গুরুভক্তি পুরুষানুক্রমে আমাদের রক্তে মিশিতে মিশিতে ক্রমেই হাই পোটেন্সি (শক্তিশালী) হইয়া পড়িতেছে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম যাহাই করি, গুরু-আজ্ঞা ছাড়া আমাদের চলিবার যো নাই, তা সে গুরু প্রাচ্যেরই হউন আর প্রতীচ্যেরই হউন, চীনেরই হউন বা 'রাশ্যা'রই হউন, একটা কাহাকেও ঠিক করিতে পারিলেই আমরা আমাদের অন্তরের অহৈতুকী ভক্তি নিবেদন করিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হই।

সম্প্রতি বিপদে পড়িয়াছি রাষ্ট্র'গুরু' গান্ধীজী ও কবি'গুরু' রবীন্দ্রনাথকে লইয়া। বাংলার তরুণদের হৃদয়া-কাশে এই দুইটি জ্যোতিষ্কই প্রায় একই ক্যাণ্ডল-পাওয়ারের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া আমাদের প্রাচীন কুসংস্কারের অজ্ঞানতিমিরান্ধকার দূর করিতেছেন। সাধারণ দৃষ্টি ত দূরের কথা, এমন কি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও ইঁহাদের কোন তারতম্য বুঝিবার উপায় নাই।

রাষ্ট্রগুরু মহাত্মাজী মুণ্ডিত মস্তকে ও অর্দ্ধোলঙ্গ বেশে অহিংসা, হরিজন-প্রেম ও প্রত্যাদেশের অদ্ভুত বাণী প্রচার করিয়া আমাদের অবতারের তালিকার পরিশিষ্টে নামটা প্রায় তুলিয়া ফেলিয়াছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শুভ্র চিকুর, শ্মশ্রু ও টুপি আলখাল্লা-সমন্বিত বেশে গীতা-উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মারাত্মক রকম দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া নৈমিষারণ্যের ঋষিপদ কায়েম করিয়া ফেলিয়াছেন।

একজন সমগ্র দেশের ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের কাঁচা মস্তকগুলি লইয়া খেয়ালমত ভারতের রাজনৈতিক অনুর্ব্বর জমিতে সার দেন, স্বাধীনতার ফসল ফলাইবার জন্য; সারবান্ জমি পাইয়া কাঁটাগুল্মে দেশ ছাইয়া যায়। অপর জন তাহাদের মস্তকগুলি গলাইয়া বিশ্বমানবত্বের মন্দিরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন, বিশ্বের পতঙ্গ মুগ্ধ হইয়া উড়িয়া আসে।

মুণ্ডিত মস্তকে ও অর্দ্ধোলঙ্গ বেশে…

উভয়েই তুল্যমূল্য, কাহাকেও ফেলিয়া অন্যকে রাখিবার উপায় নাই। উভয়েই আমাদের গৌরবের বস্তু, হৃদয়ের ধন, মাথার মণি, সব কিছু একাধারে—যাহাকে বলে ডবল জোকার, ট্রাম্প কার্ড (রঙের তাস)।

কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—কে বড় ?

অতি সূক্ষ্ম নিক্তির সাহায্যেও ওজনের কোনরূপ তারতম্য ধরা যাইতেছে না। আপনারা হয় ত বলিবেন, এ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ভোটে ফেলিয়া বড় ছোট

নির্ণয় করা। কিন্তু তাহাতেও দেখিয়াছি, বড় সুবিধা হইল না।

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় মনিষীরা না কি গান্ধীজীকে স্বয়ং যীশুখৃষ্টের লেটেষ্ট এডিশন (আধুনিকতম সংস্করণ) বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। এর উপর ত আর কথা নাই।

আবার রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রসংশাপত্রগুলির ট্রু কপি (ঠিক নকল)—সোনার পুথি (Golden Book of Tagore) নামে যাহা ছাপাইয়াছেন, ট্রু—(সত্য) হইলে তাহাতেই চক্ষু চড়কগাছ হইবার কথা।

সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছেন, গুরু-নির্ব্বাচনের সমস্যাটা বেশ গুরুতরই হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা অনেকে হয় ত এ অবস্থায় দু'জনকেই একসাথে গুরুবরণ করিয়া হৃদয়-বেদীতে যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিবেন। তাহা হইলে ত ভালই হইত, কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শ্যাম ও কুল উভয়ই যুগপৎ বজায় রাখিয়া চলা সম্ভব হইতেছে না।

এক রাজ্যে যেমন দুই রাজা চলিতে পারে না, এবং এক আকাশে দুই সূর্য্যের অবস্থিতি যেমন সম্ভব নহে, তেমনি বাংলার একনিষ্ঠ গুরুবাদী চিত্তের একটি মাত্র সীটের (আসনের) জন্য দুইজন ব্র্যাকেটে ফার্ষ্ট কম্পিটিটর (প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগী) লইয়া যে কি মুশকিলেই পড়িয়াছিলাম তাহা আর বলিয়া শেষ নাই।

গান্ধী-চরিতামৃতের মধ্য-লীলায় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে বার্ড অফ শান্তিনিকেতন (শান্তিনিকেতনের চারণ কবি) বলিয়া যে তীব্রভাবে শ্লেষ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমরা গান্ধীজীর গোঁড়ামীর উপর কতখানি খড়্গহস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা আপনারা জানেন। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন গান্ধীজীর নন্-কো-অপারেশনকে দিবালোকে দুয়ার-জানলা বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালার সহিত উপমা দিয়া রহস্য করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ন্যাকামীর উপরেও তখন কম চটিয়া যাই নাই।

ঘরে বাইরে, চায়ের দোকানে, যখন তখন, যেমন তেমন ভাবে তর্ক, হাতাহাতি, এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত করিয়া দেখিয়াছি, সমস্যার সমাধান হয় নাই।

এই অবস্থায় বিবদমান দুইজনকেই একসঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব নহে এবং একে ফেলিয়া অপরকে গ্রহণও চলিতেছে না। এইরূপ সঙ্কটজনক 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' অবস্থায় আমরা যে পরিমাণ মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিয়াছি, কলিকাতায় সেদিন বিমান-আক্রমণ-সঙ্কেত শুনিয়াও ততটা উদ্বিগ্ন হই নাই।

যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দয়ালু ভাগ্য-বিধাতা চিরদিনই আমাদের উপর প্রসন্ন। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছায় এই দারুণ পরিস্থিতির ভিতর আমাদের বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। বিপদভঞ্জন মধুসূদন একদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য্যজনক ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া আমাদের নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। খবর পাওয়া গেল, গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্যস—নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, বহু জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণেও যাহার সমাধান হয় নাই, একটি সামান্য ঘটনায় তাহার চূড়ান্ত মিমাংসা হইয়া গেল।

ঘটনাটি না কি এইরূপ :

কিছুদিন পূর্ব্বের কথা—ওয়ার্দ্ধার ঋষি আসিয়াছেন শান্তিনিকেতনের ঋষির নিকটে আশ্রম পরিদর্শনে। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ, হৃদ্যতা ও আনন্দ-জ্ঞাপনের ত্রুটি নাই। গান্ধীজী দুইদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রম পরিদর্শন পূর্ব্বক অনেক কিছু শিখিলেন ও শিখাইলেন। এইবার কবিকে ওয়ার্দ্ধায় নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিবার পালা।

শীতের সকাল। উত্তরায়ণের লাল বারান্দায় বসিয়া দুইজনের মধ্যে বিদায় সম্ভাষণ চলিতেছে। টেবিলের উপর কবির জন্য বোর্ণভিটা এককাপ ও গোটাকতক আঙ্গুর, মহাত্মাজীর জন্য গোটা দুই কমলালেবু ও ঈষদুষ্ণ সফেন ছাগ-দুগ্ধ ধূমায়িত হইতেছে। উভয়ই ঋষি শ্রেণীর লোক ও আশ্রমবাসী। সুতরাং আলোচনাও চলিতেছে ভাবমার্গে, অর্থাৎ গ্রাম্য কথায় আমরা যাহাকে বলি 'সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি'। আশ্রম-পরিচালনার পদ্ধতি সম্বন্ধে দু'জনের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ নাই। উভয়ই চান, প্রাচীন ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—মানে খৃষ্টপূর্ব্ব শতকের সঙ্গে বিংশ খৃষ্টাব্দের জোড়-কলম।

আলোচনার প্রসঙ্গে মহাত্মাজী কহিলেন—"কৃষ্টি ফৃষ্টি আমি বুঝিনে কবি। আগে দেশ তারপর মানুষ, আগে স্বাধীনতা তারপর মহামানবতা—"

কবি যেন ব্যথা পাইলেন। ভাবগদগদ কণ্ঠে কহিলেন—"কি বলছেন আপনি? জানেন না, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'? দেশ, স্বাধীনতা সবই ত আপেক্ষিক। সীমার মধ্যে অসীমের আহ্বান এসেছে, সেই আহ্বানে আজ সাড়া দিতে হবে সবাইকে, প্রাচ্যকে প্রতীচ্যকে। কার কোন দেশ? বাইরের ভৌগোলিক সীমায় কি তার অন্তরের আত্মীয়তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? সবাইকে সমস্বরে আজ বলতে হবে—'সব দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া'।"

মহাত্মাজী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন—"তা হলে স্বদেশ বলে কারও কিছু কি নেই? ভারত, ভারতবাসী এসব কি তাহলে—"

কবি অনমুকরণীয় ভাবে হাসিয়া উঠিলেন: "মিথ্যে, মিথ্যে, এ কথা বলতে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই। স্বদেশ কথাটা আজকালকার মূঢ় রাজনৈতিক চালবাজদের নতুন সৃষ্টি, মূর্খদের ভোলাবার জন্যে। কোথায় ছিলাম আমি পূর্ব্বে, কোথায়ই বা থাকব পরে। সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখবেন দেখি। আর্য্যরা ত শুনতে পাই ভারতে এসেছিলেন সাইবেরিয়া থেকে, আর্য্যত্বের বড়াই যদি আমরা করি, তবে সাইবেরিয়ার স্বাধীনতার জন্যেই ত আমাদের লড়তে হয়।"

আলোচনা চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। কেহই কাহাকেও স্ব-মতে লওয়াইতে পারেন না। বেলা বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে। আলোচনার গতি একটু মন্দীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী কেমন যেন উসখুস করিতে লাগিলেন। কি যেন বলিতে চান, অথচ বলিতে বাধিতেছে, এমনি একটা অসহায় ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদায় সম্ভাষণের পালা শেষ করিয়া এখনি যাত্রা করিতে হইবে। বাহিরে মোটরের হর্ণ।

কবি সশব্দে গলা ঝাড়িলেন। এ শব্দ যিনি শুনিয়াছেন তিনিই চিনিবেন, ভুল হইবার উপায় নাই। পর্দ্দা ঠেলিয়া পিছন হইতে নিটোল-টাক-সমন্বিত বিরাট কালো বর্ত্তুলাকার একটি ভদ্রলোক বাহির হইলেন, হাতে একখানি শান্তিনিকেতনের আর্থিক সাহায্যের চাঁদার খাতা। কবি একটু মিষ্টি হাসিয়া খাতাখানি মহাত্মাজীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন।

এক্ষেত্রে যাহা করিতে হয়, তাহা দুইজনেই ভাল জানেন—সুতরাং বাক্যব্যয় বাহুল্য। অত্যন্ত নিরুপায়ভা বিবর্ণমুখে মহাত্মাজীকে একযোগে একটা অঙ্কপাত করি দিতে হইল।

ব্যাপারটা সামান্যই, কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটি গেল। 'মহাত্মা'জী অকস্মাৎ চেয়ার ছাড়িয়া ব্যাকুলক বলিয়া উঠিলেন—"মার্জ্জনা করবেন 'গুরুদেব', চিনতে পারিনি আপনার কাছে শিখবার এখনো ঢের বাকী। আজ থেকে আপনি আমার গুরুদেব—একটু পদধূলি দিন—"

শুভ্র চিকুর, শ্মশ্রু ও টুপি আলখাল্লা সমন্বিত

কবির পদস্পর্শ করিবার জন্য নীচু হইতেই মহাত্মাজী গাত্রবিলম্বিত খদ্দরের টুকবার ভিতর হইতে এক—না খা টুপ করিয়া পড়িয়া গেল। দেখা গেল, সেগ্রাম সেবাসঙ্ঘের চাঁদা-আদায়ের খাতা।

সম্ভবতঃ এই জন্যই গান্ধীজীর শান্তিনিকেতনে আগম এবং এইটাকেই সময়মত ও দৃষ্টিশোভন ভাবে বাহির করিবা সুযোগই তিনি এতক্ষণ খুঁজিতেছিলেন। কবি পূর্ব্বেই চা দিয়া মাত করিয়াছেন—ব'ড়ের কিস্তি।

সত্য মিথ্যা জানি না, শুনা যায়, সেই হইতেই রবীন্দ্রনা গান্ধীজীর 'গুরুদেব'। আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

অপরাধী

—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

কথায় বলে অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। চরণদাসেরও অদৃষ্ট, নচেৎ তাহার মত নির্ব্বিবাদী লোক যে একদিন চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া হাজত-বাস করিবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু হাতে হাতে যখন ধরা পড়িয়াছে তখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্ধকার কারাকক্ষে বসিয়া চরণদাসও ভাবে, কোথা দিয়া কি হইল? আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছেও যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতই বোধ হয়।

ঘটনাটা এই—সেদিন কি একটা স্নানযোগের তিথি। খুব ভোর ভোর উঠিয়া চরণদাস কোন্নগরের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিল, কিন্তু রাতটা ঠিক ঠাহর করিতে না পারায় ভোর হইবার বহু পূর্ব্বেই বাড়ী সে হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মল্লাবেড়ের বড় মাঠটা পার হইয়া ডানপতিপুরে প্রবেশ করিলে খানিকদূর আসিয়া সে কোথায় যেন মানুষের গোঙানির মত একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাইল। পাশেই একটা একতলা বাড়ী। একটুখানি কান পাতিয়া শুনিয়া তাহার মনে হইল, শব্দটা যেন পাশের বাড়ী হইতেই আসিতেছে। পা পা করিয়া সে বাড়ীটার দিকে আগাইয়া গেল।

পথের উপরেই একখানা ঘর, সম্ভবতঃ বৈঠকখানা। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। রোয়াকের উপর উঠিয়া চরণদাস উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের এক পাশে তক্তপোষের উপর একটা লোক উপুড় হইয়া পড়িয়া একটানা ক্রমাগত গোঙাইতেছে। লোকটার মুখ ও হাত-পা পরণের কাপড় দিয়া বাঁধা। চরণদাস প্রথমে ডাকাডাকি করিয়া বাড়ীর অপরাপর অধিবাসীদিগকে জাগাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বার কয়েক ডাকিয়াও যখন ভিতর হইতে কোন সাড়া-শব্দ আসিল না, তখন সে বাধ্য হইয়া নিজেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লোকটির মুখের বাঁধন খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। লোকটি এরূপ গোঙাইতেছে যে অবিলম্বে তাহাকে বন্ধন-মুক্ত না করিলে হয় ত এখনই দম আটকাইয়া তাহার মৃত্যু হইবে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চরণদাস প্রথমেই তাহার মুখের বাঁধনটা খুলিয়া দিল, তাহার পর কলসী হইতে জল গড়াইয়া লোকটির মুখে-চোখে দু-এক বার ঝাপটা দিতেই অল্প অল্প করিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভূতপূর্ব্ব। লোকটী চোখ চাহিয়া তাহাকে দেখিয়াই হঠাৎ "চোর, চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

চরণদাস জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় চোর?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া লোকটি ঐ একই কথা বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই এঘর-ওঘর হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকেই ধরিয়া ফেলিল। চরণদাস বার কয়েক আমতা আমতা করিয়া প্রকৃত ঘটনাটা ইহাদের নিকট ব্যক্ত করিতে চাহিল, কিন্তু কে শোনে তাহার কথা? প্রাথমিক যাহা কিছু করিবার তাহা করিয়া অবশেষে চরণদাসকে তাহারা পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে।

যথাসময়ে মহকুমার আদালতে আসামীর বিচার সুরু হইল। মামলা তদ্বির করিবার মত চরণদাসের কেহ ছিল না। সংসারে তাহার স্ত্রী দাক্ষায়ণী ও এক মাত্র ছেলে কেষ্ট। কেষ্টর বয়স এই সবে বছর ষোল, দাক্ষায়ণী কোন রকমে পাড়ার পাঁচজনের কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া দু'চার টাকা যোগাড় করিয়া তাহাকেই আদালতে পাঠাইয়া দিল। কেষ্ট একজন বৃদ্ধ মোক্তারের হাতে-পায়ে ধরিয়া অল্প পয়সায় তাহাকে বাপের পক্ষে দাঁড়াইবার জন্য নিযুক্ত করিল, কিন্তু এজলাসে উঠিলে দেখা গেল, আদালতের একজন উকীল বিনা পারিশ্রমিকে আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতেছে। কৃতজ্ঞতায় কেষ্টর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

তবুও চরণদাসকে বাঁচাইতে পারা গেল না। সরকারী উকীল সাক্ষী-সবুদ সাজাইয়া আইনমতে দস্তুরমত প্রমাণ করিয়া দিলেন, আসামী প্রকৃতই দোষী, এবং সে রাত্রে চরণদাস চুরি করিবার অভিপ্রায়েই উক্ত গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

বিচারে চরণদাসের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

যাহা হইবার তাহা হইয়া যায়, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষকে শত দুঃখেও আবার সাহসে বুক বাঁধিয়া উঠিয়া বসিতে হয়। ছেলের মুখ চাহিয়া দাক্ষায়ণীও আবার উঠিয়া বসিল।

দিন চার পাঁচ পরের কথা।

সেদিন দুপুর বেলায় কেষ্ট তাহাদের সদরের উঠানে সজনে গাছটার তলায় বসিয়া এক মনে কি করিতেছিল, এমন সময় ঘড় ঘড় করিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পরক্ষণেই গাড়ীর ভিতর হইতে প্রৌঢ়বয়স্ক একটি ভদ্রলোক নামিয়া আসিয়া কেষ্টকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি চরণদাসের বাড়ী?"

আগন্তুকের মুখের পানে চাহিয়া বিনীতভাবে কেষ্ট উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

পরিচয়-প্রসঙ্গে লোকটী বলিল, তাহার নাম নীলমণি, নিবাস বলুহাটী, চরণদাস সম্পর্কে তাহার মামাত ভাই হয়।

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কেষ্ট বলিল, "কিন্তু বাবা ত এখানে নেই।"

"সে আমি সব জানি, কোর্টে আমার এক সম্বন্ধী কাজ করে কি না। তার মুখে সব শুনেছি"—এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া নীলমণি পুনরায় বলিল, "তাই ভাবলুম, যাচ্ছি যখন ওদিকে একবার দেখেই আসি—চরণের ছেলে-পুলেরা সব কেমন আছে।"

বাপের পিসতুতো ভাই, বয়সেও বড়, সুতরাং নীলমণি কেষ্টর জ্যেঠামশাই হয়। বাহিরের ঘরের দাওয়ায় একখানা মাদুর পাতিয়া কেষ্ট নবাগত জ্যেষ্ঠতাতকে বসিতে দিল, তাহার পর বাড়ীর ভিতর গিয়া মাকে আগন্তুক সম্বন্ধে সকল কথা বলিল।

দাক্ষায়ণীও তাহাকে আদৌ চিনিতে পারিল না। আজ বিশ বছরেরও উপর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সে এবাড়ীর কাহারও মুখে কখনও নীলমণির নামটা পর্য্যন্ত শোনে নাই, তবে একবার যেন কাহার কাছে শুনিয়াছিল, বলুহাটীর ঐ দিকে না কোথায় তাহার এক দূর-সম্পর্কের পিস-শাশুড়ীর বাড়ী আছে বটে, কোনকালে যাওয়া-আসা না থাকায় বর্ত্তমানে সে-সম্পর্ক একরকম উঠিয়াই গিয়াছে। দাক্ষায়ণী ভাবিল, নীলমণি হয় ত তাহাদেরই কেহ, দোকান হইতে মিষ্টি আনাইয়া সে ছেলের হাত দিয়া ভাসুরকে জল খাইতে দিল।

পথশ্রমে নীলমণি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জলযোগ করিয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে সে কেষ্টকে পাশে বসাইয়া তাহার সহিত এ-কথা সে-কথা লইয়া নানা গল্প শুরু করিল। নীলমণির অমায়িক ব্যবহারে ও তাহার কথাবার্ত্তার আন্তরিকতায় কেষ্ট এই অল্প সময়ের মধ্যেই জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছিল। কথায় কথায় নীলমণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কেষ্ট তোদের এখন চলছে কিসে?"

কথাটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত হইলেও জ্যেষ্ঠতাতের কাছে তাহা বলিতে কেষ্টর কোন আপত্তি নাই। সে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই, মাঝেরপাড়ার ত্রৈলোক্য পালের মুদীখানার দোকানে মায়ের মাকড়ী-জোড়াটা বন্ধক রাখিয়া সম্প্রতি এক মণ চাল ও কিছু তেল-নুন পাওয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাতেই তাহাদের একরকম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পরিশেষে সে আরও বলিল, ত্রৈলোক্য তাহাকে ইহাও আশ্বাস দিয়াছে যে, শীঘ্রই সে কলিকাতায় তাহার পরিচিত আড়তদারের দোকানে কেষ্টর যা হোক একটা কিছু করিয়া দিবে। কলিকাতা তাহাদের গ্রাম হইতে বেশী দূর নহে, প্রত্যহ যাওয়া আসা করিয়া সে অনায়াসেই চাকরী করিতে পারিবে।

শেষের কথাগুলি কেষ্ট এমনভাবে বলিল চাকরী যেন তাহার হইয়াই গিয়াছে।

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাকরী করবি তুই?"

"কেন, বেচা কেনার কাজ, সে আমি খুব পারব," এই বলিয়া কেষ্ট মহা উৎসাহে ঘাড় নাড়িল।

নীলমণি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর হুঁকাটায় দীর্ঘ একটা টান দিয়া স্মিতমুখে বলিল, "না রে কেষ্ট তোকে চাকরী করতে হবে না, তোর বাবা যতদিন না আসে তোদের খরচপত্তর যা সব আমিই দেব; বুঝলি ?"

নীলমণি এক-কথায় যাহা বলিল, কেষ্ট তাহা অত সহজে বুঝিতে পারিল না, জ্যেঠতাতের মুখের পানে সে নির্ব্বোধের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলমণি তাহার ফতুয়ার পকেট হইতে দুখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কেষ্টর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই এখন রাখ, আসছে মাস নাগাদ আবার আসব।"

এইবার যেন কেষ্ট কতকটা বুঝিতে পারিল, কিন্তু জ্যেঠতাতের সম্মুখে সে হাত বাড়াইয়া নোটগুলা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। একটা অহেতুক সঙ্কোচ আসিয়া অনর্থক তাহাকে অত্যন্ত লাজুক করিয়া তুলিল। বাড়ীর সম্মুখে সজনে গাছটার আগায় অপরাহ্ণের শেষ রৌদ্র তখন একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া নীলমণি বলিল, "আমি এবার উঠি।"

এতক্ষণে যেন কেষ্টর হুঁস হইল, সচকিতকণ্ঠে সে বলিল, "একটু দাঁড়ান, মাকে বলে আসি।"

কি ভাবিয়া নীলমণি বলিল, "থাক, পরে বলিস।"

নীলমণি চলিয়া গেলে কেষ্ট বাড়ীর ভেতর গিয়া মাকে আগাগোড়া সমস্ত বলিল। সব শুনিয়া দাক্ষায়ণী ত অবাক্। আলাপ নাই, পরিচয় নাই, বিশেষ কোন সম্পর্কও নাই, অথচ এক কথায় লোকটা যাহা করিয়া গেল, নিতান্ত আপন জন ভিন্ন কেহ তাহা করে না বড় একটা। এই খানিক আগেও দাক্ষায়ণী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে ভাবিতেছিল, ঘরে যে-চাল আছে তাহাতে বড় জোর আর দিন চার-পাঁচ চলিবে, তাহার পর যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বরই তাঁহার উপায় স্থির করিয়া দিলেন। মানুষ শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

সেই হইতে প্রতি মাসে একটিবার করিয়া আসিয়া নীলমণি ইহাদের দেখাশোনা করিয়া যাইত। সম্পর্কে ভাসুর হয় বলিয়া দাক্ষায়ণী কখনও তাহার সম্মুখে বাহির হইত না। যাহা বলিবার, দরজার আড়াল হইতে ছেলেকে দিয়াই তাহা বলাইত।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘুরিয়া দীর্ঘ দশটি মাস নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। ঠিক এই সময়ে দাক্ষায়ণী একদিন হঠাৎ জ্বরে পড়িল।

প্রথমটা সকলেই ভাবিয়াছিল ম্যালেরিয়া, দু'এক দিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু পর পর সাত দিন একজ্বরী হইয়া থাকিয়াও যখন জ্বরের বিরাম হইল না, তখন বাধ্য হইয়া কেষ্টকে একজন ডাক্তার ডাকিতে হইল। ডাক্তার আসিয়া রোগের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, টাইফয়েড্, ভাল সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন।

কেষ্ট একটু ফাঁপরে পড়িল। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কেষ্টও ছেলেমানুষ, একা সব দিক্ সামলাইয়া উঠিতে পারে না। বিশেষ করিয়া দাক্ষায়ণী যখন বিকারের ঘোরে বার বার উঠিয়া বসিতে যায়, তখন একা কেষ্টর পক্ষে মাকে শান্ত করিয়া রাখা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া ওঠে। অবশেষে অনেক ভাবিয়া একদিন সে পাড়ার একটি স্ত্রীলোককে মায়ের কাছে রাখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহার মামার বাড়ী গেল মামীকে আনিতে। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিল, মামীমা গিয়াছে বাপের বাড়ী, মামা তাহার দু'-বেলা হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতেছে। কাজেই ফিরিয়া আসা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কেষ্ট অনেক ভাবিল, এ-সময়ে আর কাহাকে আনিতে পারা যায়, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এমন কাহাকেও সে খুঁজিয়া পাইল না, যাহাকে অন্ততঃ দিন-কয়েকের জন্যও বাড়ীতে আনিয়া রাখা যায়।

ঠিক এই সময়ে একদিন সকালবেলায় নীলমণি আসিয়া উপস্থিত। সব দেখিয়া শুনিয়া সে কেষ্টকে বলিল, "কোন ভাবনা নেই, আমি এখনই বাড়ী গিয়ে তোর জ্যেঠাইকে নিয়ে আসছি।"

সেই দিনই বৈকাল বেলায় নীলমণি তাহার স্ত্রীকে আনিয়া হাজির করিল। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কেষ্ট তখন নারিকেল পাতা জ্বালিয়া মায়ের জন্য মিছরীর জল ফুটাইতেছিল, এমন সময় সহসা সে কাহার জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, উঠানের খোলা দরজা দিয়া নীলমণি একটা কাপড়ের পুঁটুলী হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তাহার পিছনে সিল্কের চাদর গায়ে অর্দ্ধ-

অবগুণ্ঠিতা একটি স্ত্রীলোক, তাহাকে দেখিয়া কেষ্টর আর বুঝিতে বাকী রহিল না, সে কে।

নীলমণির স্ত্রী সরাসরি দাওয়ার উপরে উঠিয়া আসিয়া অত্যন্ত পরিচিতের মত কেষ্টকে বলিল, "তুই তোর মার কাছে গিয়ে বসগে কেষ্ট, আমি জল গরম করছি।"

কেষ্ট সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

পাতাগুলো উনুনের ভিতর ঠেলিয়া দিতে দিতে ঈষৎ হাসিয়া নীলমণির স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে কেষ্ট চিনতে পারিস্?"

কোন কথা না বলিয়া কেষ্ট সঙ্কুচিতের মত এক পাশে দাঁড়াইয়া নতমুখে পায়ের আঙুল দিয়া অনর্থক দাওয়ার মাটী খুঁড়িতে লাগিল। জীবনে যাহাদের সহিত কখনও কোন পরিচয় নাই, তাহাদের সে চিনিবেই বা কেমন করিয়া?

খানিক পরে জল গরম হইয়া গেলে নীলমণির স্ত্রী দাক্ষায়ণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া তাহার কপালের উপর আলগা করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল, "বৌ?"

দাক্ষায়ণীর তখন ঘোর বিকার, জায়ের ডাকে সে শুধু একবার বড় বড় চোখ করিয়া তাহার দিকে চাহিল মাত্র।

মায়ের অসুখে কেষ্ট অত্যন্ত মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলমণির স্ত্রী তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, "ভাবিস নি কেষ্ট, বাইশ দিন গেলেই রোগ কেটে যাবে।"

দাক্ষায়ণীর রোগ কাটিতে কিন্তু দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ দিন সময় লাগিল। এ-কয়দিন নীলমণির স্ত্রী দিবারাত্রি রোগীর শিয়রে বসিয়া সাধ্যমত তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে। নীলমণিও প্রত্যহ একবার করিয়া আসিয়া ইহাদের খোঁজখবর লইয়া যাইত। মাঝে কয়েক দিন দাক্ষায়ণীর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি গিয়াছিল। এক এক সময় সে বিকারের ঘোরে চীৎকার করিয়া বলিত, "ও কখ্খনো চুরি করে নি, কখ্খনো না, ঈশ্বর এর বিচার করবেন, ঈশ্বর, ঈশ্বর।"

নীলমণির স্ত্রী নানা উপায়ে তাহাকে শান্ত করিয়া একটু ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিত।

দাক্ষায়ণী তখন একটু সারিয়া উঠিয়াছে।

নীলমণির স্ত্রী এক দিন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতে করিতে কথায় কথায় বলিল, "তুই ত পথ্যি পেয়েছিস্ বৌ, আমি এবার যাই, অনেক দিন হলো এসেছি—"

নীলমণির স্ত্রী ছেলেপুলের মা, কাজেই দাক্ষায়ণী তাহাকে আর আটকাইয়া রাখিতে পারে না। যায়ের কোলের উপর একখানি হাত রাখিয়া সে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল "তোমাদের ঋণ এ জীবনে শোধ দিতে পারব না দিদি।"

নীলমণির স্ত্রী তাহার হাতখানা মুঠোর মধ্যে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "ও কি ভাই, ও কথা বলতে আছে? বিপদ আপদের সময় যদি আপনার লোকেরা না দেখে, তবে আর তারা আপনার কিসেব?"

স্খলিতকণ্ঠে দাক্ষায়ণী বলিল, "কে আর জানত বল যে, তোমরা এত বড় আপনার লোক রয়েছ?"

"আমিও কি জানতুম ছাই, সেদিন কর্ত্তার মুখে প্রথম শুনলুম যে আমার একে মামাত দেওরেব বাড়ী এখানে... তোর খুব অসুখ। যাই হোক ভাই, তোকে যে ভাল দেখে যাচ্ছি, এতে কি আমার কম সুখ?" এই বলিয়া নীলমণির স্ত্রী একটুখানি থামিয়া পুনরায় বলিল, "ঠাকুরপো বাড়ী এলে কেষ্টকে নিয়ে একদিন যেতে বলিস, আর গাড়ী-হাতে পয়সা পেলে তুইও একদিন যাস, বুঝলি?"

দাক্ষায়ণী কোন কথা বলিতে পারিল না। আবেগে, অনুভূতিতে ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

দিন পনের পরের কথা।

নীলমণির স্ত্রী চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে দাক্ষায়ণীও একটু বল পাইয়া আবার উঠিয়া বসিয়াছে। চরণদাসের ফিরিবার সময়ও প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

সেদিন দুপুরবেলায় আহারাদির পর দাক্ষায়ণী তাহাদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুলতলার ঘাটে বসিয়া এঁটো বাসন মাজিতেছিল, এমন সময় কেষ্ট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খবর দিল, "মা বাবা এসেছে।"

দাক্ষায়ণীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বাসনগুলি রাখিয়া সে সকড়ী হাতেই ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া উপস্থিত হইল।

দাওয়ার এক পাশে দেওয়াল ঠেসান দিয়া চরণদাস

শত-অপরাধীর মত চুপটী করিয়া বসিয়াছিল। দাক্ষায়ণী নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইলে সে দু'-একবার কাসিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ সব?"

উত্তর দিতে গিয়া দাক্ষায়ণী ঝরঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শান্ত, সংযত কণ্ঠে চরণদাস বলিল, "কেঁদে আর কি হবে? যা হবার তা ত হয়েই গেল।"

দাক্ষায়ণী কিন্তু কিছুতেই আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। দীর্ঘ একটী বছর ধরিয়া যে অবাধ অশ্রু তাহার চোখে এতদিন জমাট বাঁধিয়া ছিল, আজ যেন তাহা দু-কূল-ছাপান নদীর জলের মত হু হু করিয়া নিঃশব্দ বেগে প্রবাহিত হইল। খানিক পরে, একটু শান্ত হইলে দাক্ষায়ণী উঠিয়া গিয়া রান্না চড়াইল। এতখানি বেলা হইয়াছে চরণদাসের আহার হয় নাই। সকাল বেলা জেল হইতে মুক্তি পাইয়াই সে সরাসরি বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে।

স্বামীকে খাইতে দিয়া দাক্ষায়ণী তাহার সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে কথায় কথায় বলিল "হ্যাঁ, ভাই বটে, লোকের মায়ের পেটের ভাইও অমন হয় না।"

চরণদাস কথাটা ঠিক ধরিতে পারিল না। খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা বলছ?"

ঈষৎ বিস্মিত সুরে দাক্ষায়ণী বলিল, "ওমা, তুমি বুঝি জান না? আর জানবেই বা কি করে?" এই বলিয়া সে নীলমণি সম্বন্ধে সকল কথা একে একে স্বামীর নিকটে ব্যক্ত করিল।

চরণদাস কিন্তু লোকটিকে আদৌ চিনিতে পারিল না। বলুহাটীতে তাহার এক দূর-সম্পর্কের পিসীর বাড়ী ছিল বটে, কিন্তু সে যতদূর জানে, তাহাদের বংশে আর কেহ বাঁচিয়া নাই। পিসীমা-পিসেমহাশয়ের মৃত্যুর পর আজ প্রায় বছর আষ্টেক-দশ হইল, তাহাদের একমাত্র সন্তান ধর্ম্মদাসেরও অকালমৃত্যু হইয়াছে। তাহার নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি জ্ঞাতিদের নিকট বিক্রয় করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। পিসীমার আর কোন সন্তান-সন্ততিও নাই। আর থাকিলেও তাহাদের কাহারও দ্বারা এইভাবে উপকৃত হওয়া শুধু অসম্ভব নয়, চরণদাসের জেলে যাওয়া অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর!

যাহা হউক, পরদিন সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই চরণদাস বলুহাটী যাত্রা করিল। সেখানে গিয়া পিসীমার জ্ঞাতিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহাদের বংশে নীলমণি বলিয়া কেহ নাই বা ছিলও না কোন কালে। চরণদাসের মনে অত্যন্ত খটকা লাগিল, নীলমণি লোকটী তাহা হইলে কে?

অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর চরণদাস বলুহাটীতেই তাহার বাড়ীটা খুঁজিয়া বাহির করিল। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা চৌমাথার মোড়ে গুটিকয়েক আমগাছের তলায় নীলমণির একতলা কোঠা-বাড়ী। নীলমণি তখন বাড়ীতেই ছিল, তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা যেন একটু চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া সে প্রসন্ন হাসিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এস এস চরণ, তার পর, খবর সব ভাল?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া চরণদাস অগ্রজের পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনারা যা করেছেন দাদা, লোকের মায়ের পেটের ভাইও…।" বাধা দিয়া, যেন ঈষৎ বিরক্তিরই সহিত নীলমণি বলিল, "আঃ সে সব বোলো' খন পরে, দুপুর রোদে এই তেতে-পুড়ে এলে, হাত-পা ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও আগে।"

খবর পাইয়া নীলমণির স্ত্রীও রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। মাথার কাপড়টা কপালের উপর ঈষৎ টানিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে দেবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো ঠাকুরপো, পথ ভুলে এলে না কি?" চরণদাস নিতান্ত বে-রসিক লোক। ভ্রাতৃজায়ার এই রসিকতার উত্তরে সে অপ্রতিভের মত একটুখানি হাসিয়া শুধু বলিল "আজ্ঞে না।" নীলমণির স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটবৌ ভাল আছে?"

ঘাড় নাড়িয়া চরণদাস জানাইল যে, হ্যাঁ, তাহারা সকলে ভালই আছে।

সে-বেলাটা চরণদাসকে এইখানেই থাকিয়া খাইতে হইল। ইহাদের সৌজন্যে ও অমায়িক ব্যবহারে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া নীলমণির স্ত্রী যখন তাহার সম্মুখে বসিয়া—"এটা খাও ঠাকুর-পো, ওটা খাও ঠাকুর-পো"—ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে সযত্নে আহার করাইতে লাগিল, তখন তাহার নির্ব্বিকার মন ইহাদের উপর এক অনির্ব্বচনীয় গভীর স্নেহে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। খাইতে খাইতে চরণদাস মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনারা যদি না থাকতেন বৌঠান্, তাহলে কি যে হোতো?"

"কি আবার হোতো ঠাকুরপো, ও কি? মাছটা ফেলে

রাখছ যে? না ভাই খেয়ে নাও, লক্ষ্মীটি" ইত্যাদি বলিয়া নীলমণির স্ত্রী চরণদাসের কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিল।

দুপুর তখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে।

আহারাদির পর চরণদাস বৈঠকখানায় বসিয়া নীলমণির সহিত গল্প করিতেছিল। এখনও পর্য্যন্ত সে নীলমণিকে ঠিক চিনিতে পারে নাই। কথাটা ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার কেমন একটা সঙ্কোচ হইতেছিল।

যাহা হউক তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। নীলমণিই প্রথমে কথাটা পাড়িল। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা চরণ, তুমি আমায় ঠিক চিনতে পেরেছ?"

চরণদাস এইবার যেন একটু সুযোগ পাইল। নীলমণির আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "আজ্ঞে, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া নীলমণি বলিল "কি বল।"

"আজ্ঞে বলুহাটীতে আমার যে পিসী ছিলেন তাঁর ত ঐ একমাত্র ছেলে ধর্ম্মদাস, সেও ত আজ প্রায় বছর আটেক-দশ হোল মারা গিয়েছে, আপনাকে ত ঠিক…" বাকীটুকু বলিতে চরণদাস একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নীলমণি তাহা বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিল, "চিনবেই বা কি করে, সত্যি সত্যিই ত' আমি তোমার পিসীর ছেলে নই।"

তবে কে সে? চরণদাস সবিস্ময়ে নীলমণির মুখের পানে তাকাইল।

তামাক খাইতে খাইতে বার কয়েক কাসিয়া ঈষৎ নির্লিপ্ত-কণ্ঠে নীলমণি বলিল, "আমি জানতুম, কথাটা তুমি জিজ্ঞেস করবেই। প্রথমে ঠিক করেছিলুম, তোমায় যা-তা একটা বলে বুঝিয়ে দিব, কিন্তু পরে ভাবলুম তারই বা দরকার কি?"

সত্য কথাটা কি জানিবার জন্যই চরণদাস আগ্রহে নীলমণির মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

নীলমণি চকিতে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বলিল, "ডানপত্তিপুরের ও-কাণ্ডটা আমিই করেছিলুম।"

চরণদাস যেন আকাশ হইতে পড়িল, বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে? আপনি?"

"হ্যাঁ আমিই। ঐ লোকটা ভারি বজ্জাত। একবার একটা মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে ও আমায় একমাস হাজত-বাস পর্য্যন্ত করিয়েছিল, সেই অপমানের শোধ নেবার জন্যে সে রাত্রে আমিই দরজা ভেঙ্গে ওর ঘরে ঢুকি। হয়ত ঝোঁকের মাথায় লোকটাকে মেরেই ফেলতুম একেবারে, কিন্তু তুমি গিয়ে পড়তে তা আর করা হল না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীলমণি নীরব হইল।

সঙ্গে সঙ্গে চরণদাস জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছেন?… তখন আপনি ঘরে ছিলেন না কি?"

স্খলিতকণ্ঠে নীলমণি বলিল, "হাঁ, তোমার সাড়া পেয়ে আমি ঘরের এক কোণে গিয়ে লুকোই। তারপর তুমি যখন লোকটার কাছে গিয়ে তার মুখের বাঁধন খুলছিলে তখন আমি ঠিক তোমার পিছন দিয়েই বেরিয়ে আসি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীলমণি একটুখানি চুপ করিয়া পুনরায় বলিতে শুরু করিল, "যখন শুনলুম আমার বদলে তারা তোমায় ধরেছে, তখন প্রথমটায় ভারি আনন্দ হল। কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। কেবলই মনে হতে লাগল, শেষে আমার দোষে একটা নিরীহ নির্দ্দোষ লোকের সাজা হবে? একবার ভাবলুম থানায় গিয়ে সব কথা খুলে বলি, কিন্তু তা আর করতে সাহস হল না। অবশেষে অনেক ভেবে আদালতে গিয়ে তোমার পক্ষে একজন ভাল উকীল দিলুম। তাতেও তোমার বাঁচান গেল না, তখন তোমার পিসতুত ভাই সেজে একেবারে তোমাদের বাড়ী গিয়ে হাজির, অবশ্য তার আগে খবর নিয়ে জেনেছিলুম, বলুহাটীতে তোমার এক পিসীর বাড়ী আছে।"

চরণদাস বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নীলমণির মুখের পানে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সে ভুলিয়া গেল যে, এই লোকটার জন্যই তাহাকে দীর্ঘ একটা বছর অনর্থক কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। তখন বার বার তাহার শুধু এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, ইহারা না থাকিলে হয় ত তাহার স্ত্রী-পুত্রকে আজ অনাহারে মরিতে হইত। দাক্ষায়ণী হয়ত বিনা চিকিৎসায় যথাযোগ্য শুশ্রূষার অভাবে মরিয়া যাইত কবে।

কথা শেষ করিয়া নীলমণি তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল, "একটা অনুরোধ চরণ, তোমার বৌদিকে যেন এসব কথা বোলো না। সে শুনলে ভারি কষ্ট পাবে। তাকে বলেছি, সত্যিই তুমি আমার মামাত ভাই।"

বাড়ীর পিছনে বাঁশ-বাগানটা হইতে শুকনো বাঁশপাতার মর্ মর্ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কের মত চরণদাস বলিল, "আপনি না থাকলে আমার ছেলে-পুলে হয়ত আজ অনাহারে মারা যেত—" কিন্তু চরণদাস আর কোন কথা বলিতে পারিল না। শুধু তাহার চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত দানা বাঁধিয়া উঠিল।

চরণদাস আজিও সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, যে ব্যক্তির জন্য তাহাকে জেলের আসামী হইতে হইয়াছিল, তাহারই মহত্ত্বে তাহার স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাইল নিয়তির এ কি পরিহাস!

যশোহর-পরিচিতি

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

মৃত্তিকার বিশেষত্ব

যশোহরের মৃত্তিকা পলি-সঞ্চিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। নদীর তীর ধরিয়া শ্বেত অথবা কর্দ্দমমিশ্রিত বালুকাই এই মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। অভ্যন্তর-ভাগে জলবাহিত সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণা কর্দ্দমের সহিত মিশ্রিত হইয়া শক্ত এঁটেল মাটির সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায়, এ-অঞ্চলের মাটিতে কঙ্কর নাই বা ইহার বর্ণও গৈরিক নহে। নদী-তীরবর্ত্তী বালুকার বর্ণ শ্বেত এবং অনেক স্থলে কৃষ্ণাভ, তবে মিষ্টজলের অঞ্চলের মৃত্তিকায় গৈরিকবর্ণের আভা দেখা যায়। মধুমতীর তীরে ও চরে প্রচুর পরিমাণে বালুকা রহিয়াছে।

যশোহর জেলায় বিলের সংখ্যা খুব বেশী এবং অনেক-গুলির আয়তনও খুব বৃহৎ। যশোহরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশকে একটা প্রকাণ্ড বিল বলা যাইতে পারে। মধ্যে-মধ্যে কৃষকপল্লী গড়িয়া উঠিয়া এই প্রকাণ্ড বিলকে বহু খণ্ডে ভাগ করিয়াছে এবং বহু পৃথক্ বিলে পরিণত করিয়াছে। কালক্রমে বহু স্থান উঁচু হইয়া অবশ্য মাঠের আকার গ্রহণ করিয়াছে। পনেরটি বড় বিলের মোট আয়তনের পরিমাণ ৯৮ বর্গ-মাইল দেখা গিয়াছে। এই সকল বিলের অনেক-গুলি পূর্ব্বে গভীর জলপূর্ণ থাকিত এবং ইহাতে চাষ-আবাদ সম্ভব হইত না। এই সকল বিলে বহুবিধ জলজ উদ্ভিদ্ ও ঘাস জন্মিত—এখনও দুই একটিতে জন্মিয়া থাকে। জলজ উদ্ভিদের দেহ পচিয়া এবং নিম্নস্থ কর্দ্দমের সহিত মিশ্রিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ, ওজনে হালকা একপ্রকার মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। ইহাকে স্থানীয় ভাষায় 'জোব' বা জোব-মাটি বলে। অধিকাংশ বিলের মৃত্তিকা এই 'জোব' দ্বারা গঠিত। এই মাটির শস্যোৎপাদিকা শক্তি অসাধারণ। এই মাটি শুকাইলে শক্ত, হাল্কা ও অগ্নিতে দহনযোগ্য হয়। ধান্যের পক্ষে এই 'জোবে'র উপযোগিতা সমধিক। উঁচু জায়গা হইতে বালুকা-মিশ্রিত মাটি বর্ষার জলে ধুইবা আসিয়া বিল ভরাট করিয়া দিতেছে এবং অনেক স্থানের 'জোব' ঢাকিয়া দিয়া ধান চাষের পক্ষে জমি অনুর্ব্বর করিয়া দিতেছে। তবুও যে-সকল বিলে বৎসরের সব বা অধিকাংশ সময় জল থাকে, সে-সকল স্থানে ঘাস ও কর্ত্তিত শস্যের গোড়া পচিয়া কর্দ্দমের সহিত মিশ্রিত হয় এবং জোব মৃত্তিকার বিশেষত্ব রক্ষা করে। শেষোক্ত শ্রেণীর বিলের উর্ব্বরা-শক্তি এখনও অনেকটা অক্ষুণ্ণ আছে।

জেলার এই অংশের উচ্চভূমিতে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিবার সময় ৪।৫ হাত হইতে ১০।১২ হাতের মধ্যে কয়েকটি স্তরের পরে এই 'জোব' মৃত্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ এই জোবের স্তরটি সাধারণতঃ ১-২॥ হাত পুরু হইতে দেখা যায়। খনন করিবার সময় এই 'জোবে'র স্তরের কাছাকাছি সুন্দরবনসুলভ নানাবিধ বৃক্ষের মূলদেশ ও কাণ্ড পাওয়া যায় এবং সময় সময় ব্যাঘ্রাদির কঙ্কালও আবিষ্কৃত হয়। ইহা হইতে এই কথা মনে হয় যে, এই সকল স্থান যখন সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল, তখন বর্ত্তমানের নিম্নভূমিগুলি বড় বড় নদী, নদীর মোহানা বা অতিশয় গভীর জলাভূমি ছিল এবং বর্ত্তমানের উচ্চস্থানসমূহ তখন অগভীর জলাভূমি ছিল। এই সময় জলজ ও বনজ উদ্ভিদের দেহাবশেষ ও কর্দ্দমের মিশ্রণে এই স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই 'জোব'ও অনেকাংশে বিলের জোবের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং পাথুরিয়া কয়লার সহিত ইহার কিছু পরিমাণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের এই জোব মাটি, পলিমাটি (বিশেষ করিয়া উত্তর-পশ্চিমের) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের যে-সকল স্থানে জোয়ারের জল উঠে, সে-সকল স্থানের মৃত্তিকা অল্প-বিস্তর লবণাক্ত। ইহা নারিকেল ও সুপারি গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই মৃত্তিকানির্ম্মিত ইষ্টক খুব শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। জোব ও লবণাক্ত কর্দ্দমমিশ্রিত মাটি জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র গলিয়া যায় বলিয়া যশোহরের নিম্নাঞ্চলে রাস্তাদি নির্ম্মাণ খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে।

বায়ু

শাহরের আবহাওয়া ও ঋতু-বিভাগ নিম্নবঙ্গের জেলার অনুরূপ। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘের শেষ তকাল বলা যায়। এই সময় উত্তর দিক্ হইতে াণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয় এবং আকাশ মেঘশূন্য পৌষের শেষ ও মাঘের প্রথম দিকে অনেক ল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে মাঘের শেষের দিকের অধিকতর স্বাভাবিক ও সচরাচর বেশী হইয়া । যশোহরের শীত দেশপ্রসিদ্ধ। গড় উত্তাপ বেম্বরে ৭৪° হয় এবং ডিসেম্বরে গড় উত্তাপ ৬৭°তে নামিয়া আসে এবং সর্ব্বনিম্ন গড় উত্তাপ জানুয়ারীতে ৫৩° পর্য্যন্ত পৌছায়। সর্ব্বনিম্ন তাপ উত্তর-বঙ্গের পার্ব্বত্য জেলাগুলির কাছাকাছি পৌছায়। ফেব্রুয়ারীতে উত্তাপ পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করিয়া ৭০° পর্য্যন্ত পৌছায়। এই সময় বৃষ্টি না হইলেও বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে ও গাঢ় কুয়াসার আবির্ভাব হয় এবং শীতের প্রথম ও মধ্য ভাগে রাত্রিতে প্রচুর শিশিরপাত হয়। ম্যালেরিয়ার জন্য যশোহরের অখ্যাতি দেশব্যাপী, কিন্তু শীতের দিকে যশোহরের পল্লীর স্বাস্থ্য খুবই ভাল থাকে এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া-রোগী ব্যতীত নূতন আক্রমণ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়।

ফাল্গুন হইতেই প্রকৃতপক্ষে গরম কাল আরম্ভ হইয়া যায় এবং বায়ুর দিক্ পরিবর্ত্তিত হয়। এই সময় প্রথমে কিছুদিন পশ্চিম হইতে বায়ুস্রোত আসিয়া থাকে এবং পরে কখনও দক্ষিণ-পশ্চিমের শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু, কখনও দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়। বৈশাখের কাল-বৈশাখীর ঝড় উত্তর-পশ্চিম অর্থাৎ বায়ুকোণ হইতে উত্থিত হয়। জ্যৈষ্ঠের দিকে বঙ্গোপসাগরের মুখে যখন ঝড় উত্থিত হয়, তখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে সাধারণতঃ প্রচুর বারিপাত হয়। এপ্রিলে গড়ে ৩·২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু মে মাসের বারিপাতের পরিমাণ ৭·৭ ইঞ্চি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে আকাশ সব সময় মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ৮৮ ভাগে আসিয়া পৌছায়। যশোহরের শীত যেমন প্রসিদ্ধ, গ্রীষ্মও তেমনই দুঃসহ। যশোহরের নদীগুলি মজিয়া যাওয়ায় এবং অগভীর অনেক বিল বর্ষার পরে শুকাইয়া যাওয়ায় সম্ভবতঃ শৈত্য ও উত্তাপের এত আধিক্য ঘটিতেছে। খুলনার সহিত যশোহরের ভৌগোলিক অবস্থানে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও খুলনার নদী-নালা ও জলপূর্ণ বিলের প্রাচুর্য্য এবং যশোহরের আপেক্ষিক জলের অভাবই উভয় স্থানের শৈত্য ও উষ্ণতার পার্থক্যের প্রধান কারণ। যশোহর অপেক্ষা খুলনা সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী (দূরত্ব ৩৬ মাইল) বলিয়া খুলনার আবহাওয়ার উপর সমুদ্রের প্রভাবও কিছু আছে। জলই উত্তাপের সমতা রক্ষা করে; যশোহরে ক্রমবর্দ্ধিত জলের অভাবই উত্তাপের গুরুতর বৈষম্য ঘটাইতেছে। এপ্রিলে গড় সর্ব্বোচ্চ তাপ ৯° এবং মে মাসের উত্তাপও ইহার কাছাকাছি পৌছায়, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ তাপ এক স্তরের উপর আরও কয়েক ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। যশোহরের বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশী বলিয়া এবং যশোহর সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাব-বহির্ভূত বলিয়া এখানকার গ্রীষ্ম কলিকাতা অথবা খুলনার গ্রীষ্ম অপেক্ষা অনেক বেশী পীড়াদায়ক। মৌসুমী বায়ুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে যখন মেঘ করিয়া বায়ু-চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, তখনকার যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা যশোহরবাসীর পক্ষে বিশেষ ভয়াবহ। বায়ুর আর্দ্রতার জন্য এই সময় অত্যধিক ঘর্ম্ম হয়।

জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহেই সাধারণতঃ বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায় এবং জুন মাসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বারিপাত হয়। এই মাসে বৃষ্টির পরিমাণ ১২·৬ ইঞ্চি। এই সময় গড় সর্ব্বোচ্চ তাপ কমিয়া ৮৬°-তে নামিয়া আসে এবং অক্টোবর মাসে ৮২° পর্য্যন্ত নামে। সেপ্টেম্বরের শেষার্দ্ধ অর্থাৎ আশ্বিনের প্রথম হইতে সারা অক্টোবর (কার্ত্তিকের প্রথমার্দ্ধ) মাস পর্য্যন্ত আবহাওয়া নিতান্তই অনিশ্চিত থাকে। মধ্যে মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও বৃষ্টি হয় এবং মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন দিন বর্ষাবসান ঘোষণা করে। ক্রমেই মেঘলা দিনের আবির্ভাব কমিয়া আসিতে থাকে এবং এইভাবে ক্রমে বর্ষাকাল শেষ হইয়া যায়;

বর্ষা ঋতুর শেষের দিকে যশোহরের পল্লীতে ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়া দেখা যায়। বিল এবং বিস্তৃত জলভূমির পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলি ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত এবং এ-সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ একটু দেরীতে, শীতের প্রথম দিকে হয়। স্বাস্থ্য-সম্পর্কে ম্যালেরিয়ার কথা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

আবহাওয়া ও ঋতু সম্পর্কে যাহা বলা হইল, তাহা সাধারণভাবে সত্য হইলেও, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার নানা বিপর্য্যয় দেখা যাইতেছে। নদী মজিয়া যাইয়া জল-নির্গমের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হওয়ায় যেমন প্রতি বৎসর বন্যা আসিয়া জেলার সকল অথবা কোন না কোন অংশের শস্য নাশ করিতেছে, ঋতু বিপর্য্যয়ের ফলেও সেইরূপ ক্ষতি সাধিত হইতেছে।

কয়েক বৎসর স্বল্প বৃষ্টির পর গত দুই বৎসর

অত্যধিক বর্ষণ হইয়াছে। বৃষ্টির এই পরিমাণগত বৈষম্য ব্যতীত অসময়ে বর্ষণ ও সময়ে যথোপযুক্ত বা আদৌ বর্ষণের অভাব—শস্য ও অধিবাসীদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটাইতেছে। ধান্য, কলাই, মশুর, বিবিধ তৈল-বীজ প্রভৃতি সকল প্রকার শস্যই ইহার জন্য ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছে। খেজুর-গুড় ও চিনি যশোহরের চাষীদের একটি প্রধান ফসল। নিয়মিত শীত ও পরিষ্কার, নির্ম্মল আবহাওয়া ইহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্ষা শেষ হইতে বিলম্ব হওয়া, শীতের মধ্যে দীর্ঘদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা ও শীত কমিয়া যাওয়া, অগ্রহায়ণ ও পৌষে শীত কম পড়িয়া মাঘ ও ফাল্গুনের দিকে আসিয়া শীত পড়া প্রভৃতি শীতঋতুর নানাবিধ বিপর্য্যয়ে খেজুর-গুড় ও চিনির উৎপন্নের পরিমাণ অনেক কম হইতেছে।

অনেকে মনে করিতেছেন, সুন্দরবন দূরবর্ত্তী হওয়ায় এবং মানুষের লোভ ও অবিবেচনার ফলে উচ্চ বৃক্ষাদির সংখ্যা অনেক কমিয়া যাওয়ায় বৃষ্টির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বর্ষণ অনিয়মিত হইয়া গিয়াছে। অনিয়মিত বৃষ্টি অন্যান্য ঋতুকেও অনিয়মিত [illegible] ফেলিয়াছে। বৃক্ষের সংখ্যাল্পতা ও সংখ্যাবাহুল্যের [illegible] অন্যান্য ঋতুর উপরও কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষভাবে [illegible] এই অনিয়ম ও বিপর্য্যয়কে অনেকে আসন্ন [illegible] পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব-সূচনা বলিয়া মনে কর[illegible] কিন্তু; এমনও হইতে পারে যে, এই অনিয়ম [illegible] সাময়িক এবং কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তনে[illegible] সূচনা নহে। এই প্রকার সাময়িক বিপর্য্যয়[illegible] অন্যান্য দেশেও আছে। তবে, সুন্দরবন যে [illegible] হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই এবং উচ্চ বৃক্ষের স[illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বহু বৃক্ষ কাঠের [illegible] কর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্থলে তদনুপাতে নূতন বৃ[illegible] আর রোপিত হয় নাই। জেলার আবহাওয়ার উপর ইহা যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবে, এ-আশঙ্কা অমূলক নাও হইতে পারে।

নিম্নলিখিত তালিকাগুলিতে যশোহরের আবহাওয়ার বিবরণ দেওয়া হইল।

যশোহর জেলায় মহকুমাগুলিতে বৎসরের শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুভেদে বারিপাতের পরিমাণ

মহকুমা	গৃহীত হিসাবের বৎসর	নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ হইতে মে	জুন হইতে অক্টোবর	মোট
বনগ্রাম	৩১	২·৫৬	১০·০৭	৪৬·১০	৫৮·৫৩
যশোহর	৩১-৩৬	২·৮২	১৩·৫৭	৫০ ৩১	৬৬·৭০
ঝিনাইদহ	২৯-৩০	২·৫৯	১১·৮২	৪৬·৪৯	৬০·৯০
মাগুরা	২৯-৩০	২·৪৬	১৩·০৮	৪৩ ৪৩	৬০·১৭
নড়াইল	২৯-৩০	২·৮০	১১·৮১	৪২·৬৯	৫৭·৩০
জেলার গড় পরিমাণ	...	২·৬১	১২·২৩	৪৫·৮৮	৬০·৭২

যশোহর জেলার বৎসরের বিভিন্ন মাসের উষ্ণতা, বারিপাত, বায়ুর চাপ ইত্যাদির পরিমাণ

	উষ্ণতা					বায়ুর আর্দ্রতা	মেঘ	বারিপাত		বায়ুর চাপ
		গড়	গড়	গড় পার্থক্য						
	গড়	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	দৈনিক	মাসিক	গড়	গড়	ইঞ্চি	দিন	গড়
জানুয়ারী	৬৮	৭৮	৫৩	২৫	২৭	৮৬	১·০	০·৪৮	১	৩০·০৫
ফেব্রুয়ারী	৭০	৮৩	৫৭	২৬	৩৪	৮২	২·২	১·০১	২	২৯·৯০
মার্চ্চ	৮০	৯২	৬৮	২৪	৩৫	৮০	৩ ৭	১·৮২	৩	৩০ ৮৯
এপ্রিল	৮৬	৯৭	৭৫	২২	২৪	৮০	৪·৭	৩·৯০	৫	৫০·৮০
মে	৮৬	৯৫	৭৭	১৮	২১	৮৪	৬ ২	৭·৮৫	১০	৫০·৭১
জুন	৮৬	৯২	৭৯	১৩	১৫	৮৮	৭·৯	১৩·১৭	১৫	৩০·৫৯
জুলাই	৮৪	৮৯	৭৯	১০	১১	৯০	৮·৪	১১·৬২	১৮	৩০·৫৭
আগষ্ট	৮৪	৮৯	৭৯	১০	১১	৯০	৮·৪	১১ ২২	১৭	৩০·৬৩
সেপ্টেম্বর	৮৪	৮৯	৭৯	১০	১২	৯০	৬·৯	৯·০০	১২	৫০·৭৩
অক্টোবর	৮২	৮৮	৭৫	১৩	২০	৮৬	৩·৭	৫·০০	৬	৩০·৮৮
নভেম্বর	৭৪	৮৩	৬৪	১৯	২৬	৮৫	২·০	১·১৮	১	৩০·৯৯
ডিসেম্বর	৬৭	৭৮	৫৫	২৩	২৮	৮২	১·৩	০.১৫	...	৩০·০৫
বাৎসরিক	৭৯	৮৮	৭০	১৮	২২	৮৬	৪·৭	৬৬·৭০	৯০	২৯·৮২

বাপীস্নান। [ফোটোগ্রাফ—পি. গোস্বামী

একটি গ্রীক উপাখ্যান

—শ্রীশচীবিলাস সামন্ত

জুপিটার তাঁহার দূত মার্কারিকে ডাকিয়া বলিলেন, মার্কারি, ইউরোপের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে শ্রীমতী জুনো আর এখানে থাকিতে রাজি নহেন; অতএব তুমি একবার ভারতবর্ষে গিয়া সেখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আইস—যদি ভাল মনে হয়, তবে আমরা সদলবলে সেখানে গিয়াই কিছুকাল অতিবাহিত করিব।

মার্কারি "যথা আজ্ঞা" বলিয়া ভারতবর্ষে রওনা হইয়া আসিল। আসিবার সময় জুপিটার বলিয়া দিলেন, ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দেশ, সমস্ত দেশের সংবাদ সংগ্রহ করিতে তোমার যথেষ্ট সময় লাগিবার কথা, কিন্তু ততদিন কি আমরা এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব? এখানে আকাশে আকাশে এয়ারোপ্লেন উড়িতেছে, কামানের গোলা ফাটিতেছে, বোমায়-ভাঙা ঘরবাড়ির ভগ্নাংশ ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ধূলির মতই ছিটকাইয়া আমাদের গায়ে লাগিতেছে। এরূপ গুরুতর অবস্থার মধ্যে আমাদের আর এক মুহূর্ত্তও থাকা পোষাইতেছে না, অতএব তুমি ভারতে যেখানে যেমন দেখ, প্রতিদিন তাহার একটি রিপোর্ট যদি পাঠাইতে পার, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। আমরা ভারতবর্ষে দীর্ঘ দিন থাকিতে চাহি, অতএব বিস্তারিত সংবাদ চাই. এবং সব রকম সংবাদ।

মার্কারি তাহাতেই রাজি হইল।

ভারতবর্ষে আসিয়া মার্কারি প্রথমেই সমস্ত দেশের উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহার যে ধারণা হইল তাহাই লিখিতে বসিল। তাহার সেই চিঠি ইউরোপের দেবাদিদেব জুপিটার তাঁহার সংবাদ পরিবেষণকারী সংঘের মারফৎ সাধারণে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই চিঠির পর মার্কারিকে আর কিছু লিখিতে হয় নাই, কারণ জরুরি সংবাদ দিয়া জুপিটার মার্কারিকে ভারতবর্ষ হইতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিবার কল্পনা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

চিঠি খানি এইরূপ:

দেব, এই মাত্র ভারতবর্ষে পৌছিয়াই সমস্ত দেশটি কয়েক দিনের মধ্যে মোটামুটি দেখিয়া লইয়াছি। ভাল করিয়া দেখিতে অন্তত এক সপ্তাহ কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা; ততদিন আমার এখানে থাকায় আপনার যদি, কোনও অসুবিধা না হয় তাহা হইলে জানাইবেন, আমি আগামী কাল হইতে আমার পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য সুরু করিব। কিন্তু আমার মনে হয় এই এক দিনেই যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার মোটামুটি একটি ধারণা হইবে এবং আপনাদের এখানে আসা সম্বন্ধে আপনি উহা হইতেই মত গঠন করিতে পারিবেন।

আমার এই রিপোর্টের ভিতর শুধু একটি বিষয় আপনাকে জানাইতে পারিলাম না, তাহার কারণ এখানে কংগ্রেস নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেই প্রতিষ্ঠান যদি জানিতে পারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেই বিশেষ কথাটি লিখিতেছি, তাহা হইলে কংগ্রেস আমার সঙ্গে অসহযোগিতা করিবে এবং তাহার ফলে আমার স্বাধীন চলাফেরা বন্ধ হইয়া যাইবে। আমার যে-কোনো কাজ তাহাদের মনের মত না হইলেই এবং আমাকে তাহারা শত্রু মনে করিলেই আমার বিরুদ্ধে তাহারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নামক একটি অতিশয় মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। এই অস্ত্রটি আমি দেখি নাই, ইহার চরিত্র সম্বন্ধেও আমি অবহিত নহি। তবে তর্ক করিতে গিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা না কি বর্ত্তমান জার্ম্মানির "ম্যাগনেটিক মাইন" অপেক্ষাও বিপজ্জনক।

আমি একটি বিষয় শুধু বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম ইহারা সকলেই অহিংস, অথচ ইহারা কেন যে অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহার সদুত্তর ইহারা কেহই দিতে পারে নাই। যাহা হউক আমি ইহাদের কথায় বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি এবং সেইজন্যই যে কথাটা আপনাকে প্রথমেই জানান উচিত ছিল, সেই কথাটা চিঠিতে জানাইতে

পারিলাম না। অন্যান্য যে সব বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি, শুধু সেইটুকুই আজ জানাইতেছি।

আমি ইহাদের কাছে জানিতে পারিলাম ভারতবর্ষে না কি এখনও উন্নত হয় নাই—এবং এই কংগ্রেসই না কি ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে মনে হয় ইহারা অত্যন্ত বিনয়ী। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখানে নানারকম ব্যাধি আছে। তাহার মধ্যে দেখিতেছি যক্ষ্মা ব্যাধিই বর্ত্তমানে অতি ভয়ঙ্কররূপে দেখা দিয়াছে। আপনারা এখানে আসিলে কিছুদিনের মধ্যেই যক্ষ্মার কবলে পড়িতে পারেন এরূপ আশঙ্কা আছে, কিন্তু তাহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। এখানে যদিও কৃষিজীবীই বেশি—তবুও এখানকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষকদের মধ্যেও তাহাদের শিক্ষা প্রচারের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আপনি ভারতবর্ষে আসিলে আপনাকে হয়ত কোন স্কুলের শিক্ষক করিয়া দিবে। আপনার দিনগুলি আরামে কাটিবে।

এখানে মেয়েদের মধ্যেও ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে—এবং তাহাদের অনেকে বর্ত্তমানে রঙ্গমঞ্চে নাচ দেখাইতেও ইতস্তত করিতেছে না। এইমাত্র পথে একখানা হ্যাণ্ডবিল সংগ্রহ করিয়াছি, দেখিতেছি, তাহাতে অনেক ভদ্রঘরের মেয়ের নাম আছে—তাহারা সন্ধ্যায় রঙ্গমঞ্চে নাচ দেখাইবে। টিকিটের মূল্য পঞ্চাশ টাকা হইতে চারি আনা। আমার এই নাচটি দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে কয়েকটি "ড্রাম" ছাড়া এদেশের কোন মুদ্রা নাই। ড্রামগুলি ভারতবর্ষে আসিবার সময় ভারতীয় মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে ঠিক হইত—কিন্তু সে কথা যাক। আমার বিশ্বাস শ্রীমতী জুনো দেবী এখানে আসিলে হয় ত তাঁহাকে ভারতীয় নৃত্য পরিচালনাই করিতে হইবে। সে বেশ আনন্দের হইবে।

মেয়েদের স্বাস্থ্য যাহা দেখিলাম তাহাতে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছি। শহরের মেয়েরা পল্লবিনী লতার মত। কিন্তু মফঃস্বলে, যেখানে সকলেই খোলা আলো বাতাসে বাস করে, সেখানে অবশ্য মেয়েরা শহরের আদর্শ স্বাস্থ্য লাভ করে নাই। পুরুষদের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অতি অল্পসংখ্যক পুরুষই দেখিলাম, যাহারা মেরুদণ্ড সোজা করিয়া হাঁটিতে পারে। সুতরাং ইহারা আধুনিক যুগের সঙ্গে বেশ তাল রাখিয়া চলিতেছে। যাহারা চাষ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেকের স্বাস্থ্য যদিও শহরবাসীর মতই, তবুও মনের দিক দিয়া তাহাদের জীবনে একটি গভীর দুঃখের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা মনে করিতেছে, মানবজীবনের যাহা কিছু সুখ-শান্তি সব সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়েই ভোগ করিতেছে। কৃষিজীবীদের কাছে এই সম্প্রদায় মহামানবের পদমর্য্যাদা লাভ করিতে চলিয়াছে।

আমি অতি দ্রুত সমস্ত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রূপটি দেখিয়া লইয়াছি, সুতরাং দুই একটি বিষয় আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়া থাকিবে। সে জন্য দুঃখ নাই, কিন্তু যেগুলি আমার চোখে অতি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িয়াছে, সেগুলিই লিখিতেছি। মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহা আমার কাছে খুব ভাল মনে হইল। দেখিলাম, কতকগুলি মেয়ে সাঁতার শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং অল্প কয়েকজন এ বিষয়ে এত উন্নতি করিয়াছে যে, তাহারা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়া রীতিমত পারিতোষিক ইত্যাদি লাভ করিতেছে। ইহাদের এই সন্তরণ প্রতিযোগিতা হাজার হাজার লোক দেখিতেছে, তাহাতে মনে হয়, মেয়েদের স্বাস্থ্যলাভে দেশের লোকের মধ্যে বেশ একটা উৎসাহ জাগিয়াছে। সাঁতার ছাড়া মেয়েরা শুধু ভাসিয়া থাকাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেছে। লোকে টিকিট করিয়াও তাহা দেখিতেছে। আমার মনে হয়, মেয়েদের মধ্যে এই যে জাগরণ আসিয়াছে, ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। নৃত্যের জাগরণ, চিত্তের জাগরণ এবং সাঁতারের জাগরণ, ইহাতে তাহাদের যে স্বাস্থ্য লাভ হইবে, তাহাতে অনায়াসে তাহারা পরিবার-জীবন এবং বিবাহিত জীবনের বন্ধন কাটাইয়া সকল বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বাধীন হাওয়ার মত বিচরণ করিতে পারিবে।

ছেলেরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার অনেকখানি তাহারা ইতিমধ্যেই আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে। এমন কি, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন এবং নানাবিধ বহুপ্রকার

তন্ত্রও প্রায় নিজের করিয়া লইয়াছে। বেশির ভাগ ছেলে চমৎকার ইংরেজি বলিতে পারে, তাহা ছাড়া অনেকে অতিরিক্ত ভাষাও জানে, জার্মান, ফরাসী, রুশীয় প্রভৃতি ভাষায় তাহাদের বেশ দখল জন্মিয়াছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকগুলি দল আছে—তাহাদের একদল গণতন্ত্রবাদ ভালবাসে, একদল সমাজতন্ত্রবাদ ভালবাসে, একদল সাধারণ-তন্ত্রে বিশ্বাসী। দেশের উন্নতির জন্য পঞ্চতন্ত্রের মত ইহারা এই ত্রিতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই তিন দল তাহাদের নীতি লইয়া পরস্পর বিবাদ করে, এবং আমার বিশ্বাস, এই বিবাদই তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সূচিত করিতেছে। হেগেলের ডায়েলেকটিকবাদে ইহারা প্রায় সকলেই শ্রদ্ধাবান, তাই ইহারা মনে করে পরস্পর দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিলে এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই ইহারা ভবিষ্যতে একটি পরম পরিতৃপ্তিকর নির্দ্বন্দ্ব নির্গুণ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবে।

সুতরাং এ দেশের অবস্থা বিশেষ ভাল বলিয়াই মনে হইতেছে। ইতিমধ্যে কৃষিজীবীদের মধ্যেও আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা হইতেছে। তাহারা অজ্ঞতার অন্ধকারে প্রায় ডুবিয়া ছিল, যেমন দেশের অন্যান্য লোকে এতকাল ছিল। দেশের শিক্ষিত লোকেরা যেমন অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে ইউরোপীয় সভ্যতার স্প্রিং-এর সাহায্যে বিরাট এক লাফে উন্নতির শীর্ষপ্রদেশে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহারাও তেমনি একদিন লাফ দিবে। ইহারা চিরদিনই অমানুষ হইয়া থাকিবে না।

কিন্তু ইহারা কৃষিক্ষেত্রের জঞ্জালময় আবেষ্টন হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া করিবে কি? ইহা অনেকের মনে একটা সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু সমস্যা সে আর এখন নাই। শিক্ষিত সমাজ সে সমস্যার সমাধান পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ বর্ত্তমানে কি করিয়া জীবনের বহুতর সমস্যা সমাধান করিয়াছে তাহাই দেখা যাউক। একদল শিক্ষিত ছেলে আছে, তাহারা কর্ম্মের ভিতর দিয়া জীবনের একটি মহা সত্য আবিষ্কার করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা কবিতা লেখে। বাংলাদেশে কবির সংখ্যা একটু আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। তাহাদের সংখ্যা অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ হইবে। শুধু ইহাদের জন্যই সেখানে চার পাঁচটি কাগজের কল বেশ ভালভাবে চলিতেছে। ইহাদের কাব্যের বিষয় কিছুদিন পূর্ব্বে কিছু ব্যাপক এবং অস্পষ্ট ছিল। মহাশূন্য সম্বন্ধে, নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য্য সম্বন্ধে তাহাদের ছন্দ অবিরাম গতিতে চলিত। তারপর তাহারা আরও একটু নামিয়া আসিয়া ফুল-লতাপাতা, প্রজাপতি ধরিল। বর্ত্তমানে তাহাদের লক্ষ্য আরও স্থির হইয়া আসিয়াছে। এখন তাহারা যে কাব্য রচনা করিতেছে তাহার একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য। এইবার তাহারা কাব্যক্ষেত্রে যথার্থ উন্নতি করিয়াছে। ইহাদের লক্ষ্য কি তাহা চিঠিতে কিছুই লিখিলাম না; পরবর্ত্তী চিঠি লিখিবার সুযোগ ঘটিলে জানাইব।

একদল ছেলে খেলার ভিতর দিয়া সমস্যা সমাধান করিয়াছে। একদল বেকার থাকিয়া সকল সমস্যা সমাধান করিয়াছে। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও তাহাদের উন্নতি অত্যন্ত স্পষ্ট। কংগ্রেস নামক যে প্রতিষ্ঠানটির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—তাহার মূলদেশে বর্ত্তমানে যিনি বসিয়া আছেন, তাঁহার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। তাঁহার নাম গান্ধী। তাঁহার নামের সঙ্গে একটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। লোকে তাঁহাকে মহাত্মা গান্ধী বলিয়া উল্লেখ করে। গান্ধীজী নিজেই এই মহাত্মা বিশেষণটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কেন তাহা বলি। আন্তরিক দেশ-সেবা এক জিনিষ আর রাজনীতি এক জিনিষ। আন্তরিক ভাবে দেশ সেবা করিলে সেবকের মনে যে নিরহঙ্কারের ভাব জাগা উচিত, তাহাতে দেশসেবক কখনও নিজের নামের সঙ্গে এরূপ বিশেষণ ব্যবহার করিতে দিতে পারেন না। নিজেকে অন্য লোক হইতে এরূপভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে এবং অন্য লোককে দেখিতে দিলে মন কখনও নিরহঙ্কার থাকিতে পারে না—এবং সেই জন্যই গান্ধীজী মহাত্মা বিশেষণটি চালু হইতে দিয়াছেন। কারণ তাঁহাকে রাজনীতি করিতে হইবে—এবং রাজনীতি করিতে গেলে নিজেকে যথাসম্ভব বাড়াইয়া না দেখিলে অন্যের মনে দূরে থাকুক, নিজের মনেই নিজের সম্বন্ধে কোন সম্ভ্রমের ভাব জাগে না। দেশের কোটি কোটি লোক যদি একটি লোককে মহাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, তাহা হইলে সেই মহাত্মার পক্ষে রাজনীতি করা অত্যন্ত সহজ হইয়া আসে। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা তখন সংবাদপত্রে ছাপা হয় এবং বিশ্বমুগ্ধ লোকের দৃষ্টি পড়ে তাঁহারই দিকে। ইহাতে মান-মর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা এবং গৌরব বৃদ্ধি পায়। কোটি কোটি

লোক যদি কাহারও পায়ের কাছে মাথা নত করে এবং পদধূলি পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি করে, তবে তাঁহার প্রত্যেকটি কাজই অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। লোক তখন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তিনি যদি দিনকে রাত বলিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে ভক্তগণও দিনকে রাত বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে। রাজনীতি করিতে হইলে ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। সেদিক দিয়া বিচার করিলে গান্ধীজীকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। ইঁহারই পরিচালনায় ভারতবর্ষ সকল দিকে উন্নত হইতেছে।

উন্নতির প্রমাণ আরও দিতেছি। ভারতবর্ষের ছেলেরা ডিসিপ্লিনে প্রায় ইউরোপের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। নেতা একদিন বলিলেন, তোমরা স্কুল-কলেজ ছাড়, চাকুরি ছাড়, সেইদিন দলে দলে সবাই মিলিয়া স্কুল-কলেজ এবং চাকুরি ছাড়িয়া দিল। আর একদিন বলা হইল, আইন অমান্য কর, সবাই মিলিয়া আইন অমান্য করিতে লাগিল। আর একদিন বলা হইল, তোমাদের ক্ষণভঙ্গুর মাথাগুলি আইন-রক্ষকের লাঠির নীচে পাতিয়া দাও—দলে দলে ছেলেরা তাহাই করিল। আর একদিন বলা হইল, তোমরা চরকা কাট, দলে দলে ছেলেরা চরকা কাটিল।

কিন্তু এক দিন সবাই জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কেন করিলাম? দেশনেতা বলিলেন, এইসব প্রক্রিয়ায় দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রায় হাতের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু তোমাদের কাহারও কাহারও মনে এখনও হিংসা আছে, সেই জন্য স্বাধীনতাটা ফসকাইয়া গেল। অতএব তোমরা হিংসা ত্যাগ কর। কিন্তু উহারা হিংসা যতই ত্যাগ করিতে লাগিল, ততই উহাদের মনে ঈর্ষা জাগিতে লাগিল—এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই ঈর্ষা নেতার মনেও জাগিয়া উঠিল। তার পর চলিল নিজেদের মধ্যে দলভাঙার কাজ। কংগ্রেসের দল দুইভাগে ভাগ হইয়া কে বড় কে ছোট ইহা লইয়া ঝগড়া আরম্ভ হইল।

এই ঝগড়া এবং দ্বন্দ্ব মানুষের চরিত্রের একটি বিশেষ বৃত্তি। হিংসাও তাই। উহা কোন না কোন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। কংগ্রেসনেতা যে ইহা জানেন না ইহা নহে, বরঞ্চ ভাল করিয়াই যে জানেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ এই ঈর্ষাই জীবনের স্পন্দন—ইহা যতদিন থাকিবে ততদিনই নূতন নূতন কর্ম্মপ্রেরণা পাওয়া যাইবে—এবং ইহা না থাকিলে রাজনীতির সমস্ত আন্দোলনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

হে প্রভু জুপিটার, এই সব দেখিয়া ভারতবর্ষ আপনাদের বাসের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে। এখানে নেতাদের মধ্যে যে খেলা চলিতেছে, তাহাও নিরাপদে দেখিতে পারিবেন—ঠিক আমাদের অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসিয়া বুলফাইট দেখবার মতই নিরাপদে।

ভারতবর্ষের ছেলেরা খেলায় যে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা দেখিবার মত জিনিস। এই খেলার কিছু পরিচয় দিয়াই বুলফাইটের একটি দৃশ্য বর্ণনা করিব।

প্রত্যেক শহরের এবং গ্রামের মাঠে সম্বৎসর ধরিয়া নানারূপ খেলা চলে। শহরের এক একটা মাঠে লক্ষের বেশি লোক খেলা দেখিতে আসে। শহরে শহরে এইরূপ বহু লক্ষ লোক পয়সা খরচ করিয়া টিকিট কিনিয়া খেলা দেখে। ইহাতে দুইটি জিনিষ প্রমাণিত হয়। এক, ইহাদের মানসিক উৎকর্ষ; আর, অর্থের স্বচ্ছলতা। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি বড় জিনিষের প্রমাণ ইহাতে আছে, সেটা এই যে ইহারা প্রাণ-সম্পদে বড়। এই প্রাণ-সম্পদের রিহার্স্যাল অপেক্ষাকৃত বাল্য বয়সেই ইহাদের আরম্ভ হইয়া যায়। শহরের ছেলেরা শিশুবয়স হইতেই সিনেমার টিকিট-ঘরের জানালা ধরিয়া ঝুলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহাদের মনে প্রতিযোগিতা জাগে এবং একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যের জন্য এবং আদর্শের জন্য অনেক সময় প্রাণ দিবার প্রবৃত্তি জাগে। মারামারি করিয়া খেলার এবং সিনেমার টিকিট করিবার সুযোগ আধুনিক সভ্যতা যে এই দেশে প্রচুর পরিমাণে দান করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহারাই বড় হইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে এই জীবন্ত প্রতিযোগিতার মশাল হাতে লইয়া দেশের অন্ধকার দূর করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলে।

এইবার বুলফাইটের কথা বলি। পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা একটি রূপক মাত্র। এইভাবে ঘুরাইয়া না লিখিলে আমার এখানে থাকাই হয়ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে, কাজেই এই বক্র-পন্থা অবলম্বন করিলাম।

এরেনার চারিদিকে বিপুল জন-সম্মেলন। যাহারা বসিয়া

আছে, তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্তির বৈপরীত্যে একটি সিংহ সঙ্কুচিত হইয়া বিড়ালের মত হইয়া গিয়াছে। মাথায় একটি কেশর নাই—মনে হিংসা নাই (হিংসা যে নাই তাহা তাহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে বুঝা যাইবে।) তাহার পাশে একটি শৃগাল বসিয়া আছে—তাহার চতুর দৃষ্টি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহারও পশ্চাতে একটি খরগোস। অত্যন্ত নিরীহ, অথচ অত্যন্ত জাগ্রত। আর একদিকে বাম দিকে রয়্যাল বেঙ্গল জাতীয় একদল বাঘ। তাহাদের আকৃতিও অত্যন্ত শীর্ণ, থাবায় একটিও নখ নাই, মুখে একটিও দাঁত নাই। চুপচাপ বসিয়া হাই তুলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে জিভ চাটিতেছে। পূর্ব্বে একবার লড়াইয়ে ইহাদেরই ষাঁড় জিতিয়াছিল। এই দুই দলই দুইটি ষাঁড়ের স্বত্বাধিকারী। ষাঁড় দুইটি এরেনার মধ্যস্থলে শিং বাঁকা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঁশি বাজিবামাত্র লড়াই আরম্ভ হইয়া যাইবে। আমাদের বুলফাইট হইতে এই ষাঁড়ের লড়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ষাঁড়কে ক্ষিপ্ত করিবার জন্য লাল নিশান ইহারা ব্যবহার করে না, এবং লড়াইটা মানুষের সঙ্গে ষাঁড়ের নহে, ষাঁড়ের সঙ্গে ষাঁড়ের। লড়াইতে একটি ষাঁড়ের মৃত্যু হইলে তাহার বিপক্ষ দল তাহার মৃতদেহ ভক্ষণ করিবে। এজন্য একটি ষাঁড়কে মরিতেই হইবে—এবং না মরা পর্য্যন্ত লড়াই চলিবে।

এই লড়াই-এর সুবিধা এই যে ইহাদ্বারা মাংসভক্ষণও হইবে—অথচ নিজেদের মধ্যে হিংসা প্রকাশ করিতে হইবে না। সিংহ, শৃগাল, খরগোস এবং বাঘ অহিংসার আশ্রয় লইয়াই আমিষ ভক্ষণ করিবার সুযোগ পাইবে। (ইহার পরবর্ত্তী অংশ কংগ্রেস কর্ত্তৃক সেন্সর্ড হইয়াছে।)

* * *

ইহাদের এই অহিংস নীতি দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তাহার কারণ, ভারতবর্ষের প্রায় সকল লোকেই এই নীতির আশ্রয়ে আসিয়া মহা আনন্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবং অহিংসা-নীতি যতই প্রচারিত হইতেছে, প্রদেশে প্রদেশে দাঙ্গা ততই জমিয়া উঠিতেছে, সুতরাং আপনারা নিরাপদে এখানে আসিতে পারেন এবং আমার মনে হয় পত্রপাঠ রওনা হওয়া উচিত। তাহার আরও কারণ ভারতবর্ষে জমির দাম নাই। খুব সামান্য খরচে এখানে জমিদারি কেনা যাইবে। দেখিলাম এখানকার জমিতে চাষ প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। শহরে যেসব খেলার মাঠ হইয়াছে, তাহাই কালক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একটি বিরাট খেলার মাঠে পরিণত হইবার আশা আছে। আমাদের অলিম্পিয়াড-এর বিস্তার চারি বৎসর কমাইয়া এখানে প্রতিবৎসর খেলা জমাইতে পারা যাইবে। আমরা যদি পূর্ব্বেই জমি কিনিয়া না ফেলি, তাহা হইলে সমস্ত জমি হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। খেলার মাঠ বিস্তীর্ণ হইবে এরূপ কথা বলিয়াছি—তাহা ছাড়া যে উদ্বৃত্ত জমি থাকিবে তাহাতে সিনেমা ষ্টুডিও হইবে। সিনেমা ষ্টুডিও ভারতবর্ষের একটি প্রকৃত উন্নতি সূচিত করিতেছে। আমি অনেকগুলি সিনেমা-ছবি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে যে সব নায়ক-নায়িকা আছে, তাহারা দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। নায়ক কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া কি ভাবে করিলে নায়িকার হৃদয় হরণ করিতে পারে অথবা নায়িকা কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া করিলে নায়ককে লাভ করিতে পারে, ইহা দেখান হয়। ইহা দেখিয়া ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা দ্রুত ইউরোপের সদ্‌গুণগুলি আয়ত্ত করিবার সুবিধালাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্তই লিখিলাম।

আমি যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই অকপটে আপনাকে নিবেদন করিলাম। শুধু একটি কথা গোপন করিতে হইল। কেন গোপন করিতে হইল, তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। ইতি—সেবক শ্রীমার্কারি।

যথাসময়ে এই পত্র জুপিটারের নিকট পৌঁছিল। তিনি নিজে পাঠ করিয়া তাঁহার পত্নী শ্রীমতী জুনোকে চিঠিখানা দেখাইলেন। তারপর তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে চিঠিখানা পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিলেন—কিন্তু কেহই স্থির করিতে পারিলেন না, ভারতবর্ষে যাওয়া উচিত কি না। সুতরাং জুপিটার মার্কারিকে জরুরি টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন—অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ কর এবং আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

মার্কারি টেলিগ্রাম পাইবামাত্র জুপিটারের নিকট ফিরিয়া গেল এবং ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল—প্রভো যে কথাটি চিঠিতে লিখিতে পারি নাই, সেটা এই যে ভারতবাসীদের

যাহা কিছু করিতে দেখিলাম, তাহা আত্মধ্বংসেরই নামান্তর। ইউরোপে যাহা কিছু ঘটিয়াছে এবং ইউরোপবাসী যে যে ভুল করিয়াছে, ইহারা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। সুতরাং উহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহাই ভুল করিতেছে—এবং ভুল যে করিতেছে সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনো চেতনা নাই। কেহ যদি বলে, তোমরা যে পথে চলিতেছ সে পথ হইতে ফিরিয়া আইস—উহা তোমাদের জাতিকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইতেছে—তাহা হইলে তাহারা অহিংস অস্ত্রে সাবধানকারীকে মারিতে আসিবে। ভারতবাসীদের প্রায় সকলেই অনাহারে এবং অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে—তাহাদের জন্য কাহারও কোনো ভাবনা দেখিলাম না।

জুপিটার তাহা শুনিয়া বলিলেন—তাহাই যদি হয়, তবে আমাদিগকে সে দেশে যাইতে বল কেন?

মার্কারি বলিল—ভারতবর্ষ কালক্রমে ধ্বংস হইয়া গেলে সেটা আপনারই রাজত্ব হইবে।

শ্রীমতী জুনো বলিলেন, তবে সে দেশে যাওয়াই ঠিক কর।

জুপিটার বলিলেন, দাঁড়াও, আরও একটু ভাবিয়া দেখি। বলিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

হে আদর্শ, হে ঈশ্বর!

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গত হোলো বহুযুগ যে জাতির পদপ্রান্তে করি' নত শির,
সে জাতির নাহি স্থান, নাহি মান, গৌরবের স্মৃতি-চিহ্ন যত
স্বার্থোদ্ধত সভ্যতার দানবীয় হিংসানলে পোড়ে অবিরত।
আপনার দেবালয়ে নাহি কোন অধিকার যে নিঃস্ব জাতির—
ভদ্রাসন-আঙিনায় তুলসীমণ্ডপতলে সংকীর্ত্তন হ'তে
সম্মান বঞ্চিত হোলো, এস প্রভু, বিত্তহীন তার চিত্তপথে।

যে প্রাচীন আর্য্যজাতি সিন্ধু-কূলে এক দিন শান্তসৌম্য মুখে
আত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচারিল বিশ্বভূমে বেদমন্ত্র সনে,
সর্ব্বজীবে দিল প্রেম জড়বাদ ধ্বংস করি'—পুণ্য তপোবনে
প্রজ্ঞাবাদ গেল রচি,' বল্কলবসন পরি' ছিল নিত্য সুখে,
যে প্রাচীন আর্য্যজাতি সপ্তর্ষিমণ্ডল হ'তে গ্রহে গ্রহে গিয়া
বিজয়-পতাকা তুলি' দেখাইল শক্তি তার বিশ্ব বিমোহিয়া,
সে-জাতির বংশধর আপনার কর্ম্মদোষে নিজ বাসভূমে
পরের করুণা মাগে, ভীরু প্রাণীসম রহে মৃত্যু আশঙ্কায়।
সে জাতির কুললক্ষ্মী হরণ করিছে দস্যু—কেহ নাহি চায়
সেই কুললক্ষ্মীপানে। কুম্ভকর্ণসম সবে সংজ্ঞাশূন্য ঘুমে।
ক্রন্দিত গাণ্ডীব ধনু সংসারের কুরুক্ষেত্রে—ভাগবতগীতা

অশ্রুগীতা হ'ল আজি। লক্ষ লক্ষ চিতা জ্বলে জাতির শ্মশানে,
অমৃতের পুত্র যারা নির্য্যাতনে মৃতপ্রায়, ঋষির সন্তানে
ব্রহ্মতেজ ক্ষাত্রতেজ হে আদর্শ! দাও তুমি,—ডুবিছে সবিতা
চেয়ে দেখ একবার এ-জাতির ভাগ্যাকাশে শেষরশ্মি রাখি'!
জীবন-আশ্রয় খোঁজে দিক্‌ভ্রান্ত নীড়হারা সর্ব্বহারা পাখী।

এ শতাব্দী অন্ত যায় অন্ধকারে যে ভারতে অশ্রুমাল্য বরি',
যে ভারত বিজাতীয় ভাবস্রোতে নিমজ্জিত আজিকার দিনে,
হে পার্থ-সারথী! তব স্বর্গ হতে আকস্মিক আবির্ভাব বিনে
এ যুগ-সঙ্কটে আর নাহি ত্রাণ, আর্ত্ত মোরা, আর্ত্তনাদ করি।
নিঃসার সভ্যতা-মোহে এ আত্ম-বিস্মৃত জাতি শক্তি আপনার
হারাইয়া ভিক্ষুকের সম রহে, পথে পথে করে হাহাকার।

হে আদর্শ! হে ঈশ্বর! দর্পহারী এস তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে তব,
মিথ্যার বিপুল মোহ ধ্বংস কর এ সঙ্কটে মহাসিন্ধুকূলে,
সহস্র যুগের শক্তি আনো প্রভু সুদর্শন-চক্র আজি তুলে;
দুর্ব্বলের রক্তলোভে যাদের শোণিত ক্ষিপ্ত,—রণে অভিনব
অস্ত্র রচি' সমুদ্ধত দম্ভের অলীক গর্ব্বে রুদ্র প্রহরণে,
তাহাদের ধ্বংস কর, বৈদিক যুগের শক্তি আনো এই ক্ষণে।

আনো সেই অরণ্যের পত্রচ্ছায়ে তপঃসিদ্ধ পবিত্র জীবন,
বেদমন্ত্র সমুত্থিত আশ্রমের বক্ষে জ্বালো যজ্ঞবহ্নিশিখা,
যেথা নাহি হিংসাদ্বেষ,—মিলনের পুণ্যবায়ে চিত্ত-উদ্দীপন
হয় যেথা আনন্দের পুষ্পরাগে, সেথা মোরে নিয়ে চল তুমি
সনাতন ধর্ম্মবলে বলদৃপ্ত মৃত্যুহীন কর আর্য্যভূমি।

বর্ষ-প্রবন্ধপঞ্জী

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ আশ্বিন, ১৩৪৬ ও কার্ত্তিক ১৩৪৬ সংখ্যার "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত ১৩৪৫ সালে যে-সকল প্রবন্ধ 'পরিচয়' 'প্রবাসী', 'বঙ্গশ্রী', 'বসুমতী', 'বিচিত্রা' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এখানে তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাসমূহের সাঙ্কেতিক এইরূপ :—প—পরিচয় ; প্র—প্রবাসী ; বং—বঙ্গশ্রী ; ব—বসুমতী ; বি—বিচিত্রা ও ভা—ভারতবর্ষ। সংখ্যাগুলি বর্ষ, খণ্ড এবং প্রকাশ সংখ্যাবাচক,—যথা, বং ৬-২-১ =বঙ্গশ্রী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।]

ভ্রম-সংশোধন—গত কার্ত্তিক সংখ্যার ৫৪৫ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৩৩ম পংক্তির শেষে ৩৯ (অর্থনীতি) বলিয়া যে সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঐ স্থানে না হইয়া ৫৩৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৩৫ম পংক্তির পরে (আর্থিক পত্রকল্পনা—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই পংক্তির পূর্ব্বে) যাইবে।

৩৯ (জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব)

আসামের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ-সমস্যা—শ্রীসান্ত্বনাকুমার দাস
প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ [৪৪-৪৭]

একটি সামাজিক সমস্যা—প্রত্যক্ষদর্শী
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ [২১৩-১৬]

চিত্রশিল্পে হিন্দু-মুসলিম সঙ্গম—শ্রীযামিনীকান্ত সেন
বি ১২।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ , পৃঃ ৭ (৩৪১-৪৭) ; ছবি-৬

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী মুরুং—শ্রীনীহাররঞ্জন রুদ্র
প্র ৩৮।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪০০-০৪) ছবি-৫

পুরুষ ও নারী—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বং ৬।১।৬ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৭৪৭-৫১)

বীরভূমের সাঁওতাল—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৪৮৫-৯৩) ছবি-১২

ব্রহ্মদেশীয় পওনা ব্রাহ্মণ—শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
প্র ৩৮।২।১ , কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (১০৩-১৩) ছবি-৬

সেকালের বঙ্গমহিলা—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ [৩৪৭-৫৪]

সেকালের বিবাহ—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্র ২৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃঃ ৯ (২৫-৩৩)

ভাষাবিজ্ঞান

৪০ (ভাষা-সাধারণ)

ভারতের জাতীয় ভাষা—শ্রীকমলাকান্ত বসু
ব-১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৬৫-৭১)

ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাঙ্গালার দাবী—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চৌধুরী
বং-৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (২৭৩-৭৮)

ভারতের সাধারণ-ভাষা বিষয়ে প্রস্তাব—শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
বি-১১।২।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮০০-০২)

রাষ্ট্রভাষা—শ্রীকমলাকান্ত বসু
বি-১২।২।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১৩ (২৩৩-৪৫)

রাষ্ট্রভাষা—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
প্র-৩৮।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৩৫৬-৫৯)

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে প্রস্তাব—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ভা-২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৮০১-০৩)

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে প্রস্তাব—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বি-১১।২।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪৫০-৫২)

৪১ (পদনির্ণয়)

বাঙ্গালা সাহিত্যে অবাঙ্গালা শব্দ—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
বং-৭।১।৩ , চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৩৭৬-৮৪)

বাংলা বানানের নিয়ম—শ্রীভোলানাথ ঘোষ
প-৮।১।২ , ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (১৭৫-৭)

৪২ (শব্দতত্ত্ব)

ভারতীয় বর্ণমালা—শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
বি ১১।২।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৫৮-৬০)

৪৩ (ব্যাকরণ)

আলোচনা—ব্যাকরণ বিভ্রাট—শ্রীনলিনীভূষণ ভট্টাচার্য্য
বং ৬।২।১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ পৃঃ ২ (৮০১-০২)
বং ৬।২।১ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (১৩-১৫)

বিজ্ঞান

৫০ (বিজ্ঞান)

কার্য্যকারণতত্ত্ব—শ্রীসুরেশ দেব,
ভা-২৩।১।৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৮৫৩-৬২)

৫০ (বিজ্ঞান সাধারণ)

চতুষ্পাঠী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (৩৭)

বিজ্ঞান-জগৎ
ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৮৯-৯২) ছবি ১৩ ;
ব ১৭।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৮৩-৮৭) ছবি ১৬ ;
ব ১৭।১।৩ , আষাঢ় ১৩৪৫ , পৃঃ ৬ (৪৬০-৬৫) ছবি ১৭ ;
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬৭৬-৭৯) ছবি ১৩ ;
ব ১৭।১।৫ , ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮১০-১৩) ছবি ১৩ ;
ব ১৭।১।৬ , আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১০৭-১০) ছবি ১৫ ;
ব ১৭।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ , পৃঃ ৩ (১১৮-২০) ছবি ৮ ;
ব ১৭।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৩ (২৬৭-৬৯) ছবি ৯
ব ১৭।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫০২-০৫) ছবি ১১ ,
ব ১৭।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬৪৫-৫০) ছবি ১৫ ;
ব ১৭।২।৫ , ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮১৯-২২) ; ছবি ১৩ ;
ব ১৭।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (১০৬ ৬১) ; ছবি ১৯ ;

বিজ্ঞান ও জনসাধারণ—এস্. দাস,
বি ১১।২।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ , পৃঃ ৩ (৭০৫ ০৭)

বিজ্ঞানের আধুনিক ভাবধারা—শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্র ৩৮।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৫৫৯ ৬৬)

৫২ (জ্যোতিষ)

আর কোথাও কি মানুষ আছে ?—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
ব ১৭।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৭০-৭৪)

দৃকসিদ্ধি সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য—শ্রীষষ্ঠীচরণ সমাজদার
ভা ২৬.১.১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (১২৩-২৪)

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
প্র ৩৮।২।১ , কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪-৮)

বঙ্কিমের করকোষ্ঠী—শ্রীমতিলাল দাশ
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (২১৭-১৯)

বিশ্ব রহস্য—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল
বি ১২।২।৩ , চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৮০-৮৪).

৫২ ও ৫৩ (জ্যোতিষ ও পদার্থ-বিজ্ঞান)

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ
ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৬৪-৬৭) ছবি-৫ ;
ব ১৭।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ , পৃঃ ৫ (৪৩৬-৪০) ; ছবি ৫ ;
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬৮৩-৮৬) ; ছবি ৫ ;
ব ১৭।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ পৃঃ ৮ (৮১৯-২৬) ; ছবি ১৫ ,
ব ১৭।১।৬ , আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (১০১৭-২৫) ; ছবি ১১ ;
ব ১৭।২ ২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৩২২-২৫) ; ছবি ৮ ;
ব ১৭ ২ ৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৬৬৫-৭০) ছবি ৪ ;

গ্রহের গতি-বৈষম্য—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী
ভা ২ ।২ ৫ , বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃঃ ১০ (৭১৯-২৮)

৫৩ (পদার্থ বিজ্ঞান)

আধুনিক ফটোগ্রাফি—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল
প্র ৩৮।১।১ , বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০-(৩৪-৪৩) ; ছবি ২১

কিরণচ্ছত্র—শ্রীনীলরতন কর
বং ৬।২।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ , পৃঃ (৩৭১ ৭৬)

চোখের ভুল
ব ১৭।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (১০২২-২৫) ; ছবি ৭

জলের কথা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক
ভা ২৬।২ ২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৯৭-৩০১)

পরমাণু চূর্ণীকরণ—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল
ভা ২৬ ১.৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৬১০-১৩) ; ছবি ৩

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে শক্তির স্বরূপ—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (২৬১-৬৮) ; ছবি ৯

বিজ্ঞান ও অব্যক্ত জগৎ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৩৩৯-৪৩)

বিজ্ঞানের কথা
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৫৯৬-৯৯) ছবি ৪

বিদ্যুতের কথা—শ্রীনীলরতন কর
বি ১২।২।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ , পৃঃ ৩ (৩৫৯-৬১)

বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের বিকাশধারা—শ্রীনীলরতন কর
বি ১২।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৮১০-১৭)

৫৪ [রসায়ন]

অঙ্গার গ্যাস—শ্রীসুবর্ণকমল রায়
ভা-২৬ ২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭১-৭৪)

ভারতে রাসায়নিক গবেষণা—শ্রীপুলিনবিহারী সরকার
প্র ৩৮।১।৪ , শ্রাবণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৭-(৫১৩-১৯)

রসায়নের নূতন পাতা,—শ্রীসুবর্ণকমল রায়
ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫৭৪-৭৬)

৫৫ (ভূতত্ত্ব)

আমেরিকায় প্রাচীনতম হিন্দু সংস্কৃতি, শ্রীকমলকুমার চক্রবর্ত্তী
ভা ২৬।১।৪ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৫২১-২৩)
এসবেষ্টস্ বা মৃৎকার্পাস, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৮৮২-৮৭) ছবি ৮
কোল্টারের গুণাগুণ, শ্রীসলিলচন্দ্র দাশগুপ্ত
ভা ২৫।২।৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৯২০-২৩)
পৃথিবীর ক্রমপরিণতি—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল
প্র ৩৮।২।১ , কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৯২-৯৯) ছবি ৯
বাংলা দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ভূমিকা—শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী
বি ১২।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১৭৫-৭৮)
ভারতে কয়লা-সমস্যা—শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়
বং ৬।২।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৩৫৬-৫৯)
সিংভূমের রত্নসম্ভার, শ্রীকাননগোপাল বাগচী
বং ৬।২।৩ , আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৪০৪-০৭) ছবি ৯
স্বর্ণ সন্ধানে—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (১১৩-১৮) ছবি ৭

৫৭ (জীবতত্ত্ব)

জীবাণু—ডাক্তার
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (১৬৬ ৬৮)

৫৮ ও ৫৯ [উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিজ্ঞান]

পঞ্চশস্য
প্র ৩৮।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮৩-৮৬) ছবি ৬
প্র ৩৮।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২০২-৩৫) ছবি ৪
প্র ৩৮।১।৩ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৩৭৩-৭৬) ছবি ৭
প্র ৩৮।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৩ (৫৫৬-৫৮) ছবি ৪
প্র ৩৮।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬৭২-৯৬) ছবি ৬
প্র ৩৮।১।৬ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮৩৯-৪৩) ছবি ৭
প্র ৩৮।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭২-৭৫) ছবি ৬
প্র ৩৮।২।২ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৯২-৯৬) ছবি ৬
প্র ৩৮।২।৩ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৪১০-১৫) ছবি ১৩
প্র ৩৮।২।৪ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫৩৯-৪৫) ছবি ১০
প্র ৩৮।২।৫ , ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৭১১-১৭) ছবি অনেক
প্র ৩৮।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮৭৮ ৮২) ছবি ৭

৫৯ [প্রাণিবিজ্ঞান]

আমের পোকা—এস-দাস
বি ১১।২।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৫১০-১১) ছবি ১
ইতর প্রাণীর ভাষা
ব ১৭।১।৬ , আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১০২৫-২৯) ছবি ৮
ইতর প্রাণীর শিল্পজ্ঞান
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ , পৃঃ ৫ (৫৯৯ ৯৬) ছবি ৯
পারাবত—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
ভা ২৫।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১৫৯-৬৩) ছবি ১৩
পিপীলিকা
ব ১৭।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৬৪-৬৮) ছবি ৭
পিপীলিকার বিচিত্র কাহিনী—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বং ৬।২।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৪৪১-৪৮) ছবি ৫
পেচক—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৪৬৫-৬৮) ছবি ৬
প্রজাপতি—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
ভা ২৬।১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৯৪০-৪৫) ছবি ৮
প্রাণি-জীবনরহস্য—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত
ব ১৭।১।৬ , আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৯৮৮-৯২)
বোলতা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
ভা ২৬।১।৫ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৭০৯-৭৫) ছবি ১১
ভারতের কাষ্ঠসম্পদ্—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত
ব ১৭।১।৫ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ ৭২২-২৫)
মানবের মিত্র কীট—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত
ব ১৭।২।৬ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (৯৭৮-৮৩) , ছবি ৬
সমুদ্রের বাঘ বা নরভুক্ মৎস্য—শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু
ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৬৫২-৫৩) ছবি ৪

ব্যবহারিক শিল্প

৬১ [চিকিৎসা শাস্ত্র]

অস্ত্রচিকিৎসা ও শারীর রসায়ন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
বং ৬।২।৪ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৫০২-০৫)
আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ
বং ৬।২।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (২৪৪-৫৩)
একহাতি পাড়ি—শান্তি পাল
বি ১২।১।২ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (২১৩) ছবি ২
খাদ্য ও স্বাস্থ্য—শ্রীনীলরতন কর
বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৯ (৩৫১-৫৯) ; রেখাচিত্র সম্বলিত

খাদ্য বিচার—শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

বং ৬।২।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ , পৃঃ ২ (৭৮৫-৮৬)

খাদ্যের পরিমাণ—ডাক্তার

বং ৬।১।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ , পৃঃ ৪ (৬৫৫-৫৮)

'১৪ [স্বাস্থ্য বিজ্ঞান]

চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

ভা ২৫।২।৫ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৬৭৩-৭৭)

বেরিবেরি ও তাহার প্রাকৃতিক চিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৩৭৩-৭৫)

'১৩ [ব্যায়াম]

বুকঝাঁপ—শান্তি পাল

বি ১২।১।৩ ; আশ্বিন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১ (৩৭২)

মাংসপেশী সঞ্চালন—শ্রীনীলমণি দাশ

ভা ২৬।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ১১ (২২৩-৩৩) ; ছবি-২৬

ম্যানচেষ্টার—পৌর প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য—শ্রীবিনয়কুমার সেন

ভা ২৬।২।৪ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৫৪৫-৫১) ; ছবি ৬

শরীর যন্ত্রের সঙ্গতি—"ডাক্তার"

বি ১২।১।৬ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮০৩-০৭)

শীতল জলে স্নান—শ্রীশান্তি পাল

বি ১১।২।৪ , বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৫০০-০১)

সন্তরণে জীবনরক্ষা প্রণালী—শ্রীশান্তি পাল

বি ১১.২।৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৮ (৬৮৮-৯৫) ; ছবি ২৫

সাঁতারের কথা—শ্রীশান্তি পাল

প্র ৩৮।২।৫ , ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৬৫৭-৬০) ; ছবি ৫

৬৩ [কৃষিবিজ্ঞান]

কৃষি ও দেশের উন্নতি—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (১১-১৬)

ধান্য—শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

বং ৭।১।২ , ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ১০ (১৭৩-৮২) ; মানচিত্র ও রেখাচিত্র সম্বলিত।

নারিকেলের কথা—শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভা ২৬।১।৫ , কার্ত্তিক ১৩৪৫ ; পৃঃ (৭৭৬-৭৯)

পাট-শিল্পের পুনরুজ্জীবন—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বং ৭।১।২ ; ফাল্গুন ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (১৫৮-৬১)

ফলতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ষ্ট্রবেরির চাষ—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

প্র ৩৮।১।১ , বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮৭-৯০) ছবি ৩ ;

ফসল পরিকল্পনা ও গোলমরিচ চাষ—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

ব ১৭।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (২৩০-৩৪)

বাঙ্গালার তন্তু উৎপাদক উদ্ভিদ্—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

ব ১৭।১।৪ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৬০৯-১১)

বাঙ্গালার মৎস্য—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

বং ৭।১।১ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৭৪-৭৭)

বাঙ্গালার জলসেচনের ব্যবস্থা—শ্রীকালাচাঁদ রায়

বং ৬।২।৪ ; বৈশাখ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৫৮১-৮৫) মানচিত্র ১

বাঙ্গালার তুলার চাষ—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ব ১৭।১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৩১৪-১৮)

বাংলায় উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ—শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

প্র ৩৮।১।৪ , শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৫৪৪-৪৫)

ভারতীয় মৎস্য—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

বং ৭।১।৩ ; চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ (৩৩৬-৪২) ছবি ১৪

ভারতের কার্পাস শিল্প—শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভা ২৫।২.৬ , জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৮৪৫ ৪৮)

ভা ২৬।১।১ ; আষাঢ় ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (৪১-৫০)

ভারতের কৃষিসম্পদ্ তুলার বীজ—শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভা ২৬।১।২ ; শ্রাবণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৬ (২৩২-৩৫)

ভারতের কৃষিসম্পদ—এরণ্ড বা ভেরেণ্ডা—শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভা ২৬।১।৩ ; ভাদ্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ (৪১৪-১৬)

ভারতের চা-শিল্প—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

ব ১৭।১।১ ; বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃঃ ৫ [৮-১২]

রাশিয়ায় কৃষি যুগান্তর—শ্রীদুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়

ভা ২৬।২।১ ; পৌষ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৩ [৮২-৮৪]

৬৪ [গৃহস্থালী]

প্রাচীন যুগের ভোজনবিলাস—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

ব ১৭।২।১ ; কার্ত্তিক ১৩৪৫ , পৃঃ ৭ [৪৯-৫৫]

ব্রহ্মদেশীয় খাদ্যদ্রব্য—শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

প্র ৩৮।২।৬ , চৈত্র ১৩৪৫ ; পৃঃ ৭ [৮৪৮-৫৪] ছবি ২

৬৫ [ব্যবসায়]

ছাপাকল ও সংকেত-লিপি, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ভা ২৬.১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ২ (৮৩০-৩১)

জনলোকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব,—শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

ভা ২৬।১।৬ ; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৫ (৮৯৩-৯৭)

জমিদারী হিসাবপত্র, শ্রীতারকগোবিন্দ চৌধুরী

ভা ২৬।২।২ ; মাঘ ১৩৪৫ ; পৃঃ ৪ (২৫৭-৬১)

ভা ২৬।২।৩ ; ফাল্গুন ১৩৪৪ ; পৃঃ ৯ (৩৭২-৮০)

রূপনারায়ণের তীরে মাটির ঘর

—শ্রীরজন্ত সেন

খরস্রোতা নদী; বিস্তৃত, রুক্ষ। পাড়ে কোথাও ভাঙন ধরেছে, কোথাও পড়েছে চড়া। নদীর তীরে যারা ঘর বেঁধেছিল, যারা সংসারের শৃঙ্খলায় বেঁধেছিল মন, তারা সব দূরে পালিয়েছে গ্রামের সংস্কৃত, শঙ্কাহীন বেষ্টনীর মধ্যে। বন্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে করে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ঘর। তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব এবং প্রবৃত্তি যে-কুটিরের অভ্যন্তরে নীড় বেঁধেছিল, তার ওপর এখন রূপনারায়ণের শান্ত-স্রোত।

নদীর আশপাশের গ্রামগুলিরও দীনতার সীমা নেই। জমিদারের লোভ, নিজেদের অজ্ঞতা এবং অশিক্ষার শোচনীয় অবস্থিতি আর অন্ধ অদৃষ্টবাদ তাদের জীবনকে পঙ্গু আর পঙ্কিল করে তুলেছে। নদী আজ শান্ত, স্থির। মনে হয় না, এ নদী কখনও ক্ষুব্ধ, হিংস্র হয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে।

রূপনারায়ণের জলে আজও আকাশের শান্ত ছায়া। নির্জন দ্বিপ্রহরে নিঃসঙ্গ, একাকী কোন বনতরুর ছবি। সকাল বিকেল নদীপথে ষ্টীমার যাতায়াত করে। বাঁধের ওপর দাঁড়ালে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, কুণ্ডলাকৃতি কাল ধোঁয়া; ষ্টীমারের সাদা চোঙাটা দৃষ্টির সীমা থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, গাছপালার মধ্যে চিম্নীর ধোঁয়া মিশে যায় আকাশের প্রান্তভাগে। ঘাটে ষ্টীমার ভিড়লে দু'একজন যাত্রী নামে, ওঠে কম। মাটির ঘর আর মরচে-ধরা টিনের ছাউনি দেওয়া 'ইষ্টিসন' থেকে মাষ্টার মশাই ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে বাইরে এসে দাঁড়ান। টিকিট দেখিয়ে যাত্রীরা বাঁধে এসে দাঁড়ায়। যেদিন সন্ধ্যে হয়ে যায়, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় জলের শব্দ। যেদিন আকাশে চাঁদ থাকে, সেদিন নদীর জল চিক্ চিক্ করে ওঠে চাঁদের আলোয়।

নদীর পাড় ঘেঁসে কয়েকখানা মাটির ঘর। জীবিকা-অর্জ্জনের দায়িত্বে একদল লোক এই সেদিন এসে সংসার পেতেছে। তখনও আকাশে শ্রাবণ-শেষের ঈষৎ গাঢ় মেঘ, চারদিকে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। ওদের কেউ ছিল চাষী, কেউ বা মজুর; কিন্তু মাঠে এখন ধান নেই, আর লোকও বিত্তহীন। স্থলের উৎপন্ন দ্রব্যের মায়া কাটিয়ে ওরা এসেছে জলের ধারে, নদীর তীরে। যাদের অবশিষ্ট কিছু অর্থ ছিল, সেই পয়সায় তাড়ি না খেয়ে বা সাঁওতাল মেয়ের জন্য রূপার গয়না না গড়িয়ে, সুতো কিনে জাল তৈরী করতে লাগল। নদী থেকে মাছ ধরে চালান দেবে সহরে, যা সাটা যে জেলেদেরই একচেটিয়া, এমন কোন লেখা-পড়া নেই।

নদীতে মাছ যাই মারে আর তাদের হাতের কাঠি চলতে থাকে দ্রুত, মেয়েরা সুতো পাকায় আর পুরুষরা জাল বোনে। কয়েক ঘর মাহিষ্য আর কৈবর্ত্ত। দিন কেটে যায়। শ্রাবণের শেষ হল বুঝি! আকাশে কড়া রোদ, গাছের পাতাগুলো শুকনো, সবুজ। আকাশে সাদা মেঘগুলোতে খানিকটা আলস্যের ইসারা।

লক্ষ্মণের জাল শেষ হল সবাই-এর আগে। ডিঙ্গি মেরামত করতে লেগে গেল সে। এই দিন কয়েক আগে সস্তায় প্রায়-ভগ্ন একখানা ডিঙ্গি সে খরিদ করে এনেছিল। তার দুই ছেলেকে নিয়ে সে এখন ভীষণ ব্যস্ত। চমৎকার স্বাস্থ্য ছেলে দুটির, এ অঞ্চলে এমন আর দেখা যায় না, সবাই চেনে তাদের। বয়স যথাক্রমে বারো আর দশ, রৌদ্রের তাপে গায়ের চামড়া কালো হয়ে গেছে, অপরিণত বয়সেই শরীরের পেশীগুলো আকৃতি পেয়েছে। লক্ষ্মণের একটি মেয়েও ছিল কিন্তু সে আর আজ নেই। সে যদি থাকত, ডিঙ্গিতে একখানা কাঠের গোঁজা লাগিয়ে লক্ষ্মণ ভাবছিল, তা হলে ডুরে-পাড় সাড়ী পরিয়ে তাকেও নিয়ে যেত ডিঙ্গিতে, —ডিঙ্গিতে চড়বার তার যে কি সখ ছিল, সে-কথা লক্ষ্মণ ভুলবে না কখনও।

—এই ত সেবার—যেবার রূপনারায়ণের বন্যায় ভেঙে পড়ল ওদের ঘর, গরু বাছুরগুলো গেল ভেসে, লক্ষ্মণ দু'হাতে তার

তিন সন্তানকে আঁকড়ে বাঁধের দিকে ছুটে গিয়েছিল, বুকের মধ্যে রাখালি বলেছিল, 'আস্তে চল বাবা, দম আটকে আসছে!' লক্ষ্মণের পঞ্চাশ গজ পেছনে উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি তখন পাগলা হাতীর মত ছুটে আসছে। জল তাকে নাগাল পায় নি, উঠে আসতে পেরেছিল সে সময় মত। এই ত সে দিনের কাহিনী। কিন্তু কোথায় আজ রাখালি! লক্ষ্মণের বুকের মধ্যে বার বার মোচড় দিয়ে উঠে। যদি থাকত সে! তার রাখালি!

জল শুকোয়, মাটি শক্ত হয়ে আসে। আবার একদিন গৃহহীনের দল মাটীতে খুঁটি পোতে, চাল বাঁধে, দেওয়াল গাঁথে। জমিদারের লোক আসে যথারীতি খাজনা নিতে, বাকী-পড়ার দায়ে নালিস করবে বলে শাসিয়ে যায়। যারা সংগ্রহ করতে পারে গোপনে, তহশীলদার বাবুর বাড়ীতে টাকাটা, সিকিটা, আধুলিটা পৌঁছে দিয়ে আসে। কেউ বা নিয়ে আসে বড় গোছের একটা মাছ। তহশীলদার দু'দিন চুপ করে থাকে। যারা ঘুষ দিতে পারে না, তাদের সর্ব্বস্ব যায়। ঘটিবাটি থেকে আরম্ভ করে ঘরের চৌকাট, গরু-বাছুর পর্য্যন্ত।

নিরুপায় এরা। এমনি ওদের জীবনাতিপাতের ধারা। দুঃখ আসে, মুখ বুজে সহ্য করে; যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, অভিশাপ দেয় ঈশ্বরকে। অন্নের জন্যে উৎসর্গ করে তাজা রক্ত। কেউ কেউ টিকেও থাকে, আর কেউ যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে।

দিনের পর দিন জোয়ারের শব্দ শুনে, রুক্ষ, বিবর্ণমূর্ত্তি নদীর এই রূপ দেখে দেখে কেউ কেউ তীর ছেড়ে ক্লান্ত হয়ে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; আবার কেউ ছুটে এসেছে নদীর তীরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায়; চোখের সামনে জলের একটা স্রোত, একটা স্পন্দন, যেখানে মনটাকে বিস্তৃতি দেয়।

কিন্তু লক্ষ্মণ এসেছিল তার দুই ছেলেকে নিয়ে নিছক পেটের দায়ে। স্বপ্ন সেও দেখে, কিন্তু পেশীগুলোকে অলস হবার সুযোগ কখনও দেয় না; সে সময় তার নেই। ছেলে দুটোকে রেখে হঠাৎ একদিন সে চার ক্রোশ পাড়ি দিয়ে শ্যামচকে গিয়ে পৌঁছুল। প্রতিবেশীরা বিস্মিত হল। লক্ষ্মণ চাপা লোক, কথাবার্ত্তা কম বলে। কেউ কোন হদিস্ না পেয়ে তার ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল। স্ত্রী মারা যাবার পর শ্যামচকে যাওয়া লক্ষ্মণের কমে গিয়েছিল। শ্যামচক তার শ্বশুরবাড়ী। লক্ষ্মণের শ্যালক রামরূপ স্নেহশীল ব্যক্তি, মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতে আসে। রামরূপের পয়সা-কড়িও কিছু আছে শোনা যায়, আর লক্ষ্মণের আছে মাথা। ফেরবার সময় লক্ষ্মণ রামরূপকেও নিয়ে এল। তাকে বুঝিয়েছে, পয়সা জমিয়ে রাখতে নেই, ফুরিয়ে যাবে। সংসারে দুটো জিনিষের ওপর আকাঙ্ক্ষা কখনও কমে না, একটা নাম, আর দ্বিতীয় অর্থ। নাম আমাদের নেই, দরকার নেই; চাষাভুষোর আবার নাম কি? কিন্তু টাকা আমাদের চাই, টাকা না হলে চলবে না। কিন্তু কি জান ভায়া? টাকা সবায়ের প্রয়োজন, এটা বোঝে সবাই, কিন্তু আলস্য তাদের মাংসপেশীগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে, তাদের বলিষ্ঠ পা চলৎশক্তিহীন; বিশাল কিন্তু অকর্ম্মণ্য।

বিকেলের দিকে লক্ষ্মণ দুই ছেলেকে নিয়ে বিলে নেমেছিল, জাল দিয়ে কিছু মাছ যদি মেলে। এই বিলগুলোতে বার মাসই জল থাকে, ছোট ছোট মাছ, চিংড়ি, সরপুঁটি আর মৌরলা।

'কি দরকার ছিল?' রামরূপ বললে, 'ছেলে দুটোকে জলে ভিজিয়ে!'

'এলে তুমি এতটা পথ, কুটুম।'

পরদিন নদীতে জাল নামাবার পালা। রাত্রে জোয়ারের সঙ্গে মাছ আসে, তার আগেই জাল ফেলতে হবে। পাড়ার অন্যান্য নিকারীরা-প্রায় সবাই প্রস্তুত। সকাল থেকে টেনে টেনে জাল দেখছে, কোথাও খুঁত আছে কি না। দেখছে ডিঙ্গিতে ঘা মেরে মেরে, জোয়ারের ধাক্কায় টিকে থাকবে কি না।

লক্ষ্মণের ছেলে দুটো—মানিক আর শাপলা লাফাচ্ছে সেই তখন থেকেই, ইলিশ মাছের কান্‌কো ধরে ধরে টেনে টেনে তুলবে ওপরে।

"জালটাকে তুমি ততক্ষণ দেখ ভায়া," লক্ষ্মণ রামরূপকে বললে, "আমি কাছারি-বাড়ীর বাবুদের ঠেঙ্গে ঘুরে আসি, তেনাদের সঙ্গে এখন থেকেই ঠিক করে ফেলি, সব যেন রোজ আমার কাছ থেকেই মাছ নেয়।"

"হপ্তায় ত দুদিন হাট, আর মাছ তুমি বেচবে কোথায়?"

"বেচবো কাছারিতে, তারপর চালান দেবো সহরে। বাবুরাই ত বড় খদ্দের, করলডাঙ্গা থেকে ব্যাটারা কাছারিতে মাছ দিয়ে যায়, আর আমরা এত কাছে থাকি। হাটের দিনে মাণিক আর শাপলাকে পাঠিয়ে দেবো, ওরা মাছ বেচে পয়সা নিয়ে আসবে, দরটবগুলো শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে। কি রে পারবি নে মাণিক?"

মাণিক তার ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে জানায়—সে পারবে।

দুপুরটা কাটল জল্পনা আর কল্পনায়। মাণিক আর শাপলা গোঁ ধরেছে রাত্রে তারাও যাবে নদীতে। রামরূপের ইচ্ছে নয় ছেলেছোকরা নিয়ে হাঙ্গাম করা।

"যাক না।" লক্ষ্মণ বলে, "এখন থেকে শিখুক, সমস্ত কাজই শিখতে হয় ছেলেবেলা থেকে। এই ত বয়েস, কুঁড়ে হয়ে যাবে শেষকালে। আমি চাই আমার ছেলেরা আমারই মত জোয়ান হয়, সাহসী হয়। কি রে! জোয়ারের জল যখন চার হাত উঁচু হয়ে আসবে, দেখে ভয় পাবি নে ত?"

"দূর! ভয় কি?" মাণিক প্রায় বয়স্ক লোকের মতই বলে, "তুমি যখন মামার বাড়ী গিয়েছিলে আমরা লুকিয়ে সাঁতার কেটেছি জান?"

"কখন রে?" লক্ষ্মণ বিস্মিত হয়।

"এই ত সেদিন।"

লক্ষ্মণের ছেলেরা যে তারই মত সাহসী এবং বীর হবে এতে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যার পর জাল নিয়ে সবাই নদীতে ডিঙি ভাসাল। লক্ষ্মণের দুই ছেলে নিয়ে সেও চললো, সঙ্গে রামরূপ। মাঝনদীতে ভাঁটা পড়েছে, এই সময়েই বাঁশ পুঁতে বসাতে হবে জাল। জোয়ার এলে অসম্ভব; থই পাওয়া যায় না।

মাঝ-নদীতে ওরা জাল ফেললে। প্রকাণ্ড জাল, মাছের সংখ্যাধিক্যের আসায় লক্ষ্মণ ক্ষেপে যাবার যোগাড়।

রাত্রি হয়ে এল। রূপনারায়ণের দুই তীরে গাছপালার মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দূরে প্রকাণ্ড ঝাউগাছটার নীচে খোড়ো বাড়ীর 'ইষ্টিসান', বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ইষ্টিসান-মাষ্টার ভাঙ্গা চেয়ারটায় বসে বসে বোধ হয় ঘাটাল থেকে-আসা মাখনের হাঁড়ির হিসেব করছেন, ফিরতি ষ্টিমারে কলকাতা চালান যাবে। একটু পরেই যে ষ্টিমারখানি কোলাঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে আসবে, সেটাই আবার শেষরাত্রে ফিরে আসবে রাণীচক থেকে। এই হিসেবের কাজটা মাষ্টার মশাই এখনই সেরে রাখছেন, কেন না শেষরাত্রে চোখে ঘুম থাকে, কাজ করতে ইচ্ছে করে না।

জাল বসাবার কাজ সম্পূর্ণ হল। চারদিকে ঘোরতর অন্ধকার, দূরে পূবের আকাশে খুব বড় চাঁদ আস্তে আস্তে উঠে আসছে, তারই আলোয় আলোকিত হচ্ছে নদীর চঞ্চল স্রোত; রূপালী ঢেউগুলো চিক্ চিক্ করছে।

"তামাকের সরঞ্জামগুলো এনেছো?" রামরূপ একটু আরাম করে ডিঙির উপর বসে বললে, "বিস্তর জল হাঁটকানো হয়েছে।"

"আছে, ঐ কোণায় টিনের মধ্যে। নাও ধরাও না এক ছিলিম।"

ডিঙি বাঁধা ছিল বাঁশের খুঁটিতে, দুলছিল ঢেউএর মৃদু আঘাতে।

তামাক ধরানো হ'ল। আরাম করে কয়েকটা টান দিয়ে রামরূপ হুকোটা লক্ষ্মণকে এগিয়ে দিলে। জোয়ারের এখনও দেরী আছে প্রায় ঘণ্টা খানেক। মাণিক তাকিয়ে আছে সেই অদৃশ্য অন্ধকারের দিকে—যেখান দিয়ে জল আসবে হু হু করে, প্রচণ্ড শব্দে, প্রায় একখানা চলন্ত, ক্ষিপ্ত জলের পাহাড়, হিংস্র, ভয়ঙ্কর। জোয়ার আসছে কতদিন ও দেখেছে; কত সময়; কিন্তু আজ এই অন্ধকারে নিঃশব্দে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল তার সমস্ত শরীর, উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল চোখ। বসেই রইল ও চুপ করে। ওর পাশে যে অন্য সবাই বসে মৃদু আলাপ করছে, সে-শব্দ তার কানেই আসছে না, ও ভুলে গেছে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থিতি। হঠাৎ এক সময়ে চোখ তুলে তাকিয়ে আচমকা তার মনে হ'ল—চার পাশে কল্লোলিত জলের আবর্ত্ত, ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, উন্মত্তের মত ফেটে পড়ছে একাকার হ'য়ে; ভয় পেয়ে মাণিক শাপলাকে জড়িয়ে ধরল।

"কি হল?" লক্ষ্মণ চট করে হুঁকোটা নামিয়ে রাখলে। মাণিকের ততক্ষণ চমক ভেঙ্গেছে, কৈ কোথায় জল? আশে পাশে নৌকোর মধ্যে লোকের কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ষ্টিমারের হুইসেল, জলকে তোলপাড় করে

এখনি এসে পড়বে। আর ঐ ত দেখা যাচ্ছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ষ্টেশনের বাত্তি।

"কি হল রে?" লক্ষ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করল।

"কিছু না, ডিঙিটা দুলছিল ত।"

"দূর! তোর ঘুম পেয়েছে! চল রেখে আসি তোদের, এখনও অনেক দেরী, কখন জোয়ার আসে তার ঠিক নেই।"

"না বাবা, শাপলা যাক," মাণিক বললে, "আমি দেখবো।"

"আমিও দেখবো!" শাপলা প্রায় শক্ত হয়ে বসলো।

"থাক্ না।" রামরূপ বললে, "এক কাজ কর,—এই—"

"কি?" লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করল।

"না, জোয়ারটা আসতে আর কতক্ষণ দেরী আছে জানতে পারলে হত।"

"কি হবে?"

"তা হলে আমরা একেবারে খেয়ে দেয়ে আসতাম, পরে ছেলে দুটোকে রেখে এসে নিশ্চিন্দি হওয়া যেত।"

কয়েকজন যাত্রী নিয়ে একখানা নৌকা আসছিল নেমে। অন্ধকারে মাঝিকে লক্ষ্য করে লক্ষ্মণ হাঁক দিলে, "কদ্দূর যাবে গা?"

"পশুপতির চড়া।" উত্তর এল।

"জোয়ারের আগে পৌছুতে পারবে?"

নৌকো খানিকটা এগিয়ে গেছে। দাঁড় ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মাঝি উত্তর দিল, "পারব, এখনও এক ঘণ্টা।" অন্ধকারে মাঝির গলার শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, আর দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল নৌকো। চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে জল।

"এক কাজ করা যাক্।" লক্ষ্মণ বললে, "এরা নৌকায় থাক, চল আমরা এক ঝটকায় সেরে আসি। প্রথম ধাক্কায় কিছু মাছ পড়লে তাই শুদ্ধ ওদের ঘরে পাঠিয়ে দেব। তা না হলে আমরা আর খাবার সময় পাবো না, সবশুদ্ধ চলে গেলে দেখবে জাল ফাঁকা, সব চুরি হয়ে গেছে।"

"ছোঁড়াগুলো ভয় পাবে না?" রামরূপ জিজ্ঞাসা করল।

"কি রে ভয় করবে?" লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করল, "না, ভয় কিসের রে? জোয়ারের আগেই ত আমরা এসে পড়েছি, ভাঁটায় আর ভয় কি? তোরা থাক্ বসে, দেখিস কেউ না জাল খুলে দেয়, আমরা আসছি এখুনি। চল রামরূপ আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে আসি।"

"আর কেউ যাচ্ছে না কি?"

"ঐ ত গোটা যাচ্ছে বোধ হয়।"

"হাঁক দাও না!"

অন্ধকারে লক্ষ্মণ চেঁচিয়ে আর একখানা নৌকা লক্ষ্য করে' হাঁক দিতে ডিঙিখানা এগিয়ে এল।

ভাল করে খুঁটির সঙ্গে ডিঙি বেঁধে লক্ষ্মণ আর রামরূপ তীরের দিকে চলল, যাবার সময় বার বার করে বলে গেল ওরা যেন সাবধানে চুপ করে বসে থাকে। নৌকার মধ্যে যেন ঘুমিয়ে না পড়ে, চার দিকে যেন লক্ষ্য রাখে, কেউ কোন দিক্ থেকে এসে জাল খুলে দিয়ে যেন না পালায়।

যে দু'একখানা যাত্রী-নৌকা এতক্ষণ নেমে যাচ্ছিল ভাঁটার টানে, এখন আর দেখা যাচ্ছে না একখানাও। চারদিক্ শান্ত, স্থির; জলের মধ্যে চাঁদের ছায়া এগিয়ে এসেছে ডিঙির কাছে। দূরে-দূরে আরও যে কয়খানা নৌকো, তার মধ্যে লোকগুলোর আর সাড়াশব্দ নেই, তামাক টানতে টানতে বোধ হয় ঝিমিয়ে পড়ছে।

"এই ঘুমোচ্ছিস?" মাণিক শাপলাকে জিজ্ঞাসা করলো।

"না।"

"তুই ঘুমো, আমি বসে আছি বাইরে।"

শাপলা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। মাণিক বসে' রইল জেগে। ওদের উৎসাহের আগুণ এতক্ষণে নিবে গেছে। মাণিকও ঝিমিয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে, তবু সে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল দূরে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তার মনে হচ্ছিল, ঐ বুঝি এল জোয়ার, কিন্তু কালো জল তেমনি শান্ত, নির্ব্বিকার। ঘুম এসেছিল বলে ও জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দিলে।

বসে বসে তারও বোধ হয় একটু চোখ বুজে এসেছিল; হঠাৎ একটা অস্পষ্ট জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে চমকে উঠে তাকাল চারিদিকে। পর মুহূর্ত্তে তার শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের একটা শিখা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল; জল থেকে পা তুলে সে ভাল করে তাকাল দূরে, নদীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত চলন্ত জলের একটা বিরাট স্তূপ প্রচণ্ড শব্দে এগিয়ে আসছে—একদল ক্ষিপ্ত সিংহের মত, রুদ্ধ আক্রোশে, প্রবল পরাক্রমে; রূপোর কেশর তাদের ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়! মাণিক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল," জোয়ার! জোয়ার আসছে! ওরা কি মাছের ঝাঁক? সাদা সাদা মাছ?" দেখল, আশপাশের লোকগুলো দাঁড় হাতে রুখে দাঁড়াচ্ছে, ওর মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে। দেখতে দেখতে কল্ লক্

শব্দে জল এগিয়ে এল আরও কাছে; পায়ের কাছ থেকে প্রায় অজ্ঞাতে মাণিক দাঁড়খানা তুলে নিয়ে দাঁড়াল, হঠাৎ প্রবল কণ্ঠে চীৎকার করে শাপলার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, তার কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না। "ওঠ; ওঠ! উঠে দাঁড়া।" মানিকের কম্পিত, ভয়ার্ত্ত কথা শোনা গেল, "শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, জোয়ার এসেছে, জোয়ার! ঐ বাঁশের খুটিটা খুব শক্ত করে—"

শাপলা ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে, "বাবা কোথায়?" সে জিজ্ঞাসা করলে, "এখনও—"

আর তার বাকস্ফুরণ হল না, পঁচিশ গজ দূরে দুরন্ত জলের স্রোত দেখে আর্ত্তকণ্ঠে সে কি বলতে যাচ্ছিল—

"চুপ চুপ", মাণিক বললে, "বাঁশের খুঁটিটা ধরে থাক্, আঃ ধর না—"

বিশাল জলের পাহাড় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আলোড়নে বাঁশের খুঁটি থেকে প্রথম ধাক্কায় দড়ি ছিঁড়ে ডিঙ্গি ছিটকে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই গেল উল্টে। শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্যে জলের আবর্ত্তে দুটি ক্ষীণ দেহ একবার দেখা গিয়েছিল, তারপর কোথায় ডিঙ্গি আর কোথায় দুটি ক্ষুদ্র মানবশিশু।

জোয়ার এগিয়ে গেছে।

লক্ষ্মণ এবং রামরূপের ধারণা জোয়ারের দেরী ছিল তখনও, তারা হিসেব মত ঠিক সময়েই পৌঁছেছে। তীরে এসে জলের দিকে তাকিয়ে তারা চমকে উঠল, জোয়ার এসে গেছে। নদীর আপাতঃ শান্ত রূপ কোন শঙ্কাই তাদের মনে আনল না। তবু ওরা না ভেবে পারছে না—ডিঙ্গিটা বাঁধা আছে ত ঠিকঠাক্। দুটো শিশুকে অমন অনির্দ্দিষ্টের মধ্যে ফেলে আসা ঠিক হয় নি। কাল বোধ হয় পূর্ণিমা, জোয়ার বেশ বেগেই এসেছিল সে হিসেবে। বিস্তৃত নদী, তীরে দাঁড়িয়ে ঠিক ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকারে—অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দূরে তাকিয়ে মনে হল ডিঙ্গির সংখ্যা যেন কম। ব্যাপার কি? এখান থেকে হাঁক দিলেও শোনা যাবে না। নৌকা নিয়ে ওরা এল তাড়াতাড়ি, দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না কোন্ ডিঙ্গিটা তাদের।

"কৈ কুঞ্জ! আমাদের ডিঙ্গি গেল কোথা?" কাছেই আর একখানা নৌকোর উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ কথা কটা ছুঁড়ে মারলে। তার কণ্ঠে পৃথিবীর সমস্ত ভয় এবং আশঙ্কা।

"কি জানি বাপু! ভেসে গেছে আর কি।" বিরক্ত সুরে কুঞ্জ বললে, "ডিঙ্গি ভাসিয়ে বাবুরা গেলেন চলে! একটা লোকও ত রেখে যেতে হয়।"

"ছিল যে!" লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে পড়ল, সমস্ত রক্ত তার ঠাণ্ডা হয়ে গেল এক নিমেষে, মেরুদণ্ডের মধ্যে ঠাণ্ডা বরফের স্রোত। ভাববার শক্তি তার যেন লোপ পেয়েছে। "ওর মধ্যে আমার ছেলে দুটো ছিল যে।" বিস্মিত, নিস্তব্ধ গলায় লক্ষ্মণ কোন রকমে বললে, "ভেসে গেল? কোন্ দিকে?" রামরূপ বললে, "চীৎকারও শুনলে না তোমরা?"

কুঞ্জ এবং তার সঙ্গীরা ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল; জোয়ারের মুখে এমন করে দুটো ছেলেকে রেখে যেতে আছে কোথাও?

অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না লক্ষ্মণের মুখের সমস্ত রেখাগুলো একে একে কঠিন হয়ে উঠল, হৃদ্‌পিণ্ডের গতি এল স্বাভাবিক হয়ে। "চল", ও বললে।

জোয়ারের মুখে ওরা দাঁড় ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল, সঙ্গে প্রায় সব ক'খানা নৌকা। নদীর এ-পাড় ও-পাড় কোথাও আর বাকি রাখল না কেউ। কিন্তু সন্ধান মিলল না কোনখানে ডিঙ্গি বা ছেলে দুটোর।

কয়েক মাইল তারা এগিয়ে এল আরও, নদীর বিস্তৃতি এসেছে হ্রস্ব হয়ে, চাঁদ মাথার ওপরে; চাঁদের আলোয় নদীর দুটি তীরই প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডিঙ্গি চলা ভিড়িয়ে খানিকটা গাছপালার দিকেও অনুসন্ধান করতে ওরা কসুর করল না; কোথাও নেই, কোথাও নেই। আশ্চর্য লাগ ছিল সবাই-এর, গেল কোথায়? এত দূরে এসেও ডিঙ্গি তীরে আটকায় নি কোথাও।

রাত্রি গভীর হল। নন্দনা ছাড়িয়ে ওরা পানসিউলীর ঘাটে এসে পড়ল, অক্লান্ত পরিশ্রমে চলল তাদের অনুসন্ধান। লক্ষ্মণের বার বার মনে হচ্ছিল এই বুঝি "বাবা" বলে ওরা কোন দিক্ থেকে ডেকে ওঠে। সমস্ত শ্রবণ খাড়া করে রইল সে। শুধু জলের একটা ছল্‌ছল্ শব্দ ব্যতীত আর কোন দিক্ থেকে এক কণাও শব্দ শোনা গেল না।

সমস্ত রাত এমনি পাগলের মত ওরা খুঁজে খুঁজে বেড়াল একখানি ডিঙ্গি আর দুটি ছেলে। শেষ রাত্রির আকাশ শুভ্র এবং শান্ত; তারাগুলো প্রখর, মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিম-প্রান্ত-সীমায়; পূবের আকাশ অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। পানসিউলী ছাড়িয়ে ওরা এল নন্দগ্রাম; প্রায় ভোর হয়ে গেছে, আকাশে খণ্ড খণ্ড লাল মেঘ।

হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ যে! ঐ ত!" সবাই এগিয়ে গেল কাছে; আগ্রহ তাদের অধীর, অসংবরণীয়। বালির ওপর লক্ষ্মণের ডিঙ্গিখান কাত হয়ে পড়ে আছে। তারই কয়েক হাত দূরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুটি শিশুর মৃত দেহ; ঠাণ্ডা, বিধ্বস্ত, জলসিক্ত।

শান্ত রূপনারায়ণের তীরে এখানে সেখানে একটি দুটি মাটির ঘর।

সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা

—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

ইংলণ্ডের সমবেত প্রার্থনা দিবস : অযোধ্যায় স্বাধীনতা লোপ

ডাঃ সূর্য্যকুমারের দিনলিপির এক স্থানে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ভাইকাউণ্ট পামারষ্টোন কর্ত্তৃক মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লিখিত পত্রের একাংশ উদ্ধৃত আছে এই ভাবে :

10th Sept, 1857

"Viscount Palmerston presents his humble duty to your Majesty and begs to submit··· that a day should be set apart for National Prayer and Humiliation with reference to the present calamitous state of affairs in India···"

সিপাহী যুদ্ধানল প্রথম জলিয়া উঠে ১০ই মে। ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইহার দাহিকা-শক্তির প্রখরতা সুদূর ইংলণ্ডেও অনুভূত হয় এমন ভাবে যে, জনসাধারণের মুখপাত্র-স্বরূপ ভাইকাউণ্ট পামারষ্টোন মহারাণীকে বিনীতভাবে জানান, ভগবচ্চরণে জাতির সমবেত দীন প্রার্থনার দিন নির্দ্ধারিত হউক।

দীনের দীন হইয়া সকাতরে সূর্য্যকুমার বলিতেছেন : "অহোরাত্রি আমাদের কামনা, হে ভগবান, যুদ্ধানল নির্ব্বাপিত হউক, শান্তি স্থাপিত হউক, কিন্তু এই পাশ্চাত্য জাতি যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা—অসি, আগ্নেয়াস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক শক্তি বলে তাহারা ঐশীশক্তি সম্পন্ন, তাহাদের 'a day of humiliation' সম্ভ্রমে রক্ষা করা পদস্খলিত আমাদের কাহারও পক্ষে চমকপ্রদ হইতে পারে—পাশ্চাত্য প্রকরণে আপাতমধুর বোধে অন্ধ অনুকরণই আমাদিগকে চমকিত করিবে— ইংরাজের এই 'Day of humiliation' সমবেতভাবে পালনে অন্ধ আমাদের যথার্থ জ্ঞানের কিঞ্চিৎমাত্র উন্মেষ যদি করে।"

ইহার পরে সূর্য্যকুমার বলিতেছেন, "দুর্গা দুর্গা উচ্চারণ করিয়া যাত্রারম্ভই আমাদের সনাতন প্রথা। সর্ব্বকার্য্যে নামকীর্ত্তন করিয়া আমরা জয়টীকা ধারণ করি, ফল, শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু। তথাপি যুদ্ধে ব্যাপৃত অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রকেও শক্তি আরাধনা করিতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতির এই day of national prayer ইহারই রূপান্তর কি না, কে জানে!"

যে-রাজপুরুষের নিকট হইতে ভাইকাউণ্ট পামারষ্টোনের পত্রের হুবহু নকল সূর্য্যকুমার প্রাপ্ত হন, সিপাহী যুদ্ধের কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কাছে বলেন, "ইংলণ্ডের এই day of humiliation এর ঘটনায় অযোধ্যার বিশাল রাজ্য ব্রিটিশ রাজ অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা মনে করিয়া দেয়। বেশী দিনের কথা সে নহে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যার স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। পাঞ্জাব, পেগু, নাগপুর তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যার নৃপতিও ব্রিটিশ-রাজের কথায় উঠিতেছেন বসিতেছেন কিন্তু Oudh annexation সম্পর্কীয় দলীল দস্তাবেজে অযোধ্যারাজ নাম দস্তখত করিতে একেবারে অসম্মত হন—"

রাজপুরুষ : "আপনি যে ভাবে বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় Annexation of Oudh ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু প্রজার উপর কি দারুণ অত্যাচারের জন্য কোম্পানী এ কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়—"

ডাঃ সর্ব্বাধিকারী : "ও সকল আলোচনা করার অভিপ্রায় আদৌ আমার নাই। যত বড় অত্যাচারী নৃপতি হউন না কেন Annexation দলীলে সহি না করিয়া সজল নেত্রে রেসিডেণ্টের কাছে অগ্রসর হইয়া নৃপতি যখন আপন মুকুট রেসিডেণ্টের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই লউন আমার মুকুট স্বেচ্ছায় আমি ইহা ত্যাগ করিলাম কিন্তু সহি করিতে বলিবেন না, আমি তাহা করিতে পারিব না'—এ দৃশ্যে কাহারও পক্ষেই অশ্রুসংবরণ করা কঠিন। সে কথা যাউক নৃপতির এই মুকুটত্যাগের ঘটনা এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার উপর ভরসা করিয়া মিরাট, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়

চক্রীরা ভীষণ আয়োজনে বহুদূর অগ্রসর, সে সংবাদ নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। ওদিকে বক্সারেন কুমার সিং-এর বিপুল অভিযান আয়োজনও দ্রুতবেগে চলিতেছে। অত্যাচারী নৃপতি প্রভৃতিকে দমন করিয়া প্রজার সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া কোম্পানীই এখন অত্যাচারী পর্য্যায়ভুক্ত, তাহার কি বলুন।"

রাজপুরুষ—"বগাংলি সামলাইতে আছেন আপনারা, ন্যায় ও সত্যের জয় অনিবার্য্য ইহা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তাহা না হইলে আপনাদের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমরা পাইতাম না।"

কথোপকথন কালে সংবাদ আসে, গাজীপুর হইতে ষ্টীমার যোগে সৈন্য অবিলম্বে রওনা হইবে এবং ডা সর্ব্বাধিকারীকে সেই সৈন্য সমভিব্যহারে যাইতে হইবে। গন্তব্য স্থান এখন অপ্রকাশিত।

ইহার জন্য ডাঃ সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বদাই প্রস্তুত যাত্রার সকল আয়োজন সূর্য্যকুমার সত্বর করিয়া লইলেন। যাইবার পূর্ব্বে অযোধ্যার নৃপতি সম্বন্ধে যাঁহার সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল তাঁহার নিকটে গিয়া তিনি বলিলেন, "শোনা কথার যৎসামান্য আপনাকে বলিয়াছি, আমার বিশ্বাস যাহা আপনাকে বলিয়াছি তাহা অতিরঞ্জিত নহে। অন্ততঃ অতিরঞ্জিত আমার মনে হইলে, সে কথাই একটিও আমি উচ্চারণ করিতাম না। এইটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখিবেন।"

কথা যে অতিরঞ্জিত নহে, কলিকাতা হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লিখিত লর্ড ডালহাউসীর এক পত্র হইতে তাহা প্রকাশ পাইবে। প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল। লর্ড ডালহাউসী লিখিতেছেন—

"...The Resident at Lucknow waited upon the King in person—communicated to him the resolution which the British Government had taken—and tendered for his acceptance a new treaty, whereby the transfer of the Government of Oudh would have been made a matter of amicable agreement,

"The King wholly refused to sign any treaty. He declared himself ready to submit to the will of the British Government in all things. He bade the Resident observe that every mark of power had already been laid down by His Majesty's own orders—the guns at the palace gates were dismounted, the guards bore no arms, and though drawn up as usual in the Court, they saluted the Resident with their hands only, while not a weapon was worn by any officer in the Palace.

"The King gave way to passionate bursts of grief and anger—implored the intercession of the Resident in his behalf, and, finally, uncovering his head, he placed his turban in the Resident's hands. The act, the deepest mark of humiliation and helplessness which a native of the East can exhibit—became doubly touching and significant when the head, thus bared in supplication, was one that had worn a Royal Crown."

ভবী ভুলিবার নহে, সুতরাং

"At the end of the three day's space which was allowed him for deliberation, (he) still refused to sign a treaty, the territory of Oudh was taken possession of, by the issue of the Proclamation...."

সূর্য্যকুমার ও ডাঃ লর্ড ডালহাউসীর কথার সার একই। তবে সূর্য্যকুমার 'টার্‌বান্'-এর (পাগড়ী) স্থলে 'রাজমুকুট' ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার দিনলিপির একাধিক স্থানে কথাটী 'রাজমুকুট' বলিয়াই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

দিনলিপির এক স্থানে প্রকাশ: "রাজদরবারে আগমন করিয়া রেসিডেন্ট দেখিলেন, দরবার সকল প্রকার জাঁকজমক-বর্জ্জিত। অযোধ্যারাজ সাধারণ বেশে সজ্জিত হইয়া দরবারে উপস্থিত—মস্তক সাধারণ উষ্ণীষে আবৃত, রাজমুকুট পার্শ্বদেশে এক অনুচ্চ মঞ্চে স্থাপিত। অযোধ্যারাজ তাঁহার বক্তব্য অল্প কথায় শেষ করিয়া রাজমুকুট রেসিডেন্টের হস্তে অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তক অনাবৃত করেন।"

সূর্য্যকুমার নিজেই বলিয়াছেন এ সকল তাঁহার 'শোনা কথা'—শোনা কথা বটে কিন্তু খুবই নির্ভরযোগ্য।

ডালহাউসী-বর্ণিত 'ফাঁকা কামান', 'নিরস্ত্র রক্ষী' প্রভৃতির সহিত সূর্য্যকুমার-কথিত রাজমুকুট-অর্পণের সামঞ্জস্য করা খুব কঠিন নহে। তবে মুকুটত্যাগ সত্ত্বেও 'ট্রিটী' না হইয়া 'প্রক্লামেশনের' প্রয়োজনীয়তার জন্য এ কথা অপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা যদি থাকে, স্বতন্ত্র কথা।

ছোট বড় অনেক কথার যোগ-বিয়োগে জগতে অনেক কিছু হইয়া গিয়াছে এবং হইবে। ইতিহাসের স্বচ্ছ রূপ দেখিতে যাঁহাদের অভিলাষ, বহু আয়াস স্বীকার করিলে তবে তাঁহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে। নতুবা 'চর্ব্বি সংযুক্ত টোটা' বা 'সিপাহীর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা'—সিপাহী যুদ্ধের সার কথা, এই জ্ঞান অর্জ্জন করা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

পঞ্চনদ, নাগপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি কোম্পানী হস্তগত করার কারণে দেশের আবহাওয়ার গতি পর্য্যবেক্ষণে এবং তাহার সঙ্গে অন্য শত বিষয় ধীরভাবে অনুশীলনে প্রত্যক্ষদর্শী সূর্য্যকুমার সিপাহী-যুদ্ধের স্বরূপ-চিত্র তাঁহার দিনলিপিতে যথাসাধ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত যুদ্ধের আকস্মিক আরম্ভ, যুদ্ধের মুখ্য ও গৌণ কারণ, যুদ্ধারম্ভে যুদ্ধরত সিপাহী ভিন্ন অন্যান্য সিপাহীর কোম্পানীর সম্বন্ধে মনোভাব, চক্রীদের তৎপরতা ও কৃতকার্য্যতা, যুদ্ধ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনের কথা, কোম্পানীর ব্যবস্থা ও অব্যবস্থার কথা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকটি খণ্ড-যুদ্ধের বর্ণনাও প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সকল পাঠে যুদ্ধারম্ভের সূচনা হইতে বর্ণিত কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা পাঠক-পাঠিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সূর্য্যকুমারের দিনলিপি হইতে নানা স্থানে যুদ্ধের জ্বলন্ত ঘটনা পাঠক-পাঠিকাকে এইবার আমরা জানাইতে আরম্ভ করিব।

ব্যারাকপুর, বহরমপুর ও অম্বালায় অশান্তি মিরাট ও দিল্লীতে সিপাহী

সিপাহী যুদ্ধাগ্নি সর্ব্বপ্রথম মিরাটে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেও অগ্নির ক্ষীণ একটি শিখা প্রথমে দেখা দেয় বঙ্গদেশে। পত্রাদি সংযোগে সূর্য্যকুমার জানিতে পারেন—

"নূতন বন্দুকের ব্যবহার প্রণালীতে শিক্ষাগার দমদমায় সিপাহীরা বিগড়াইবার উপক্রম হইয়াছে। দুষ্ট লোকে রটাইয়াছে, টোটা হিন্দু ও মুসলমানের অস্পৃশ্য চর্ব্বিমিশ্রিত।"

কলিকাতায় সিপাহী অসন্তোষের এই প্রাথমিক সংবাদ প্রাপ্তির কয়েক দিন পরে ডাঃ সর্ব্বাধিকারী সংবাদ পান—"অবস্থা গুরুতর। জাতিনাশ ভয়ে সিপাহীরা নূতন টোটা ব্যবহারে অসম্মত। কর্ত্তৃপক্ষ অনেক বুঝাইয়াও বুঝাইতে পারিতেছেন না যে, টোটা নির্দ্দোষ, হিন্দু বা মুসলমানের আপত্তিজনক কোনও দ্রব্য এই টোটায় নাই। সিপাহীকে আয়ত্তে রাখিতে, হুকুম পালনে বাধ্য রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষের কঠোরতা অবলম্বনের কথাও শুনা যাইতেছে। অনেকের ভয় একে বুঝি আর দাঁড়ায়। টোটা সম্বন্ধে জনরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।"

পরের সংবাদ ভীতিপ্রদ—"ব্যারাকপুরে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যসমূহ (২নং, ৩৪নং, ৪৩নং ও ১৭নং পদাতিক দল) ও রাণীগঞ্জে অবস্থিত ২নং পদাতিকের শাখা দলের কাওয়াজের মাঠে অল্প-স্বল্প অবাধ্যতার পরিচয় কয়দিন পাওয়া যাইতেছিল। ইংরাজ অফিসারদিগের বাংলার চালায় জ্বলন্ত তীর মারিয়া ঘরে আগুন ধরাইয়া দেওয়া উপর্য্যুপরি কয়দিন ঘটিয়াছে। এ কার্য্যে সিপাহীর হাত আছে। কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হইলেও তাঁহারা হাতে-নাতে এপর্য্যন্ত কাহাকেও ধরিতে পারেন নাই। সিপাহী ও কর্ত্তৃপক্ষের এই মনোভাব বিশেষ ভয়ের। সিপাহীরা চিঠি-চালাচালি করাইয়া টোটার জনরব চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে অনেকের বিশ্বাস। জনরব যে দৌড়ঝাঁপ করিয়া বেড়াইতেছে তাহার প্রমাণ দূরবর্ত্তী বহরমপুরেও সিপাহী-মহলে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। তথায় ১৯নং পদাতিক- একদল ক্যাভালরী এবং কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্য আছে। সবই দেশীয়, গোরা সৈন্য সেখানে নাই।"

এই সকল সংবাদ পাইয়া ডাঃ সূর্য্যকুমার স্বদেশস্থ আত্মীয়-স্বজনের জন্য ভাবনায় অধীর হইয়া পড়েন এবং সে কথা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবর্গকে জানান। ভয় অলীক, তাঁহারা এক-বাক্যে বলেন এবং সিপাহীদিগের উত্তেজনা ক্ষণিকের বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন। ব্যারাকপুরের সিপাহীদিগের পরামর্শে অন্যান্য স্থানের সিপাহীদের ঘোঁট বাধাইবার জন্য কোনও

চিঠিপত্র গাজীপুরে পৌছায় নাই। কিন্তু কানপুর, অম্বালা, অযোধ্যা, মিরাট প্রভৃতির সেনানিবাসে পত্রাদি পৌছাইয়া গোলমালের সৃষ্টি করিতেছিল। একথা সূর্য্যকুমারের তখন জানা ছিল না। গোলমালের খবর গাজীপুরের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌছাইয়াছিল কি না, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সূর্য্য-কুমারের সহিত কথোপকথন কালে বুঝা যায় নাই। সংবাদ পাইলেও সম্ভবতঃ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অবহেলা করেন। সিপাহীদিগের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা অসীম। তাহার বিশেষ পরিচয় তাহারা সে পর্য্যন্ত প্রভূত ভাবে দিয়াছিল। তাহারা যে 'বাজারে কথায়' নাচিয়া উঠিয়া রূপান্তরিত হইবে তাহা তাঁহারা ভাবিতেই পারেন নাই। আরও এক কথা, তেমন গোলমালের সূত্রপাত হইলে প্রধান সেনাপতি সিমলা শৈলাবাসে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। কলিকাতায় যাইতেন নিশ্চয়ই। তাহা যখন তিনি করেন নাই, ভয়-ভাবনার কোনও সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নাই। এই আশ্বাসেই বিভিন্ন স্থানের কর্ত্তৃপক্ষ সুস্থির হইয়া থাকেন।

ওদিকে কিন্তু বহরমপুরের সৈনিক দলকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য দলটি বারাকপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। পরের একখানি চিঠিতে সূর্য্যকুমার জানিতে পারেন—"বহরমপুরের সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য সিপাহীদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর রেঙ্গুণ হইতে এবং চীনে অগ্রসর গোরা সৈন্যের কলিকাতায় আসার গুজবে সিপাহীরা ত্রস্ত ও সমধিক উত্তেজিত। তাহাদিগের দ্বারা সিপাহীদিগকে জোর করিয়া নিষিদ্ধ টোটা ব্যবহার করান হইবে। না করিলে সামরিক আইনে কঠোর শাস্তি ভোগ বা মৃত্যুবরণ অনিবার্য্য। একদিকে ধর্ম্মহানি, অন্যদিকে প্রাণহানির ত্রাসে সিপাহীরা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য-প্রায়। কখন কি হয়, এই অবস্থার মধ্যে বারাকপুরের মঙ্গলপাঁড়ে নামক একজন সিপাহী ভাঙ খাইয়া সম্প্রতি ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়াছে। রাত্রিতে সেনানিবাসে উত্তেজনাজনিত গোলমালের অবধি ছিল না। তাহার কারণানুসন্ধানে ইউরোপীয় অফিসারেরা ব্যস্ত হয়। অকুস্থলে তাহাদের মধ্যে একজন (লেফটেনাণ্ট বক্) উপস্থিত হইলে মঙ্গলপাঁড়ে তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং আহত করে। অন্যান্য সৈনিকেরা অবশ্য মঙ্গলপাঁড়ের কার্য্যে যোগদান করে নাই বা মঙ্গলপাঁড়েকে নিরস্ত্র করিবারও চেষ্টা করে নাই। সেনাপতি হিয়ারসে ইহার পরে নিজে সশস্ত্র হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পাঁড়ে তাঁহার উপরও গুলি চালাইতে যায়, কিন্তু সহকর্ম্মীদের ঔদাসীন্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সেনাপতির উপর গুলি না চালাইয়া বন্দুকের মুখ ফিরাইয়া নিজের উপরই গুলি চালায়। তাহাতে সে ভূলুণ্ঠিত হয়। এখন সে হাঁস-পাতালে।"

পত্রের শেষে মঙ্গলপাঁড়ের বিদ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসী হওয়ার কথাও লিখিত থাকে। ৩৪ নং পদাতিকের সকলে মঙ্গলপাঁড়ের কার্য্যে উদাসীন থাকার জন্য সেই বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে, সংবাদ আসে। সেই সঙ্গে কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসী-বৃন্দের সিপাহীদিগের হঠকারিতার জন্য তাহাদের উপর তাহাদের বিরক্তির ইঙ্গিত ভূয়ঃ ভূয়ঃ পাওয়া যায়। পত্রে ইহারও আভাস থাকে যে, প্রধান সেনাপতি কলিকাতায় আসিয়া যাহাতে অসন্তোষের মূল উৎপাটিত করিবার আশু ব্যবস্থা করেন, তাহাই তাহাদের মনোগত ইচ্ছা।

প্রধান সেনাপতি তখন অম্বালায় ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৩৬ নং পদাতিক ছিল। টোটা ব্যবহার সম্বন্ধে ইহাদেরও মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। প্রধান সেনাপতির কানে সে কথা উঠিলে কাওয়াজক্ষেত্রে তাহাদিগকে উপস্থিত করাইয়া প্রধান সেনাপতি সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার কথা: পদাতিকদলের প্রভুভক্তি ও অতীত গৌরব অসামান্য। সেই প্রভুভক্তি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পদাতিক দল প্রাণপণ করিবে, তাঁহার স্থির বিশ্বাস। কোম্পানী কাহারও ধর্ম্মহানি করিবার কোন কল্পনাও করে নাই। টোটা সম্বন্ধে জনরব অমূলক। কেহ যেন তাহাতে আস্থা স্থাপন না করে। করিলে সমূহ বিপদ।

এই বক্তৃতা সত্ত্বেও সিপাহীদের ধর্ম্মহানিভয় দূর হইল না। নূতন টোটা ব্যবহার ব্যবস্থা স্থগিত রাখিবার মন্ত্রণা দেশীয় অফিসার, এমন কি কোনও কোনও ইউরোপীয়ান অফিসার দেওয়াতে প্রধান সেনাপতি তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার মনে হয়, এই টোটা ব্যবহার আপাততঃ স্থগিত রাখিলে মন্দ হইবে না। গভর্ণর জেনারল লর্ড ক্যানিং কিন্তু স্থগিতের পক্ষপাতী

হইলেন না। হইলে সিপাহীদিগকে অস্ত্র দেওয়া হইবে, তাঁহার মনে হইল। টোটা ব্যবহারবিধির নড়চড় সুতরাং হইল না। ইহাতে সিপাহীদের অসন্তোষ জমাট বাঁধিবার পথ হইল।

এইসকল কথা সূর্য্যকুমার ঠিক সেই সময়ে জানিতে না পারিলেও পরে তাহা জানিতে পারেন; তাঁহার দিনলিপি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায়। টোটা ব্যবহারে সমাজচ্যুতি ও জাতিচ্যুতি হইবার আশঙ্কায় সিপাহীদের চাঞ্চল্যের অবধি থাকে না। কূট-চক্রীরা নানা ভাবে সে চাঞ্চল্য বাড়াইয়া মঙ্গলপাঁড়ের ফাঁসী ও কলিকাতায় কোনও কোনও সৈনিক-দলের নিরস্ত্রীকরণ হওয়ার ঘটনা তাহাতে ইন্ধন প্রদান করে। সূর্য্যকুমার সহসা সংবাদ পাইলেন, অম্বালার সৈনিকদের প্ররোচনায় ইউরোপীয় সৈনিকনিবাস, মালখানা, ডাক্তারখানা প্রভৃতি কাহারা প্রায় নিত্য জ্বালাইয়া দিতেছে। ব্যারাকপুরের অগ্নিদান অম্বলাতেও প্রায় নিত্য চলিতেছে। অনিষ্টকারীর কাহাকেও ধরিতে পারা যাইতেছে না। ইহার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতি সিমলা শৈলে চলিয়া গিয়াছিলেন। অপরাধী বা অপরাধীরা ধরা না পড়ায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর তিনি বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করেন।

এই সময়ের মিরাটের অবস্থা সম্বন্ধে সূর্য্যকুমারের ডায়েরীতে যাহা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বিশিষ্ট কথা এই :

"সৈনিক-নিবাস সম্বন্ধে মিরাট একটী প্রধান স্থান। সৈন্যসংখ্যা তথায় প্রায় পাঁচ হাজার। ইহার মধ্যে ইউরোপীয়ের তুলনায় দেশীয় সৈন্যসংখ্যাই অল্প বেশী। অস্ত্রাগার, নূতন টোটা তৈয়ারীর আস্তানা ও মিলিটারি ট্রেনিং স্কুল সম্বন্ধেও মিরাটের প্রসিদ্ধি যথেষ্ট। ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈনিকনিবাস পৃথক পৃথক স্থানে দূরে অবস্থিত। কালী-নদীর একটি শাখা দুইটী নিবাসের মধ্যে প্রবাহিত। দুইটি নিবাসের দূরত্ব তাহাতে বাড়াইয়া দিয়াছে আরও।

"ব্যারাকপুর প্রভৃতি সৈনিকনিবাসের ঘটনা-পরম্পরায় মিরাটের সৈনিকনিবাস চঞ্চল হইয়া পড়ে এমন এবং কোম্পানী বিদ্বেষসংক্রামক হইয়া পড়ে এভাবে যে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সামরিক ও অসামরিক অধিবাসীদেরও চঞ্চলতার অবধি থাকে না। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ মিরাটের মুখ চাহিয়া কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে ভারতীয়ের ধর্ম্মনাশের চেষ্টা তাহাদের মূল অভিযোগ খাড়া করিয়া সম্ভব-অসম্ভব কত কথা যে হাটে-বাজারে ঘুরিতে থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। নুন, চিনি, ময়দায় হাড়ের-গুঁড়া মিশান, ঘৃতে নিষিদ্ধ চর্ব্বি মিশান, দেশীয় যাহাকে-নয়-তাহাকে ধরিয়া "কেরেস্তানী" রুটি কৌশল করিয়া খাওয়ানর গল্প করিয়া বেড়ায় জনে জনে। কোম্পানীর এসব কারসাজি ভারতীয়ের জাত মারিতে—রব উঠিল যত্র তত্র। কোম্পানী দেখিল, 'তোকে ছাড়িয়া উহারা মোকে' ধরিতেছে। ইহার প্রতিবিধান করা আশু কর্ত্তব্য। কোম্পানী প্রতিবিধান করিতে তৎপর হইল।

"প্রতিবিধান কিন্তু কি করিয়া করা যায়। ভূতের হাওয়ায় যেন কথা চালা-চালি হইতেছে। ধরা যায় কাহাকে? "মার্শাল-ল" জারি করিলে কি হয়। অগ্নিতে তাহা ঘৃতাহুতি স্বরূপ হইবে ভাবিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিতে ইতস্ততঃ করে। ব্যারাকপুরে যখন প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল মনোযোগী হইয়া তখন তাহা নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিলে সহজেই শুভ হইত। সে সময় এখন উত্তীর্ণ। সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করার চেষ্টা ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় নাই। কর্ত্তৃত্বের শিখরে যাঁহারা, এই নীতি অনুসরণের উপদেশ অধস্তন কর্ম্মচারীদের তাঁহারা দেন। কার্য্যকালে কিন্তু এ নীতি—সম্যক্ অনুধাবন করা সকল সময়ে সম্ভবপর হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে কর্ম্মচারীদিগের ধীরতার দৃষ্টান্ত বিপক্ষের কাছে কোম্পানীর ভয় পাওয়ার চিহ্ন বলিয়া অনুমিত হইল। তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল সেই অনুপাতে।

"এ অবস্থায় সামরিক সম্প্রদায়ে অনুবর্ত্তিতা-জ্ঞান রক্ষা করা কঠিন। সিপাহী সামলাইতে কোম্পানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। টোটার গোলমালে তাহারা অশান্তচিত্ত। নূতন টোটার ব্যবহার স্থগিদ রাখিতে কোনও কোনও কর্ম্মচারী পরামর্শ দিল। এ পরামর্শ গ্রহণে সিপাহীদের ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যাইবে সুতরাং ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিবর্গের সে পরামর্শ মনঃপূত হইল না। সিপাহীদিগকে সমবেত করাইয়া বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগকে বুঝান—রটনা মিথ্যা, এই পন্থা গ্রহণই নির্দ্ধারিত হইল। মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহী দলকে লইয়া এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়। কুচকাওয়াজের মাঠে এই দলটির

পঁচজন দেশীয় অফিসার ভিন্ন বক্রি ৮৫ জন সৈনিক টোটা ব্যবহার করিবার আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকার করে। ফলে তাহারা দীর্ঘকালের জন্ত কারারুদ্ধ হয়। 'ঝিকে মারিয়া বৌকে শিখাইবার মত' দণ্ডপ্রাপ্ত সৈনিকদিগকে সর্ব্বসমক্ষেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। প্রকাশ্য ভাবে অপরাধী-দিগকে এইরূপ করার জন্ত ভারতের প্রধান সেনাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সে কথা তখন কে শুনিবে? কোম্পানীর বিরুদ্ধে আর এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার এমন সুযোগ কি বিরূপ সিপাহী তখন ছাড়ে! স্কুলে-স্কুলে তাহা প্রচারিত হইতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে। কূপাদিতে গো ও শূকরের হাড় ফেলিয়া হিন্দু ও মুসলমানের জাত মারিবার চেষ্টা কোম্পানী করিতেছে, রটিয়া গেল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে হাতে হাতে 'চাপাটি' ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাপাটি সম্বন্ধে সরকারী, বে-সরকারী নানা অভিমতের প্লাবনে আসল কথা কি কাহারও বোধগম্য হইল না। চাপাটি যাহাদের সৃষ্টি এবং সৃষ্ট দ্রব্যটি যাহাদের হাতে পড়া দরকার তাহারা ভিন্ন অন্ত কেহ ব্যাপার কি বোঝে—সাধ্য কি?

"পেশোয়ার পদগৌরবে বঞ্চিত নানা সাহেব বিঠুরে তখন বসবাস করিতেছিলেন। সিপাহীর অসন্তোষ পাকা-পাকি রকমের দাঁড়াইবার উপক্রম করিলে যমুনার নিকটবর্ত্তী কাল্পী হইয়া দিল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া এই সময়ে তিনি লক্ষ্ণৌয়ে উপস্থিত হন। অযোধ্যার কমিশনার স্যার হেন্‌রি লরেন্স তাঁহাকে মহাসমাদর দেখান। [illegible] হইয়া নানা সাহেব কাণপুরে গমন করেন। নানা সাহেবের সহিত অসন্তুষ্ট সিপাহীদের গুপ্ত সংযোগ [illegible] আছে অনেকে বলিলেও তাঁহার বিঠুর ত্যাগ ও দেশদেশান্তর গমনে কোনও বাধা কোম্পানী দেয় নাই। বিরুদ্ধ [illegible] কথা উঠিলেও নানা সাহেব কোম্পানীর বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট সিপাহীদের শান্ত ও সংযত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা [illegible]ন। ইহাতেও অনেকে বলে নানা সাহেবের এ ওপর চা[illegible]ল, তলে তলে নানা সাহেবের উত্তেজনাতেই সিপাহী উত্তে[illegible]জিত। চাপাটি অভিযানও তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত।"

অযোধ্যাও সংক্রাম[illegible]ক ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সূর্য্যকুমার ডা[illegible]রীতে বলিতেছেন:

"ব্যারাকপুরের ৩৪ নং পদাতিক দলের ঈশ্বর পাঁড়ের ফাঁসী হইবার পরে পদাতিক দলটি শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে কর্ম্মচ্যুত ও অপমানিত সিপাহীরা স্বদেশ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসে। স্বদেশে ফিরিয়া তাহাদের প্রায় সকলেই কোম্পানীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। শাস্তিপ্রাপ্ত ১৯নং সৈনিক দলও অযোধ্যার লোক। তাহারা প্রতিহিংসাপরায়ণ এই পূর্ব্ব সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করিল। অযোধ্যার ৭নং সৈনিক দলে টোটার অজুহাতে ক্রমে ঘোর অসন্তোষ দেখা গেল। অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবা মাত্র স্যার হেন্‌রি এই সৈন্যদলকে নিরস্ত্রীকরণ করেন। ৪৮নং সৈনিক-দলের মধ্যে অসন্তোষ-বহ্নি ধূমায়িত—স্যার হেনরির জানা ছিল। অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইতেছে বার বার নিরস্ত্রীকরণ পন্থা গ্রহণ উচিত নহে ভাবিয়া স্যার হেনরী এই সৈনিক দলকে স্থানান্তরে প্রেরণের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশেষ বিবেচনায় তাহা করাও যুক্তিযুক্ত তিনি মনে করিলেন না—যেখানে ইহারা যাইবে ইহাদের প্ররোচনায় সেই স্থানের সিপাহীদের বিগড়াইয়া যাইবার ভয় যে রহিয়াছে! অযোধ্যাতেই ৪৮নং দল সুতরাং রহিয়া গেল অন্য পন্থা তিনি অবলম্বন করিলেন। দেশীয় অফিসারদিগের সহিত মেলা-মেশা করিয়া আদর আপ্যায়নে ও পুরস্কারদানে তাহা-দিগের সন্তোষ বিধান করিয়া সিপাহীদের বিরুদ্ধ ভাব অনেকাংশে দমন তিনি করিলেন। মিরাটের তুলনায় অযোধ্যার অবস্থা বেশ আশাপ্রদ দাঁড়াইল।"

সূর্য্যকুমারের অভিমত, 'স্যার লরেন্সের বিবেচনা-শক্তিই অযোধ্যার অবস্থা আশাপ্রদ করে।' হইলে কি হইবে সহসা মিরাটে আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কারারুদ্ধ সিপাহীদের তাহাদের সহযোগিগণ বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল। ১১নং ও ২০নং সৈনিকদল তাহাদের সহিত যোগদান করিল। মিরাটে অবস্থিত সমস্ত সিপাহী এখ[illegible] একজোট। অসামরিক যাহারা তাহারাও আসিয়া ভি[illegible] বাড়াইল। ঘটনাকাল অপরাহ্নের শেষভাগ। সেন[illegible] নিবাস হইতে ৩নং অশ্বারোহী দল কারারুদ্ধ সৈনিকদিগ[illegible] মুক্ত করিতে যখন বহির্গত হয় তাহার অনতিবিলম্বে বহির্গ[illegible] সেনাদলের অধ্যক্ষের নিকট সে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল দূরে অবস্থিত ইউরোপীয়ান সেনানিবাসে সংবাদ পৌঁছাই[illegible]

যতটুকু বিলম্ব ঘটে এবং ইয়োরোপীয়ান সৈনিক দলের সাজ-সজ্জা করিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন তাহা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইলেও ৩নং সৈনিক দলের ক্যাপ্টেন ক্রেসী ব্যতীত উন্মত্ত সিপাহীদিগের সম্মুখীন হইতে অন্য কাহাকেও দেখা যায় নাই। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ গোরা সৈন্য যখন অবতীর্ণ হয় তখন নানাস্থানে অভাবনীয় অনিষ্ট সাধিত হইয়া গিয়াছে—সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। গোরা সৈন্য দেখিল, সিপাহী সৈন্য-নিবাস শূন্য, কাওয়াজের মাঠেও কোনও সিপাহী নাই। কয়েকজন সিপাহী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গোলা বর্ষণ হইল। তাহারা সন্ধ্যার আবহাওয়ায় মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। ওদিকে ইউরোপীয়ান সৈন্য-নিবাস সিপাহীরা তখন জ্বালাইয়া দিতেছিল। দূর হইতে গোরা সৈন্য তাহা দেখিল। অগ্নি নিবারণ করা তখন অসাধ্য; রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। অন্ধকারে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সিপাহীরা কিন্তু সৈন্য-নিবাস জ্বালাইয়া দিয়া অফিসার ও অসামরিক অন্যান্য শ্বেতাঙ্গের গৃহলুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিপ্রদান ও নরহত্যাজনক নৃশংস কার্য্যে লিপ্ত থাকে। সেই বিপদসঙ্কুল সময়েও শ্বেতাঙ্গদিগের রক্ষার উদ্দেশ্যে বহু বিশ্বস্ত দেশীয় সৈনিক ও ভৃত্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে পশ্চাদপদ হয় নাই।

পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে যদুনাথের 'তীর্থ-ভ্রমণ' হইতে উদ্ধৃত মিরাটের ঘটনার সম্পর্কে সিপাহীদের দিল্লী অভিমুখে যাত্রার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রাত্রিযোগে মিরাট তছনছ করিয়া সিপাহীরা আঁধারে আঁধারেই দিল্লী যাত্রা করে। সুর্য্যকুমার বলিতেছেন, 'সিপাহীরা মিরাটে সম্মুখ যুদ্ধ করে নাই। গভর্ণমেণ্ট পক্ষের অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দস্যুবৎ আচরণে তাহারা মিরাট প্রকম্পিত করে। পরদিনে বাজার, হাট, পথঘাট ও লোকাবাসে আতঙ্কের মধ্যে যখন সকলে অবস্থিত শ্বেতাঙ্গের মধ্যে যাহারা প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা ইয়োরেপীয়ন ক্যাভালরী (cavalry) নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্যাভলরী-নিবাসের দিকে পূর্ব্ব রাত্রিতে সিপাহীরা যে কারণেই হউক হানা দেয় নাই। সিপাহীরা মিরাট দখলের কল্পনা করে নাই। করিলে ইয়োরোপীয় সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। তাহাতে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে হওয়াতেই দস্যুবৃত্তি করিয়া তাহারা অচিরে স্থান ত্যাগ করে।

মিরাট-ত্যক্ত সিপাহীদিগের সহিত দিল্লী যাইবার পথে গবর্ণমেণ্ট-বিদ্বেষী কিন্তু অসামরিক অনেক উত্তেজিত ব্যক্তি যোগদান করে। তাহারা দিল্লীতে পৌঁছাইলে স্থানীয় প্রায় সকল সিপাহী দল তাহাদের সহিত যোগদান করে। দিল্লীতেও সিপাহীদের যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তাহারা দিল্লীর সম্রাটের নামে দিল্লী দখল করিয়া বসে। দিল্লীর ঘটনা সম্বন্ধে সেই সময়ে সুর্য্যকুমার কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংবাদ সংক্ষিপ্ত ভাবে এই:

দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুর সাহেব নামে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে কোম্পানী বিদ্বেষী যাহারা তাহারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে নানাকথা রটাইতেছিল। সে সকল রটনার মধ্যে পারস্যাধিপতির ভারতবর্ষ আক্রমণ, সিপাহীদের কোম্পানীর বিরুদ্ধে আরও উল্লাসের নিশ্চয়তা প্রভৃতি চমকপ্রদ কথা থাকিত। ক্রমে ব্যারাকপুর, কানপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে সিপাহী-সংঘটিত অতিকল্পিত সংবাদ দিল্লী তোলপাড় করিয়া তোলে। সেই অবস্থায় মিরাটের ঘটনা 'মনসায় ধুনার গন্ধ'-এর ন্যায় দাঁড়ায়। মোগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠি হইবার স্বপ্ন দেখে অনেকে। বাহাদুরশাহ স্বয়ং কিন্তু নির্লিপ্ত ছিলেন অনেকের অভিমত।

৩৮, [illegible]৪, ৭৪নং সিপাহী সৈন্য ঘটনা কালে দিল্লীতে অবস্থিত থাকে[illegible]। এই তিন দলের সৈন্যসংখ্যা মোট চারি হাজারের কাছা[illegible]কাছি। গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় দেড়শত। ইংরা[illegible] সৈনিক পুরুষ ৫০,৬০ জন মাত্র। ১০ই মে মিরাটে বিপ্লব ঘটে[illegible]। ১১ই মে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত দিল্লীর [illegible]ক্ষের কেহ সে সংবাদ পায় নাই। কেহ অন্ততঃ সরকার প[illegible]গ্রামের তার সিপাহীরা কাটিয়া মিরাট ও দিল্লীর মধ্যে টেলি[illegible] দেওয়াতে সংবাদ পৌঁছে নাই। [illegible] ১১ই মে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত দিল্লীর তিনটি দলের [illegible] কুচকাওয়াজ হইয়া যায়। সিপাহীরা সহজভাবেই তাহাদের [illegible]ওয়াজ করে। ইহার পরে বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময়ে [illegible]য় মিরাট হইতে ৩নং অশ্বারোহী দল এবং তৎপরে প[illegible]দাতিক দল বলিয়াজ মাট দরওয়াজা দিয়া দিল্লীতে প্রবেশ [illegible] করে। তখন হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। দিল্লীর অনেক মুসল[illegible]মান এবং গুজরদিগের সকলে আগন্তুকদিগের দলবৃদ্ধি করে। [illegible] দিল্লীর সিপাহী দল

ওদিকে নানাদিক্ দিয়া মিরাটের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান হয়। উৎসাহভরে তাহা করিতে অগ্রসরও হয়। কার্য্যকালে কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া বিপক্ষের সহিত তাহারা মিশিয়া যায়। তাহাদের ইংরাজ অফিসরেরা মিরাটের সৈন্যের হস্তে হত হয়। রণোন্মত্ত সিপাহীরা কমিশনার ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন ডগ্‌লাসকেও সপরিবারে হত্যা করে তাঁহাদের আবাসে।

উন্মত্ত সিপাহী ক্রমে দিল্লীর ইংরাজ পল্লী দরিয়াগঞ্জে হানা দিয়া দিল্লীর ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন ও বিনষ্টকরণ, 'দিল্লী গেজেট' সংবাদপত্রের কার্য্যালয় ধ্বংসকরণ, ও যুদ্ধে কাজে লাগাইবার জন্য টাইপ লুণ্ঠন করতঃ শ্বেতাঙ্গ হত্যাভিযানে মাতিয়া উঠে। তাহাদের গৃহাদি লুণ্ঠন ও তাহাদের গৃহে অগ্নিপ্রদানকার্য্য অবাধে চলিতে থাকে। সিপাহীদিগের দিল্লী আক্রমণের পরক্ষণেই ঘর ছাড়িয়া অনেক শ্বেতাঙ্গ স্থানান্তরে যাইয়া দিল্লীবাসী দেশীয়ের সাহায্যে রক্ষা অবশ্য পায়। রাত্রিযোগে তাহারা দিল্লীবাসীরই সাহায্যে দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে সমর্থ হয়। বিদ্রোহীদিগের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি থাকিলে শ্বেতাঙ্গ কাহারও দিল্লী ছাড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর হইত না। অধিকন্তু তাহাদের কেহ বিপদে কোনও শ্বেতাঙ্গকে আশ্রয়ও দিত না।

দিল্লীর অস্ত্রাগার প্রচুর কামান, বারুদ, গোলাগুলিতে পরিপূর্ণ ছিল। উইলোবি এই অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ। সিপাহীরা এই অস্ত্রাগার দখল করিতে অগ্রসর হইলে উইলোবি ৮জন ইংরাজ সহকারী সহযোগে বহুক্ষণ সিপাহীদের বাধা দেন। সিপাহীদের বাধা দেওয়ার শক্তি যখন হ্রাস পাইল, অস্ত্রাগার দখল যখন তাহারা করে তখন উইলোবির আদেশে একজন সহকারী অস্ত্রাগারের বারুদে আগুন লাগাইয়া দেয়। অস্ত্রাগার ভীমরোলে ফুটিয়া উঠে। আকাশ মণ্ডল ঘন ধূমে আচ্ছন্ন হয়। উইলোবির তিনজন সহকারী হত হয়। নিকটস্থ দিল্লীবাসীও ইহাতে হত হয় অনেক। উইলোবি ও তাঁহার পাঁচজন সহকারী কিন্তু বাঁচিয়া যান। সিপাহীদের সৌভাগ্যবশতঃ অস্ত্রাগারের সমস্ত অস্ত্র কিন্তু বিনষ্ট হয় নাই। অবশিষ্ট অস্ত্রাদি সিপাহীরা দখল করিয়া লয়—অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপিত হইলে।

দিবা অবসানের পূর্ব্বেই সমগ্র দিল্লী সিপাহীদের দখলে আসে। জয় ঘোষণা তাহারা করে দিল্লী সম্রাটের নামে।

জীবন অপরিমেয়

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

নৈরাশ্য কিসের বন্ধু? জীবনে তোমার
দুঃখ যদি আসে নামি' কী তাহাতে ক্ষতি?
জীবন যে দুঃখজয়ী, কালসিন্ধু মথি'
নিরন্তর যাত্রা তব মহাদূরপার।
বিপদ-বন্ধুর পথ সান্ত্বনা কোথায়?
কেন বা সান্ত্বনা চাহি, দেখিয়াছ বীর,
বিপদ বিস্ময়াহত ভয়ে নত শির
শক্তির ভ্রুকুটিভরা দৃপ্ত মহিমায়।

জীবন অপরিমেয়—বেদনা অপার
কণামাত্র ক্ষতি তার সাধিতে না পারে;
মানব জড়তামুক্ত আঘাতে তাহার,
নেহারে অমিত-শক্তি আপন আত্মারে।
দুঃখের ভূমিকা 'পরে মানব-জীবন
শোভিছে নিকষশায়ী কনক-লিখন।

CALCUTTA UNIVERSITY
Sen. No........
Book No........
LIBRARY.

স্থিতি ও গতি

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

"সে হবেক নি সায়েব, ওপরে যেতে পাববেক নি। মিসি দিদি শতেক বার ক'বে ব'লে দিয়েছে, ওপরে কাউকে এসতে দিবিক নি, খবর আমাকে না দিয়ে আর আমি না এসতে ব'ল্লে! ওমা! এ কেমন ভদ্দরেব রীত গো!—অবলা অবীরে একটা মেয়ে একলা থাকে আব অমনি গিয়ে ঘরে ঢুকবেক,—কোনও কথা সোনবেক নি।"

বলিতে বলিতে এলোকেশী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল, আর তার আগে আগে খটাখট্ একটা পাদুকা-শব্দও ধ্বনিত হইতেছিল।

সিঁড়ির উপরেই অপ্রশস্ত ছোট একটি বারান্দা। বারান্দার সম্মুখে দুখানি ঘর। একটি ঘরের দরজা খুলিয়া মীনা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

"মীনা!"

এলোকেশী কহিল, "এইত দেখ দিকি মিসি দিদি। শতেক বার ববে আমি বল্লু—"

"থাক্ এলোকেশী, মিছে আর গোলমাল ক'রোনা। এসেই উনি প'ড়েছেন, কোনও কথা মানলেন না, কি আর ক'রবে? যাও, তুমি ওদিকে গিয়ে ব'সো। আসুন মিষ্টার রায়, নমস্কার!"

"মীনা।"

এদিক্ ওদিক্ একবাব চাহিয়া মীনা কহিল, "আসুন মিষ্টার রায়, ঘরের ভিতরে এসে বসুন।"

মধ্য-কলিকাতাব এই বাড়ীখানির একটি অংশে দ্বিতলে ছোট একটি পাকের খোপব সহ পৃথক্ দুইটি ঘর ছিল; অমুতোষের সাহায্যে ভাড়া করিয়া মীনা আসিয়া এইখানেই আশ্রয় লইয়াছিল। বাড়ীওয়ালা নিজে এবং আরও দুই ঘর ভাড়াটিয়া এধারে ওধারে থাকেন। গোলমাল শুনিয়া মেয়েরা আর ছেলেপিলেরা কেহ কেহ উঁকি দিয়া দেখিতে-ছিল। মীনা তাই রবীনকে ঘরের ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

"মীনা! মীনা! আমার মীনা! আজ—আজ—সত্যই এ অবস্থায় তোমাকে এসে পড়তে হল, আর তাই আমাকে চোখে দেখতে হল! মীনা!"

চক্ষু দুইটি আর্দ্র, কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত, আন্তরিক একটা বেদনাই সে কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইতেছিল।

কয়েক পা একটু পিছনে সরিয়া ধীরভাবেই মীনা কহিল, "বসুন ওখানে, মিষ্টার রায়।"

হাতখানি বাড়াইয়া আবেগভবে রবীন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। থমকিয়া একটু পিছনে সরিয়া তখন চেয়াবখানি ধরিয়া দাঁড়াইল।

"মীনা!"

"বসুন মিষ্টাব রায়। এসেছেন—তা আপনার বলবার যা থাকে, ব'সে ধীরভাবেই বলুন।"

রুমালে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রবীন বসিল। মীনাও একটু দূরে আর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

"বলুন, কি বলতে চান আপনি।"

আবার একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া একটু ইতস্ততঃ কবিয়া রবীন্ আরম্ভ করিল, "বলতে যা চাই, যা চেয়েছিলাম, তোমার এই দারুণ নির্ম্মম দূর দূর কেবল এই ভদ্রতাটুকু—this mere cold courtesy—সব গুলিয়ে দিচ্ছে। এটা ঠিক আমি প্রত্যাশা করি নি, মীনা। এর চাইতে যদি তুমি আমায় গাল দিতে, দোর থেকেই দুব দুব করে তাড়িয়ে দিতে—"

"থাক ও সব কথা মিষ্টার রায়; বলতে কিছু চান বলুন। আর যদি নাই চান—"

"না না, চাই বই কি, চাই বই কি। যা ভেবে—যে ব্যবহারই আজ কর, আমার কথা আমাকে বলতেই হবে।"

"বলুন।"

একটু কাল নীরব থাকিয়া, চিত্তের উদ্বেল আবেগ যথা-সাধ্য চাপিয়া, অপেক্ষাকৃত কিছু ধীবভাবে রবীন তখন কহিল,

"সবই আমি শুনেছি মীনা। মিঃ মোকার্জ্জি হঠাৎ এইভাবে চ'লে গেলেন। তারপর কলকেতায় এসে এই বিপদে পড়েছ, একা—অসহায়—নিঃসম্বল।"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "কি করব? ভাগ্যে যখন যার যা ঘটে, তার সঙ্গে মানিয়েই তাকে চ'লতে হবে।"

"কোন্ অবস্থায় কতটা কে তা পারে তার একটা সীমা আছে। যতদূর বুঝতে পারি মীনা, মিষ্টার মোকার্জ্জির অমন আদরের মেয়ে তুমি—তাঁর সেই গৃহে আধুনিক উন্নত পরিমার্জ্জিত জীবনের যত কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতা হতে পারে, বাল্যাবধি অবাধে ভোগ করে এসেছ, কিছু দিতেই কার্পণ্য তিনি কখনও করেন নি, আর তার পর হঠাৎ আজ এত বড় একটা দুর্ভাগ্য—আর তার এই সব দুঃখ-ক্লেশ—কি করে তুমি তার সঙ্গে মানিয়ে চলবে, বুঝতেই পারছি নি মীনা।"

একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া মীনা উত্তর করিল, "চলতেই হবে যে করে হয়। উপায় ত কিছু নেই।"

"উপায়—উপায়—তা যাই বল মীনা, ধীরেশ কবে ফিরে আসবে জানি না, এসেই বা কি করতে পারবে বুঝতে পারছি নে। যাই সে পাকক, তোমার সেই পিতার অভাবে যেটা ঠিক তোমার এখন চাই ও যা নইলে তুমি বাঁচতেই পার না, সেটা সে তোমায় কখনও দিতে পারবে না।"

"সম্ভব নয়।"

"সম্ভব নয় কেবল কেন, নিশ্চিতই নয়।"

"কি করব? যা গেছে তা গেছেই। ফিরে আর কোথাও পেতে পারি না। বেঁচে যদি থাকতেই হয়, না পেয়েই থাকতে হবে।"

"কিন্তু তোমার বন্ধু কেউ জেনে-শুনে এই অভাবে—আরও এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখতে তোমাকে পারে না।"

"তেমন বন্ধু ত কেউ আমার নেই, মিষ্টার রায়।"

"আছে—আছে মীনা। বলবার মুখ আজ আমার নেই, অমার্জ্জনীয় যে অপরাধ করেছি, তার পর—তার পর—কোনও দাবীও আমি করতে পারি না। তবু যদি মার্জ্জনা কিছু করতে পার—"

"কেন আর ওসব কথা তুলছেন মিষ্টার রায়? আপনার অপরাধ—তা সে যাই হয়ে থাক, মনে আমি কিছু রাখি নি, রাখা উচিতও নয়। আপনিও ও সব মনে কিছু রাখবেন না।"

"মুখে ব'ললেই মন সে কথা মানতে চায় না। মন যা ভুলবে না, জোর করেও কেউ তাকে তা ভোলাতে পারে না। অনিবার্য্য কারণে ঘটনাচক্রে অকস্মাৎ যে বিচ্ছেদটা আমাদের ঘটল, সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে দূরে দূরে থাকা যদি সম্ভব হ'ত, তবু সে কথা ছিল আলাদা। কিন্তু আজ যে অবস্থা এসে ঘটল, তাতে যে সেটা সম্ভবই হচ্ছে না মীনা। এই দুর্ভাগ্যের দুর্গতিতে একা এমন অসহায় এ ভাবে তোমাকে ফেলে দূরে দূরে যে আমি থাকতেই পারছি নে মীনা।"

"থাকতেই যে হবে মিষ্টার রায়? কি আর আপনি এখন করতে পারেন।"

"অন্ততঃ—অন্ততঃ যদি একজন বন্ধু বলে আমার মনে করতে পার—পার না কি মীনা? সে দাবীও কি করতে আমি পারি না?"

কেমন একটা আশাময় আকুল দৃষ্টিতে রবীন চাহিয়া রহিল।

একটুকাল মৌন থাকিয়া মীনা শেষে কহিল, "দেখুন মিষ্টার রায়, একটা পরিচয় আপনার সঙ্গে ছিল ঘটনা-চক্রে সেটা শেষে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হয়েই ওঠে। তারপর—তারপর—বাবার ইচ্ছায় আর অনুমোদনে বিবাহসম্বন্ধও একটা স্থির হয়। সেটা ভেঙ্গে গেছে। যে কারণে ভেঙ্গে গেছে, সেটাও উল্টান যায় না। যে ব্যবধান এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা আপনি কি আমি কেউ আর লঙ্ঘন করতে পারি না। এ অবস্থায় বন্ধুত্বের কোনও সম্বন্ধ দূরে থাক্, সাধারণ ভাবে পরিচয়ের একটা সম্বন্ধও আমাদের আর চলতে পারে না। শোভনও সেটা—অন্ততঃ আমার পক্ষে—হয় না। লোকেও ভাল চক্ষে দেখবে না, কুকথাও অনেক বলবে। তাই আমার প্রার্থনা, সত্যই যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হন, আমার সঙ্গে দেখা করবারই চেষ্টা আর করবেন না জানবেন, তাতে আমার দুর্ভাগ্যের ভার বাড়বে বই কমবে না।"

গভীর একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রবীন কহিল, "কিন্তু কি করবে তুমি? একা অসহায় একটি বালিকা মাত্র তুমি,

কেবল তোমার ঐ এলোকেশীকে নিয়ে এখানে থাকবে—"

"কি করব? উপায় ত আর কিছু নেই। তবে—তবে—একেবারে অসহায়ও আমি নই। বাবার আফিসের কর্ম্মচারীরা রয়েছেন, তাঁরাই আমার তত্ত্বাবধান করছেন। দরকার মত সাহায্যও তাঁদের কাছে পাচ্ছি। আপাততঃ তাই যথেষ্ট।"

আবার কেমন একটা রক্তজ্বালা রবীনের চক্ষু-মুখ ভরিয়া জ্বলিয়া উঠিল। একটুকাল দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আফিসের কর্ম্মচারীরা—কে, কে কে তোমার তত্ত্বাবধান এখন করছেন? যিনি পারেন, তোমার পিতার প্রধান সহকারী সেই জানকীনাথ বাবু ত অতি অসুস্থ, বেরোতেই পারছেন না শুনলাম।"

"হাঁ, তিনি অসুস্থই বটেন, বেরোতেও পারছেন না। তবে আমার অভিভাবক এখন তিনিই। আর তাঁর উপদেশ মত তাঁরই একজন সহকারী, অমুবাবু দেখাশুনো যা দরকার তাই এখন করছেন।"

"কে এই অমুবাবু?"

"ঐ আফিসেরই একজন কেরাণী। জানকীনাথ বাবুর প্রধান সহকারীই এখন তিনি। বাবারও বড় একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।"

"শুনেছি, বয়সে সে একটা ছোকরা মাত্র।"

একটু ভ্রূকুটি মীনার ললাটে দেখা দিল। কিন্তু ধীর ভাবেই উত্তর করিল, "বয়স খুব বেশী নয়। এই দাদার চাইতে কিছু বড় হতে পারেন।"

"একা একটি মেয়ে তুমি এখানে রয়েছ, আর আফিসের একটা কেরাণী এই ছোকরা আসছে যাচ্ছে, দেখা-শুনো করছে, সেইটেই কি খুব শোভন হচ্ছে মীনা?"

"অন্ততঃ আপনার আসা-যাওয়া দেখা-শুনোর চাইতে বেশী অশোভন কিছু হচ্ছে না। যাক, এসব নিয়ে কোনও আলোচনা আপনার সঙ্গে করতে আমি চাই না। এরকম কোনও প্রশ্ন করবার কোনও অধিকারও বোধহয় আপনার নেই। যাক, তাহলে আসুন এখন, নমস্কার।"

"বটে! আচ্ছা, দেখব তবে।"

বলিয়াই গম্ গম্ করিয়া রবীন বাহির হইয়া গেল।

২৯

আরক্ত মুখে মীনা কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর উঁকি দিয়া একবার দেখিয়া পাশের ঘরটির দরজায় একটা ঘা দিল। ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ ছিল। খুলিয়া বিন্দুমতী বাহির হইয়া আসিল।

"উনি গেছেন ত নেমে?" বলিয়া ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে একবার উঁকি দিয়া চাহিল।

"গেছেন।"

"ফিরে আবার এখুনি আসবেন না ত?"

"সম্ভব নয়, আজই এখুনি। আর এলেই বা কি? ভয় কি তোর? আস্ত ধরে অমনি গিলে খেয়ে ত ফেলবে না তোকে?"

"না, না, ভয়ের আর এমন কি? তবে বড় লজ্জা করে। আর তোর—"

"আমার কি? আমি বরং সুখীই হব যদি ফিরে আবার আসে আর তোকে এখানে এসে দেখে।"

বিন্দু একটা নিশ্বাস ছাড়িল।

"ব'স্ তুই এখন। ভয় নেই কিছু। হাঁ, উনি কখন আসবেন—এই তোর শ্বশুর—তোকে নিতে?"

"বলেছিলেন ত অফিস থেকে ফিরবার পথে আমাকে অমনি তুলে নিয়ে যাবেন।"

"ও, ছটার আগে তা' হলে বোধ হয় আসছেন না। আধ ঘণ্টার উপর সময় তবে আছে। তা ব'স্ তুই, ব'স্। আয়, এই চৌকিটার ওপরেই বরং দুজনে বসি।"

এক ধারে একখানি তক্তপোষ ছিল, উভয়ে গিয়া তাহার বসিল।

"কি, অত ভার-ভার কেন রে? কি ভাবছিস্ বল দিকি?"

কেমন একটু কুণ্ঠিত ভাবে বিন্দু কহিল, "ভাবছি—ভাবছি—তা কিছু মনে করিস নি মীনা, উনি যে এসেছিলেন সেটা এমন অন্যায় কিছু হয় নি। হঠাৎ এত বড় একটা বিপদে তুই পড়েছিস, হয় ত মনে করেছেন, একটা খবর নেওয়া উচিত; সত্যি যদি কোনও সহায়তা ওঁকে দিয়ে তোর হতে পারে—সেটাও দেখতে হয় একবার। এসেছেনও

সম্ভব কলকাতায় ফিরে এইটে ভেবে। নইলে হয়ত অমনি বিলেত চলে যেতেন।"

"হতে পারে। মনেও এটা করতে পারেন। তা উচিত ছিল একখানা চিঠিতে আমাকে ওঁর কথা সব জানান। তা বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে হুড়মুড় এসে উঠলেন—আর এসেই অমনি—থাক্, আর কাজ নেই ও-কথায় বিন্দু।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিন্দু কহিল, "তবে কি না—একটা টান ত ছিল এখনও হয়ত আছে।"

"থাকলে সেটা এখন দমন করে রাখাই উচিত।"

"ভাবছি যদি না পারেন, আবার যদি এসে একটা জুলুম টুলুম কিছু করেন—অভিভাবক কেউ নেই—এক একটা মেয়ে তুই—"

"সেটা আমিও ভাবছি। শিষ্টতার সীমা যদি একদম ছাড়িয়েই উনি যান কি করব আমি তখন? একটা রাগের ভাবও কথায় লক্ষ্য করলাম—একেবারেই অযথা—কার কাছে কি শুনছে জানি না—তবে মনে বেশ একটা রিষের বিষ এসে ঢুকেছে।"

"বয়েস অল্প, অভিভাবক কেউ ছাড়া একা একটা মেয়ের এভাবে থাকাটাই নিরাপদ নয় মীনা। শ্বশুর মশাইও সর্ব্বদা তাই বলেন।"

"কি করব বিন্দু? কেউ—কেউ যে আমার আর নেই। আবার রেজিনার ঐ ভাই ভিক্টরও পরশু এসেছিল। এসে খবর পাঠায়, আমিও ভদ্রতার খাতিরে আসতে বললাম। তা লোকটি কথাবার্ত্তায় বেশ ভদ্র, বোনের এই ব্যবহারে অনেক দুঃখও করল। তাকে দিয়ে কোনও সহায়তা যদি আমার হয় করতে সে প্রস্তুত, একথাও বেশ শিষ্ট বিনীত ভাবে জানালে। কিন্তু আমার যেন কেমন ভালই লাগে না ওকে। আর চোখের চাউনিটা—কেমন একটা ভাবে তাকায়—যেন কেমন কেমন লাগে আমার। আবার শুনেছি, নিজেও একটু আভাস দিয়েছিল কোন্ সিনেমায় কাজ করে। আমাদের ঐ ছাই নাটকটার ছবি যখন তোলা হয়, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখেছে তাও বললে।"

"হুঁ। তা যখন তখন যদি আসে—"

"আসতে কেন দেব? কড়া ভাবে তখন নিষেধ করেই দিতে হবে।"

বিন্দু কহিল, "একটা কথা ভাবছিলাম কি মীনা, শ্বশুরমশাইও বলছিলেন।"

"কি?"

"পড়াশুনোই করিস কি কাজকর্ম্মই করিস—সেই কাজ কর্ম্মই বা কি করতে পারবি তুই জানি না—তা সে যাই হক, একা এ ভাবে কি করে তুই থাকবি? এই সব উৎপাতও ত এসে জুটবে।"

"তা কি ভাবছিলি তুই? উনিই বা কি বলছিলেন? একা এ অবস্থায় আপনাকে রক্ষা করে চলা শক্ত তাও বুঝি। কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা কি হতে পারে?"

"আচ্ছা, ধর্ তোর যদি বিয়ে এখন কোথাও হয়—হতে কি পারে না মীনা?"

একটু হাসিয়া মীনা কহিল, "বিয়ে! কি ক'রে হবে? কে করবে বিয়ে? কেই বা দেবে? নিজে কি রাস্তায় রাস্তায় একটা বর খুঁজে বেড়াব?"

"পাগল! তা কে বলছে? তবে দেখে শুনে দেবার লোক আছে; তোর যদি আপত্তি কিছু না থাকে।"

"থাক্ ওসব কথা এখন বিন্দু।"

একটি নিশ্বাস মীনা চাপিয়া নিল। মুখে মৃদু একটু হাসিও ফুটিল।

বিন্দু কহিল, "তোর বাবার আফিসের জানকীনাথ বাবুকে শ্বশুরমশাই জানেন। এখনও তিনি অসুস্থ, আফিসে বেরোতে পারেন না। তা শ্বশুরমশাই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলেন।"

"তোর শ্বশুরমশাই—এত দয়া আমাকে করেন? কেন করেন? দয়ার কোনও কারণই ত দেখতে পাই না। বরং সুনজরেই তিনি আমাকে দেখতে পারেন না।"

"বড় বেশী সুনজরেই এখন দেখেন। আর দয়া? বলব কি মীনা, তোর বাবা যে একা অসহায় এই অবস্থায় তোকে ফেলে হঠাৎ চলে গেলেন, সেই অবধি যেন নিজের মেয়েটির মতই তোকে দরদ করেন। যদি সম্ভব হত, মেয়েটির মত নিজের ঘরে নিয়েই তোকে রাখতেন। বোম্বে থেকে ফিরে এসে অবধি তন্ন তন্ন করে তোর খবর সব নিচ্ছেন। তারপর এই ক'দিন হল জানকীনাথ বাবুর সঙ্গেও গিয়ে দেখা করেছেন। অনেক কথাও তাঁদের হয়েছে। দুজনেই ওঁরা বলেন—"

"কি, একটা স্বামী কারও হাতে যেতে পারলেই আমি নিরাপদ হব?"

"নিরাপদ কেবল নয়। মেয়ে-জীবনও তোর সার্থক হবে, যদি—যদি—"

"যদি তাই হবে বুঝে স্বেচ্ছায় কারও হাতে যাওয়াটা আমি বরণ করে নিই। কিন্তু হাতে নিতে আমাকে কে আসছে? এই যে একটা কলঙ্কের দাগা আমার নামে পাকা হয়ে রয়েছে—"

"ওঁরা ত বলেন, ওতে কিছু আটকাবেনা। এমন লোকও থাকতে পারে, যে বুঝবে সত্যি কোনও কলঙ্কের কারণ তোর হয় নি। তবে তোর মত না হলে ত কিছুই তাঁরা করতে পারেন না।"

"না, মত আমার নেই বিন্দু। তাঁদের নমস্কার জানাচ্ছি। দয়ার পার নেই তাঁদের। তবে—তবে—ওসব কথা ভাবতেও এখন কিছু পারছিনি। ভালও লাগছে না।"

"না, আজই যে তোকে একটা মত দিতে হবে, আর কাল অমনি টপ করে বিয়ে হয়ে যাবে, এটা কেউ বলছে না। তবে তুই ভেবে দেখ। যদি—যদি—মনটাকে তৈরী করে নিতে পারিস। আর—আর—তোর মন ত তুই জানিস—সত্যি যদি কোনও বাধা না থাকে—"

কেমন একটু আনমনা ভাবে ধীরে ধীরে মীনা কহিল, "বাধা - বাধা—কিসের বাধা?"

বিন্দু কহিল, "মেয়ে মানুষের সব চেয়ে বড় বাধা যা হতে পারে। জানি না—তবে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, খোলাখুলি সেভাবে মেলামেশাও কত দিন ক'রেছিল। সেদিন বলছিলিও ভাল ওঁকে বেসেছিস—"

গম্ভীর ভাবে কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে মীনা শেষে কহিল, "কিছুই বুঝতে পারছিনি বিন্দু। সেদিন থেকে অনেক ভেবেছি, মনটাকে বুঝতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু বুঝতে ঠিক এখনও পারছিনি বিন্দু। ভাল ওকে খুব লাগত, মনে হ'ত ভালই বেসেছি।' বিয়ে হবে স্থির হয়েছিল, জানতাম স্বামী-স্ত্রী আমরা হব, মেলামেশাও তারপর অনেক করেছি। কিন্তু তার সম্ভাবনা হঠাৎ একদিন সব চুকে গেল। বুঝলাম কোনও সম্বন্ধই তার সঙ্গে জীবনে আমার হতে পারে না। মনটাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি বিন্দু। যাকে আমরা ভালবাসা বলি, বুঝতেই পারছি নি, সেটা কি? একটা চোখের নেশা, মনের একটা টান। কিন্তু সে টানটা কি বস্তু? তার গোড়ার বাঁধন কি? যদি শ্রদ্ধা হয়, সে শ্রদ্ধা আমার নেই। চোখের নেশাও কেটে গেছে। মনের টান—সেইটেই বা কতটা কি আছে, ঠিক ধরতে পারছি নি। তার কথা মনে হ'লে সুখী হই না, দেখেও তাকে আজ সুখী হই নি। কিন্তু তবু যে-চোখে তাকে একদিন দেখেছিলাম, যে টানে মনটা তার পানে টেনেছিল, সে চোখে যে আর কাউকে দেখতে পারব, সে টানে মনটা আর কারও পানে টানবে, সেটা ত মনে হয় না বিন্দু। যদি কখনও আপনা থেকে হয় হবে। কিন্তু যদি না হয়, যতদিন না হয়, বিবাহ কাউকে করতে পারব না, ভাবতেও সেটা পারি না। আজ আমি অসহায়, রক্ষা করবার কেউ নেই, কেবল তাই বলে, দয়া করে কেউ হাতে ধরে নিতে চাইলে, সেই নেওয়াটা স্বীকার করে নেওয়া, না, বিন্দু, সেটা—সেটা বড় একটা হীন কাজ আমার পক্ষে হবে। আর যিনি নেবেন, স্ত্রী হয়ে তাঁকে যা দেবার, সেটা যদি না দিতে পারি, তবে কি ব'লে কি দাবীতে তাঁর ঘরে যাব? আমার রক্ষণাবেক্ষণের সকল দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপাব?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিন্দু কহিল, "আচ্ছা থাক তবে এখন ওসব কথা। দেখ, মনটাকে আরও ভাল করে বুঝে দেখ, দেখ কাউকে আর সে চোখে দেখতে পারিস কি না, কারও ওপর সে-টান মনে জেগে ওঠে কি না।"

বাহিরে তখন কড়া নড়িল। এলোকেশী আসিয়া জানাইল, "ঐ দিদিমণির গাড়ী আসিয়াছে।"

বিন্দু তখন উঠিল। এলোকেশী সঙ্গে গিয়া তাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

এলোকেশী ফিরিয়া আসিল, হাতে একটা থ'লে ছিল; থ'লের মধ্য হইতে একটি কৌটা বাহির করিয়া মীনার সম্মুখে রাখিল; কৌটার মধ্যে ছিল একজোড়া জড়োয়া ব্রেসলেট।

মীনা কহিল, "কি হ'ল? কত দাম ব'ললে?"

"কপাল আমার। দাম আর কি ব'লবেক? নিতেই ত

চাইলেক নি কেউ। জড়োয়া গয়না—কুচি কাচি কতকগুলো পাথর, দামই কিছুই হবেক নি, কিনবেই নি কেউ—কোনও কাজে কারও লাগবেক নি। সোনা যা আছে' নীরেস সোনা—গালালে কিছুই থাকবেক নি। দাম তার আর কি হবেক ?"

"সে কি ? হাঁ, সোনাটুকু নীরেস হ'তে পারে। কিন্তু পাথরগুলো ত আর ঝুটো নয় ; খাঁটি ব'লেই ত জানি।"

"সে ত বল্লে ক'ত ক'রে। তা ব'ললেক ঐ সব কুচি কাচি—কোনটা ঝুটো, কোনটা খাঁটি, কে এখন জহরীর বাড়ী গিয়ে গিয়ে পরখ করে বেড়াবেক ? খাঁটি হ'লেও ওসব কুচি-কাচি কাজে কারও লাগবেক নি। নতুন গয়নায় কোনওটা লাগানও যাবেক নি—সে সব গয়না বুঝে, মাপ মত তৈরী ক'রে নিতে হয় গো—যে যেমন চায়। ব'ললে, ওসব আমরা নেবো নি কেবল সোনার গয়না কিছু থাকে ত নিয়ে এসবেক—গিনী না হক খাদ কি পান-মরাতেও ক্ষেতি নেই। গালিয়ে ক'ষে দেখতে পারি ভরী কত হবেক।"

"কি সর্ব্বনাশ। সোণার গয়না আর কি এমন আছে ?"

"আছে ত হাতে ঐ কটা ক'রে সরু চুড়ী আর গলায় নিকনিকে ঐ হারটুকু বারমাসের ঘরন্যাভারী। মোটা সোটা ভারী গয়না ত তোমারা কাঠি দিয়েও ছোবেক নি। আর ঐ বেচে শেষে কি কেবল কাচের চুড়ী পরে আর পুঁতির মালা গলায় দিয়ে থাকবেক। জড়োয়া যে গুলো আছে সদাসর্ব্বদা কিছু গায়ে পরে থাকতে পারিবেক নি। পাথর-টাতরগুলো খ'সে প'ড়ে সে-যা ছিরি তখন হবেক। আর কত ভরী সোণাই বা ওতে র'য়েছে—বিক্রী করে কত আর আসবেক—ক'দিন তাতে চ'লবেক ?"

"হু। ওতে আর কত সুসারই বা হবে। না হয় খালি হাতে খালি গলায়ই থাকতাম। কিন্তু—"

"খালি গলায় খালি হাতে থাকবেক। ও মা, সে কি কথা। মিসি দিদি। তোমরা কিছু মান না মান, একটা অলক্ষণ ত বটেক। সে আমি চোখেও দেখতে পারবেক নি—বল্লু। মা নেই, বাপ নেই, ভাই-ভাজ কেউ নেই—তা আমি একটা বুড়ী ধাই রয়েছি হাতে করে মানুষ করেছি—"

"থাক্ থাক্—থামো এখন এলোকেশী—অত কথার দরকার নেই কিছু। ও-আর বিক্রী ক'রব না। হাঁ, লাভ যদি কিছু হত সে ছিল আলাদা কথা। সামান্য ক'টা টাকা যা পাব কদিন আর চলবে ?"

"হাঁ, তাই বলছি, মিছেমিছি অলক্ষণ কেন করবেক গো। একেই ত কবে কপালে কি ঘটবেক—"

"থাক্ থাক্; আর কাজ নেই। কপালে সে সব কিছু ঘটবেক নি আমার, নিশ্চিন্তি তুমি থাক। তাহ'লে এখন কি হবে এলোকেশী ? বল ভরসা ছিল কেবল ঐ জড়োয়া গয়নাগুলো, শুনেছিলাম অনেক দাম ওর।"

"আর দাম। ঠকিয়ে নিয়েছে, হতভাগা বড় বড় সব নামকরা গ্যাকরার দোকানওয়ালাগুলো সাহেবকে—নিজেও ছিলেন সাদাসিদে ভাল মানুষ।"

"ঠকায়নি কেউ, কিনবার বেলায় ঐ রকম দাম দিয়েই সবাই কেনে। কাটাকুটো যাই হক, পাথরগুলোরও দাম আছে, মজুরী-খরচাও অনেক পড়ে। তবে বেচবার বেলায় যে দাম কিছু হবে না, এটা জানতাম না। তা এখন কি হবে এলোকেশী ? সম্বল ত কিছুই আর নেই।"

"তাই ত ভাবছি মিসি দিদি! সাহেবের ঘরে এসে ওরা জুড়ে বসলেক, তোমাকে দিলেক হাতে টুকনী দিয়ে পথে বের করে। তোমার এই হেনস্তাও কি সইতে পারেক কেউ। ইচ্ছে করে যাই একবার ঝাঁটা-পেটা করে দিয়ে আসিগে হতচ্ছাড়া গোষ্ঠীকে।"

"পায়ের জ্বাল গায়েই তোমার মেটাতে হবে এলোকেশী, মিছে বকাবকি ক'রে লাভ কিছু নেই। এখন ভাবতে হবে, আমরা কি করতে পারি ?"

"সেই ত ভাবছি মিসি দিদি সেই অবধি! পোদ্দাররা যখন এই বলে দিলেক, মনে হল আমি আর নেই। চলবেক কি করে ? মাসে ধরগে পঞ্চাশটে করে টাকাও ত লাগবেক। আছে ত আমার হাতে কিছু, সে আর কত হবেক। পাঁচ ছ কুড়ি যদি হয়। টাকাত ত কম কামাই নি তোমাদের ঘরে, অমন বিশ তিরিশ শতেক কুড়িও কি আজ জমত না। তা ঐ হতভাগা বোনপোটা আসে আর সবে সব নিয়ে যায়। ওদের সংসার চলে না, আমিও মায়াটা এড়াতে পারি নি কো। নইলে কি আজ ভাবতাম কিছু ? টাকা ত তোমা-দেরই টাকা মিসি দিদি ?"

কি ভাবিতে ভাবিতে মীনা কহিল, "আচ্ছা, বড় বড় যে সব গয়নার দোকান আছে, এই সব জড়োয়া গয়না তৈরী করে, তাদের কাছে গিয়ে দেখালে হয় না?"

"ও বাবা গো! তাদের সেই দোকানে কে যাবে গো! ঢুকতেই যে পারব নি কো। পারলেও অমনি চোর বলে পুলিশে ধরে দেবেক। না, না, সে আমি পারবো নি মিসি দিদি।"

"না না, তোমাকে যেতে হবে না। নিজে গিয়েই আমাকে দেখাতে হবে।"

"যেতে পার। তবে যো পেয়ে বসবেক না হতভাগারা? দামই দিতে চাইবেক না, ঐ পোদ্দার মিন্‌সেগুলো যা বল্লেক, একটুখানি মিষ্টি কবে—ভদ্দরনোক কি না—তাই বলবেক।"

"তবু একটিবার দেখতে হবে চেষ্টা।"

"দেখতে পার, তবে হবেক নি কিছু। তা সাহেবেরই ত লোক ওঁরা—তাঁরই আফিসে কাজ কর্ম্ম করেন, নিজের লজ্জা করে, বল না আমি গিয়েই সব বলছি। দাদা সাহেবকে চিঠি লিখে হক, তার করে হক, একটি হিল্লে তোমার করে দিন। দুটো মাস—তা তাঁদের ঠেঁসে কিছু না নিতে চাও—আমার হাতে যা আছেক তাই ভেঙেই চালিয়ে নেব। ভাবনা কি?"

"আচ্ছা—দেখা ত যাক্, স্যাকরা দোকানগুলোও ঘুরে একবার আসি। আর—আর—দেখি যদি কাজ কর্ম্ম কিছু পাই।"

চক্ষু দুটি ফাটিয়া জল আসিতেছিল। বলিতে বলিতে হঠাৎ পাশের ঘরটিতে ঢুকিয়া মীনা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

[ক্রমশঃ

পূজারিণী

—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

নিভৃতে আমার দেহের দেউল মাঝে
কিশোর দেবতা ঘুমাইয়া ছিল একা,
কে আসিল হেথা ধীরে পূজারিণী সাজে,
কপোলে তাহার কাঁপিছে অরুণ-লেখা!
কণ্ঠে ছিল যে প্রভাতের কলধ্বনি,
কঙ্কণে ছিল কাঁসরের রণরণি,
কবরী-কুসুমে-খচিত পরশ-মণি,—
অরুণ-আলোকে নিভৃত দেউলে দেখা।
অঙ্গুলী-পরশনে
অঙ্গ-সুরভি সনে,
অরুণ নয়ন বিকাশে দেবতা স্বপ্নের জাগরণে।
বক্ষ-আঁচলে শিহরে চাহনিখানি,—
দেবমন্দির-প্রাঙ্গনে জাগে পল্লবে কানাকানি।

চন্দন-ধূপ-গন্ধে সেরূপ লিখা
দেহের দেউলে দেবতার বেদীমূলে,—
জ্বালে আরতির পঞ্চ-প্রদীপ-শিখা,
সাজাল দেবতা অন্তরে ফোটা ফুলে।
মন্দির-মাঝে দেবতার দেহ-প্রাণ
আরতি-শিখায় রহস্যে মহীয়ান্,
অজনে জাগে মঙ্গলময় গান,
পূজারিণী-বুক সঘনে উঠিছে দুলে।
দেবতা শুধাল বাণী,—
কি বর মাগিবে রাণী?
ইঙ্গিতে শুধু কহে পূজারিণী,—বক্ষের মালাখানি।
দেবতা-অধরে জাগিল শুভ্রহাসি,
কিশোরী বালার শ্যাম-অন্তর প্রান্তরে বাজে বাঁশী।

হামবুর্গ

—শ্রীমতিলাল দাস

হামবুর্গ জার্ম্মানীর তোরণদ্বার। পৃথিবীর সহিত সমুদ্র-পথে জার্ম্মানী যে আনাগোনা চলে হামবুর্গ বন্দরের মধ্য দিয়া সে পরিচয় ঘটে। আমষ্টার্ডামের হীরার কারখানা দেখিয়া হামবুর্গ চলিতেছিলাম।

গাড়ীতে মিসেস কালি ক্রুনার নামক একটি মহিলার সহিত আলাপ হয়। দু'বৎসর পরে এই বিদেশিনীর রূপশ্রী স্মৃতি হইতে মুছিয়া গেছে। চলার পথে এই সুন্দরীর সঙ্গ ক্ষণিকের জন্য অন্তর ভরিয়া রাখিয়াছিল।

মিসেস পল্লীবাসিনী। আলাপে বলিলেন, "য়ুরোপের সহরে চলেছে কামনার তাণ্ডব-লীলা—মানুষ সেখানে পশু—সে আত্মার সন্ধান ভুলেছে।"

প্রশ্ন করিলাম, "তবে আলো কোথায়?"

পথ-বান্ধবী মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পল্লীতে, সেখানে আছে সহমর্ম্মিতা, সমবেদনা।"

য়ুরোপের পল্লীর এই স্নিগ্ধ-মধুর ছবি দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

অসনাব্রুকে গাড়ী বদলাইতে হইল। পথে একটি ডাচ ট্রভেলিং এজেণ্টের সহিত আলাপ হইল।

তরুণ সুদর্শন যুবক।

দুধারে প্রান্তরের পর প্রান্তর চলিয়াছে…শষ্পশ্যাম, কিন্তু বাংলার তরু-শ্যামল প্রান্তর-শ্রীর সহিত ইহার মিল নাই।

সন্ধ্যার পর হামবুর্গ পৌছিলাম।

আলো-ঝলকিত বিদেশী পুরীর পথে নামিলাম আশ্রয় সন্ধানে। স্বাবলম্বী হইয়া নিজের সুটকেশ নিজেই বহিয়া চলিয়াছি। বিদেশী মুশাফির দেখিয়া অর্থ-সন্ধানী দালাল সঙ্গ লইল।

বলিলাম, "ডাঙ্কে (ধন্যবাদ)—প্রয়োজন নেই নিজেই খুঁজে নিতে পারব।" তবু সে সাধ করিয়া সঙ্গ লইল। উঠিলাম Stad Hamburg হোটেলে ১২নং কামরায় রেহিতে তৃতীয় শ্রেণীর সরাই।

য়ুরোপের প্রত্যেক সহরে নানাবিধ হোটেল থাকে, বড় বড় হোটেলগুলি অর্থবান্ ধনীদের জন্য, কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভ্রমণকারীরা অনর্থক এই সমস্ত ঐশ্বর্যলুপ্ত পান্থশালায় ঘরের পয়সা জলে ফেলেন। 'কুকে'র উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা খুঁজিয়া লইলে অনেক সময় মনোমত সুন্দর হোটেল অল্প খরচে মেলে।

দালালটি হোটেল-ওয়ালার নিকট হইতে ১২ মার্ক—প্রায় এক টাকা নিল। অবশ্য সে টাকা হোটেল-ওয়ালা নিজে দেয় নাই—আমার বিলে তাহা আদায় করিয়া লইল। বিদেশে সর্ব্বত্র অযাচিত সাহায্য চাওয়া ভাল নয়, অনেক সময় পস্তাচা

ক্রুনার পরিবার।

দিতে হয়—কিন্তু এ কথা সত্য, ইহারা ঘৃণিত জুয়াচোর নয়, সাহায্যের পরিবর্ত্তে সাহায্য নেয়।

যে হোটেলে উঠিলাম, সেখানে আহারের বন্দোবস্ত নাই। অন্য স্থান হইতে খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। বৃষ্টি হইতেছে তাই বাহির হইলাম না। মিসেস কালি ক্রুনার আমার গৃহ-পরিবারের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কথাবার্ত্তায় আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার কথা ওঠে। তখন তিনি তাঁহার পুত্র-কন্যার দুইটি ছোট ছবি আমাকে দেন। এই চিঠি বাড়ী পাঠাইবার

সময় যে চিঠি লিখি সেটি পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে ভরসায় উদ্ধৃত করিতেছি।

রেলপথ
বেনথিম
বুধ-অপরাহ্ণ

সীমান্তে—হল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর সীমান্তে—আকাশ কালো কালো বর্ষার মেঘে ঢাকা—পত্রহীন তরুগুলি দাঁড়িয়ে আছে নীরবনত—ঠিক আমাদের দেশের বর্ষার ছবি। আমষ্টার্ডম

এলব নদীর সেতু।

থেকে চলবার পথে একটি ডাচ মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল ঘণ্টা দুই, মেয়েটি তিনটি ছেলে-মেয়ের মা, লেখাপড়ার দিকে তার নজর আছে—নানা বিষয়ে আলাপ হল।

ওর কাছে জানলাম, য়ুরোপ কেবল স্বার্থপরতায় ডুবে নেই—ওদের পাড়াগাঁয়ে মানুষ মানুষকে সাহায্য করে, ধর্ম্ম ভিন্ন হলেও আটকায় না।—তা ছাড়া গল্প হল একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ে—সেটা হল নর ও নারীর সম্বন্ধ। একটা বইয়ে পড়েছি, 'এদেশে একটি মেয়েও কুমারীরূপে চার্চ্চে বিয়ের মন্ত্র পড়ে না।—' তার কারণ তার আগেই ওরা স্বেচ্ছা-বিবাহ করে বেড়ায়—এইটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে য়ুরোপে, আগে করত লুকিয়ে—এখন করে স্বাধীন ভাবে।

সতীত্ব এ দেশে নেই বললেই হয়, ওজিনিষ নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না, ক্ষণিকের আলাপ তার পর ক্ষণিকের মিলন—এটা ওদের ধর্ম্মে বাধে না,—দোহাই, চোখে দেখবার সুযোগ হয় নি—কিংবা কোথাও জুটল না—এমন চারুসঙ্গিনী, নারী-মন জয় করবার যে মন্ত্র, তা বোধ হয় আমার জানা নেই—এ চিঠি পাঠাবো জার্ম্মানীর হামবুর্গ সহর থেকে—তার আগে নিশ্চয়ই তোমাদের চিঠি পাবো।

সেই আশায় বুক বেঁধে চলেছি—এই কালো মেদুর আকাশের মধুর আবেষ্টনে মনে জাগছে একখানি কালো মুখ—বল ত কার? ঠিক জান না তুমি?

বৃষ্টি পড়ছে খুব—এমন বৃষ্টিতে চলাফেরা খুব দায়, রাত্রি—হামবুর্গে পৌছে গেছি—যে হোটেলে উঠেছি সেটা মন্দ নয়—বৃষ্টির জন্য আর বার হলাম না—শুয়ে পড়তে যাচ্ছি, ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছে—কাল ডাক দেখে—এ চিঠি ডাকে দেবো—

ভাল লাগছে না, এ উদ্দেশ্যহীন যাত্রা, মনে ভাবছি কি ফল হবে এই অর্থব্যয়ে, এক একবার মনে হয়, বুঝি ভুল হয়েছে, আবার ভাবি এই যে বিরাটের সাথে পরিচয়, মানুষের সাথে এই যে মোলাকাৎ, এ আনবে নূতন দৃষ্টি, আনবে নূতন ভঙ্গী যার ফলে জীবন পুষ্পিত হয়ে উঠবে···

প্রাতরাশ শেষে সদ্যজাগ্রত পুরীর লোকচঞ্চল পথ বাহিয়া কুকের ওখানে চলিলাম, আলষ্টার হ্রদের পাশে আলষ্টার ডাম রাস্তায় কুকের আফিস, এত ভোরে আফিস খোলে নি, তাই হ্রদের তীরে তীরে সহর খানিক দেখিয়া লইলাম।

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আপন পরিপূর্ণতায় প্রকাশমান, কিন্তু বিরহীর চিত্ত পড়িয়া আছে সুদূর প্রিয়জনের জন্য, কাজেই ভাল লাগিল না। নটার সময় আফিস খুলিল, প্রত্যাশিত চিঠি আসে নাই, অন্য দুই একখানি চিঠি মিলিল, সেখান হইতে হামবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গেলাম। এইটি অতিশয় নূতন, মাত্র ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদেশীর ভাল শিক্ষার প্রতি খুব জোর দেওয়া হয়।

অধ্যাপক স্থুব্রিং আসেন নাই শুনিয়া গেলাম নিকটস্থ পশু-শালায়, দর্শনী নাই। খানিকটা ঘুরিয়া পশু দেখিবার উৎসাহ থাকিল না। পাশে বরফের উপর স্কেটিং ক্রীড়া চলিতেছিল।

সেখানে দাঁড়াইয়া আনন্দ-মুখর কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীর ক্রীড়ামোদ দেখিলাম। সেখান হইতে Wilhelm Gymnasium গেলাম। এটি একটি নামকরা স্কুল।

হেডমাষ্টারের সহিত অনেকক্ষণ আলাপ হইল। স্থির হইল, পরদিন ছেলেদের নিকট ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিলাম। অধ্যাপক স্থুব্রিংকে খুঁজিয়া পাইতে

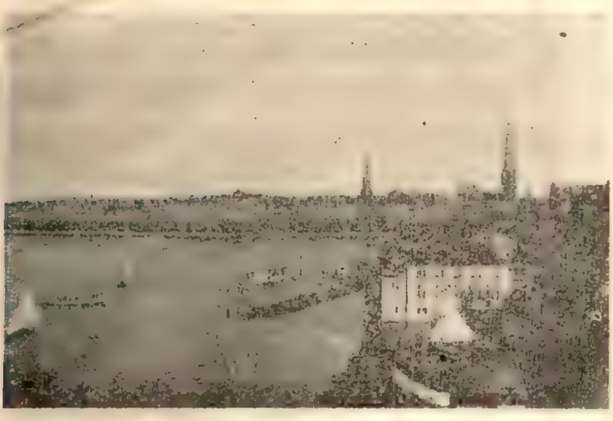

আলষ্টার হ্রদের ষ্টীমার-ষ্টেশন।

একটু কষ্ট হইল। অধ্যাপকের সহিত খানিক আলাপ হইল। বিলাতেই তিনি আমাকে লেখেন যে, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

অধ্যাপকের নিকটে শ্রীমতী হেলেন ফেরার সন্ধান লইলাম। টেলিফোনে তাঁহাকে ডাকা হইল। শ্রীমতী বলিলেন যে, তাড়াতাড়ি আমার চিঠির উত্তর দিতে পারেন নাই, তজ্জন্য দুঃখিত। বৈকালে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীমতীর নিকট অধ্যাপক সরকার পরিচয়-লিপি দিয়াছিলেন।

ফিরিলাম। কাছাকাছি কোনও সুবিধামত খাওয়ার যায়গা না দেখিয়া দোকান হইতে ফল কিনিয়া রাস্তায় লাঞ্চ শেষ করিলাম। তার পর গেলাম kunsthalla বা কলা শালায়। এই চিত্রশালাটি জার্মানীর নামকরা আর্ট-হল। এখানে নানা প্রকার চিত্র-সংগ্রহ আছে। তারপর শিল্প-কারু মন্দিরে গেলাম। এই যাদুঘরে পৃথিবীর নানা দেশ-দেশান্তর হইতে কারু-কলা সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেখান হইতে স্থানীয় ইতিহাস-কক্ষে গেলাম। এলবা নদীর পাশেপাশে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাতে তাহার নানা কালের ঐতিহাসিক সংগ্রহ আছে।

বিকালের দিকে শ্রীমতী ফেরার আতিথ্য গ্রহণ করিতে চলিলাম। সহরতলীতে তাঁর বাড়ী, বাড়ীর নাম বেলভিউ। এক ঘণ্টা আলাপ চলিল। শ্রীমতী বৃদ্ধা—কিন্তু হৃদয়-ভরা সহজ তারুণ্য মুগ্ধ করে। আমি অসলো ও কোপেনহাগেন যাইব শুনিয়া দুখানি পরিচয়-পত্র দিলেন।

আহার করিতে করিতে নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। শ্রীমতী বলিলেন, "য়ুরোপ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার বাঁচবার মন্ত্র আছে ভারতে—"

ভারতীয় দর্শন ও সভ্যতার প্রতি বৃদ্ধার অগাধ-প্রীতি। বুড়ীর অটোগ্রাফের খাতা আনিলেন।

তাঁহাতে বিভিন্ন দেশের যে-সব নর ও নারী ফেরার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের স্মৃতি লিখিত আছে। য়ুরোপে মানুষের বহু খেয়াল আছে, অটোগ্রাফ নেওয়া তেমনিই একটি খেয়াল।

মন্দ নয়, আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন সামান্য জীবধর্ম, মানুষের বিশেষত্ব তার ঐশ্বর্য্যে, অন্তরের সম্পদে, রসের আতিশয্যে। মানুষ তাই খাদ্য সংগ্রহ করিয়াই প্রীত নহে, সে চাহে সৃষ্টি করিতে, সে চাহে প্রকৃতির দাবীকে ছাড়াইয়া উঠিতে। এই প্রেরণার ফলে মানুষের শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্য।

টাউন-হল।

খেয়ালের মূলেও এই আনন্দের আকুতি, এই সৃষ্টির বেদনা, এই বৃহত্ত্বের আকুলতা।

দেখিলাম খাতায় ভারতীয় অনেকের নাম ও রচনা আছে।

আমি বাংলাতে দু'চার লাইনের একটি কবিতা রচনা করিয়া লিখিয়া দিলাম। তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাইলে শ্রীমতী অত্যন্ত খুসী হইলেন।

নিকোলাস গীর্জ্জা।

কি লিখিয়াছিলাম স্মরণ নাই, আমার অটোগ্রাফের খাতা খুলিলাম। বান্ধবীর লেখা জল্‌জল্ করিতেছে, কিন্তু জার্ম্মান ভাষায় লেখা তাঁহার স্নেহ-লিপি আজ বুঝিতে পারিতেছি না।

আজিকার বর্ষণ-মুখর ভাগিরথী-তীর কেবল সেই দিনের মধু-মাখা স্মৃতি হৃদয়ে ফিরাইয়া আনিতেছে।

শ্রীমতী সঙ্গে করিয়া আনিয়া আলষ্টার হ্রদের উপর বোটে উঠাইয়া দিলেন। বোটে হ্রদের উপর সহরে ফিরিতে দুধারে যে দৃশ্য দেখিলাম—সে অনুপম।

দূরে জ্বলিতেছে সহরের তড়িতালোক—জলে পড়িয়াছে তাহার বিম্বিত দ্যুতি, আকাশে তারার মালা। সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ চলে না—ভাষা জানি না। তাই নিসর্গের হৃদয়-হরণ শোভা হৃদয়কে মোহিত করে।

রাত্রে শিলারের 'দৈনিক' নামক নাটকের অভিনয় দেখিলাম। গল্পটি জানা ছিল না—ভাষাও বুঝি না। মূক-অভিনয়ের মত দেখিলাম অঙ্গ-ভঙ্গী।

এ অভিনয় ভাল লাগে নাই—আমার অজ্ঞতাই তার জন্য দায়ী কিনা বলিতে পারি না। মনে হইল যেন কেবল চীৎকার ও হল্লা চলিতেছে—সুকুমার অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় মিলিতেছে না।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বৃষ্টিও চলেছে—কাজেই শয্যার আলিঙ্গন অভিভূত করিয়া রাখিল। উঠিতে একটু দেরী হইল।

পরদিন, বিশে নভেম্বর ভোরে উঠিয়া ব্যাঙ্কে গেলাম। টাকা ভাঙ্গাইতে খানিক সময় কাটিল। তারপর আলষ্টার-ডামে চিঠির সন্ধান করিলাম। মৃগ-তৃষ্ণিকা সে—শুধু আশা জাগায়, তৃপ্তি দেয় না।

ব্যর্থমনোরথ হইয়া চলিলাম উদ্যান-শালায়—তরুলতার মাঝে যদি সান্ত্বনা মেলে।

এখান হইতে জিমনাসিয়াম স্কুলে গেলাম। ছাত্রদের একটি ঘরে জড় করা হইল—উপর ক্লাসের জন ত্রিশ ছাত্র, কয়েকজন শিক্ষকও রহিলেন, আমি আমার ইংরাজীতে লেখা প্রবন্ধ 'ভারতের আত্মা (The Soul of India)' পড়িলাম।

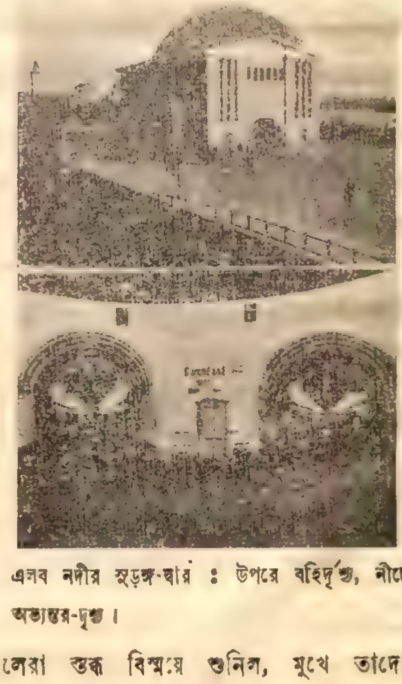

এলব নদীর সুড়ঙ্গ-দ্বার : উপরে বহির্দৃশ্য, নীচে অভ্যন্তর-দৃশ্য।

ছেলেরা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিল, মুখে তাদের জাগ্রত কৌতুহল, অন্তরে প্রবল জিজ্ঞাসা।

প্রবন্ধটীতে ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মধারার কথা ছিল, পাঠ শেষ হইলে প্রশ্নোত্তর চলিল।

একটি বালক প্রশ্ন করিল, ভারতবর্ষের সভ্যতা যদি এত ..., তবে ভারত বৃটিশের শাসনে কেন ?'

এ কথার উত্তর দেওয়া শক্ত, আমি কোনও প্রকারে উত্তর ...লাম।

...র্কের প্রবেশ-দ্বার।

একটি ছেলে বলিল, তাহারা ভারতবর্ষকে খুব ভালবাসে। ...তা শেষ হইলে হেড মাষ্টার অটোগ্রাফে লিখিলেন যে, তিনি ...তায় অতিশয় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ...য়ের পক্ষে এই বক্তৃতা অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে।

মনভোলা মানুষ, প্রবন্ধটী পাঠের পর কোথায় ফেলিলাম, ...জয়া পাইলাম না—স্কুলের কেহ অসদুদ্দেশ্যে ...াছিল কিনা একথা বলা মুস্কিল।

সেখান হইতে এসপ্লানেড হইতে St. Paulico ...কাল ইনষ্টিটিউটে গেলাম। শ্রীমতী ফেরার এই ...ন পড়েন এমন একজন বাঙালী ডাক্তারের ঠিকানা ...াছিলেন। সেণ্ট পৌলি হামবুর্গের আরামকেন্দ্র, ...সিতার রঙ্গভূমি। দিনের পর দিন জলরেখার ...য়ে নীলিমা দেখিয়া যাহারা বিরক্ত হইয়া উঠে, ... সমস্ত নাগরিকদিগের স্থলের ক্ষুধা মিটাইবার ...শ্য আয়োজন এই সহরতলীতে বর্তমান।

দেখা হইল ডাক্তার গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে। বাঙ্গালী ...বল এই আত্মীয়তার খাতিরে অনেক দূর আসিয়া- ... কিন্তু আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ভদ্রলোক একান্ত ...ডিগ্রীর মোহের জন্ত বিদেশে পড়িয়া আছেন, না ...ছেন য়ুরোপের কর্ম্মমাদকতা, না পাইয়াছেন জীবনরসের প্রাচুর্য্য। ঘণ্টা দুই সময় অনর্থক অপব্যয় করিয়া এলব নদীর টানেল দেখিতে গেলাম।

সেণ্ট পৌলির ঘাটের নিকট একটি গম্বুজ দেওয়া দীর্ঘ মিনারের মধ্য দিয়া টানেলের নীচে নামিতে হয়। লিফ্‌ট আছে। নদীগর্ভের ২০ ফুট নীচে দিয়া টানেল চলিয়াছে। ১৯০৫—১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু অর্থব্যয়ে এই সুড়ঙ্গ-পথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

নীচে নামিলে দুটী সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী দিয়া ওপারে যাইতে হয় অপরটী দিয়া ফিরিতে হয়। এই সুন্দর টানেলটী জার্ম্মান কারু-বিদ্যার চরম কীর্ত্তি।

দেখিয়া মনে বিস্ময় জাগে। জার্ম্মানী—প্রগতি মন্ত্রের উদ্গাতা। জার্ম্মানীর মনীষীরা বলিয়াছেন, 'মানুষের ধর্ম্ম প্রগতির ধর্ম, মানুষ বসিয়া রহিবে না, সে চলিবে অনন্তের পানে, এই চলাই তাহার সার্থকতা।'

এলবা নদীর এই চমৎকার সুড়ঙ্গটি দেখিলে মনে হয়, এই তত্ত্ববিদ্যা জাতির চরিত্রে বিফল হয় নাই, প্রগতির তত্ত্ব ইহাদের অধিকৃত হইয়াছে।

ফিরিলাম ট্রপিক্যাল ইনষ্টিটউটের পাশ দিয়া। নানা দেশ-দেশান্তরের মানুষের দহরম মহরম চলে, তাহাতে পরিচয়ের পরিধি বাড়ে, কিন্তু ফলে আসে নানা আগন্তুক ব্যাধি।

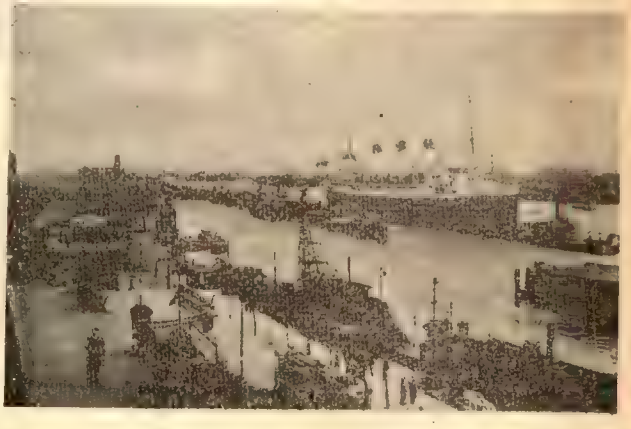

বন্দরের দৃশ্য।

এই ব্যাধি নিরাকরণের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি

অদ্ভুত ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে। আমাদের পরিচিত হইবে বলিয়া ম্যালেরিয়া-নিবারক 'প্লাস্‌মোচিন' এবং 'আটে-ব্রিনে'র নাম করিতে পারি।

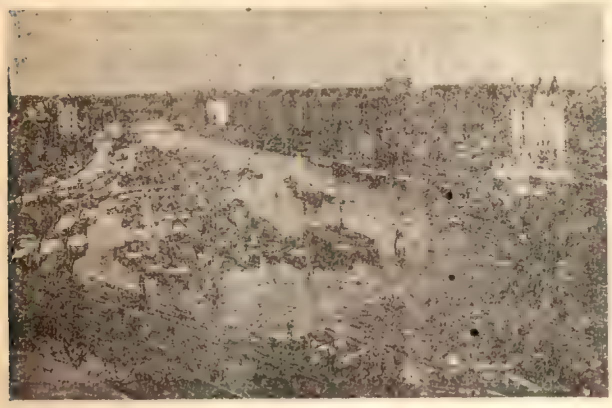

খাল।

এখান হইতে হামবুর্গের হাইকোর্টে গেলাম। বেলা বেশী হইয়াছিল, একজন মাত্র জজ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আধ ঘণ্টার উপর আলাপ হইল। লোকটি রসিক ও অমায়িক।

আমার সঙ্গে আইনের নানা জটিলতার খোস্‌-গল্প করিলেন। ডাইভোর্স আইনের নিন্দা করিলেন।

ভারতবর্ষের বিচার-প্রথার সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রশ্ন করিলেন। ডায়েরীতে সকল বিষয় লিখিয়া রাখি নাই। ভাবিয়াছিলাম পরে মনে পড়িবে।

বয়স বাড়িতেছে, ছোট বয়সের অদ্ভুত স্মৃতির দাবী করিতে আর পারি না। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-বাসরে রামায়ণ গান হয়, লেখক তখন আট বৎসরের বালক। রামায়ণের সমস্ত সঠিক আবৃত্তি করিয়া কাকার নিকট রামায়ণ পুরস্কার পাই। সেদিন আজ নাই, দু'বৎসর পরে সে দিনের কথাবার্ত্তার ভাবাংশ ছাড়া সব ভুলিয়া বসিয়াছি। জজের নামও লিখিয়া রাখি নাই, তিনি বৃটিশ আইনের কয়েকটী ত্রুটির কথা বলিয়াছিলেন, সে গুলিও বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে হামবুর্গ ডোমে মেলা দেখিতে চলিলাম। প্রত্যেক বৎসর নভেম্বর মাসে এই বড় মেলা বসে। মিউনিকের মেলার পরেই হামবুর্গের মেলা। আমাদের দেশের মেলার মত খেলা ও কৌতুকের যথেষ্ট আয়োজন, নানা প্রকার নাগর-দোলার আয়োজন, তা ছাড়া নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় হয়। রাত্রিতে আলো-মালায় দীপ্ত ডোমের শোভা চিত্ত-চমকপ্রদ হয়, কি রাত্রিতে উৎসব-সমারোহ দেখিবার সৌভাগ্য ঘ নাই। দিনে দেখিয়া দধির স্বাদ ঘোলে মিটাইতে বাধ্য হইলাম।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগ-সূত্র এই মেলার মধ্যে দেখিতে পাই। মধ্য-যুগে মেলাগুলিই ছিল বির প্রদর্শনী, ইহাতেই মানুষের যাযাবর প্রবৃত্তি এ আনন্দানুরাগ মিটাইবার সুযোগ মিলিত। সভ্য কালকে হটাইয়া অনেক অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু অতীতে সঙ্গে নাড়ীর যোগ কেহই কাটাইতে পারে না, দে দেখিয়া এই কথাটিই বারে বারে মনে হইয়াছিল।

ডোম দেখিয়া টাউনহল দেখিতে চলিলাম হলটি ১৮৮১ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মি হইয়াছে। ইহাতে জার্ম্মান রেনেসাঁশ যুগের স্থাপত্য কলার পরিচয় বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই খানে সিনেটের অধিবেশন হয়। একটি সুবৃহৎ সভা-গৃহ আছে ভগেলের তৈরী বিরাট ছবিতে হামবুর্গ সহরের বিভি কালের মনীষী ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি দিগের পরিচয় দেও আছে। হলের উপর জার্ম্মান ঈগল সহরের স্বাধীনতা প্রতীক স্বরূপ শোভা পাইতেছে।

সারাদিন ঘুরিয়া ক্লান্তি লাগিল। ফিরিয়া The Ci

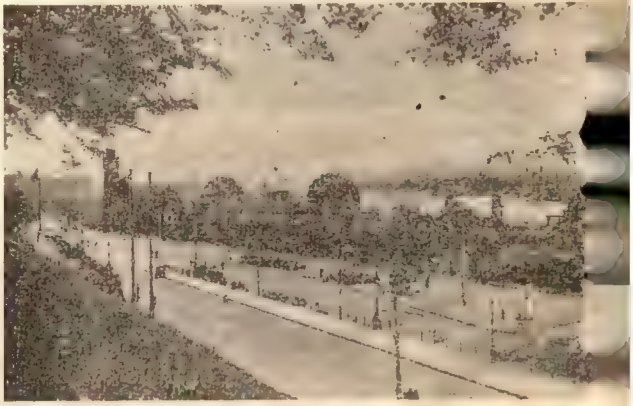

সেণ্ট পৌলির ঘাটের পাশের রাস্তা।

Theatre এ একটী ছবি দেখিলাম। ছবিটি বিশেষ লাগে নাই। য়ুরোপের সহরে যে সব চিত্র গৃহ দেখি তাহারা কলিকাতার সিনেমার চেয়ে বিশেষ উচ্চ নহে।

অন্তঃপুর-শিক্ষা

[পঞ্চাশ বৎসরের কথা]

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। দেখিয়াছি জ্যেঠাইমা, খুড়ীমা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই দুর্গানাম বা নাম করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেন, তখন হইতে বাট্‌না-বাটা, জল-তোলা, রান্না-বান্না তি এক সংসারের যাবতীয় কাযে নিজেদের সমস্ত ব্যাপৃত রাখিতেন, সন্ধ্যাবসান হইলেও তাঁহাদের দ্য-কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইত না। সংসারের সমস্ত কাজ শেষ রার পরও তাঁহারা শয়নের পূর্ব্বে রামায়ণ বা মহাভারত য়া সনাতনী পাঁচালী পড়িবার ঢঙে সুর করিয়া তে বসিতেন। ছেলেরা মায়ের হাতের তৈয়ারী, নও ডালসহ মাছ-ভাত বা অভাবে কখনও শুধু আলু-তে ভাত খাইয়াই স্কুলে যাইত—বিকালে খেলাধূলা ও বাড়ি ফিরিয়া পড়িতে না বসিলে মায়ের তাড়া ত—এবং সর্ব্বশেষে রাত্রের আহারের পর গোল বসিয়া মায়েদের কণ্ঠের সুর-করা পুরাণ-কথা ত।

তখন হইতেই শিশুদের কোমল মনে পরবর্ত্তী লে পরিণত ধর্ম্মভাবের বীজ সঞ্চারিত হইত। গৃহে র এই অমূল্য শিক্ষাদানে কত ছেলে বড় হইয়াছে, হাদের হৃদয়ে ভারতের সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা অঙ্কুরিত য়াছে এবং মিথ্যা প্রভৃতি জঘন্য অভ্যাসে ঘৃণা য়াছে। মায়েরা যে ব্রত ও পূজা করিতেন, সৎকথা করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণের মনেও ত্বিকভাব সঞ্চারিত হইত। মনে আছে শিশুকালে রে উঠিয়া একদিন শুনিলাম, মা কৃত্তিবাসের রামায়ণ তেছেন। সীতার বনবাসের কাহিনী পড়িতে পড়িতে র চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল—চিরদুঃখিনী সীতার পাঁচালীর সুর বেতালা হইয়া যাইতেছিল। যে সীতার কাহিনী শুনিলাম, আজও সীতার কথা পড়িলে মায়ের কাছে শুনিবার সময় যে-মূর্ত্তি কল্পনায় অঙ্কিত করিয়াছিলাম, সেই মূর্ত্তিই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আর একবার সিন্ধুমুনির কাহিনী শুনিতেছিলাম—একমাত্র সম্বল পুত্রের জন্য অন্ধমুনি ও মুনিপত্নীর বিলাপের মর্ম্মভেদ বিবরণ শুনিয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলাম।

তার পরে কতবার দেখিয়াছি, হিন্দুমহিলার কোলে স্তন্যপানরত শিশু মায়ের নিকট কৃষ্ণের শতনাম শিক্ষা করিয়াছে। ঠাকুরমা-ঠানদিদির কাছে গল্পচ্ছলে রামচরিত, যুধিষ্ঠিরচরিত শ্রবণ করিয়া উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। এই উচ্চাদর্শেই বালকগণ অধর্ম কথা মুখে আনিতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়াও পরের অহিতসাধনে সমর্থ হয় নাই। আবার সঞ্চয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াও ভিখারীকে বিমুখ করিতে প্রয়াসী হয় নাই।

ছেলে-মেয়েদের, বিশেষতঃ ভাবী গৃহিণীদের হৃদয় সে-সময়ে গৃহিণীদের অনুষ্ঠিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য নিত্য-কর্ম্মদ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত হইত। অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলাগণ অন্যান্য কাযের পূর্ব্বে কলাপাতার উপরে খাগের কলম দিয়া ন্যূনকল্পে একশতবার দুর্গানাম বা হরিনাম লিখিতেন, তারপর সেই সব কলাপাতা চালের বাতায় গোঁজা থাকিত—শুষ্ক হইয়া গেলেও তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইত না। বাড়ীর লোক দূরদেশে কোথাও যাইতে হইলে তাহা মাথায় ঠেকাইয়া যাত্রা করিতেন। প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষার ইহাও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

বস্তুতঃ এই প্রণালীতে তখন গৃহে যে অপূর্ব্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল, এই সব শিক্ষায় বালক-বালিকাগণের হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত হইত, কালক্রমে তথাকথিত প্রগতির চাপে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। অথচ কোন বিদ্যালয়ে এই সব মহিলা এই শিক্ষা লাভ করেন নাই, অনেকেই লেখা-পড়া জানিতেন না, কেহ কেহ নাম

ত শুধু চিঠি-পত্র হিসাবাদি মাত্র লিখিতে পারিতেন আর সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে পারিতেন।

বিদ্যালয়ে পঠিত শিক্ষা যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে; আমাদের শিশু-বয়সেও কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি সহরে মেয়েদের জন্য উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে শুনিয়াছি। চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, কামিনী রায় প্রভৃতি বিখ্যাত মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-করা ছাত্রী। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অল্প এবং ইঁহাদের কথাও বহু পূর্ব্বের। ইঁহাদের অধিকাংশই আমাদের ১২।১৩ বৎসরের সময় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। বাল্য-জীবনের শেষে প্রথমে যখন ঢাকায় যাই, তখন সেখানে 'ইডেন ফিমেল বিদ্যালয়' ছিল। প্রধানতঃ ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই সেখানে পড়াশুনা করিতেন; কদাচিৎ দুই একজন হিন্দুমেয়ে সেই স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মগণই প্রথমে ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের দিক্ হইতে তখন এই সব শিক্ষার জন্য হিন্দুদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত না। তাঁহাদের রক্ষণশীলতা ইহার একটি কারণ বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পৃথক্ আচরণও ইহার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ; মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মগণ এমনভাবে চলাফেরা করিতেন যে, হিন্দু ও ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যে দূরত্ব ক্রমে যেন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। এই আচরণগত বৈলক্ষণ্যের জন্যই হিন্দুগণ বা ব্রাহ্মগণ পরস্পরকে বিশেষ আপন মনে করিতে পারিতেন না। ফলে সেই সময় হিন্দুর অন্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে বর্ত্তমান শিক্ষার বিশেষ আলোক-স্ফুরণ হয় নাই।

এবংবিধ পার্থক্য হেতু প্রথম স্তরে সার্ব্বজনীন নারী-শিক্ষার তেমন বিস্তৃতি হয় নাই বটে, কিন্তু স্বতঃপ্রসারিত স্ত্রীশিক্ষার দুর্দ্দমনীয় বেগ কেহ রোধ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে মেয়েরা পড়াশুনা করিলে সনাতনীরা তাঁহাদের বৈধব্যের ভয় দেখাইতেন, সেই সংস্কার ক্রমে দূরে সরিয়া যায়।

হিন্দুগণ ব্রাহ্মগণের অসহযোগিতায় অথচ তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় মেয়েদের কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা বোধ হয় বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহারা প্রথমতঃ পূর্ব্বকথিত গ শিক্ষারই সংস্কার করিয়া এক প্রকার অন্তঃপুর-শিক্ষ বন্দোবস্ত করিলেন। প্রায় একই সময়ে 'বিক্রমপুর সম্মিলন 'ফরিদপুর সুহৃদ্-সম্মিলনী' ও 'মৈমনসিংহ সম্মিলনী'র প চালনায় পূর্ব্ববঙ্গের একাধিক অঞ্চলে মেয়েরা অন্তঃপ থাকিয়াই নানাশ্রেণীর পরীক্ষা দিয়া পারিতে পাইতেন। নিম্ন প্রাইমারি, উচ্চ প্রাইমারি ও ছাত্র পাঠোপযোগী পুস্তকাদির পরীক্ষা হইত। শিল্প ও সু কার্য্যেরও বিশেষ অনুশীলন হইত। 'সুশীলার উপাখ্য এই সময়ের একখানি বড় উপাদেয় গার্হস্থ্য উপন্যাস ছি ঐ সকল পরীক্ষায়ই এই বই খানির উপর খুব জোর দেও হইত। কিন্তু এ-ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা অধিকদিন স্থ হইল না। অনতিকালের মধ্যেই উক্ত সম্মিলনীগু উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে অন্তর্হিত হইতে লাগিল ফলে অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রসারও তখন এইভাবে এক র রুদ্ধই রহিল।

পশ্চিম বঙ্গাঞ্চলে এই ধরণের শিক্ষা-দানের ব্যব একেবারে হয় নাই এ কথা বলিতে পারি না কিন্তু নগণ্যই বলিতে হইবে। পশ্চিম বঙ্গ এমন কি সমস্ত ব শিক্ষাকেন্দ্র কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে তখন ব্রাহ্ম মিশনারি প্রভাবযুক্ত প্রগতিশীল শিক্ষা চলিতেছিল। শিক্ষা যে কল্যাণকর হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্ম দেশীয় খৃষ্টান সমাজভুক্ত মেয়েদের অনুকরণে হিন্দু মেয়ে হিন্দু দেবদেবী, হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও আহারাদির উ বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন। কুশিক্ষা, শিক্ষা ও অশি একত্র সংযুক্ত হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কারের মূ কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইল। এই দুর্দ্দিনে মহারাষ্ট্রী গঙ্গাময়ীর (মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর) কলিকাত শুভাগমন হিন্দু অন্তঃপুরের জাতীয়তার সংরক্ষণে শুভমুহূর্ত

কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সনাতনী হি সমাজে এই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী মহিলার নামও অ নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ মাত্রেই অতি শ্রদ্ধার সহিত উচ্চা হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মসাধনের ফলে অশীতিবর্ষেও খুব দ্রুত চলাফেরা করিতে পারিতেন। কেহ বলেন, তিনি না কি রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সমসাময়ি

র স্তোত্রপাঠ না কি শুনিবার বস্তু ছিল। তৎকালীন
মাজের মহিলাদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম ও আদর্শের
র অভাব দেখিয়া তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটের বিখ্যাত
কালী পাঠশালার' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্বন্ধে একটি
এখানে উল্লেখযোগ্য।

কবার তিনি কালীঘাটে মা-কালী দর্শনে আসিয়া-
ন। মাকে দর্শন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার
দেখিতে পাইলেন একটি বার তের বৎসরের
কা তাহার সঙ্গের একটি বর্ষিয়সী মহিলাকে মন্দিরে
শ করিতে নিষেধ করিতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া
রটি দেখিলেন—মেয়েটি মহিলাটিকে (সম্ভবতঃ
র মা) মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিতে নিষেধ
তছে, আবার মাও সেকথা গ্রাহ্য না করিয়া মন্দিরের
অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মেয়ের
পারিয়া উঠিতেছেন না। মাতাজী সব শুনিয়া ও
সেই মহিলাকে বলিলেন, "মা, তুমি আমার
ল, আমি তোমাকে প্রণাম করাইয়া আনি।"
ট মাতাজীর হৃদয়ে বড়ই গভীর ভাবে রেখাপাত
। মা-কালীর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে সে-
নি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ কর,
শিক্ষার উচ্ছেদ করিতে পারি।'

পাঠশালার' সূচনা হয় এইখানেই।
াচটি মেয়ে লইয়া বিদ্যালয়ের পত্তন
-সংখ্যা পাঁচ শতে উঠে। পাঠ ও
স্ত ছিল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা-
ও স্তবাদির উপরেই প্রাধান্য
। ক্রমে মহাকালী পাঠশালার
স্থানে স্থাপিত হয়; এবং
ালা হয়। এরূপ বহুদিন

দ হইল না।
াপদ্ধর্ম্ম-

মনোযোগ দেখা যাইত না। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, এই শিক্ষায় ধর্ম্মহীন শিক্ষা অনেকটা নিবারিত হইয়াছে।

কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, লোকপ্রিয়তার তুলাদণ্ডে ইংরাজীশিক্ষার মতপন্থীরাই ওজনে ভারি হইয়াছেন। সেই কারণেই বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, যথ-তথা বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। স্কুল করিবার বাসনা যেন সকলের একটা সখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কেহ সংস্কারের জন্য করেন, কেহ ধর্ম্মের জন্য, কেহ বা নামের জন্য আবার এমনও দেখা যায়, কেহ কেহ লাভের জন্যও স্কুল স্থাপিত করেন। স্বীকার করি, বিদ্যালয়ের প্রসারের সঙ্গে 'বিদ্যা'রও কিছু প্রসার হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে দুর্নীতিও বাড়িয়াছে এ-কথাও স্বীকার করিতে হয়। অনেক শিক্ষিত মেয়ে (যদিও সংখ্যায় অল্প) কলেজ হইতে পাশ করিয়াও সংসারে যাবতীয় কাজ নিপুণ ভাবে নির্ব্বাহ করেন, আবার অনেক মেয়ের মধ্যে দুর্নীতিমূলক পাশ্চাত্য প্রগতি অতিমাত্রায় পুষ্টি লাভ করিয়াছে। অনেক স্থলে বি.এ. এম.এ. পাশ করিয়াও মেয়েদের আশ্চর্য্য গৃহধর্ম্ম-পরায়ণা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছি। এমন মেয়েও দেখিয়াছি, ছেঁড়া কাপড় পরিতেছে, সারা বাড়ীতে গোময়লেপ দিতেছে, পরিচারিকার ন্যায় সংসারে সমস্ত কায করিতেছে, আবার স্বামীর সঙ্গে বার্ক-শেক্সপীয়র, ব্যাস-বাল্মিকী লইয়াও সমানভাবে তর্কালোচনা করিতেছে। পক্ষান্তরে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে—কলেজে পড়িয়া পুরুষের সমকক্ষ হইতে গিয়া মেয়েরা পুরুষের অনুরূপ কার্য্য করিতেছে এবং সমবয়স্ক যুবকের সহিত মিশিয়া বায়োস্কোপ-থিয়েটার, পার্টি প্রভৃতিতে গতায়াত করিয়া পাশ্চাত্য প্রগতির চরমাদর্শ প্রদর্শন করিতেছে। শিক্ষা খারাপ নহে, কিন্তু শিক্ষার অসঙ্গতি বা কুশিক্ষাই ঘৃণ্য। এখনও এমন মহিলা আছেন, যাঁহারা কর্ম্মক্লান্ত স্বামীর দেহ-মন সুস্থ রাখিতে নিজে বহুবিধ কষ্ট সহ্য করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিত নারীপ্রগতিপন্থীরা
নে করেন উহা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার—কিন্তু উহার
দেশের নীতি ও সমাজের যে কত ক্ষতি হয়
লোকে মোটেই অনুধাবন করে না।

এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই জার্ম্মান্ জননেতা হের্ হিট্‌লার্ মেয়েদের সংসারধর্ম্ম করিবার জন্য আদেশমূলক ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তরেই হোক, গৃহের বাহিরে বিদ্যালয়েই হোক, সম্পূর্ণ শিক্ষিতা হইয়া যেন স্ত্রীজাতি গৃহধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ না হন ইহার ব্যবস্থাই প্রকৃত শিক্ষা এবং ভারতে সেই শিক্ষারই একান্ত প্রয়োজন।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও একটি কথা বলিতে চাই। স্ত্রীশিক্ষা যে প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি ভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হয়, সে বিষয়ে দেশের অভিভাবকগণ চিন্তা করেন নাই। সরকারী কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য ইংরেজ সরকারের কতকগুলি দেশীয় লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজ এদেশে স্কুল-কলেজ স্থাপিত করেন। আজিও সেই আদর্শ আমাদের স্কুল-কলেজগুলি অনুসরণ করিতেছে। বালিকাদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রবর্ত্তন না করিয়া দেশের লোক বালকদের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছে। আজও বালকদের বিদ্যালয় ও বালিকাদের বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন প্রভে... নাই। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যতই বাড়িতেছে ততই তাহা... জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও নারীজীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যা... আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এ-বি... চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। চাকুরি করিবা... নারীদের শিক্ষার এত সমারোহের সত্যই কি... প্রয়োজন আছে? যাহাতে তাহারা আদর্শ গৃহিণী... আদর্শ জননী হইয়া উঠিতে পারে এদেশে সেই শিক্ষা... প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত। জাতিকে বাঁচাইতে হ... আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ জননীর প্রয়োজন।

আর আর একটি কথা, গৃহ-সংসার ও বিদ্যা... উভয়ের মধ্যে একটা সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য না থা... কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না। বিদ্যালয়ে নারীর... যাহা আদর্শ শিক্ষা তাহা দিয়া লাভ নাই, যদি... শিক্ষা বিপরীত পথে যায়। আমাদের গৃহের বিদ্যা... শুচি-সুন্দর না হইলে বিদ্যালয় কিছুতেই অ... আদর্শ শিক্ষায় পুনর্গঠিত করিতে পারিবে না। দে... কি এইদিকে অবহিত হইবেন না?

নর ও নারী

...আমাদের সুন্দরীগণ যে পুরুষের তুলনায় অধিকতর মনোহারিণী ও শান্তি-প্রদায়িনী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই... শরীরবিধান যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান পুরুষকে এমনভাবে গঠিত... পরিচালিত হইতে পারিলে পুরুষগণের পক্ষে স্ত্রীলোক ছাড়াও সংযত, সুস্থ ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য হই... পক্ষে পুরুষ ছাড়া সংযত, সুস্থ ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য নহে। যে মনোমুগ্ধকর রূপ, রস ও গন্ধ লইয়া... পশুভাবাপন্ন জীবগণের আকাঙ্ক্ষা ও লুণ্ঠনের সামগ্রী হইয়া পড়ে, তখন পুরুষ না হইলে স্ত্রীলোকগণের রক্ষা পাওয়া কে...

ইহারই জন্য এক দিন স্ত্রীলোকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুরুষকে পালনকর্ত্তা অথবা 'ভর্ত্তা'রূপে গ্রহণ... হইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকের রূপ, রস ও গন্ধ-বিষয়ক বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জানা যাইবে যে, উহা... হয়, তখন স্ত্রীলোক দেবত্বের আধারস্বরূপ হইয়া থাকেন এবং দুই-এর মিলনে দেবতাসদৃশ... স্ত্রীলোকের ঐ রূপ, রস ও গন্ধ একাধিক পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের সামগ্রী... বুদ্ধিহীন অসুরের মাতা হইতে থাকেন।...